

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Roll No. KLMLOK 2007	Place of Publication: ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି, କଟକ
Collection: KLMLOK	Publisher: ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
Title: ଶ୍ରୀମତୀ	Size 6" x 9" 15.24 x 22.86 c.m.
Vol. & Number: ୧/୧-୧୨	Year of Publication: ୧୯୭୯-୧୯୮୦
	Condition: <input checked="" type="checkbox"/> Brittle <input checked="" type="checkbox"/> Good
Editor:	Remarks:

CD Roll No. KLMLOK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি

গবেষণা কেন্দ্র

১৮/এম. ট্যামার স্ট্র., কলিকাতা-৭০০০০১

জন্মভূমি।

মাসিক পত্র।

(প্রথম বর্ষ)

১২৯৭ সালের পৌষ হইতে ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা.

৩৪।১ কলুটোলাস্ট্রিট, বঙ্গবাসী-গ্রীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৮ সাল।

মূল্য ২০ একটাকা চারি আনা।

ডাঃ মাঃ ১০/০ ছয় আনা।

নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা
অগ্রদ্বীপ	দেশজীবনী :—পেশি উৎসব (পদ্য)	১৭৭
অজিতান-শকুন্তল	শ্রেষ্ঠ হস্তশিল্প	১৮০
ও গল্পপ্রণালি	নিবন্ধমালা	১৮৬
অমৃত-নিধি	নাম-মাধুর্য্য	১৮৬
অজ্ঞানের বিস্তারপদর্শন (পদ্য)	‘নিজস্ব ও পরস্ব’	১৮৭
অর্থদাতার	নিমিত্তে অস্পষ্টত্ব ও সঙ্গীত (পদ্য)	১৮৭
অশোক-কানন (পদ্য)	নেপোলিয়নের কারাবাস	১৮৮
আকাশ (পদ্য)	নেপোলিয়নের (নির্মলসন)	১৮৮
আমাদের হাজত	দৈশ সঙ্গীত	১৮৮
আমার জীবন-চিত্রিত ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯	পদপাশ	২০
আয়তনের	প্রাণের গান	২০৯
আয়তনের বাসনা অনুভব	প্রাণ ও পুণ্য (পদ্য)	২১৩
ইংরেজের পরত্নী-গমন	প্রাণদত্তে বীরের স্বপ্ন (পদ্য)	২১৬
ইন্দ্রাজ	শ্রেষ্ঠ ও পরী	২১২
ঐশ্বর্যচন্দ্র বিদ্যাসাগর	শ্রেষ্ঠ-পূজা (পদ্য)	২১৮
উদ্ভাস	প্রেম-প্রাণ-প্রণয় :—জমার আসনে বুঝাজ	২১৮
উষারত্ন আলোচ্য	প্রেমের জিহবার (পদ্য)	২১৮
এ এক নতুন খেলা (পদ্য)	জলধরে (পদ্য)	২১৯
একাকাকানন	জাগরণ (পদ্য)	২২৩
কন্দলী	ভারতবর্ষের কৃষি	২২৯
কলি	ভারতে সংস্কৃতচর্চা	২২৯
কলিঙ্গ রাজ্য	ভারতে স্বর্ষ	২৩০
কাশিরাজ এবং কাশিরাজ	ভারতের কৃষি-উদ্ধার ও ডাকার ভেদস্ব	২৩২
কে বৌদ্ধ স্থল ? (পদ্য)	মণিপুর	২২৮
গর্ভধান-ব্যবস্থা	মণিপুর-আবিসার	২২৮
গোপাল-ব্যবস্থার মন্তব্য	মণিপুরে মহাঘিটার	২২৮
গো-জাতি	মণিপুরে বিভাগ	২২৮
গো-মত	মণিপুরে বীর বন্দী	২২৮
চাতকী (পদ্য)	মণিপুরে মণিপুর	২২৮
ছাত্র-মোড় (পদ্য)	মহাবিদ্যালয়-গান (পদ্য)	২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১
জাতিবিচার	মুর্শিদাবাদের নবাব	২২৮
জীবনের শেষ বর্ষহস্ত	রাজচন্দ্রজাতী শিখিন্দ্রগীতি (পদ্য)	২৩০
জীবন-তত্ত্ব	রাজ-চিত্রিত	২৩১
জগদীশ শঙ্কর	রাজা রাজেন্দ্রগোপাল শিল্পের জীবনী	২৩২
জীবন-কালী	রাজনাথ	২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০
জীবনী	রূপ (পদ্য)	২৪০
দাবা-কোলা	রূপ-আবিষ্কার	২৪০
দ্রুতিমের-নির্দেশ (পদ্য)	বোধ	২৪০
দেবোদ্যোগ প্রভৃতি	বোধের দুর্গোৎসব	২৪১

কেন এমন হইল? কেন মানিকপত্রের অবস্থা এত শোচনীয় হইল? কেন, কোন পাশে, কোন অভিধানে? কেনও মানিকপত্র বসনেষে এপরিচয় হুচাকরণে চালিত?—হইল না? বসনেষে সাপ্তাহিক সংস্কারের উৎসবরূপে চলে,—তবে না কেনই সংস্কারের? প্রত্যহ প্রত্যহে হুনিয়ের বৈদিক প্রকাশিত হয়,—প্রতি সপ্তাহেই নির্দিষ্ট দিনে সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়,—কিন্তু বহু বেলা, এই মানিকপত্রের বেলায়। কেনই এই বিবির বিভ্রম?—মানে মানে, নির্দিষ্টকালে বা নির্দিষ্ট দিনে—কখনও কোনও মানিকপত্র কনিষ্ঠকালে প্রকাশিত হইল না। রাত্রিকাল হইতে আজ পর্যন্ত কেহোই সেবিতে কৈশ পরিপক হইল, চোখে চালিয়া ধরিল—কিন্তু কেহোও স্থলে মানিকপত্র প্রকাশের শৃঙ্খল কখন দেখিলাম না। বৈশাখের মানিকপত্র বাকি তুমি আবার মানে পাইলে,—তাহা হইলে, তুমি স্থাপনাকে জগদ্যবনী বলিয়া ভাবিও। কিন্তু এরূপ স্থ-পেতেগোত্রী বা ময়ূরচর সজ্জিত হইলে? বৈশাখের পর, অক্টোবর পর্যন্ত শারদীয় পূর্ণার পূর্ব পাইবে,—আবারও, পুত্র সন্তান আর বেধা দিবে না! আবার কোন কোন মানিকপত্র আছে,—গীষ্মের মনে অমর বর পুত্রহইলে। মুহূর্ত্তাধরে কিছুই হয় নাই,—সেই বহু না থাকুক, মাসে না থাকুক, অতি চুই হউক,—তখান তাহার মরিলে না। বাজারে রাষ্ট্র, মুহূর্ত্তাহইবে; এক বৎসর বা দেড় বৎসর খেঁস সংবাদই নাই,—হঠাৎ একদিন দেগিলাম,—মুহূর্ত্তেই ঝড়িয়া আসিল। এ কি কুতূং না,—নিভাওনা?—কিন্তু কখন দেগিলাম, ১৯২৫ সালের বৈশাখ মাসের মানিকপত্র ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসের হুজুগত হইয়াছে। কাঁচের বসিত হয়,—ইহা কি মরিয়া কুত হইয়া আসিল? না,—মহা মতাই বাবৎ পণ্য? কলকাতা,—ইহাদের মুহূর্ত্ত নাই,—ভর মসে মসে হউক, এক বৎসর পর হউক, বা দুই বৎসর অল্প হউক,—সেই ‘মানিকপত্র’ কবিত্ব থাকিয়া প্রকাশিত হইবেই,—তখান কীনা-মরবর কিছু—তাই করিবেন না। বিভ্রমের অবধিও নাই,

পর্যন্তও নাই—আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত স্রষ্টাই নিরুপকার। কেন—এমন হয়? কারণ কি? কার্য মেনে ওস্তাদ, আয়োজন সেইজন্য প্রস্তুত চাই। ভীমগিরি ভারিহে হইবে, তুমি একা কলি কলি দান লইয়া, কণাঘণ্টে কুই কুই করিয়া, বা গিছে আরম্ভ করিলে—কিন্তু তাহাতে দ্বন্দ্বনে সিদ্ধিলাভ হইবে কেন? হুনি বাসুন, দাঁড় বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে চাও; হুনি পশু, পক্ষত লম্বন করিতে চাও; তুমি অমর এবং অমৃত, অমৃত তুমি দশ দিক্ দিগন্ত চক্রে দেখিতে চাও। তোমার কোথাও কিছুই নাই। তোমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই,—তুমি উন্মোচী নও, অধ্যায়ী নও, প্রাণশীল নও,—তোমার বিদ্যা—বুদ্ধি নাই, অভিজ্ঞতানাই, বহুধর্মিতা নাই,—তুমি সংসার-ভিখারী,—তুমি হুনিয়ার ফকীর,—অমৃত তুমি ব্যতি ওস্তাদ হইবে হুজুগত করিতে অভিজ্ঞ নাই। তুমি তোমার চাল নাই, তববারি নাই—হুনি নির্দিষ্টম সন্ধান—তুমি তালপত্রের দিপাহী—অমৃত তুমি অমৃতকর—কেতসময়ের সেনাপতি সাজিবার জন্ত ব্যাকুল।

মানিকপত্রের এ ব্যাপার—অথবা উহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ব্যাপার। অনেক সময় দেখিবে,—দ্বৈত বোকের রেখাবিহীন নয় দুই মানিকপত্রের সাম্প্রদায়িক। ভবিষ্যৎ জানা নাই, উত্তর-পূর্ব জান নাই, হুই-মার্ম জ্ঞাত নাই,—অথচ নয়া-জন্ম মানিকপত্রের সাম্প্রদায়িক। নিবাহিয়ারদের পরাক্রম, বারবার ফেল হইয়া, বহু উন্মোচীতেও কুত্রাপি চাকুরি না পাইয়া, এক সময়ে কোথাও স্থান অধিকার করিতে সক্ষম না—হইয়া, নয়া-জন্ম হইলে,—মানিকপত্রের সাম্প্রদায়িক। যত অর্জ বা সিকি-শিলিত কুত্রান্তের পিছনে কোকের শেষ আশ্রয়—এ মানিকপত্রের সাম্প্রদায়িক বা প্রকাশক পদাধীন। ইহার ভিতর কেহ কেহ আবার প্রত্যাকর আত্মদন, প্রবন্ধক আছেন,—যেখানে,—সাম্প্রদায়িক। কেন জুগাটের মঞ্চল তাতা তাতা জুগাট পটাইতে,—এক মানিকপত্রের ভান করিল—লিখিল, কেবল দুইটা পদ্যম ডাক দিয়া দিলেই, অথবা বসন্তে ডাকমহুৎ স্বরূপ ছয়গু পদ্যম দিলেই, মানিকপত্র মানে মানে

গ্রাহকের নিকট বাইবে। সে মানিকপত্র আর কিছুই নহে,—কেবল তাঁহার শ্রুতিময় বিভ্রান্তিপূর্ণ পুস্তক।

কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য লইয়া, মানিকপত্র চালাইতে আরম্ভ করেন হটে,—কিন্তু যোগ্য, অধ্যবসায়, সামর্থ্য পরিচালন ও অর্থব্যয় স্বভাব,—তাহা অকালে কালক্রমে পণ্ডিত হয়।

আবার এইরূপ। যেখানে পাণ্ডিত্য আছে, সেখানে উন্মোচনা নাই; যেখানে কবিত্ব আছে, সেখানে উন্মোচনা নাই।

আরও, লোকের একটা ভয় আছে।

অনেকে মনে করেন, মানিকপত্র চালানো পুর সহজ। এক মাস অন্তর, চারি মাস বা ছয় মাস কলংগে একখানি মানিকপত্র প্রকাশ করিতে হইবে,—তাহার জন্ত আর এত চিন্তা কি?—উহা ত ক্ষুদ্র কাজ। আমি মনে করিলে কিশিনি সময়মধ্যে শিশু বর্গের এক মানিকপত্র বাহির করিতে পারি। এইরূপ আশ্রমাব্যায় আশ্রম জলে,—ক্রমে ১৫ দিন, তার পর ২৫ দিন কাটয়া যায়। সম্প্রদায়ের তখন মজা হয়।

শেষভাগের পর, তিনি বেয়বায়ের কলম চালাইয়া দেন; অবশেষে নিয়মত পত্র প্রকাশ হইল না। একবার অনিয়ম হইতে আরম্ভ হইলে, আর ভাবাক নিয়মে রাখা দায় হইয়া উঠে। কলম পুত্র একবার কলমিই হইতে আরম্ভ হইলে, তাহাকে কলমে রাখা দায় হইয়া উঠে। এরূপ অনিয়ম হইতে-হইতে, মানিকপত্র প্রকাশে কলমের ভ্রান্ত ভ্রমণ ঘে, উদ্যোগ হইয়া, উড়িয়া পলায়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

কলকাতা, মানিকপত্রের কার্য বড়ই কঠিন কার্য। বহু সাপ্তাহিক বা বৈদিকপত্রের কার্য সহজ হইতে পারে, কিন্তু মানিকপত্রের কার্য কিছুতেই সহজ হইতে পারে না। হুচাকরণে মানিকপত্র চালাইতে হইলে, বহু লেখকের সাহায্য আবশ্যক। একা সাম্প্রদায়িক দ্বারা কেন এক মাসও মানিকপত্র ভাল চলে না; অথচ একা সাম্প্রদায়িক দ্বারা একা বৈদিক চালাইতে পারেন, কখনো একা সাম্প্রদায়িক চালাইতে পারেন। মানিকপত্রের অধিকাংশ বিষয়েই পরের দোষ নির্ভর করিতে হয়। অল্প লেখকের

লেখা ঠিক নিয়মে পাইবার সম্ভাবনা অল্প। অথচ মানিকপত্র ঠিক নিয়মে বাহির করিতেই হইবে। এই বার্নেই বিভ্রান্তি বাধে। কিন্তু বিভ্রান্তি প্রকাশিত বিভ্রান্তি না বাধে, তজ্জন্ত পূর্ণ হইতেই সত্যক হওয়া চাই। এই নিমিত্ত নিপুণ আয়োজকের প্রয়োজন। আয়োজন করিতে হইলেই অর্থ আবশ্যক। অমৃত দশ হাজার টকা না লইয়া বিনি মানিকপত্রের কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহাকে আবার নিত্য-অমৃত কলিমা মনে করি। ইহা কি তামাসার কাণ?—ইহা কি যায়ে কুঁ দিয়া, টুঙ্গি মারিয়া, বাবুগিরি হিচাবে চালাইবার কাজ?

না। তাহা নহে। ইহাতে কেবল পরিচয়, সেইরূপ অর্থের আবশ্যক; যেসকল পাণ্ডিত্য, সেইরূপ উন্মোচনার আবশ্যক; যেসকল লেখক-বল, সেইরূপ বয়সের আবশ্যক। ইহার কোনও একটা বিষয়ের পরীক্ষা শীঘ্রই, মানিকপত্র কিছুইই সন্দেহভরমূহকরণে হুচাকরণে চালিবে না।

বৈদিকপত্র চুই; সাপ্তাহিক পত্র চুই মরিয়া দীর; কিন্তু মানিক পত্র কখনপরের মুহূর্ত্তা;—বহু আয়োজকে, বহু উপকরণে, বহু মনোনা-সাধনে প্রস্তুত। বাহা বৈদিকে বা সাপ্তাহিকে থাকে না, মানিকপত্রে তাহা আছে। মানিকপত্র মাসিক এবং অধিক ক্রতঃসিদ্ধি।

মানিকপত্রের এক প্রধান অঙ্গ—উপভাষা। কিন্তু বহু উপভাষা শ্রিত্বিত পোনে, এমন করজন যোক আছে? একজন বা দুই জনের অধিক নাই। অথচ যে কোন উপায়েই একক, তাঁহার উপভাষা লেখাইয়া মানিকপত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। বিনি শাস্ত্রজ্ঞ, হুশপ্তিত, এবং অমৃত্যুশাস্ত্রসম্পন্ন বলিয়া শোণগ্রন্থি—তাহা-কেই সাপ্তাহিক কলমে বহু বহু করিতে হইবে। এইরূপ বিনি কবি বিদ্যাক্ষান্তিত, তিনি কবিত্ব-রক প্রবন্ধ লিখিবেন; বিন্দি-শিশি বিদ্যাক্ষপ্তিত, তিনি শিশু সহজ প্রবন্ধ লিখিবেন; বিনি প্রাণিত-রক হুশপ্তিত, তিনি অধিকমতে লেখনী পরিচালনা করিবেন; বিনি হুজাব-কবি, তিনিই কার্য লিখিবেন। এইরূপ উন্মোচনা এবং সংযোগ হইলে, মানিকপত্র উত্তমরূপে চলে; ‘অজ্ঞা অকালমুহূর্ত্তে’

মানিকপত্রের সমাজের, কেবল শিশু। হয়, অথ কিছুই সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

উদ্দেশ্য।

“জননী জমজুমিৎ স্বর্গদ্বিগি পরায়মী।”

মা নাম কি মম্বরনাম! অনিলচন্দ্রীয়া! একবার ভ্রূজিতরে উচ্চকরে মা—মা বলিয়া ডাকিলে, জ্ঞানাব্যবহারী কিছুই থাকে না, শোকতাপ সহ হৃদয়, মমসার হৃদয় হয় না। এ সংসারে মমের চেয়ে আর কিছু আছে কি? জননী স্বর্গদ্বিগি পরায়মী।

জমজুমিৎ স্বর্গদ্বিগি পরায়মী। অসন্তান যেমন জননীর সেবা করে, সেইরূপ জমজুমিৎও সেবা করে। জমজুমিৎ আর শ্রিয়ন্ত জুমি পুত্রবোতে পারি নাই। এই দেশব্যপারিত, পুরোঙ্গলিগানান্দীমালা-বিভূষিত, স্বকৃত্ত সমাধিত, স্তম্ভপলে হুগোভিত ভারতবর্ষ মমসার জমজুমিৎ, তাঁহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যবান পুত্রকে আছে? এই ভারতজুমিই একমাত্র জমজুমিৎ। এই ভারতজুমিই মানব-জীবন সকল করিবার জুমি। কিন্তু হৃদয়বর্ষে ভারত এখন ধোর যুগে অতিভূত; কর্তৃ নাই,—কেবল মুক্ত জুমিগণ পড়িয়া আছে। আজ কালাবশে এই জমজুমিৎ—এই ভারতজুমি ইংরেজের করতলপত্র।—আমরা নিম্নাহুত,—নিম্নাধারা, জন-হারা। স্বর্গবৎ বলা করিতে আমরা জুলিয়া পাইতেছি। রাগাই ধর্মের রক্ষক। কিন্তু রাগা আমাদের নিজেই নহে। রাগা স্রেহ—ইংরেজের। এ দুর্দিনেও এই স্বর্গ—রাগা স্রেহ হইলেও, আমাদের ধর্মের মাধ্যম সমুদ্রে হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী নহে। বিজিত-জাতি এমন রাগা বহু পুঞ্জই পাইয়া থাকে।

ইংরেজ রাজা আমের, রাজাই বাহন,—কিন্তু এই প্রার্থনা, হিন্দুর ধর্মই যেন তিনি কর প্রদায়ক না করেন।

রাগা বিশ্বাসী; ইচ্ছা থাকিলেও, দেশের অবস্থা মনুষ্যকরণে অবগত হইতেন তাঁহার শক্তি নাই। হুতরাং রাজা যখন জগন্মতে হিন্দুর ন্যায়নাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন আমরা তাঁহাকে উপদেশ দিব, সত্যকৃত্তি, সুপথ দেখাইব। ইহাই আমাদের প্রধান প্রত্যাশ।

যোগ-হয় অনেকেরই জ্ঞানেন, হিন্দুর সকল

কার্যই ধর্মের সহিত জড়িত। ধর্ম ছাড়া হিন্দুর কাজ নাই। হিন্দু-রাজনীতি, হিন্দু-প্রজাণীতি, হিন্দু-শিকানীতি, হিন্দু-ব্যবস্থানীতি হিন্দু-আচারনীতি, হিন্দু-বিহারনীতি, হিন্দু-চিকিৎসানীতি—হিন্দুর কৃষিবাণিজ্য-শিল্পনীতি,—প্রত্যেকেই মূলে ধর্মই বিরাজিত। হিন্দুর ধর্ম রক্ষিত হইলে, উক্ত সমস্ত নীতিই স্থায়িত্ব হয়। ধর্ম রক্ষিত হইলেই, হিন্দুর সংসার স্বথময় হয়,—তখন আর কোন বস্তু থাকে না; বিবাদ, অবদাদ তখন আর তিরিহিতে পারে না।

বড়ই কঠিন কাল উপস্থিত। আজ আমরা পরাবাদী, পরপদানত, পরের সেবায় সত্য নিরত। ভারতের সৌভাগ্যার্থে অন্তর্গত। হিন্দুর ধর্মের বল নাই, ধর্মের শক্তি নাই,—দুষ্টিহীন, নাড়ীকীর্ণ, হিমকলেবর। হিন্দুর শিবী নাই, জ্ঞান নাই, চিত্তরক্ত আর। জগদাধিপতি, ভূবনেশ্বর বা কন্যারাজ চারি বিশ্ববিজয়ীমানব মর্শির আর বিনির্মিত হয় না; এমন একটা সূত্র মানবমুর্তি ধাতু বা প্রস্তরে গঠিত হইলে, তাহা নিম্নাত হইতে তৈয়ারি হইয়া আইবে। বস্তু বিলাত হইতে আদিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করে। হুত, হুতা, দিয়াশিলাই, হুতাত, কপক, কপা, কাপুত, চাবি, গজাল, ইন্ডিস, পুতুপ, পুত, ছবি,—বিলাত হইতে না আসে কি? ভারত হুতের ফলস্ত অর্থাৎ সমুদ্রে ডুবিয়া আইবে।

ভারতে কৃষক নাই,—আছে মট-মজুর। ইংরেজ চা বাগান তৈয়ারি করেন,—ভারতবাসী কুলী হয়। ইংরেজ নৌা যুগেন,—ভারতবাসী জরো হয়। ইংরেজ বাণীশ্য শট চণাতি করেন, ভারতবাসী মাটি কাটা পথ তৈয়ারি করে। ইংরেজ জয়চাক রাজন, ভারতবাসী সেই চাক পিঠে করিয়া বহিতে থাকে।

কিছুই নাই,—কিছুই নাই—সব শূচ্যকাহ—শূচ্যকাহ। ভারতে আজ সম্রাটবাস্তবী অযোগ্য-নন্দনী নাই, নন্দপুত্রগণশ্রম প্রভু রামচন্দ্র নাই, লক্ষ্মীপুত্রী নীতা সতীও বুঝি আর নাই। ভারতে আজ হস্তিনাপুরী নাই, ইন্দ্রপ্রস্থ নাই, রাজহৃদ-অশ্রমেধ বস্তু নাই। ভারতে এখন ভীষ্মার্জুন নাই, জনক-বৃষাভিষি নাই, ভীষ্ম-ভীষ্ম নাই। আজ শুকদেবকে আর দেখিতে পাই না, বেদব্যাসকে চিনিতে পারি না, বামদেবকে ওণ-কর্ত্তন করি না। আজ বসিষ্ঠের জায় ওক নাই, যোগেশ্বর

জায় পুত্রোহিত নাই, বিদুরের ন্যায় মন্ত্রী নাই। আমরা ভক্তি, স্মৃতি, দর্শন হারা হইয়াছি; রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ জুলিয়া গিয়াছি। কঠে আর সামসান উচ্চারিত হয় না, অন্তরে আর অমল ধ্বন, মনোবৈশিষ্ট্য অস্তিত হয় না, বাহু আর পাণ্ডব তুলিতে সক্ষম হয় না। কিছুই নাই,—সাম্প্রদায়িক গিয়াছে।—আমরা কেবল বজ্রগত বৃক্ষের ছায় দেখাশোনা আছি।

কিন্তু তিনিহই কি এমন বাইবে? একাল-ব্রাহ্ম কি পোহাইবে না? আর কি, শারীরীয় নীলাকান্তে পুণ্ড্রচন্দ্রের দর্শন পাইব না? আর কি স্বয়ং সত্য, সার্বভৌম, অরক্ষণীয় এ সংসারে আসি-বেন না? পুনর্বার কি সমুদ্রমগ্ন হইবে না? পুনর্বার কি ধ্বংসপ্রাপ্ত অমৃত-কলস মমসার লইয়া সাগর-পৃষ্ঠ হইতে উভিত হইবেন না? কোন্তজ-মি কি আর করতলপত্রে হইবেন না? স্বয়ং সম্রাট কি আর উদ্বৃত হইবেন না? উত্তেজপ্রভা-প্রেরিত কি আর দেখা দিবে না? তাই বলিতেছি,—চিরদিন কি এমন বাইবে।

না। তাহা কখন হয় না। চিরদিন কখন সমান বস্তু নাই। হুতের পর হুত, সীতের পর বসন্ত, নিম্নার পর জাগরণ,—ইহাই ভগবানের হৃদয় স্বর্গের জৈয়ার পর প্রতিজ্ঞা—ইহাই প্রকৃতির অলঙ্কারীয় নিয়ম। সেই জমজুমিৎ—আমরা। আমা হুত, স্মরণাই, আজও জীবিত আছি।

আম নাই—ভগ নাই।—

চিরদিন কখন সমান না যায়।

ইংরেজ-রাজের আগ্রহে থাকিয়া, স্বধর্মপরায়ণ হও, আচার্য্য সম্বৎসর, হৃদয়করণে রক্ষার মন দাও, এই লক্ষ্যকেন্দ্রে শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য—কৃষি, শিল্প, কারিগর্যের বৃত্তি উন্নতি হইবে,—জমজুমিৎ আবার জমজুমিৎ হইবে।



রাধানাথ।

প্রথম অংশ।

গোলাপসুন্দরী-প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোলাপসুন্দরীর গৃহ বাজীপুরে। কিন্তু
স্বামী এবং সত্যের বন্ধাদি রক্ষা করিতে হইলে,
বলিতে হয়, পরবর্ত্তি গোলাপসুন্দরী দেবী ইহা-
জীবনে বাজীপুর কখন দেখেন নাই, বাজীপুর
কোথায় তাহাও জানেন না,—অধিক ঐক্য, বাজী-
পুর নামটী পর্য্যন্ত তিনি—তিনিরাছেন কি না
সন্দেহ। তবে কেন লিখিলাম,—গোলাপসুন্দরীর
গৃহ বাজীপুর? লিখিলাম,—অমৃত্যু, অল-
মৃত্যু স্বামীর বাস্তবিক, গয়ে-গয়ে মিল রাখিবার
পাতিরে, প্রত্যেক মিত করিবার লালসার।
ভাবকে মিত করিবার জন্য মন্দিরস্থ লেখকগণ
ইহাংসারে মূল্য চুক্কর করিতেই সম্মত।
আমার একজন প্রিয়বন্ধু বলেন, তিনি ভাবকে
প্রতি মিত করিবার জন্য পুনঃপুনঃ করিতেও প্রস্তুত।
সত্যের ভাবের জন্য বিশ্বাসকে সত্য বলা ত
অতি ক্ষুদ্র কথা। খেদটাতেও তত্ব-তত্ব করিলে,
কার দ্বিতী ত-দ্বিতী করিয়া, ছেলিয়া গুলিয়া ভাব-
কার কর্বাই নাচিত্তে নাচিত্তে চলিয়া যাইবে—সত্য-
আমি নিত্য বাহিরে না, জ্ঞান-অজ্ঞান মানিবে না,
পর সম্বন্ধ-কর্ত্তব্য বুঝিবে না, কালকালে-পাত্রাপাত্রের
আ প্রতি দৃষ্টিপত করিবে না,—ভাব কেবল নাচিত্তা
ও নাচিত্তা, ভালে ভালে পা—ফলিয়া, বোমার
গুলাইয়া, চলিয়াই যাইবে।—উত্তেজ ভাবা !!
যে পুরু আবার ওস্তাদ—আমি তাঁহার সাক্ষ-
ক্ষেপে। তিনি বলেন, ইতিহাসে যদি এরূপ
মাতোরা থাকে যে, নীলপঙ্কজ রাক্ষুর জন্ম ১৮-
৩০ শকে,—তবে তাহার এইরূপ ভাবে রচনা
পঙ্কজরিতে হইবে,—“নীলগোহিতভক্ত, নীলাপ-
জ-প্রিয়, নীলকণ্ঠ নীলপঙ্কজ নৃপতি শাস্ত্র-নিরা-
জ নরকী ত্রীজাঙ্গে নররাজ নিগৃহণ করেন।”
হইব বলা, ১৮-৩০ বনে ১৯১ বলা হইল
বলে,—কিন্তু ১১ বৎসরের সামান্য তদ্ব্যবস্থা

নহে। আর, শকের পরিবর্ত্তে নীলাঙ্গ বলা
হইয়াছে।—ইহার এইরূপ কৈফিয়ত দিনেই
চলিবে, যথা;—“বেদব্যাস, অষ্টাদশপুরাণ-মধ্যে
প্রধান পুরাণ স্বল্প-পুরাণের রেখা-বধে শককে
নীলাঙ্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।” এ কথা
বালিলে, ধরিতে চুইতে নাই। কারণ স্বল্প-
পুরাণ এখনও হীপা ইয় নাই; এবং এদেশে
স্বল্প-পুরাণের হারের লেখা পুঁথি কাহারও ঘরে
নাই। এ-ধেন প্রিয়বন্ধুর আমি প্রিয়তম শিষ্য।

সে যাহা হউক,—গোলাপসুন্দরীর বাড়ী
বলন বাজীপুরে নহে, তখন উহার বাড়ী
কোথা, ইহা ঠিক করা উচিত। কিন্তু বাড়ী
ঠিক করিবার পূর্বে, উহার প্রকৃত নাম গোলাপ-
সুন্দরী কি না,—ইহা ঠিক করা উচিত।
স্বাস্থ্যবিক্র উহার নাম গোলাপসুন্দরী নহে,—
সে নামে “গ” অবয়ের কোন অংশই নাই।
তবে তাঁর নামটী কি? নাম এবং ঠিকানা
বলিবার যদি শক্তিই থাকিলে, তবে এত ভাড়া-
ভাড়ি করিব মনে? আল আমি তাঁর আসল
নাম এবং স্ব-দোষের পরিচয় দি, আর,
কাল আমার নামে লাইবেলের মোকদ্দমা
জাহুক,—আমি ছ-নাগ জেলে যাই আর-কি?
নাম-ধাম বলা আমার কর্ত্তব্য নয়।

আচ্ছা, তবে গোলাপসুন্দরী কৈন জাতি—
বলুন! জাতি বলা আরও শক্ত কাজ।
গোলাপসুন্দরী এখন দেবী।—হুতরাং কোন
মাংসে আমি এখন তাঁহার জাতির পরিচয় দিব?
গোলাপসুন্দরীর নাম বলিবে না,—ঠিকানা
বলিবে না, জাতি বলিবে না,—বলন এমন
শ্রিত প্রতিজ্ঞা, তখন গোলাপসুন্দরীর সহিত
অলাপ পরিচয় হইবে কিরূপে?—পাঠকেরই বা
তাঁহার সহিত ভাব-ভালবাসা জন্মিবে কিরূপে?
স্বরে চোরে, ইতিহাসে ইমারার গোলাপসুন্দরীর
পরিচয় দিলে কোন দোষ আছে কি? না
হয়,—কানে কানে বলুন।

আহ,—এত ব্যস্ত হও কেন? পরিচয় না
পাইল কি তোমার দুঃ ইন্দ্র?—কামিনীর
হুল-কাহিনী ত্রি এতই মধুর, দুঃস্বাদক?
—মনে কর না? কেন,—গোলাপসুন্দরীর নাম
ক,—ইহাতে আমল কার্যে ব্যাঘাত হয় কি?
আরও মনে কর,—তাঁহার পিতার নাম—
মাতার নাম গ, ভাতার নাম চ, পিতার নাম

গোলাপসুন্দরী।



রাধানাথ উপন্যাস—৩ পৃষ্ঠা।

হাড়-খোড়-ভাঙ্গা হু, উপপত্তির নাম তত্ত্বপত্তীর
গজ্ঞানশিশিরে বর্ষায় জ—

এ আবার কি রকম হইল? "কুলদ্বার"
আবার উপপত্তি কিরূপ?—উপপত্তি গৃহস্থ-গৃহের
একজন পরিজন নাকি? পিতা মাতা এবং পতির
সহিত বেমানম তাহে উপপত্তির নামকরণ
হইতেছে, ইহারই বা অর্থ কি?

অধিক চমকিত হইও না। ইহা উনবিংশ
শতাব্দীর শেষভাগ—শেষভাগের শেষভাগ—
আরম্ভাব্দে কাল ১৮৯২ অব্দ উপস্থিত হইবে,—
এ হেনে জ্ঞতকালে, সভ্যতা-জ্যোতের ধরপ্রবাহে
গোলাপস্থলীর উপপত্তিই অবশ্যই দোষাবহ
নহে। ইহারই মধ্যে কাহারও যেন ধারণা না
জন্মে যে, আমি এখন নিশ্চয়ই বলিতেছি—গোলাপ-
স্থলীর অবশ্যই উপপত্তি আছে। কেবল এখন
কার প্রাথমিক ইতিপূর্বে নিষিদ্ধাচ্ছিন্নাম,—মনে
কর, গোলাপস্থলীর পতি ন, উপপত্তি জ।

না হু, সভ্যসত্তাই গোলাপস্থলীর উপ-
পত্তি আছে। উপপত্তিতে দোষ কি? উপপত্তি
কি মূল জিনিষ? উপপত্তি আর কিছুই নয়,
কেবল পতির সহকারী-সম্পাদক মাত্র। চেয়ার-
মানে থাকিলেই ভাইস-চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি
থাকিলেই অগার-সেক্রেটারি, এডিটর থাকিলেই
সব-এডিটর; হুতরাং পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানাত্মসারে,
পতি থাকিলেই উপপত্তি। আচ্ছা!—কেমন মধুর
কমনীয় ভাব! বিশেষতঃ এই,—পতি আটপোরে;
উপপত্তি পোষাকী। পতি বারমাসে, এক-
ধেয়ে,—উপপত্তি পূজায় পার্কসে, উৎসবে-
আছাদে। পতি অমরব্রত, উপপত্তি পূর্ণিমা।
পতি আপদে-বিপদে,—উপপত্তি সোহাগে-
সম্পদে। পতি বৈদ্যজ্ঞানদ্বারের ধান, উপপত্তি
মিহি কালাগেড়ে করেঘড়াচার পুতি। বিশেষ,
উপপত্তি ছিল না কার? মনোদরীর উপপত্তি
বিভীষণ, তারার উপপত্তি হুজীব, অংঘ্যার
উপপত্তি ইন্দ্র। কুহীর কথা কত কহিব?
অর্জুনের বিবাহে স্বামী ধরিলে, জ্যোতীর
উপপত্তি চারিজন। আর সেই স্বয়ং ব্রহ্ম ভগবান,
সেই শ্রামনটবরই বা কি? কবি কুহিয়াছেন,
শ্রাম অবিলে পতি, তাকে বলে উপপত্তি,
পোকালোক পাগলপতি, না বুঝে খিচার।
শ্রাম হু পুরুষোত্তম, পতি সে পুরুষোত্তম,
এখনকার এ নিয়ম, তখন মরে মার ॥

আর সাবিত্রীই বা কি? তিনি কি বিতোর-
বার পতিপরিগ্রহ করেন নাই? তাহার
পতিতা কালবশে প্রাণত্যাগ করিল। পতির
প্রাণত্যাগে সাবিত্রী অবশ্যই তখন বিধবা
হইলেন। আবার যখন সেই মৃত পোকটা
বাঁচিয়া উঠিল,—অমনি সাবিত্রী তাহার সন্নি-
গতপ্রাণিনি হইলেন। পতির মৃত্যুর পর
আবার পতিগ্রহণ অর্থাৎ উপপত্তি গ্রহণ করা
হইল না কি? কিন্তু এখানে বলিতে পার,
সাবিত্রীর পতি মৃত হইল,—সাবিত্রী বৈধব্য
অবস্থায়, সেই পতিকেরই অর্থাৎ সেইরূপ ভবনশিষ্ট
যাকিবেই পুনরায় পতিয়ে বরণ করিলেন।
ইহাতে সাবিত্রীরই ভূভাষ্য বলিতে হইবে।
কেননা, বাছিয়া-ভাছিয়া লইলে, তিনি পূর্ণপতি
অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট উৎকৃষ্টতর অল্প
পতি পাইতে পারিতেন। সাবিত্রীকে যখন
দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ অর্থাৎ বিধবা-বিবাহ করি-
তেই হইল,—তখন নিরীচানপূরক পূর্ণাপেক্ষা
ভাগ পতি গ্রহণ করাই সাবিত্রীর পক্ষে মঙ্গল-
জনক ও সুখদায়ক ছিল।

এখন স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং নিরীচান-প্রবাহার
সময়। স্ত্রীস্বাধীনতা যদি স্বাধীনভাবে বহুজা-
ত্রে বাছিয়া-বাছিয়া, গুছিয়া-গুছিয়া, পরীক্ষা
করিয়া-করিয়া মনের মত অল্প পতি গ্রহণ করিতে
না পারিল, তবে আর উচিত কি হইল?
স্বাভাব্যতার নামে যে, কলঙ্ক রটিল! স্বাধীনতা
কবার যে, অপর্যায়তার ঘটিল।

কোন কোন বিজ্ঞ বন্ধু বলেন, উপপত্তিতে
দোষ নাই, সভ্য বটে,—কিন্তু এই উপপত্তি
শব্দটা কেমন যেন একই শ্রুতিকটু লাগে।

সুসংস্কারবিশিষ্ট লোকের বর্ণেই এরূপ কথা
কই লগ্নিতে পড়িলে শিখিত লোকের কাছে
ইহা বড়ই মধুর বাক্য। প্রতীয়মান হয়।

অশিক্ষিত ব্যক্তি, স্ত্রীর "উপপত্তি"—এই
কথায় অনভ্যস্ত; শিক্ষিত ব্যক্তি—সদাই এই
কথায় অভ্যস্ত। অন্যভাষের নামে একজনকে
কই লাগে; অন্যভাষের নামে অন্যজনকে মিষ্ট
লাগে।

সত্য মিথ্যা ভগবান বলিতে পারেন, কিন্তু
এইরূপ ব্যক্তি—প্রত্যেক শিক্ষিত পুত্ৰই মনে
মনে জানেন, অস্তিত্ব জানা উচিত যে, তাহার
প্রত্যেক শিক্ষিত-স্ত্রীর অংশই এক একটা ক্রিয়া

উপপত্তি আছে। উপাত্ত আছেই, এ-পরা-
অপ-সং-নি আছে কিনা, ইহারই অন্তর্যক্ষণে
তাঁহার সত্যতা থাকে। অন্তর্যক্ষণে
ধাকিতে বলিতেছি কেবল এই জন্ম যে, হিমাব-
ষ্টিক ধাকিতে বলিয়া, জন্ম-ধাকতে গোল ধাকিতে
না বলিয়া—সংসারবাহী, পূর্ণস্বরূপ মন্বন্তর রা-
মাঞ্চা ঠোকাঠুকি হাতীত, যথেষ্ট নিরীহাচিত
হইবে বলিয়া।

কিছু জন্মাব সম্বন্ধে আশা হান করা
যায় না। সে যাহা হউক,—পোলাপুহুদীর
নামটী কি? এ যে মহাবিপদে পড়িলার
ধেবিতেছি। না বলিলেও ছাড়ানু নাই, কিন্তু
বলিলে প্রাণ বাচানো ভার।

না বাইলে রাজা ধৰ্ম্মে, বাইলে ভুলঙ্গ।
রানবের হাতে—যুধা মারীচ-হুতর।

মানহানির মোকদ্দমা আসিলে, মোহকপণ
যদি আমার পক্ষ সমর্থন করি, আদালত-ধরটা
দিতে রাজী হন, তাহা হইলে আমি পোলাপ-
হুদীর নাজী-নক্ষত্র সমস্তই প্রকাশ করিতে
পারি। কিন্তু বলিয়া রাখা ভাল,—ওপক্ষে
অধিকাংশ বাস্তবিকই বশ। বিঘ্ন বশ! যেমন
ক্রীড়কের বশ পরাজিত, ক্রীড়ামের বশ
হুদয়ানু—সেইরূপ বশ। আগে হইতে বশ,—
শতাব্দিক বশ—হুতরার পরমা দিয়াও পাই-
বার ঘো নাই।

শ্পষ্ট নাম বলা হইবে না,—কোনো
রূপ—বিশ্বজ্ঞানক বুঝিা গটন—

জুনি, পানী, মনো, বিনো, বানো, কুন্ডনো,
চৌরী, উত্তনো, রাখানো, ধাকো, কেতি, জীরা, বিশি,
মণি,—বালিকা বচনে পোলাপুহুদীর নাম এই
জাতীয় ছিল। কালক্রমে যত তাঁহার পরোক্ষ
হইতে দূরিল, ততই তাঁহার নামের উন্নতি
হইতে থাকিল। রন-বরল,—পরিবর্তন; সুপরি-
বর্তন হইল, জন্মশ তাঁহার নামটী ধাঁড়াল,—
এক পৌর-সৌরভ-ভূবদুল, গোলাপী-বস্তুর
আভাষিত, মহামদগন্ধ সমধিত, মহামহিমা-
বিত্ত-ভাব-মসজ—এক জন্মজটনোয়, আভাব-
ন, স্বপ্না, মরল, হুদয়ানু, নাম! হায়! সে
নামের কথা আর কি বলিব?

মাগো! একবার অন্তর দাক, তাঁহার
নামটী একবার প্রাণ বুগিয়া বলিবা কেলি।
দয়ামতি! হুতর! সে নাম যে, আর পেতে

রাখিতে পারি না মা! জাহি মে, জাহি মে,
জাহি মে! পেতে যে হলিয়া দমসম হয় মা!
অসময়ে-রক্ষা কর,—কালি। পকাশ-মহত শ্রোতা
উপস্থিত—লক্ষ কর দ্বারা সে নাম-মুদ্রণ
কদম্বার, জন্ম মকলে উদ্ভূত। তাই বলি,
মাগো! মহিম-বর্ধনো মাগো!—অন্তর দাও।
তবে প্রাণ কর,—সমাধিত চিত্তে প্রাণ
কর—বলি মে-মমি। সে নাম,—

দাড়িম-দলনৌ দেবী।

আদরের, মোহাধের ডাক নাম ছিল—

জালিম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যত দিন ঘোমটা, তত দিন ভয়। এক-
বার ঘোমটা খুলিলে, আর ভয় থাকে না।
জেনে যাইবার পক্ষেই যত ভয়, জেনে গেলে
আর ভয় কি? আমি এখন কারাগারেই
আছি বলিলে অস্বাস্থ্য হয় না। এই মুহুর্তে
করিগারে নই বটে, কিন্তু এখনিতে যাইতে
হইবে। কেননা আমি ডালিম নাম উচ্চারণ
করিয়াছি। বনন কারাগারে, তখন আর ভয়
কি? ডালিমের পিচটোটা একটী ছুটীয়া-
ফাটীয়া বলি না কেন?

ডালিমের নিবাস বশোহর জেলায়। ডালি-
মের পিতার নাম পরায়াম মুচি। বালিকা-ভনে
ডালিমের নাম ছিল,—হারাণি। পরায়াম ভনে
ডালিমের জন্মলাভ। হুদের মেয়ে হারাণি
মায়ের দুই বাইত, এবং দুলায় পড়াগড়ি দিত।
পেছকি মুচিট না, কেনেই হোকি পিরিহুট
ধাকিত। পরায়াম বরো ধাকো,—কোথা কি
পানে? বিঘ্নে রবির তাপে এবং রাতে
আতনের তাপে হারাণির শীত নিবারণ হইত।
শয্যা ছিল—হেঁড়া চৌ। সেই চৌটার উপর
ঘেটনি একটী ছাড়া পাতা হইত, সেদিনত
হারাণি পকে হুদ-ফেনেদিত হুকোম খণ।
ছাড়াই লক্ষ ধুইতে উড়ে, প্রাকিত প্রায় শয্যা,
জিল সঙ্গল উলঙ্গ। এইরূপে দিন যায়,

দিন আসে; মাস-ঘটা, মাস আসে; বর্ষ
বায় বর্ষ আসে। জেনে হারাণির বয়স হইল
পাঁচ বছর।

এইরূপ বর্ষন ভনিয়া, মিহি-মিহি মহিলা-
গণ ঘেন ঘেন না করেন,—হারাণি হুদ-মুদে
নিপতিত হইয়াছিল।—হারাণির কষ্টের আদি
ছিল না, অন্তও ছিল না। হস্তাটী কলি বিধাতার
বির-মরমে পড়াছিল।

তা নয়। মুচির মেয়েটার কোনও কষ্ট,
দুঃখ বা যন্ত্রণা ছিল না। হারাণি হুদ-মুদে
হাসিত, খেলিত, নাচিত, বাগিত। মধুর স্বরে
মা—মা বলিয়া, হাসি-হাসি মুখে হারাণি মায়ের
কোলে কাঁপাইয়া পড়িত; আবার হুদ-মুদে
ভংকবাংই বাবা—বাবা বলিয়া, মায়ের কোল
হইতে, বাপের কোলে দৌড়িয়া যাইত।
এমনকি ইহাই তাহার ছিল,—আনন্দ-বেলা।

মুচির স্বর যে মা-বাপ হুবেলা হুয়টী পেট
পুড়িয়া বাইতে পায়, তাহারে ঘেলের আবার
কষ্ট কি? মুচির স্বরে উদর পূর্ণ থাকাই
হইল,—পূর্ণ স্বখোতা-ভোগের লক্ষণ। পেট
ভরিলেই মুচির সঙ্গ পোষ মাস। দ্বিতল
ব্রিত্তন অটালিকা চাই না, রক্তত পালক চাই
না,—হায়! মুচি-প্রাণ-বান-জড়িত মাইমুখ্য
বনন চাই না,—দাস, বাসের দাস, দাসী,
দানীর দাসী—এ সব কিছুই চাই না,—চাই
কেবল হাসি হুয়টী ভাত। হাতী চাই না,
খোড়া চাই না, উট চাই না, নৌকা চাই না,
নর-বন চাই না,—চাই কেবল হুবেলা হুয়টী
ভাত। সেই হুবেলা-হুয়টী-ভাত—পরায়ামের
তখন ছিল। জন্মদায় শ্রুতহুদ পানে হারাণি
হুদ-মুদে, বলিষ্ট, সঙ্গ হাসি-বিশিষ্ট। হুদের
উপর যে আবার লক্ষ-মুদুত তখন ক্রোধান্ত
বাহিতে পাইত। আর কি রকম ছিল? হাম-
গড়ি দিয়াই হারাণি এ-বাড়া ও-বাড়া করিত।

কেহ ধরিতে আসিলে। খিল-খিল হাসিয়া
হারাণি হাম-গড়ি দৌড়-কাত। দেবিয়া
ভনিয়া, মা-বাপের হুদ-মুদে আনন্দ ধরিত না।
মুঠ বা গল্পম বর্ষে হারাণির অঙ্গে ঈষৎ
কাপড় উঠিত। বরে উলঙ্গ থাকিত, বাহির
হওয়ার সময় মা-বাপ জোর করিত। সেই
কৌশল বা ক্ষোভানিহু হারাণিকে পরাইয়া
দিত। হারাণির কাজ ছিল,—পুহুরে পুহুরে

শাদুক-ওপলো-হুদান। সেই ক্ষোভানী পরিয়া
একটাই জলে নামিয়া, কাপা খাটিয়া হারাণি
পুহুরে হাত-বাহিত। মা-বাপ ধনদ্রব্য রবে ধরিতে
আসিলে, হারাণি একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইত।
শাদুক-ওপলো-বিশুদ্ধ বৃত্তিতে বৃত্তিতে যেদিন
হারাণি একটা সাল না পেত। হুদ-মুদে পাইত,
সেদিন আর আফ্রাণের সীমা থাকিত না;
সেই সাল মাজ্জা, বসিয়া-বসিয়া নাড়িয়া-ভুড়িয়া,
স্বাং স্বাংনে পড়াইত; প্রকট দুঃখ এবং তেল
নাড়াইয়া তাহাতে লক্ষা-বুড়ির বুকনি দিত।
তখন সেই মাজ-পোড়া এক অশুভ বয়স
পরিণত হইত। হারাণি সেই বয়স, বয় ও
ভক্তির সহিত মাকে দিত, বাপকে দিত, এবং
নিজে হুদ-মুদে পাড়তালেক সহিত সেই পর-
শমন মাজ-পোড়া বাইতে বসিত। হারাণির
তখনকার দৈই তদাত ঐকান্তিক ভাব দেখিয়া
মনে হইত, বুঝি লক্ষ-শোণের দ্বার এ সময়ে
আর কোনও হুয়টী সামগ্ৰী নাই। বুঝি
ইহাই স্বর্গের হুয়টী। বুঝি সমস্ত-লক্ষ-মুদে
বয়সটির এই সাল-মাজ-পোড়া-রূপ অথবা কলসই
মুদুকে করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন! বুঝি
এই এক-এক রতি ওজন মাজ-পোড়ার মূল্য—
মাত রাকার মূল্য একটা মাণিক।

হারাণি বয়স এত ধনুরে অধিকারি, এরূপ
এপর্শের ঈশ্বরী, তখন তাহার কষ্ট কি?—
কথা কি?—হুদ-মুদে কি?

লক্ষ কথা, হারাণি হুদেই ছিল। সভ্যতার
যে কষ্ট, অসভ্যতার সে কষ্ট থাকে না। হারাণি
বহিত তখন হুদ-মুদে, সভ্যবাহিনী
হইত, তাহা হইলে হারাণির কষ্টের, বয়সের,
মনোহুদ-বর্ষের অর্থ থাকিত না। না-বাহিতকই
হারাণি বহিত, হুদ-মুদে বালিকাকালে কোন
কষ্টই পায় নাই।

হারাণির বয়স কত? মুখ-কী মল নয়।
হাতের, পরোজ, গাধের গঠন ভাণ।

হারাণি আজ উপভোগ্যে স্থান পাইয়াছে
বলিয়াই, হারাণি বৈষ্ণব গোড়াই হইল, তাহা
নহে।

মুচির মেয়েকে সর্বাঙ্গ-হুদরী বলিলে,—
হুদ-মুদে হুদ-মুদে মনে মনেই জন্মিত
পারে বটে,—কিন্তু বাস্তবিক সম্বন্ধেই কোন
কথা নাই। আমি এমন কথা বলি না—



সে জন কখন করে এই ছাটে হাট।
 আত্মতার পথ নাই মৃততর নাট।
 সেই রোগে রোগী এক আমিও প্রবান।
 অকৃত-ভাটকে এক নিরুতির স্থান।
 বামন-রূপেতে আনে বিষয়-বিকার।
 হেহ তাম্র প্রলাপ লিপাসা দ্বিধা আর।
 তরুণকৃৎ বোর স্রোম-মহার কারণ।
 চিরমোশ পিঠ তার বুদ্ধি-অনুজ্ঞাপ।
 মানদ্যাহু প্রবণ হতেছে নিরবধি।
 অনিরাহি দুর্গানাম দুর্গে শুধিবা।
 কোথা গো মা শব্দ-রমা অসুজ-নয়ন।
 নিস্তার এ তবরণে হস্তের জনন।
 বিশ্বমাত্রা হুতুনাশ শিষ্ট-প্রাপিকা।
 সর্গ-বর্গ-বর্গ-করা সর্গ-প্রাণিক।
 বিদ্যাক্রপা আকী ভূমি হুতি-সুখী নাম।
 দক্ষহুতে রক্ষ-হুতে যোগধাম ধাম।
 ইন্দুশক্তি সিদ্ধান্তে বিদ্যানিবাসিনী।
 করুণাক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান বর্ধ-অম্বিনী।
 চণ্ডখণ্ড চামুণ্ডা অষ্টা মহাদেবী।
 শক্তিধা মূলিন্দরী ভক্তিভাবে সেবি।
 হুর্গে ক্ষে মা বজ্রধরী অজ্ঞে কর গ্রাণ।
 ভায়ে পদপ্রান্তে সব অঙ্গে লিখি স্থান।
 নিত্যজ্ঞানময়ি মম চিত্ত নয় শুভ।
 জ্ঞানসে তরিত কিমস মায়াজি রক্ত।
 স্বভবে নির্গুণে তাক তব জ্ঞান গুণ।
 মুক্তি পাবকিসে নই তাকিসে নিপুণ।
 তনেছি মা কোন-হুত্ব থাকে মা তাহার।
 যে পূজ্য ও দশবিদ্যা মূর্তিতে তোমার।
 সমায়ে বাতনা পথের বিস্তর বিস্তর।
 হরেছি শরপাশ পূজ কেলে কর।
 ভক্তি শক্তি আমার কিংই নুহি পুঁজি।
 মা যদি মদ্যার থাকি দশবিদ্যা পুঁজি।
 ভাবনাতী-বীজ্যন্তনে তব বাণী।
 গিরিগিরি বজ্রহু মা আপনি ভ্রামনি।
 "নিমগ্নপরিবারে মোর বুল-কলমবর।
 তথ্যমোতে দেবীমুখি আরোহণ বিস্তর।
 বিশেষত মহাবিদ্যা ময়ে ভবে কাণ।
 আত মুক্তি-প্রদায়িনী জনপরিব্রাজ।
 এই স্বাক্ষা আপনি দেখেন স্থানদেশে।
 সজ্জ হুত জন্ম শিখা পুঞ্জি-প্রদায়ক।
 সজ্জি তোমার শ্রদ্ধা মুক্তি ভেদ মাত্র।
 পুঞ্জি কিছ আমি নই পুঞ্জিবার পাত্র।

পূর্বব্রহ্মময় কর পূর্ব অভিলাস।
 অতঃপর মহাবিদ্যা মূর্তি প্রকাশ।

দশমমহাবিদ্যা।

কালী, আরা, বোড়ী, ভুবনেশ্বরী আরা।
 ভৈরবী ও হিমব্রতী, দুমা পরচার।
 ইপনা, মাতলী, মহালক্ষ্মী রূপবতী।
 এই দশম মহাবিদ্যা ভূমি গো পার্জতী।

প্রথম মহাবিদ্যা।

কালীর স্থান।

শবাক্ষা মহাভাগ্য বোরবংশীয় হসমুখী।
 চতুর্ভুজা বজ্রদ্যাবারভরকর্য শিবাং।
 মুণ্ডমালাধরা দেবী লজজিহ্বা দিশবদী।
 এবং সাক্ষিতরং কালী মহাশালয়বাসিনী।
 বাবা।

নবীন নীরবধরী বজ্রা বিকট।
 শবাক্ষা ভয়ঙ্করী আন কটিকট।
 নরক-শ্রেণী তায় চতুর্ভুজা শিবা।
 বজ্রভুজ্য বজ্রাধর হস্তে শোভে কিরা।
 মুণ্ডমালাধরা দেবী লজ কি রসনা।
 অশ্রুমালাধরী মধ্য আকাশবাসনা।
 লটপট মুক্তি কেশ লুণা দুমর।
 লগাটকলে শোভে অর্জ শশধর।
 তনোমাশা বিক্রোনা প্রিনেতা তাম্বিহী।
 চিত্তরে এ মহাকালী কালনিবাসিনী।

মানস পূজা।

উর কালি, মুণ্ডাময়ি, মম জ্বিকমলে।
 পুঞ্জি পাল, কোকনর, ওমা সর্গমহলে।
 মনোমোতা, ভক্তি-জা, অক্ষ ভাব-চন্দলে।
 হবে শোভা, হুহুগতা, দিলে রাসা চরণে।
 মন ভাণ্ডা, দিই অর্ঘ্য প্রভা-পাশ্য যতনে।
 চতুর্ভুজা, গহ পূজা, নানামি মা মঘনে।
 প্রাণশাস্ত, সর্গপণ, করিলাম ত্রিপদে।
 পোনে নত, অশ্বত্থ, পড়ি যোচ-বিপদে।
 আমি দীন, ডাকি কণ-ভয়ে শুমা অজয়ে।
 দীনভক্ত, কর মুক্ত, গিরিবর-তনয়ে।

কালীস্তোত্র।

মহাকালি কালহরা, ব্রহ্মদায়ী পরাংপর।
 ভরাস্য তরপে তার মহাকাল-মোহিনি।
 পাদপদ্ম মুক্তিময়, ত্রিভূত তকতিচয়,
 কে জামে মরিমা তব শাবিধ-বাহিনি।
 আকাশ পাতাল ভূমি, সমস্ত-প্রসঙ্গ ভূমি,
 মানসকন্দরী মাত্রো মানসক-পেরিহী।
 তোমাতে সকল সত্ত্ব, তোমাতে মহৎ তত্ত্ব,
 বেদ বিদ্যি শাস্ত্র বৃত্ত সব তব কাহিনী।
 হরনর হর কেশ, হর তনু, হর দেহ,
 রক্ষ দায়ে কালভয়ে সৌখ্য-মোক-দারিনী।
 হুধাত শিবগী ভাগ, সূতি পট কেশজাল,
 ভব-উরে বিরাজ মা ভবপারে বাহিনী।
 বীজমন্ত্র সে প্রবণ, ব্রহ্মবিদ্যি ভূমি সব,
 ভূমি গো পাঠ্যভীক্ষক কৃপাশ্রয়-দারিনী।
 অপর্যাপ্তাভিতা, নরককে হুশোভিতা,
 চণ্ডমুখ মুণ্ডখণ্ড দেহভরতপারিনী।
 ভূমি বিষ্ণু ভূমি ব্রহ্মা, ভূমি বিষ্ণু বিষ্ণু,
 ভূমি ইন্দ্র ভূমি চন্দ্র, ভূমি চন্দ্রসাপিণী।
 ভূমি বেদ ভূমি বিদ্যা, ভূমি আদি মহাবিদ্যা,
 হইও কালী মহাবিদ্যা, অস্ত্রমে মহারিনী।

তারাতাঁদ সন্দার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার হুদর দক্ষিণে সংগ্রামপুর নামে
 একটা অতি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল।
 গ্রামে অনেক লোকের বাস; তন্মধ্যে কাহার
 গ্রামধর্মই অধিক। আমরা যে সময়ের কথা
 বলিতেছি, ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন তাহার
 অতি অল্পকাল পূর্বে হইতে সংস্থাপিত হইয়াছে।
 হুতরং ও তখনও দেশ শ্রমশীল হয় নাই।
 তখনও বিশৃঙ্খলতা ও অস্বাভাবিকতা পূর্ণমাত্রায়
 বিরাজ করিতেছিল। তখনকার দিনে দহা-
 ভোতি এত প্রবল ছিল যে, কেহই মনপ্রাণ
 নইয়া দিগ্বিদ্যে বাস করিতে পারিত
 না। দহাভাষ্য কাহারও বাড়ীতে ডাকাইতি
 করিলে বলিয়া পর পাঠাইতেছে; কাহারও

বাড়ীতে লোক-দ্বারা সংবাদ দিতেছে। আবার
 কাহারও বাড়ী অতিবিশেষে পিয়া জাহাদের
 যথাসম্পূর্ণ গুপ্তন করিতেছে। তখনকার লোকদের
 দিম প্রায় এইরূপেই কাটিত। সে সময়ে
 "অবশ্য পুঞ্জি দিগ; কিন্তু পুঞ্জিদের কার্য-
 কালিতার হুদয় তখন ঘেরণ ছিল, এমন
 তাহা অপেক্ষা যে দেশী উৎকর্ষদায়ন করিয়াছে,
 এমন বোধই হয় না।

বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র সংগ্রামপুরের এক
 জন অসম্পূর্ণশালী লোক। গ্রামের মধ্যে
 তাঁহারই হুদয় আটলিকা। দহাভয়ে তাহা
 অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তাহার বয়স
 ৩৬ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। বেশিভে
 উজ্জল শ্রামবর্ণ, বর্ষাকৃত্তি, হুতরিত-মেহ, বড়
 শ্রমশাস্ত-মুগ্ধি এবং অতি শান্তিভাব। তিনি
 সেই প্রদেশস্থ জমিদারের, একজন সর্বপ্রধান
 কর্মচারী। আর জমিদার-সরকারে তাহার
 প্রতিপত্তিও বহুই। তিনি নিজগণে জমিদারের
 বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং প্রজাবিশেষের অসীম
 শ্রদ্ধাভাজন। জমিদারের আয় কিসে বৃদ্ধি
 হইবে, তাহার চেষ্টা তিনি সর্বতোভাবে করিয়া
 গেলেন, অথচ প্রজাদের উপর কখন অঙ্গমান
 করেন না। যদি কোন বৎসর প্রজাঘা হয়
 বা অল্প কোন কারণে শস্য না জন্মে; তাহা
 হইলে তিনি জমিদারকে অল্পরোধ করিয়া,
 সে বৎসর প্রজাদের খাজনা রেহাই করিয়া
 দেন। প্রজাদের মধ্যে মারীভয় উপস্থিত হইলে,
 তিনি জমিদার-সরকার হইতে যতদূর পারিতেন,
 নানাপ্রকারে প্রজাদের সাহায্য করিতেন।
 তিনি নিজেও কিছু চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন
 করিয়াছিলেন, এবং কিছু ঔষধও রাফিতেন;
 কাজেই কৌশল, জ্ঞানবান, বিধিমাতে
 তাহাদের উপকার সাধিতে করিতেন। প্রসন্ন
 বাবুর এই সকল সৌভাগ্যে প্রজারা যারপর-
 নাই বশীভূত ছিল।

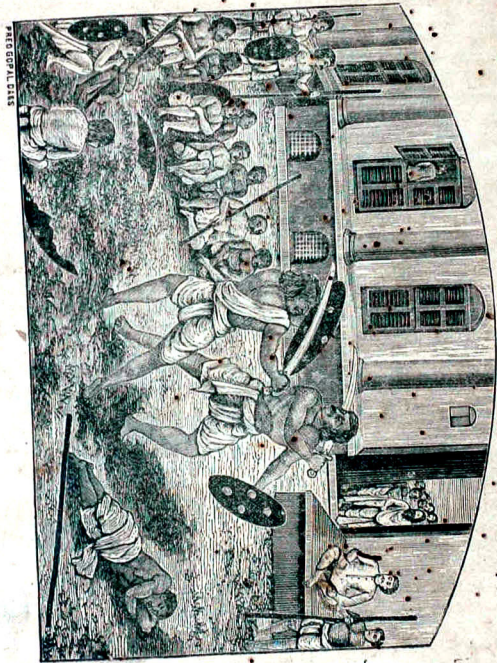
সংগ্রামপুর বাড়ী, জমিদারী কাছারী হইতে
 কিছু দূর। প্রত্যহ বাতায়নের সেরাপ হুবিধা
 ছিল না বলিয়া, তাঁহাকে কাছারীবাড়ীতেই
 থাকিতে হইত। হুবিধামতে কখন কখন
 বাড়ী আসিতেন। সে সময়ে ডাকুইতের
 ভারা অ। এদিকে তিনি সন্তোষ প্রাপ্ত।
 বাড়ীতে সর্বদা থাকিতে পারিতেন না বলিয়া,

বাঁটা রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত তিনি তারাচাঁদ সন্ধার নামে একজন পাইক রাখিয়াছিলেন। তারাচাঁদের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর হইবে। বর্ণ শ্রাম, শরীর দীর্ঘায়ত, প্রায়ঃবলে বলিষ্ঠ। হস্ত-পদের পেশী ক্ষীণ, যেন লৌহনির্মিত। তাহার চকুদ্বয় অলস, কটাক্ষ বড় কঠিন, তাহাকে দেখিলেই শঙ্কা হইত; কিন্তু এদিকে সে স্থানীয় অতীত ধর্মভীরু এবং বিপারী। তারাচাঁদ ব্যতীত তাহাতেই বাবুর বাড়িতে প্রতিপালিত বয়ী তাহার স্বাক্ষরাত সর্বত্রই ছিল। সে বাড়ীর একজন পরিচারক বয়সিই পরিগণিত হইত। এমন কি, তাহার কষ্ট বাড়ীর একটা প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট ছিল। সে রাজিকালে তথায় ধর্মিত। তরবারি খেলায় তারাচাঁদ একজন অধিকার; বেশমধ্যে তাহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। তারাচাঁদের দুই জন মাস্কের ছিল। একজনের নাম গোরাচাঁদ, অপরের নাম হাভার। ইহারা দুই জনে প্রমত্তবাবুর বেতনভোগী হুত। এই তিনজন একত্র ফিলে, তাহারা কোন ডাকাইতের দ্বারক নৃহুতও করিত না। তাহাদের সাহস—তাহাদের পরাক্রম অসু-নীয়। আর ইহাদের জন্ত প্রমত্তবাবুর বাড়িতে ডাকাইতি হওয়া দূরে থাকুক, যেই গ্রামে কখন ডাকাইতি হইতে পারিত না। ডাকাইতেরা তাহাদের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত।

প্রমত্তবাবু অতিশয় ধর্মপরায়ণ লোক, হিন্দু ধর্মে তাহার অপরিমিত আস্থা, তাহার বাড়িতে দোল, চূর্ণোৎসব, বার মাসে তের পার্বণ হইত। একবার বিজয়া-দশমীর পরদিন প্রমত্তবাবু সর্গদ্বারকে পুজার জালানে বসিয়া আছেন। প্রত্না বিসর্জনাগ্রে প্রাণানীত সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ হইয়া রক্ষাচ্ছে। সমাগত ব্যক্তিদের আর তেমন কোন দৃষ্ট নাট্য; সকলেই স্বীতি নিয়মান হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে কাশান্তক ঘরের স্তর এক দল বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী লোক তথায় আসিয়া প্রমত্তবাবুরকে অভিযান করিল। তিনি তাহাদের আগমনের ক্রুর বিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, যদি অসুস্থ হইলে, তাহা হইলে তাহারা স্ত্রী একবার তারাচাঁদের সঙ্গে এক হাত পেলে। প্রমত্তবাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি পুত্রিতঃ পারিগা-

ছিলেন, ইহারা সকলেই ডাকাইত, খেলার ভান করিয়া তারাচাঁদের প্রাণ বিনাশ করিতে আসিয়াছে; হুতরাং তিনি প্রথমে তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন না। এদিকে ডাকাইতেরা তাহাকে ছাড়ে না। অবশেষে তারাচাঁদ আসিয়া প্রমত্তবাবুরকে করোড়ে বলিল, তাহাদের মধ্যে একজন প্রাণ আছে, যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া অস্ত্রের সঙ্গে খেলিতে আইসে, তাহা হইলে সে অসুস্থ হইবে। তাহার সঙ্গে খেলিলে, আর এমন ফলে না খেলিলে, অস্ত্র কাম্পকতা প্রকাশ পায়; অতএব তিনি তাহাদের আজ খেলিতে অসুস্থিত প্রদান করিল। প্রমত্তবাবু বলিলেন, তোমাদের এই খেলাতে যদি কেহ হত কিংবা আহত হয়, তাহার দায়ী কে হইবে? তিনি ইহার জন্ত কখন দায়ী হইতে পারিবেন না। ডাকাইতেরা বলিল, ইহার জন্ত তাহাকে কোন প্রকার বিন্দুগ্রস্ত হইতে হইবে না। প্রমত্তবাবু পাক লোক, তিনি তাহাদের কাঁকা কথায় বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, তাহাকে এই মর্মে একটা লিখিয়া দিতে হইবে যে, যদি এই খেলাতে কোন পক্ষ হত বা আহত হয়, তাহা হইলে তিনি তজ্জন্ত কখনই দায়ী হইবেন না। ডাকাইতেরা এই চুক্তি লিখিয়া খেলিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। প্রমত্তবাবুর বাড়ীর সমুখ এক সরদা জায়গায় খেলিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে সেখান লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্রথমে ডাকাইতেরা তারাচাঁদের সঙ্গে খেলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তারাচাঁদ বলিল, তাহার দুইজন মাস্কেরে এখানে উপস্থিত আছে, আর তাহাদের সঙ্গে খেলা হউক; পরে তাহা সঙ্গে খেলিলে। সকলেই এই প্রস্তাবে মুগ্ধ হইল। ডাকাইতের দল বক্তব্যের দাঁড়াইল। প্রথমে গোরাচাঁদের পালা পড়িল। গোরাচাঁদের বয়স প্রায় ২৫-২৬ বৎসর, মা-ঘোঁসাল এবং গুণ বলিষ্ঠ; কিন্তু অপরিণত বয়স বলিয়া খেলাতে কিছু অপরিণত গোরাচাঁদ তাহা তরবারি তাইয়া বহুদূরিত অবতীর্ণ হইল। ডাকাইতের দল হইতে কক্ষায় বলিষ্ঠগণ এক জন ছোক আসিয়া তাহার সমীপবর্তী হইল। দুইজনে খেলা আরম্ভ করিল। একজন অপরকে আঘাত করিবার জন্ত অঙ্গের ঝুজিতে

তারাচাঁদের তরবারি খেলা।



তারচাঁদ উপাখ্যানে—১৫ পৃষ্ঠা।

আপিল । অবশেষে ডাকুইত্তের দলের লোক
হুযোগ পাইয়া পোরাটাঙ্গের মস্তক লক্ষ্য করিয়া
তরবারি আঘাত করিল ; পোরাটাঙ্গ চক্ষোদ্ধীন
হয় সে আঘাত রক্ষা করিল নষ্ট, কিন্তু সে
খেলিতে তাদৃশ সুনিপুণ ছিল না বলিয়া,
আঘাতকার্য্য অসির শেষ ভাগ তাহার কপালে
পারিয়া, একটা হস্ত দাপ পড়িয়া গেল ।
ভদ্রর্শনে ভাড়াটাঙ্গ তাহাকে খেলিতে নিষেধ
করিল । তাহার পর হাতীরাম আসিল ।
হাতীরাম বর্ণাশ্রুতি, মজল-জগদ "ভীমমূর্ত্তি"
বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে । তাহার মস্তকের
মধ্যে এক প্রকাণ্ড লাঠি ; তাহাই হাতে
করিয়া সে ঘোষানে উগঠিত হইল । হাতীরাম
তথার উপস্থিত হইয়াই বলিল, "বেধ ভাই ।
আমার ঢাল নাই, তরওয়ালও নাই, আমি
জয়রাম সর্দার, যে লাঠি খেলিতে জান, সেই
আমার সঙ্গে খেলিতে আইস ।" এই কথা
ভনিয়া ডাকুইত্তের দল হইতে, একজন
ভীমকায় পাকা লেঠেল তাহার সমুখীন হইল ।
দুইজনে খেলিতে লাগিল । হাতীরাম বড়
বৃত্ত । তাহার ছায়ত খেলার দিকে তত লক্ষ্য
থাকুক বা না থাকুক, কি প্রকারে তাহার
প্রতিদ্বন্দ্বাকে ভূতলশাণী করিবে, সে তাহার
চেষ্টার বাকিল । সে খেলিতে খেলিতে তাহার
প্রতিপক্ষের ঢালের উপর এমন জোরে আঘাত
করিল যে, ঢালত ভাঙ্গিয়া গেলই ; অধি-
কৃত ডাকুইত্তের পোর পাঁজরা চূর্ণ হইল ;
সে পড়িয়া ক্রমদার ছায় গড়াইতে লাগিল ।
সেই সময়ে ডাকুইত্তের দল হইতে ভারী
গোল উঠিল । তাহারা সকলেই একব্যাক্যে
বলিল, অস্ত্রায় করিয়া তাহাদের সঙ্গীকে মারিয়া
কেনা হইয়াছে ; খেলার এরূপ কখন স্রীতি
নহে । যথা হউক, ভাড়াটাঙ্গ তাহাদের মিষ্ট
কথায় দুই করিয়া নিষেধ খেলিতে চাহিল ।
আর ডাকুইত্তেরা তাহাই চায় । ডাকুইত্তেরা
দল হইতে বাছিয়া বাছিয়া, একজন লোক
দিল । সে যেমন যেতান, তেমনি খেলোয়াড় ।
দুইজনেই প্রায় সমান-শিক্ষিত বলিয়া, অনেককণ
পর্যন্তও খেলা চলিতে লাগিল । ভাড়াটাঙ্গের
ইচ্ছা নয় যে, সে আপন আঘাত করে,
এইজন্য সে অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল ।
এমন সময়ে ভাড়াটাঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার

মস্তক লক্ষ্য করিয়া, তরবারি আঘাত করিল ।
ভাড়াটাঙ্গ তাহার বিচিত্র শিলা-কৌশলে দ্বী
তরবারি দ্বারা সে আঘাত নিবারণ করত
নিষেধমধ্যে আক্রমণকারীর স্বক্রে এমনভাবে
আঘাত করিল যে, সে তৎক্ষণাত্ বিধ্বস্ত
হইয়া মাটিরত পড়িয়া গেল ।" সেখানে থাকিলে
প্রাণহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিলম্বিতা করিয়া,
ভাড়াটাঙ্গ ঝাল তরবারি হস্তে এক ক্ষণে সেই
মদুযামগুনী পার হইয়া, অতি দ্রুতবেগে
কাহারও বাড়ীর ভিতর, কাহারও বাড়ীর পশ্চাৎ
দিয়া শেষে বিড়কার দ্বার দিয়া, আপনার প্রভুর
বাড়ী প্রবেশ করিল । তখন ডাকুইত্তেরা
দেখিল, অতি চাতুরী খেলিয়া তাহাদের হাতের
লীকার ঝাল ছিড়িয়া পলাইয়া গেল । তাহারা
মনে মনে গির সম্মল করিয়া আশিয়াছিল, ছায়ত
হউক আর অজীত হউক, ভাড়াটাঙ্গ সদ্দারকে
শ্রান্তি শমনসমনে পাইয়াই আসিবে । একথা
ভাড়াটাঙ্গও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই
সে সকলের দৃষ্কে দুলি দিয়া প্রস্থান করিল ।
ডাকুইত্তেরা এখন অন্যতোপায় হইয়া কয়েক
জন সেই ছুটা নামকে লইয়া গেল । উপর
কর্ত্তজ্ঞান সেই শোণিতাপ্লুত হানকে দোত
করিয়া প্রস্থান করিল । কয়েক দিন এই
ব্যাপার লইয়া প্রাক্ষে বুর দূর পড়িয়া গেল ।
মাঠে ঘাটে সর্বত্রই এই কথা । অনেকেই
ভাড়াটাঙ্গের প্রশংসা করিতে লাগিল ; দুই এক
জনের ভাষা তত ভাল লাগিল না । এদিকে
প্রমদবাবুর ছুটা ঘুরাইয়া আসিল, তিনি আপন
কণ্ঠস্থানে চলিয়া গেলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতীত হইল ।
আবার শরৎকাল সমুপস্থিত । গ্রীষ্মের আর
তেমন প্রখর তেজ নাই ; বর্ষার জল জন্মে
সব অবসর হইয়াছে । প্রকৃতিহৃদয়ী বর্ষা-
বারিধাত হইয়া, স্তব্ধবর্ণ পরিচ্ছদে দিক
ঝিন্সিত করিয়া উলিয়াছে । গারখীর উৎসবের
আমি অধিক দিন নাই দেখিয়া, ভাড়াটাঙ্গ
মন করিল, "এই সময়ের মধ্যে তাহার
নাভাকে একবার দেখিয়া আইসে ;" হুঁহু
আর শীঘ্রই উঠিয়া উঠিবে না । সে এই সকল

কথ্য গৃহকর্তা প্রসন্নবাবুর বাস্তব নিকট গিয়া বসিল, অনেক দিন সে তাহার মাতাকে দেখে নাই, তিনি যদি অসুস্থ হইলেন, তাহা হইলে সে একবার মাতৃচরণ ধর্ম্ম করিয়া আসিত পাবে। প্রসন্নবাবুর মাতা বলিলেন, থাকিবার মেরুম ডাকাইতের ভয়, তাহাতেও তিনি ক্রি প্রকারেই বা বাইতে কেন? তারাচাঁদ বলিল, সে কেবল একটা রাত্রের জঙ্ঘ বাইতে চাহে, পরদিন প্রভাতে আমার এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বিশেষত গোরাচাঁদ এবং হাতীয়ার রহিয়াছে; তাহাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিইবে, তাহার রাত্রের ভাল বিশেষ সতর্ক বাইবে থাকিবে। কর্ত্তাচাঁদ হাঁকি ক করেন, অগত্যা তারাচাঁদকে, নিদ্রার দিতে সম্মত হইলেন। তারাচাঁদ জটিলিত গোরাচাঁদ এবং হাতীয়ারকে আপনায় গৃহে হইবার কথা উল্লেখ করত তাহাদের সে রাত্রের জঙ্ঘ অভিযান সাবধান হইয়া থাকিতে বলিল। তাহারও তাহাতে সম্মত হইল।

তারাচাঁদের বাড়ী সংগ্রামপুর হইতে প্রায় চার ক্রোশ অন্তর। রাত্রি আট বাটকার মধ্য সে বাড়ী পৌঁছিতে পুণ্ডির দ্বিগ্ন করিয়া, সন্ধ্যার সময় তববায় হস্তে প্রভু-গৃহ হইতে বহির্গত হইল। শরৎ কালের রাত্রি অতীত হইল। অধিক বিস্তৃত, নির্মল; তাহাতে প্রকৃত-নন্দনমাল্য-ভূষিত রিক-রশ্মির শব্দর অসুচরণ-পরিবেষ্টিত নরপতির ভায় বিকাশিত হইয়া রহিয়াছে। পুণ্ডিরীতলে বৃন্দর ও লতাশ্রমহ নীরবে চম্ভার হনির্মল করগাণিতে বিশ্রাম করিতেছে। অপর্যায়িত সময়ে তারাচাঁদ বাড়ী পৌঁছিতেছিল। বাড়িতে তাহার কেহই নাই, কেবলমাত্র এক অসুখিতবুয়া, বুয়া মাতা। বুয়া অনেক দিনের পর প্রত্যন্ত অলোকান করিয়া আনগে অধীর হইল। তাহাকে কি বাইতে গিয়ে, তাহা লইয়া বুয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তখনকার দিনে হাজার গরিব হইলেও ঘরে অন্তরে সম্মান থাকিত। তারার বারের চাকরা ছিল, কিন্তু কাঠেছিল না। বুয়া তাহার প্রত্যন্ত বলিল, ঘরে রাখিবার আর সন্ধান নাই। আছে কেবল কাঠ নাই; এই বলিয়া বুয়া বাড়ী হইতে কিছু দূরে আশ্রয় করিতে গিয়া তারাচাঁদও মনে করিল, ইত্যবসরে সে তাহার

প্রতিবেশীর সঙ্গে একসঙ্গে সাধাং করিয়া আসিলে। বাইবার সময় সে ঘরের কোণে তববায় রাখিয়া, মাতাকে বলিয়া গেল, ঘনে তাহার বাড়ী-আমার সংবাদ শুনাও, তখন নিকট প্রেক্ষাশা কর। বুয়া বুটে অসুখে মাত্রে গেল। সে মাত্রে বুটে হুড়াইতে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে একজন লোক সেই স্থান দিয়া বাইতেছিল। তাহার বুয়াকে দেখিয়া বলিল, 'তারার মা! তুই এত রাত্রে যে ঘর বুটে হুড়াইতে ছাড়িলি?' বুয়া বলিল, 'তারাচাঁদ বাড়ী আসিয়াছে, ঘরে কাঠ ছিল না, তাই হুটে হুড়াইতে আসিয়াছি।' লোকটা বলিল, 'ভালই হইয়াছে, আমরা এখন কাঠ্যহারায়ে হানামজুরে বাইতেছি, আসিবার সময় তারাচাঁদার সঙ্গে একবার সাধাং করিয়া আসি।' স্বাস্থ্যময় তাহার মা গৃহে আসিয়া, রজন্যকার্যে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছে, এমন সময় তারাচাঁদ প্রতিবেশীর সঙ্গে সাদর-সম্মান করিয়া, গৃহে করিয়া আসিল। আসিমালায় বুয়া প্রত্যন্ত মাত্রে বটনা সব বিবৃত করিল। তৎপ্রবন্ধে তারাচাঁদ অত্যন্ত মুগ্ধিত হইয়া বলিল, 'মা! এত দিনের পর বাড়ী আসিলাম, এক মুঠা লাভও বাইতে গিলে না। বাহ্যের মনে মাত্রে তোমার বেথা হইয়াছিল, তাহার সকলই জুইয়াছে। তাহার আপাততঃ আমার মনিবের বাড়ী ডাকাইত করিতে বাইবে, তাহার পর আসিবার সময় আমাকে এখানে একটা পাইয়া বুন করিয়া রাখিয়া দিবে। মা! আমি এখানে চলিলাম, বাহ্যের ঘরে আমি এত দিন প্রতিপালিত হইয়াছি, আপে তাহাদের প্রায় রক্ষার উদ্যোগ করিতে বাই।' এই কথা বলিয়া, তারাচাঁদ তববায় হস্তে গৃহের বাহির হইল।

রাত্রি তখন দশটা বাজিয়াছে। চন্দ্ৰমা অন্তঃস্থ, বিষময় অন্ধকারে পরিপূর্ণ একে প্রায়মগ্ন, অতি সন্ধ্যা, তাহাতে তারার শ্রাম-শোভায় নানাপ্রকার বর্ণান্বিত ছায়া করিয়া আরও অন্ধকার করিয়াছে। তারাচাঁদ এই পর্ব দিয়া অতি সাবধানে বাইতেছে। কিয়দূর গিয়া তবিল, কতকগুলি লোক কথা করিতে করিতে সেই-পথ দিয়া চলিয়া বাইতেছে। অসুমনে গুলি, ইহারই ডাকাইত



পাছে তাহাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে তারাচাঁদ তাহাদের নিকটবর্তী হইল না; বরং অপরূপ দিয়া গা ঢাকিয়া চলিতে লাগিল। কিছুদূর গেল একটা সন্ধ্যা-শ্রীয়া স্রোতধিনী ছিল; ডাকাইতেরা তাহা পার হইয়া, অপর পারের দিয়া গাটনাকে করিল, 'সে যদি আসে রাত্রে আর কাহাকে পার করিলাম' দেখ, তাহা হইলে কাল তাহার আসিয়া তাহার মাথা কাটয়া ফেলিবে।' তাহার অনতিদূরে তারাচাঁদ আসিয়া উপস্থিত। সে পাটনাকে শীঘ্র পার করিয়া দিতে বলিল; কিন্তু পাটনী তাহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। তারাচাঁদ তাহাকে অনেক অনুন্ন বিনয় করাত সে বলিল, যদি তাহার হুইটা মাথা থাকিত, তাহা হইলে সে তাহাকে পার করিয়া দিতে সম্মত হইত। তারাচাঁদ তাহার এই রকমের সর্ব অবগত হইয়া আর দ্বিধা নাই করিয়া, নদীতে দিয়া চলিতে লাগিল। কিছুদূর সে একস্থানি জল-ভিত্তি দেখিতে পাইয়া, তাহার সাহায্যে অপর পারের দিয়া উপস্থিত হইল। পাছে-ভিত্তি-পার লাগে ভাসিয়া যায়, এইজন্য এক বৃক্ষমূলে অহা বাঁধিয়া, সে আপন গন্তব্যস্থানে চলিয়া বাইতে লাগিল। তারাচাঁদ বুঝিল, ডাকাই-তেরা কিছু অগ্রবর্তী হইয়াছে; সে সতরে চারি দিক দেখিয়া বাইতে লাগিল। এমন সময় দেখিল, রাস্তার অনতিদূরে একটা সমুদ্র তবানের ভিতর আলো জলিছে। এবং বহু মহাযাত্র-বর ভনা বাইতেছে। তারাচাঁদ বুঝিল, ডাকাইতেরা এখানে আসিয়াই আজ্ঞা পাড়িয়াছে; হুতরাং সে আর কাং-বিশ্বাস না করিয়া, অতি জতপনে আপনায় মনিবের গৃহাভিমুখে চলিল। রাত্রি বর্ধন প্রায় আড়াই প্রহর, তখন সে প্রায়মগ্নর বাড়ীতে উপ-স্থিত হইল। বাড়ীর কাহারও কোন শব্দ নাই, সকলেই নিদ্রার শান্তিময় জোড়ে শায়িত, কেবল মধ্যে মধ্যে সোঁদা-পাখির চেঁচকের কর্ণ শব্দ, আর দূরে গোরাচাঁদ এবং হাতী-য়ারের চাঁৎকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল। প্রায়মগ্নর বাড়ীর এক পার্শ্বে একটা বিদ্যার বটরূপ ছিল। বৃক্ষটা শাখা-প্রাশাণা বিস্তৃত করিয়া, মূলেও বাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তারাচাঁদ তাহা, বাহির হইতে ডাকিলে কাহারও

সাড়া-শব্দ শোওয়া বাইবে না। সে উজ্জ-বৃক্ষতলে আশ্রিয়া দেখিল, তাহার একটা শাখা হুইয়া বাড়ীর ছাদের উপর পর্যন্তও বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে; আবার সৌভাগ্যক্রমে সেই শাখা হইতে একটা নারী (নামন বা খুরি) নামিয়াছে। তারাচাঁদ সেই নারীর সাহায্যে ছাদের উপরে নামিল এবং পাছে ডাকাইতেরা এই উপরে ছাদে আইসে, এই ভয়ে তাহার হাত বড় দূর শব্দিভুক্ত, তববায় দ্বারা তবুর নামাটা কাটয়া দিল। তববায়র সে অতি দক্ষশীল ছাদের সিঁড়ির দরজা বুঝিয়া নীচে নামিল। সেই ঘোঁষা বাড়ীর এক পার্শ্বে তাহার একটা ঘর ছিল। সেই ঘরের মধ্যে অল্প বয়সের কোনকণ সন্ধ্যা ছিল। তারাচাঁদ আসিয়া সেই ঘরে গিয়া। 'প্রকাঠটা অতি সন্ধ্যাযুক্ত। সম্প্রতি মধ্যে তাহার এক সন্ধ্যাযুক্ত। তাহা দ্বিগুণিত ঘরের পেটরা, আর সেখানে দুই বানি ঢাল ও দুই বানি তাক্কার, অতি ছিল। তখন দীপশালসার প্রচলন ছিল না; তারাচাঁদ চকমক এবং মোলার সাহায্যে ঘরে প্রাণী জালিল। সে প্রাণকে কতকটা সজ্জি বটীয়া প্রচুর পরিমাণে তাহা পান্যকর্য তুলিল। শেষে সেই পেটরা হইতে ছিন্নবস্ত্র বাহির করত মন্তকে হাতে, পৃষ্ঠে বেশ করিয়া জড়াইয়া, ডাকাইতদের প্রত্যাখ্য করিতে লাগিল। এদিকে ডাকাইতেরা যে বাগানের আশ্রয় লইয়াছিল, সেটা অতি বিস্তৃত; তাহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষ, ডালে ডালে, পাড়ার পাড়ায় মিশিয়া রহিয়াছে। সেখানে ছিল নাই, আলো আসিবার পথ পর্যন্তও নাই। কয়েক তলার গাছের উপর। রাত্রের কথা দূর থাকে, নিবাভাগেও কিছুই জল দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জনশ্রুত প্রকৃতদৃষ্টান্ত কানে, ডাকাইতেরা কলসী কলসী মদ আসিয়া, উরসার করিতেছিল। আত্ম হুতাপনোদিত হইয়া, নানাপ্রকার কুসমিত আমোদ ও চাঁৎকারে বন কাঁধাইতেছিল। আর অধিক বিশেষ কার্যহানির মজ্জান না মনে করিয়া, ডাকাইতের দল সেই স্থান পরিভ্রমণ করিয়া। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর মতঃ; চন্দ্ৰ অনেক দূর অন্তঃস্থ; আকাশে কেবল মাত্র দুই

একটা নক্ষত্র পরিদৃশ্যমান, তাহাও আবার মধ্যো মধ্যো সান্না মেঘ আশিয়া আবৃত করিতেছে। এমন সময় স্থাপানোহ-মাহিত হইয়া, ডাকহইতরা প্রসমভাষ্য-বাড়ীর দরজায় ঢেকৌ ঘারা দন-দন আঘাত করিতে লাগিল। দরজা খুব একাও, অতীত দুই তাহাতে আবার বড় বড় গুলি বসান। ঢেকৌ আঘাতে দরজা শব্দ হইতে লাগিল। বাড়ীর বাহিরে সাধারণ-গর্জনবৎ সেই ডাকহইতদের চাঁৎকার শব্দে প্রাণের চারি দিক্ অপ্রসন্নিত হইতে লাগিল। সেই শব্দে পোরটান এবং হাতীরা প্রসমভাবুর বাড়ীর সমীপবর্তী হইয়া, এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাহাদের কাণ্য দেখিতে লাগিল। বাড়ীর সমীপবর্তী রাস্তার দুই প্রান্তে দুইটা খাঁটা বসিয়াছে। তাহার মনে হানে, মশাল পুঁতরা, রাস্তার সেই নিকটস্থকার নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আর শোভিত-পিপায়ে বাসুরে ভ্রাতা তাহার বাড়ীর চারিদিকে ছুটাছুটি করত বিকট-চাঁৎকার করিতেছে। মাধ্য কি যে, কেহ এমন সময়ে তাহাদের সন্ধান হয়। পোরা এবং হাতীরা প্রাণী গুলিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিতেন, দিন বৃষ্টিয়া আজ তারাচাঁদ গৃহে নাই। তাহার হইলেন ওই ভাষ্য ডাকহইতের। তাহার বাসুর পরিবারদের যে, আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, এ আশা নাই; তথাপি তাহার প্রাণপন করিয়া, আপনাদের প্রবুর পরিবারকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। তাহার নিশ্চয় বৃষ্টিয়াছিল, আজ তাহাদের প্রাণপন করিতে করিতেই পশ্চাৎপদ হইবে না। তাহারা কেবল উপরক্ত অবস্থার গৃহিতে ছিল।

যে ডাকহইতের প্রতীক্ষায় তারাচাঁদ একদল বসিয়াছিল, তাহারা আসিয়াছে দেখিয়া, সে সময়ে নীচে নামিল। অন্যচাঁদ তখন সির, উৎকণ্ঠিত, নিভীক—যেন ত্রিভুজ তপ্ত নাই। সে প্রাণে নীচে নামিয়াই এক হাঁক দিল; প্রাণের পদাঙ্কল আশিয়া আর একটা হাঁক দিল। এই শেষ বোঁদার প্রাণ হাতীরা কণ্ঠে পড়িল। তাহার তারাচাঁদের হাঁক বেশ চিনিত; সেই শব্দে বৃষ্টিয়া, তারাচাঁদ

আসিয়াছে। তখন আর তাহাদের ভয় কি হুতরাই যিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তাহারও এক একটা হাঁক দিল। তদনন্তর তারাচাঁদ দরজার নিকট আসিয়া, সেইরূপ আর একটা বিকট শব্দ করিল; পোরা এবং হাতীরা তাহার উত্তর দিল। তখন তারাচাঁদও বৃষ্টিয়া, হাতীরা দুইজনে এখানে উপস্থিত আছে। তারাচাঁদ সর্বদা অবিকল্পিত-ধরে ডাকহইতের বসিল,—‘মেঘ, তোরা আমার ননিবের দরজা ভাঙ্গিস না, আমি দরজা খুলিয়া দিতেছি।’ এই বলিয়া, সে অর্ণণ মনে করত দুহুৎ কবাত গুলিয়া দিয়া বসিল,—‘ডাকহইত করবি ত বাড়ীর ভিতর আর, বাহিরে কেন?’ ডাকহইতেরা বলিল,—‘তুই বাহিরে আর।’ তারাচাঁদ—‘তোরা ডাকহইত করিতে আসিয়াছিস, তোরা বাড়ীর ভিতর আসিয়া ডাকহইত কর, আমি ত দরজা খুলিয়া দিয়াছি, আমি কেন বাহিরে যাইব?’ ডাকহইতেরা তারাচাঁদের বাহবল, তাহার শিকা উত্তমরূপে জানিত। বাড়ীর ভিতর গেলে, হুত কাহারও পলাইবার স্থিতি হইবে না, একমুহূর্তে তাহার বাড়ীর ভিতর যাইতে সাহস করিল না। তাহারা তারাচাঁদের বাহবল বাহিরে আসিতে লাগিল। তারাচাঁদও বৃষ্টিয়া, তাহারা ভিতরে আসিতে ভয় পাইতেছে। তখন সে দপিত-মেঘ, অতুল-মাহসে হস্তার ছাড়া, এক লক্ষ সেই হস্তমাহসে মধ্যবর্তী ডাকহইতের দলমধ্যে পড়িল। হস্তেগ বৃষ্টিয়া, পোরা এবং হাতীরা তাহার পার্শ্ববর্তী হইল। তারাচাঁদ অতি ক্রিপ্রহস্ত, অতিশয় শিখার শিকিত; তাহার সমুদ্রে যে আসিতে লাগিল, সেই দ্বিধার হইয়া মাটিতে পতিত হইল। আবার তাহার কুরাল কবল হইতে যে পলাইবার চেষ্টা করিল, হয় সে পোরা অসিতে, না হয় হাতীরা তদনন্তর লাগিতে কুতলশাণী হইল। হাতীরা তিন জন মতস্তার ভ্রাতা চারিদিকে বৃষ্টিয়া ডাকহইতের বিনাশ করিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্করভাবে ডাকহইতের দলের ৮৯ জন পোকে, কাহাকেও দ্বিমুগ্ধ, কাহাকেও দ্বিধার হইয়া ভূপতিত হইতে দেখিয়া, ক্রমশঃ কয়েক জন প্রাণ লইয়া উজ্জ্বল প্রাণ করিল। ডাকহইতেরা সকল পলাইয়া গিয়াছে,

বাড়ীর বহির্ভাগ এবং জনমানবশূন্য তথাপি তারা এবং পোরা পরস্পর ‘তারা কাই’, ‘কাই, তারা কাই কাই’ এই কথা বলিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, আর হস্তার ছাড়াইতেছে। তাহারা এখন বাহজানশূন্য, উন্নত এবং মরিয়া। তাহাদের একদল সমুদ্রে গুলি চাপি-উঠিতে। কেবল হাতীরাই প্রকৃতপক্ষে বহিরাছে। যে আশার সন্ধানে অসহ্য হস্তমাহসে কাহারা, কি উপায়ে তাহাদের প্রকৃতপক্ষে করিবে, তাহা ভাবিতেছে। এদিকে নিশা অবসানপ্রায়। জন্মে রাস্তার পিকদের বাড়ীরওদের সময় হইয়া উঠিল। পাছে ডাকহইতেরা তাহাদের কোন-রূপ অনিষ্ট করে, এই ভয়ে হাতীরা বড় ভীত হইল। ঠিক সেই সময়ে প্রসমভাবুর অবসোহনে বাড়ীর সমুদ্রে আশিয়া উপস্থিত। ডাকহইত পড়িলে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাহাকে সংযাম পাড়িয়া দেন, সেইরূপ তিনি সেই সময়ে বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাহা হুত, হাতীরা বধপদে তাহার সমীপবর্তী হইয়া, সকল ঘটনা তাহাকে বিবৃত করিয়া, এবং তাহাকে ষড়্ভাষার দিয়া বাড়ী প্রবেশ করিতে প্ররম্প দিল। তিনি বাড়ী প্রবেশ করিলে হাতীরা তারাচাঁদের বলিল,—‘তাঁরা দান্য! দেখিছ কি, ডাকহইতেরা যে বাড়ীর ভিতর গিয়াছে।’ তারাচাঁদ—‘হী, তবে চল, আমরার বাড়ীর ভিতর যাই।’ এই বলিয়া, তাহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল; কিন্তু সেখানে গিয়াও তাহারা দুইজনে সেইরূপ ‘তারা কাই কাই, পোরা কাই কাই’ করিয়া বাড়ীর প্রাণ প্রদপন করিতে লাগিল।

বাড়ীতে ডাকহইত পড়িলে, স্ত্রীলোকেরা জন্মে একবারে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাহাদের ধারণা ছিল, তারাচাঁদ গৃহে নাই। হুতরা তাহাদের শব্দ আরও অধিক হইয়াছিল। ডাকহইতের সেই ভাষা চাঁৎকারে কেঁহ বা মুছিত, কেঁহ বা আশার পূজ কন্ডা লইয়া ব্যস্ত; কেঁহ বা সময়ে বিপদ-ভঞ্জন মুহূর্তমধ্যে ঘরগত তৎপর ছিলেন। প্রসমভাবুর পুণ্ড্রভাতের যে প্রবেশ করিলে পুর, তাহারা—‘তারাচাঁদ ও পোরাচাঁদের সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর আসিল। তারাচাঁদকে দেখিয়া, এবং ডাকহইতের প্রাণ-

‘বাড়ী তিনটি, মহিলাপন ভয়হীন’ হইলেন। ‘আমরা আনন্দে উৎসাহিত হইয়া, বারান্দা হইতে কেহ বা সাল, কেহ বা ভাল পরিবেশ হইতে, কেহ বা ঘড়া ইত্যাদি পুস্তক দিতে গুণিত। পূর্বদিকে উদায় ক্রিষ্টাভ্যাসিত প্রভাসিত হইল; তথাপি তাহারা দুইজনে উৎকণ্ঠে ‘তারা বাড়ীর চারিদিকে পূর্বদিকে—‘তারা কাই কাই, পোরা কাই কাই’ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কি উপায়ে তাহাদের প্রকৃতপক্ষে করিবে, এই চিন্তায় হাতীরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। সে এখন তাহাদের জ্ঞান সমুদ্রে করিতে বলিয়া, তাহার পূর্ব পোরা পশ্চাতে গিয়া তাহাকে গুলিয়া দিল। সে সমস্ত রাত্রি পরিপ্রম ক্রিয়া করি হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে ধরিয়ালাভ, সে শব্দ হইয়া বসিয়া পড়িল; এবং অতি সময়েই জানলাত করিল। এমন তারাচাঁদ—তাঁহার নিকটবর্তী হওয়া বড় শব্দ কথা নহে। একে তাহার শরীরে আত্মবিক বুল, তাহাতে সে অতুল গতির নেশার বিচার, তাহার উত্তর জ্ঞান আর এই ডাকহইত-বধে উদ্বিগ্ন; এতদুশ অবসার তাহার সমুদ্রান হওয়া, আর মুহূর্তমধ্যে পতিত হওয়া একই কথা। বাহা হুত, হাতীরা অনেক কৌশলে, অনেক চেষ্টায়, তাহার পশ্চাতে গিয়া তাহাকে একবারে সাপটীয়া ধরিল। ধরিয়ালাভ সে অপরূপ মনে হইয়া পড়িল। অনেক বধে তাহার চেতনা সঞ্চার হইল। মুহূর্তমধ্যে সে দেখিল, প্রসমভাবুর তাহার সমুদ্রে দাঁড়াইয়া, তাহার সন্ধ্যা উপায়েনো চেষ্টা করিতেছিল। তাহাকে দেখিবার জন্য সে অভিজ্ঞদান করিল। আজ প্রসমভাবুর এবং বাচীশ মনস্ক পরিবার তারাচাঁদের উপর কণ্ঠ সঙ্কট, তুলা বলা যায় নাই। সকলের মধ্যে তাহারই প্রাণশা, তাহারই কণ্ঠ। তাহারই বাহুল্যে, তাহারই পরামর্শে আজ তাহারা এই ঘের বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। তাঁহাদের হন, মান, প্রাণ এবং ইচ্ছা সকলই আজ তারাচাঁদ সঞ্চার হইতে যে রূপ হইয়াছে, তাহা তীক্ষ্ণ ইন্দ্ৰজ্ঞে স্বাক্ষর করিতেছেন। আর এদিকে নানাপ্রকার পারিতোষিক-দ্রব্য গৃহ-প্রাঙ্গণের অর্ধেক পূর্ণ হইয়াছে। সকলের মধ্যে তাহার

ওষাহবল-ভনিয়া, তারারিচ বড়ই লজ্জিত ও বড়ই ক্রুদ্ধ। সে সকলের নিকট কতই চেয়ে, বিনয় এবং সৌজন্য প্রকাশ করিতেছিল, তাহা বলা যায় না। বাহা হউক, শ্রবণবাহু তাহাদের বিভ্রাম করিতে বলিয়া, নিজে বহির্বিচারিত পোনে। বাহিনী দেখেন, ইহার মধ্যে এমের লোক সেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ভাঙ্গাইতে দেহ রক্তস্রোতে বহির্বিচারিত বেন নদী বিহেছে। স্বধাময়ে হলল সমভাষায়ে পুনি-শের দারায় অতিবাহ হইল। তাহার একলে কত পলায়িত লেখিয়া কত আত্মলন করিতে, কত মালাট মারিতে লাগিল। এসময়বার তিন জন পাইক থাকিতে অকলন ও ডাকাইত প্রেশুর হয় নাই বলিল। তাহার ঠাচার লোকদের, নিম্নাধার করিতে লাগিল এবং দ্রাহারা এনেহাত অকরবা, তাহার প্রতাপি কারবার অনেক উদারগ প্রয়োগ করিতে ক্রটি করিল না। বাহা হউক, সে কথার আদ্যের আর কাজ নাই। একলে পলিশ আপনাদের লিখিত্য বিষয় লিখিয়া এবং তৎসঙ্গে আপনাদের অনেক বাহাদুরীর কথা সুদক্ষপণ করিল, সববে পাঠাইয়া দিল। এই ডাকহিত্য-ভক্তি ব্যাপার এইরা, এসময়বরেক্ষকিত্ত যে কত পাইতে হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নিস্ত্রোচন।

অজ চিহ্নের মধ্যে এই ডাকহিত্য বাঙ্গালার সকল গোল মিটিয়া গেল। এসময়বার—তারাচাঁদ, পোরচাঁদ এবং বাস্তীরামকে পারিষাৎগিক বরদ্ব তিন ঘোড়া বোপা-বল্য আর তারাতিকে অতিবিক্র একটা সেবার তাপা গড়াইয়া দিলেন। তাঁহার বাজার সিন্ধুতে তারাতাদের বায়োগোপী একদানি গৃহ নির্মাণ করিয়া, তাহার নাতকে সেই ঘরেনে আনাইলেন। প্রভুর এতাদৃশ দয়ার জন্ত তারাতার ব্যবজীবন তাহার নিকট কৃণ্ডতাপাসনে খাণ্ড হইয়া রহিল। এসময়বার জীবনের শেষতপ অতি স্বপক্ষমে অতিবারিত হইয়াছিল এবং এতাহাকে আর কখন ডাকাইতের হাতে উৎপাদিত হইতে হয় নাই। আমাদের এই গুরু আশংকিত্য এখানে শেষ হইল। এ স্টমেন যে সত্যমুক্ত, তৎক্ষণে বোধ হয়, এমনি উল্লেখ করা বাহবা মজ।

পদ্মপাল।

চরুক্ষণ।

এবার বৈষ্ণব-পুত্রের নিদারুণ দুর্লক্ষণ। পদ্মপাল উড়িয়াছে। উড়িয়াছে প্রায় বাঙ্গালার সমস্তরা। পঙ্কজ, নারায়ণ এবং বোধাইয়ের নানা স্থান হইতেও এ হুমসংবাদ আনিয়াছে। পদ্মপাল পড়িল বেশ শতশূভ হইবে। এবারও হইয়াছে। হতভাগ্য ভূত্বিক ও মারীতা অশবৎ।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

“অনারট, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, জলপ্রাণ প্রভৃতি যেমন হুর্ভিকাদি অলম্বনের পূর্ব লক্ষণ, পদ্মপালের প্রাচুর্য্যও এইরূপ। শাস্ত্রেই আছে;—

“অতিবৃষ্টিরনারটঃ শলভা মুখিকা শুকাঃ।
অসংকরঃ গুণ্ডত পতক্রাপি তস্তারঃ।
রাজানীকপ্রয়োঃসর্গো মরকত্যাধিপীতনম্”
পৈতৃভ্যঃ মরণং বোগো রাষ্ট্রবাসনমুচ্যতে॥
কান্দশলী নোতিশাস্ত্র ১৩৬০৮৩৪।

এমন শাস্ত্রীয় প্রমাণ বহুল পরিনামে পাইবে।

বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতায় আছে;—
“মোমোহংকেন্দ্রনারটঃপাণ্ডবশলভওভৈক শতবঃ।
ব্যাবিভ্যঃ মিষ্টরপি ভূপান্য জায়তে বৈশম্”
বৃহৎসংহিতা ৮৪।

শাস্ত্রে ছয় প্রকার “দ্বৈত” বা আমদলের কথা শাস্ত্র করিয়া দেখা আছে। তাহার মধ্যে “পদ্মপাল”ও একটি; যথা;—

“অতিবৃষ্টিরনারটঃ শলভা মুখিকা যথা।
প্রত্যাম্যাত রাজানঃ বড়েতা দ্বিত্যং স্মৃতাঃ”
জ্যোতিষশাস্ত্র।

শাস্ত্রে “শলভো”রই উল্লেখ আছে। “শলভের” অর্থ পতঙ্গ। পদ্মপাল অশবৎ মৌলিক কথা নহে। “পদ্মপাল” মর্মে দেশজাত। শলভঃ (পুং) কটিকেশবঃ। কাড়ি ইতি। পদ্মপাল ইতি চ ভাব। শব্দকল্পদ্রুম।

পদ্মপাল যে পতঙ্গজাতি, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ইহার প্রকৃত নামই “পতঙ্গপাল”। জন্মে অপবশমে তৎ পুত্র হইয়াছে। “পদ্মপাল”

ছাড়া শতশালা কট ও পতঙ্গ আরও আছে। তা থাকুক, এমন প্রলয়ধরী বিশ্ববাসিনী শক্তি আর কোন পতঙ্গেরই নাই। পদ্মপাল এমন থাকে-থাকে, থাকে-থাকে, অগণিত দলে, বৃক্ষ শতাদি আছন্দ করিয়া, সর্বদা করে, এমন আর কোন পতঙ্গই পারে না। “পদ্মপালের” অবশুস্তাবী কল যে, হুর্ভিক ও মারীতা, তাহার চাপুষ ও ত্রিভাঙ্গিক প্রমাণ যথায়। এই জন্তই শাস্ত্রোক্ত “শলভ” তা যে পদ্মপালেই বিশিষ্টরূপে সূচিত হইতেছে, তাহা হুর্ভিক।

পদ্মপাল ছাড়া আর কোন পতঙ্গকে এমন নিরবস্থায় ভাবে বৃক্ষাদি আছন্দ করিয়া থাকিতে দেখা যায় না। সেই জন্ত নিরবস্থায় বাগ-নিমেষের আছন্দকারিতার তুলনা দিবার সময়, কবিরা “শলভ”ও উল্লেখ করেন। যথাভারতের বিরাট পর্কেই দেখিতে পাইবে;—

“কক্ষপুখাঃ হুতীত্বা মূল্য হস্তবজা যয়া।
ছাদয়ন্ত শবাঃ পার্থং শলভা ইব পাদমপুঃ”
মহাভারত বিরাটপর্ব ৪৬৪।

এখানে “শলভ” পদ্মপাল ছাড়া আর কি হইতে পারে? বাহা হউক, “পদ্মপালের” প্রাচুর্য্য বোধ হুর্ভিকেরই দুর্লক্ষণ। “কেনল এদেশে বা একালে কেন, সকল দেশেই এবং সকল সময়েই “পদ্মপাল”ের সর্বলক্ষণ-পুত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়ছে ও হইতেছে। শাস্ত্রের প্রমাণত মরগাতীত কাল, মরগের অন্তর্ভুক্ত কালের প্রমাণও লক্ষ লক্ষ লও না।

এ দেশের ঐতিহাসিক প্রমাণ।

এবার যেমন “পদ্মপাল” উড়িয়াছে, ১৮৩১ সালেও ঠিক এইরূপ উড়িয়াছিল। সেও একই একই ভাব। উড়িবার সময় শ্রাবণ-ভৈরব পগন-বিদারী বিকট গর্জন এবং গড়িবার সময় বৃক্ষ-লতাদির পদ্য-পতঙ্গ, ধ্যান, মতিরা, কলাই প্রভৃতি শব্দের ভূরি ভোজন, এবারও যেমন হইয়াছে, সেবারও সেইরূপ হইয়াছিল। পদ্মপাল উড়িলই আকাশ আছন্দ হয়, স্থাবিরগণ ভূমিয়া যায় এবং চারিদিক অকরময় হইয়া উঠিল। এইরূপ এবারও যেমন হইয়াছে, সেবারও তেমনই হইয়াছিল। এদেশেও যেমন হয়, অন্যত্রও সেইরূপ হয়। ১৮৩২ সালে আমেরিকার পোয়াটমালা

দেশেও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। সে সময়ে মার্কিন প্রবন্ধুর পেজ স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া বাহা শিক্ষায়েছেন, তাহা পড়িলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, যে কি ত্রিভাবন ব্যাপার। পেজ এই ভাবে লিখিয়াছেন,—

“পদ্মপাল উড়িয়া, আকাশ আছন্দ করিয়া হুর্ভিকের পতিবোর করিয়াছিল। এবং বৃক্ষাদিতে পড়িয়া, কল-কলন বাহিরা সব নিমেষে করিয়া কেলিয়াছিল। এমন কি, রাস্তার চলিয়া ইটিয়া বাইতেও পদ্মপালের পাখনা চোখে টেকিয়াছিল। শব্দশোমলা এবং স-কলা বাবাতী তুমি উত্তর-কেন্দ্রবৎ হইয়াছিল।

১৮৩১ সালে উড়িয়ার নিম্নর ভূমি শ্রব্দা অংশে অনেকটা এইরূপই ঘটিয়াছিল। সেখানে যে “পদ্মপাল” দেখা-গিয়াছিল, তাহা নীল বর্ণের। উড়িয়ার তাহা— “কিনটিক” বলে। ইহার পর সেই রক্তলোক-ধরকর উড়িয়া-হুর্ভিক ঘটয়াছিল। এবার কি হয়, বিবাহতই জানেন। তবে একই হুবিদা এই, অনেক স্থলের প্রাচুর্য্য বোধের কিছুই হয় নাই। মধুসূদন। হুর্ভিক বর্ণিত পায়, অমুচি কি আছে। বাহা হউক, এমন পদ্মপালের উৎপাত ও ভারতে কতবার কত স্থানে হইয়াছে, তাহার স্মিত্য কি? সব কথা কি আর ইতিহাসে উঠে? উড়াই মধ্যে উল্লেখযোগ্য উই চারিদিক বিরগণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। ১৮৪১ সালে অপরূপ ভীষণ সময় জলপ-পূর্বে পদ্মপাল উড়িয়াছিল। ইহার উত্তর-পূর্বদিক হইতে উড়িয়া পলিন দিকে যায়। বলা বাহুল্য, যে যে স্থানে অপরূপ কৃষিকারি কামিনী ছিলেন, সেইসেই স্থান মরুভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। এবার পুনর চারিদিকে মারাত্মক প্রদেশে পদ্মপাল উড়িয়া প্রায় ২০ মতকোশাবাপী ভূমির শতাদি নির্ণয় করিয়াছিল। সে ক্ষম-বিবরণ বর্ণন করিতে গেলে, চক্ষু কাটিয়া গুল হইবে। উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাংশে পদ্মপাল প্রায়ই দেখা-পড়িত ও ঐ অঞ্চলেই অধিক হয়। ১৮৩২ সালে উত্তর-পশ্চিমপাল পদ্মপালের দৌরাত্যে একবারে উজড় হইয়া গিয়াছিল। সেবার ভূপাল-জীবন হইতে পদ্মপাল আসিয়া হোসদাম্পত্যে লালন দুর্ভবিত কইয়াছিল। ইটালি, রাসপুত্র প্রভৃতি স্থানে হুর্ভিকের একশেষ হইয়াছিল। এমন কত স্থানে কত হইয়াছে, কত বলিল?

বিদেশের ঐতিহাসিক প্রমাণ।

পৃথিবীর দৃষ্টি হইতেই পঙ্গপালের দৃষ্টি, একথা বোধ হয়, স্বচ্ছন্দে বলা যায়। যখন রমারূপেও, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন এক্ষণি বর্ণায় ক্ষেত্র কি? রমায়ণেও উল্লেখ আছে;—
“শরতিতপস্বীরোহণী দিক্তৌ নিপতিতাবৃত্তৌ।
অদৃষ্টতয়া যত্নান্নেচ্ছা বিকৌ শব্দভরণা”।

গৌড়ীয় রমায়ণ, সুকস্মক ২০২৩।

৪৪ জমাবাহার ১৪ শত ২১ বৎসর পূর্বে মেলভের সময়, প্রাচীন নিশরাজ ক্ষেত্রের রাজপুত্র, ইহাঙ্গির উপর অত্যাচার-কালে পঙ্গপালের কি ভাষণ বর্ণিত হইয়াছে।
“আমি কিংবদন্তী হইয়াছিলাম, তাহা বাইবেল-পাঠকমত্রেই অবগত আছেন; অন্তত টেলার মাথেরে প্রাচীন কালের ইতিহাস বাঁধারা পড়িছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহাঙ্গির পরিচয়, দিতে হইবে না। এতৎসম্বন্ধে বাইবেলে বর্ণনা আছে—

“They covered the face of the whole earth, so that the land was darkened: and they did eat every herb of the land, and all the fruit of the trees which the hail had left; and there remained not any green thing in the trees, or in the herbs of the field, through all the land of Egypt.”

Exodus, x. 15.

সেই অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন; সেই পঙ্গপালের, ভূরি-ভোজন; সেই বাতায়ী ভূমি কল-কলশযুক্ত, সেই সবই।

কোন প্রকৃতপক্ষে বলেন—পৃথিবী দৃষ্টি হইবার (অবশ্য ৪৪০০ বৎসর পূর্ব) আফ্রিকার উপকূল হইতে অগণিত পঙ্গপাল উড়িয়া সাগরে-গিয়া দুরিয়া মরিয়াছিল। তৎপরে সেই মৃত পঙ্গপাল সাগরকূলে নিপাতিত হয়। সেই স্বকল মৃত পঙ্গপাল পতিত এই বর্ণিত হইয়াছিল যে, এক লক্ষ মৃত্যুর মরিয়া পতিত সেরূপ দুর্ভিক্ষ হয় না। আফ্রিকা-অঞ্চলে পঙ্গপালের উপত্যক দুরিফাল হইবে। সিঙ্গাপুর বলেন;—একবার দক্ষিণ আফ্রিকার পঙ্গপাল উড়িয়া প্রায় এক হাজার বর্গমাইল ভূমি ব্যাপিয়াছিল। উত্তর-পূর্ব-প্রবাহিত বায়ুকর্তৃক তড়িত হইয়া তাহার

সমুদ্র-উপকূলে নিপাতিত হয়। মৃত পঙ্গপালের অঙ্গে প্রায় ২০০ কোশ-ব্যাপী ভূমি আরত হইয়াছিল। সেহেরে দুর্ভিক্ষ ৭৫ কোশ দূরে ছুটিয়াছিল।

১৮৬৬ সালে আলজিরিয়া এবং আফ্রিকা সমুদ্র উপর ভাগে ভয়ঙ্কর পঙ্গপাল উড়িয়াছিল। এই জন্ম ১৮৬৭ সালে দারুন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষের পরই আরার প্রায়দূরী মাথারীতে কত কোটি কোটি জীবের যৎ প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ হয় না। আবার ১৮৭৪ সালেও এই অঞ্চলে পঙ্গপালের এইরূপ অত্যাচার ঘটয়াছিল। পঙ্গপাল জীবনেও মরণে জ্ঞাতমন করে। জীবন্তে মূল কল-কলসাদি বাহিয়া ফেলে এবং পাছের পাড়াতী পর্যন্ত রাখে না। ক্ষমকষ্ট হইলে, লতাপাতা সিদ্ধ করিয়া বাহিয়া যে কল-কলসাদি নিবারণ করিবে, তাহারও উপায় থাকে না। আবার মরণোত্তর পঙ্গপালের অঙ্গ পতিয়া টোল হইয়া উঠে। সেই প্রকৃতি বিময় বিম্ব্যাপী ব্যাপি উৎপন্ন হয়। তাহাতে কোটি কোটি জীবের আত্মক্লম্ব হইয়া থাকে। ভারতে এরূপ বড় দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন, অস্ত্রাভ্র হান অশ্বকো এখানে পঙ্গপাল অঙ্গ সংখ্যায় দেখা দেয় বলিয়া এরূপ দৃষ্টি প্রায় ঘটে না। বাহাই হউক, আফ্রিকা অঞ্চলে আমেরিকার পঙ্গপালের অত্যাচার বেশী বই কম হয় না। ১৮৩২ সালের সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত ইতিপূর্বেই দিয়াছিল। ইহার পর ১৮৭২ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিবৎসর আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অসংখ্য পঙ্গপালের পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য হইয়াছিল। প্রত্যেক বৎসরের বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে প্রকাও পুস্তক হয়। সে স্থান ত আর হইবে না। ইয়ুরোপ এবং এশিয়ার অস্ত্রাভ্র হান কোথায় হবে পঙ্গপালের অত্যাচারে কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহারও বহু বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সব কথা বলিবারও স্থান অসুবিধা এক প্রবন্ধে হইবে না। তবে সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া রাখি, ১৮৭৪ সাল হইতে আফ্রিকার মতন ইয়ুরোপের নানা স্থানে বন বন পঙ্গপালের প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের ‘মার্সেল’ সহরে পঙ্গপালের বন্য বন্য-করিবার জন্ম পুস্তক দিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। সে বৎসর এতদূর প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এখনও এরূপ পুস্তককারে ব্যবস্থা আছে।

১। পূর্ণাকারে পঙ্গপাল।



মাইটেনা এবং ‘রেড শেপার্ড’ নামে উড়ো-পতঙ্গ প্রসিদ্ধ। দুইয়ের রঙ্গ ইতরবিশেষ আছে। এখানেও এইরূপ দুই প্রকার পঙ্গপাল প্রসিদ্ধ। এক প্রকার পঙ্গপাল আছে, লম্বা ২ হইতে ২½ ইঞ্চি। অঙ্গ বেশ তেজা। রঙ্গ প্রায় উজ্জ্বল শীতবর্ণ। কখন কখনও ফিলা লাল হয়। মাথাটির রঙ্গও উজ্জ্বল, বেশ তেজা। মাথার পশ্চাদিকে বাড়িবার উপর দুটা ডোরা দাঁপ আছে;—তত স্পষ্ট নহে। ছোট ছোট পাখান দুটা আরও আছে। পাখান আরও পেষ্টের মতো বড়; প্রায় সিকি আন্বজ বৈদী। আবারওর শেষ সংযোগ-স্থান কতকটা গোলা। সমুদ্রাটী খুঁজ ও চিকণ এবং পীত বর্ণের ছায়াভা ছায়াভা দাপ আছে। পশ্চাতে দুটা, মাঝে পেষ্টের কাছে দুটা এবং সমুদ্রিকের দুটা পা আছে। মাঝের দুটা পুষ্টিভাঙ্গার মতন। চোখ দুটা ডেব-ডেব-কোণ। পুষ্টি মধ্যস্থান কভরের কাজ করে। উপরে ১৫৫ চিত্রে সব ভাবেই আঁকা আছে। এ ছাড়া লালবর্ণের পঙ্গপালও লম্বা যায়। এইবার লালবর্ণের পঙ্গপাল উড়িয়াছিল। কখন অল্প দেখি নাই, তন্নিমিত্ত, এক প্রকার পঙ্গপাল আছে, দেড় হাত লম্বা। ইহার সাগরের উড়ি ধরিয়া মরিয়া ফেলে। ইহারেও পঙ্গপাল কভরের কাজ করে। ইহার দল বাঁধিয়া সাগরে বা অস্ত্র-জমা-শয়ে গিয়া পড়ে; কিন্তু তৎসংখ্য মারা যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহার রাত্তিকালে উড়িতে পারে না; কিন্তু শিরের চোটে ইহার রাত দিন না মানিয়া উড়িয়া সাগর পার হয়। যখন সাগর পারের প্রয়োজন হয় না, তখন জমার উপর পড়িয়া ‘সুর্ক-নাশ করে’, বা পথ, তাই বাহিয়া ফেলে। বাহা করে না যায়, তাহেই তাহার দশা পড়বে। ‘পঙ্গপাল’ এত-সু-পঙ্গপালে’ (কিংবদন্তী আকার-ভেদও দেখা যায়।) পঙ্গপালের বিস্তার আরও।

নাম বা সংজ্ঞা।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে পঙ্গপাল ভিন্ন ভিন্ন নাম। তাহাভেদে—সংজ্ঞাভেদ। ইহা ত আর বিচিত্র নহে। পঙ্গপালকে নিরীণিত ভিন্ন ভিন্ন নামেও বলা যায়;—আমেরী, জরথ, জরথল-বীহার; মিশরভাষা, কফরী; জৈক, ওকিগেয়েক; হিব্রু, চারগো; পমরজ—মল্ল, মল্লারী; প্রভৃতি কিত বড় নাই। আমেরিকার ‘রকি-

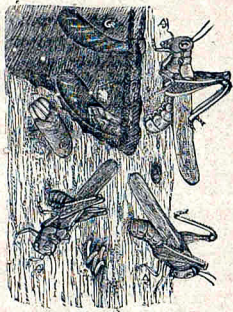
২। অবস্থানভেদ।



আশঙ্কার কথা।

পদ্মপাল কোথা হইতে আসে, কোথা যায়, গতি তার নিরূপণ কে করিতে পারে? পদ্মপালের গতি হ্রদনিরীক্ষা এবং স্থিতি ও ধ্বংস-শক্তি হ্রদনিরীক্ষা। ইহাই যথোক্ত দেখে এবং বলে। কেহ কেহ বলেন, “অত্র দেশ হইতে পদ্মপাল” উড়িয়া আইসে এবং কেহ কেহ বলেন, পাছাড়ের ভিত্তির পদ্মপালের বাস, সেখানে তাড়া বাইয়া উড়িয়া আসে, আবার উড়িয়া যায়। পদ্মপাল পদ্মপাল জন্মানা। ইহাই ত বিবাস। কিন্তু এবার যেরূপ গতিকে দেখিতেছি, তাহায়ে সে বিবাস থাকে। কে? যেখান দিয়া পদ্মপাল উড়িয়া গিয়াছে, সেখানকার সকল স্থানে তা হউক, স্থানে স্থানে এক রকম কালা-মুগো পোকা দেখা যাইতেছে। তাহারিগকে দিনের বেলায় দেখা যায় না, রাত্রি বেলায় কিন্তু তাহার ধানের শীষ কাটিয়া ছাদখার করিতেছে। ইহা এক মূলে, এ পোকা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াও দেখা হয়নি। এ এক জায়গায় একটা দিনের চোটে ২১০০টা পোকা ধরিয়া রাখা হয়। ৮১০ দিন পরে দেখা যায়, ৩৪টা মরিয়াছে, বাকি ১৭৬০টা আবার ফড়িরেরই মত। ২২২ (খ) চিত্র দেখুন। তবে পুণ্য যায়, পদ্মপাল মতে বাটে—মুগিয়া গিয়াছে। বড় সর্বসম্মত কথা,—স্বাদ ও ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। আমেরিকার নানা স্থানে মতে “ক্রী-পদ্মপাল” ডিম পাড়ে। সেখানে এইরূপ কীট জন্মায় এবং অল্পট অবস্থায়ও এইরূপ শস্যের সর্বনাশ করে। ইহার বিবৃতি কি? জাতীয় স্বস্তার বাইরে কোথায়? মস্তারিগণের দ্বারা পেট হইতে গড়িয়াই লড়াই করিয়াছিল। ইন্দ্র-জ্ঞান ও বাহু-পেতারার কপোত বিন্দী হইত-হইত কাপেৎ পড়ে, বিদে-জাউলিও দাঁত-সাইলিৎ জালা ধরে এবং কান-কেউটের বাছার বিধেও মনুষ্য মরে।

৩। প্রসবপ্রণালী।



৪। ডিমপুঞ্জ।



উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি।

পদ্মপাল যেখান হইতে আয়ত, আর যেখান হইতে আয়ত, তাহার উৎপত্তি মাতের মাটিতে ডিম্ব হইতে। “ক্রী-পদ্মপাল” ডিম পাড়ে। যেখানে লাঙ্গল চলিয়া মাটি আরা হয়, তাই যায়, “ক্রী-পদ্মপাল” সেই স্থান বেশী পছন্দ করে। বাছারা কীটপতঙ্গদের তত্ত্বাসম্বন্ধীরা, তাছারা এ সবতত্ত্ব সবিসেষ রাখিয়া থাকেন। তাছারা এ সবকে যেরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা গড়িলে বা শুনিলে অস্বাভ হইতে হয়। ভবনানের স্তম্ভ-কোশলেশ্বর কথা ভাবিয়া বিস্ময়পূর্ণক হ্রদ পূর্ণ হইয়া উঠে। সে সব বহিরাহা স্থান ত আবাদের নাই। তবে পাটকলের কতক কোঁহুল নিয়ন্ত্রিত জন্ম সংস্পর্শে বলি। এ সবকে “আরিষ্টলেস” বর্ণনা করি বিবাস-যোগ্য। তাহার মতে, শীতকালে ডিম মাত্র ভিতর থাকে, বসন্তে হুটিয়া পাখা বাহির হয়। প্রসব-প্রণালী অতি চমৎকার। ডিম পাড়িবার পূর্বে ক্রী-পদ্মপাল মাটিতে গর্ত খোঁড়ে। যাহাতার বিচিত্র রচনা। ক্রী-পদ্মপালের পেটের অন্ত্র

ভাগে দু-ছোড়া থোকা থোকা শূকরার খণ্ডিত মতন পদার্থ আছে। ইহা থোলে এবং বন্ধ হয়। ইহার দ্বারা ক্রী-পদ্মপাল গর্ত খুঁড়িতে পারে। গর্তটা লম্বা, স্বচক একটু কৈকটে হয়। বর্ধার্থ ১০- ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩৪ মত। ৩০২ (৩) চিত্রিত চিত্র। ক্রী-পদ্মপালের পেটটা সমুদায় গর্তে ঢুকিয়া যায়। ক্রমে পেটটা শাখা-বাকার কাঁপিতে থাকে। বাড়ার মত পাটপিঠের উপর উঠিয়া হুটে ঠেকা-ঠেকা হইয়া যায়। অন্য (ক) চিত্রিত চিত্র দেখুন। সেপরে ক্রী-পদ্মপাল ডিম পাড়িতে শুরু করে। তাই যে শূকরার বলিটা আছে, সেটা আস্তে আস্তে ডিমগুলি বখাছানে রাখিয়া দেয়। ২০টা হইতে ৩০টা পর্যন্ত ডিম হয়। গড়ে ২৮টা। কেহ কেহ বলেন, ৪০টা পর্যন্ত হয়। চারি থাকে পাশাপাশি সমান সংখ্যায় সাজান হয়। ৪২২ চিত্র দেখুন। এসবের পর ক্রী-পদ্মপালের পেট হইতে যথান্যায় মেছা বাহির হইতে থাকে। সেই মেছা, ডিম করটকে খাটিয়া-নাটিয়া রাখিয়া দেয়। ক্রমে ডিম হুটিতে থাকে। ডিম হইতে ছানা হুটিয়া আস্তে আস্তে গর্তের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। বাহির হইয়া যেরূপ গঠন হয়, ২২২ (খ) চিত্রিত চিত্রে তাহার পরিচয় আছে। তাহার পরিচয় অর্থাৎ (গ) চিত্রিত চিত্র। তাহার পর (ব) চিত্রিত চিত্র। ডিম ভাঙ্গিবার পর, সপাখা পুষ্টিগত পরিণত হইতে দেখে যা দুই মাস লাগে। যত দিন না পাখা হয়, ততদিন পদ্মপাল-বাছা বাস, কচিচি পাতা এবং বাছের শীষ খাইতে থাকে। ক্রমে যত বয়স বাড়ে, আহার-শক্তিও ততই বাড়ে। দিনের বেলায় ইছারা এক সন্দেশ বসিখা আশে-পাশে ছাড়ে, দেখালে একে ভুকাইয়া থাকে; রাত্রির কালে আশিয়া বাছের সর্বনাশ করে। ক্রমে আকৃতি-বুদ্ধির সঙ্গে গতিশক্তি এবং জাতীয় প্রগতি বাড়িতে থাকে। অর্ধশত অবস্থার পদ্মপাল স্কটায় ৬ হাত চলিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, ক্রী-পদ্মপাল প্রবাস করিলে পর, তাহাদের পলায় এক রকম পোকা জন্মে, তাহাতেই তাহাদের মৃত্যু হয়।

গতি ও শক্তি।

এ পতঙ্গ নৃদ-পতি; কিন্তু গতি ও শক্তি অপরিসীম। ইহার আকৃতি ও গঠনের সহিত-গতি-

শক্তির তুলনা করিতে গেলে, বিষয়েই অস্তিত্ব হইতে হয়। এ নৃদ জীব বধন ও ত একা দেখা পেরান,—অর্থন দেখ, তখন অসংখ্যও অগণ্য। গতি তখন হ্রদনিরীক্ষা। কোথায় বা এক দিন, কোথায় বা দুই দিন, উজ্জ্বলগাথা তিন দিন, থাকিয়া শত শত কোষাব্যাপী ভূমি, বৈভূমি করিয়া দেয়। একি অভাবীয়া অদৃশ্যশক্তি বসি দেখি। কোথা হইতে এ শক্তি ও গতি আসিয়া জুটে, ভাবিয়া নির্ণয় হয় না এবং কল্পনা আসে না। তাহার জন্ম করে। পদ্মপাল আফ্রিকা হইতে সমুদ্র পারের মাদাগাস্কারে বাইয়া থাকে। কখন কখন আফ্রিকা হইতে ইতালী যায়। আমেরিকার কোন কোন পতঙ্গতত্ত্ববিদ শক্তিত বসিয়া থাকেন, পূর্বে আমেরিকায় পদ্মপাল ছিল না; এমিয়া হইতে রোয়ালি প্রবালী পার হইয়া আমেরিকায় গিয়া-ছিল; তাহাদেরই শীর্ষে আমেরিকার পদ্মপালের উৎপত্তি হয়। ১৮৭৬ সালে আমেরিকার এক স্থান হইতে জুলাই মাসের মাঝ বরাবর পদ্মপাল উড়িত-শুক করে এবং স্টেটসের মাসের শেষ টেক্সাসে গিয়া পছন্দ; প্রায় ৭৫ কোশ ১০ ১৫ দিনে পছন্দিয়াছিল; প্রতি দিন ১০ কোশ দ্বিগুণে গিয়াছিল। নৃদ বৃন্দ রজত প্রাপ্ত হইয়া, জাহাজ টানিয়া লইয়া যায়; এই নৃদ পদ্মপাল একসঙ্গে একর হইলে, রেল-পথিও গতি বন্ধ করিতে পারেন। মতে মতাই, অনেক স্থানেই হইয়াছে। সে দিন পঞ্জাব-রাবাল-পাতিতে রেলের উপর পদ্মপাল গড়িয়াছিল; তাহাতেই গাড়ীর গতি বন্ধ হইয়াছিল। পঞ্জাবশাখা-বাহিরে নিকট কোন স্থানে এক জমীদারের শিশু-মস্তানকে নাকি পদ্মপালে মারিয়া ফেলিয়া চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। এক হাত পদ্মপাল ঝুটিয়া আসিয়া বাছের সর্বনাশ করে। ক্রমে আকৃতি-বুদ্ধির সঙ্গে গতিশক্তি এবং জাতীয় প্রগতি বাড়িতে থাকে। অর্ধশত অবস্থার পদ্মপাল স্কটায় ৬ হাত চলিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, ক্রী-পদ্মপাল প্রবাস করিলে পর, তাহাদের পলায় এক রকম পোকা জন্মে, তাহাতেই তাহাদের মৃত্যু হয়।

শব্দ ভাবিলেই হয়, যেন পদ্মপাল উপর হইতে হুটীয়া জলপড়িতেছে কিংবা বাত-বিধে-বিধে

সমুদ্রতর বেন পাহাড়ের উপর আছাড় বাইয়া পড়িতেছে।

ইংরেজ কবি সাউকে ঠিকই লিখিয়াছেন—

"Onward they come, a dark, continuous cloud.

Of congregated myriads numberless.

The rushing of whose wings was the

"sound,

Of a broad river, headlong in its course,

Plunged from a mountain's summit or

the roar

Of a wild ocean in the autumn storm,

Shattering its billows on a shore of rock."

পশুপালের খাদ্য।

এখানে ত পশুপাল সূর্য্যার মর্ম রকম দমন ও গাছের নরম নরম পাতা খাইয়া থাকে। আমেরিকায় পশুপালের বিস্তৃতা আহার। বৎসুর সময় তাহার গাছের শুকনা ছাল এবং কাটো খাইয়া থাকে। শুকনা পাতা, কাগজ, চুলা এবং পশমজাত বস্ত্রও খায়। পড়ে না। তাহার ভেড়ার পিঠে বসিয়া ভেড়ার লোম খাইয়া ফেলে। মরা বাহুড় এবং পক্ষী তাহারে উপহার দেয়। অস্ত্রায় বাঘতী শাক-সজিত নিত্য আহার। শুকনা তান্ত্রিক এবং কাঁচা ফল পাইলে, আমোদ ঘর না।

পশুপালের স্বভাব-শত্রু।

আমেরিকায় ছানা-পশুপালের অনেক শত্রু আছে। তাই একই রকম। অনেক রকম পাখী দৈনিকে শাখায়া যায়, তাহার ডিম-খাইয়া ফেলে। সাপ, বিড়াল, ব্যাড, শূকর-একই কাঁচিড়ানী ছানা-পশুপালের বিধম শত্রু। এ ছাড়া পশুপালের ডিম নষ্ট করে, এমন কাঁট ও অনেক রকমের আছে। সে সকলের বিরূত বর্নন এই প্রবন্ধে অসম্ভব। সেখানে এই সকল পশু, পক্ষী ও কাঁট প্রভৃতি পুষ্টিবার রীতিমত ব্যবস্থা আছে।

হাতে মারিবার ব্যবস্থা।

এখন পশুপালের উৎপত্তি প্রায় দেখা যায় না, তাই পশুপালের ডিম বা ছানা নষ্ট করিবার কোন

রকম উপায়-বিধানের ব্যবস্থা নাই। আমেরিকায় অনেক রকম কল কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে ও হইতেছে। সেখানে একরকম নীচাতাপের কৌশলে ডিম নষ্ট হয়। সচরাচর লোক লাঙ্গল দিয়া ডিম খুঁড়িয়া বাহির করিয়া ফেলে। সেখানে এসব প্রক্রিয়ার মল হয় না, সেখানে ডিম খুঁড়িয়াবার জন্ত লোকজনের ব্যবস্থা আছে। যদি ও গের ডিম নষ্ট হয়, তাহা হইলে পুষ্টি বিধা জমির ফল বাঁচে। খাল কাটাও অল্পতম উপায়। মার্টের চারিদিকে খাল কাটিয়া রাখিতে হয়, ছানা-পশুপালগুলি তাহাতে পড়িয়া মারা পড়ে। খুঁড়িয়া মারাও আর এক উপায়। এক রকম শোয়ার কল আছে,—সেই কলের ভিতর শোয়ার নীচবর্তিতে আদম থাকে। আদম এমন ভাবে রাখা হয় যে, তাহার নীচবর্তিতে নিয়মিত হইতেই হইবে। সেই কৌশল পশুপাল খাইয়া যায়। যেমন এখানে কল বাস্তব রাস্তা বনান হয়, সেইরূপ সেখানে এক রকম কল আছে যে, তাহার চাপে মাটি বসিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কলের চাপে ১০১২ গিলের পশুপাল-ছানা পিষিয়া ময়। এমিয়ার অনেক স্থানে দুর্গুণ করিতে হয়। কলে করেদিন পুষ্টি, জমির উপর ছড়াইয়া দিলে পশুপালোনা খুঁড়ি মরিয়া যায়। এ ছাড়া নানা রকম জ্বালের মতন কাপড়ে পশুপাল ধরিতে হয়। ইহাতে প্রতিদিন ১০-১২ হাজার ফল ধরা পড়ে। কোমোনিমে এসে এবং পরামর্শে মার্টে ছড়াইবার এমন কৌশল আছে যে, তাহার কৌশল পশুপালের বাছা মার্টে বৈধিতে পাবে না। এ ছাড়া আরও নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। কেহ কেহ পরামর্শ দিতেছেন, ক্ষেত্রের চারিদিকে গন্ধক পোড়াইয়া ঘোঁরা দিলে, পশুপাল আসিতে পাবে না। আমেরিকায় কুম্ভারি রক্ষারও অনেক সূত্রপাল আছে। যে সকল পাছের পুঁড়ি সোজা ও চোস্ত। সে সকল পাছের পুঁড়িতে চুন মাখাইয়া দিতে হয়। ইহাতে পশুপালোনা পাছে উঠিতে গেলে, হড়কাইয়া পড়ে। যে পাছের পুঁড়ি বীনা-চোরা, তাহার গায়ে দড়ি জড়াইয়া, উপরে টান দাখা যায় এবং দুই মুখ দাঁধ রাখিয়া, মুখ বুজাইয়া দিতে হয়। সেখানে পশুপালের বাছা জলে, সেখানে গালাকাতা চালিয়া দেওয়া রদকার। ছোট ছোট গাছ, ফলা-জড়ান বা আলকাতরা-মাখানই মণিষেয় সূত্রপাল। বাড়ী পশুপাল বধ করা

বড় সোজা কথা নহে। এখানে লোকের ঝাঁটা, কুপো, লাঠী, সোটা লইয়া, পশুপাল ভাড়াইবার চেষ্টা করে। অনেক স্থানে অনেকে ঢাকঢোল বজায় এবং বহুকে অওয়াজ করে; কিন্তু তাতে মল প্রায়ই হয় না। তবে কোন কোন স্থানে ঘোঁরা দিবার ব্যবস্থার অনেকে কৃতকার্য হইয়াছেন। এ ঘোঁরা দিবার কৌশল আছে। দুটো কাটিতে বাস রাখিয়া আদম দিতে হয়; তার পর, যে দিকে বাতাস বহে, সেই দিকে সেই বাস লইয়া বাইতে হয়। আদমের ঘোঁরা পশুপাল পর্ব্বাহিত আরম্ভ করে।

দৈবনির্ভর।

পশুপাল বিশেষরূপে জন্ম অনেক স্থানে প্রামত্ত লোকের, এমন কি রাজ্যের সামিক পুণ্যধর্মিকেরও নিম্নুক্ত করা হয়। সেদিন পারস্ত-রাজ্যে এইরূপ পশুপাল ভাড়াইবার জন্ম হইল নিম্নুক্ত করিতে হইয়াছিল। নিম্নুক্ত পুণ্য-নির্ভর। ১৮৭৬ সালে আমেরিকার ওহায়ো রাজ্যে এ দুর্গুণ দূরীকরণ-উদ্দেশ্যে সকল প্রজাৎ উপাস্য করিয়া একত্র ভগবানের স্তব্ধত করিতে আদেশ হইয়াছিল।

পশুপাল আহারীয়।

অনেক দেশের অনেক জাত পশুপাল খাইয়া থাকে। পুরাকাল হইতে পশুপাল এই সব জাতের খাদ্য। পূর্বে ইহা অতি উপদেয় বায়রূপে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। গ্রিস-দ্বীপ প্রাচীনকাল হইতে খাইয়া আসিতেছে। তাহাদের মতে, ইহা ভগবৎ-প্রেরিত আহারীয়।

বাইবেলে আছে;—

"Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind and the beetle after his kind; and the grass-hopper after his kind."

Leviticus. XI. 22.

এখন গ্রিস-দ্বীপে পশুপাল খাইয়া থাকে। তাহাদের মতে, যেই-পশুপালই শুষ্ক। তাহার বগল, মেয়ে-পশুপালের মেয়ের ভিতর দেখা আছে, ইহাই তাহাদের খাদ্য। এক রকম শোয়ার মত কাল-কাল পাঁপও আছে বটে। কুম্ভার মুসলমানেরা পশুপাল খায়। এক রকম পশুপাল তাহাদের

শাস্ত্রমতে শুদ্ধমোদিত, আর এক রকম নিম্নুক্ত। আরবদেশের লোকের মনে সিদ্ধ করিয়া, মাখন বর্চমর্ষ মাখাইয়া পশুপাল খায়; কখন কখন বা পোড়াইয়া খাইয়া থাকে; ঠেং-গুলা ছাড়া আর কিছু বাদ দেন না। আফ্রিকার কোন কোন দেশের আদিমসীরা "পশুপাল" রাখিয়া খায়। সিনিগলের লোকেরা পশুপাল শুকাইয়া গুঁড়া করে এবং তাহাতেই মদ্যার কাজ হয়। মগোরা পশুপাল খাইয়া থাকে। ব্রজের রাজা একেশ্বর এক হইলেও নীচী পশুপালের চড়চড়ি বাইতে গিয়াছিলেন। পশুপাল পেষ্টের ভিতরের সব বাহির করিয়া, তাহার ভিতর মসলা-দেওয়া মাংস দিয়া খাবার তৈয়ারি হয়। গ্রীসের ইটিপল জাতের "পশুপাল" খুঁড়ি খিঁচি। পার্থিয়ানেরাও ছাড়াই কথা কহিতে ন। মরোক্কো দেশ-মাসীরা পশুপাল পোড়াইয়া খায় এবং পোড়া পশুপাল খানাহেই জ্বালার বিজয় করে। পশুপাল ময়ে এবং উত্তর আমেরিকায় ইহা অনেকেরই আহারীয়। ভিম দেশে ভিম ভিম প্রকারে "পশুপাল-জাত" খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আফ্রিকা এবং মরিয়র লোকেরা পশুপাল মনে খুঁড়িয়া রাখে। কোথো কোথো "চিংড়ি" মাছের মতন চড়-চড়ি খাইয়া থাকে। মাহার মেনন রজি, তাহার আরও তত্ত্ব হাম পশুপালের ও গুঁড়ি, আদম কি, মাহারায়, তাহারাই অবশ্য তাহা মনে। আমেরিকায় মাহার। পশুপাল খাইয়া থাকে, তাহার নাকি হুটুই। মাহাই হুটু, পশুপাল আহারীয় অনেকেরই।

শেষ কথা।

পশুপালের অপরূপতা ত যৌন-আনন্দ—উপ-কার কি বিধাতই জানে। এই প্রবন্ধ ত দৈবভিত্ত পাই, অনেকেরই ইহা আহারীয়; অনেকেরই পশুপালের পিঠা করিয়া হুজুর ভিড়ালে বাতায়ীয়া থাকে এবং অনেকেরই সূঁ পশুপাল জমীর মার দিয়া থাকে। মাহাদের পশুপাল আহারীয় এবং মাহাদের পশুপাল অতি না করে, তাহার পশুপাল উদ্ভিতে দেখিলে আনন্দময় হইবে তাগিত করে; কিন্তু আমাদের কি? পশুপাল দেখিলে যে, আমাদের রক্ত শুকাইয়া যায়। এখান আবার তৈরি দেখি-তেছি, তাহাতে আশ্চর্য্যাত্মক জ্ঞান ত্রাণি ত্রাণি। মতা-মতা ই যদি পশুপালের বীজ এখানে পড়িয়া

আমি ত জগৎ ছাড়া নহি। হুতাশী শীত আমায়
অন্যকো জীবিত কর, নতুবা তোমাকে শাপ প্রদান
করি। তবু— তুমি পুত্রশাপে ভুতলে অশুভ্যত
হইয়াই আছ; এখন আমি তুমিহঁকে অধিকার-
চূড়ত করিব। শিব! আমি শাপপ্রদানে তোমার
জ্ঞান লোপ করিব। ধর্মের ধর্মলোপ ও যশের
অধিকার নাম অশুভপাত্রকে করিব। ইত্যাদি।
তখন,—

তাৎ শপ্ত মন্যভাং দৃষ্টী ত্রকা দেবপুত্রোপমাঃ।
জগাম মন্যং বিহং তীরং কীরণসান্নিধ্যৈঃ—
মান্যভাতকে শাপপ্রদানে উভাত, দেবিয়া,—
শিব, ধর্ম ও অত্যাচ দেবপথে পরিত্যক্ত ত্রকা,
বিহুয় শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত, কীরণসান্নি-
ধ্যৈঃ ধনন করিলেন। অন্তরত অনেক শপ্ত স্তুতি
করিয়া ত্রকা বলিলেন,—

রক বন্ধ হুতীকেশ ত্রকাসঃ শরণং বন্যং।
অধিকারহতঃ মাং কুরোতি শালন্তী সত্যী।
হুতীকেশ। রক্ষা কর, রক্ষা কর; আমার
আপনার শরণাপত্ত। দেখন, সত্যী মাগতী আমাকে
অধিকারহুত করে।
শিব বলিলেন,—

মন তত্ত্বজ্ঞানরহং শাপেন যাত্তি বোমিতঃ।
অথো পতিতব্রতভেকঃ সর্বমেষাং তেজসাম্ পরম্।
তেজোবলেন দ্বন্দ্বঃ মং রক বহু হরে হরে।
আমার তত্ত্বজ্ঞানরহ রমণীশাপে বিনষ্ট হয়।
ও! পতিতব্রত তেজ, সকল তেজ হইতে উৎকৃষ্ট;
আমি সেই তেজে দম্ব হইতে পরিসাচ্ছি।
যে হলে! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।
ইত্যাদি।

পরিণামে মঢ়াবতী-পতি, পুনর্জীবিত হন।
বধেষ্ঠ হইয়াছে ছায় বচন প্রমাণ অশ্বপনের
আবশ্যকতা নাই।

শ্রান্ত, স্তুতি, পূজা—এখানেই অশ্বপন করিলে
সেইখানেই দেখিতে পাউব;—স্রাজাতির সম্মান,
পূজার আদর, সাক্ষীর মায়াভ্য। সেইখানেই
দেখিবে, নারী-বেলায় নিদ্রা, পত্নী-অন্যায়ের
হুম্মা, হুতবৎ-সম্পদের বিষয় ফল। গুনিয়া
সাক্ষী-সমীকে ভাবিতেন দেবী, হুতবৎ লক্ষ্মী,
উপদেশও তাঁরাগিরের তদ্ব্যবস্থা, তাই এত ধ্যে
অন্যতম হইয়াছে, তদাশি হিন্দুর ঘরে এখনও
এই হুতবৎ লক্ষ্মী-রমণীর আদর পৌর
কমে নাই। এখনও হিন্দু পুণ্য, হিন্দু ভীয়ে—

সাক্ষী-রমণী হর্ষের হৃষ্টি, লক্ষ্মীর মূর্তি, দেবীর
প্রতিম। হিন্দু এখনও জানে,—প্রিয়ঃ শ্রিয়ন্ত
পেয়েই বিশেষো নাস্তি কণ্ঠন। হিন্দুর এখনও
মনে আছে—“সারাদীনন্তথা ধর্মঃ পিতৃশা-
স্মনকং যতন।

সহধর্মীকে আদর করার কারণ নির্দেশ ইহা
অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। তাই
হিন্দু, ধর্মের ভাবে না;—পত্নী বিলাসের
উপকরণ, বিদেশের সামগ্রী, মস্তকের জিনিষ।
হিন্দু মনে করে, পত্নী ধর্মের সহায়, কর্মের সঙ্গী,
হর্ষের ঘার।

এখন ইংরাজ বা ইংরাজ-শিষ্য নব্য-মতের
বল, যত পার বল, হিন্দুশাস্ত্র স্ত্রীর প্রতি দারীর
ছায়াব্যবহার করিতে উপদেশ দেয়; যুক্তকর্ত্ত বল,
‘হিন্দুশাস্ত্র’ স্রাজাতিকের ধ্যে জ্ঞান করিতে শিক্ষা
দেয় আর হিন্দুসমাজ তদ্ব্যবহার ব্যবহার করে,
কৃতি নাই; কিন্তু মনে মনে জ্ঞানও স্রাজাতিকের
ও পত্নীকে এমন উচ্চমান প্রদান করিতে অন্য কোন
জাতির শাস্ত্র জানে না। পতিব্রত মণ্ডির ও
পৌরষ অজ জাতি ভাবিয়াও আনিত পারে
না। সাক্ষ্যং মহেশ্বর বিশ্বনাথ পতিব্রত রমণীর
ভয়ে কষ্টমান। জগদ্বিতাত্ত্বিকা স্রাজা সমীর প্রভাবে
হইয়া! স্বয়ং ধর্ম, সত্য নারীর বোধভয়ে ভীত
হইয়া পরিত্যাগপাইবার আশায় বিহুয় দ্বারম্।
এ অত্মতত্ত্ব—তত্ত্বমৎ-সুহৃদারী অবগার এ লোকা-
ভীত ভ্রমতা, অসিক্তিতা হিন্দার এই অপরূপ
মায়াভ্য আর কোন জাতি কখন করিতেও
অধিকারী নহে।

কৃত শত-কৃত সাহস—কৃত লজ বৎসর
অতীত হইয়া গিয়াছে, কৃত যুগ-যুগান্তর কাটিয়া
গিয়াছে; বত্মাদের সতে অসত্য বন্যাস্ত্রীরামণী
স্বপ্নের বৈদ্যনাথ-পুত-কর্ত ও শমদমাণি-শোণিত
হুয় হইতে পত্নী ও রমণীকে সম্মান করার
কারণ-নির্দেশক যে সকল মায়াবাক্য উল্লেখিত
হইয়াছে—আজ তোমার উনিষিত শতাব্দী, সভা-
ভার যৌবনকাল; এখনও কি তাহার প্রতিরূপ
একটী ব্যাক্য ও কোন সভ্যতা জাতির উচ্চসঙ্গর
হইতে উণ্ডিত হইয়াছে?

তবে হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুসমাজ ব্যভিচারিণী
রমণীর উপর বলায়ত্ত। তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়াই
হিন্দুশাস্ত্রের অর্থমোচিত। তাহাদিগকে অপমান
ও পীড়ন করা শাস্ত্রবিহিত;

‘অজ্ঞাধিকারং মলিনম পিতৃমাত্রেপক্জনিবন্ধম্।
পরিভূতানধঃশয্যাং বাসয়েদ্যভিচারিণীম্॥’
বাক্তবাক্তা ১ম। ৩০।

যে রমণী ব্যভিচারিণী হইবে, তাহাকে সংসারের
বাতত্যা অধিকার হইতে বিচূড়ত করিবে। মলিন-
ভাবে রাখিবে। প্রাণ রক্ষার উপযোগী দ্বন্দ্ব অঙ্গ
প্রদান করিবে। সর্বদা তাহার জ্ঞান ও অমৃত্যু
উৎপাদন করিবে। ভূতলে শরন তাহার পক্ষে
ব্যবস্থা করিবে। এইরূপে আত্মহুত্রে আবদ্ধ
করিয়া রাখিবে।

ভক্ত্যন্ত লক্ষ্যদেয়া তু স্ত্রী জাতি-ওণ্ডদর্শিতা।
তাং ব্রতিঃ ব্যায়েব্রাজায়াং মনোহরং বহুমস্মিতৈঃ॥
মহ ৮ম। ৩৩।

আর যে রমণী, প্রিয়াদি বাক্তবের ধনাদি ধর্মে
বা আপনার সৌন্দর্য্যাদি গুণবর্ণে দর্শিত হইয়া,
পতি লজ্জনপূর্ব্বক পরপুংসবে উপগত হয়, রাজা
বহুজনকারী দেশে তাহাকে হুকুম দ্বারা ধাওয়া
হইবে।

এজন্য যদি হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুসমাজের নিকা
হয় ত, তাহা যেন চিহ্নিতই থাকে। সে নিকা
হিন্দুশাস্ত্রের ভূষণ, হিন্দুসমাজের পৌরষ, হিন্দু-
জাতির প্রশংসা। সে নিকা হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব-
প্রধান-পরিচায়ক বিজয়স্তম্ভ। সে নিকা হিন্দু-
জাতির পৌরষ মণ্ডিরের অস্ত্রাক চূড়াক। সে কলঙ্ক,
সে নিকা আমরা মাদরে মস্তকে বহন করিতে
সর্বদা প্রস্তুত আছি।

বেদান্ত-দর্শন।

প্রস্তাবনা।

যেদ্যক ধর্ম হুইপ্রকার—প্রকৃতি-ধর্ম আর
নিরুক্তি-ধর্ম। স্রাজি প্রকৃতি প্রজ্ঞাপনিত, প্রকৃতি-
প্রজ্ঞাবল্য। আর সনদ্যাকি মর্ষাণি নিরুক্তি-ধর্মের
উপাসক। প্রজ্ঞাদি-মর্ষাণি ব্যর্থ-মর্ষাণি প্রকৃতি-
ধর্ম; আর মর্ষাসাধন ত্রকজানই নিরুক্তি-ধর্ম।
বয়ের ধ্যে অংগে এই প্রকৃতি-ধর্ম উপার্জিত হই-
য়াছে, তাহার নাম কর্মব্রত। ব্যর্থ ধ্যে অংগে
নিরুক্তি-ধর্ম অনুশিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম জ্ঞান-
কাণ্ড। উপনিষৎ ও বেদান্ত এই দুই সনদ্যাকের

নামান্তর। বেদান্ত, বেদের শিরোভাগ। স্রাজা
বিশেষ সম্মানিত। বেদের কর্ত্ত্বকাণ্ড-বিতার লইয়া
বেদশাস্ত্রের আভির্ভাব হইয়াছে, তাহার নাম বেদ-
সৌমাংসা বা মধুহুত। জ্ঞানকাণ্ড বা পূর্ব্বদ্বান্ত
অর্গলম্বনে যে দর্শনের স্রাজি, তাহারই নাম
বেদান্ত দর্শন, উত্তর সৌমাংসা বা ত্রকজান। এই
দর্শনের প্রণেতা ত্রকজান চক্ষু-বৈদ্যপান দেবশাস্ত্রম্।
এরূপ অশূর্য্য কামহুত দর্শন জগতে আর নাই।
ভাষ্য, বৃত্ত্য, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণপুণী, বেদান্তের এত আছে
যে, তদ্বারা একটী পুস্তকায়ন হইতে পারে; তদাশি
ইহার নিগূঢ় অর্থ—প্রকৃত মর্ষে আঞ্জি ও উল্লাসিত
হইয়াছে কিনা বলা যায় না। এই দর্শনই রামা-
নুজ শাসিপ্রভৃতির বিশিষ্টদৈবত্ববাদের (বৈদ্য
মতঃ) প্রবর্ত্তি; ব্যভিচারিণীর শৈবত ও এই দর্শন
হইতেই উৎপন্ন; আবার পরিত্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ
শঙ্করাচার্য্যের মার্য্যাবাদও ত এই ত্রকহুত্রে পুজ।
তাই বিজি, ইহার প্রকৃত মর্ষ আঞ্জি ও উল্লাসিত
হইয়াছে কিনা বলা যায় না। বাই হউক শঙ্কর-
ভাষ্যের প্রতিষ্ঠা কৃত এখন অসীম। তাই আজ
এই বেদান্ত-বক্তিত দেশে সেই মহাপুংসব আচা-
র্যের পদচিহ্ন অহুতরণ করিয়া হুতরণাং বেদান্ত
দর্শনের সম্মান ভাষ্য অর্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছি। প্রজ্ঞাদিগের প্রকৃত ফল অবগত হইয়া
হিন্দুগণ অমৃত্যুনে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহাই আমার
মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন—

দৈবাৎসাদি কচিহ্নিহ স্বপ্নম ওৎপাদি
নিম্মারকো ভবত্ব য়ে জগদ্রস্তরায়া ॥

বেদান্তে কি আছে?

জীব-বস্তুর উক্ত্য, পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতি-সমুদয়,
ব্রহ্মের বেদকর্ত্ত্বক, অত দর্শনের মত বক্ত্ত্বক, ‘আজ-
মত সংস্কার, মনস্কর্ত্ত্বিতা ও অনিত্যতা’ বক্তিত
বিচার, কৌতব পরমার্থ প্রমাণমানে বিচার,
বৈরাগ্য-নিরূপণ, ব্যাপ্ত-বক্ত্ত্বক ও মন-মর্ষাণি
প্রয়োজনীয়তা, ‘তত্ত্বং’ পদার্থের বিচার, জীবমুক্তি
ও নির্দোষ-মুক্তি স্রুপ ইত্যাদি অনেক গভীর
বিষয় এই বেদান্ত-সমুদয়ে রহিতব্য।

বেদান্তবিষয়ের প্রয়োজন।

আজ, নিষেধ, নিরুক্ত, নিরুক্ত, উদারোণ।
আমি দুঃখ, আমি দুঃখ, আমি কষ্ট ইত্যাদি জ্ঞান
এম মাত্রণ তাহারই নাম অধ্যাস। শাস্ত্রীয়



বিকল্পে স্বর্ণসংগ্রহ করে দেখান হইয়াছে। এই সকল স্থানে দৌহ ও উৎসব হয়। পূর্বো-
ল্লিখিত উপারে বাণি হইতে স্বর্ণ পৃথক করি-
বার সময় অতি দ্রুত দ্রুত স্বর্ণকণিকা, বাহা কণে
সোণা যায় না, তাহা রহিয়া যায়। কিন্তু ভারত-
বর্ষের অসামান্য প্রদেশে যে নিম্নে স্বর্ণ সংগৃহীত
হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ সকল কণিকা নষ্ট হয় না।
একটা রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা তাহা অত্যাধিক
বাছিয়া যায়। পারদ, স্বর্ণ ও সোণের সহিত
মিশ্রিত তালবাসে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই
ভারতবাসীরা তাহা অন্বেষণ ছিলেন। স্বর্ণ-নিষ্কাশ
বাণির সঙ্গে পারা মিশাইয়া দিলে, পারা বাছিয়া
বাছিয়া সেই স্বর্ণ টানিয়া লয়। কিন্তু যেহেতু মাত্র
আবশ্য, তাহার অধিক পুরাতন মিশাইলে স্বর্ণ
কতকটা জবজব ধারণ করে। বাণি দুইতে দুইতে
পরিণমে তদার স্বর্ণ-কণিকাসমূহ যে পদার্থে
পড়িয়া থাকে, মাত্রাজ, পঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি
স্থানে সেই অবশিষ্টাংশ একই পারা মিশাইয়া
দেয়। সেই পারা, সোহ, কঁকর, বাণি, কর্দম
প্রভৃতি পদার্থকে পৃথক করিয়া স্বর্ণ-কণিকা-সকল
বাছিয়া বাছিয়া লয়। তৎপরে সেই পারা-মিশ্রিত
স্বর্ণে অতি উত্তম দিলেই পারা উড়িয়া যায় এবং
বাটা সোণাটাই পড়িয়া থাকে। সোণাওয়ালারা
আসামে যেরূপে স্বর্ণসংগ্রহ করিয়া থাকে,

মণিরাম নামক আসাম-নিবাসী এক ব্যক্তি
এবিধে একটি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব রচনা করিয়া
ছিলেন। এমিয়াটিক-সোসাইটীর জর্ণালে তাহা
প্রকাশ হইয়াছিল। নদী যেখানে অসংখ্য
বলুণানী হইয়াছে, এবং স্রোত অতি দ্রুত ও পাড়
উচ্চ এবং ভাড়া ভাড়া, সচরাচর তাহার অপর
পারে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। প্রথমে
বিশেষ করিয়া নদীর গর্ভ হইতে কতকটা বাণি
তুলিয়া তাহাতে স্বর্ণ আছে কি না দেখিতে হয়।
সেই বাণিতে ১০১২১ স্বর্ণ-কণিকা আছে,
দেখিতে পাইলেই বুঝিতে হইবে, সেই স্থানে
স্বর্ণ পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সোণাওয়ালারা
তদার কুটির নির্মাণ করিয়া কাহারও কড়ী
তাহার প্রথমে সেই স্থানে নদীর উপর একটা
বৃক্ষ বেগ এবং যে স্থানটী মনোনীত করিয়াছে,
তাহার উপর দিয়া স্রোত বহিয়া যাঁহিতে দেয়।
এইরূপে স্রোতের কর্দম প্রভৃতি পদার্থ সকল
দুইয়া গেলে, তদার স্বর্ণ-কণিকা-মিশ্রিত বাসু-
দানি পড়িয়া থাকে। তখন প্রত্যাশা বাঁটী ভাঙ্গিয়া
দেয় এবং নদীর স্রোত বহাধানে ফিরিয়া যায়।
স্রোতের কর্দম প্রভৃতি পদার্থ দুইয়া গেলে, কেবল
বালুকামণি পড়িয়া থাকে। স্বর্ণকণিকা-সমূহ উপ-
রেণ বাণি সকল তখন তাহার চটনিয়া ফেলিয়া
দেয় এবং নদীর স্বর্ণ-কণিকা-মিশ্রিত বাণি তুলিয়া

বাঁশের চালুনির উপরে জমা করে এবং চালুনির
বসে করিয়া তাহার উপর ধীরে ধীরে জল ঢালিতে
ও সেই চালুনিতে নাড়িতে থাকে। এইরূপে স্বর্ণ-
মিশ্রিত বাণি ধৌত হইয়া নিম্নে স্থাপিত
একটা পাতে পতিত হয়। কঁকর, পাথর
প্রভৃতি পদার্থ সকল বাহা উপরে পড়িয়া থাকে;
মাকে মাঝে বাছিয়া ফেলিয়া দেয়। এক
একবেগ প্রায় ৪০০০ পুন্ডি বাণি, দৌহ
করে। এইরূপ এক এক বেগকে তদার দিয়া
বলে এবং ইহা হইতে একবার স্বর্ণ সংগৃহীত
হইলেই পরিসরের মধ্যে পুরস্কার হইল। এক
এক দল সোণাওয়ালারা প্রতি দিন প্রায় ২৫০০
দিয়া বাণি দৌত করিয়া তাহা হইতে সিকি তালো
স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রতি দলে পাঁচজন
করিয়া লোক থাকে এবং সেই পাঁচজনে এই
স্বর্ণ ভাগ করিয়া লয়। সেই ধৌত ও পরিষ্কৃত
স্বর্ণকা-মিশ্রিত বাণি তুলিয়া লইয়া তাহার
প্রথমে বাঁশের চোপার রাধিয়া দেয় আবার
নূতন বাণি লইয়া এইরূপে ধৌত করিতে থাকে।
এইরূপে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণবাণি সংগৃহীত হইলে
চোপা হইতে সেই বাণি একটা পাতে রাধিয়া,
উপরে পারা মিশাইয়া ধীরে ধীরে তাহার
উপর অল্প অল্প জল ঢালিতে থাকে। বাণি
প্রথমে পারা ও পারা-সংযোগে স্বর্ণকণিকা সকল
ডেলা বাঁধিয়া পড়িয়া থাকে। তখন তাহার সেই
পারা-সংযুক্ত স্বর্ণও লইয়া একটা শাশুরের ভিতর
রাখে ও তাহাতে অধির উপাণ দেয়; শাশুরী
পড়িয়া চুপ হইয়া যায়, পারা উড়িয়া যায়
এক স্বর্ণ আরও বিতস্ত হইয়া পড়িয়া থাকে।
এইরূপে পারসের মহাযাত্রা ভারতবর্ষের নানা
নদীর বাণি হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে।
বাঙ্গালার বেশ-বাটী সমস্তই পারদ ব্যবহৃত হয়।

এটা আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাই যে, অতি
প্রাচীনকালে হিন্দুরা যে সকল জয়-ওণ বাঁধিবার
সমর্থ হইয়াছিলেন, বর্তমান ইউরোপীয় বিস্তৃতি
ও তাহার অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।
স্বর্ণসংগ্রহ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে ইউরোপীয়-
দিগের মধ্যে পারদ ব্যবহার ছিল মুম্বা বোম
না। এই সময়ের (১৫৭৭) 'বার্টলেমে-মেসিনা'
নামে এক ব্যক্তি মেক্সিকো দেশে স্বর্ণ সংগ্রহ
উপলক্ষে পারদ-ব্যবহার প্রচলিত আবিষ্কার করেন।
ইহার পূর্বে কি অষ্ট্রেলিয়া, কি কালিফোর্নিয়া

সকল দেশেই অতি দ্রুত দ্রুত যে সকল স্বর্ণকণিকা
বাণির সঙ্গে থাকিত তাহা প্রায়ই নষ্ট হইত।
ভারতবর্ষের প্রায় সমস্তই স্বর্ণ আছে সত্য,
কিন্তু অনেক স্থানে এরূপ সামান্য মাত্রা পাওয়া
যায় যে, তাহা সংগ্রহ করিতে, কিছুমাত্র লাভ হয়
না। যেখানে এই মহামূল্য প্রাকৃতিক পরিমাণে পাই-
বার সম্ভাবনা নাই, সেখানে ইহা সংগ্রহের বহু
চেষ্টা ও অর্থব্যয় বিভ্রমজনক। সেই স্থানে
লাভ নাই হইয়া বহু শো সান ইহার বিশেষ
সম্ভাবনা। ছোটনাপপুরে এই কাণ্ড বাহা-
দের উপকলিত, তাহারা দুই আনার অধিক
দিনাভে উপার্জন করিতে পারে কি না সন্দেহ।
ইহাতে তাহাদের কার্যক্ষেপ কোনরূপে দিন-
পাত হয়, লাভের ত 'কথা' নাই। কাজেই
স্বস্ত হুযোগ্য পাইলে, একাধি তাহারা করে না।
তিনবার বর্ষ পূর্বে অনেক স্থানে স্বর্ণধৌতকারী-
দিগের অস্বাভাবিক দ্রুত, এখনও প্রায় তদ্রূপ।
বহু বাণাশ্রয় হুম্বা হইয়াছে বলিয়া, তাহা-
দিগের অস্বাভাবিক অধিকতর মূল্য হইয়াছে। অতি
কল্প সিধিয়া গিয়াছেন যে, 'ভারতবর্ষে বহু অল্প
স্বর্ণ হইতে স্বর্ণের আবাদানি হইয়া থাকে সত্য
হইতে, কিন্তু এই দেশের উত্তর-প্রদেশেই পার্শ্ব
প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে এই বহুমূল্য স্বর্ণ উৎপন্ন
হইয়া থাকে। ভিক্টোরিয়ায় যথেষ্ট স্বর্ণ পাওয়া
যায়। সিন্ধু ও গন্ধার নদীর বাণি-মিশ্রিত স্বর্ণ
পারা-সংযুক্ত স্বর্ণও লইয়া একটা শাশুরের ভিতর
রাখে ও তাহাতে অধির উপাণ দেয়; শাশুরী
পড়িয়া চুপ হইয়া যায়, পারা উড়িয়া যায়
এক স্বর্ণ আরও বিতস্ত হইয়া পড়িয়া থাকে।
এইরূপে পারসের মহাযাত্রা ভারতবর্ষের নানা
নদীর বাণি হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে।
বাঙ্গালার বেশ-বাটী সমস্তই পারদ ব্যবহৃত হয়।

এটা আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাই যে, অতি
প্রাচীনকালে হিন্দুরা যে সকল জয়-ওণ বাঁধিবার
সমর্থ হইয়াছিলেন, বর্তমান ইউরোপীয় বিস্তৃতি
ও তাহার অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।
স্বর্ণসংগ্রহ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে ইউরোপীয়-
দিগের মধ্যে পারদ ব্যবহার ছিল মুম্বা বোম
না। এই সময়ের (১৫৭৭) 'বার্টলেমে-মেসিনা'
নামে এক ব্যক্তি মেক্সিকো দেশে স্বর্ণ সংগ্রহ
উপলক্ষে পারদ-ব্যবহার প্রচলিত আবিষ্কার করেন।
ইহার পূর্বে কি অষ্ট্রেলিয়া, কি কালিফোর্নিয়া

হইত। স্বর্ণখোতকারীদিগের ছরবহার আর একটা কারণ এই যে, এক হানে চিকচিক সমভাবে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায় না। অনেক কালের ধোয়াতে নদীর বাগিনেতে বেশ-খানি স্বর্ণ থাকে, লুইতে-লুইতে তাহা কবিরাজি আইনে, সেই সঙ্গে লাত ও কবিরাজি থাকে। স্বর্ণসংগ্রহ বাহানের উপকৌশলিক, এইজন্য তাহাদিগকে প্রায় মধ্যে মধ্যে হান পূরণভাগ করিতে হয়। অনেক পুণ্ডে আবার হানপরিবর্তন করা অসম্ভব হইয়া থাকে। নদীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন লোকের অধিকার। একজন অপরের তালুকে বাইলে, খোরতর নাক-বিসম্বাদ বচিবার সম্ভাবনা।

কোন কোন স্থলে আবার স্বর্ণ-খোতকারীদিগের কপালে আরও একটা খোরতর বিপদ ঘটয়া থাকে। যেমন জলাশয়ের নিকট শিকারীরা নিকার বাহিরের জন্তু-এবং কবিরাজি বসিয়া থাকে, সেইরূপ কোন কোন স্বর্ণসময় প্রদেশে ভূতপূত আশাদিগের অধিকার স্থাপন করে। প্রচুর পরিমাণে পূজা না পাইলে, তাহারা স্বর্ণ-সংগ্রহকারীদিগকে সেখানে স্বর্ণ খোত করিতে দেন না। আসাম-প্রদেশে জুইনামক নদীতে এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল। এই নদারকালকা স্বর্ণকণায় পরিপূর্ণ বসিলেও জুইনামক নদী। ইহাতে এত সোণা প্লাওয়া হইতে এবং সেই সোণা একশ নির্গম দে, বহুকালব্যয় আসাম দেশের রাজারা এই স্বর্ণক্ষেত্রে আপনাদিগের নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিঞ্চি কিছু দিন গত হইল, এখানে খোরতর ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। চারি দিকে নাপা, মিরি, মিমি, আবর, আকা প্রভৃতি অসভ্যজাতিরা সে সকল ভূত-দিককে পূজা করিত, তাহারা এইনদীকূলে বর্ষে বর্ষে অসংখ্য লোকের সমগ্রাণ্ড কলিয়া ভাবিলে যে, এখানে আসিয়া বসিলে অধিক পরিমাণে পূজা পাইব। প্রথমে দুই চারিটা ভূত আসিয়া উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে, স্বর্ণখোতকারিগণ প্রচুর পরিমাণে পূজা দিয়া তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিল। ক্রমে চারিদিকে ভূতমহলে এই সংবাদ প্রচার হইয়া গেল, আর পূজারি সোভে দলে দলে বাপুন্য-বাপুন্য ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল। পূজারি যত্ন করিলে এত বাড়িয়া গেল যে, স্বর্ণখোতকারীদিগের আর কিছুমাত্র শান্তি রহিল না; তাহারা এই হান পরিভাগ করিয়া পলাইল।

অনেক দিন যথিয়া জুইনামক আর কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। এখন ভাটন সাহেব আসামে বাইসেন, তখন তিনি এই দৈব-অভ্যুত্থানের কথা শুনিয়া ভাবিলেন যে, অধিকেন্তজনক দুর্ভাগ্যবশত অসামান্যদিকের উপর উপদ্রব করিয়া, ভূত ভূতেরা দুর্ভাগ্য অসাম-বিক্রমশালী ইংরাজ-পুরুষের প্রতি দুর্ভাবহার করিতে সাহস করিলে না। প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিল। অনেকগুলিন স্থলি লাইয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন, নিউয় গাউয়াইয়া আশার সাহায্যে বালি লুইতে আদেশ করিলেন। ভূতদিগের মধ্যে কাহারও সাহস হইল না যে, ভাটন সাহেবের কথায় কথা কর। অসভ্যজাতিদিগের কাছেও এ জাতীয় ভূতেরা কখনও পদমণ্ডল বিলম্বণ শিষ্টা পায়। ভূতেরা বাণে পাইলেই তাহাদিগের দিকে ছোট ছোটদিককে লুকাইয়া রাখা, পূজা পাইলে তবে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু এক-আধটা ভূত এরূপ লোভী থাকে যে, একবার দুবার পূজা পাইলেও ছেলে বাহির করিয়া দেয় না। আরও দাঁড় এই অভিলাষ। তখন অসভ্য জাতিরা বিরক্ত হইয়া, বনের বড় বড় গাছ কাটিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে। একটা গাছ কাটিল, দুইটা গাছ পড়িল, ক্রমে অনেক গাছ পড়িতে লাগিল। অপরপার ভূতেরা, যাহারা-এবিধায় কিছুই জানে না, তাহারা আশ্চর্য হইল—আজ এত মানুষ জটিল এক ব্যাপার করিতেছে কেন? অহমসান করিয়া জানিল যে, অমুক ভূত অমুক মানুষের ছেলেকে লুকাইয়া রাখিতেছে; দুইবার পূজা বাইয়াও বাহির করিয়া দিতেছে না। সকলে সেই লোভী ভূতের কাছে গিয়া তাহাকে যথেষ্ট বকিতে লাগিল। দেখ দেখি, তোমার জন্ত আমাদিগের পর দ্বার সব নষ্ট হইল, বনের বড় বড় গাছভাঙি মানুষেরা সব কাটয়া ফেলিল, আমরাই বা এখন কোথায় থাকি, আর এর পর ভূতিনীদিগের দুইটা পাচটা ছেলেকে পিলে ফেলিয়া বা কোথা থাকে! তখন অসভ্য ভবনদার মায়ে ভোটা ভূতটা মানুষের স্তন্যলোকে বাহির করিয়া দেয়।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বর্ণকণিকা সকল পালত মধ্যস্থিত প্রস্রবামধ্যে নিহিত থাকে। পালতম-পার পটমা বর্ষার জলে নদীতে বাইয়া পড়ে। কোয়ার্টার নামক একজাতীয় প্রস্তর স্বর্ণ-কণা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ পাথরের মাজে বাজে যেখানে সোণা থাকে, তাহাকে স্বর্ণ-শিরা কহে। যে কোয়ার্টার পাথরের শিয়ার অধিক পরিমাণে স্বর্ণ থাকে, সেখানে কয়েক কোলা দিয়া বুড়িয়াই কত লোকে বড় মাহু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মসরাচার এরূপ পরিমাণে থাকে না। তাই কেবল কোলা দিয়া বুড়িয়া থাকেন একই, সেখানে একই সোণা পাইলে লাভ হয় না। এরূপস্থলে পাথর চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। সেই পাথর-চূর্ণ লোকে যেরূপ বালি হইয়া থাকে, সেইরূপ করিয়া লুইতে সোণা বাহির হইয়া পড়ে। মসরাচার উপরে পাথরের মধ্যে হইয়া যায়, মাটির নোচের পাথরে পরিমাণে অধিক সোণা থাকে। তাই লোকে পাথরের ভিতর দিয়া কূপ খনন করে, ভিতরের পাথর উত্তোলন হইয়া আসে ও গুঁড়া করিয়া সোণা বাহির করে। আজ কাল এই প্রথা সর্বত্রই প্রচলিত। অতি প্রাচীনকালে হিম্মরাও এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সোণা বাহির করিতেন। তবে বাপ্পী কাল পাথর না ভাঙ্গিয়া তাহারা বড় বড় মণ্ডরের দ্বারা হাতে ভাঙ্গিয়া লইতেন। প্রাচীন হিম্মরাও সকল-কূপ খনন করিয়াছিলেন, অনেক স্থানে এখনও সে সমুদ্র কূপ বর্তমান আছে। কোন কোনটা পকাশ হাতের চেয়েও পড়ার, বস্তুর ভাঙ কাঠ কোয়ার্টার পাথর ভেদ করিয়া আঁধা গোড়া বাদিত হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয়া ভূতবৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগের কার্য দেখিয়া চমকিত হইয়া থাকেন। কি কারণে মসরাচার এক হুসাত্য কার্য সাধিত হইয়াছিল, তাহারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যে প্রাণী অবলম্বন করিয়া প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রস্তর হইতে স্বর্ণ উদ্ধৃত হইত, এখনকার কালে কালিকট ও অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় স্বর্ণ-ক্ষেত্রে সেই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। মাটির ভিতর হইতে পাথর বাহির করিয়া সেখানকার লোকেও প্রথমে গুঁড়া করিয়া, তার পর হইয়া, অবশেষে পারার মসরাচার সোণা বাহির করিয়া থাকে। হাতে না করিয়া সেই সকল দেশে অধিক-কাল বাপ্পী করণ দ্বারা পাথর ধুলাভূত হইয়া থাকে, কেবল এই বিকল্পতা। প্রস্তর চূর্ণ করিবার নানাপ্রকার উপায় আছে। এখন আমাদিগের দেশে যেরূপ আকমড়া কল প্রচলিত হইয়াছে, কেহ বা সেইরূপ কলের মসরাচার করিয়া থাকেন, কেহ বা স্বরকীর কলের

মত কলে, আবার কেহ বা পিটিয়া পিটিয়া চূর্ণ করিয়া দেন। প্রস্তর উত্তমরূপে চূর্ণ হইলে অধিকপরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। জুই জলপ্রচুর আমদান্য অমেকগুলি ছোট ছোট কবলের উপর দিয়া নিম্নদিকে বহিয়া যায়। পাথরের চূর্ণ জলের সহিত ভাসিয়া যায়, ওড়কতার বিশিষ্ট স্বর্ণকণিকা সকল তলার পড়িতে থাকে; আর কবলের গোমের ভিতর আটক-বাইয়া যায়। নাথো-থাকো জলের দ্বারা বন্ধ করিয়া কবল ভূগিয়া লইতে হয়। একটা বস্তুর টবে এই কবল জমায়ে হইলে তাহার ভিতর স্বর্ণকণিকা সমুদ্র একত্র হইয়া থাকে। টবের জল উপর উপর ফেলিয়া দিয়া নিচে হইতে স্বর্ণকণা উঠাইয়া লইতে হয়। এই সমুদ্র স্বর্ণরেখার সহিত তখনও অনেক অসভ্য জন্ম মিশ্রিত থাকে। তাই তৎকাল করিয়া তাহার সহিত পারদ মিশ্রিত করিলে পারদ ও স্বর্ণ-সংযোগে একটা শীর্ণক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া পড়ে। ইহারাজ্যে তাহাকে আশাদিগণ বলে। প্রচুর পরিমাণে এই যৌগিক পদার্থ একত্র হইলে হবার ভায় তাহাকে চেনাইতে হয়। চেনাইলে নবের ভিতর দিয়া পুস্তর অপর পদার্থে দিয়া পড়িত হয়। স্বর্ণ প্রথম পাঠে রাখিয়া যায়। এ উপায়ে পারদ নষ্ট হয় না, সেই পারদ বার-বার ব্যয়ভূত হইয়া থাকে। আজ কাল, স্বর্ণ বাহির করিবার এই প্রতিক উপায়।

ইউরোপীয়েরা প্রস্তরকূপনিহিত ক্রিম জন্মোত্ত কবলের উপর দিয়া বহিয়া বাইতে দেন, কেন না কবলের গোমে স্বর্ণেণ্ডে লাগিয়া থাকে। আমরাও এ প্রণালী জানিতাম। তবে আমেরা কবল ব্যবহার না করিয়া, লোমকূট চূর্ণ ব্যবহার করিতাম। পজাব প্রভৃতি প্রদেশে স্বর্ণ সংগ্রহকারীরা এই চূর্ণ নদীর জলে চাতিয়াই চারিট খোঁটা মারিয়া পাতিল রাখিত, তাহাতে ওড়কতারবিশিষ্ট স্বর্ণকণিকা সমুদ্র লাগিয়া বহিত, অন্ততঃবিশিষ্ট বাসুকরেণ্ড প্রবাহ সঙ্গে ভাসিয়া যাইত। মাঝে মাঝে এই চূর্ণ ভূগিয়া বাউলেনে উপর রাখিয়া, অপর বিকৃতি জলের ভিতর মাটিতে পুতিয়া রাখিত। এই চূর্ণ শূন্যের দ্বারা, লোহার ফলক দিয়া কেহ বা মাটি বুড়িয়া সোণা বাহির করিত। সদাকে ও তিরুতে স্বর্ণখোতকারীরা

আজও এইরূপ শূণ্য ব্যবহার করিয়া থাকে। শূণ্য, চৰ্ঘ ও স্বৰ্ণ সংগ্রহকারীদের আরও নামারূপ অশূণ্য মাজপোজ দেখিয়া প্রাচীনকালে রোম ও গ্রীশদেশে একটা আচর্য গমের উদ্ভাবন হয়। এইরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবসা আদায়কার যেরূপ একরূপ সোণ, পাইয়াজ, সেকালে তাহা ছিল না। জগৎব্যপ্ত কৃত নিকৈ তখন এক-টোটা প্রভৃতি স্বত্বকার জনসমূহে-বাস ছিল। যখন পৃথিবীকে দেখে খ্রিষ্টীয় ভাঙ্গাধিকের পর-করিতেন, তখন লোকেরা করিয়া ভবিত; যেরূপে রোমায়িত হইত; পৃথিবীকে কৃত মান বাবিত। আজ কাল আর সে সকল কিছুই নাই। এখন আফ্রিকার ধূমধামে ও মাহুয়ে মাহুয় বাঙাড়া ভিন্ন আর কিছুই ভবিত পাই-লাম না। তাতে আবার 'আমাদের মান থাকিবে কি? আমিও তো একজন ছোট বাটো পৃথিবী, আমার কি মান আছে বলুন দেখি? জাতি লইয়াই ভাবিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার মান। অস্বীকৃতি কি, গ্রীশদেশীয় কোন পৃথিবী দেশে বহিয়া যুগলেন যে, ভারতে একপ্রকার সিপীলিকা আছে বাহারা মাতীর ভিতর হইতে, স্বৰ্ণ বাহির করিয়া উপরে জড় করে। সেখানকার লোকের সেই স্বৰ্ণ পুষ্টিয়া লইয়া যায়। সিপীলিকা-গুলিনের শরীর দেখে ঢাকা, মাধার শিং। গ্রীশদেশীয় কোন লোকের সেই সিপীলিকার একটা শিংও রখিত হইয়াছিল। এই কথা লইয়া বহুকাল পূর্বে নামারূপ আদায়কার চণিয়াছিল, কেহ একথা বিবাস করিলেন, কেহ করিলেন না, আবার কোন অভিজ্ঞ লোক বা এই সিপীলিকার আরও ভালরূপ এক প্রকার করিয়া মানবজাতিকে চিকিৎসার মত কুসুজ্য পাশে পুঙ্খ করিলেন। প্রকৃত কথা এ গমের মাটে কিতাহার কিছুই ঠিক হয় নাই। আর দিন হইল, হিমালয়বাসী নামারূপ মাহুয় প্রভৃতি হিন্দুগণ গুপ্তগণে ভিক্ত অকলে ভ্রমণ করেন। সেখানে বাহা বাহা দেখিয়া-ছিল, ভারতবর্ষে প্রত্যাপন করিয়া তাহার শিল্পের বিবরণ পরবর্তীতে হাতে লখন করেন। এই বিবরণের মধ্যে তিস্তে-ও কিলপে সোরা সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা বর্ণিত হইয়াছিল। তাহার, বুলিয়াছেন যে, তিস্তে দেখা-নামগ্রহ-কারীরা মাটি বর্দন করিয়া মাতীর নিচে বাস করে। তাহাদিগের ছোট ছোট তাঁপ আছে; তাহা

চামরমুখ পাভার গোমে বুলিয়া প্রস্তত হইয়া থাকে। মাতীর নীচে শুয়ে শুয়ে তাহার এই মকল-তাঁপ থাকায়। মাতীর নীচে সমস্ত দিন কাজ থাকে; আর মাতীর নীচে রাক্তিতে নিদ্রা যায়। তাহাদিগের সর্বশরীর গোমমুখ পুরুষের আবেত; চমু হুইয়া কেবল মাত্র ভিতর হইতে গিঁঠ গিঁঠ করে। তাহার কোমালি হুড়াণী দিয়া মাটি খনন করেন। বহুদলের গোমমুখ পুরুষের এককি গোবার কলক পরাইয়া লয়; তাহাই দিয়া মাটি খুঁড়িয়া থাকে। নীচে হইতে মাটি খুঁড়িয়া ইচ্ছার মত ক্রম্যপাত উপরে ক্রম্য করে। নীতকাল এইরূপে কাটায়। গ্রীষ্মকাল আসিলে, উপরে উঠিয়া সেই মাটি খুঁড়িয়া সোনা বাহির করে; সোম বুক অশূণ্য-বেশপায়া হইয়া, শূণ্য হইল, মাতীর নিচে বাস হইল, উপরে স্বৰ্ণ-মিশ্রিত মাটিও ফেলা হইল। সিপীলিকার বা কিছু লখন বাধা নিত্যন্ত আবশ্যক, একে একে তাহা সকলই মিলিল। সেক্ষেত্র জীবাণুভিত্ত হেতুগোষ্ঠিত্য বড় মিয়া কথা লিখিয়া যান নাই যে,—কাত্তপ (কাম্বীর) দেশের নিকট ভারতবর্ষে একপ্রকার সিপীলিকা আছে, মৃতিকার নীচে খনন করিয়া তাহার বাসুকায়নি উপরে প্রক্ষেপ করে। এই বাসুকায়নি স্বর্ণ-খণ্ডেতে পরিপূর্ণ। গ্রীশদেশে প্রচলিত প্রকারের মৃৎ এই। হিমালয়নিধন-বাসীরা তিস্তভারতগণকে জন বা হুনীয়া বলিয়া জানে। এই হুনীয়ায় আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে স্বৰ্ণ খুঁড়িয়া আইসে। হিমালয় পায় হইয়া ভারতবর্ষে আসা বড় লখন কথা নহে। সহস্র ক্রোশাধিক বিস্তৃত হিমালয়ের মধ্য দিয়া কেবল দশ বায়টী পথ আছে। এই কয়টা পথ ভিন্ন আর পথ দিয়া আসা মহাবীর মাধ্যাতীয়া। একগুটি পথের আবার বাসায় থোলা থাকে না। সব-সমুদ্রি প্রায় পর্বত-সমুদ্র স্থপাকার ত্বায়ে পরি-পূরিত থাকে। কেবল বর্ধার মাধ্যামাশি হুই গিন মাস একটু পরিত্র হয়। পথ আবার অতি মক্কায়। একদিকে গননভোটা পাহাড়, অপরদিকে অন্ত-লম্পা বাত। একবার একটু পরশবিত হইলে মানু-দেহের আর চিহ্নমাত্র থাকিবার অন্তাবনা নাই। এই হুগি পথ দিয়া প্রায় এক মাস চলিল, ভারত হইতে তিস্তে-ও তিস্তে হইতে ভারতে উপস্থিত হইতে পারা যায়। বলা বাহুল্য যে, এতাত্য পাণ্ডি-মোড়া

চল না। পাণ্ডি-মোড়া চলা দূরে ধাক্ক, পঞ্চাজাত মেঘ ও ছাপলের পিঠে কোবাই দিয়া আনিত হয়। মেঘ ও ছাপলের পিঠে কল্লয়ার লখন ও মোহালা লইয়া আইসে। বিনিময়ে ভারত হইতে গোমু ও শুড় লইয়া যায়। তাহার নিম্নের কাছে জমার ফলে, স্বৰ্ণ রেণু ও ফিরোজা পাথর টাফিয়া দেয় ও এই হুই বহুমুখ অণবো বিনিময়ে টাকা, আত্মলি, সিকি ও হু-আনিলইয়া হুনীয়া দেশে প্রত্যাপন করেন। তিস্তেও রোপা নাই। সিকি হু-আনি-টাকার মাথা গাখিয়া গলায় পরিলে কেমন দেখায়। পুঠে লখনম বেকীর পান দিয়া মহারানীর মৃৎ-ভলিন কেমন উক্কিকি মারিবে। এই মাধে কতটা কামিনীগণ পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। টাকা সিকি হু-আনি আত্মলি লইয়া যদি না বাও, তাহা হইলে কি তোমার আর বণা থাকিবে? অন্তিতে পাই, কালিফুগিয়া হইতে মোহালা গনিয়া, আর ভূগুর হইতে লখন গিয়া, এই বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাখ্যাত করিয়াছে। হিমালয়ের অজ্ঞাত প্রদেশসমূহকে ভোট বলে। ভোট-বাসীরা এই ব্যবসার মাধ্যমে থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। এক দিকে তাহার তিস্তভারত পঞ্চাঙ্গত হুনীয়াগণের নিকট হইতে লইয়া ভারত-বাসীলিকে বোপাইত, অপরদিকে ভারতীয় পণ্যস্বত লইয়া তিস্তভারতগণকে দিত। এক্ষেত্রে ভোটবাসীদিগের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের কষ্ট নিবারণের জন্ত গবর্ণমেণ্ট লখনের শুদ্ধ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিলেন বলিয়া-ছিলেন। কি হইল, বলিতে পারি না। এই সাক্ষিপ্ত প্রস্তাবে বিবরণ আর কিছু বড় থাকি নাই। ভারতের সর্বত্রই প্রায় গোমার আকার আছে। আর এই দোয়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। আজ কাল কিং এই স্বৰ্ণ-সংগ্রহ-কার্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। সমুদ্র পৃথিবীতে প্রতি বৎসর আর চলিষ্ট কোটি টাকা মেঘের স্বৰ্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে; কিন্তু ভারত হইতে অতি অল্পই উপহার হয়। ভারতে ভারতের আধিক্য মত সোণও উপহার হয় না। গম, চাউল ফল প্রভৃতি অতি বিনিময়ে প্রতি বৎসর আমরা প্রায় তিন কোটি টাকার সোণা কিনিয়া থাকি। এই সোণা লইয়া আমরা গহনা পড়াই, কিংবা মাতীর

ভিতর পুতিয়া রাখি। পূৰ্ব-প্রচলিত প্রণালী অবলম্বনে আর এখন অধিক পরিমাণে স্বৰ্ণ সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষেত্রে সোণাক্রমে পাত ফলক দাসদাসী নিম্নক রকমের নো নাই, থাকিলেও বোধ হয়, এখনকার লোকের ঐক্লপ কার্যে প্রবৃত্তি না হইলেও না হইতে পারে। তার পর পূৰ্বকালে আহারীয় জ্বালানমুহ লকলই লুপ্ত ছিল। বহুতরু সোণা গিয়া আগে ক্ষতজি, চাউল চমিলিত, এখন ততরু সোণা দিয়া ততজি চমিলিত ছিল না। সে জন্ত দিনান্তে আপু বহুতরু সোণা পাইলে লোকের ভরণ পোষণ হইত, এক্ষেত্রে সোণা ততরু পাওয়া বাইলেও সে সোণার আর এখন কোনও ভরণ পোষণ হয় না। তাই স্বৰ্ণ-মোহালাগণ স্বৰ্ণ-সংগ্রহ করিতে পাইলেন এবং এক্ষেত্রে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। আবাদিগের এ ব্যবসা কেন, যেদিক পানে চাহিয়া দেখি, সেই দিক পানেই এই কথা। কালের ভূমিতে দেশ অবিভক্ত পরিবর্তিত হইতেছে। আজ যেখানে ক্ষো নাই, কাল সেখানে সেল হইল, অথনি নোকাগোলা, পাণ্ডিগোলা প্রস্তত কত লোকের অম গেল। আশি হাজার লোককে ডাকি না কেন, কেহই আর আমার নোকা চড়িয়ে না। আমি হাজার নোকা আর বলি না কেন—যে বেশি হইতেবিগণ। আজ আমি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া শান্তিপূর হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে শান্তিপূর নোকা বহিতে-ছিলাম, মোমায়া সকলই আমার নোকার আসিতে-ছিল; আজ যেন বুলিয়াছে, বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। রেল বিদ্যভাটেরা যোগা-করে। আমি তেমানিগের বহুশী ও বজাতিয়। অতএব যে ভারতাকিউলাও আইসে-ভারত-নোকা-কিউলা দেশ-হইতেবিগণ। তেমায়া রেল কিউলা আমার নোকায়া চড়িয়া আমাকে প্রতি-পালন কর। বলা বাহুল্য, আমার কথায় কেহই কপুরুষ করিলে না। দেশ কাল যেরূপ পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার মধ্যে সবে আমাদিগের ব্যবসার প্রণালীও পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহাই পাশ্চাত্যদিগের মত এই ধারণার জীবাণু-মুহে আমরা জ্ঞান হইতে পারি। তা না হয়, যি

শায়ে পরম স্থপতি, গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন শ্রীমূল শশবর তরুতরুণি মহাশয়ের প্রতিনিধি কি কংগ্রেস? না,—তাহা নহে। তবে কোন চিন্তা-শ্রীনের দিকে মিঃ ঘোষের লক্ষ্য? নির্দেশ মিঃ ঘোষ ভেড়া ভাবে চিন্তা করেন, সেইরূপ ভাবে তিনি চিন্তা করেন,—তিনিই কি মিঃ ঘোষের “চিন্তাশীল” বলিয়া লক্ষ্য? জানি না—কি। সে বাহা হউক, এখান জিজ্ঞাস্য এই—কংগ্রেস কি দমনবানের প্রতিনিধি নহে? কংগ্রেস কেবলই চিন্তাশীল, দমনবানের কিছুতেই নহে—এই কথাই কি ঠিক? তাহা হইলে, কল এই ঠাড়াইতেছে,—দমনবা বলি চিন্তাশীল না হন, তবে তিনিও কংগ্রেসে স্থান পাইবেন না। তাই মুক্তি কংগ্রেসের সভাই স্বার্থে টানটানি। এখানে কেবলই “চিন্তাশীল” ব্যক্তিগণের সমাবেশ। কংগ্রেসে মা লক্ষ্মী পালাইয়াছেন।

এবারের কংগ্রেসে প্রধান আলোচ্য বিষয় এই তিনটি—(১) রক্তাক্তের ব্যবস্থাপক সভায় এবং হোটেলবাদের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতাসীম কর্তৃপক্ষ থাকে চাই; (২) ভারতে যুদ্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই; (৩) ভারতবাসীর বালভীয়ার মনোদানের প্রবেশ কল্প চাই; (৪) প্রব্লেস আইন উত্থান চাই; (৫) গবর্নমেণ্ট ভারতে পোরেসিড এবং সিপাহীসৈন্য রাখিতে যে টাকা ব্যয় করেন, তাহার হ্রাস করা চাই; স্বর্ণাং বেতনভুক্ত সৈন্য-সংখ্যা কমান চাই; (৬) ইংলণ্ড এবং ভারতে এক নমুনে মিলিপার্মিট পত্রিকা হওয়া চাই;—স্বর্ণাং অধিক সংখ্যক ভারত-বাদীকে নিষিদ্ধকান করা চাই;—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার আশ্চর্য্যের কারণ অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। সে বাহা হউক, উল্লিখিত ছয়টি প্রশ্নের অর্থ কি? ইহার অর্থ আর কিছুই নয়,—কেবল এই যে, ইংরেজ! তুমি পশুও, আমরা একবার ভারতশাসন করিব। কিন্তু এমন করিয়া কি ভিত্তিরী ভিগা মাটিতে আছে? ছি! ইহাতে? স্বেমবানের লজ্জা না হউক, আমাদের কিছু মনে, মনে বড়ই লজ্জা বোধ হয়। পৃথিবীপতি ব্রাহ্মণ নিকট ভিত্তিরী থিয়া হঠাৎ বাসিল,—“মহারাজ! গর্বোপহান করুন,—অপমান সিংহাসন ছাড়িয়া দিন,—বিস্ত! আপনি

দনব্রী হউন,—আমি একবার রাজাসংঘাসনে বসিয়া রাজপদে বসিব করিব, রাজকোষে থাকিব, এবং রাজকর্তার পানিগ্রহণ করিয়া পরমহুখে কাল কাটাইব।” তখন সেই ভিত্তিরীকে রাজা কি উত্তর দিলেন, বসুন দেখি? অল্পদিন নির্দেশ—পূর্বক তাহাকে তখন তিনি কি পাগল-পারদের দিকে অগ্রসর হইতে বলিলেন না? বাহা হউক, আমাদের এই বক্তব্য,—ক্রোধপরশ্ব না হইয়া কংগ্রেস-ভক্তগণ আমাদের কথা বুঝুন,—চিন্তা করুন,—বিচারপূর্বক মীমাংসা করুন। হিত-সামর্থ্য কে কি প্রতিফল কণা বলেন,—তাহা তাহারে দাঁতভাবে অথব কথা উচিত।

এবার জন্মভূমিতে যে সকল উক্তপদস্থ ব্যক্তি প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নাম প্রকাশ করিতে সম্মত নহে। কারণওবা নাম প্রকাশ করিবারই পো নাই। তবে এই মাত্র বলিব,—তিনি কালচাঁদ, মডেলভগিনী অশ্রুতি উপভাস লিখিয়াছেন,—তিনিই জন্মভূমির এই রাখানার্থ উপভাসের রচয়িতা। এ উপভাস বিস্তৃত হইবে। আর “ভারতে স্থপতি” প্রবন্ধের প্রবেশা শ্রীমূল বাবু হৈলোকান্য বর্ণনাগণ। ইনি ইংরেজসম্রাজ্যের নিকট মিঃ, টি, এন, মুখার্জী—এল, এল, এল, বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুখো-পাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় শিল্প-বিষয়ে একজন প্রখ্যাত চিন্তাশীল লোক। ইংলণ্ডে ইহার রব নাম। ভারত-পর্বমেন্টের স্থাপিত কলিকাতা বাহু-বধু কলিকাতা-শিল্পজ্ঞাত-বনজাত জবাসমূহের এবং মানববৃত্তি বিষয়ের অধ্যয়নপে হৈলোক বাবু গবর্নমেণ্ট কর্তৃক উক্তভেতনে নিযুক্ত আছেন। শিল্প এবং মানববৃত্তি সম্বন্ধে ইহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও কর্তৃক ইহা বিশেষরূপে প্রশংসিত। কল কণা, হৈলোক বাবুর ভ্রাতা ভারতবর্ষে শিক্ষাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অতুল্য হয় না। ইনি ভারত-পর্বমেন্ট কর্তৃক গৃহাধিষ্ট হইয়া ১৮৮৩ অব্দে দুবরাজ শ্রিল স্বর-পেশন-প্রতিষ্ঠিত মহরমোদা পরিদর্শনার্থ ইংলণ্ড গমন করেন। ৩ তথায় তথ্য ভারতবর্ষের ভিত্তিরী নিয়ন্ত্রণ করিয়া পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া ছিলেন।

জন্মভূমি।

১ম ভাগ।

মাঘা ১২২৭।

২য় সংখ্যা।

স্রী-জাতির কর্তব্য।

আমি মুখ্য ব্যক্তি; আমরা এমন কি শক্তি যে, আমি হিন্দু-রমণীর কর্তব্য নিরূপণ করিতে সক্ষম হইব? ত্রিবাংল, তত্ত্বদর্শী কথিব, কামিনী। কুলের কর্তব্য যাঁহা স্বির কামিনী গিয়াছেন, আমি কেবল তাহাই দেখাইব। আমি সাংগ্ৰহকার মাত্র। আমার কৃত্য কিছুই নাই। হিন্দু-প্রাণী লক্ষ্যরূপী হউন,—মহর্ষি মহু প্রকৃতির কথা কঠম করুন, শায়ের মর্ম্ম অন্বেষ হউন, শায়ের আভা পালন করুন।

মমুর উপদেশ,—(৯ম অধ্যায়)

পতিং যা মাভিরতি মনোবাসদেহমসতি ॥
মাতৃকুলোক্তান্যোত্রোতি স্যঃ মাণ্ডিত্য চোচ্যতে ॥
যে রমণী,—মন, বাসক এ শরীর দ্বারা ব্যক্তি-চারিণী না হয়, তাহার পতিহারা প্রাপ্তি হইয়া থাকে; সাধুগণ, তাহাকে মাণ্ডী বলিয়া থাকেন। পিতা রক্ষিত কোমোর ভর্ত্তী রক্ষিত যৌনে। রক্ষিত হায়ের পুত্রা ন ত্রী পাতর্য্যমহিতি ॥
ত্রীলোকের বাল্যকালে রক্ষাকর্ত্তা পিতা, যৌনকালে ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধকালে রক্ষাকর্ত্তা পুত্র-পুত্র; ত্রীলোকের স্বামীকালেকোন কালেই নাই।
ন কশ্চিন্দ্যোবিতঃ শব্দঃ প্রমথ পরিব্রিজমু ॥
এতরূপার্য্যোবৈগৈশ শব্দান্তাঃ পরিব্রিজমু ॥
অর্থক সাংগ্ৰহে চৈন্যং ব্যয়ে চৈব নিযুক্তয়েৎ ॥
যৌনে ঘর্ষেঃসংস্কার্য্য পরিব্রাজক ব্রহ্মণে ॥
কোন ব্যক্তিই, জোর-জোর করিয়া ত্রীলোকিক রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু স্বামীগণ উপা-সাধ্যো ভায়াবিকগে রক্ষা করিতে পারা যায়।

রমণীকে দনমকর, বাহ, জ্যোত্ধিক, শরীরভক্তি, পতি-সোদারি ধর্ম্ম, অমরপক্ষ ও গৃহোপকরণ প্রভৃতি পর্ধ্যবক্ষণে নিযুক্তি কৃত্তিব।

অর্থকিতা গ্রহে রক্ষাঃ পুরুষৈরাপকরিতিঃ ॥
আত্মদানাত্মনা ব্যাপ্ত রক্ষোত্তিতাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥
যে রমণী, হুশীলজাত্রমূলক আশ্রয়ক না করে, আত্মদানাত্মনা বিপত্ত পুরুষপক্ষপকর্ত্তৃক গৃহে মুখ হইলেও অরক্ষিতা; আর বাহারা মাণ্ডিকতা প্রকৃত আশ্রয়ক করেন, তাহারা ই ব্রহ্মকিতা। “অতুত্রা” স্বর্গনিরকারি, হাতের কারণ-নির্দেশ দ্বারা ইহাবিশেষের লক্ষ্যাদি সংস্থাপন করা আবশ্যক।

পানঃ চরুজান্যামাঃ পত্যাক বিরহোহটমু ॥
বসোহচরুবেদ্যশাশনানীবাং দূষদানি য়ে ॥
মম্পান, হর্জন-সংসর্গ, কামিবিচ্ছেদ, ইত্যন্তঃ উদ্রা, অকামিনীতা এবং পুণ্যগুণে বাস,—এই ছয়টি কার্য্য রমণীবিষয়ে ব্যক্তির দোষের নিদান।
নাত্তি ত্রীবাংক্রিয়া মস্তৈরতি ধর্মো ব্যবহিতঃ ॥
স্রীজাতির জ্ঞাতব্যমি সংস্কার,—মুখ দ্বারা হইবে না। ইহা শাস্ত্র-ব্যবহা।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ,—(৬ম অধ্যায়)

ত্রীতিত্বকর্ত্তব্যঃ কার্য্যমেষ ত্রীঃ পরঃ ত্রিয়াঃ ॥
অ্য ভগ্নেঃ সমুপ্ত্রীকো হি মহাপাতক কথিবে না ॥
ত্রীলোক, স্বামী ব্যক্তি যেকোন করিবে না; ইহা তাহাদিগের পরম ধর্ম্ম। ভর্ত্তা মহাপাতক-পাপে-উদ্রিত হইতে, ত্রি পর্ধ্যক তাহার অপেক্ষা করা উচিত।
মৃত্তে জীবতি না পতৌ মন নাভ্যদৃশ্যচ্ছবি ॥
সেহ কর্ত্তব্যমাত্মো মৌমেষে কোদ্য মনঃ ॥
যে নারী, স্বামীর জীবিতাবস্থাতে

পর পর-পুত্রবসনিনী না হয়, তাহার ইহলোকে
ক্রীড়না, পরলোকে উন্নয়ন সহিত আনন্দ-
ক্রীড়না হইয়া থাকে।

সুখযোক্তপদ্য দক্ষা হইয়া বচনপুত্রবাসিনী।
কৃত্যঙ্ক শুরমো পানবন্দন তত্ত্বতংপায়।
রমণী, গৃহ্যপুত্রবন বয়স সাবধানে ও পরিকার-
ভাবে রাখিলে; কার্যদক্ষ হইবে; সদা, আনন্দ-
ময়ী হইয়া থাকিলে; মিতব্যয়ী, স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন-
ভিত্তি। পাত্তপ্রভা এবং বন্ধ বস্তুরে পদবন্দন-
ভক্ত্যা অমর্যর কর্তব্য।

জ্যোতিষ শ্রীসংস্কার সমাজোৎসবপুর্নম।
হুজ্জ পরপুত্র বান্দ তাজে প্রোথিতভক্ত্য।
যে রমণী-ভক্ত্য বিবেশে—জ্যোতিষ, শ্রীসং-
স্কার, সন্ধানপুর্ন, উৎসবপুর্ন, হাজ-পরিহাস
এবং পরপুত্র বান্দ, তাহার গর্বে অন্তর্ভুক্ত।
শিরু-মাত-সুত-ভ্রাতৃ-বন্ধ-পুত্র-মাতৃপুত্র।
হীনা ন জারিনা ভক্ত্য বর্ধিতব্য ভাবে।
ভক্তী না থাকিলে, বা জগৎ থাকিলে,
রমণী—পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধ, পুত্র,
বা মৃতদের অদ্বৈত অর্থনয়ন করিলে। নতুবা
তাহার নিকা হইবে।

পতিপ্রিয়হিতে ব্রহ্মা বাচ্যতা সৎপ্রোথিত্রায়।
ইহ কীর্ত্তিময়প্রোতি প্রোতা চাহশমন স্বয়ং।
যে নারী পতি-হিতজনক প্রিয়কর্তা করিতে
নিষ্কল, শ্রীচাচার-সম্পদা এবং জিতপ্রিয়া; তাহার
ইহলোকে দেশলাভ ও পরলোকে অন্তর্যমীয়
সুখভোগ হইয়া থাকে।

বিষ্ণুর উপদেশ, — (২৫শ জ্ঞাপায়)

অথ জ্ঞাপায় বর্ণন্য। ভক্ত্য সমানস্তচচারিৎস।
বন্ধ-পুত্র-ও-সৎসত্যভিপ্রিয়ম। দুঃখভোগ-
পরতা। অদুঃখভোগ। স্বচ্ছন্দভোগ। মূল-
ক্রিয়াপনতিরিত্তি। মূল্যচাচার-ভৎসপতা। ভক্তির
প্রসিদ্ধিতত্ত্বক্রিয়। পরপুত্রবান্ধবান্ধব।
চারপেশপদ্যককেশবান্ধব। নরকপুত্রবস্ত্রতা।
বাল্যাবধিব্যক্তিধর্মপিতৃভক্ত্যপুত্রাণিনতা। মুতে
ভক্তির ব্রহ্মচর্য্য ভদ্রবাসনাংক।

পতির সঙ্গ প্ৰভাবলগ্ন; বন্ধ, পুত্র, ও-
সৎসত্য এবং অধিবিক পুত্রা করা; গৃহপুত্রবন
বন্ধ-প্রসিদ্ধিতত্ত্বক্রিয়া; পরপুত্রবান্ধবান্ধব।
সংকিত পুন গোপনেন সাবধানে রাখা; মূলকর্ম
অর্থব্যবহারপদ্যকার্য্যে আনন্দিক; মূল্যচাচারে

অর্থব্যবহার, ভক্ত্য নিবেদন—থাকিলে মূল্য-খোজ না
করা এবং পরপুত্র বা বাঙা;—জ্যোতিষের বর্ণ।
আর বীরবেশ ও গর্ব্যকে অর্থনয়ন না করা; সুকসা
ভায়েই অদ্বৈত থাকি; বালাচালে পিতার, যোনে
পতি ও মারিত্যের পুত্রের অদ্বৈত থাকি এবং
পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য বা তাহার সহমরণ
অথবা অমরণ জ্যোতিষ কর্তব্য।
নাশ্তি জ্যোতিষ পুত্রবন্দন না ব্রত না পুত্রোপাধিতম।
পতি, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত তন বর্ণে মনীয়ত।

জ্যোতিষ ব্রত বন্ধ, ব্রত ব্রত এবং ব্রত
উপায় নাই। পতিসেবানেই জ্যোতিষের পূর্ণ
লাভ হইয়া থাকে।

পতিশরের উপদেশ; — (৪র্থ অধ্যায়)
দর্শন্য ব্যাখ্যিত মূল্য ভক্তির যান ব্রহ্মচর্য্য।
না মুক্তা জায়তে যাব্যি তৎসব্যক পুনঃ পুনঃ।
যে রমণী—পতি, ব্রহ্মচর্য্য, পুত্র, বা মূল্য
ভক্তকে না মানে, মৃত্যুর পূর্ন তাহার সর্প যোনিতে
জন্ম হয়। অমরণ, মৃত্যুজন্মেও তাহার পুনঃ
পুনঃ বৈধব্য হইয়া থাকে।

মুতে ভক্তির বা নারী ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থিত।
না মুক্ত লাভতে পূর্ণ বধ্য তে ব্রহ্মচর্য্য।

যে রমণী, ভক্তির মৃত্যুর পর, ব্রহ্মচর্য্যে অর্থনয়ন
করেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যবিশেষে ভ্রাতৃ স্বর্গলাভ করিয়া
থাকেন।

ত্রিঃকোটো ব্রহ্মকোট চ যানি রোমায় মাননে।
ভাবন্যকালং যৎসং যৎসং ভক্তির বাহুগচ্ছতি।
যে রমণী সহমরণ বা অমরণ করেন, তিনি
মহমরণেই ব্রত রোম ভক্ত কাল অর্থব্যবহার-
ক্রীড়াইয়া ব্রত পূর্ণবাসন করেন।

স্বচ্ছার উপদেশ; — (৫ম অধ্যায়)

ন ব্রহ্মেনোপাসনে ধর্ম্যে বিবিনে চ।
নারী স্বর্গময়প্রোতি প্রোতি পতিপুত্রনাম।
ব্রত, উপায় ও বিবিধধর্ম্যহীন হারাও
রমণির স্বর্গলাভ হয় না, কিন্তু ব্যাধি-পুত্রাভেই স্বর্গ
প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

দ্রব্ধের উপদেশ; — (৪র্থ অধ্যায়)

গৃহবাস্য হুবাধার পদ্য-মূল্য ব্রহ্মে হুয়ম।
মা পুত্র্য বা বিনোতা জ্যোতিষতা বর্ধনিত।
গৃহবাস্য হুয়ের জন্ম; গৃহবাস্যে হুয়ের
মূল পুত্র; চিত্তজা বর্ধনিত, বিনোতা পুত্রই
পুত্রাশপ বাচ্য।

অমৃতদ্বা ন বাপুত্র্য দক্ষা মার্যী প্রিয়বধা।
ব্যুতগুণা বানিতক দেবতা মান মৃত্যুবা।

যে রমণী পতির অমৃতদ্বা, বাসোদ্যবিতা,
কুশলা, শান্তী, প্রিয়বধা, আশ্রয়িতা এবং
বানিতক, তিনি মানবী নহেন;—দেবতা।
অমৃতদ্বা ন বাপুত্র্য দক্ষা মার্যী পতিব্রতা।
এভাবেই ভবৈব জ্যোতিষেই নারী না মন্যবা।

পতির সহিত ব্রহ্মমত, বাসোদ্য-মুদ্রতা,
মততা ও পতিব্রতা যে শ্রীর আছে, তিনি সাক্ষ্য
লক্ষ্যই, সৎসৎ নাই।

মুতে ভক্তির বা নারী সমারোহে তানময়।
মা ভবৈব ভক্তচাচার পরলোকে মনীয়ত।
যে রমণী ভক্তির মৃত্যুর পর আর প্রবেশ
করেন, তাহার আচার অমৃত ভক্ত এবং তাহার
সমারোহে স্বর্গবাস হয়।

দ্রামায়ণ, অধ্যায়াকাণ্ড ১১ম অধ্যায়,
মীতার প্রতি অনমৃত্যুর উপদেশ; —

নারহা বনহো বা ব্রহ্মা বা যদি বাহুভক্ত।
বাসায় জ্যোতিষ প্রিয়োভক্ত্যভাসানোবাহোদায়।
পতি, নপুংসই থাকুন, বা—বনেই থাকুন,
উভয়েই—হউন আর অমরণই হউন—যে রমণী
পতির সেই পতিই প্রিয়, তাহারিগের উৎকৃষ্ট গতি
লাভ হয়।

শ্রীশীল; কামকৃত্যে বা ধর্ম্যে পুত্রবর্জিত।
জ্যোতিষার্থ্যভাবানায় পরম বৈধব্য পতিঃ।

শ্রীশীল, কামচর্য্য, ধর্ম্যহীন,—পতি বাহাই কেন
হউন না, সংস্কার রমণীরগের তিনিই পরম
দেবতা।

মহাভারত, বনপর্ব্ব—জ্যোতিষ-মত
জ্যাম-সংবাদ প্রকরণ—২৩০ অধ্যায়।

সত্যভামা ও জ্যোতিষের পুত্রের সাক্ষ্য
হইল; সত্যভামা জ্যোতিষ করিলেন, জ্যোতিষ-
নামি। জ্যোতিষ বীরপুত্র লোকপাল-মুদ্র
পুত্রাশ্রয়ী—এক বংশধার কর্তব্য হইলেন।
ময়, গুণব, ব্রত, জ্ঞান, ধোম, বাহাই ইউক না
কেন, তিনি বাহার জ্যোতিষ বানিত্যপক এমন শু
করিত্য, তাহা আমর্য্যক বলিতে হইবে। তখন
পতিভক্ত মহাভামা জ্যোতিষ বলিলেন,—

“অমর্য্যাবাস্য মন্যবায় মতে মানমৃত্যুজন্ম।
অসদাচারিতে নার্য্য কথ্য জামৃত্যুজন্ম।”

বৈধব্য ভুক্তা আনীয়ামরমূলপায় প্রিয়মী
উজ্জ্বিতভক্ত ভদ্রবাস্য; সর্বাশ্রয়েপতিবিত্ত।

ন বাসিধা বপো ভক্ত্য প্রিয়ো জামরমূলপায়।
অমিরপ্রোদ্যভাস্য পদ্যন পরমভাস্যম।
মূলপ্রোদ্যভাসি বিধ্য প্রথমজতি জিহাস্যমঃ।
জ্যোতিষের সাক্ষ্যভুক্ত্য প্রিয়; পতিব্রতা।
অপুমান্য; কৃত্য; জ্যোতিষজ্যোতিষবিত্ত্য।
না বাহু প্রিয়ং ভক্ত্য প্রিয় কাথ্য বধনম।

অর্থ এই—“যে সত্যভামে। তিনি অমর-
জ্যোতিষের আচার আমর্য্যক জিহাস্য করিতেছে;
এক প্রমোদ উত্তর দেওয়া যায় না। শ্রী আমার
জন্ম ময়প্রোদ্য বা মূলকর্ম (অর্থ্য শিকড়-বাড়)
বাওয়ান বা কোনরূপে বাহার কুরান) করিতেছে,
ইহা জানিতে পারিলেই ভক্ত্য ব্রহ্মভিত্তি সর্গের
জায় সেই জ্যোতিষেই মন্য-পতি থাকেন। ময় ও
মূলকর্ম কাম পতিব্রতা হইবে। আধিক্য জিহাস্য
ব্যক্তি এই ব্রহ্মচর্য্যকরণে ভানে বিধ্যপ্রোদ্য করিয়া
থাকে, নানাবিধ ব্রহ্ম পঞ্চায় ও করিয়া দেয়।
রমণী পতি-কর্তব্য এই গতি করিতে গিয়া—
নিজ নামকে জ্যোতিষ, শ্রী, ভক্ত্য, কাম, কাম,
অর্থ, অর্থ বা ব্রহ্ম প্রিয় প্রিয় প্রিয়।”
অনুভূতি জ্যোতিষ, মা পুত্র ব্রহ্মে ব্রহ্ম করিয়া
শ্রীমণির মনোহরণ করিয়াছিলেন এবং বাহা
মংস্রীদিগের কর্তব্য, তাহাই বলিতে মাগিলেন।

নাহুতকর্তব্যে নান্যতে নামংব্রিজে চ ভক্তির।
ন বাসিধা মন্যবায় মতে মানমৃত্যুজন্ম।

ভক্তির ভোজন না হইলে, আমি ভোজন
করি না; আমি না হইলে, আমি মান করি না;
ভক্ত্য শমন না করিলে, আমি শমন করি না।
ভক্ত্য কেন, ভক্ত্যপণ্ডেও ভোজনানি না হইলে
আমি ভোজনানি করি না।

ভোজনানি প্রিয়ামা ভক্তির গুহ্যমাতম।
অভ্যুভাষ্যভিনয়। আমরমূলপায় চ।
হামি,—অর্থ, বন, বা গ্রাম হইতে গুহ্য
আসিলে আমি ভৎসন্য্য আছুহিত হইয়া
পদপ্রস্থানগের জন্ম ও বসিবার আসন প্রদানে
আনন্দ প্রকাশ করি।

অমৃতভাষ্য মূল্য। আমে ভোজনমানি।
সত্যভা ব্রহ্মভাষ্য চ হুদ্যমৃত্যুজন্ম।

অমিরমৃত্যুজন্ম হুদ্যমৃত্যুজন্ম।
অমৃতভাষ্য নিত্য জ্যোতিষমান্য।

“এই ঘৃণিত অশ্রম্যানিত দ্বিগুন দুঃখ-বারিদের
কলণও হইতেছে—হায় অতি পৈশাচীয়া ব্যক্তিচারে
বিলাত প্রবর্তি হইতেছে। ক্রীতদাসীকর্মে
মধ্যান্তিক দুর্গতি সহিতে না পারিয়া অসম্মান
স্বকৃৎকরা কটকট জন্য শরীরের পবিত্রতা পথে
পথে ছিন্ন করিতেছে—অসুখ্য সভ্য-রত্ন ব্যক্তি-
চারের অন্তঃপার্শ্ব গর্ভে সন্নিবেশ করিয়া বাজারে
বাজারে, বেড়া-গিরির স্রোত প্রবাহ হইতে প্রবাহ-
রত্ন করিতেছে। হায় প্রাতিমূর্ত্তে কতই রমণী
আশ্রয়ের অভাবে, জটরান্বিত হৃৎসহ হ্রদনে,
ঐ পুষ্টিক্ষয় স্রোতে আশ্রয়ের তরে বৈতক
কাঁচে কাঁপ দিতেছে। ঐ শ্রেণে অশ্রমিত পবিত্রা
তোমাদের ‘পিকিভি’—চারিফ্রস, ‘কোনে
আমি বা নর?’ পূর্ব প্রানিত। রজনীর নিশীথ
সময় পর্যন্তও তোমাদের সত্য (১) সমাজ-স্বার্থ
শখিনীয়া শরীর বিনিময়ে এক গ্রাম স্বাধৃত
উপার্জনের জন্য অশ্রম করিতেছে। কিন্তু এই
ভাবিকে, বিষ্ ইহাশিগের জাতীয় জীবনকে
হিক ইহাদের সাম্য, স্বাধীনতা-সম্ভাষণে। হি
হি কি লজ্জা। কি দুঃখ। নারীজাতির কি দুর্গতি,
হেলগুনু। তোমার বক্ষের-পরিচয়। বিষ্ তোমার
জীবনে। বিষ্ তোমার সম-জগৎ।

“সত্য মনোবিশ্বাস। আপনাদের সমাজ-
শক্তির—আপনাদের স্ত্রী-বাল্যানুরাগ, দাম্পত্য-
ভবনের এবং পৌনঃপুনিক বিবাহের বিঘ্নের,
বিক্রমের পরিধি আনি খড়কে সর্বলই ত্রুণি-
কর্তে, চক্ষুমান মন্থেই দেখিতেছেন; অতএব
ভ্রম “মন-মাহেবগণ” আনি উল্লংঘ্য প্রচার
করিতেছি—আমরা হিন্দু-সন্তান, তোমাদের ঐ
সকল কলুষিত রীতি নীতি চাই না। বিস্তার মান-
বিশিষ্ট এবং মিসেস মানবিশিষ্ট চাহেছেন—
চাউন; আমরা চাই না; আমাদিগকে অহুগ্র-
পূর্বক তোমাদের উপকার হইতে অব্যাহতি
দাও। পারদর্শী তোমাদের পাপ প্রমাণ সকল
অরলনন করিয়া অধ্যাপ্যাক্ত হইতেছে।

“স্বপ্নের নিয়মানুসারে আত্মগোপিত অসু-
পাত ক্রীত-স্বর্গ, বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইয়া, ইহা একটি
বৈজ্ঞানিক সত্য। মহত্ব জাতিও ঐ সত্যের
বহিষ্ঠত করে। উন্নয়ন এখন আদি চিকিৎসা-
শাস্ত্রের স্বাক্ষরপত্র একটি কথা বলিতে চাই।
আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, কিন্তু আপাতত পবিত্র
ব্রহ্মচর্য-নীতি অধরূপ না করিয়া, নারী-বিমান-

শাস্ত্রাধ্যাতী স্বরূপ এককর্তা বলিতেছি; বলিতেছি
এই—আমি মিসেসেরই বলিতেছি যে, এই
রূপের ভ্রম এক আকারের ভ্রম-ভ্রম বিশেষ
রূপে প্রচলিত আছে, বাহা এতদংশীয় আইনের
দ্বারা বাদে শাসিত হয় না।” (এই সময়ে
শ্রোতৃগণের বহিরা উঠিলেন, “মহালালজী।”
“মহাপাপ।”)

“হা, মহাপাপ তাঁতে আর সন্দেহ কি থাকে
ইহা তোমাদের আইন-অনুমোদিত বিধি-পত্র কি
এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের আর একটি অনিষ্টের
বিষয় আর অধিক উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না;
কিন্তু সে অনিষ্টটাত মহা-অনিষ্ট। ইদপাতাভারের
কাণ্ড উপলক্ষে আমি সর্বদাই সেবিয়া থাকি যে,
এই স্বাধীন দেশের দুঃখীয়া দুঃখীরূপ তাঁহারের
স্ব স্ব শরীরের দ্বারা কোমল আত্মবিশ্বাস অশ্রমে
এমন ভাবহ অনিষ্ট সংশোধন করেন যে, তাহা
বলিবার নয়। যদি এমনিভর পৈশাচিক ব্যাপার
আপনাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক আইন
দ্বারা যেরূপ অসম্মোদিত হইতেছে, এইরূপ আরও
কিছুকাল হয়, তাহা হইলে, আমি দিবা-চক্ষে
দেখিতেছি যে, আপনাদের এই ইংলও-ভূমি প্রকৃত
প্রস্তাবেই প্রেত ভূমিতে পরিণত হইবে; ইহা আর
মহত্বজ্ঞানি বামুদ্বার যোগ্য থাকিবে না।
একবিধ বিশপুত্র ব্যক্তির দ্বারা ক্রমে আপনাদের
জাতীয়তা শরীরের সৌন্দর্য্য অংশ হইবে এবং
আপনাদের পুরুষদিগের বুদ্ধি-বুদ্ধি একেবারে
শোণ পাইবে। আপনাদিগের এই সকল গির্জা-
গণের তোমারা এবং বিবাহ-পত্রের বিঘ্ন
এখনকার এই আরজ্ঞ হইতে আরও অধিকতর
জরজর প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কিছুমান সন্দেহ
নাই।

“তা, বজ্রবর্ণ। স্বাধীন-দেশের স্বাধীন
জেনোনাগণ। আপনারা কি কখনও এ সকল
তত্ত্ব মনোযোগের সহিত ভিত্তি করিয়া
দেখিয়াছেন? এই মিসেস ম্যানিং ও মিসার
মালবার্গার বাহ্যিকের কি কখনও চিত্তা করিয়া
দেখিয়াছেন যে, কিরূপ আপনাদিগের তথা-বর্ণিত
স্বাধীন-সমাজের এত দুর্গতি এবং কিরূপই বা
আমাদের ক্রীতদার হিন্দুসমাজ ঐ সকল দুর্গতি
হইতে বহুদূরে অবস্থিত রহিয়াছে? “
“অমল কথাটা আছে এই যে, হিন্দুসমাজ
অতি কঠোর ধর্ম-নীতি দ্বারা দুশাসিত। ধর্ম-

নীতির অবতার ব্রাহ্মণের হস্তে সমাজের শাসন-
ভার। বর্তমান কালে ব্রাহ্মণ অশ্রমকৃত
দুর্গতি হইয়াছেন বলে, কিন্তু আপনার দেশে
সদ্যচার এতাপুণ ব্রহ্মপুত্র বহুমূল হইয়া রহিয়াছে
যে, তাহা উন্নয়ন করা হিন্দুসমাজের পক্ষে
একেবারেই অসম্ভব। যে সকল বিপুল শাসিনারা
“সুইনাইন-পেমারী” এবং “ববার পিকিভারী” দ্বারা
নিরাপন্ন করেন, তাহা অসম্মোদিত নিষিদ্ধ হয়,
আন্তঃ-সংঘ, উপবাস এবং অশ্রমপোশেণ ন্যূনা।
আপনারা, আমি ভরসা করি, অসুখী পিতার
করবেন যে, আন্তঃ-সংঘ লোকত এবং দর্পিত
উভয়দিকেই প্রেত।” (মহাবল।)

“হিন্দুরা একবারের অধিক এবং একের
অধিক কদাচ বিবাহ করেন না। আমাদের
পুরুষগণও আশ্রম একপত্নীক। হিন্দু-মহিলা,
ইংরেজ-মহিলা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসভাজ;
পরন্তু আমাদের পুরুষগণও অধিকতর মর্দপায়ণ।
আমরা “প্রেম” বিষয়ে বেশী লেখা পড়া বা
কথা-করা, করি না; কিন্তু কাণ্ডে আমরা তাহার
মানন করিয়া থাকি। আমরা অস্বস্তি অতি গুরু-
আমাদের গৃহস্থালীতে নানান অভাব, কিন্তু আমরা
আন্তরিক হই, মতভার ও মিষ্টকথায় সব অভাব
মুগ্ন করিয়া থাকি; সেইজন্যই হিন্দু-সম্ভার দুর্গ
বিশেষ। তা আমরা যে বড় গরিব হইয়া
পড়িয়াছি, সে পৌরষী আমাঙ্গের ব্রিত্তি
গর্ববোধেরই বটে।

“আপনারা দাস দাসী-স্বত্বকে বড়ই চণা
করেন। থাকাই উচিত; কিন্তু আপনারদের
শৌর্য্য অবিবাহিতাণ ক্রীতদাসী-অপেক্ষাও
অধিক এবং ক্রেশকর জীবন বহন করিয়া থাকেন।
পঞ্চাশত আপনাদের বিবাহিতাণের বেজার রূপক
বিগানিনী। আমাদের দেশে কিন্তু তাহা নয়।
আমাদের স্ত্রীপুত্র দাসীও নহেন, বিগানীও নহেন;
তাঁহারা প্রকৃত স্বত্ববিশ্বী। তাঁহারা আমাদের,
আন্তঃসংঘের এবং অনাকাঙ্ক্ষার স্বত্বাচার।
তাঁহারা আমাদিগকে দুঃখের ঘর এবং দুঃখের
বিশ্ব প্রদান করেন; জীবনসংগ্রামে সর্বশক্তি
সহায়তা করেন। আমরা মায়িক মন টাকা
হইতেও দুঃখ সম্ভার চলাইয়া থাকি। কিন্তু
আমাদের কথা তাহা পারেন না। ইহার কারণ
কি? কারণ এই যে, আমাদের গুরু-কর্তৃপক্ষ
লক্ষ্যপূর্ণ; আন্তঃসংঘে একান্ত আত্মা।

তাঁহারা পাবাদাশ পাঠ করিতে জানেন না বটে;
কিন্তু তাঁহারা সত্য, সাদী, শেখলী, প্রেমিকা,
মর্দপায়ীরা। হিন্দু-স্ত্রী—দুর্গতি, পদ-পলিতা
নহেন, তাঁহারা সম্ভার সর্বস্ব-সর্বস্বী, তাঁহারা
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে, আশ্রয়; তাঁহারা পবিত্র
একান্ত প্রাণেশ্বরী। রমণী, হিন্দুর নিকট শৈবী,
ক্রীতদাসের প্রতি একটি তৃপ্ত উল্লিখ করাও হিন্দুর
চক্ষে মহা পাপক। ইহাচারে আপনারা দুঃখী
লউন, হিন্দু-স্ত্রী কি প্রকার সম্মানীয়-পদ-পলিতা
না জানিতা, না তাঁহারা তাঁহাদিগকে পদ-পলিতা
মনে কল্পা—ছি ছি আপনাদের কি মহাভক্তি।

“এখনও বিধবা ও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একটা
কথা। তা দেখুন। হুমারী যখন একান্তই বা
পাওয়া হইবে, তখন না ছাড়, আমরা বিধবা-
বিবাহ করিব। কিন্তু অশ্রমকৃত্যে কদাচ উচ্ছিন্ন
ভ্রমণ করিব না।

“কিন্তু দেখুন। আপনাদের আমাদের বিধবা-
দিগকে রেক্স পদ-পলিতা, চাঁচকালীয়া জীবনে মনে,
বৃত্তত তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহারা হিন্দু-
সম্ভারের সর্বস্ব-সর্বস্বী। সুতবে, সম্ভারের সন্তান।
পরন্তু তাঁহারা সাধারণ-দেবী-স্বরূপে পুজিত।
পাতিভ্রতা এবং ব্রতনিয়ম-পরায়ণতা তাঁহারা
প্রকৃতই শৈবী-পদের বাচ্যা। ব্রহ্মচর্য্যের যে
বিঘ্ন হইত, তাহা তাঁহাদের আছে; তবে
পবিত্রতায় পতি-বিয়োগ-জনিত দুঃখ, মর্দপায়িত্ব
মর্দপায়িত্ব, তাহাতে তাঁহারা দুঃখিনী বটেন;
কিন্তু কেহও ইহাফলে নিষিদ্ধ হইয়াও কোন
উপায় নাই; আর ঐ সম্ভারের কেই বা সম্পূর্ণ
স্বত্বী বহন দেখি?।

“এমন সভ্য-সম্ভার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এক
আধ কথা কহিয়া, আমি আমায় বক্তৃতার
উপসংহার করিব।

“এ সভায় অনুপস্থিতা আমরা মহিমা-বহু-
দিগের সকলেই সম্যক অর্কাবে জানেন, প্রথম
কি প্রাথম বক্তা। আপনাদের মধ্যে অনেকেরই
আশ্রম প্রবেশ পড়িয়াছিলেন এবং সকলেই পতি-
প্রেমের পরিত্যক্তা এবং প্রবর্তায় বিমুগ্ধ।
প্রেম-পতিভাগ্যের নিকট প্রেম কি লজ্জা তাহা
আমরা মাথায় করিয়া বসাইতে হইবে না। এখন
জিজ্ঞাস্য করি, প্রেমাপন্ন পতি-বিয়োগ-জনিত
দুঃখ ভোগ কল্প অশ্রম-অধিনারী সুতবে, ঐ
সংজ্ঞণে যুক্তকর মনে করেন না? হাঁ। অবশ্যই।

করেন, তাহাতে মন্থেই নাই। আপনাদের মধ্যেও ত অনেক কথোপকথন। প্রেমিকা পত্নী “প্রজ্ঞাতিক আনন্দিত” পানেন প্রাণত্যাগ করিয়া, পতিব্রত অমর্যবণ করিয়া থাকেন। এই অমর্যবণের নামই সত্য-সমর্যবণ। মতীপণ আমোদের সর্বশেষ পূজনীয়। “আমরা সহস্রা সতীদিগের পূজার্তন করিতাম, আমরা তাঁহাদের প্রভিমুখি স্থাপিত করিতাম। আমরা বলপূরক ভাষাধিককে চিত্ত-আবোধিতা করিয়া দাহ করিতাম না। আমরা তাড়ন বর্ষের কোনকালেই ছিলাম না। যে বর্ষের তাহাদেরই মখে ছিল, গোঁয়ারা এই রূপে মানবিক-জাকিনী মনে করিয়া দাহ করিতেন। হিন্দুর চক্ষে রমণী লক্ষ্যরূপিতী মূর্তি-দেবী। রমণীর দ্বায়ে একটা স্থলের আঘাত কাণ্ড গোঁয়ারের নিকট-মুখ পাতক, তাঁহার। সেই দ্বিগুণিত রমণীদিগের প্রতি অজাত্যার করেন, ইং ও কি ধার। আপনাদের বিধনগণী পুত্র প্রভৃৎ শ্রীকৃষ্ণ দেশাই মহাপ্রব বক্তৃত সমাপ্ত করিলে, রাজকুমারী ইয়ুজিন তাহার অনেক প্রশংসাবাদ করিয়া, তাহার দ্বারা প্রস্তুত সত্তা বিদ্রুত হওয়াতে, তাঁহাকে দ্বন্দ্ববাপ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কুমারী হঠাৎ প্রস্তাব অগ্রহণ করেন। সত্যমণ্ডণী সাগরে দেশাইয়ের গুণ-সংকর করিলেন।

এখন আমাদের দেশের সোক বহুই—বিলতে নারীজাতি বৃদ্ধ ক্রিষ্ট। আপাতত মনোমুগ্ধকর বিলাতি প্রধার, বিলাতিবিলম্বস যিনি বীণা বিলেন, তিনিই মল্লবলেন।

শ্রীচাকুরদস মুখোপাধ্যায়।

তীর্থকাহিনী।

কার কথাই বা বুলি,—কাকেই বা বলি, তনেই বা কে? কখন কালে আইসে—অমুখস্থলে মহাত তাড়ন লশট নহেন বটে, কিন্তু তিনি মিথ্যা-সোকদ্বার, জাল-জালকণ্ঠে, যুগ-আদি কার্যে বিশেষ পারদর্শী। কখন কালে আইসে,—কোন স্থলের মহাত সর্গসদৃশমশার, সর্বসদৃশ-সুন্দর, সর্গ-সুন্দর-সমুদ্র খুঁপুস—ইহ-মদ্যারে ইহার নিরুত্ত গোঁড়া মিলে না। ইহ নামে বোলে অম্বলেন সর্বত্রই সমভাবে বিরাজমান।

কাহারও বাড়ী ডাকাইতি করিতে হইবে,—ঐ সর্গসদৃশমুখ মহাত অমনি তাহার সেনাপতি; সুকণ্ঠতার কুলমণ করিতে হইবে, ঐ সর্গসদৃশম-সম্পন্ন মহাত তাহার কর্তা; কোন প্রজাকে-ধর ভাঙ্গিয়া উঠাইয়া দিয়া, তাহার ভিত্তির সর্বাধা বুনিয়ে হইবে,—ঐ সর্গসদৃশম-সমুদ্র মহাত তাহার-অধিকার।

যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই এ ভাব। কন-হুক, কন-হুক,—ভাব কিংবা ৩ শ্রীকৃষ্ণ দ্বায়ের ভূতপূর্ণ বর্ণপতি—যিনি দ্বিতীয় জগদ্বার বলিয়া অভিহিত হইতেন,—তিনি নরহত্যার অধিনেতা দীপান্তরস্বামী হইয়া, জীৱ-লীলা শেষ করেন,—অথচ তিনিই দেবাবিলেন জগদ্বারের প্রধান দেবাবর্ত, অধ্যাক, কলি ছিলেন। বাহ্য হইক, তীর্থ-বর্তিত হনেন ভুবন ভরায়াকে। যুগের চট্রগ্রামস্থ চন্দ্রনাথ মহাতীর্থের বিকে দৃষ্টিপাত কর, সেখানে কলক-কালিয়ার রেখা দেখিতে পাইবে। লক্ষ্মিচরণে, মাজাঙ্গি প্রলেপের অন্তর্গত বিপুলবিভবমণী অনন্ত রত্নের জুবীধর, আজ সেই ত্রিপতির মহাত কোথায়? তিনি আজ রাজসংকে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে কালান্তিবাধিত করিতেছেন।

আজ কানীয়ার মেন বাহগ্রস্ত শশধর; ত্র-ব-বামে কেবল হাফাকার; প্রায়ে কেবল সূত-ন-মার। চারিদিকের অবিভক্ত দেখি-নো চিত্তকর। পাণ্ডারের উৎপীড়নে ব্যাধির অস্তিত্ব। তীর্থ-স্থানের সাত বৎসরের বালকটি পর্যন্ত বিষম দুরন্ত, বাইসবিলে।

ভাল পাণ্ডা যে নাই তাহা আমরা বলি না,—কিন্তু অনেক পাণ্ডাই অর্থপিণ্ডিত, নর-রাক্ষস, এবং ক্রমিকভাবে অশেষাৎ ও অধর। তাহার। পৈতা-ধারী বটে, কিন্তু সে পৈতা, ব্যাধিদের গলায় কাঁদি দিবার জন্য।

সকল ব্যাধীই যে, ভূতভোগী,—তাহা নহে। ভাল-মাহুৎ নৃতন ব্যাধীর বিপল অধিক।

অথ আমরা পাণ্ডাদের উৎপীড়নে সখসে তিনধানি পত্র প্রকাশ করলাম,—

১ম পত্র।

অনেকেই বিষয়-বিষয়ে দৃঢ় হইয়া, শান্ত-স্বভাবের প্রজ্ঞাপার তীর্থনি দেবোত্তর আশ্রয় করেন। তীর্থের এও যে মাহাত্ম্য, এও যে পবিত্রতা, তাহা

কেবল মাদ্র সমুদ্রত গণিগণের আশ্রয় এবং দৈবতের আবির্ভাব হেতু; শাক্তগণও বলিয়াছেন যে,—পুত্রবাহাদুরাচরণে মলিপত্র তৎবেয়া।

পরিগ্রহাদুনীকাত তীর্থবাসী পূণ্যতা মৃত্যু। ইতি কানীধুও।

ভূমির অনির্গলনীয় মহিমা, জলের অপূর্ণ পাণনাশিকা শক্তি এবং মূলিগণের আশ্রয়,—এই তিন কারণে তীর্থবাসী পবিত্র। হুজুরা তীর্থাদি দর্শনে বিষয়-বিত্রস্ত-চিত্তের শান্তিপ্রদত্তা সন্তু-প-র হইতে পারে; যদিও কালের ভাব্য তীর্থাকর্ষণে দৈবের দুরত্ব উৎপীড়নে, সে সমস্ত সাধ, গুণ ও পূণ্যকর্তি ব্যাধব অন্তহিত হইয়াছেন, তথাপি “কোনো যমানি পূজাতঃ” কলিকালে গোত্রাদির নিমিত্ত হইতেও পাইব।—তীর্থানে উপভূত হইলেই, ভক্তিমান ও অকামান পুত্রদের ইন্দ্ৰিয় সকল অস্বিধ্যর হইতে নিরুত্ত হয়; মন শান্ত ও কলম হয়।

হানাবিজনিও পূণ্য দারিত্রের পক্ষে দৃঢ়িত; কেবলমাত্র তীর্থাদির্শন মাদ্র দরিদ্রের আশ্র-রুতাথ্যতা সম্পাদনেন পাণ্ডা; ইহাই জীবনের মুখ্য কর্ম মনে করিয়া, বিপত্ত আঘাত মাসে আমি দীনভাবনে তীর্থপর্যটনে পিতৃ-প্রদেমে গিয়া-ছিলাম। প্রমাণ্যে ও পিতৃকর্ম সমাধান করিয়া, গৃহবির সার ভগবান বিবেচকেনু প্রিয়জন কানীধামে উপস্থিত হই। তথায় পর্যটনে প্রবৃত্ত হইয়া, দেখিয়া ভগিনী, শান্তি ও কল হুইয়া থাকে, হুজীয়াবশত আমি স্থলয়ের অন্তরে বাসিরে বহু হইতে থাকিলাম। বাহা দেখিলাম, ও শুনিলাম, তাহা চিত্ত করিত্তে, আত্ম কলুজিত হয়। বাহা আমাদের যে কানীধাম দুরন্ত মুক্তির মাহুৎ উপায় এবং মানবের আশ্রয়ণ ক্ষেত্র, তাহা আজ অস্বাভাবিক অসহ্যবাহারের, অর্থাৎ-পার্জনের ও ইন্দ্ৰিয়চারিত্র্যভার কমাড় হান হইয়া উঠিয়াছে। অপরই অনেককে মহাত্মা অধ্যাপি কানীধামে বিলাত করিতেছেন। কিন্তু দ্রাব্যরা আমাদের নিকট ভূগর্ভবিহিত কিন্তু মলুপ হইয়াছেন। ধর্মাল্লগীদিগের মধ্য হইতে উক্ত মাহুৎকর ব্যাধিয়া গণ্ডা দুর হইয়াছে।

সাঁ প্রাণ্য বৃদ্ধার সম্ভার বহন।—কানীধাম হইতে অমোঘ্যাকিমুখে হইরা কলিমান। কানীধ্য বিজুল টুয়েনে উপভূত হইরাবাজাই অমোঘ্যার পাণ্ডার নিয়োজিত একটা লোক তাহার প্রভুকে

তথায় পুরোহিত, বীকার করিবার লক্ষ আমাকে বেলগ বিনয় প্রশর্শন করিয়াছিল, বোধ হয়, আমার। চিরজীবন শিকারিও তাড়ন বিনীত হইতে পাকি না। পিণ্ডে আনিলাম, তাহার নাম বলবেন। বলবেন অশ্রুপার ব্যাধিদিগের সোচের লক্ষ-পণ্ডিতও আনিয়া দিত; মদ্যে মদ্যে তাহারে ভারিবারের কার্য করিত্তে ত্রুটি করে নাই এবং মুহুর্মুহু বলিত যে, “আপনারা আমাদের অমোঘ্যতাব্রাহ্মণ; এই তীর্থস্থানে কলিতে আপনাদিগকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, এক দৃষ্টি তত্ত্ব কিংবা একটা পরমা দিলেও আনন্দে গ্রহণ করিব; আর কিছু না দিলেও অসন্তুষ্ট হইব না। আপন না ইউন, আপনার পুত্র গোত্রাদির নিমিত্ত হইতেও পাইব।—ইত্যাদি ইত্যাদি। বাচ্যাদুর্ঘ্যে প্রকাশিত হইয়া ব্যতিরিক্ত জেলাগণ্যত কোটালীপাড়া ও মুণিকপাড়ের কতকগুলি ব্যাধিগণের অমুগম্য কলম হয়। অতিও তাহার বিনয়ভাষিয়ে মুগ্ধ হইয়া “সৈন্যকালের অভ্যস্ত”

“এ এবং যীরা মুহুর্মুহুভাবী, স এবং মহাত পুত্রিকানীয়া।” এই নীতিপুত্র কবিতাটা জুলিয়াছিল।

পরে বাইতে বাইতে কলিমান, “আজ আমরা হুজ্রাত হইবে। আজ প্রাতকালে দুর্তা নাম স্বরনের ভক্ত কলি। লটি করিব। যার মণ্ডন ভবানু রাজচরিত্ত পবিত্র জগদ্বার অমোঘ্য সর্গার দর্শন করিব।” এইরূপ চিত্তা করিতে করিতে অমোঘ্য-প্রদেমে উপস্থিত হইলাম এবং অপরটা বাহ্য হইয়া অন্যান্য পাণ্ডাদিগের লোকদিগকে উপেক্ষা করিয়া বলনবের নিষ্কিষ্ট পাণ্ডাতে চিহ্নিয়া সমুদ্র অনতিদূরে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডারই পোতালায় যতৈ থাকিবার স্থান নিরূপিত হইল। বোনা ১ টার সময় সমুদ্র জলে স্থান-তর্পণের সমাপন করিলাম। তৎকালে সমুদ্র-তীরের পোতা মল্লবলেন এবং পূর্ববর্তায় স্থলগে বাস্তবিকই স্থলগে আনলের উদ্দেশ্য হইয়াছিল। মধ্যভোজ্য-মধ্যে মল্লবলেন আনিয়া পাণ্ডা ঠাকুরকে লিখিয়া নিবৃত্ত মিমিত আমাকে ঠৈক-নাশ্য বহীয়া গেল। পাণ্ডা দীর্ঘকাল, লুণ ও লিখিত পুঙ্খ বাহাই হইক, তৎকালে তাহাকে স্থলগে ভাবে দেবমুগ্ধিই ভর্মব্যা এগাম করিলাম ও ঐবৎ তাহার আশ্রমস্থানে আসিন উপবেশন করি-

দ্বার, তাহাতে পাণ্ডবভীষ্মের বৈরিকথার সমুদয়
 স্মৃতি চাটাইয়া এছারী রূপক ভূত্বা তথার সমুদয়
 বিলাসনাম। মনোরমধর্মশিখি, একটী মন
 একটী পাচরিকারি—আমি—আমার বিমল-ব্রত
 পড়িলাম। পশাইবার উপায় নাই। দ্বার।
 সেই শান্তিময়ী অর্থোব্যাসদেবী কিল্লিনন
 অন্তর্য করিতেছে। অনন্তর বাহিরে ইহা
 অনন্তোত্তর হইয়া সঙ্গী শিখা, পরিচরিকার
 পার্থক্য ব্যাধিগণকে পোষনে বলিয়া আমি একা
 পলিগে ফইলাম। দেবিলাম, পুনীশে একটা
 বাসনীয় নাই, এতদৈব পূর্ণাচার। তাহার ব্যক্তি
 অথবা আমার অন্তঃস্থ দৃষ্টিতে বর্ণিত
 বিশেষতঃ বৃহদ্রথের শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি চিত্রা করি
 অসম্মান ভয়ে টাংকি-ভুলু মনে করিয়া তথাই
 করিলাম। পথিমধ্যে একজন পাহারাওয়াল
 নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কহায়, সেই বাক্য
 “পাণ্ডবের প্রাণটি টাংকা দেওয়া ব্যতীত উপা
 য় নাই।” উক্ত পাহারাওয়াল আমার
 অতুলপ্রভা। অনন্তর বায়ার আসিয়া পাণ্ডব
 পায়ে ধরিয়া কত অশ্রুপাত করিলাম। বার টা
 দিয়া ফেল মতে বিধার লইয়া সেই বাক্য
 যাপন করিলাম। পরদিন আহারান্তে টেব
 উপস্থিত হইয়া মনে করিলাম যে, “কোনকালে
 হইতে মুক্ত হইলাম, নিবিড় অন্ধকার
 আলোকে আসিলাম, প্রাণ পাইলাম।” হৃদয়
 অন্তর “হু” ইহা চিরপ্রাণিক, “দৈব
 “আমার সেই মধ্যমশ্রেণীর গাড়ীতে যি
 কল্যাণ কল্যাণবাহী হইতুলের হেতুপত্তি অম
 শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রাইর সহিত সাক্ষাৎ
 সংকত ভায়ায় আলাপ পড়িত
 করিত আমার আয়োজ্যাত সমস্ত বৃত্তান্ত
 তিনি “হেহে!” “হেহে!” “শক্তি হৃদয়কে
 করিতে লাগিলেন। ভুলিলাম, পড়িত পাণ্ডব
 মনোঃ শ্রীযুক্ত বিবেকর পাণ্ডাও শ্রীযুক্ত সাহেবদা
 নাথী, প্রকৃত ভদ্র, দায়ালু, ভক্তিভাজন ও
 লাভে সন্তোষী। ইহাদের স্বরেই অনেকক
 বাসনীয় হইয়া থাকে। আমার ধ্যেয় শনি চাপিয়া
 ছিল; তাই আমি সেই পাণ্ডুর পঙ্গবের
 হইয়াছিলাম। পর দিন ৩ মধ্যাহ্নে আমি
 সেই কোটলিপাড়া পাণ্ডবকে ব্যাধিগণে
 মনোঃ তাহাদিগের উপর করিবার উপা
 য়ে ভুলিলাম। মধ্যাহ্ন বাসনীয় হইত

এক
আমার
জিজ্ঞাসা
বিলাপ
নাম
আমার
দেশ
আমি
বন
শ্রুত
পণ্ডার
মত
সে
হুই
জনে
সাবধা
প্রত্যা
বি
তীর্থে
এস
এস
আদাল
গমন
কেন
হুই
দশ
মহা
সমু
নিতা
নিদ্রা
ননি
অ
সকল
ভেজ
ভনি

এক দরিদ্রা অন্ধ বুকা বিলাপ করিতেছিল।
আমার পরিচায়িকা তাকে বোদনের কারণ
জিজ্ঞাসা করিতে, সেই দরিদ্রা অন্ধ বুকা আমার
বিলাপ করিতে করিতে আবেদনের সেই পাণ্ডা
নাম দরিদ্রা কহিল, “আমাদের অন্ধ পাণ্ডা
আমার সর্বনাশ করিয়াছে, আমি এখন কিরূপে
দেখ যাই” ইত্যাদি। দরিদ্রা হৃদয়ঙ্গম বুকা
আমি আরও মর্মান্বিত হইলাম। পরদিন ৩ বুকা-
বন, আসিরা ও তরত হুয়ার ভক্তিবাদী
শ্রীমুক্ত হরগোবিন্দ ব্রজবাবাী ঠাকুরের মুখেও উক্ত
পাণ্ডার ভগ্নের কথা শুনিলাম; তিনিও আমার
সত কতগুলি খাড়ীর হৃদ্যশার গল্প কহিলেন।
সেই হৃদয় পাণ্ডা যে একরূপ কৃত কৃত দীন
হুবা হুস্তি একে অপীড়িত করে, তাহা ঐ ঠাকুরই
জানেন। অতএব যে পাণ্ডবদা আনন্দ
সাধন হউন, যেন একরূপ আত্ম-পিশাচের হাতে
প্রত্যর্পিত না হন।

त्रिजगत्सु सिद्धांतद्वयम् ।

୭କାଳୀବାଟ ଦଳିକାତା

২য় পত্র ।

বিগত ৩১শে আশ্বিন আমি মুন্দের হইতে
তীর্থভ্রমণ-উদ্দেশে বাত্ৰা করি। পথের মধ্যে শ্রীযু
প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত আলাপ হয়।
এসময় বাবু, শ্রীহট্টের অন্তর্গত কনিমগঞ্জ মুনসেফী
আদালতের সেরেস্তাদার। উভয়ে একত্রে পয়সা
গমন করিলাম। পয়সা পরিকিত প্রয়াগী ছিল,
কোনরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই।

এই কৃত্তিক প্রভাতে ৬ কান্দীয়ে আসিলাম।
 হইছে হইবাটা একা ছায়া আনায় ভোঁজ করিয়া
 দশাংকট নামে পৌছিলো। পৌছিলো।
 মহাদেব মিশ্র-নাটক এক হরপ পৌরন্দ্র বুঝা পুণ্ডর
 সমুখে উপস্থিত হইল। সে, দ্বৈতপ্রবৃত্ত হইয়া
 নিভান্ত অন্তরঙ্গ বৎকালের পরিচিত বজ্র হইয়া
 নানাপ্রকার সাহায্য করিতে লাগিল। তিন
 দিন শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তকপ্রসঙ্গ সেন মহাপরমের
 আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রমান্বয়ে কান্দীর কবীর কার্য
 সকল পদ্য পুস্তকভিত্তিক সমাধা করি। দণ্ড
 কোলাসের দিন দণ্ডান্তে বেদনাগ ও হর্ষোদাশ
 ভনিয়া জীক সর্ষক বোধ হইল। ৬ প্রয়াগদশ

বাইবার আমাদের সন্তান ছিল। বিজ্ঞান-দর্শনীর
 রাস্তাতে আমাদের বাওরা ঘিরে হয়। আমরা
 যে কয়েক দিন কীভাবে হুজিলাম, সম্ভবতঃ নিজ
 বেনে-পোনেদের মতো আমাদের সঙ্গে থাকিয়া
 সকল শেখাবার প্রশংসাদি করে; সকল রকম কাহা-
 ফরাসা, বাতী; আমরা যা চাই, নিজ হাতে
 কিনিয়া আনিয়া দিয়া, পরে মুখ্য লোক একরূপ
 পরিশ পর করিয়া দেয় যে, কাশী শোকেও তুলত
 বলে। যাহাতে আমাদের ব্যয় বেশী না হয়,
 কেহ না ঠকয়, কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তদ্বিষয়ে
 সে পোষণিত সাহাবানতা দেখাইতে লাগিল।
 তাহাকে আরোও বড় বিশ্বাস হইল। বিজ্ঞান-দর্শ-
 নীর রাস্তাতে আমরা প্রয়াণ থাকা করি। মহাদেব-
 আমাদের সঙ্গে থাকিয়া হুজুর হতে কাঁচ করিতে
 লাগিল। কিন্তু কাশীর ষ্টেশনে, ষ্ট্রিক্সের শোক,
 মহাদেবকে আমাদের নিকট দেখিবামাত্র, এরূপ
 তড়ান করিল যে, মহাদেব অর্থাৎ আমাদের কাছে
 আসিতে পারিল না। পুলিশ একরূপ এক শো-
 টার বিষয়ে আত্মনিগূঢ় সতর্কী করিয়াছিল;
 কিন্তু আমরা মোহাক্ত-গ্রন্থক জিহ্বা বুঝিতে
 পারিলাম না। মহাদেব বাসীর আদায়, তাহার
 জন্ত এলাহাবাদের টিকিট লইবার নাম আমরা
 হাতে নিলাম। আমরা তাহাকে টিকিট কিনিয়া
 দিয়া, সঙ্গে লইয়া, এক্সপ্রেসে ৮ই প্রাতে বেশী-
 মাথের বাটে যাবাবি নাম, তপশী, পার্শ্ববাসিনী
 করিলাম। আমরা ইচ্ছাপূর্বক সম্ভাব্যের
 সহিত একত্র ৫, ১ টাকা সমরকর্ম দান করি।
 রানও প্রাক্ত করিতে বেশী ১টা হয়। তাহার
 পর বেশীমাথ দেখিয়া রাস্তিতে ষ্টেশনের নিকট
 থাকিব,-এই কথা মহাদেবকে বলায়, মহাদেব
 অগ্রহণ করি। হইয়া পণ্ডপ্রশংক হইল। কলীবায়ে
 আমাদের সঙ্গে মহাদেবনিগূঢ় এক প্রসঙ্গ এবং
 তখন ত্রিগোণ আমাদের সম্ভাব্য হইয়; তাহারও
 আমাদের সঙ্গে চলিল। পরিশেষে বেশীমাথের
 মনির, প্রয়াণথাক হইতে এক মাইল হইবে।
 থানিক বাইয়া মহাদেব বলিল, "পাণ্ডার নিকট
 হুজুর লইতে হইবে।" দ্বাদশবা বলিলাম, "আমা-
 শের হুজুরের প্রয়োজন নাই।" তখন মহাদেব
 এগুণি-শুগলি করিয়া আত্মনিগূঢ় এক কীড়
 বগিতে প্রবেশ করাইয়া। আমাদের সম্ভাব্য হইয়া
 একটা ত্রিগোণ সর্বদায়ে হুজুরেরও চিত্তে
 পারিলাম। সে, তাহারও বসি, আত্ম উঠি লো-

শুভাংগু হইয়া প্রস্থান করে। যথার্থে তাহাদের সুসম্বন্ধে যায়। আবার তখন পর্যন্ত মহাদেবকে তিনিতে পারি নাই এবং পূরিবামে বিপদও বৃদ্ধিতে পারি নাই। তাহাদিগকে বুলিয়া লইয়া, জুলাইয়া, মহাদেব পৌঁছে ফিরিয়া আসিয়া মহাদেব কান্দিগকে আমাদের আজ্ঞাবহ বিধাসী বন্ধু—তখন পর্যন্ত সে জন আমাদের যায় নাই; স্বকৃত্য পুনরায় মহাদেবের সম্মুখ হইল।

কিঃ পাতার বাটার নিকট উপস্থিত হইয়া মহাদেব বলিল, “এ পাতার বাটার চান, হুকল না লইয়া বাইতে পার কি?” একথা বলিয়া মহাদেব নিকটস্থ হইল। অমনি আর, মাত জন পাণ্ডার ওগা আসিয়া আমাদের দিকে বেরিল। অত্যা পাতার বাটার ভিতর গেলেন। পাতাকে সাবান ধোই। পাতা প্রহাণ্ড, চান্দা, পূর্ণিম হস্ত; হলে স্বর্গের বহুস্বপ্নের হার। সে ভীম মুহুর্তে আসিয়া আমাদের দিকে বলিল, “হুকল নেও বাবা।” আমরা বলিলাম “আমরা গরিব, কুমত নাই যে, টাকা দিয়া হুকল লই।” তখন সেই বিভীষণ পাতার পদপ্রান্তে পড়িয়া ভয়ে কান্দিতে কান্দিতে অব্যাহতি চাইলাম। পাতা এই মর্মে বলিল, “সোহোয়া সেই বাবা; বাইসে ডোমনতোক মেরা পা খুঁচা কিয়া হায়, রেগোরা নেই—মেরে মেরে তো, তোমালোককা হাম পা পূলা করকে ছেড়েছি।” বিব্রত তখন দেখা দিল। পাতার ওগারা বলিল, “তোম লোক রেগোলা না সেও, তোমালোক মূল্যবানকা পয়সা।” কি কির। আমরা নিকট তখন মুহুর্ত পর্যন্ত ট্রেন ভাড়া পাঁচ টাকা ছিল। পাতা এই বহুদ মিয়া চলিয়া গেল যে, “কি আদমকা পাম দশ দশ রেগোরা শেক ছেড়ানা, বহু-তলক সিংহ না ঘোর, উঠাওকে রাব।” আমাদের সকলকে জুজ জায়ায়া সমাইল। ওগারা আমাদের সঙ্গে অতিরিক্ত টাকা ছিল না। আমরা কেবল নিরাশ হইয়া অধ্যবসায় নিকট সকাভরে কর্তব্যেতে উপস্থিত বিদগ্ধ হইতে উদ্ভার প্রার্থনা করিলাম। ক্ষমের জলে সকলকে ভাসিতে লাগিলাম। পাতার ওগারা নানা করমে ডন আরম্ভ করিল। আবার সেই বিভীষণ পাতা বহু-কিরে আসিয়া ওলিল, “কেওরে, সিংহ হুই।” ওগারা বলিল, “মহাছে—টোপো নেই।” আমাদের দিকে তখন বাটার বাহিরে পয়সা ধারে বসাইল। আমাদের জয়াদি পাতার

বাটারে রহিল। কান্দোকেরা কান্দিয়া সোর পোশ করিয়া ওলিল। তাহারা ভয়ে এ টাকা পর্যন্ত ম্রিতে চাহায়, তাহাতেই সম্মত হইয়া তাহাদিগকে এক একটা মস্তপাঠ করাইয়া, পিঠে চাপড় হারিয়া বিদায় দিল। কিন্তু প্রথম বাবু ও আমার টাকা পৌঁছেছিল না। প্রথম বাবুকে উঠাইয়া লইয়া গেল। প্রথম বাবু বাইবাঁকালে ভয়ে আসিল। মহাদেব বলিল, “প্রথম বাবু ত্রীর জন্ত যে কান্দিতে আমাদের কাপড় বিনিয়াছে—সেখানি দেখা।” ওগারা অনেক কষ্টক্লিতে প্রথম বাবুকে তাড়না করিতে লাগিল। প্রথম বাবু ৭ টাকা মরদ এবং ৩২ টাকা মূল্যের সেই বারানদী-সাঁড়খানি দিয়া অস্বাভাবিক লাভ করিলেন। শেষে আমার পাতা। আমি কখনও একবার বলি, “যদি কখনও হাম দেন—হরকা করেন; তবে এই সংবাদ সংবাদপত্রে ছাপাইয়া হইবার প্রতিকার করিব।” এই কথা মহাদেব শুনিয়া পাতাকে বলে। পাতা ভীমমুহুর্তে তখন তখন কান্দিয়া বলে, “এই শানা বন্ধন্যাকা টাই করে।” তখন আমাদের পেছনমোড়া করিয়া বাঁধবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। আমি নিরুপায় হইয়া সেই বিভীষণ পাতার পায়ে ধরিয়া কান্দিতে লাগিলাম। পাতা, পা কাঁদিয়া আমাকে ঘুরে ফেলিয়া দিল। শেষে পাতা বলিল, “বেশী টাকা না থাকে, তোর কাছে অজ না বা জিনিষ আছে যে।” চারিখানি কাপড়, একটা তোরঙ্গ, একটা খটা এবং ট্রেন-ভাড়ার সেই মরদ ৫ টাকা, দিল। আমরা পোতার তোরঙ্গের চাকিটাকা বিপা দিলাম। একজন ওগা আসিয়া পোতা হইতে চালি বুলিয়া লইল। আমি একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহিরে আসিতেছি, আমার কাঁদি একখানি পামছা ছিল। হঠাৎ দেখি হইতে কে একজন আসিয়া আমার কাঁদি হইতে পামছা উঠাইয়া লইয়া গেল। আমি মনুষ্যের নাম জপ করিতে করিতে জুতপরে পলাইয়া ট্রেনে আসিলাম। হাতে টাকা নাই। একজন ডল্লোলাকে আমার অভ্যন্তর কথা কতক বলিলাম; তিনি বোধহয় আমাকে জুয়াচোর মনে করিলেন; কারণ, তীর্থস্থানে এমন অনেক জুয়াচোর থাকে, বাহারা হইলেন বলে মিছামিছি পয়সা দিয়া কান্দিয়া থাকে। বাহাউক, বহুকেই একজন সজ্ঞান সহযাত্রীর নিকট হইতে কান্দি আসিবার রেলভাড়া



দার করিয়া লইয়া, কান্দিতে শ্রীমুক শ্রীমুকপ্রদ সমন মহোদয়ের বাসায় আসিলাম। আমার পিঠের সাধারণকে দিবার আবশ্যকতা নাই। আমি যুদ্ধের বাকি—মূল চাটুর করি।

শ্রীঃ—

৩য় পাত্র।

এখনও হুইচাড়ির এলাহাবাদের প্রয়াগী-পাতার অত্যাচারের কথা ভুলিলে মস্তশরীর নিহরিয়া উঠে। গত ২১ শে পৌষ দ্বারাগঞ্জে কলক পাতা মনসমিহ নিরাশ হইলেন পুরুষ ও এক জন বুঝাকে একটি বাটীতে অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের নিকট ২৫ টাকা করিয়া বন্ধন্য চাহে; কিন্তু তাহারা উইঠর প্রাণ-বন্ধন্যের পদে পুষ্ঠিত হইয়া কহেন, “মহাশয়! আমাদের প্রাণ অত্যাচারে নহে যে, আমরা এক এক জনে এত টাকা দানিয়া বিধি।” কিন্তু সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাহাদিগের বস্ত্র উন্মিত করণাত না করিয়া, তাহাদিগকে এই বাটা মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া দুইজন অশ্রুচরকে তাহাদিগের প্রহারা রাখিয়া চলিয়া যায়। ইত্যবসরে তাহাদিগের মধ্যে এক জন যাত্রী কোন ভাপ করিয়া বাটা হইতে বাহির হইয়া, প্রাণপদে মোড়িয়া বাইয়া, ভীতী-টাকিকম্পপারেতেও আঁকিদের মস্তবর জনৈক কর্তৃত্বার মরণ, লইয়া, কান্দিতে কহিলেন, “মহাশয়, আমাকে রক্ষা করুন।” উক্ত কর্তৃত্বার মহাশয় তাহার সমস্ত কথা নয়া বিশ্বাস হইয়া, তাহার হুই জন বন্ধকে সঙ্গে লইয়া, রিমন-হলে উপস্থিত হইয়া দেখেন,—একটি বুঝা ও একটা পুরুষ বসিয়া কান্দিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তোমাদিগকে সেখানিয়া আনিয়াছে?” তাহাতে তাহারা উত্তরে কহিলেন যে, “প্রয়াগ-ওগারা তাহার এই দুইজন চাকর।” তাহারা চাকর দুইজনকে সেখানিয়া দিলেন। উক্ত বাবুটী চাকর দুইজনকে কহিলেন যে, এ সমস্ত বিষয় আমি পূর্ণিশের প্রধান কর্তৃত্বার সাহায্যকে লিখিয়া পাঠাইব। তখন একজন চাকর তাহাদিগকে লইয়া “বাবুজী! অব্ধি হুইলোমোরকে মাক কিজিয়ে।” পরে বাবুটি উক্ত ভিন্দন লোককে নিষ্ঠুর দিগের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া ঋণান বাটীতে লইয়া গেলেন। তৎপরে তাহাদিগকে রেলপাটীতে লুইয়া দিবার সমস্ত বন্দপ করিয়া দিলেন।

সমুদ্রে মাঝমেলা আসিতেছে। তাই আমাদিগের মনে নানা একার আশঙ্কা হইতেছে। এখানিসকর পুলিশ-কর্তৃত্বার মহাশয়দিগের নিকট আমাদের প্রাণ-এই নিম্নদেশে যে, তাহারা যেন এই সমস্ত বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখেন। মধ্যে একপ অস্ত্রসচাচার ছিলনা; কিন্তু অল্পকাল আবার এইরূপ ব্যাপার ভদা বাইতেছে ও দেখা বাইতেছে। পুলিশ মনে করিলে, এই সব অত্যাচার নিবারণ-হুচক মোটামুটি বিধি ভাষার ছাপাইয়া। হানে মানে লটকাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক দুষ্ট প্রাণওগারা ভীত হয় এবং বিদেশীয় লোকপণকেও ওরূপ অত্যাচারিত হইতে হয় না।

ত্রীপরমানন্দ চক্রবর্তী। এলাহাবাদ।

জমজুমির বহল প্রচার-বলিয়াই, এই তীর্থ-কাহিনী জমজুমিতেই প্রকাশিত হইল। যদি প্রত্যেক বড় জমজুমির আঁট জন করিয়া ব্যক্তি পড়েন, তাহা হইলে জমজুমির পাঠক হইলে, লক্ষ শেকের কম নহে। অনেকে পড়িবেন, অনেকে জানিবেন, অনেকে সাবধান হইবেন,—এই আশা-তেই এই “তীর্থকাহিনী” জমজুমির কলসার পরিকৃত হইল।

একাত্তরকানন।

কান্দিয়া আমাদের প্রেতভূত পূর্বক্ষেত্র। এই মুক্তিপ্রদ তীর্থের মায়াট, অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় অবধি বিশ্বসম্মান-মায়েই অবশ্যিত আছে। নেবাদিগের মহাদেবের লীলা-জুগ কাশীধাম ধর্মিণে অনেক পুণ্য লাভ হয়; এই মানে যেই শিসর্জন করিলে, মানব শিবব লাভ করেন; ইহার মায়াও অব কলিলে, কোটি-জ্যাক্ষিত পাণ পূর হইল। সকল পুণ্য-উপপুরায়েই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু মায়েই তাহা মাত ও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই ভারতভূমে কাশীধামসমূহ অপর একটি পুণ্যভূমি আছে। যে স্থান পূর্বকালে “হিত্য কান্দিয়া বিখ্যাত হইল; কান্দিয়া-পরি-তাপ করিয়া যে মনোরম স্থানে আসিয়া মহাদেব অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই হিত্য কান্দিয়া বিষয়

অমর কাহ্ননে অবগত আছি? সেই হর-পার্ষ্ণী তার সীলভূমির পূবাংকণ অবগত করিতে পারেন? হিন্দুর ধর্মে না অভিল্যাপ জন্মে? তাই, স্নান আমাদের সেই পূবাংকণের মাথায়া বাধায়া সমগ্র করিয়া আমাদের পরম হৃদয় পঠিকবর্ণকে অর্পণ করিলাম। এখনে হয়ত পঠিক মনোবশ 'ছিত্তির কাশী' নাম শুনিয়াই 'হাসিয়া উঠিবেন; হয়ত লেখকের এই অসম্ভব কথা শুনিয়া ঠট্টা-বিদ্রুপ করিবেন। আবার স্নানাদেশও ও ভয়, পাছে শিবসিদ্ধ গড়িতে গিয়া বাসর ব্যক্তিরা ফেলি। ভাতভাতসীমী চিরাঞ্জিভেত পূবাক্ষেত্র বারানসীর মহিৎ অপর স্বানের তুলনা করিতে গিয়া, পাছে উমহাসাশপ হই—তবু মনের কথা চাপা রাখিতে পারি না। ধার মন্দির। কীর্তন করিতে উৎসুক, এখন ভিত্তি এককল্প ভাঙ্গা।

সেই কাশীসমূহ পূবাংকণের নাম একাক্ষকানন। এই একাক্ষকানন কোরিয়া? স্বপ্নপূরণের উৎকল-ধেও নিশিত আছে—
“স বর্ততে নীলগিরিধোজেনেত্র কৃতদাকে।
ইদন্তেকাক্ষকাননং ক্ষেত্রং পৌরীপতবিরহঃ” ১২ অঃ
“চতুর্দশবিভোহং বৈ বৈ নীলমবিশ্রামঃ।
তত্তোত্তরভাগ্য বনমেকাক্ষকাননম্” ১৩ অঃ।
উক্ত প্রায়শ্চর্য দ্বারা জানা যায়িতছে যে, একাক্ষকানন উৎকল দেশে এবং নীলাচলের হই বোজন উত্তরে অবস্থিত। এখন দেখা যাক, এই 'হানের একপ নামকণ' হইবার কারণ কি?

“কপিলসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—
“একাদশগুপ্তরাসীং পুরাকালে তু মুক্তিবনঃ।
তত্র একো বসতস্নানস্থানেকাক্ষকাননং বনম্” ৫৫
মহোজ্ঞাঃ পূষাবী চ নববিজ্ঞানমগরঃ।
বর্ষাশ্রীমাংগকন্যাক যত্র বৃকে স্মরণমিহ ৪ ৫৩
তং বৃক্ষং পৌনঃপকিক চকার স্মরণশনঃ।
তত্র মূলং মহেশ্বর তমাস্য ধ্যানভিত্তিমিহ” ৫৭

১০ অধ্যায়।

পুরাকরে সেই স্থান মুক্তিবানক এক আয় বৃক ছিল। সেই বনে কেবলমাত্র একটি আয় বৃক

হয়—

“একাদশগুপ্তরাসীং পুরাকরে বিজ্ঞাতমঃ।
নামকৃত্যৈব তং ক্ষেত্রমেকাক্ষক ইতি স্মৃতম্” ৫৯

৩২ অঃ, ১২ শ্লোক।

থাকায়, তাহার নাম 'একাক্ষকানন' হইয়াছে;—
—এই বৃক অতিশয় উচ্চ, যখন শাখাবিশিষ্ট এবং নরকম বিশাল ও গম্ববশোভিত। তাহার কল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ভুগ্ন হল-প্রদায়ক। সেই গোপনীয় বৃক স্বয়ং মুরারি বধি করিয়াছিলেন।

এখন একাক্ষকাননের ভূমি-প্রতিমান এবং চতুঃসীমা নির্ণয় করা আবশ্যক—[কপিলসংহিতার মতে, ইহার পূর্বপাশ এককোষাক্ষকানন—
“মমস্তাং জ্যোতিষগে চকোটিলিঙ্গারুতা মূহী” ১১৩
একাক্ষ-চন্দ্রিকা-নামক একধামি আধুনিক মন্তব্য প্রদেয় মতে—

“ক্ষেত্রস্ত মূলধিকৈ চ পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
জ্যোতেশন ওজলকাক্ষং সূচ্যং—ক্ষেত্রপ্রাথমিকম্”
ক্ষেত্রমেতৎ সমাধিতং চতুঃকারণং শুভং সুখং”

কিছু একাক্ষ-চন্দ্রিকা এই স্থানের বৈদ্রুপ চতুঃসীমা নির্ণয়িত হইয়াছে, তাহাতে ইহা এক কোষ বিদ্রুপ বশিষ্ঠ বীকার করিতে হয়।

“শুভাচলং সমাস্তায় স্বাস্তেতং সুওলেবধঃ।
আসাদ্য বারাহীদেবী মধিরেখবরাধি”

শুভগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া সুওলেবধের মধির পূর্বভাগ এবং বারাহীদেবীর মন্দির হইতে মধিরেখবধের মন্দির অবধি মণ্ডলাকার ভূমিই একাক্ষকানন।

স্বপ্নপূরণের মতে, এই একাক্ষকানের অপর নাম শান্তবনক। পুরাকালে ভগবান শঙ্কু এই এই ক্ষেত্র নির্ধাণ করিয়াছিলেন—

“বর্ষমেতৎ পুরাক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্দিষ্টম্।
তত্র সাক্ষ্যকাননঃ স্থাপিতঃ পরমোস্তি।
যদেতস্ত্যস্তাংগং ক্ষেত্রং তমস্যা নাশনং পশম্”

উৎকলগুণ ১০ম অঃ।

এই স্থানে ভগবান ভুবনেশ্বরের লিঙ্গমুক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এই লিঙ্গের নামাহ্বাসের সকলেই এই পূবাংকণকে 'ভুবনেশ্বর' বলিয়া থাকেন। এখন এই স্থান পুরীজেলার অন্তর্গত এবং ২১৩৫৫ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৫২২৫ পূর্বদ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এখন দেখা যাক, এই লিঙ্গ ভূমিধর্ম পূর্বকালে কেন বিখ্যাত হইয়াছিল, কেনই বা কাশীসমূহ বলিষ্ঠ আধিত হইত? ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।



স্বপ্নপূরণের উৎকলগুণে এইরূপ বিবরণ উক্ত হইয়াছে—

“পুরাকালে ভগবান দেবাদিগণের পার্শ্বতীসহ বংশাশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। দেবী নিত্য, নিত্য অভিনব আয়োনে-পতিবে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। একদা কয়েক জন পুরোহী, দেবীকে সন্মান করিয়া কহিলেন, মতি। ভূমি অতি সৌভাগ্যবতী, তোমার বৃক পতি বৃকবধি পরিচাল্য করিয়া যৌবনকালী তুমোর। তাঁহার কামিনীর মতি নিয়ত বশ করিয়াছেন। তাঁহার কোন ভাবনাচিন্তা নাই, স্বতন্ত্রের আশ্রয়ে থাকিয়া ইচ্ছামত বেবেগার উপভোগ করিতেছেন। কবে তিনি নিজ গৃহে গমন করিবেন? তখন পার্শ্বতী উত্তর করিলেন, আমি শুভভাগ্য বরং সেই নির্দল নির্দল বৃককে লাভ করিয়াছি। রাত্রি আসিলে, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে পারি না, তাই তিনি এখানে আছেন। পার্শ্বতীর মাতা কহাকে সন্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎসে! তোমার পতি কখন গুণ আছে যে, শুনে পতির প্রদান লাভ করিবার স্বত এত ব্যগ্র? ভূমি বসনভূষণে অসম্মত হইয়া আমার গৃহে অবস্থান কর।

পতিনিজা ভাষিয়া পতি-মোহাদিনী মতী পতির নিকট আসিয়া কহিলেন, স্বামিনী! তোমার আর স্বতলাগ্নের বাস করা উচিত নহে। (চিরকালই কি এখানে থাকিতে হইবে?) তোমার বামাংগা স্থান কি স্বগতে নাই? দেবীর কথায় মহাদেব সকলই সুবৃত্তে পারিলেন। তখন উভয়ে বৃককে আরোহণ করিয়া মহাদেবেন গমন করিলেন। তৎপরে সর্গভূমি অতিক্রম করিয়া গদ্বার উত্তর-ভাগে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে মহাদেব পৌরীর বাসের জন্য পরম সম্মান প্রদেয়—পরিমিত বারানসী নামক পুরী নির্ধাণ করিলেন।

*** দ্বাপর যুগে এই কাশীধামে কাশীনাথ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি কঠোর তপস্বী রাজা মহাদেবকে ভক্ত করেন। তৎকালে মহাদেব তাঁহাকে এই বর দেনশ্রুত, যুদ্ধকালে যুগে আরোহণ করিয়া কাশীনাথের হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন। *** এক সময়ে চক্রবর্তি বিষ্ণু কাশীনাথের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত কাশীধামে চক্র নিষেপ করিলেন। মহারসবও ভক্তের রক্তার জন্ম প্রমথগণের পরিত্র হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

হৃদয়-চক্র-প্রভাভে প্রমথগণ দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন মহাদেব অকম্পিত ধারণ করিয়া পাশ্চপত অস্ত্র নিষেপ করিলেন। সেই অমোঘ পাশ্চপত সূর্যও বর্ষ হইল, কাশীধাম দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। কাশীধাম ধ্বংস হয় দেখিয়া মহাদেব স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন। তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধার বিষ্ণুসকলগণে আরোহণ করিয়া মহাদেবের সমুপস্থে—আধিকৃত হইলেন এবং শিবকে সন্মান করিয়া কহিলেন, “ধৃক্জিট!” তুমোর এক হৃক্জিট কোথায় আছে? আমি—একজন সামান্য কীট—কীট রাজার হইয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ। আমার কি প্রভাব, তাহা কি ভূমি জান না? মত তোমার পাশ্চপত অস্ত্র হৃক্জিট; কিন্তু আমার জ্যোতস্ব মন্তকে—নিষ্ঠ তুমিও পরিচাল্য পাইতে পার না। আমার—অবলা করিয়া, ‘তুমি তাই’ এখনও স্তম্ভিত হইয়াছ। তুমি কি জান না, স্বতন্ত্র উপজা করিয়া আমার মৌরীস্ব লাভ করিয়াছ? এখন যদি তোমার মৌরীর মহিৎ থাকিতে বাসনা থাকে, যদি বারানসী পুরী চিরকাল থাকিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, আমার আশা, আমার নামে বিখ্যাত স্বক্কেমতমক্ষেত্রে গমন কর। *** তথায় নীলগিরির উত্তরে একাক্ষকানন বনে গিয়া পার্শ্বতীসহ বৃকখল্লে বস কর। বাহুদেশের কথা ভাবিয়া—মহাদেব অবনতশিরে কৃতজ্ঞগুণিতে তাঁহাকে কহিলেন, ‘বেদেদেব জগদাধি! তোমার আশে’ পানন করা শ্রেয়। আমি যুগ, তাই তোমার অপমান করিয়াছি। আমি তোমার আশা শিরোধার্য করিয়া মুক্তিপদ ক্ষেত্রধামে গমন করিব।’ অনন্তর, মহাদেব এই স্থানে আগমন করিলেন। এই স্থান পুরাকালে মহাদেবকর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে সর্গপ্রাণ দূর হয়।

কপিলসংহিতায় এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—
“পুরাকালে জ্যোতস্বগে কাশীস্ব মধের মনিকর নাদকে বলিয়াছিলেন, ‘নাদহ! আর এখানে থাকিব না, এই কাশীধাম শীতাই বিনষ্ট হইবে। এখন এই স্থান জনসংগীর্ণ ও তপোবিধকর হইয়া উঠিয়াছে।’ (ব্রহ্মকোষ) স্থানে বাস করা উচিত নহে।) জাননিহাল নাথিকেরা উপলব্ধি করিতে। ধর্ম আর থাকে না, সকলেই অধর্মচারী হইতেছে। ইতিভাগও এখানে গোপ হইল। পার্শ্বতীর স্বত অভিযে এই পুরী স্থাপন করিয়া

ছিলাম। পার্শ্বতীর স্বচিকর হাং আমায় হৃৎ-
দায়ক বটে, কিন্তু আর এখানে থাকিতে সন
সরিতেছে না। কোথায় পরম স্থান আছে,
এখনই আমায় বল।' নারদ কহিলেন, 'লক্ষ্য-
সমুদ্রের তীরে নীলশৈল নামে একটি প্রসিদ্ধ একান্ত-
পাহাড় আছে। তাহাই উত্তরে প্রসিদ্ধ একান্ত-
ক্ষেত্র। সেই বিহীন বনে অনন্তের সহিত
জগদগুপ্ত রম্যনাথ, 'বাহুবল্লব' নাম বাহুবল্লবক
অবসান করিয়াছেন। সেই- পরমগুপ্ত স্থান
প্রাপ্তপতি, এমন কি, আপনি পর্য্যাপ্ত জানেন না;
সেবতাপসেরও কথাই নাই। জগদাধীর কোলে
বাঁকিয়া ওয়ং লক্ষ্মী সেই পরমগুপ্ত একান্তক্ষেত্র
ঐশ্বর্যত নহেন। জনাবনি সেই স্থানে থাকিয়া
অনন্তের সহিত স্থিতি-স্থিতির বরিতেছেন। সেই
স্থানে -রাম, লক্ষ্মণ, কুমার ও বনরাম সর্বলী
বাস করিতেছেন।' লক্ষ্মী বহনিন-ব্যাপ্তি ত্যাগত,
দ্বারা বাহুবল্লবক ভূট করিয়া সেই স্থান অগত
হইল। আমি, অনন্ত ও জগদাধর, আমাদের
শিব-জনেরই কোলে সেই স্থানে গতিবিধি আছে,
ইন্দ্রাদি দেবগণের কোম সঙ্গর নাই।'

'মহাদেবনারদের কথ্য শুনিয়া, একান্তকাননে
বাইতে উগাত হইলেন। পার্শ্বতীরে, মাল-মজায়
ভুক্তিত হইতে বলিলেন। অনন্তর কানীনা কাশী
পরিত্যক্ত করিয়া পূর্বতীরেই একান্তকাননে গমন
করিলেন। শিব পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া জগদাধর
সম্মেলন করিয়া কহিলেন, 'হে পরমেশ্বর! পুণ্যভূত
স্থলোচন। হে ত্রয়ীমূর্ত্তির হরি! তোমায় নমস্কার।
হে নীল-কীমূত-কলেবর! শৈলোৎপাদক!।
দেবগণের বরদাতা। পীড়িত-ভীত-প্রবলিনী।
একান্তনিবাস পীতাপুর। হে শম্ভুরূপাদিপ-
গাবিনি। তোমায় নমস্কার। কতপাদাশ্রয় ভক্তকো
জগদাধর। তুমিই জগত্তরু আদিকারকের করণ।
তোমার সমস্ত-সমস্ত-রম্য স্থান আছে জানি,
কিন্তু এই একান্তে তোমার গুপ্তরূপ জানিলাম
না। হরি! তুমিই আমায় বখাষিলেন, আমি
তোমার অর্দ্ধ-শরীর, কখন একে কান আমার
পতন্ত করিলে। তোমার প্রিয়ভক্ত নারদ আর
তোমার শর্যা অনন্ত এই দুজনেই কেবল এই
'হৃদয় জানিয়াছে; কিন্তু আমি জানিতে পারিলাম
না। হরি! আমায় প্রতি আশা অহুগুগ নাই।
নাগীময়।' তোমার, নীল কে বসিতে পারে।
তোমার প্রেমভক্ত গোপীপদ অনারহস মুক্তিলাভ

করিল, আর সনকাদি ঋষিগণ মুক্তি লাগসার
অন্যাপি আপনার ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভর করিয়া
রহিয়াছে। পরমেশ্বর। আমায় একবার কল্পনা-
নামে অম্বলোচন কর। আমি তোমার
আরাধে-আসিয়াছি, তোমার এই প্রিয় স্থানে
আমাকেও বাস করিতে দাও। পার্শ্বতীপতি
এইরূপে শ্রব করিল, বিহু চকু মেলিয়া হাতমুখে
বলিলেন, 'শস্তো। তোমার হিতের জন্ম বাহা
বলি।' সন। আমি তোমার হিতের তোমার
থাকিতে দি। কিন্তু তোমাকে একটি সত্য
করিতে হইবে। তুমি শপথ করিয়া বল, আর
কিই থাকিবে না, স্বপনের সহিত এই মনোহার
কাননে বাস করিবে? শঙ্কর কহিলেন, 'কেমন
করিয়া আমি কানীনাথ একেবারে পরিত্যাগ করি
ওঁ? মনোহর যে আমার জাহ্নবী এবং সর্বভূতমী
মহাবর্কিতা বহিরাছে।' বাহুবল্লব উত্তর করিলেন,
'স্বপ্নের; এইখানে আমি। সমুখের পাশপাশিনী
নারী মনিকর্ণিকা বহিরাছে।' আমার আধিকার
আহারই পানিহস্ততা দধা-মুদ্রা নারী জাহ্নবী
নারী প্রবাহিতা হইতেছে। নারদ অথবা অনন্ত,
কেইই হইবার বিষয় অগত নহে। এখানে
আরও অনেক গুপ্ত ভাণ্ড আছে, সে সকলও
এক্ট একে তোমায় বলি। এখন আমার কাছে
সত্য কর যে, এইখানে থাকিবে? শঙ্কর কহি-
লেন, 'সত্য, যথুৎসাহ। সত্য আমি বলিতেছি,
সত্য আমি তোমার কাছে থাকি, আমি পুরায়
সত্য করিতেছি, বারানসী অথবা অপর কোন
দেখণ্ডে আর থাকিব না।' এই বলিয়া শঙ্কর ফিরে
নগেন্দ্রাবাসী লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই
লিঙ্গ-লিঙ্গকসম্বন্ধ মাণিক্যাত মহানীল মূর্ত্তি।
(এই মূর্ত্তি জিজ্ঞাবসনের বা জুবনসের নামে
বিখ্যাত।)

শিবপুরাণে আবার ভিন্নরূপের উপাখ্যান
পাওয়া যায়। শিবপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত
আছে;—
'এক দিন পার্শ্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
প্রভো! এই কানীনাথসমূহ আর কোথায়
আপনার পুণ্যভাণ্ড আছে? স্বর্গে, মর্ত্তে অথবা
পাতালে, যেখানেই বাহুবল্লব অহুগুগ করিয়া আমার
নিকট প্রকাশ করুন। তখন শঙ্কর পার্শ্বতীদেবীকে
প্রোমানন্দে-আমার অঙ্গে বসিয়া হাসিতে
হাসিতে কহিলেন,—'দেবি! তুমি নানা প্রকারে



আমায় পরিভ্রষ্ট করিয়াছে, তাই শ্রাজ তোমার
কাছে পুণ্ডরীক মধ্যে একটি অতিথি-স্বপ্নের
বিষয় বলি। দক্ষিণ সমুদ্রের নিকট মহাকল্প
উর্ধ্বলক্ষ্য ক্ষেত্রে মধ্যে বিখ্যাত-নিমিত্ত একটি
পুণ্যস্থান নারী প্রবাহিত হইতেছে। এই নারী
নাম পদ্মবতী। ইহাই সাক্ষ্য পদ্ম। এই
নারী তীরে পুণ্যভূত পুণ্যক্ষেত্র 'একান্ত' বিরাজ
করিতেছে। এই কানন সর্বৈশ্বর্যমগ্ন, যজ্ঞভূ-
পরিবেশিত এবং কৈলাসের ভায় সমৃদ্ধিশালী;
এখানে অশোক, বহুল, তিলক, কাকিয়ার, চন্দ্র-
উপচন্দন, বিহ, বট, পদম, পিচুর্মদ, আম্র,
আম্রতাক, নারদ, নারিকেল, কোবিদার, পুষ-
কর, শুভাক, কল্যাণী, কদম্ব, চম্পক, কেশর, নাপ-
কেশর, কেশকী, তুলা, আমলক, মাগতী, মাধবী,
জাম্বা, মৌচ, জাতী, যুগী, মরিচা, করবী,
সুহৃৎক, মূল, মল্লার প্রভৃতি নানাবিধ ফুলগাতি
আছে, সকল গুহুতেই এই সকল-বৃক্ষ ফল-ফুলে
শোভিত হইবে। হে দেবি! শুভ, সারী, কপোত,
মহর, টিগ্ৰি, চম্বাক, ঢকার, কলহুট, কদম্ব,
কলহুট প্রভৃতি পক্ষী সকল তথায় ময়ূর গুহে কুজন
করিতেছে। এইখানে স্বল্পমণি সর্বোপর সলল
চাটায়ের দিবা সোপানে অশ্বত্থ, কুমুদ ও
পদ্মকুম্ভ প্রভৃতি হইয়া সর্বোবরের শোভা ঈর্জন
করিতেছে। আমার এই পরমক্ষেত্রে একান্ত-
কানন হুহুধর নগরগণের হস্তাশ্রয়। এই কানন
বারাণসীমুখ কোটি-লিঙ্গ-বিভূতি। কান্যাবি।
তোমার প্রীতির জন্মই এই গুপ্ত স্থান বর্ণনা
করিলাম।' পার্শ্বতী কহিলেন, 'ভগবন! শস্তো!
তোমায় নমস্কার। হে ত্বনমঃশু! আমায় রক্ষা
কর। তোমার মুখে পরম কাহিনী শুনিয়া আমি
বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। নারী তোমার
গুপ্ত বন দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল।
যদি তুমি অহুমতি দাঁও, তাহা হইলে, সেই
পরম কানন একবার দেখিয়া আসি।' মহাদেব
উত্তর করিলেন, 'কি তোমার একান্তই ইচ্ছা
হইয়া থাকে, বহিঃ প্রাপ্তি। সেই পরম
রমণীয় স্থানে তোমাকে একাকিনী বাইতে হইবে।
সেই স্থানে তুমি যে যে রূপ ধারণ করিবে, সেই
রূপে আমিও তোমার সহিত জোড়া করিব।
তুমি অগ্রে সেই পুণ্যক্ষেত্রে গমন কর, আমিও
প্রথমধর্ম পরিত্যক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছি।'
ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া, স্মরণনা দেবী

পার্বতী গিরি-আরাধণ করিয়া একান্তক্ষেত্রে
গমন করিলেন। মহাদেব বাহা বাহা বলিয়া
জিহ্বন, তিনি সেই সমস্তই দেখিতে পাইলেন।
আহা! ষ্মিক-দেবী-সেবিত, নানাবিধ-তত্ত্ব-তত্ত্বাদি
শোভিত বিবিধ-পল্লিমালা স্বকৃতীকৃত ক্রি-
মুগ্ধার। 'দেবী এইখানে যেত-কক্ষ-অঙ্গণ-বর্ণিত
জিহ্বন দর্শন করিলেন। পরে এই ক্ষেত্রে
জিহ্বনবসন-দর্শন করিয়া বিবিধ উপচারে
তীহার পূজা করিলেন। এই নান্দরে 'তিনি
হ্রদমধ্য' হইতে বিনির্গত মহাসমুদ্র পাতী
দেখিতে পাইলেন। ই প্রাতীপন একটি লিঙ্গের
নিকট আসিয়া প্রভূত দ্বার প্রদান করিত। পরে
ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া বরুণলোকে চলিয়া
বাইত। আজ বিখ্যাত-মুদ্রাটোনা দেবী পার্শ্বতী
যতক্ষণ সেই ঘটনা দেখিলেন। শিব এক খটি দ্বারা
ই প্রাতীপনকে তাড়িয়া ত্রিভুবনেশ্বরের নিকট
লইয়া গেলেন এবং জাহ্নবীর দ্বার দ্বারা নিম্ন-
বরকে বান করাইয়া নদ্রন মুদিত করিলেন। এই
রূপে কিছু দিন অভিহাতি হইল। ঘটনাস্থলে
একদিন সেইখানে কাঁড়ি ও বাস নামক দুই জন
অশ্বর আপনান করিল। উত্তর মহোদর রূপ-বৌদ-
নয়ন-গিরি-উত্তমাবিধি গন্ধমালাচর্চিতা হুহুধা
শীতোর-পদোদয়া স্মরণনা। চন্দ্রাননা পোপীপা
দেবী গোষ্ঠীকে দেখিতে পাইল। অজগত
উভয়ে অনন-বশবর্তী হইয়া কৃতান্তলিপিতে দেবীকে
সম্মেলন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, 'হে
চন্দ্রমুখী! মহাপাদারিক! তুমি কে? তুমি গন্ধবী
রাজকন্যা, না সমুদ্রকন্যা? কিংবা কামারিমাছিনী
হুগি? না ইচ্ছের মনোহারিণী শতী? আমার
বিনতি কর, বল তুমি কে? তখন গোপী কহি-
লেন,—'আমি সমুদ্রকন্যা নই, আমি পুণ্যমা-
কল শতী নই, আমি গন্ধবী অথবা কামারীও
নই। আমি একজন রাজকন্যা গোপালিনী। উত্তর
জাত দেবীর পরিচয় পাইয়া বিনীতভাবে বলিল,—
'অরি হুগরি! আমাদের উভাকে একবার
কৃতার্থ কর। তোমার মূলর জড়নী ও অধরুগুট
আখ-আখ হাসি দেখিবার জন্ম বড়ই উৎসুক
হইয়াছি। তোমার অঙ্গ-স্পর্শজনিত সুখবারি পান
কুরিবার আশায় আমরা আকুল হইয়াছি।' 'হি!
পরশীলোপল মুদ্রাঙ্গি পাণী, এরূপ অসম্ভবভায়
বদন ভোদেব মন উদ্ভা হইল। শীঘ্রই ভোদেব
যমাগরে বাইতে হইবে।' এই বলিয়া গিরিহস্তা-

তাহাদের সমক্ষেই অন্তরিতা হইলেন। তখন উভয় ভ্রাতা অবাঞ্চ্য হইয়া আপন আপনি বলিতে লাগিল,—একি? কাহাকে আমরা দেখিলাম? সেই মায়াময়ী অবলা তেও এ দিকে দেবী! আপনার অবস্থা জানাইবার জন্ম শিরকে ঘর করিলেন। মহাশয়ের কান্ধিধামে অর্ধকালের ক্ষেত্র আর অপেক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি আপন প্রথমধর্মকে পুণ্যস্ত পুণ্যভাগ করিয়া নীচোপাংশ-শ্রমবশেষে মুরলী বাজাইতে বাজাইতে একান্তকাননে উপস্থিত হইলেন। হৃদয়ের বেগুনিতে মদুময় কানন প্রসূর হইয়া উঠিল; তরু, সারী, মধুর কোকিল প্রভৃতি পক্ষীপন নৃত্য গীত আরম্ভ করিল; গো ও মৃগসকল চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল, তরুলতা ক্রমশঃ ভূমিতে ছুটিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিল। ত্রিনয়না গোপী হৃদয়িতে হৃদয়িতে গোপবেশধারী পতির নিকট গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘হে পুরুষ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?’ তত্ত্বরে গোপকর্ণপর্শ্বর হর প্রসন্নবদনে দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘হে গোপপরিমণি! মধুরভাগিনি! আমি জিজ্ঞাসা করি বল, তুমি কে?’

গোপবেশধারী ত্রিপুরারির ঈশ্বর বাক্য ত্রিনয়না দেবী তাহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ‘গোবন্দপতে! আমি তোমাই গৃহিণী! তোমার বিবাহবরের অন্ততঃস দান করিয়া আমার তোমার দাসী কর।—প্রভো! আমি তোমার কথামত আসিয়াছি। কিন্তু হুট অহরহণ আমার বিয় জন্মাইতেছে। সেই হুট অহরহরকে বিনাশ কর, আর আজ্ঞা কর, কিরূপে আমি তোমার সেবা করিব?’ শব্দর কহিলেন,—‘পূর্বকালে এই পৃথিবীতে জন্মিল নামে একজন রাজা ছিলেন তিনি বিবিধ যোগ বজ্রাদি করেন; তদুপলক্ষে অস্ত্রশূন্যগকে বক্ষিণাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করেন; তাহাতে দেবগণ রাজার প্রতি মন্তস্ত হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন—‘হে রাজন! তোমার মানসিক অভিলাষমত বর প্রার্থনা কর’। রাজাও চাহিয়াছিলেন,—‘দেবগণ! আমার পুত্রদয় পুরুষ’অথবা অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট না হয়’। দেবগণও ‘তথ্যতা’ বলিয়া সেই বর প্রদান করিয়াছিলেন। এখন তুমি গিয়া তঁহাদের বিনাশ কর’। শব্দরের আজ্ঞা পাঠিয়া দেবী গোপালিনী পুণ্ড্রচরনে মিতম পুণ্ড্রশোভিত লতিকাবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় অহরহর

মগনমনাকে দেখিতে পাইয়া কৃতান্তলিপিতে কহিতে লাগিল,—‘হে বরকপালিণি! দেখি! তুমিই আমার কোর স্ত্রীসন! আমার বহনিন হইতে তোমাকে পাইবার জন্ম বহকষ্টে বাপন করিতেছি’। তখন দেবী কহিলেন, ‘হে মনোবদয়! আমার একটি ব্রত আছে, যদি তোমরা সেই ব্রত পূর্ণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের রমণী হইব। আমি বাহার স্বর্গে ও মন্তকে পদভর দিয়া দাঁড়াইব, সে যাকি যদি আমাকে তুলিতে সক্ষম হয়, আমি তাহারই পত্নী হইব। গোপীর বাক্য ত্রিনয়না মাননে অহর-পুত্র উভয়ে দেবীকে তুলিবার আশায় তৎক্ষণাৎ স্বপ্নগর হইল। উভয়ে মন্তক নত করিয়া দেবীরে আরোহণ করিতে বলিল। মহাদেবী সেই অহরহরকে পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। তখন উভয় ভ্রাতা দেবীকে তুলিতে না পারিয়া তাহার সহিত মহাস্বপ্ন আরম্ভ করিল। তখন দেবী পুনরায় উভয়কে পদতলে দলন করিলেন; অহরহর দারুণ আঘাতে মুক্তি হইয়া ধরাশায়ী হইল। পার্শ্বী কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে শমনসমনে প্রেরণ করিলেন। যে স্থানে অহরহর নিহত হইয়াছিল, অত্যাগি তথায় দেবী পুণ্ড্রালিল স্নানমূল রূপে অবস্থান করিতেছেন। *

(শিবপুরাণ ২০ অঃ ।)

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে মহাদেবের একান্ত কাননে ‘আগমন-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই একান্ত পুরাণ অতি পূর্বকাল হইতে যে একটি পবিত্র তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের আদিপুরাণ ত্রুপপুরাণে নিবিত আছে,—

“সর্বপাপ হরণ পুণ্য দেবতঃ পরমহর্ষভূমি।
লিঙ্গকোটিসমাস্তুল্য বারাবাসীসমগ্রভূমি।
একান্তকোতিবিধাত্যত তীর্থষ্টিকসমগ্ধিতম্ ॥৩৩৭ঃ

এই শ্লোকের দ্বারাও স্পষ্ট জানা যাইতেছে, পূর্বকালে এই ক্ষেত্র বারাবাসীসমগ্র পুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

* এই ব্রতের নাম নিম্নব্রতঃ একান্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও ত্রুপপুরাণাদির মতে, এই ব্রত অব-
গাহন করিলে সর্বতীর্থের ফল লাভ হয়।



ত্রুবকোটিক্ষেত্র

ব্রাহ্ম, পান্ড, শিব ও একাদ্য পুরাণ, কপিল-সংহিতা, উৎকলখণ্ড, একশ্রমচন্দ্রিকা ও ভুবনেশ্বর-মাছাধ্য প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মতে এখানে বৃহ-সাম্যক তীর্থ ছিল, তদ্বধ্যে বিন্দুতীর্থ, গন্ধবতী, শঙ্করবাপী, কপিলতীর্থ ও সোমতীর্থ সর্গপ্রধান। এতদ্বির আশ্রম্য নিম্নমুখি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও পাঁচ ছয় শত দেবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভুবনেশ্বর মন্দিরই একাদ্যকাননের প্রধান মন্দির। এই মন্দিরের অপূর্ণ শিল্প-উৎসাহ দর্শন করিলে চমকিত হইতে হয়। প্রাচীন হিন্দু শিল্পীর অসাধারণ ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রের মাণলাপঞ্জীর-মতে,— উৎকলরাজ যশোভিক্রেশ্বরী ৩৩৬ শকে ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরটি যেরূপ নির্জন স্থানে, বিশেষতঃ যেরূপ ধরনে নির্মিত, দেখিলেই কান্দাধাম অথবা ইন্দ্রভবন বলিয়া মনে হয়। বাহ্য। পূর্বাঙ্গলি বিন্দুদ্রব কেন্দ্র ধরাভাবে এই মন্দিরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নৌকায় চড়িয়া এই ভ্রমের মধ্য হইতে, মন্দির দর্শন করিলে, জলয় পূর্ণকিত হইয়া উঠে। এই নির্জনপ্রদেশে আগমন করিলে আর সংসারে কিরিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, যেমন চিরদিন জীবনের অস্তিম দশা অবধি এই পূর্বাঙ্গক্রেত ধাক্কিয়া সেই পরম পিতার অপূর্ণলীলা গ্রাণ ভরিয়া মানস-নেত্রে অবলোকন করি। সংসারের রোগ, শোক, জালা, যজ্ঞবা, এখানে আসিলে প্রকৃতই জুলিয়া যাইতে হয়। এখানে মুখীনতী শান্তিদেবী চির-বিরাগজনা। (অন্ত স্থানে চিত্র দেখ।)

ভুবনেশ্বরের নাট্য-মন্দির যশোভিক্রেশ্বরীর বংশধর শালিনী কেশরী নির্মাণ করেন।

মাণলাপঞ্জীতে লিখিত আছে; একাদ্যক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ অগ্ন্যুৎকবেশ্বরের মন্দির ১২৯৯শকে অগ্ন্যুৎকেশ্বরী বিষ্ণুর অর্থ ব্যয় করিয়া নির্মাণ করাইয়া ছিলেন।

“তত্র বিন্দুরসাতীর্থ তীর্থবিভক্তিপূরিভম্।

তস্ত মজ্জনমাত্রেন সর্গতীর্থাপুগ্রাহনম্।”

প্রসূরপাণ।

ত্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বিষকোষ প্রকাশক।

ভারতবর্ষের কৃষি।

পূর্বমুখি ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন; কৃষির উন্নতিকল্পে প্রদেশে-প্রদেশে কৃষিশ্রমের গুলিয়াছেন; যেটা-যেটা বেতন দিয়া কৃষিকর্মচারী নিয়ুক্ত করিয়াছেন; বড় বড় জমি ক্রিয়া পুরীক্ষাক্ষেত্র ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে স্থাপন করিয়াছেন। বাহারা এসকল বিষয় জানেন না, বা শুনে নাই, তাহারা পূর্বমুখিকে কৃষি-উন্নতি বিষয়ে উদ্যোগী মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা জমিদার ভূনিয়া পূর্বমুখকের প্রতি মে দোষ আরোপ করিতে পারি না। আমরা বিশেষরূপে জানি, পূর্বমুখিক, কৃষি-উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ; এবং ইহার জন্য বিশেষ অর্থও ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। তজ্জন্ত আমরা পূর্বমুখকের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। কিন্তু একটা কথা মনে উদয় হয়,—এই চেষ্টা, উদ্যোগ ও ব্যয়ের কি ফল হইয়াছে? আমরা যতদূর সুবিধে পাই এবং সরকারী সীলপাটে যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে চেষ্টা, উদ্যোগ ও ব্যয়ের আশুপাতিক ফল দূরে থাকুক, কোন ফলই দেখিতে পাই না। শুধু আমরা দেখিতে পাই না, তাহা নহে; পূর্বমুখকের বিবিস্তিত কর্মচারীরাও দেখিতে পান না। অতএব ফল যে, কোন হইতেছে না, তাহার অনুমান করিতে হইলে, গোড়াপাতিয়া কৃষিক আন্দোলনা আবশ্যক।

সুত্রধারের কার্য যেমন একরূপ শিল্প, পুঙ্খ-নিরূপণের কার্য যেমন আর একরূপ শিল্প, কৃষিও সেই রূপ এক পুঙ্খনিরূপণ শিল্প। এক শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, অপূরণীয় আনুসঙ্গিক শিল্পের সাহায্য আবশ্যক। সুত্রধারের শিল্প কর্মকারের শিল্পের উপর নির্ভর করে; কর্মকার তাঁকে ‘বাটালী’ প্রস্তুত করিয়া না দিলে, সুত্রধার কিরূপে কার্ত্তর উপর দিহি খোদাই কাজ করিবে? সেইরূপ কৃষিশিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাঙ্গ শিল্পের উন্নতি আবশ্যক। একখানি জাল-বাগল প্রস্তুত করিতে হইলে, একজন ভাল সুত্রধারের আবশ্যক, এবং একজন ভাল কর্মকারের আবশ্যক। ভাল সুত্রধার ও ভাল কর্ম-

কারের অভাবে ভাল লাগন প্রকৃত হয় না; ভাল লাগনের অভাবে ভাল চান হয় না।

বিলাতে একশত বৎসর পূর্বে কৃষি বড় হৌনো বহুসাম ছিল; কিন্তু আজি কালি তথায় কৃষিখনিম্ন অতি উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের সেই বিলাতী রাজা, সেই বিলাতী-জুঁতে-চালু্য চেঁতা, সেই বিলাতী কৃষি-বিদ-কৃষি-অধ্যাপক প্রভৃতি কৃষিকারী, তবে কেন কৃষি উন্নতি হইতেছে না? কৃষি-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, আনুমানিক শিল্পের উন্নতি আবশ্যক। বিলাতী কৃষকের সার আংশক হইল—একজন শিমকার বাণ্য-যেতে-যোগে সুদূর দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে ‘ওয়াশো’ নামক সার আমদানী করিতে লাগিল; আর একজন শিমকার সেইরূপ দেশ-বিশেষ হইতে যত সৎগ্রহ করিতে লীগিল; তৃতীয় শিমকার ‘হাফারলক’ প্রকৃত করিয়া সেই হাফ দ্রব্য করিয়া উৎকৃষ্ট সার প্রকৃত করিতে লাগিল। উন্নতিজনক বিলাতী কৃষকের পু্যাতন লাগলে মন উঠিল না, অমনি একজন শিমকার চাষের বিশেষ উপযোগী নানা প্রকার নূতন লাগল নির্ভর করিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষির আনুমানিক শিল্পের উন্নতি-চেঁতা কার্যেও দেখি না। গর্বগমেটের ও জনসাধারণের তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই এবং যত দিন তাহা না হইবে, তত দিন কৃষি-উন্নতির আশা দুঃখ্য।

জানেক মনে করেন যে, বিজ্ঞানের সহিত শিল্পের আহার-ভাঙ্গারই সম্পর্ক; শিল্প, বিজ্ঞান হইতে যত দূর থাকিকে, ততই শিল্পের পক্ষে মঙ্গল। ইহা যে তাঁহাদের মহাজন, তাহা বুঝাইতে ‘অধিক দূর যাইতে হইবে না। ম্যাকগেরিয়ার কন্সাল্টে দেশে ‘রোপ’ ও ‘রোজার’ আনাই নাই। সে দিন পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, যোগীর নাতী টিপুরাই দ্রোণকে দৃষ্টি থাকিতে হইত, নাতী টিপুরাই বৃষ্টিতে হইত, জলের জ্বালা কিরণ। জর-পরিণাম-করণর শিল্পের অবস্থা এইরূপ অতি দুঃখ ছিল; কিন্তু এখন ‘পেপেগমেটের’ বর আবৃত্ত হওয়া অবধি, আর দেশের ‘স্বাক্ষর-বিল মারা’ বৃষ্টিভাঙে। এখানে উক্ত বহুদূর মাধ্যমে জলের পরিণাম অতি স্বাক্ষরপে জানা যায়, কাজেই চিকিৎসাও বৃদ্ধি হইয়াছে। চিকিৎসা শিল্পের এই যে উন্নতি হইয়াছে, ইহার মূল জিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বলে, যোগ্যোপকরণ

যন্ত্রের-খটি এবং সেই যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসা-শিল্পের উন্নতি। বলা বাবাহ্য, এইরূপ সকল শিল্পের উন্নতি মূল্যেই বিজ্ঞান গাঠি। বিজ্ঞান বিনা, শিল্প কত দূর অগ্রসর হইতে পারে সত্য, কিন্তু তৎপরে তাহার আর এক পদও অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই; অগ্রসর হইতে হইলে বিজ্ঞানের প্রবেশ করিতে হইবে, বিজ্ঞানের হাত ধরিয়া চলিতে হইবে। বিজ্ঞানই শিল্পরূপ অঙ্গের বাড়ী।

দ্বিতীয় বিজ্ঞানে কৃষি-শিল্পের যত দূর উন্নতি হইতে পারে, আমাদের দেশে তাহা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের সাহায্য বিনা কৃষির এক পদও অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন একজন অন্ধ মল্ল রাষ্ট্রা পাইলে, সহজে আপন-আপনি অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু যেখানে পথে বাধা-বিপত্তি, সেখানেই তাহার গতিরোধ হয়; সেইরূপ কৃষিখনিম্ন আপন-আপনি কতক দূর অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু-বাধা উপস্থিত হইলে, আর অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের দেশে এক্ষণে কৃষির সেই অবস্থা উপস্থিত। বিজ্ঞান ব্যতীত আর কেহ এই বাধা দূরীতে পারিবে না।

অনুমা আমাদের দেশের লোক বিজ্ঞান-বিষয়ে অজ্ঞ বলিলে, অভিশ্র-উক্তি হয় না; কাজেই তাহার কৃষি-শিল্পের উন্নতি বিজ্ঞানের যে কি দৃষ্টি দৃশ্যক, তাহা বৃষ্টিতে সর্থ্য নহে। কিন্তু আমাদের রাজা বিজ্ঞানে পণ্ডিত; কাজেই কৃষি-শিল্পের উন্নতির পথে কৃষক উপস্থিত দেখিয়া, বিজ্ঞানবান সেই কটক দূরীভূত করিতে চেঁতা করিতেছেন। অনুরোধ করি। আমরা একজন মন্ত্রী, আমরা যে গর্বগমেটের সভ্যপ্রায়ের মন্ত্র পদাধিকার, তৎপ্রতি দোষারোপ করি, তাহা নিতান্ত নহে; কিন্তু আশ্চর্য ও গোচ্যের বিষয়, গণমাধ্যম ও উক্তপন্থর কোন কোন ইংরেজ কর্মচারীও আমাদের সহিত যোগদান করেন। তাঁহার বলে, ভারতের কৃষি উন্নতিকার্যে প্রেষিতম যোগ্যনে উত্তরায়; ভারতের কৃষকে শিল্পিয়ার কিছু থাকি নাই; বাহারা শিখাইতে আইলে, তাহাদের শিখাইবার কিছু নাই, বরং শিখিবার অভাব আছে। এই যোগ্য লোকের মতে, সেই জন্ত, গর্বগমেট-প্রাথমিক কৃষি-উন্নতি-প্রাণী



পুণ্ড্রম ও বাতুলের কার্য বন্নিয়া অভিহিত হয়। ইহাদের কার্য একেবারে যে নির্বন্ধ; তাহা বলা যায় না; কল্যাণ-আপন-আপনি যতদূর উন্নত হইতে পারে, ভারতীয় কৃষি ততদূর উন্নত হইয়াছে; ততদূর ভারতীয় কৃষক, কৃষি-পণ্ডিত, ততদূর তাহাকে শিখাইবার চেষ্টাই নাই। কিন্তু উক্তপন্থীর লোক এই ইচ্ছা রাখেন না যে, আজি কালি ভারতবর্ষের বহুপাশা উপস্থিত, তাহাতে দেশের কৃষিপণ্ডিতের আর চলে না; বাহারা উন্নত হউক, ইহার আরও উন্নতি আবশ্যক এবং এইজন্য আমাদের সাহায্যও আবশ্যক। আরই এক কথা আছে। কৃষির উন্নতিবন্ধে গর্বগমেট হইতে-এ পর্যন্ত যে সকল চেঁতা হইয়াছে, তাহার ফল বিশেষ কিছুই দেখা যায় না; কাজেই উক্ত-পন্থীর ফলকে মনের প্রতি অশ্রুণি নির্দেশ করিয়া আপন অভিমত সর্থ্যন করেন এবং গর্বগমেট ও গর্বগমেটের পূজাবলগী লোককে টটিকারী দিয়া থাকেন।

আমরা উপরে দেখাইয়াছি, বিজ্ঞান বিনা কোন শিল্পেরই সমর্থক উন্নতি হয় না; কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষি-শিল্পের উন্নতি হইতেছে না কেন? একটী অহুমহান কারণেই ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায়। আমাদের রাজা ইংরেজ; কাজেই ইংলেণ্ড ও ইউরোপে বিজ্ঞান-সাধারণে যে সকল কৃষি-ব্যাখ্যিত হইয়াছে, আমাদের রাজা সেই সকল কৃষি-ব্যাখ্যিত বহুপ্রচার করিয়া আমাদের দেশের কৃষি-উন্নতির চেঁতা পাইতেছেন। কিন্তু হুগ্গের বিষয়—এই সকল বিভাগ ও বিভাগীয় কর্মচারীর হস্তে এই কার্যের ভারপণ্ড করিয়া আমাদের দেশের কৃষি-উন্নতির চেঁতা পাইতেছেন। ইহাদের শাসনকার্যে বিশেষ দক্ষ ও পরায়ণ হইলেও, বিজ্ঞান ও ভারতীয় কৃষিখনিম্ন বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। দেশীয় লোকের অথবা বিশেষজ্ঞ না জানার স্বরূপ, যেমন রাজকর্মচারীরা অনেক সময় শাসনকার্যে বিভ্রান্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ ভারতীয় কৃষিখনিম্নের বিষয় অনভিজ্ঞ বলিয়া, কৃষি-উন্নতি-সাধনে নিম্নলিখিত রাজকর্মচারীরা কৃষি-উন্নতি কার্যে বিভ্রান্ত হইয়াছেন। ইহারা যব ও গমের প্রভেদ জানেন না, ইহারা মটর মটর জম করেন, ইহার পাতীর সাহায্য না হইয়া যব ও গমের উন্নতি করিতে চাহেন, ইহাদের মতে ভারতীয় কৃষি-উন্নতি একবেলা বাইয়াই শস্ত, হই যেনা থাকিতে চাহেন না ও বাতুলের উপভোগ

যোগ কর্তা, তাঁহাদের ‘হস্তেই কৃষিখনিম্ন-উন্নতির ভার অর্পিত হইয়াছে। আরও তাঁহাদের বিজ্ঞান-জ্ঞানও তদুপ ‘অগ্রসর এড়া’ দেখিয়া গেছে। ইহার উপর তাঁহারা একপ অহুমহৎ যোগ্যে সৎ-পারদর্শ দিলে, তাহা তাঁহাদের গ্রাহ্য করেন না। ইহাদের নিজে জানা নাই, তাহারা স্বতাই পনের জানের উন্নতি নির্ভর করিতে সক্ষম দৃশ্যক। এইরূপ ত্রাঘর্ষণ দেখে কৃষি-উন্নতির কার্যে মহাভ্রান্ত হইতেছে।

এইরূপ কৃষিখনিম্ন-অনভিজ্ঞ, বিজ্ঞানজ্ঞান-রহিত, অহুমহৎ রাজকর্মচারীদের প্রচেষ্টাভেদেই, ভারতীয় গর্বগমেট একজন বিলাতী কৃষিপণ্ডিত ও বিজ্ঞানভিজ্ঞ লোক এদেশে শাটাইতে, বিনাশ্ব হেঁটেসেজেটোরিক বিশেষ অহুমহৎ করেন। অহুমহৎসেজেটোরিক হেঁটেসেজেটোরী পদ বসার ভেল্লুকীর নামক একজন ইংরেজ যুবককে এদেশে পাঠান। তাঁহার পরিচয় ‘ম্যারা’ এই পর্যন্ত জানি যে, তিনি একজন ‘মহারপণ্ডিতের পুত্র; তাহার পিতা যত দূর ভেল্লুকীর ইংলণ্ডীয় কৃষি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ও কৃষি-সাধনে আভিযাত্র পণ্ডিত ছিলেন, এবং ইংলণ্ডের রাজকীয় কৃষি-সমিতির সামান্যিক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর, কৃষি-সমিতির তৎপূজ স্বক-ভেল্লুকীরই পিতৃপদে নিযুক্ত করেন। ইংলণ্ড-দেশেই অনেক সময় পিতার নামে পুত্র-চলিয়া যায়; আমাদের যুবক ভেল্লুকীর তাহাই কিনা তাহা অনুমান জানি না, তবে তাই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, বিলাতে ও গর্বগমেট তিনি এমন কোন গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন নাই, যাতে ভারতীয় কৃষির অহুমহৎ ও উন্নতিকল্পে পারদর্শ-দান রূপ কার্যার্থের ভার তাঁহার হস্তে স্থাপ্ত করা যায়। বিলাত হইতেই যদি বৈদ্য অধ্যয়িত হইল, তাহা হইলে আমাদের মতে প্রাণি-গুরু-প্রভিৎ একজন কৃষি ও বিজ্ঞান-বিশারদ লোককে আনিয়াই ভাল হইত। মৃত্যুপ হই একজনের নামও আমরা বলিয়া বিতে পারি। কিন্তু সেরূপ একজন লোক কেন না পাঠান হইল, তাহার মর্ঘভেদ করিতে আমরা অক্ষম।

দ্বিতীয় লগলান, ‘মহার’ ভেল্লুকীর যে কার্যের জন্ত ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি উক্ত বিশেষ উপযোগী। এক্ষণে দেখা যাউক, তিনি এদেশে কি করিয়াছেন ও বাতুলের উপভোগ

সম্ভব। আমরা ভাবিতে পাই, তিনি আপন কার্য শেষ করিয়া, কলিকাতার কোন নিভৃত স্থানে বিশ্রাম, বিশ্রান্ত লিখিতেন। যত দিন পর্যন্ত না বিশ্রান্ত প্রকাশিত হয়, তত দিন পর্যন্ত তাঁহার কার্যের যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু তিনি আপন কার্য উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে গমন করিয়াছেন, আমরা সেই সেই স্থানে তাঁহার কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান রাখিয়াছি। তিনি পরিদর্শন-কার্য শেষ করিয়া শিমলাকৃত্তিমিত্তে যে সকল অভিন্ন প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা সংবাদপত্রে প্রস্তুতকৃত পুঙ্খিত তাহার অংশগণন করিয়াছি। আমরা বত দূর বৃত্তিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন সাহেব রসায়নবিৎ ও একজন সাহেব কৃষিবিৎ নিম্নকৃত করিতে পারামর্শ দিবেন এবং উভয়েই যে, প্ৰকৃত হইতে আনা হইবে তাহা নিশ্চয়।

সাহেব কৃষিবিৎ আশিয়া-এ দেশে যে কি করিলেন, তাহা পরামর্শদাতা হইবেন ও যাঁহারা তাঁহার পরামর্শ ভাবিলেন, তাঁহারাওই হইবেন। আমরা কিছুই বৃত্তিতে পারি না। দেশের ভাষা, কৃষি ও কৃষকের অবস্থা ক্রমিত, তাঁহার জীবন কঠিন হইবে, তিনি কৃষি উদ্ভাবন করিলেন কোন কারণে? তাঁহাকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় থাকিলে, তাঁহাকে এ দেশে আনা উচিত; কিন্তু তিনি শিক্ষা দিবেন এ অভিপ্রায়ে তাঁহাকে আনা বুঝা। বিলাতী কৃষক যে, এ দেশের কোন উপকারে আইসে না, তাহাতে পরামর্শেই হইবে এক স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ও টেকিয়া শিখিয়াছেন; এখনও কি উভয়ই হয় নাই।

রসায়নবিজ্ঞ পণ্ডিত আনয়ন সংগতও আমাদেব সেই কথা। আমাদের দেশে অপেক্ষা বিলাতে অভিজ্ঞ রসায়নবিৎ পাওয়া যায় এবং কেবল রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা প্রদত্ত আবার শুধু শিক্ষা বিচার আশ্রয়না হইতেছে না; কৃষিসম্বন্ধীয় রসায়নিক অনুসন্ধান ও শিক্ষা রাখাই হইতেছে; যিনি রসায়ন-পণ্ডিত ছিলেন, হইবেন, তাঁহার কৃষি-বিদ্যায়ও অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত আবশ্যিক। এরূপ লোক বিলাতে কোথা পাওয়া হইবে? উত্তর কি রসায়ন ও কৃষি অভিজ্ঞ পণ্ডিতের

প্রয়োজন নাই? আমরা সে কথা বলি না; আমরা বলি, এরূপ পণ্ডিতের জন লোকের নিভৃত আবাসিকতা আছে। এখন কথা হইতেছে, এরূপ লোক কোথায় পাওয়া যায়? এ কথা উত্তর দিবার পূর্বে আমরা একটা কথা জ্ঞানিত রাখি। এই যে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ১১জন বাঙ্গালী যুবক বিলাতে পাঠাইয়া কৃষি-বিজ্ঞান, কৃষিবিদ ও আনুমানিক বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা দিয়া এদেশে আনা হইয়াছে, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি কিন্তু, তাঁহারা বিলাতে কি শিখিয়াছেন? এবং এদেশে আসিয়া কি কি কার্যে নিযুক্ত আছেন?

তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিলাতে যাইবার পূর্বে এদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধি গ্রহণ করেন; দুই জন বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং চারজন বি, এ, ও এম, এ, উপাধি পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন বলিয়া, পরামর্শে-সম্প্রদায়ের অধ্যাপকতা কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি সহিত আপন আপন কার্য নির্বাহ করেন। অতএব বিলাতে যাইবার পূর্বে তাঁহারা নিভৃত নগর্য ছিলেন না।

আমাদের অনুসন্ধান বত দূর, তাহাতে আমরা জানি, তাঁহারা বিলাত-গমন কালে, কেবল কেতাব পড়িয়া নহে, বরং দেখিয়া ও স্বকণ্ঠে ভাবিয়া, বিলাতী কৃষিবিদ ও কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা করেন; এবং কৃষিবিদদের প্রধান সহায় কৃষি-রসায়নে বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করেন। তাঁহাদের রসায়ন-ব্যাপ্তি কেবল পুস্তকে আবদ্ধ নহে; সর্বপ্রকার মৃত্তিকা, মনুষ্য ও গৃহপালিত জন্তুর সর্বপ্রকার বায়ু, পানীয় জল প্রভৃতি পদার্থে রসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইয়া বস্তুতত্ত্ব বিজ্ঞান (Geology), প্রাণীবিজ্ঞান (Zoology), উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany), গৃহপালিত জন্তুর চিকিৎসা (Veterinary Science & Practice), জলপ, প্রভৃতি আনুমানিক বিজ্ঞান এবং শিল্পে তাঁহাদের দর্শন আছে। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন বিলাত-বাসের পূর ফার্মাসিওয়ে গমন করিয়া ফার্মাসিওজী কৃষি আশ্রয়না এবং গো-মল্লের নতুন চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষা করিয়া বিলাত-ই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসাপত্র

প্রাপ্ত হইবেন। অতএব তাঁহারা বিলাতে গমন করিয়া কেবল সীম দিয়া কালব্যাপন করেন নাই।

বদশেষে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে মূল্যবোধ প্রায় পরমর্শে-কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু কার্য কেনম দেখুন। দুইজন কৃষিবিদ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোম্পানী-বিদ্যাকর হইয়া কম্পাচার বিচার করিতেছেন; তিন জন জমির জরিপ ও প্রমার সহিত বদশেষ করিতেছেন; দুই জন কেরানিগিরিতে কারিগরি দেখাইছেন; একজন জমিদারের নায়ের ও একজন রেগমের মেক্সা। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, কৃষির উন্নতিকর্ত্ত প্রদেশে-প্রদেশে যে কৃষি-বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে ও কৃষিকর্ত্তারী নিযুক্ত হইয়াছে, সেই সকল বিভাগ ও সেই সকল কার্যে ইহারা নিযুক্ত হইলেন না কেন?

এই সকল লোকের মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যিনি উপরোক্ত রসায়ন-পণ্ডিত বা কৃষি-পণ্ডিতের কার্যে নিযুক্ত হইতে প্রস্তুত? ইহাদের মধ্যে কাহারোকে কি কৃষিবিদ্যায় কোন ওস্তাদের ভার দেওয়া হইয়াছে ও তিনি সেই কার্যের অংশগত প্রমাণ হইয়াছে? অতএব বিলাত হইতে লোক আনিবার কথা ভাবিয়া আমরা বিগত চাহি, একবার ইহাদের মধ্যে দুই একজনকে কৃষিসম্বন্ধীয় কোন ওস্তাদের ভার দিয়া দেখিবার মতি কি? ইহাদের বিলাতী কৃষিতে ব্যাপ্তি আছে -ও দেশীয় কৃষিতে দর্শন আছে, ইহাদিগকে একবার কার্যভার দিয়া দেখিলে হয় না? কিন্তু আমাদের পাণ্ডা কৃষা, দেশের লোকের (কেবল পরমর্শে-উপার পদার্থ দেখি কি হইবে?) সাহেব চাহেন, তাঁহাদের মতে সাহেব, সকলে জানে, কালা-বাগালি কিছু জানে না। দেশের অধ্যাপকদের আর কি বাকী আছে?

ভারতীয় ও প্রদেশীয় কৃষিবিদগণ এই যে আট দশ জন অভিজ্ঞ লোকের স্থান হয় না, ইহা কি, বিদ্যায়ের বিদ্য নহে। কৃষিবিদগণের কার্য দেখিয়া বোধ হয়, ইহাদের কৃষিবিদ্যাই যেন ইহাদিগকে কৃষিবিভাগ প্রবেশের অংশগত করিয়াছে; ইহাদের প্রাতি সুবিচার দেখিয়া বিদ্যাহস্তদের কথাই মনে উদয় হয়, শুণ হয়ে দেখা হইল বিদ্যার বিদ্যার। কৃষিবিদগণের মূল্য, দেশে টেকিলে পড়িয়া যায়, সাধ-প্রশংসা, ভক্ত, ইহাকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা আর

পুস্তক গিরি লগ্নন করিবার ইচ্ছা, একই প্রকার। আমাদের বিশ্বাস, পরমর্শে-বিদ্যায়ের ভর্তুকা বুঝেন, কিন্তু প্রধান পরামর্শদাতার দেখে এরূপ বিভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে। আমরা পরামর্শ দি, পট, উদ্ভিদক পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা না করিয়া, তৎস্থানে নতুন বর্ষ রোপণ করা হউক-অর্থাৎ কৃষিবিদগণের আমূল পরিবর্তন করা হউক।

ত্রিগিরিশচন্দ্র বসু।

বেদান্ত দর্শন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

২*। ব্রহ্মজ্ঞানের সত্ত্ব বিচার করা ও বিহিত বটে; কিন্তু এখন কথা এই যে, ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ কি—না; যদি প্রসিদ্ধ হন, তবে তাঁহাকে জানিবার সত্ত্ব বিচার করিতে হইবে কেন? আর যদি অপ্রসিদ্ধ হন, তবে তাঁহাকে ও জানা যাইবেই না; সুতরাং এ বিধি-বিজ্ঞান কেন? ইহার উত্তর এই—

ব্রহ্ম, নিত্যসত্ত্ব সত্ত্ব-মুক্ত-স্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-সম্পন্ন। সকলেরই আত্মা, এইজন্য তিনি প্রসিদ্ধ। আমাদের অস্তিত্ব প্রত্যয় সকলেই করে। নতুন 'আমি নাই' এরূপ প্রত্যয় হইত। আত্মাই হইত। ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও আত্মা স্বরূপ-বিকারগত বহুতর গোলাযোগ।

চার্লস মতানবিশিষ্ট ও সামান্য লোকে দেখাইবে আত্মা বলে; যেহে ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলে; কেহ বা মনকেও আত্মা বলে; বৌদ্ধগণের মতে কণ্ঠস্বরূপ বিজ্ঞান দ্বারাও আত্মা। অনেক ক্ষেত্রে আবার শূন্যত্ববাদ। ত্রৈলোক্যিকামি মতে সেহাদিহাতিরিক্ত স্বভাব আত্মা আছেন; তিনি কতী ভোক্তা সত্ত্ব 'সংসারী'। সাংখ্যমতে আত্মা কতী নহেন—ভোক্তাশাত্র। এইরূপ নানান মূর্খির নানা মত। সকলেই আপন আপন মতে কিছু কিছু যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করেন। তবে সে সকল যুক্তি ভাল, কি মন্দ, সেত পরের কণ্ঠ। অতএব বিশেষ বিচার না করিয়া এক মত

* ১ম স্তরের দ্বিতীয় আশ্রিত এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

অবলম্বন করিলে মুক্তিলাভ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় এবং বিশেষ অবস্থায় থাকে।
অস্থায়ী নাম তে লোক অনেক ভ্রমশীলতাঃ।
তাৎপ্রে প্রত্যেকজিহ্বান্তি যে কে চাহয়নো জানাঃ।
(শ্রুতিঃ)

যাহারা আশ্রয়ব্রহ্ম অবগত নহে, তাহারা আশ্রয়ত্যাগী; অজ্ঞতমতাবৃত্ত অস্থানিকের জননী-জঠর তাহাণিগের পরকালে যাইবার হান।
যোগজ্ঞান সন্তমাস্তান সন্তম্যাপ্রাপ্তপঙ্কজঃ।
কিং তেন ন কৃত্য পাপং চৌরোদ্যোগাধারিণাঃ।
(শ্রুতিঃ)

যে ব্যক্তি একরূপে অবস্থিত আত্মাকে অষ্ট-রূপে গ্রহণ করে, সেই আত্মাপ্রসারক চৌরের কোন পাপ হয়। ব্যক্তিগণের যুগ্মতায় ব্রহ্ম-জ্ঞানের জন্ম বিচার করা অবশ্য কঠোর।

২য় সূত্র।

আত্মাস।

ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম বিচার করা বিধিত হইল;
কিছু ব্রহ্ম কি? ব্রহ্মের লক্ষণ কি?—

“জন্মান্দ্যাম্য বর্তঃ।”

দুর্ভাগ্যিত পদের অর্থ।

জন্মাদি (৪টি স্বিতি-প্রণয়) অষ্ট (এই পরি-
ভ্রমণকার) বস্তু (যাহা) হইতেঃ।

বাখ্যা।

যে সর্গজ সর্গশক্তিমান হইতে এই পরি-
ভ্রমণকার জগতের ৪টি স্বিতি-প্রণয় হইয়া থাকে,
তিনিই ব্রহ্ম। এ বিষয়ে প্রথম প্রণয় প্রতি;—
“যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জ্ঞানিন
জীবতি যং প্রজ্ঞাত্যস্তমুখোতি ত্রিবিজ্ঞানস্য
তদব্রহ্ম”।

এই সমস্ত ভূত-জীব ও জড়, যাহা হইতে
উৎপন্ন, যাহার প্রণয়ে অবস্থিত এবং চরমে
যাহাতে নান দ্রব্য, তাহাকে জ্ঞানিতে বিচার কর;
তিনিই ব্রহ্ম। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রণয় জগৎবস্তুর স্বভাব। যে বস্তুর
উৎপত্তি হয়, তাহাকে ‘জন্ম’ বলা যায়। জন্ম হইলে
কেহ না কেহ তাহার জনক আছে। জগতের
নবজাত এবং কালকৃত পরিবর্তন—জন্মতার বলা

অনুমানক*। অগতের উৎপত্তি আমাদের কেহ দেখি
নাই সমান, কিন্তু অস্থানীয় যাহা বুঝা যায় জগৎ
জন্ম। কালকৃত পরিবর্তন যাহাতে থাকিলে, তাহাই
জন্ম—এরূপ অনুমান তৎসম্ভবতঃ নহে। গৃহ বন,
উদ্ভিদ বন, সকলেরই কালকৃত পরিবর্তন আছেই
সম্পদেই জন্ম। আজ যে অট্টালিকা অমরবাতীক
ইষ্টভবনকেও বিহার প্রদান করিতেছে, কিছু
দিন পরে দেখিবে, তাহার তত্ত্ব নাই, একই
একই মনিতা দেবা বিদ্যাতে, যথ্য যাত্রে
মহো একই হৃদয়ের ভাষা উচ্চি মারিতেছে। দীর্ঘ-
কাল পরে দেখিবে—তুমি না হয়—তোমার পুত্র
কোন দেখিবে—সে অট্টালিকা বহিরাগতা যায়
না, কার্ণিভ ভাদ্রিয়াছে, আশিলা পড়িয়াছে, উপরে
বড় বড় বৃক্ষ, গরাক বহীক-নিমেষা—ভয়
ক্রেত। ক্রমে সে অট্টালিকার চিত্রও থাকে
না, এরূপ হয়। আজ যে উদ্ভিদ পৃথিবীর নন্দন-
কানন বলিয়া পুষ্টিত, যাহার বৃক্ষরাজী নিজ নিজ
শুশুমসৌরভে বিলিঙ্গত মা তাহায়া ভূতাপ্যর্গত বিলুপ্ত
কৃত জমিক পরিবর্তনগতাহার ভূতাপ্যর্গত বিলুপ্ত
হইবে। যে ব্যক্তি এই অট্টালিকা ও উদ্ভানের
নির্মাণ-কাণ্ড দর্শন করে নাই, যেও ত ইহার
জন্মতা অনাগ্রাসে উপলব্ধি করিতে পারে। সে
বেশ বুদ্ধিতে পাবে, এই জাতীয় বস্তু, জন্মই হইয়া
থাকে। জগৎও সেই জাতীয় বস্তু, সেই কালকৃত
পরিবর্তনময় জগৎবস্তু। নদ, নদী, বৃক্ষ, বীণ,
পৃথিবী, সমুদ্র—কালকৃত পরিবর্তন কারণ নাই।
সকলেরই আছে। তবে ইহার জন্ম-না
হইবে কেন? জগৎ যদি জন্ম হইল, তবে
ইহার জনক কে হইতে পারে? ঘটপট যেন
মাথুয়ে করল—স্বরদার যেন মাথুয়ে করিল; কিং
এ বিশাল কণ, কলিঙ্গ কে? ঘটপট-স্রাব্ধিগতা,
গৃহদ্বার-নির্মাণতা, মাধুর্য সামান্য মানব—যাহার
বিষয় ভাবিতে অক্ষম, যাহার এক একটা শিশির-
বিন্দুর আশ্রয় ও ভাব বুদ্ধিতে শিখায়ায়া হয়,
সেই বিশাল প্রপঞ্চের জননিতা কে?—স্বভাব
নহে; প্রজন্মিতনহে; পরমাণু নহে; জীবনহে; ব্রহ্ম
নহে; আর কেহই নহে। যিনি সর্গজ সর্গশক্তি-
মান সর্গকারণ, তিনিই এই জগতের জনক।

* জগৎ ‘জন্ম’ হইলেও ৪টি স্বিতি-প্রণয়-চক্র
অনাদিত্যে চলাতেছে; তাই জগতকে জন্ম
যায়।

স্বভাব জগতের কারণ হইতে পারে না; কেননা,
স্বভাব পদার্থ নিরাশ্রয় নহে। কোন এক আশ্রয়
অবলম্বনেই স্বভাবের সত্তা। শতোৎপাদন পুষ্টি-
বীণ-স্বভাব হইতে পারে, জলবর্ষণ মেঘের স্বভাব
হইতে পারে, জ্যোৎস্নাপ্রদান চন্দ্রের স্বভাব
হইতে পারে, কিন্তু এই জগৎ ৪টি কাহার স্বভাব?
যাহার স্বভাব বলিবে, তিনিই সর্গজ সর্গ-
শক্তিমানসম্পন্ন ব্রহ্ম। শুধু স্বভাব, নিরাশ্রয় স্বভাব
তখনও কণা। যখন ‘আদীদিগং তসোভূতং’
বস্তু এই জগতের কিছুই ছিল না—পট-পঙ্ক-
কট-পতন্ত, নর-নারী কিছুই ছিল না; তরু-লতা,
শস্য-বীজ, ভূত-বন্যী কিছুই ছিল না; আকাশ-
পতাঙ্গ, স্বর্গ-মর্ত্য, দেব-দেবী কিছুই ছিল না;
তখন আশ্রয়-মাপেক স্বভাব থাকিল কিরূপে?
যখন চন্দ্র-সূর্য, তারা-গ্রহ, জল-হল কিছুই ছিল
না; নন্দন-বীণ-উপবীণ, শুভ-অশুভ কিছুই ছিল
না; পুরুষ-কানন, নগর-উদ্ভিদ, নিরা-গতি, কিছুই
ছিল না; তখন হে স্বভাববান্ধি! তোমার স্বভাব—
আশ্রয়-মাপেক স্বভাব, নিরাশ্রয়ে থাকিল কিরূপে?
তাই বলি, স্বভাব জগতের কারণ, বলিতে অর্থকর
করে, ভনীতে নির্বিবাদ বটে, কিন্তু একই
ভলাইয়া বুদ্ধিতে গেলেই বিভ্রান্তি, ব্রহ্মহীতে গেলে
তত্ত্ববিদকি। সূত্রায় স্বভাবের কথা ছাড়িলাম।

প্রকৃতি বা পরমাণু ও জগতের জনক নহে।
কেন না জানবানু চেতন পূর্ণতা বস্তুত কোন কার্য
হইতে পারে না। সামান্য ঘটপটাদিও চেতন
জনককে কার্য। সূত্রকার ও তত্ত্বদ্বারা জানবানু
জীব। আর এতবড় ব্রহ্ম কার্য জগৎ কি কখন
জানবানু পরপ্রেরণাপেক প্রকৃতি বা পরমাণুর
কার্য হইতে পারে? ইহা কি কখন সম্ভব হয়?
পৃথিবী হইতে উভিত্রয়ের উৎপত্তি হয়
বটে, কিন্তু তাহারও মূলে যেই “অবোরমিহানু”
মহত্তো ব্রহ্মহীদ্যু” সর্গজ সর্গশক্তি—কারণভাবে
বিরাজমান। সূত্রায় প্রকৃতি ও পরমাণুর কথা
এই পর্যন্ত।

ব্রহ্মাদি কোন শ্রেষ্ঠদেবতাও জগতের কারণ
নহে, তবে জগৎসৃষ্টির বর্ধক বটে; কেননা
ব্রহ্ম ও অজ্ঞাত জীবনক সকলেও জগতের
অন্তর্ভুক্ত। আপনকার কারণ ত আর আপনি
হইতে প্রসবিত না।

“যো ব্রহ্মাণ্যে বিদধতি পূর্বং
সর্বং এতৎ আদ্যনো দ্যুতস্রজি।” (শ্রুতিঃ)

“যিনি পূর্বে ব্রহ্মাকে বিধান করিয়াছেন,
সকল জীবই তাঁহা হইতে উৎপন্ন।” তিনি ভিন্ন
এই—অগতের স্বিতি সহকার, করিবার শক্তিই বা
আর কাহার দ্বারা? অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে,
জগতের সৃষ্টি স্থিতি সহকার, যাহা
হইতে হয়, তিনি ব্রহ্ম।
এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার চর্কপাদে থাকিবে।

অপুষ্টি ও শুণ্ডন।

১। বেদান্তের মতে ব্রহ্ম ত নির্ণূণ—অকর্তা;
তবে তিনি জগৎকর্তা বলিয়া কথিত হইতেছেন
কিরূপে? জগৎ-জনক স্বভাবের লক্ষণ হইল,
ইহা ত অতি বিচিত্র নহে।

বিচিত্র নহে—কিরূপেপেকি হইল তখন: মনে
কর ভূমি পথে যাইতে যাইতে একখানি চক্চকে
বিশ্বক দেখিতে পারিলে, ভূমি-কিছু ভাঙা। বিশ্বক
বলিয়া বুদ্ধিতে পারিলে না—ভাবিলে রজত; ভূমি
তাহা গহীবার ভূমি-বগে হইলে, তখন আর এক
জন মর্দাঙ্গ পথিক তোমাকে বুঝাইবার জন্ম কি
বলে?—বলে, ঐ রজত—বিশ্বক; যাহা জন্ম
বলিয়া বুদ্ধিতে, উহা বিশ্বক। কিন্তু সে যদি
তখন অষ্ট স্বভাবপ্রণয় বলে যে, আমি বিশ্বক
দেখিতেছি বা এখানে বিশ্বক আছে, তাহা হইলে
তুমি চারিটিকে নির্ভীক কর—‘তোমার রজত’
ছাড়িয়া এমিক ওমিক অন্বেষণ কর। কিন্তু যাহা
বুদ্ধিগত বিশ্বক, তাহা ভূমি ত রজত-বলিয়াই
বুঝিয়া আছে, তাহার প্রতি তোমার একেবারে লক্ষ্য
থাকে না। সূত্রায় তোমাকে বুঝাইতে হইলে
‘ঐ রজত—বিশ্বক’ এই কথাই তাহাকে বলিতে
হয়। অপিচ, মনে কর, এক বিদূষক পথে
তোমার দিগ্ভ্রম হইয়াছে; পূর্বকে অধিগ
ভাবিতছে; ‘এক সময়ে’ ভূমি একজনকে জিজ্ঞাসা
করিলে: ‘জন্মক প্রণয়ে যাইতে হইবে’ কোন দিকক
যাইবা? তখন সেই মতাবাদী—তোমার দিগ্ভ্রমের
কথা তাহার জানা না থাকাতো বলিয়া দিল,
‘দক্ষিণ দিকে যাও।’ তখন ভূমি কি কর? অবশ্য
কমের বেশ ‘এই দক্ষিণ’ ভাবিয়া পূর্বদিকেই
যাইতে থাকে, তাহাতে তোমার গৃহস্থস্থানে পদম
আর ঘটয়া উঠে না। কিন্তু সে যদি তোমার
ভ্রমের কথা জানিয়া বলিয়া দেয়, ‘এই তোমার
পশ্চিম দিকেই দক্ষিণ দিক’ অর্থাৎ ভূমি যাহাকে

পশ্চিম বনিয়া বুঝিতেছে, তাহাই দখিল; এইদিকে গমন কর, তাহা হইলেই তোমার পক্ষে গন্তব্যস্থানে বাইবার প্রকৃত উপদেশ হইল।" ব্রহ্মসম্বন্ধেও তোমার পক্ষে তদ্রূপ জানিবে। ব্রহ্ম বলিলে তুমি কি বুঝ? কিছুই নহে। ভূগর্ভস্থকার বসিল তবু তোমার কতকটা দ্বন্দ্বভয় নাই। জগৎকার্যত্বা বস্তুত ব্রহ্মে ন। থাকিলেও তোমার জ্ঞানবস্তু, তদ্রূপ লক্ষ্য করাই তবুজের উচিত। নতুবা উচ্চৈশ্বর্য্যাবাস্তব যুগে, ত্যোক্তক ব্রহ্মান কোন-রূপেই হয় না। এইরূপ লক্ষ্যকে "ভত্বল-লক্ষণ" বলা যায়।

২। ব্রহ্মসিদ্ধির প্রতি যে মুক্তি অবশিষ্ট হইয়াছে, তদ্বারা কত্ব-কোক্ত্যাদিবিষিষ্ট সত্ত্ব উপবাদের সিদ্ধিও হইতে পারে। নির্ভগ ব্রহ্মের অস্তিত্ব বোকার করিতেই হইবে, প্রদর্শিত মুক্তি ত অশূন্য নহে।

৩। ইহা বলিতে পারি বুটে; কিন্তু বেদান্তের নির্ভর কেবল মুক্তির উপর নহে; বেদের উপর—শ্রুতিব্যাক্যের উপর। এতদ্ব্যতীত হইতে পারে, অহুমানো আভ্যন্তর ব্যটিতে পারে, মুক্তির অস্তিত্ব থাকি তৎপরে, কিন্তু শ্রুতিব্যাক্যের অন্তর্ভুক্ত কিছুতেই হইবার নহে। অতি অভ্যন্তর, অব্যভিচারিত এবং অশূন্যবীর। এরূপ প্রবল প্রমাণ দ্বারা কিছুই নাই? তাই দর্শনশ্রেষ্ঠ বেদান্তের ভিত্তি এই দৃষ্ট-শৈল। ইহুয় জিজ্ঞাস্য-কপাল, জ্ঞানধর্ম সূত্রকোষে "মূল এই শ্রুতি। এই শ্রুতি অবহেলা করিয়া যে সকল বর্ণন বা পারমিতিক কেবল মুক্তি, অহুসরণ করেন, তাহাশিপক্ষে মুক্তকর্ত্ত বলা যায়।"

পূন্যভাণ্ড চরণে ভিত্তি।

চাণ্ডালবাসীমটমাই ভিক্স।

"পদাধাতে ধ্বংস ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া চাণ্ডালগণের নিকট-ভিক্ষা করিতেছে।"

এই শ্রুতি আমাদের আশংকা দেরের আশ্রয়। যে মুক্তি বা অহুমান যে পরমাণে শ্রুতির অহুগমন করিলে, সেই মুক্তি বা অহুমানের তত্ত্বই প্রাণ। বধন শ্রুতি-উপদেশ দিতেছেন।

"দুঃস্বপ্নজা সর্ববিন" "হতো বা ইমানি কৃত্বানি জায়তে যেন জাতানি জীবন্ত-যং প্রবর্ত্তান্তি-নাবিশিষ্ট" অরিক্সাদিসং ভক্তস্বঃ "আনন্ডাত্মক ব্রহ্মানি ভূতানি জায়ন্তে," "সত্যং জ্ঞানমমন্ত"

ব্রহ্ম "আত্মা বা ইহমেক এবাং আমীং" "নিত্যঃ সর্বগতো নিত্যতত্ত্বো নিত্যতত্ত্বভূতমুদ্বলভাবঃ" ইত্যাদি।

অর্থাৎ জগৎকারণ ব্রহ্ম, সর্বজ্ঞ, নিপেদ, নির্ভগ, নিত্যতত্ত্ব, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তখন অহুমান বা মুক্তিসিদ্ধি জগৎকারণ, এইরূপ নির্ভগ ব্রহ্মই মুক্তিতে হইবে। ব্রহ্ম—সত্য জ্ঞান অনন্ত এবং আনন্দস্বরূপ, এই লক্ষণ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ।

শিব-মঙ্গলীত।

বেদাঙ্গ—একতাল।

হর!—প্রণামি আমি তোমারে।
অনল-মণিলা বিশ্ব-বিশ্বর,
হৃদয় আশ্রয় বর শশ্বর,
এহেন বিরোধী অলঙ্কার কাশ,
ত্রিপুরারি! একাধারে।

২
তোমারি শাসনে যম-বন্দনানর,
নিজ কর্ত্ত্ব হত বরুণ-সমীর,
হৃদয়কার হৃদয়ানর, প্রধর-
কর বিনয়কর বিতরে।

৩
করে করি প্রজ্ঞা আপনি কপাল,
গলে অস্ত্রমাল, পরি বাদ্যদাল,
অদ্বৈতে বিভূতি রুণ জটাজাল,
না'রে ভিক্ষা স্থলি আধারে।

৪
হইয়া ভবেশ ভিখারীর বেশে,
কর্ণ পরিভাণ্ড ময় উপদেশে,
বুঝিছে উদ্দেশ, নাশিবারে কেশে,
পাপ-তাপ-পূর্ণ সংসারে।

৫
যাতে পঞ্চানন স্বরূপ সন্নপ,
বৈষ্ণব তোমার হউক স্বরূপ,
ত্রিগুণাক্ষ রূপে ওহে বিশ্বরূপ,
দীপ্তও দাসের অন্তরে।

নিজস্ব ও পরস্ব।

"অহং"-জ্ঞানে পৃথিবী পূর্ণ। দূর্ণ দশ-দিক্তে দোষীপাশান। প্রকৃতিভেদে দূর্ণও নানা প্রকার।

অম্যকার এ প্রবন্ধ কেবল একটীমাত্রই সমালোচ্য।
দু-দিনে হউক, দশ-দিনে হউক, দু-বৎসরে হউক, দশ-বৎসরে হউক, অর্ধ-জীবনে হউক, পূর্ণ-জীবনে হউক, প্রবল চিন্তা-প্রভাবে জ্ঞানার প্রবল হইতে বাধ্য প্রকৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা আর কাহারও মস্তিষ্ক হইতে প্রকৃত হয় নাই বা হইবে না এবং তাহা আমারই "নিজস্ব", এরূপ একটা অতি-প্রবল দূর্ণ প্রায়ই সর্বত্র দেখিতে পাইবে। ইংরেজিতে বাহাকে "অরি-জিনালি" বলে, বাঙ্গালীরা তাহা "নিজস্ব" বলিয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, আচার, আইন প্রভৃতি সকল বিষয়েই এ "নিজস্ব"-দূর্ণ নিহিত আছে। কিন্তু সত্য সত্যই কি এরূপ দূর্ণ করিবার অধিকার, এ সংসারে কাহারও আছে? বাহুক বা নাই বাহুক, এইরূপ প্রশ্ন প্রায় উঠিয়া থাকে। অতি-বড় বিজ্ঞ বিজ্ঞান-সমাজেই এ প্রশ্ন শুনা যায়। আবার বিজ্ঞান-সমাজ হইতেই ইহার মীমাংসা হইবার চেষ্টা হইয়া থাকে।

বাহারা এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের কথা এই—আমরা পুস্তকের সারার কথি; কিন্তু জানী ব্যক্তিরা পুস্তকের আদর সর্বাঙ্গপক্ষে অধিকই করিয়া থাকেন। যেহেতু জ্ঞান ও গবেষণা অনেকটী পুস্তকেই অন্তর্ভুক্ত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, অন্বেষণ ও আলোচনা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা জ্ঞান-গবেষণার সুসূচীত্ব কারণ। ইহা জ্ঞান-গবেষণায় ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, মানুষ-মাত্রেই অসুখকণ-প্রবল। নৃতন ও পুরাতন প্রাতি-মুহুর্ত্তেই টানা-পোড়নে হইতেছে। এমন এক-গাছি স্থতা নাই যে, এই টানা-পোড়নে পড়িয়া একবার না একবার দুঃপাক খাইয়া আসিয়াছে।

কাহারও অসুখকণে খাভাবিক অসুখিক আছে, কাহারও অসুখকণ একান্ত আশংক্য হইয়া উঠে এবং কাহারও অসুখকণে অসুখ আনন্দ লুপ্ত হয়। কেবল পুস্তকে নহে; শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে, আচারে, ব্যবহারে অসুখকণ দেখিতে পাইবে! এমন কি ধরে, মণিরে, আমনে,

নামনে, কৃত্তাপি অসুখকণের অসম্ভাব নাই। দেখিবে—সকল নিত্য ব্যবহার্য্য কল-কক্সা পুনঃ পুনঃ উদ্ভাবিত ও পুনঃস্ফাবিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

জ্ঞানার্জের দিগন্তর, নৌকা, বাড়ির পোখুলন, কাচ, হস্ত, রেলওয়ে প্রভৃতি কতবারই শিশর, চাঁদ, পশু, জ্বরত প্রভৃতি স্থানে কালে উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং কালেই পোপ পাইয়াছে। "পাণ্ডুরে-করম-জাত শৈলের বাপ-কোমলে কাঁটে কাঠ নষ্ট করিতে পারে না—কাঠ যেন একরকম অজ্বর ও অমর হইয়া যায়। এই কোশল-শৈলনের উদ্ভাবিত বনিয়া পরিচিত; কিন্তু প্রাচীন মিশরে এইরূপ একটা প্রকব্রই প্রচলিত ছিল। সেই প্রকব্রে প্রাচীন মিশরের মৃত মানব-দেহ টারি সহজ বৎসর অক্ষত রহিয়াছে।

সত্য সত্যই-তবে "নৃতন" বনিয়া দূর্ণ করিবার অধিকার কিছুই নাই। জ্ঞানী জ্ঞানী ভাবিতে পারি, তুমিও তাহাই ভাবিতে পার। ভাবিতে যখন মানুষ-মাত্রেই পারে এবং ভাবিবার সুলাভার যখন সবারই এক; বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপিনী মন-প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক যখন সবারই সমান; তখন একে বলা। ভাবিয়া ঠিক করিলে, আর একজন তাহা পুথিবী-না, এ কথাই বা কেমন করিয়া বলিতে পারি?

আমি আজ বাহা ভাবিলাম, তুমি হয় ত কাল তাহা দেখিবে, সংবাদপত্রে কালীর অক্ষরে স্বর্গ-বিভাগ্য মুটিয়াছে। এক জন্তের সঙ্গে আর এক জন্তের কোন কালে দেখা নাই, এক জন্তের কথা আর এক জন্তের কোন কালে শোনা নাই, এক জন্তের ভাষা আর এক জন্তের কোন কালে জ্ঞান নাই; কিন্তু দেখিবে, পরস্পরের বিষয় বা ভাবাদির কোনকোন একটা অপূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটয়া গিয়াছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

এইটুকু সহজে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্বলে বাস্তবিক রামায়ণ এবং হোমারের ইলিয়াড উল্লিখিত হইয়া থাকে। রামায়ণ ও ইলিয়াডের বিষয়গত সামঞ্জস্যই বুঝাইতে অসুখ আর আমাদিগকে প্রায়শ শাইতে হইবে না। এটা অতি-বড় পুরাতন প্রশ্ন হইয়া গিয়াছে। তবে এখন কোন কোন বিচলন কুহিনান পণ্ডিত বনিয়া থাকেন, হস্ত ও হোমার, লুকানির রামায়ণ হইতেই, সার-সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাও

his own to the stature* of that he contemplates.”

ইহার ভাবার্থ এই, যিনি সন মুক্তিলাভী ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন তাঁহারি ভাবাদি দ্বিগুণিত হয়; আর যিনি জগৎকাহ্নত উচ্চতর বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির সাহায্য লইয়া থাকেন, তাঁহার ভাবাদি ক্রমে উচ্চতর ব্যক্তির মতই হইয়া পড়ায়। বেনেদিক্টস্ ব্রিটেন্সী গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

“Swedenburg, Behmen, Spinoza will appear original to uneducated and to thoughtless persons, their originality will disappear to such as are either well read or thoughtful; for scholars will recognise their dogmas as reappearing in men of similar intellectual elevation throughout History.”

ইহারও ভাবার্থ এই,—যাহারা অগাধ-অধ্যয়ন-শীল বা চিন্তাশীল, তাহাদের নিকট মুন কিছুই মনে হয় না; বরং যী ব্যক্তিদের ভাবাদি সমুদয় বুদ্ধিজীবীদের ভাবাদিতেই প্রতি-দ্বিগুণিত হইয়া থাকে।

কেনী কথার প্রয়োজন কি? মহর্ষি বৈশম্যাস প্রবীত-পুত্রাদিতেও উল্লেখ দেখিবে,—“অত্র চোদ্যাবতীনিমিত্তান্ পুরাতনম্”।

সারমগ্র-অপার সর্গভিত্তি বিদ্যমান; কিন্তু কয় জন সে সন তত্ত্ব রাখিয়া থাকেন বা রাখিতে পারেন? “রেনার্ড দি কলক্স” গ্রন্থে শতাব্দীর একাদশি জার্মান পণ্ডগুরু। লোকে জানিত, ইহা কাহারও অজ্ঞকরণ বা অস্মরণ নহে; বাবারই এই বিশ্বাসই চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বিখ্যাত ভাবতত্ত্ববিদ জার্মান গ্রন্থকার গ্রিম ইহার একশত বৃন্দগুরুসকল রচিত টিক এইরূপ গ্রন্থের র্ত্তক অর্থ আবিষ্কার করেন। বাহিরের কথার আর কল কি? বরের কথাই বলি। কেন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশেই বলিয়াছেন,—

“অথবা কৃতবাহুদ্বারে বরুণমধিন পূর্নস্মৃতিভিঃ।
মণৌ বজ্রমুদ্যকীর্ণে হৃদয়োগ্রাভি যোযিতঃ।
একপ কথ্য তিনি ‘শকুন্তল’ সম্বন্ধে না বলিলেও, শকুন্তল-সম্বন্ধে সার-সংগ্রহে মহাভারতের শকুন্তল-উপাখ্যান হইতেই হইয়াছে, তাহা এখনও অনেকেরই বিশ্বাস। আবার অনেকেরই

ধারণা, হর্সারির অবতারগাও অতিজ্ঞান-অসুখীয় ব্যাধিরাশি কালিদাসের কল্পনা-সমুত্ত; বস্তুত কিন্তু তাই নহে। এ বিষয় পদ্যপুস্তকের স্বরূপেও শকুন্তল-উপাখ্যানে বিস্তৃত আছে। এখানে সংক্ষেপে সেই সামঞ্জস্যই বুঝাইবার খর যাওক।

রাজা হুমন্তের বিরহে শকুন্তলা তন্দ্রা; হুতরায় ব্যাধ-জ্ঞানবহিনী। হারে ‘হর্সারি’ অতিথি-বিশেষে দণ্ডায়মান হইয়া, উচ্চাধরে বলিলেন,—“কে বাঁধ চাহিয়া দেখ, হর্সারী ভোজন ভ্রম সমাপ্ত হইয়াছে।” শকুন্তলার তাহাতেও সংজ্ঞা নাই। হর্সারী অতিশয় বলিলেন,—

“আঃ অতিথিপরিত্রাণি!
বিত্তিস্তস্তা যদনন্তরং যমঃ।
তপোবান্বেদ্যেদি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিত্যতি কান্ ন স যোগিতোযশস্।
কথ্য প্রমত্তঃ প্রথম কৃতনিবন।”

অতিজ্ঞান শকুন্তল।

পদ্যপুস্তকে দেখুন;—

“হুঃ হুঃ চিত্তরসে বালে। মনসানন্তবৃত্তিনি।
বিস্মরিত্যতি স ত্বাং বৈ অতিথৌ যৌনশালিনীম্”।
ইহার পর শকুন্তলা-সখী প্রিয়বদা বিদ্য-নন্দবচনে মনুবরের কৈশিকাভি করিয়া, প্রসন্নতা লাভ করেন। মনুবর তখন প্রসন্ন হইয়া বলেন;—

“মম বচনম্ অন্তথা ভবিষ্যৎ ন অর্থিত। কিন্তু
অতিজ্ঞানাতরগর্ভনেন শাপো নিবর্তিত্যতি”।

অতিজ্ঞানশকুন্তল।

এই টুকু শব্দ অনস্মরণ্য নিকট প্রিয়বদার মুখে প্রকাশিত হয়, হুতরায় “শকুন্তলা” ইহা প্রাকৃত ভাষায় প্রকটিত।

পদ্যপুস্তকেই আছে;—
“বিস্মৃতিস্তত্ব রাজর্থেস্তাবদেব ভবিষ্যতি।
প্রিয়বদে! নৃপো বাবদতিজ্ঞানং ন পশতি।”
দেবরাজের আদেশে দেবপণের অবধা অসু-গণের বধগ্রস্ত হুতরায় অতিজ্ঞানাদি বিবরণও পদ্যপুস্তকেই প্রকটিত আছে; ইহা কালিদাসের কল্পনা নহে। ব্যাভারতের এতৎসম্বন্ধে সন্নিবৃত্ত আলোচনা-করিবার ইচ্ছা রাখিল। আদ্যোপাখ্যানে দেখিলে বুঝা যাইবে, শকুন্তলার সারমগ্রই মহাভারত-ইহাতে না হইয়া, পদ্যপুস্তক হইতেই হইয়াছে।

কালিদাসের অনেক উপাসঙ্গিও পূর্ব বা আংশিক আভাস প্রাচীনতম পুত্রাদিতেও যে পাওয়া যায়, তাহার তত্ত্ব বা কল্পনা রসিক সঙ্করা বিরহ-বিদ্যা শকুন্তলাকে পদ্যপুস্তকের বাতাস করিতেছেন। শকুন্তলার তাহা অসুখই হইতেছে না। এইরূপ ব্রহ্ম-বৈবর্তপুস্তকেও দেখিবে, কুম-বিরহিণী রাধিকা পদ্যপুস্তকে শায়িতা; কিন্তু পদ্যপুস্তক বিরহ-তাপে ভকতিয়া হইতেছে।

এমন তা-সামঞ্জস্যেও উদাহরণ বহু পরিলক্ষিত পায়। “কালিদাসের কুমারসম্ভব গ্রন্থে নিম্নপুস্তকের উত্তর খণ্ডের প্রয়োজন অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিলে বলিতে হইবে, শিবপুস্তকের পার্শ্ব-অর্থ-বিরহপাদি কুমারসম্ভবে প্রকটিত হইয়াছে। এ সামঞ্জস্য বুঝাইতে হইলে পাঠ্য গ্রন্থেরই নানা প্রাক উচ্চত করিতে হয়। পার্শ্ববর্গের কতক কোঁহল নিবারণে অত্র পোটা-দুই উপায় এখানে উচ্চত করিলাম। পার্শ্বতীর জন্ম-উপায় কুমারসম্ভবে স্থিতি আছে;—

“প্রসন্নবিক্ত পাণ্ডববিজ্ঞানাত
শম্ভু খনানিস্তরপুস্তকটি।
শত্রুরিণাং স্বাস্তবজ্রমানাং
স্বাধ্যায় তজ্জন্মদিনঃ বহুশ্চ”। ১-২৩।

শিবপুস্তকে আছে;—

“বিশঃ প্রসন্নঃ পবনঃ স্বধং বনৌ।
শম্ভুনিমগ্নগর্ভনেন শাপো নিবর্তিত্যতি।
পদ্যত যৌনৌ কুম্ভমঞ্জলিশূন্য।
বহুত তজ্জন্মদিনঃ স্বপ্ৰথমম্”।
কুমারসম্ভবে ইহের নিকট কামবদেব বলিতেছেন,—
“কামেকপত্নীতরুণশীলীশা।
গোলং মনঃস্রাক্ত্যতঃ প্রবিষ্টম্।
নিকসিনীমিস্তসি শকুন্তলাং
কঠে স্থয়োগ্রাধনিবজ্রবাহুম্”। ৩। ৭।

শিবপুস্তকে আছে;—“করিয়ে কাং সত্যী দেব।
তদায়ে তাকলজ্জাকাম্”।

সংস্কৃত-চর্চায় এ দুর্ভিক্ষ-দিনে সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনার হয় ত অনেক পার্শ্বই বিরক্ত হইবেন। কিন্তু তা-সামঞ্জস্য ভারতে কথ্য উল্লেখ অনেক সত্যেরই আসন শূন্য হইয়া যায়; তখন কেবল একটা সঘন-পতীর নাসিকা-গর্ভনে, জনককল-হৃদয়ে সত্যেরই অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। এই সংস্কৃত-চর্চায় সেইরূপ অবস্থা ঘটিলে অনেকটা সম্ভবনা; হুতরায় এখন সংস্কৃত অর্থাৎ বাস্তবায় বীণা বাউক।

বাস্তবায় দিলে, বদের সুবিখ্যাত সুবিক্ত গ্রন্থকার পশ্চিম বাবুর গুপ্তকাবলী বিবেচন করিলেই করিতে হয়। সেও বড় সোজা সঙ্করা নহে। সংক্ষেপেও ইহার নহে। বস্তুম বাস্তবেও যে উপজ্ঞানাদি লিখিত-অপরের অল্প-বিস্তর সাহায্য লইতে হইয়াছে, তাহা তিনি কয়েকখানি পুস্তক ছাড়া আর সকল পুস্তকেরই হুতরায় শীকার করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা “আইভানহো” য় হুগেন্স-লিনী, রজনী কা “পুয়ার মিশ্‌ফিক” বিবৃক কা “মিটিং-ক্যান” ক্রমচরিত বা “হাসক্ এও কায়সেনা” প্রভৃতির আলোচনা করিবার নহে। তবে এইটুকু সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, সীতারামের রাণী রমার চরিত্র-চিত্রাশনি দেখিলে, সেসুগমিগ্ন-কর্ত্ত “উইকল টেলের” রাণী “হাসমিগনেন” কথা মনে পড়ে। যদি পরম্পর-পরিমাণ একটু রহিয়া গিয়া পণ্ডিত্যত হয় এবং ঈশ্বরের কৃপায় একসম সমাধাও পুষ্টিম্, নী টটে, তাহা হইলে বস্তুম বাসু, কন, অভ্যস্ত প্রতিবন্ধ। বাসানী ও ইংরেজি গ্রন্থকরদের এক এক খানি গ্রন্থ লইয়া সাধ্যাশ্রমে তুলনা-মাপোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যদি সাংসে কুর্গীয়া উঠে এবং ক্ষমতাও পাই, তাহা হইলে, সংস্কৃত-সাহিত্যাদি চর্চায়ও প্রবৃত্ত হইব।

এখন আমাদের সেই মূল কথা,—“বীতি নিজস্ব” কোথাও আছে কি না। পণ্ডিত্যোচনাত প্রতিপন্ন হয়, কোথাও আছে। এ সংসারে বড়ই অপ্রভু। “বৈদ্য” “বেদই বীতি স্ব-সারসম্ভব।
পরমোটা ব্রহ্ম, বিশ্বব্রাহ্ম হইতে উৎপন্ন পদ্যপুস্তকে প্রবেশ করিয়া পয়মন তাহার আদি-কৃত নিরুপন করিতে পারেন না, সেইরূপ বেদের আদি-কৃত নিজস্বত্ব হয় না। মোক্ষ-মূল কুল না পাইয়াই বীতিয়াছেন,—

“The most ancient of books in library of mankind.”

ইহাই বলিয়া তাঁহার স্মৃতি-নহিলে আর উপায় কি? যাহা অস্মরণ্যে এবং যাহা ভগবৎ-বাক্য, তাহার আবাস মূল কোথায়? তাহার আবার আদর্শ কি? আমাদের পুরাণ, ওয়, স্মৃতি ইতিহাস এই-সমস্তসম্পন্ন বদেরই নিদান।

শাশ্বতই আছে—
“ইতিহাস-পুরাণক পদ্যো বৈদ্য উচ্যতে।”

শ্রীমদার্ণব ১। ১মধ্যক. ৪। ২।

মহাভারতে বোধার্থে বিবৃত হইয়াছে। তাহা
হইতে স্ত্রী জাতি এবং শূদ্র প্রভৃতি বর্ণও ধর্ম্মার্থ
জানিতে পারে। স্বয়ং বেদব্যাসই বলিয়াছেন—

“ভারতবর্ষাৎ যস্যৈব ব্রাহ্মণ্যর্থঃ প্রসিদ্ধিঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাণি স্ত্রীহান্দ্রীভিরপ্যুত।”

ব্রীহস্পতি ১ম স্কন্ধ, ৪। ২২।

পুত্রাণাং অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন নির্বিল
বেদার্থের সারসংক্ষেপই বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া
আছে। বৈব ভিন্ন ইহাদের আদর্শের আর
কিছুই নহে; একত্ব কেই অস্বীকার করিতে
পারিবেন না।

এখন কথা হইতেছে, যদি সত্যের জড়িয়া
সার-সংগ্রহ-প্রক্রিয়া চলিল এবং “বীতি নিম্নং”
মন্ত্রিয়ার যদি সত্য-সত্যই কিছু না, রহিল, তবে
একপক্ষে বাহ্যিক বা কালিয়ার, হোমের বা সেকস-
পিয়র, জয়দেব বা চণ্ডীয়ার, কবিকল্প বা ভারতচন্দ্র,
বঙ্কিম বা মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের এত
প্রতিভা কেন? ইহার উত্তর দিতে হইলে
অনেক কথা বলিতে হয়। অন্য এক কথা বলি,
যিনি সারসংগ্রহে সারসংযোগ এবং সৌন্দর্যের
স্বাভাৱিক সমাবেশ করিতে পারেন, তাহারই কীর্তি
অতুলনীয় এবং তাহারই প্রতিভা বরাণীয়া।
কালিদাস সমগ্র সৌরভগুণের সৌন্দর্যসম্ভার
সংগ্রহ করিয়া শব্দভাস্যকে সাজাইয়াছিলেন। তাই
পেতে বলিয়াছেন,—

“Wouldst thou the young year's
blossoms and the fruits of its
decline,

And all by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed?
Wouldst thou the earth and heaven
itself in one sole name combine?
I name thee, O Skkontala! and
“all at once is said.”

পেটের কথা অন্তর জাগ্রাণ ভাষায় নির্বিল।
ইহার অন্তরে অন্তরে ইংরাজিতে অনুবাদ
হইয়াছে।

ল্যাণ্ডার সেক্সপিয়রের সৌন্দর্য-স্মৃতি-মন্ডিতে
বিমোহিত হইয়া বর্ণনা করেন,—

“He was more 'original than his
originals. He breathed upon dead bod-
ies and brought them into life.”

শায়ন পূর্ণ-শশীর সহিত প্রেমসৌর হৃদয় মুখ-
খানির তুলনা হয়। হৃদয়ের আলোক না থাকিলে,
চন্দের দেখা কোথায় পাইতাম? মলভোজী
মন্দিরকারও ক্ষুদ্র-অঙ্গে বিচিত্র সৌন্দর্য দেখিয়া
হৃদয়শীল প্রকৃতির বরপুত্রবর্ণ-সহস্রের সহস্রবার
মস্তক আনন্দ করেন। কিন্তু সৌন্দর্য সংগ্রহ
করিতে এবং সৌন্দর্য দেখিতে জানে কয় জন?

মহাবিদ্যা-মাধন।

দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা—তারাধ্যান।

প্রত্যাহাচপদাণি তালিশবৎ যোরাটাসাপরা
ব্রহ্মোদ্যায়কর্ষণরত্নাঃ হকারবীজোত্তমব।
বর্মানীলবিশালপিঙ্গলজটাজুটেকনাগৈর্দ্বতা
জ্যোত্স্নকপালকক্লীপতঃ হস্তাশ্রয়তারাধনম্ ॥

যাচা।

সকোটা দান্বণ্যপন প্রমারিত বাম।

পরে পরে বিপরীত চরণের ঠাম।

প্রত্যাশীত তীরে বলে শঙ্করদাবনী।

শব্দেপরে অটহাসি সমুদ্রজলি।

হস্তকর বীজোত্তম বনীগবরনী।

লম্বোদরা চতুর্ভুজা শঙ্করগহনী।

ইন্দ্রাবরী বজ্রকান্দি বর্ষাবারিনী।

কম্বুক এককোটা স্তম্ভাভোষণনী।

নন্দিতুতমোনিব বাধাস্বরপনী।

জগৎনাশিনীরূপে শোভে উত্তমতারা ॥

তারাশোভা।

মহাউগ্র তারা আদ্যা, “তুমি না দ্বিতীয় বিদ্যা,
লম্বোদরা হনুলগবনী।

কান্দি বজ্রা নীলগহন, বর্ণের শোভিত ভূজ,
পদভরে কাঁপাও ধরনী।

নীলগণে সমমুতা, হয়ে মহা ক্রোধমুতা,
বিস্ময়ে নিমগ্নে কর জলে।

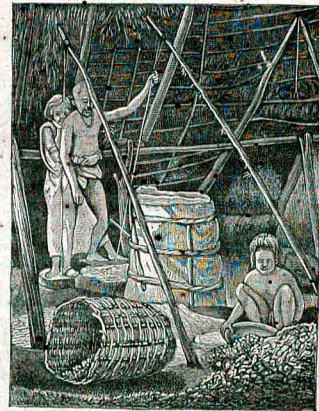
যারা ক্রি জ্ঞানমুগ্ধ, জানিয়া কিবিশ্ব অন্ত,
পুরাণ প্রকাশে তপোবলে।

সে নীলপর্কতকুটে, আনন্দ-হৃদয় হুটে,
তোমার চরণ-রজ হতে।

ভক্তি-আকাশের ইন্দু, তোমার করুণাবিন্দু,
প্রার্থিত কবিতা বিধিমেতে।

হৃদয়ের শিখার হেতু, না তব চরণ-সেতু,
তুমি নীল-সমুদ্রতী বাণী।

পদ্মা গঙ্গা রচনার, তুমি ভরসার সার,
প্রমাণ স্তন গো ভবরাণী ॥



লৌহ।

উপরে কে যে ছবিখানি দেখিতেছে, উহা বামা
ও ভাষার খানী নৃত্যমের। ইহাদের নিম্ন
ছোটোপদপুত্র, লোহারডাণ্ডা লিখা, যাহাকে অনেক
রাতিরা জিনা বলিয়া জানেন। জাহিতে ইহার
অপরীয়া। অপরীয়া আশ্রয়দিগকে অস্ত্র
বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বলে—ছোটোপদপুত্র
আমাদের আশ্রয় নির্বাসনস্থান নহে; আশ্রয়দিগের
পূর্ণপুত্রেরা আরা অকল হইতে আশ্রিয়া এখানে
বসতি করিয়াছিলেন। পলায় আশ্রয়দের সজো-
পবীত ছিল; স্বীকার করি কৃষিকার্য্য অবলম্বন
করিতে হইল বলিয়া আমরা ইহা এখন পরিচয়
করিয়াছি। আশ্রয়দিগের অস্ত্র-হইলেও, ইহা-
দিগের আচার ব্যবহার জ্ঞান কোন বিষয়ে অজ্ঞাত
সজোজি হিন্দুদিগের সত নহে। ইহাদিগের মধ্যে
বিধা-বিবাহ প্রচলিত আছে। নৃত্য দেখে হৃদয়
করিয়া ইহার অস্ত্রোত্তীর্ণ সঙ্গের ভবিষ্য থাকে।
তবে কিছুদিন পরে বড় বড় হাড়গুলি কুড়িয়া লইয়া
গদার জলে প্রক্ষেপ করিয়া আনে। অপরীয়া

ও আশ্রয় এই-ইহুই নামে বিশেষ সাধু দেখা
বাহিতেছে।

যাহা হউক, বামা ও নৃত্যমের নাম ধাম
কুল-বন্দ্যাদ্য সম্পর্কে অল্পোদের বিশেষ আলোচনার
আবশ্যক নাই। ইহার কি কাজ করিয়া দিনপাত
করে, তাই লইয়াই আমাদের কথা। বামা ও
নৃত্যম ও তাহাদিগের হুইতি ছেলের প্রস্তর হইতে
লৌহ বাহির করে, ও সেই লৌহ কর্ম্মকারদিগকে
বিজয় করে। তাহাতেই অস্ত্র করে ইহাদিগের
ভাষণপোষ হয়। সেই কাজ করে বলিয়া সকলে
ইহাদিগকে লৌহ-অপরীয়া বলিয়া থাকেন।
লোহা হয়, তজ্জন্ম রাতি কিলার নাম লোহারডাণ্ডা
হইয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। রাতি-
গন্ধের দিকে ধারার কখনও বেড়াইতে গিয়াছিলেন,
মার্তে ছোট বড় কত পাথর পড়িয়া আছে, তাহার
গোঁড়া থাকিলে। এক একখানি পাথর দেখিতে
ঠিক লোহার মত, তাহাে ভুলিয়া দেখিলে য় তারি
বিশিষ্ট দেখে হয়। ইহাতে অধিক পরিমাণে লোহা
আছে। অনেক জাতীয় প্রস্তর, ও মৃত্তিকা লৌহ
থাকে; সে কথা পূর্বে বলিয়া। বামার হুইতি ছেলে
একপদ পাথরজুড়িয়া আনে ও সকলে মিলিয়া

তাহা চূর্ণ করে। বামাদের একটা আঁখো। সেই ভাঙিটা অনেকটা চূর্ণ পোড়াইবার ভাঙির মত দেখিতে। ইহা মূৰ্খতা বিয়া গঠিত, গোলাকার, প্রায় তিন-হস্ত উচ্চ। তলভাগে মেয়ে। মেয়ের আধ হাত উপরে ছায়ে। ছায়ে হইতে ভাঙির চূড়া পর্যন্ত মাটি দিয়া বুজানো, কেনক মাঝখানে-একটা হুড়ঙ্গ। হুড়ঙ্গের উপর-মুখে কিছু ছিলেই মেয়েতে গিয়া পড়ে।

নতুনায় প্রথমে মেয়েটিকে কাটের করণা মনিয়া দেয়। তাঁর পর উপর হইতে মুঠা মুঠা করিয়া গিয়া হুড়ঙ্গটাও করণায় পরিপূর্ণ করা হয়। হুড়ঙ্গা হুড়ঙ্গের করণা ও মেয়ের করণা এক হইয়া পড়ে। তাঁর পর নিচেতে একই আতুন গিয়া জাঁতার তাও ছিলেই সমুদায় পরিপূর্ণ দিয়া উঠে। জাঁতার তাও কিছু উপর হইতে দেওয়া যায় না, নীচে হইতেই সোকে গিয়া থাকে। ভাঙির তলভাগে যে মেয়ে সেই মেয়ের এক পায়ে একটি ছিট ছায়ে। ছিটটিকে একটা মাটির নল লাগানো থাকে। মাটির নলের সহিত জাঁতার বাঁশের চোয়ের যোগ। বদি মাঝখানে একটা মাটির নল না রাখা যায়, তাহা হইলে বাঁশের চোয়টা যে পুড়িয়া বাইবে, আর জাঁতিট যে নষ্ট হইয়া বাইবে। ভাঙিতে বাতাস বিবার জন্ত এককোণটা জাঁতার আবশ্যক। জাঁতাগুলি দেখিতে ঠিক জাঁতারেশের মত, কাঠের খোল, ছাপলের ছালে ঢিলে-ঢিলে ছাওয়া। জাঁতার এক দিকে বাঁশের চোয়, বাহা দিয়া ভাঙির ভিতর রডাসা বায়; অপর দিকে একটী ছিট, বাহা দিয়া বাহির হইতে বায় আসিয়া জাঁতাকে পরিপূর্ণ করে। ভাঙির দুইদিকে ছিটি কাঠের খুঁটি ঢেঁকি-কল ভাবে ভূমিতে সংলগ্ন আছে। ভাঙিদিগের মাথার হাড়ি বারিদা নীচে হইতে টানিলে দুইটা ছিটের, আবার নোঙ্গু দিলেই 'আপনি-আপনি' উপরে উঠিয়া পড়ে। এই বড়ির আর দিকটা জাঁতার চর্চের সহিত ঢানো, ঢানো ভাবে রাখা। উপরে কাঠের ঢানো জাঁতার চর্চ তাই সর্বদা বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে। জাঁতার বাহির দিকে যে ছিটিট আছে, তাহাকে কিয়ৎদূরের নিম্নস্থ বক করিয়া চর্চের উপর চাপ দিলেই, খুঁটি নষ্ট হইয়া পড়ে, আর চর্চের, ভিতর যে বায়ুস্থ থাকে, তাহা কৌশল করিয়া বাঁশের চোয় দিয়া ভাঙিতে প্রবেশ করে। বাহিরের ছিটটা এই সময়

বুলিয়া দাও, চর্চের উপরে চাপটা ছাড়িয়া দাও, অমনি খুঁটির মাথাটা উপরে উঠিয়া পড়িলে, খুঁটিতে আর জাঁতাকে যে দড়ি বাধা আছে, তাহাতে টান ধরিবে, আর বাহির হইতে বায়ু আসিয়া চর্চকে পরিপূর্ণ ছায়ে। আবার ফের চর্চকে চাপিয়া ধর, ফের সেইরূপ বায়ু গিয়া ভাঙিতে প্রবেশ করিবে। এখানকার লোকেরা পায়ে ভর দিয়া জাঁতাকে চাপিয়া ধরে। জাঁতার উপর-যেই একবার পা রাখে, অমনি কৌশল করিয়া ভাঙিতে বাতাস থাকে, তা তুলিয়া লইলেই জাঁতা বাতাসে পরিপূর্ণ হয়। অপর পায়ে হারা বাহিরের ছিটকে একবার বক, একবার মুক রাখিতে হয়। পাশা-পাশি হুইটী জাঁতা রাখিয়া লোকের কাজ করে। একবার এটীতে পা, একবার গুটীতে পা, এই করিয়া ক্রমান্বয়ে দুইটী জাঁতা হইতে অধিকতর ভাঙিতে বাতাস যাইতে থাকে। একেমন দুইটী জাঁতা চালাইতে গেলে ভালরূপ ভর পড়ে না, আর লীজই নতুনায় আশ্রয় হইয়া বাইবে, তাই সে আপনায় জাঁকে ক্ষেপে লইয়াছে। পড়াই হইতে বান্ধা তাহার কানের বুরিয়াছে, আর খুঁটি-পুঙ্খবে দুইদিকে মিলিয়া জাঁতা চালাইতেছে। অকস্মাৎ মধ্যেই করণা ধরিয়া উঠে; ভাঙির ভিতর কি মেয়েতে কি হুড়ঙ্গের আতুন গ্নু গ্নু হইয়া হুড়ঙ্গের করণা পুড়িয়া অগ্নিগামী হইতে থাকে। অঙ্গার অগ্নিগামী হইয়া হুড়ঙ্গের উপরিভাগ ক্রমে খালি হইয়া পড়ে। এখন সেই যে সকলে মিলিয়া তাহার প্রস্তর চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কিয়ৎকাল হুড়ঙ্গের মধ্যে ঢালাইয়া দিতে হয় ও তাহার উপরে ফের করণা সামুয়াইয়া দিতে হয়। এক বাক পাথরের গুঁড়া, এক বাক করণা ক্রমাগত হুড়ঙ্গকে পরিপূর্ণ করিতে হয়। যেমন করণা পুড়িতে থাকে, পাথরের গুঁড়া ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ওসময়ই পলিতে থাকে, আর পলিটা তুলার ভাঙির মেয়েতে পড়াই জন্য হয়। এই দলীত প্রস্তর ধূসরে মিশ্রিতভাবে ওসময়ই প্রস্তুত করে। লৌহ ভিন্ন প্রস্তর আর-যে কিছু পদার্থ থাকে, তাহা গলিয়া তল ভাবে উপরে ভাসিও থাকে। মাঝে মাঝে ভাঙির পায়ে ছিট করিয়া উপরিস্থিত এই স্লেম বাহির করিয়া দিতে হয়। এইরূপে এই প্রথন কাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রস্তুত কর ও করণা মেগোয়াইল, ভাঙিতে অনেক খানি লৌহ জমিয়া

বায়। তখন শেখলেক একবার জাঁতায় বন বন ভর দিয়া অধিকতর প্রস্তুত করিতে হয়। তার পর ভাঙির মুখে মাটির নলটা ভাঙিয়া ফেলিয়া সেই পথ দিয়া লৌহ বাহির করিয়া থাকিতে হয়। এই লৌহ সম্পূর্ণ ভরসাভাব ধারণ করে নাই, স্বল্প অবশিষ্ট শিঙাকারে ইহা ভাঙি হইতে বাহির হইয়া আসে। সম্পূর্ণ বিত্তও নয়। প্রস্তর-মিশ্রিত অপরূপ দ্রব্য (মাথার কণা) যাহাকে লৌহময় বসিয়া থাকে ও কলকার গুঁড়া, এখনও-ইহার সহিত অধিক পরিমিত মিশ্রিত থাকে। তাই বাহির করিয়াই বর্জকর্ষণ করিয়া থাকতে হইলেক বস্তুপূর্ণ পিটিতে হয়। তাহাতে অমার জয়সমূহ ধূসে গিয়া পড়ে ও লৌহ ক্রমে নির্ঘন হইয়া আসে। একবার পিটিলেই লৌহ সম্পূর্ণভাবে বিত্তও হয়। আবার হুই চারিবার হারিয়ার পোড়াইলে ও পিটিলে তবে ঠিক হয়। কোনও কোনও লৌহ-নিষ্কাশক লৌহক সম্পূর্ণরূপে বিত্তও করিয়া ভবে লৌহার ও কর্ণকারিতাকে বিত্তর করে। আবার কেহ বা তাহা না করিয়া অন্তত স্বহায়েই বিত্তর করিয়া কলে। কর্ণকারের আরও পোড়াইলে ও পিটিয়া আশানুযায়ের করিয়া লয়। ছয় বর্গটা গুলিয়া পরিষ্কর করিলে ভাঙি হইতে যে এক বণ্ড লৌহ বাহির হয়, তাহাকে "প্রিরি" বলে।

লৌহের উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান-মহলে একটা আশ্চর্য প্রণয় প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন কালে লোহা হইয়া নামে একটা দুর্দান্ত দেবতা ছিল। বোরডর তপোবলে সে এরূপ বলশালী হইয়াছিল যে, স্বর্গের দেবতাদের তাহার ভয়ে কল্লিত থাকিতেন, এমন কি ইন্দ্রকেও তাহার নিকট পরাজিত হইয়া স্বর্গহবে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। লোহা হইয়া স্বর্গ-নিবাসনে উপস্থিত হইয়া শতকে লইয়া পরম হর্ষে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল। ইন্দ্রবৎ পথের ভিচারী হইয়া কখনও মর্তে, কখনও পাতালে, কখনও মাঠে, কখনও বাটে। অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। শ্রুতকাল রাজত্বভোগে গঠিত। এ হুকোমল দেহে এরূপ অসুখ-বদন্তের ক্রেশ আর কদিন সম্ব হইয়া থাকে? আর সাহসেই না পারিয়া তিনি রক্তকেশ, মলিনবস্ত্রে দেবারিদের, মহা-ধর্মের নিকট গিয়া কদমিতে লাগিলেন। অনেক

কাল-কালনার পর দয়াময় মহাদেব তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন। কিছু সদয় হইলে কি ইহাকে, গুলিকে নিজেই লোহাধর্মের বর দিয়া বসিয়া আছেন যে, বিত্তর করাই হউক, ইন্দ্রের বজ্রই হউক, জ্বরি, বদন্তের পাশই হউক, দেহ, দানব, যক্ষ, রক্ষ, ক্রিমর, গরুড়, শিশাচ, মহদ্য মধ্যে যে কোন অন্ত প্রচলিত থাকুক, তাহা দিয়া লোহাধর্মের মারিলে তাহার গর্বে কাড়চুটা পর্যন্ত সাপবে না। সুতরাং বড়ই শঙ্করের কথা। অতঃপর ভাঙিয়া "চিঙ্গিয়া" থাকিলে একটা মনুষ্যের বহন করিলেন। তাহাকে কামারের মজ্জায় মজ্জিত করা হইল। কিন্তু কি স্বর্গে, কি মর্তে, কি পাতালে, তখন হুতাপি একটাও কামার ছিল না, কামার রাখাকে বলে কেহই জানিত না। তা, কামারের সজ্জা কোথা হইতে আনিবে, তাই সেই কামান-নির্ভরগীতী ভক্তধাম ভবানীপতি নিজের 'আসবাব' ভাঙিয়া-চুরিয়া জাঁতা হাড়টী প্রভৃতি কর্ণকারের আশ্রয়-স্থান-সমূহ গড়াইয়া দিলেন। ভদ্রকটী ভাঙিয়া হইল হাড়টী, মড়ারমাথার খুলিখানি একই পিটিয়া-পাটীয়া হইল নেভাই (যোহার উপর স্বর্গকর ও কর্ণকারের ক্রোম ভ্রম্য বাহিয়া হাড়টীর দ্বা মারিয়া থাকে), সাপটীকে বাকাইয়া হইল চিটাট। এইরূপ আয়োজন দেখিয়া শরব-বাহন বাড়টীও চূর্ণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের প্রতি সন্মত হইয়া তিনিও আপনায় গায়েই একই ছাল বুলিয়া গিলেন। তাহায়েই জাঁতা বোড়াটা প্রস্তুত হইল। মহাক্ষেপে এইরূপে হুমজিত করিয়া ভবানীপতি তাহাকে আশ্রম করিলেন, স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ইন্দ্র হুতি লোহ পাঠেতেছে, ইন্দ্রের নিমিত্ত অতি ক্রোধসহস্রকঃ সচিত, বায়ু হ্রস্ব কর, সেই দুর্জয় দানবপুত্রকে স্ত্রীহই বধ কর। এইরূপে হুমজিত ও আদিত হইয়া 'দুহুং' 'দেবি' 'দুহুং' 'সে' ভৈরবের মহা 'মহা' লোহাধর্মের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁর পর পর্বতভাগ লোহা-ধর্মের এই কীটস্রুত সামাজ্য মহাক্ষেপে হুতাকারী দেখিয়া আর-পুন-না' প্রমিত হইল। মনে মনে ভাবিল, তাই চো, -এ যে সেই বাঙ্গলার রসময় দেখি-কলিকালে বাহা বসিলেন, আজ তাহাই দেখিতেছি। বাঁশেরা, মলিনবস্ত্রে দেবারিদের, মহা-ধর্মের নিকট গিয়া কদমিতে লাগিলেন। অনেক

না হইলে যুগ-যুগান্তের পরে রম্যর বাবু কি বলিলেন, লোহাঙ্গর কেমের করিয়া জানিলি? রম্যর কবি একবার একজন 'সমুদিশালী' তক্তার জমিদারের বাড়িতে কিছু বিদ্যা পড়ইবার প্রত্যাশায় গিয়াছিলেন। দক্ষিণাটা—কিছু মনের মত হয় নাই। এ অবস্থায় কবিগোলা চুপ করিয়া চমিয়া আসিলেন, এর কথা তো কখনই হইতে পারে না। যুগস্থানী পাঠক ভাষা পাড়িতেছেন সেমিয়া তৎক্ষণাৎ মনে মনে একটা কবিতা রচনা করিলেন, ও বাবুকে তখনইয়া বলিলেন,—

“ভায় রেণ কব গেছেন শয্যা সেনাপতি।
মোগল গেছেন পাঠান গেছেন ফাঁশী ঝাঁ আজ
ভাতি।”

এই কথা বলিয়াই প্রস্থান। লোহাঙ্গর জবিল, ইন্দ্র চন্দ্র বাবু বরুণ সকলেই রূপে পরাভব লেন, রম্যরকানন এই কর্ণদেশে আমি বাবুগেল একাধিপত্য-অধীন করিয়া, আজ কি না মর্কটের মত একটা মানুষ আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চায়। এই রহস্ত চিন্তা করিয়া হাঙ্গ মনঃবর্ণ করিতে পারিল না। হাদিয়া মনঃবর্ণ করিল,—
তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না,
তোমার মত-সামান্য কাটকে আমি বন এক
পালে-বাইয়া ফেলিতে পারি, তা আবার তোমার
সহিত যুদ্ধ কি করি? যেকোন আমাকে উপহাস
করিবে, মার বাহা বলে করিয়া যও। মনঃবা
নিরুপায় দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। আপনেষ
লাবকে-বলিল,—ভাল প্রস্তুত যি তুমি, এত
বশালী, সত্যই যদি তুমি অমর, তোমার আশ্রয়
কি-কিছুই না থাকে, তবে আমি একটা
কথা বলি, তাহা-করিতে পারি তা যদি
করিতে পার, তবে আমার মনে বিশ্বাস হয় যে,
যথার্থই তুমি অমর অমর, আর তাহা হইলে
তোমার সহিত যুদ্ধ আর কি-করিব, কাজে
কাজেই যেরূপ করিয়া বহিষ্ট। দান উত্তর গিয়া,—
বল, আমি আবার করিতে না পারি কি? মনঃবা
বলিল—একটু রও, আমি এই খানে কাটা দিয়া
একটা ভাটি গড়ি, সেই ভাটির পায়ে আমার এই
জাতনী বসাই, আর তাহার ভিতর কলা সাজাই,
তুমি যদি সেই কলার উপর থাকি-মধ্যে-ভাজ
স্বিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে
দুখি হই। বৈদ্য বটে। দানব তৈয়া কৃত প্রেতেরা
প্রায়ই বোকা হইয়া থাকে; তাহারা বড় ফের

কমি বুঝে না; পায়ের বদলেই তাহারা জগৎকে
সরা-মুদা দেবে। মজলব বুঝিল যে পায়ের
বদলে সেবে বড়, তাহা তাহারা বুঝে না। তাহার
সাক্ষী আরব উপগ্রহের দৈত্যের, যে মনঃব্যবী
বায়ের এক কথাতাই তাহার হাড়ির ভিতর পুনঃ
প্রবেশ করিয়াছিল। আর আমদারের সেনার
রোজাদের ত কথাই নাই, বুদ্ধি-কৌশলে তাহারা
আজও ভুতটী-এমিয়া হাঙ্গর ভিতর পুরিতেছেন;
কাল দে ভুতটী ধরিয়া স্থানীয় ভিতর জাগাইয়া
মানিতেছেন। তাঁদের কাজই হইল এই। দানব
হাদিয়া বলিল—আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি
কি না উৎকর্ষ কাব করিতে যাবেন। বত বড় যুগ
ভাটি গড়; বন তো আমি না হয় তোমার সহিত
কলার বোপাড় দিব, বত বুলী কলা চাপাও,
কলার আওত গিয়া বত খুলী জাঁতা-বন। একলা
না পুর, তোমার যিবে কেহ বাবা, যুগরী থাকে,
ভাতিও না হয় ভাতিয়া আর। তোমার-কোমর
ধরিয়া সেও জাঁতা বহিবে। তার পর বতখন বল,
ততখন আমি ভাটির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া
থাকিব। ভাটি গড়া হইল, কলা সাজান হইল,
জাঁতা বসানো হইল। হাদিতে হাদিতে দানব
গিয়া ভাটির ভিতর কলার উপর আসনগিড়ি
হইয়া বসিল। মনঃবা কলার আওত গিয়া—পার
তাও আরম্ভ করিয়া দিল। আওত ধরিয়া উঠিল,
কলা রক্তবর্ণ হইয়া টুকটুক করিতে লাগিল। অম্ব-
রের বা-পুড়িল, হুহুহু বাতনা হইল; তবু কোন বাক
কি না পাঞ্জুরি টুক তো চাই। বতই দৈব কষ্ট
হইল না, প্রকাশ কাঝি, হেনো। তাই লোহা-
ঙ্গর ফ্রাট অলন ভাবে গুণ করিয়া বসিয়া রহিল।
জমো তাহার শরীর লাল হইয়া উঠিল। শরীর
গলিতে গলিয়া, অশেষে সমুদয় শরীরটা গলিয়া
ভাটির বাহিরে গড়াইয়া আসিল। এই যে সব
লোহা, দেখিতে পাও, বাঁটি সেকোই বল আর
লোহাব প্রগ্রহই বল, এগু সেই লোহাঙ্গরের
শরীর। কেবল লোহা নয়, শিবল কাণ্ডও তাই।
আর সেই যে মনঃবা, তিনি কোণে করিয়া
লোহাঙ্গরকে বর্ণ করিয়াছিলেন—ও তাহার শরীর
গলাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনিও বড় কেও কেটা
না। তিনি কর্ণকার প্রভৃতি কয়েকটা গা-
সম্পর্কীয় শিল্পকারদিগের পূর্ব-পুরুষ। লোহা-
ঙ্গরের স্বস্বীকৃত শরীর লীভল হইয়া যেই একটু
জমিয়া আসিল, অমনি তিনি তাহা পিটিতে

আরম্ভ করিয়া দিলেন। পিটিয়া পিটিয়া ক্রমে
প্রকার গাড় বাহির হইল, তাহা তিনি আরো
সন্ধানবর্ণকে বিভাগ করিয়া দিলেন, যথা—(১)
লোহাঙ্গর কর্ণকারকে তিনি লৌহ দিলেন; (২)
লোহাঙ্গর কর্ণকারকে পিতল দিলেন; (৩) কান্দারকে
তিনি কাঁচা দিলেন; (৪) কর্ণকারকেই তিনি
স্বর্ণ ও রৌপ্য দিলেন; (৫) বী কর্ণকারকে তিনি
এরূপ লৌহ দিলেন যাহাতে অনাদ্যসে কালজ-
নাভা, সৌহৃদল ও শুর্তিকা বিবেচিত অসী-
পুখার সময় যে-পেচকের আশঙ্ক হয়, তাহা গড়া
বাহিতে পারে; (৬) চাঁদ কান্দারকে তিনি এরূপ
দিলেন, যাহাতে যুগান্ত দুর্গম নিশ্চিত হইতে
পারে। (৭) ও (৮) চোক্রা ও তাম্রকে তিনি ভাতি
দিলেন। প্রথমটা জল্লব মনঃবর্ণ, হুতরাং যে সকল
গাছকান্দারকে কথা বলিলাম, ত্রুহাংয়ের মধ্যে
কয়েকটা নাম কিছু জল্পনী জল্পনী। ইহাদের মধ্যে
অনেকের আচার ব্যবহারও উজ্জব। সম্পূর্ণ ভাবে
হিন্দুশাস্ত্রমতে নহে। কেহনা মূর্ত্যাদিগেরও মূর্ত্য
থায়, আবার কাহারও বা সেই উপদেশ উইসের
মাংস পাইলেই পুরুষ আনন্দ। আবার, ভাতি
মাংস খোর-নিশেথ যখন এই কর্ণকার-কুমারীরা
হেলিয়া শিশিা শ্রীশ্রীভাঙ্গ দেবতার স্ততিস্তুত করি
গাছ-গাছ থাকেন, তখন কার না মন মোহিত
হইয়া যায়? সুখিহাতে যদি এমনও কেউ কনি-
প্রাণ পাখও কান যে, সেই কোলককী কর্ণকার-
কুমারীদিগের অলকা-তিলকা-বিভূষণে স্মৃৎস-
বিনিমিত মৃৎশিল্পা দেখিয়াও একবারে আনন্দায়া
না হইয়া পড়, পায়ের ভাব মুরিলে তাহার আর
কিছু বাকি থাকে না। বৃকে সকলে সাহস করিল,
আমি সেই পায়ের ছুইটা কথা এখানে বলিয়া
কমি।

কমি গাছে উঠিয়া ভাড়া কাটা কমি ছেদনো।
পাঙ্কলে কমি সবাই থাকে কেউ কিছু ভবন বাসে না।
অথচ কি, না হে, তাও। সুমি হুত হুত করিয়া
কমি গাছে উঠিলে দেখিতেছি; কিন্তু কমি বল
এখনও পাকে নাই। কাঁচা কমি ফলগুলি ছিড়িয়া
বুঝানি করিও না। বন্য কমি পাকিলে, তখন
আমরাও বাইব, তুমিও খাইও; বত ইচ্ছা পাড়িও,
কত তখন তোমাকে লোনা করিবে না। বনা
বাহন যে এখানকার মনো পাকা কদম ফল
বাইয়া থাকে।

এই পের, জল্লব-মনঃবর্ণ লৌহ-উপনিষৎ বিষয়ে

প্রবাদ। প্রবাদটা সত্য কি মিথ্যা সে বিচার
করিবার আমার ক্ষমতা নাই। যদি সে শাস্ত্র-
জ্ঞানই থাকিবে, তাহা হইলে এই সামান্য নীরস
প্রস্তাবটি গৃহীতেই বা প্রবৃত্ত হইব কেন? উপগ্রহস্বয়
‘রচনা’ করিতাম, না হয় তীব্র বাসে সাহসিক
গিয়া দিয়া প্রবঞ্চ লিখিতাম। আবার-বুদ্ধ সেন-
হিতৈষীরা, মার ভাদের জানা-পোণী পৃথুত,
সাহু সাহু বলিয়া আমার জয়নিম্ন করিলেন।
যাহা, সে বন আমার করপালে নাই। আমার
যে পতিবির, সীম নাই ভাটারী তারপরাসী-
দিয়ের-পর্ণকূটরে। আমি যে তাহাদিগের হাড়ি
উটকিয়া জিজ্ঞাসা করি—“কেমন নতুরাম, কাল
কতকুই খেদা না মাইলে, কতকে বেচিলে; হুই
বন ছেলে পিলে পেট ভরিয়া থাকিতে পাইবে
তো?” বাহার গুণিগি পর্ণকূটরে, ছাটিকা-
বান্দীরা তাহাকে ভাল লিখেন কেন? হুতরাংসীরা
কি থাকি, কি পরে, বাহার হুতরাংসীরা
পরায় জাননভীর হুতরাংসীরা তাহাকে আদর
করিলেন কেন? লোহা প্রভৃতি ভাটেরা পণ্যভাঙ্গ
লইয়া বাহার আলোচনা, আপনাদিগের-সেই
এম এ বিএকর মনিষয় হুতরাংসীরা পণ্ডিতেরা সে
মুখের পানে ফিরিয়া চাহিলেন কেন? কেহনা আগ্নেই
লিখিলে যেখোখোলা হইয়াছি, আমার শাস্ত্রজ্ঞান
বায় যে বেচারি করি, এতএ বিধ নই যে, অধিকুলিগ
বায়কুলিগ উপলক্ষ করিতে করিতে উগ্রবাপন
প্রবঞ্চ লিখি। তবে এরূপা বলিতে পারি, যে
উপলক্ষেরূপেই হইয়া থাকুক লৌহ একটা
মূল বা রক্ত পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নয়। যৌগিক
পদার্থ, হুতী বা তৎপরিণত মূল পদার্থের রাসায়নিক
মধ্যেগে হইয়া থাকে। উত্তাপ দ্বারা-হুতরিক
ভাতিভবল প্রয়োগে হুতক বা অন্য কোন উপায়ে
হুতক, যৌগিক পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মূল
পদার্থ পরিণত করিতে পারা যায়, আবার সেই
মূল পদার্থগতিকে লইয়া পুনরায় রাসায়নিক
মধ্যেগে যেরূপ যৌগিক পদার্থ জ্বিল, তাহা করিতে
পারা যায়। কৃত্র একটা যৌগিক পদার্থ। তানা
ও গন্ধকযুক্ত একটু মিখাইয়া তাপ দিলেই তঁতে
হয়। হুতরাং রাসায়নিক উপায় দ্বায় তঁতেকে
বিসোধ করিয়া ইহা হইতে গন্ধকযুক্ত ও তামাইহ
পৃথক করিয়া হইতে পারে। কিন্তু গন্ধককে বা
তামাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। তাইই দিষ্ট,
ভাতিভবলই প্রয়োগ করি, যে কোন রাসায়নিক

মোটে মজুরি খরচণ দিন ১৯০ টাকা লইয়াছেন । তিনি বাবা বলিয়া দিয়াছেন, তুমি-জেরা মাথের পদার্থই সেই মত ক্রয় করিবেন । তাহা হইলে ঈর্ষিকার সম্ভাবনা কম । বাহার্য্য কৃষিকার্য্য করিয়া থাকিলে, তাঁহারাও ছু ম পরীক্ষা করিয়া লন । আমিও জমিদারী কিনিবার প্রস্তাবনা করি, তাহাতে আশুর চাষ করিয়া হই পয়সা পাইব কি ন্যু, মাটি পরীক্ষা করিয়া আমাকে বলিয়া দিলেন । আমিও ছুটি টুকরো গমের চাষ করিয়াছিলাম, কলস ভাঙা হয় নাই, জমিতে কি জবোর অন্তর্য্য আছে ; আর তাহাতে কি দ্রব্য দিলেই বা ঘোই দোষ দৃষ্টভূত হয়, তাহা আশা করি বলিয়া দিল । নানা ব্যয়ভারীয়া আপনাবলিগের ব্যবসার উৎসর্গকার্য্যের নিমিত্ত এইরূপ নিত্য নিত্যই বিভ্রান্তে মগ্নাভূত লইয়া থাকেন । বাহা হউক পুর্বেই বিলগিয়াছে যে, এমনকরি বিজ্ঞানোপযোগী ক্ষিতিক-বহুমূল পদার্থে বিক্রিয় করিয়া থাকেন । ত্রেজ্ঞ ও জ্ঞানশকে বড় কিছু করিয়া উঠেতু পাবেন নাই, কিছু জল ও বায়ু যে মূল পদার্থ নহে, তাহা স্বিকৃতি করিয়াছেন । জগতের যে কোন বস্তু আমরা দেখিতে পাই, মায় মূহুর্তি সুবিধাতি পর্য্যন্ত, নিদ্রাগ ও সংযমে কল্পিতে কি পার্থা আছে, নদীই ছির কান্নাম্রান্ন । ইহাদের কথা আর কি বলিব, কেহও নানী যোজন দূরে সূর্য্যমণ্ডলে, আবার তরিতলে কোটা কোটা যোজন দূরে নভঃমণ্ডলে, কোন্‌নীতে কি পার্থা আছে, তাহাও নিগ্ৰ করিয়াছেন । জগতের বস্তুসমূহের মধ্যে কেবল ৩৩টা দ্রব্যকে ইহারা কোনও উপায়েই বিক্রিয় করিয়া তাহা হইতে অন্য পার্থা বাহির করিতে পারেন না । তাই, এই ৩৩টা পদার্থকে ইহারা মূল পদার্থ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন । মূল বা রূপ পার্থাগুলির মধ্যে কতকগুলি বায়ু, কতকগুলি বাহু, ময় । এইগুলি প্রত্যয়ে নানারূপ মূল ও যৌগিক পার্থা লইয়া আমাদিগের কাণ্ড পড়িলে । সকল ময়রে পদার্থই বুঝাইতে পারিব না । কাঙ্কেই ঘট-কত পার্থারই নাম ও ভাবের কথা কিছু কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন । অনেক এগুলিরে আবার বাঙ্গলা নাম নাই । কতকগুলির বাঙ্গলা নাম, থাকিলেই ইংরাজি নামই কথি প্রসঙ্গ । ইংরাজি নাম করিলে বহু কিয়ৎপরিমাণে যোকে বুঝিবেন, কিন্তু বাঙ্গলা নাম করিলে একবারেই হয় তে-কেহ মজুরী দিতে পারিবেন না । ৩৩টা ময়

পার্শ্ববর্তী মধ্যে ৪৮টা ধাতু, আর ১৫টা ধাতু নহে।
৪৮টা ধাতুর মধ্যে প্রথমে প্রথমে কয়েকটা ধাতু
এখানে করিতব্য, যথা—(১) এণুনিয়ম
ইহাকে সোজাহুজি ফকিরিয়ার পাথর দ্বারা বাইপেন
বহিত হয়। কখন ইহার সমস্ত অস্ত্রত পদার্থ
সমৃদ্ধ হয়। বাস্তবে যে ফকিরিয়ার সৈন্যে পদ
সমৃদ্ধ যৌগিক সম্রাটী উৎপন্ন হয়। (২)
একিমান ইহাকে হুমার পাথর বলিতে পারি, কারণ
ইহা হইতেই উত্তর-পশ্চিমাবর্তী শৈলেন্দ্র, চতু
য়ে হুমার পাথর, তাহা প্রস্তুত হয়। (৩) বিয়ম
ইহা হইতে শুভ্রবর্ণ এক প্রকার যৌগিক পদার্থ
প্রস্তুত হয়। উত্তর বেদনা হইলে ভালোবাসা
তাহা ব্যবহার করা যাবে। (৪) প্যাস্টিম
ইহাকে চূর্ণের আকার বলিতে পাওয়া যায়, কারণ
ইহা হইতে যৌগিক পদার্থ চূর্ণ পাওয়া যায়; যদি
নাটো ইহা আর একটি যৌগিক পদার্থ।
কোবোত, লায়নুর অংশে এই ধাতু পাওয়া
যেখানে ইহাকে তৈরি বস্তু। (৫) ম্যাগনেসিয়াম
ইহা হইতে ম্যাগনেসিয়াম নমক যৌগিক পদার্থ
উৎপন্ন হয়; তাহা সচরাচর চিকিৎসা প্রকল্পে
ব্যবহার করা যাবে। (৬) স্যান্ডিনা, এক
ধাতু। সচরাচর বলিতে নানা স্থানে পাওয়া যায়। কা
একটি বস্তু হইতে বিলাতে সচরাচর ব্যবহার হই
থাকে। (৭) স্যান্ডিনা প্রাণীতে আকার হইতে সৌন্দ
নিধারণ কর্যেও ইহার বিশেষ আনন্দ
(৮) নিকেল, ইহা একটি নূতন আবিষ্কৃত ধাতু
নতুন তাম্র ও এই নিকেল একত্র লেপাইয়া নক
রৌপ প্রস্তুত হয়। বাস্তবে ইহা
নাম গ্রন্থান গিলবার। গ্রিক রূপার নক বাস্ত
য়ে চামচা বিক্রয় হয়, তাহা এই নক রৌপ
হইতে প্রস্তুত। (৯) প্যাস্টিম, এক প্রকার কাম
নাম। প্রকল্পে নানা বিষয়ে ব্যবহার হইয়া থাকে
(১০) সোডিয়াম, ইহা হইতে সোজা হয়। অস্বাভাব
ইহা শশী ধাতুর নাম কলিয়ার দ্রব্য হইয়া
রাবে। তাহা হইলেই ইহা চামচের নক
আর বেশী নাম করিতে বেশী দ্রব্য আমায়
বিরক্ত হইবে, মনেও করিয়া রাখিতে পারিবে
না। কিন্তু এখন দেশের শ্রমজীরা নাম করিয়া
সমকালে নিম্নিত বিশেষ, তখন পার্টকর্মকে আমা
নির্ভর করে হওয়া উচিত। অর্থ দিয়া, তাহা
কল্প পরিচালনা করিতে হইবে না, তাঁহারা য
এই শশী ধাতুর মূল পদার্থের নাম মনে করি
রাবেন, তাহা হইলেই ইহা চামচের নক

পূরায় এই বংশের নাম কারোতে;—এখানে নামের
বা কটকিরি আরক; এতদিন বা হুবরা আরক,
বিসমথ; ক্যানসিয়ম বা চূণ ও খড়ির আকর;
কোপার; ম্যাগনেসিয়াম; ম্যাগনেসিয়াম; মিসকো;
পটাসিয়াম; সোডিয়াম। এই দশটা ছাড়া সোনা,
রূপা, তামা, সিনা, সোহা, পায়, টিন, দস্তা, এই
আটটি ধাতুর নাম তো মরলে জানেনই। সর্ব
তক্ষ ৪৮টা ধাতুর মধ্যে দশটা আর আটটা ১৮টার
নাম জানা হইল। আশা করি, সকলে এই
১৮টির নাম মনে ধরিয়া রাখিবেন।

পূর্বেই বলিমাছি, যে ৩৩টা মূল-বা রূপ
পদার্থের মধ্যে ১৫টা ধাতু নামে। এই ১৫টার নাম
হুইটা অধিক পাওয়া যায় না, কার্যেও বড় লাগে
না। তাহাদের ছাড়া রূটি, ১৩টার নাম
করিতেছি। (১) আয়েনিকাম,মায়ার বা পেরো বিষ।
ইহা কি তাহা আর সুইয়ায় দিতে হইবে না।
(২) বোরণ; ইহা হইতে সোদা-বা হুও।
(৩) স্রোমিয়, সমুদ্রের জল-জলিয়া দিয়া প্রাপ্ত হওয়া।
স্রোমিয় অর্ক। পটাসিয়াম নামক মহেযথ
ইহা হইতে প্রকৃত হুইটা থাকে। মূল পদার্থ
সমুদ্রে মধ্যে কেবল হুইটা বস্তু তখনভারে দেখিতে
পাওয়া যায়। এক এই স্রোমিয়, দিটারিয়
পারা। এতদিন অপরপার পদার্থ হয় কঠিন,
না হয় বাষ্প। (৪) ক্লোরিন বা অম্লার, ইহার কথা
পরে বলিব। (৫) স্রোমিয় ইহা এক প্রকার বাষ্প
এই বাষ্প ও সোডা দুয়োগো লয় ইহা থাকে।
তাহারকি স্রাবহা এই বাষ্পকে দেখিতে পাওয়া
যায় না। লণ্ঘকে রায়ানিক উপায়ে বিযো
করিলে ইহা পাওয়া যায়। (৬) ক্লুফিয়, ইহার
একপ্রকার বাষ্প, চূর্ণের আকর প্রকৃতি পদার্থ
মিশ্রিত হইয়া থাকে, সহজে বাহির করা যায় না।
(৭) হাইড্রোজেন বা জলনান, ইহার কথা পরে
বলিব। (৮) ক্লয়েডীন, সমুদ্রে উচ্চতর শরীরে,
সোডা প্রকৃতি পদার্থের মিশ্রিত মিশ্রিত হইয়া
থাকে। ওখাখায়ে উহা, বায়হত হয়। (৯)
নাইট্রোজেন যক্ষ্মারজান, ইহার কথা পরে
বলিব। (১০) অক্সিজেন, সকলের বা অম্লজান
ইহার কথা পরে বলিব। (১১) ফ্লুরিন; আমোদের
শরীরের নানা অংশে এই জন্ম বা বস্তুমান আছে।
শরীরের নানা অংশ বিশেষতঃ অস্থি শরীরের
নিখি হইয়া নিত্যত আবাসক। অস্থি ভয়
করিয়াই ইহা। সমুদ্রের প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খোলা আছে, এরূপ ঘরে, কয়লা জালাইলে, কার্বনিক অম্ল উৎপন্ন হয়। বায়ুশিশির সহিত মিশিয়া বায়ু, তাহাতে মনুষ্য-জীবনের হুঁসি অনুভব হয় না। কিন্তু ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া কয়লা কি ওল জালাইলে, ঘরের অন্তর্ভুক্ত লইয়া কার্বনিক অম্ল উৎপাদন করে। সেই বাষ্প ঘরেই রহিয়া বায়ু, বাহিরে যাইতে পায় না। বাহির হইতে অক্সিজেন আসিয়াও ঘরের বায়ুকে সংশোধিত করিতে পারে না। এ অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বৃত্তার আশঙ্কা। অনেকেই জানিয়া এই বাষ্প হইতে প্রাণহারা হইয়া থাকেন। তাইবার ঘর কিংবা আঁতড় ঘর উত্তম রাধিবার জন্য, দোষাবোধ না জানিয়া কেহ কেহ ঘরে কয়লা বা ওল জালাইয়া, দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া শুইতে যান। নীচই তাহারা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। ইহকালে সে কালনিদ্রা আর তদ্বৎ হয় না। কখন মরিলাম তাহা টেরও পান না। এইরূপ দুর্বৃত্তনার কথা প্রায়ই শুনা গিয়া থাকে। জরানী দেশে অনেকে এই উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। এই বিষয় বিদ্যাক হইয়া একবার আমিও মরিতে মরিতে রহিয়া গিয়াছি। আমার জ্বর হইয়াছিল। শীতকাল, গায়ের শীত-শীত আর কিছুতেই ভাঙে না। তাই ভবিলাম ঘরে কলের আগুন করিয়া, শুই। কার্বনিক অম্লের কথা জানিতাম। তাই বাহিরে ওল ধরাইলাম; যখন বুঝি রহিয়া ওলগুলি লাগ টুক টুক করিতে লাগিল, তখন ঘরের ভিতর লইয়া আসিলাম, মনে করিলাম ইহাতে আর কোন দোষ হইবে না। কিন্তু এরূপ করিয়াও ঘরের বায়ু বিলম্বন দূরিত হইয়াছিল। ভাণ্ডা-ক্রমে জ্বর হইয়াছিল, শরীর অস্থির ছিল, তাহার জন্য একবারে নিজের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি নাই। বানিক রাজ্যে তখনক শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল, মাথা আর তুলিতে পারি না। উত্তীয়া দাঁড়াইতে দেখেই অমন রূপ করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। বাহির হইতে অক্সিজেন আসিয়া ক্রমে বর হইতে কার্বনিক অম্লকে দূরীভূত ভাবে হ্রাস হইলাম। কয়েক বৎসর গত হইল, সিমলার পাহাড়ে কার্বনিক অম্লের দ্বারা একবারে চৌদ্দ জন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। তখন

আমি সিমলার ছিলাম। শীতকাল, বরফ পড়িতেছে, গাছপাশী পাহাড়-পর্বত সমুদায়ই বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। ভারত-সেনাপতি নেপির সাহেব সেই সময় সিমলা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে অনেক ছাত্র ছিল। রাজিকালে ছাত্রা শিবিরের ভিতর নিদ্রা বাইত। একটী তাঁবুতে চৌদ্দজন ছাত্র শুইত। বড় শীত; প্যাহাড়ী লোক হইলে এক ঘর, গরির নাহয়, অধিক কাপড় চোপড় তো নাই। শীতে তাহাদিগের কক্ষেকাঙ্কেই কষ্ট হইতেছিল। একদিন, দিনমানে তাহারা কোন জমিদারের নিকট হইতে দুই ঋড়ি করিয়া পাইয়াছিল। রাজিকালে তাঁবুর মাঝখানে একটা গর্ত করিয়া সেই গর্তে কিছু আগুন সিঁদু তাহার উপর দুই ঋড়ি করিয়া একবারে ঢালিয়া গিয়াছিল। গর্তের ভিতর কয়লা পুড়িতে লাগিল, চারিদিক ঘেরিয়া ছত্রিয়া শুইল। তাঁবুর নিম্নভাগে যে এক আধটু স্নাঁক ছিল, রাজিতে বরফ পড়িয়া সে স্নাঁকটুকুও বুদ্ধিয়া গেল। সকাল হইলে সে স্নাঁকটুকুও বুদ্ধিয়া গেল। সকাল হইলে সকলে দেখিল, ১০জন লোক একবারে মরিয়া গিয়াছে, কেবল তাঁবুর দ্বারের নিকটে যে স্নোকাটা শুইয়া ছিল, তাহার ঈষৎমাত্র খস বহিতেছে। কয়লার ধনি, জাহাজের খোল ও পুরাতন কুপেও কার্বনিক অম্লের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতেও অনেক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এক বৎসরের অধিক হইল, বিলাত হইতে কলিকাতায় একখানি জাহাজ আসিতেছিল। তাহাতে এই বাষ্প দ্বারা সাত আট জন লোকের মৃত্যু হয়। প্রায় দুই বৎসর হইল চুড়ার বাড়েশ্বরতলায় একটা পুরাতন কুপে এইরূপে চারি পাঁচ জন লোকের মৃত্যু হয়। সেই কুপে প্রথম যে লোকটা নামিল, সে তৎক্ষণে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। উপরে বাহারা ছিল, তাহারা বুদ্ধিতে পারিল না যে, কি হইয়াছে। নীচে যে লোকটা নামিয়াছে, তার কোন সাড়া শব্দ নাই কেন? সেখিবার জন্য আর একজন লোক নামিল। নীচে না পৌঁছিতে পৌঁছিতে সেও মর্ছিত হইল। এইরূপে একে একে তার পর যে কয়েকজন নামিল, সকলেরই প্রাণ নষ্ট হইল। পুরাতন কুপে, বাহা অনেক দিন ধরিয়া ব্যবহার হয় নাই, কিংবা শুক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নামিতে

হইলে প্রথমে একটা প্রচলিত দীপ বা উদ্দীপ্ত
রাখিতে দৃষ্টি দ্বারা তাহার ভিতর স্থলিয়া
করিয়া দিয়া হয়। যদি দীপ বা বাতিটা ভিতরে শিখা
জলিতে থাকে তবে সে কূপে নামিতে কোন
ভয় নাই। যদি বাতিটা ভিতরে গিয়াই উপ
করিয়া নিবিয়া যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, প্রাণ-
প্রদীপও সেখানে উপ করিয়া নিবিয়া যাইবে।
বাতি তাহার ভিতর জলিতে থাকিলে জানিবে
যে, কার্ণবিক-অগ্নি সেখানে বহু একবারেই নাই
কিংবা বৎসামাত্র ভাবে আছে। অক্সিজেন
প্রচুর পরিমাণে আছে। অক্সিজেন না থাকিলে
দাহন-কার্য হয় না, অক্সিজেন কোনও একটা
বস্তুর সহিত নিশিয়া অপর একটা যৌগিক পদার্থকে
উৎপন্ন করার নামই পোতা। উতাপ বাহির
হওয়া সেই বিশিষ্ট কার্যের লক্ষণ নয়। হুতরাং
যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে কোন বস্তু দগ্ধ
হইতে পারে না, সেখানে প্রদীপ জলিতে পারে না,
প্রাণাধিক ও সেখানে নির্বাহ হইয়া যায়। তাই অক্সি-
জেন প্রাণী মাত্রের জীবনরূপক। এই যে আমাদের
দেহ রাসবের চিত্তর চ্যায়, ইহা দ্বিবা রূঢ়। হ-
করিয়া জলিতেছে। আরও নিবিশেষে মৃত্যু। আমা-
দের বামা সামগ্রী সমুদয় নাইট্রোজেন, কার্বন, হাই-
ড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশেষরূপে এই চারিটা মাত্রের
পদার্থের সহযোগেই নির্মিত। হুতরাং আমাদের
মধ্যে সর্বদাই শরীর কার্বন প্রবেশ করিতেছে।
কাঠ ও কয়লা রূপে এই কার্বন কীনাধিক প্রচ-
লিত রাখিতেছে। যেমন আমাদের সঙ্গে কার্বনের
যোগান চাই, তবে অগ্নি জলিতে থাকিলে, তেমনই
অক্সিজেনের যোগান চাই, তাহেই এই প্রাণ-হতভান
জগিত। পান ভোজনের সহিত যে ইচ্ছা অক্সি-
জেন উত্তর হয়, তাহাতেও এ কার্য সমাপ্ত হয় না।
পূর্বেই বলিয়াছি যে, মস্ত বস্তুর জলে থাকে,
আমারও বায়ুর ভিতর সেইরূপ ডুবিয়া আছি।
বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন আছে। এই
অক্সিজেন আমার অস্থির নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ
করিতেছি। অক্সিজেন শরীরের ভিতর গিয়া
করে। শরীরের ভিতর যে কার্বন আছে, তাহার
সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশ্রিত হয়। অক্সিজেন
বস্তু কার্বনের সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন কি
লক্ষ্য উপস্থিত হয়? অগ্নি হয়, উতাপ হয়,
তাহাই জীবনাধি। এই মিশ্রণ-কার্যের লক্ষণ
অগ্নি বটে, কার্বনে যে উতাপ সাধক ছিল তাহা

অক্সিজেনের সহিত নিশিবার সময় বাহির হইয়া
পড়ে বটে; কিন্তু কার্বন ও অক্সিজেনে নিশিয়া
কণ কি হইল, কি নূতন যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি
হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই দুই বস্তুর
সহযোগে উৎপন্ন হয়, সেই ভয়ানক বিষময়
কার্বনিক রাসায়নিক পদার্থ। এই বিষময় বাপটা নীরবে
থাকিয়া পাছে রক্তকে দূষিত করে, তাই প্রাণদের
সহিত আমরা হোকে বাহির করিয়া দিই। হুতরাং
একটুকু অনেক লোক মনন করিলে সবলে নিশিয়া
অক্সিজেন ইচ্ছা টানিয়া লন, কার্বনিক অগ্নি
প্রাণদের সহিত ছাড়িয়া দরটা তাহাতেই পরিপূর্ণ
করিয়া থাকে। অক্সিজেন কখনো জ্বালাইয়া শয়ন করাও
যা, আর এক বস্তু অনেক লোক শোয়াও তা।
হইতে পীড়া হইয়া কেন সম্ভব না। তাহা বুঝি-
লেন তো? আচ্ছা, এই যে অগ্নয় বস্তুজাত,
অসংখ্য মহত্ব কাল-কালান্তর হইতে অরোহিণী
অবিরত প্রধানের সহিত, কার্বনিক-অগ্নি বাহির
করিয়া দিতেছে; যে কার্বনিক অগ্নি কোয়ার্থ বায়ু
পৃথিবী কেন তাহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া যায় না?
তা যদি ঘাইত, তাহা হইলে এই বরাধানে আজ
একটা প্রাণীও জীবিত থাকিত না। দ্বৈতের
আশ্রয় কোশল নন। আমরা যেমন নিশিয়া
অক্সিজেন লই, প্রাণের কার্বনিক অগ্নি-তাপ
করি। গাছেরা তাহার ঠিক বিপরীত করে, তাহারা
নিশাসে কার্বনিক অগ্নি লয়, প্রাণের অক্সিজেন
তাপ করে। গাছেরের তো কাটা নাই, তখন
কি করিয়া তাহারা নিশাস প্রসার কার্য সম্পন্ন করিয়া
থাকে। প্রাণাধিকের পাতার নিয়মেই অনেক
ছিদ্র আছে, তাহা দ্বারা এই কার্য সমাধা হয়।
হুতরাং আমরা যে কার্বনিক অগ্নি প্রাণদের সহিত
তাপ করি, যা বায়ুতে নিশিয়া যায়, গাছেরা
তাহা নিশাসের সহিত গ্রহণ করে। মনে
আছেতো, কার্বনিক অগ্নি একটা যৌগিক পদার্থ,
মূল পদার্থ নয়, ইহা কার্বন ও অক্সিজেনের
সহযোগে হইয়াছে। গাছেরা এই বায়ুকে
নিশাসের সহিত লইয়া সূর্য্যলোকের স্নায়ুতাপ
কার্বনকে একটিকে আর অক্সিজেনকে একটিকে
পৃথক করিয়া ফেলে। কার্বন ইচ্ছা লইয়া ছাল
কাঠ করিয়া আপনাদের দেহ পরিবর্তন করে,
আর অক্সিজেন ইচ্ছা ছাড়িয়া দেয়। একটিকে
জীবী জন্তু অপরটিকে উদ্ভিদ এই দুই দলে
ক্রমাগত এইরূপ কার্বন ও অক্সিজেনের বিনিময়

চলিতেছে। পণ্ডিতেরা পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন
যে উদ্ভিদ শরীর হইতে অক্সিজেন অক্সিজেন
বাহির হয় না। অক্সিজেন কার্বনিক অগ্নি বাহির
হয়। হুতরাং রাত্রিকালে শুভবার ঘরে অগ্নিক
কল্ল রুল পাটা রাখা ভাল নয়। বিলাতে দুই
একজন অশালেন্দ্র-বাসবাসীর এইরূপ মত হইতে
ভনিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি যেখানে অক্সিজেন
নাই, সেখানে অগ্নি জলিতে পারে না। আবার
যদি ঐটি অক্সিজেনের ভিতর কোন দ্রব্য দগ্ধ
করা যায়, তাহা হইলে অতি মস্ত বস্তু হয়।
সেই দ্রব্যটা পুড়িয়া যায়। ঐটি অক্সিজেনের
ভিতর কোন দ্রব্য পোড়াইলে বড়ই উতাপ হয়।
যে দ্রব্য বাহিরের বায়ুতে মজছে পোড়াইতে পারা
যায় না, ঐটি অক্সিজেনের ভিতর যে দ্রব্য অনা-
রামেই পুড়িয়া যায়। কিন্তু অক্সিজেনের ভিতর
থাকিলে, ঐটি অক্সিজেনের নিশাস লইলে,
পাছে আমাদের এই প্রাণাধি দাঁড় নাট করিয়া
জলিয়া সস্তর আমরা পুড়িয়া যাই, তাই যে বায়ুর
ভিতর আমরা ডুবিয়া আছি তাহা শুধু অক্সিজেন
না। অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন নামক বায়ু
আমাদের এই বায়ুতে বিস্তার রহিয়াছে।
এই নাইট্রোজেন একটা মূল পদার্থ, ইহা হইতে
সোণা, নিম্নাল প্রভৃতি বস্তু সমূহ উৎপন্ন হয়।
সেইরূপ ইহার নাম বস্তুজাতক।
একজন ধরিয়া বড়ই নীরস বিষয়ের আশে-
চনা হইতেছিল। কিন্তু কি করি, আজ কালের
যে কোনও ব্যাসার কথা বলিতে হইবে, তাহাতেই
এই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন প্রভৃতি
পদার্থের বিয়োগ, সংযোগ, স্তম্ভ হইতে স্তম্ভতম
ব্যবহার। একে তাহা জ্ঞান-উপাসন করাই
করিল; তাহেই আবার সেই জ্ঞান পাখির পদার্থ
প্রকৃত হইয়া কিরূপে অর্থ উপার্জন হয়, তাহা
বুঝাইতে হইবে। ইংরাজেরা ছাই মুঠাটা ধরিয়া
কিরূপে স্রোবা মুঠাটা করেন, তাহা বলিতে হইবে।
কাজেই এভাবে প্রস্তাব আশাশোভা বাসগদের
মত হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষেই সাহেবেরা
ছাই মুঠাটা ধরিয়া সোণা মুঠাটা করিয়া থাকেন।
যেখানে বামা ও নুতরাং পাথর হইতে
যোহা বাহির করে, সেখানে হইতে কেবল
মাত্র কাটাগা কলিকাতায় আনিতে যাওঁট পড়ে,
বিলাতে হইতে ইংরাজেরা সোণা আনিয়া আমা-
দিগকে সেই নামে বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাহে

আর বামার যত্নে অগ্নি থাকিলে কি? বামার
ছেলে পিলে কেন না পেটের জ্বালায় পথ পথ
কাটিয়া বেড়াইবে? কিন্তু পোষ কার? বামার
সোণ নয়, নুতরাংসেরও সোণ নয়, অগ্নি যখন
অগ্নি-পঞ্জর-নাগ ছেলে ছুটীতেও সোণ নয়।
আহা! ইংরাজ কি জানে। সোণ আমার, ও
আমার স্বপ্নজাত সাম্রাজ্যের। সেই না আমার,
আমরা নানা শাস্ত্র রচনা করিয়া জগতকে এক
নিশাশা দিয়াছিলাম? বড় কথা দুই বাহুই।
১, ২, ৩, ৬, প্রভৃতি অতি সামান্য কণ্টক অগ্নি
চলিতেছে, আজও জগতের লোক সেই স্বপ্ন-
মুদ্রিণে প্রাণীরা চাটুড়ি খেদিয়া চাটুড়ি
হইতেছে। বীজধনিত প্রভৃতি উচ্চ শাস্ত্রের
কথার আর কাজ কি? কিন্তু আজ আমাদের
পানে একবার চাহিয়া দেখ। জগতের শিকাদাত,
জগতের পূজ্য না হইয়া, সার্বদা মেদিন হইলাম
কাজেই? আবার আজ হইয়াছি “নিগার।”
কেন বল দেখি? একটা বিশেষ কারণ এই—
আমরা ক্রিপ্তপুত্রভ্রমকর্যোম বদ্বিগা নিগার
বহিলাম। কালে “ক” অক্ষর এদেশে অপ্রচলিত
মধ্যে পরিণতি হইল, পূর্বাঙ্কিত মন এক এক
কিছু গিলে, জন্মে সকলই সোপ হইল।
কিন্তু অজ্ঞাত ভাতিরা এই ক্রিপ্তপুত্রভ্রম-
রম্যোম ভাতিরা চুরিয়া নানা অশুভ শাস্ত্রের
স্বকৃত তরিলেন, নানা অশুভ পদার্থের রচনা
করিলেন, নানা অশুভ বস্তুর নিগুঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার
করিলেন, আর এই বিশ্বমাসার-নিহিত ভীষণ
আত্মহনিক বল সমূহকে পুণ্ড্রাবাক করিলেন।
তাই, আজ তুরস্ক আর্য্য, পারস্য গাভুর,
ভারত শাম, চীন-মহাচীন, মঙ্গল পৃথিবী, প্লাস্টার
দগ্ধ-প্রাণীরা, গুপ্তপ্রাণীরা, বলপ্রাণীরা, বিদ্যার
নিকট কৃতান্তলিপটে যুক্ত কল্পনত করিয়া
রহিয়াছে। এই মহাবিদ্যা তোরামও নন
আমারও নন। সোণা বাজি হাঁদন দড়ি ভূমি
কার? না, যখন বার কাছে থাকি, তখন তার।
হাজার ক্ষয়ে একশে—এই মহাবিদ্যা বিরাট
করিতেছেন, আজ, তিনিই নিপুল বলশালী,
তাইই বর বদনভাত উচ্ছলিত, ব্রাহ্মণ লল,
তিনিই অস্বাধ, আর তাঁর কাছে দ্বারদাস লল,
মুজ লল, সকলেই গণ-বস্ত্র। নদের কালী

বার, চক্রে জল মুছিয়া দ্বাশি,—যদি এই মহা-
বিষয়কে আনিয়া সভ্যতার শিবসমূহ উদাসীন
ছন্নছাড়া পিতৃমুনি জন্মভূমিকে ফিরিয়া দিতে পারি।
সকলে এস, ভাই, সেই ক্ষত্রবিদ্যার অধবেশ
করি; যেখানে পাই তাঁকে সেইখানে থেকে
ফরিয়া আনি।

কৌশলের বিষয় এখনও লিখি য় নাই;
হুজুর হইয়া রহিল। বাকি পক্ষে লিখিব।

ত্রিভৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

বীরবালী—কর্মদেবী।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে আর্ঘ্যাবর্তের নির্য-
স্ত্র শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল। এই সময়ে মধ্য-
এশিয়া প্রভাবপাতিত হুয়াই তিমুরলঙ্গ প্রবল পরা-
ক্রমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি পারস্যে
যেরূপে ক্ষমতা বহুমূল করিয়াছিলেন, তাহাতে যেরূপে
বিজয়নিশানটির পরিচয় দিয়াছিলেন, সাইবিরিয়ায়
যেরূপে প্রাচ্য প্রভিষ্ঠার কৃতকাণ্ড হইয়াছিলেন,
ভারতবর্ষও সেইরূপে আত্ম-প্রভাব বিস্তারে
উন্নত হইলেন। কোন স্থলে তাঁহার পরিচয়
হইল না। তিমুর শতজর তট হইতে পঞ্চবর্তী
হাট-সমূহ উৎসর করিতে দিল্লীতে উপস্থিত
হইলেন। দিল্লীর ভগ্নানিধন ভূপতি
মহম্মদজলক ওজরাটে পশ্চান করিলেন।
দিল্লী অধিকৃত, বিলুপ্ত ও বিদগ্ধ হইল। অধিবাসি-
গণ ভয়াবহরূপে মুগ্ধ সমর্পিত হইতে লাগিল।
দেখিতে দেখিতে অপরূপ শোচনীয় মহানগরী
মহামুগ্ধানে পরিণত হইয়া উঠিল। তিমুর
অধিক্রমে নরশোণিত প্রোত প্রোত করিয়া,
স্বাভাৱণ পনন করিলেন। আর্ঘ্যাবর্তের স্বহ-
বিদ্যার দৃষ্ট দীর্ঘকাল তদীয় অশকতিয়া খানী
স্বরূপ রহিল। ভাভেতে এই দুর্ভাগ্যর সময়ে
রাজস্থান চিরন্তন বীর্য-গৌরব রক্ষা করিতেছিল।
রাজস্থানের পতিপ্রাণ বীরবালী আদ্যাবধ চরিত্র-
বৎ ও আদ্যাবধ তেজস্বিতা দেখিয়া, পতি
উদ্দেশে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। বীরভূমির
এই জেগখিনী কিশোরীর নাম কর্মদেবী।
রাজস্থানের শত্রুর নামে একটি জনপদ আছে।
ঐ জনপদ, মরুভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত। উহার

চারিদিকে নবপন্ন-সমুদ্র তরু-লতার অশ্ব-
সমুদ্র সৌন্দর্য-পরিমা নাই; শত্রুসমাকর্ষণ ভাঙ্গল
ভূতবৃক্কের বনোহর শোভা নাই; চিরহরিৎ প্রান্তরের
প্রান্তবাহিনী বহুসলিলা প্রোতবর্তীরা আবির্ভাব
নাই। যশুলবীরের চারিদিক প্রকৃতি জীবনচাতুর্ঘ্য
শোভার পরিবর্তে বিশাল বায়ুকাসাগরের ভীষণ
ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রকৃতি এই ভীষণ
রাজ্য কেবল যশুলবীর শত্রুশমনা। সরিষাশোভা
ভূমিতে পরিমোহিত হইয়া, বহিঃকর্তার অনন্ত
মহিমার পরিচয় দিচ্ছে। চতুর্দশ শতাব্দীর
মৌঘ্যবেশ যশুলবীরের অন্তরত পুংল নামক ভূগো-
ল অনন্দবৈ আবিপত্য করিতেন। তাঁহার গুণের
নাম সাধু। ভট্টাচার্যের মধ্যে সাধু সর্বপ্রধান
বীরপুংল ছিলেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার
ক্ষমতা ও তাঁহার বীরবলের নিকট সবচেয়ে মঙ্গল
অনন্ত করিত। তিনি সেই হুবিলাল মরুভূমি
হইতে সিন্ধুদের তট পর্যন্ত আপনাদি প্রভাব
অনুগুণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে, বেহেই
পার্শ্ববর্তী ভূগোলে আত্মপ্রাণের যোগ্যতা করিতে
পারিত না। পুংল-হুমার এইরূপে ভীষণ
মরুভূমির মধ্যে অসীম প্রভাব ও অবচলিত
সাধনের সহিত স্বীয় আবিপত্য বহুমূল রাখিয়া
ছিলেন।

এই সময়ে মহিলবাশীরা মাবিকরাও নামক
একজন ক্ষত্রিয়ের অন্তঃনগরে আবিপত্য
করিলেন। ১৪৪০ খ্রিঃ জনবহুল প্রান্তে তাঁহার
কর্তৃত্ব ছিল। তিনি যেরূপ সর্বসম্পত্তিখণ্ড
জনপদের অধিবাসী, সেইরূপ একটি অসামান্য
দায়-দায়-নিধান হুইতা-রয়েজ অধিকারী ছিলেন।
মাবিকরাওর এই হুইতার নাম কর্মদেবী।
কর্মদেবী জন্মে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া কিশোরী
দায়-দায় করিলেন। যৌবনসমক্ষে তাঁহার
কোমল দেহলতা পূর্বভাষ্য হইতে লাগিল;
রূপাশী পলিকট হইয়া উঠিল; লাক্ষ্যসাধার
বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হইয়া, প্রসঙ্গ মুখগণ্ড, প্রশান্ত
নয়নমুগল নবর অধর ভাসাইয়া দিতে লাগিল।
যে নবীন লতা এতদিন আপনাদি রূপাশী পলিই
সমুদ্রিত রাখিয়াছিল, তাহা এখন পরিপূর্ণ ও
পরিবর্তিত এবং নবপন্ন ও নবমুগল শোভিত
হইয়া হুমকি মারিতে লিপিত হইতে প্রোতগোচনের
প্রীতি কল্পাইতে লাগিল। মাবিকরাও, হুইতাকে
কিশোর-দশার উপস্থিত দেখিয়া সঙ্গপাত্রাৎ

করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাষ্ট্রোৎসাহীরা যথার
রাজহুমার অর্থ্যকমলের সহিত মহিপত্রাঙ্গ
ইমারী কর্দমবীর বিবাহের কথা হইল।

একথা পুংলহুমার সাধু, জনপদ-বিক্রম-প্রসঙ্গে
কোন বৃহৎ হইতে প্রভাপনন করিতে ছিলেন,
এমন সাধে বহুসংখ্য অশ্ব, উই ও সৈন্যের
সহিত অন্তঃনগরে উপনীত হইলেন। অন্তঃনগর
মাবিকরাও আদ্য-সংকরে পুংলহুমারকে নিমন্ত্রিত
করিলেন। সাধু ও প্রসারিত মহিপত্রাঙ্গের
অভিবি হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বীর্য
মহিমা অবিকতর বার্ত্ত হইল। সৌন্দর্য
লীলাময়ী উদ্যানলতা যুক্ত আদ্য তরুগণকে
আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিল। পুংল রাজহুমারের
অতুল্য বীর্য ও সাহসের কান্দনীর কর্দমবীর
কর্ণোত্তর হইয়াছিল। কর্মদেবী এখন সেই
বীরবলের বীর্য-বাক্য অনির্লসনীয় বৃহত্তার পরিচয়
পাইলেন। বীরগুণা এ পরিজ বীর্য-কীর্ত্তি
অখ্যমান করিলেন না, অতঃপর অসামান্য অতিক্রম
করিয়া, মরুভূ-বিহারী পুংল-সিংহের সহিত
পরিগ্রহণে আনক হইতে উৎসব হইলেন।

সাধু এই প্রস্তাবে অসম্মত প্রকাশ করিলেন
না। অর্য্যকমলের ভয়ে তাঁহার হৃদয় কিছুমাত্র
বিললিত হইল না। তিনি আপনাদি সাহস ও
বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া লাবণ্যবতী
কান্দিনীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যথা-
সময়ে বিবাহের দিন অবধারিত হইল, ঋগ্মসময়ে
মাবিকরাও স্বীয় রাজধানী অন্তঃনগরে হুইতা-
র স্বক্কে সাধুর হস্তে সমর্পিত করিলেন। উদ্যান
শোভিনী নবীনলতা আদ্যতরুগণকে আশ্রয়
করিয়া, তদীয় দেহলতায় শোভা বর্ধিত করিল।

এই বিবাহে অর্য্যকমলের হৃদয়ে আশ্রয়
লাগিল। হুইতার হত্যা হুময় হইতে আশার
সম্মোহন দৃষ্ট অন্তরিত হইল। যে কল্পনা,
তাঁহার সুদূরবে দীর্ঘ বীর্যের শোভা, শাস্তি ও
প্রীতি রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা অতিক্রম
ভাবে কোথায় যেন মিশিয়া গেল। অর্য্যকমল
প্রতিহিংসার কটোর দৃশ্যনে অধীর হইলেন।
আশার সম্মোহন দৃষ্ট হইলে, মৌঘিনী কল্পনার
অনন্ত উৎসবময় রাজ্যের পরিবর্তে অর্য্যকমল
হিসার ভীত হলাহল পুংলিকর্মজ্ঞি দেখিতে
লাগিলেন। তিনি কর্মদেবীর বিবাহের সংখ্যা
পাইয়াই বৈরনির্ঘাতনে কৃতসম্মত হইলেন;

প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই এ সাধনা হইতে
চলিত হইবেন না; যতদিন ক্ষত্র-শোণিত-
শেখর মুগলনোতে বর্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা করি-
লেন, ততদিন, প্রতিহিংসী সাধুকে পরাজিত করিতে
বিমুগ্ধ হইবেন না। বিবাহতার অপরূপ বস্তি—অপরূপ
বিকশিত কান্দিনী-হুময় নাচে বর্ধিত হওয়াতে
অর্য্যকমলের হত্যা-হুময় এইরূপ কান্দিনীয়া হইয়া
ছিল। সুপ্রতিজ্ঞা, দৃঢ়সম্মত তাহাকে এইরূপ
ভয়ঙ্কর প্রত্যাপনে উত্তেজিত করিয়াছিল। সাধুর
ভবিষ্য-হুময়ের পথ এইরূপে কটকিত হইবার
উপক্রম হইয়াছিল।

অন্তঃনগর, জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ বহুমূল্য
মণি, মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, একটী কর্ণম বৃণ
এবং তেরটি স্তম্ভারী দিয়া, রেখমহাকারে বিদায়
দিলেন। তিনি জামাতার সহিত চারি হাজার
মহিল-সৈন্য দিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু সাধু
হুইতে অসম্মত প্রকাশ করিয়া, মাত শত্রু
ভাগিনো এবং আপনাদি অসামান্য সাহসের
উপর নির্ভর করিয়াই নবপরিণতা প্রণয়নিককে
শোয়া রাজ্যে লইয়া যাইতে উন্নত হইলেন।
যেই অন্তঃনগরের সবিধম্ব অসুযোগে তাঁহার যাকে
পঞ্চাশ জনমাত্র মহিল-সৈন্য সঙ্গে ধাইতে হইল।
কর্মদেবীর জীতা মেঘরাজ এই সৈন্যের অধি-
নতায় পদে অবস্থিত হইলেন।

সকলে অন্তঃনগর হইতে পাত্রা করিল। সকলে
অজিহ্ম উৎসব ও আঙ্গাদে প্রোত চাহিয়া,
কিছু প্রাণ নগরের অধিমুখে-অগ্নয়ে হইতে
লাগিল। পথে চন্দননামক স্থানে সাধু-যখন বিজ্ঞান
করিতেছিলেন, তখন দূরে মরুভূমির বায়ুকাসাগর
উজ্জ্বল হইয়া, একদল প্রবলবেগে তাঁহার অভি-
মুখে আসিতে লাগিল। সৈন্য দল ভীষণ মরুভূমির
অতিক্রম করিয়া সাধুর বিজ্ঞানমুগলক সমুদ্রবর্তী
হইল। সাধুর সাধু চাহিয়া দেখিলেন, মরুভূমি
সৈন্য তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইতেছে। অর্য্যকমল
নিখোপিত ভয়াবহর আত্মক্লান্ত করিতে করিতে
এই সৈন্যগণের পরিচালনা করিতেছেন। দেখিয়া
মাত সাধু, বীরভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন;
বীরভাবে আপনাদি সৈন্যদলকে আত্মবিসর্জন
সাধনা বিজ্ঞান-সম্মার, অধিকরণে জ্ঞান প্রস্তুত
হইতে করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চারি হাজার
রাষ্ট্রো-সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতিহিংসী
পাইয়াই বৈরনির্ঘাতনে কৃতসম্মত হইলেন;

ভাবকল্প হানে দেখিতেন; ঐশ্বর্যভিত্তিক অশুদ্ধ তত্ত্বের হানে দেখিতেন, পুঞ্জাতিকে প্রতিকূল তত্ত্বের হানে দেখিতেন এবং ঐশ্বর্যভিত্তিক সন্তান-সোপানবর্ণের স্বরূপে দেখিতেন, আর পুঞ্জাতিকে বীজ পুটনের স্বরূপে দেখিতেন। কিন্তু অবিকারী মানুষের দ্বারা অতি জঘন্য ভোগ্য-ভোজ্য কখনই হনো করিতেন না। পরম্পরের জঘন্য লুণ্ঠনাদক জঘন্য বণিয়াও বিচার করিতেন না। আত্মদানের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই তাঁ পুরুষ সম্প্রদায় বর্ননা প্রসেক্ষ অঙ্গর হইতে এই নমোক্ত জ্ঞানের জ্যোতি নিখাশিত হয়।

এই বহুমুখ্য দৃষ্টির প্রেরণায়, তাঁহার জাতি-পুরুষের বটনা মধুকে কেবল সম্ভারের হিত-হিতৈষিত্যেই মগ্ন করিতেন, কোন কোন উপায়ে দ্বারা সেই ক্ষেত্র এবং বীজের উৎকর্ষ সাধন হইয়া উৎকর্ষ স্বরূপ হইবে, তাহার প্রতিই আভিলাষ করিতেন। “কোন উপায়ে দ্বারা হস্ত, পুট, বলিষ্ঠ এবং গুণবতম পরম পবিত্র গরম ধর্ম্মি সন্তান হইবে, তাহাই সেই শিক্ষিত হিন্দুর আশ্রিত লক্ষ্য। সেই জন্ম চিকিৎসকগণ, যেমন, রোগ-দোষ শাস্ত্রি করার নিমিত্ত রোগীর কন্যাদার্থের সন্তানকে মরণজ্ঞানে উপদ্রবের, লজ্জাকর বিবরণের পর্ধ্যবেক্ষণ এবং উপদেশ দিতে কুহিত হইতেন না, রোগীও তাহার অহুতান করিয়া থাকেন; হৃদতা হিন্দুও তেমন আশ্রয়, অন্তঃকরণ এবং মস্তনের ত্রিক পারত্রিক কন্যায় সাধনের নিমিত্ত কোন উপায়ে আশ্রয় করিতে, জ্ঞান, রোগের গণন-কুসুম, ব্যবহার-পরিষ্কৃত জ্ঞানকে কিছুমাত্র বর্জ করিতেন না। তখন মরণ ভাব, মরণ দৃষ্টি, সত্যজ্ঞান-প্রসূত সত্যতাই অহুতান করিতেন।” যে উপায়ে দ্বারা ঐ সেকল কুশল সমাধিত হয়, তাহাই অনর্থক ভাবে অহুত করিতেন। তদ্ব্যবহার দৃষ্টির লজ্জাকর হইলেও সাধারণের নিদানক হইলেও, তাঁহাদের পরমহয়ের, পরমহয়ের বস্ত্র। আর বাক কোন ব্যবহার বীজক না হয় তবে তো কোন কথাই নাই। আশ্রয় দেহাদি এবং সন্তানের ত্রিক পারত্রিক কন্যায় সাধনের নিমিত্ত হিন্দু সমস্ত পুত্রব্রিক কন্যায় সাধনের নিমিত্ত হিন্দু সমস্ত পুত্রব্রিকের মধ্যে, এমন তিন চারিটি অহুতান আছে, বাহা ব্যবহার দৃষ্টির লজ্জাজনক বটনা বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই জন্ম দ্বারা সেই প্রাচীন-হিন্দুগণের

উচ্চতর জ্ঞানের শিখরদেশে উপস্থিত হইতে অনার্য তাঁহারা ঐ সকল অহুতান দেখিলে অস্বাভাবিক কথার ভিষ বিবাস করিতে পানেন না। আর তিনি সেই শিক্ষার গঠিত, সেই শিক্ষার শিক্ষিত তিনি তাহা অস্বাভাবিক উপায়ে ভাবে সমাদর করিয়া থাকেন। এনিমিত্ত সকলের সম্মুখে সেই সকল বটনা বা অহুতান অবতীর্ণ করা করিয়া প্রকাশ করিতে কুহিত হওয়ার আবশ্যক হয়। কিন্তু এখন বিপদাপন্ন হইয়া তাহা করিতে হইবে। অহুতাই আমাদের স্থিতিস্থাপন রাষ্ট্র-পুরুষগণ কিহা স্থিতিস্থাপন সম্পাদকগণ তাহা করণ্য ভাবে গ্রহণ করিনেন না বলিয়াই বিবাস করিন।

হিন্দুর গর্ভাধানে কথ্য ঐ পুর্নোক্ত তিন চারিটি অহুতানের একতম অহুতান। ইহার গুণতত্ত্ব সম্পন্ন করিতে না পারিলে অতি অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহা নহে। ইহা আমাদের একটি অত্যাবশ্যক অতি গুরুত্বপূর্ণ করিতে না পারিলে অতি অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহা আমাদের একটি অত্যাবশ্যক অতি গুরুত্বপূর্ণ করিতে না পারিলে অতি অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

এ বিষয়ে কোন অকণ্ঠ্য অমাপ প্রয়ো উপাধিত করিব না। যে যে ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে সমস্ত হিন্দুসমাজ বাহ্য ধর্ম্মকার্যের অহুতান করিয়া থাকেন, বাহা হিন্দুসমাজের প্রত্যেক ধর্ম্মকার্যে প্রচলিত আছে, তাহারই বচনগ্রন্থ এবং বচনমত আমাদের পর্ব্বণমেটের বেধা আবশ্যক। হুতরাই তাহারি আমায় এ প্রস্তাবে উর্থাপন করিব।

শ্রীশম্ভর শর্মা (তর্কভূমি)।

গর্ভাধান ব্যবস্থা।

গর্ভাধান কাহাকে বলে?

প্রথমে গর্ভাধান কথাটির অর্থ কি, তাহা জানা আবশ্যক। “গর্ভ” আর “আধান” এই দুইটি কথার যোগে “গর্ভাধান” কথাটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। “গর্ভ” কথাটির অর্থ জন্ম—জন্মস্থান, স্থান, “আধান” কথাটির অর্থ বিশেষরূপে সাধন। “গর্ভাধান” কথাটির অর্থ “গর্ভাধান” (জন্মস্থান) “আধান” পুরুষজাতি (জন্ম) ইহারের উচ্চতর যোগে, বিশেষ একাধারে, বিশেষ বিশেষে সন্তান-

বীজ গণন করা অর্থ প্রকাশিত হয়। ইহাই গর্ভাধান কথাটির যোগ্যার্থ।

এই মূল যোগ্যার্থ হইতে এবং গর্ভাধানের দ্বিবিধি বিধান ও মন্ত্রাদি হইতে নিরূপণ করিয়া যতদূর বিদ্যাভ্যাস কর্তা স্মৃতিব্যবহার প্রবেতা মন্ত্রমহাপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র গর্ভাধানের একটি পারিভাষিক অর্থ অবধারণ করিয়াছেন। তাহা এই—“গর্ভাধানং পত্যা ভোজ্যেণ তুৎকালীন ভোজ্যে ভেতনেনক” (স্মৃতিসংগ্রহঃ) অর্থ—“রক্ত উদ্ভাষন হইলে যথাবিধি প্রথমমাত্র সন্তানোৎপত্তির ক্রিয়া করার নাম ‘গর্ভাধান’। গর্ভাধানের সমস্ত বিধিবিধানাদি হইতে এই অর্থই প্রকাশিত হয়। হিন্দুগণও এই অর্থই ‘গর্ভাধান’ কথাটির ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং গর্ভাধান কথা শুনিতে এই অর্থই বুঝিয়া থাকেন, আচরণও এইরূপই করেন।

এই ক্রিয়ার আরও তিনটি নাম আছে। এক “নিষেক”, দ্বিতীয়, “গর্ভলগ্নন”, তৃতীয়, “প্রথম সন্তান”। “নিষেক” “প্রাশনাভ্যাস” বাজবল্যসংহিতা ১ অঃ ১০ শ্লোক। “গর্ভলগ্নন” গুণসমন্বয় সৌমস্তোত্রের ১ (আবলারন হুত) “নিষেকাদিবিধিনাং কার্যে শরীরমন্তরঃ ***” (মহাশ্রুতি ২ অঃ ২৬ শ্লোক)।

গর্ভাধানের বিধি কোন্ কোন্ শাস্ত্রে

নিখিত আছে, এবং ইহা

কি নিখিত করে।

এই গর্ভাধান ক্রিয়ার বিষয় হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে, ইহার অবশ্য কর্তব্যতার বিষয়ও আছে এবং ইহার উদ্দেশ্যও দর্শিত হইয়াছে।

গর্ভাধান ক্রিয়াকালে যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহা সমস্তই ঋগ্বেদোদি হইতে সংগৃহীত। অতএব প্রথম ঋগ্বেদ হইতেই গর্ভাধান ক্রিয়া ক্রিয়িত হইয়াছে। তাহার কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

ব্রহ্মদেবসংহিতা (১০ মণ্ডল ১২ অনুব্রাহ্ম ১৪৪ হুত ১-২০-৩৪)।

“বিষোনিং কয়স্বত্ব স্তোত্রাঙ্গারি পিথিৎ।
আদিকৃৎ প্রাণপতির্ভাষা গর্ভাধান্যতঃ ॥

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

গর্ভাধান দেখি সিনীবালি গর্ভাধান দেখি সরস্বতী।

পারস্তর-পৃথ্যপুত্র—গ, প্র।

“নকিবেন পানিবা উত্তে প্রজ্ঞাশ্বানে পরিমুখতি
পুত্রা জগতি।”

অর্থ—“পুত্রা জগৎ” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা
পুত্রীশ্বর-সংস্কার করিবে।

আখ্যায়ন-পৃথ্যপুত্র, অং ৩।

“পুত্রগন্তব্যং পুংসবনং সোমস্তোত্রায়নং * * *

অর্থ—“প্রথম পুত্রীধান কার্য্য করিবে; তৎপরে
পুংসবনং কার্য্য করিবে, তৎপরে সোমস্তোত্রায়নং
কার্য্য করিবে।”

আখ্যায়ন-পৃথ্যপরিষিষ্ট ১ অং।

“অথকৃত্যঃ প্রাজ্ঞাপত্যং।” হতে প্রথমে

অনুকুলেৎহনি দ্ব্যত্ভাভ্যাকার্য্য প্রাজ্ঞাপত্যম্

জ্ঞানীপাকস্য ইত্ৰহতা আত্মাহুতীজ্ঞান্যঃ বিষ্ণু-

বেদিনিমিত্তি নেজ্ঞমেধেতি অথ পুত্রগন্তব্যং। অর্থ—

বিবাহের পর গুরুকালে প্রাজ্ঞাপত্য হোমাদির

দ্বারা স্ত্রীর সংস্কার করিয়া সন্তান-জন্মন ক্রিয়া

করিবে। তাহার নিয়ম এই—স্ত্রীর প্রথম গুরুত

(১৬ দিনের মধ্যে) শুভদিনে দ্ব্যত্ভাভ্যাকার্য্য সহিত

করিত হইয়া প্রাজ্ঞাপত্য অস্থাপন করিবে।

তৎপর এই সকল দ্ব্যত্ভাভ্যাকার্য্য হোম করিবে।

যথা—বিষ্ণুবেদিনি কল্পত্ব ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা

তিনবার আহুতি দিবে, নেজ্ঞমেধা এই মন্ত্রের

দ্বারা দুইটি আহুতি দিবে। * * * অন্তর

এইরূপ নিয়মে সন্তানজন্মন ক্রিয়া করিবে * * *।”

বৌধান প্রমাণ—

“প্রজ্ঞামুং পাদবৈদৌষম-মন্ত্রস্যমোনে—”

অর্থ—বিবিধ বিহিত ঔষধ এবং মন্ত্র প্রয়োগাদির

দ্বারা পুত্রীশ্বরাদি সংস্কার করিয়া সন্তান উৎপাদন

করিবে।

সূত্রকারদিগের প্রমাণ উক্ত হইল। এখন

সুত্রীশ্বরপুত্রোক্তা—মহ প্রকৃতির প্রমাণাবলী

দর্শিত হইতেছে।—

মহামহিষ্ঠী ২ অং ২৬। ২৭ শ্লোক।

“বৈবৈক্যে কব্ধিভিঃ পুংসান্যৈক্যাকারিণাম্।

কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রোত চেষ চ।

পার্ভীহৌতমজ্জাকর্য্যং চৌদমৌজানিবর্তনঃ।

বৈজিক্যং পার্ভীকথেনা দ্বিজানামবশম্ভবতঃ।

অর্থ—“পরম শুভাষ্য বৈদ্যক্য মন্ত্র এত্য়

প্রকৃতির দ্বারা নিম্নোক্ত—পুত্রীশ্বরাদি—বিবাহ

পূর্ব্বভূক্ত দশমতি ক্রিয়ার অন্ত্যষ্টানে এই শরীর

সংস্কারের দ্বারা আত্মার পাপক্ষয় হইয়া পরম

পবিত্রতাব জন্মিয়া থাকে। আর মাতার পুত্রীশ্বর

ও পিতার বীজগত যে কোন অপবিত্রতা

যেবা থাকে, তাহা বিমোচন হয়।”

মহাব্যবসায়হিতা ১ অং ১০ শ্লোক।

পুত্রীধানমূর্ত্তে পুংসঃ সননং স্পন্দনাৎ পুরা।

যেঠেইমবে বা সীমস্তঃ এসবে জাতকর্য্য চ।

অভেজ্ঞাপ্রাশনং নাম চতুর্থং মানি নিজ্ঞনং।

যেঠেইপ্রাশনং মানি চূড়া কার্য্য যথাকুলং।

এতেনেনঃ স্বয়ং যতি বীজপুত্রসুদন্তং।

অর্থ—“বিবাহের পর প্রথম গুরু হইলে পুত্রীধান

কার্য্য করিবে। তাহারে পুত্রীসংস্কার হইলে গুর্ভের

স্পন্দনকালের পূর্বে (৩ মাসে) পুংসবন সংস্কার

করিবে, * * * এইরূপ সমস্ত ক্রিয়ার অন্ত্যষ্টান

করিলে পিতার বীজগত; মাতার পূর্ব্বগত যে

সকল অপবিত্রতা দিবে থাকে, তাহার সাধন হয়,

সন্তান পবিত্রীকৃত হয়।”

রঘুনন্দন এবং হাম্পুধ-বৃত্ত হারিতবচন।

“পুত্রীধানবধেতো ত্রাক্ষর্য্যং সমধতি * *

* * * এতৈরষ্টাভিঃ সংস্কারৈর্গৌপেযভাত্যং পুত্রো

ভবতি।”

অর্থ—“পুত্রীধান-বিষমিতে পুত্রোৎপাদন করিলে

পবিত্র সন্তান উৎপন্ন হয়। * * * এই

রূপ পুত্রীধানবিধি অন্ত্যষ্টান সংস্কার ক্রিয়া দ্বারা

সন্তান “উপপাতক” “মলিনীকরণ” “জাতিভ্রম

করণ” “সঙ্করীকরণ” এবং “জ্ঞাপাতীকরণ” এই

পাঁচপ্রকার পাপ হইতে পুত্র হইয়া থাকে।”

কাত্যায়নসংহিতা, ১ প্রপাঠ ৭ অং ২ শ্লোক।

“বিবাহাদিঃ কর্ণগণা য ততো

পুত্রীধানং শুভময় বজ চাশ্তে।

বিবাহাদিনোক্তকমেযাং কুর্ধ্যাৎ

ভ্রাক্ষ্যং নানো কর্ণগণঃ কৰ্ণগঃ স্যাত ৷”

অর্থ—“বিবাহের পর পাণ্ডুরহাদি কর্ণ এবং

পুত্রীধান কর্ণের প্রত্যেকের পূর্বে সাম-বৌদী

ত্রাক্ষণগণের আত্মদিকের আত্মকরিবার আন্ব্যক

নাই। বিবাহের পূর্বে একমাত্র আত্মদিক

করিয়াই পুত্রীধান পূর্ব্বগত সমস্ত ক্রিয়া করিবে।”

রঘুনন্দনবৃত্ত অন্তির বচন—(সংস্কারতত্ত্ব)

“চিত্রাং কুর্ধ্যং বধানেইকৈরৈকৈরান্যাত্যেত শনৈঃ।

ত্রাক্ষণ্যাদি উৎসং স্যাত সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ।

অর্থ—“সন্তান বর্ধন দ্বারা যেমন একটা চিত্র

কার্য্য সাধন হয়, পুত্রীধানাদি নানাবিধ সংস্কারের

দ্বারা তেমন এই বৈধ এবং আত্মাদির মধ্যে বিশেষ

গুণ উপভুক্ত হইয়া ইহাবিক্রমপ্রাপ্তির যোগ্য হয়।”

ই অন্যমুখ্যতি।

“অষ্টৌ সংস্কারকর্ম্মারি পুত্রীধানমিব স্বয়ং।

পিতা কুর্ধ্যাৎ ততোবা বা তদন্বয়ং পিতৃ তৎক্রমাত ৷”

অর্থ—“পুত্রীধানসংস্কার যেমন ভবিষ্যৎ

উৎপন্নমান সন্তানের পিতাকেই করিতে হয়,

সন্তান পূর্ব্ব হইলে পুংসবনাদি উপনয়ন

পূর্ব্বগত অন্য সংস্কারও সেই পিতাকেই করিতে

হয় * * *।” এইরূপ অন্যান্য মুখ্যভাষ্যেও

পুত্রীধানের বিধি এবং তাহার ফলের বিষয়

উল্লিখিত আছে।

এখন আনন্দে বর্ধশাস্ত্রের ব্যাখ্যা তা ও

ব্যবস্থাপক মণ্ডলী কি বলিতেছেন শুভন;—

রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের প্রণীত সংস্কারতত্ত্ব

“অথ পুত্রীধানং” হইতে “অথ পুংসবনং” পর্য্যন্ত

বর্ণিত একটা প্রবন্ধের দ্বারা পুত্রীধানের রীতি পদ্ধতি

কৃষ্ণ হইয়াছে, কাহার হইয়াছে বলিয়া সমস্ত সংস্কার

করিতে পারিলাম না।” রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আমা-

নিদের বাদ্দাগার ব্যবহাওক, ইহার ব্যবহা-

ওমারেই আমরা সমস্ত পুত্রীধান ক্রিয়া থাকি

এবং ইনি যে ব্যাখ্যা করেন, তাহাই শাস্ত্রের

প্রকৃত অর্থ বলিয়া, বঙ্গীয় হিন্দুগণ বিবাস করিয়া

থাকেন।

মহামহোপাধ্যায় নাচশক্তি মিশ্র—(স্মৃতিসার-

সংগ্রহ, সংস্কার প্রকরণ।)

“অথ সংস্কারা। তন্ম সংস্কারো বিবাহাদি জ্ঞ-

শরীরপুষ্টিগুণঃ। স তু স্মৃতিস্থাপনাদিবং সংস্কার-

বিশেষ এব। ততোদ্যন্ত ধোমোজ্যাক্ষত্কারি-

শংপ্রকারঃ। অতঃপরেণ সংস্কারগণপ্রয়োগঃ।

অতঃপুত্রীধানং প্রথমতঃ দর্শেৎ। ত্রেণপি স্ব-

জ্ঞান্যসংস্কারাদ্যঃ ত্রাক্ষণ্যং সাম্পাদিকা পুত্রীনা-

চ্যাপনয়নাত্য নট্টেব। বিবাহতৎসংস্কারঃ পতিভ-

বপ্তীহেৎপি জনয়তি * * * ততঃ * * * পুত্রীধানং

পুত্রীণ্যো বোদৌ স্বকৃৎকালীন আচার্য্যেতৎসংস্কর * * *।

অর্থ—“অতঃপর সংস্কার কাহাকে বলে তদ্বিশয়

বলা বাইতেছে। বিবাহাদি ক্রিয়া দ্বারা স্ত্রীর

একপ্রকার পবিত্র ওপনিষদ জন্মিয়া থাকে,

তাহাই মানবের সংস্কার নামে অভিহিত হয়;

উহা সাধারণ জ্ঞানের স্মৃতিস্থাপনাদি এবং

স্ত্রায় মানবের প্রকৃতি-মনোভেদ হয়। যেময় ঋষি

তাহাকে চতুরাংশংপ্রকারে বিভক্ত করেন, স্ত্রীর

তাহাদিপক্ষেও সংস্কার বলা যায়। কিন্তু অত

সমস্ত মুনিগণ দশটি ক্রিয়াকেই মুখ্য সংস্কার

বলিয়া গণনা করেন। মানবের সেই দশটি সংস্কার

পুত্রীধান হইতে উদ্ভূত হইয়া পর্য্যন্ত। তদ্বশে পুত্রীধান

হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত দশটি সংস্কার মানবের

স্বৈহ ও আত্মাকে ব্রহ্ম শাস্ত্রের উপভুক্ত করে,

আর বিবাহ-সংস্কার তাড়শ ব্রহ্মশাস্ত্রের যোগ্যতা

ও দ্বাপাত্য বর্জন (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী একত্বভাৱত,

এই উভয়ই জ্ঞানীয়া থাকে। তদ্বশে প্রথম

জ্ঞত্বকালে, বিবিমতে পুত্রোৎপাদন ক্রিয়াই

পুত্রীধান।”

অতঃপর যে যে “পদ্ধতি-পুস্তক” অহমানে

আমাদিগের পুত্রীধানবিধি সমস্ত ক্রিয়ার অন্ত্যষ্টান

করা হয়, সেই সকল প্রমাণাবলী দেখুন—

হলান্দ—(ত্রাক্ষণ-সংস্করণ)

ইহার পদ্ধতি অনুযায়ী বাদ্দাগার সমস্ত

য়ুক্তকর্ত্তব্য ত্রাক্ষণগণ ও অজ্ঞাত সমস্ত জাতি,

কল্প হইতে মুখ্য পর্য্যন্ত ব্যব্জ ক্রিয়ার অন্ত্যষ্টান

করিয়া থাকে, ইনিও পুত্রীধান সংস্কারের বিষয়

বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। “পুত্রীধান-

পুংসবনং সামনিমুখং স্মারকপাণং। ধর্ম্মাধ্যাত্মাধ্যমেন

রুচিভাত্যং ব্যাখ্যানিমাণং শ্রুতং।” * * *

এই শ্লোকটি হইতে “অথ পুংসবনং” পর্য্যন্ত

মহাশা হলান্দ পুত্রীধানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই শ্লোকটির অর্থ—“পুত্রীধান হইতে বিবাহ

পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কার বিষয়ে ইলাধ্য রুচ ব্যাখ্যা

অবগত হও, পরে তদনুসৃত অন্ত্যষ্টান বর।”

ভবেনবট্টকরুত পদ্ধতি।

তবেষ ভট্ট সামবেদীয় ত্রাক্ষণগণের পদ্ধতি-

ওক। ইহার পদ্ধতি-পুস্তকক অন্ত্যষ্টানে বাদ্দাগার

সমস্ত সামবেদীয় ত্রাক্ষণগণ নিখিল ধর্ম্মপ্রণয়

অন্ত্যষ্টান করিয়া থাকেন। ইনিও পুত্রীধানের

রীতি পদ্ধতি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

“অথ পুত্রীধানং। তত্রোক্তসামান্যদ্বিধং নিষেক-

বিধেন সায়াং মধ্যাহ্নমভীতায়াম্ শুভকমে পতিঃ

ভটিঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সমস্তং কুর্ধ্যাৎ।” * * *

অর্থ—“ইহার পর পুত্রীধান-সংস্কারের বিষয়

বর্ণিত হইতেছে—কুশ্বানের পর স্ত্রীসংস্কারের দিন

সামান্যকাল অতীত হইলে শুভকমে পতি ভটি হইয়া

পুত্রীবাচনপূর্ব্বক সমস্ত করিবে, ইত্যাদি

বাহুদেবভট্টরূপ পদ্ধতি।

ইনি কয়েকটা ব্রাহ্মণগণের পত্রিকাকার।
বাল্লার সমস্ত কয়েকটা ব্রাহ্মণ ইহার পত্রিকায়
অন্যদের সমস্ত ধর্মকার্যের অহুতান করেন।
ইনিও অতি নিপুণত মতে গর্তাধান-কার্যের বন্দী
করিয়াছেন।

“অথ গর্তাধানপ্রণালিঃ। গৃহপরিশিষ্টোক্তেন
গর্তাধানমিহোচ্চাতে। শুভমখতিথিঃ মাংসকাপুজা-
পূর্বকমভ্যাবরিকৃত্য কৃত্য কৃত্য উপপেনপান্যারি-
প্রতিষ্ঠাপনান্তঃ কৰ্ম কৃত্য আধানং কৃত্যং।”

অর্থ,—“অতঃপর, গর্তাধানাহুতান করিতে।
আমি গৃহপরিশিষ্টোক্ত বিধিমতে গর্তাধান সংস্কার-
ের নিয়ম প্রণালী বলিতেছি। ঋতুকালে শুভমখ
তিথ্যাদিনময়ে পতি “যোদ্ধমাংসকাপুজা ও বৃষ্টি-
লাজ করিয়া, অস্তিতাপনান্তঃ কৰ্ম মাংসা-করিয়া,
আধান করিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।”

পতপতি আচার্য্য বাল্লার বজ্রকৌর্য্য বাল্লার
ও অজ্ঞাত সমস্ত জাতির “আচার্য্য। ইহার
পদ্ধতি অনুসারে সমস্ত বজ্রকৌর্য্য ব্রাহ্মণগণ
এবং ব্রহ্মের বৈশ্ব মুখারি সমস্ত জাতীয় মানবগণ
সকল প্রকার ধর্ম-কার্যের অহুতান করিয়া থাকেন।

“অথ গর্তাধানং। তত্র প্রথমং নিবোধোক্ত-
কালে দিনে এবং পূর্বাহ্নে রক্তনিত্যকৃত্যং বিবাহ-
পন্থাক্রমেণ *গৌর্য্যাদিবেদ্যমাংসকাপুজাং
কৃত্যং।”

অর্থ,—“অতঃপর গর্তাধান সংস্কারের বিধি
বলিতেছি। প্রথম শাস্ত্র-নির্দিষ্টকালে দিবা
পূর্বাহ্নে অজ্ঞাত অহুতান সমাধা করিয়া, বিবাহ-
পন্থার উক্ত নিয়মানুসারে গৌর্য্যাদি বেদে-
মাতৃকা পূজা করিবে, অনন্তর দৈশানদিগনিমুখ
হইয়া উপবেশনপূর্বক ইত্যাদি ইত্যাদি।”

“গর্তাধানক্রিয়া কতদিন বাৎ প্রচলিত?

এই গর্তাধান ক্রিয়া হিন্দুর কোন অভিনব
আচার নহে, ইহা অতীত প্রাচীন কাল হইতে
অদ্বিতীয় হইয়া আসিতেছে। যে দিন বেদভট্টর
প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে “শস্য
প্রাকৃত্য বরাবর ইহা প্রচলিত। গঙ্গাপ্রবাহের
দ্বারা লক পলক বৎসর পর্য্যন্ত, চতুর্দশ পর্য্যন্ত,
অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত প্রবাহে ইহা চলিয়া আনি-

তেছে। বেদ-হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ
সংগ্রহ পর্য্যন্ত, ব্রহ্ম, সর্গহিতা, পুরাণাদি সমস্ত
ধর্মশাস্ত্রেই এই গর্তাধান সংস্কারের বিশেষ সমার
দৃষ্ট হয় বিনীয়াই এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।
হিন্দু-ইতিহাস ও বর্তমান আচার ইহার অনুরোধেই
সাম্য দান করে। অতএব গর্তাধান করা আমাদের
সমনাত ধর্ম।

আজকাল এই গর্তাধান সংস্কার
কত লোকে করে?

বর্তমান সময়েও দ্বাংরা প্রকৃত হিন্দু, তাঁহারা
প্রত্যেকেই গর্তাধান সংস্কার করিয়া থাকেন।
কিন্তু আজকাল ইংরাজী শিল্পিতদিগের মধ্যে
দ্বাংরা প্রকৃত হিন্দু নহেন, প্রকৃত হিন্দুগণ দ্বাংরা-
দিয়ে অপবিত্র হিন্দু বা পতিত হিন্দু বলিয়া মনে
করেন, তাঁহারা অজ্ঞাত পণ্ডিতকার্যের দ্বারা ইংরাজ
না করায়ই সম্ভব। তৎপর বৃষ্টিজন মূলমানের
মধ্যেও যেমন সকলেই তাহাদের ধর্মশাস্ত্রের সকল
আজ্ঞা প্রতিপালন করেন না, তেমন এই কোটি
কোটি হিন্দুর মধ্যে যে অধার্মিক এবং শাস্ত্রভাঙ্গার
প্রতিকূলবাকী লোক থাকিবে, ইহা নিতান্তই
সম্ভবপর।

গর্তাধানে জী-সম্ভোগের আবশ্যকতা
আছে কি না?

গর্তাধান-ক্রিয়ার দ্বৈধ লক্ষণ, যেরূপ অর্থ ও
যেরূপ বিরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে গর্তাধান
ক্রিয়াসম্ভোগে জী-সম্ভোগের আবশ্যকতা আছে কি
না, এ বিষয়ে সম্বন্ধে কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।
মৃত্যুর তাহা এখানে বলা পুনরুক্তি মাত্র।
তথাপি সেই বিবাহের প্রতি সকলের বিশেষরূপ
শ্রদ্ধা দ্বাপনের নিমিত্ত কিছু বলা আবশ্যক
হইয়াছে।

জী-সম্ভোগ না হইলে গর্তাধান হইতেই পারে
না। কারণ শুভকালে শিখিত ত্রায় সম্ভোগ
করাই গর্তাধানের অর্থ। “ইহা পূর্বসেই বলা হই-
য়াছে। অতএব তাহা না হইলে কেমন করিয়া
গর্তাধান হইবে?”
“গর্তাধানং প্রত্য যোনৌ ঋতুকালীনা অমোহে-
সেকঃ।” (বাচপতিবিশিষ্ট যুগতিসারঃগ্রন্থঃ।)

• অর্থ,—“ঋতুকালে বিবিধতঃ অধ্বন্যার সম্ভোগে-
পাদন ক্রিয়ার নাম গর্তাধান।”

গোষ্ঠিত বর্ণিয়াছেন,—
“সমাপ্যাকৌ সম্ভবতঃ”

• (গোষ্ঠিতগৃহস্থঃ, ২য় প্রপাঠক, পঞ্চম কাণ্ড,
১০ শ্লোক)

অর্থ,—“পূর্বোক্ত মন্ত্রপঠাতির পর, সম্ভান-
প্রঞ্জননের ক্রিয়া করিবে।

বোধান, গর্তাধান প্রকরণ।
“প্রজামুৎপাদয়েৎ ঔষধমজ্ঞাযোনেন।”

অর্থ,—“ঔষধ ও মৃত্তি দ্বারা গর্তাধানাদির
সম্ভবপাঠে সম্ভান-জননের ক্রিয়া করিবে।”

হলায়ুধ—(ব্রাহ্মণ-সম্ভোগ, গর্তাধান-প্রকরণ)
“তত ইমং মন্ত্রঃ মনসা পঠনং সেতঃ স্রাবয়েৎ
ঔ রেতোমুৎপৎ বিজহাতৌ তৎ।”

অর্থ,—“গর্তাধানের অঙ্গাহুতান করিয়া পরে
“রেতোমুৎপৎ বিজহাতৌ” এই মন্ত্র মনে মনে চিত্তা
করিয়া সম্ভান-জনন ক্রিয়া করিবে।

সেই মন্ত্রটির দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।
“রেতোমুৎপৎ বিজহাতৌ যানিঃ প্রথমশিল্পিয়ং।
গর্তো জরায়াং যুত উবাং জহাতিক্রমণা।”

(ঋগবেদসংহিতা)
ইহার অর্থ সম্ভোগের নিকট বলা উচিত নহে
তাই লিখিলাম না। এরূপ আরও মন্ত্র আছে—

“ও তাম পুংগ শিবতমো যে রম্য যজ্ঞাং বিজং
মুখ্যাং বপতি।”

মান উশতী বিশ্বায় তে বজ্রমুৎপৎ প্রথমঃ শেখং।
ও যথা ভূমিবিপতিঃ যথা দেগিরিজেণ গতিঃ।

বাহুধাঃ দিশাং গর্তমেবং গর্তঃ ধামনি তে।”
(ঋগবেদসংহিতা)

এই মন্ত্রদ্বয়ের অর্থও সম্ভোগের প্রকাশ নহে।
রঘুনন্দন—(সংস্কার-তত্ত্ব)

“গর্তো সমাপ্যৈব সমাধোং যুগুতঃ।”
অর্থ,—“মন্ত্রপঠের দ্বারা গর্তাধান করিয়া
সম্ভানোপাদান ক্রিয়া করিবে।”

ভবদেবপদ্ধতি (গর্তাধান প্রকরণ)
* * * “ততো ভাধ্যমুপোগাং।”

অর্থ,—“কথিত ও নিয়মানুসারে গর্তসংস্কার
করিয়া সম্ভানোপাদান ক্রিয়া করিবে।”

কাশ্যপ-পদ্ধতি (গর্তাধান প্রকরণ)
“ও তাম পুংগ * * * ইতি পঠিতা উপাচ্ছেৎ।”

অর্থ,—“পূর্ব ক্রিয়া সমাপনান্তর “তাম পুংগ”

এই যন্ত্রাৎ অরণ করিয়া সম্ভান-জনন ক্রিয়া
করিবে।

এইরূপ সর্বত্রই উপদেশ আছে। অতএব
সম্ভান-জননের ক্রিয়াই গর্তাধানের মুখ্য বিষয়।
ইহা না হইলে, গর্তাধান কদাচ হইতে পারে না
ইহা জানা গেল।

গর্তাধান সংস্কারে আর কি কার্য্য
করিতে হয়?

গর্তাধান ক্রিয়ার অন্তরূপে বহুর অহুতের
বিষয় আছে। ইহাতে “সেই দিন দিবসময়
দম্পত্যের উপাসন করিয়া থাকিতে হয়। তদবিত্যং
সমস্তের সম্ভোগেই ঈশ্বরের পূজা করিতে হয়, হোম
করিতে হয়, পিতৃপুত্রের আঞ্জ (ঋগবেদীয় ব্রাহ্মণ-
গণের) করিতে হয় এবং সাধু, ব্রাহ্মণদিগকে
ভোজন দিরাইতে হয়, বিধি, মঙ্গলচারণ করিতে
হয়। অর্থাৎ কি গর্তাধানের অহুতের কৰ্ম এত
আছে যে, প্রত্যেকের হইতে আরম্ভ করিয়া রাতি
১০টা, ১১টা সমাপ্ত হয়। অতএব ইহা কোন
সামান্য অহুতান নহে।

গর্তাধান কোন সময় করিতে হয়?

প্রথম কতুই গর্তাধানের সময়। জী যখন
প্রথমে কতুতী হয়, তখনই—গর্তাধান করিতে
হইবে। গর্তাধানের মন্ত্র দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন
হয়।

মন্ত্র যথা :—

“ও বিশ্বপূসা বিশ্বকতা বিশ্বযোনির্যোনিজঃ।
নবপুশোংসবে চার্য্যং গৃহাং তং দিবাকরঃ।”

নবপুশোংসবে চার্য্যং গৃহাং দামিঃ ভক্তিতংপরঃ।
সম্পশাং হেতুকতা চ গৃহগার্য্যং দিবাকরঃ।

কর্ণদীপনমস্তেহস্তনমস্তে বিশ্বলোচন।
নবপুশোংসবে চার্য্যং গৃহাং তং দিবাকরঃ।

বিবাহা বিশ্বব্রহ্মণিবেশে বিবতান।
নবপুশোংসবে চার্য্যং গৃহাং তং দিবাকরঃ।

(ভবদেবপদ্ধতি গর্তাধানমন্ত্রঃ।)
* অর্থ,—“নির্ণিত ব্রহ্মকর্তে গর্তী হিতি, লয়ের
কারণ অর্থাৎ ইহাও যেরূপ। এই জী নবপুশোংসবে
(প্রথম কতুপের) সংস্কার লক্ষ্যে ইত্যাদি এই

অর্থ্য দিতেছি, তুমি অর্থ্য গ্রহণে প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল বিধান কর। ১৪। হে হৃদ্য! তুমি সম্পদের হেতু এবং দাতা, অতএব আমি ভক্তি-তৎপর হইয়া তোমাকে এই স্ত্রীর নবপুষ্পোদয়ের (প্রথম গুহ্যকালের) সংস্কার দক্ষ্যে। অর্থ্যদান করিতেছি ৷ ২২ ৷ হে হৃদ্য! মণ্ডলাধিষ্ঠিত পূর্নমে-
শ্বর। তুমি পূর্ণকালে সকলের স্বর্গরাজ্যের পথ-প্রদর্শক, অতএব তোমাকে প্রণাম করি।
হে বিবর্তন! তোমাকে প্রণাম করি। এই স্ত্রীর নবপুষ্পোদয়ের (প্রথম গুহ্যকালের) সংস্কার দক্ষ্যে তোমাকে পূজা করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ৷ ৩০ ৷ হে হৃদ্য! মণ্ডলাধিষ্ঠিত পরমাত্মন! তুমি বিশ্বের আত্মা, তুমি বিশ্বের বস্তু, তুমি বিশ্বের অধিপতি, তুমি বিশ্বের নয়ন, আমি এই স্ত্রীর নবপুষ্পোদয়ের (প্রথম গুহ্যকালের) সংস্কার দক্ষ্যে তোমাকে এই স্ত্রীর দান করিতেছি, তুমি গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল বিধান কর ৷ ৪১ ৷

এই সকল মন্ত্রত্রিহিঁ প্রথম গুহ্যতে গর্ভাধান করায় আবশ্যকতা দৃশ্য হইতেছে। প্রথম গুহ্যকালে গর্ভাধান না করিলে এই সকল মন্ত্র-পাঠই হইতে পারে না। কারণ ইহার প্রভিমন্ত্রেই নবপুষ্পোদয়ন বা প্রথম গুহ্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। হৃতরাং উহা অন্য সময়ে পাঠ করিলে মিথ্যা কথা বলা হয়।

এই স্ত্রত, এই মন্ত্র হইতেই প্রথম গুহ্যতে গর্ভাধান করার আবশ্যকতা বিধি সমাধৃত হয়। শব্দই বলিয়াছেন যে, 'প্রদোষামনবকোণাধারক মন্ত্রাঃ'। তেমাৎ 'তাদৃশাধারকত্বেনৈবাবিবর্তন নতু তদুচ্চারণমাত্রার্থেই সম্ভবতি। * * * মন্ত্রের পর হৃত্যধিনিষ্ঠ নিয়মবিধাভাষ্যং।'

(শৌণ্ডিকভাষ্যস্বতঃ সীমাসার্থ সমগ্রঃ)
অর্থ—যে কার্য যেরূপে যে নিম্নে অঙ্গষ্ঠান করিতে হয়, সেই কার্যের মন্ত্রের অধরে দ্বারাই তাহা হয় করিতে হয়, তাহাই 'কর্তব্য বলিয়া সুশিষ্ট হয়। এই অর্থ প্রকাশ করে বলিয়াই মন্ত্রের আবশ্যকতা। কিন্তু কেবল পাঠের দ্বারা নহে। বনের আশ্রয়লাভেই এই কথা বলিয়াছেন যে, মন্ত্রের দ্বারাই কার্যের নিয়মাদি সমস্ত অবগত হইতে হয়।'

অতএব প্রথম গুহ্যতে গর্ভাধান করার বিশেষ এই মন্ত্র কয়েকটাই আতি প্রাণ ও অঙ্কনীয় প্রমাণ, ইহা অপেক্ষা আর গুরুতর প্রমাণ আর কিছুই হইতে পারে না। হৃতরাং স্ত্রত প্রমাণ উভয়ের

আর আবশ্যক নাই। তথাপি বেশীর ভাগে আরও কতকগুলি দৃষ্টি হইতেছে।

(শৌণ্ডিক-গৃহসূত্রঃ ১ প্র, ৬ কা, ৮)
"মহর্ষুতী ভবতাপারতশ্রুতিভাষিতা তদা সম্ভবকালঃ।"
অর্থ—বিবাহের পর গুহ্যতী হইয়া বধন উপরতশ্রুতিভাষিতা হয়, সেই সময়ই গর্ভাধানের সময়।

এই স্ত্রুতে "প্রথম" এই বিশেষণটী না থাকিলেও প্রথম গুহ্যই বুঝিতে হইবে। "বিবাহের পর বধন গুহ্যতী হইবে" এই কথা বলিলে প্রথমটি বাদ দিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি গুহ্য উপস্থিত হইতে পারে না।

আবলারন-গৃহ্যপরিশিষ্ট ১ অধ্যায়।
"অথহৃতমাতা প্রাজাপত্যী, কৃত্যে প্রথমে অহ-কুলেবহনৈ হুমাতা অধারকঃ" ইত্যাদি।

অর্থ—বিবাহের পর স্ত্রী 'হৃতমতী' হইলে, প্রাজাপত্যী হোমাদিগুরুক গর্ভাধান করিলে। তাহার নিয়ম এই—প্রথম গুহ্যকালে 'হৃতমতী স্ত্রীর সহিত একত্রিত হইয়া অম্যাদান করিবে * * *

(বিষ্ণু সং ২ অং ১ শ্লোক)
"গর্ভস্ত স্পষ্টতাজ্ঞানে নিষেককর্ম।"

অর্থ—বিবাহের পর সস্তান জন্মিবার কারণ, অর্থাৎ গুহ্য হওয়া স্পষ্টরূপে অবগত হইলে নিষেক বা গর্ভাধান করিলে।

শব্দ সং (২ অং ১ শ্লোক)
"গর্ভস্ত স্পষ্টতাজ্ঞানে নিষেকঃ পরিকর্তিতঃ।"

অর্থ—"স্পষ্টত গুহ্য হওয়া জানিতে পারিলেই তখন গর্ভাধান করিলে।"

বাজবল্য সং (১ অং ১১ শ্লোক)
"গর্ভাধানমুত্তো পুংসঃ সননং স্পন্দনং পূজা।"

অর্থ—"কৃত্যং বহনৈ হইলেই গর্ভাধান করিতে হইবে।" এই বিষ্ণুশব্দ এবং বাজবল্য কথনে প্রথম মন্ত্র না থাকিলেও কথার ভাবে তাহাই বুঝায়।

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিত্র (স্মৃতিসার-সংগ্রহ, গর্ভাধান-প্রকরণ) "এবং মুখ্য-কাল এবং কালঃ * * * তদৈবাম মুখ্য-কালঃ তদিশেষকালং মাস্তোক্তব্যম্। তদাপি পূর্ব পূর্নঃ প্রোক্তঃ। যথা গর্ভাধানে প্রথমমুহূর্তঃ।"

অর্থ—"এই গর্ভাধারাদি দশবিধ সংস্কার মুখ্য-কালেই করিতে হইবে।" তদাপি বিশেষ করিয়া যে সময়ের কথা বলে, তাহাই সেই কার্য করার মুখ্য কাল বলিয়া সুশিষ্ট হয়। যেমন গর্ভাধানের

মুখ্য সময় প্রথম গুহ্য। অর্থাৎ প্রথম গুহ্যতে গর্ভাধান করিলেই প্রকৃতফল হইবে।

রঘুনন্দন স্ট্রীত্যাচার্য—(সংস্কারতত্ত্ব গর্ভাধান-প্রকরণ)
"অথ গর্ভাধানং। তত্র শৌচিনঃ, যদা গুহ্যমতী ভবতি উপরতশ্রুতিভাষিতা তদা সম্ভবকালঃ। গুহ্য প্রাজ্ঞাননবোপাধ্যায়ঃ তদিনিমিত্তেন নৈমিত্তিকং গমনং কার্য্য অকুর্তব্যং প্রত্যভায়াবিধিঃ।"

অর্থ—শৌচিনঃ বলিতেছেন যে, স্ত্রীর প্রথম রমোদর্শন হইলে, যে দিন রজন-করণ নিবৃত্তি হইবে, সেই দিনেই গর্ভাধান করিবে। সেই সময় গর্ভাধান না করিলে মহাপাপ হয়, অতএব গোষ্ঠিন সেই গুহ্য সময়েই গর্ভাধান করার অবশ্য গর্ভাভ্যাস নিয়ম করিয়াছেন। এইটী নিয়ম বিধি।" এখন নিশ্চয় হইল যে প্রথম গুহ্যকালেই গর্ভাধান করা নিত্য আত্মক।

স্বাত্ত, পুষ্প ও আর্ভব শব্দের অর্থ কি?

প্রস্তাবিত প্রমদের প্রমাণগুলির মধ্যে কোন বানে প্রথম গুহ্য, কোনখানে প্রথম পুষ্পোদয়ন এবং কোনখানে প্রথম আর্ভব বলিয়া কথিত হইয়াছে, অতএব ঐ "কৃত্ত" "পুষ্প" ও "আর্ভব" প্রভৃতি কথা কএকটির অর্থ কি, তাহা হুস্পষ্ট করা আবশ্যিক। স্ত্রী-জাতির স্বর্গধারণন হওয়ার নামই গুহ্য এবং পুষ্প। আর গুহ্য হওয়ার পরি-
কল্পক বাহা, তাহাই (স্বর্গের) আবর্ভ নামে অভিহিত হয়। গুহ্য কথা হইতেই 'পুষ্প' প্রত্যয় করিয়া আর্ভব কথাটি হইয়াছে। প্রমাণ—উশ্রুত ৩ অং (আহুর্বেদ)।

"মাসেনাপাতিতং কালে রমণীমং তদাভবৎ।

ঐষকংমণ্ড বিগুরুক বায়ুধোনিমুখং নয়েৎ।
গুহ্য দ্বাশরাত্র্য ভবতি দৃষ্টার্ভঃ-অদৃষ্টার্ভঃ-
হাশ্রুতীভ্যোকে।"

অর্থ—প্রায় একমাস কালপর নারীর সেই গর্ভাধন-ধর্মসম্বন্ধিত আর্ভব (স্বর্গের) ঐষক কুম্ভত এবং বিগুরুক-আকারে আভ্যন্তরিক বায়ুবিশেষের দ্বারা বহির্নিষ্কৃত হয়, সেই আর্ভবোদয়নের প্রথম দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্যন্ত গুহ্য। দ্বাদশ দিন পর্যন্তই স্বর্গের বহির্নিষ্কৃত হইয়া না বটে, কিন্তু অন্তরে প্রকাশ পাকে, হৃতভাং বায়ুনিষ্কৃত হইতে গুহ্য দৃষ্টার্ভ বাকে। বারদিনের পরেও কএক দিন (৭ দিন) পর্যন্ত অদৃষ্ট অবস্থায় আর্ভব

বাকে। এ নিমিত্ত অনেক মূনিগণ আরও অধিক সময় (১৬ দিন পর্যন্ত) গুহ্যকাল বলেন।"

মহামহিতা ৩ অং ৪৩ শ্লোক।

"গুহ্য বাতাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্র্যঃ মোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরতিমঃ সর্গমুহোঃ সর্গিণঃপতিতঃ।"

অর্থ—স্ত্রীলোকের প্রতিমাসে যে চারদিন পর্যন্ত রজন-করণ হয়, সেই চারদিন সহিত মোট মোড়শ দিন স্বাভাবিক গুহ্যকাল জানিলে।

বাজবল্য সংগ্রহ—"মোড়শদ্বিগুণিমাঃ স্ত্রীণাং।"

অর্থ—স্ত্রীলোকদিগের রজন-প্রকাশ হইতে মোড়শ দিন পর্যন্ত গুহ্যসময় বলে।"

অমরকোষ—"গুহ্যঃ স্ত্রীকুম্ভোৎসংপি চ।"

স্ত্রী-মোণিতোদয়ন হইলে গুহ্য বলে।

"ভাজজঃ পুষ্পমার্ভবং।"

রক্ত, পুষ্প এবং আর্ভব ত্রিগুণেও কথিদের নাম।

"স্ত্রীদর্শিন্যবিরাড্রৌ মলিনী পুষ্পবতাপি।"

গুহ্যমহাস্বকাদি।

স্ত্রী রমণী হইলে তাহাকে স্ত্রীদর্শিনী, অবি, আত্রেয়ী, মলিনী, গুহ্যমতী এবং উদকতা বলে।"

গুহ্য কথাটি অন্য কোন কোন স্থানে সীত-
দ্রোণাদি সময় বুঝিতেও ব্যবহৃত হয় এবং পুষ্প মন্ত্র উক্তিভাজ্যতঃ কুম্ভমেও প্রকৃত হইয়া থাকে।

কিৎ 'স্ত্রী-পুষ্প' 'স্ত্রী-গুহ্য' বলিলে তাহা বুঝাইতে পারে না। এই প্রকরণে সেই সকল অর্থ বুঝিতে বাওয়া নিত্য অসম্ভব। এখন জানা গেল, স্ত্রীর গুহ্য এবং স্ত্রীর পুষ্প অর্থ স্ত্রীর সুখিলাকাশ হওয়ারকালেই হইতে যেমন দ্বাদশ দিন পর্যন্ত প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিতাবস্থ শোণিত, অথবা তদুপাশিষ্ট যোগ দ্বিগুণ সময়।

তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিলাম যে, প্রথম রজনোদয়নের পর যোগ দ্বিগুণে মধ্যই গর্ভাধান-সংস্কার করিতে হইবে। কিন্তু তাহার কৌন দিনে করিতে হইবে, তাহা জানা গেল না।

প্রথম পঞ্চুর কৌন দিনে গর্ভাধান করা কর্তব্য?

মন্ত্র ২ অং ৪১। ৪৮ শ্লোক এবং ৪র্থ অং ৪০। ৪১। ৪২ শ্লোক।

"স্ত্রীমাসাদ্যাত্তপ্তজ্ঞ নিমিত্তৈকাদশী চ য।"

ত্রয়োদশী চ শোভ্য প্রশস্তা দশ রাত্র্যঃ।
যুদ্যদ্য পুত্রা জাযতে স্ত্রিণোমুখ্যো রাত্রিঃ।

তদান্যদ্ব্যধীশ পুরাণী সম্বিশোধিতের দ্বিতীয়।
নোপপক্ষেঃ প্রমত্তাংপি স্ত্রিয়মাত্রবর্ণনম্।
সমানবধনে চৈব ন শ্রীত তয়া সহ।
রজসাম্ভিত্যো নারীঃ নরস্ত হৃদযজ্ঞতঃ।
প্রজা তেজো বলা চন্দ্রারূপৈশ প্রদীয়তে।
তাঃ বিবৰ্জিতস্তত্ত্ব রজসা সমাভিষ্ট ত্বাং।
প্রজা তেজো বলা চন্দ্রারূপৈশ প্রবৰ্জ্যতে।

অর্থ—“যোল দিন জন্মসময়ের মধ্যে রজোদর্শন
হইতে প্রথম চারি দিন নিম্নিত ‘সমর।’
দ্বিতীয় দিন এবং ত্রয়োদশ দিনও ভাল নয়, অবশিষ্ট দশ
দিনের মধ্যেও অব্যবস্থা, পুৰিবা, অষ্টমী, ১০
চন্দ্রসিদ্ধি এই কয়েক তিথি এবং, সমাক্রান্তি বাদ
দিয়া অবশিষ্ট দিনের মধ্যে যে কোন দিনে
গর্ভাধান-সংস্কার করিলেও তাহাতেও একটি বিশেষ
আছে, শুক্লপূর্ণিমার দিন হইতে যুগ্মদিনে গর্ভাধান
করিলে, পূর্ব উপপত্ত হয় এবং অযুগ্মদিনে কষ্ট
উৎপন্ন হয়, অতএব পূর্বকাম্যে ব্যক্তি উহার যুগ্ম-
দিনেই গর্ভাধান করিলে।”

কিছু
এবংলগ্ন উদ্ভিদগণের বশ হইলেও কদাচ
ত্রয়োদশের যে কয়েক দিন ব্যতিত বাক্য থাকে, সেই
কয়েক দিন করিলে না। তাহার সহিত এক
শব্দান্তরেও থাকিলে না। কারণ, যে ব্যক্তি স্থি-
রাক্ষা ত্রয়োদশ উপপত্ত হয়, তাহার প্রজা, তেজ,
বল, দর্শনশক্তি এবং আয়ুস্ সৌখ্য যায় এবং
পুষ্টকরকাল। অতীত হইয়া, ঐশ্বর্যবান্ধব।
কৃত্তে উপপত্ত হইলে প্রজা, তেজ, বল, দর্শন-
শক্তি এবং আয়ুস্ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব
চারিদিনের পরেও আরু হই এক দিন দি তাৎস
অবস্থা থাকে, তবে তাহাতে উপপত্ত হইলে না।

যোজিত ১৫, ১৬, ১৭।

“শব্দকুত্যা তুভ্যস্তপসশোভিতা বদাস্তবৎকালঃ।”
অর্থ—“বিবাহের পর গর্ভ হইলে, যখন
উপপত্ত-শোভিতা হইবে, তখন এইগর্ভাধান-সংস্কার
করিলে।” ক্ষেত্রশাস্ত্রেও গর্ভাধানের ব্যৱস্থার
সংক্ষেপ অনেক কল্পা আছে, অনুবজ্ঞক বোধে
তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

প্রথম স্মৃতে গর্ভাধান না হইলে
দোষ আছে কি না ?

প্রথম স্মৃতে গর্ভাধান না হইলে দোষ আছে কি না এই সমস্যা অতি স্বম্ভূত। কারণ প্রথম

স্মৃতেই গর্ভাধান-সংস্কার করা সর্ব শাস্ত্রে
অনুমোদিত ও বিহিত একথা যথোচিত দর্শিত
হইয়াছে। সুতরাং সেই বিহিত মনসে উক্ত
সংস্কার না করিয়া হই মাস, ছয়মাস কি বৎসরান্ত
করিলে অবহিত মনসে করা হইল। তবে

তাহার আর সেই কল প্রাপ্তির আশা কি ? যে
কালে যেভাবে যে কার্য করার বিধি আছে, সেই
কালে সেই ভাবে সেই কার্য করিলেই তদার
উপপত্ত কল লাভ করা যায় এবং তাহার অস্ত্যায়
মলেরও অস্ত্যায় হইয়া থাকে। সুতরাং যখনসময়ে
না করিলে গর্ভাধানের প্রকৃত কল হইতে পারে

না এবং সমস্ত ধর্ম-শাস্ত্রের বিধি বা আজ্ঞা লঙ্ঘন
করা হয়, সুতরাং ধর্ম লঙ্ঘন করা হত, শাস্ত্র লঙ্ঘন
করা হয়, ধর্মহানি হয়, ইহাই অতি গুরুতর
দোষ। হিন্দুগণ ইহাকেই গুরুতর হানি বলিয়া
বিবাস করেন।

তৎপর শুক্লাক্ষেত্র জীবন না করিলে তাহার
গুরুতর পাপের বিষয়ও উল্লিখিত আছে।

রঘুনন্দনগুপ্ত স্মৃতির বচন।

“কৃতমতীভ্যো যো ভাৰ্য্যাঃ সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
অব্যাহোতি স মন্দ্যাতা জঘ্যতামৃত্যুরতী।
অর্থ—“নিকটে থাকিয়া যে ব্যক্তি কৃতমতী
ভাৰ্য্যাকে উপপত্ত না হয়, সে প্রতি মাসের
প্রতি কৃত্তে জঘ্যতামৃত্যুরতী হয়। যত গুরুতর
উলঙ্ঘন করিলে, ততটা জঘ্যতামৃত্যুর পাপ
হইবে।”

পরশুরামস্মৃতি ৪ অং ১০। ১০ শ্লোক।

“কৃত্তমতীভ্যো যো ভাৰ্য্যাঃ সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
অব্যাহোতি স মন্দ্যাতা জঘ্যতামৃত্যুরতী।
অর্থ—“নিকটে থাকিয়া যে ব্যক্তি কৃত্তমতী
ভাৰ্য্যাকে উপপত্ত না হয়, সে প্রতি মাসের
প্রতি কৃত্তে জঘ্যতামৃত্যুরতী হয়। যত গুরুতর
উলঙ্ঘন করিলে, ততটা জঘ্যতামৃত্যুর পাপ
হইবে।”

গর্ভাধাত্ত যো ভাৰ্য্যাঃ সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
অব্যাহোতি স মন্দ্যাতা জঘ্যতামৃত্যুরতী।
অর্থ—“নিকটে থাকিয়া যে ব্যক্তি গর্ভাধাত্ত
ভাৰ্য্যাকে উপপত্ত না হয়, সে প্রতি মাসের
প্রতি কৃত্তে জঘ্যতামৃত্যুরতী হয়। যত গুরুতর
উলঙ্ঘন করিলে, ততটা জঘ্যতামৃত্যুর পাপ
হইবে।”

গর্ভাধাত্ত যো ভাৰ্য্যাঃ সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
অব্যাহোতি স মন্দ্যাতা জঘ্যতামৃত্যুরতী।
অর্থ—“নিকটে থাকিয়া যে ব্যক্তি গর্ভাধাত্ত
ভাৰ্য্যাকে উপপত্ত না হয়, সে প্রতি মাসের
প্রতি কৃত্তে জঘ্যতামৃত্যুরতী হয়। যত গুরুতর
উলঙ্ঘন করিলে, ততটা জঘ্যতামৃত্যুর পাপ
হইবে।”

গর্ভাধাত্ত যো ভাৰ্য্যাঃ সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
অব্যাহোতি স মন্দ্যাতা জঘ্যতামৃত্যুরতী।
অর্থ—“নিকটে থাকিয়া যে ব্যক্তি গর্ভাধাত্ত
ভাৰ্য্যাকে উপপত্ত না হয়, সে প্রতি মাসের
প্রতি কৃত্তে জঘ্যতামৃত্যুরতী হয়। যত গুরুতর
উলঙ্ঘন করিলে, ততটা জঘ্যতামৃত্যুর পাপ
হইবে।”

গর্ভাধাত্ত যো ভাৰ্য্যাঃ সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
অব্যাহোতি স মন্দ্যাতা জঘ্যতামৃত্যুরতী।
অর্থ—“নিকটে থাকিয়া যে ব্যক্তি গর্ভাধাত্ত
ভাৰ্য্যাকে উপপত্ত না হয়, সে প্রতি মাসের
প্রতি কৃত্তে জঘ্যতামৃত্যুরতী হয়। যত গুরুতর
উলঙ্ঘন করিলে, ততটা জঘ্যতামৃত্যুর পাপ
হইবে।”

গর্ভাধাত্ত যো ভাৰ্য্যাঃ সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
অব্যাহোতি স মন্দ্যাতা জঘ্যতামৃত্যুরতী।
অর্থ—“নিকটে থাকিয়া যে ব্যক্তি গর্ভাধাত্ত
ভাৰ্য্যাকে উপপত্ত না হয়, সে প্রতি মাসের
প্রতি কৃত্তে জঘ্যতামৃত্যুরতী হয়। যত গুরুতর
উলঙ্ঘন করিলে, ততটা জঘ্যতামৃত্যুর পাপ
হইবে।”

গর্ভাধাত্ত যো ভাৰ্য্যাঃ সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
অব্যাহোতি স মন্দ্যাতা জঘ্যতামৃত্যুরতী।
অর্থ—“নিকটে থাকিয়া যে ব্যক্তি গর্ভাধাত্ত
ভাৰ্য্যাকে উপপত্ত না হয়, সে প্রতি মাসের
প্রতি কৃত্তে জঘ্যতামৃত্যুরতী হয়। যত গুরুতর
উলঙ্ঘন করিলে, ততটা জঘ্যতামৃত্যুর পাপ
হইবে।”

গর্ভাধাত্ত যো ভাৰ্য্যাঃ সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
অব্যাহোতি স মন্দ্যাতা জঘ্যতামৃত্যুরতী।
অর্থ—“নিকটে থাকিয়া যে ব্যক্তি গর্ভাধাত্ত
ভাৰ্য্যাকে উপপত্ত না হয়, সে প্রতি মাসের
প্রতি কৃত্তে জঘ্যতামৃত্যুরতী হয়। যত গুরুতর
উলঙ্ঘন করিলে, ততটা জঘ্যতামৃত্যুর পাপ
হইবে।”

হয় ততটা কল অতীত হইবে, ততটা জঘ্যতামৃত্যুর
পাপভারী হইবে। এইপাশের কল চিরদিন
তাহাকে নরকে থাকিতে হইবে।”

মহাস্মৃতি ২ অং ৪ শ্লোক।
“কালেহনাতা পিতা বচো বাচ্যাত্মপুত্রভো।”
অর্থ—“বিহিত কাশ মধ্যে যে পিতা কছাদান
না করে সে পাপীয়ান হয়। শুক্লাক্ষেত্র যে স্বামী
কিছুভোগ না করে, সে পাপী হইবে।”

ঐতি তথাপি, আবারের পক্ষে ইহা গর্ভাধান-
সংস্কারের প্রকৃত কলে বৃদ্ধি থাকে। অর্থাৎ লগ্নভূত
বিষয়। যথাবিহিত সংস্কার না হইলে ইহকাল
পর্যন্তই অপ্রতিষ্ঠ থাকিবে অতএব গুরুতর
কারণ পাপ যদিও কোন প্রায়শ্চিত্তে অপসাদ হইতে
পারে, কিন্তু যথাকালে গর্ভাধান না হইলে সংস্কার
পরের পক্ষে যে হানি হয়, তাহা যথেষ্ট কারণ আর
কোন উপায় নাই। তাই বলি, সংস্কারের হানিই
আমাদিগের অতি গুরুতর হানি।

প্রথম স্মৃতে গর্ভাধান অসুষ্ঠানের
বিধিগুলি কোন্ জাতীয় বিধি ?

এই গর্ভাধানের প্রথম শুক্লাকলীন অসুষ্ঠান
বিষয়ে ব্রহ্মগুণি বিধি পণ্ডিত হইয়াছে, তৎসমগুই
“নিমমবিধি” বলিয়া পরিপূর্ণিত হয়।

যথা, “নানাসাধন-সাম্যজিয়ারমে কসাবনজ
প্রাপকো বিদ্রিয়নমবিধিঃ।”

অর্থ—
“নিবৃত্তান্তপ্রাপ্তো নিয়মঃ পাকিকো সতি।
তত্র চাচর্য চ প্রাপ্তো পরিমার্জিতো সীতা ইতি।”
অর্থ—প্রমাণান্তবোধাপ্রাপ্ত প্রাপকো বিদ্রি-
পূর্ববিধি। যথা,—মজ্ঞত স্বর্গকামঃ ইত্যাদি।
স্বর্গকামপ্রাপ্তপ্রমাণান্তবোধাপ্রাপ্ত কসাবনজনাং।
পক্ষেপ্রাপ্ত প্রাপকো বিদ্রিয়নমবিধিঃ। যথা
ব্রাহ্মনবহতি ইত্যাদি। কথম পক্ষেপ্রাপ্ত-
প্রাপকবহতি চেদিদম—অনেন হি অব্যবস্ত-
সৈব্যার্থ্যন ন প্রতিপাদ্যতে, অব্যবস্ত্যকসিকস্বাং,
কিঞ্চ নিয়মঃ। স চাপ্রাপ্তাংশুপূর্ণম্। ইত্যুত
হি নানোপায়সাম্যাব্যবস্থাপ্রাপ্ত পতিভ্যো-
পায়সংগুণৈঃ হইত্বারভত, তদব্যবস্ত্য চাপ্রাপ্তেন
ভবিষ্যতান্যকপ্রাপ্তাংশুপূর্ণম্। নিয়মঃ এষ
ব্যাক্যঃ। পক্ষেপ্রাপ্তাব্যবস্থাবিশদমিতি যাবৎ।

উক্ত
বিধিঃ পরিমাণবিধিঃ। যথা—পক্ষ পক্ষবা ভক্ষ্যঃ
ইতি। ইং হি বাক্যঃ ন পক্ষব-ভক্ষণপক্ষ-
ভজ রায়তঃ প্রাপ্তভ্যং। নাপি নিয়মপক্ষ-
পক্ষবাণ্যকব-ভক্ষণ পূর্ণপক্ষেঃ পক্ষে-
প্রাপ্তভাবাং। অত ইং অপ্রপ্তব-ভক্ষণ-
নিয়মপক্ষিঃ ভবতি পরিমাণবিধিঃ।
স চ বিধিবা। শ্রৌতা লাক্ষণিকা চেতি।
তত্র চ যোব্যবস্ত্যতি শ্রৌতা পরিমাণায়া।
এবংপক্ষপক্ষবাণ্যকব-ভক্ষণপূর্ণপক্ষেঃ পক্ষে-
পক্ষ পক্ষবা ভক্ষ্য ইতি তু লাক্ষণিকা।
ইতরন্বিত্তিবিদ্যচকপপাভাবাং। অতএবৈব। তদো-
প্রাপ্তঃ। দোষমাত্রঃ ক্রতহানিক্রতকরণ প্রাপ্ত-
ব্যবহেতি। তদন্তঃ।
শ্রুতভ্যং পরিমাণমাত্রভ্যং কছনাং।
প্রাপ্তঃ বা ইত্যেব পরিমাণা ত্রিভূতং।
ক্রতঃ পক্ষব-ভক্ষণ ইত্যং। অশ্রুতভ্যঃ
অপক্ষব-ভক্ষণনিরুত্তেঃ কছনাং, প্রাপ্তঃ চাপক্ষব-
ভক্ষণভাবানিতি। অশ্রুতঃ দোষমাত্রঃ দোষমাত্রঃ
শব্দনিঃ প্রাপ্তপক্ষব-ভক্ষণ ইতি দিষ্টং। নোপা-
ভ্যবস্ত্যতঃ সীমাংসংগুণৈঃ।

নিয়মবিধিঃ পরিমাণবিধিঃ এবং অপ্রপ্ত-
বিধির লগ্নবিধি সমস্তই উক্তত কথিত। নিয়ম।
কিঃ ইহা একটি। অতঃ স্মৃতিবিধি, সীমাংসা-
নর্শনেন অসুষ্ঠত বিধি। ইহা—ভাষ্যান্তরে অসুষ্ঠত
করিলে অতি বৃহদাকার গ্রন্থের ভার হইয়া পড়ে।
অতএব ইহার মূল তাৎপর্যটা মজ্জিত বলিতেছি—
উক্ত বাক্যকলী হইতে বলিতব্য এই হইয়াছে
যে, উক্ত বিধিগুলি যদি “অপ্রপ্তবিধি” হয়, তবে
প্রথম শুক্লাক্ষেত্র-গর্ভাধান-সংস্কার করা যথোক্ত
পূর্ণাংগ হইবে এইরূপ অর্থবোধ বুঝায়।
“পরিমাণবিধি” হইলে গর্ভাধানে করিতে যদি
কাহারও ইচ্ছা হয় তবে প্রথম শুক্লাক্ষেত্র
কৃত্তে করিলে পাপ হয় এইরূপ বুঝায়। আর
“নিয়মবিধি” হইলে গর্ভাধান প্রথম শুক্লাক্ষেত্র
অপ্রপ্ত করিয়া; তাহা হইলেই গর্ভাধানের
উপযুক্ত ফলভাব করিতে পাইবে। যদি তাহা না
করে, তবে পাপ হইবে এইরূপ অর্থ বুঝায়।
এই ভিনের মধ্যে বর্তমান কথিত নিয়ম-
বিধির লগ্নবিধি উপস্থিত হইতে পারে। কারণ
বচনের দ্বারা শুক্লাক্ষেত্র জীবন না করিলে
মহাপাপের বিষয় কথিত হইয়াছে এবং বচনের

ঘায়াই উহার ধারা উৎকৃষ্ট ফলশাক্তের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এইটি নিয়মবিধি। অকণ্ট এবং প্রকৃত পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও হইতে মতভেদ হইবার আশংকা নাই।

আমাদের ন্যায়মান্য পণ্ডিতবীর যদুনন্দন 'ভট্টাচার্য্য'ও বলিয়াছেন,—“অকণ্ট প্রত্যক্ষ্যায়িরমঃ।” (সংস্কারতত্ত্ব গর্ভাণ্যায়প্রকরণ) “উপস্থিত শুক্লকালৈ স্ত্রীসংস্কার্য্য না করিলে পাপ হওয়ার উপদেশ আছে, অতএব প্রথম শুক্লকালে গর্ভাণ্যায়-সংস্কারের বিধিটি নিয়মবিধি জানিবে।” এইরূপ সকলই প্রীতিকর করিয়া থাকেন।

গর্ভাণ্যায় ক্রিয়ার বিরসে আমাদের যে যে বিষয় বলা আবশ্যক বোধ হইল, তৎসমস্ত সমুদায় বিবেচ্য উপাধিত করিলাম। কিন্তু গর্ভমন্ডে কিংবা অজ্ঞ কাহারো এ বিষয়ে, ইহা হইতে অনিচ্ছিত কিছু জিজ্ঞাসা আছে কি না, কিংবা নিষিদ্ধ বিষয়ের কোনটির প্রতি তাঁহাদের বিশেষ জিজ্ঞাস্যতা আছে তাহাও জানিতে পারি নাই। সুতরাং আর অধিক বিষয় লিখিলাম না, ভবিষ্যৎ বিস্তারও করিলাম না। গর্ভমন্ডে এই গর্ভাণ্যায় বিরসের কোনো বিষয়টি বিশেষরূপে জানিতে চাহেন, তাহা জানিতে পারিলে সেইটিই বিশেষ-বিস্তার করিয়া দেওয়াইতে পাবিগতি। কিন্তু হুঃখঃ! বিষয় তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

বাহা হউক এখন কবিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণের মুকটস্থিত একটি মুখ্য প্রমাণের বিষয়নিবেশন করিয়া রাখি।

পূর্বে বৃত্ত বৎ প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ভাস্কর্য্য অপেক্ষাও শুভ্রতর প্রমাণ,—হিন্দুর কুল-পারম্পরাগত ধারণা, বিশ্বাস এবং ব্যবহার বা আচার। কারণ বিশ্বাস এবং প্রতীকী ধর্ম্মের প্রতি, তাহা হইতেই ধর্ম্ম পণ্ডিতগণের হৃদয়। যুক্তি তর্ক বা অসুভাব্য-উপদেশে কখনই ধর্ম্মের “অনুগমন নহে। বাহ্যার যে শাস্ত্রকে বেদান্তে যে অর্থে প্রজ্ঞা বিশ্বাস করে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। হিন্দুমান, মুসলমান, এবং বৌদ্ধদিগের মধ্যেও এইরূপ নিয়মই প্রচলিত আছে। আমাদের শাস্ত্রেও এইরূপ উপদেশ আছে।

“বেদঃ স্মৃতিঃ সন্যাসাচারঃ স্বয়ং চ প্রিয়মানসঃ।
অর্থঃ ধর্ম্মধর্ম্মঃ প্রার্থঃ সাক্ষাৎস্বত্ব কার্য্যম্।
বস্তুনি দশে ব আচারঃ পারম্পর্য্যজ্ঞানাপত্তঃ।
স্বর্ণানামপ্রমাণাঞ্চ স সন্যাসচার উচ্যতে ॥

(মহু ২ অঃ ১২। ১৮ পৃঃ)

অর্থ,—“বেদ, স্মৃতি, সন্যাসচার এবং প্রজ্ঞা এই চারিটিই ধর্ম্মের সাক্ষ্য প্রমাণ। যেদেশে যেজাতি এবং যে আচারের স্বপনসম্পন্নায় যে আচার প্রচলিত হইয়া আসিবে, তাহাকেই সন্যাসচার বন্দে।”

আবার অন্তর উক্ত হইয়াছে,—
“দেহাচার্য্যানু সমন্যান জাতিধর্ম্মান্
যঃ প্রজ্ঞান বর্জ্জ্যেযোতিবাধী ॥” মহাভারতঃ।

অর্থ,—“যিনি যুজ্জমান, তিনি স্বধর্ম্ম-প্রকৃত যুক্তি তর্কের দ্বারা আপনার শোভাচার, স্থলাচার এবং কামাচারও জাত্যাচারাদি কখনই পরি-
ত্যাগ করিবেন না।

অতএব যে যে শাস্ত্রকে যে দেশের হিন্দুগণ ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া প্রজ্ঞা বিশ্বাস করে, তাহাই তাহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং সেই সকল শাস্ত্রের ব্রহ্মণ অর্থে তাহার প্রকৃত অর্থ বলিয়া প্রজ্ঞা বিশ্বাস করে, তাহাই তাহাদের পক্ষে সেই শাস্ত্রের ধর্ম্ম। যে যে অর্থকর্ত্তা বা ব্যবস্থাকর্ত্তাকে তাহার প্রকৃত কর্ত্তা এবং প্রকৃত ব্যবস্থাপক বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাই তাহাদের প্রকৃত-অর্থ-ব্যবস্থা এবং প্রকৃত-অর্থ-ব্যবস্থাপক। আর যেকালে যেভাবে যে কার্য্য বিশ্বাস সহকারে চিরদিন করিয়া আসিতেছে, সেই সময়ে সেইরূপে সেইরূপ কার্য্য করাই তাহার ধর্ম্ম।

কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস অন্ধার বাহিরের কোন শাস্ত্র আসিয়া কোন নূতন উপদেশ দিলেও তাহা তাহাদের ধর্ম্ম নহে, বিশ্বাসের বিরুদ্ধ নূতন অর্থও অর্থ নহে, বিশ্বাসের বিরুদ্ধ নূতন অর্থকর্ত্তা বা ব্যবস্থাপকও তাহাদের পক্ষে কেহই নহেন এবং তাহা স্থলাচারের বিরুদ্ধ কোন আচার হইলেও তাহাদের পক্ষে অর্থকর্ত্তা হইবে।

অতএব এই গর্ভাণ্যায় সম্বন্ধে আমরা দ্বাধা-দ্বিধার যে সকল প্রস্তাবে বচন প্রমাণ যে যে অর্থে প্রকাশ করিয়াছি, মোটের উপরে সমস্ত হিন্দুই তাহাদিগের সেই সকল প্রকৃত সেই সেই অর্থের ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ব্রহ্মণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদনুরূপ আচরণ করেন। হিন্দুগণ গর্ভাণ্যায় ক্রিয়ার অর্থব্যবস্থাক্রমা মনে করেন, তাহার অস্ত্রযাচ্য শুভ্রতর জাতিধর্ম্মকর্ত্তা করেন, প্রথম কর্ত্তাই তাহা করিয়া থাকেন, প্রথমশুক্লভূমিতে না হওয়াও দেখা মনে করেন।

অতএব, যদিও আমরা ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বচন প্রমাণ বা কোন অর্থ প্রবর্ত্তা নাই

সত্য, তথাপি যদি অন্য কোন প্রকারে ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কিংবা এই সকল প্রমাণ

সেইই অভিব্যক্তি কোন ব্যাখ্যাকর্ত্তা উপাধিত হইলে, তবে তাহার কোন ব্যক্তিবিশেষ বা রাজপুরুষগণের বিশ্বস্ত হইলেও সমস্ত হিন্দু, তাহাকে কিংবা সেই শাস্ত্রকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন। হিন্দুর হাথে বিবাস প্রজ্ঞা আছে, হিন্দু কুল-পারম্পরা বাহা করিয়া থাকে; তাহাই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রমাণ।

কিন্তু দ্বাদশ বৎসরের আইন করিলে, হিন্দুর সেই চিরাচরিত পুজনীয় ধর্ম্মের প্রতি গুরুতর আঘাত করা হইবে, হিন্দুর মস্তকে ব্রাহ্মাঘাত করা হইবে, হিন্দুর জন্মে পুণ্য বিদ্ধ হইবে।

প্রকৃত হিন্দুগণ, আজও পিত্র, কন্য, বশ, নাম, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য অপেক্ষায় ধর্ম্মকেই অধিকতর ভাল বাসিয়া থাকেন। আজও কত শত শত হিন্দু, প্রাণত্যাগ তনয় তনয়া ত্রাণ্য মুদগামনি হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইলে, তাহাদিগকে এজন্মের মত পরি-
ত্যাগ করিয়া আপনার ধর্ম্ম লইয়া অবস্থিতি করেন; পাশও অনেক হিন্দু লক্ষ লক্ষ টাকার বিভব ঐশ্বর্য্য তৃণজ্ঞানে বিসর্জন করিয়া ধর্ম্মের নিমিত্ত উপাধীন হইয়া থাকেন; হত্যাং সেই প্রাণত্যাগ বহু ধর্ম্মের সম্বন্ধে আঘাত করিলে হিন্দু পুত্রশোকাপেক্ষায়ও, স্ত্রীশোকাপেক্ষায়ও অধিকতর পরিতপ্ত হইবে, রাজ্য-ঐশ্বর্য্যাদি ধর্ম্মমান্য অর্থোপাধিও প্রশীড়িত হইবে। অতএব আমরা করণুটে সনিয়েন তাহারা হইয়া প্রাণনা করিতেছি,—মহামান্য গর্ভমন্ডে আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করুন।

একাদশ বৎসরের পর দ্বাদশ বৎসরে শুভ হওয়া, ভাতব্যাস্তা শ্রীমন্তবিশ্বামিত্রের মতেও প্রত্যাহার বদান। আমাদের সূত্রমণ্ডি বলিয়াছেন যে,—“তদবধি দ্বাদশাঃ কালৈঃ পরানামকং পুনঃ।
জর্য্যপক্ষ্মণ্যার্য্যাব্য যাব্য পক্ষ্মণ্যতঃ ক্ষয়ম্ ॥”

হুগুণ্ড তঃ, আদ্যোপরি।
অর্থ—“একাদশ বৎসরের পর দ্বাদশ বৎসরের পক্ষ্মণ্য বৎসর হইতে উহার ক্ষয় হইয়া থাকে।”
অতএব জর্য্যপক্ষ্মণ্যের অস্মিত হইয়া ১২ বৎসরের বৎসরে কাহারও ক্ষয়দায় হইলে তাহার সমুচিত কার্য্য করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া কত দূর সম্ভব, তাহা গর্ভমন্ডেই বিবেচনা করিতে পারের।

শ্রীশশধর শর্মা (তর্কচূড়ামণি)।

ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ।

ব্যবস্থাপক সভায় যে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা বড়ই ভয়ানক। আইনের অত্যাঙ্গ পাইয়াই শোক-সমুদ্রের অক্ষ-খলি পড়ে-বিদ্যোভিত কর্ম্মপটের তার, বোর-রঙি আবেশিত হইতেছে। লোক-সকল যেন দিশাহারা, জ্ঞান-হার—সদা ইতস্ততঃ ধারিত। আমেরে ক্রিককর্ত্তব্যবস্থা হইয়া কোক শিরে “করাবাত” করিতেছেন। দলে দলে লোক, ধর্ম্মবান-কার্য্যালয়ে আসিয়া, সংকুচিত কি,—ইহাই কেবল জিজ্ঞাসিতেছেন। কত ব্যক্তি রাজ্য শিশুবেশ-বেশের নিকট আশ্রয় লইতেছেন,—কেহ বা ভক্তার রাজ্যে রাজেন্দ্র লাল মিত্রকে পিয়া ধরিতেছেন; কেহ বা শোভাবাজার রাজস্বজনে উপনীত হইয়া রাজস্ব-সমীপে কাড়কড়ে আনন মর্থাৎবা জানাইতেছেন। ওরফে, শ্রীমহোদয় ন্যায়রত্ন, শ্রীভুবনমোহন বিহার্য্যর, শ্রীচৈত্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীরাধালাল ন্যায়রত্ন, শ্রীদীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মানুগের আশংকা বৃদ্ধাইয়া, ব্যবস্থাপ্রস্তাবে গ্রহি-
করিতেছেন। “জন্যাদিকে পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্ক-চূড়ামণি, পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণনাথ বেনোধ্যাপক, পণ্ডিত শ্রীসত্যরত্ন নামশ্রী, পণ্ডিত শ্রীকৃতরত্ন সামাধ্যায়ী প্রভৃতি জ্ঞানগিরি সর্ব্বসর্গাশ্রয় হুগুণ্ড, দেবিয়া, শাস্ত্র-সমার মন্বন্তরকর্ম্মগণের জন্ম, প্রতিপন্ন করি-
তেছেন। গৃহে শিরোভাঙ্গে অধি লাগিয়া দাঁড়িও অলিঙতে,—গৃহস্থ কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? প্রবৃত্ত চক্রে দেশ ধর ধর কাপিতেছে, মাহুখ কি আর শির হইয়া নিস্তা হইতে পারে? মর্থাৎবি পণ্ডিত নোকা, মাহাকর্ক-কায় ভূর ভূর, আত্মাধীন কি আর নীরবে বহুদেবে বসিয়া থাকিতে পারে?

বাস্তবিকই বড়ই ভয়ানক ব্যাপার। ভাবিয়া দেখুন, কিঞ্চিৎ মোহমগ্ন কাত্য স্যারগণও এদেশে একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরে হিন্দুস্তা রাজস্বকা হইয়া থাকে। কতদূর জখলা হইলে, গর্ভাণ্যায়-সংস্কার একটা আবশ্যক—গর্ভাণ্যায় বাতায় ধর্ম্মানুগ হইত। অজ্ঞ গর্ভমন্ডে আইন করিতে হইতে-
ছেন যে, একাদশ বৎসর এগার মাস ত্রিশদিন স্ত্রীর বয়স উত্তীর্ণ না হইলে, সে স্ত্রী সতিত তাহার স্বামী সহবাস করিতে সম্মত হইবেন না। স্ত্রীর রজোদশনিই হউক,—ততাত ঐ কালমধ্যে স্বামী

ন তে ভাং নরকায় দংষ্ট্রিত্য শক্কেতাংস্ত্রিণা।
ত্রক্ষণিক্যং তবিত্য মংগ্রাপাদমরাধি।
রাজন বিবিনিসিতা চ ন তে পীড়া ভবিষ্যতি।
সংগ্রামে চ রাক্ষসে শবজ্ঞানমাপ্যমি।

নবমর্শ ৬৬ অধ্যায়।

হে নরাধিপ নরেন্দ্র! আমার প্রমাণ, দংষ্ট্রী শবক
ও বেদবিৎ ব্যক্তিগণ হইতে আপনার ভয় থাকিবে
না; মর্শ্য বিদ-জ্ঞান আপনার কষ্টও হইবে না।
এবং আপনি সংগ্রামে নিরস্তর জয় লাভ করিবেন।

পরে দময়ন্তীর কৌশলে শুভপর্যায়কে এক
দিনের মধ্যে বিদর্ভনগরে বাইতে হয়, পথিমধ্যে
শুভপূর্ণ, নলকে অক্ষ-বিদ্যা প্রদান করেন।

তত্ত্বক্ষণপক্ষান্তে শরীরাক্রান্তঃ কলিঃ।
কর্কটিকবিৎ, তীক্ষ্ণ মুখাং সত্যতমুদন।

নিঘবনাঃ নন্দ কৃষ্ণকিনা জাত হইলে, কলি
কর্কটিকের তীক্ষ্ণ বিষ সত্য বসন করিতে করিতে
তাহার কন্যাবন হইতে নিঃসৃত হইল।

কুলেশ্বর্য তদারক্ত শূপাধিঃ স বিনিঃসৃতঃ।

ন তেন কুর্খিতা রাজা দীর্ঘকালমনাশ্রবান।

ততো বিবিধকুশাঃ স্বঃ রূপমকরাং কলিঃ।

তৎ শব্দে মৈচ্ছং কুপিতো নিঘাধিপিতম শঃ।

অস্রোত কলিতাতো বোমানাঃ কৃতজ্ঞাঃ।

কোণং সংযজ সুপতে কীর্তিঃ দাশামি তে পরাম্।

সে দময়ন্তীর শাপনিলে পীড়িত হইয়া নলশরীরে

বাস করিতেছিল, এইক্ষণে নলশরীর হইতে নিঃসৃত

হইলে, তাহার সেই শাপাধিও নির্গত হইয়া গেল;

এক্ষণে সে বিবিধকুশ হইয়া নিজরূপ ধারণ

করিল। নিঘাধিপতি নল, দীর্ঘকাল কলিকর্তৃক

কুর্খিত হইয়া অস্তর ছিলেন, তন্নিমিত্ত তিনি কুপিত

হইয়া সেই কলিকে শাপ প্রদান করিতে ইচ্ছুক

হইলেন। তখন কলি ভয়ে কল্পিত-কন্যাবন হইয়া

কৃতজ্ঞাধিপুটে ক্রোধকে কহিল, হে নৃপতে! আপনি

কোণ সংযব করুন, আমি আশ্বিনকে পরম

কীর্তিভাজন করিব।

ইন্দ্রসেনত্র জননী কুপিতা মাশপং পুরা।

যা পুরা পরিভাষ্যং ততোহহং ভূপীড়িতঃ।

অবশং ক্রুদি রাক্ষসে যদুযবমপর্যাসিতঃ।

বিলেপ নাপরাজয় দময়ানো পিঙ্গনিশম্।

শরৎ ষ্ট্রং প্রাপ্তব্রাহ্মি শৃণু, দেবং বতো মম।

যে চ ষ্ট্রং মহাজ্ঞাণোকে কীর্তিনিস্তাত্মনিষ্ঠাঃ।

মংগ্রস্বতঃ ভয়ং তেষাং ন কদাচিৎকিণ্বাতি।

জ্বাৰী শরৎ যাতঃ যদি মাং তং ন শপ্যামে।

“হে রাক্ষস! পূর্বে আপনি দময়ন্তীকে
পরিভাষ্য করিলে, তিনি কুপিত হইয়া আমাকে
অভিশাপ দিয়াছেন, হে অপরাধিত! আমি
তাহাতে ও নাপরাজয়ের বিষজ্ঞান দ্বারা দগ্ধ
ও অতিপীড়িত হইয়া নিদারুণ দুঃখভোগপূর্বক
আপনার শরীরে বাস করিয়াছিলাম। আমি
আপনার শরবাণের হইলাম, আপনি আমার এই
কথাটা শ্রবণ করুন, আমি ভয়ান্ত হইয়া শরবাণত
হইয়াছি, অতএব যদি আপনি আমাকে শাপ
প্রদান না করেন, তবে যে সকল মনুষ্য নিরাস
হইয়া আপনাকে কীর্তন করিবে, তাহাণিপের
আমা হইতে কখন ভয় থাকিবে না।

এবংকো নগো রাজা দ্ব্যক্ষসং কোপমান্বন।

ততো ভীতঃ কলিঃ প্রবিশে বিভীতকম্।

কলিঃশব্দেপদাটুঃ কথ্যদ্রোণমধেন বৈ।

ততো গজভয়ো রাজা নৈমধ্যঃ পরবীরহা।

১২ অধ্যায়।

কলি নলরাজকে এইরূপ কহিলে, তিনি আপনার

ক্রোধ সংযবণ করিলেন। অনন্তর শাপ-ভয়ে

পীড়িত কলি অবিলম্বে এক বিভীতক রূপে প্রসিদ্ধি

হইল। পরন্তু কলি যখন নিঘাধিপতির সহিত

কথাবাকখন করিল, তখন অল্প কয়ে তাহাকে

দেখিতে পাইল না। হে রাজন! কলি, বীর শজ্ঞ-

হস্তা তেজস্বী নলরাজের শরীর হইতে নিজস্ব

হইয়া পলায়ন করিলে, নিঘরাজ বিপত-জর ও

পূর্ববৎ পরম তেজোব্রুত হইলেন।

এই কলি যে কালের অধিষ্ঠাতা, তাহাই ‘কলি-
কাল বা কলিযুগ’ বলিয়া কথিত। বর্তমান সময়

এই কলিযুগেরই অন্তর্গত। এই কলিকালের পরি-

মাণ, মন্মতা ও মন্মতাংশ সম্মতে ৪৩২০০০ চারি লক্ষ

বর্জন হাজার বৎসর। তন্মধ্যে ৪৯১ বৎসর অতীত

হইয়াছে। মানবী পৃথিবী এই কলিযুগের আরম্ভ।

এখনও চারলক্ষ সাতাশ হাজার বৎসর অপ্রতীত

এবং ক্রম-ব্রুত প্রভাবে এই কলির রাজ্য আপনার

গৌরব প্রকাশ করিতে থাকিবে।

কলিকালের আরম্ভ ৪৯১ বৎসর হইয়াছে বটে,

কিন্তু যতদিন ভাবনা বাহুদের ভ্রম-গুণে লীলা প্রকাশ

করিতেছিলেন, ততদিন কলির অধিকার হয় নাই।

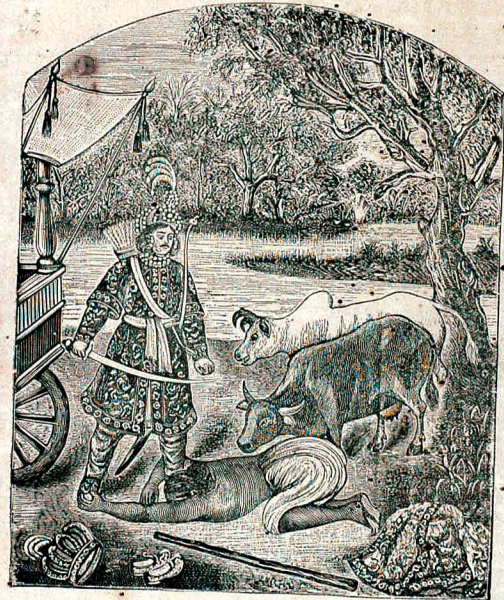
“বাংস স পাদপদ্মাত্মাং পুশ্রাণ্ডে রম্যপতিঃ।

ভাবং কলির্ভৈ পৃথিবীং পরাজাজ্ঞাং ন চাক্ষরং।

ভাপনত।

রমানাধ, চরণ-পঙ্কজ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করত

কলি-নিগ্রহ।



কলি-প্রবন্ধে (১১৭ পৃষ্ঠা)

যতদিন অবস্থিত ছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীতে
অজ্ঞান প্রকাশ করিতে পারে নাই।

প্রহার পর পরীক্ষিতের সময়ও কলি নিগৃহীত
হইয়া অধিকারচ্যুত হয়।

তত্র পোমিখ্যং রাজা ইচ্ছমানমনাথবৎ।

দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষলং দদুশে নৃপলাঞ্ছনম্॥

রাজা পরীক্ষিত, সেই সরসভাভীরে দেখিতে
পাইলেন, রাজচিহ্নধারী একজন শূদ্র—দণ্ডহস্তে
একটা বৃষ ও একটা গাভীকে প্রহার করিতেছে।

প্রহার নিবারণ করে এমন ব্যক্তি তথায় কেহ নাই।
দেখিয়া রাজা শরাসনে বাণ যোজনাপূর্বক
জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কে হে? আমার রাজ্যে
দুর্বল পীড়ন কর। বেশ ত তোমার রাজার আয়
দেখিতেছি; কিন্তু কার্যে যে তুমি শূন্যধর্ম।
নিরপরাধ প্রাণিকে তুমি নির্জনে পাইয়া প্রহার
করিতেছ; বধই তোমার উপযুক্ত দণ্ড।

তং বা নৃপলাঞ্ছনঃ পটেন্দ্রনিপলা চরন।

বৃষরূপে কিং কশিচ্ছবো নাঃ পরিধেয়নম্॥

অহে বৃষ! মৃগালের আয় শুক্রবৎ তোমার দেহ;

তিন পাদ তোমার ভর, একপাদ মাত্রের উপর
নির্ভর করিয়া তুমি আছ; তুমি বাস্তবিকই কি বৃষ?
না—কোন দেবতা বৃষরূপে আমাকে ছলনা
করিতেছ? হে চতুষ্পদ! তোমার তিনপাদ ভর
করিল কে? এইরূপ কথোপকথন দ্বারা পরিশেষে
রাজা নিজেই বুঝিলেন, ধর্ম—বৃষ, পৃথিবী—গাভী
আর কলিই—রাজচিহ্নধারী শূদ্র। তখন রাজা
বলিতে লাগিলেন,

তপাঃ শৌচং দয়া মতামিতি পাদাঃ কৃত্য কৃত্যঃ।

অধর্ম্মাংশৈঃ পদয়োঃ ভগ্নাঃ ক্ষয়ঃ সঙ্গ-মদেস্তব॥

যে ধর্ম! সত্যযুগে আপনার তপস্বী, শৌচ,
দয়া এবং মতা এই চার পদ ছিল, গর্বি, সঙ্গদেয় ও
মদতা প্রভাবে তিন পদ ত্যজ হইয়াছে। অবশিষ্ট
মতা নামে একপদ। কলি, মিথ্যা প্রভাবে তাহাও
ভাঙ করিতে চেষ্টা করিতেছে। রাজা ইত্যাদি বলিয়া,
নিশাতমাদদে ধৃত্যং কলয়েৎ ধর্ম্মং যতেবে।

তং জিহ্বাং হুমভিত্রোক্তা শিহায় নৃপলাঞ্ছনম্।

তংপাদমূলং শিরসা সমাপাভ্যবিস্কল্যঃ॥

ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১৭ম অধ্যায়।

রাজা পরীক্ষিত “অধর্ম্মমূল কলিকে লক্ষ্য করিয়া
পাণিত অঙ্গি গ্রহণ করিলেন। তখন কলি, রাজাকে
বধোদ্যত দেখিয়া ভীতি-বিজ্ঞানচিত্তে রাজচিহ্ন
পরিচাপপূর্বক তাহার পাদমূলে নিপতিত হন।

তখন শরধাপতবৎসল রাজা, তাহাকে অস্ত্র
দিয়া তৎপরে কলির প্রাণনাশের নিমিত্ত, মদ,
কাম, হিংসা এবং বৈর; এই পঞ্চমানে তাহার
বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন।

এইরূপে কলি, পরীক্ষিত “প্রভাবে তদীয়
অধিকার কাণেও আপনি অধিকার স্থাপন করিতে
পারেন নাই। তৎপূর হইতেই তাহার বিক্রম
আরম্ভ হইয়াছে।

এখন বাই কোথা? করি কি? কত জন্ম
যাতনাভোগের পর দুর্লভ মহাবল্লভ গ্রহণ করা
পিয়াছে, তাহা সক্ষম করিব কিরূপে? ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত
অন্তমিত হইতেছে। কর্ম্ম, প্রবৃত্তি, দেহ, ইন্দ্রিয়,
মন এবং উপকরণ; সকলই “পাপের নিক
প্রদাবিত। এখন করি কি? করিলার কি কিছু
নাই? কেবল কি পাপই করিতে হইবে? ঐ
দেখ, সংযুগে ভয়াবহ নরক; ঐ দেখ, কলির পৌত্র
নরক, পিতামহের রাজ্যে সগোরের সাতভামনে
বিচরণ করিতেছে। নিষ্ঠুরিত কি কোন উপায়
নাই?—হা! আচ্ছ; অবশ্য জাচ্ছে—এই পাপ-প্রধান
যুগে নিষ্ঠুরতাভের জন্ম যে যে ধর্ম্ম কার্য করিতে
হয় এবং বাহ্য কলির দোষনাশের সম্পূর্ণ উপযোগী,
তৎসমুদয়ে পরম হিতকর সর্ববিশেষ শাস্ত্রের উপদেশ
এইঃ—

কলৌ কলিমালমেসং সর্গপাপহরং পূরম্।
যেহুতয়ন্তি হরিং নিত্যং তেইপি বন্ধ্যা যথা হরিঃ।

স্মৃতি।
“যাহারা কলিকালে কলিমাল-বিনাশক সর্গপাপহারী
হরিকে পূজা করে, তাহারাও হরির চায় বন্দীয়া।

তীর্থস্নান-পবনবো বাবো বিপ্রান্তথা ভূবি।
মহাকালোহতি বিজ্ঞানান্তনবো মন পঞ্চাধা॥

তোমাং পুণ্যায়নাং ভীতো ভূষং কলিরবাঙ্ককঃ।
মদীভবং হমিতাবো নিশাঙ্কনে প্রদ্রুতং॥

“পূজিতাঃ প্রভাতাঃ পুষ্টাঃ গতাঃ দূতীঃ স্মৃতাঃ অপি।
নৃণাং সর্গাঘস্তারঃ সত্যং তে হি মমগাঃ।

নারদীয় পুরাণ।
তীর্থস্নান, অশ্বখ বৃক্ষ, গাভী, অধর্ম্মনিরত
ভ্রাঞ্জন এবং আমার ভক্ত—এই পাঁচ প্রকার

অম্মদ (শত্রুর) দেহ। পাপায়া কলি, ইহাদিগকে
নিকট অত্যন্ত ভীত বলিয়া নিশাঙ্কন বাড়িতে পারে
না। নিজের স্বামী একই খাট করিয়া রাখে।
ইহাদিগকে পূজা, শ্রবান, স্তব, দর্শন, স্পর্শ এবং স্মরণ
করিলে সকল পাপ নষ্ট হয়।

সেহানিশং জগজ্জুত্বানুবেনত কীর্তনম্।
কুর্বেতি তান্ নরকায় ন কলিধিকরো নরান্।
চক্রাধ্বত নামানি সবা সর্গরূপ কীর্তনং।
নাশোচ্য কীর্তনে তস্ম স পবিত্রকরা মতঃ।

বিষ্ণুপূজকঃ।

হে নরশ্রেষ্ঠ! বাহ্যার্য দিবারাত্র জগৎপতি বাহু-
দেবের নাম কীর্তন করে, কলি ভূতাদিপিকে অধীন
করিতে পারে না। সবা সর্গরূপ যকল হানে হরিনাম
কীর্তন করিতে পারিলে, সেই পরমপারম দেবের
নাম কীর্তনে অসৌচশ্য নাহি।

পবানমুতকোচীনং কন্যানামমুতাত্তমৈঃ।

তীর্থকোটিসমপ্রাণাঃ কুল্যং গোবিন্দকীর্তনম্॥
স্বপনপূর্ণা।

এক হরিনামকীর্তন, অমৃত কোটি গোদান, অমৃত
অমৃত কল্যান এবং সহস্র কোটি তীর্থ গমনের তুল্য।
ধ্যান রূপে যখন যৈষ্ণবস্তোত্রায় ধ্যানেচ্ছর্যম্।
যদাপোতি তদাপোতি কলৌ সাংকীর্ষ্য কেশবম্।
বিষ্ণুপূর্ণা।

সত্যযুগে বিশ্বধামে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞধরের যাগ
যজ্ঞে এবং দ্বাপরে হরি পূজায় যে কল পাওয়া যায়,
কলিকালে এক হরিনামসংকীর্তনই তীলা ত্যক্ত হয়।
শিব! শঙ্কর! রূপেশ! নীলকন্ঠ! জ্ঞাতোহন।
ইত্যাদি যে নিত্য ন হি তান্ ধ্যেতে কলিঃ॥

শিবপূজাপরা ফেই শিবনামপরায়ণাঃ।
ত এন শিবকুল্যাস্ত বোরে কলিযুগে দিগ্ভাঃ॥

বৃহদারণ্য পুরাণ।

বাহ্যার্য প্রত্যহ শিব, শঙ্কর, রূপ, ঈশ, নীলকন্ঠ,
জিতেন্দ্র। ইত্যাদি শিবনাম-সংকীর্তন করে, কলি
ভাঙ্গাধিককে কষ্ট দিতে পারে না। এই যের কলি-
যুগে যে সকল বিজ্ঞ, শিবপূজায় রত ও শিবনাম-
কীর্তনে তৎপর, তাহারাই শিবকুল্য।

যজ্ঞস্তমসঃ শিব্যেতি মুচ্যতে স কলৌ নরঃ।
শার্টোনাপি নমস্কারঃ প্রকৃত্য শূলপাশে।
সংসাররোগমদ্যখানীচ্ছমূলকরঃ কলৌ।

মহাভারত।

কলিযুগে যে মনুষ্য 'ও' নাম শিবার' বলিয়া
প্রণাম করে, তাহার নিজেরই হয়, শরীতপূর্ণক শিবকে
নমস্কার করিলেও কলিকালে তৎকালেই সংসাররোগ-
পাপ-ভাঙ্গাধিক হয়।

রূপে সর্গরূপ তীর্থানি ত্রেতাযুগে বক্রং পম্।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গর্গৈব কেশবম্॥
ভবিষ্যপুরাণ, কালীখণ্ড।

সত্যযুগে সর্গরূপে তীর্থ, ত্রেতাযুগে পুষ্কর তীর্থ,
দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র তীর্থ, কলিকালে কেবল গর্গা তীর্থ।
যান্নং রূপে মোক্ষোভুত্বস্তোত্রায় তচ্চ বৈ তপঃ।
দ্বাপরে তদ্বদ্য যজ্ঞঃ কলৌ গর্গৈব কেশবম্।

তৎকালেই সত্যযুগে তত্ত্বজ্ঞান, উপায়, ত্রেতাযুগে
তত্ত্বজ্ঞান ও তপস্যা, দ্বাপরযুগে তত্ত্বজ্ঞান, তপস্যা ও
যজ্ঞ—মুক্তির কার্য, আর কলিকালে কেবল গর্গাই
মুক্তিাদানী।

কলৌ কল্মষচিত্রান্যং পাপভবরাত্যত্মনাম্।
বিবিরহীনক্রিয়াধাঞ্চ গতিপ্রাপ্তং বিদ্যাম্।

ভবিষ্যপুরাণ।

কলিযুগে কল্মষভয়রূপ, পাপভবরাত, বিবিধজীত
কর্মে তৎপর, মনুষ্যগণের গঙ্গা ব্যতীত গতি নাই।
কলৌ বিধেধরো দেবঃ কলৌ ব্যাঘ্রাণী পূরী।
কলৌ ভাগীরথী গঙ্গা কলৌ দান্ধি দান্ধি নিমিষায়।

স্বপনপূর্ণা—কালীখণ্ড।

বিশেষণই কলিকালে আরাধ্য দেব, বরাদানী
পূরীই কলিকালে আরাধ্য, ভাগীরথী গঙ্গাই কলিকালে
তীর্থ, আর দান-ধর্মই কলিকালে উৎকৃষ্ট ধর্ম।
তপঃ পর তপস্কে ত্রেতাযুগে জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাধর্মানমেকং কলৌ যুগে।

পরশর।

সত্যযুগে ধর্ম—তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে
যজ্ঞ এবং কলিকালে দানই একমাত্র ধর্ম।

কলৌ দানং দদ্য দদ্যঃ।

মহাভারত ও বৃহৎপতিসংহিতা।

দান, দদ্য এবং বাহ্যেস্ত্রি-নিগ্রহই কলিধর্ম।
সেবাস্তম্যমুর্ত্যাপি নবর্যাপি কলৌ যুগে।
কর্তব্যানি মহীপাশেঃ স্পর্শকোমভীপুস্তিঃ।
অবিপূর্ণা।

কলিযুগে স্পর্শকোমভী রাজপণ, সেব্যায়, বিগ্রহ-
প্রতিষ্ঠা, নগরপ্রতিষ্ঠা কার্য করিলে। কলিকালে
কর্তব্য এই সকল ধর্ম কর্তব্য ও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ
হইয়াছে। কিন্তু কলিকাল-সমুত মনুষ্যগণ, এই
বর্জন্য কালের হিন্দুগণ কোন কর্ম অমুষ্ঠান করেন?।
আজ হরিনামকীর্তন নাই বলিলেই হয়, শিবপূজা ও
উষ্ণীষধিগায়ে। কলের জল বা ভাণ পুষ্করিণীর
জল পাইলে, কলিকালের একমাত্র গতি ও তীর্থ—
পতিভাঙ্গারী পাপনাশিনী গঙ্গার পাশে গঙ্গা-
দ্বান এখন কটা লোকে করে?। দানকর্ত্ত ও আর
নাই। ইত্যাদি শিখার গুণে সংগোলে দানের কথা

প্রায় উষ্ণীষ্য গিয়াছে। দান আছে কেবল, বৃথা
চানায় আর ইন্দ্রজ-ভোজে।

সম্ভ্রাক্ষণাদির স্বতি প্রধানায় কয় জনে করে?।
এবং সকল ধর্মই ত বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম-
অজ্ঞানে প্রায় সকলেই বিমূঢ়, এদিকে বাহা
দ্রব্যদ্বৈত, অভ্যন্ত কঠিন, সেই ধর্ম—যোগ তপস্যা
প্রভৃতি করিতে কিছু কেহ কেহ বাগ্ন। কল উভয়
পক্ষেই দান্য, দেন না;—

ন সিধ্যতি কলৌ যোগো ন সিধ্যতি কলৌ তপঃ।
জ্ঞান্যজিত্তনোঃসর্গেঃ সত্যঃ সিধ্যোৎ কলৌ পরম্॥
কালীখণ্ড।

কলিকালে, যোগ বা তপস্যা সিদ্ধ হয় না, জ্ঞান-
প্রাপ্তিও দনপ্রানাই কলিকালে সিদ্ধি লাভের উপায়।
কলিযুগে বাহ্যে কলমস্ত্যং কলিযুগে।
এনাংসি তাত্শং বাস্তবং যে ন কাশীং সমাপ্রিতাঃ।

কালীখণ্ড।

এই যের কলিকালে বাহ্যায় কালীদাস না করে,
কালীদাস ভাঙ্গাধিকেরই হয়, কাল ভাঙ্গাধিককেই
নিদান করিতে অভিনাশী, আর পাপপুঞ্জ ভাঙ্গাধি-
কেই আক্রমণ করে। এই কালীদাসেই বা ধর্মের
কলি কলি নিবারনের জন্ম কাহার অভিনাশ হয়?
ভাই! কলিকাল বিনাশ হাশ ছাড়িও না, ভা নাহি;
সে কাল, সে সর্গবর্ধ-বহির্ভূত কাল আগিতে এখনও
অনেক বাকি। "সবের কলির সাক্ষ্য" চারলক্ষ
বর্ষের হাজার বৎসরের পাঁচচাষার বৎসর কাটে
নাই। বিশেষ, কলির আরও তখন সোয় থাকুক
না, ধর্মবর্ধক করিবার হ্রদ্বাণ, পাপ পরিহারের
হ্রদ্বাণ এমনটা আর কখন হয় না।

ধর্মোৎকর্ষমভাব্যতাপ্রাপ্তো প্রকৃত্যঃ কলৌ।
স্বসারসেন ধর্মজ্ঞাস্তেন তুষ্টিংস্মাৎসং কলৌ॥
ধর্ম্য কলৌ ভজ্ঞেদ্রিগ্ধা যজ্ঞোৎকর্ষমহাশলম্।
অত্যন্তদুষ্টিত্ব কলয়সেনেকা মহান গুণঃ॥

অবিপূর্ণা ও বিষ্ণুপুরাণ।

কলিকালে লোকে অজ্ঞানসেই অনেক ধর্ম
সমগ্র করিতে পারে, এইজন্য আমি কলির প্রতি
সমুদ্র। সত্যদ্বৈত কলির এই এক মহাশয় যে,
ইহাতে প্রাক্কল্যের অরুণেই মহাবর্ধক প্রাপ্ত হয়।
বৎ রূপে শব্দবিশেষেত্রাতার্য হারোনে গ।
দ্বাপরে তত্ত্ব মাসেন আহোরাত্নে তৎ কলৌ।
তপস্যা ব্রহ্মচর্য জপাস্তে কলৌ দিগ্ভাঃ।
প্রাপ্তোতি পুরুষন্তেন কলিঃ সালিগতি জন্মতম্॥
বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ।

ভবিষ্যতে দশতিবর্ধেঃ **
অহোরাত্রৈব তৎকলৌ।

এমন হ্রদ্বাণ আর হইবে না, এখন জ্ঞান, ধ্যান,
যাগ যজ্ঞ, যোগপূজাধিক হ্রদ্ব্য রূপে কিছুই করিতে
হইবে না, কেবল ভবভয়-ভজন কালিয়-গজেন মনু-
হৃদনের কিংবা অক্ষরকায়-বিমর্দক ত্রিপুরারির নাম-
সংকীর্তন, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, "কলৌ জাগতি
কালিকা" তাই কালীপূজা, পতিভাঙ্গারী ভাগ্যভাষী
কলির অপর্যায়, কালীদাস, দান, দদ্য, ইন্দ্রিয়-সংযম
ও সৈবগাধি প্রতিষ্ঠা আপন আপন শক্তি, ও
অধিকার অম্বারো করিতে থাক। আলস্য করিও
না, অহংকার করিও না, দেহবৈ, ভীরত আবার
জ্যোতির্ধর হইয়াছে, অক্ষরক দূর হইয়াছে। ভাই।

অমূল্য সময় বুঝা নষ্ট করিও না, এই ধর্ম সাধনার
মুখে বুঝাওকে ভুলিয়া থাকিও না। এখন একবার
তারশব্দ মনোবৃত্তি বল—

“হরে মুরারে মনোবৃত্তিভারে প্রাণপালি গোবিন্দ
মুখশ শোরে। বজ্রেশ নারায়ণ ক্রম বিক্রম নিরাময়
মাং জগদীশ রক্ষ।”

একবার কুম্ভধারা করিয়া উত্তরকণ্ঠে বলা,—
নমস্যা কংম হামদেব সোকালাং শুক্লমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপুণ্যসাম্রাজি পয়ঃ।

শ্রীপকানন তর্করত্ন।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও পদ্মপুরাণ।

(১)

এ মর্ত্যভূমে কালিদাস মহা-কবি। অতি সুদূর্বলত
কবিত্ব-শক্তি লইয়াই কালিদাস এ ধরাধামে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া-
ছেন;—“বাহার কাব্য-শাস্ত্রের রস-পাদে যথার্থ
অধিকারী, সেই সহস্রমহাশয়ের লিখিতে পারেন,
কালিদাস কিরূপ কবিত্ব-শক্তি লইয়া ক্রমশঃ
অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎক-
ৃষ্ট নাটক, সর্বোৎকৃষ্ট নাট্য-কাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট গুণ-
কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।” কোনও দেশের কোন
কবি, কালিদাসের তায়, সর্ববিধে সমান সৌভাগ্য-
শালী ছিলেন না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ হয়,
অত্যুক্তি পোষে দৃষ্টিত হইতে হয় না।

আজ প্রায় দুই হাজার বৎসর অতীত হইতে
চলিল, কালিদাস সূর্য্যে গিয়াছেন; কিন্তু আর একটা
কালিদাস এ পর্যন্ত পাইলাম না। এই রূপই
বলিতে হয়,—

“নবরত্ন দুর্লভ লোক বিদ্যা তত সুদূর্বলতা।
কবিত্ব দুর্লভ তত শক্তিভূত সুদূর্বলতা।”

অধিপূরণ।

হুয়া-কাহাই বল, গুণ-কাহাই বল, আর দুষ্ক-
কাহাই বল, কোন কালে কালিদাসের কৃতিত্ব নাই?
অন্য আমায় এ প্রসঙ্গে কেবল কালিদাসের দুষ্ক-
কায়সম্বন্ধে কৃত্তিক-তত্ত্ব কতকটা বুঝাইতে চেষ্টা

করিব। “শকুন্তলা” কালিদাসের উৎকৃষ্ট দুষ্ক-
কাব্য; দুষ্ক-কাব্যের যে অস্তিত্ব-শক্তিবিধি শুদ্ধ-
বিধি-নির্দিষ্ট আছে, সে তেজ-বিধান “অভিজ্ঞান-
শকুন্তল” নাটক বলিয়া আখ্যাত। এই নাটকের
নাট্যকার: কুন্যার ভারতে কালিদাস অভিজাত;
বিদেশে “সেক্সপিয়র” ভিন্ন আর কেহ কুন্যার
নহেন; কবিত্তে কবিত্ত সেক্সপিয়রেরও কালিদাসের
নিকট মুখা: কবিত্তে কবিত্তে হয়। আবারও কালিদাসের
মহাশয়ের সঙ্গে যোগ দিয়া বলি,—“এই অতুর্ল-
নাটকের আদি হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বদাশেই
সম্বন্ধস্থল।” * * * এই নাটক পাঠ করিলে,
সংস্কৃতজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তিগত অস্ত-কল্পে নিঃসংশয় এই
প্রতীতি জন্মে; মাহুদের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট রচনা সম্বলিতে পারে না। বস্তুতঃ কালি-
দাসের “অভিজ্ঞান-শকুন্তল” ঐশ্বর্য্যলৌকিক পদার্থ। স্বপ্নের
শক্তিশালী নাট্য-সমালোচক হুষ্ক-দুষ্ক শ্রীকৃষ্ণ
চন্দ্রনাথ বহু মাহুদের কালিদাসের এই “অভিজ্ঞান-
শকুন্তল” নাটকের ঐশ্বর্য্যগৌরবচূড়ক যে পরিচয়
দিয়াছেন, তাহাই পর্যাপ্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
যেটুকু বলিতে বাকি ছিল, চন্দ্রনাথ বাবু সেইটুকু
পূরিয়া দিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু এক কথা
বলিয়াছেন;—“দ্ব্যস্ত প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে
অশ্লী পরিত্যক্ত করিয়াছেন। মহা-কবি তাঁহার
নিশালা ভিতপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আনিয়া
দেখাইয়াছেন। সে চিত্তের বিস্তার,—পৃথিবী হইতে
কর্ণ পৌঁছায়। সে চিত্তে গ্রীক নাটকের আকার-
গত সৌন্দর্য্য, জর্মান নাটকের প্রাণীকৃত আধ্যাত্মি-
কতা এবং ইংরেজি নাটকের কাব্যগত জীবন্তত্ব
পূর্ণমাত্রায় পরিগলিত হয়। সেই সৌন্দর্য্য-
পূর্ণ ভাষণেরা যারকৃত্যজ্ঞান মহাপটের নাম
অভিজ্ঞান-শকুন্তল।”

চন্দ্রনাথ বাবু এই “অভিজ্ঞান-শকুন্তল” নাটক
দৃষ্টিত এবং অস্তাত অপ্রমাণ ব্যক্তিগত পরিচয়
চিত্রিত তিল তিল বিশ্লেষণ করিয়া এবং নাটকের
প্রত্যক ও অপ্রত্যক সৌন্দর্য্যরাশি অভিজ্ঞ
অনভিজ্ঞ শোকের চোখেই উপর দিয়া দেখাইয়া-
ছেন, মানব-চরিত্র-ভিত্ত-অর্থের কালিদাসের কাব্য-
অনুভূতি শক্তি ছিল। সত্য-সত্যই চন্দ্রনাথ বাবু
কথার উপর কথার চন্দ্রনাথ। বাঙ্গালী
সমালোচকের সমীচীনতার ও প্রবন্ধ-বুদ্ধিমত্তার
পরিচয়, ইহা অপেক্ষা বোধ হয়, আর অধিক হইতে
পারে না। চন্দ্রনাথ বাবু “শকুন্তলা-তত্ত্ব” বাঙ্গালি-

সাহিত্য-সমসারের যে এক অতুর্ল। মনোহর
সমুজ্জ্বল রসরূপে দেখাযায়, তদ্বিধির আর
সম্ভব নাই। “শকুন্তলা-তত্ত্ব” বিদ্যাসাগর দ্বারা
“অভিজ্ঞান-শকুন্তল” নাটকের নাট্যতত্ত্ব প্রতিপন্ন
করিতে, আর কাহাকেও প্রয়াস পাইতে হইবে না।
সুতরাং সে সম্বন্ধেও আমরা বেশী কথা বলিব না।
আমাদের যা কিছু কথা আছে, তাহা প্রধানতঃ কেবল
তাঁহার উপাস্যতার কয়েকছত্র বলা লইয়া। “শু-
কেশ ধারাবা বিখ্যাত-ভেদে। কেবল কালিদাসের
কৃত্তিক-কীর্ত্তন-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একটু মত-
বিরোধ ঘটিয়া গিয়াছে। সেইসূত্র আভাস আসার
পতবার “নিজস্ব ও পরস্ব” প্রত্যক দিয়া গিয়াছি, অন্য
কেবল তাহা আর একটু বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা
করিব। চন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছেন;—“অভিজ্ঞান-
শকুন্তলের গদ্য মহাভারতের গদ্য অংশোপা-
কৃত উৎকৃষ্ট, তাহা দেখা হইল। দুই গদের মূল এক,
কিন্তু পরিণতি বিভিন্ন। এই বিভ্রান্ততার, ওগেই
নাটকের গদ্যটির উৎকৃষ্ট, এই বিভ্রান্ততা সম্পাদনই
নাট্যকারের কার্য্য।”

কালিদাস যদি প্রকৃত পক্ষে মহাভারতের গদ্য
অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে চন্দ্রনাথ বাবুর
এই কয়েকটা কথার একটা ছত্রও কাটিতে পারা
যায় না। কিন্তু, আমাদের বিশ্বাস, কালিদাস
মহাভারতের গদ্যই অবলম্বন না করিয়া, পূর্ব-
পুরাণের “শকুন্তলোপাখ্যান” ভাগ অবলম্বন
করিয়া, “অভিজ্ঞান-শকুন্তল” নাটক লিখিয়াছেন।
এইটুকু দেখাইতে পারিলে, বুঝা যাইবে, গদ্যমহাশয়ের
পরিণতিবিধির বিভিন্নতা কত অম। মহাভারতের
গদ্যমহাশয়ের লিখিত “অভিজ্ঞান-শকুন্তল”ের গদ্যমহাশয়ের
গদ্য-প্রকৃতিতে পারিলে, সন্দেহই প্রতীতি হইবে;—“হুষ্ক-
সারমাণ” কালিদাসের অতুর্ল কৃতিত্ব। চন্দ্রনাথ
বাবু বলিয়াছেন;—“এই ঘটনা আছে বলিয়া শকু-
ন্তল উপাখ্যান, নাটক বলিয়া পরিণতি হইতেছে।”
এই ঘটনা যে জীবন্ত নাট্যকারের পরিচায়ক, তাহা কে
অবাকার করিবে? ইহাতে নাটকত্ব থাকিলেও, কিন্তু
কৃত্তিক কালিদাসের নহে। কালিদাসের কৃত্তিক,
কবিত্তে, নাটক-গত চরিত্র-চিত্রকূটনে এবং অস্তাত
সৌন্দর্য্য-পটের শক্তিতে। “হুষ্ক-সারমাণ” বিরবাদি
কালিদাসের কল্মসপ্রবৃত্ত নহে; না ইহাও তাহাতে
তাঁহার অঙ্গোব নাই। তিনি “পদ্মপুরাণের” প্রসিদ্ধ
আখ্যাতিকা হইতে এ প্রসঙ্গ পঃপ্রঃ করিয়া আপনায়
“অভিজ্ঞান-শকুন্তল” সমাবেশিত করিয়াছেন।

ইহাতে যে নাটক-কল্পের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছে, ইহাই তাঁহার পরম চিত্রপ্রদান।

নাটক লিখিতে হইলেই কোন প্রসিদ্ধ আখ্যাতিকা
অবলম্বন করিয়াই লিখিতে হয়;—

“নাটক, খ্যাততত্ত্ব, ত্রাং পঞ্চদ্ব্যস্তমস্মিতম্।”

সাহিত্য দর্পণ ২৭৭ পৃষ্ঠা।

“শকুন্তলা” নাটক লিখিতে হইলে, গদ্য মহা-
ভারতের, না, হয় “পদ্মপুরাণের, গদ্যভাগ অবলম্বন
করিতে হয়। যখন “পদ্মপুরাণের” শকুন্তলোপাখ্যানের
সহিত, “অভিজ্ঞান শকুন্তল”ের গদ্যভাগের সম্যক
সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তখন বলিতে হইবে, কালিদাস
“পদ্মপুরাণ” অবলম্বন করিয়াছেন।

“পদ্যদ্ব্যস্তি পুরাণে আখ্যানকমিত্তি স্মৃতম্।
সর্বত্র প্রত্যগুচ্যে বাসো শকুন্তলানি চ।
বংশাচারচিত্রৈশ্চৈব পুরাণং পঞ্চদ্ব্যস্তম্।”

সংস্কৃত-পুরাণ ৫০ অঃ ৩৪।

হুষ্ক, লয়, কবিত্ববর্ণনা, সমস্ত-কবিত্ব এবং কবিত্ব-
চরিত্র-কীর্ত্তন, পুরাণের এই পঞ্চদ্ব্যস্তের নাম
“আখ্যান।” পুরাণে এই পঞ্চদ্ব্যস্ত থাকে। “শকুন্তলা-
প্রসঙ্গ” এই আখ্যানের “অনুভূতি।” এই “শকু-
ন্তলা” উপাখ্যান। এই উপাখ্যান অবলম্বন
করিয়া নাটক রচিত হইয়াছে। নাটকের অভিন্ন
হয়, উপাখ্যানের হয় না।

এখন অবশ্য উপাখ্যান অবলম্বনই হইলেও,
উপাখ্যান ও নাটকে বিভিন্নতা থাকিবেই। হুষ্ক
গদ্যমহাশয়ের শকুন্তলোপাখ্যান, কলিঙ্গাসমুদ্র “অভি-
জ্ঞান-শকুন্তল”ের অবলম্বন করিয়া, হইলেও, প্রকৃতি-
গতম্ প্রকৃতিতে বিভিন্নতা ত থাকিবেই। গদ্যমহাশয়ের
মহাভারতের অবলম্বন রচিত; কৌম্ভমহাশয়ের
গদ্য-প্রকৃতিতে বিভিন্নতা পরিণতিত না হইবে
কেন? সেক্সপিয়রের “রোমিও-জুলিও” এবং
“হামলেট”ের সমাধানে প্রশংসিত হইয়াছিল; সে
চিত্র কিন্তু অসম্পূর্ণ ও অস্বচ্ছ। সেক্সপিয়রের
হাতে তাহার সম্যক পুষ্টি ও পূর্ণতা সাধিত হয়।
সেক্সপিয়রের সকল নাটক সম্বন্ধেই এইরূপ। স্ত্রীর
প্রত্যেক কাহাই এইরূপ। অভ্য-অপরিচ্ছন্ন বসন্ত
স্বপ্নও হইতে স্বপ্নের স্বপ্নসাম্পন্ন নানাকর্ত্তশালী
কালিদাস গঠিত এবং মালিন্যময় আর্য্য রূপে
অসীম সৌন্দর্য্যশালী প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতিত হইয়া
থাকে। এইরূপ সেক্সপিয়রের নাটক-সমালোচনার
উদাস শা সাহেব লিখিয়াছেন, —

"We thus are in a position to Compare the changes introduced by the consummate art of Shakspeare into the rude draughts of his theatrical predecessors, and to appreciate the wise economy he showed in retaining what suited his purpose, as well as the skill he exhibited in modifying and altering what did not."

প্রদর্শনের সহিত সমাজ রক্ষা করিয়া, নাটকরূপকাজ্য রস-প্রবাহ না ভাঙ্গিয়া এবং নাটকের লক্ষ্যাদি পূর্ণ-ভাবে, বজায় রাখিয়া নিন 'যত অধিক' পরিমানে সৌন্দর্য-স্বপ্ন করিলেন, তিনি 'ততই' প্রতিষ্ঠানই হইলেন। পরপূরণের শঙ্কলোপাখ্যান ও কাণিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' পাঠ করিলেই সফলই এ প্রতিষ্ঠা হইবে। নাটক-কারের এ অধিকারও আছে;—

"অবিকৃত্ত যদুত্তরং রম্যাদিগুণৈঃধর্মিকং।
তদপ্তরগুণৈঃকীমান্ ন যদুৎ ন কাচান।"
সাহিত্য-দর্পণ ৪৯৯ সূত্র।

কবি প্রণীত আখ্যানে যাহা নিবৃত্ত হয়, তাহার সমাজে সহজে নাই। পুরাণের 'শকুন্তলাই' সমাজের। শকুন্তল-চরিত্রনির্ণয়ে কাণিদাস কতকটা বিভিন্ন পথে গিয়াছেন; তাহা হইলেও প্রকৃতি ছাড়িয়া যান নাই। কাণিদাস পুরাণ ছাড়া অনেকগুলি চরিত্র-স্বপ্ন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও প্রকৃতির অধিকার পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। এইজন্যই কাণিদাসের এত অপরি-
সের প্রতিষ্ঠা। গল্পভাণ্ডারের বিভিন্নতা-সম্পাদনে কাণিদাস প্রয়াস পান নাই। "বিভিন্দা অঙ্ক রচন। সে রচনাই হউক,—অপ্রাসঙ্গিক নহে। তৎসময়ে কাণিদাসের অধর্ম কৌশলময়ী প্রতিভা সন্দেহে বাস্তবিকই বিদ্রোহিত হইতে হয়।

মহাভারতের শকুন্তলা-বৃত্তান্ত অধিকই পড়িয়াছেন; কাণিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'ও অনেক-ই পড়িত; কিন্তু পরপূরণের 'শকুন্তলা' বৃত্তান্ত দেখে হয় অনেক-ই অবশিত। যখন চন্দ্রনাথ বাবুও সে কথার উল্লেখ করেন নাই, তখন এ কথা বলিতেও অনেকটা সাহস হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এ-সময়ে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন;—"মহা-

ভারতের আদি'পর্বে দ্ব্যস্ত ও শকুন্তল'কে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, কাণিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলা রচনা করিয়াছেন।" উল্লিখিত শকুন্তলোপাখ্যান পাঠ করিলে বুঝিতে পায়া যায়, কাণিদাস 'মহাভারতীয়' অধিকারের উপাখ্যানে কি স্বত্ব কৌশল ও অলৌকিক চমৎকারিত্ব সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

এক্স অবস্থায় পরপূরণের শকুন্তলোপাখ্যান পাঠকবর্গকে উপহার দিলে বোধ হয়, অসুখপায়ে হইবে না। তাহা হইলে সুমিলিত পারিলেন, প্রত্যক্ষককে কাণিদাসের কৃত্তিত্ব কোথায়? অতি প্রাচীন কাল হইতে দার্শনিক যুগের যুগে এই পুরাণের পাঠ হইয়া আসিতেছে। "অভিজ্ঞান-শকুন্তল"ও প্রতি অনেক ন্যায় দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্র-চিত্র দ্বারা প্রকৃতি হইয়াছে। নাটকের কর্তব্য এই উদ্দেশ্য তাহাই;—
"অভিজ্ঞান-চরিত্রা রাভাবসমজ্ঞপণ।"
তত্ত্ববিশুদ্ধস্বার্থঃ ক্ষুদ্রকৃৎসনসুতঃ।"

সাহিত্যদর্পণ ২৭৮ সূত্র।
এতি অধিকের চিত্রাবলি একত্র করিলে যে এক মহা-চরিত্র-সমষ্টির ধারণা হয়, পরপূরণের উপাখ্যানকার প্রথমে দু-দশ কথাই তাহা হারিঙ্গম করিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন। এ উপাখ্যানে দ্ব্যস্ত সহজে এইরূপ লিখিত আছে;—

"দ্ব্যস্তা নাম রাবর্ষে চন্দ্রমণ্ডলবিষ্ময়ঃ।
পৌরবঃ হুমহাতেজা দেবেদ্যোদগপারগঃ।
দেবদ্বিত্য নিপুণ সর্দ্বজ্ঞগণাধিপঃ।
কলপ ইব সৌন্দর্যে ধৈর্যে চ ভূমিনাচলঃ।
সমুদ্র ইব গভীরঃ ক্ষুদ্রের ইব কচ্ছিন্নান।
প্রত্যঙ্গ বাসবসমন্তপ্তেহী ভাস্মানি।
সংহৃদ্বিঃ স্ফা চক্ষুঃ ধর্মভক্তঃ স্ফা মহুঃ।
স প্রজাঃ পালয়ামস যুগপঃ পুরানিহেরান।"

পরপূরণ, কর্ণধ্বং, ১ম অধ্যায়।
ভাবার্থ এই;—দ্ব্যস্ত নামে চন্দ্রমণ্ডলবিষ্ময় হুমহাতেজা বীরবেদ্যোদগপার সর্দ্বজ্ঞগণাধিপ পৌরব রাজমহাশয়। তিনি ধর্মজ্ঞান যমনিপুণ, রূপ মন, ধৈর্যে হিমালয়, গাভীরে সপ্ত, উগ্রধ্বং কুবের, প্রত্যঙ্গ ইন্দ্র, তেজঃ স্ফা, স্ফে চক্ষু ও ধর্মভক্ত মহুর সমান ছিলেন। তিনি প্রজাদিপক—নিজ উগ্রদজ্ঞাত পুত্রব পালন করিতেন।

মহাভারতেও দ্ব্যস্তের চরিত্র-চিত্র এইরূপই প্রকটিত হইয়াছে। অবশ্য সে বর্ণনা-চতুর্থ অধ্যায়-

কৃত গভীর ও ভাব-সমবিত। ইহার পর মৃগয়া ব্যাপার;

"কুশাচিন্দ্রমুগং রাজা স জ্ঞানম বৈশল্যে তঃ।
রম্যং ক্রন্দনামারুহ্য নানামণিষ্যাচিতম্।
অখ্যাগোদগদদর্শিনো মৃগমণ্ডলমুচ্ছিন্নম্।
অমলধব রাজস্বিনীপাতস্তরাসনঃ।
মৃগোপনি বলাবাস্তমিহুৎসলং মহাবাহাঃ।
ধাবতে ততো রাজা রাভাঘর্ষেহুচ্যবতি।"

পরপূরণ, কর্ণধ্বং, ১ম অধ্যায়।
ভাবার্থ;—কোন সময় রাজা নানামণিবিচিত্র মনোহর রথে আরোহণ করিয়া সৈন্যেতে অরণ্যমধ্যে মৃগয়ার গমন করেন। অরণ্যমধ্যে এক উজ্জ্বলিত সুপ অশ্বশালক করিয়া তিনি ধর্মজ্ঞানপূর্ণকৃত্ত তপস্জ্ঞা ধাবমান হন। মৃগ ও উগ্রম-পাতিতে সবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া রাজাও জ্যোৎস্নাভে তাহার অমুখান করিলেন।
এই মৃগয়াব্যাপারে কলিঙ্গবাসের কৃত্তিত্ব করিতে, তাহা অভিজ্ঞানশকুন্তল-পাঠকমণ্ডলই বুঝিতে পারিলেন। মৃগ্যাসারী রাজাকে দেখিয়া সারথি বলিতেছেন;—

"কস্মদ্যে দদন্তকুসুমি চাচিচ্ছাকার্কস্কং।
মৃগ্যাসারিণঃ সাক্ষাৎ পশুদীর্ঘ পিলাবিন্দুম্।"
সারথি যাচা বলিলেন, দর্শক অভিলেখে তাহা দেখিলেন। উপাখ্যানে অস্বস্তি যে কাণা থাকে না। পশুস্বাভিত মৃগের ক্রিয়ণ অবস্থা ঘটয়া থাকে, উপাখ্যানকার তাহা দেখান নাই, নাটককার সে মৃগের চিত্রণও চতুর্থ উপর করিলেন;—

"গ্রীবাভঙ্গাভ্রাভিন্নম মূরুগুপভতি ক্রন্দনে বন্ধদৃষ্টিঃ।
পাতকং প্রবিষ্টঃ শরণসংভারদ্বারা পূর্ণকায়ঃ।
দর্শনভ্রমলোচনঃ প্রমথিতমুখঃশ্রিত্তিঃ কর্ণধ্বং।
পজ্ঞাপ্রাপ্ত ভ্রামিতিবর্তনঃ স্তোকমুখ্যংপ্রয়াতি।"
কি অপূর্ণ যুগের চিত্র। কি অলৌকিক অবস্থার স্রবী কবিত্ব। ইতালীর চিত্রকরগুরু রায়সেল-হাতে চিত্রিত মৃগরী স্রিগুপের এক বাসি চিত্রের মূঢ়া ভনিয়াছে ৭৫ ছায়ায় ঢাকা। পাঠক! এ চিত্রের মূঢ়া নিরূপণ করিতে পারেন কি? এরূপ স্বপ্নদ্রাবক কবিত্ব যে অভিজ্ঞান-শকুন্তলে প্রকটিত ছিল,—এরূপ মনোহর চিত্রও যে পড়ে পড়ে,—এইরূপ কাণিদাসের কৃত্তিত্ব দুঃখানি দিতে পেলো।

এমনকি সঙ্কট-প্রকটও অসুখান হইয়া না। কাণ্য-কাম্যমোদী পাঠকগণ নিজে নিজে তাহা নির্ধারণ করিয়া লউন। আসন্ন এখন

উপাখ্যানকারের উপাখ্যান-বিবৃতি করিয়া যাই।
মৃগে যাহা সাদামত কাণিদাসের কবিত্বের একটু একটু আভাস দিয়া যাইতেও চেষ্টা করিব।

মৃগয়াব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া, রাজা দ্ব্যস্ত মহাবীর শর শান্তরাস্পদ আশ্রম-সমীপে এক আশ্রম-মৃগের পতং-পুটাত ধাবিত হইলেন।
"ততঃ কণ্ঠস্রাভাসো মৃগঃ প্রতি মহাবাহাঃ।
সমপে শরমুগাহং শব্দভেদিনিমাত ভৈ।
জং তথা সন্ধিত্তিরং কণিষায়াঃ হৃদরতঃ।
অজ্ঞাপ্রাথমমৃগো ন হস্তয়ো মৃগপতিঃ।
তদামমুগোতোযং কর্ণকীর্ণাপতি শরৈঃ।
সংজ্ঞহার মহাবাহঃ পৌরবঃ পৌরবঃ।"

পরপূরণ, কর্ণধ্বং, ১ম অধ্যায়।
ভাবার্থ;—অনন্তর মহারাজ নরপতি মহাবীর কণ্ঠে আশ্রম-সমীপে সমাগত হইয়া মৃগের প্রতি অত্যাশ্র শর সন্ধান করিলেন। কণিষায়া হৃদর হইতে বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ। "এ আশ্রম-মৃগ, ইহাকে বধ করিলেন।" ইহা আশ্রম-মৃগ, এ কথা ভনিয়া পৌরবাবৃত্তি পৌরবরাজ শর সংহার করিলেন।

এইখানে, উপাখ্যানকার অথবা নাটককার কাণিদাস আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন। নরপ-রায়ের অস্ত্র ত্যাগ করা কর্তব্য নহে; দীন-জন উদ্ধারার্থে তাহা প্রয়োজ্য। কাণিদাস এই 'মহাশিলা' দিয়াছেন। "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" এই গল্পধর্ম ও-ভাবপূর্ণ ছত্রটি দেখিতে পাইলে;—"অভিজ্ঞান" তে মৃগ ন প্রকৃষ্টনামসি।" ইহাই মৃগতত্ত্ব লোপাখ্যান। ইহাই রাজনীতির মূলমন্ত্র। মৃগ্যার-ব্যপদেশে মহারাজ দ্ব্যস্ত মুনিময়ের নিকট এই মহাশিলা পড়িলেন। নাটকের কৃত্তিত্ব-পরিচয়ও পূর্ণ মাত্রায় হইল।

ইহার পর রাজা, সেই অনির্দেশ্য-তেজস্বী স্বকৃত-তপোবল-সমবিত্ত-কৃত্তিমান মহাত্মা দ্ব্যস্ত-মৃগের কণ্ঠে মৃগকলনিরকারণ-নির্মাণিত, নানাবিধ-বিহংনিচর-সেবিত এবং ব্রহ্ম-লোকসমুদ্র শান্তিরসমুদ্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, সেই কল্যানদুষ্টি রূপবর্তী তাপসব্রহ্মাণ্ডারী অনবদ্যাদী বরেন্দ্রা অনিতেজনা আশ্রমললা-ভূতা শকুন্তলাকে সন্নিপদসহ দেখিতে পাইলেন। "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" এইখানে কলিঙ্গবাসের কল্যাণ-ভর। রস-গচনা পরম রমণীয় এবং কবিত্ব ও নাটক স্বকলনীয়। যতন্তু এইখানে

কালিদাসের কৃত্তির অধিতায়। স্বাভাব-সৌন্দর্যের
অনন্ত ভাণ্ডার,—প্রেম-অনুরণের পূর্ণ বিকাশ,
মানব-চরিত্রের আমূল আবেগ এইখানে দেখিলে।
এইখানে দেখিতে পাইবে,—কালিদাসের চরিত্র-
খরির অমাহুতিক শক্তি। কুলদেব দাবানল,—রাজকে
মহীহরুৎ,—পুরাণে পরাক্রম এইখানেই প্রকটিত।
শ্রেয়-পরিণতি পরিণয়ের পূর্বে (পূর্বসূর্য্যে) শ্রমাদার
সিদ্ধ-সৌন্দর্য্যোক্ত মিত-ক্লোৎসার এবং নৈরাশ্রের
গভীর কুন্তল-কণ অক্ষকরের যে ভাষা-প্রতিভাত এই-
খানে প্রবহমান, এ সময়ে আর কোন সামান্য-
নাগরে তাহা আছে কি না মনেহ। উপাখ্যানে অকল্প
আহার কাণা করা যায় না।

কালিদাসের কৃত্তির অর্থাৎ নাটক ও উপাখ্যানের
বিভিন্নতা আরও স্পষ্টা দ্বিধায় বুঝাইতে হইল,
“অভিজ্ঞান-শকুন্তল”ের এই স্থানটী তিন ভাগে
বিভক্ত করিতে হয়। তিনটি ভাগ,—তিন ভাগ
ছবি। * (১) সেই কনক-কান্তিময়ী সরলা তাপস-
বালা শকুন্তলা এবং তনেকপ্রাণা সখীসহচর বহতর-
সোনালী। (২) রক্তের অন্তরাল—হইতে শকুন্তলা-
সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতর আয়-বিসর্জন ও আয়-সংগ্রাম।
(৩) শকুন্তলা, সখী ও রাজার সম্বন্ধন। আশ্রম-
পাদপলতার সম্মিলন-পালিতা শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের
কত, রাজা হুমন্তের আশ্রম-গ্রাম কেন, আর রাজাকে
একদিনার দেখিবার ইচ্ছা যেই তাপসবালারও
চরমপূর্ণ ক্রোধের স্রুত ও বিনাকল্ল ক্রুদ্ধবশবর্ত
আসিত হইল কেন;—উপাখ্যানকার সে সব কথা
উল্লেখ করেন নাই। শকুন্তলা সেই অন্তঃকলানি
অন্তঃকলানি প্রেম-প্রাণাধীর গভীরতাই বা কত,—
কালিদাস ভিন্ন আর কেহ তাহা দেখাইতে পারেন
নাই। তবুও কি বুঝাইতে হইবে, কালিদাসের
কৃত্তির কেবল ?

পুরাণে কি বিদূরক আছে? বিদূরক না
ধারিলে কালিদাসের হুমন্তকে যত অন্তঃতপের
পটীপাকেই দৃঢ়ীভূত হইতে হইত। উপাখ্যানে
আছে কেবল,—

“প্রভাধ্যাত্যমুদ্যোপস্থায়ীঃ স মহীপতিঃ।

তোমসমেবেদন কভা দর্শনপ্ৰসঙ্গা সমাঃ।

রাহুলকণ্ঠধ্বজঃ কক্ষদ্বিত্তোঃ সরসঃ পথঃ।

আছড়া সিংহাটীয়া বজ্রানুগ্রমপাদপাল।

* সত্য সত্যই “অভিজ্ঞান শকুন্তল”ের উদ্বোধন এক
একটি অলংকারী রাজকীয় ভাষা এবং এককোটি
প্রাণীতর বাণে চিত্রিত আছে।

তামাং মধ্যোহতিময়ীঃ কভা নামা শকুন্তলা।

রাজ্যম্ প্রেক্ষ্য হৃদয়মুবাচ চবনং বিজঃ।

সমদ্যাবিধিরাজ্যতঃ সংহত্যা বাহসি ক্রম্।

ইহামাসনমেতৎ তে পদামসংগমঃ পুংসব।

তদ্রাশ্রমসংকটে পুত্রীস্বাভিষমংক্রিয়াম্।

মনসাতপসপাশবিক্রমঃ পুণ্ড্রসনোবহঃ।

উবাচ রাজা হুমন্তঃ কানি কথামি ভাবিনি।

পুত্রানি যৎ বহাংহেতুং দেবীমিষ দিত্যুত্থ্যতম্।

বৃদ্ধকাত্যবহঃ পুংসুহলে হুমন্তো নাম তুণ্ডপতিঃ।

তজ্জুহা সা সখীঃ প্রাঃ কথং তং সমোভয়ম্।*

পদপূরণ, কর্ণধ্বজ, ১ম অধ্যায়।

ভাব্যঃ,—রাজা হুমন্তের অসুসংবৎসতঃ ক্রোধব্রু

হইয়া জল স্নেহের করিতে করিতে অক্ষরামসম

কামাদিপকে দেখিতে পাইলেন। তাহার বাক্যসম

যট করুক রাধিয়া, মদারের হইতে জল সংগ্রহ

করিয়া, বস্ত্র-আশ্রম তরুণিপকে দিল করিতেছে।

তাহাদের মধ্যে স্নানঘাটী শকুন্তলা-নারী কভা

রাজাকে দর্শন করিয়া, হৃদয়-বচনে বলিলেন,

আপনি অদ্য অভিধরপে আসিয়াছেন। নিঃস্বয়ই

সংকট হইয়াছে। এই আপনার আসন, এই

পাদ্য, এই অর্ঘ্য, গ্রহণ করুন। রাজা তাহার বচন-

স্থলয় প্রসিদ্ধ হইয়া অভিধর-ক্রিয়া গ্রহণ

করিলেন। তৎকালে মনবান-সম্পাতে তপীর

মনের কিরণস্রুপ্ত হইল, তিনি বলিলেন,—

ভাবিনি। তুমি কাহার কভা? বারোহে।

তোমাকে পরিত্রাণ দেবার জ্ঞান দেখিতেছি। আমি

কনিস্রা, পুরুষকে জন্ম,—নাম হুমন্ত। এই আমি

তুমি শকুন্তলা সখীকে বলিলেন, তুমি আমার

জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

মহাভারতে কোন সখীই উল্লেখ নাই। পদ-

পুরাণে অনেকেরই কথা পাওয়া গেল। নাম

কিছু কাহারও নাই। “অভিজ্ঞান-শকুন্তল”ের সখী

দ্বাঃ প্রেমবান ও কনস্রা। মহাভারতের শকুন্তলা

নিজস্বভাবে আপনার জন্মবাহা বলিতেছেন। পদ-

পুরাণ ও “অভিজ্ঞান-শকুন্তল” ইহা সখীসুখেই গায়।

কালিদাসের শকুন্তলা, মহাভারতে শকুন্তলা আরও—

পদপূরণেরও নহে—এ নিম্ন ব্রজাও নহে—

নহে,—কেবল, “কালিদাসের” নিজেরই সম্পত্তি।

কালিদাসের শকুন্তলা অন্তরের দাবানল—পুত্রীয়া

মগ্নিত পাইলেন,—কিন্তু মুখ চুটিয়া অভিধর চুটো

দিলের সম্মান্য করিতে পারেন না—জন্ম কৃত্যন্ত

অনেক কাল। সুখ নাইই হইক,—ধর্ম্মর আশ্রমে,

ধর্ম্মপালিত্য শকুন্তলা দ্বারা অভিধর-কারের, ক্রটি
হইতে পারে না। শকুন্তলার অন্তর্নিহিত স্নেহের ভাব-
স্রুটক স্বেচ্ছতে এবং লাজভারানন্ত কটাক্ষের নীরব
ইঙ্গিতে সখীপন দ্বারা অভিধর পরিচয়। স্বাধীরাতি
সম্পন্ন হইয়াছিল। আবার সখীসুখেই জন্মবিবরণ
বর্ণিত হইল। পরপূরণের উপাখ্যানে তাহাই এই-

গায়ে। উপাখ্যানে সখীই বলিতেছেন,—

“রাজভ্যা পাতনভ্যা বিধাতিভ্যা বাহমানাঃ।

বশিষ্ঠেন দ্বিজৈঃ যুক্তৈঃ ত্রয়শ্চেন্দ্রাণ্য বহীয়াঃ।

গর্হয়ন্ কশ্মিরাদ্যং ত্রপশ্যং বহু মানয়ন্।

ত্রপশ্যাব্যং তপস্তপে বহুবর্ষাঘলকম্।

তদ্বৃত্তা ভামাপর্য্যঃ শক্ভঃ সামন্ত্যঃ সর্ববৈতঃ।

মেনকাঃ প্রেমমামাস তপোবিহার্য্য পার্থিবং।

নাগতা পুংস্তপ্তজ্ঞ কণ্ঠভাববলিতা।

প্রলোভ্যামাস্য মুনীং বিগামিহাস্য সমিজমৈঃ।

জিতেন্দ্রিয়ান্যাপি কামেন তপস্রাশ্রমশ্চ তুজৈঃ।

কটাক্ষকণ্ঠৈঃ রাজেশ্চৈব বিবৃণেৎ পানিনন্দনঃ।

যৈষ্ঠ্যোক্তাতোহং বাহভ্যামাস্রময় মেনকাং মুহঃ।

রমেন চ মদনাবিষ্টঃ কণাঃ সান্ন্যাসপ সঃ।

ত্রাণিতস্তাং বিদ্রম্যাহ বদনধর্ম্মি প্রথমে ক্রম্।

মেনকাপি চ তৎ গর্ভং বিদ্রুতা গহনে বনে।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

শকুন্তলক সমপেচেন ন ত্রৈকপ পুনঃ প।

করিলেন। অশ্রময্যে তাহার সংজ্ঞা লাভ হইল।
তখন তিনি বড়ই লজ্জিত হইলেন; হৃতরঃ
মেনকাকে বনে, ক্রোশিয়া রাধিয়া মত্তর প্রাণন করি-
লেন। মেনকাও গহন বনে গর্ভ ত্যাগ করিয়া
ইন্দ্রকোটে গহন করিল; গর্ভের প্রতি আর
কিরিয়াও চাহিল না। রাজন। শকুন্তল্য গর্ভ
পোষণ করিতে লাগিল। এই জন্ম এই বর-
বর্ণিনী নাম শকুন্তলা। হুমহাজেজা কণ্ঠ কটাক্ষে
বনে পতিতা দেখিয়া অকল্পপাদপনৈস্বক
তাহাকে আপনার পুত্রীতে করুণা করিলেন। কটাক্ষও
মুনিবৃত্তক পালিত হইয়া তাহাকে পিতা বোধ করিতে
লাগিলেন। রাজন। আপনি ইহাকে মুনিশ্রেষ্ঠ
কণ্ঠের পুত্রী বলিয়া অবগত হইল।

শকুন্তলার জন্মবিবরণের পূর্ণতা মহাভারতে এই

রূপেই বিবৃত হইয়াছে। “অভিজ্ঞান-শকুন্তল”ে

এই রূপেই আছে। রূপে গঠন তাহার অল্পরূপ।

নাটক ও উপাখ্যানের ভারত্যা এই বোনে।

গজভাণ্ডের “অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা ভনিতো কষ্ট হয়

না; অভিনয়ে কিন্তু বড়ই বিবর্তিকর, তাই

নাটককেও অভিনয়-সৌন্দর্য্যের শিক দৃষ্টি

রাধিয়া,—গজভাণ্ডের ব্যর্থকল্প আনিতে হয়। “অভি-

জ্ঞান-শকুন্তল”ে তাহাই হইয়াছে। বিশ্বাসিত্রের

তপস্রাশ্রমই ইন্দ্রের স্বর্গতা কেন, উপাখ্যানকার তাহা

বলেন নাই; বলিবার প্রয়োজনও হয় নাই। গর্ভের

ব্যর্থকল্পে কালিদাস সেইটুকু বুঝাইলেন। উপা-

খ্যানে হুমন্তের আশ্রমগোপন নাই;—“অভিজ্ঞানে”

কিছু আছে। ইহাইতে সৌন্দর্য্য। এ টুকু না থাকিলে

কালিদাসের কৃত্তিরে ক্রটি হইত। শকুন্তলা ও

হুমন্তের প্রেম-পরিণতি পোষনীয় পরিণয়। উপা-

খ্যান ও নাটকে এ পরিণতির রীতিমত ধারো

নাই; কিন্তু প্রকৃতির বাস্তব্যে সস্পৃহ, তাহাতে

মদেহ নাই। উপাখ্যানে বাহা প্রজন্ম থাকে,

নাটকে তাহাই মুটাইতে হয়। এই জন্ম কবি

বলিয়াছেন,—“মানব-প্রকৃতিসময়ে বহতলি গুঢ়

তত্ত্ব আছে, তাহা আধ্যাত্মিক দর্শনের অগ্রপণ্য,—

বিজ্ঞানের অগ্রপণ্য। তাহা কেবল কবিই দেখিতে

পান। তাহার প্রকটনই নাটকে। উদ্দেশ্য—সেই

জন্ম নাটকের স্বীকৃতি। এমন সেহন, উপাখ্যানে কি

আছে। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অনিবার্য হুমন্ত

বর্ণিলেন।

“স্বযুক্ত্য রাজপুত্রীং যথা কল্যাণি ভাষ্যে।

অন্তথা পৌরবাহাং হি মনো-সোমস্বত্বরাজ্যে।

স্বযুক্ত্য রাজপুত্রীং যথা কল্যাণি ভাষ্যে।

“এবমস্থিতি তাং রাজা প্রত্যাচাৰিচারয়ন।
 অসি চ ত্বাং হি নেহামি নগরং স্বং শুচিচ্ছিতে।
 ত্বাং ত্বমর্হা হস্তোনি সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥
 এষমুক্তঃ। স রাজবিস্তারমনিষিতবিগ্রহাম্।
 জগ্রাহ বিধিবৎ পাবাদ্বাস চ ত্বাং মহ।
 বিদ্যাহ চৈনাং স প্রায়শত্রবীজ পুনঃ পুনঃ ॥
 প্রেমধিষে চ নেতুং ত্বাং বাহিনীং যুধিষ্ঠিঃ মহ।
 বিস্তুতা পররাপেক্ষাং নারয়িত্বামি যুজতে ॥
 ইতি তত্ত্বাং প্রতিজ্ঞায় স নৃপো মুনিসকন।
 মনসা চিত্তয়ন প্রায়াদকা চাপাধুরায়কম্ ॥
 কাশ্যপস্তপসা বৃদ্ধঃ তত্রাং কিংহু করিষ্যতি।
 এবং বিচিহ্নয়নৈব প্রাৰিষন্নগরং নৃপঃ ॥”

শত্ৰুপুংগ, স্বর্ণবশু, ১ম অধ্যায়।

ভাবার্থ,—শত্ৰুস্তলী যাহা চাহিয়াছিলেন, রাজা কোন বিচার না করিয়া, ‘তাহাই হইবে’ বলিলেন। তাহার পর তিনি ‘বলিলেন’, ‘অসি শুচিচ্ছিতে। আমি তোমাকে অচিরেই পায় নগরে লইয়া যাইব। আমি তোমার নিকট সত্যই বলিতেছি,—তুমি নগরবাসের উপযুক্ত।’ “রাজা এই কথা বলিয়া সেই অনবদ্যাদার পাণি-পীড়ন ও তাহার সহিত বাস করিলেন। অনন্তর তাহার উপাস্য-সমুৎপাদনপূর্বক গমনে উদ্ভূত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন; “যুজতে। তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য মন্ত্রিপার্শ্বের সহিত বাহিনী প্রেরণ করিব।” রাজা তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া মনে মনে চিন্তা করত অস্থবী দান করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং ‘তপস্বী কণ এই ঘটনা শুনিয়া কি করিবেন,’ ইহা ভাবিতে ভাবিতে নগরে প্রবেশ করিলেন।

উপাখ্যানের শব্দস্থলা জোর করিয়া চাহিয়া যাহা পাইলেন, নটকের শব্দস্থলা না চাহিয়াও প্রকারান্তরে তাহাই পাইলেন। একে, পাণ্ডা জোরে, অঙ্গুরের পাওনা অনুসরণে। রাজার পরিচয়-সম্বন্ধে নিদারুণ দ্রষ্টব্য লেখিয়াই উপাখ্যানের শব্দস্থলা উপায়ান্তরে রাজাকে প্রতিক্রিয়া করাইয়া লইয়াছিলেন। উপাখ্যানের শব্দস্থলা যাহা নির্ধকর পর পাইয়াছেন, নটকের শব্দস্থলা তাহা পূর্বেরই পাইয়াছেন। স্বইচ্ছা এইটুকু। এই স্বাতন্ত্র্যে কিন্তু কাণিদাসের রুচিত্ব। এই স্বাতন্ত্র্যটুকুতে নটক-চিত্রিত শব্দস্থলা-চরিত্রের অপার সৌন্দর্য্য অপ্রতিহত রহিয়াছে।

শিব-সঙ্গীত।

খান্দাজ—একতাল।

(১)

কেঁপারে তোমারে জানিতে যে ভন এতল এতল
 তোমা হতে ছয়,
 স্থিতিলয় কর, ভূমি কি পুরুষ
 অথবা প্রকৃতি ত্রিগুণের।

যোগে যারে বলে পুরুষ বিশেষ
 কেশবধ্বানি অনাগি অশেষ
 প্রথব-বোধিত জগতের ঈশ
 সেরূপ কি তর হয় পরিচয়।

নিত্য জ্ঞান যঃ/নিত্য অভিনায
 পরমাত্মা কিবা ভূমি কুড়িয়াস
 সত্য চিদানন্দ পূর্ণ স্বপ্রকাশ
 ব্রহ্ম কর্ম কিবা ভূমি শব্দময়।

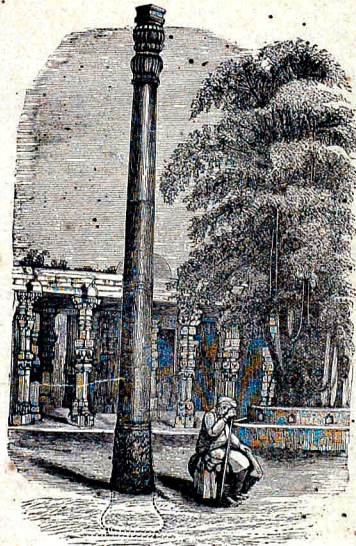
ভূমি কি কেশব বিরিকিপ্রসব,
 বিরিকি, বাসব, বহু কিবা সব
 এ সব সংবাদে কাজ কি মোর শিব
 তব শিবরূপে যেন মন রয়।

খান্দাজ—একতাল।

(২)

শিব শব্দরূপে করিছ কাহার মাধন মাধন।
 ফেলি বাষাধর হয়ে লিপপ্তর কাহার সোয়ানে
 আছ নিমগন।
 কেন বা হৃদয়ে ধরিয়ে রমণী ভীমা উগাদিনী
 মুগুণমালিনী,
 তরল তরল নিত ত্রিনয়নী নরকহরশী
 রশনা বসন।
 ওহোহো বুঝেছি রাজস তামস প্রকৃতির বশে
 চেতন পুরুষ, লভে যেই দম্বা করি রঙ্গরস
 প্রকাশিছ তাহা ভুবন ভাবন।
 থাকেনাক জ্ঞান জ্ঞানময় জীবৈ স্বাধীন পতিত
 পরাধীনভাবে
 চিরদিন যেন এই লীলাভাবে মানসে মরসে
 হেরে পঞ্চানন।

দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভ।



লৌহ-প্রবন্ধে (১২৯ পৃষ্ঠা)

লৌহ।

(২)

অক্সিজেন, অর্থাৎ যে বাষ্পটী অদৃশ্য ভাবে আমাদের বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে আছে, বাহাই আমাদের বায়ুর তৃতীয়াংশ, যে অক্সিজেনের অভাবে দহন কার্য হয় না, বাহা নানা বস্তুর সহিত মিশিয়া নূতন নূতন যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করিতেছে, যেটাকে আমরা নিবাসের সহিত নইয়া জীবিত থাকি; হাইড্রোজেন, অর্থাৎ যে বাষ্পটীর সহিত অক্সিজেন মিশিলে “জল” যে যৌগিক পদার্থ, তাহার সৃষ্টি হয়; কার্বন, বাহা কাট ও কয়লার ভিতর প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং বাহার সহিত অক্সিজেন মিশিবার সময় বাহির হয়, যে উত্তাপের সহায়তায় আমরা রন্ধনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করি; ফসফরস, অর্থাৎ যে বস্তু চুনের সহিত মিশিয়া জীবন-শরীরে অস্থিগুলির কঠিন অংশটী নির্মাণ করে, বাহা একটু খসিলেই অগ্নির উৎপত্তি হয়, বাহা হাড় হইতে লোকে বাহির করিয়া লয় ও বিলাতী দাঁপ-শলাকা প্রস্তুত করে; সিলিকন, বাহা দ্বারা এই যে বাসুকারাশি আমরা সচরাচর পদ-দলিত করি, আর এই যে নানাবিধ প্রস্তর আমরা দেখিতে পাই, তাহাদিগের অধিকাংশ ভাগই বাহা দ্বারা গঠিত; ম্যাগনেসিয়, যে পদার্থটী বিলাতে কোন কোনও প্রকার কাচ প্রস্তুত করিতে লাগে;—যদিও এই সমুদ্রয় পদার্থের নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের শিক্ষারেরা অবগত নহেন, তথাপি তাহাদিগের কার্য্য-কৌশলকে কেহ যেন হেয় জ্ঞান না করেন।

মহত্ত্ব মহত্ত্ব বংশের অজিজ্ঞাতা, ঐহাদিগের মনে এখনও কিছু কিছু বর্তমান রহিয়াছে, কার্য্যে প্রকাশও পাইতেছে। যুগ যুগান্তর হইতে পিতা, পুত্রকে শিখা দিয়াছেন, পুত্র আবার তাহার পুত্রকে শিক্ষা দিয়াছেন। এইরূপ এই জ্ঞান পুরুষ-পুরুষ হুজুমে ক্রমগতই চলিয়া আসিতেছে। যখন হিন্দুজাতি জীবিত ছিল, হিন্দু-দেশে যখন প্রাণ ছিল, তখন এই অজিজ্ঞাতা ক্রমশই বর্ধিত হইতেছিল। কেবল নিজেই যে তাঁহারা নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিতেন, তাহা নহে, পৃথিবীর সমস্ত জাতিই জ্ঞান উন্নত করিয়া তাহারা যদেখ পুষ্ট ও শলশালী করিতেন। নানা দেশে তাহাদিগের জয়-পতাকা উড়িত, আজও নানা ধীশে নানা দেশে তাহাদিগের কীর্তিস্তম্ভ মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু

যে-হিন্দু আজ হুমি মৃত! সেই প্রবল-পরাক্রান্ত, জ্ঞানদ্রোণকে উদ্দীপ্ত, বেসমদ্রণ আর্ঘ্যজাতি আজ মৃত। আর্ঘ্যবংশ-সমুদ্র লক্ষ লক্ষ নরনারীর দেহ অক্ল-জীর্ণ ও শীর্ণ মূন নিস্তেজ ও নিশ্চল। যখন আমরা জীবিত ছিলাম, তখন-কিরাত যবনপ্রভৃতি কিন্দীশী বিজাতিসমূহ, অধি-পরাক্রম সেই গগন-ভেদী আর্ঘ্য-মনের উচ্চতা কীরূপ, তাহা জানিয়া-ছিলাম! কিন্তু এখন দেখ, এই দেহ প্রাণশূন্য ও নিষ্কীব।

হে প্রাচীন আর্ঘ্যগণ! স্বর্গ হইতে একবার আপনাদিগের এই দীন হীন সমুদ্রদিগের প্রতি কৃপাকটাক করুন। এই খণ্ডের ১ম পৃষ্ঠায় আমরা যে চিত্রখানি দিতেছি, চকু বেলিয়া-একবার যেন তাহারা সেই চিত্রখানি লেখিত পায়। ভারতের পৌর-স্বর্গ একবারেই অস্তমিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু, সেই স্বর্গ-রশ্মি আজও এই চিত্রখানিতে নিহিত রহিয়াছে, যেন সেই আলোকে লম্বেক মাত্রের নিমিত্তও তাহাদিগের মন আলোকিত হয়। তাহা হইলে, আশা হইতে পারে যে, একবারে আমরা মরি নাই, কালে ঐ ভিমিরময় উদভ্রমণে পুনরায় সেই ভারত-পৌর-ব-ব-বিকে উদ্ভিত হইতে দেখিব।

চিত্রখানি পুরাতন দ্বিতীয় হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেই ইঙ্গপ্রস্থ, যেখানে ময়দানর রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্র সত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন, যেখান হইতে ভীষ্মার্জুন-নির্যোজিত লক্ষ লক্ষ শত্রুর বীরগণ নিহত হইয়া জগৎকে কপিত করিয়াছিল। চতুর্থখানি একটী লৌহ স্তম্ভের। কবে, কে, এই লৌহ-স্তম্ভটী নির্মাণ করিয়াছিল, তাহার কিছু ঠিক নাই। কেহ বলেন, ইহা পাণ্ডবদিগের সময় হইতে এখানে আছে। কেহ বা ঐ কথা বলিয়া থাকেন-যে, পঞ্চদশশতাব্দী অমৃত হইল দ্বিতীয় প্রদেশে ধাব-নামক এক নরপতি ছিলেন, তিনিই এই লৌহ স্তম্ভটী প্রতিষ্ঠিত করেন। দেবজ্ঞানর কল্পের ইহার উপর কিছু লেখাও আছে, কিন্তু সে অমরত্বটি এরূপ আঁচড় পিঁড়ের মত যে, তাহা পড়িতে পড়া যায় না। খ্রিস্টপূ মাত্রেব বলেন যে, ইহাতে এই কয়টা কথা কেশা-আছে—রাজা ধাব এই স্তম্ভটী নির্মাণ করেন, ইহা তাহার কীর্তিস্তম্ভ, ইহাতে যে সমুদ্র চিহ্ন অঙ্কিত-রহিয়াছে, খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে তিনি তাহার শত্রু-শরীরে অঙ্কিত করিয়াছিলেন; বাহুল্যে তিনি পৃথিবী

সেদের নিকট পাঠাইয়া দিল। মুহূরন সেই এই পরম্পরা আমিল জিলেন। লোকটা হায়া সমুদ্র কৃতান্ত কাহাকে বলিল। আমিল সাক্ষে তৎকালে বেড়ার উপর চড়িয়া এই গ্রামে আসিলেন, আর নিজের চক্ষে সেই হানটা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। সেখানে চারিদিকে প্রায় ২৫ হাত লম্বা ভূমিখণ্ড একবারে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে একটাও ঘাস ছিল না, এক-পাছিও তৃণ ছিল না। তখনও তুমি উত্তর ছিল। সেই হানটা তিনি খুঁজিতে আসেন করিলেন। খুঁজিয়া লোক যতই নিচে বাইতে লাগিল, ভূমি ততই উত্তর দেখিতে পাইল। অবশেষে একখণ্ড পৌষ বাহির হইয়া পড়িল। তখনও তাহা অতিশয় গুরু ছিল, বনে এই হাঙ্গর হইতে বাহির করা হইয়াছে। অনেকক্ষণ পরে ইহা শীতল হইল। আমিল অথবা অপার্নার বাড়ীতে নইয়া আসিলেন, তার পর একটা বলির ভিতর পুরিয়া শিশনগের করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নিজের সমুখে আমি ইহাকে ওজন করাইলাম, ওজন ১৩০ তোলা হইল। উত্তার দাঁতেরে বলাসাম, ভূমি হইয়াছে একখানি তলোয়ার, একখানি ছোরা ও একখানি ছুরি প্রস্তুত কর, গুড়িয়া আমার নিকট লইয়া আনি। উত্তার দাঁট বসিল, এ লোহে হাড়াড়ি বা মহিবে না, ইকরা ইকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া বাহিবে। আমি বলিলাম, তা যদি হয়, তবে ইহার সহিত অপর একই লোহা মিশাইয়া ধাও। বীর ভাগ আকাশের সোহার সহিত একতাপ পুখির লোহা মিশানো হইল, আর তাহাতে ঠেট থানি তলোয়ার, এক খানি ছোরা ও একখানি ছুরি বাড়িয়া উত্তার দাঁট আমাকে নজর গিল। পুখির লোহার দ্বারা ইহার বাত-টিক গ্রহণ ও ইহার উপর জলের ছায়া আঁতা খাতার দাপ বসিল। দম্পন সেনের অসম্মান তলোয়ারের ছায়া ইহাও হুড়িয়া বাইত, আবার হাড়াড়ি দিলে রিস্ট মোহা হইত। যে ছুই খানি তলোয়ার প্রস্তুত হইল, আমার সমুখেই তাহার পরীক্ষার জন্ম আসেন করিলাম। যুব উত্তরই তলোয়ারের বেরণ কাটে, এই তলোয়ারের হইতে রপই কাটিল। সিংহাল চোরেয়া বস্তুর লৌহ-হইতে সিঁদকাটি প্রস্তুত করে, এই যে কণাটি এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার মূল কি এই উক্ত-প্রস্তুত ?

৭৮ হাট্টক, অধিক পরিমাণে লৌহ থাকিলে কি হইবে, বড় বড় উক্ত-প্রস্তুত হইতে মনুষ্যের বিশেষ

উপকার হয় না। মাঠে মাঠে উক্ত-পাথর পড়িয়া নাই যে, মনুষ্যের হেলেরা হুড়াইয়া আনিবে, আর মনুষ্য তাহাখণ্ডকে উড়িতে পলাইবে। মাঠে মাঠে উক্ত-পাথরের ছাড়াছড়ি হইয়াও কাজ নাই। তাহা হইলে আর কীস কথা বাড়িলে না, আমাদের স্বর যার সব ভাঙ্গিয়া বাইবে। অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না বলিয়া, উক্ত-প্রস্তুত হইতে কেহ কখন লৌহ প্রস্তুত করে না। কিন্তু চুষক পাথর সেরণ নয়। চুষক পাথর অনেক পাওয়া যায়, আর ইহাতে অধিক পরিমাণে লৌহও থাকে। চুষক পাথর আর কিছুই নয়, কেবল লৌহ ও অক্সিজেন সম্বলিত একটা যৌগিক পদার্থ। চুষক পাথরের এককমত ভাগে ৭২ ভাগ লৌহ ও ২৮ ভাগ অক্সিজেন। সুইটা প্রস্তুত এই পরিমাণে থাকিলে, তাহাকে বিশুদ্ধ চুষক পাথর বলিতে পারি। কিন্তু তা প্রায় ঘর না, ইহাতে অস্বাভাব্য মিশ্রিত থাকে, যথা—হাইড্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম, আলুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, স্যাণ্ডনেসিয়াম, গন্ধক, ক্ষুদ্র স্তর ইত্যাদি। যাহা হোক, লৌহ হইলেও চুষক প্রস্তুত হইতে অনেক লৌহ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। পুখির উত্তারামশই এই পাথর অধিক পাওয়া যায়। নরওয়ে, সুইডেন, রুশ, সাইবিরিয়া ও উত্তর আমেরিকায় ইহা রাশি রাশি পড়িয়া আছে। সেখানকার লোকে ইহা হইতে মোহা বাহির করে। সুইডেন দেশে ডানিয়েটা নামক স্থানে লোকে একটা বর্গ করিয়াছে, ১০০ হাত দীর্ঘ, ১০০ হাত প্রস্থ ও ৩০ হাত গভীর; এই বর্গ হইতে চুষক পাথর তুলিয়া তাহার অতি উত্তম লৌহ প্রস্তুত করে। এই লৌহ প্রতিক্রমের বিব্রাতে অনেক আমানি হয়, বিব্রাভের লোহেরা তাহা হইতে ইষ্টাভ প্রস্তুত করেন। ভারতবর্ষেও সুইডেন দেশীয় লৌহ আমানি হইয়া থাকে, তাহাকে সুইডিশ আইরন বলে, ইহা চুষক পাথর হইতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষের নানা স্থানেও চুষক প্রস্তুত আছে। মাদ্রাজ প্রদেশে নামক স্থানায় ইহা অনেক, এমন কি সেখানকার ছোট ছোট সমুদ্রে চুষকগুলি এই চুষক পাথরেই পরিণত। কোটি কোটি মোল চুষক পাথর সেখানে বিস্তৃত আছে, আর পূর্ব কাল হইতে লৌহও উদ্ধৃত হইত। কিন্তু আজ কাল সেখানে কাঁচ ও কয়লা বড়ই অস্বাভাব্য।

কিছু দিয়া তৈরী এই পাথরকে মোড়াইতে হইবে, তখন সে লৌহ ভাঙিয়া অপর্যাপ্ত পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে। তা, সেখানে এমন কিছু

নাই, যা দিয়া পোড়ায়। সে জন্ম একপ্রণ, তাহা লৌহময় প্রস্তুত রূপা পড়িয়া রহিয়াছে।

শেখুলার লৌহ প্রস্তুত এক জাতীয় প্রস্তুত আছে, তাহাতেও প্রচুর পরিমাণে লৌহ থাকে। ইহা সেথিতে বিশুদ্ধ ধাতুর রূপে উজ্জ্বল। ভূমধ্যসাগরে এখা নামক যে দ্বীপ আছে, সেখানে অতি প্রাচীন কাল হইতে, এই প্রস্তুত হইতে লৌহ নিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছে। এই লৌহ উত্তম পুখি বালিয়া সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। বিশুদ্ধ শেখুলার প্রস্তুত ১০০ ভাগে ৭০ ভাগ লৌহ থাকে, ৩০ ভাগ অক্সিজেন; কিন্তু লৌহময় যৌগিক প্রস্তুতসমূহ একবারেই বিশুদ্ধভাবে সেথিতে পাওয়া যায় না। এই ভূমণ্ডলে চারিদিকে অপর্যাপ্ত নানাবর্ণ মূল পদার্থ বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে। তাহার কেহই একেটা থাকিতে ভালবাসে না। তাহাদের অণু পরমাণু সর্বস্বত্বই এই চিত্তা, কেথায় যাই, কার সঙ্গে পরিচয় মিশি। আজ এমির সহিত মিশিতেছে, কাল সেটির সহিত মিশিতেছে। আজ এখানে মিশিতেছে, কাল সেটাকে ছাড়িতেছে। অপর ভূমণ্ডলে এই রহস্ত চলিতেছে। মনুষ্য শরীরীটা মূল, কোট কোট অণু পরমাণু, কোট কোট কোষ-শরীর দ্বারা ইহা গঠিত। মূর্খমূর্খ কোট কোট অণু পরমাণু, কোট কোট জীবাশ্ম এই যে মনুষ্য-দেহে সংলুপ্ত হইতেছে। কান-প্রাপ্ত হইয়া আবার মূর্খমূর্খ ইহা হইতে তাহার বিকৃত হইতেছে। মূল ও যৌগিক পদার্থের সমাবেশ-বিচ্ছেদ লইয়াই রাসায়নিক শাস্ত্র। পদার্থ-সমূহের গুণাগুণ লইয়াই আধুনিক শাস্ত্র। কাহার কি স্বভাব, কে কি চায়, কে কি করিতে পারে, এই জানই মনুষ্যের যুক্তি। জানিলে মনুষ্য ধরাদামের অধীশ্বর, না জানিলে হুড়মোহা শিশুর জায় নিমস্বায়। এই অণু পরমাণু বিচ্ছেদ-সংযোগের ভিতর আরও কত সুন্দর কথা রহিয়াছে। কেহ কেহ নামাত্র একটা বস্তুকে রেখেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাও দর্শন করেন, এই জগৎ সমুদায়ের সমস্ত লীলা সেই সামান্য বায়ুকারণের বেলাতেই প্রত্যাক্ষ। তাহাদের চক্ষে আহার, নিদ্রা, ভয়, সৌন্দর্য, কাম, মেঘন, মোহ, মোহ, মাদামের বন্দকী এই “সাধারণ” মনুষ্য-জীবনের সাধ-আজ্ঞা, সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম সকলই বাণকের জটীক বালিয়া বেদি হয়। পৃথিবীতে যে মনুষ্য মূল পদার্থ বিকৃতভাবে

রহিয়াছে, সুবিধা পাইনেই তাহার। অল্প পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয়। তাই, শেখুলার প্রস্তুতের কেবল লৌহ ও অক্সিজেন না থাকিয়া, ইহার সহিত অস্বাভাব্য পদার্থ সংলুপ্ত থাকে। এক জাতীয় শেখুলার প্রস্তুতকে হিমাইট বলে। ইহা আবার দুই প্রকার, রক্তবর্ণ ও কটাবর্ণ। লাল হিমাইটের গায়ে খাঁটু মালিশ লাগান্য পড়ে, আর ইহাকে ঝঁড়া করিলে, কখনও চূর্ণে পরিণত হয়। তার জন্ম ইবার নাম রক্তবর্ণের হিমাইট। যে রক্তবর্ণ হিমাইট গুলি নরম ও মাটির মত দেখিতে, তাহাই আমাদেয় লালমাটি, পেরিমাটি ও হিরিমজি। বর্ধমান, বায়ভূম অঞ্চলের মাটি কিয়ৎপরিমাণে রক্তবর্ণ। ইহার সহিত অক্সিজেন-সংলুপ্ত লৌহ মিশ্রিত আছে বলিয়াই ইহার র্বর্ণ এতপ্রণ। শীত-কালের প্রত্যকালে শীতে ব. কুরিয়া যখন বায়ুকে স্বহৃদে গ্ৰস্ত করে—হে—হে—হে—শীত আপনি উত্তর হইয়া আমাদেয়ের গৌরব প্রদান করুন—এই স্বরে বর্ধমানের লালমাটির কণাটি ভুলিতে পাইতাম, তখন চক্ষে দেখি মাটি। বিপাকিত কাপড়ের প্রসারে এখনও স্বরটা আর বড় ভুলিতে পাই না। কিন্তু পূর্বে যখন এদেশের অনেক স্থানেই কেবল “আহ তাহা কৃশাৎ শীতের পরিচায়ক” ছিল, তখন বায়ু-মালিকা-মূল-নিপুত এই স্বহৃদেই হুড়মোহা গুলি ভুলিতে পাইতাম। “আর গৌরব যেনে ছালা বিল যেনে—অবশেষে যেনে হইত—যেনে—”পর্যন্তের রাজা মাট, বুড়িক ছাড়াই শুধু কাট।” ছেলেরা জানে না যে, বর্ধমানের রাজমাটির জন্ম বুড়ির কিছুমাত্র অপর্যাপ্ত নাই। একজা যদি কাহারও অপর্যাপ্ত থাকে, তা অপর্যাপ্ত অক্সিজেন ও লোহার। সুইটা-লৌহ-প্রস্তুতও একজাতীয় হিমাইট। ইহা সেথিতে অনেকটা “অর্জবের ছায়া। কটা হিমাইট তিন প্রকার—টপাইট, মোমাইট ও লাইমোলাইট। কটা হিমাইটই সুতিকার ছায়া সেথিতে, তার জন্ম ইহাকে প্রস্তুত বলিতে পারি না। অস্বাভাব্য লৌহের আকর অপেক্ষা ইহায়ে জলের ভাগ কিছু অধিক। নামাত্র লৌহ-প্রস্তুত, পুটিয়া, তার পর হাড়াবিশের মনুষ্যমূল মিশ্রিত হইয়া, কটা হিমাইটেতে উৎপন্ন হয়, একপ্রণ সীদ্ধান্ত হইয়াছে। যে প্রস্তুত, লৌহ কার্বন ও অক্সিজেন-সংযোগে হইয়াছে এবং যে প্রস্তুত, লৌহ ও গন্ধক সংযোগে হইয়াছে, ইহারিণের অণু মিশ্রিত হইয়াই কটা-হিমাইট মজার

দিতে সাহস করিবে না। সেই জন্তই এত কথা বলিলাম।

উপরিউক্ত কোশানি আপনাবিগেণে কথাবানার ঘরে বোধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা কিছু মন্ব হয় নাই। কিন্তু সে লৌহ বিলাতি পোতা নৌহের মত ততটা উৎকৃষ্ট হয় নাই। মতচারের যে ঢালা লৌহ বিলাত হইতে এসেছে আসে, তাহার মত হইয়াছিল। কারখানা বালিয়া প্রাচীরে শেষ পর্যন্ত ইহার তিন লক্ষ পঞ্চাশ বাছার মোশ লৌহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম প্রতি মোশ লৌহ প্রস্তুত করিতে তিন টাকা করিয়া খরচ হইতেছিল। ক্রমে বত অভিজ্ঞতা লাভ হইতে লাগিল, খরচও ত কমিয়া আসিল। শেষ কালে প্রতি মোশ লৌহ করিতে ১০ টাকা খরচ পড়িতেছিল। কাজ যদি চলিত, তাহা হইলে খরচ বোধ হয়, আরও কম হইয়া আসিত। রাষ্ট্রপতির নিকট লৌহ করিতে যে প্রস্তর পাওয়া যায়, সে সকলে সমানভাবে লৌহ থাকে না। যে কোশানি রাষ্ট্রপতি এতদধন ধরিয়া বলিতেছিলেন, তাহারো যে প্রস্তর হইতে লৌহ বাহির করিবে, তাহাতে শতকরা ৬১ ভাগ লৌহ ও অল্পকেনে জড়িত হইয়াছিল, শিলিকন বা বালুকার মূল মশভাগ ছিল, আলুমিনিয়াম বা ফটিকির মূল ৫ ভাগ ছিল, বাকি জালা, ম্যাঙ্গেনিস, ম্যাগনেশিয়াম, কল্ডরস, গন্ধক ইত্যাদি। এই রাষ্ট্রপতির আর এক প্রকার প্রস্তর পেড লৌহের মতো পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল। তাহাতে লৌহের ভাগ কম। লৌহ ও অল্পকেনে জড়িত হইয়া শতকরা ৪৯ ভাগ, শিলিকন ২৫ ভাগ, আলুমিনিয়াম ১২ ভাগ, ক্যালসিয়াম ৭ ভাগ বাকি অশুদ্ধ পদার্থ।

জমজুমিত যে কয়টা পাত ইহার লৌহের জন্ত রাখিয়াছেন, তাহা শেষ হইয়া গেল। কাজেই আমাকে এখানে চুপ করিতে হইল। প্রথম প্রথম আমাকে নানারূপ বাজে কথা বলিতে হইতেছে। ক্রমে তাহা কমিয়া আসিল।

ক্রীত্বৈলোকানাপ মুখোপাধ্যায়।

বাজীকর-রামজীবন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শারদীয় উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রবাদী কর্মচারীরা পুজার কয়েকদিন ছুটিতে আশ্বায়-বজ্রের সমবাস-স্থ পুজোত্রপ করিয়া আপনাপন কর্মস্থানে গাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। কেহ রেলপথে, কেহ জলপথে, কেহ বা স্থলপথে—পাকী বা গো-বানে, কাধেও বা পদচক্রে বাইতে হইবে—তাঁহার জন্ত সকলেই বন্দোবস্ত করিতেছেন। এই সময়ের কোন-একদিন প্রাতঃকালে বায়ু চন্দ্রনাথ শর্মা কলিকাতার বাগবাছারের বাটে বাড়াইয়া আসেন। মাঝিরা তাঁহাকে চারিদিকে ঘোরিয়া কেহ বলিতেছে—“আমি যুব-শ্রী পঞ্চদ্বিা দিল, আমার নৌকা ‘আহান’ না।” কেহ বলিতেছে—“আমি সকলের আগে পৌছিয়া-নি, আর সকলে যাহা লইবে, তাহা হইতে এক টাকা কম লইব, আমার নৌকাই কোন কষ্ট হইবে না।” কেহ তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিতেছে, কেহ বা তাঁহার হাতের ছড়িঝাড়াটা লইয়া বাইতেছে। এইরূপ বাণ ক্রমাগতিতে ঘেরিয়া চন্দ্রনাথ বাসকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফুটিয়াছে। তিনি কাহার নৌকার বাইনে, কাহার সঙ্গে-কিরূপ চুক্তি করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অবশেষে অনেক কষ্টে, অনেক নান্দনা ভোগ করিয়া, শেষে এক নাটুরে মাঝির নৌকায় বাওয়া স্থির করিলেন। অজ্ঞাত বৎসরে তাঁহাকে ১২ টাকা করিয়া নৌকা ভাড়া দিতে হয়, এবার অন্ততপূরে বাইতে কেবল-মাত্র ৭ টাকা দিতে হইবে। পাঁচ টাকা কম হইয়াছে বলিয়া তিনি কিছু হঠাৎকরি বাড়া দিবারা আসিলেন। আবারাও কর্মস্থানে যাইবেন স্থির করিয়া তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবুর ব্রাহ্মণহুলে জন্ম। বাড়ী কলিকাতার বাগবাছারে। তিনি গৌরবর্ষ। শরীর নাতি দীর্ঘ, নাতি বর্ষ। হস্ত পদ মধ্যম হুগোল, সম্পূর্ণভিত্ত। বিকারিত চক্ষু; নিচোল ললাট। বড় শাস্তমুদ্রি। বয়স উত্তীর্ণ বৎসর হইবে। বৌদনকাল এখনও দিয়া যায় নাই তাই শরীর বৌদন-হলে এখনও সম্পূর্ণ বলিষ্ঠ। চন্দ্রনাথ বাবুর প্রথম স্ত্রী গর্ত; আবার দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং

একটা পুত্রসন্তানও হইয়াছে। তিনি অমৃতপুরের জমীদারের নাসব। জমীদারী-পরকারে বেতন অধিক না হইলেও, তাঁহার আর বেশ ছিল। তিনি কখন কাহার উপর জম্বু-জবরদস্তি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন না, অথবা এজারা হ-ইচ্ছার বাহা দিত তাহাতেই তাঁহার পর্যাপ্ত হইত। বাইতে প্রতিবৎসরই চুপোপস হইয়া থাকে; এবারও হইয়াছিল; সেই উপলক্ষে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন; এখন পুজাসময়ে ঢাকার দ্বারা অন্ততপূরে বাইতেছেন। আজ চন্দ্রনাথ বাবু কিছু বাস্ত-বাস্ত, পেটরা, সব গোছাইতেছেন—পাঁঠির বাইতেছেন, এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার আশ্রয়েরাও তাঁহার কার্যের সাহায্য করিতেছেন। বেলা ১১ ঘটিকার মধ্যে আহারাদি করিয়া দ্বীপক্ষে সঙ্গে করিয়া শকটযোগে বাগবাছারের বাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আর কোন লোক ছিল না। মাঝিরা তাঁহাদের অপেক্ষা করিতেছিল, তাঁহার নৌকা-রোজ কবিবামত নৌকা ছাড়িয়া গিল। নৌকার ভিতরনাট, একজন মাঝি ছিল। নৌকা পঞ্চপর্থে আসিবারাত্র মাঝিরা “দরিয়ার পাঁচপীর বদার বদার” করিয়া উঠিল। নৌকা হুতু-হুতু-হুতু দাঁড়ীয়ার বিশাল উদয় দিয়া তরঙ্গিত-তরঙ্গ-বিভিন্ন করিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। অতঃপর-পলনে চলিত হইয়া পান্দুপানী সীতাই সহর ছাড়িয়া গেল। এমিকে হৃদয়ে মথ্যাছে বিখার-কর প্রচণ্ড ক্রিয়ের জগৎবাদীকে উত্তপ্ত করিয়া নিজে তেজোহীন ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; এখন আর তাঁহার তত প্রচণ্ড ক্রিয় নাই, তেজও নাই, তাই লিখিয়া চন্দ্রনাথ বাবু নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ছাতের উপর বসিয়া নদীর মোড়া দেখিতে লাগিলেন। নদীর জল অগাধ, অসীম, ক্রোড়ায়ন,—অসংখ্য অগিরল গাভী, মনোমগ্ন অগাধ উদ্ভী-রাশি বিচুড়িত হইয়া চলিতেছে। ছোট বড় কত নৌকা পণ্যভার-সমাহিত হইয়া অতি নব্বয়-বমনে ফেলিতে চলিতে আপন আপন গন্তব্য স্থানে বাইতেছে। নদী উভয় কূল প্রাণিত করিয়া বাইতেছে, বিয়ান নাই, বিয়ান নাই, কাহারও প্রতি দৃষ্টপূর্ণও নাই। অবিরামই চলিতেছে। বাটে বাটে লোক, সকলেই আপন আপন কার্যে ব্যাপৃত। নদীর উভয় কূলে কোথায় বা বহুদূর-প্রসারিত প্রান্তর, কোথায় বা স্থবিত্ত নন্দাতিয়াম

হরিৎবর্ণের শজঘেত্র, কোথায় বা নিবিড়-কুম-বৃক্ষশ্রেণী নিশেপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কত শত জলচর পক্ষী মহানদে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আর চন্দ্রনাথ বাবু বেগপ্রবাহিণী বিপুল জল-করোয়ানী স্রোতস্তীরে অনন্ত বীটামালায় হৃদয়ের গন্তীর ঘর এক মনে ভনিতো ভনিতো বাইতেছেন। অকৃত্রিম এই অপরূপ রূপমায়ী দেখিয়া তিনি স্তম্ভ, বিমোহিত এবং মুগ্ধ। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহাদের নৌকা একটা খালের ভিতর প্রবেশ করিল। চন্দ্রনাথ মাঝিকে বলিলেন, “এখানে কেন আসিলে? তিন এতকাল অমৃতপুরে আসিতেছেন, কিন্তু কখন এখান দিয়া ত যান নাই, তেমনটা বোধ হয় ভ্রমকেনে এই খালের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।” ইহার উত্তরে মাঝিরা বলিল,—“সকল মাঝিতে সকল পথ জানে না; এই খাল গিয়া গেলে আমরাও একদিন পূর্বে অমৃতপুরে পড়িতে পারি। আমরা এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট বিশেষরূপে চিনি, আপনি এ বিষয়ে নিশ্চয় হইয়া যাবেন।” চন্দ্রনাথ বাবু থাকিলেন হেঁসেণ্ডা, তাঁহার এ পথ জানা ছিল না। তাঁহার মনেও কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইল না। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিলেন। নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

এ দিকে দিবা অবসাদ-প্রায় হইয়া আসিল। অস্তপানোমুখ দিবাকরের আরম্ভে গোচনে দেখিয়া অকৃত্রিম নিস্তম্ভভাব প্রায় করিতে লাগিল। পক্ষীপাল নীড় অথেষ্টে চলিল। কৃষকেরা আপনাদের নৈশলিন কাপ সমাপন করিয়া গৃহাভিমুখে বাইতে লাগিল। এমন সময়ে মাঝিরা ধামের একদিকে নৌকা ভিড়াইয়া নৌদর-করিল। চন্দ্রনাথ বাবু তাহাদের জিজ্ঞাস্য করিলেন, “তোরা এখানে কোথায় করিলে কেন?” মাঝিরা বলিল, “সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এই গ্রাম হইতে কিছু দূর চাল ভাল আনিয়া রবিবার উৎসব করিয়া দিই।” এই কথা বলিয়া প্রথম একজন লোক চলিয়া গেল। কিছুদূর পরে আর একজন দীড়ী পূর্ববাচ্চির অধুসরণ করিল।—তাঁহার কিছুদূর পরেই তৃতীয় বাচ্চিও নৌকা হইতে উঠিয়া ইতস্ততঃ করিতে সেও চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ বাবুর মতে উভয়ও কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। তিনি নিশ্চিন্তমনে নৌকা বসিয়া আছেন।

কিছুক্ষণ পরে মাঝি বলিল, “কতী! অনেকক্ষণ হইল, ইহার। তিনজনে জিনিষপত্র পরিবেশে গেল, এখনও আসিতেছে না কেন বুঝিতে পারিতেছি না, আমি তাহাদের তলসে বাই।” চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, “আর! অধিক বিলম্ব করিও না, শীঘ্র তাহাদের ডাকি।” আমি “আজ্ঞা! হ্যাঁ! কতী! আমি তাহাদের এখনই ডাকি।” আমিও ছিলাম, কিছুই ঘের হইবে না;—এই বলিয়া সেও নৌকা হইতে উঠিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যথ্য এক্ষণে অন্তর্নিহিত হইয়াছে। তাই দেখিয়া সম্ভ্রান্তকরা কপালে একটী উজ্জ্বল তারার টিপ পরিয়া চারিদিকে শোভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল। প্রকৃতির শোভা আরও সুবর্ণভিত্তি করবার জন্ম ক্রমে সেই নিবিড় ‘নীলাকাশে’ একটী একটী করিয়া নক্ষত্র হুটুতে আরম্ভ হইল। আবার কদাচিত্ত কালমেঘ এক একবার ভাষা আঘাত করিয়া কেহনিত লাগিল। বোধহইল, তাহার। মনে লজ্জাবতী নব্যোচ্চাসবরণ ‘গ্রাম’ উপর হইতে পৃথিবীর ‘শৈশ শোভা’ দেখিবার জন্ম এক একবার অবগুণ্ঠন উদ্ভুক্ত করিতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, তথাপি অনেকগুলি মাঝিও কিরিয়া আসিল না দেখিয়া, চন্দ্রনাথ বাবু কিছু বিমোহ হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তাহার। “এই আসিতেছি” বলিয়া চলিয়া গেল, অথচ এখন পর্যন্ত তাহাদের এক জনেরও দেখা নাই, ইহার কারণ কি? তাহার। কি সত্য সত্যই জন্মসময়টী কিনিতে গিয়াছে? না তাহাদের অজ্ঞ কোন দুঃখভিক্ষা আছে? তিনি মনে মনে কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু মাঝিদের বাড়িতে বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের মনে উদ্বেগ বৃদ্ধিতে লাগিল। এতদিন আর এক ‘হানে স্থির হইয়া’ বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া তাঁহার ত্রী তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু জালিলেন, প্রকৃত কথা বলিয়া অনেকের মনে তাঁহার ভ্রান্ত উপলব্ধি করেন; সুতরাং নিবন্ধ মন্তব্যে দুঃখ্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “আজি আশ্রয়-যজ্ঞমক্ হুজিয়া বাড়ী হইতে আসিয়াছি, তাই মনটা কিছু ঢলান হইয়াছে।” “স্মারি এই কথা শুনিয়া পতিভ-প্রাণা-হিস্তময়ী তাহাি বুলিল। তাঁহার মনে কোনরূপ

সন্দেহ স্থান পাইল না। শেষে তিনি পুত্রটী কোলে করিয়া সোহাগ করিতে লাগিলেন। ওরিকে চন্দ্রনাথ বাবু মুখে বাহাই বস্তু, কিন্তু তাঁহার মন নানাপ্রকার উত্তেজনা, নানাপ্রকার চিন্তার মণ্ডিত হইতে লাগিল। তিনি আর নৌকার স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁরে উঠিলেন। ভ্রমার বেশিলেন চারিদিকে রুদ্ধবাহী, প্রাণিহীন, শোহাহীন সুবিশুভ প্রান্তর পু. দ. করিতেছে। নিকটে লোকালয়ের কোন চিহ্নই তিনি দেখিতে পাইলেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনের উদ্বেগ আরও বিগুণিত হইল। কি করিলেন, কি হইলেন—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বালের দূর দিয়া মনুষ্য গত্যন্তরে জন্ম-একটী সন্ধ্যা পথ রহিয়াছে। দেখাশোনা তিনি স্বপ্নকেন্দ্রক পথ্যন্ত পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অথচ সেই সময়ের মধ্যে পথবাহী এমন কোন লোকই তাঁহার দৃষ্টিগোচরে পথিক হইল না যে, তিনি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন। বাল দিয়া কোন নৌকা যাই-ছেছেও না, আসিবেছেও না, কিংবা কোথায় নদ্রপ করিয়াও নাই। চন্দ্রনাথ বাবু সেই জনশূন্য প্রান্তরে একাকী চিন্তাভিনিবিশি হইয়া পদচারণা করিতে করিতে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের কথা তখন তত মনে ছিল না, তাঁহার সেই ত্রিমেঘ-পতী প্রণাবিক পুত্রের আসন্ন বিপদের কথাই মনে হইয়া যত্নবীর আঁধার হইয়া পড়িতে ছিলেন। তাঁহার চিন্তাসমুদ্র ললাট দিয়া দেদ নিশি হইতেছিল। “আর। প্রাণে, পদচারণা করিতে সেই স্বপ্নবির পতি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুঃখনিধান, বিপদভঞ্জন, মনুষ্যদমনক ময়ন করিতে গুলিলেন। চন্দ্রনাথ পুরে তিনি দেখিলেন, দুঃখবীর হইয়া দুঃখবীরের ভরুক হইয়া একটী লোক, তাঁহার নিকটে আসিতেছে। ক্রমে লোকটী তাঁহার সম্মুখীন হইল। চন্দ্রনাথ বাবু মাঝার ছায়া রক্তপায়িতক-পলায় পরিল। মধ্যরাত্রে সেই হানে বেড়াইতেছিলেন; সুতরাং তিনি যে দ্রাক্ষ, তাহা আর কাহারও পরিচয় দিবার প্রয়োজন ছিল না। আগন্তুক দেখার সমাপদবর্তী হইয়া তাহাকে প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি নিমিত্ত এই জনশূন্য বিপদময়স্থল হানে একাকী বেড়াইতেছেন? চন্দ্রনাথ বাবু ভা-ক্লিষ্টবদনে, তাহাকে আপনাদের উপস্থিত বিপদের কথা সকল বলিলেন। আগন্তুক তাহাকে বলিল, “এই প্রান্তর দূর হইলে লোকালয় আছে, সেখানে প্রায় প্রায় সকল লোকই ডাকাইত। দয়াধূবি

করিয়া তাহার। জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। আর তাঁহার নৌকার মাঝিরাও নিশ্চয় ডাকাইত। এই অনুমুখণে বাইবার পথ নাই। তাহার। প্রবন্ধনা করি। এই পথে আসিয়াছে এবং তাঁহাকে এই নির্জন স্থানে একাকী পাইয়া প্রাণ বিনাশ করত ক্কা-সর্বস্ব লুণ্ঠ করিয়া লইয়া যাইবে।” চন্দ্রনাথ বাবু এই কথা শুনিয়া ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি সেই বাজীকরকে স্বতী কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—“দেখ বাপু! ‘আজ’ হইতে তুমি আমার ধর্মপুত্র, যদি কোন প্রকারে আমার এই বিপদ হইতে আমাদের উদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলে, আশীর্বাদ তোমার কথা তুলিতে পারি না। আর দেখিতেছে, আমি তাক্ষ, তাক্ষপুত্র প্রাণ রক্ষা করিলে, তোমার যথেষ্ট পুণ্য হইবে, তুমি বাপু! আমাদের আজ রক্ষা কর।”

বাজীকর রামজীবন, জাগ্রিতে জাগ্রি, হুতরাং বিম্ব। হিন্দু-ধর্মের সাধারণতঃ বড় কামল, পেরাপেক্ষা করিতে স্বতই উৎসাহ; তাহাতে তাক্ষ বিপদগ্রস্ত, এমন স্থলে, সে কখনই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকাইতে পারে না। যাহা হোক রামজীবন এখনও বলিল,—“মহাশয়! আমি একাকী, আর তাহার। চারিদিক, এখন কে বলিতে পারে যে, তাহার। আরও হুই একজন সঙ্গে করিয়া না আসিবে? এমন ঠিকই আমি কি করিতে পারি? যদি নিকটে থানা থাকিত, তাহা হইলে, কোন উপায় করা বাইত; কিন্তু সেই থানা এখন হইতে হুই দূর। সেখানে যথায় গিয়া আসিবে সময় থাকিবে না, ইহার মধ্যে তাহার। আসিয়া সব লুণ্ঠ-পাট করিবে।” চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন,—“ইহা আমি সব বুঝিলাম, কিন্তু তাহা বলিয়া ত কিছু উপায় করিতে হইবে। আমি যদি একা হইতাম, তাহা হইলে, এক কাতর হইতাম না এবং এক ভাবিতামও না। আমার সঙ্গে আমার ত্রী ও একটী শিশু-সন্তান রহিয়াছে, তাহাদের কথা মনে করিয়া আমি নিতান্ত অধীর হইয়াছি। এই বলিতেছি, রামজীবন! আজ তুমি আমাদের এই দুঃখমুখ হইতে বাঁচাও।” চন্দ্রনাথ বাবুর এই কাতরোক্তি শুনিয়া, রামজীবন কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল। সে কি ভাবিল, বা কি স্থির করিল, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে সে বলিল,—“সম্মান আমি আপাকে পুত্র বলিলাম, তখন আমিও পুত্রের ছায়া রক্ষা করিব। যতক্ষণ আমি জীবিত থাকিব, ততক্ষণ

আপনার কেহই কিছুই করিতে পারিবে না; তাহার পর যাহা ঘটবে, তাহাতে আমার কোন হাত থাকিবে না। চন্দ্রন, আমার। তখনও নৌকার গিয়া যাই, সেনোদা! এখানে অনেক ‘আশা’ আছে।” এই বলিয়া চন্দ্রনাথ বাবু রামজীবনকে সঙ্গে করিয়া নৌকার উঠিলেন। রামজীবন তাহার হুইটা ভরুক হুই পার্শ্বের বাহিয়া আপনি তাহাদের মধ্যে থাকা বলিল। চন্দ্রনাথ বাবুর ত্রী এই উপস্থিত বিপদের কথা জানিয়া, ক্রমে ভীত এবং কাতর হইলেন, তাহার। বলা যায় না। তিনি মনে মনে ইষ্টনাম জপিতে লাগিলেন।

আমরা রামজীবনের এতদঞ্চ কোন পরিচয় দিতে পারি নাই বা অবসরও হয় নাই। রামজীবনের বাড়ী একসময়ে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ছিল। তাহার শিষ্যমক্ কটোপোলককে বহুসঙ্গে আসিয়া বস করে, তাহার পর আর তাহার। দেশে যায় নাই। এই কয়েক-পুত্রের এদেশে ‘পারক’ জন্ম তাহাদের চান্দ-চন্দন, কথাবার্তা অনেকটী বাদ্যাদিগের ছায়া হইয়া গিয়াছে।” কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার বল, হিজন, সায় কিছুই অন্তর্ভুক্ত হইতেছে না। নৌকার-নের আত্মকি কিছু দীর্ঘ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার। মায়িল নহে। কাত্তিও বড় কর্কশ। মুখখানি শুণ্ড-শুণ্ড-শোভিত। মাথায় একখান কাপড়ের পাণ্ডী, হাতে একপাখি লাঠি এবং একটী তুড়ুড়ু। হুই মুগি। সঙ্গে সেই হুইটা ভয়ঙ্কর ভালুক। তাহার। মনোবল সৌহার্দ্য আছে, যেকোন শোখা সন্ধ্যা নাই। এদেশে সন্ধ্যা ভিন্নির ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ় হইতে লাগিল। দুঃখ কোন বস্ত্তই এখন আর নদ্রগোচর হইতেছে না। নৌকার। মক্কাই পড়ার চিন্তাময়, তাহাদের। কখন। কি হইবে, কি করিয়া তাঁহার। এই নিমিত্ত হইতে রক্ষা পাইবেন, তাহাি ভাবিতেছেন। এমন ‘সময়’ একজন লোক এক দীর্ঘ লাঠি, কীয়ে করিয়া পাড়ের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সেইগল্প আর একজন লোক তাঁহার পার্শ্ব আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথম ব্যক্তি বোর জন্ম-গতীয়রে রামজীবনকে জিজ্ঞাসা করিল,—“নৌকার উপর তুই ‘কে’? রামজীবন নির্ভয়ে উত্তর করিল,—“আমি রাণুর চাকর।” প্রথম ব্যক্তি—“আমরা ত ব্যুরকে এতদূর আসিলাম, কে কোন চাকরকে আসিতে দেখি নাই।”, রামজীবন—“আমি ‘ইটা’ পথে আসিতেছিলাম বলিয়া দেখিতে পাও নাই।” এই

কথা পাড়িয়া কাজ নাই। যদি ত্রুক্ষক জগৎ-
কারণ বলিয়া, প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হইলে
তাহার সর্বজ্ঞতা প্রতিপাদন করা অসম্ভব; সর্বজ্ঞতা
সমগ্রাণ না হইলে তাহার জগৎকারণত্ব
সিদ্ধ হইবে না; জগৎকারণ আর সর্বজ্ঞ একই
কথা; ত্রুক্ষ জগৎকারণ না হইলে জগৎকারণ
হইবেন কিরূপে?—এই সর্বজ্ঞতা প্রতিপাদনের
জন্যই তৃতীয় স্তরের আশ্রয়,—

শাস্ত্রবোনিত্বাৎ ।

এই স্তরে একটা পদ; ইহার পদের আর
স্বতন্ত্র অর্থ করিবার কি; ব্যাখ্যাতেই ইহার পর্য্যাপন।
বাখ্যা।

তিনি শাস্ত্রের কারণ, অতএব সর্বজ্ঞ।

শাস্ত্র—আচার্য্য শাসন হয়, উপদেশ হয়, তাহাই
শাস্ত্র। বেদোনে যে শাস্ত্র থাকিল, বেদই সর্বশ্রেষ্ঠ,
মহত্তম শাস্ত্র বলিলে তদুপায় সর্বপ্রথমে বেদেরই
উল্লিখিত হয়। নৃত্যগীত, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন,
বিজ্ঞান, সকলই বেদের সম্বন্ধ; যোগ, বেদান্ত,
জ্ঞান, সাংখ্য ও বেদবহির্ভূত নহে; যুক্তি, মীমাংসা,
শাস্তি, অভিচার, সমুদয়ই-বেদের অন্তর্গত; হুতাশ
শাস্ত্র বলিলে প্রথমে-বেদেরই প্রতীতি হয়।
বর্ণশাস্ত্র, ধর্ম, যোগ, যজ্ঞ, জিহাদীক, তত্ত্বজ্ঞান,
ত্রুক্ষজন উপদেশ এই বেদই মহাভূত; এই
সমগ্রত উপদেশ দ্বারা—সেবকের মানন করা,
অসংখ্য “হইতে নিরন্তর” সংসংগে ধ্যান
করা যাহার বিশেষ সাধারণত্ব, শাস্ত্র বলিলে
তাহাকে—সেই বেদকে না বুঝিবে তাহার সুখিক কি?।
আত্মদলিগের সুবিস্তৃত ধর্মক্ষেত্রে বোধচক্ৰীয় ফল-
সম্পাদনোচিত, শাস্ত্রজ্ঞান-সমর্থিত, বনপরাবলী-
সামাল উত্তর-বুদ্ধি। কর্মই কলিগ ইহার
জ্যায় বসিয়া জ্ঞানপানিকের শীতল করিতে।
সুসমার-পরিচয় মানবগণ সেই জ্যায় আশ্রয়
লইবার জন্য কলিগের শরণাপত্ত হইতেন।
জ্ঞাত শাস্ত্র সেই বেদের পত্র পত্র মাত্র।
মানবের সর্বদর্শনজ্ঞান, পরমার্থ-প্রবেশ, অব্যাহত-
পাত প্রকৃতি অলৌকিক আত্মতা—যে সেগ-
শাস্ত্রের আশ্রয় প্রত্যন্ত-পরিচায়ক, যাহার ভাষ্যপত্র
মত অসংখ্যন কলিগ সর্বকর্তা সর্বজ্ঞ বলিয়া
স্বীকৃত, সেই যোগে বেদের অংশ ভিন্ন, বেদতত্ত্ব
নবপত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিত্যত্ব হুত-

পীড়িত ভোগ-বঞ্চিত দীনতম মানব যে কর্মক্ষেপে
কার্য্যের আদানান্নিভাগী বা তদলেকা উত্তরদত্ত
হইতেছে, সে কর্মের বেদ ভিন্ন আর কার্য্যের উপস্থিতি
নহে। সর্বগা কৌতোপম মহাযা যাহার প্রসঙ্গে
সেই সর্বগত, সর্বশক্তি-সম্পন্ন তৃতীয় ত্রুক্ষক
পরিণত হয়।—সেই অসামর্থ-বঞ্চিত, নির্বেপ, নির্বি-
কৃত সর্বকর্তার সহিত জড়েন প্রায় হয়, সেই
তত্ত্বজ্ঞানও বেদের প্রায়তম সজ্ঞান। তাই আচার
পালি, সেই মহাশাস্ত্র-বেদ দ্বারা হইতে উৎপন্ন,
তিনি যে সর্বজ্ঞ—ইহা বলাই বাধ্য। রাজ-
রাজেশ্বর হইলেও, মহাত্মপানিষ্ঠ পুণ্ড্রাঙ্গা হইলেও
যাহার অনতিমত কাণ্ড করিলে নীচাঙ্গ পিচ, অধম
হইতেও অধম হইয়া পড়ে, সেই প্রভাব-সম্পন্ন
বেদের অধিতীয় কর্তাকে সর্বশক্তিমানমিত সর্বজ্ঞ
বলিতে যদি ইচ্ছা না হয়, বলিতে ইচ্ছা না করিলে
অন্তরে যদি অন্তর সংকর না হয়, তাহা হইলে না
হয় বলিও না। পত্ন, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দানব,
মানব, দেব ও উন্মিরের কাঁচাকাণ্ড অবস্থা দানব
দীঘার অসীত; ত্রুক্ষচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্ম
ও ত্রুক্ষক ক্ষত্রিয় শৈল্প শূদ্র এই চতুর্ভাগী ও চতুর্দর্শ
দীঘার ইচ্ছিতে পরিচালিত; সেই সর্বপ্রভু সর্বজ্ঞ
বেদের কর্তা যে সর্বজ্ঞ ইহা না বলিলে যদি সম্ভব
হইত, ত না হয় বলিও না। কিন্তু প্রতিবাদী! একটা
কথা ভুল, পার্থিব, ব্যাকরণ প্রকৃত করেন, তাহাকে
যদি কেহ বলে পার্থিব, ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ-গওকৃৎ,
কোন অর্থটান যদি বলিয়া ফেলেন তাহার দণ্ড,
প্রমোদ দণ্ড পার্থিব কিছুমাত্র ছিল না; তাহা
হইলে বোকে কি সত্য সত্যই পার্থিবকে তথাপি
বর্ণজানহীন বোধ করিলে? কখনই না। প্রকৃত
বক্তাকেই বাতুল বলিলে। ইহা সকলই জানে,
ব্যাকরণে যতই জ্ঞান-রত নিহিত আছে; নিদান-
কর্তা পার্থিব তদলেকা অধিক রহে বিভূষিত ছিলেন,
অধিকতর জ্ঞান তাহার জ্ঞান-বস্তুর প্রভাবিত
করিত। হুতাশ প্রতিবাদী! সুমহাশার প্রত্যাবার
কর না কেন; মনে ও রসনার নিরন্তর সাধ্যম
করিয়া যে কথাই বাহির কর না কেন; শাহারা বেদের
বিষয় ভাষ্যকৃত, বেদের জ্ঞান সমাবেশনার বিকি-
দ্বারা অধিকার পাইয়াছে, বিম্ব-স্বস্তিত মনে যাহারা
বেদের বাড়া একটু ছন্দসম করিয়াছে; তাহারাই
মূলকর্তা বলিলে, অন্যতর জ্ঞানকে ভাবিলে, ভক্তিপূর্ণ
অন্তরে চিত্তা করিলে—এই-সর্বজ্ঞানময় শাস্ত্রের এই
সর্বপ্রভু বেদের অধিতীয় কর্তা নিরতিশয় সর্বজ্ঞ

সর্বশক্তি-সম্পন্ন; তাহার উদ্দেশ্যে কোটি কোটি
প্রণাম। তাহার জ্ঞানবস্তুর সহিত বলিলে,—

অতঃ পরে ভূতত্ত্ব নিরূপিত, বহুপদে—

ইত্যাদি (স্মৃতি)

এই সর্বজ্ঞানাকর জ্ঞানোদায় বৈদ্য, বিনি অমর
জ্ঞানোদয়ে নির্মাণ করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়াছেন,
সমাধিত মানবের নির্যাসের মত এই সর্বজ্ঞান-
প্রভু বৈদ্য যে মহাভূতের যে সর্বকর্তার অমর-
সমুদ্র বা মিথ্যাস, সেই সর্বজ্ঞকে কোটি কোটি
প্রণাম। যাহা হউক, এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইল যে,
ত্রুক্ষ বৈদ্যকারণ স্মৃত্তান্ত সর্বজ্ঞ।

আপত্তি ।

বেদ ত্রুক্ষ-প্রবীত বা ত্রুক্ষ-প্রকাশিত নহে।
কলিগই বেদের রচয়িতা। যে যে মন্ত্রে যে যে কবির
নাম আছে, তাহারাই সেই সেই মন্ত্রের প্রণেতা।
নচেৎ কলিগের নাম ত্রুক্ষ উন্মিরিত থাকিলে
কেন?

খণ্ডন ।

ত্রুক্ষই বৈদ্য-কলক; তবে যে কবি যে মন্ত্রে
সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বা সাধারণ সমুদ্র হইয়া
যে মন্ত্রে যে কবিকে ত্রুক্ষ ধারণপূর্বক দর্শন দিয়াছেন;
সেই মন্ত্রে সেই কবির নামোচ্চ আছে;—

বেদ যদুপায় দৃষ্টং সিক্তিঃ প্রাপ্তো হু যেন বে ।

মন্ত্রেণ তত্ত্ব সমুদ্রোক্তো মুনীর্বাৎসল্যস্বাক্ষকঃ ।

দৃষ্টপুণ্ডরাক-মাতৃভক্তি, ২য় অধ্যায়।

যে মন্ত্রে যে কবিকে দর্শন দিয়াছেন, যে মন্ত্রে
যে কবি সিদ্ধ হইয়াছেন, সেই মন্ত্রে সেই কবির
ভূম্যভ্যাকর্ষণ হইয়া থাকে। ভাষ্যপত্র এই যে,
যেইরূপ বৈদ্য প্রকাশ করিয়া, সাধারণ আচার্য্যশিষ্য,
অভিচারী কলি উপদানই মনুষ্যের পূর্বক
কবি-উদ্দেশ্য করিবার উদ্দেশ্যে। ফলতঃ কি—

স দিগ্যতে বেদমাতঃ স বেদঃ

করোতি ভেদেবর্ভুক্তিঃ সমাধনঃ ।

শাখা-প্রণেতা চ সমস্তশাখা

জ্ঞানস্বরূপা উপদানমতঃ ।

বিম্বপুণ্ডরাক, ২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়।

সেই প্রকাশ্য ত্রুক্ষই বৈদ্য, সর্বজ্ঞ। সর্বজ্ঞাধি-
রূপে তাহারই ভেদ হইয়া থাকে। বহুশাখাধিক
বেদ তাহারই প্রবীত। সেই ভাবনায় অনন্তই
বেদশাখা-কর্তা, বেদশাখা ও জ্ঞানস্বরূপ।

এই স্তরের আর একটা অর্থ আছে, যথা;—
পূর্বস্তুত্রে ত্রুক্ষের জগৎকারণতা কীর্তন হইয়াছে
যটে, কিন্তু মূল্যে কোন প্রমাণ, প্রদর্শন করা হয় নাই,
তুঃ অসমান দ্বীরাই কী তাহার জগৎকারণত্ব
সিদ্ধ হইবে, না অতঃ কোন প্রমাণ আছে; এই
আত্মতা “শাস্ত্রবোনিত্বাৎ” এই তৃতীয় স্তরের
অবতারণা। ইহার অর্থ এই—

শাস্ত্রশেষে শ্রুতি; আর বোনিত্ব প্রমাণ;
শ্রুতিই এখানে প্রমাণ।

কী তাই ইমানি জ্ঞানান্তর ইত্যাদি।

শিবজীর মাতৃভক্তি ।

আর ভারতের “সেবিন নাই,—যে দীন ভারত
সমগ্ন জগৎকে ছয়দিক দ্বারা গুলজনি ছাড়ে,—সে
দীন আর ভারতের নাই।—আর্য্য কলিগদের সে
পাণ্ডিত্য নাই; আর্ধ্য বীরগণের সে বীরত্ব নাই;
আর্ধ্য জ্ঞানিত সে পৌরব নাই।—আর্ধ্য-অভাব-
রূপ জলস্থ, স্থ্য নির্মাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। সত্য,
রোষ, রাগ, হিংসা—স্বভাব উজ্জ্বলিত রহিয়া, সেই
নিবের দীর্ঘপ্রাণ চিরপ্রাণী ভাষ্যমুক্তি, এখন
পোর অন্ধকার-পূর্ণ, কালের গভীর গর্তে, বিম্ব-
তির পঙ্খমো নির্মজ্জিত হইয়াছে। জ্ঞত পার্থ,
সর্বাঙ্গতা, অলেকা, কলহ, ঘে, হিংসা, আশ্রয়,
ঐশ্বর্য, বিবাস্যভ্যক্ততা, নাস্তিক্যপ্রকৃতি জ্ঞাতীয়
কলকে ভারত পরিপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতাবীর
চিরানন্দমতী, চিরশাস্ত্রাচারিণী, সর্বজনীন, মুক্তি,
সেই জ্ঞাতীয় কলহ-রূপে বিসর্জিত হইয়াছে।
ভারত, মৃত্যু-অবসারণ—কৈতব্ধহীন, পাণ্ডহীন,
গৌরবহীন, আনন্দহীন—নিবিড় অন্ধকারে,
শাশন-শয্যা যের নিদ্রাভুক্ত।

আজ মেগালয় আরম্ভের, ভারতের সার্ব-
ভৌম সম্রাট। ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর,
দক্ষিণ—সকলদিকই “আজ তাহার পদানত।
ভারতের ক্ষত্রিয়রাজ, স্বরাজ্যবোধিত, আশ্রয়,
শাস্ত্রবীর প্রকৃত বিম্বুতির অন্ধকারগর্তে তুঙ্গীয়া,
মোহনের প্রাণীকাজ্যের পুর নানানিত, মুখ-
বাতব্যস্ত—স্বজাতির প্রকৃত কলিগের আপনাদের
পৈশাচিক আশ্রয় পরিচরিত্ব মানন করিতেছেন।

সুতরাং ভারতের সর্বস্বিহই, মোগলসম্রাটের
খেচ্ছাকারি-প্রভুরূপে এতও ততঃপ্রবাহে প্রাবিত
করিয়াছে। ভারতের সর্বত্রই মোগলবিশ্ব-
নৃপতাক উভীয়মানা,—মোগলের জয়ধ্বনিতে
পরিপূর্ণ। কিন্তু এক অবশ্য চিরদিন বর্তমান
ধাকে না এবং চিরদিন সমানও যায় না।
ভারতের দক্ষিণাংশে, মোগলসম্রাজ্য-বিস্তারে এক
মহাবাহ্য উপস্থিত হইয়াছে। সেই মহাবাহ্য
“শিবজী”। শিবজী অস্পৃশ্য বীরত্ববলে, অতুল
মাহাদে, অসামান্য বিক্রমে এবং জাতীয়িক
অনুরাগে—“কর্ণাদশি” পরায়নী—পূর্বমাত্রী জম্বু-
ত্মির স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত, অসুত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
হইয়াছেন। তিনি, ভারতের দক্ষিণাংশে, অতল
নিরিরামের ভায়-দণ্ডায়মান হইয়া, লোকাতীত
তেজস্বিতার সহিত,—সেই হাজার-প্রাণবকারী,
মোগলসম্রাটের খেচ্ছাকারি-প্রভুরূপে এতও ততঃ-
প্রবাহের ক্ষিপণতি প্রতিরোধ করিতেছেন। র্তার
পরানীতায় গভীর শোচনীয় কাণ্ড, স্বাধীনতার
অসুমন্য চিরানন্দবাহিনী, বর্ষায় মূর্তি, এইরূপে
ভারতের একভাগে, মনোবিষয়মান বাণভট্টের ভায়
দশমিকি “বিস্মিত” করিয়া, বীরে বীরে একাম
পাইতে লাগিল। ভারতে নৈরাশ্র-বলি-বধ জ্বলনে,
সম্ভারি হ্রিহরারি সিক্তি,—উৎসাহের মন্যমান
মহারি বহিরা। মশান-শাখার-মাগি মমুর ভারত,
যেন একই কাগিয়া উঠিল।

শিবজীর অসুত্রে বীরত্বকাহিনী, ভারতের দশ-
মিকে ছড়িয়া পড়িয়াছে। মোগলসম্রাটের
ভাষার—সেই লোকাতীত বীরত্ব-কাহিনী, সমুদ্রক
মদে প্রবল রুজিতেছেন। আজ শিবজী, বীরত্ব-
মাহাত্ম্যে মহাবীর—রমণীয়? স্বতন্ত্র তিনি বীরত্ব-
বলিয়া, ভারতের নর-নারীর বনসায় রসুনায় কীর্তিত
হইতে লাগিলেন। “ভারতের সার্বভৌম সম্রাট,
আজগণের, আজ গভীর ভিত্তায় নিমগ্ন!—ভাষার
নিকট শিবজীর প্রতিপত্তি অসম্বাদন হইয়া উঠিল।—
“পূর্ববর্তীতে বীহার প্রতিভাতী দ্রুত, ভাষার প্রতি-
ভাতী কোথা হইতে আসিলে? যে অগ্নি, অধিক
দিন, হইল নির্মাপিত হইয়াছে, তাহা কি আবার
প্রকৃতিতে হইবে? ইহকন কোথায় পাইব? দুঃখই
মিথ্যা। হুজ্ব হিন্দুদার!—বুঝা চিহ্ন।” কিন্তু
হলয়,আগন্ত হইল না। “হর হর কানী”—অনি
এনে হার-হার উল্লাসে করিয়া, জয়ন্ত-রাজ্যে
প্রবেশ করিল। আবার সেই গভীর চিন্তা।—

“নির্মাপিত অগ্নিবাণ প্রজলনেদ্রুতী হইয়াছে।
সুতরাং প্রচুর ইন্ধনই জুটিয়াছে। ইহা উপেক্ষা
করিবার নয়। কি আনি, ইহাতে মোগলের ধ্বংস-
সম্বন্ধও পুড়িয়া তীব্রীকৃত হইয়া রহিতে পারে।
অতএব এনেনই ইহাকে নির্মাপিত করিতে হইবে।
পরন্তু অনন্ত আকাশমণ্ডলে, অনন্ত গ্রহ, অনন্ত
উপগ্রহ অবস্থিত করিতে পারে।—কিছু যথার্থ
বাচক।” ভাষার “প্রতিভাতী” বিজয় স্বর্গের
স্বরাযান,—অনন্ত হইলেও, আকাশে হইতে
পারিলে না।

সম্রাট আরম্ভজেন, শিবজীর পরাক্রম বর্ধ-
করিবার জন্ত, দামিণীভাতে অসুত্রে বাহিনী প্রেরণ
করিলেন। আবার হিন্দু-মুসলমানে ধোরত
মৎসংঘ উপস্থিত হইল। দামিণীভাতের সর্বত্রই
দুঃখান প্রবলিত হইয়া উঠিল। একবার শিবজী-
সংগঠিত দুর্গ, মোগলসেনা অধিকার করিতেছে;
আবার মোগলদুর্গ, শিবজী অধিকার করিতেছেন।
এইরূপ একবার মোগলের জয়, আবার শিবজীর
জয় হইতে লাগিল। দক্ষিণাংশ, সৈন্যদলভরে
প্রকম্পিত, অস্ত্র-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত, অস্ত্র-
প্রতিভার প্রদীপ্ত এবং যুদ্ধের ভৈরব গর্জনে পরিপূর্ণ
হইল।

আরম্ভজেনের সেনাপতি দশবংশ সিংহ, শিব-
জীর সিংহদুর্গ অধিকার করিয়াছেন; আজ শিবজী,
অহা পুনরধিকার করিলেন। বীরত্বের মহাপ্রাণ
শিবজী, আজ গভীর ভিত্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন।—
কিন্দমগ্ন বিধ্বংস করিয়া দুর্গপ্রাচীর কবিরার উদ্যায়,
নীরবে—গভীর ভাবে উদ্ভাবন করিতেছেন। সিংহ-
দুর্গ, সমুদ্রত পর্যন্তমালায় পরিবেষ্টিত; ইহার
চতুর্দিকেই হরারোহে পর্যন্তমশী,—অনন্ত নীলাকাশে
মস্তক ভুগিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার শিখর-
ভাগে একতরঙ্গ-উপবে, বোধ হয় যেন, অসুত্রে পিণ্ডে
শিব্য বিগলনা-সমকর্ণ জন্ত উদ্ভাবন হইয়া রহিতেছে।
এই দুঃখরোহে, প্রাকৃতিকপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত দুর্গ-
সিংহদুর্গ, আজ রজনীযোগে শিবজী অধিকার
করিলেন।

মহাবীর শিবজী, পরম মাতৃভক্ত ছিলেন। দুঃখে
গমন সমুদ্রের তীরে, অগ্নে পরমায়োধ্যা মায়ার চরণ-
ভলে মস্তক বিনুতিন না করিয়া, অস্ত্র ধারণ করিয়া
নন্দ। তিনি কলুসকণ্টক, প্রকৃতভাবে মধ্যমনিয়
ভাবনী জ্ঞানেই পূজা করিতেন। দুঃখমলে, শত-
কর্তৃক ঘোরতর আক্রান্ত,—মহা বিপদাপার হইলে

অমনি মহাবীরমহা জননীর মহামন্ত্রলময় অস্ত্রপ্রদ
মুখমণ্ডল এবং অনন্ত আশাসন্যায়ন, “অতল বিবাস-
প্রদ আশীর্ষকন যারণ করিতেন।—করিবার, অমনি
যেন এক অভিনব কার্যশক্তি,—নর বাহ্য, নব
উৎসাহ, নব অব্যবসায়, নব আশাভ্রাতৃ মস্তে
সিদ্ধান্ত করিয়া, “মাতৃভ” পরমোচ্চা করিতে পাই।
এই অভ্যাসি। যে মহাদেব। আপনার এই
সুহৃদন্ত, প্রথম মন্ত্রলময়, পবিত্র আত্মদ-মুখলে
এতও নব জেগেবাগি, লক্ষ লক্ষ করিয়া কলিয়া
উঠিত। তখন শতগুণ বাহ্যে, শতগুণ উৎসাহে,
শতগুণ অব্যবসয়ে, শতগুণ আশার বীরত্ব, সেই
অতল বিবাস-কনিত, অতল বসে বিপদবাহিনী
আক্রমণ করিতেন। সে আক্রমণ,—অনিবার্য।
বিপদসৈন্য অনন্ত হইলেও,—অসুত্রে-বলপ্রয়োগ
করিলেও, সে অনিবার্য ভাষণ আক্রমণে বাধ্য গমন
করিতে সামর্থ্যবান হইত না।—শিবজী জয় লাভ
করিতেন।

যিকিছুক সন্ন্যাস সমাজ। এনেনই আকাশ
জুজুটিকার সমাজের হইয়াছে। পৃথিবীতলও ধোর
অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন সময়ে শিবজী,
মাতৃ-সদিগলে উপস্থিত হইয়া, রক্তাভিনিপুটে
দণ্ডায়মান হইলেন। মাতা, প্রাণাদিক পুত্রের
অপাদানস্বত্ব নীরাম্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—
“বৎস! কুশল ত?”

শিবজী। আপনার আত্মদ-প্রসাদে, সর্বত্রই
কুশল।

মাতা। এইক্ষণে কিরূপ আশ্রয়ন?
শিবজী। আশীর্ষকন প্রাণে জন্ত।
মাতা। কোন দুর্গে জয় করিব?
শিবজী। সিংহদুর্গে জয় জ্ঞান করিব।
মাতা। বাহা?—
শিবজী। হা অমাই।

শিবজী, মাতৃচরণে প্রণত হইলেন। মাতা,
পুত্রের শতকারণ করিয়া আশীর্ষকন করিলেন।
শিবজী, ভাষণ বর্ণনা রমণীয়তৈ ধারণ করিয়া,
প্রায়টের বর্ষাভ্যাস মেঘাভ্যাসের ভায়,—ভক্তি-
স্নাত্তিক, গভীর শপে কহিতে লাগিলেন,—
“অননি। আপনাই আমার আরাধ্য দেবী,—অসুত্রে
রাজ্যের মহাশক্তি ভাবনী। আপনার এই বিপুল
শক্তিবাণী, জুজুটী সীমামিতা ভ্রাতৃতী মূর্তি, যেন
আজীবন অসুত্রে-মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাই।—
বেথিয়া বেথিয়া, আমি যেন অসুত্রে তেজ, অসুত্রে
বাহ্য শক্তি, অভয় স্বাধা এবং অনিনশ্রয় আশ্রয়

লাভ করিয়া,—“কর্ণাদশি পরায়নী”—জম্বুত্মিকে
দ্বাখ্য, ও সৌন্দর্য্য-দানে সামর্থ্যবান হই।
অনন্তর দশবংশবাসী,—একমণী, একপ্রাণ ভাতা-
সিদ্ধান্তও তেজ, শক্তি, স্বাধা, সৌন্দর্য্যপ্রভৃতিতে যেন
নিপুণত করিয়া, “মাতৃভ” পরমোচ্চা করিতে পাই।
এই অভ্যাসি। যে মহাদেব। আপনার এই
সুহৃদন্ত, প্রথম মন্ত্রলময়, পবিত্র আত্মদ-মুখলে
এতও নব জেগেবাগি, লক্ষ লক্ষ করিয়া কলিয়া
উঠিত। তখন শতগুণ বাহ্যে, শতগুণ উৎসাহে,
শতগুণ অব্যবসয়ে, শতগুণ আশার বীরত্ব, সেই
অতল বিবাস-কনিত, অতল বসে বিপদবাহিনী
আক্রমণ করিতেন। সে আক্রমণ,—অনিবার্য।
বিপদসৈন্য অনন্ত হইলেও,—অসুত্রে-বলপ্রয়োগ
করিলেও, সে অনিবার্য ভাষণ আক্রমণে বাধ্য গমন
করিতে সামর্থ্যবান হইত না।—শিবজী জয় লাভ
করিতেন।

যিকিছুক সন্ন্যাস সমাজ। এনেনই আকাশ
জুজুটিকার সমাজের হইয়াছে। পৃথিবীতলও ধোর
অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন সময়ে শিবজী,
মাতৃ-সদিগলে উপস্থিত হইয়া, রক্তাভিনিপুটে
দণ্ডায়মান হইলেন। মাতা, প্রাণাদিক পুত্রের
অপাদানস্বত্ব নীরাম্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—
“বৎস! কুশল ত?”
শিবজী। আপনার আত্মদ-প্রসাদে, সর্বত্রই
কুশল।
মাতা। এইক্ষণে কিরূপ আশ্রয়ন?
শিবজী। আশীর্ষকন প্রাণে জন্ত।
মাতা। কোন দুর্গে জয় করিব?
শিবজী। সিংহদুর্গে জয় জ্ঞান করিব।
মাতা। বাহা?—
শিবজী। হা অমাই।

শিবজী, মাতৃচরণে প্রণত হইলেন। মাতা,
পুত্রের শতকারণ করিয়া আশীর্ষকন করিলেন।
শিবজী, ভাষণ বর্ণনা রমণীয়তৈ ধারণ করিয়া,
প্রায়টের বর্ষাভ্যাস মেঘাভ্যাসের ভায়,—ভক্তি-
স্নাত্তিক, গভীর শপে কহিতে লাগিলেন,—
“অননি। আপনাই আমার আরাধ্য দেবী,—অসুত্রে
রাজ্যের মহাশক্তি ভাবনী। আপনার এই বিপুল
শক্তিবাণী, জুজুটী সীমামিতা ভ্রাতৃতী মূর্তি, যেন
আজীবন অসুত্রে-মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাই।—
বেথিয়া বেথিয়া, আমি যেন অসুত্রে তেজ, অসুত্রে
বাহ্য শক্তি, অভয় স্বাধা এবং অনিনশ্রয় আশ্রয়

বিশুদ্ধ হইয়া পড়িল বটে; কিন্তু বিচিত্র শিক্ষা-নৈপুণ্যে, পুনর্বার মুহূর্ত মধ্যে প্রতিলিখ ও নিশ্চিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিশুদ্ধাবস্থায় আক্রমণ করিল।—হিন্দু-মুসলমানে যোৱতঃ বুদ্ধ উপস্থিত হইয়া।

আবার হিন্দু-মুসলমানে যোৱতঃ বুদ্ধ বাখিয়াছে। উভয় সেনার যোৱা পড়িল পড়িলে, পড়িলে পড়িলে পড়িলে।—সেনা হইয়া প্রবেশে যোৱাওজন হইতেছে। যোগল-সেনার—“আমি আয়া হো আকবর” ধ্বনি, শিবজী নওরোণী সেনার—“হর হর মহাদেও—হর হর ভাবানী” ধ্বনির সহিত মিশিয়া, পৰ্ব্বতের গুপ্তে গুপ্তে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাহার মধ্যে মধ্যে, আয়োজকের ডাকল, উত্তর হইয়া সমুচিত হইয়া, মহাবীৰ্য্য শব্দে মিলিতকৃত পরিপূর্ণ কণ্ঠ, সৈন্য-কামের দূর দিগন্তে মিশিয়া যাইতেছে। উল্লেখ্যেব প্রকৃতিত, মহাশাখির আলোক ছটা, পৰ্ব্বতের কক্ষ শরীৰে নিপতিত হইয়া, বিম্বমুগ্ধ, জ্যোতিৰ্ভাষিত নৌশব্দেব পূৰ্ণাতি বিকীরণ করিয়াছে।—নিমিত্ত ঘনঘন পড়িল ক্রমরূপে, যেন রাধাধারী মিশিয়া, মিশিয়া জটীল করিতেছে। দেখিতে দেখিতে ছুৰীকী মৌল-সেনা, সৈন্য-প্রাণী মাগোলা-দিগের প্রত্যন্ত আক্রমণে,—ভীষণ অস্ত্রাঘাতে, ক্রমে ক্রমে অনন্ত, নিজস্ব অস্তিত্ব হইতে লাগিল। শিবজী বিজয়ী হইলেন। এলিকে প্রভাত উপস্থিত। নববিত্তিকর মূৰ্তি, তাহার এই প্রভাতে শিবজী বিজয় প্রভাত দেখিয়া, আশ্চর্য্য মনে এক অশ্রুপূর্ণ জীবন্ত নবীনরূপে সমুচিত হইলেন।—

হৈন এক অশ্রুপূর্ণ জীবন্ত নবীন হাদি হাদিয়া উঠিলেন। অনন্তত্বকী প্রকৃতিবদীও, যেন এক অশ্রুপূর্ণ নবীন-হাদি হাদিলেন। অনন্তর নব-প্রকৃতিবদীদিগের সহিত, নবীন উন্মাদে—নবীন অশ্রুপূর্ণ মিশিয়া আশ্রয়াদিগের উত্তরে নবীন হাদি, বিদিশনাগবেব প্রস্থ,—অনন্তত্বকী নবীন হাদির সহিত মিশাইয়া, অনন্ত নবীন হাদি হাদিলেন। সমস্ত মঙ্গল হাদি হাদিয়া উঠিল।—ভারতও হাদিয়া উঠিল।—শরৎকালীন বিহব অস্ত্রাক্রান্ত দৌলী, হেমন্ত ও শীতের নিম্নকণ-বিহব জর ভোগে কেমতা, জীবনী—কল্লাবাবশিষ্ট হইয়া এবং ক্রমে ক্রমে মৃত্যুসূত্রে গড়াইতে থাকে।—হাদি, সৈন্য, মনুষ্য প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হয়।—মৃত্যু-চিত্তায় জীবমৃত হইয়া পড়ে। এমন সময়ে, নীতায়

হইয়া, যদি বসন্তের আগমন হয়; বাসন্তী মন্য-নিল জ্বালাত হইতে থাকে; তবে সেই মৃত্যু-দৌলীও, যেন বসন্তবায়ু-সংস্পর্শে, নব পাশা লাভ করিয়া, এক অশ্রুপূর্ণ নবোৎসাহে পরিপূর্ণ হয়,—এক অশ্রুপূর্ণ নব আশায় এক অশ্রুপূর্ণ নব হাদি হাদিতে থাকে; তদন্ত শিবজী বিজয়প্রভাতে,—অন্যত্রা জীবন-বসন্তে ভারতও হাদিয়া উঠিল। হাদির ছতায় শব্দিত হইয়া প্রথম হইল। হুগলিখি, শিবজী নবীন বিজয়-পাতকা, নবীন সূর্যের বিস্তার, নবীন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া, প্রভাতে বিজয়-পতনে,—শিবজীবিব প্রকাশনে প্রকাশিত হইতে লাগিল। “হরহর মহাদেও, হরহর ভাবানী,—মাইকা জয়,—শিবজীকা জয়” বিজয়-সংবনে প্রভাতগগন পরিপূর্ণ হইল।

জ্ঞানকানায় চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষা আবিষ্কার।

ইতিপূর্বে মৎপ্রকাশিত বিবরণে নামক বৃহৎ অভিধানে ‘উপনিবেশ’ শব্দে লক্ষার বর্তমান অবস্থিত নিরূপণ করিবার জন্ত সংকল্পিত প্রমাণ-প্রয়োগ উপস্থাপিত করিয়াছিলাম; কিন্তু বিস্ময়জনক অন্তরত, বিশেষতঃ এতৎসম্বন্ধে সম্যক আলোচনা ‘উপনিবেশ’ শব্দেব অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় অনেক আশঙ্কায় কথা বলিতে পারি নাই। সেই সেই কথা সমগ্র বঙ্গবাসীকে জানান আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, উপস্থিত প্রস্তাবে স্বত্বভাৱী করলাম।

আমরা বালাকাল হইতে ভদ্রীয়া আদি-তেজি, রামচন্দ্র কপিলেশ্বর মন্ডে লইয়া সীতা উদ্ধারেব জন্ত লক্ষার গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই লক্ষা কোথায়? তাহার বর্তমান নাম কি? সেই লক্ষাপুত্রীর উৎপত্তি, তাহার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস প্রভৃতি আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা অনেকেই অগণত নহি। এই পুরাকান্দী জনিত তে কাহা না ইচ্ছা হয়? বর্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় ভৌগোলিকগণ একব্যকো বলেন, এখন যাহাকে আমরা সিংহল বা সিংগল বলায় থাকি, তাহারই প্রাচীন নাম লক্ষা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সহজ বলিয়া বোধ হয় না। অতি পূর্বকাল হইতেই আমাদের পুরাণাদি-শাস্ত্রকাব্য

লক্ষা ও সিংহলকে দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই জ্ঞানিতেন। নিম্নলিখিত শ্রোতৃকণি দর্শন করিলেই সমস্তের সম্বন্ধে দূর হইবে।

“সিংহলানু বর্ধমান ক্ষেত্ৰান্ন যে চ লক্ষানিবাসিনঃ।”
মহাভারত বন ৫১ অঃ ২২ সো।
“লক্ষা কালাজিনাটৈব শৈলিকা নিকটাপ্তাঃ” ২০
কথায় সিংহলাটৈব তথা কাশীনিবাসিনঃ” ২৭
মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮ অধ্যায়।

এতদ্বিধ ভাবপত্র ৫, ১১ ও ৩০, বৃহৎ-সংহিতা ১৪ ১৫, প্রকৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লক্ষা ও সিংহল দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে অনেক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সিংহলদ্বীপ যদি লক্ষা নয়, তবে লক্ষা কোথায়? তাহার শাস্ত্রীয় অমাণ কি?

রামায়ণে দক্ষিণদেশীয় হানাদির উল্লেখকালে লিখিত আছে—মলয় পর্বতের পরে তাম্রপর্ণী নদী, এই নদী সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদী উত্তর হইয়া পাণ্ডুনগর, এই নগরে পুথুরায় স্থবর্ণনির্মিত। পরে সাগরের নিকটে উপস্থিত হইবে, সমুদ্র পার হইয়া সাগরের মধ্যে অশ্বত্থ-নিবসিত সিংহলে পর্বত দেখিতে পাইবে। অপর পারে শতবোজন-বিন্দুত অভিশয় প্রভাত্যক একটি দ্বীপ আছে, এইখানে রাবণ বাস করে। যথা—

মলয়ত মহোদগঃ।

জ্যোতিষমন্ত্রাশমসম্প্রদায়নিবাসিনঃ।
ততঃসেনানাহুহুজাতাঃ প্রসময়ে মহানন্দা।
তাম্রপর্ণী, গ্রাহকৃত্যঃ ত্রিযম্যং মহানদীম্।
স। ভবনবর্মেভিত্তেঃ প্রকৃষ্টপাণ্ডুপাণ্ডিণী।
কান্তেব সুবতী কান্তঃ সমুদ্রমধ্যাহতে।
ততো হেমমল্যং দিব্যং মুকুটপাণ্ডিত্বমুতম্।
তুস্ত কপাটং পাণ্ডানাম্। বত। ক্রম্যতঃ বানরাঃ।
ততঃ সমুদ্রমালায় সম্প্রদায়ানিচয়ম্।
অগস্ত্যোদ্যত্রে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ।
চিত্রায়তনপঃ শ্রীমান মহেশঃ পর্বতভাগমঃ।
জ্যোতিষমন্ত্রাঃ শ্রীমান অগস্ত্যঃ মধ্যাহণম্।
দ্বীপস্থত্বপরে পারে শতবোজনবিন্দুতঃ।
তত্র সমুদ্রান্য সীতা মার্গিতব্য বিশেষতঃ।
তে হি কোশল বধ্যতঃ রাবণঃ হুহুজঃ” ১।
বিকীকাত্য ৪১ সঃ। ১৫—২৫ সোঃ।

মধ্য পর্বতের বর্তমান নাম পশ্চিমবর্ত, এই পর্বতের যে স্থান হইতে তাম্রপর্ণী উৎপন্ন হইয়াছে,

সেই স্থানকে এখনও অশ্বত্থাদি বলায়। (Caldwell's Dravidian Grammar, Intro.p.48) ‘তাম্রপর্ণী নদী ত্রিমবেদী অগস্ত্যের মধ্য দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে সমুদ্রের নিকটে যে পাণ্ডুনগর স্থাপিত ছিল, তাহাকে প্রাচীন আরব ও গ্রীক ভৌগোলিকগণ ‘কোলিক্স’ ও ‘কোএল’ এবং নিকট সাগরের কোলিক্সা * বলিতেন। সমুদ্র পার হইয়া মহেশ পর্বত। এই পর্বত সিংহল দ্বীপের বর্তমান মহেশ্ব পর্বত বলিয়া বোধ হয়। যে সমুদ্রে কথা লেখা হইতেছে, বোধ হয়, তৎকালে তাম্রপর্ণী নদী-প্রবাহিত ভূমিখণ্ড দক্ষিণাংশে আরও অনেকটা বিস্তৃত ছিল। এই নদী অতি ক্রমে করিয়া সিংহলদ্বীপে যাইতে হইত, এজন্য সিংহলদ্বীপকে পৌরাণিককালে তাম্রপর্ণী বলিত। এাসের প্রাচীন পুরাণবিশ্বকোষেব, পাণ্ডুনগর মুকুট আদ্যের জন্ত প্রমাণ দিল। কিন্তু হুহুজাতার মতে, সিংহলদ্বীপ লোকে মুকুট আদ্যের কবিত। রাক্ষস বজ্রকালে সিংহলদ্বীপের শৈবকরাই রাজ্য স্থাপিতকর মুকুটপরে শাসিতহইয়াছিলেন।

“সমুদ্রসারং বৈবৃধ্যং মুকুটলক্ষ্যন্ততৈব চ।

শাশনং কুণ্ডাপস্তর সিংহলাঃ মুদ্রাপত্রম্।”

সত্যপর্ক ৫১। ৩৬।

রামায়ণেই আরও অপর স্থানে লিখিত আছে, হুম্যানাদি, বানরগণ সীতায়োব কবিত- কবিত- দক্ষিণদেশে অতিক্রম করিয়া এক অজাতপূর্ণ পর্বত-গর্ভেতে উপস্থিত হয়। এই স্থানের নাম ‘অশ্বত্থনি’। ইহার চারিদিকেই স্থূর্ণ পর্বতশ্রেণী। বানরগণ এই স্থানে আদিয়া ক্রান্ত ও পঞ্চাভ্যস্ত হইল। (তাহারা পূর্বে স্থূর্ণদ্বীপের নিকটে ভনীয়াছিল, মহেশ্ব পর্বতের পরে, সমুদ্রেব পুথুরায় রাবণবিবাস লক্ষ্যতীর্থা; কিন্তু এই স্থানের বসতি তাহারা পূর্বে কখন অগণত হয় নাই।) অনেক অসুস্থস্থান, করিতে করিতে এই ভয়ঙ্কর গর্ভের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর গমনের পর তাহারা এক রমণীয় স্থান দেখিতে পাইল। সেই স্থানে নীল, বৈদ্যুত মণি ও পঞ্জিনী সকল পতনধমে পরি-বৃত্ত হইয়াছে, রক্তও কাশ্মীরিষ্ঠিত বিমানসম শোভা পাইতেছে, যুক্তাকালে সমুদ্রতঃ স্থূর্ণপান্যাক্রম হইয়া, রক্তনির্মিত গৃহকল্প বিদ্যমান রহিয়াছে (ইত্যাদি।) তাহারা অনতিদূরে একজন * তপ-

* কোলিক্স সাগরের বর্তমান নাম মাসার উপসাগর (Tasson.)

বিনাকে দেখাতে পাইল। এই ভগ্নদ্বীপের নিকটে
হইতেই সকলে জানিতে পারিল,—

“মহো নাম মহাতেজা। মায়ার নাম বদভূত।
তেনেবঃ নিমিত্তঃ সর্বং মৃত্যুঃ কাঞ্চনং বনম্।”

পুরা দানবমুখান্নং বিশ্বকর্মা বভূব হম
সু তু বর্ষাৎপ্রাণি তপ্তপত্না। মহাবনে ॥

শিখারায়ঃ লেভে সর্কসোশিনাম বদ্রম্।

বিভাঃ সর্বং বনবন সর্ককামেবরস্তম্।

উদাসঃ স্থখিতঃ কাঞ্চন কপিলেশ্বিন মহাবনে।

তমঙ্গারিঃ হোয়ায়াঃ সফঃ দানবপুত্রম্।

বিজ্যোবানশনিঃ গৃহঃ জ্ঞানামঃ পুংসবঃ।

ইহকঃ ব্রহ্মণা দত্তঃ হোয়াঃ বনমুদ্রম্ ॥

কিষ্কিন্ধ্যা ৫১ সঃ। ১—১৫ শ্লোঃ।

মহাতেজা মাতৃদ্বীপ স্থলবৎ মায়াম্বে এই কানন-
ময় বনভূমি নির্মিত্ত করিয়াছেন। তিনি পূর্বে
দানবদ্বীপের বিশ্বকর্মা ছিলেন। তিনি এই মহাবনে
মহেশ্বর লজ্জা করিয়া স্নিগ্ধময় ব্রহ্মার নিকটে হইতে
বরকল্পণ উদনসংগতিঃ সর্কপ্রকার শিখর ন্যাত
করেন। এইরূপ তিনি সর্কসোশিনাম ও বদ্র
ভোপা-বিষয়ের ভোক্তা হইয়া কিছুকাল স্থব এই
বন বাস করেন। সেই সময়ে হোমা নদী
অসরায়ে আসক হওয়া দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা
তঁাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা
হোমকে এই অন্ধক বন প্রদান করেন।

মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থের মতে সিংহলদ্বীপের
একটি বিদ্যার নাম ময়। বর্ধমান আদমপুত্র
বা ত্রীপার্বতী ও তরিকটস্থ দান মরাল্লের অন্তর্গত
বলিয়া অনেকে অহমান করেন। “Tennent's
Ceylon, Vol. I, p. 337 n.” বলিও মহাবংশে
সিংহল, মাদগাস্কার ও চাপ্পন এক-দ্বীপের পঞ্চায়
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই বৌদ্ধমত
অনেকেই অস্বীকৃত বলিয়া বোধ হয়। কারণ
প্রাথমিক মহাবংশে প্রবেশা সিংহল এই নাম
লইয়াই গোল ধরাইদিয়েছেন। তিনি বলেন, পূর্বে
এই স্থানের নাম সিংহল ছিল না, বরং রাজমার
বিজয়সিংহ এই দ্বীপ জয় করিলে তাহারই নামাঙ্ক-
নারে এই স্থানের নাম সিংহল হয়। কিন্তু সেই
সময়ের অনেক পূর্বে যে এই বর্ধকে সিংহল
বলিত, তাহা মহাভারতের অনেকস্থলে উক্ত
হইয়াছে। এ ছাড়া তাম্রপত্র (সিংহল) ও
নাগদ্বীপ যে দুইটি পত্ন তাহা সকল পুরাণ পাঠেই
জানায়।

রাম কপিদেশ্য সন্তো সাগরভারে উপনীত হইবার
পর মল ১০০ যোজন পরিমিত সেতু নির্মাণ করিয়া-
ছিল। ইহাতে জানা যায় যে, সেই সমুদ্রতীর
হইতে দূরত্ব বোলাভূমি ১০০ যোজন অর্থাৎ
১০০ ক্রোশ।

কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বর দ্বীপ হইতে
সেতু আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বর্ধমান আদম
ত্রিকটকে কেহ কেহ নল-নির্মিত সেতু বলিয়া
উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা আদমিক সোপানবিশিষ্ট
কমলমার। রামেশ্বর দ্বীপ হইতে নলসেতু হইতে
পারে, কিন্তু বর্ধমান আদমপুত্রিককে আমরা
নলসেতুর নির্মণ বলিতে প্রস্তুত নহি। যে
সকল সম্ভব স্থান সেই নলসেতুর প্রস্তর থণ্ড
বলিয়া লক্ষ্যকে মনে করেন, সে ওলি সমুদ্রপ্রান্তে
স্থ পীঠত মালি অথবা সেন্দ্রপাথর (Sandstone)
এ মাল। ভূতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,
যে সকল নিম্নতর আদমিক সময়ে গঠিত।
(Oudlen Nieuw Oost Indien, Ch. XV, P. 218.)
ইহার নিকটেই সমুদ্রের অঙ্গুলিগল মধ্যে
বিস্তার প্রদায় দেখা যায়। কালে প্রবালসমূহ এই
থণ্ড সকলে মিলিত হইয়া দ্বীপাকারে পরিণত
হইলে—অনেকের মতে পূর্বে সিংহলদ্বীপ ভারত-
বর্ষের সহিত মিলিত ছিল। বিশেষতঃ বর্ধমান
রামেশ্বর দ্বীপ হইতে সিংহলের বোলাভূমি ১০০
যোজন নহে।

ষ্টকট্রয়ের তিনশত বর্ষ পূর্বে পালিগ্রন্থ মহাবংশ
বর্তিত আছে। এই মহাবংশের মতে সিংহলের আদম
নাম লক্ষ্য। কিন্তু এই সময়ের অনেক পূর্বে (বর্ত্তের
মুগ্ধম শতাব্দীতে) প্রসিদ্ধ চীনপরিভ্রাজক
হিউএনসাংগ সিংহল-দ্বীপে মনন করেন। তিনি
সিংহল-দ্বীপকে লক্ষ্য বলেন নাই। তিনি লিখিয়া
দিয়াছেন—“সিংহল-দ্বীপের” বলিও পূর্বে একটি
নামক আছে, এই পর্বতকে লোক লক্ষ্য বলে।
সেখানে বহু প্রভূতি বাস করে।” সুতরাং দ্বীপের
বর্ত্তিত হইলে যে, হিউএন সাংগের সময়েও
সিংহল-দ্বীপকে কেহ লক্ষ্যদ্বীপ বলিত না। সিংহল-
দ্বীপের হুবহু দক্ষিণ-পূর্বে, লক্ষ্যনামে একটি সামান্য
পর্বত থাকিলেও সমগ্র সিংহলকে আমরা রামা-
রথোক্ত লক্ষ্য লক্ষ্য বলিতে পারি না। সিংহলে
লক্ষ্যপাথর আছে তন্নিমিত্তই কেহ বরি সিংহলকেই
লক্ষ্য বলিতে চান, তাহা হইলে অনেকে কাঞ্চীর
অন্তর্গত লক্ষ্য দ্বীপকে অন্যায়সেই বাবেশ্বর লক্ষ্য

বলিতে পারেন, কারণ নামের মিল পাওয়া যায় যে-
তে—(J. A. S. Bengal, vol. xxxv. pt. i.
p. iii.) কেবল একটি নামের মিল পাইলে
প্রাচীন জনপদাদির অবস্থিতি নির্ণয় হইতে
পারে না। সেই সেই স্থানের ভূতত্ত্ব, চতুর্দাসী
ও উপর অধ্যায়িঃ সহিত বর্ধমান নিম্নিষ্ট
স্থানাদির ভূতত্ত্বাদির সৌম্যদৃষ্টি হইলে তবে সেই
সেই প্রাচীন জনপদাদির কতকটা সন্ধান পাওয়া
যাইতে পারে।

আমরা লক্ষ্য-মহত্ব পূর্বেই বলিয়াছি যে,
আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় মহাভারতে লক্ষ্য ও
সিংহল দুইটি পত্ন দ্বীপ। এখন দেখা যাউক,
কোন স্থানকে আমরা লক্ষ্য বলিতে পারি।

অধিগম্যে লিখিত আছে,—
“ক্রিশ্চোবোজনবিশ্বীর্বাৎ স্বপ্রকার্যভারতবাসম্।
দক্ষিণস্যোদ্যেবস্তোত্রীং ত্রিকটো নাম পর্বতঃ।
শিখরে তন্ত শৈলঃ মধ্যমেবমুদ্রসমিতিঃ।
পত্তত্রিংশ চতুর্দশাং টঙ্কক্রিমাং চতুর্বিংশম্।
শজাৎবাং মন্তস্তা পূর্বঃ প্রবাহঃসুদূরবাসমিতিঃ।
বদন্ত ভন্ত চতুর্দশঃ স্থঃ স্বঃ রাক্ষসপুত্রবঃ ॥”

দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকট নামক পর্বত
আছে, সেই পর্বতের মধ্যম শিখরে সাগরের
নিকটে ৩০ যোজন-বিশিষ্ট অপ্রকার ও তোরণাবি-
শোভিত লক্ষ্যপুত্রী। এই পুত্রী পক্ষিবিধেরও
হুম। পূর্বকালে ইন্দ্রের জ্ঞাত স্বঃ বসবঃ ধরিয়া
বহেছে আমার (বিশ্বকর্মা) দ্বারা নির্মিত হইয়াছে।
যে দুর্ভীক রাক্ষসণ। সেই স্থান হইবে বাস করে।

রামায়ণেও লিখিত আছে,—
“দক্ষিণ্যোদ্যেবস্তোত্রীং ত্রিকটো নাম পর্বতঃ ॥ ২২
হুবলে ইতি চাপত্যো দ্বিতীয়াং রাক্ষসপথঃ।
শিখরে তন্ত শৈলঃ মধ্যমেবমুদ্রসমিতিঃ ॥ ২৩
বৃহন্নৈরগি চতুর্দশাং টঙ্কক্রিমে চতুর্বিংশম্।
ত্রিংশযোজনবিশ্বীর্বা শতযোজনমায়তা ॥ ২৪
স্বপ্রকার্যভারতবাসী হেমন্তোভবাসমিতিঃ।
ময়া লঙ্কতে নগরী শত্রাজ্ঞানমৈ নির্মিতা ॥ ২৫

উপরকণ্ড ৫ম সর্গ।
হে রাক্ষসণ! দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকট
নামক পর্বত এবং তাহার মাঝে আর একটি হুবলে
নামক পর্বত আছে। সেই শৈলের মধ্যম
শিখরে মৌসুমদ্বন্দ্ব, বিশেষতঃ পাণ্যবাকুল্য চারি-
দিক বিকীর্ণ হওয়ায়, উহা পক্ষীদিগেরও হুম।
আমি (বিশ্বকর্মা) সেই শিখরে ইন্দ্রের আদেশে

লক্ষ্য নির্মাণ করিয়াছি, এই নগরী ত্রিশযোজন-
বিশিষ্ট, একশত যোজন আয়ত, স্বপ্রকার্যভারত-
বাসী হেমময় তোরণ পরিবৃত্ত।

আবার অপর দ্বীপে লিখিত আছে,—
“শিখরঃ ত্রিকটঃ প্রান্তঃ চৈকৈবঃ দক্ষিণশম্।
সমস্তাঃ পুণ্ড্রসংখ্যমঃ সার্বভৌমসামিতিঃ ॥
শতযোজনবিশিষ্টাঃ শিখরঃ চতুর্দশম্।
নির্মিতা তন্ত শিখরে লক্ষ্য রাবণপালিতা।
দক্ষিণ্যোজনবিশিষ্টাঃ বিশযোজনমায়তা।
স পুত্রী গোপুত্রকটকৈঃ পাণ্ডুরাক্ষসমিতিঃ ॥
সকলকেন শালেন রাজভতে চ শান্তেভঃ।
প্রাসাদৈশ্চ বিমানৈঃ লক্ষ্য পরমভূতিকা।
লক্ষ্যকণ্ড ৩৩ সর্গ।

যাহার মধ্যেই শিখর অংশান। স্পর্শ করিয়াছে,
সেই ত্রিকটপর্বত পুণ্ড্রসংখ্যমঃ হওয়ায় দক্ষিণশম
বলিয়া বলে হইয়া থাকে। সেই গিরি শতযোজন
বিশিষ্ট বিশাল চতুর্দশ, তাহারই শিখরে রাবণ-
পালিতা লক্ষ্যদ্বীপ। সেই লক্ষ্যদ্বীপ দশযোজন
বিশিষ্ট এবং বিশযোজন আয়ত। সেই
নগরী পাণ্ডুরক্ষস সৈন্যদল, স্বর্য ও রক্ত প্রাসাদ
এবং বিমানসমূহে বিভূষিত।

রামায়ণের মতে লক্ষ্য নিম্নলিখিত উক্তির মধ্যে—
“চন্দ্রকান্তঃ কুরুবংশাংশালসমাক্রান্তা।
তমালপনমজ্জমা নাপমাল্য-সমারুতঃ।
হিষ্টপৌলশ্চক্রেতনৌপিসমগুপ্তৈঃ স্থপুপ্লিভৈঃ ॥
তিনকৈঃ কর্ণিকৈঃ পাতলৈশ্চ সমস্তভঃ ॥”

লক্ষ্যকণ্ড ৩৩ সর্গ।
চন্দ্রক, অশ্রুত, বহু, শাল, তাল, তমাল,
পনম, নাপমল, হিষ্টপ, অজুন, কনক, সপুপ্লি,
তিনক, কর্ণিক ও পাতাল।
ভাস্করাচার্য লিখিয়াছেন,—
“লক্ষ্যপুত্রঃ স্যেদগিঃ স্যেদগিঃ স্যেদগিঃ স্যেদগিঃ
তাল নিমিত্তিঃ যমকোনিষ্ঠাঃ।
অথস্তলাঃ সিন্ধুপুত্রঃ স্যেদগিঃ।
ম্যারোমকৈঃ রাতিবলঃ ততৈব ॥
যোজনক্রিমাঃ চতুর্দশভাণ্ডে
প্রাচ্যঃ দিশি স্যাদ্ যমকোনিষ্ঠাঃ।
ততঃ পট্যঃ ততঃপট্যঃ
লক্ষ্যে পট্যঃ কর্ণিকোনিষ্ঠাঃ ॥”
গোলাধার্য ৩৪৪—৩৪৭
যখন লক্ষ্য পুণ্ড্রসংখ্যমঃ হয়, তখন (তাহার নক্সা
অংশ পূর্বে) যমকোনিষ্ঠে মধ্যাক, সিন্ধুপুত্রঃ স্যেদগিঃ

এবং রোমকগণনে বিপ্রহর রাতিকাল। যমকোট উজ্জিনীর ঠিক পূর্বেই অক্ষাংশ দূরে অবস্থিত আবার লগ্না যমকোটের ঠিক পশ্চিমে, উজ্জিনী পশ্চিমে নদ।

কৃষ্ণপুত্রের কুমাবিকা যশোর হতে লঙ্কাদেশে ৩৬০০ গ্রাম আছে।

“ফলিংশিখর সহস্রাবি লঙ্কাদেশঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ”
কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অধ্যায়।

সূর্যসিদ্ধান্তের মতে—লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর।

(সূর্যসিদ্ধান্ত ১২, ৩৬)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—বব্বরীপের পর মলয় দ্বীপ, এই স্থান নামক দ্বীপের অন্তর্গত পর্বতের মাড়দেশে লঙ্কাপুত্রী।

শিখাচ মলয়দ্বীপের সেরেন্দেব হুসংস্কৃতম্।
মণিরসাকরং কীতমাকরং কলশত চ॥
অনেকোজ্যোতিষিভিঃ চিত্রসাহস্রবিধাঃ।
তত কৃতভূতং বসেৎপ্রাকারভারতম্॥

নির্দ্যুৎসববিজিতা হুৎপ্রাণসাদমানিনী।
শিখোজ্যোতিষাভিঃ জিহ্মপুংগবজনমায়তী।

শিত্যপ্রমুখিতা কীতা লঙ্কা নাম বব্বরীপী।
স্বা কামরূপিতা হানং রক্ষসানাম হাভ্যন্তনাম্।
আনামো বলদগুণানাম তদ্বিষ্যদেববিমায়তী॥

ব্রহ্মাণ্ডে অক্ষরূপাদি ৫০ অঃ।

মাধারেন লঙ্কাকে স্বর্ণলঙ্কা বলিয়া থাকেন।
রামায়ণে একস্থানে লিখিত আছে,—

“বব্বরীপা বব্বরীপঃ সমুদ্রকোণ্যাপশোভিতম্।
স্বর্ণলক্ষ্যকক্ষীপঃ স্বর্ণকরমণ্ডিতম্” কিঃ ৪০-৩০

উক্ত শ্লোকের দ্বারাও জানা যাইতেছে বব্বরীপের কাছেই স্বর্ণ ও রূপ্যকক্ষীপ। অতএব ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের সহিত রামায়ণের বিশেষ ত্রুটি হইতেছে।

সূর্যসিদ্ধান্তে লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বকালে ভারতমহাদেশীয় দ্বীপগুলিও ভারতবর্ষের মধ্যেই গণিত হইত।

বাল্মীকীতে পুরাণে লিখিত আছে—

“অঙ্গরীপা বব্বরীপঃ মলয়দ্বীপসম চ।
শম্বরীপা কুমারীপা বব্বরীপসম চ ॥ ১৪”

এবং ভদ্রতে কথিতা বব্বরীপা সমস্ততঃ।
ভারতবীপদেশো বৈ দক্ষিণে বব্বরীপঃ ॥ ৪১ ॥

বাল্মীকীতে পুরাণে লিখিত আছে—

“অঙ্গরীপা বব্বরীপঃ মলয়দ্বীপসম চ।
শম্বরীপা কুমারীপা বব্বরীপসম চ ॥ ১৪”

এবং ভদ্রতে কথিতা বব্বরীপা সমস্ততঃ।
ভারতবীপদেশো বৈ দক্ষিণে বব্বরীপঃ ॥ ৪১ ॥

বাল্মীকীতে পুরাণে লিখিত আছে—

দ্বীপের অন্তর্গত লঙ্কাপুত্রী বলিলে, পৌরাণিক মতে তাহা ভারতবর্ষ ছাড়া নহে। হুতরাং সূর্যসিদ্ধান্তের সহিত অনেকা হইতেছে না।

বব্বরীপকে এখন সকলে বাবা বলিয়া থাকেন। ভারতমহাদেশের এই দ্বীপটির অবস্থিতির বিষয় অনেকেরই অসংগত আছেন, তাহা বলা অনাবশ্যক।

তবে বব্বরীপের নিকটেই যে লঙ্কা ছিল, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নির্দেশ করিতেছে, লঙ্কাপুত্রী মলয়-দ্বীপের অন্তর্গত। এক্ষণে পূর্ব-উপদ্বীপের অন্তর্গত শ্রামদেশের “দক্ষিণবিশিষ্ট বিস্তারিত ভূমিখণ্ডকে মলয় আয়োগেশ্বরী বলে, উহা বব্বরীপের পশ্চিমে অবস্থিত।

এখানকার মলয়প্রান্তের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তাহারই হুমাতা দ্বীপ স্বনৈক্যপু নামক স্থানে পূর্বে থাকিত, উহা তাহাদের আদিবাসস্থান এবং

ঐ স্থানকে তাহারা মলয় বলিত।

এই মলয় জাতি ভাষা এখনও হুমাতা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কার পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।

ভারত মহাদেশের দ্বীপসমূহে প্রায় এক ত্রুটি বব্বরীপের থাকার সহজেই বোধ হয় এই মলয়-দ্বীপী ভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতিগণ পূর্বে এক-জাতি ছিল, কেহ অসভ্যবাহুরা থাকিতাও কাল-ক্রমে সভ্য হইয়াছে, কেহ খৃস্টীয় সভ্য হইয়াও পুনরায় অবস্রাজ্যে নিতান্ত অসভ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

এই মলয়দ্বীপী জাতিগণ বহুঃ বা রক্ষস-জাতি বলিয়া রামায়ণে লিখিত উক্ত হইয়াছে। এখন বব্বরীপের নিকটবর্তী কোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদম্বার ভাষা বহুদ্বীপ অসভ্য জাতি বাস করে, ঐ কদম্বারের সন্মতকই রক্ত গুণী বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাতক নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও

সংস্কৃত নরাতক * শব্দের অপভ্রংশ, বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। এই দ্বীপের নিকটেই এখনও রক্ত, লক্ষ্মণ, নীল, ও নল প্রভৃতি রামায়ণোক্ত বীরগণের নামানুসারে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপও রহিয়াছে।

যায় হউক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতানুসারে বীরত্ব হইতেছে মলয়ের মধ্যেই লঙ্কাপুত্রী। রামায়ণের মতে এই মলয়ের নাম স্বর্ণব-দ্বীপ, উহার বর্তমান নাম হুমাতা।

বর্তমান মানচিত্রে দেখিতে পাই হুমাতা দ্বীপের উত্তর পূর্বাংশে পর্বতের ‘মাহুদেশে’ও সমুদ্রের নিকটে ‘সোনীলঙ্কা’ নামক একটি নগর রহিয়াছে, উহা ‘স্বর্ণলঙ্কা’ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। আবার এই দ্বীপের অন্তর্গত বীরক দ্বীপের নিকটে ‘ডায়মন্ড প্লেট’ নিকট একটি বন্যরকে এখনও ‘লঙ্কায়’ বলে। এখনও এই দ্বীপের

উত্তরপশ্চিমাংশে ‘কোল্ডগিলি’ (Golden Mt.) রহিয়াছে। ঐ ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ হইতেছে রামায়ণোক্ত ‘লঙ্কাপুত্রী’ অথবা ‘স্বর্ণ দ্বীপ’ বর্তমান হুমাত্রাদ্বীপকে বুঝাইত।

বব্বরীপ ও কোরিস দ্বীপের দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত বিস্তীর্ণ সমুদ্রকে এখনও এখানকার দ্বীপী জাতিরা ‘লঙ্কা’ দ্বীপের বলিয়া থাকে। এতদ্বারাও স্পষ্ট করতকী হান নির্ণয় হইতে পারে।

যদিও এই হুমাত্রা দ্বীপে হিন্দুজাতি বাস করেন না, যদিও হিন্দুনিষ্ঠ মন্দিরগিরি কিছুমাত্র প্রমাণবশে দৃষ্ট হয় না, কিংবা ইতিহাসেও লিখিত নাই, কিন্তু এমন অনেক প্রমাণ আছে, যদ্বারা আমরা মূলতঃ বীরক করিতে পারি যে শ্রীমদ্ভগবতঃ ‘অখমলেন’ পর হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণ বব্বরীপের আশ্রয় এই স্থানে আপনমন করিতেন।

* নরাতক শব্দের অর্থও রাক্ষস। রামায়ণে একজন সেনাপতির নামও নরাতক।

† ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহাই ‘কাকদপাণ’ নামে মলয়দ্বীপের মধ্যে উক্ত হইয়াছে।

“তৎ কাকদপাণম্ মলয়ভাগরাজ হি” ব্রহ্মাণ্ড ৫৩ অঃ।

† রামের গর্ভ হইতে এই লঙ্কাদ্বীপে অনেকেরই স্বর্ণলঙ্কাভাষা প্রমাণমান করিতেন। লঙ্কাপুরাণের নাগবংশোক্ত নিম্নলিখিত ঘটনের দ্বারা তাহা করতকী প্রমাণিত হইতেছে।

এই দ্বীপে এখনও মদল, ইন্দ্রগিরি, ইন্দ্রপুর ইত্যাদি হিন্দুপ্রাণক সাংস্কৃত নাম নগর ও নদীবিধেই রহিয়াছে। এখন মলয়জাতি যে স্থানেই আপনাদিগের আদিপিতৃভূমি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, সুমিত্রীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা যে স্থানে সমাদিত স্বর্ণ উৎপত্তি হইত, এখনও সেই স্বর্ণময়ী ভূমির নিকট দিয়া ইন্দ্রগিরি নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নামটি পাঠে স্পষ্টই স্বরূপময় হয়, যে এক সময়ে হিন্দুগণ এই হুমাত্রা-দ্বীপে আশ্রয় উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

গো-জাতি।

ভারতবাসী প্রধানতঃ কৃষি-জীবী। অত্যাচ্ছন্ন দেশের মতন ভারতও কৃষিকান-নির্ভর। ভিন্ন উপায় অবলম্বিত হয় নহে; কিন্তু অধিকাংশ কোষেই চাষ করিয়া দিন ওভরণ করিয়া থাকে। ভারতের মাটি অপর্যাপ্ত শস্য প্রসূত করে। এই

লক্ষ ভারতকে অনেক ‘স্বর্ণ-প্রস্থ’ বলেন, এই জঙ্গল প্রাচীন-বাক্যে রাজসেনা অর্থও চাহার অপেক্ষা কৃষিই প্রধানময়ের প্রকৃষ্টত উপায়।

বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বর্তমান ইংরেজ-শাসিত ভারতও জমীর খাজনাই রাজকোষের সমর্থক পুষ্টিমান করে।

গোজাতি এই কৃষিকোষের প্রধানতঃ উপ-যোগী। এই উপযোগিতা বুঝাইয়া রবী ওরাদেন নামক একজন কৃষি-শাস্ত্রবিৎ ইংরেজ ভারতে

“ভবিষ্যতি কৃষ্যে কালে দরিদ্রা মুখমানয়া”
হেতু বর্ণিত ভোক্তেন দেবতঃশ্রমণা চ ॥

নির্ভর্যোপাধিবিদ্যাপ্তি তত্। রক্ষসকৃত্য ভাস্ম ॥ ৪১
নাগবংশ ১৪ অঃ।

রাম পূর্ণায়েব করিলে পর তৎপুত্র কৃষ্ণ লঙ্কায় আপন করিয়াছিলেন, তাহাও নাগবংশেও উল্লিখিত হইয়াছে। ১। নাগবংশ ১৮ অঃ ১০-২২ শ্লোক দেখ।

এই হুমাত্রার পার্শ্বেই রূপ্য নামে একটি দ্বীপ আছে, উহা রামায়ণোক্ত রূপাক দ্বীপ বলিয়াই অনুমিত হয়।

জন্ম করিতে আসিয়া লিখিয়াছেন যে, "ভারত-সম্বন্ধে যত কিছু আলোচনা বিষয় আছে, তন্মধ্যে গোজাতিবৈধ সর্বপ্রধান।" "হেলেন পেরে" এই হুইটী কথা বঙ্গদেশীয়দেরই সুপরিচিত। ভারতের জন্মতে লাঙ্গল বিহার জন্ম পেরে" না হইলে যে দেশ না, ইহা একপ্রশ্ন বিহীন সিদ্ধান্ত। আমাদিগের চোখে আরবদেশ কাহ্ন হইতে পেরেছেই লাঙ্গল টানিয়া আসিতেছে। বিলাতে ও অন্তর্গত অনেক দেশে যেোয়ার লাঙ্গল চাষ; কিন্তু আমাদিগের দেশে যেোকা প্রয়োজনমত বৈধী পাওয়া যায় না এবং শাহার হুখিয়া হইলেও ইহা দেখা গিয়াছে যে যেোয়ার খাড়া তত শক্ত নহে ও এইজন্য বড় বড় লাঙ্গলপেরে কক-খোড়া-মারা ভাল হয় না। আর এক কারণ এই যে, ভারতের নদী কিছু রস্যা বলিয়া চাদের সম্মত, যেোয়ার পা ক্রমী ভিত্তি চুকিয়া গিয়া উহার শক্তোৎপাদিতা শক্তি কমিয়াছে; এইজন্য অধোলাঙ্গল করা হইতে লাঙ্গল বিহার জন্ম এমন কি বিলাতেও কিছুদিন হইতে যেোয়ার বিলাতে পেরের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতের পেরের সাহায্যেও লাঙ্গল দেওয়া হয়; কিন্তু জমীনি অবস্থা ও ব্যবস্থা বৃষ্টিমা দেখিলে "পট্টই প্রয়োজনীয় হয় যে, ভারতে পেরের সাহায্যে লাঙ্গল দেওয়া কখনই সম্ভবতঃ চলিতে পারে না। প্রথমতঃ, কক চাউনিয়ার সরঞ্জামের বৃহৎ এত বেশী পড়ে যে তাহাতে যোকসানাই হইবার বেশী। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে ছোট ছোট ইহাও বেশী; একটামাত্র একলপেচো জমী না হইলে ও আর কক চাউনিয়ার তমেন হুখিয়া হয় না। তৃত্বিকার্থে একপ্রকার একত্রটিয়া পদ্ধতি অবলম্বিত না হইলে কলের সাহায্যে লাঙ্গল চালাইন অসম্ভব।

কলপা লেপে মার্চে জল বিহার জন্ম সিউনী ব্যবহারই প্রচলিত। কলপায়ে শ্রমহানির মদ্যমান হইলে। নদী, পুষ্করী বা ডোবা হইতে জল হেঁচিয়া নালা দিয়কচুর্কিকি ছড়ান হয়। উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব প্রান্তে অবশেষে পুষ্করী বড় দেখা যায় না, এই জন্ম সেখানে পুষ্করী কূপ হইতে জল তুলিতে হয়। শব্দের উপপদের জন্ম এই জল-তোলা কার্যে যোক বিশেষ সহায়তা করে; এমন কি যোকই একমাত্র উপায় ও অলংকার। যাকনী স্বক প্রথম উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দেশের, তখন পেরের সাহায্যে এই জল-তোলা ব্যাপার উহার দূরী ও মনোযোগ আকর্ষণ করে; এবং

তিনি বোধিয়া বৃষ্টিতে পারেন যে, যোক না থাকিলে ঐ মরুত অঞ্চল কি কই হইত।

তৃত্বিকার্থের জন্ম যোক কত দরকারী তা উপরে কক দেখান গেল। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও অনেক কার্যে যোক বিশেষ সহায়তা করে। যেমন এখন বেল-বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে, সেোয়ার গাড়ীর চালন ও অনেক স্থানে হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু এখনও পেরের গাড়ী য়ে অতি প্রয়োজনীয় যান, ইহা বলিলে বোধ হয় অস্বীকার হয় না। পেরের গাড়ী চিহ্নতে হইলে ভুলিলে হয়ত অনেক মহুরে লোক চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু যাহারা মহুর ছাড়াই একই ভাবে চিহ্নে পিয়াছেন-বাহালায় পন্নামাম বলিলে কি বুঝায় তাহার কিছুমাত্র জানেন, তাহার পেরের গাড়ীর আধিপত্য ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছেন। পেরের গাড়ীতে লোকজন বসিয়া গিয়া এখনও অনেক যোক সাংসার-খাজা নির্বাহ করে। মাল পত্র বহনের জন্মও যোকের গাড়ী বিশেষ দরকারী। কিছু দিন হইল, কলিকাতা মহুরে পেরের গাড়ীওয়ারা এক ধর্ম্মভক্ত করিয়াছিল; যেহানকার মাল-সেইখানেই পড়িয়া গেল, মহাজনের কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। হতভাগ যাহাতে গাড়ীওয়ারা সজ্জ হইয়া আবার কার্যে প্রবৃত্ত হয়, কলুপনীরে তাহাই করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পন্নামামের লোকে জানেন যে, যোকের জালায়ে মানাধি জয়সমগ্রী একশ্রম হইতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। সাত-একজনহন-কার্যেও যোকের সহিষন উপকারিতা ও সাহায্য দেখা যায়।

একজন যবপু পুষ্করজাতিবিহী কথা হইতেছিল। আমরা এক্ষণে গাড়ীর উপকারিতা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হিংস্র সাত্তিক-ভাব-প্রধান ধর্ম্ম হইতেই হিংস্রধর্ম্মের স্রোতঃ। সাত্তিক-ভাব-প্রধান ধর্ম্ম পালন করিতে সর্ম্ম করিবার জন্ম কবিধন সাত্তিক ব্যতীতও বিধি নির্দেশ করিয়াছেন। যাম সিং-বাহার তালিকাতে অতি নিম্ন স্থান অধিকার করে, এমন কি স্থান পায়া না বলিলেও চলে। যাহার বুদ্ধিমানী এবং ডাকারিতে এবিধ বৃষ্টিতে, তাহারও ডাকারি-কম দেখেন, যে মাস-তাহৌ হইলে সাত্তিক-ভাব-পরিণামের বিশেষ

ব্যবহার পড়ে। ধর্ম্মপ্রাণ হিংস্র শারীরিক পোষণ ও ধর্ম্ম-কর্ম্মতার পক্ষে হুহু বত উপকারী, এমন কিছুই নাই, ইহা বলিলে বড় অস্বীকার হয় না। সকলেই জানেন, কলহাণ করিবার পর ভিত্তিয়ার বসন্ত হুহুই একমাত্র ঋত। বয়োবৃদ্ধির সহিত অন্তঃস্থ ব্যাধি আসিয়া জোটে ইহা সত্য; কিন্তু কে না জানেন যে, ভোজন হুহু প্রায় সকল সময়েরই থাকে, না থাকিলে ভোজন যেন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। অনেকই দেখিয়া থাকিলেন যে, যখন মাম-ব-বীরে কলহু চিহ্ন-গুলি দেখা দেয়-যখন মামে কোন ভ্রম, এমন কি শুধু পূর্ণতাও বিলিতে পারে না, তখন তাহার পুষ্টির জন্ম তাহাকে হুহু-পান করায় হয়। শব্দ হুহুর নিয়মিত শুণ-গুলি বর্ণিত আছে;— "শব্দক, অতঃস্রব, গাহু, সিংহ, পিত্ত, বাতাসম্মিশ্র, মেধাক, কাহ্নিপ্রভাপুষ্টিবিহী-কৃষ্ণকরিত্ব", অর্থাৎ—হুহু হিংস্রের আহার; অত্যন্ত রুচিকর; হাট; শি; শিব্রাক-জনিত যোগ নাম করে; পরি; এবং কাহ্নি, প্রজা, অস্পৃশ্য ও বল-বৃদ্ধি করে। হারীত সংহিতায় প্রথম-মানে অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে;—

"পথ্য পিত্তক, রসায়ক পথ্যক স্থায় বলপুষ্টিংস্থায়। আত্মপ্রব, রক্তবিহার-পিত্ত-ক্রিয়-ক্লেশ-বিষাণং জাং।" অর্থাৎ—হুহু পিত্ত; রসায়ন; হিতকর ব্যাধি; মনোহর; বল ও পুষ্টির কারণ; আত্মপ্রব; এবং রক্তবিহার, পিত্ত, ক্লেশ, ক্লেশোপ ও বিষ নাশ করে। হুহু হইতে দধি, দধি, মৈল, মাম ও ঘৃত প্রভৃৎ হয়। শব্দে দধির নিয়ম-পিত্ত অংশগুলি বর্ণিত আছে;— "অতিপিত্তক, সীতক, সিংহক, সীতক, বলাকারি, মধুক, অরোচ, বাতাসম্মিশ্র, গ্রাহিক", অর্থাৎ—অপিত্তিক, ঈষা, মি, জঠরাধিবর্জক বা বলকারী, মি, অরোচ ও বাতজিহ্ন-পীড়া-নাশক এবং মনোহর। মামকক সাহুভায়া নবনীত হলে। নবনীতের নিয়মিত শুণ-গুলি আছে;— "সীতক, বলাক, শুক্লক, রুচিক, রুচি-হু-কাজি-পুষ্টিকারি, সমুদ্রক, মগ্নীকরিত্ব, চুর্কীকরিত্ব, বাত-সর্গীশ-শুল-কাম-প্র-সর্গীকরিত্ব।" উত্তর অধিক-গুণ;— "স্থায়, দী-কাহ্নি-স্মৃতি-বল-শোধ-পুষ্টি-বিহী-শুক্ল-বপুষ্টিকারি, বাত-প্র-পিত্তনাশিক, বিলাক মুরক, হবাতমহ, বহ-ওবহ।"

হারীত সংহিতায় উক্ত আছে;— "দিশাকে মুরক, হুহু বাতপিত্তকপাম্যম। চকুয়া, রসকরোপাং পথ্য সপির্গুণেরম।" বাহ্নিবিহী নামক সাত্তক গ্রন্থে হুহুর অর্থ-সম্বন্ধে, ঐতিহ্যক অতি সুন্দর প্রমাণ আছে, নিম্ন উক্ত হইল;— "পথ্য আত্মবিহী দধি ও শুষ্ক পিষ্টক চুর্কম। তমাদিভ্যস্তিতে হুহু বাম, বামার্গেরম বা। সমুদ্রক পথ্য গ্রাহক তৎ পথ্য দীপনং লু।" বিবংসাবলংসমানং পথ্যলোবসদীকৃতম। শব্দক বৎসকরিত্বা ধবলীকরিত্বেরম। ইক্সা মাধুর্গা উক্সীচ চ বা ভবে। তসাম পথ্য হিতং সীতং শুভং বশ্যতমব বা।" পথ্য সিংহাং বাতক, কৃষ্ণাধি পিত্তনাশম। শ্রেয়ম রক্তবর্ণনাং দ্রৌ হস্ত কাপাণাম।" অর্থাৎ—"প্রাতঃকালে, হুহু, তৎ, মগ্নগাহী ও শুণকায় হু, অতঃপরে হুহুর পথ্য-ওক প্রের বা অধুগ্রহণ অশোকা বারিা হুহু দোহন করিবে, সেই হুহু হিতকর ব্যাধি, আত্মপ্রব ও লু। যাহার বাহু মরিয়া গিয়াছে বা অতি অস্বাস্থ্য, একপ্র গাড়ীর হুহু ভাল নহে। ধবলী হুহু বা কৃষ্ণ হুহু, যৈ গাড়ীর ও তাহার বাহুর বর্ণ এক, তাহার হুহু ভাল। যে গাড়ী হুহু বা মাধুর্গা আহার করে ও যাহার শূণ উক্সিকি প্রসারিত, তাহার হুহু কাটা বা জাল দেওয়া উত্তরগাহী ভাল। যেহেতু গাড়ীর হুহু বর্ণিত, কৃষ্ণব গাড়ীর হুহু পিত্তক, রক্তবর্ণ, গাড়ীর হুহু শ্রেয়ম এবং কপিা গাড়ীর হুহু ক্লেশনাশক।" ষ্ট্রীকরিত্ব বিহী ও মুর অতি অস্বাস্থ্য, অস্পৃশ্য ও হুহার সামগ্রী; ক্লিত পোমর (গোবর) ও পোমুর (চোনা) সম্বন্ধে শব্দে কি-নিখিত আছে ভাব্য কলম;— "পোমর, যদুনা সাকাদ্য পোমুর নর্ধ্বা ভজা।" পথ্য দীপনং বামং কিং পিষ্টি মতঃপুষ্ক।" অর্থাৎ—"পোমর সামগ্রী যদুনা, পোমুর পথ্য নর্ধ্বা এবং হুহু পথ্য; অতএব ইহা অপেক্ষা অধিককর পথ্য কি হইতে পারে?" পোমর ও পোমুর-মাধ্যম শব্দে উপলব্ধি করিত আছে;— "শব্দ, বহাৎসম, তৎসম্পদ হুহুরম।" গোজি পুষ্টিবিহীজিহ্নক শ্রেষ্ঠতমিতি। অধ্যাপ্তীমুখ্যানে জনঃ পুণ্ডেত সর্গনা। শব্দক চ পিত্তবিহী সর্গীকরিত্ব দেববাহ্যঃ।

তাত্ত্বিক বর্ণনায় ব্রহ্মা তপসোমগ্নে বসত প্রভুঃ।
এবং ভবতি বিদুঃসংকল্পাভ্যবহতি চ ॥

অর্থঃ—সেইভাবে পাইবার জন্ম পোষিত, লক্ষ্য-বস্তু বর্ণনায় তপস্বী, করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর চাহিয়াছিলেন যে, 'যেই তাহারেব বিত্তা ও মৃত্যু, দেবতা ও মনুষ্যের পক্ষে অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। তপস্বী-শেষে বসন্ত ব্রহ্মা 'তথাক্ত' বর দিয়াছিলেন।' অর্থাৎ, গোময়ে ও গোময়ে লক্ষ্যবস্তুর বাস।' মহাভারতে লক্ষ্যবস্তুর, সাহিত্য পোষিত নিম্নলিখিত কথোপকথনের উল্লেখ আছে:—

এবং উচুঃ—

"অবশ্যং মানুসাঃ কৃণ্ডা তদাযাতিবংশিনি।
শব্দমুদ্রে নিবসন্তঃ পুণ্যমোদিত্বি নঃ ভতে ॥"

শ্রীকৃষ্ণাচঃ—

"বিস্তীর্ণ প্রসারো যুযাতিঃ কৃতে নেহগ্রহাশ্বকঃ।
এবং ভবতঃ ভবন্তঃ পুত্রিতামিহ যুগপ্রদাঃ ॥"

গো-ভাষিত উক্তি।

অর্থঃ—অগ্নি বংশিনি! তোমার সম্মান করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; ভতে। হুনি আমাদের বিত্তা ও মৃত্যু বাস কর, যেহেতু উহা পবিত্র।

লক্ষ্যার উক্তি।

আপনারা আমার শুভাভিষ্টক্সে আমার প্রতি অগ্রহ করিবেন। অগ্নি যুগপ্রদপন। তথাক্ত, তোমাদের মন হইক, আমি তোমাদের ঘরা সম্মানিত হইলাম।

গোময়ের উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। রত্নকর্ণে বৃষ্টির ব্যবহার গ্রন্থ বর্ণনায় প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। পূর্বোক্ত-বিস্তৃত ওয়াসে মাঘের লিখিতছেন:—

"As fuel, dung does not throw out sparks like 'dry burning' wood, to endanger the safety of the house, and it has, in addition the valuable property of remaining in a smouldering condition for a long time, ensnaring the inmates of the house to have the food to cook while they are 'at work in the fields.'"

অর্থঃ—গুন্দো কেকড়ার আগুন হইতে এমন কুসি উদ্গত হয়, বৃষ্টির আগুন হইতে সেগুলি

হয় না; ইহাতে রন্ধন-কার্যে বৃষ্টির আগুন ব্যবহার করিলে ঘরে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা কম। আরও দেখা যায় যে বৃষ্টির আগুনের আঁচ অনেকগুলি থাকে; তজ্জন্য লোকের হাঁড়ী চড়াইয়া মাঠে কাঁচ করিতে বাইতে, পারের; বাহ্যে আপনাপনি প্রগত হইয়া থাকে।

তামাক বাঁহবার জন্ম বৃষ্টির আগুনের প্রয়োজনীয়তাও অবগতের ভিতর আছে। 'সেখানে গোবর লেপা ও ঘরে, উঠানে গোবর ব্যবহার করা সকলেই পরিচিত। ইহা হাড়ী, মাটিতে সার দিবার জন্ম গোবর ও বৃষ্টির ছাই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয় এবং জমীও সমস্ত হয়।' গোময়-সম্বন্ধে ইহা সকলের জানা উচিত যে, অত্যন্ত জীর্ণ, বঁকা, রোগাক্রান্ত বা রোগগ্রস্ত গাভীর গোময় আহরণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

গোময়ের শুণ-সম্বন্ধে হারীত-সংহিতায় ও চিকিৎসা-গ্রন্থসমূহে অনেক বচন আছে। আমরা নিম্নে কেবলমাত্র হৃৎপ্রত্যের বচনটা উদ্ধৃত করিলাম:—

"গোমূতঃ কহীত্বৈকম্বং সকারহারাভম্।
লব্ধ বীরাণ্যং মেধাং পিত্তকঃ কফাতন্ত্রিঃ ॥

মূল-ওষধিঃ সারং-বিরেকঃ সারং-পানীয়ঃ।
মূত্রপ্রণেয়ঃ সারং-পান্যং মূত্রং প্রণেয়ঃ ॥"

অর্থঃ—গাহারা মুক্তিবাদী, সকল বিষয়ই মুক্তির বিশপ দুর্ভাগে দেখিতে চাহেন, তাহার গোজাতিতে উপকারিতা সমালোচনা করিয়া নিম্নরূপেই বলেন যে, গো-মেঘা, গোপালন, গোফা-ভাত-বাসী মাঝেরই অতি কর্তব্য। আর শাস্ত্র-বিদ্যাসী ভদ্র হিন্দুসম্প্রদেই চক্রে পাতী ভগবতীর আচার্য। তাহার। গাভীকে পুত্র বলিয়া মনে করেন না; দেবতা বলিয়া পূজা করেন। গো-মেঘা, গোপালন হিন্দুর ধর্মকর্মের মধ্যে পণ্য, না করিলে প্রত্যাহার আছে। গোহত্যাকে তাহার। মহাপাপক বলিয়া বিশ্বাস করেন। গাভী, আহার করিতেছে বা-জলপান করিতেছে, এমন সময় তাহারে নিবার করা, নও হারা গাভীকে আশাত করা, গাভীকে উচ্ছিন্ন ভোজন করিতে দেওয়া—এ সকলও তাহার নিকট নৃশাপাতক। কিন্তু অতীত হুৎথের বিবরণ যে, এই সকল শাস্ত্রবিশ্বাস প্রতীপালনে হিন্দুসমাজ আজ কাল শিথিল-বহ হইয়াছে। গোজাতির উপভুক্তরূপ সেবা ও পালনের সমুদ্র-ভেদী হইতেছে বলিয়া গোজাতি ত্রমে হীন অবস্থা

প্রাপ্ত হইতেছে। সেকালের মত প্রচুর হুৎথ পুণ্ড্রা যায় না; তেমন বসিষ্ট ও পরিম্পর্গই ব্রহ্ম-সম্ভাচার দেখা যায় না,—একজন নিম্নরূপে আমাদের শাস্ত্রাংশুমান অবহেলার বিষয় কয়। তাহার উপর আবার ভারতে মিলাতীয় বিশ্বদী বন ও ব্রহ্মহৃদিগের জাল্য গোজাতির বিশেষ হ্রাস হইয়াছে ও হইতেছে। এমন সময় যে সকল মাহাত্ম্য গো-রক্ষা ত্রতে কৃতসম্বল হইয়াছেন, তাহার। হিন্দুসম্প্রদেই বিশেষ মন্যবাদের পাত্র। বাহ্যতে তাহাদের চেষ্টা কম্পনীয় হয়, সে বিষয়ে ব্রহ্মপাদ্য সাহায্য করা হিন্দুসম্প্রদেই অবশ্য কর্তব্য; যেহেতু, সে চেষ্টা ফলবান হইলে, ঐহিক পারত্রিক উত্তরবিদ মৌল সংসাধিত হইবে।

মহাবিদ্যা-সাধন।

তৃতীয়া মহাবিদ্যা—বোড়ী-প্যান।

বালার্কমণ্ডাভাসং চতুর্ভূহং ত্রিপোচানাম।
পাশাচ্ছশরাং-চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং ভজঃ ॥

ব্যখ্যা।

অবিত্রী শব্দ-নাতিপদের উপর।
রাজ্যরাজ্যের বীরে বরণেছেন হর।
বালার্কমণ্ডাভাসং রক্তিমবরণ।
চতুর্ভূহং পাশাচ্ছশর-ধারসন।
ত্রিভাস হুশোচিত, চ্যামং-কর।
বোড়ীমূর্ত্তয়ে, নম্র হুর্গে গো তোমার ॥

মানসপূজা।

কর মা বোড়ীদেবী হুদে অধিষ্টান।
মানসে করিব, পূজা অর্জুন সন্তান।
সাধিতানপরে আছে সগলসময়।
পাশ্য দিব চরণে লুইয়া সেই জল।
বায়ু আছে অনাহতে বাজনি তায়।
মণিপুং-অবি শেষে যোগে কাঁচ সায়া ॥
পূজ্যপ্রদায় আছে ক্রিতি-সুগুণ-সুভিকারী
প্রতিমা গঠিব তব পীঠপ্রবালিকা ॥
বিত্তভক্ষমল সেই আকাশমণ্ডল।
তাহাতে রাবিব ভক্তি হুৎথং শীতল ॥

তোমার রূপের জ্যোতি সে চাঁদের ভাতি।
বিস্তৃত করিবে মন-অন্ধকার-পাতি।
হইবেক এ বর সমস্ত আলোময়।
অভ্যর্থন করি লব বোধানে যে ব্রহ্ম।
হুৎথম্বে, হাকিনী সে ব্রহ্মত্ব-শাকিনী ॥
হুৎথয়ে কাকিনী আর নাহিতে দক্ষিনী ॥
গিৎথয়ে ভাকিনী আর হুৎথিনী মূল্যে।
মিলাব তোমার সঙ্গে সাহসের তুলে ॥
ব্রহ্মসুত্র ব্রহ্মবিদ সংমিলিত হও।
সেই দিন দাও আর এই পূজা লও ॥
ব্রহ্মনে হুৎথনী রাবি তোমার পুজিয়া।
মানস করিব পূর্ব নাচিয়া নাচিয়া।
ভেদিয়া সে ব্রহ্মরূপ পণ্যাইয়ে প্রাণ।
এই কর শীঘ্র মম সাধন-নিধান ॥

বোড়ীশক্তোত্র।

কোড়শ শক্তি, ত্রিপুরাশক্তি,
রাজ্যরাজ্যের, রূপসীসার।
ওমা ত্রিপোচনে, হের ত্রিপোচনে,
নির্গুণ নন্দনে, কুলনা আর।
নগেন্দ্রনন্দিনি, জগৎবংশিনি,
হইয়া যোহিনি, ভূলাগে হের।
হরপ্রাধিকার, তমোপাধিকার,
তমোবিশাশিক, তমো-হের ॥
ত্রিজন-বংশনি, ত্রিজন-পালনি,
ব্রহ্মজ্ঞানপালনি, অশ্বচ জ্ঞপ্তা ॥
তুমি বশকর্ত্ত, তুমি ভবসেতু,
তুমি ভবসেতু, ভজিতে গিষ্ঠা ॥
গোমোনিরূপা, সচ্চিদ্রূপা,
সরগু অরূপা, রূপবিস্তর ॥
যে পারেচাঁদে, সে পারে কিনিতে,
শমনে, জিনিতে, তার কি ডর ॥
অঙ্গপদবী, শম্বরপদবী,
বিপদে তরবী, তত্ত্বসীসার।
ভালে শশিচাঁদ, রূপে জ্যোতিছটা,
দেখে রিপু ছটা, থাকে কি আর ॥
কনুঘারিণি, পদে আছি গুণী,
তা বলে ত্রিগুণী, তাজ্ঞ না জানে ॥
পূজ্যপ্রদায়, গাই মগ্ন গান,
জন্তে দিও হান, ওপদ্যপ্রভে ॥

জন্মি অন্য বিলাতে চাকাহীন লাঙ্গলের ব্যবহার আছে। আমাদের দেশে বিলাতী লাঙ্গলের অনুকরণে নামাশ্রকার নুতন ধরণের লাঙ্গল প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু উহার কোনটিকেই প্রায় চাকার ব্যবস্থা নাই। বাহ্যিক এই সকল লাঙ্গলের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার পাখা ও ফলের উন্নতির জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কণ্ঠের গভীরতার ভ্রাস বৃদ্ধি করা হাঁতে পারে, তৎপরিণতি নষ্ট করিতে নাই। বাঙ্গলা দেশে যদি কখন নুতন ধরণের লাঙ্গল প্রচলিত হয়, তাহা হইলে চাকাহীন লাঙ্গল অপেক্ষা চাকামুক্ত লাঙ্গল চলিবারই সম্ভব বোধ। কারণ প্রথমতঃ চাকাহীন লাঙ্গল-চালান অপেক্ষা, চাকামুক্ত লাঙ্গল-চালান সহজ, পাকা চাচী না হইলে চাকাহীন লাঙ্গল চালাইতে পারা কঠিন; দ্বিতীয়তঃ চাকাহীন লাঙ্গলে যেনে অধিক কৌশলের আবশ্যকতা, সেইরূপ অধিক ব্যয়ও প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের সৌকর্য বল নাই। ইহা ব্যতীত এদেশের জমি ছায়ায় ছায়ার সমতল, কাজেই চাকামুক্ত লাঙ্গল চালাইবার কোন সম্ভাব্য নাই।

বিলাতী লাঙ্গল ঘোড়ার টানে। সমগ্রসর একখানা লাঙ্গলে একজোড়া ঘোড়া মোড়া হইয়া থাকে। কিন্তু ঘোড়ার কথা জমিয়াছে যেমন মনে না করিলে, বিলাতী লাঙ্গলের ঘোড়া আমাদের দেশের ঘোড়া ঘোড়ার মতো। বিলাতে লাঙ্গলের ঘোড়া এক একটা হস্তী বিশেষ, সেগুলি ঘোড়া একেই প্রায় দেখা যায় না। সে জাতীয় ঘোড়া লাঙ্গল ও দুই-দুই-বোলাই পাড়ী বা 'অমনিবল' টানিবার জন্যই প্রতিপালিত। আমাদের দেশের একজোড়া ভাল বলদ 'সে লাঙ্গল' টানিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ইহাও দেখিয়াছেন কোন কোন হাফে আঙ্গিও বলদে লাঙ্গল টানে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এক এক খানা লাঙ্গলে দুই তিন ঘোড়া, বলদ মোড়া হইয়া থাকে।

বিলাতে একখানা লাঙ্গল, একজোড়া ঘোড়া ও একটা লোককে একদিনে ৩০ বটায় এক একবার প্রথম তিন বিঘা জমি চাষিয়া থাকে।

উপরেই উল্লেখ করিয়াছি, বিলাতী লাঙ্গলের অনুকরণে, ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশের গবর্ণমেন্টের কৃষিকর্মচারীরা নামাশ্রকার নুতন নুতন লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ অমুক লাঙ্গল এক বৎসরে হাজার বিঘার হইল, অমুক

দুই হাজার বিঘার হইল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সকল লাঙ্গল কোন ক্রমক-ব-ইচ্ছায় ক্রম করে না। গবর্ণমেন্ট-কর্মচারীদের ভাও বাতিরে, ওয়ার্ডেট ও বাসমহলের প্রকারে এবং কোথাও কোথাও জমিবার ও তালুকদারেরাও নুতন ধরণের লাঙ্গল কিনিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের কেনা এই পর্যন্ত, লাঙ্গল জমিতে প্রায় যায় না, হয় পোহালে না, হয় বরেন্দ্র-পল-লাঙ্গল পড়িয়া মড়িয়া ধরিতে থাকে।

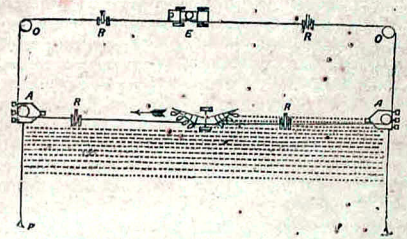
এত বয় ও এত চেষ্টা করেও চাচীরা নুতন লাঙ্গল কেনে পছন্দ করে না? প্রথমতঃ সকল নুতন লাঙ্গলই বেশী লাঙ্গল অপেক্ষা ভারী, এবং দেশের একজোড়া বলদ উহা সহজে টানিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এ সকল লাঙ্গলে কাষার চাব চলে না, কেবল গুলার চাবের ব্যবস্থা। কৃষকে একরূপ দীক্ষণ অবস্থা নহে যে, দুইখানা লাঙ্গল রাখে, একখানা 'অগ্রপ্রহরী', একখানা 'পোষাকী'। নুতন লাঙ্গল না প্রচলিত হইবার এই দুই প্রধান কারণ। ইহা ব্যতীত অধিকাংশ নুতন লাঙ্গল চালাই নোয়ারপ্রস্তুত 'কাজেই একবার ভাবিলে আর জোড়া যায় না। পেটালোহা নির্মিত হইলেও পলিগ্রামের কর্মকারেরা' উহা সহজে সেরামত করিতে পারে না।

ইহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমরা লাঙ্গল উন্নতির বিরোধী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমাদের দেশী লাঙ্গলের যে পরিবর্তন ও উন্নতি আবশ্যক, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি। কিন্তু এদেশের কৃষক ও কৃষির অবহাভিজ লোক ভিন্ন কেহ এ কার্যে দক্ষ হইতে পারিলে না।

এজিন অর্থাৎ 'কল' লাঙ্গল-চালানার কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। কলিকাচার রাষ্ট্রা মোরামত করিবার জন্য মেরুপ বোলার-এজিন দেখিতে পাওয়া যায়, লাঙ্গল চালাইবার এজিন বা কল দেখিতে প্রায় সেই রূপ। কল কিন্তু লাঙ্গল চলে ও জমি চাষ হয়, তিনটা চিত্রদ্বারা তাহা পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল।

৩য় চিত্রে সারেক ধরণের কল-লাঙ্গল-চাষ দেখান হইল। কাপড়টাকে জমি মনে করিয়া লও, R-চিহ্নিত যন্ত্রটা-কল বা এজিন; ইহাকে জমির উত্তর দিকের বসান হইয়াছে। জমির উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম কোণে C-চিহ্নিত দুইটা কপিকল এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে A-চিহ্নিত দুইটা নোঙ্গর বসান হইয়াছে; নোঙ্গর দুইটার ঢাকা

২য় চিত্র।



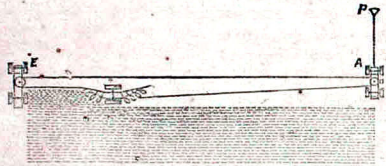
আছে, আবশ্যক হইলেই সেই চাকা দ্বারা নোঙ্গর সহজে টেনিয়া সরান হাঁতে পারে। নোঙ্গরের উপরে একখানা ও এজিনের নীচে দুইখানা চাকা সমতলভাবে স্থাপিত আছে। একটা যে বাঁক আঁকা দেখিতেছে, তাহার পশ্চাত্তাঙ্গের যন্ত্রটী লাঙ্গল; ইহার একদিকে চারিটা ফাল ও অপর দিকে আর চারিটা। লাঙ্গলের উপর একটা বস্ত্রাঘর স্থান আছে, তাহার উপর একটা লোক বসিয়া আবশ্যক মত এদিকের চারিটা ফাল জমির উপর নামাইয়া দিতে ও অপর দিকের চারিটা ফাল জমি হইতে তুলিয়া রাখিতে পারে। এজিনের নীচে যে দুইটা চাকা আছে, তাহাতে এক ঘাছি দড়ি জড়ান আছে; যখন এজিন চলে, তখন চাকা দুইটা এইরূপ ভাবে ঘুরিতে থাকে যে, যখন একটা চাকাতে দড়ি জড়াইতে থাকে, অমনি তাহার সহিত যিটার চাকার দড়ি ঘলিতে থাকে। দড়ি-বাছটার দ্বারা উত্তর-পূর্ব কোণের কপিল ও পশ্চিম দিকের নোঙ্গরের উপর দিয়া, লাঙ্গলের পূর্বদিকে বাঁধা, এবং অপর খুঁট সেইরূপ উত্তর-পশ্চিম কোণের কপিল ও পশ্চিম দিকের নোঙ্গরের উপর দিয়া, লাঙ্গলের পশ্চিম দিকে বাঁধা। দড়ি বাহাতে জমিতে পড়িয়া ধৌবড়াইয়া না যায়, সেই জন্য R-চিহ্নিত চারিটা যন্ত্র দ্বারা তাহাকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। A-চিহ্নিত নোঙ্গর দুইটা C-চিহ্নিত দুই হাফের নমী দিয়া বাঁধা, কারণ তাহা না হইলে রসীর টানে উদার-উত্তর দিকে সরিয়া যাইবে। ১ম চিত্রে দড়ির যে খুঁট লাঙ্গলের পূর্বদিকে বাঁধা, সেই খুঁট এজিনের নীচের একটা চাকা

হইতে ঘুরিতেছে ও অপর খুঁট দ্বিতীয় চাকার জড়াইতেছে, সেইজন্য লাঙ্গল পশ্চিম মুখে চলিয়াছে। লাঙ্গল যখন পশ্চিম মুখে চলে, তখন চারিটা ফাল চাষিয়া যায় ও অপর চারিটা ভোলা থাকে। লাঙ্গল যখন জমির পশ্চিম দিকের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়, তখন এজিন এইরূপ করিয়া চালাইতে, হয় যে, দড়ির যে খুঁট লাঙ্গলের পশ্চিমদিকে বাঁধা, সেই খুঁট চাকা হইতে ঘুরিতে থাকে ও অপর খুঁট চাকায় জড়াইতে থাকে, কাজে কাজেই লাঙ্গল পূর্ব মুখে চলে। লাঙ্গল যখন পূর্বাভিমুখে চলে, তখন প্রথমতঃ চারিটা ফাল জমি হইতে তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং শেবাক চারিটা জমিতে নামাইয়া দিতে হইবে। লাঙ্গল একবার জমির একদিক হইতে অন্য দিকে আসিল, অমনি নোঙ্গর দুইটা টেনিয়া সরাইতে দিতে হয় এবং R-চিহ্নিত যন্ত্রগুলিকেও সরাইতে দিতে হয়। দড়ি যেমন, তেমন হইলে চলে না, গোয়া বা অস্ত্র কোন যন্ত্রের তার পাকাইয়া যে মোটার রসী প্রস্তুত হয়, তাহাকে আবশ্যক। একটা কলের জট যিনি হাজার হাত রসীর আবশ্যক এই প্রকার সাবেক-বলবান্ধ-কল অনেক রসী, নোঙ্গর, কপিকল, R-চিহ্নিত যন্ত্র ও তাহাদ্বিকের সরাইবার যন্ত্র-সমিতি ও যন্ত্র কাজের জট অনেক বেশী কাল্য পড়িত; সেই জট অবশ্যবস্ত্র-উঠিয়া গিয়া ইহারই ভাঙ্গচুর করিয়া একটা স্বস্তর হইয়াছে।

এক পাশে কল না বসাইয়া এক কোণে কল বসান হইল। মনে কর '১ম চিত্রের উত্তর-পশ্চিম

কোন O-চিহ্নিত কপির পরিবর্তে সেই স্থানে F-চিহ্নিত এঞ্জিন বসান হইল; এঞ্জিনের নীচের ঢাকা হইতে রস্মী উত্তর-পূর্বকোণের কপির উপর দিয়া না বিয়া, বরাবর কোণাক্রুপ পূর্ব দিকের A-চিহ্নিত নোঙ্গর দিয়া পূর্ববৎ লাঙ্গলে বাঁধা হইল। ইহাতে বড় ঞ্চায় শিকি বাঁচিল, তা ছাড়া কপি ও ও-চিহ্নিত যন্ত্র অনেকগুলি বাঁচিল।

৩য় চিত্র।

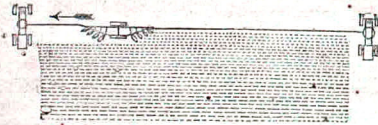


বাইয়া লাঙ্গলের অপর দিকে বাঁধা। রস্মী একটা চাকার যখন জড়াইতে থাকে, তখন ত্রুণের ঢাকা হইতে উহা গুলিতে থাকে; এইরূপ প্রকারে লাঙ্গল জমির এক দিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত চাষিয়া যায়। এঞ্জিন অবশ্য ক্রমে ক্রমে এক পাশ দিয়া অপর হইতে থাকে, নোঙ্গরকেও অপর পাশ দিয়া সরাইয়া দিতে হয়। ইহাতে আরও রস্মী ও

ক্রমে ইহা অপেক্ষাও সহজ প্রণালী উদ্ভাবিত হইল; ৩য় চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল, ইহা দ্বিতীয় বর্ধনা আবশ্যক করে না; B-চিহ্নিত যন্ত্র এঞ্জিন, A-চিহ্নিত যন্ত্র নোঙ্গর, F-চিহ্নিত স্থানে রস্মীয়ার বাঁধা। এঞ্জিনের নীচে পূর্বের ঞ্চায় দুইটা সমতল ঢাকা হইতে রস্মী বরাবর লাঙ্গলের একদিকে বাঁধা এবং দ্বিতীয় ঢাকা হইতে রস্মী নোঙ্গরের উপর দিয়া

অগ্রভাগ যন্ত্র ও মজুরি বাঁচিয়া যায়; তা ছাড়া ইহাতে চবার কাজও সহজ হয়—কারণ রস্মী কতকগুলি নোঙ্গর ইত্যাদির উপর দিয়া না যাওয়ায় এঞ্জিনের জোর বা বল কমে না। ক্রমে ইহাতেও অনেক অস্থিবা দৃষ্ট হইল ও ইহার নানা পরিবর্তন হইল। অবশেষে আবিষ্কার দ্বারা প্রচলিত সেই প্রকার প্রণালীর আবিষ্কার

৪র্থ চিত্র।



হইল; ৩য় চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল। জমির দুই পাশে দুই কল বা এঞ্জিন, অত্যন্ত এঞ্জিনের নীচে একখানি (দুইখানি নাহে) করিয়া সমতল ঢাকা, লাঙ্গল বানি দুই পাশে রস্মীয়ার দুইখানি এঞ্জিনের চাকার সহিত বাঁধা। এক সময়ে একখানি এঞ্জিন চলিতে থাকে ও অপর বানি বন্ধ থাকে। যে এঞ্জিন চলিতে থাকে, বসীপাছটি তাহার চাকার

জড়াইতে থাকে, ও লাঙ্গলখানি সেই এঞ্জিনের দিকে চলিতে থাকে; এবং যে এঞ্জিন বন্ধ তাহার চাকা হইতে রস্মী গুলিতে থাকে। লাঙ্গল জমির একদিক হইতে অপর দিকের দিকে আসিলে, উল্লিখিত বন্ধ করিয়া অপর এঞ্জিন চালান হয় এবং লাঙ্গল আবার গিরিয়া সেই দিকে যায়। এই প্রকার কলের অনেক স্থিবা; কপিকল ও নোঙ্গরের কিছু

দরকার নাই, মজুরি অনেক কম পড়ে, রস্মী অনেক দীর্ঘতায় এবং কপিকল ইত্যাদি নাই। বসীয়ার কলের পুরাতনের লাঙ্গলে পড়ে। তা ছাড়া এক জমিতে কাজ শেষ হইলেই বুসাদী লইয়া এঞ্জিন অপর জমিতে যায়, বাড়তি বহন করত লাগে না। দুই জন প্রতিবাদী কলক ভাঙ্গে এক শেট কল কিনিলে, চাষ কারের পর দুইটা এঞ্জিন দুই জনে লইয়া নিজের নিজের ধান কাড়া, জলকাটা ও অগ্রভাগ কাজ করিয়া লইতে পারে।

বার হাজার টাকার দুইটা উপযুক্ত এঞ্জিন ও তাহার উপযুক্ত লাঙ্গল প্রভৃতি কৃষিকার পাওয়া বাইতে পারে। সমস্ত বৎসর চাষের কাজ চলে না, বৎসরে তিন মাস কাজ চলিলেই যথেষ্ট। অত্রের ধরা বাড়ুক, রোজ ২০ মটা করিয়া তিন মাস কল চলি। এইরূপ হাল যেতিয়ার লইয়া কাজ করিতে প্রতিদিন কত বরচ পড়ে, তাহার একটা হিসাব নীচে দিতেছি;—

হুস *	১৩/০৪০
মেরামত *	৪/১০৮
করগা *	১২/০
৪ জন শোকারে মাথিনা	৩
ঠেল	১
অগ্রভাগ বাবৎ দরশ	১০

মোট বরচ ৩৭

এই হাল যেতিয়ারে রোজ ক্রিপ চাষ হইবে, তাহার একটা হিসাবও এই সঙ্গে দেওয়া উচিত। জমির ইতরনিম্নে কালের ইতরনিম্নে অবস্থাই হইবে; বেলে জমিতে চাষ দেওয়া সহজ হয়, মনে জমিতে তেমন হয় না। আরও এক কথা, অত্র দেশে লাঙ্গল দেওয়া অর্থে বাবা বুকায়া, আমাদের দেশে তাহা বুকায়া না। অত্যন্ত মটেল মাটি হইলে, কলের লাঙ্গলে রোজ ৩০ বিদা জমি

অন্যায়সে লাঙ্গল দেওয়া যায়। জমি মাধারিা প্রায়ে হইলে ও লাঙ্গলে কটা কাল থাকিলে, এমন কি ৬০ বিঘারও আশক লাঙ্গল দেওয়া হইতে পারে এবং ১০০ বিঘারও অধিক মে দেওয়া চলিতে পারে। মনে কর কোন বর্ধন ৬০০ বিদা জমি চাষ করিলে (বিলাতে এরূপ চাষ অনেকের আছে)। তিন মাসের মধ্যে ৬০০ বিদা চাষ করিতে হইলে, মাসে ২০০ হাজার বিদা অর্থাৎ রোজ প্রায় ৩৭ বিদা চলিতে হইবে। ইহার জন্ম তাহারে নিদানপক্ষে ২০০ শত হাল ও বলদ সমস্ত বৎসর ঘুমিতে হইবে। বলদ পেছু ন্যূন সাংখ্যায় মাসে ২ টাকা বরচ ধরিলে, বৎসরে ৪০০ টাকা বরচ। তা ছাড়া ২০০ বলদ ঘুমিতে ক্রিপ আয়োজন ও কুঠি বাকার আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। এদেশে অনেক জমি লইয়া চাষ করার আরও এক বিশেষ অস্থিবা আছে। পালে যদি একবার গোমড়ক দেখা দিল, তাহা হইলেই আর কখাই নাই। দেবদুর্বিপাকের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে হইবে যে, চাষের কাজ বড় জোর বৎসরে তিন চারি মাস চলে; বাকী সময় বলদ বিশ্রাম বাইবে ও তাহার বরচ যোগাড় করিতে হইবে। শস্যের বদলে এঞ্জিন রাখিলে তাহারে বসাইয়া ণাওয়াইতে হইবে না এবং গোমড়কেরও ভয় নাই। লোকমানের মধ্যে কেবল সেই কয়-মাসের টাকার মূল্যট।

আমাদের দেশের অনেক স্থানে জমির বেরপ বন্দোবস্ত, তাহাতে কোন কৃষকেরই এক জোতে দশ বা পনের বিঘার অধিক জমি নাই। এক একটা জোত প্রায় পাঁচ ঘু বিঘা ও তাহার চারি ধারে এক একটা আলি। জমির এরূপ বন্দোবস্ত থাকিলে কলের চাষ করণ প্রচলিত হইতে পারে না; এবং কেবল কলের চাষ প্রচলিত করিতে হইবে বলিয়া এরূপ বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিতে হইবে, তাহারও কোন উপযুক্ত কারণ দেখি না। তবে এমন অনেক জমিদার আছে, যাহাদের অনেক জমি পড়িয়া আছে, এজা বিলি নাই, তাহার চেষ্টা করিলে কলের চাষ চালাইতে পারেন; এবং আদারী ভাষাধিপিক বিন্ধ্য বণিতে পারি যে, বিংশশতাব্দীর সহিত কাজ করিলে তাহাতে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। অনেক পরিমাণ জমি চাষ করিবার বিশেষ অস্থিবা; মজুর ও বলদের অভাব; মজুরের অভাবে চাষ বন্ধ থাকিতে পারে। যখন

* শতকরা ১০ টাকা হিসাবে বার হাজার টাকার বার্ষিক হুদ ১২০০ শত টাকা; যে তিন মাস কাজ চলে, সেই তিন মাস বা ৯০ দিনে তাহা ভাগ করিয়া দিলে রোজ ১৩/০৪। শতকরা ৫ টাকা হিসাবে বার হাজার টাকা হুদের কলের বার্ষিক লোকসান বা মেরামতি ৫০০ শত টাকা; যে তিন মাস কাজ চলে, সেই তিন মাস বা ৯০ দিনে ভাগ করিয়া দিলে রোজ ৫/১০৮।

সময় উপস্থিত হইল, তখন একেবারে সকল কান্না আরম্ভ করিতে হয়, কাজেকাজেই মজুরের স্থান হইয়া উঠে না। কল থাকিলে সে অস্থান হয় না, অনেক কাজ আর সময় মধ্যে হয়, মজুর আসিল কি না আসিল, তজ্জন পূর্ণ পানে চাহিয়া থাকিতে হয় না।

তিনিই বড় রকমের চাষ করিবেন, তাঁহারেই যে কল আনিতে হইবে এখন কোন কথা নাই। ইহাতে বাক্যও চলিতে পারে। কোন ভূমিয়ার বা ব্যবসায়ের এক শেট কল আনিয়া ভাড়া দিতে পারেন, তাঁহার কল ভাড়া লইয়া পার্শ্ববর্তী হই তিন বা সাত্তরিক জমিদার স্বয়ং জমি আবাদ করিয়া লইতে পারেন।। শিল্পের অধিকাংশ কলের চাইই এইরকম হইয়া থাকে। একজন টাকাগালা কল এক শেট কল কিনিল, পার্শ্ববর্তী হই তিন জন কলক তাহা ভাড়া লইয়া নিজের জমি চাষিয়া লইল।

কতকগুলি বিশেষ কথা এখনও বলা হয় নাই। এখন, কল চহিতে হইলে জমি একসা হওয়া আবশ্যক, অধিক উচ্চ নীচ হইলে সেই জমি কল চাষার উপযুক্ত হইবে না; বাহালা দেশে এ কথা বলা এক প্রকার বাহালা, কারণ সকল জমিই প্রায় একসা। দিটার, এক এক কিতার একতর দুইতর বা তিনতর বিবিধ জমি থাকিলে ভাল হয়। তৃতীয়, জমি যত চিরি চৌকা হয় ততই ভাল; বৈকটুরা আসি থাকিলে কলের চাষ চলে না। চতুর্থ, জমির মাঝে নালা থালা বা নদী থাকিলে চলিবে না। পঞ্চম, এজলাস কোমোয়ারের জমি জমির এক পার্শ্বে একটা চৌবাচ্চা বা ছোট পুকুর থাকা চাই, তাহা না হইলে কলে জল ভুলিবার হুখিয়া হয় না। ষষ্ঠ, প্রতিজিত জমির লই পাচহু হইয়া হাত প্রশস্ত পরিমিত জমি রাস্তা-বস্ত্রপে রাখিতে হইবে, এই পঞ্চ দিয়া এজলাস ব্যতীত করিবে।

জমি কালি বালা অঞ্চলে অনেক চাষ করিতেছেন। এই সকল স্থানে মজুরের অভাব, এবং জমি ছোট ছোট কিতার বিভক্ত নহে। আমাদের বিবেচনায় “বারাং বেড় চারীরা” কলচাষ করিলে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু ।

রাধানাথ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সকল মন দিয়া শুনি, হুজুরীর বরক্স জ্যোদশ হইল। বনসি নাই, ভূষণ নাই,—অধিক কল, উপযুক্ত অন্নও নাই,—তথ্যচা রায়-শেখ, হজুরের হাফিম, হুজুরীর অন্ন-প্রসাদ খালাস্তব পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল।—নাথবাওতা যাবিধি প্রস্তুত হইতে থাকিল; নানরথ যথা-কথিৎ নীলপল্ল-খালিগে নিশানীয়া করিয়া তুলিল।

জ্যোদশ পূর্ণ হইল। তখন সর্বনিরন্তর মহাকাল, হুজুরীকে চতুর্দশবৎসর বয়স-রত্ন সমর্পণ করিলেন। এই মহামূল্য—“অমূল্য” রত্নের মূল্য নির্ণয় করা মনুষ্যা মহত্বের কর্তব্য নহে। আমি বনসি আকাশের নন্দ্যাকালি গধিবার ভার লইতে পারি;—সাহায়া-মন্ত্রভূমির অনন্ত বাসুকী-কলা গধিবার কটু-জি লইতে পারি,—বরক আমি গোবিন্দ তৈল একাকী শীতল হইয়া দলপলিগে শূন্যে বসিয়া থাকিতে পারি,—তথ্যচা আমি ঐ অমূল্য রত্নের মূল্যনির্ণয়ে সক্ষম নহি। হুনির্গল, হুৎ-শাস্ত্র বাসিকা-কলা হুয়াইয়াছে, অথচ ঐ কালের বনে একটু দ্বিধা-কৌকও আছে; আর ওগিরি নবরত্নে রঞ্জিত, নবীন, বৌদন নদী রত্ন ভঙ্গ দীত হইয়া, কলোলা-কলোলাছে দিক্‌মুখ পূর্ণ করিয়া, মহাবিক্রমে হু-কল কাপিয়া জেমশই নিকটাবর্তিনী হইতেছে। ঐ আসিল,—ঐ আসিল। শেষ, শেষ,—খুসি আদিয়া পৌঁছিয়াছে। কৈ না,—এখনওতা আমো নাই। ঐ যে,—ঐ যে,—হুজুরীর ঠিক এখন ঐ রকম কাল উপস্থিত। একালের বর্জন করা আমায় কর্তব্য নহে। আমি বর্জন করিতে অক্ষম হইলাম বলিয়া, ইহাতে যে হুজুরীর কিছু ক্ষতি আছে, তাহা নহে। অথবা হুজুরীর পমীর বা বিক্রমপ্রবিন্দ মণ্ডলীর যে বিশেষ কিছু ক্ষতি আছে, তাহাও নহে। ক্ষতি কিছ পাস্ট-বস্তের আছে;—আর সমগ্রিক ক্ষতি আছে, আমায়। হুজুরি যদি, হুজুরীর এই চতুর্দশ বৎসর বয়স-রত্নটীর (সৌভাগ্য-মমত এবং হুখীজন অমূল্য-মোদিত) মন্যক বর্জন করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মুহূর্ত্তেই অভীত-সামান্য ইতিহাসে আমায় নাম, হুসব অক্ষরে না হউক,

অন্তত রোপ্য অক্ষরে,—রূপার কিছু অভাব পড়িলে,—অন্তত তাম্রাক্ষরে অঙ্কিত হইত। হুজুমতী হেতু অধোবর অবধি রহিল না। পাস্ট-গণের ক্ষতি এই,—তাহারা হুজুরীর সেই মহা-রটীর যে, কিরণ অমূল্য স্তমীর আভা, কিরণ কমলার কাঁচি, তাহার কিছুই অক্ষয়ম রূপিতে সমর্থ হইতেন না। বলা বাহুল্য, এমতকথ যৎ হুজুরীর কিছুই ক্ষতি নাই,—আমি বর্জন করিতে পারি আর না পারি,—হুজুরী—যা, তাই থাকিল। সমস্ত বর্জনে অসমর্থ হইলে, সমস্তের বেশ কম হয় না। হীরকের যথার্থ বর্জনে অসমর্থ হইলে, হীরকের জ্যোতি কম হয় না। ভগবানের স্বরূপ বর্জনে সক্ষম না হইলে, ভগবানের তাহাতে কোন পোষক কম হয় না।

হুজুরী, এই বয়স-রত্নের অধিকারিণী হইয়াও, হুজুরী। বয়সভাবে পূর্বে পনের আনা উল্লভ থাকিত; বাহির হইবার সময়ে সে একখানি শল্য-ছিন্ন বনসি পরিভ। সে কাপড়খানি এত দূর ছিল যে, হুজুরী তাহা পরিয়া আপনাপনি লজ্জিত হইত এবং সেই লজ্জানিবন্ধনই গ্রামের ভদ্রসত্রীতে বিন্দা করিতে, বা পাত ফুড়াইতে আসিতে পারিত না।

জমে দিন আর যায় না। হুজুরীর স্তমীর আশ্রয় হইয়া পড়িল। অনন্যনে বা অর্ধাননে শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িল। হুজুরী যমীকে উপদেশ দিল,—“লল, আমায় দু-জন জমীদার-ব-বুড়ি যাই। তাঁহার কাছে গিয়া কিছু ডিন্ডা করে আনি।”

স্বামী। না, যাওয়া হবে না। সেখানে গেলে, তিনি আমাকে ধারবেন।

ইতিপূর্বে গোত্রকে বিশ্বপ্রয়োগ-অপরাধে মুচি-গণ বিশ্ব প্রচারিত হইয়াছিল।

হুজুরী কহিল,—“না, কখনই তিনি ধারবেন না। আমি সেই জন্মই সঙ্গ বহির্ভেদ। তাঁর পত্নাব বড় দয়ালু। আমায় কিছু পড়িলে, তিনি কিছুই পাবে তেলতে পারবেন না।”

হুজুরী এবং গোত্র,—স্বামী এবং স্ত্রী—উভ-মেই জমীদার বাটা চলিল। হুজুরী ভাঙিলে বাহালা, বহালা আর সখ হয় না। ভাতের চাল নাই, পরিবার কাপড় নাই,—লজ্জাসরমই বা কথা হয় কিংবা, বাঁচ বা কোন করিয়া? যাই কোথা, কর কি?

জমীদার বাটা ঝাঁজ তিন দিন হইল; হুইটা থাকিৎ জলা আদিয়াছেন। জমীদার মহাশয় তাহারিগে নিমন্ত্রণ করেন নাই।—তাঁহার, দল-

তখন শিবজায়া সতীর ছায়া, বিনা নিমন্ত্রণে আপনা-পনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারাকিৎ উদার প্রজ্ঞতিক। “উদার চরিত্রদাতা বহুধৈর্য হুইখিক”। হুজুরী পরগৃহ পমেনে তাঁহার নিমন্ত্রণ বা আশ্রাসের অপেক্ষা রাখেন না। বিশেষ তাঁহাদের অধরে শ্রমভাষা বড়ই প্রবল। সেই প্রাবল্য-হেতু তাঁহার কলিকাভার তিষ্ঠিতে না পারিয়া মুকতবে আসিয়া পড়িয়াছেন।

আত্মর, জমীদার-বাটা তিন দিন কাল তাঁর গান-করিয়াছেন,—

“অনাদি অনন্ত ঈশ্বর হে।”

তিনদিন কাল একটানা বক্তৃতা করিয়াছেন,—

আত্মর সর্বকর্তৃত্ব যথাস্থিতি স পত্তিতঃ।

তিনদিন কাল অনবরত উগ্ৰবেশে গায়ছেন,—

ভবে ভেদজ্ঞান করানার নর।

তিনদিন কাল প্রত্যেক বার আহারের সময়

রুহং রুহইখালে মুড়া ধাবিবার কলি বলিতে,—

“ঈশ্বর-হিংসা বড় পাপ।”

জমীদার-মহাশয় এ সকল কথাবার ভাল মন্দ কিছুই বড় একটা বুঝিতেন না এবং তাঁহারের গান, বক্তৃতা-উপদেশ বা কথাতে বিশ্ববাসা উপাধন করা যুক্তিগত মনে করিতেন না। তিনি আতিথি পাইয়া কেবল আতিথ্যসেবা-তৎপর হইয়াছিলেন। কলিকাভা হইতে হুইটা হইয়েজী-জান্না সহরে ভ্রমণকে পাণ্ডাঘেরি অম্বাৎপূর্ণক তাঁহার বাটতে পণ্যপূর্ণ করিয়াছেন,—পাছে “তাঁহাদের” সেবার কোনরূপ জটী হয়, পাণ্ডাঘেরে নিশা হয়,—এই চিন্তাতেই তিনি অহরহ নিমগ্ন ছিলেন।

সে যাহা হউক,—হুজুরী এবং তাহার স্বামী জমীদার-সভায় প্রবেশ করিয়া বাহা, হুইটা প্রকৃত ভাষা অমনি আনিব লোচনে হুজুরীর প্রতি তাঁর চুটিপাত করিতে লাগিলেন। বিভ্রাণ বনে দুহের দিগ্‌সমুদ্র পাইল,—বাধ বৈদে সৃগ-শিত্ত অবলোকন করিল।

গোত্র কহিতে কহিতে বোড় হাতে বলিল,—

“আমায়। না যেতে-পড়তে গেলে আমায় মায়া পোলায়। আমাদের হয় একটা কিনারা করে দিন, নাহয় বেলে মেলুক।”

জমীদার।—না—না—এখন যা,—কাল আসিল।

—ওরে যে আছিস,—গোত্রকে মুচিকে একসর চাল দেও,—তাঁর হুজুরীকে একখানা পুরান কাপড় এনে দে,—

গোহাল তখাত কাঁদিত লাগিল,—বলিল,—
“জুহু! আজ একসের চাপ নিয়ে দেখে কি
করবে? কাল কি থাকবে?—আমাদের একটা
কিনারা করে বিন্—দোহাই! জুহু!—আমরা মরে
গেলাম।”

জমীদার। আচ্ছা, আচ্ছা—তাই হলে,—
কাল আসিস—আমি দুজন ভগ্নবাক্ত কল্‌কতা
থেকে এসেছেন,—তুই আজ যা,—

তখন সেই ধার্মিক ভাতৃদ্বয়ের মধ্যে উঠে ধার্মিক
ভাতা, ছাতি মিহিহবে, সিদ্ধ-উত্তরবর্তে থলি। উঠি-
য়ে,—না—না—তা-তা হলে না,—বারিয়ার হুং
তু আমরা থাকিতে দিব না—; এ যে নিদাশন বধ
আর বেহিতে পারি না—এ যে প্রাণে আর মরে না,
মরে না—

জমীদার। এ কি—আপনার ঢকে জল
আসিলে যে? আপনি কুড়িয়েছেন কেন?
সভা? অনেকটাই জাগিতো পাগলেন,—এই
ধার্মিক ভাতাটা কোনরূপ মস্তক জ্বলেন নাকি,—
অথবা কোন রকম অভ্যাস করত আছে নাকি—
নচেৎ হঠাৎ তাহে এরূপ জল আসিলে কেন? এই
বিষয় হামি হামি মুখে বেশ কথা কহিতেছিলেন,—
আর এখনি অখনি কারা বাহির হইল? এ কি—এ?
যা হউক, সে কারা সহজে খামিল না। ক্রমশ
আর এক ভাতাও উদিতো আরম্ভ করিলেন। উত-
তের বিলাপগোড়া সভাভুক্তি পূর্ণ হইয়া উঠিল।
উঁহাদের বিলাপের মর্ম এইরূপ—নারীকাতর
পরীগ্রামে যে এত দুর্ভিক্ষ, তাহা আমরা দেখেও ভাবি
নাই। নারোবৎসম্পন্ন রমণী অনাহারে জর্জরীর্ণ
হইতহে,—হই কথা ইউরোপপ্রভৃতি সভ্যদেশে
প্রচারিত হইলে, ভারতবর্ষে যে, বিশেষ নিম্নার বিষয়
তৎকালে ‘আজ কোন সময়ে না। বিশেষ,
যৌন-উত্তেজক রমণীগুলির প্রবাহ চিহ্নন-তথ
বাঁজা উচিত। পরাসীদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ
জ্ঞানপ্রবীণ পণ্ডিত কহিয়াছেন, নারীকাতর
বীরপ্রসবিনী করিতে হইলে, প্রতিদিন তিনবার
কিয়া গাওরের মাংস খাওয়ান একান্ত প্রিয়ের।
কিন্তু অমহ! সমুদ্রে এ কি ভীষণ দৃষ্ট। কল্‌কাতা-
বিশিষ্টা কামিনী গণ্ডারমানা! অনাহারে মরগোষ্ঠের
অবকানন অনাহার অবস্থিত! মরি! মরি!—

নিয়ম বিধাতা! কেনরে উত্থার!
ভাত্যে পাঠালে রমণী ক’রে রে।
এইরূপ অনেক বিলাপ করিয়া হুইছেন হুইটা
ইষ্টা করা যেতামহীন ন্যায়নরূপ কাপড়ের
অতি পুরান পিরিহান কুছনীর উদ্দেশে পোকাকু
প্রদান করিলেন। নগ্ন চারি আনার হিসাব
এটি আনা গিলেন। এবং বলিলেন,—“হইত
যদি আজ কলিকাতা, ধার্মিকতাম যদি ধর্মমন্ডলে,
তাহা হইলে এখন উভয়ের সর্বস্বত্ব অচিরে দূর
করিতাম।”

ধানকার্য শেষ হইলে, ঐ দম্পতীকে ভাতৃদ্বয়
কলিকাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন।
ইহাকালে উভয়ের অঙ্গদ্বয়ের কোন কষ্ট হইবেই
না—আপিত উভয়ে স্বর্ষের কীরোরামমুখে তুষিয়া
থাকিবে। এই প্রস্তাবে পোক প্রথমতঃ সম্মত
হয় নাই; কিন্তু কুছনীর কথায়, ধার্মিকদ্বয়ের সহিত
সম্মত কলিকাতা-গমনই গোহাল শেষে স্থির
করিল।

ভাতৃদ্বয়ের ভেদজনন ছিল না। শুনা যায়,
পর দিবস ভাতৃদ্বয়, কুছনীর সহিত একই শব্দে,
একই থানসনে, একত্র বসিয়া কলিকাতা যাত্রা
করিয়াছিলেন।

সহবাস সম্মতির আইন।

বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিতো পাই, সহবাস-
সম্মতির ব্যতীতই আইন আদানী ২০ শে মার্চ
৭ ই চতুর্থপ্রকাশ হইল।

ইংরেজ-রাজ্যে কোটা ভারতবাসী কল্ল-
আর্জনে বস করিতে করিলেন না,—মহাশয়ের ৫
সালের বেখাপপত্রের আজা গ্রাহ্য করিলেন না;—
প্রজার ধর্মদানের কথা ভাবিয়া দেখিলেন না;—
সংশোধনা, যুক্তি, যুগ্ম অবলম্বন করিলেন না,—
লোকের মনে রাজতন্ত্রের ভ্রাসের কথা চিন্তা করিলেন
না,—মুম্বশ মাতঙ্গের ভায়, পুরুত-নিগত যোগবীরা
নগীর ভায়, ইংরেজ-রাজ আদানমানে, এক খোঁরিয়া,
কতপক্ষে গন্তব্যপথে চলিয়াছেন। কাজ ভাল হই-
তেছে না।

জানিনা কোন উপায়ে ইংরেজ-রাজের এই জন্ম
অকস্মাৎ পূর্ণ হইবে?

বুঝিউতে বহে বাকি করেন নাই। বিলেন
বিরুদ্ধে অন্তত দশ সহস্র দরখাস্ত রঙলাট ভরনে
উপনীত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ বিরুদ্ধে দেশে

সভাসমিতি যে কত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।
কখন প্রথম নং গণির সংখিপ্ত বিবরণ দেখুন।

১ম ৫ই মার্চ—পটলভাড়া আলবার্ট হল—
সভাপতি পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকবরত সমাধায়া, বঙ্গা—
শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

২য় ৮ই মার্চ—১২ নং জানবাজার স্ট্রীট
সমিতি সভা—শ্রীকৃষ্ণ রাজা গিরীধারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সভাপতি—রাজা শশিন্দ্রধরবর, পণ্ডিত,
শ্রীশম্ভর তর্কচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ-
মোহন বিদ্যার প্রভৃতি মহোদয়গণ সভায় উপস্থিত
ছিলেন।

৩য় ১১ই মার্চ—বাগবাজার শ্রীকৃষ্ণ-নন্দলাল
বরুণ বাড়া মজলিস সভা—পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রশেখর
চট্টোপাধ্যায় সভাপতি।

৪র্থ ১২ই মার্চ—পটলভাড়া আলবার্ট হল
(২য় দিন) ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র উদ্ভিদবিদ্যা-
গবেষক সভা—রাজা গিরীধারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভা-
পতি—হুই একটা ব্রহ্মচর্য এই সভায় উপস্থিত
করে।

৫ম ১২ই মার্চ—আলবার্ট হলের সভা
ভাঙ্গিয়া গেলে গোলাদিবীর ধারে প্রকাশ্য ময়দানে
সভা হয়। শ্রীকৃষ্ণ রাজা শশিন্দ্রধর জেটীস এই
সভায় বক্তৃতা করেন।

৬ষ্ঠ ১০ই মার্চ—গোড়াঘাটে সভা। শ্রীকৃষ্ণ
গোপালচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের ভবন। সভাপতি
পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ভাণীকমল-তর্পাদান। শ্রীকৃষ্ণ
অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীকৃষ্ণ রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি
মহাশয়ের উপস্থিত থাকেন।

৭ম ১২ই মার্চ—শোভাবাজার মহারাজ
কল্লগল বাহাদুরের ভবন। সভাপতি মহামহো-
পাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন বিদ্যার মহাশয়।
করিয়াজুলুচুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চাঙ্গলাল সেন, কবি-
রাজ শ্রীকৃষ্ণদামোদর বিশারদ, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-
প্রসন্ন বিদ্যার, শ্রীকৃষ্ণ সীতানন্দ রায়, ডাক্তার
লালমণির মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ কালীনাথ মিত্র,
শ্রীকৃষ্ণ কিশোর রায়, শ্রীকৃষ্ণ যদুনাথ ঘোষ, পণ্ডিত
শ্রীকৃষ্ণ শম্ভর তর্কচূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণ শশিভূষণ মুখো-
পাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় তিন সহস্র লোক উপস্থিত
ছিলেন।

৮ম ১৬ই মার্চ—সিকদারবাগান হল।

শ্রীকৃষ্ণ ভবনীচরণ মিত্রের ভবন—সভাপতি পণ্ডিত
শ্রীকৃষ্ণ কোরনার্থ বিদ্যার, শ্রীকৃষ্ণ শিরাচন্দ্র
বিদ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ নন্দগোপাল রায়, শ্রীকৃষ্ণ নন্দগোপাল
মিত্র প্রভৃতি প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

৯ম ১৪ই মার্চ—হাটবাগান—২নং
কলিকাতা বাবু সেন, শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের
বাটা। সভাপতি পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ তিব্বত সার্ক-
ভোম। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ অম্বোনারথ বিদ্যাকৃষ্ণ,
পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত ভূষণ, হুমার
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি প্রায় তিন শত লোক
উপস্থিত ছিলেন।

১০ম ১২ই মার্চ—টোরাবিটোর—বঙ্গ-
বিদ্যালয়ের জুনিয়র উপবিদ্যারগণের ২য় সভা—
সভাপতি উদ্ভিদবিদ্যা শ্রীকৃষ্ণ-সারাদেব মিত্র মহাশয়।
শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈতেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকৃষ্ণ মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রভৃতি হুই সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

১১শ ১১ই মার্চ—ভারীঘাট, প্রসন্ন-
হুমার ঠাকুরের ঘাট। তিন সহস্র লোক উপস্থিত
ছিলেন। বঙ্গ হুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

১২শ ১২ই মার্চ—বীজ উদ্যান। পাঁচ
সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গ হুমার শ্রীকৃষ্ণ-
প্রসন্ন সেন।

১৩শ ১০ই মার্চ—৫নং মুক্তার বাবুর
গাট, হরিকৃষ্ণপ্রসন্ন মিত্র। বঙ্গা শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন
চট্টোপাধ্যায়। পাঁচশত সত্তের জনলোকের স্বাক্ষরিত
দরখাস্ত বঙ্গ লাট বাহাদুরের নিকট পাঠাই হইয়াছে।

১৪শ ১২ই-মার্চ।—ওয়েলিংটন স্কয়ার।
বঙ্গা—হুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন-দ্বৈত ও বঙ্গভাষায় বক্তৃতা
করেন।

১৫শ ১২শে মার্চ—ভট্টাবারাম বিধবৈধ
সভা। সভাপতি পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ মননগোপাল
গোপালী।

১৬শ ২০শে মার্চ।—শোভাবাজার, রাধা-
কান্ত সেনের নাটকশ্রী। বঙ্গা—হুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন
সেন। তিন সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

১৭শ ২০শে মার্চ।—ভাবানীর কার্দারী
পাড়া মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবন।
সভাপতি রায় ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালবাস চারুদর, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবাস 'বেদান্তবাসীশ', উকীল' শ্রীকৃষ্ণ অধিকারবাস বহু, উকীল শ্রীকৃষ্ণ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উকীল শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধনাথ সরকার প্রভৃতি অত্যন্ত মহোদয়েরা বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১৮শ ২০শে মার্চ—বিলিরপুত্র শ্রীকৃষ্ণ নন্দীলাল ব্যবস্থাপনাধ্যায় মহোদয়ের বাটী। সভাপতি ডাক্তার লালমোহন মুখোপাধ্যায়। সহস্রাবিক লোক সমবেত ছিলেন।

১৯শ ২১শে মার্চ—লেগপেচিরা, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবাস দালানের বাটী। ইহা সমুদয় লোক উপস্থিত ছিলেন। রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহোদয় সভাপতি ছিলেন।

২০শ ২২শে মার্চ—টার বিয়েটার বিল-নিয়োগের প্রবীণ-হিন্দু ও মুসলমান উপাধিকারীগণের সভা।—সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ ডাক্তার কল্যাণ বহু মহোদয়। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, উকীল শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধনাথ সরকার, উকীল শ্রীকৃষ্ণ গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, উকীল সারদাচরণ মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ., শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমাদ্রস মুহম্মদার, এম. এ., মৌলভী সামল হুদা, এম. এ., মৌলভী মহম্মদ ইকবাল খাঁ, বি. এল, প্রভৃতি বিখ্যাত উপাধিকারীগণ বক্তৃতা করেন। তিন সহস্রের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

২১শ ২৩শে মার্চ—ওয়েলিংটন স্কোয়ার। হুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সেন হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া হিন্দু মুসলমানদিগকে আইনের অপকারিতা বুঝাইয়া ছিলেন।

২২শ ২৪শে মার্চ—২১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে শ্রীকৃষ্ণ সত্যব্রজ মহোদয় বাটী। তিন সহস্রের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সত্যব্রজ মুখোপাধ্যায়। হুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সেন বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

২৩শ ২৫শ মার্চ—৪০ নং রাস্ট্র স্ট্রীট, বড়বাজার দ্বারস্থ হরিশঙ্কর। সভায় অনেক হিন্দু মহোদয়ের সমাগত হইয়াছিলেন। বহু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমাদ্রস গোপালী।

২৪শ ২৬শ মার্চ—৩২ নং বীডন স্ট্রীট, গোঁড়ীপরের কলীয়ার শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মেশ্বরের রায় চৌদুরীর বাসাবাড়ীতে বারেন্দ্র সভা। হুমার

মহারাজা কনকরঙ্গ সিংহ সভাপতি ছিলেন। শ্রীমাদ্রসের কলীয়ার শ্রীকৃষ্ণ হেমচন্দ্র খোষারী, সত্যোপাধ্যায় জমিদার শ্রীকৃষ্ণ কেশবদাস ভট্টাচার্য্য, যোগেশনাথ হুমার বন্দীকান্ত রায় ইত্যাদি বারেন্দ্র সমাজের সমস্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৫শ ২৭শ মার্চ—এমারেল্ড চ্যানেল। সভাপতি পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ কেশবদাস মুখোদয়, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রসেনের চন্দ্রমণি, পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়র, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শ্যামদাস সিদ্ধান্তবাসী, শ্রীকৃষ্ণ অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপনাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন।

২৬শ ২৮শ মার্চ—৮২ নং নবকুমার চৌধুরীর বাটী। শ্রীকৃষ্ণ কল্যাণচন্দ্র কর মহোদয়ের বাটী। বহু কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সেন।

২৭শ ২৯শ মার্চ—বহুবাজার বঙ্গ বিদ্যালয় ১০ ও ১১ নং ওয়ার্ডের অধিবাসিনীদের সভা।

২৮শ ৩০শ মার্চ—কলীয়ার কলী মাজার নাস্তিকদের মহতী সভা।

২৯শ ৩১শ মার্চ—শিয়ালদহ। ১২ নং সারকিউলার রোড মেডিকাল স্কুলের কাঁকা কনভেন্টে দুইতী সভা। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তবাসী সভাপতি। উকীল শ্রীকৃষ্ণ কেশব চন্দ্রবিশ্ব বাক্তি, শ্রীকৃষ্ণ কাঁচারব খোষা, ডাক্তার নীরদচাঁদ বহু, হুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সেন প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন।

৩০শ ৩২শ মার্চ—বহুবাজার হিন্দুরা বাক্তিদের গণি, দেওয়ানী বাড়ীর বাটী। সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শম্ভব তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ সিদ্ধান্তবাসী, রাজা শমিশবরেশ্বর রায়, শ্রীকৃষ্ণ হরেন্দ্রনাথ পাগড়োয়ী, শ্রীকৃষ্ণ অক্ষয়লাল রায়, হুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সেন প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন।

৩১শ ৩৩শ মার্চ—বহুবাজার শ্রীকৃষ্ণ কানাইলাল শেঠের বাড়ীতে মাজোরারী সম্প্রদায়ের সভা। সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত বৈষ্ণবদাস শাস্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত দেবীস্বামি, শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সত্যনাথ মিশ্র, শ্রীকৃষ্ণ হরিশঙ্করী নেত্রবালা প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন।

৩২শ ৩৪শ মার্চ—পাণ্ডুরিয়াবাটী ৩ নং

কম্বু খোষা মহোদয়ের বাড়ীতে তৃতীয় উপবৃত্ত; পুর শ্রীকৃষ্ণ বন্দীনাথ খোষার সনিবিশ উদ্যোগে বহুতী সভা। প্রায় তিন সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর। এটনী শ্রীকৃষ্ণ গণেশচন্দ্র চন্দ্র, কালীনাথ মিত্র, ও অপরূপক গাঙ্গুলী, শ্রীকৃষ্ণ বহুনাথ মলিক, নেনদন সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণ নগেন্দ্রনাথ খোষা, শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গললাল বী, মহামহোপাধ্যায় রাখালবাস চারুদর, পণ্ডিত রাজকুমার চারুদর প্রভৃতি মহোদয়গণ সভায় বক্তৃতা করেন।

৩৩শ ৩৫শ মার্চ—টাইনহল পণ্ডিতদিগের মহতী সভা। নরীয়া, হাবলা, হপলী, বন্দমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, রংপুর, বর্নোহর প্রভৃতি জেলা হইতে পাঁচশতের অধিক পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া আইনের প্রতিবাদ ছিলেন।

৩৪শ ৩৬শ মার্চ—ব্রহ্মদেব মহাসভা। প্রায় দুই লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

পঞ্জাব।

২০ মার্চ—লাহোর—সকল সম্প্রদায়ের বিরতি সভা। ছয় সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন। এখানে বক্তাগণ—বারিষ্টার লক্ষ্মীনারায়ণ, পণ্ডিত গোপীনাথ।

৩১শ মার্চ—লাহোর—হানায় ছোটী সম্প্রদায়ের সভা। পাঁচ শতাধিক লোক সমবেত। সভাপতি লাল দেবীদাস মল।

৩২শ মার্চ—লাহোর—হানায় আরো সম্প্রদায়ের সভা। ছয় শত লোক সমাগম। সভাপতি লাল হরনাথ দাস।

৪ঠা মার্চ—লাহোর—আনজুমান হিম্মতে নামক হানায় মুসলমান সভা আইনের প্রতিবাদ করেন। সভাপতি সেখ খোঁসরু মাহেব।

৪ঠা মার্চ—লাহোর—ভেরা—হানায় সমস্ত ব্যক্তিগণ প্রতিবাদ সভা করেন।

৪ঠা মার্চ—শিয়ালকোট—হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া প্রতিবাদ সভা করেন।

৮ই মার্চ—উজ্জয়িনী—হুমার কাঁচারো হিন্দু মুসলমানদিগের সভা। সভাপতি কাটা বারকত রায়। এখানে বক্তা পণ্ডিত শালিগ্রাম কোল।

৯ই মার্চ—জব্বার—আজমান ইলাল

নামক হানায় মুসলমান সভায় আইনের প্রতিবাদ। সভাপতি সর্দার ইয়ার মহম্মদ বী।

১০ই মার্চ—শেখ—হিন্দু মুসলমানদিগের প্রতিবাদ সভা। সভাপতি দেওয়ান নৌতরাম।

১১ই মার্চ—জব্বার—তৃতীয় সভা। এখান হিন্দু মুসলমান সমবেত হইয়া সভা করেন। সভাপতি লাল ভগবান দাস।

১২ই মার্চ—লাহোর—বর্ণকার সম্প্রদায়ের সভা।

১৫ই মার্চ—অম্বালা—হিন্দু মুসলমানের সভা।

ইহা জিম্ব অমৃতসারে দুইতী ও কলদারে একতী প্রতিবাদ সভা হইয়া গিয়াছে। সুদায়ান, জব্বার, রানালা, সভাপতিগণ এই তিন স্থানের অধিকাংশ লোকেরা আইনের প্রতিবাদী এবং তাহাদের সভা হইবার কথা ছিল।

উত্তর-পশ্চিম।

১০ই মার্চ—বেরেলি—দায়াল, দুইতী সভা।

১৩ই মার্চ—কানীধাম—আর্যদ্বন্দ্ব প্রচারিত সভায় যের বিরতি সভা।

২৭শে মার্চ—আপরা কোর্ট, ভিক্টোরিয়া কলেজে সকল সম্প্রদায়ের বিবর্তি সভা।

২৭শে মার্চ—আপরা কোর্ট, হানায় প্রবর্তিত পাণ্ডিনী সভার বহুর দুইতী সভা।

২৯শে মার্চ—মুন্সী দুইতী সভা। চারি সহস্র লোকের সমাগম।

৮ই মার্চ—কানপুর, হরিশঙ্কর উদ্যোগে দুইতী সভা।

৮ই মার্চ—বন্দাবন, দুইতী সভা, সভাপতি পণ্ডিত হরেশ্বর প্রসাদ।

৯ই মার্চ—দিল্লী, দুইতী সভা। সভাপতি পণ্ডিত বিহারী লাল বেদান্তবাসীশ।

১০ই মার্চ—লক্ষনৌ, দুইতী সভা।

১০ই মার্চ—কানপুর, মিত্রলাল উদ্যোগে ২য় সভা।

১৫ই মার্চ—হাওয়া, দুই সহস্র পণ্ডিত

বোম্বাই।

২৭শে মার্চ—বোম্বাই মাধববাণে বিরাট সভা। দশ সহস্র লোকের সমাগম। সভাপতি—রাও বাহাদুর নানী মোরোজী। বহুতর গণ্য মান্য ব্যক্তি বক্তৃতা করেন।

৫ই ফাল্গুন—পূনা মহামহোপাধ্যায় রাম শাস্ত্রী আশ্বের বহুতর সভা। ছয় সহস্র লোকের সমাগম। সভাপতি সর্দার রাও মাধব বাস নিন্তেল।

৮ই ফাল্গুন—সুরাট হিন্দু মুসলমানের বহুতর সভা তিন সহস্র লোকের সমাগম। সভাপতি শেঠ দ্বারিকাদাস।

১১ই ফাল্গুন—বোম্বাই দুই শতাব্দি ডাকরপোশে সভা।

১১ই ফাল্গুন—বোম্বাই মাধববাণে ২য় সভা। পাঁচ সহস্র লোকের সমাগম। সভাপতি ব্রহ্মনিষ্ঠ কংকর জরকর।

১৫ই ফাল্গুন—বোম্বাই = মুসলমানদিগের বহুতর সভা।

এতদ্বিতীয় মধ্যভারতের সাগরে, ত্রৈলোক্যে-মেওতে, সিমলা-শৈলে, আজমীর, আসাম দেহ-গড়ে, নাপদুর, কাছার সিলচরে, মাজাজ প্রদেশের অনেক স্থানে প্রতিবার সভা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রান্তক নগরে ও গড়গ্রামে সভা হইয়াছে।

কিছু কিছুতেই কিছুই হইল না। বীর্যবন্ত ঐশ্বর্য ও সাম্রাজ্যিক বিকারে ফলদায়ক হয় না।

এক্ষণে বিল পান হইলে, এইরূপ আইন হইবে—

কোন ব্যক্তি যখন ১০ বৎসরের একটা বালকও, নিজ স্ত্রীর সহিত সংবাস করিলে, বলাৎকার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে পারে। ই ব্যক্তি বালকজনীন দ্বীপান্তর-বান দণ্ড হইতে পারে।

ই বালকের স্ত্রীর যদি বয়স এবার বৎসর এবার দশ ত্রিশদিন হয় এবং স্ত্রীর যদি পূর্ণোপসমপ্রভৃতি যৌন লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়,—তথ্য ই বালক আইনের হাত হইতে রক্ষা পাইবে না।

ঐ স্ত্রী যদি সংবাসে সন্মতি দিয়া থাকে, অথবা সংবাস জ্ঞাত স্বামীকে উল্লেখিত করিয়া থাকে, অথবা সংবাস-ক্রমিত স্ত্রীর যদি কোনরূপ হানি বা ক্ষতি না হইয়া থাকে, তথ্য ই বালক আইনের হাত হইতে রক্ষা পাইবে না।

শাস্ত্রাধ্যাপি, সামাজিক প্রাধাম্যাদি, ঐকরূপ সংবাস সংঘটিত হইয়াছিল বলিলেও স্বামী, আইনের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন না।

যে স্থলে স্ত্রীর বয়স প্রকৃত বয়সের কম অথচ নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত স্ত্রীর বয়স বার বৎসরের অধিক, সংবাস কালে স্বামী এ কথা জানিলেও—ঐ স্বামী আইনের হাত হইতে রক্ষা পাইবে না।

কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট এইরূপ মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারেন—(১) যে যে কার্য করিলে আইন অনুসারে এই অপরাধ হয়, সেই সেই কার্য হইয়াছে, এইরূপ কেহ নালিশ করিলে (২) পুলিশ দ্বারা এইরূপ ঘটনার রিপোর্ট হইলে; (৩) পুলিশ ভিন্ন অন্য কোন লোকের নিকট হইতে এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাইলে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের নিজ জ্ঞান মতে বা তাঁহার সম্মত মতে।

এইরূপ মোকদ্দমার স্ত্রীকে সাংখ্যার রূপে আদালত করায় এবং তাহাতে স্বামী গোপী সত্যজ্ঞ হয় সেই প্রথ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায় কোন বাধা হইবে না।

স্ত্রীর বয়স বার বৎসর সম্পূর্ণ হইলে যদি তাহাকে গর্ভবতী দৃষ্ট হয়, তবোই তখন আইন অনুসারে দরিদ্রা লগুয়া হইবে যে, স্বামী বলাৎকার অপরাধে অপরাধী।

পুলিসকে, সংবাস দেওয়ানরূপ কর্তব্য কার্য করে নাই, অথবা অস্বাস্থ্যে সাহায্য করিয়াছে এইরূপ অপরাধে কতলাকে যে অপরাধী হইবে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

বোম্বা বিত্তবিদ্যা। জন্মভূমি মধ্য-শাশন রূপেপাণ্ডা অবস্থা হইতে চলিল। হিন্দুসম্প্রদায়ের দুইটি ইহা অপেক্ষা গৌরবতর। যাবত্বকরে। হিন্দু নিয়তি মিত্রক হও, তোমার সন্তানগণ তথ্য আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

১ম ভাগ।

চৈত্র। ১২২৭।

৪র্থ সংখ্যা।

বীরত্ব।

বীরত্বের আদর, বীরের গৌরব, সকল সমাজেই সমভাবে বিরাজমান। কোল, জিল, স্রেজ, শবর হইতে এই চাতুর্ক্য-বাংগাঠিত 'আর্যসমাজ' পর্যন্ত সর্বত্রই বীরত্বের মন্ডান। শুধু এই মানবগণ্ডাই বা কেন—পৃষ্ঠ, পক্ষী হইতে বক, রাক্ষস, অশ্ব, অমরগণ পর্যন্ত সকল সমাজে, সকল স্থানেই বীরত্বের প্রতীক প্রভু-প্রতিষ্ঠা। বীরত্বের প্রভাবে কেশরী পশুত্বের রাজ্য, বীরত্বের প্রভাবে পরুড় পক্ষিপদের সর্বপ্রধান। দেবরাজ ইন্দ্রকে অজ্ঞাত লেতা অপেক্ষা বীর বলিয়া বর্ণনা আছে; বিষ্ণুর বীরত্ব ত জগতে অতুলনীয়। বীরত্বের দ্বারা বহু জগতে আর নাই। প্রখ্যাত সত্যাহরণাই বীরত্ব। পশুপতীর সভ্যসভ্য জ্ঞান না থাকিলেও সত্যে প্রতিষ্ঠা—তাহাদিগেরও বীরত্ব। শুধু বলবান হইলে বীর হয় না, অস্ত্র-শস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইলেও বীর হয় না; বহু সৈন্ত-সামন্ত থাকিলেও বীর হয় না। হুর্দলও বীর হইতে পারে, অস্ত্র-শস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিও মহাবীর হইতে পারে। সৈন্ত-সামন্ত ত বীরত্বের সঙ্গে নিঃস্পর্শ। যাহার প্রখ্যাত সত্যাহরণ আছে, সেই বীর; যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইলেও, আপনার সভ্য সম্বন্ধ হইতে বিচলিত না হয়, সেই বীর। যে ব্যক্তি ধন, জন, কীর্তন, স্ব-সৌভাগ্যের পরিবর্তে নিজের সভ্য আর্য রাধিতে যত্নবান, সেই বীর। আপনার সম্বন্ধ, আপনার বাক্য, আপনার কার্য, মৃত্যুর তেজে উভাসিত করিবার জন্ম যে ব্যক্তি মহাবিপদকেও বহুর দ্বারা আপদিত করে, বীরত্ব

তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। শুধু দেশ জয় করিলে বীর হয় না; সামান্য ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র রাজ্য হইলেও, তাহাকে বীর বলা যায় না। সর্ববিজিত ব্যক্তিও বীরত্ব থাকিতে পারে, অকিঞ্চিৎকর বীরত্বের বহুতর হইতে পারে। রূপ বল, ধন বল, বিদ্যা বল,—বীরত্বের নিকট এ সকল কিছুই নহে। তবে বিদ্যা বহুতর বীরত্বের সহায় বটে, বীরত্বের সুপথ দেখাওয়া দিতে পারে বটে, এই পর্যন্ত। অর্জুনাভ কাপুরুষের ভাঙ্গাচোঁট হটিতে পারে। কিন্তু মহত্বের সর্বশ্রেষ্ঠে অর্থবীর্য স্বর্ধ ও মোক্ষ-বিদ্যা-বীরত্ব কখনই লাভ করা যায় না। কাপুরুষের পদে পদে পাপ; পদে পদে দারুনা। বীর না হইলে পাপের নিকট পরিণাম পাইবার যো নাই। বীরও পাশী থাকে বটে; কিন্তু তাহা কেবল সংশ্লিষ্টতার অভাবে। নহুবা পশ্চের সহিত-বন্ধু ও বহুতর বাপ-স্বৈতমকে পরাজিত করা বীরেরই কার্য। প্রখ্যাত সত্যাহরণাই বীরত্ব বটে, কিন্তু অবলম্বন-ভেদে, সাধিবার বীরত্ব বিধি; বহুবীরত্ব ও ধর্মবীরত্ব। তদ্রূপে—

দেশপাত্তারক্ষায়াং জয়ে যুদ্ধাপারিণামে।
প্রাণাত্যে নাপি সম্বন্ধ যঃ সভ্য কলুষী হইতে।
যুদ্ধবীর ইতি খ্যাতঃ সোহস্তে শূকসানীভজকঃ ॥
নীতিসার।

স্বদেশ রক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা, জয় করা এবং যুদ্ধ হইতে পরাজয় না করা,—যে ব্যক্তি এ সকল বিষয়ে সম্বন্ধ স্থির রাধিতে প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া চেষ্টা করে, তাহাকেই যুদ্ধবীর বলা যায়। যুদ্ধবীর, পরাজিত ইন্দ্রের সহিত একাদমে উপবেশন করে। স্বার—
ধর্মোৎকণ্ঠ-দয়ান-প্রতিষ্ঠাপালনম্ চ।
ওজস্ত্যক্তাভিধায়-ধর্মরক্ষাদিকং তথা ॥

প্রাণত্যাগনি সক্ষমঃ যঃ সত্যং কৰ্ম্মযোজ্যে
ধৰ্ম্মবীর ইতি খ্যাতঃ সোহংস্তে একমুখ্যং ভক্তেঃ ।
নৌভীষাৎ ।

ধৰ্ম্ম উদ্ধারিকার, দয়া, দান, প্রতিজ্ঞা-পালন, অক্লিষ্টব্রাহ্মণ এবং সাক্ষাৎ ধৰ্ম্ম-কর্ম্মার্থ কার্যে, যে ব্যক্তি প্রাণাত্য পূর্ব করিয়াও সক্ষম স্থির থাকিতে চেষ্টা করে, তাহাকে ধৰ্ম্মবীর বলা যায়। হুতরাং সাক্ষাৎ সক্ষম বীরও স্থিতির ইহলেও, অব্যাহতরূপে উহা মানাবিধ, দান-বীরও হুতা-বীরও ইত্যাদি। যিনি প্রাণের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, নত সন্তুষ্ট বিগ্নপাতের ভীত না হইয়া, পূর্বোক্ত দুই-ধর্ম্ম-ট সক্ষম সত্য করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন, তিনিই সূচবীর। মাহাত্ম্য, অনন্যতা, জ্ঞান প্রভৃতি প্রাচীন আৰ্য্যগণ ও সংগ্রাম-সিংহ প্রতাপসিংহ প্রভৃতি নব্য ক্ষত্রিয়গণ, এই সূচবীর। এই সক্ষম বীরগণ মনে মনে ধারা করিয়াছেন, সেই সক্ষম সত্য করিয়াছেন যাহা প্রাণপণে শত শত বোরস্তর যুদ্ধ করিয়াছেন। মাহাত্ম্য পীর, জৈলোকা-লুপ্ত-সমুদ্র সিদ্ধ করিবার জন্য এইসব সন্তোষ যুদ্ধ করিতে, গিয়াছিলেন। দেবদেব পৃথিবীজয় অসম্পূর্ণ আছে তুমি প্রত্যাভূত হইয়া, তুমুল-সংগ্রাম করিতে করিতে শির-বসে বক্রীমান লম্বাশ্বারের শূলখাতে অকাতরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু আপনায় সক্ষম মিথ্যা করিয়া কলঙ্ককর্ণানামার-জীবন লইয়া প্রত্যাহ্বন করেন নাই। রাজসিংহনরথ্য, যৌবনের বীরত্বক্ষেত্রে নিখণ্ডিত পূর্ব করিয়া পরিশেষে পলিতকেশ বসিত্যক্তে, রাজ্য হইতে অসমর লইবার উদ্দেশ্যে ছিলেন; এমন সময়ে জিলোকজ্ঞতা রাবণের "সুখং মেহি নতুবা পলায়ং দেহি" র তাহার জরা-বির কৰ্ম্মভূতের প্রতিষ্ঠা হইল। আর ব্যক্তিই পরিচালন না; সুখ মিষ্ট জাতিয়া উঠিল। কদ্যত কাহারও অস্বীনতা দোকার করিব না, এই মন্ত্র, চিত্তবিশেষ এই মনোভাব,—আজ যুদ্ধ বরশ্রেণেও রিক সমভায়ে সীতা রাবিয়ার জগৎ জয়া-শক্তি দৃষ্টিপথের দীপ্ত লক্ষ্যমান জগুগুগ উল্লস-বন্ধনে উন্নত করিয়া, হুতরাং-বিজয়ী তুর্কর রাবণের সমুদ্রীন হইয়া অসামান্য বিজয় প্রকাশ করত, তাহার অজায় সময়ে মানবলীলা সংবরণ করেন, তাহার তিনি অনন্যতা স্বীকার করেন নাই। ভীষণে বীরতাও সক্ষমই জানেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভারতযুদ্ধে অজ্ঞাশ্রয় করিলেন না বলিয়া দীর্ঘত হইয়াছেন; কিন্তু ভীষণ মনে মনে স্থির করিয়াছেন।

আমি ত্যাগক, ভয়সম্পন্ন করাইব করাইব। পরিচয়ই ভীষণে সক্ষমই সত্য হইল। ভীষণ, বিঘ্ন সমসং-সমুদ্র প্রকাশ করত পাণ্ডবচন্দ্রসিদ্ধিন করিতে গাধিলেন; নিবারণ করিবার শক্তি কাহারও নাই, বাহুবলান জলিয়া উঠিয়াছে, জলবিধুপাতের তাহার কি ইহলে? তখন জলবৎসল বাহুবলে, ভীষণত্বের উল্লেখে অসম্ভব করিয়া ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীষণের সক্ষম সক্ষম হইল। আবার দেখে—তিনি অবলীলাক্রমে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন, তথাপি শিবভীকে সন্তুষ্ট দেখিলে যুদ্ধ করিব না, এই যে মন্ত্র ছিল, তাহার অমৃত্যুচারণ করেন নাই। সেই পুরাণের প্রাচীন কথা ছাড়িয়া কিয়ৎকালপূর্বে চাহিয়া দেখে—বাগদাসত্যাগের দারুণ বিষমস্বাদতরঙ্গ তাহার চিত্তের—সংগ্রাম-সিংহ পরাজিত; নামে মাত্র পরাজয় হইয়াছে; কিন্তু রাজা, মন, হৃৎ-সম্পত্তি কিছুই যায় নাই, সক্ষমই আছে, নামে কেবল পরাজিত। বীরত্বের তাহাও মন্থ হয়ে নাই; তিনি নিজের সাক্ষ্যভুক্ত অজয়তা রক্ষা করিবার জন্য যে, যুদ্ধ করিতে করিতে অকাতরে প্রাণ পরিত্যাগের স্বেপণে পান নাই, ইহাই তাহার দারুণ অশ্রুমাচনা। যিনি স্থির করিলেন, আমি যখন বিজিত হইয়াছি, তখন আর সেই চিত্তবিরের পরিত্র সিংহাসনে অধিকার আমার নাই; সেই রাজোচিত ভোগে, রাজসম্মানে, রাজসম্মানে অধিকারী, আমার যাহা ইদম ব্যক্তি হইতেই পারে না। তরলতা আমার উপযুক্ত আভ্য; বক্র-সালুকারী বক্রপদ-পূর্ণবাল্লি-সমাচ্ছাদিত তুলসী এই আভ্য উপযুক্ত থায়া; বজ্র কল-মূল-পত্রাদি আমার বিঘ্নের, যমেস্তর শীত, নিদ্রাবের প্রচণ্ড তাপ এবং মধুরত্বের উত্তপ্ত ঘাখ-বায়ে আমার উপযুক্ত ভোগ্য; বুদ্ধের বক্রবাই আমার উপযুক্ত পরিধায়। কখন যদি হৃৎসংঘের পৌরব রক্ষা করিতে অবসর পাই, যদি কখন এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে পানি, তবেই আমি আমার রাজ্য গ্রহণ করিব; নতুবা এই পর্যন্ত। সক্ষম, কার্যে পরিণত হইল। বহুমূল্য বসন-ভূষণের বিহার-ক্ষেত্রে রাজ-অঙ্গে বস্ত্র অগ্রসর করিয়া; রাজপ্রাসাদের পরিবেষ্ট অপরিস্রুত অমরিত তরলত্ব সেইএকচন্দ্র, একপদ, একহস্ত, অক্ষিত অজাভ্যত-চক্রে তাহার মহাবীর, শীতপাত হিমবারি

ধারা সঞ্চ করত অহুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইতে; অজ্ঞানত, অনিচ্ছা-সম্পাদিত সক্ষমত্ব পাপের প্রায়চিত্তভরণেও সক্ষম পূর্ব করিবার স্বেপণে অধমত্বের কালচিত্তাপ করিতে গাধিলেন। এভাবে এক বৎসরও অতীত হইতে হয় নাই, মহাবীরের জীবন এই পাণলোক ত্যাগ করিয়া পুণ্যভাষে পান করিল। সত্যং সক্ষম সত্য না হইলে বীর যে কিরণ বীরতা প্রকাশ করে, সংবাদসিদ্ধির বন্দনায় তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ। আর প্রতাপসিংহের বীরতা—যবনরাজের অস্বীনতা অস্বীকারে অবিচলিত সক্ষমত্ব কোন রূপেই অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। কোটিপতি রাজোবর হইয়াও ভীষণার অপেক্ষা ইদানবায়ী স্রীপুত্রাবির সহিত যেন বনে, কাঁড়ের কাড়ের, গুহায় গুহায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছে; হৃদযোজন স্রীপুত্রের বিতস্ত মৃগমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নীরবে অশ্রুবিষ্মু মুগ্ধিত হইয়াছে। না—না—অন্যকে বিগ্ন ও উদ্ভাসিত করিতে হইয়াছে; বালকবালিকাগণ, বৃদ্ধাখ্যাখ্যা লগ্নমান বংশকণ্ডকে গম্ভীরাবকের আশ্রয় করিতে হইয়াছে—অশ্রুপূর্ণ নাই; চিত্তবিরের প্রতাপসিংহ—তথাপি অচল, অটল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। পদাভ্যন্তর তিনি নামে মাত্র, একবার অস্বীনতা স্বীকার করিলে, অতুল-রাজত্ব, অতুলসম্পত্তি লাভে অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু এখন তিনি রাজসভা, শ্রীমন্ত, বনহীন, ভ্রম মহাসাম্রাজ্য, তথাপি তাহার সক্ষম সমান ভাবে মতেজ্ঞ লেখাধ্যমান। শেষে এই মহাবীর যুদ্ধে উপর নির্ভর করিয়াই প্রাণ-পতনজননাবী হুতর আকরক পুরাজিত করত নিজের বধীনতা, রাজা, মান, পৌরব,—সমুদ্রবই রমণ করেন। এইরূপ শত শত যুদ্ধবীর এই ভারতে পৌরবর নামকে সমধিক পৌরবে কিছুমিত করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাভি, এবং জীমূতবাহন, দলি, কণ্ঠ, হরি-কণ্ঠ, দশরথ, উদালক, শিবি, প্রজ্ঞান এবং আধুনিক তেজোবাহুর প্রভৃতি ধর্ম্মবীর। বিদ্যাভি কল্লির হইয়াও ভ্রামণ্যহ লাভের সক্ষম সত্য করিতে যে দারুণ তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কত সন্তুষ্ট করিয়া অতীত হইতে গাধিল, নামে মানে কত বিঘ্ন বাধা উপর্য উপরীয়া দ্রুতিতে গাধিল, দ্রুততাই নাই, সেই সক্ষম সত্য করিতে জীবনের দৃষ্টে দৃষ্টি না করিয়া গাঢ়ত সমাধি-মাগের নিমগ্ন। হর-বলীলগণের প্রোভাত, আভিভূত উত্তরজগৎ, রিপুগণের ভাঙনা, এই সকল বাধা পুনঃপুনঃ সহিয়া শেষে আপনায় সক্ষম সত্য করিতে সক্ষম হন। পঞ্চবীয়া বালক এবং, যৌবতর অরণ্যে বাপ-ভর তুচ্ছ করিয়া উচ্চাধিকার লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। পরতন্ত্র-বীড়ন দয়াসাগর জীমূতবাহন, শম্ভুচন্দ্র সক্ষমক পরজয়ের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পীর সক্ষম সত্য করিতে আপনায় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেন। বলি, বামনরূপী ভগবানের মর্মে অন্তর্গত জানিতে পারিয়াও আপনায় দান-সক্ষম প্রকাশ করেন নাই; সর্গের দান করিয়া অরণ্যের গাঢ় অরণ্যে আবদ্ধ হন। কণ্ঠ, নিগ্ন অরণ্যক কণ্ড-কণ্ডল প্রাণবিন্যাসে ইন্দ্রকে প্রণাম করেন, কিছুমাত্র বৈধ করেন নাই। আর তিনি পীর পুত্র যমকণ্ডকে ছেদন করিয়া অস্তিত্ব ব্রাহ্মণের প্রাণ পূর্ণ করেন। হস্তিযন্ত্রে মহারাজ, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার সক্ষম সত্য করিতে সর্গের দান, স্রীপুত্র বিজয়, শামলোপগৌরী চতুর্ভূতের দিকট আভ্যবিক্রম পর্যন্ত করিয়াছেন। সম্রাট হইয়াও, রাজহস্তায্যী মার্কভোম নরপতি হইয়াও, তিনি শামল-চাণুররূপ কাশ্যাপন করিয়াছেন, তথাপি সত্যভূত হন নাই। দশরথ অজ্ঞানত সত্যপাশে বদ্ধ হওয়াতে শ্রীমাকে বনবাসী গিয়া আপনায় প্রাণ-পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু সম্রাট হইতে প্যারেন নাই। উদালক, গুহর অহুমতি ত্রম, সমুদ্র যুদ্ধ হইতে বঞ্চিত হইয়া কর্ম্মপত্ন ভক্ষণে অঙ্গ হন। অস্বীনীস্বারয়্য কাঁহার ত্বণে তুট হইয়া অকাত দূর করণের আশ্রমে তাঁহাকে পিষ্টক ভোজন করিতে দিলে, গুহর, অহুমতি নাই বলিয়া তাঁহা তিনি ভোজন করিতে নাই। আভ্য অঙ্গ হইয়া থাকিতে তিনি প্রকৃত হইলেন, কিন্তু গুহর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না। শিবরাজ, আপনায় শরীরের সমুদ্র মাংস সর্জন করিয়া দিয়া শমভাত রূপাতক পৌরব হইতে অহুমতি করেন। প্রজ্ঞান, জৈলোকা বিজয়ী পীতা হিরণ্যকশিপুর আদেশে শিব ভোজন করিয়াছেন; অধিভে, হস্তিপদতলে ও সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন; পর্যন্ত হইতে নিপাতিত হইয়াছেন; কিন্তু পীর-সম্মত পর্বা ত্যাগ করেন নাই। তেজ-বাহুরা, আরাভোনের আদেশে শিব দিয়াছিলেন, ধর্ম্মরাজের দূত সক্ষম তাঁর করেন নাই।

এই বীরত্ব জ্ঞাতব্যত্রে একপ কতন্ত নে বীর ছিলেন, তাহার ইচ্ছা নাই। এখন কাল অন্তরূপ; বীরত্বের বালি কতর্জিত, সত্যাহার নিষ্ঠা-সাগরের অতল নিমগ্ন। চারিদিকেই

মিথ্যার—চাতুরীর—জুয়াচুরীর—প্রান্তর্ভাব। শির্ষে
সত্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে, এরূপ
লোক জন্মেই কমিয়া আসিতেছে। অধঃপাতের
আর বড় বিলম্ব নাই। ভারতীয় পুৰুষপুষ্করণ!
একবার সম্ভাবনামের ক্ষণেই ভোমাদিগের চিত্র
আর্য্য সত্য-বল সন্ধানিত কর, প্রথায় সত্যে
অনুরক্ত কর। তোমরা যে উদ্দেশ্যে যিয়াছ :—

“সত্যোক্ত্যঃ প্রত্যপ্তি সত্যো তিষ্ঠতি মেদিনী।”—
হে পুৰুষপুষ্করণ! তোমরা যে তারফের বলিয়াছ :—
“সত্যেনাদিত্যস্তপ্তি সত্যেন ভাতি চন্দ্রময়ঃ।”—
সত্যেন বাতি পবনঃ সত্যেনাপতিষ্ঠতি সত্যেনসেবাঃ।”
সেই সত্য-মায়াছ, ভোমাদিগের সম্ভাবনগণ,
ক্রমেই ভুলিতেছে; একই শক্তিপ্রদান কর।

যাহা নইয়া ভারতের গৌরব, ভারতের হুনাম,
যাহা নইয়া ভারতের প্রতিপত্তি; সেই ধর্মবিষয়েও
যদি বীরত্ব, প্রগাঢ় সত্যস্বরাগ, আমাদেব না থাকে,—
সকল যন্ত্রণা, সকল কষ্ট ভোগ করিয়াও যদি সেই
ধর্মসম্বন্ধ সত্য রাখিতে না পারি, যদি সামান্য
প্রলোভনে পড়িয়াই সেই মহান ধর্ম হইতে বিচ্যুত
হইতে অগ্রমাত্র ছুটিত না, হই, যদি স্রেষ্ঠের
মায়ায়, বাহ্য চাকচিক্যময় ইন্দ্রজালে ভুলিয়া দিয়া,
সত্য, আভিধেয়তা, ওরূপকি প্রকৃতি সমুদয় সং-
কার্য হইতে বিরত হই, তবে আর কেন?—হে
ভারতবর্ষ! আর কেন?—কাল পূর্ণ হইয়াছে; এই
বুলিরামি-মদুশ কাপুরুষপুত্র বহন ও প্রসব করিয়া
কাজ কি? রসাতলে প্রতিষ্ঠ হও!

দোলযাত্রা,—হোলি উৎসব।

কান্দনীর পূর্ণিমায়েই জন্মশই দেবাল।
বেদোলে বেদেন্দ্র শব্দ বেদোলে বেদোলা।
দোলায় দোলায় গোপী রাধা আর গ্রাম।
গোপীদের আনন্দের নাহিক বিরাম।
বসন্ত উৎসব দোলা উৎসবের সার।
চৌদিকে রঙ্গিনী মাতে সন্নিবী রাধার।
সন্নিবীর সন্নিবী চৌমুটি জন আর।
চৌমুটি বসতে পায় চৌমুটি প্রকার।
পুঞ্জ পুঞ্জ যুগের শব্দে লোক স্তব্ধ।
হরিহায় হরিহায় হরিহায় শব্দ।
আর আর বৃত গোপী স্রবিত নলে।
বন্ধিন নরনে চায় বন্ধিন নরনে।

কেহ দেয় কদম্ব কুসুমমালা গলে।
কেহ দেয় তুলসী চন্দন পদমলে।
পুষ্পওছ কেহ বা কেলিয়া মারে গায়।
কেহ বা মিলার নেত্র তারায় তারায়।
হরমে পরশে পাড় সরসে সবাই।
দোলের—সুবন্ধ বিনা রঙ্গ আর নাই।
এ মূঢ়ে গোপীমন মরুর লুন্ধ।
হরিহায় হরিহায় হরিহায় শব্দ।
পঞ্চভায়ে মঞ্চেরা বড়ৈবর্য ভেদি।
প্রেমমধুর্য মানেবর্য ভাবেবর্য সেবী।
আখিরে রবির সব স্কন্ধ লালে লাল।
মক লাল রঙ্গ লাল হুলাল হুলাল।
লালে লালে নন্দলালে লাল করে কেউ।
সিন্দুর-বিশুর মাঝে বহে যেন চেউ।
সন্ধনে গোপীর প্রেমসিদ্ধ কামেনক।
ভক্তির সিদ্ধিতে বহে মুক্তির তুলসী।
হেলায় সেলায় কার প্রেমহৃৎ লজ।
হরিহায় হরিহায় হরিহায় শব্দ।
হরিহেলা উপলক্ষে হরিহেলা ধুম।
কেহ বা আখির দেয় কেহ বা কুঙ্কুম।
কেহ বা পিচ্ছিকী দেয় রাধা আর গ্রামে।
কত শোভা ললিত ত্রিভঙ্গ নব রাগে।
কোন সখী ধূর মগধে মারে চাটী।
বাজে দোহামন্দিরে মুন্দিরা গরিপাটী।
বাঁদোর মারায় কেহ বাজায় মারুড়।
কোন সখী বীণায় শুনার্য রাগরঙ্গ।
কেহ অনুরোপে রাগ করয়ে আরঙ্গ।
হরিহায় হরিহায় হরিহায় শব্দ।
পানিতে স্নানের যায় কপাট বুলিয়া।
গ্রাম পড়ে রাই-অঙ্গে চলিয়া চলিয়া।
হেলা চুড়া হেলাইয়া হেলায়ে নয়ন।
গ্রাম সেবে রাইচাঁদ ঢকার যেমন।
গ্রাম অঙ্গে আখির বেধিয়া কয় ভুঙ্গ।
কোথারে চাতক আজ দেখে যা কি রঙ্গ।
কোথা আজ গ্রামরূপ জগদর তোর।
এ আক্ৰি ফুটেছে মকে রক্ত জবা মোর।
কি শোভায় শোভিত্তে বন্ধিন রসরাজ।
প্রভাতে অরুণ দেখে পাইসেক লাজ।
আখিরে মাজয়ে গ্রামে দোলায় দোলায়।
সেই ভাবে অনায়াসে ভোলায় ভোলায়।
সিদ্ধিম হুখে ভাসে বিন্দু নয় মুখ।
হরিহায় হরিহায় হরিহায় শব্দ।



দোলযাত্রা,—হোলি উৎসব।

(১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।)

কাশীরাজ্য এবং কাশিরাজ ।

মুঘলমানেরা যখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে উদ্যত হন, তখন বারানসী কাণ্যকুব্জরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিল্লীর অধিপতি কোতবখান ইবকু উহা স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মোঘল-সম্রাট আকবরের রাজত্ব সময়ে বারানসী, এলাহাবাদ, হুয়ার অধীন ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে বারানসী অখোধ্যার অন্তর্গত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বারানসী কোন স্বতন্ত্র অধিপতির শাসনাধীন ছিল না। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হইতে উহা অখোধ্যার হুবাদারকর্তৃকই শাসিত হইতেছিল। ১৭০০ ঃঃ অব্দে, পবিত্রভূমি রানীর পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে গদাপুর নামক গ্রামের জমীদার বাবু মনসারাম, দিল্লীর অধিপতি মহম্মদ শাহ হইতে রাজ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। কালক্রমে মনসারামের একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই বালকের নাম বলবন্ত সিংহ। বলবন্ত সিংহ “রাজা” উপাধি পরিগ্রহ করিয়া ১৭৪০ ঃঃ অব্দে পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন। গদাপুররাজ মনসারামের এই পুত্র বলবন্ত সিংহই পুণ্যভূমি বারানসী-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

পরাক্রান্ত নাদির শাহের আক্রমণে মোগল-সাম্রাজ্যের বলক্ষয় হয়। বিভিন্ন প্রদেশের হুবাদারেরা দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছেড়ে করিয়া সর্বতোমুখী প্রভুতা বিস্তারে উদ্যত হন। এই সময় হইতে বারানসী সর্বতোভাবে অখোধ্যার নবাবের অধীন হয়। কিন্তু মুঘলমান-শাসনে বারানসীতে চিরন্তন হিন্দুশ্রমের পৌরষ বিলুপ্ত হয় নাই এবং বারানসী-রাজের ক্ষমতাও একবারে অন্তর্দীন করে নাই। তখনও পবিত্র বেদধর্মমতে বারানসী পরিপূর্ণ ধারিত, তখনও সংস্কৃতচির হিন্দুপন বারানসীতে হিন্দুশ্রমের আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হইতেন, তখনও বারানসীরাজ স্বরাজ্যে আপনার ক্ষমতার পরিচালনা করিতেন। যখন বলবন্ত সিংহ ধীরে ধীরে বারানসীতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যত হন, তখন হুজাউন্দৌল্লা অখোধ্যার নবাব ছিলেন। নবাব মাফা-নব্বভে বারানসীর রাজকীয় কার্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও, “বারানসী হইতে বার্ষিক কর গ্রহণ করিতেন।” যাহা, হউক, বলবন্ত সিংহ

ক্রমে নবাবের এ অধীনতার উচ্ছেদ সাধন করেন। ১৭৪৭ অব্দে যখন হুজাউন্দৌল্লা সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন বারানসীরাজ বলবন্ত সিংহ, সৈন্য দুিয়া ইংরেজের সাহায্য করেন। ইহার সাহায্যে ব্রিটিশ-কোশানি এতদূর উপরূত হন যে, বিশাভেরা ডিরেঞ্জেরা ইহার প্রতি যথোচিত সন্তোষ প্রকাশে বিমুগ্ধ হন নাই। যুদ্ধের অবসানে বলবন্ত সিংহ অখোধ্যার নবাবের অধীনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া, বারানসীর স্বাধীন ভূপতি বলিয়া সম্মানিত হন। এই অবধি বারানসীর ভূপতির সহিত ইংরেজের মিত্রতাসূচক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইংরেজ বা বারানসীরাজ কখনও এই সন্ধির অবমাননা করেন নাই।

গদাপুর গ্রামে মনসারামের গৃহে যে বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, পূর্বের কেহই ভাবে নাই যে, সেই বালক খাঁয় বালবলে ও বুদ্ধিকোশলে প্রয়াগ হইতে বহুসর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিও অধীন করিয়া, হিন্দুশ্রমের আশ্রয়-ক্ষেত্র পবিত্র বারানসীতে রাজধানী স্থাপন করিবেন—কেহই ভাবে নাই যে, পরাক্রান্ত ব্রিটিশ-সিংহও সেই বালকের বালবলে সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হইবেন। কালে সেই বালকের অদৃষ্টকৃত এইরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল,—কালে সেই বালক ঈশ অলোকসাধারণ ক্ষমতার পবিত্র-মলিলা জাহ্নবীতে হিন্দুশ্রমের পবিত্র-নিদর্শন ভূমিতে রাজধানী স্থাপিত করিয়া স্বাধীন রাজা বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ বলবন্ত সিংহ ৩২ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যোক হইতে অন্তর্হিত হন। ইহার একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোন সন্ততি না থাকায় ইনি দৌহিত্রকেই দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহার মৃত্যুর পর চেংসিং (অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে বলবন্তসিংহের গর্ভে সিংহ উৎপন্ন) মধ্যপ্রাচ্যক রাজসিংহাসন অধিকার করেন, এবং ইংরাজের সহিত নিজেহাচরণে সহরেই সিংহাসন হইতে বিদ্যাত। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ইতিহাসে লিখিত আছে। চেংসিংহের পর মহারাজ মহীপুনারাম সিংহ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইহার সহিত ইংরাজের যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইনি স্বরাজ্যের কোন কোন অংশ গবর্নমেন্টের হস্তে সমর্পিত করেন। গবর্নমেন্টও ঐ ভূখণ্ডের শাসন-সংক্রান্ত বাস বাদে উক্ত অংশ ইহাকে দিতে প্রস্তুত হন। অখোধ্যা ব্রিটিশ

গবর্ণমেণ্ট সেই উদ্ভূত টাকা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ মহীপনারায়ণের পরলোক-প্রাপ্তির পর মহারাজ উদিতনারায়ণ সিংহ রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইহার শাসনকাল রাজ্যের

সমুদ্র উন্নতি ও এই রাজ্যের সহিত অস্বাভাবিক মূপতি-বর্ণের মিত্রতা স্থাপিত হয়। অনন্তর ইনি স্বর্গারূপে হইলে মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ সিংহ রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

৩ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ।



এই মহারা ১৮২২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাণ্যকাল হইতেই গুপের অসাধারণ পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজে একজন অসাধারণ গুণবান ছিলেন। ইহার স্বস্থানস্থিত বৃহত্তর হস্তিশস্ত্রের কার্যকার্য, অন্যাপি রাজবাটীতে বর্তমান আছে। বাণ্যকাল হইতেই ইহার কবিদক্ষিত্রও অসাধারণ ক্ষুদ্র ছিল। ধর্মের উপর ইহার প্রায়া 'আস্থা' ছিল; নিয়মিত রাজকাণ্ড ব্যতীত অধিকাংশ সময়ই ইনি জপ প্রভৃতি অতিবাহিত করিতেন। জনসাধারণের প্রতি ইনি নিরতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিতেন; তিনি একবার ইহার সহিত আলাপ করিতেন, তিনি জীবনে আর ইহাকে ভুলিতে পারিতেন না।

ভারতের যাবতীয় রাজপণ ইহাকে আপনান্ন অকৃত্রিম মিত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেন। বর্তমানকালে ইহার ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ভুলভ। ইনি একাদিক্রমে চারি পাঁচ প্রহরকাল উপাসনায় অতিবাহিত করিতেন, কখন কখন দুই দিন পর্যন্ত অনাহারে একাসনে বসিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিতেন। ইহার প্রীতি তুলসীদাসের রামায়ণের এক টাকা আছে। নানশক্তিও ইহার অসাধারণ ছিল। ভিখারী কখনও ইহার নিকট হইতে বিমুখ হইত না। ইহার মরণবারে ইহার সমিধের সম্মান ছিল। সিপাহি-যুদ্ধকালে গবর্ণমেণ্ট ইহার মাধ্যমে না পাইলে একপ্রকারে বিশেষ বিপন্ন হইতেন। ইহার সম্মানার্থ ১০ ভোপ

গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রেরণ হয়। বংশানুক্রমে এই সম্মান চলিয়া আসিতেছে। দিল্লীর দরবারে লর্ড লিটন কেবল মহারাজ বলিয়া ইহাকে আহ্বান করেন নাই, অধিকন্তু আপনান্ন একজন পরামর্শদাতা বলিয়াই আহ্বান করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের দে সমস্ত গুণ ছিল, তাহা বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে

পেলে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ইহার রাজ্য-শাসনে রুশি-গবর্ণমেণ্ট ইহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৯৪৬ সংবৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রাতঃকালে এই মহারা জ্ঞাতৃতের লোকনিচয়কে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া পুণঃক্ষেত্র কাশীতে অনিত্যবেশে পরিত্যাপপূর্বক চির-অনন্তপদে বিদীনা হইয়াছেন।

শ্রীপ্রভুনারায়ণ সিংহ।



উপরে যে মূর্তি চিত্রিত রহিয়াছে, উহা কাহার? ঐ যে প্রথায় শাস্তিমাথা ভাব, ঐ যে সমুজ্জল বিশাল নয়ন। উহা কাহার? পাঠক! উহাই কাশীর বর্তমান মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহের প্রতি-মূর্তি! মহারাজ্ঞ প্রভুনারায়ণ সিংহের প্রথম ৩০ বর্ষ বয়ঃক্রম; যৌবনের পূর্ণ উৎসাহ এখন ইহার স্বদরাক্ষা উজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রায় দুই বৎসর হইল, মহারাজ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ

করিয়াছেন। এই অল্পকালের মধ্যেই রাজকাণ্ডে ইহার বিশেষ দক্ষতা প্রতিভাত হইতেছে। মহারাজের অসামান্য ব্যবহারে প্রকটিকর্ণ বিশেষ পরিতুষ্ট। রাজসিংহাসনে অধিরোহণের পূর্বে মহারাজ, শিব-প্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ-সম্পর্ক পরিত্যাপ করিয়া স্বকীয় কার্যাবলম্বিতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহারাজ শিবপ্রসাদ ইহার স্বর্গীয় পিতার রাজ্যকালে একদিন কাশিরাজ-সংসারে প্রায়

ধরুসের ছিলেন। নবীন মহারাজ একটি যন্ত্র-সহ্য স্থাপন করিয়াছেন; তাহারই পরামর্শেও নিচের উন্নতিশাসিনী বুকের সাহায্যে এক্ষণে রাজকাৰ্য্য নিৰ্বাহ করিতেছেন। গত পূর্বে বঙ্গের উত্তর-পশ্চিমে মহামন্ত্র লেকটেনেণ্ট গভর্নর জর জুলও কমন্ডিন্ বহাদুর-স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ইহাকে রাজ্যভিত্তিক করিয়া দান। মহারাজ সংকৃত বিদ্যা, বিশেষ আদর করিয়া থাকেন এবং নিজেও একজন অতি উৎকৃষ্ট কবিতা এবং সংস্কৃত কবিতা রচয়িতা বিশেষ পারদর্শী। আমরা চিরদিনই আশা করিয়া আসিতেছি—যে যে মহাপুরুষ তাঁহাকে সন্মানিতোরাই যুগ্মবল শিক্ষাওণে গৌরবিত করিয়াছেন, এবং আজ তিনি দ্বার, এতিনিধিরূপে কাশীরাজ-সিংহাসনে শিরাজমান রহিয়াছেন। কালে নিজের প্রতিভাভলে বীর শশাংক-বল যশোরায় বিস্তার করিয়া তাঁহার গৌরবজ্ঞ নামকে সজ্ঞানপথে স্মৃতিপথ হইতে অপ-নীত করত, নিজে তদীয় স্থান অধিকার করিবেন।

কিছু আজ দুইশের সহিত বলিতে হইতেছে, দেশীয় রাগগণের অথবা বড়ই শোভনীয়। অনেকের মতে—ইহাদের নিজের অস্তিত্ব নাই ধারণা অস্বাভাবিক হয় না। ইহারা নামে রাজা, কিন্তু স্বমতীয় প্রজার অধীন। কেহ বা এমনও বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বাস্তুশক্তি থাকিতে মুক; অধঃশক্তি থাকিতে বধির; চক্ষু থাকিতে অন্ধ। তাঁহাদের পা আছে, চলিবার ঘো নাই—হাত আছে, মাড়িবার ঘো নাই;—রাজ-সুহৃৎ আছে, মাখার বিবাহ ঘো নাই। রাজপণ আহার করেন, ভয়ে-ভয়ে; নিদ্রা বাস, ভয়ে-ভয়ে; অমল করেন ভয়ে-ভয়ে;—বৃষ্টি নিরাসও কেলেস ভয়ে-ভয়ে;—বুড়ি জ্ঞাও করেন, ভয়ে-ভয়ে। তাঁরাভাজ্য রক্ষণ জ্ঞা, ভাঙ্গতেই বদলের জ্ঞা—ইংরেজরাজ দেশীয় রাজ-গণকে স্বপক্ষে আনিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—এই স্বপক্ষে আনিবার প্রক্রিয়া-গুণই যেহেতু রাজপণ একগুণ অবস্থাপন হইয়াছেন। বিশদ গিকে বশির রক্তম বধিন, রাজগণের পোহ-মন জঙ্করিত। উঠিতে বধিন, বসিতে বধিন, শুইতে বধিন, পাশ করিতে বধিন;—মাখার উপর বধিন, পায়ের নীচে বধিন—মুকে বধিন, পিঠে বধিন—সর্করই বধিন, বধিন, বধিন। বধিনের উপর আবার বিজীবিলা, ঐ-ঐইহার রাজ্যচ্যুত, নিরাসিত।—ঐ কাশীপাতি অবসারিত, লাঞ্চিত, ভূপুতি!! প্রাজেই বধিতে হয়, দেশীয় রাজপণ ব্রতশ-বন্ধনে ভিত্তি করিয়া

সদাই ধরহরি কশিত। পক্ষাভাববিশিষ্ট রোগীর শাশু রাজপণ সদাই ধরহরি কশিত। এমন কথা বলি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে দূরদর্শী ব্যক্তিমাজেই বলিবে—ইংরেজরাজ দেশীয় নরপতিপক্ষে এতদূর ক্ষুণ্ণতিনি, নিজাই করিয়া ভাল করেন নাই। বাহা নিজের সামর্থ্য—বাহা আমাদের উপকারী,—তাহাকে ভালবাসা-রূপ ছুয়ে সদাই পরিপুষ্ট এবং পরিবর্ধিত করিতে হয়।

সনাতন সন্দর্ভ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আবিন মাস। এবংও পঞ্চদশ জন্ম “কাণে কাণ” পূর্ণ—হ্রাস নাই, বর্ধন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময়ে জন্মপথে ব্যাধি করা অনেক সময়ে বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা বলিয়া যে কেহ জন্ম-ব্যাধি করে না এমন নহে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সকলকেই বাইতে হয়। বাহা হউক, এই আধ্বনি মাসে পঞ্চমীর দিন একাধিন হুদ্র নৌকে পাল-ভরে ভাগীরথীর বিশাল বক্ষ দিয়া তাঁরবেগে উত্তরাভিমুখে বাইতেছে। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন কেমন একটা বৃহদাকার পক্ষী যেত পক্ষ বিহার করিয়া যোগে গা ভাসাইয়া বাইতেছে। দেখিতে দেখিতে নৌকাধানি হৃৎসাগরের ঘাট পার হইয়া গেল। তখনও নিম্নাবি অস্তচাল গমনো-দ্যোগী ঘন নাই। অস্তমনোমুখ হইলেই যেহেতু আজ তরুণের এবং ভাগীরথীর সলিল সলিলে প্রতিফলিত হইয়া রক্তমুক করিতেছিল। তরুণধানি সেই চূর্ণমানীয় পঞ্চর যোগেভাবেগে ভেগ্ন অসঙ্গত মাসের—বাইতেছিল, তাহা দেখিলে বোধ হয় আরোহীদের বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকিবে; নতুবা এত তাঁর বেগে বাওয়া হৃৎসত নহে।

উক্ত নৌকার আরোহী ছই জন। এক জন বাদু,—অপর জন তাঁহার ভৃত্য। বাবুর নাম কৃষ্ণ-কিশোর আচার্য্য। তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর তাঁহার পক্ষ বিহার করিয়া গুলিল। এই সময়ে পঞ্চদশের নৌকার উপর গাঁড়াইয়া যে দিকে দেখিবে, সেই দিকের পক্ষ অতি রমণীয়,—অতি প্রীতিভর। নিম্না ত্রিংশতশানি। পঞ্চর জল-উজ্জ্বল,—ভ্রমণোকে ঐকমিক করিতেছে। আকাশে ছই ‘ঐক’ গুণ্ড মেষ দেখা যাউতেছে,—তাহা আবার চুপেচুপে কখন কখন চাকিয়া ফেলিতেছে। আবার বাবু দ্বারা চালিত হইয়া চন্দ্রমার সুনন্দল জ্যোতি হৃৎক-

চিত্তের গুণাধ্যা মুটিয়া বাহির হইতেছে। সেই চিত্তের ক্ষমতায় মূর্তি দেখিলে প্রভা-ভক্তি স্বতই মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণকিশোর বাবুর বাড়া হরিহরপুর। তিনি কলিকাতায় কোন এক কলসের মুংহুদি। বেতনও মোটো,—উপাধার্কণও যথেষ্ট আছে। বাড়াতে প্রতি বৎসর মহামায়ার আয়মন হয়। তজ্জন্ম সমারোহের একশেষ হইয়া থাকে। এবার কলিকাতার কাজ-কর্ম শেষ করিতে কিছু বিশ্রাম হইয়াছে। তিনি কোন প্রকারে পঞ্চমীর দিন কলিকাতা পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাকে মঠাশ্রম বৈরাগী পুঁজিতেই হইবে। একজন মাঝিদের বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবেন বলেন; তাই তাহারা এত ক্রম বেগে নৌকা বাহিয়া যাইতেছে। তাঁহার সঙ্গে বিবাহী প্রভুপারায় ভৃত্য সনাতন সন্দর্ভ। তিনি যেখানে যান না কেন, সনাতন সন্দর্ভ ছায়ায় স্নায় তাঁহার অস্বভাবী হইয়া থাকে। সনাতনের বয়স প্রায় ৪২ বৎসর। সে কিছু স্বর্করিত। তাহার হস্ত-পদ বিস্তৃত,—যেন লোহার কপটি। হস্ত-পদ মাকারের ছায় খেল-পালা এবং হৃৎক পশী-বিকসিত। মনসময় ভীতীয়া ছায়া এবং জবাচুহ্মের ছায় আচ্ছন্ন। মস্তকে নীর-নিমিত্ত কুচিত কেশদাম। তাঁহা আবার বাবির-কাটা। গলায় এক ছড়া ব্রহ্মদেবের মণা। স্বক্কে একাধিন অতি পুরস্কায় গামুছা।

সনাতন কিছু পরিহার পরিচ্ছন্ন। তাই তাহার জিনিষপত্র,—বেশ-ভাষা এককৃষ্ণ পরিপাটি। কিন্তু তাহার বড় কঠোর এবং পঙ্কম ভাব। সে ভীষণ মুগ্ধমগ্ন দেখিলে অন্তরঙ্গতা শুক্কাইয়া যায়। সনাতনের শরীর অগাধ অপরিস্রবস সামর্থ্য। তাহার বীর্ঘ্যও অপরূপ। বালাকাল হইতে ভয় কাহাকে বলে, সে তাহা জানে না। তাহার কোন বিষয়ে দুঃখপা নাই। সে সর্বদাই গম্ভীর এবং অমমীয়।

হৃৎসাবীর পার হইয়া কস্তুর শূ পলেস সমাধি উপস্থিত হইল। নৈশাঙ্ককায় ক্রমে ক্রমে দিগদিশন্ত ব্যাপৃত করিয়া সায়ংকালীন নিশ্চলতাকে অধিকতর রমণীয় করিয়া গুলিল। এই সময়ে পঞ্চদশের নৌকার উপর গাঁড়াইয়া যে দিকে দেখিবে, সেই দিকের পক্ষ অতি রমণীয়,—অতি প্রীতিভর। নিম্না ত্রিংশতশানি। পঞ্চর জল-উজ্জ্বল,—ভ্রমণোকে ঐকমিক করিতেছে। আকাশে ছই ‘ঐক’ গুণ্ড মেষ দেখা যাউতেছে,—তাহা আবার চুপেচুপে কখন কখন চাকিয়া ফেলিতেছে। আবার বাবু দ্বারা চালিত হইয়া চন্দ্রমার সুনন্দল জ্যোতি হৃৎক-

ব্যাপিনী ভাগীরথীর প্রশস্ত বন্ধে পতিত হইতেছে। আকাশ প্রধাণ নীরব। তাহাতে দুই একটি নক্ষত্র দেখা কাইতেছে। সমুদ্রে পক্ষতে নীর জল ধু ধু করিতেছে। হুমধু বহু-হিল্লোলে সেই জল উচ্ছ্রিত হইতেছে।—মধুরভাষী গোপালগীর ভরমণালা ছই ফেরারীর মুখ দিয়া কৃষ্ণকিশোর বাবুর নৌকা কল কল শব্দে বাইতেছে। তাঁহার শ্রদ্ধা স্মিতকর স্নেহোহর তরুণ পুত্র নিশাভেরে উচু গাঁড়িয়া রহিয়াছে—কদাচিৎ হৃৎপলনিহিলোলে গম্ভীর শব্দ করিতেছে।

শারদীয় চন্দ্রমা বড়ই হুমধুর,—বড়ই মনোহর সুদার্ষণ্য করিয়া গগনকে পরিমোহিত এবং পৃথিবীকে পরিচুপ্ত করিতেছে। কৃষ্ণকিশোর বাবু নৌকাভর হইয়া স্বভাবেরই বিখনিমুগ্ধের মোহা দেখিতে দেখিতে বাইতেছে। এমন সময় নীল কাপধিনী সমুদায় আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া দিম্বগুল একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘোর রবে ভয়ানক ঝড় উঠিল। তখন কৃষ্ণকিশোর বাবুর নৌকা ভাগীরথীর বিশাল উরসে ভাসিতেছিল। হয় ত ঝড় নীর ধামিয়া যাইবে বিবেচনা করিয়া মাঝিরা নৌকাকে উরগল ঘূরিবার বিশেষ প্রয়াস পাইতেছিল না। কিন্তু ক্রমে ঝড় প্রচণ্ডমূর্তি ধারণ করিল। নিবিড় কালো মেঘে সমস্ত গগন ছাড়িয়া গেল। সেই নবীন হাবাবাণী শোভাময় নিশানাথ উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঙ্ক মগ্নে করিয়া ভয়ে মেঘের আড়ালে সূক্ষ্মরিত হইল। প্রভুর এতদন আর সে স্নিকরর বেশ নাই,—অতি অম্লগন্ধ বেশ হইয় মনোমোহিনীর বেশে তাগ্য করিয়া এখন অতি বিকট বেশে সাজিয়া দাঁড়াইল। সে সর্বদ্যমোহকারিণী বরদধিনীর মূর্তি দেবীয়া বিবরন্ধাও গুস্তিত—ও ভীত; আবার জীবনুসের ভীত উপাধারের অভিজ্ঞায়ে ক্রমে ক্রমে আকাশ-প্রান্তে ধ্বংসপ্রাণ ছাড়িয়া আঁহাঙ্গি হামিলে লাগিল; কিং তাহাতেও সন্তুষ্ট নাই, ক্রমে ক্রমে সর্বপ্রাণি-ভয়জনক গগনভোগী গভীর গর্জনে বিবরন্ধাও কাপাইতে লাগিল। নৌকারোহীরা এখন অশেষ বিপন্ন। প্রবল ঝড় আঁহাঙ্গি নৌকার পিঠ যেরূপ করিয়া দাঁড়াইল। কাছার সাধ যে তাঁহার প্রতিবেশে একপল অগ্রসর হয়। নবীর বক্ষ স্কীত হইয়া বড় বড় ডেউ উঠিতে লাগিল। সেই সময় তরুণ নৌকাভর হইয়া মাঝিদের গাত্রের আঁড় করিতে লাগিল। সর্বে সময়ে মূল্যপারে রাষ্ট্র আঁহাঙ্গি দেখে

দিল। মারিরা প্রাণপণেও নৌকা স্থির রাখিতে পারিল না। কক্ষকিশোর বাবু দেখিলেন, একটি বড় মন্ম—আর নিস্তার—নাই। তিনি এই বাক্যে আপনাকে বিপদভঞ্জনকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত লাগিলেন। এ সময়ে তিনি ভিন্ন আর কোন গতি নাই, সুতরাং তাঁহারই শরণাবলিই হইলেন। বাবা হউক, মারিরা বড় মজবুত ছিল। তাহার কক্ষকিশোর বাবুর নিকট পরিচিত, অনেকবারই, তাঁহাকে লইয়া বাঙা পল্লভিয়া দিয়াছে, এবারও তাঁহাকে বাঙা লইয়া যাইতেছেন; কিন্তু—সেবের উপর কৌণিক হাত নাই। মারিরা প্রাণপণে তাহাদের আপন কাজ করিতেছিল বলিয়া কক্ষকিশোর বাবু তাহাদের কোক কাষ করেন নাই; কিন্তু তাহারা এই উপস্থিতি বিপদাপাতে দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি পুনঃপুনঃ তাহাদিগকে নৌকা তাঁর লইয়া যাইতে বলিলেন। নৌদাণ্যক্রমে নৌকা তাঁরে যাইবার পূর্বেই ক্ষুদ্র বুধি ধামিয়া গেল। এক্ষণে যত্নের আর কোনও হস্তার শব্দ নাই—নৌকাতে তখন ভয়ঙ্কর তরঙ্গও নাই। ক্রমে সকলই মণীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রকৃতি এক্ষণে সংস্কারমুখি তাগ কর্তৃক তাহার পরিবর্তে শান্ত এবং স্থূলত মৃতি ধারণ করিল।

প্রথম সময়ে নৌকা তাঁরলধ হইল। কক্ষকিশোর বাবু মারিদের নোঙ্গর করিতে বলিলেন এবং সে সাত সেইধরনে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু—একবার মারিরা কিছুতেই রাইতে চাহে না। তাহারা বলিল, ইহার নিকটবর্তী মকল হানে ভয়ানক ডাকহাঁড়ের ভয়, লোকের দিনের বেলায় এখানে থাকিতে বাস কর না; তাহারা রাগে, এখানে কিরূপে থাকিব? কক্ষকিশোর বাবু বলিলেন, আকাশ এখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় নাই, আবার ক্ষুদ্র বুধি হইলেও হইতে পারে, এমনও তাহার বেশ সম্ভাবনা হইয়াছে; এমন হলে তিনি নৌকা ছাড়িয়া দিত কোন মুতে বলিতে পারেন না। পূর্বেজন্মকৃত পুণ্যবলে এবারে এ ভয়ানক ঝড় হইতে হক্স পাইয়াছেন, আবার যদি ঝড় হয়, তাহা হইলে সকলকে ভুগিয়া মরিতে হইবে। নিশ্চেষ্টে আর নদীর অঙ্গ জলে ভুগিয়া জলজন্তুদের নীকার হওয়া ভয়ানক। ডাকহাঁড়ের হাতে মরা ভাল। মারিরা বলিল—মহাশয়! আমরা ডাকহাঁড়ের তত ভয় করি না, কেননা আমাদের এমন কিছুই নাই যে, তাহার জল তাহার ডাকহাঁড়ী করিতে পারেন।

ভয় আপনান, কেননা আপনি টাকা কড়ি লইয়া বাঙা যাইতেছেন, আপনি যদি সাহস করিয়া এখানে থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে আমরা আপনাকে পূর্বেই হইতেই সাবধান করিয়া দিতেছি যে, এখানে অভিশয় ডাকহাঁড়ের ভয়।” যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ের শৃঙ্গপারের নিকটবর্তী হানে ডাকহাঁড়ের অত্যন্ত ভয় ছিল। তবিরকর্তব্য হানে কোন লোক দিবসে হউক, রাতে হউক, নৌকা করিয়া থাকিলে আর নিস্তার থাকিত না। ডাকহাঁড়ের আগিয়া লুট পাট করিয়া লইত—কখন বা নৌকা—বোহীদের প্রাণে মারিয়া যাইত। এ সকল কথা মারিরা বেশ জানিত—সেই জন্তই কক্ষকিশোর বাবুকে মতকৃত করিয়া দিতেছিল। কিন্তু তিনি তাহাদের কথা না ভাবিয়া সেখানে যাইই করিলেন। কক্ষকিশোর বাবু নিজেও তাহারই ছিলেন, তাহার পরিচয় পাল পাওয়া যাইবে; তবে এক্ষণে তাঁহার মনে যে সনাতন সন্দর্ভ ছিল, তিনি তাহার বলে বলীয়ান ছিলেন, তজ্জন তাহার সাহসও ছিল। যাহা হউক, তিনি সনাতনকে ডাকিরা বলিলেন—“সনাতন, মারিরা বাহা বলিল, তাহা ত ভুলিলে? আমি কিন্তু আর আজ রাতে কোন হানে যাইতে ইচ্ছা করি না, এখানে থাকাই স্থির করিলাম; তবে আমাদের দুই জনকে বিশেষ মতকৃত হইয়া থাকিতে হইবে এবং আমরা দুইজন পালানোর রাত জাগিব। প্রথম রাতে আমি জাগিয়া থাকি, তাহার পূর্ব ভূমি জাগিব। কি জানি যদি কোন বিপদ ঘটে, সুতরাং সকলের নিরাপত্তা থাকা হয় না।” এই কথা বলিয়া তিনি সনাতনকে নিয়া যাইতে বলিলেন। সনাতন প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিজে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। কক্ষকিশোর বাবুর নৌকা সেই জনশূন্য হানে নোঙ্গর করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতি এক্ষণে শব্দহীন—মাতশ্বর শব্দহীন। নদীতীর জম্বুহীন, নিস্তার, অক্ষরাক্ষম—বড়ই ভয়ঙ্কর। কেবল মনমে সময়ে ভেজকা নবাবির-মণ্যপানে অভিশয় প্রয়ুক্ত হইয়া নৈশ নার্য্যত বিদীর্ণ করত উৎসব করিতেছিল, আর মনে মধ্যে স্মিয়ারবৎ

প্রতিপোচ হইতেছিল। এমন সময়ে এ প্রকার জনশূন্য নদীতীরে কক্ষকিশোর বাবুকে আর কখন থাকিতে হয় নাই, “আজ সৈবজলপাকবশত নদীতীরে স্ববহান করিতে হইয়াছে। কত কথা যে তাঁহার মনে উদয় হইতেছে, কত কথাই, তাহাতে লীন হইতেছে, তাহা বাহা যায় না। বাহা হউক, কক্ষকিশোর বাবুর সঙ্গে কেবল মাত্র একটি ছোট কাঠের বাছা ছিল—সেটা বহুমুখ্য জব্য-সামগ্রীতে পূর্ণ। তিনি বাঙালীকে আপনান নিকটে রাখিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুখী লোক, অধিক রাজি জাগর করা অভ্যাস নাই—কিঞ্চৎকণ বলিয়া থাকিতে না থাকিতে তাঁহার নিরাপত্তা। তিনি সনাতনকে জাগাইয়া আপন নিয়া গেলেন। সনাতন, বাবুর রাজনী আপনান সমুখেরে রাখিয়া বলিয়া থাকিল। রজনী অতি গভীর, জল-সংসার হস্ত, এখন সময়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া বলিয়া পাকা বড় মকল কথা নুহে। সনাতন অনেককণ চুপ করিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না, অজ্ঞাত-সারে নিয়া আসিয়া তাহাকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে চুকিতে আরম্ভ করিল। সে এক একবার চুলিয়া পড়ে, থার চমক ভাঙ্গিয়া সমুখেরে জাগাইবার প্রতি চাহিয়া দেখে। এইরূপে যে কত সময় অভিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। প্রথম প্রথম তাহার তত্তা অতি অজ্ঞান্য হারী ছিল। কখন বা সে চুকিতে বাক্সটা বাক্সের উপর পাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু চমক ভাঙ্গিবারই বাক্সটা যথান্যে আছে কেনি, আগে তাহাই দেখিতেছিল। হুর্ভাগ্যক্রমে ক্রমশ তাহার তত্তা কিছু অধিকবশহারী হইতে লাগিল। একবার তদ্রূপ আবেশে যে কিছুকণ সিধিহইতেছিল, হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখে সমুখের বাক্সটা নাই। বাক্সটা তাহার সমুখ হইতে যে অজান্তে হইয়াছে, ইহা তাহার প্রথমে বিশ্বাস হইল না। সে একবার চমক মুছিয়া তাহার সমুখের হানটী ভাল করিয়া দেখিল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না, আবার ভাল করিয়া চমক মুছিয়া সেই হানটী হাত দিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু বাক্সটা তাহার হাতে ঢেঁকিল না। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল যে, বোধ হয় সে খপ্পে দেখিতেছে, কিন্তু অজ্ঞান্য মধ্যে তাহা সে ভ্রম দূরে পেল, তখন তাহার মাথাই যথেষ্ট জালাত হইল। তাহার চমক হুঁচি দিয়া বাক্সটা সমুখ হইতে চোরে চুরী করিল, এই কথা

মনে করিয়া সে বড়ই কাড় হইল। চোরের একধর কার্য্যপত্রত দেখিয়া তাহার মনে কিছু বিষয় জ্বলিল। কারণ নিমেষমধ্যে বাক্সটার অন্তরীন হওয়া বড় সহজ কথা নুহে। চোরে যে অনেককণ পর্য্যন্ত সেখানে গুপ্ত করিয়া অবসর আঁতাকা করিতেছিল, তাহার আর অনুভূত সন্দেহ নাই। সে কিছুকণ কিসকর্তব্যবিমূর্ত হইয়া বলিয়া থাকিল, কিন্তু এরূপ দোষে বলিয়া থাকিলে ত কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। সে নিশ্চয় জানিত, তাহার প্রভুর সমস্তসময়ের উপাঞ্জিত অর্থের অধিকাংশ সেই বাক্স মধ্যে ছিল, এবং তিনি উহা তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্তভাবে নিয়া যাইতেছেন। যদি তিনি জাগ্রত হইয়া জানিতে পারেন যে, তাহার বাক্স চুরী গিয়াছে, তাহা হইলে তিনি আর জীবিত থাকিবেন না। সনাতন নিমেষ মনে এই সকল বিষয় ভাবিয়া তাহার প্রভুর দিকে চাহিয়া দেখিল। তিনি তখন নিজার শাখিময় কোড়ে হুশে শায়িত। তাহার যে কি সন্দেহান হইয়াছে, তাহা তখন পর্য্যন্ত তিনি কিছুই জানেন না। সনাতন—তাঁহাকে জাগ্রত না করিয়া, পামুচা ধানি কাঁধে ফেলিয়া এবং তাহার চির থাকা বৈশের লাঠি লইয়া অতি সাধন্যে নৌকা ছিরাে বাহির হইল। যাইবার সময় একজন মারিকে জাগাইয়া বলিয়া গেল যে, যদি ইচ্ছাযে তাহার মনিব জাগ্রত হইয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তখন বলিয়া দেয়, যে, বিশেষ কার্য্যচার্য্যে গিয়াছে, এখনই আসিবে। এই কথা বলিয়া সে শ্রীহার শরণ করত নদীর তীরে উঠিল।

সনাতন হুশে উঠিয়া দেখে, নিকটে মনুহোরে বাসোপযোগী হানের চিহ্ন মাত্রও নাই, কেবল চারিধর অন্ধ প্রান্তর। সে যে কি করিলে, কোন পথে যাইবে, মলকপা তাহাই ভ্রান্তিতে লাগিল। যদি এই সময়ে তাহার কেহ দেখিত, তাহা হইলে তাহার মুখে ভয়ের কি উদ্ভাসের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইত না, বরং তাহার পরিবর্তে দৃঢ় মকল পরি-লম্বিত হইত। বাহা হউক, রাজি তখনও বোর তমাসাচ্ছন্ন—আকাশও মনে আবৃত। পথ বাট ভাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বুধি হওয়াতে মার্দের রাস্তার কাহা হইয়া বড়ই ভ্রমণ হইয়া উঠে। সনাতন কি করিল? একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু দুই সূতা এখন এক হানে উপস্থিত হইক যে, সেখানকার রাস্তা দুই দিকে

ডাকাইতি করিয়া আবার কেমন করিয়া বাড়ী করিয়া আসিব? কিন্তু বাস্তবিক আমি কোন মনে জানি না। ঐ যে লাঠি গাছটা দেখিতেছেন, মস্ত বনুন, আর তস্ত বনুন, ঐ আমার সব। উহার উপর তব থিয়া একরকমে ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াছি, আর কিরিয়া আসিয়াছি; উহার উপর তব থিয়া বড় বড় পাঁচিল অন্যায়সে টপকাইয়াছি; কখন ডাকপত্রও করি নাই। কিন্তু এত যে টাকা চুষপাতি করিয়া আনিয়াছি, তাহাতে আমার কি দুঃখ-স্বচ্ছন্দতা হইয়াছে, তাহা ত বলিতে পারি না। কত টাকা আনিয়াছি, কোথায় যে গিয়াছে, তাহার চিত্রমাত্রও নাই। পাপের পরমা কখনই থাকে না,—আমারও থাকিত না। আমি যে কত পাপ করিয়াছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। লোককে বলে একজনের পাপ জগতেরে ভোগে করে; কিন্তু আমার একজনের পাপের দ্রুতিতর কল আমি এই জন্মেই ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার পূর্বকৃত পাপেরে ক্ষমা দ্রষ্টা গিয়াছে, পুত্র গিয়াছে, কন্যা গিয়াছে, বাকীটা পর্যন্ত গিয়াছে। আছি কেবল আমি,—ইহার পর আর যে কত যন্ত্রণা পাইব, তাহা জানি না। আমি জানি, আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রায়শ্চিত্ত থাকিলে কোন প্রকারে করিতাম। যখন সেখানায় একে একে আমি সকল ধরাইতেছি, তখন আমার চক্ষু মুটুল,—তখন বুঝিলাম, আমার পাপের ফল কলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই অবধি আমি পাপ কাজ হইতে বিরত হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখন গহিত কাজ করিব না। তবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, উদ্ভয়ের চিন্তা করিতে হয়, কেননা জঠর-জ্বালা বড় জ্বালা, তাই আপনার নিকট ঠাকুরী নীকার করিয়াছি এবং মনে মনে স্থির করিয়াছি, আপনাদি ভ্রাতৃ, আপনার দুঃখ আমার নিবনাও হইবে, আর জীবনের শেষভাগ ভাবানন্দের নাম করিয়া কাটাইব। আমার গুণ জীবনের সর্বকথাই অকপটে আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। আমি জানি, আপনি বড় দয়ায়, বৈষ্ণব আমার স্নায় মহাপাপের অশুভ ফল করিবেন, আর পূর্বে যে যেন করিতেন, তাহা হইতে এখন বঞ্চিত হইবে; বাহা হউক, যে কথা এখন থাকি। বোধ হয়, এতদ্বারা বঞ্চিত পাবিয়াছেন, আপনার বাক্য উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব প্রমাণ হয় নাই। আমার সমুদয় হইতে বাকীটা বেরণ

চতুরতার সহিত উক্ত ডাকাইতিটা লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে তাহার যে খব বাহাদুরী আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাহাকে অনেককাল ধর্যন্ত নৌকার নিকট গুপ্ত করিয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। বাহা হউক, যখন আমি সন্ধান করিয়া তাহার বাড়িতে পাইছিলাম, তখন তাহার ঘরে আসলে দেখিয়াই, আমার মনে সন্দেহ হইল। ভাবিলাম একপ্র চাচা-ভুঁয়ার ঘরে এভাবে প্রাণপ দলিবার অশুভ কোন কাণ্ড আছে, এই সন্দেহ করিয়া আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। যখন ঘরের ভিতরিক বৃজিয়া বাকীটা খাইলাম না, তখন মনে হইল, এমন স্থলে আমার অগন্তত জিনিষ ছাড়িয়ে যাইবে, না হয় পাকে পুটিয়া রহিত্য। এই মনে করিয়া সেই নিম্নিত ডাকাইতির পদতল তলিয়া পূর্বকর গরু গাইলাম, বাকের বাহিরে আসিয়া পূর্বকর সন্ধান করিয়া বাকীটা পাকেই উঠাইয়া আমি। তাহার পর ঐ চোরকে একবার দেখিবার জন্য বড় কৌতূহল জন্মিল এবং আমানকেও দেখাইতে ইচ্ছা হইল, তাই আমানকে সঙ্গে করিয়া সেই ভোমার ধরে গিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে আমার উদ্ভবে যে কথা কহিতেছিলাম, তাহা আপন বৃত্তিতে পাবেন না। তাহার কারণ এই, আমাদের মধ্যে একটা ভাষা আছে,— তাহা ডাকাইতির ভাষা; কামরাতির মধ্যে যেহে বৃত্তিতে পাবেন না, তাই আপনি বৃত্তিতে পাবেন নাই। সোকেটা আমার দলে ছিল না, তবে আমাকে জানিত। যে আমাকে বলিল, আপনার নৌকার আমি আসি, ইহা যদি সে পূর্বে জানিতে পারিত, তাহা হইলে গ্রামভক্ত শোক আনিয়া মর্মেস্ত ব্রাহ্ম আপনার নৌকা চৌকি দিত। না জানিয়া যে আপনার করিতেছে, তাহার জন্য সে সৎসংসানে আমার নিকট কথা চাওয়া গেল। সনাতন যখন এই সকল কথা বলিতেছিল, কৃষ্ণকেশোর বাবু তাহা জবিরবিশেষপূর্বক ভনিতাইছিলেন। তাহার পর অতি ধীর এবং গভীর ভাবে বলিলেন,—সনাতন, তোমার পূর্ব জীবনের কথা সকল শুনিলাম। তুমি যে তখন যোব পাণ্ডী ছিলে, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রবীণ ধর্ম্মীর প্রতি দয়, দেব দিগ্ধের প্রতিভক্তি, প্রাণ-পণে পরের উদ্ধার এবং ভগবানের চিন্তা ভিন্ন তোমার এ যোবতর পাপের আর কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? তাহা ত জানি না। তোমাকে বাহা বলিলাম,— জীবনের শেষ পর্যন্ত

তাহাই করিও। কৃষ্ণকেশোর বাবু এইরূপ নানা প্রকার উপদেশপূর্ণ বাক্য সনাতনেরে বলিলেন। সনাতনও যত্নসহকারে তাহা ভনিতাই লাগিল। বধাসময়ে তাহার নৌকা হরিহরপুরের বাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণকেশোর বাবু বৃগ্ধে গমন করিলেন। তাহার বিশদ দেখিয়া বাড়ীর সকলে বিশেষ উৎসাহ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারের সকল ভাবনা দূর হইল। পুত্রার স্বয়ংক দিন নানা প্রকার উৎসবে কাটিয়া গেল। তাহার পর এক দিন কৃষ্ণকেশোর বাবু বৃদ্ধ-বাক্যের সমুদয় সনাতন যত্নকারে ডাকাইয়া তাহার অগন্তত বাহা পুনঃপ্রাপ্তির কথা সকলের নিকট বলিলেন এবং সনাতনের অনেক প্রশংসা করিলেন। কৃষ্ণকেশোর বাবুর বড় ইচ্ছা ছিল, সনাতনের বিশেষরূপে পুনরুত্তর করেন, কিন্তু সে তাহার নিকট হইতে প্রত্যাখ্যান হইত আর কিছুই লইত না বলিয়া তিনি তাহা ভিত্তি ক্ষান্ত হইলেন। সনাতনের গুণ-জীবনের কথা কৃষ্ণকেশোর বাবু কখন কাহার নিকট প্রকাশ করেন না। বাহা হউক, সনাতন যতদিন জীবিত ছিল, তাহানি সনাতনের পাপপুণ্যকর এবং আপনাদি ইষ্ট দেবতার চিন্তা করিয়া পূর্বকর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল।

বিনোদী সভ্যতা।

যে ইংরেজ জাতি সভ্য বলিয়া আশ্ব অনেকের আদর্শ,—হিমাদি হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত যে জাতি আজ কতকগুলি হিন্দু-স্থানবাসীর আদর্শ; এই পতিত দেশের কোন কোন পতিত-ভ্রাঙ্গণ পর্যন্ত যে জাতিকে আদর্শ ভাষা করিয়া দেখায্য ভুলিয়া তাহাদিগকে অর্জুনা করিতেছেন;—সেই আদর্শ-জাতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা একবার দেখিবার বিষয় বটে। ইংরেজ! তুমি পর্বপথ ভারতবর্ষের ভোক্তা, তুমি পতিত হিন্দুজাতি আদর্শ! তোমার পুত্র একবার চক্ষু তরিয়া দেখিয়া লইয়া যদি তুমি শুধু বেলাইতি দেখিয়াছ, চক্রে দাঁধি দাঁধি থাক, তোমার অন্তরের নরপ যদি জ্বলন্ত কদম্বের হয়, তবে সে গরিমা ভাল করিয়া দেখিয়া উচিত। কারণ প্রভারিত হইতে চায় কে?

তুমি চক্রে অনেক ধাধা দিয়াছ; বিদেশকে শ্রমের-পরিচয়—রেল-প্রীমার-বন্দনে। বাহা নাম হইয়া দূরে ছিল, তাহা আজ বাড়ীর নিকট। আজ দিল্লী, লক্ষী, বেবে, আজমীর, কান্দাহার কোথায় থাকিত, আর বঙ্গদেশ কোথায় থাকিত?—তোমার গলে পাগড়ীতে অল্পে দূরকে সমুদ্র করিয়াছ—যেজন-পরিষদ ভূমিকে এক পাকত্যা করিয়াছ। আর তোমার বৈজ্ঞানিক টেলিগ্রাফ—উনবিংশ শতাব্দীর অশুষ্ক খণ্ডি!—ভারতবাসীর চক্রে ধাধা দিয়াছ, চক্রে লক্ষসিংগা গিয়াছে। চতুর্ভুজকে কোয়টি, কোয়টি—কেবলই কোয়টি দেখাইতেছে, আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছি। এই দেখ, বিষয়ে বিশ কোটা ভারতবাসী! আজ তোমার—পদে লুটাইয়া! ঐ দেখ, বিশ কোটা ভারতবাসী—তাহাদের দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া তোমার জন্ত মন্দির রচনা করিতেছে। তোমার অশুষ্ক—শক্তি—করাদী-লোককে বাহা বদ্বস্থলে লিখিয়াছেন,—ভাষা সভ্য।

The Indian Empire of two hundred and forty millions of people ruled by princes covered with gold and precious stones, and the black John Bull's boots and are happy. Verse VI was of

ইংরেজীতার ভাবার্থ এইরূপ:—

“মণিযুক্তানরী, স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমির চক্ষুর নিকট লোক দেশীয় রাজস্বয়ের সহিত, যে ইংরেজ! যে বৃষ! তোমার বুদ্ধতা বুদ্ধ করে এবং যথেষ্ট থাকে।”

বৃষ।—এই উনবিংশ শতাব্দীর জন্ম হিন্দুস্থানের দেব। একমেবাদিত্যাম্। তবে তোমার অন্তর টুহ ভাল করিল, তব পাপের কাঁধা, তার পর বুদ্ধতা স্থান করিল।

প্রথমত নীতি-বিষয়ে তোমার রূপ দেখিব। তুমি বুদ্ধ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, সভ্য—বাহা হিন্দুস্থানে চিরপুত্র, তাহা তুমি কতদূর পুত্র—একবার দেখা উচিত। হিন্দুস্থানে বদ্ধন বৃষাইতে শ্রীমান যুগ্ম; এইম-লীলা বৃষাইতে—চতুর্ভুক্তি বৃষাইতে—প্রজ্ঞা; সভ্য বৃষাইতে—মানবী; কলুষ বৃষাইতে শ্রীমন্তক লীলা করিয়া গিয়াছেন,—সে লীলা-সহস্রী ভূমিতে প্রাণবান গল্পে,—ভাষা, ভারতের—হিমাদিগিরে স্বর্ণবর্ণের আভিত,—ভাষা গৃহস্থের গৃহের প্রতিভুক্ত

অন্ধিত, তাহা ভারতের প্রতি সাধুপুত্র উদ্যানে, লতাপত্রিক-বিরাহিত তোরণে—গৃহে, মন্ডে, পথ্য-শালায়,—হিম্ময় অক্ষরে অঙ্কিত। আর পথারি ছাড়াই যদি অন্তর দেখা—অপে দেখিব, ভারতবাসীর হৃদয়-নিজতে হৃদয়িত মানন-কৃপাট সেহি রূপে স্ফাটিক।

আমরা প্রথম, সেখনি ভূমি নীতিবিশেষ আমাদের আদর্শ হইতে পার কি না? প্রথম তোমাদের আদর্শ-স্ত্রীর সম্বন্ধে দেখিব। হিন্দুধর্মে আদর্শ-স্ত্রীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র। প্রথম তিন জাতি স্বাক্ষরময়, ১ম, ১১ম ও ১২ নং বঙ্গের উপরীত এইখনি মনে। সেই শৈশব হইতে তাঁহাদের ধর্মজীবন আরম্ভ হয়।

যখন জ্ঞান উন্মেষিত হয় নাই, তখন ধর্মমতের সহিত পণ্ডিত পার্থক্য নাই। শিশুকে করি সেবায় নির্মল ভক্তিতে পারেন, কিন্তু যুক্তি-সারা দেখিলে, শিশু পণ্ডিত-জ্ঞানকে কৃত্য অজ্ঞান। কিন্তু যে মুহুর্তে—শিশুর জ্ঞান উন্মেষিত হইল, সেই মুহুর্ত হইতে হিন্দু তাহার পতি, ধর্মের দিকে প্রবাহিত করিতে প্রয়াসী। কারণ, জ্ঞান যদি পান্যচাচারে নিযুক্ত হয়, তবে সে জ্ঞান ব্যর্থ। ইন্দ্রিয়-নিরোধ-সময়, স্বপ্ন-চিন্তা,—এই সব গুণের ব্যাপারে ৮ম বর্ষেই শিশু ত্রুটি হইল। কিন্তু

৮ম বর্ষে তাহাদের বিবাহ বিচার জন্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা—অর্থাৎ অষ্টম বর্ষে বিবাহ হইলে সর্বোৎকৃষ্ট ফল, নগর হইলে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন, দশম হইলে তদপেক্ষে অধিক। এইসব প্রাচীন উত্তরাধিকার না থাকিলেও, যতদূর তাহাদিগের ধর্মজীবন গঠিত করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যাগীর্ণি করান হইতে পারে, ততদূর হিন্দুধর্ম চেষ্টিত।

যে ব্যক্তি বলে, বাল্য-বিবাহের উল্লেখ ইন্দ্রিয় চরিত্র্যই কর্তৃক, সে মূঢ়। সেই অতি শৈশব-হইতে বালিকা একমাত্র লক্ষ্য হিষ্ট করিয়া, মনোপ্রতি-সংযম অভ্যাস করিয়া প্রত্যক্ষিণী হইয়া থাকিলে; তাহার পানীয় একমাত্র লক্ষ্য; আজন্ম এক বসে-বসিয়া তাহার নিজের অঙ্গ স্বর্গ বিশ্বত হইতে দেখে। হিন্দুর নিকট বিবাহের কৃত্য পবিত্র কাণ্ড আর নাই।

ত্রীত উদ্দেশ্য আদর্শ। এক সেবাত পুত্রা করিয়া বাল্য চিত্তকলিত করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়-নিরোধ শিখিতে পারেন, স্বর্গ গম্যার বিসর্জন করিতে পারেন—তবে সে সেবাত, না হয়, নিরাপার নাই হইলে—ত্রীত যদি আদর্শ-পুত্রা করিয়া তাহাদের সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, তবে তাঁহার অঙ্গ

সেবপুত্রার আবশ্যক নাই। ইহাকে যদি পৌত্র-লিখিত বাল্য, সে পৌত্রলিখিত হিন্দুস্ত্রীর মাধার ভূমি। আদর্শদেগের গৃহে পিতা, মাতা; স্ত্রীভ্রাতা ও পতিরূপে যে সব সেবাত বিবাহ করেন, তাহাদিগের, জন্ম স্বর্গ ভোগ না শিখিলে, জিত-ক্রোধ, সংযত-স্বির না হইতে পারিলে, সংসারে তেমন কোন শিখাই হইল না। এখন বিলাতে বিবাহ-পদ্ধতি দেখা যাক।

A girl goes out one fine morning to post a letter and on her return, informs her parents that she is married.

J. H. Bull And his Island, P. 41.

অর্থাৎ,—এক বালিকা কোনদিন হুপ্রভাতে নিজ-ভবনের পর হইতে একদান পর ডাকঘরে গিয়া-ছেন; বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া কহা, পিতামাতাকে জানাইলেন যে, পুত্র-পুত্রার বিবাহ হইয়াছে।

A son writes to his parents, "I am about to be married" or "I am married". "We are glad to hear it" answer the parents; "We shall be in your acquaintance with your wife" John Bull.

ইহার অর্থ এইরূপ;—বিলাতী পুত্র, বিলাতী পিতাকে লিখিতেন—আমি বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছি, অথবা বিবাহ করিয়াছি। পিতা উত্তর দিলেন,—ভানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম,—তোমার পুত্র সহিত পরিচিত হইলে, আমরা সুখী হইব।

বিলাতে বিবাহ শিশুর বেলা—ইন্দ্রিয়ের লীলা, একটা কপোত এক প্রান্তে আহার খুজিতে গেল এবং একটা কপোতকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আসিল। ধর্মোদ্দেশ্য হইবে, তাহা জগন্নাথসেই বুঝা হইতে পারে। আমরা বিবাহ করি পুত্র-উৎপাদন-জন্ম—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাণ্ডা; পুত্র কেন? পুত্র; "পিতৃ-প্রয়োজন।" আর বিলাতী-বিবাহ ভালবাসার জন্ম। সে ভালবাসাও আবার কিছুই নহে; কেবল, বোভম্পাশপরে ইন্দ্রিয়সেবা। পুত্র উৎপাদন-জন্ম হিন্দু বিবাহ করেন। এখানে পুত্র ভোগ বাননা নাই, ইন্দ্রিয়-সেবা নাই; হিন্দু আজন্ম ধর্মব্রত-বিবাহ।

ইউরোপীয় বিবাহ, ইউরোপীয়-বিবাহের ছাত্র ইন্দ্রিয়-সেবার অস্বাভাবিক। ১৭৯০ সালে ৩ মাসের মধ্যে প্যারিস নগরে ১৭৫৮টি বিবাহের মধ্যে ৫৬৮টি ভাইভোদে (অর্থাৎ বিবাহবন্ধন ছিন্ন) হইয়াছিল—

প্রায় একের তিন সংখ্যা। আর বাকী নয় মাসে অবশিষ্ট সংখ্যাও শূন্য হইবার সম্ভাবনা; সে বিবাহের সংখ্যা ঠিক জানি না।

তথার তাহাদের ব্যতিরিক্ত এনি দেখুন। জারজ সন্তান বলিষ্ঠ হয়, তাহার মনোবী হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত—পুস্তক এলিতে বুঝ বোধী চেষ্টা আছে এবং উত্তম উত্তম কারণ পরিচিত আছে।

Burt n's Anatomy of Melancholy, Vol I, Page 2 (ed 1821).

Pasquier, Resear-ches, Ohap "De quelques memorables batards" and Pontus Heuterus, De Libera Hominis Notivitate. See also observations of Dr Elliott in his edition of Bhermenbach's Physiology in notes to Chap 40.

ইংলেণ্ড এবং অল্প অল্প সভ্য দেশে জার-জের সংখ্যা দেখুন। প্যারিস নগরে ১৮৪২ সালে ১৮২৮টি সন্তান জন্মে; ইহার মধ্যে ১০২৬টি জারজ। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক অপেক্ষা কিছু কম সন্তান জারজ। ইহার মধ্যে ৮২০ টার যে পিতা, কে মাতা;—তাহার ঠিক পাওয়া যায় নাই। সমস্ত ক্রমে ১৮৪১ সনে ১০,০৬৮টি জারজ জন্মে। সমস্ত শাস্ত্রের লোকের হার দিলে প্রায় প্রতি ১২টি সন্তানের মধ্যে ১ জন জারজ। কিন্তু রাজধানী প্যারিস, যেখানে সভ্যতা বুঝ বোধী সেখানে অজ্ঞাত আর হুপ্রভাতে সংখ্যা প্রায় তুল্য। (Annuire du Bureau des Longitudes, ১৮৪৪)।

১৮৩১ সালের লোক-সংখ্যা গণনায় লুই হয়, ইংলেণ্ডে ২,৪৫,৫৫৮টি লোকের মধ্যে ১৮,৩৬৮টি জারজ অর্থাৎ প্রতি ১৬ জনের মধ্যে এক জন জারজ। কিন্তু ১৮৪১ সনে জারজের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয়। সেই বঙ্গমতের লোক-সংখ্যা গণনা হইলে বুঝা যায়, ৩০,০০০টি জারজ। নরওয়ের কোন কোন স্থলে প্রতি তিনটি সন্তান মধ্যে ১টি জারজ দেখা যায়। (Census Report 1831)

ইউরোপে ১৮৩০ হইতে লোক-সংখ্যা গণনার দেখা যায়, ইংলন্ডে ২১৯৪টি সন্তানের মধ্যে, ১১৩৮টি জারজ জন্মিত হয়। অর্থাৎ প্রতি দশটি সন্তানের মধ্যে একটি জারজ। ১৮ জনের মধ্যে ১ জন

জারজ। ইংরেজের লিখিত গ্রন্থে লওনের হার খুঁজিয়া পাইলাম না। প্যারিস, ইংলন্ড, প্যারিস প্রভৃতি রাজধানীর হার দেখিলেই লওনের একটি হার মনে মনে কল্পনা করিতে পারিবেন। অষ্ট্রিয়াতে (১৮৪৪ হইতে) জির্মানী নগরীতে ২২ জনের মধ্যে ১০ জন জারজ। সিরিয়াতে ৩ জনের মধ্যে এক জন, সিনিয়িয়াতে ৭ জনের মধ্যে ১ জন। আর কত দেখাইব। শুনিতে পাই, বিলাতে জারজ উপাধি বড় দেশের কল্যাণ নহে। ব্রিটনের আরব্য গ্রন্থে নিকট যখন উইলিয়াম-বি-কনকারার আদেশ পাঠান, তখন এই ভাবে লিখিত আরম্ভ করেন,—

"I William, Surnamed the Bastard"—তাঁহার জন্মের দশম যে কোনরূপে লিখিত ছিলেন, এই দেখায় তাহা বুঝা যায় না। ইংরেজ জাতির সভ্যতায় আদর্শ কত দূর তাহা নিম্নোক্ত পুস্তিকালি পাঠে জানা যাইবে। এক জন ইংরেজ লিখিতছেন,—

In the case of the Countess of Gloucester in the reign of Edward II, a child born one year and seven months after the death of the father was pronounced legitimate. Mr. Serjeant Rolle, in the reign of Henry VI of opinion that a widow might give birth to a child at the distance of seven years after her husband's decease, without wrong to her reputation. (Coke upon Littleton 123 P. note by Mr. Hargrave; Rolle's abridgment "Bastard"; and Le Marchant's preface to the case of the Banbury Peerage).

ইহার সংক্ষেপার্থ;—এই "এক" জন সম্রাজ বংশীয় বংশধর পানীর মহুদর এক বংশীর সাত মাস পরেই সন্তান হয়, তাহাকেই পানীর ঔরসজাত পুত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে এই অসুখী বিচার হয়। আর চতুর্থ নেব্রীর সময় প্রিন্সিপাল জার জিজেট রোয়াক এই মত প্রকাশ করেন যে, পানীর মহুদর ৭ বৎসর পরে স্ত্রীর যদি সন্তান হয়, তাহাকে জারজ কহা যাইবে না এবং তাহাতে উক্ত সন্তানের মাতার সন্তানই কোনরূপে নষ্ট হইয়াছে—বাল্যা মাতার সন্তান হানির কোন আশঙ্কা নাই। অতুত রাজ্য।

জনর এই রকো অধিবাসী—এই রকো জারজ সন্তানের নাম "Natural child"। স্বামীর মৃত্যুর পরেই যদি স্ত্রীর বিবাহ হয়, তবে সম্ভাব্য ভবিষ্যে সে সম্ভাব্য পুত্র স্বামীর পুত্রসমাজ, কি বিত্তীয় জবের উন্নয়ন, এ বিষয়ে সম্ভেদ হইলে, সেই সম্ভাব্য যে জনকে ইচ্ছা তাহাকেই পিতৃরূপে বরণ করিতে পারিত, ইহাও পূর্বে এই নিয়ম ছিল।

(Ventre Inscipiendo De writ).

The husband of an unfaithful wife, is not an object of ridicule in England.

JOHN BULL p. 41.

ইহার অর্থ এইরূপ—“স্ত্রীর স্বামীরকে ইংলণ্ডে উপহাস্যপন্য হইতে হয় না।”

ইংরেজ কবি সোলি লিখিয়াছেন,—

"Hell is a city much like London."

ইহার অর্থ এইরূপ—“নরকপুরী অনেকটা ইংলণ্ডের রাজধানী লন্ডন নগরের দ্যায়।”

পত ১৮৮০ সনের স্যেক্সপায়ার গ্রন্থে উপন্যাসে হিন্দুক কাহাণির প্রতি বাস্তব প্রতিভা চাহিয়া মি. ব্লেজি সাহেব যে উক্তর পাইয়াছেন, তদ্বর্ণন নিম্নে উক্ত হইল;—

It was only the other day that we are reminded, by high authority, that Hindoos are only heathen, little differing from the aboriginal tribes who worship stacks and stones.

CENSUS OF BRITISH INDIA, P. 20 v. i.

ইহার ভাবার্থ—“যে ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা যায়, এমন একজন উপন্যাস রচয়িতা যিনি বস্তুনিষ্ঠ—অসুভা বর্ণনের ব্যঙ্গ-সৌকর্যের সহিত—হিন্দুসম্প্রদায়ের পার্শ্বক সামান্যই আছে।”

সে, এমন আমেরা জানিতে চাই, এই উক্তপদ্য ব্যক্তির কে? যদি কোন ব্যক্তি-বিশেষ কোন সময়ে ন্যায় হিন্দুসম্প্রদায় তপস্বী জীবিকা পালন করিয়া উক্ত ভাষায় হিন্দু কল শোধ করিলে, তবে আমরা বড় মুগ্ধিত হইতাম না। কিন্তু এই উক্তপদ্য ব্যক্তির কে? আমরা বিশ্বাস করিতে চাই না, আমাদের গবর্ণমেন্ট হিন্দুগণের উপর এই অনুরূপ বর্ণন করিয়াছেন। যদি প্রকৃতই হিন্দুর উপর গবর্ণমেন্টের এই মত থাকে, তবে হিন্দুর

ভবিষ্যতের এক মাত্র নক্সা আজ অতল নীলাধরে লিখিলে। শিক্তি সমতা গবর্ণমেন্ট প্রাচীন ইতিহাস জানেন না যিনি কি প্রকারে? আমাদের দুঃস্থই যদি গবর্ণমেন্টকে তাহা বলিতে হয়। আমরা বিশ্বাস করি না যে, উক্তর গবর্ণমেন্ট ইহা লিখিয়াছেন। জানিতে চাই এই উক্তপদ্য ব্যক্তির কে? একজন ফরাসী-লেখক কি লিখিয়াছেন দেখুন;—

Soil of ancient India, cradle of humanity, hail! hail! Venerable and efficient nurse whom Centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! hail fatherland of faith, of love, of poetry and of science. May we hail a revival of thy past in our Western future.

Bible in India, by M. Louis Jacollot.

“ইউরোপগুরুত্ব প্রদেশের সভ্যতা মূহুর ভবিষ্যতের যে ভারতীয় সভ্যতার নিকট পৌঁছিতে পারে,—ফরাসী-লেখক এই প্রার্থনাই করিয়াছেন। আর কি দেখাইবে? আজ যুক্তি গ্রীক কি রোমের জাতি হইলেও, ভারতের অসভ্য বর্ষের বলিতে পারিত না। বাহাদের অজ্ঞাত ইতিহাস উজ্জ্বল, এমন জাতি কোথা হয় এতদা বলিত না। তবু তৎকালে, ন যেটি নির্ভর। এক হাজার বৎসর পূর্বে ইংরেজ তুনি কোথায় ছিল? দুই তিন শত বৎসর পূর্বে উপাধায় শির রাখিয়া যে উইতে হয়, তাহা যুক্তি জানিতে না। (Green's History of English People), অথবা? কি বৈজ্ঞানিক, সেই জাতি আদিমগণের ভাষায় বলিতেছে। যদি সুভাষিত না থাকিত, যদি ইংলণ্ডের উপর অসংখ্যবার শত্রুর বিজয়-ক্ষমা উর্বিত হইত, যদি ইংলণ্ড পর শাসন-নিয়মে বহু হইয়া শত সহস্র বৎসর বলিতে সূচিত থাকিত, তবে সভ্য ইংলণ্ডবাসী। বিশেষকৈ দেখাইবার যোগ্য কর্মী নিম্নি থাকিত বল দেখি! এক খানা সোফিস্টার, এক খানা মিল, এক খানা নিউটন ভিন্ন আর কিছু থাকিত কিনা সম্ভেদহীন। আর আমাদের কি আছে, তাহা কি জান না? এক গীতা গ্রন্থকেই Burnouf ফরাসী ভাষায়, Stanesan an Gaiti নাটক ভাষায় এবং ইংরেজিতে Thomson, Davies, এবং প্রসিদ্ধ কবি Arnold অনুবাদ করিয়াছেন। গীতার গ্রীক

ভাষায় অনুবাদ কর্তার নাম Gulanus। আর কত শত সহস্র গ্রন্থ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায়, অনুবাদিত হইতেছে, তাহা কি তুমি জান না? সভ্যতার শীর্ষ স্থানে যে, ভারতবর্ষের নাম তাহা কি জান না? কাহার বর্ষের ছিল, কাহার সভ্য ছিল, তাহা কি জান না? স্বামির বংশধরদিগকে যে শাসন করিতেছে, তাহা কি জান না? তবে ঐ উক্তি কর কেন? এমন বৈষম্যক—এ দেশ ভক্তের দেশ। আর এমন বিবেচিত করা করি। সভ্যত্ব জ্ঞান প্রিয় জ্ঞান, ন জ্ঞান সভ্যত্বজ্ঞান। অস্ত্রির সভ্য বলিতে নাই। তবে কোন জাতিতে আমরা আশ্রয় করিতে চাই? আমরা কি এতই পতিত হইয়াছি? চতুর্দশম হইয়া অন্ধ হইয়াছি? সেল পাঠ্যেতে চিঠিয়া যুক্তি অন্ধ হইয়াছে। বৈদেশের দ্রাবীণ্যমূলক বলিতে জানে,—ন পিতা নাহাঙ্কো ন্যাতা ন মাতা ন স্বামীজনঃ। ইহ প্রোক্ত নাহাঙ্কো পতিতকো পতিত সপা। যদি ঐ প্রোক্তিতা হৃদয় বনমস্ত্যেব বাবৎ।

অন্যভাবে গমিষ্ঠ্যামি যুগ্মতী কৃষ্ণকটক। সেই দেশের দ্রাবীণ্যমূলক জাতি শিকার করিতে? বন্যবাই, ভারতের কলঙ্ক! কলঙ্কবাই ভারতের কলঙ্ক। যে ভারতের নাম লইয়া গৌরব করে, তাহাকে হিন্দুসম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বীমা। পার কাহাণি দেখিয়া উচিত। যাহা-পিতৃ-ভ্রাতৃকলঙ্কক বিলাতে করিল, তাহা আজ দেখাইব না,—প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইবে। হিন্দুসম্প্রদায়কে ইংরেজ পাশেপুষ্ট করিয়া দাপটে চলিয়া যায়, শত্রুভাষা জননী ভারতবর্ষ, স্বর্গপ্রাপ্ত ভারতবাসী ইংরেজ-ভাষা। হিমালয়-তম্বর তোমার জন্ম-নিশান। ভারত-মানচিত্রে তোমার রক্ত-নিশান। রক্তের হৃৎকণ্ডে হিন্দু বক্তা। রেলে স্টামারে, জল-হস্তে চায় পদ্ম। তোমার প্রতাপ, ইংরেজ। ভারতবর্ষে। তোমার রাজ্যে, ইংরেজ! ভয়ে হুগু অস্ত যান না। কত দেখাইলে। কত করিলে! কিহুর হইলে। নক্ষো ভাঙ্গিলে। ব্রহ্ম জয় করিলে। শির দমন করিলে। হিমালয় ভেদ করিয়া পথ করিয়া। বেগুন, প্যারাফ্রেটে যোম-বিহারী হইয়াছে। কিন্তু তুমি আমাকে, আমি বাহা চাই, তাহা দেখাইলে কোথায়? সেই যে একজন এককৃত চকন-চাকিত, এককৃত হুতার-অস্ত হইলে তুমি আমা করিতে, সেই এককৃত পোষামকে দেখাইতে পার কি? নব জাতিভাষা, পশ্চিমের উন্নয়ন করি। বিনি পিতাভেদে সিংহাসনে বসিতে উন্নত হইয়াছেন,

বিনি পিতাভেদে চারাজিন-জটায়ুর হইয়া বনে গমন করিলেন,—সেইরূপ কর্তব্যের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার? সেই জনক ব্যক্তিক দেখাইতে পার, বিনি হস্তকৃত হুগুের ন্যায়, হুগুভুক্ত কর্তব্যের ন্যায়, কর্তব্যকৃত মজিকার ন্যায়, সংসারে থাকিয়া অহংগুণ ছিলেন না।

এই সাধু-পুণ্ডিত, হিমালয়-পদা-বিশোধিত,—শিখা-ব্যাট-সংরক্ষিত মহাজে,—ভারতবর্ষে, পৃথিব্যানের পাশচারণ ক্ষেত্র ছিল। তুমি যদি তোমার পুণ্যবান হইতে—তবে ইংরেজ। তোমার পাদ-পেহন করিয়া শ্রাস্তা জ্ঞান করিতাম। কিন্তু যে সব গিজকে, বৃত্তিগত আর তাহা মিলে না। এই অসংখ্য হিন্দু-শাস্ত্র রত্নের ত্রায় উজ্জ্বল, কবিত্ব হইতে মূল্যবান;—তাহা দেখি। কই? অক্ষয় মানিক বাঁধা, তাহা না দেখিয়া তুমি যে ছাই শিকল মিছে—তাহাকেই তুমিগা মিলাই। হায়। তুমি যে শিকল দিতেছে, তাহা শুধু উদারের জায়। ব্রহ্মাণ্ডের মিলি ভ্রমণ—তাহারও এক ভিন্ন বিভীত উদার নাই। সেই উদারেরই শিখা তুমি দিতেছে। হায়। যদি তুমিই হইতাম,—যদি এই অসংখ্য ব্রহ্ম-সমুদ্রের তলে বিলক করিতেছে, এই শত শত্রুগণি বাহা অস্ত্র-কল ছড়াইয়া আছে—হায়, যদি তুমিই হইয়া এই ব্রহ্মসমুদ্র ভূমি দিতে পারিতাম।—তবে কি ইংরেজ? তোমার শিখায় তুমি চতুর্দশ, মড় দমন, গীতা উপনিষদ হস্তে, বৌদ্ধীনা পরিজ্ঞা তবে হিন্দু এককর্তব্য বনে যাইতে। সেই বনে নিম্ব-বায়ি গান করিয়া, আরগা কল ভগ্নন করিয়া, একবার হুগুণ হুগুণ আকাশের তলে, হিন্দু সেই গ্রন্থকাল পড়িত।

হায় সে দিন ক্রি হইবে। পতিত ভারতে কি সেই দিন হইবে।

ঐন্দ্রনৈশঙ্কর সেন।

রাজ-চরিত্র।

এখন আমাগণকে যে বাধা বলে, তাহাই সহিতে হয়। কথায় বলে “হাতী হাড়ে পড়িলে বেগেও লাথী মারে।” চিরদিন কিছু আমরা এমন

দ্বারা আধ্যাতিক করিবেন, এই অভিপ্রায়ে চন্দ্রের
অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। হুবের যেকোন নিবি-
রঞ্জন দক্ষ, রাজাও তদ্রূপ কোমলকণ্ঠস্বরে নিবুধ
হইবেন, এই উদ্দেশ্যেই প্রজাপতি রাজনিকস্বে
হুবেরাংশ গ্রহণ করেন।

পিতা মাতা গুরুভিত্তিকবৃত্তিপ্রবণতা যমঃ।
নিত্য মনুষ্যপ্রেমেরায মুক্তা রাজা ন চাঙ্কখা।
পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা, বন্ধু, হুবের এবং যম,
এই সাত জনের সমগ্ৰাবলম্বী হওয়া রাজার নিত্য
আবশ্যক।

ওদ্যাদনসংদক্ষঃ প্রজ্ঞায়াঃ পিতা যথা।
কর্মহিত্যপদাধান্যঃ মাতা পুত্রবিধায়িনী।
‘রাজা, পিতার হ্রাস প্রজ্ঞাদিপকে ওদ্যাদন
করিতে যথানু যাক্ষিবেন এবং মাতার ছায় পোষণ
ও অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

হিতোপদেশে শিষ্য হুভিত্যধ্যাপকো গুরুঃ।
শ্রুতগোষ্ঠাকল্মাষতা যদ্যাপি পিতৃবিনাঃ।
গুরু যেমন শিষ্যদিগকে উত্তম বিদ্যাদান ও
হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, রাজাও তদ্রূপ
প্রজাদিপের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে
হিতোপদেশ দিবে। ভ্রাতা যেমন পিতার বন
হইতে আপনার ভ্রাতা ভাগ গ্রহণ করে, রাজাও
তদ্রূপ নিজের ভ্রাতা ভগ্ন প্রজাদিপের নিকট হইতে
গ্রহণ করিবেন।

আত্মব্রত-বন-ওদ্যানঃ প্রোষ্ঠা বহুত মিত্রবঃ।
বনবঃ হুবেরঃ ভ্রাতৃ যমঃ ভ্রাতৃ শত্রুগুরুঃ।
রাজা, মিত্রের হ্রাস প্রজাদিপের আত্মরক্ষা, ব্রা-
হ্মা, ধনরক্ষা এবং গোপনীয় বিষয়ের রক্ষা করিবেন।
হুবেরের ছায় বনদান ও যমের ছায় উচিত
কর্তব্যবান করিবেন।

কমতে যোগ্যপুত্রাং স শত্রুঃ হুইবেন কুমীঃ।
কমতা তু বিনা কুপে ন ভাত্যবিত্যদ্ব্যতপেঃ।
যে রাজা, মাংসখণ্ডসঙ্গে কলম্বা অপরাধ ক্ষমা
করেন, তিনি শত্রুসঙ্গে সক্ষম। কুমারীনা রাজা
অধিব মনুষ্যসম্পন্ন হইলেও ভাল করেন।

যান হুভবান পরিত্যজ্য হুভিপাদ্যন্তিতিকতে।
ব্রহ্মৈমমসং সসকরেঃ প্রজ্ঞারাজকঃ সপা।
রাজা মনুষ্য শত্রুপ্রহরণোপহরিনিসূচকঃ।
অসংসৃত মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানসমুদয়ঃ।
নীচহীনো দীর্ঘদর্শী বুদ্ধসেবী হুনীভূতকঃ।
ওদিত্তকৃত্য যো রাজা স জ্ঞেয়ো দেবভ্যাংকরঃ।
যিনি নিজের কোনরূপ সাম্যকরে থাকিলেও,

লোক-নিষ্যয়ে হ্রোষ করেন না এবং সেই যোগ্য-
পরিহারের সচেতন এবং সর্বপা প্রজাদিপের
প্রতি সমাদর, সমান-প্রদান ও ধনাদিগন দ্বারা
তাহাদিগকে আপনার প্রতি অম্লরক্ত করিতে
যথানুঃ; আর যিনি দাত্ত, দীর্ঘ, হুভবতা, শত্রুজ্ঞতা,
অপেক্ষাচারী, মেধাবী, শাস্ত্র ও বিদ্যাবিজ্ঞান-সম্পন্ন,
নীচমৎসর্গ-হীন, বহুদর্শী, হুনীভূতসম্পন্ন, ওদিসেবিত
ও বুদ্ধসেবী, সেই রাজাই দেবাংশসমুদয়।

বিপরীতস্ত কল্যাণঃ স বৈনরকভাজনঃ।
ইহার বিপরীত-ভাবাপন্ন রাজা রাক্ষসংশসমুদয়,
তাহারা নরকে গমন করে।

সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক, এই তিন
প্রকার রাজা আছে।

সাত্বিক তামসিকৈব রাজস্যঃ ত্রিবিধঃ তপঃ।
যাতুক তপতি যোগ্যতর্থাঃ তদুপভবতি সো নৃপঃ।
তপসা তিনকরঃ; সাত্বিক, রাজসিক এবং
তামসিক; যিনি রাজা হইবার উদ্দেশ্যে, যেকোন
তপসা অধিক করেন, তিনি সেই ওদ্যাবলম্বী
রাজা হন।

যো হি স্বধর্মনিরতঃ প্রজানাঃ পরিপালকঃ।
যদী চ সর্ঘ্যজ্ঞানায় জ্ঞেতা শত্রুগণস্ত চ।
দানসৌগুঃ ক্ষমী শূরো নিম্পথ্যে বিষয়েধপি।

বিরক্তঃ সাত্বিকঃ সো হি নৃপোহন্তে মোক্ষমুখ্যং।
যিনি স্বধর্মনিরত, প্রজাবল্লের উত্তমরূপে পালন
করেন, শত্রুগণ-জ্ঞেতা, সর্ঘ্যজ্ঞানী এবং অত্যন্ত
বদান্ত; যিনি ক্ষমাওদ্যান, দীর্ঘ, বিদ্যানিশু
এবং বৈরাগ্যযুক্ত, সেই রাজাই সাত্বিক, তিনি
অন্তে মুক্তি লাভ করেন।

বিপরীতস্তমস্যঃ শাস্ত্রঃ সোহন্তে নরকভাজনঃ।
নিরুপ্তং মলোচ্ছতো হিংসকঃ সভাবজ্জিতঃ।
যে রাজা পুণ্ডরীক যন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত-
ভাবাপন্ন, নির্দম, মলমগ্ন, পঙ্কিত ও মাপ্যগারী,
হিংসক এবং সভাবজ্জিত; সেই তামসিক রাজার,
অন্তে নরকভোগ হইয়া থাকে।

রাক্ষসো সাত্বিকো গোভী বিদ্যা বধকঃ শরঃ।
মনসাত্ত্বং বচসা কর্মযা কল্যপ্রিয়ঃ।
নীচপ্রিয়ঃ অতঃক নীতিহীনঃকল্যন্তরঃ।

স তর্কিহুস্তঃ স্বাধারঃ তবিতান্তে নৃপাধমঃ।
আর রাক্ষসীওদ্যাবলম্বী রাজা, সাত্বিক, গোভী,
বিদ্যাদাত্ত, শর ও বধক হইয়া থাকে। সে রাজার
মন এক, বাক্য এক এবং কাঁজে অস্বল্প হইয়া
থাকে। কল্যপ্রিয়, নীচদর্শী, নীতিহীন সেই

রাক্ষস-মধ্যেচ্ছাচারী হয়, মরী ও প্রজাদিপের
কর্ম্য করণাত করে না; এবং অন্তর তাহার
কপটতাপূর্ণ। ‘রাক্ষস রাজা কল্যপ্রিয় পতন্ত বা
মহারথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এমন দেখা গেল, রাজা
হইলেই যে দেবাংশ, রাজা হইলেই যে শোকপাল
তাই নাহে, যে রাজা প্রধরিক্ত, বেছাচারে প্রবৃত্ত
নহেন, প্রজাদিপকে দয়া-চৌর্যগিহিত্য হইতে রক্ষা
করেন, প্রজাপণের যমান রক্ষা ও আশ্রয় পৌরব
করেন; যে রাজা শত্রুজ্ঞতা, দীর্ঘ, ক্ষমাওদ্যাবলম্বী,
জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রশিক্ষ-জ্ঞানসম্পন্ন, ধার্মিক, বিনীত
ও প্রজাপণের ধর্মশিক্ষক, তিনিই দেবাংশসমুদয়।
দেচ্ছাচারী, অধার্মিক, গোভী, অজিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি
হুস্তরাক্ষস রাক্ষসংশসমুদয়। ইহাই আমাদের
শাস্ত্রোপদেশ ও ধারণা।

একদে রাজার কর্তব্যসম্বন্ধে শাস্ত্রে কি উপদেশ
আছে, তাহা এদৃষ্টি হইতেছে।

নরক বিনয়ো যুগা বিনয়ঃ শাস্ত্রনিঃসৃতঃ।
বিরক্তশ্রিয়রাস্তদ্ব্যবহৃত্যঃ সমুদ্রযুক্তিঃ।
বিনয়ই নীতিপ্রণয়ের মূল, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান ও
ইন্দ্রিয় জয়ে বিনীত হওয়া যায়, ইন্দ্রিয়রাজ-শাস্ত্রতত্ত্ব-
জ্ঞানেরও কারণ।

আঁখানঃ প্রথমঃ রাজা বিনয়েনোপপাদয়েৎ।
ততঃ পুত্রান্তস্তোহমাত্যানু স্ততোক্ত্যাস্ততঃ প্রজ্ঞাঃ।
রাজা প্রথমে আপনাকে বিনীত করিতে যত্নবলী
হইবেন; পরে যথাক্রমে পুত্র, অমাত্য, কৃত্য এবং
প্রজাদিপকে বিনীত করিতে সচেতন হইবেন।

পুত্রোপদেশঃশূন্যঃ কেবলো ন ভবেৎ পুঃ।
প্রজাদিকারহীনঃ শাস্ত্রঃ সগুণোহপি নৃপঃ কচিৎ।
রাজার ‘পুত্রোপদেশে পাণ্ডিত্য’ থাকা উচিত
নহে। নিজেরও উপদেশানুযায়ী হওয়া উচিত।
কেননা, পুত্রোপদেশপট ওদ্যান রাজা সেই উপদেশ
অনুযায়ী থকা না চালাতে মাঙ্গাচ্ছাদ্য হইয়াছেন।

প্রকীর্ত্তিবিষয়গো বাহবৎ বিপ্রাধিনিমঃ।
জানাত্মনে হুদয়ীত বশমিশ্রাদভিগমঃ।
বিদ্যা বিদ্য-বহনে চিত্তবশীল হুদয়ীত ইন্দ্রিয়-
মত্তমাত্তকে জানাত্মপ্ণ সাহায্যে বশীভূত করা
রাজার করব্য।

বিদ্যারমিষলোভেন মনঃ প্রেরয়তীশ্রিমঃ।
তদ্বিক্রম্যঃ প্রবহন জিতো তদমিত্ত জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মনই বিষয়মিষ-লোভে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়কে
তদ্বিনয়ে প্রবর্তিত করে, ‘হুস্তর’ মনকে জয় করিলেই
জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়।

একত্রেই হি যোগ্যশক্যো মনসঃ সবিবর্তনে।
মহীয়া সাগরপ্ৰাণস্তাঃ স কথং স্বকল্লভ্যতী।
যে রাজা একমাত্র মনকেই আয়ত্ত করিতে
অসমর্থ, সাগর, পণ্ডিত ভূমণ্ডল জয় করাকি তাহার
মাতা?

শব্দঃ স্পর্শকঃ স্পর্শকো গদ্যস্ত পঞ্চমঃ।
এককল্পলম্বেতয়া বিনাশপ্রাপ্তিস্তয়ঃ।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটা বিষয়ের
এক একটাই, লোকের বিনাশসাধনে সক্ষম।

তর্কিতঃকল্পবাহুরো বিদুরভবনঃ কথঃ।
পুঞ্জঃ সখীতামোহেন মুগো যুগলন্তে বন্মঃ।
তর্কিতঃকল্পবাহুরো বিদুরভবনঃ কথঃ।
পুঞ্জঃ সখীতামোহেন মুগো যুগলন্তে বন্মঃ।

দর্পিতঃকল্পবাহুরো বুরভবনঃ হপট, পণ্ডিত ভীষ-
মঃ, ব্যাধের সখীতে মুক্ত হইয়া মুক্ত, অধীন হইয়া
থাকে।

সীরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।
সিরিরাক-শিবরসমিত্র মহাকায়, স্বলীলাক্রমে
বুদ্ধ-উদ্ভবনে সর্ঘ্য করি, কবিরীপ্পদ-লোভে
বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়।

স্মিরাশ্রিশিবলোকো-বিলোলিত-বিলোচনঃ।
মৃত্যুমক্ষতি সন্ধ্যোহাং পদন্তঃ সন্ধ্যা পতন্তঃ।
স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।

স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।
স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।

স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।
স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।

স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।
স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।

স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।
স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।

স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।
স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।

স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।
স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।

স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।
স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।

স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।
স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।

স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।
স্মিরাশ্রিশিবরাকারো লীলোয়ঃশ্রুতিভক্তমঃ।
কবিরীপ্পদংলোভাভক্ষনং যাতি বারগঃ।

রাধানাথ।

গোলাপমন্ডরী-প্রকরণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুন্দনয়নী ক্রিয়ায় এখন হইতে দৃঢ় "ন" বসাইতে হইবে। কেননা, কুন্দনী এখন কলিকাতায়। কুন্দনী আর "ভূমি" নাই; এখন হইতে "তিনি" হইয়াছেন। নামটী আর কুন্দনী নাই;—এখন হইতে "কুন্দনয়নী" হইয়াছে। কুন্দনয়নী আর কাঁঠ বা আম হুড়াইতে হয় না;—এখন কুন্দনীর কলম্বনের কাছে কতকত গোক কামাকল হুড়াইতে আইসে। কুন্দনীকে আর আম-পেটা খাইতে হয় না;—এখন কত কত সোক কুন্দনীর জুই আম-পেটা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কুন্দনীর আর বদনের অভাব হয় না;—এখন কুন্দনীর জুই কত কত লোককে বিদান-প্রায় হইতে হইতেছে। কি ভক্তবর্ষেই কুন্দনয়নী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন।

কুন্দনী, (বিশ্ব) কুন্দনয়নী রাত্রি আটটার সময় কলিকাতা আসিয়া পৌঁছেন। তিনি কলিকাতা দেখিয়াই অবাক। কলেরগাড়ী, টামগাড়ী, বোড়গাড়ী দেখিয়া,—ভেঁড়ো—দোঁদো—গড় গড়—বড় বড় শব্দ শুনিয়া তাঁহার প্রাণ চমকিল। হুগল্লশ রাজপথ, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, বিবিধ বিলাসভাবাপূর্ণ সোকারশ্রেণি, স্বরকীর কল, মদ্যর কল, ডঙ্কের কল, গ্যাসলোক, লোকারণ্য, মহা কলকল হইলল শব্দ,—এই সব দেখিয়া-শুনিয়া কুন্দনয়নী নিবাত-নিষ্কণ প্রতীপের ভায় স্থির হইয়া রহিলেন।

কুন্দনয়নার সঙ্গে সেই হুড়ী ধার্মিক-ভ্রাতা। আর, স্বামী-গোহুল, অর্ধশত নিকটে আছেন,—কিছু সঙ্গে নছেন। স্টেশন হইতে বার আনা পরয়া চাকি করিয়া একধাশি-দ্বিতীয়শ্রেণী জুড়িগাড়ী ভাড়া করিলেন। ভাড়ায়ের খেদান বাসা, স্থায় স্টেশন হইতে ছয় আনার সাধারণত বোড়গাড়ী দ্বিতীয় শ্রেণী; সময়-বিশেষে চারি আনাতেও গাড়ী পাওয়া যায়। কিছু অল্প ভাড়ায় গাড়ী হইতে নামিয়াই একখানি শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয়শ্রেণীর গাড়ীতে, কোচম্যানকে কোন কথা না বলিয়াই, জটপদে কুন্দনয়নার হাত ধরিয় উঠিয়া পড়িলেন।

কুন্দনয়নী কাঠপুতলিকাবৎ। গাড়িখানি বড়। দশ-দুইশে। কুন্দনয়নীকে সমুখের আসনে বসান হইল। তাঁহার স্বামী গোহুল, আদেশ মত, বাহিরে গাড়ির পশ্চাতে বসিল। পচাত্তাশে লোক দেখিয়া, মহিষ উপরে উঠিয়া কোচম্যানের কাছে বসিল। ভাড়ায় সেই সমুখের আসনেই কুন্দনয়নার দুইপার্শ্ব অধিকার করিয়া উপবেশন করিলেন। হুতব্যা গাড়ীর একধিকারে আসন খালি পড়িয়া রহিল। গাড়ী যখন হইলোও, একভাগের আসনে এককালে তিন প্রাণী একত্র উপবিষ্ট হওয়ায়, স্ব-কিঞ্চিৎ ঘেষমাশ্রয় হইল;—ভাড়ায়ের গাড়, কুন্দনয়নার গায়ে হুকিঞ্চিৎ সংঘর্ষ হইল। পর-পরুষের সঙ্গে গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি করিয়া বদা,—বিবাহের পর কুন্দনয়নার এই প্রথম। হুতব্যা তিনি কিছু বিরত হইলেন।

এদিকে এইরূপ উপবেশন কাঁচ সমাধা করিয়া, ভাড়ায় কোচম্যানকে বলিলেন,—“গাড়ী হালাও—ইন্টরমিডিয়াম চালাও।” কোচম্যান গাড়ীখণের বলিল, “ভাড়া বারে আনা লাগেগো।” ভাড়ায় উত্তর দিলেন,—“ওস্তা ওয়াস্তে হুচ হরুহ নাহি।”

গাড়ী গড় গড় চলিল। ভাড়ায় গাড়ীর সমস্ত বড়খড়ির বিশিষ্টতা বিলিয়া দিলেন। তৎপরে তাহার উভয়ে একমতাবলম্বী হইয়া কুন্দনয়নীকে জিজ্ঞাসিলেন,—“আপনার ত কোন কষ্ট হয় নাই?” কুন্দনের আপাদ-মস্তক জলিয়া উঠিল। একে ঠোঠাঠোঠে তাহার গুণাগুণ প্রাণ,—তাহার উপর প্রেম,—আপনার ত কোন কষ্ট হয় নাই? কি নিষ্ঠা বেশে গো? এ প্রেম এখন মৃত্যু বলে;—রেলগাড়ীতে স্বামী গোহুল ঘুমাইয়া পড়িলে, ভাড়ায় কুন্দনকে ঠিক ঐ কথাই আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন কুন্দনয়নী কোন উত্তর দেন নাই। কেবল মনে মনে এইকথা বলিয়াছিলেন,—“যাডোতে বেশ গড়গড় ঘাইতেছি।” বসিয়া বসিয়া, কাঁঠ হোলান দিয়া ঘাইতেছি,—ইহাতে আমার কষ্ট কি? মিলেওনা বলে কি? উদ্বাহের বুদ্ধি-ভক্তি লোপ পাইয়াছে না কি? এক্ষণে বিতীয়ার প্রিক ঐ প্রণয়ে কুন্দন বড়ই বিরক্ত হইলেন,—ধীরভাবে বলিলেন,—“এখানে ঠোঠা-ঠোঠিতে একটু কষ্ট হচ্ছে। আমি ঐ দিকে গিয়া একা বসিতেছি।” এই বলিয়া কুন্দন বিস্ময়ে গাড়ী তৎক্ষণাৎ সেই খালি আসনে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভাড়ায় বলিলেন,—“তাহা হইবে

না;—আপনার যদি কষ্ট হয়, তবে আমরা ঐ পচাত্তাশে আসনে বসিতেছি।—এই সমুখের আসন নারীভাজির প্রাপ্য। রমণী, মাথার শিরোমাণি। অবতরণ—আপনি উঠুন,—আমরা এখানে হুইকেনে বসিতেছি।—আপনি এই সমুখের আসনে আসুন, বহন এবং আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।” এই বলিয়া ভাড়ায় কুন্দনয়নার দক্ষিণ কক্ষমণ ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসার্য করিলেন; কুন্দন কিছু ভাড়ায়ের করে, নিজ কর অর্পণ না করিয়া, তাঁহারে আশ্রয় মত, অপত্যা সমুখের আসনে আসিয়া তৎক্ষণাৎ উপবেশন করিলেন। ভাড়ায় কিছু দুষ্ট হইলেন কি না জানি না;—কিছু তাঁহার আর গাড়ীর ভিতর কুন্দনের সহিত কোন কথা রূহিলেন না।

সে যাহা হউক, কুন্দন এখন একা একাগনে বসিতে পোতা মানের স্তম্বে বিশিষ্টাশি বিয়া কলিকাতা নগরীর শোভা অবলোকন করিতে লাগিলেন,—এবং ক্রমশ যেন মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

স্বামী-গোহুল বাহিরেই বসিয়া আছে। তাহাকে বনে ভাবাচাকা লাগিয়াছে। সর্ব্বে, কি মর্মে, কি পাতালে,—সে তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না।

দেখিতে দেখিতে নির্দিশ্টি স্থানে গিয়া গাড়ী ঘামিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গাড়ী ঘামিয়া মাত্রই, ভাড়ায় আগে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। কুন্দনকে বলিয়া বলেন,—“আপনি একটু উঠুন,—সীজই আপনাকে লইতে আসিতেছি।” তাঁহার গাড়ীর পশ্চাতের দিকে আসিয়া, স্বামী-গোহুলকে স্থগিষ্ট সন্মোদন করিয়া বলিলেন,—“ওরে! গোহুলো মুগ্ধ! হুই ধার্মিক বদে থাকু—আমরা বাড়ী থাকি।” এখনি ফিরে এলে, তবে তুই বাড়ীতে যাই। গোহুল খোড়োতে প্রণাম করিয়া বলিল,—“যে আছে হজুর।” তাঁহার কোচম্যানকে বলিলেন,—“কোচ-ম্যানজী! একবার খাড়া থাক, আমরা সীজ তোমার ভাড়া আনিয়া দিতেছি।”

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে কুন্দনয়নী প্রত্যাগত হইলেন। সঙ্গে তাঁহারের সাজসজ্জা ছাড়া একটি পুস্তক। কোন কামিনীর বয়স ১৪; কোন কামিনীর

বয়স ১৬; কাহারও বা বয়স ১৮; কাহারও বা বয়স ২০; কেহ ২৪, কেহ ৩০, কেহ বা ৫০।—দেই মণ্ডলমণ্ডে সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বল রকমের স্ত্রীলোকই বর্তমান। কোন স্ত্রীর হাতে বাতির আলো, কোন স্ত্রীর হাতে মুখের মালা; কাহারও হাতে হাতীর দাঁড়ের পাখা; কাহারও হাতে-গোলাপের তোড়া। কেহ বা বিলাতী পঞ্চকবীর শিখি লিরা আসিয়াছেন, কেহ বা লাল রমণ্য ঘুরাইতেছেন,—কেহ বা কাচ-পাত্রে পরকজল খরিয়া আছেন। কুন্দন, স্ত্রীলোক গণকে দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন; চক্ষিণ বস্তীর অধিক ভাল কেবল পর-পরুষের মূখ দেখিয়া, তিনি বিমর্ষকণ্ঠে বসিয়াছিলেন; এক্ষণে হঠাৎ নির্দিশ্টি বাসস্থানে এতগুলি স্ত্রীলোককে একেবারে দেখিয়া, তাঁহার বদনকমল প্রকৃষ হইল,—ক্ষম স্ত্রীমুখ জীবোৎসাহ। এইশুণ স্ত্রীলোকের মধ্যে যিনি বয়েজোতা তিনি গাড়ীর ভিতর মূখ ঢুকাইয়া, ভালবাসা-বসে যেন—পরিচয় গিয়া, কুন্দনকে কহিলেন,—“এস, এস, ভগিনি। এস।” আশীর্বাদে মূখ পর মনে করিওনা—এ তোমারই স্ব। আহা! ভগিনীর আমার, যুগ্মী ভূমিবে আছে! মূখ নয় ত, ঠিক বদে মনে আনুহুত পথ। মরি! স্ত্রী!—গাড়ীতে কতই না কষ্ট হইয়াছে!!

সেই বয়েজোতা, কুন্দনের করে ধরিয়া, তাহাকে গাড়ী হইতে অবতরণ করাইলেন। তখন কোন কামিনী তাঁহার গলার ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন; কেহ তাঁহার মুখের নিকট ষাতিতী ধরিয়া রহিলেন; কেহ বা শিখি হাতে তাঁহার স্তম্ভেরে কেশেধারি একটু গন্ধবোচা চলিয়া গেলেন।—কিছু সেই বয়ো-জোতা সকলকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,—“তোমাদের ভগিনীকে এখন দেখিবার, সাজিহির বা গন্ধাবলম্বন দিবার সময় নয়। উনি এখন মূখ হাত পুণ, জলটল ঘান, একটু ক্রিয়াম করল,—তারপর ইহার তোমরা আদুর-বহ, সেবা শুশ্রূষা করিও।”

বয়োজোতা কুন্দনের করে ধরিয়া, দীর্ঘপদে গৃহ-ভাঙ্গর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পশ্চাত-পশ্চাত অস্ত্রাভ রমণীপন হাইতে লাগিলেন। গমন-কালে কলকল করিয়া কামিনী হাসিয়া-হাসিয়া, চলিয়া চলিয়া পরশুরের পাশে পড়িতে লাগিলেন।

মহিলাকল অন্তর-মহলে প্রবেশ করিতে হইলেন। সঙ্গে তাঁহারের সাজসজ্জা ছাড়া একটি পুস্তক। কোন কামিনীর বয়স ১৪; কোন কামিনীর

গাড়ী হাঁকাইল। জাহ্নবীও গৃহাভিমুখে জটপল-
বিক্ষেপে পলাতেন।

গাড়ী পড়িয়াছে। খানী গোন্ধল ঘোড়হাতে জড়-
ভরতের স্রায় বিসর্গাছিল। এসে একে মুচি তায়
বন্দ কলিকাভায় আসিয়াছে। কলিকাভার কাও
দেখিয়া তাহার প্রাণের ভিত্তি ধ্বংসন একটা অংশ
করিতেছিল। কাজেই সে প্রথমত কোন কথা
কহিতে সাহসী হয় নাই। সে বোম্বল,—প্রথম
সে পুরুষের অবগত করিলেন; তার বানিক
পরে কলকাতা স্ত্রীলোক আসিয়া তাহার স্ত্রীলোক
নক্সা গেলেন;—অবশেষে সে ঘির করিল,—
“বোধ হয় আর একই পরেই আমাকেও লইয়া
হইবে।” এই আশায় আশাবারিত হইয়া খানী-
গোন্ধল চুপুটী করিয়া সেই গাড়ীর পশ্চাতেই
বিসর্গাছিল।

কোচম্যান বেগে খানীগাড়ী হাঁকাইল। খানী-
গোন্ধলের চাকর, ডাকিল,—কেনন সে ‘খাসত’
খাইয়া উঠিল। তখন সে এলিক-ওলিক চাহিতে
লাগিল,—কে, আমাকে কেহ লইতে আসিল না?
গাড়ী ত্রুে চলিয়া যায়।—এ পথ ছাড়িয়া অতপন
যায়। করি কি?—হয় কি?—ডাকি, কাকে?
গাড়ী একশল সে পথ পায় হইয়া, অতপন
আসিয়া পড়িয়াছে। খানী-গোন্ধল তখন হাঁকা-
হাঁকি আরম্ভ করিল,—“বাবু মোশাই! এ বাবু
মোশাই যো!—আমাকে নিয়ে যান না?—আমি
যে, পাড়িতে পড়ে গেলাম।”

গাড়ী তখন বেগে ছুটিয়াছে; কেই বা সে কথা
সে সময় শুনে? বিশেষ, কোচম্যানও জানিত না
যে, তাহার গাড়ীর পশ্চাত্তপে সে লোকটী ভগ্নও
বিসর্গাচ্ছিল। সে মনে করিয়াছিল, পাড়ী হইতে
যখন, সকলই নামিল, সে লোকটীও সেই সঙ্গে
অস্তিত্ব নাশিল। কে এমন বোকা আছে যে,
গাড়ী নিশ্চিৎ হায়ে দৌঁছিল, তাজা চুকাইয়া গিল,
অথচ একজন জ্ঞেয়কে রথ পশ্চাতে বসাইয়া
রাখিল? কাজেই কোচম্যান নিঃসন্দেহে গাড়ী
হাঁকাইতে লাগিল।

খানীগোন্ধলও লুইতে আসিল না, কোচ-
ম্যানও গাড়ী থামাইল না,—খানী গোন্ধল জ্ঞানহী
বড়ই কাতে হইয়া উঠিল। তখন সে গাড়ীর
আঁঠোন করিয়া উড়িল। কোচম্যানের কাণে
সে আওয়াজ কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রবেশ করিল।
কোচম্যান্য পত্রিকা সেদনিই করত, অথবা অত

কোন কাণের অস্থানমুখ বাঁকত,—সে, ডাকিল,
তাহার গাড়ীর পশ্চাতে বুকি হুই ডিনজন মাতাল
উঠিয়া সোমালল করিতেছে। তখন সে, কিঞ্চিৎ
মিলি কথায় তাহাঙ্গিকে লগেশন করিয়া, কহিত
মাতালগণের উদ্দেশে কোচম্যান হইতে চান্দুক
কহিতে আরম্ভ করিল। খানী-গোন্ধল, এক্ষণে
চান্দুক দ্বারা অবগত প্রহারিত হইতে লাগিল।
তখন সে একটা বিকট চান্দুক করিয়া, প্রাণভয়ে
গাড়ী হইতে ছুতল লাফাইয়া পড়িল।

খানী-গোন্ধল পত্রীগামবাণী। সহর কখন
দেখে নাই। গাড়ী-ঘোড়ার কখন চড়ে নাই।
উঠিতে নামিতে জানে না। বিশেষ, খোড়গাড়ী
বেগে দৌড়িবার কালে, কিরূপ কৌশলে যে, গাড়ী
হইতে অবতরণ করিতে হয়, তাহার রহজ খানী-
গোন্ধল কিঞ্চিৎকাল অবগত নহে। প্রাণভয়ে
যেমন সে, ভূতল পতিত হইবে, অমনই মূখ-
খাবড়িয়া পড়িয়া গেল। নাক, মুখ, হাত, পা
দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। বুক ছিড়িল; পেট
ছিড়িল; কাশড় ছিড়িল। সর্দীর হইতে হস্তাঙ্গ
স্রবিরধার্য নির্গত হইতে লাগিল।

ওকিৎ কোচম্যান, মাতালওনা পলাইয়াছে
ডাকিয়া, ক্ষুধিত সহিত গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।
একিৎ খানী-গোন্ধল, রাজপথে শিশালোকে একটী
অর্দ্ধক্ষিত অবস্থায় পতিত, লুপ্ত, মর্দ্যহত।
সুখিয়া এই, অধিকজন এ অবস্থায় তাকে
ধাতিতে হইল না। রাজপথে শীঘ্রই লোক জড়
হইল। একজন ভদ্রব্যক্তি, খানী-গোন্ধলকে
ধরিয়া তুলিলেন। তিনি দেখিলেন, লোকটী বিকৃত,
অবসন্ন। কাণ্ডবাহনি রূপে রক্তিত। তিনি
তাঁহার মণিরে মাছায়ে খানী-গোন্ধলকে পরাধরি
করিয়া হুটপথে লইয়া আসিলেন।

এই সহস্রাঘাতী ভয়-ভঙ্কির নাম স্ত্রীলোক
দীননাথ রাজপুত্রগৌরী। বয়স পঞ্চাশের কম নহে।
তিনি জ্ঞাতিতে ব্রাহ্মণ;—এক অতুলনশীল।
অভিজিৎ সম্ভান হইয়াও, একশে কেবল নিজগলে
বজ্রাঘ্রয় হইয়াছেন। সামান্য পত্রাবগের কাণি
হইতে আরম্ভ করিয়া, এক্ষণে যৌসের ‘মুন্সুদি’
হইয়াছেন। যৌসের কাণ্য-সমাপন করিয়া, তাঁহার
বাসায় এঁতাপাত হইতে প্রত্যহ প্রায় রাত্রি আটটা
নটাই ঘেঁহে। অরা তিনি প্রত্যাহমানে আপন
গাড়ী হইতে নামিয়া, কৃষিরাষ্ট্র আত্মপ্রাপ্ত
খানী-গোন্ধলকে রাজপথ হইতে উত্তোলন করেন।

দীঘবাবু, প্রথম ভাষিয়াছিলেন, লোকটা বুকি
নাং-বাতিরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। বুকি সে,
এখন মরিবে; এখনি তাহার প্রাণব্যাপ্য বর্হণত
হইবে। কিন্তু তাকে হুটপথে তুলিয়া আনিয়া
বুকিলেন,—আঘাত অন্তরে তাকুশ লাগে নাই;
আঘাত অধিকাংশ বাহিরে। খেঁসড়া লাগিয়া অঙ্গ-
প্রান্ত চিরিয়া ছিড়িয়া গিয়াছে,—এমত না। দীঘ-
বাবু নিরুতকর্কী কোন গৃহস্থের গৃহ হইতে অঙ্গল
আনাহি। তাহার মুখে দিলেন; এবং নিজে
চান্দবাহনি বুকিয়া সহিসের হাতে দিয়া বলিলেন,—
“এই চান্দর উদ্ধাকে পরাইয়া দাও।”

খানী-গোন্ধল প্রথমত ভয়েই যেন হতজ্ঞান
হইয়াছিল। এক্ষণে একটী জল বাঁধা, দীঘবাবুর
অন্ত-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, সে একটী প্রবৃত্তি
হইল। দীঘবাবু তখন তাকে কিস্তাদিলেন,—
“হুঁমি একপা ভাবে হঠাৎ পড়িয়া গেলে কিরূপে?”

একপা। গাড়ী দৌঁড়িতেছে, তাহার পেছন
হইতে যেমন নামিল, অমন পড়িয়া গেলাম।
দীঘবাবু। কলিকাভায় বুকি থাক কোথায়?
গোন্ধল তখন দীঘবাবুর পা ছুটী জড়াইয়া
ধরিয়া বলিল,—“জুজু! আমাদের কেউ নেই!
আমি আজ সবে এইমাত্র কলিকাভা এসেছি—
আমি কলিকাভার কিছুই জানি না। আপনি
আমাকে রক্ষা করুন।” এই বলিয়া গোন্ধল
বড়ই করুণবশ বিলাপ করিতে লাগিল।

দীননাথবাবু গোন্ধলের সহিত আর কোন কথা
নাথিয়া, আপন-পাড়াতে উঠিলেন; এবং সহস্রকে
কহিলেন, “এই ব্যক্তিকে একখানা ভাড়াটে গাড়ী
করিয়া আমায় বাটীতে শীঘ্র লইয়া আইস।”

ভারতে সংস্কৃতচর্চা।

প্রথম প্রস্তাব।

বহনত বর্ষের উপর্য উপরি বিভিন্ন জাতির ভাষণ
আক্রমণে ও সামাজিক সম্বন্ধে, হিন্দুসমাজে যে
ভীত ভুত উৎপাদন করিয়াছে—সেই ক্ষতের
কালার ও তাহার স্রাব বিষয় ‘সংস্কৃতমিত্য’
আজ ভারতে সমগ্র হিন্দুসমাজ ব্যাপ্তিছে, ও মর্দ্য-
হত। ভারতীয় সমাজ এক্ষণে ভীত অর্ধদগ্ধে ছুট-
কট করিতেছে এবং উত্তরত স্রায় বাহাকে সমুখ

দেখিতে পাইতেছে, আত্মলভাবে ত্রাহি-ত্রাহি’র
তাহাকেই যেন জড়াইয়া ধরিতেছে। বাহাকে
ধরিতেছে, তাহার শব্দভা বা সামর্থ্য, শূন্যতা
বা অক্ষমত পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা আজ যেন হিন্দু-
সমাজে বিলুপ্তপ্রায়, হুঁতংগ এপ্রকার সামাজিক
বিশৃঙ্খল অবস্থায়, দূর প্রান্তরকরূপ বিক্ষলন গ্রহীয়া
পাইয়াছে। নিজে সামাজিক ভয়ের অন্তরে অপ্র-
বিত্ত হইয়াও, সেই প্রান্তরকরূপ ছন্দে-বন্দে-কৌশলে
ঘণিত পাশ্চাত্তিকের কটাকাঁকাঁর নব্বুকে কি পরি-
মাণে হুশ্কারণিত করিয়া লইতেছে,—লোক-স্ব-
হায়ে নিপুণ ব্যক্তিগণ তাহা বিশেষরূপে ক্ষয়ক্ষয়
করিতেছেন। আর সেই “সকল প্রান্তরকরূপের
প্রয়োজনীয় স্বত্ব হইয়া যে সকল ব্যক্তি, আশাময়”
পথে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, তাইসের
বর্তমান অবস্থা ভবিষ্যৎ কিংবা আতিক্রান্ত দৈরাজ্য-
ভালাময় পতনে, সমাজের কি পরিমাণে অনিষ্ট
উৎপাদন করিতেছে, তাহা চিত্তা করিলেও ক্ষয়
বিশেষ বাধ্য পায় এবং অন্তরঙ্গা শিখরিয়া উঠে।

ইহা নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, সেই
সকল অন্তপ্রতিভা-সম্পন্ন বর্ধকশলকর্তৃক প্রযুক্ত
হতশাল-ব্যক্তিগণ দৈরাজ্য-মাগের নিপতিত হইয়া কিছু
দিন বিক্ষলগণের সহিত অভিবাহিত করেন।
কিছুদিন পরে তাঁহার একপ্রকার শিপ্তপ্রায় হন।
অবশেষে তাঁহার,—নিজে বুকির,অবিরহ, হুঁতংগ
“হিন্দু-সমাজ, ও হিন্দুধর্ম সামগ্রিক”—এই মাতের
পোষকতা করেন। সেই ক্ষতের-কৈ-কুমীর-
গণের তীব্র আঘাতে সমাজ যত ওগ্ররূপে ক্ষতি-
গ্রস্ত হয়, শব্দবর্ষের বৈদেশিক উৎপাদন তাহার
শতাব্ধের একাংশও সম্ভাবিত নহে। যে সকল
অবদূরপ্রী ব্যক্তি, চিরন্তন সমাজের নূন পদার্থ উদ্ধেল
করিয়া নতন সমাজ করিতে প্রাতিলাভী, তাঁহাদের
প্রশান্ত অন্তঃকরণে অদ্যকার এই আশোচা বিষয়টী
স্থান না গাণিলেও, প্রাচীন ইতিহাসের গৃহস্ত-
দ্বারা ক্ষয়ক্ষয় করিতে সমর্থ, এই সকল হিন্দু-
ধর্মের মর্দ্যপ্রীয়া মনীষিগণের নিকট অল্প ইহা
অপেক্ষা ওগ্রতর বিষয় আত্ম কিছুই নাই বলিলেও
অস্বাক্ষর হয়।

ভারতের সিংহাসনে বঁট দিন মূল্যমান ভূপতি-
গণ বসিয়া আমাদের অদৃষ্টচক্র চালনা করিতে
ছিলেন, তখন ভারতগণের এখনি কতকগুলি
নিগূঢ় শক্তি ছিল। যে, তাঁহার সেই সকল শক্তি
পরিচালনা দ্বারা যথোচ্চাচারী বদন-মূর্তিপতির একশ

উৎপাদনও, নিজের সমাজে ধর্মের বিজ্ঞাতীয় সর্লক্ষণবিন তীক্ষ্ণক্সেদ্বয়ভা নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেছে।

সুসভ্য যুগ্মশব্দ ইংরেজ-রাজত্বের আরম্ভ হইতেই ভারত একে একে সেই সর্বলক্ষণিক হারাইতেছেন; উহার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডিত্য সভাতার তীক্ষ্ণ প্রাণবিন্দু সর্বলক্ষণিক চারিত্রিক হইতে ভারতবর্ষ প্রাস করিতে আগ্রস হইতেছে। মুসলমান রাজত্বকালে যে সকল শক্তির পরিচায়না দ্বারা হিন্দুসভ্যতা নিজ জাতীয় ধর্মের ও সমাজের সম্বন্ধে নিজাতীয় হলা-হলময় সর্লক্ষণ হইতে বক্ষা করিয়াছেন, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বিশেষরূপে স্বংগত আছেন; সুতরাং এখানে তাহার পুনরুদ্বোধ নিম্নলিখ্যে।

সেই সর্বলক্ষণিক হারাইয়া, প্রকৃত হিন্দুসমাজ এখন অল্পের বিলম্বনিমিত্তইভাব রাখণ করিয়াছে। সেই নিম্বেষ্টভাব দূর করিতে হইলে, বহুবর্ণ্যাপী পৌরসভা ও অপরিসিত স্বপল্লিগণ প্রকৃত আত্মশুদ্ধি। আমাদের সামাজিক অধোপাতি নানা কারণ আছে। কতকগুলি কারণ সামাজ্য, কতকগুলি কারণ পরম্পরায়। ইউরোপীয় জাতি সম্বন্ধে যে বিখ্যাত প্রাচীনদেহবিদ্যা আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে,—তাহা যেমন সাক্ষ্য, তেমনি পরম্পরায়। এই হৃতীয় সর্লক্ষণবীজ হইতেই প্রাণবিন্দু: সঙ্কত শিশুগণ অধোপাতিগুণ একতী হৃদিশাল বিদগ্ধ উৎপন্ন হইতেছে। সেই বিদগ্ধগণের বিদগ্ধ জায়া দ্বারা হিন্দুসমাজের নবোদারী শান্তিময় আলোক, পৃথিবী হইতে ধীরে ধীরে অস্তিত্ব হইতেছে।

হিন্দুসমাজের পরিচালক, সাধারণ মনুষ্য হইতে পাত্রে না। ত্রিকালদর্শী, দোদীপশিখের চূড়তরঙ্গ, বর্জিতম-ধর্মের সারঙ্গ, সমাহিতচৈতন্য, সমস্যারের মোহময় আদর্শগুণস্ব, তপোবানবানী, আদর্শচরিত্র পৌত্রি গৌতন প্রভৃতির জাতি স্বপল্লিগণ এ সমাজের পরিচালক, ইহার সত্যপুত্র বর্জিত সর্লক্ষণ, এবং ইহার ইষ্ট করিতে যুগ্মপুত্র। কলিগুণ এখনে মা ব্যাকুলেও, তাহাদের পুত্র্য, তাহাদের সমাহিত্য, তাহাদের পবিত্র ইতিহাস ভারতবর্ষ ভবতিন বিদ্যমান থাকিলে, ততদিন হিন্দুসমাজের পরিচালনার জ্ঞতা ওপায়ান্তর গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই;—এই অতাবশ্যকীয় ও সন্মুখল সমভাতি যৌনি হইতেই হিন্দু সুল্লিগণে শিথিয়াছে, সেইদিন হইতেই হিন্দু সমাজস্বর্গ নারাজের সঙ্গে অনেকগুলি গাছগাছড়-রূপ উপলব্ধি গুরুপ্রবেশ হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে

ভারতে সংস্কৃতশিক্ষার এতদূর অধোপাতি হয় নাই বলিয়া, তখনকার উপলব্ধিগুণ এতদূর সমাজ-বিসারক হয় নাই।

মুসলমান-রাজত্বকালে সংস্কৃতশিক্ষা বর্জিত অনন্যভাবে আরু হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভারতীয় হিন্দুসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই। তাহার কারণ, সংস্কৃতশিক্ষা পুণ্ড্র হইলেও সে, সমগ্র সংস্কৃতশাস্ত্রের ভাব আর্থাভাজির মস্তিষ্ক হইতে, বৈদিকগুণ ভাবার এবং বৈদিকগুণ সভ্যতার তীক্ষ্ণ সর্লক্ষণ, হৃতীয় আঘাত পাইয়া, বিলয়ের পথে বাধিত হইতে পারে নাই। মুসলমান, ভারতে রাজ্য করিত বটে, কিন্তু ভারতীয়-সমাজের মূলভিত্তি উদ্ভেদন করিয়া, নিজজাতীয় ছাচে তাহাকে প্রত্যা, তাহারই উপর নিজ সাম্রাজ্যের সমুদ্রলুপ সিংহাসন বসাইতে চেষ্টা সে করে নাই, বা করিবার উপায় ভাল করিয়া দেখিতে পারে নাই। যদিও কোন কোন জন মনুষ্যত্ব মুসলমান ভূপতি এবিষয়ে কলিগুণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাহাদের সংখ্যা এত অল্প ও কাঁচালাক এত সঙ্কট এবং তাহার পথ এত বহল পরিমাণে ফুটকোঁকীয় যে, তাহাতে তাহাদের রুতকাঁচাভা এক প্রকার অধঃপাতি বোধ্যা বলিলেও অস্মজিত হয় না।

কি আত্মকীয় অধ্যব্রোত আর একদিকে ছুটিয়াছে। লোক-হৃদয়ানভিজ, নিলাস-পরায়ণ, অসি-মাত্র-সমল মুসলমান নরপতিগণ পরিবর্তে ভারতে রহস্য সিংহাসনে আজ “হিন্দুসভ্য” রাজ-নীতিবৃন্দ, ভারত-সমাজের অস্ত্র-প্রবেশক, মহাদীপশক্তি-সমগ্র, মহাপ্রতাপশালী ইংরেজরাজ্য আনীন। কল্পণ সাম্রাজ্য চিরায়ী করিতে হয়,—কোন উপায়ে এতদূর ভারতে অধ্যব্রোত, উপলব্ধিগুণ, বিশুদ্ধ, ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতিগুণিত, একই অস্ত্রভিত্তিকী সাম্রাজ্যশক্তি নিজে পলাতন স্বীকার করে, তাহা যেমন ইংরেজরাজ্য ন্যূন। পুত্রি আর কাহারও তাহা সুবিধার শক্তি নাই। এ প্রকার সুবিধার শক্তি আছে বলিয়াই ইংরেজ-জাতি যথা ভারতে অগ্রযাত্রিত প্রকৃতিগুণ বিস্তার করিতে পারিয়াছেন; সম্ভবত বর্জ মুসলমান যথা করিতে পারে নাই, অর্ধশতাব্দীতে ইংরেজ তাহা করিয়া পাইয়াছেন।

অনি-বলে মুসলমান যথা করিতে পারে নাই, যুক্তি-বলে ইংরেজ তাহা করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন,—“ইংরেজ সুবিদ্যাগে, ভারতের সামাজিক

জীবনকে নতদিন না আয়ত্ত করা বাইবে, ততদিন তাহারা ভারত-সাম্রাজ্যে অর্ধলক্ষ্যরূপ,—ততদিন তাহাদের প্রকৃতিগুণ অস্ত্র-প্রতিভা। হিন্দু অন্তর-বাহির, সমগ্র-অক্ষণ, পাশ্চাত্য-চতুমণ্ডল—সমস্তই অস্ত্র-প্রতিভা রাখা,—ইংরেজের সুমূল্যনীতি। এই মূলনীতি আশ্রয় করিয়া আজ ইংরেজ নিজ জাতীয়-শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতেছেন, নিজ জাতীয়-সমাজের মনোভাষা ভারতীয় জাতীয়-সমগ্র ভিত্তিগুণিত করিবার চেষ্টায় আছেন। আজ ইংরেজরাজ্য বিশাভীভাবের বিষম চটকে ধাঁধা লাগাইয়া, ভারতকে পূর্ণস্বাভি জুলাইয়া দিতেছেন। সামাজিক বিশুদ্ধলভারূপ আপাত-বহুশাসিত বধ্য আবিষ্কৃত করিতেছেন। এই প্রকার চারিত্রিক হইতে অধঃপতনের দ্বার মকুল খুলিয়া দিয়াছে। ইউরোপী-সভ্যতার তীক্ষ্ণমুদে উদ্ভবপ্রায় ভারতীয় সমাজ, কোন পথে গেলে আগে অধঃপাতে বাওয়া যায়, যেন তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন। সে যথা হউক, ইংরেজ ইচ্ছাপূর্বক আদর্শগুণ অধঃপাতে পাতীন আর নাই পাতীন,—আমরা মোক্ষ প্রকৃত অধঃপাতে বাইতেছি।

এই হৃতীয় পবিত্র হইতে একমাত্র উদ্ধারের পথ “সংস্কৃত-চর্চা”। মতিভিত্তি হিন্দুসমাজকে অধঃপাতে হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে, এখনে সর্লক্ষণে সামাজিক-চর্চকে পূর্বকালগের পূর্ণ-সভ্যতার হিন্দুসমাজের মনোমোহক ছবিগুলি ঐকিতে হইবে; পূর্ণভাষাতা কাহাকে বলে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে; ব্যাস, বসিষ্ঠ, গৌতম, কণা, জেমিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণের জ্ঞান-ভাণ্ডারের মন হইতে রহতুলি রাখির করিয়া হিন্দুসমাজকে দেখাইতে হইবে যে, এই সকল রহস্য শতাব্দীর জ্ঞান-রহস্য করিতে হইলে, তোমাদের আদর্শিক শিক্ষাগুণ, ইউরোপীয়-আদর্শিক-জ্ঞানিক-সমাজ-পতিগুণকে এখন হইতে অনন্ত যুগযুগান্ত কঠোর ভাষা করিতে হইবে। ইংরেজ, রাজস্ব, ব্যাতি, সুবিধিত প্রভৃতি নৃপতিগণের মনোমোহক চিত্র মকল তাহাদের জ্ঞানে অস্তিত্ব করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, আদর্শিক-বলে লোক-মনুষ্যের উপর পৈশাচিক ভাবেই অভিভাব্য করিবার জ্ঞতা রাশজিত পুত্র হয় নাই,—সমস্যার উদ্ভীলিত প্রভিগুণ দেখাইবার জ্ঞতা রাজশক্তি বিদগ্ধ। তৎক, রাজস্ব, কলিগুণ, জীবদুঃখগণের জ্ঞতাবাহী প্রভিগুণিত সকল মানসপটে অস্তিত্ব করিয়া আজ সাধারণকে

দেখাইতে হইবে যে, পূর্ণ-পাক-সাধারণ বিদগ্ধ-মুখ, এই চূড়ত মহর্ষিগণের লক্ষ্যভূত নহে। যে যুগের অগ্রপণ্ডিত হুৎসে ছায়া নাই, যে যুগ-সাপের মধ্য হইলে আর উদ্ভান করিতে হয়-না, সেই অধঃপতি সাম্রাজ্যময় যুগই মানবের একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রকার অনেক বিদগ্ধের তত্ত্ব আজ ভাল করিয়া বুঝিয়া না দিলে,—বিজাতীয় সমস্যার বিকল-হৃদয়ে উদ্ভাস্ত হিন্দুসমাজকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া না দিলে,—আজ হিন্দু মোহবিদ্যা ভাবিলে না। অস্ত্র সে মোহবিদ্যা না ভাবিলেও, হিন্দুসমাজের অধো-পতি পথে কণ্টক পড়িলে না।

এই মোহবিদ্যাভাবের উপায়,—এখনে একমাত্র সংস্কৃত-শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। যজ্ঞায়, যিগেটোরে বা কথকটায়,—ব্যাস, বসিষ্ঠ, গৌতম, কণিগণ; রাম, যুধিষ্ঠির, ব্যাতি, নর্ভবের; জনক, শুকদেব, নারদগণ; ভীষ্ম, অর্জুন বা কণের,—বিস্তৃত প্রায় চিত্র দেখিয়া তাহাতে অনুভবী হইবার দিন আর আজকাল নাই। আজ যথার্থ নির্মূল-নর্গলে সেই সকল মুক্তি পূর্ণপ্রতিভিত না দেখাইতে পারিলে, লোকের হৃদয় অস্বহক হইবে কেন? ইউরোপীয় সুভিগুণ, আজ হিন্দু হৃদয়ে সমগ্র-সমুদ্রের অস্তরভাষা করিয়াছে। আর্থা কলিগণের বিজ্ঞানজ্যোতি: পূর্ণকালীন না পাইলে, সে সাগর শুকাইবে কেন? তাই বলিতেছিলাম, সংস্কৃত-শিক্ষার পূর্ণ-বিশাল ব্যক্তিরকে, সেই আদর্শ-চিত্র-সকল চিত্রিত করিবার অস্ত্র কোন উপায় বিদ্যমান নাই।

একবার নিম্নগুণের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখুন। দেখিবেন,—কতকগুলি লোক হিন্দুসমাজের নেতা যাজ্ঞিয়া করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুসমাজে নেতা? নামভীকৃত মধ্য:। ব্যাস, বসিষ্ঠ, গৌতম—একদিন যে নাম ধরে করিয়া আত্মাকে গৌরবাবিত বোধ করিয়াছেন, সেই নামভী আজ কৃত অজ্ঞমুগে নাম: জ্ঞের বাজারে বিক্রীত হইতেছে। তাহা কি কেহ দেখিতে পারে? যাহার উপদেশে পাণ্ডিত্যের ব্যাধি-মধ্যা দূর হইবে, শোক-প্রবেশে শোক-ভাষা বহু বাইবে,—যাহার প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সকলই সর্লক্ষণ-বিদগ্ধ হইবে, সে জন ব্যক্তিরকে উ অস্ত্র কেহ হিন্দুসমাজের উৎকৃষ্ট নেতা হইতে পারে না। কিন্তু সমাজ কি আজ উপলব্ধি পাত্র পাত্রী নয়। কিন্তু সমাজ কি আজ উপলব্ধি পাত্র পাত্রী নয়। কিন্তু সমাজ কি আজ উপলব্ধি পাত্র পাত্রী নয়। কিন্তু সমাজ কি আজ উপলব্ধি পাত্র পাত্রী নয়।

এই পাঠ্য মাননীয়তার প্রতি হেতু; ইহাবশেষে মুখ্য উত্তরোত্তরে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৩৪। প্রাণিবিশেষের হিসাব বহাতে না হয়, এবং বিশ্ব কার্যের শ্রম নির্ভর প্রেরণা অর্জন করিবে। ধর্মোৎপত্তির সর্বদা মূল্য ও শৌক্যের বাহির ব্যবহার করা কর্তব্য। ১৩৫। গুরুগুরু হাঙ্গামের মত, মাংস, মাংস, পক্ষ, উদ্ভিদ-রস ওজাদি, স্ত্রী, কাম, ক্রোধ, লোভ, মৃত্যু, গীত ও বাতা এই সকল পরিভাষা প্রবিষ্ট। পলিত (পচা) দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না, প্রাণিহিংসা করিবে না; তেল মাখি। বসি। নেড়ে অঙ্গন, পাচকা এবং ছত্র ব্যবহার, এই সকল একান্ত নিষিদ্ধ। হুইভাবে নারীজন-দর্শন বা স্পর্শ, ইহাও পাপব্যবহার একান্ত নিষিদ্ধ। ১৩৬-১৩৭। নিজের ও গুরুগুরের কার্য-নির্বাহোপযোগী জ্ঞান-হাঙ্গ, পোয়া, সূতিকার এবং কৃষিকার আরহণ করিবে। প্রতিদিন ভিক্ষাটন করিবে ১৩৮।

এই সকল আচারের প্রধানতঃ প্রয়োজন, বাসকোর চিত্ত ক্ষেত্রকে বিদ্যাবাদ-বিশেষে উপযোগী করা। পূর্বকালের আচার-সম্প্রদায়ের শিখা-প্রণালী এখন একাধারে স্থগিত হইতে হইবে, তাহাতে রক্ত বা তমোগুণের বহুল ভাবে জুগল হইবার প্রথা সম্পূর্ণরূপে প্রতিরুদ্ধ থাকিবে। যে পলার্থের সম্পর্কে কোন-দ্বারে প্রবেশোদ্ভূত হৈবিক সম্ভান-বর্গের জ্বলে তামসিক বা রাজসিক বহির ছায়া পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে, সেই সকল বস্ত হইতে তাহাশিখের সর্বদা অভিস্রব প্রস্থান থাকিতে হইবে। যে সকল বৃত্তিনিচয় পরিকল্পিত হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে মনুষ্যকে জীবনের সংপদ হইতে বিচ্যুত করে, অর্থের আনন্দে ভবিষ্যৎ উদ্যম-নিয়ন্ত্রকে ভুগিয়া রাখে, মনুষ্যজন্মের সাধন্য-বোধকে চিরজীবনের জ্ঞান অঙ্গন-নিচয় হইতে বিলাস দিয়া থাকে, সেই সকল প্রাচীন প্রকৃতি-নিচয় কেবল নীতিশিক্ষার উপদেশে প্রতিরুদ্ধ হইবার নহে—কেন্দ্র সমাজের বা রাজসংগে তাড়নায় তাহার দমন হওয়া অন্তর্ভুক্ত। বালাকাল হইতে দূতর অভ্যাস ও প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না হইলে, এমত লোক অতি-অবহি আছেন, ইহার বোধনীয় দুর্দান্ত বৃত্তিনিচয়ের প্রবল উৎপাদন মনুষ্য-জীবনের সারভূত সফলকরিতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এই সকল কারণে প্রাচীন আচার-সমাজ-পরিচালকগণ নিজ বালকগণকে কেবল এমের হস্তে সমর্পণ না করিয়া, প্রকৃত-

ভাবে নীতিশিক্ষার অহুতান করাইছেন। বৈদ্যধা-রন, ও তাহার অভ্যাস, ইহা নিত্যকার কার্য; ইহাওই ব্রহ্মচারীর অধিক সময় অতিবাহিত হইতে; অবশিষ্ট যে সময় থাকিত, সে সময় নিজের উত্তমপুত্রের জন্ম ভৈক্ষ্যচর্যা, মধ্যোপাসনা, গুরুসেবা, বন হইতে কাঠানয়ন প্রভৃতি কার্যে অতিবাহিত হইতে; এমত একই ও সময় পাওয়া যাইত না, যে সময় অল্প-উত্তমপুত্রকে ব্রহ্মচারীর জ্বলে বিশ্বচিহ্না প্রদেয় করিয়া, তাহার হৃৎচিহ্ন স্ত্রেরে বিধি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে।

এই প্রকার ব্রহ্মচার্য, অবস্থার, কঠোর তপস্যার যে অমৃতা রস, আর্ঘ্যভঙ্গনপর্যন্তকর্তৃক অঙ্কিত হইতে, সে রস ব্যাপি আজ হতভাষা ভারতে নাই, কিন্তু কে-কোনও রক্ষালাল বিচার্য করিয়া তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে, সেই সকল মনোরমণ পুস্তকরূপ রক্ষালাল, আজও মানবদেহে বিঘ্নের পায় নাই। আজও গ্রাম, পাতঙ্গ, মাংস, কাশান, মায়ামায়া ও বৈদ্যদর্শন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখনও রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাঙ্গ যোগসুত্র ও উপপুরানিচয় সর্বসমুদায়ক কালের কঠোর শাসনের সমক্ষে সম্পূর্ণরূপে মস্তক অবনত করে নাই। এখনও চন্দ্র, সূর্য্যত প্রভৃতি গ্রহ ভগ্নতে প্রোথিত হয় নাই। এখন ভাষ্যরচয়িতা, আর্ঘ্যভা, বরাহমিহির প্রভৃতি মনীষিগণের অনন্ত চিন্তার অমৃতময় ফল-স্বরূপ সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থচিন্তা মহাকাশের করাল বদনকণ্ঠে প্রবেশ করে নাই। আছে ত সকলই; কিন্তু সেখা কে? বৈদেশিক সভ্যতার আত্ম-বাঙ্কিতে বিমুগ্ধভাৱে ভারতের আশ্রয়দ্বার “শিক্ষিত-সম্প্রদায়” সে রচের আলোকে কাম্যদ্বার অহুত করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কঠোর বিনাভী দাম্যদামধনিকের কণ্ঠ বহির হইয়া গাইছে; ত্রিভুজের মনোমোহকের স্বরলহরী তাহাতে প্রতিধ্বনিত হইবে—কেনন করিয়া?

যে শিক্ষার প্রভাবে ভারত একদিন ব্যাস, বসিষ্ট, শৌতম প্রভৃতি প্রিয়সন্তানবলকে জেগে উঠিয়া সাফা লাভ করিয়াছিল, সে শিক্ষা—সেই প্রাচীন ভারতে সর্বগুণভূত প্রাচীনশিক্ষা আজ আর ভারত নাহি। কখন যে আবার সে শিক্ষা সর্বভাষে স্থাপিত হইবে, তাহাও জানি না। প্রাচীন শিক্ষার অনেক দিনই লোপ পাইয়াছে; যে শিক্ষার অমৃতময় রস হইতে ও আমরা অনেক দিনই বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু তাহার অভাবেও

অতীত ছয় শতাব্দীতে আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহার প্রোক্ত ও আজ হঠাৎ প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরপূর্বে সংস্কৃতশিক্ষা-প্রণালী যে ভাবে চলিতেছিল, আজ-কাল তাহা যে কত অবনত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিলে কোন মনুষ্যের হৃদয় চক্ষে জল না আইসে?

ত্রিপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

ত্রিবেণী।

পূত-সালিলা ভাগীরথীর কূলে ২২ ৫০ ১০° অক্ষরেখা ও ৮৮ ২৬ ৪০° দ্রাঘিমাংশে প্রাচীন পবিত্রপ্রাণী ত্রিবেণী সম্মিলিত। (১)। ত্রিবেণীর সর্বপ্রথম ভাগীরথীকে একটি প্রশস্ত দ্বীপ বা চর পরিশোভিত। এই দ্বীপের দক্ষিণ সীমান্তের ঠিক বিপরীতে, ত্রিবেণীর অপর তীরভূমে ময়ূনা-কলপ্রোত প্রবাহিত হইয়া আদ্যি, তটশালিনী কলনিদানিনী জাহ্নবীর পবিত্র সলিল-রাশি সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে (২)। ভাগীরথীর যে স্থান হইতে ‘বিনির্গত হইয়া ময়ূরভী বহমানা হইয়াছে, সেই স্থানে ময়ূরভী-সলিল-ধারার দক্ষিণে ভাগীরথীর উন্নত তটভূমে

(1) Vide Statistical Account of Bengal, vol. iii, p. 310 by W. W. Hunter.

(2) Vide Note Journal of the Asiatic Society, of Bengal vol. xlii, 1873 p. 214.

“The island opposite Tribeni has a conspicuous place on De Barros' Map of Bengal and on that by Blaeu (Vide Pt. iv.). The maps also agree with Abul Fazel's Statement in the Ain, that at Tribeni there are three branches, one the Saraswati on which Sâtgan lies; the other, the Ganga, now called the Hugli; and the third, the Son or Jabuni (Jamunâ). De Barros and Blaeu's maps show the three branches of almost equal thickness, the Saraswati passing Sâtigan (Sâtgan), and

ত্রিবেণীগ্রাম অবস্থিত। ভাগীরথী, ময়ূরভী এবং ময়ূনা এই পূর্ণা-নীর ধারাজনক সলিলন্থলে সম্মিলিত বলিয়াই, উক্ত স্থান ত্রিবেণী নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছে।

কালের অনিবার্য গতি কে রোধ করিতে পারে! কোন বাধা বিপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া কালপ্রোত অবিচল পতিতে অনন্ত পথে প্রবাহিত হইয়াছে। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, কি ধনী কি দীন, কি দীপকিতা কি পরাক্রমশালী, সকলকেই ঐ প্রোতের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে হইবে। এই নিঃস্রের বহনবর্ধী হইয়া, একদা-পরমেশোভা-সমুচ্ছালিনী জনানী-নগরী ত্রিবেণী এক্ষণে একটি সামান্য গ্রামসম্মে পরিণত হইয়াছে। ত্রিবেণীর নিয়ে ময়ূরভীর খালে অব্যাপি ও সুবিকা ‘খনন করিবার সময় অনেক মানুষ, জীর্ণ নৌকা, ভাঙ্গা তক্তা ও শূণ্যশালী প্রাণ্ড হওয়া যায়। প্রাচ্যের কোন কোন অংশে সুবিকা খনন করিতে করিতে, অনেক ইটকাঁদি ও অটালিকা প্রভৃতির ভিত্তি বৃদ্ধ হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের প্রিনির সময়ে যে সকল পোত, যুরোপ হইতে বাণিজ্য্যভিনয়ে পণ্যভাষ্যাদি লইয়া এদেশে আগমন করিত এবং এতদেশজাত বস্ত্রাদি লইয়া প্রত্যাপন করিত, সেই সকল পোত গোদাবরীর নিকট একত্র হইত; তৎপরে বঙ্গোপসাগর-কূলবর্তী কয়েকটি স্থান অভিবাহিত করিয়া, ত্রিবেণীতে আগমন করিত। (৩) টেলিমির-পুস্তকেও ত্রিবেণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ময়ূরভীর মুখের উত্তরে স্থপ্রশস্ত ও সমুচ্ছ ত্রিবেণীট সম্বন্ধিত। বাটের অতীত ময়ূনা ও প্রশস্ত সোপানপ্রণী, উন্নতভূমি হইতে ক্রমশঃ নিম্নে অব-

Chowma (Chaimuha in Khugli District, North), and the Jabuni flowing westward to Buram (Borhan, in the 24 Perganahe.)

(3) “Pliny mentions that the ships assembling near the Godavari Sailed from thence to cape Salimurus, thence to Tentigale opposite Falta, thence to Tribeni, and lastly to Patna.”—Vide Calcutta Review-article by Revd. J. Long.

তদুপপূর্বক, স্রোতধারীর অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়। কথিত আছে, উড়িষ্যার গরপতি-বংশীয় অধিবাসিন নৃপতি মুহুম্মদবল্লভ এই অবস্থায়ই নির্মিত হয়। তিনি দুইয় প্রাচীরে শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন (৭)। তঁহার পুত্র-কন্যারাই বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এখান আছে, হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি অসংখ্য কল্পিত পূজা-প্রস্তুত, তিনি ত্রিবেণীতে এই খাতি নির্মিত করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত একটি দেব-বিগ্রহও তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। অসংখ্য উৎসব-বাসিন্দগণ সময়ে সময়ে মুহুম্মদবলের নামোন্মেষণ করিয়া বলিয়া থাকে যে, তাহার রাজ্য বাঙ্গালার পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উপর উক্ত ত্রিবেণী-ঘাটের নির্মাণকাল তিন-শতাব্দীর অধিক হইলেও, অসংখ্য উহা উন্নত অবস্থায় রহিয়াছে। মধ্যে ভাঙ্গা-নিচু-চুয়া-করা শিল্প-চতুর্ভুজ-সিংহ-কর্তৃক ঘাটটি সংরক্ষিত হয়। এই ঘাটে চান্দনী নাই। মুহুম্মদ-ঘাটের পার্শ্বে আর একটি চান্দনীসমূহ ঝাঁপ রহিয়াছে; ত্রিবেণীতেই ৮ হরিদমোহন মজুমদার ঝাঁপের নির্মাণ করিয়াছিলেন। মজুমদার ঘাটেই গঙ্গাবাতীর ধর আছে।

ত্রিবেণীর প্রাচীরের সাক্ষরপূর্ণ ঐতিহাসিক আখ্যান অধিক সেবিতে না পাওয়া বাস্, উহার ঐতিহাসিক প্রবাদ-মুখ্যিই জনগণের মনেমাধ্য অবিকৃত জ্ঞান্যমানরূপে বর্তমান করিতেছে। তথাপি উক্ত হানের ঐতিহাসিক বিবরণ ও চিহ্নাদি সমুদ্রে বা কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। তথা পাঠকগণের যৎপরিত জ্ঞত এখানে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিব।

ত্রিবেণীপ্রদেশে দক্ষিণ দীর্ঘাঙ্গ একটি প্রাচীন মসজিদ সেবিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদটি বিলম্ব প্রায়ত বিন্দু প্রাচীরগণিত হয়। উহারই দীর্ঘাঙ্গের প্রাচীরে জাফর খাঁর সমাধিস্থিত অবস্থিত আছে। প্রবাদ, এ মসজিদটি এক সময়ে হিন্দুদিগেরই দেবমন্দির ছিল। জাফর খাঁ একজন আফগান মুসলমান বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি পাওয়ার গো-দুহর নাক সাহ সাকির পিতৃব্য হইতেন। রাজা জুয়ানর সহিত সংগ্রাম করিবার

(৪) ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মুহুম্মদ উড়িষ্যার সিংহাসন আরোহণ করেন।

সময় তিনি নিহত হন। জাফরের পুত্র হুদাদীর রাধাকে মুহুম্মদ পরাজিত করিয়া, তাঁহার কন্যাকে উহারহস্তে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এখিত হিন্দু-মন্দিরের সীমান্তভাগেই এই রাজহত্যার সমাধি হয়। অসংখ্য কোম কোম মুসলমান-পুত্র উপলক্ষে, হিন্দুগণ এ সমাধি-মন্দিরের সমীপে উপস্থিত হয়। পূজা দিয়া থাকেন। জাফর খাঁ গোবিন্দ মুসলমান ছিলেন বটে; কিন্তু কথিত আছে যে, তিনি হিন্দুদিগের পবিত্র-সালিলা গঙ্গাবাতীর পূজা করিতেন। (৫)

অধ্যাপক ব্রজমোহন সাহেব জাফরখান মসজিদ এবং সমাধি মন্দির সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

ঐ আশ্রিতা দুইটি বিভিন্ন বৈচিত্র্যে (৬) বিতল। অশ্রিতা ভাগীরথী-তীরবর্তী বিস্তৃত-পাহাড় মাটিতে স্থাপিত। এ বৈচিত্র্য প্রাচীরটি দুই-তরফে বাসন্তী প্রস্তম্বসমূহ দ্বারা বিরমিত। কথিত আছে যে, জাফর খাঁ কর্তৃক বিস্তৃত একটি হিন্দু দেবমন্দির হইতেই এ মসজিদ স্থাপিত হয়। এখান ছিল। নদীর সমুদ্র-পূর্বদিকের প্রান্তের একটি দুর্গ নির্মিত করিলেই, সেবিতে পাওয়া যায় যে, উহার প্রান্তে অসংখ্য দেব-দেবীর ও পুষ্কবিশিষ্ট সতীসংপারি মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। ভূমি হইতে প্রায় চার হস্ত উচ্চ প্রাচীর-অংশ একটি-লৌহদণ্ড সমন্বিত রহিয়াছে। প্রবাদ আছে যে, উহা জাফর খাঁর দুহস্তের বিশেষণের মূর্তি (৭)। তৃতীয় ভৌগোলিক প্রত্যক্ষণের অধীনে পশ্চিম প্রাচীরের সঙ্গে সংলগ্ন, উহা সৈকত শিলা দ্বারা নির্মিত। বর্তমান বাগিচা বা আশ্রিতা-রক্ষককে নিতান্ত মূর্খ বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, এ পশ্চিমদিকের পৌরসংগঠিত ইজদার খাঁর সমাধিস্থিত। অজু তিনটির মধ্যে একটি আনই খাঁর পুত্র, একটি পাইন খাঁর পুত্র এবং তৃতীয়টি বার খাঁ গাজির সমাধি। অথোমক বেবেজর মধ্যে জাফরখাঁর তৃতীয় পুত্র বার খাঁ গাজির এবং

(৫) *Vile Statistical Account of Bengal Vol. III, p. 311 by Mr. W. W. Hunter.*

(৬) জনসাধারণে এ গোহনভূতি "দক্ষা-গাজির সন্তান" বলিয়া থাকে। এ সন্তানটী নড়াইল আশ্রিতা ছিল, কিন্তু অধিরে আইসে না। গাজির সন্তান নড়ে চড়ে কিত পড়ে না।

তৃতীয় পুত্র রহিম খাঁ গাজি ও কয়ম খাঁ গাজির সমাধিস্থিত নির্মিত আছে।

"যদিও বৈচিত্র্যের পশ্চিম দিকের চতুর্ভুজ-সংলগ্ন স্থানে মুসলমানদিগের একটি ভবন-প্রান্তে অসংখ্য পরিচালিত হয়। থাকে উক্ত মসজিদটিও একটি প্রাচীন হিন্দু-দেব-মন্দিরের উপকরণ দ্বারা নির্মিত। বাসন্তী প্রস্তম্বের প্রতি যে কয়েকটি বর্ণসংগঠিত স্তম্ভ মসজিদের বিধান-নিচয়ের আধারস্বরূপ দণ্ডমান রহিয়াছে, সেগুলি বিমান্য হুলাকার। কথিত মসজিদে যে কয়েকটি কলস (পূজা) আছে, এ কলসের নির্মাণপ্রণালীর প্রতি দুর্গ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেকটিই হিন্দু নির্মাণপ্রণালীর উপাদান অর্থাৎ মসার স্তম্ভসংলগ্ন সংলগ্ন। নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ভসংলগ্নের ব্যাস ক্রমশঃ সর্বাধিক হইয়াছে। এ প্রত্যেক কলসের শীর্ষভাগে, সমস্ত স্তম্ভসংলগ্নে অস্ত্র করিয়া, অসংখ্যমাত্র এক একটি বৃত্তাকার ছিদ্র রহিয়াছে। আবার এ ছিদ্রসমূহ একটি করিয়া গোলাকার শিলাখণ্ড দ্বারা শীর্ষকরূপে আবৃত। কলসরূপের মধ্যে দুইটি তরঙ্গাঙ্গ প্রাঙ্গ হইয়াছে। পশ্চিমদিকের প্রাচীরগণে কতকগুলি লেখা খোদা আছে। মসজিদের মধ্যদেশে প্রাচীরগণের যে কয়েকটি মন্দির (হুলাকার কলস) রহিয়াছে, অসংখ্য আয়ত-ভাষা খোদিত প্রেক পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, এ মসজিদ, বৃত্ত-দেবীখাঁর মন্দির। জাফর খাঁ কর্তৃক ৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে (১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হয়। মসজিদের চতুর্ভুজ-পার্শ্বটী হানে অত্যন্ত অসমতল—কতকগুলি বাসন্তী প্রস্তম্ব নির্মিত স্তম্ভ ইত্যন্ত বিকল্প রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত কয়েকটি মসজিদ এবং অন্যান্য ইজদারগণের ভিত্তিমূল্যে অবশিষ্ট রহিয়াছে। কথিত আছে এ স্থানটীয়া পূর্বকালীন বাগিচা (আশ্রিতা রক্ষকদিগের) বিশ্রামালয় ছিল। (৭)।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভাগীরথী, সরস্বতী এবং যমুনা এই তিনটি পবিত্র স্রোত (ত্রিধারা) আসিয়া, ত্রিবেণী-ঘাটে নিকট সম্মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলনস্থানটি হিন্দুদিগের অতীত

(৭) *The Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. xxiv part I for 1870, p. 282.*

পবিত্র এবং এই পবিত্র স্থানই ত্রিবেণী নামে প্রখ্যাত। প্রার্থ্যে যমুনা এবং সরস্বতী (৮) আসিয়া অলঙ্কারসম্বার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া, উক্ত স্থল যুক্তবৈশী নামে অভিহিত হয়। থাকে। পুনরায় ত্রিবেণীর সন্নিবেশে এই দুইটি নদীস্রোত ভাগীরথী হইতে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া, মুহুম্মদখাঁ নামে কথিত হইয়া থাকে। ফলে উপরিত্ত উক্ত স্থান—প্রাণাঙ্গ ও ত্রিবেণী—হিন্দুদিগের পক্ষে অতীত পুণ্যক্ষেত্র। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—

"প্রাণাঙ্গ নদীদ্বারা যেরূপতঃ প্রবাহিত।
তদ্বক্ষিণ প্রাণাঙ্গ পদ্যতে যমুনাগতা।
প্রাণা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রাণাঙ্গিব লক্ষ্যতে।" (৯)
অর্থাৎ—প্রাণাঙ্গ নদীর (১০) দক্ষিণ ও সরস্বতী নদীর উত্তর, দক্ষিণ প্রাণাঙ্গ; যথা হইতে পদ্য সম্ভবিত তাগ করিয়া যমুনা নদী গমন করিয়াছেন। সেই স্থানে শ্রান করিলে, প্রাণাঙ্গ দান করার মত পুণ্য হয়।

পুণ্য-কৃত স্থানের অবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা:—

"দক্ষিণ প্রাণাঙ্গ উত্তরবৈশী মগ্ধপ্রাধান্য।
দক্ষিণদেশে ত্রিবেণী ত্রিভায়াঃ।" (১১)

অর্থাৎ—এই দক্ষিণ-প্রাণাঙ্গ উত্তরবৈশী দক্ষিণ-দেশে সগুণ্যমেব নিকটে ত্রিবেণী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্বকাল হইতে ধর্ম্মাসাম—বিশেষতঃ গঙ্গাহান—উপলক্ষে এই স্থানে কয়েকটি ধর্ম্মীয় সম্মিলন

(৮) যমুনা এবং সরস্বতী এই পবিত্র স্রোতদ্বয় জাহ্নবীর পুত্র মণিগণের সঙ্গে প্রাণাঙ্গ প্রদেশে সম্মিলিত বা যুক্ত হইয়াছেন বলিয়া, 'সোমোহ যুক্তবৈশী' নাম হইয়াছে। এই স্থল হইতে এই সম্মিলিত স্রোত জাহ্নবীর শাটে প্রবাহিত হয়। ত্রিবেণীতে যুক্ত অথবা পুনরায় বর্ধিতমূলপূর্বক প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়াই, এখানে যুক্তবৈশী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাণাঙ্গ সরস্বতীস্রোত অঞ্চলে বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল তৎকালে অবশিষ্ট রহিয়াছে।

(৯) যুগপ্তিক ন্যারে যদুদন্য ভাটচাট্য-প্রসিদ্ধ প্রাণাঙ্গিত তত্ত দেশ।

(১০) প্রাচীনকালে "পুণ্ড্রা" "প্রাণাঙ্গ নদর" নামে অভিহিত হইত।

(১১) যুগপ্তিক ন্যারে যদুদন্য ভাটচাট্য-প্রসিদ্ধ প্রাণাঙ্গিত তত্ত দেশ।

এবং মেলা হইয়া আসিতেছে। উক্ত স্থানের অবস্থান, জনাকীর্ণ এবং পবিত্রতা সহজে, প্রায় সার্বত্রিকভাবে লক্ষ্য করিয়া, তাহার রচিত চতুর্ভুজ বাহা শিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিয়ে উক্ত করা গেল।—

‘হাস্য দিক হারিস্থানের দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাজিরের কোলাহলে কিছুই না শুনি।
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে নান।
বাস হেম তিল দেখে দিলে ধৈর্য দান।
রক্তের নিলে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভে বসি শিবপুত্র করে কোন জন।
প্রাক্তন করে কোন জন জলের সমাপে।
সম্ভাষণে কোন জন দেয় বৃষ দীপে।’ (১২)।
ত্রিবেণী একটি প্রধান-তীর্থ এবং বাগিছার স্থান বলিয়া, উক্ত পুস্তকে ‘ভাগীরথীর উত্তরণ’ মধ্যে, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা:—

‘ত্রিবেণী তীর্থের চতুর্ভাগ।

আশ্রয় করিয়া তথি, স্থান করে ধনপতি,
তথা পুরে নানা ধন কিনি।’
‘শিবেশ্বরের সন্নিকটে একটি স্থান আছে, ঐ স্থানের নামে ভাগীরথীর একটি দহকে কালীদহ কহে। ঐ কালীদহে, মনোদোষীর আশ্রয়, চাঁদ সন্ধ্যারের সমুদ্রতীরে হনুমানকর্তৃক জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল। এই দহকে ‘মনোর ভাসান’ নামক পুথি হইতে হুই একটি স্থান আনয়া নিয়ে উক্ত করিলাম;—

‘হনুমান বলদান পরাংপর বীর।
কালীদহে করিয়া প্রবল সমীর।’

(১২) শ্রীমদ্রাক্ষসঙ্গম সন্নিকট মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে ‘ধনপতির সিংহল বাতাস’ বর্ণনা। ২৬ পৃঃ দেখ।

উক্ত পুস্তকে ২০১ পৃষ্ঠে ‘শ্রীমন্তের সিংহল বাতাস’ এই বর্ণনাকৃত ছত্র পুনরুক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপর উক্ত ছত্র তিন মধ্য প্রদেশের কৃত অগ্রদূত আছে, তাহা নিয়ে সন্নিবেশিত হইল। যথা:—

‘হৃৎকলের ভ্রমে তপে কিছুই না শুনি।’

‘বাস হেম তিল দেখে কেহ করে দান।’

‘গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে গুণদ।’

‘প্রাক্তন করে কেহ জলের সমাপে।’

পুণ্য পান গিয়া দেবী তাঁর প্রতি বলে।
চাঁদনেরের মাত ডিঙা ডুবাইবে জলে।’

পুস্তক:—

‘চাঁপিয়া তরণি, হনুমান আপনি,

‘হোয়াং কোলায় নাচে।’

‘করি হুড় মুড়, পথনে করিল হুড়,

হনুমান বাড়িল যে বলে।’

‘মতিগতি মনসা, মারিয়া পদের বা,

মাত ডিঙা ডুবাইল জলে।’ (১৩)।

পুর্বে সাধারণ জ্ঞান স্বীকৃত হইলে (বীর) অর্থাৎ প্রাচীরপারে সংলগ্ন লৌহ-দণ্ডের কণ্ডার উৎপত্তি করিয়াছি। উক্ত স্থানকে মাধব জনগণে যে, ‘দক্ষর পাঞ্জি’ এবং ঐ লৌহ দণ্ডকে ‘পাঞ্জির উত্তরণ’ বলিয়া থাকে, একথাও পুর্বে বলিয়াছি। কিন্তু মধ্যযুগে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। যথা:—

‘দরক ষাঁ নামে কোন মুসলমান, পঙ্গবাসী

হইয়া, এই স্থানে গঙ্গাদেবীর আরাধনা করিয়া ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে স্থানটি ‘দক্ষরপাঞ্জি’ নামে অভিহিত হইয়াছে। কথিত আছে, দরক ষাঁ বিদগ্ধন ধনতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদা সন্ধ্যার পর, স্থানান্তর হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া, প্রত্যাহ্বান করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে অকস্মাৎ অত্যন্ত রক্ত হইতে লাগিল। যদ্বিগ্ধন তাঁহাকে পরিত্যক্ত করিয়া গেলেন। যদ্বিগ্ধন তাঁহাকে ‘দক্ষরপাঞ্জি’ নামক একটি কণ্ডে কোথায় পলায়ন করিয়া, তাহা তিনি কিছুদূর শির করিতে পারিলেন না। সুতরাং সেইরূপিতে আশ্রয়গ্ৰহণ করিয়া, অগত্যা পথি পার্শ্বস্থ শোভামুখিম সন্নিকটে একটি বটুগুহের তলে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধমূলে বসিয়া রহিয়াছেন এমন সময়ে, প্রেত-প্রেরিতের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন। প্রেতিনী কহিল, ‘ভাই! আমার কি বিবাহ হইবে না, চিরদিনই কি অবিবাহিতা থাকিবে?’ অগ্রদূতের ভূত কহিল, ‘দাদি! অমুক গ্রামের দরক ষাঁর ভৃত্যকে, আগামী হুতা, সেই বাড়ীর বুঝিয়া নান্দা দেখে গুল্মপাত হইয়াছে। সে মরিয়া ভূত হইবে। সেই ভূতের সহিত তোমার বিবাহ হবে।’

দরক ষাঁ এই কথা শুনিয়া, স্বতন্ত্রে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু কাহারও নিকট কোন কথা প্রচার করিলেন না।— প্রাতে উঠিয়া, ভূতাকে একটি

(১৩) যেমানদাস ও কেতকানন্দ দাস কর্তৃক রচিত ‘মনোর ভাসান’ ১০ ও ১১ পৃঃ দেখ।

গৃহমধ্যে বন্ধ করিয়া, দ্বারে কুলুপ লাগাইয়া, কার্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে গমন করিলেন। কিন্তু বাইবার সময় তিনি চারিটি ফেলিয়া গেলেন; তাঁহার পতী উহা বুঝিয়া রাগিলেন। এদিকে বুঝিয়া দশা ছিড়িয়া অত্যন্ত উপদ্রব করিতে লাগিল। সে যাহাকে দেখিল, ‘কোঁসা’ ‘কোঁসা’ শব্দে ছুটিয়া, তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাইতে লাগিল। কখন, নন্দরবেগে বাটীর বাহির হইয়া, পঙ্গবীর দিয়া আসিতে লাগিল। দরক ষাঁর পতী পৌঁছিতে দেখিয়া, গোমুটিকে বাঁধবার জন্ত, ভূতকে গৃহের বাহির করিয়া দিলেন। হতভাগ্য ভূত যেমন বুঝিাকে বন্ধন করিতে হইল, অমনি বুঝিয়া ছুটিয়া আসিয়া, শূন্যস্থানে তাহাকে হত্যা করিল এবং তৎপরে শাশুর্ভাই হইয়া নিজস্থানে গিয়া ঝড়াইল।

‘দরক ষাঁ, এই সম্ভার পাওয়া, ভূতপনে বাটী আসিয়া দেখিলেন ভূত কলসের পরিত্যক্ত করিয়াছে। তিনি, কাহারও কোন কথা না বলিয়া, সন্ধ্যার পর পুনরায় আবার ঘরে ঘরে শাশনভূমির সন্নিকটস্থ সেইবটুগুহের তলে গিয়া উপবেশন করিলেন। কিছুকাল পরে, শুনিলেন,—‘প্রেতিনী কহিতেছে, ‘ভাই! ভূনি বলিয়াছিল দরক ষাঁর ভূতা, বুঝিয়া কর্তৃক হত হইয়া, ভূত হইবে এবং তাহার সহিত আমার বিবাহ হবে; কিন্তু কই সে তো ভূত হইয়া না।’ ভূত কহিল, ‘হতারা পুর্বে বুঝিয়া পঙ্গবীর দিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, তাহার শূণ্যে পঙ্গবীরা লাগিয়া ছিল; সুতরাং পঙ্গবী ভূতা উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে।’ দরক ষাঁ এই কথা শুনে, মনে মনে কহিলেন,— ‘আহা! হিন্দুদেবতা গঙ্গার কি অসীম মহাশক্তি!’ এই কথা বলিয়া, তিনি তৎপর দিনই সংসার-পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থানে আশ্রয় গঙ্গার স্তব করিতে লাগিলেন। ‘তিনি যে ভবিষ্যৎ রচনা করেন, তাহার প্রথম এবং অন্তিম শ্রোত্র এই স্থানে উক্ত করা গেল। যথা:—

প্রথমংশ—

‘যং তাত্ কং জনানি পর্ণধ্বংসিনী পৃষ্ঠাং হুত্বা কবৈ-
বধিনী পাদদ্বয়সমিপ্রতিতে তেঃ মধ্যভেদে শ্রীহরিঃ।
‘যতঃ ততঃ উদীশং বপুর্বাং সমনীয়েতে পৌসং
‘তঃ তবঃ কল্পদ্বারায়াম্ভবঃ মাতাঙ্গি ভাগীরথি।’

দ্বিতীয়শঃ—

‘হরুরনি মুনিরূপে তারয়ে পূণ্যবতং

স তত্রিতি নিভৃপুণ্ড্রাশ্রয়ং কিং তে মহেশ্বর।

যদি চ গতিবহীনং তারয়ে পাপিনং মাং
‘তবিত তং মহেশ্বরং তদহং মহেশ্বরং।’ (১৪)।
ইতি দক্ষর্যঃ বিচিত্রং পঙ্গবীকপ্তেজং সমাপ্তং।
এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পঙ্গবীর ইষ্টার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, ঈশ্বরব্রহ্ম উত্তোলন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। (১৫)।

জানকী ষাঁ যে, পঙ্গবীর পুত্রা করিতেন, তাহার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে; আর উপরে উল্লিখিত হইল যে, দরক ষাঁ পঙ্গবাসী হইয়া জাহ্নবীর স্তব করিয়াছিলেন। যাহাকে মাধবন শোকে ‘দক্ষরপাঞ্জির বুদ্ধন’ বলিয়া থাকে, উহাই জানকীর স্মৃতি-বিশেষের বট বলিয়া উহাশে উল্লিখিত হইয়াছে। ফলে, এই সকল ভিত্তিগত বিস্তারিতা থাকা প্রকৃষ্টভাবে বলা হইতে পারে যে, ‘জাহ্নবী’ এবং ‘দক্ষর্যঃ’ একই ব্যক্তি; কেবল কালসংস্কারে মাধবন শোককর্তৃক ‘জাহ্নবী’ শব্দ ‘দক্ষর্যঃ’ বা ‘দরক’ শব্দে পরিণত হইয়াছে। (১৬)।

যে প্রাচীরপারে পুর্নকথিত লৌহদণ্ড (১৭)

(১৪) শ্রীমদ্রাক্ষসঙ্গম বসনো প্রকাশিত—

‘ভাগীরথী স্তবমালা’ ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৫) ৪ বারকানান বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

‘কল্পকল্প হইতে উক্ত, ‘দেবগণের নর্ত্তে আশ্রয়ন’

৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৬) ‘জাহ্নবী’ স্থানে ‘দক্ষর্যঃ’ অথবা ‘জ’ স্থানে

‘দ’ লক্ষ্যে পরিণত করিতে অনেক ‘স্থানে, ‘জাহ্নবী’

ইতর লোকবিশেষে মধ্যে, দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন

অনেক পুণ্ড্রদেশবাসী নিয়ন্ত্রণের লোকে ‘যজ-

লক্ষ্য পুরের’ স্থানে ‘যোজলক্ষ্য’ বলিয়া থাকে।

এতদ্বশে অনেক ‘যোজলক্ষ্য’ ব্যক্তি ‘যোজলক্ষ্য’ শব্দের

স্থানে ‘যোজা’ ব্যবহার করে। ফলে, নিরক্ষর অথবা

পারজ্ঞতাভার উচ্চারণভেদে ব্যক্তি যে, ‘জাহ্নবী’

স্থানে ‘দক্ষর্যঃ’ শব্দ ব্যবহার করিতে, তাহার ‘আদ্য’

কি? দেখিতে পাওয়া যায় যে-এতদ্বশে অনেক

পারজ্ঞতাভারিত্য ব্যক্তি পারজ্ঞতা-মুখকশের

ইচ্ছামত একটি উচ্চারণ গড়িয়া লয়। এই প্রকার

ব্যক্তি ‘জাহ্নবী’ বিবৃত ‘দক্ষর্যঃ’কে ‘যোজলক্ষ্য’

উচ্চারণ করিতে গিয়া, ‘দরক’কে যে, ঝাঁড় করিয়া

নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

(১৭) পাদদ্বয় স্তবঃ ১ ‘পৌড়োর মন্দির’,

ঐরূপ একটি লৌহদণ্ড স্মরণার্থে সংলগ্ন আছে।

উহাও নড়ে-চড়ে খোলে না।

বা জনসাধারণকর্তৃক অভিহিত 'পাঞ্জির হুজু' সংযোজিত আছে, এই প্রচারের সংলগ্ন যে একটি প্রত্নশিল্পিত ছাত্রবহীন বাড়ী রহিয়াছে, কথিত আছে, পদ্মানদী হইয়া 'বাক খাঁ' ও তাঁরভেই অবস্থিতি করিতেন। এ গৃহটির ছাদ বা ধাক-প্রকৃ, জনসাধারণ মধ্যে প্রচলিত প্রচলিত আছে যে, বিবাহের এ বাড়ীর নির্মাণ করিতেছিলেন; কিন্তু নির্মাণ-কর্ম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে, রজনী প্রভাত হওয়ায়, দেখ-ই-জিনিয়ার এই বাড়ী অসম্পূর্ণাবস্থায় বেশিরা প্রস্থান করিয়াছিলেন।

বেহলা নবিশদের নাম অত্বেশে আবার লক্ষ্য বসিতা কাহারই অবস্থিত নাই। ক্ষেমানন্দ দাস ও কেতকনন্দ দাস কর্তৃক বিরচিত 'মনসার ভাসান' নামক গ্রন্থে ইহাদের উপস্থান বিবিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্মুখভাগে বটনাবলীর মধ্যে ত্রিবেণী একটি বিশেষ বটনা-স্থল। বেহলা-সতী, চম্পাশুনীর হইতে নৃত্যশাস্ত্র কল্যাণীভোলা ভাসিলে ভাসিলে আসিয়া, এই ত্রিবেণীতে নেতো রজকীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আশ্রয় অনেকে অব্যত আনেন; তন্মুখি সাধারণের অবগতির জন্য উপরি-উক্ত ভাসান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটি নিয়ে সম্মুখভাগে করিলাম; যথোপযুক্ত, সম্মুখভাগেই হইবে।

চাম্পাশুনীর নামক এক অতি ধন্যতা প্রাপ্তিপ্রাপ্ত রজকীর চম্পাশুনীর বাস করিতেন। মনসাদেবীর প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রিয়ভাব প্রকাশ করিতেন। সেইজন্য বৈরা কোথানে পতিত হইয়া তীব্র হুয়াট পুনর্বার হইয়। আর তিনি নিজেও বাণিজ্যমগন কালে পথিমধ্যে বাতায় পদাঘাত হারাইয়া, বহুবিধ ক্রেশ পাই। তথাপি মনসা-দেবীকে কই-কথা প্রয়োগ করিতে দ্বিষ্ট হন নাই। কিন্তু কাল পরে মনসার গুপ্তে নবিশের নামে চাম্পাশুনীরের এক পুত্রের এবং নিম্ননিম্নগণনিবাসী মায় প্রবিশের পুত্রী অম্বারীর পুত্র বেহলা নাট্যী একসময় লক্ষ হয়। কিছু-কাল অভিজ্ঞ হইলে, বেহলায় সহিত নবিশদের বিবাহ হয়। মনসা-দেবীর জ্যেষ্ঠে বিবাহ-বাসনাই হইবে নবিশদের মনসারের মনসা হইবে, জানিতে পারিয়া, চাম্পাশুনীর মাতাই পুত্রকে উপরিভাগে লৌহময় বাস-গৃহ নির্মাণ করেন। মনসার সম্মুখ বাস করা সম্ভব ব্যাপার নয়। বনিকের পুত্র নবিশের নববধিবাই পুত্রকে সহ বহনীয়তে সেই বসিরতের শব্দ করিলে, মনসা-দেবী তাঁহার মনসা হইয়াছিল। নেতনা সতী মৃতপতির

শবকে ক্রোড়ে লইয়া, কলার মাশাস বা তেলী মনসারের ভাসিতে ভাসিতে অমৃত্যু গ্রাম ও নদীর পার হইয়া ছয় মাসে ত্রিবেণীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে নেতো নামে এক রজকী দেবতাধিপের বস্ত্রাঙ্গি বোধ করিত। বনিক-মাঝী তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া, তাহারই সাহায্যে শ্রুতপূরে, প্রথম পুত্রক মৃত্যু হওয়ার পোতা-নিগ্ৰহ করিত। তাঁহার পতিকে পুনর্জীবিত করেন। চাম্পাশুনীর মনসার পুত্রী করিতেন না; তাঁহারে 'চেসমুভাকানী' বলিয়া গানি দিতেন; এবং হেঁতালের গাঠি লইয়া প্রহার করিত হইতেন। এই জন্ত তাঁহার উপর মনসাদেবীর ক্রোধ ছিল। একসময় সাধারণ আর তাঁহারে বৈ করিতেন না।—পুত্রক মনসার, বেহলায় নিকটে এইজন্য দূর আশ্রয় পাইয়া, দেবী মনসারের পূর্বনক্ট ছয় পুত্রক ও জীবন দান দিয়া, জন্মদগ সমস্ত ধনও বিক্রয়সময়ে উক্তা করিয়া দিলেন। তামিলা বিক্রয়সময়েই সমস্ত ধনসম্পত্তি ও পুনর্জীবিত পতি এবং তাঁহার-দিগকে সমভিভাব্যর লইয়া, দেশে আগমন করিলে, চাম্পাশুনীরের মনসাদেবীর পুত্র প্রচার হইল।

ত্রিবেণীতে উপনীত হইয়া বেহলা তাঁহার ভ্রমণ কেন সমাপ্ত করিলেন, সেই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবাস নিয়ে দেখা হইবে—

পথে নানা বিঘ্ন-বিপত্তি উত্তীর্ণ হইয়া বেহলা ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভোলায় উপর বসিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন—দেখিতে পাইলেন যে, নেতোরজকী বস্ত্রাঙ্গি বোধ করিতেছে। এই সময়ে তাহার পদাঘাতের পুত্র অত্যন্ত বিরক্ত করিতে লাগিল। ক্রমে অসহ্য হওয়ায়, ধোপানী পুত্রকে এক চপেটাঘাতে মৃত করিয়া, এক স্থানে প্রহ্লাদস্থিত করিয়া শয়ান করাইয়া রাখিল। কাপড় কাটা সাধ হইলে, আবার জীবন-দান করিয়া, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহা চম্পায়া যায়। বেহলা ধোপানীর এই অমানুষিক ক্ষমতা মন্দর্শনে, উপকার-নাশনায়ে, উভার গৃহে আশ্রয় লইলেন। তৎপরে বাহা বাহা মাঝেই হইয়া, তাহা পুর্বেই বিবৃত হইয়াছে; পুনরন্তর অনাবশ্যক।

পুর্বে যে মুকুন্দদেবের বাটের কথা বলা হইয়াছে, বাহা ত্রিবেণী হইতে মাঝে অবস্থিত হইয়া থাকে, উহার কিঞ্চিৎ উত্তরে অবধা ত্রিবেণী ও বান্দাপাড়া নামক স্থানের মধ্যে একখানি প্রস্তর আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের বিশ্বাস

নেতাধোপানীর পাট বসিয়া থাকে। মনসার ভাসানে বর্ণিত আছে, যে পাটে নেতো দেবতাধিপের বস্ত্রাঙ্গি বোধ করিত, সে পাট ছিল হুবর্ণের। সে বাহাই হউক, এই উপাখ্যান সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীমুখ রামপতি ভায়ায়র মহাশয় বাহা লিখিয়াছেন, তাহার ছুই একটি অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হইতেছে;—

“এই উপাখ্যানের প্রকৃত মূল কি, তাহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, অব্যাপ্তিও ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে 'নেতাধোপানীর পুষ্ক' নামে একটা প্রাচীন পুষ্করিয়া আছে। * * * * * এই উপাখ্যান সর্বদা সম্ভব ও সম্ভাব্যতার প্রকাশ না হউক, কিন্তু ইহাতে বেহলায় চরিত্র ফেল্প বর্ণিত হইয়াছে, তন্মাত্র পণ্ডিত নির্মিত সত্য হুত্বভোগ বর্ণনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। * কীট, পলিত, কীটাক্ষিত, পুষ্করিয়া মুগ্ধপতি ক্রোড়ে লইয়া, নির্মিতকালিতে ও নির্ভয় মনে বেহলায় মানসে রাজ্য ভাবিতে গেলে, দিগন্তী, দময়ন্তী প্রভৃতি সতীধনের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্রেশভোগ মানসে বলিয়া বোধ হয় এবং বেহলাকে পতিভ্রাতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।” (১৮)

প্রসঙ্গক্রমে নেতাধোপানীর সম্বন্ধ আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করি। অসম্পূর্ণতর লোক-মিথ্যে মধ্যে অনেকের মনে এইজন্য বিশ্বাস যে, উক্ত স্থানেই নেতা-রজকীর বাটা ছিল। কিন্তু এই বিশ্বাসটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এইজন্য বিশ্বাস হইবার একটি কারণ আছে। নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্র পাঠ করিলেই সেই কারণের উপপত্তি করা যায়;—

“এখানে (তমসুক) রজকীর বহুকাল হইতে একখানি প্রস্তর-মলককে নেতার প্রতিমূর্তি মনে করিয়া পূজা করিয়া থাকে। নেতার প্রস্তর নেতার প্রতি ভক্তি চহু মাত্র। এবং সেই কারণ হইতে সাধারণের এই সংস্কার হইয়া থাকিলেক যে, এই স্থানেই নেতার বাস ছিল।” (১৯)

(১৮) পণ্ডিত শ্রীমুখ রামপতি ভায়ায়র প্রণীত “বান্দাপাড়া ও বাসনা-সাহিত্য” ১৬ ও ১৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৯) শ্রীমুখ উমচরণ অধিকারী প্রণীত “ভদ্রাপুত্রের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ” ২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

হিন্দুশাস্ত্রাদির শিক্ষা ও আলোচনা জন্ত বিশ্বাস্ত হানুজ-স্বপ্নের মধ্যে যে স্থানওলি সমাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে—ত্রিবেণী তন্মধ্যে অন্যতম। অপর তিনটি নবদ্বীপ; ভট্টপাণি এবং এণ্ডাপাড়া। পুর্বে ত্রিবেণীতে ত্রিংশাদিক চতুর্ভাগী (টোল) ছিল। সর্গভূইলিয়ন ক্রোড়ের সংস্কৃতশিক্ষক (২০) হুপ্রদ্বীপ পণ্ডিত ও জগদ্বাচ তর্কপঞ্চাননের এই স্থানে বাস ছিল। তাঁহার জন্ত অব্যাপ্তিও ত্রিবেণীর পৌরব রহিয়াছে। এখানে তাঁহার সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পণ্ডিত ও জগদ্বাচ তর্কপঞ্চানন ক্রমদেব তর্ক-বাগীশের পুত্র। শেখাবহায়া ক্রমদেব হিত্তীরবার সাংসার করিয়া, এই পুত্রদেবের যুবাধোপনিষদ করেন। যুবাধোপনিষদ পুত্র বলিয়া জগদ্বাচ-পিতার অত্যন্ত আদরে ছিলেন। জগদ্বাচ বাল্যকালে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন—প্রবিশেষে ও প্রভিভেদশিল্পিগণকে বড়ই জ্ঞানাতন করিতেন। পড়া শুনার চাতুশ মনোবোধ্য ছিলেন না। কিন্তু ইহার মরবশক্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, একবার বাহা পাঠ করিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। ইনি বাল্যকালে পুত্রের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া, হাচিরাং একজন সিংহদ্বীপ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার মরবশক্তি বিরূপ প্রবল ছিল, এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত সম্মুখভাগে করিলেই, পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। *

(২০) কৃষ্ণদামোদরবাসী-একজন বহুর নিকট আমরা ভদ্রাধিকারী যে, যে সময়ে সর্গভূইলিয়ন জোপন নদীয়া জেলার জজ হইয়া কৃষ্ণদামোদর বান, সেই সময়ে নবদ্বীপ-নিবাসী জনৈক কবিরাও কোন কারণবশতঃ তাঁহা বন্দ্যায় পরিত্যক্ত করেন। তৎকাল অব্যাপকরণ নিয়মক্রমে তাঁহার আহার্য্য প্রেরণ করিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাদের জগদ্বাচ; তাঁহার আহার জুটিত না; একজন তিনি সাধারণ ক্রমে জীবিকানির্মাণ করিতেন। সংস্কৃতভাষা শিক্ষা মানে সর্গভূইলিয়ন জোপন নবদ্বীপে নামনিধি চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু ক্রম দিবস মনস্কম্পন হইতে পারেন নাই। প্রাণতুঃ কবিরাওই ত্রাণতুঃ গণের অসুখকাল, সর্গভূইলিয়নকে সান্ত্বিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার হৃদয়েরও অসদান হয়।

একদা বর্ধমানাধিপতি রাজা ত্রিবেণীচন্দ্র বাহাদুরের (ভিলকচাঁদ) কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, বর্ধমানে উপস্থিত হইলে, রাজা জগদ্ব্যভূতকে কজ্জাস করিলেন—“ভট্টাচার্য্য! আপনাকে কাজে পনিমত্তা কি কি প্রেমিয়া আশ্রয়িত হ’? তদন্তের জগদ্ব্যভূত, ত্রিবেণী হইতে বর্ধমান পর্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বের বৃক্ষ, লতা, জলপান, শ্রব, দ্বার, দেওয়াল প্রভৃতি এরূপ পর্য্যায়ক্রমে বলিয়া দিলেন যে, রাজা এই সকল লিখিয়া লইয়া, লোক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া, অত্যন্ত বিশ্বাস্যচিত হইলেন এবং তদীয় মোক্ষান্তির চূড়নী প্রশংসা করিয়া, পাউনাম পরশবার, অন্তর্গত বেহুড়া-পোতা নামক একখানি গ্রাম ও যথেষ্ট স্নেহান্তর জমী এবং তিন শত বিঘা জম্মাল একটুকু পুত্রবধি জগদ্ব্যভূতকে দান করিলেন।

এখানে ইহার স্বর্ণ-শক্তি পরিচয় আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা বাইতে পারে। একদা ইনি পল্লার বাটে বসিয়া আত্মিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন ইংরেজ ও একজন বঙ্গদেশী নৌকা আসিয়া নালিল। কথান্তর-মতে উভয়ের উভয়ের মধ্যে প্রথমে বাবুবিভক্তা চলিতে লাগিল; পরিশেষে মারামারি হইল। সেই ব্যাপার একদূর দাঁড়ায় যে, উভয়েই শ্রমপ্রকারে অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং জগদ্ব্যভূতকে দাঙ্গা দান। রাজাধিপতি বিচার্য্যের উপস্থিত হইয়া করিলেন—“আমি উভয়ের কথার স্বার্থ জ্ঞানি না; তবে বিবাদের সম্মত যিনি যাচা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি শ্রুতিকল বলিতে পারি।” এই বলিয়া, তিনি উভয়ের বাক্যাবলি আকোষাভ্যন্তরিত করিলেন। ইনি তারতের শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়, হিন্দু-বিধি-ব্যবস্থা গ্রহ প্রশংসা করিয়া, পর্ব্বমেন্ট হইতে মাসিক পঞ্চমত প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার জীবদ্দশায় কলিকাতা ও বঙ্গালী হইতে লড়া বড় মায়েদেরা জগদ্ব্যভূতের নিকট ত্রিবেণীতে পুরানন্দ লইতে আসিতেন। জগদ্ব্যভূত জগদ্ব্যভূত জগদ্ব্যভূত বঙ্গের জীবিত থাকিয়া ইহলোক পুত্রিত্য করেন।

এর দুই একটি কথা বলিয়াই আমরা এ প্রবন্ধের শেষ করি। এক সময় ত্রিবেণীর জল-বায়ু বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। তৎকালে ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের ভূময়িকারী এবং দন্যতা ব্যক্তিগণ বায়ু পরিষ্করণে অভিযোজিত এই স্থানে থিয়া বাস করিতেন এবং পানীয় জলও এখান হইতে লইয়া আসিতেন। কিন্তু হায়! সেই ত্রিবেণী

এখন সমাজমাক জলের জাগায় ফালায় সন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থ, উত্তরায়ণ ও বারুণী প্রভৃতি কয়েকটি পর্ব্ব উপলক্ষে প্রতিবৎসর পদ্মাসনের জন্ম নানা দিকদেখ হইতে স্বয়ংস্বয় বারুণী এখনও ত্রিবেণীতে আগমন করিয়া সম্মিলিত হন; এবং তদুপলক্ষে মেঘও বসিয়া থাকে। জিবেণীর হাট বাজার এখনও বিশাল শোভা-সমৃদ্ধি সম্পন্ন; গ্রামের কিঞ্চিৎ বড়ই চুবুয়া হইয়াছে।

শ্রীঅধোবনানাথ দত্ত

সহবাস-সম্মতির আইন।

আইন ত হইয়া পো। এখন একবার স্থির চিত্তে আইনের ফলাফল ভাবিয়া দেখা উচিত। এখন আমাদের কর্তব্য কি, তাহাও নিরূপণ করা উচিত।

এই আইনের বিষয়, ফল হাতে হাতে প্রত্যক্ষ হইবার নহে। আইন পাসের সঙ্গে সঙ্গেই দেশ-বার্ণিয়া নোরায়া আরম্ভ হয় নাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, এই আইনসমূহে কালক্রমে দেশের স্বর্জনশন হইবে না। বীজ বোপিত হইয়া মাত্রই কখন ফল ফলে না। বীজ হইতে অল্পের হয়, তাহা হইতে প্রচুরাশা হয়, তাহার পর যাইবলি কাণ্ড শাখা-পত্র-পুষ্প-ফল-সমৃদ্ধ তাকে সেই বীজ দর্শন হয়। এই আইনের ফলও কাল সাপেক্ষ।

দাম্য বঙ্গের রাজ্যের পুর্বে অসম্ভবতা ত্রি-লোকেরই প্রকাশন হইয়া থাকে। সুতরাং যে ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া আইনের কার্য হইবে, তাহা যখন কালক্রমে, তখন আইনের সাক্ষ্য অনিচ্ছ-ফল নিভা প্রত্যক্ষ হইবার নহে। তাহার উপর এরূপ ঘটনা হইলেও রাজ্যের তাহা অপ্রকাশ থাকিবার বিলম্ব সম্ভাবনা আছে। আবার ইদ্রিতে যতদূর পর্ব্বমেন্টের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, এই আইনের প্রয়োগ অতি অমর হইবে। কিন্তু ভাই বলিয়া আশায় আমাদের উৎসাহ হইলে চলিলে না। সাক্ষ্য বিপদপাত হইল না বলিয়া নরেন্দ্র এই আইন মঞ্চ করিলে আমাদের উৎসাহ নাই। সর্ব্বসাধারণের সাক্ষ্য অমঙ্গল হইবে না, কদাচ কোন ব্যক্তির অনিষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া কাত

থাকিলে চলিলে না। এই আইন বাস্তবিকই বিষয়ের বীজ। অল্পেরই ইহার বিনাশ-সাধকের নিমিত্ত যত এবং অব্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে হইবে।

এই আইনে আমাদের এত আশঙ্কা কেন হইয়াছে, তাহা অনেকবারই বিচার্য্য। ভাবী অমঙ্গলের বহুতর চিত্র পুর্বেই আমাদের দ্বারা সঙ্কিত হইয়াছে। তাহাণি আর একবার এই আইনের অধিকারিত্য বৃদ্ধি করিয়া দিব।

বকাল হইতে হিন্দুধর্মের রক্ষক নাই। যিনি ধর্মের রক্ষক, হিন্দু মতে তিনিই প্রকৃত বীজ। সে অর্থে বহুকাল হইতেই হিন্দুর রাজা নাই। ইংরেজ আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছেন বটে, আমাদের ধন-প্রাণ স্বতন্ত্র তার এবং বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মের রক্ষা তিনি গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং ইংরেজ আমাদের অধিপতি হইলেও রাজা নহেন। এ বড় কথা। কিন্তু কি করিব, এ কথাই যে মতা।

ইংরেজ অধিপতি হইয়াও আমাদের ধর্মরক্ষার তার গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের ধর্মের কীরা ধর্ম-আচার-অনুষ্ঠানে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই আশা বতীর আদর্শমুখে দিয়া আনিতেছেন। সেই আশায়ে বিশ্বাস করিয়া, ভাবাবলেক মন্থ করিয়া আমরা সকলে যথাসাধ্য ধর্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এখানে এই আইন হইবার উপলক্ষে পর্ব্বমেন্ট আমাদের সেই আশার বিনাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্কটই এখানে আমরা এত বিচার্য্য দেখিতেছি।

আইন-মন্ডায় এই আইন পাস হইবার দিলে বড়লটি বাহাদুর যে সকল কথা বিচার্য্যছেন, তাহা বোধ করি, অনেকেরই জ্ঞানে। যদি জানা না থাকে ত জ্ঞানিয়া রাখা উচিত। সে কথা হিন্দু মুসলমান সকলেরই মর্ম্মস্থলে গাঁথিয়া রাখা উচিত। রূঢ়লটিবাহাদুর অসম্মতলেন, মুরুতল, স্পষ্টাঙ্গলের ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ‘মরাগিটার’ সঙ্গে দেখেই ‘রিগিলনের’ বিরোধ হইবে, সেখানে পর্ব্বমেন্টে রিগিলন মানিলেন না, মরাগিটার চাহিয়াছিল। অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রের কাছে ধর্মশাস্ত্র আত্মপাত হইবে না। আমাদের ধর্মসম্মত না থাকিলেও কোন কথ্য নহে, আচরণ, কোন অনুষ্ঠান, যদি ইংরেজের রুক্তিতে ইংরেজ-স্বনীতির বিরুদ্ধ বলিয়া অব্যবাহিত হয়, তাহা হইলে ইংরেজ

পর্ব্বমেন্ট আমাদের সেই কথ্য, সেই আচার, সেই অনুষ্ঠান, সেই পুর্নক লোপ করিয়া দিলেন। বারুণী বঙ্গ এবং অব্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে হইবে।

এই আইনে আমাদের এত আশঙ্কা কেন হইয়াছে, তাহা অনেকবারই বিচার্য্য। ভাবী অমঙ্গলের বহুতর চিত্র পুর্বেই আমাদের দ্বারা সঙ্কিত হইয়াছে। তাহাণি আর একবার এই আইনের অধিকারিত্য বৃদ্ধি করিয়া দিব।

বকাল হইতে হিন্দুধর্মের রক্ষক নাই। যিনি ধর্মের রক্ষক, হিন্দু মতে তিনিই প্রকৃত বীজ। সে অর্থে বহুকাল হইতেই হিন্দুর রাজা নাই। ইংরেজ আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছেন বটে, আমাদের ধন-প্রাণ স্বতন্ত্র তার এবং বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মের রক্ষা তিনি গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং ইংরেজ আমাদের অধিপতি হইলেও রাজা নহেন। এ বড় কথা। কিন্তু কি করিব, এ কথাই যে মতা।

ইংরেজ অধিপতি হইয়াও আমাদের ধর্মরক্ষার তার গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের ধর্মের কীরা ধর্ম-আচার-অনুষ্ঠানে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই আশা বতীর আদর্শমুখে দিয়া আনিতেছেন। সেই আশায়ে বিশ্বাস করিয়া, ভাবাবলেক মন্থ করিয়া আমরা সকলে যথাসাধ্য ধর্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এখানে এই আইন হইবার উপলক্ষে পর্ব্বমেন্ট আমাদের সেই আশার বিনাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্কটই এখানে আমরা এত বিচার্য্য দেখিতেছি।

আইন-মন্ডায় এই আইন পাস হইবার দিলে বড়লটি বাহাদুর যে সকল কথা বিচার্য্যছেন, তাহা বোধ করি, অনেকেরই জ্ঞানে। যদি জানা না থাকে ত জ্ঞানিয়া রাখা উচিত। সে কথা হিন্দু মুসলমান সকলেরই মর্ম্মস্থলে গাঁথিয়া রাখা উচিত। রূঢ়লটিবাহাদুর অসম্মতলেন, মুরুতল, স্পষ্টাঙ্গলের ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ‘মরাগিটার’ সঙ্গে দেখেই ‘রিগিলনের’ বিরোধ হইবে, সেখানে পর্ব্বমেন্টে রিগিলন মানিলেন না, মরাগিটার চাহিয়াছিল। অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রের কাছে ধর্মশাস্ত্র আত্মপাত হইবে না। আমাদের ধর্মসম্মত না থাকিলেও কোন কথ্য নহে, আচরণ, কোন অনুষ্ঠান, যদি ইংরেজের রুক্তিতে ইংরেজ-স্বনীতির বিরুদ্ধ বলিয়া অব্যবাহিত হয়, তাহা হইলে ইংরেজ

পর্ব্বমেন্ট আমাদের সেই কথ্য, সেই আচার, সেই অনুষ্ঠান, সেই পুর্নক লোপ করিয়া দিলেন। বারুণী বঙ্গ এবং অব্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে হইবে।

এই আইনে আমাদের এত আশঙ্কা কেন হইয়াছে, তাহা অনেকবারই বিচার্য্য। ভাবী অমঙ্গলের বহুতর চিত্র পুর্বেই আমাদের দ্বারা সঙ্কিত হইয়াছে। তাহাণি আর একবার এই আইনের অধিকারিত্য বৃদ্ধি করিয়া দিব।

বকাল হইতে হিন্দুধর্মের রক্ষক নাই। যিনি ধর্মের রক্ষক, হিন্দু মতে তিনিই প্রকৃত বীজ। সে অর্থে বহুকাল হইতেই হিন্দুর রাজা নাই। ইংরেজ আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছেন বটে, আমাদের ধন-প্রাণ স্বতন্ত্র তার এবং বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মের রক্ষা তিনি গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং ইংরেজ আমাদের অধিপতি হইলেও রাজা নহেন। এ বড় কথা। কিন্তু কি করিব, এ কথাই যে মতা।

ভাঙ্গি নাই। আমার প্রতিজ্ঞার প্রকৃত অর্থ তোমরা বুঝিতে পার নাই। বাহার কথার উত্তর দিবার অধিকার নাই। সে যদি বিক্রম করে, তাহা হইলে প্রাণে বড় লাগে। রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ইংরেজ আমানিকে বিক্রম করিলেন, কপালে করাণ্ডা ভিৎ আর আমার কি করি? এ বিপদে মরুস্থান যদি রক্ষা করেন, তবেই আমাদের রক্ষা, নহিলে বিধুর এই শেষ।

কিন্তু আমরা এখনও হতাশ হই নাই, কেন না মরুস্থান আছে। তিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিবার জন্য, আমাদের ভলিট পরিচয় লইবার জন্য, এই বিভীষিকা দেখাইয়াছেন মাত্র। নারায়ণ! জগৎকো! অন্তর্ধান! তোমার কাছে কি পরীক্ষা নাই?

একটা নৌকি উৎসার আছে, তাহা আমাদের অবশ্যই ব্যবহার্য। ধর্মশাস্ত্রের না বলিয়া, ধর্ম হস্তক্ষেপ করিব না বলিয়া ইংরেজ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পরম ভারতেশ্বরী বিক্রোয়ার প্রমুখ ব্যক্ত হইয়াছিল। এবার তাঁহার প্রতি-নিধি স্বকোপলব্ধি ব্যাখ্যার ছলে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। আমরা ইহাতে পরিতুষ্ট হইব না। যে মুখে প্রতিজ্ঞা বাহির হইয়াছে, সেইমুখেই প্রতিজ্ঞাহরণের বাজী না জনিলে, আমরা চেষ্টায় ক্ষান্ত হইব না। ভারতেশ্বরী বিক্রোয়ার ধর্ম বলুন, আমি ঐ রূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। কিহা ঐ প্রতিজ্ঞার ঐ রূপ অর্থ নয়। তিনি বলুন, নিজ মুখে বলুন;—তাহার পর আমরা মরুস্থানকে অরন করিয়া অন্তিম চিন্তা করিতে আরম্ভ করিব। অতঃপর হিন্দুস্তান। একবার হতাশ হওয়া বিমুখ হইত। ইংরেজের সম্মুখে ইংলণ্ড-ভূমে তোমার হুমকিসহীত একবার প্রচার কর। কোটি কোটি যাক্ষস-সংকুলে যাবেন পক্ষ প্রদর্শীর বিলাতে পঠাইয়া দাও। একবার সকল কথা এলাভের রাজ-সম্মত পোচার কর। ঠাঁজপ্রতিনিধি কি সর্বনাশের প্রকৃষ্টাভ্যন্ত করিয়াছেন, এতাহা বুঝিয়া দিলেও যদি বিলাতে ইহার প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে তখন না হয় একান্তে দুর্গা নামাই করিব।

কিন্তু আর একটি কাজ করিতে হইবে। বিলাতে ভিক্ষা করিবার সময়েও এইমুখ সাহসের পরিচয় দিতে হইবে। নিরীহ ভিক্ষুর উপর ইংরেজ জাতি বড় বিরক্ত। মুষ্টি ভিক্ষুককে মৃত্যুদণ্ড ইংরেজের

প্রতিশোধ। অতঃপর ভিক্ষা করিতে যাও, কিন্তু মরুস্থান দেখাইতে ভুলিওনা। মহারাজী ভিক্টোরিয়া নামে ভারতেশ্বরী হইলেও কাজে ভারতেশ্বরী নহেন। ইংলণ্ডের সমুদয় অধিবাসী, বিশেষত ইংলণ্ডের বণিকসম্প্রদায়ই ভারতের প্রকৃত অধিবাসী। বাহ্যতে ইংলণ্ডের বণিক আমাদের অস্বকুল হন, তাহারি চেষ্টা করিতে হইবে। বিলাতের বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিতে পারিলেই বিলাতি বণিক স্বার্থের বশে আমাদের প্রতি সদয় হইবেন। যদি হিন্দুস্তান কেহ থাক, যদি পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে লাজিত না হও, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিলাত বিলাস পরিচাণ কর। আর-কর শাস্ত্রের উপদেশ-গ্রন্থ এবং স্বধর্মের অমুঠান অভ্যাস। ধর্মের প্রতি তোমার মমতা যদি নিমিল না হইত, তাহা হইলে আজিকার এ বাতাসে দৃঢ় তোমাকে কখনই দেখিতে হইত না। করি-য়াছ কঠিন শাপ, কর এইবার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত। গোত সংবরণ কর, বিলাসে কিনিতে হইও না, একবার পূর্বপুরুষোচিত শাস্তসংযমের পরিচয় দাও

পাগলের গান।

আড়াণি বাহার—রাঁপতাল।

(হর।) সাংহার মুরতি ধরি কর ছারখার।
যাক চলে রসাতলে ভারত অসার।
তাড়নে চরণভঙ্গ দাও প্রভু মহেশ্বর।
অনন্ত সরাং বেধা না করি বিচার।
ভুলভয় প্রহরণ শ্লিষ্ট তারা গ্রন্থন
ভারত ভরিয়া যোগ বোর অন্ধকার।
জটাজুট হতে গঙ্গা, উচ্ছল-তরঙ্গভঙ্গ,
ভাঙ্গায়ে ভারত ভূমি করুক পাথার।
তব ভূমি কবিগণের, কালকূট বহিগণ,
জীব সব যোগ শব, করি হাছাকা।
করি দ্বোর দুঃশব্দ, ভব। ভবে কর শুভ,
দুঃশব্দ লুপ্তি হোক দেহ সবাকার।
মরনের তরুণী, মরন-কুশাঙ্গ রাণি
ছুটাই প্রবল বেগে পুজুক সাংসার।
নিশিত-ত্রিশূল অঙ্গি উজ্জলিত মনাদিধি
হাসিয়ে ভারত যক্ষের কর উপকার।

সমাজ-সম্মিলন।

মিল মিল আজি, ভায়ে ভায়ে সবে,
ভিন্ন ভাব আর নহে তো শোভা।
প্রেম-হেমহার, গলে এ উহার,
পরায়ণে দোষাও হুখের রতন।
দাঁড়াও দেখিবে, সারি সারি সারি,
কি হৃদয় হেরে দেখিতে তখন।
অবতার দেখি, করকের ক্ষেত্রে,
লাখ কর কিরা হবে সঞ্চালন।
লাখ কর মেলি কি করিতে নারে?
পারে উপাড়িতে অরণ্য গহন।
পারবে তুড়িতে, ভীম শৈলগণও,
ভীম শ্রোতাবোণ করিতে রেধন।
লাখ লাখ কর্ণে, হৃদ্যবহ দেখি,
আপনি ভেমিয়া উঠিবে গগন।
আপনি চমকি, দেব সৈন্য আদি,
জয় পথ ছাড়ি দাঁড়াবে এখন।
শতে শতে শতে, মেলি কর কাজ,
যা করিব তাই উৎসব গগন।
হারি সে উৎসব, জিনি সে উৎসব,
না মিলে রক্তস্রব উৎসব-গহন।
কেন রে সাগরে, হেরি চমকিয়া,
দাঁড়াই ধমকি স্তম্ভ নদয়।
বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব, বারি মিলে মিলে,
ধরছে তো সেই তরু হৃদীশ।
লাখ লাখ মেঘে, মিলে মিলে দেখ,
কেমন আচ্ছাদে অনন্ত গগন।
কোথায় সুকোণে, সমস্ত-কিরণে,
ভুবায় আঁধারে অনন্ত ভুবন।
নিরমিলে কেন, নিবিড় অরণ্য,
মিথ্যানে তরু, কাঁপে প্রাণমন।
ভুরি ভুরি ভুরি, মিলে মিলে তরু,
আচ্ছাদে একত্রে এই না করণ।
চখে নাহি ধার, তরু বাত-কণা,
সেই বাতকণা মিলে কি ভীষণ,
হৃদয়ে মধুভ্রম, সে মধু সাজিতে,
শত শক্তিবর হারায় হারায়।
তাই বলি ভাই, ভাই ভাই সবে,
মিল দেখি আজি করিয়ে হৃদয়,

চরাচরে সবে, থাকে মিলে মিলে,
আমাদেরই কেন না হবে মিলন? ১০
একই দেশে বাস, জঙ্গ একদেশে,
সেই একই দেশে উদ্ভাস-পতন।
সকল, সপোতা, সমান-উদক,
কত বংশ ব্যাপি কত সে জনম। ১১
সে দেশেরই জলে, মিটাই পিপাসা,
সে দেশেরই শত্রে শরীর-পোষণ,
সে শরীরে একই, পবন সম্বরে
অন্তরে প্রভেদ কেন রে এমন। ১২
ছিছি ছাড় ছাড় ভিন্নভাষা এসে,
মিল দেশবাদি, বুলি প্রাণমন।
মিল যে বনেশী, দেখাও জগতে,
দেশের পৌর, জাতীয় জীবন। ১৩
চিরক জগতে, চিরক জগতে,
নিখুয়ে তরঙ্গে মেগিয়া নদয়।
গাউক উচ্ছ্বাসে, কবি শত শত
জাতীয় পৌর-নীতি অগণন। ১৪
ত্রিশাশরাপ্রদান স্মৃতিভীষণ বিদ্যাবিধান।

লৌহ।

(৩)।

রাণীগঞ্জে নিকট বীণভূম। এখানেও অনেক
লৌহের আক। অতি প্রাচীনকাল হইতে তাহা
হইতে লৌহ নিষ্কৃত হইত। এত লৌহ বাহির
হইত যে, বীরভূম জিলার পশ্চিমপ্রদেশে লৌহ-
মহল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। লৌহকে মনে করে;
ধাতুকে আঁকর রহিয়াছে, তবে আর ভাবনা কি?
যাই, নিয়া বাহির করি, অনেক, টাকা পাইব।
১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইন্দুনারায়ণ শর্মা নামে একটা
লোক তাই মনে করিয়াছিলেন। তখন এদেশে
ইংরেজের রাজত্ব সবে হইয়াছে। ইন্দুনারায়ণ
জ্ঞান আর ইংরেজি জানিতেন, সাহেবদিগের নিকট
ইহার বিলম্ব প্রতীপত্তি ছিল। বিলাতে কি
প্রাচীনতে লৌহ প্রস্তুত হয়, তাহার ছই চারি কথা
জানিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমিও বীর-
ভূমের পাথর হইতে সেই প্রাচীনতে লৌহ
বাহির করিব; তাহা হইলে আমার বিলম্ব পাত
হইবে। তিনি গণপেশেক্টে বসিলেন—আপনারা

আমাকে বীরভূম জিলায় লোহা বাহির করবার অনুমতি প্রদান করুন, চারি বৎসর পরে আমি আপনাদিগকে পাঁচ মাল্লুস টাকা করিয়া বাৎসরিক কর দিই। কিন্তু আমাদের বা-দশা, ভুলুগু পাই-ইয়ে চকু বুজিয়া বাঁপ দিই। ইন্দুরদারের তাই-ই করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহা বিলাতে এইরূপে লোহা করে? তো আমিও করি! কত ধনট পড়িলে তাহা হিসাব করিয়া দেখেন না। পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব প্রদান করা সম্ভব কথা, কি অসম্ভব কথা, সে চিন্তা তাঁহার মনে একবারও উদয় হয় নাই। ক্রমে তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন আর লোহাপাড়া করিয়া লইলেন না। তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, নাই ও হার-হুহার সাহেবের বীরভূমে লোহ-আকাশের চন্দ্র-কুরিরে ছায় উদ্ভূত হইলেন। ইহার পূর্ণবেশকে বলিলেন,—আমরা আপনাদিগকে অল্প মূল্যে গোলা-গুলি প্রস্তুত করিয়া দিব। আপনারা আমাদিগকে বীরভূম প্রভৃতি স্থানে লোহা বাহির করিবার অধিকার প্রদান করুন। আর, যেন আমরা সেই লোহ বিনাক্ষেত বাজারে বেচিতে পারি। পূর্ণবেশট প্রস্তুত হইলেন, ভাল করিয়া উটি নির্মাণ করিবার জন্য ১৫,০০০ টাকাও রিলেন। কিন্তু যেনে ইহার উটি নির্মাণ করিতে আশ্রয় করিলেন, অমনি চারিদিকে মহাপোলোড় উপস্থিত হইল। এ অঞ্চলের জমিদারগণ ও জমিদারীরা ভাবিলেন—এ আবার কি? চিরকাল—হইতে এ মকল স্থান অঞ্চলের জমিদার ও জমিদারী। বা-দশা, নাক-কড়া, ইহার। আমিরা এখানে বড় বড় উটি নির্মাণ করে কেন? বার বৎসর ধরিয়া সাহেব-দলে ও জমিদার-দলে, বা-দ-বিদ্যার অনুগোষক অভিযোগ চলিতে লাগিল। সাহেবরা লোহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিম্বা বলিতে পারি না। যদিও করিয়া থাকেন, অথচ হইলে এ যোগদত্ত বিবাদের উল্লস করিলে লাভ হইতে পারে, তাহা বুজিয়া উঠুন। কল কথা এই, ১৭৮১ সালে, হার-হুহার সাহেবকে উটি সোলিয়া পলাইতে হইয়াছিল। দয়া করিয়া পূর্ণবেশট তাঁহাকে পলাইতে বাহকের কারুবাদান কর দিয়াছিলেন। বীরভূমে লোহ-কার্য পুনরায় পূর্ণবিষয় পরিণত হইল। যেমন প্রাচীনকাল হইতে এখানে লোহা বাহির হইয়া ‘আমিডেজিল’ এখন আবার সেইধর হইতে লাগিল। এই লোহ কলিকাতা পর্যন্তও

আসিত। কলিকাতার বাজারে সে লোহ প্রভি-মণ, পাঁচ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইত। তখন বাহরগের লোকগণ হইতেও কলিকাতায় লোহ আসিত। বীরভূমে লোহ অপেক্ষা সে লোহ ভাল। তাহার মূল্য ৬০ টাকা ছিল। বিলাত হইতেও তখন অল্প পরিমাণে লোহ এদেশে আমদানি হইত। বিলাতি লোহের মূল্য আরও অধিক, প্রতি মণ দশ টাকা করিয়া বিক্রীত হইত। বীরভূমে অপরদ্বারা লোহ বাহির করিত না। মুণ্ডা বনিয়া যে বজ্রজাতি আছে, তাহারা এই কাজ করিত। তাহারা চিরদিন এক স্থানে বাস করিত না। কিছুদিন এক স্থানে থাকিয়া তাঁহার পর আবার অন্য স্থানে গিয়া উটি নির্মাণ করিত। তাহার কারণ এই যে, কল্যাণ না হইলে লোহা বাহির করা যায় না। গাছ কাটায়া কল্যাণ করিতে করিতে যাই এক স্থানের বন শেষ হইয়া আসিত, তখন নাক্ষেই তাহাদিগকে অল্প স্থানে বাহিতে হইত। লোহা-মহলের অনেক স্থানে মূল্যবান লোহাকারেরাও এই কাজ করিত। তাহারা কাঁচ অর্থাৎ অপরি-স্কৃত লোহ করিয়া হিন্দু-কৃষ্ণকরদিগকে দিত। হিন্দুকৃষ্ণকরেরা তাহা পাক অর্থাৎ পূর্ণবস্তু করিয়া ব্যবসাদারদিগকে বিক্রয় করিত। বীরভূমের উমিডিলি এত বড় করিয়া লোকে পড়িত, ও এক এক উটিতেই বড় অধিক পরিমাণে লোহা প্রস্তুত হইত যে, ভারতবর্ষের আর কোথাও এরূপ ছিল না। ১৮২২ সালে ডাক্তার ওডহাম সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তখন প্রতিবৎসর এই সকল উটি হইতে ৫০,০০০ মণ লোহ নিষ্কৃত হইত। বলীয়া, নরায়ণপুণ্ড, সেওতা, হুমরা ও গণপুণ্ড নামক স্থানেই অল্পেক দেশীয় উটি ছিল। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত বীরভূমে এই ভাবে লোহার কাজ চলিয়াছিল। কিন্তু বন কাটরা কল্যাণ করিতে করিতে কল্যাণ ক্রমেই কমিয়া আসিল, সুতরাং লোহা প্রস্তুত করিবার যোগও ক্রমে অধিক হইয়াছিল। কিন্তু সেই পরিমাণে বাহর মূল্য অধিক হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, বিলাতে লোকে এখন অল্প আয়াসে অল্পভাবে লোহ বাহির করিতে শিখিয়াছিলেন। তাহারা সেই লোহ দেখিলে আম-দানি করিতেছিলেন; কলিকাতায় তাহার ছই টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হইতছিল। বীরভূমে লোহ কলিকাতার ছই টাকা মণ বিক্রয় হইতে পারে না। তাই, এখানকার লোহ-কার্যেরও ক্রমে হ্রাসদতি

হইতেছিল। ১৮৫৫ সালে ম্যাকি বলিয়া একজন সাহেব মধ্যম-বা-জারে লোহার কারখানা স্থাপন। তিনি ভাবিলেন, কাঠের কল্যাণ মধ্যম হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমি কতকপরিমাণে পাথুরে কল্যাণ ব্যবহার করিব, তাহা হইলে আমার ‘বরত কম পড়িলে, বিলাতি আমদানির দাম আমিও অল্প মূল্যে আমার লোহা বেচিতে পারিব। এমন কি, তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার লোহা কলিকাতায় ১৬০ করিয়া মণ বেচিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। যে পাথুরে কল্যাণ তিনি ব্যবহার করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা একজের উপযুক্ত নয়। পাথুরে কল্যাণ হইলেই হয় না। পাথুরে কল্যাণ কার্শনের ভাপ অধিক থাকে সত্য, কারণ পাথুরে কল্যাণ আর কিছুই নয়, অতি প্রাচীন কালের বনের কাঠ। লক্ষ লক্ষ বৎসর মুন্সিকা মনে প্রোথিত থাকায়, এরূপ কক্ষপূর্ণ প্রস্তরের আকার ধারণ করিয়াছে। পাছের কাঠ যে কক্ষটি মূল পদার্থ দ্বারা নির্মিত, তাহার মধ্যে কার্শন, হাইড্রোজেন, ও অক্সিজেনের ভাগই অধিক। অর্থাৎ অল্প পরিমাণে এটিতে ধাতব পদার্থ ছাড়া থাকে বহু পরিমাণে এটিতে ধাতব পদার্থ ছাড়া থাকে। অল্প ভাপ বিশেষ জলের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, কার্শন ও ধাতব ভাগটুকু বহিয়া যায়। তাহা কক্ষপূর্ণ ধারণ করে। তাহা হইলে কাঠের কল্যাণ বলে। কাঠকে ছোট ছোট বৃকো কাটায়া তাহাতে আতন দিয়া, আঁধা আঁধা মাটি ঢালা দিলে, তাহা অতি ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকে। সেই আঁধা মাটিকে ভেদ করিয়া অতি অল্প পরিমাণেই বাহুর অক্সিজেন তাহার ভিত্তি প্রবেশ করিতে পারে। প্রচুর পরিমাণে—অক্সিজেন না পাইয়া কাঠ বৃকগুলি একবারে জলিয়া যায়। অতি সামান্য গুণে গুণে পুড়িতে থাকে। সেই অল্প পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। বাকি থাকে, কার্শন ও ধাতব পদার্থ। তাহা হইলে কাঠের কল্যাণ বলে। ইহাতে প্রায় ৮০ হইতে ৯০ ভাগ কার্শন থাকে। ইহাকে যদি আবার আরও অধিক উত্তপ্ত করা যায়, তবে কার্শনটুকু ও কার্শনিক-অ্যাসিড-বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, আর স্বাভাবিক বাকি থাকে, কেবল সেই ধাতব ভাগটুকু, যাহাকে আমরা ‘ভস্ম’ বলি। ভূতত্ত্ববিদ পুণ্ডিতরা বলেন যে, অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ নির্মিত বস্তুই ছিল, তখন

হয় নদীর ধোয়াটে, না হয় অল্প কোন কারণে স্থানে স্থানে এই বস্তুসমূহ মাটির নিচে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ভূতত্ত্বজ্ঞের উদ্ভাষণে সেই বস্তুসমূহের কাঠরাশি হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উড়িয়া যায়, গিয়া কল্যাণ পরিণত হয়। আবার কালক্রমে সেই কাঠের কল্যাণ প্রস্তররূপ ধারণ করে। তাহাই পাথুরে কল্যাণ। অনেক স্থানের মৃতিকাতে গন্ধক ও কক্ষপূর্ণ অধিক পরিমাণে আছে। নদীর ধোয়াট পড়িয়া যেখানে সমুদ্রকূলে নতুন ভূমির উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানকার মৃতিকাতে ক্যালসিয়াম অর্থাৎ চুন ও খড়ি এবং ফসফরাস অধিক থাকিবার সম্ভাবনা। কারণ সেখানকার মৃতিকাতে অনেক শব্দজাতীয় প্রাণিদেহের খোলা মিশ্রিত থাকে, আর ঐ সকল খোলা ক্যালসিয়াম-ফসফরাস প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা গঠিত। নদীর ধোয়াট পড়িয়া সমুদ্র-পৃষ্ঠ পরিপূর্ণ হইয় ও তাহাতে নতুন নতুন ভূভাগের সৃষ্টি হয়, একথা ভূমিবিদ মনে কেহ হারিলেন না। এই কলিকাতা, যেখানে বসিয়া আজ আমি এই কথাগুলি লিখিতেছি, ইহাও একদিন সমুদ্রপৃষ্ঠে ছিল। বিস্তৃত হিমালয়-সেহ হইতে মৃত্তিকা বহন করিয়া এদিকে ভাগীরথী উপদ্বীপকে দ্রুতপদে এইসম ভূভাগের স্বজন করিয়াছেন। আজও এই চলিতেছে। আজও বর্ষাকালের সেই কর্কশ-পরিপূর্ণ নদীনাগার জল পড়িয়া হুমধবনের নিকট পৌঁছিয়া নতুন ভূমির উৎপত্তি হইতেছে। ১২০০ বৎসর পূর্বে চীনদেশের একটা কবি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। পরা প্রভৃতি প্রাচীন স্থানসমূহ দেখিলে পরে। তঁহঁদের বসিয়া পরিগণিত ছিল। স্বদেশে প্রত্যাপনকালীন তিনি তমলুকে যাইয়া জাহাজ আরোহণ করেন। তখনকু তখন সমুদ্রে যাত্রা ছিল। একদে তমলুক সমুদ্র হইতে বিশ কোশ দূরে। যদি উত্থায কোন জল না থাকে, তাহা হইলে দেখ, এই বারশত-বৎসরের মধ্যে বিশ কোশ নতুন ভূমি উৎপত্তি হইয়াছে। যেখানে মৃত্তিকায় গন্ধক ও ফসফরাস অধিক পরিমাণে থাকে, সেইখানে বন পুতিয়া গিয়া যদি পাথুরে কল্যাণ হয়, তাহা হইলে সেই কল্যাণও অধিক পরিমাণে গন্ধক ও ফসফরাস থাকে। মৃত্তিকা হইতে এই দুই বস্তু বাহিয়া কল্যাণ ভিতর প্রবেশ করে, সেই জন্ম এরূপ হয়। আবার, এরূপ কল্যাণ গিয়া লোহার আকর পাওয়াইতে হইলে, কল্যাণ গন্ধক ও ফসফরাস বাহিয়া লোহাতে প্রবেশ করে। এই

হুই জ্যে অতি অল্প পরিমাণে থাকিলেও লোহা একবার অশুদ্ধ হয়। পড়ে। লোহা পোড়াইতে হইলে ভাল কয়লা চাই। তাহাতে কার্বনের ভাগ অধিক ও রিক্ত ভাবে থাকে। আবশ্যিক। বীর-জ্বলের পাথুরে কয়লা একরূপ নয় বলিয়া। মাঝি মাঝেরে কারখানা চর্চিল না। বীরজ্বলে অপরিসিত লৌহ-আকর পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল আকরে শতকরা ৪০ হইতে ৬০ ভাগ লৌহ, বাকি অক্লিষ্ট অপ্রতি অপর্যাপ পদার্থ। অক্লিষ্ট অপ্রতি অপর্যাপ পদার্থ লৌহের সহিত একত্রিত থাকিয়া যখন সমুদ্রের বায়ু করিতেছে। আজ তোমার এক কথাকে কি তাহারা লৌহকে ছাড়িয়া দিলে? তোমার খণ্ডা কুড়ুলের জন্ত লৌহের আব-শ্যক হয়। তাহা তাহাদের কি? বিচার করিয়া বলা কঠিন হইয়, তাহা হইলে অক্লিষ্ট অপ্রতি পদার্থের দোষ নাই। তাহারা বলে, পৃথিবীতে নানা জ্যে আছে, যাহাদিগকে লৌহ অপেক্ষা আমরা ভালবাসি। তোমরা সেই সকল জ্যে আম-দিশকে আনিয়া যাও, তাহা হইলে লৌহকে ছাড়িয়া আমরা সেই সকল জ্যের সহিত গিয়া মিলিব। লৌহ তখন একলা পড়িয়া থাকিলে, তাহাকে লইয়া তোমাদের বাহা ইচ্ছা হয় করিও। পোড়াইও, পিটিও, কাটিও,—বাহা ইচ্ছা তাহা করিও, আমরা সেখানে থাকিব না, তোমাদিগের কার্যে কোনরূপ বাধাও করিব না। লৌহ-নিষ্করণ-কার্যের গুঢ় তাৎপর্য এই।

মানুষ মেলারও অনেক স্থানে লৌহের আকর আছে। চুখের প্রস্তর-স্রাতি লৌহ-আকর এখনকার নদীপথে অনেক স্থানে বাসকারদের দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র করা বাসদায়া বসিয়া এই লৌহ-বালুকা লইয়া বড় কেহ লৌহ বাহির করে না। করিলে, ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হয়। প্রস্তর, কয়লা, লুপ্ত প্রকৃতি নানা রকম একত্রী-কৃত কাণ্ড ব্যতীত। অধিক পরিমাণে লৌহ প্রস্তুত না করিতে পারার দোষও বড় সামান্য কারণ নয়। অনেক দিন হইল, আমি একবার তিস্তার নিকট যিহানাবাদ পর্বতের উপর আরোহণ করিতে বহি করি। অনেক দূর উঠিলে, পর এক প্রকার মাটিতে আমাকে বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল। তাই পর্বতের উপরিভাগ পর্যন্ত উঠিতে পারি নাই। বতসুর গিয়াছিল। তাহাতেই অনেক চুখ-কাণ্ডীয় লৌহ-প্রস্তর দেখা গিয়াছিল। রানিগের দক্ষিণ-

পশ্চিম কোণে মেঘের মত যে পর্বতটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই বিহারিণ্য পর্বত। মানচুকের অনেক স্থানে লাল ও কটা হিমাইটিই আকর দেখিতে পাওয়া যায়। সিংভূম জিলার নানা স্থানেও লোহার আকর আছে। টাইবামার পশ্চিমদিকে প্রচুর পরিমাণে ইহা পড়িয়া রহিয়াছে। এ অঞ্চলে এক্ষণে রেল হইয়াছে। এই সমুদয় আকর লইয়া আসা হইয়া, শীঘ্রই যোগ্য হয় লৌহ প্রস্তুত করিয়া। আমরা? আর সে কথা কান নাই। নীচ নিচিল হইয়াই থাকা ভাল। মোঘারজাণা জিলার কথ্য বলিয়াছি, যেখানে নতুনায় লৌহ প্রস্তুত করিয়া, ইহা, সেই স্থান। পালানো এই জিলার অন্তর্গত। পালানোতে প্রচুর পরিমাণে লৌহের আকর আছে; আর, এই আকর অতি উৎকৃষ্ট। লৌহ প্রস্তুত করিতে যে সমুদায় জ্যের আবশ্যক, সে সমুদায়ই এখানে আছে। চুখকান্টায় লৌহ-প্রস্তর এবং লাল ও কটা হিমাইটিই রানি রাশি অনেক স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই সকল আকর পানিয়া ৪০ হইতে ৬০ পর্যন্ত লৌহ, বাকি অপর্যাপ পদার্থ। বাসনগর নামক স্থানের চারিদিক প্রায় হই ক্রোশ ধরিয়া এইরূপ লৌহ-আকর পরিপূর্ণ। কাহেই আবার চুখের প্রস্তর। অতি উৎকৃষ্ট চুখের প্রস্তর, বাহাতে প্রায় ৯২ ভাগ কার্বন ও চুনি। নিম্নেই আবার ওয়ালা ও ডাউনপল্লের কয়লায়। মৃতরাং লৌহ করিতে যাহা কিছু আবশ্যক, সকলই এখানে বর্তমান। তবে রেল নাই। ভলিউতে রেলও শীঘ্রই যাবে। তাহা হইলে এখানকার লৌহের আকর আর কৃষ্ণ প্রস্তর করিলে। আমরা বৃত্তভূ-জীবী, অর্থে আমাদের প্রয়োজন নাই, আমাদের কেবল গণপাদীরা দিক মনে। যখন আসবোরা কারখানা খুলিলে, তখন বসিয়া বসিয়া বৃত্তভূই করিতে থাকিব, আর মাংসবিশিষ্ট লৌহ বাহির করা দেখিব। ছোট-নাগপুরে তাঁকৃত সামান্য রাজাদিগের আকরও দেখা আছে। ইহার মধ্যে ভ্রমপুণ্য ও পশুপুরে কিছু কিছু লৌহ নিষ্কৃত হইয়া থাকে। জমশেদের লৌহ উৎকৃষ্ট অনেক। ইহা অঞ্চল প্রসিদ্ধ। পূর্বকালে মুঙ্গের জিলায় অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত, মুঙ্গেরের অল্প-শ্রম সর্বত্রই প্রসিদ্ধ ছিল। ঝড়কপুরের নিকট পাহাড়ে অনেক লৌহের আকর আছে। এই পাহাড়ের উপরে হুই মণ ওজনে এক

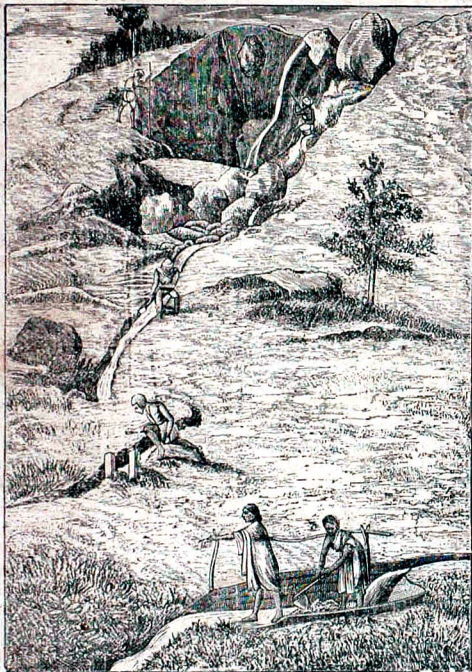
৭৭ লটো বয়সিন হইতে পড়িয়াছিল। পাহাড়ীরা তাহাকে পুকা করিত। কোথা হইতে এত বড় একখানি লৌহ-আসিদিয়াছিল, আর কৃষ্ণ এখানে পড়ি-য়াই বা ছিণ কেন, তাহা কেহ জানেনা। কেহ কেহ মনে করিতেন যে, ইহা আকাশ হইতে পড়িয়াছে। আবার কেহ মনে করেন, ইহা কোন লোহাকারের উটি হইতে নির্গত হইয়াছিল। সম্রাটের উটি হইতে বেরুণ লৌহ বাহির হইয়া আসিলে, ইহা বেশা ছিল না। ইহার বিকৃতি আকার, তাহা দেখিয়া লোহাকারেরা উটি দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। পাহাড়ীরা কিন্তু চরু, একটী সাহসও আছে। তাহারা ভাবিল, এত বড় লৌহখানি মিছামিছা পড়িয়া থাকে কেন, আসরা ইহাকে পুকা করি। তাহারা ভাল করিয়া শিশুর মাথাইয়া পুকা করিতে আরম্ভ করিল। অনেক দিন ধরিয়া অনেকে এই লৌহ থাকি পুকা করিয়া আসিতেছিল। এমন সময়, ইংরেজ-রাজ গিয়া সেই লৌহখানিকে উঠাইয়া আনিবলেন, আনিয়া কলিকাতা জাহাজের রাখিলেন। এ পাহাড়ে লোহাকারদিগের আরও বিপদ অনেক। আর একবার একটা উটিতে হইল কি, লোহা বাহির না হইয়া কেবল হুই ও রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, তাহার শব্দে মাত্র লোহাকারদিগের ঘরে হুই এক জনের মৃত্যুও ঘটিল। কাহেই জাহাদিগকে উটি ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে হয়। নায়েবেরা বলেন, সে হুইও নয়, রক্তও নয়। আকরের সহিত তিন ও দীয়া ছিল, তাহাই গলিয়া বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক, আপনাদের শান্তি হইয়া গিয়াছে, লৌহ বাহির করার কাজ এখানে একবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আসাম অঞ্চলে সকোলে অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত। এখনকার লৌহের আর সম্রাটের কয়-লার থাকেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে যে লৌহ-কর্করের কথা বলিয়াছি, তাহাই অধিক। সেই সমুদায় লৌহের, পরিমাণ অধিক নয়, কেবল শতকরা ২২ হইতে ৪০, কোন কোন স্থানে আবার ইহা অপেক্ষাও অল্প। লৌহের পরিমাণ কম হইলেও এই আকর লইয়া সকলে লোকে অনেক লৌহ প্রস্তুত করিত। এক তিল্লমা ও বাথিপুর্বে নিকট প্রায় তিন মাহ লোক এই যাবদা অলম্বন করিয়া দিনপাত করিত। এই লৌহ লইয়া বড় বড় তেপা নিষ্কৃত হইত। হুই

শত বৎসর পূর্বে আসামের বড় বড় তেপা সর্ব-ত্রই প্রসিদ্ধ ছিল। করনেল যানে সাহেব রতনপুরে হুর্গে একটি বারতাহ লুণ্ড তেপা দেখিয়াছিলেন, ইহার ত্রুতা প্রায় সর্বত্র হইত। ত্রুতাদীরা যখন আসাম আক্রমণ করে, তখন তাহাদিগের খোরতর অত্যাচারে আসামের লৌহ-নিষ্করণ-কার্য অনেক ক্রীম্বা গিয়াছিল। ত্রুতাদীরা চলিয়া যাইলে, একাধারে বাহা কিছু থাকি ছিল, তাহা আসামের রাজা নিজের ধন্য করিয়া ফেলি-লেন। তিনি লৌহ আকরের উপর এরূপ ভর্য নিষ্কৃতি করিলেন, যে তাহাতে এ যাবদা একবারে চণিতেই পেরে না। আসামে লৌহ প্রস্তুত করা একবারে বন্ধ হইয়া যাইল। খামিয়া পর্বত হইতে এখানে লৌহ আসিতে আরম্ভ হইল; বাহিয়া পর্বতে পাওয়া নামক স্থানে এক আশ্চর্য প্রণালীতে লোকে লৌহ প্রস্তুত করিত। লৌহের আকরকে এখনে পরিকার করিয়া তাহারা জলে তলিত, আর সেই জলে কাটি-মুটি, পাতা মড়া বুঝিয়া রাখিত। লৌহকণা এই পাতা-মড়া কাটি-মুটিতে লাগিয়া যাইল, তাহা লইয়া আতলে পোড়াইলেই লৌহ বাহির হইত। চেরাপুঞ্জি হইতে প্রায় নয় ক্রোশ দূরে অনেক লৌহের আকর আছে। সেখানে ইহা হইতে অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত। আমি যে টাইটনিয়াম ধাতুসম্মিত লৌহের আকরের কথা পূর্বে বলিয়াছি, এখনকার আকর তাহাই। ইহা শ্রেষ্ঠে সূক্ষ্ম বাস্কানেও প্রায়। পাহাড়ের পাথর পড়িয়া ইহার উৎপত্তি। বড় বড় পাথরের কাছে লোকে টুই রেং, অধিক পরিমাণে জড় হইয়া থাকে, সেখানেই এখন দিয়া সরগর জলপ্রোত পরিচালিত করে। জেলে দুইয়া বাস্কানেও খনি কর্দম-মুখ ও পরিষ্কৃত হয়। তাহার পর রেক্স স্বর্ণ-বালুকা মৌত করে, সেইরূপ এই লৌহ-বালুকা লইয়া কাঠ গাড়ে লোকে দুইয়া লয়। অনেকেই ইচ্ছা করে উটিতে পোড়াইয়া লৌহ বাহির করে। ২২ পূর্বাং যে চিত্রাণা আছে, তাহাতে খামিয়া পর্বতে লৌহ-আকর কিয়ৎ সংখ্যাই হইত, তাহাই পরি-দর্শিত হইয়াছে। বিশাতি লৌহের আকরানিষ্ট খামিয়া পর্বতে লৌহ প্রস্তুত করা, প্রায় এক-বারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ত্রিবেণীক্যানাথ মুখোপাধ্যায়।

আমাদের খাসিয়া পর্বত।



কিরূপে খাসিয়াগণ লৌহ সংগ্রহ করে।

মণিপুর।

মণিপুর সহসা লোকের মন আকৃষ্ট করিয়াছে; মণিপুরে দ্রুম-বিভাট; ভীষণ অভিনব উপস্থিত। অভিনয়ের কথা পরে কহিব; অগ্রে কিছু পরিচিত মণিপুরকে আরও ভাল করিয়া পরিচিত করিয়া দিতে হইবে। মণিপুর কোথায়; রাজ্যের অবস্থা কিরূপ; সেখানে কত লোকের বাস; কত গ্রাম নগর; সেখানে নল নদীর অবস্থা কিরূপ; পাহাড়-পর্বত কীদূর; রাজ্যের চতুর্দশীমা কিরূপ; বহু ও আমাদের সহিত মণিপুর-রাজ্যের কিরূপ ভৌগোলিক সম্বন্ধ; ব্রাহ্মের সহিতই বা কিরূপ; মণিপুরে কোন জাতির বসবাস; সেখানে কি ধর্ম প্রচলিত; সেখানকার রাজবংশের ইতিহাস কিরূপ; রাজনীতি কিরূপ; মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস কিরূপ; বর্তমান ইতিহাসেরই বা কিরূপ রহস্য; মণিপুরে শস্ত-সমৃদ্ধি কিরূপ; বন-জঙ্গল কেন; সেখানে ধনরত্ন কিরূপ মিলে; সেখানকার জল-বায়ুর অবস্থা কিরূপ; লোকজনের প্ৰভাব-চরিত্র বল-বৃদ্ধি কিরূপ; মণিপুর কোন পথে যাইতে হয়; মণিপুর হইতে ব্রহ্মচাত্তর পথ কিরূপ; ইংরেজের সহিত মণিপুর-রাজ্যের পূর্বে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল; এখনই বা কিরূপ আছে; ব্রাহ্মের সহিত মণিপুরের পূর্বে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল; এখনই বা কিরূপ আছে; ইত্যাদি সকল বিষয়ের আভাস সংক্ষেপে পাঠকগণকে জানাইতে হইবে।

মণিপুর আমাদের জম্বুভূমি না হইলেও, আমাদের জম্বুভূমি ভারতের সহিত উহার বন্ধিত সম্বন্ধ; মণিপুর-কথা পুরণের অন্তর্নিবিষ্ট, মহাভারতে মণিপুরের কথা আছে, মণিপুর পাণ্ডবযজ্ঞিত বেশ নাহে, মণিপুর হিন্দুর রাজ্য, মণিপুরের আধিকার প্রজাই হিন্দু, সেখানে জাতিভেদ আছে, আবার অসুখিত আছে। সুতরাং মণিপুরকে আমাদের জম্বুভূমি—এই পবিত্র ভারতভূমিরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। যে রাজ্য আমাদের জম্বুভূমির অন্তর্নিবিষ্ট; জম্বুভূমিতে তাহার আদর না হইবে কেন? জম্বুভূমিতে তাহার উপযুক্ত স্থান না হইবে কেন? এতএব মণিপুর-কথা জম্বুভূমিতে সন্নিবেশিত হইল।

ভূগোলে।

প্রথমেই ভৌগোলিক অবস্থার কথা। শোভা, শ্রীহট পার হইয়া, কাছাড় দিয়া বরাবর মণিপুরে পৌছান যাইত; ময়মনসিংহ জেলার পূর্বে শ্রীহট জেলা, তাহার পূর্বে, কাছাড়, কাছাড়ের পূর্বেই মণিপুর রাজ্য। মণিপুরের উত্তর-সীমা নাগা-পাহাড় বা নাপপর্বত-প্রদেশ; পূর্বে-সীমা উত্তর-বঙ্গের শান-প্রদেশ; দক্ষিণ-সীমা লুশাই ও হুজিদিগের দেশ; পশ্চিমে-সীমা কাছাড়। মণিপুর-রাজ্য উত্তর দক্ষিণে অধিক লম্বা; বিস্তার দক্ষিণ ভাগে কিছু অধিক। মোট দৈর্ঘ্যে প্রায় বৌটাকাটা পোয়ারার মত। উত্তর-দক্ষিণে মণিপুর রাজ্যের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬ মাইল; পূর্বে-পশ্চিমে বিস্তার প্রায় ২০ মাইল। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ৮ হাজার বর্গ মাইল। দ্রষ্টব্য অধিকাংশ পর্বতময়; চাম্বাস-বোগা ভূমির পরিমাণ ৬০০ বর্গ মাইলের অধিক হইবে না।

মণিপুর পর্বতময় প্রদেশ; পর্বতশাখা-গুলি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। উত্তরদিকেই উচ্চ অধিক; মধ্যোচ্চ শৃঙ্গও কিছু উচ্চ। ৮০০০ ফুটের বড় অধিক হইবে না। পর্বতশ্রেণী যত দক্ষিণে গিয়াছে, ততই ক্রমশঃ মস্তক অবনত করিয়াছে। সেবে চটগ্রাম হইয়া আরাকানের কাছে গিয়া, একেবারেই বিনীত ভাব ধারণ করিয়াছে। বোধ হয় যেন অসীম মহাসাগরের দর্শনেই, ইহাদের দর্প হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তরেও, মণিপুর সহর হইতে চারিদিনের পথ গিয়াই, পর্বতশাখাসমূহের যত গর্ভ;—সেই ধানেই শিরোদেশ সর্বাঙ্গোপেক্ষ উন্নত করিয়াছে, তাহার পর ক্রমে যত হিমালয়ের দিকে গিয়াছে, ততই স্ফাবর উচ্চ মাথা নীচু করিয়াছে, অতঃপৌ হিমালয়কে দেখিলে, কোন পর্বত হ্রদ, মাথা তুলিয়া থাকিতে পারে?

পর্বতের অধিত্যকা হইতে উপত্যকায় অবতরণ কর, দেখিলে, মধ্যস্থলে একটা বিশাল হ্রদ; ইহার নাম লোগটাক হ্রদ। ক্ষুদ্র হ্রদ আরও অনেক আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, সমগ্র মণিপুর প্রদেশটাই পূর্বে, একটা মহাবহুস্রূপে বিরাজ করিত; জলভাগ কালবশে পুরিয়া আসিয়াছে, তাই জল হ্রদ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতিবশে পৃথিবীর চারিদিকে এইরূপে জল স্থল হইতেছে, আবার স্থল

জল হইতেছে; কিন্তু সে প্রাকৃতিক ভূবিদ্যা লব্ধা এ প্রস্তাবে আর আমরা বিদ্যা-প্রকাশ-করিতে বসি না।

সোপাট হ্রদের দক্ষিণ তীরভূমি মরুজঙ্গল; পার্শ্ব পার্শ্ব অবনততীর পর্যবেক্ষণেও বিরাজ করিতেছে। দক্ষিণের বনরাঞ্জিত কিন্তু বর্ষাকালে; যেখানে পর্যন্তেই আর্দ্রতা বর্ধি, সেখানে বন-পালপ কি মস্তক উন্নত করিতে পারে? উভয়েই গ্রাম্যমণ্ডলি, বিরাজ করিতেছে, আর হ্রদের উত্তর কোণেই রাজধানী মণিপুর বিরাজিত। বনপালপগুলিই উত্তরদিকেই মস্তক উন্নত-করিবার অঙ্গর পাইয়াছে।

রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম-দিক হইতে কয়েকটা নদী প্রবাহিত হয়, ঐ সোপাট হ্রদে পতিত হইয়াছে। জল হইতে এদের আরও নদী কাহির হইতে পারে নাই। কিন্তু সাগরের দিকে ইহার পথে এই নদী কতগুলি উপনদীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

বৃক্ষাদি জীবজন্তু।

পর্যন্ত মণিপুর প্রদেশের পর্যন্ত পর্যন্ত বড় বড় বনশ্রীত বিরাজ করিতেছে। এখানে নাগেশ্বর, জারল, বংশীকট, টুল, ওক প্রভৃতি বৃক্ষ চারিদিকে অভ্যন্তর করিতেছে, রক্তসীমায় সেতনেরও অভাব নাই; মধ্যে মধ্যে ছিঁ এক স্থানে সেবার জমও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মের চারিদিকেই নিবিড় উচ্চ বনরাঞ্জিত বিরাজ করিতেছে। মণিপুর ও ব্রহ্মের মধ্যবর্তী ভূভাগেও ব্রহ্মজঙ্গল-বন দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ নীলগিরি অস্তিত্ব দেখিয়াও আনন্দিত হইয়াছেন। যেখানে বন, সেখানেই বন্যজন্তু; মণিপুরের বনেও নানাবিধ বন্যজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। বনে হস্তার অভাব নাই; ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, বন্যমাক্কার এবং জলক ঘরগর; বনে নানাবিধ বৃগও বিরাজ করিতেছে। দক্ষিণ-পূর্বদিকের বনে গণ্ডার দেখিতে পাইবে। দক্ষিণে মহিষের আধিপত্য; আর, সেইখানেই এগুনও দুই একটা বন্যগোর দর্শন পাওয়া যায়। পূর্বেই বৃগ-ঘেরের বড়ই আধিক্য ছিল। বন্যজাত্য দেখিতে প্রায় মণিপুরের মত, কিন্তু উহার শৃঙ্গ মহিষের মত দীর্ঘ নহে। মণিপুর-বনে বানরেরও দর্শন পাওয়া যায়। ইহারদিকে দেখিলে কিন্তু

লঙ্কাবিক্রমাদিগের বংশধর বলিয়া মনে হয় না। পাখী-পক্ষীও মণিপুর অঞ্চলে নানাবিধ আছে। মণিপুরে বড় বড় পাহাড় বেড়া। অম্বাং। নিকটেই নাগপর্বত; নাগের উৎপাত না হইবে কেন? মণিপুরের বৃহৎশ্রীত বিহীন; কিন্তু টাঙ্গী নামে একপ্রকার দীর্ঘ, কিন্তু হৃৎকাজিত মৃগ প্রকার বিধ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার বংশবন-বিরাজিত। গ্রাম্যমণ্ডলে থাকিলে এই বংশবিরাজী সূর্য কিছ 'মণিপুরীদিগকে নির্মম করিত। গ্রাম্যজন্তুও রাজ্যমধ্যে নানাবিধ দেখিতে পাওয়া যায়। বশ ও ব্রহ্মের অনেক গ্রাম্য-জীবই মণিপুরে বিরাজ করিয়া আছে। হস্তুর মণিপুরীদিগের অশ্বশ্রেয়; নাগদিগের ভোজ্য। মণিপুরের টাট্টাষোড়্য প্রদিশ; দেখিতে প্রায় ময়াই টাট্টার মত; সেইরূপই কম্বুট। মণিপুরীরা এই টাট্টাপুটে চড়িয়া যে খাঞ্জাই খেলা খেলিয়া থাকে, সাহেবেরা তাহাই মিশিয়া লইয়াছেন। সেই মণিপুরী খাঞ্জাই খেলাই সাহেবদিগের 'পোলা'।

ফল ও ফসল।

অতিভাড়া উপত্যকা সর্বত্রই শজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধাতুই মণিপুরীদিগের প্রধান ভণ্ডা; আর ধানের চাষই হুতরাং মণিপুরের প্রধান চাষ। মণিপুরে অধিকাংশ খান পাকে ভাতের শেষে, আর আধিনের প্রথমে। আখাধ্য এই সময়েই পাকিয়া থাকে। আর উচ্চ-ভূমিতে আখাধ্যই জমিয়া থাকে। চাষাবাস প্রায় পূর্ববঙ্গের মত। কার্পাসের তুলা, মর্দপানি তৈলশজ, গোলামরীচ, তামাক, আদা, নানাবিধ ভাণ্ড-সজারী, স্থমিট সারকন্দ আলু, জনার প্রভৃতিও মণিপুরপ্রদেশে উপভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু ধাতুই প্রধান শজ; মণিপুরের উপত্যকার প্রায় ১৯ প্রকার ধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। উচ্চভূমিতে আখাধ্য পাকে আধিনের পূর্বে। নিম্নভূমিতে হৈমন্তিকও জমিয়া থাকে; হৈমন্তিক পাকে অগ্রহায়ণের শেষে।

স্থিলাও অনেক প্রকার জমিয়া থাকে। আবার বিশালাবল্লভ কল শক্তও না দেখিতে পাওয়া যায়, এমন নহে। দীর্ঘতালে গোলাম উপভোগ হয়। ফলো মধ্য কদলী, আনারস এবং আরও মত; আর পাঁচ, কুল এবং আপেল বিশাল মত; কিন্তু তত উৎকৃষ্ট নহে। অল্প রোজবেরিও

দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বিলাতী ফলের মূল চাষ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পথ ঘাট।

কাছাড় হইতে মণিপুর পর্যন্ত একটা প্রশস্ত পথ আছে। ১৮৪২ সালে ব্রহ্মসমর সাদ্ধ করিবার পর, ইংরেজ ভবিষ্যৎ সেনাচালনার ও যাতায়াতের সুবিধা জ্ঞাত এই পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত পথটা ইংরেজের তত্ত্বাবধানে ছিল; পরে মণিপুর-রাজের হাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। পথটা সংগ্রহিত সমস্ত হইয়াছে; এই পথেই যাত্রা আসা-চলিতেছে। সৈন্যচালনার পক্ষে এই পথই প্রশস্ত। মণিপুর হইতে, ইহারই উত্তরদিক দিয়া, আর একটা পথ কাছাড় পর্যন্ত আসিয়াছে। এ পথে কিন্তু চলাবিলা কম। নিজ মণিপুররাজ্যে উপত্যকার উপর দিয়া আরও অনেক পথ চলিয়াছে; তাহাতেই অন্তর্ভাবিতা চলিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল পথ কাঁচ। উপত্যকার চারিদিকে নদী; পলু সেতু অনেক স্থলেই করিতে হয়। সেই জন্তই পথ প্রস্তুত করিবার পক্ষে কিছু অসুবিধা।

নদী তলি কিন্তু সবই সংকীর্ণ। নাগ-প্রদেশে কহিয়া নামক স্থানে ইংরেজের যে ছাউনি আছে, তাহার ১৮ মাইল দূর টিয়া, মণিপুরের দিকে আর একটা পথ দিয়াছে। এ পথেও সৈন্যচালনার সুবিধা হইতে পারে। ব্রহ্মের দিকে তামুর পথ;—এ পথ নূতন এবং বন্ধুর।

ব্যবসায় বাণিজ্য।

মণিপুরের বহির্লোকাভিা অধিক নহে। জলপথ না থাকিলে ত আর দেশের সিনিধি বিদেশে চলাইবার সুবিধা হয় না। বহির্লোকাভিা হুতরূপে চলিতে পারে, এমন স্থলপথও নাই; এমনও মণিপুর পর্যন্ত রেল হয় নাই। কিন্তু সে পক্ষে কমেই যথোপ হইয়া-আসিতেছে; আর বড় অধিক দিন বিলম্ব করিতে হইবে না। অতর্লোকাভিা বিনে কলা উচিত, সেইরূপই আছে। স্থানে স্থানে হাট আছে; হাটের উপরুক্ত হাট হাটও না আছে এমন নহে। মণিপুরের নানিক দূর-বাণিনীতাবী সুদৃষ্ট আছে; তাই হাটে বাটে রমণীদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়। হাটে মাছ-উরকারী কাপড়-চোপড়

মিষ্টান্নাদির বেচা-কেনা হইয়া থাকে। চাটল ঘরে 'বরেন্দ্র' মজুত থাকে; সবলরই চাষ আবাদ আছে।

কেনা-বেচা বিনিময়ে-এবং মুদ্রাযোগে চলিয়া থাকে। মণিপুরের টাকশালে একপ্রকার ক্ষুদ্র তামামুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহার ছটায় আদ্যের এক পয়সা। ভারতের ও ব্রহ্মের সকল প্রকার সৌম্যমুদ্রাও মণিপুরে চলিয়া থাকে।

কাছাড় হইতে নানাতর্য মণিপুরের শিমা থাকে। তাহার মধ্যে সুপারি, কানিকো কাপড়, বনাত, পিঞ্জলের রসন, তামাক, গন্ধমাসা, বস্ত্র তন্ত্র, পশমী কাপড়, এই তলিই প্রধান। বিলাতী ত্র্যাও কাছাড় দিয়া মণিপুরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মণিপুর হইতে অল্পদূর যাত্রা টাট্টাষোড়্য, মণিপুরী কাপড়, রেশম, বেত, মর্দ, চা-বাগী, হস্তশ্রুত এবং বংশীঘরের নিদ্রাসরুপ রবার। মণিপুর হইতে নাগ দেশের দিকে যাত্রা টাট্টা, লৌহ, মধ্য, লবণ, কাপড়; আর সে অঞ্চল হইতে মণিপুরে অনেক পিঞ্জলের বাসন ও একপ্রকার রক্তবর্ণ প্রস্তরমণি। ময়, সর্দপানি তৈল শজ, তুলা এবং বস্ত্র চারিদিকের পার্শ্বভাষাভিও মণিপুরে লইয়া আসে।

খনিজ দ্রব্য।

মণিপুরে—সহরের উত্তরপূর্বদিকে—অনেক কয়লা খনি আছে। সে খনি এখনও খোলা হয় নাই; মণিপুরে ইংরেজের আধিপত্য হইলেই, রেল বিস্তার হইবে, হুতরাং কয়লা খনিও খনিও হইবে। পর্যন্ত-ভূমিতে লৌহ খণ্ডই আছে। মণিপুরে বলা যথেষ্ট; উপত্যকার কৃপ বনানী কুর্বি বলা তোলা হইয়া থাকে। যখন মণিপুর পূর্বের সাধারণ ছিল, তখন ভূগর্ভ-যে মর্যবে পরিপূর্ণ হইবে, তাহাতে আর বিচিৎ কি?

লোক জন।

এবারকার আদম-সংখ্যার—কিরূপ দাঁড়াইবে, ঠিক বলিতে পারি না; ১৮৮১ সালের স্থানে কিন্তু দেখা গিয়াছিল, মণিপুর রাজ্যে ২ লক্ষ ২১ হাজার ৯০ জন লোকের বাস। ইহার ভিত্তি ১ লক্ষ ৯ হাজার, ৫৫৭ জন পুরুষ, ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫১৩ জন স্ত্রীলোক। প্রকৃত অংগেণা স্ত্রীলোক

কিন্তু আর্থিক। রাজ্যে ২৫৪ থানা গ্রাম আছে, গ্রামে ৪৫০২২ কন্স-বান্ডী আছে।

মণিপুর রাজ্যের এই যে ২ লক্ষ ২১ হাজার ৭০ জন লোকের কথা বলা পেল, ইহার ভিতর নিজ মণিপুরের অর্থাৎ উপত্যকা-ভূমিতে আছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার। অবশিষ্ট অংশে পুশে, পাহাড় পর্বতে। উপত্যকায় যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার, তাহাতে আসল মণিপুরী আছে ৩০ হাজার মাত্র; অবশিষ্ট ৭৪ হাজার নানাবিধ পার্বত্য জাতি, নাপা ইতি প্রভৃতি।

সমগ্র মণিপুররাজ্যে সম্রাজ্ঞীরা অবিসার সাংখ্য্য যে ২ লক্ষ ২১ হাজার ৭০ জন বলা গিয়াছে, তাহার ভিতর হিন্দু ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৮২২ জন; মুসলমান ৪৬৮১ জন; নাপা ইতি প্রভৃতি পার্বত্য ৮০ হাজার ২৮৮ জন; বৌদ্ধ ২ জন; আর বৃটশ ৭ জন—পলিটিকেল এজেন্ট ও তাঁহার পরিবারবর্গ। এটা কিন্তু ১৮৮১ সালের হিসাব।

জাতি ও ধর্ম।

মণিপুর হিন্দুর রাজ্য। হিন্দুর ভিতর জাতিভেদ আছে। তনুতে পাই, মণিপুরী হিন্দুর ৮ জাতিতে বিভক্ত, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরই সংখ্যা এবং স্থান অধিক। মহাভারতে দেখা যায়, অর্জুন এই রাজ্যে গিয়া, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র বক্রবাহন মণিপুর সিংহাসনে অধিরাহণ করিয়াছিলেন।

বক্রবাহনের বংশলোপ হইয়া থাকিলেও, ক্ষত্রিয় জাতির বংশলোপ হয় নাই। হুতরাং মণিপুরে এখনও ক্ষত্রিয় জাতি প্রাধান্য আছে। রাজবংশ ক্ষত্রিয়, মণিপুরের রাজবংশ এখনও অর্জুনের দোহাই দিয়া থাকেন, হুতরাং রোহ হর, আশান-দিককে চন্দ্রবংশীয় বলিয়াই মনে করেন। অজ্ঞাত জাতির কথা আমরা সন্নিবেশ অব্যত নহি। মুসলমান জাতির মুসলমান ধর্ম, কিন্তু শিখা কি হুতী তাহা বলিতে পারি না। পার্বত্যগিরির পার্বত্য ধর্ম; কিন্তু তাহারও অনেকাংশে হিন্দু, সকলেই নগেন্দ্রবীর পূজা করিয়া থাকে। নাপা জাতিও নগেন্দ্রবীরদিগের ধর্ম বটে, কিন্তু ধর্মেরই একরাস্তর, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ইতি প্রভৃতিও হিন্দুধর্মেরই অঙ্গসম্বল করিয়া থাকে।

মণিপুরের ভ্রমসম্প্রদায়ে এখন হিন্দুধর্মের বৈধব্যী মাথাই প্রচলিত; স্নানবৎস বধ্যম নব-

বীণের গোহামী তাঁহুরের গিয়া মণিপুরে বৈধব্য ধর্ম সজীব করিয়াছেন। আর অর্জুন-পুত্র বক্রবাহন যে পিতৃবংশের জ্ঞান, জ্ঞানান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, তাহাত পুরাণেই উক্ত হইয়াছে। হুতরাং মণিপুরের ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ে বৈধব্য ধর্ম নুতন নহে; নববীণের গোহামী মহাপ্রেরা স্ফীত ধর্মই সজীব করিয়া গিয়াছেন।

আচার ব্যবহার।

সম্রাট হিন্দুসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার হিন্দুই বিস্তৃত। নীচ-সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ততটা বিস্তৃত বলিয়া দেখে হয় না। ইংরেজেরা বলিয়া থাকেন, মণিপুরে ক্রী-স্বাধীনতা আছে; কিন্তু ক্রী-স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত নীচসম্প্রদায়েই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেও নীচ সম্প্রদায়ের হিন্দু-রমণীরা স্বাধীনভাবে চলাবিনা চলি থাকে; হাটবাজার করা, সোকাণপাট করা, এখানে ওখানে যাওয়া-আসা করা ও ভারতেও নিম্নজাতীর রমণীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। মণিপুরের এরূপ হিন্দু-রমণীরা যে, পার্বত্য রমণীদিগের সঙ্গে সঙ্গে কড়কটা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ভাষা ও শিক্ষা।

মণিপুরের পূর্বে সংস্কৃত ভাষার খেণ্ড ভাঙার ছিল, হুতরাং পূর্বে নাপারামেরই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু নববীণের গোহামী মহাপ্রেরা যে অধিবীর মন্ত্রণ হইয়াছেন, সেই অধিবীর স্বভাবের ও বাক্য-কবের আদর হইয়াছে। তিনি বলিয়া যে, প্রাচীন নাপারামের একেবারে লোপ হইয়াছে, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষিত মণিপুরীদিগের প্রজ্ঞা আছে; ত্রিমভাষাভাষ এবং অজ্ঞাত বৈধব্যগ্রন্থের খুবই আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্বত্যজাতির ভাষা বড়ত। নাপসম্প্রদায়ে নাপভাষা, হিন্দুসম্প্রদায়ে ব্রজভাষা; কিন্তু ইহা ভাষারই অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। অমসিন হইল, ভ্রমসম্প্রদায়ে একটি ইংরেজিধর্মের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পলিটিকেল এজেন্ট সাহেবই

উহার প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু মণিপুরে এখনও বিলাতী বিদ্যার আদর বা আধিপত্য ঘাই নাই।

ডাকঘর ও ডাক্তারখানা।

মণিপুরের যখন বৃটশ পলিটিকেলকে থাকিতে হইয়াছে, যখন আমাদের পর্ববর্তের সহিত মণিপুরের বরাবরণার রায়িতে হইয়াছে, তখন মনোনে ডাকঘর না থাকিলে, চলিবে কেন? মণিপুর সময়ে ডাকঘর আছে, ইংরেজের একটি ক্রেকার বা খানদাখানা আছে। ডাকঘরে মণি-অভ্যন্তরে কাজ আছে।

মণিপুরে বিলাতী ধরনের একটি ডাক্তার খানাও স্থান হইয়াছে। কিন্তু মণিপুরীরা এখনও সুশাসক বিলাহ করিলেন এবং মণিপুর রাজ্যে ২ বৎসর কাল অভিজাহিত করিলেন। পূর্ব-পরি-হয় নাই।

মণিপুরের প্রায় সকল কথাই সংক্ষেপে কথিত হইল। বাকি রহিল রাজবংশের কথা। রাজনীতির কথা, পটপটের কথা, রাজখানির কথা। এ সকল কথা শেষে কথিব; এইবার কিছু পুরাণের কথা—মহাভারতের কথা কথিতে হইতেছে। মণিপুর ত আর ভারতভাগ নহে।

পুরাণে।

ত্রিমভাষাভাষের ২ম যুগে ২২শ অধ্যায়ে অর্জুন-পুত্র মণিপুরাধিপ বক্রবাহনের কথা আছে। আর মহাভারতের আদিপর্বে এবং অংশবৈপর্কে মণিপুর ও বক্রবাহনের কথা বিশিষ্টরূপেই কথিত হইয়াছে। ভাগবতে উল্লেখমাত্র; মহাভারতেই বর্ণনা।

পাণ্ডবদিগের ভিতর সকলেই প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, এক জাতি যখন দ্রৌপদীর সহিত নির্জনে থাকিলে, তখন অস্ত্রে সেখানে ঘাইতে পারিলেন না; যিনি ঘাইলেন, তাঁহাকে ২২ বৎসর বনবাসে বাইতে হইবে। একদা সুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে নির্জনে বলিয়া আছেন, এমন সময়ে অর্জুনকে যুদ্ধের পূর্বে অস্ত্র আনিবার জ্ঞাত সংঘা সেই যুদ্ধে গিয়া পড়িতে হইল। হুতরাং প্রতিজ্ঞাত হইল। অর্জুনও সুধিষ্ঠিরের নিষেধ-নিষেধ না মানিয়া, দ্বাদশদণ্ডের জ্ঞাত গৃহযাত্রী হইলেন।

গৃহযাত্রী হইয়া, অর্জুন পদ্মাতীরে আগমন করিলেন। কথিত আছে, পদ্মাতীরে-পদ্মপুষ্পে আসিয়া তিনি তপ জপ শ্রান আশ্রিক করিতে লাগিলেন। একদা দ্রাবীড়ী তিনি পদ্মপুষ্পে নিমজ্জিত হইয়া, কৌবয়ানামা নাপারজের জ্ঞাত উদ্ভূপী কর্তৃক চুষ্ট হইলেন। উদ্ভূপী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না; হুতরাং অর্জুনকে, নাপারজের পাতালগৃহে গিয়া, উদ্ভূপীর পারিগ্রহণ করিতে হইল। উদ্ভূপীর কথা এখানে কেন কহিলাম, পাঠক তাহা পরে বুঝিতে পারিলেন।

উদ্ভূপীকে বিলাহ করিবার পর, অর্জুন সাগরের উপকূল দিগা বুঝিয়া করিয়া, মণিপুর রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চিত্রবাহন মণিপুরের রাজা; অর্জুন তাঁহার কন্যা-চিত্রাঙ্গদাকে বিলাহ করিলেন এবং মণিপুর রাজ্যে ২ বৎসর কাল অভিজাহিত করিলেন। পূর্ব-পরি-হয় নাই।

শীতা নাপকন্যা উদ্ভূপীর গর্ভে অর্জুনের ইরাম নামে এক পুত্র হইল; আর মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বক্রবাহন নামে এক পুত্র হইল। চিত্রাঙ্গদারের পুত্রসন্তান ছিল না। দেখিতে বক্রবাহনই মাতামহের সিংহাসনে অধিকারী হইলেন। এই গেল আদিপর্বের কথা।

অনন্তর বক্রবাহন পুত্র—ব্রহ্মকেন্দ্র সমরের অস্ত্রে—বৃষ্টিধির সমাগ্রদেশে গিয়া, যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময়ে বক্রীরা অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনকে নানাগির্দেমে জঘন করিতে হইয়াছিল। অশ্বমেধের খোড়া যেন নরপতি রাজ্যে ঘাইলো, তিনি সেই অশ্ব আটকাইবার জ্ঞাত যুদ্ধ সমাজ করিলেন; অশ্বধর্মীর সহিত তিনি যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়াই, তাহাকে যাহার অশ্ব, সেই সমাগ্রের বক্রাত্মীকার করিতে হইল। এইরূপই অশ্বমেধের নিয়ম। যজ্ঞাধ কামচোর। অর্জুনকেও সেই কামচোরী অশ্বের মাতে সঙ্গে ঘাইতে হইল। অশ্ব যেখানে ঘাইতে লাগিল, অর্জুনকেও সেইখানে ঘাইতে হইল। সেইখানেই যুদ্ধ করিতে হইল। চারিগিকে বুঝিয়া অশ্ব আশ্রয়প্রাপ্তিবে অর্জুন আসাম রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে ব্রহ্মকেন্দ্রজন্মে, হুত রাজা ভগদত্তের পুত্র, বক্রজ্ঞানের সহিত অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে বিজিত হইয়া বক্রজ্ঞান অর্জুনের বক্রাত্মীকার করিলেন, এবং অর্জুন কর্তৃক অশ্বমেধে আশ্রয়িত হইলেন।

আসাম হইতেই অথ মণিপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। অর্জুন জাতিভেদে স্বীয় পুত্র বজ্রবাহন মণিপুরে রাজত্ব করিতেছেন। পিতা অথ সমজিবাহুরে দিগ্বিজিত আসামিগণের ভগ্নিমা, বজ্রবাহন তাঁহার স্বভাবদ্বারা করিতে অগ্রসর হইলেন; পিতার সহিত যুদ্ধ করিবেন কিরূপে? কিন্তু জাতিগের ধর্ম একরূপ নহে; বজ্রবাহন লইয়া ইনি আসিবেন, তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং ক্ষত্রবংশী অর্জুন পুত্র বজ্রবাহনকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। বজ্রবাহন ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সপত্নী-মাতা সেই উলুপী আসিয়া সহসা, অবিনীত হইলেন, এবং সপত্নীপুত্রকে পিশুকে উৎসাহিত করিলেন। দোর সুক্কে পুত্র পুত্র মর্জিত সত্যং হইয়া পড়িলেন, পিতা অর্জুন গভাঘ হইয়া পড়িয়া পেলেন।

এই সংবাদ পাইয়া বজ্রবাহনের জননী— অর্জুন-পত্নী সেই 'চিত্রাঙ্গদা'—পাগলিনীর মত রসমত্তে আসিয়া দেখিলেন, পতি পুত্র উভয়ই পড়িয়া আছেন, সপত্নী উলুপী সেইখানে বিরাম্য আছেন। দেখিয়াই চিত্রাঙ্গদা ব্যথিত পড়িলেন, সমস্তই সপত্নী উলুপীর কার্য।

বহুশ্রম খেলিলাপ চলিল। ক্রমে বজ্রবাহন জাগ্রিত হইয়া উঠিলেন। পিশুভাঙ্গনিতে পাগের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ত, তিনি প্রাণোপায়সমূহ সেবাভাঙ্গ করিতে রুতসঙ্কর হইলেন। চিত্রাঙ্গদাও প্রাণোপবেশনে পতির অল্পমমণ করিতে স্থিরপ্রজ্ঞা হইলেন। তখন নাগরাজ-কর্তা উলুপী মৃতসম্ভাবন মনিকে দাব করিলেন; স্বরমত্তা মনি আসিয়া উপস্থিত হইল। উলুপীর কানেসে কবচবদন সেই মনি মুখ পিতার কলশেলে রাখিয়া দিলেন। অর্জুন জাগ্রিত হইলেন। অধরোরে অশ্রু লইয়া রূপটি অশ্রুকা 'করিবার ঘো নাই; সুতরাং অর্জুনকে পুত্র ও পত্নীর অন্তর্নয় নিমগ্নপদেও মণিপুরভাগ করিয়া' চলিয়া 'বাইতে হইল। মহাভারতের আরম্ভের-পর্বে এই কথা কবিত হইয়াছে। মণিপুরে যে কতি প্রাচীন হিন্দুরাজ্য, তাহা মহাভারতে এই কথায় সম্যকরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রভৃত্তে।

পাঠক দেখিলেন, অর্জুন নাগরাজ-কর্তা উলুপীকে প্রিবা-করিবার পরই মণিপুররাজ্যকর্তা

চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্বপ্রিয় প্রধিকার পণ্ডিতেরা মহাভারতের কথায় নিম্নের করিয়া নানাপ্রকার অম্মনয়ন করিতে পারেন। হয়ত তাঁহার্য বলিবেন; মণিপুরের উত্তরপ্রান্তে এখন যে নাগা-প্রদেশ সেয়া যায়, উহাই উলুপীর পিতা নাগরাজ কৌরবের রাজ্য ছিল। অর্জুন প্রথমে নাগরাজ-কর্তাকে বিবাহ করিয়া, পরে আসিয়া মণিপুর-রাজ-কর্তাকে বিবাহ করেন। প্রথকদেরা বলিবেন, উই রাজ্যই পরম্পর সংলগ্ন ছিল, এখনও ত রহিয়াছে। তাহার পর দেখ, নাগবংশীয়েরা মণিপুর-বংশীয়দিগের বৈমাত্রেয় বংশজ; তাই তিনি বিবাহ বিবাহ্য চলিয়া আসিয়াছিলেন। আধুনিক ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়, ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে পামহাই নামে একজন নাগা মণিপুরে রাজা হন। প্রথকদেরা বলিবেন, নাগবংশীয়দিগের মণিপুররাধিকার এই নতুন নহে; পূর্বেরও অনেকবার হইয়াছিল। উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের এই উই স্ত্রীর ভিত্তর যে, সম্ভাব্য জিন্দা না, তাহা অর্জুন-বংশবাহনের যুদ্ধেই; প্রায়তঃবাহনরা স্থির করিবেন। উলুপী যে, অর্জুনকে ভীষ্মব-জনিত গন্ধা ও বহুদিগের আক্রোশপ্রবল অভিসম্পাত হইতে মুক্ত করিবার জন্ত, পুত্রহন্তে নিপাতিত করিয়াছিলেন, পুরাতত্ত্ব-প্রিয় পণ্ডিতেরা হয়ত তাহা স্বীকার করিবেন না। তাহার উপস্থায়ী কার্যে কেবল 'সপত্নীভাবেরই' উপলব্ধি করিবেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে স্থির হইবে, নাগারা মণিপুরীদিগের বৈমাত্রেয়বংশজ, তাই ঘন ঘন বিবাহ, আর্য-মধ্যে মধ্যে সম্ভাব্য, তাই এখনও মণিপুর-রাজ্যে অনেক নাগবংশীয় প্রজা।

আসাম একল পুরাতত্ত্বজ্ঞপিকের আসামিা-প্রকাশনে একটা হুযোগ দিয়া রাখিলাম। নাগা ও মণিপুর রাজ্যের প্ররত্ববিধিগে—উলুপীর সে মণিবিদ্যে—মণিপুরের নামবিদ্যে—ইহার্য এখন অনেক প্রকার বিদ্যাপ্রকাশ করিতে পারিবেন। আবার মহাভারতে দেখা যায়, উলুপীর পিতা নাগরাজ কৌরবা ঐরাবৎবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ভাগবতে দেখা যায়, উলুপীর গর্ভে অর্জুনের ইরাবতী নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। বঙ্গের পাণ্ডভাট্টা প্ররত্বজ্ঞো বলিবেন; 'ঐ দেখে ঠিক হইয়াছে'। ব্রহ্মের যে ইরাবতী নদী, তাহাও নাগ-পাহাড়েই দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; উলুপী-সময় ইরাবতের নামই নদীর নাম ইরাবতী হইয়াছে; যেমন ভগীরথের জন্ম ভাগীরথী। আর, দেখে হয়,

ভগীরথের জন্ম অর্জুনপুত্র ইরাবত ও ব্রহ্মক্ষেত্র-সমরে হইত আখ্যায় ব্রহ্মনদিগের মুক্তার ইরাবতীকে ব্রহ্মের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের জ্ঞাপনও ত ঐ দিকে ছিল। ভগীরথের যেমন কপিল, ইরাবানের সেইরূপ বশিষ্ঠ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথাই এখন পাণ্ডভাট্টা প্ররত্বজ্ঞোদেরা বলিতে পারিবেন। আসামিা কিন্তু, প্ররত্ব ও পুরাণ ছাড়িয়া, ইংরেজের ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করিতে চলিলাম।

ইতিহাসে।

মণিপুরের পূর্বকথা ইংরেজের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না; যাহা কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই কেবল অম্মনয়ন। ইংরেজ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে আসিয়া যেন ইতিহাসের সূত্র ধরিতে পারিয়াছেন। জ্ঞানর হস্তের বিগতহেঁদে—ঐ সময়েই পামহাই নামে একজন নাগবংশীয় আসিয়া মণিপুরের সিংহাসনে অধিকার করেন; মণিপুরের রাজা হইয়া, তিনি পরী-নবাঙ্গ নামে পরিচিত হন।

পরী-নবাঙ্গ অনেকবার ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা অধিকার করিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, জয়সিংহ মণিপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি কে, তাহার পরিচয় ইংরেজ দিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহারই সময় ব্রহ্মদেশে মণিপুর আক্রমণ করে। এই সময় হইতেই নাকি ১৭৬২ সালে ব্রহ্মদেশে ইংরেজের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। আর সেই যুদ্ধেই নাকি ইংরেজ একটা সন্ধিরও যোগাড় করিয়া লইয়াছিলেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড আমহারস্ট প্রথম ব্রহ্মসমরে প্ররত্ব হন। সেই যুদ্ধ উপলক্ষে ব্রহ্মদেশে কাছাড়া, আসাম এবং মণিপুর আক্রমণ করে। তখন গবর্নরসিংহ মণিপুরের রাজা। তিনি ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, ইংরেজ জও কয়েকজন সিপাহী ও কয়েকটা কামান পাঠাইয়া দিলেন; আর মণিপুরীদিগকে লইয়াই একটা সেনা-প্ররত্ব করিলেন। সেই সেনায় ইংরেজসেনাই প্ররত্ব করিলেন। সেই সেনায় ১৭৬২ সালে প্রথম দিগবর্তে মণিপুরে আসিয়া গেল; মণিপুরও ব্রহ্মের, অধীনতা হইতে মুক্ত হইল। ১৭৬৪ সালপর্যন্ত আর কোন গোলামগোণ ঘটিল না।

১৭৬৪ সালে গবর্নরসিংহ মানসীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্তি সময়ে একবৎসরের শিশু, সুতরাং গবর্নরসিংহের ভাতা নরসিংহই মণিপুরভাগ করিতে লাগিলেন। মণিপুরের অধিকৃত কিংদশ ব্রহ্মরাজ্য ১৭৬৩ সালে ইংরেজ ব্রহ্মরাজকে দিয়াইয়া সেনা, কিন্তু তখনও মণিপুরে বঙ্গর বৎসর ৩৩০ টাকা ইংরেজ কর্ণেও খাজনা বঙ্গর বৎসর থাকেন। ইংরেজের, শুদ্ধ ব্রহ্মদেশ সেই রাজ্যশ-টুকুর জন্ত মণিপুরকে বৎসর ৬০০০ টাকা দিতে থাকিলেন এমন নহে, ১৭৬৪ সালে মণিপুরে প্ররত্ব বট্টশি পুণ্ডিতিকের একেটা রাখিবার ব্যবস্থা হইল। সেই অবধি অদ্য পর্যন্ত মণিপুরে বট্টশি একেটের দর্শন পাওয়া গিয়াছে। নরসিংহ দিল্লিহে—ভাটপুত্রের রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন, এমন সময়ে ১৭৪৪ সালে তাঁহার প্রতিকূলে 'একটা যমজ হইল। বালক রাজা চন্দ্রকীর্তি জন্মকর্তেও সেই যমজকে সংলগ্ন বলিয়া স্থির করা হইল, সুতরাং তাঁহাকে পুত্র লইয়া কাছাড়ে পলাইয়া আসিতে হইল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নরসিংহের মৃত্যু হইল এবং তাঁহার পুত্র বেবেসিংহই রাজা হইলেন। ইংরেজও তাঁহাকেই মণিপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনমাস বাইতে না বাইতেই প্ররত্ব রাজা চন্দ্রকীর্তি সৈন্যে মণিপুরের দিকে অভিযান করিলেন; তখন বেবেসিংহ সিংহ কাছাড়ে পলাইয়া আসিলেন। চন্দ্রকীর্তি শৈবক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, ইংরেজও ১৭৬১ সালে তাঁহাকেই মণিপুরের রাজা বলিয়া মানিয়া গইলেন।

গুবর্ণাল—বৈমাত্রেয়বিবাদ চন্দ্রকীর্তির সময়েও অনেকবার হইয়াছিল; চন্দ্রকীর্তিকে কিন্তু কেহই সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন নাই। ১৭৬৬ সালে যে গুবর্ণালবিদ্যা ছিল, চন্দ্রকীর্তির সময়ে, তাহার পর আর কোম্পানি বিদ্যা পড়ে নাই। চারি বৎসর হইল, চন্দ্রকীর্তি ইংলোকে পরিচ্রাণ করিয়া গিয়াছেন। ১৭৮১ সালে ইংরেজ যখন নাগরাজ প্ররত্ব হন, তখন চন্দ্রকীর্তি ইংরেজের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, তখন চন্দ্রকীর্তি সৈন্যভাগ ইংরেজের সাহায্য করিয়া, নাগারা যখন ইংরেজের কহিয়ার্স আক্রমণ করে, তখন চন্দ্রকীর্তি সৈন্যভাগ ইংরেজের সাহায্য করিয়া ছিলেন। ইংরেজও তাঁহাকে'কে, দি, এম,আই উপাধি দিয়া আশ্বাসিত করিয়াছিলেন। বিগত ব্রহ্মসমর উপলক্ষে যখন কতিপয় ইংরেজ মণিপুরপ্ররত্ব ব্রহ্ম-যোদ্ধাদিগের হস্তে পতিত হন, চন্দ্রকীর্তির সৈনিকের তখনও ইংরেজগণের সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রায় ৪ বৎসর হইল, চন্দ্রকীর্তি মহা হইয়াছে। হুই পতীর গর্ভে তাহার ১ পুত্র। একপক্ষে শূরচন্দ্র প্রভৃতি পাতকন; অন্যপক্ষে কুলচন্দ্র, টাকেশ্বরি, কুলচন্দ্র এবং আর একটা জটিলনাম—এই ৪ জন। শূরচন্দ্রই পৈতৃক সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। কিন্তু বিপুল আশ্রমসম্মে বৈমায়েয়-ভরে তাঁহাকে পলাইয়া আসিতে হইয়াছে। তিনি ও তাঁহার সহোদরপুত্র এখন কলিকারায় আছেন। পলাইবার পূর্বে শূরচন্দ্রকে সিংহাসনের দাবী ছাড়িয়া দিয়া আসিতে হইয়াছিল। রাজ্যভাঙা হইয়া বৃন্দাবনে বস করি, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, তবে তাঁহাকে নিস্তার পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু শূরচন্দ্র তাঁহাকে বান নাই, রাজ্যের মায়াও পরিত্যাগ করেন নাই। শূরচন্দ্রের নির্দেশে ফোটে বৈমায়েয় কুলচন্দ্র রাজা হইলেন, কিন্তু নামে; কাজে রাজা হইলেন মধ্যম টাকেশ্বর। তিনিই মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি, তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর। রাজ্য পূর্ববর্ত চলিতে লাগিল। ইংরেজও কুলচন্দ্রকেই মণিপুরের রাজা বলিয়া মানিতে সম্মত হইলেন, বরাবরইও তিনি যখন রাজা হইয়াছেন; ইংরেজ তাঁহাকেই রাজা বলিয়া মানিতছেন। যখন নরসিংহ জাতপুত্রের সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন, তখন ইংরেজ তাঁহাকেই মণিপুরের রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন; তাহার পুত্র বেলেম-সিংহকেও রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। আবার চন্দ্রকীর্তি যখন সেনাপতিতে তড়িয়া দিয়া সিংহাসন লইলেন, তখনও ইংরেজ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। চন্দ্রকীর্তির পর তৎপুত্র শূরচন্দ্রকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শূরচন্দ্র নির্মমিত হইবার পর, তৈমায়েয়-কুলচন্দ্রকে বা রাজা বলিয়া না মানিলেন কেন? কিন্তু এবার যিনি বিভাট ঘটাইলেন। বিভাটের কথা শুনে কহি; এখন রাজ্যের অবশিষ্ট কথা।

রাজত্ব

মণিপুর রাজ্যের রাজত্ব বড় অধিক নহে। দান-চাউলেই অনেক রাজত্ব দিয়া থাকে; কিন্তু আজ কাল দুয়ারও চলন হইয়াছে। পূর্বেরি বলাগাতি, মণিপুরের নামান্ত টাকশালে কেবল কুন্দ কুন্দ তাম্র-মুদ্রাই প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার ভীষণ আমোদে ১ পদা। ভাড়াভের ও ব্রহ্মের সৌখিন্যেও মণিপুরে চলিয়া থাকে। মণিপুর-রাজ্যে সজাতিতে কত

টাকার রাক্ষস আদায় হয়, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু শোনা যায়, মুজায় আদায় হয় বৎসর ৩০ হাজার টাকার অধিক নহে। বর্ষট পুত্রও অধিক নহে; রাক্ষস-চরিতারা সরকার জমি জরাত ভোগে দখল করিয়া থাকেন।

আদালত

মণিপুরে দুইটা বড় আদালত আছে; একটা মাধারন অপরটা সামরিক। মাধারন বিচারালয়ে মাধারন প্রজার মাগনা মোকদ্দমা থাকে থাকে। ইহার নাম চিরাপ। চিরাপ বা মাধারন বিচারালয়ে ১০ জন প্রবীণ বিচারপতি থাকেন; সকলেই রাজার নিযুক্ত।

সামরিক বিচারালয়ে ৮ জন প্রবীণ বিচারপতি অধিবেশন করিয়া থাকেন, সকলেই উচ্চপদস্থ নানা। এ আদালতে শুধু সামরিকবিধেরই বিচার আচর হইয়া থাকে।

শুধু নারীজাতির জন্ম একটা বড় আদালত আছে। ইহার নাম পাঙ্গা। পুত্রীপীড়ক, পুত্র-দগিককে এই আদালতে হাইতে হয়। স্ত্রীলোক-দগিককে, বাচ্চাদগিক হইলে, এই আদালতের বিচারমান হইতে হয়। স্ত্রীলোকের অজ্ঞাত বিচারও এখানে হইয়া থাকে। কিন্তু গুরুতর মাগনা মাধারন আদালতে অর্থাৎ উচ্চতরপে আপীল হইয়া থাকে।

গো-মোষদি লইয়া বিবাদ বিসংবাদ হইলে, বা অস্ত্রাশ্রয় গোষ্ঠা বিবাদ ঘটিলে, একপক্ষে বড় আদালতে আসা—সহজ বা স্ববিধানক নহে; হুতরাং অনেকগুলি ছোট আদালতও রাহিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া মণিপুরে পকার-প্রাণী-লীর আদর আছে। পকারতেও অনেক মোকদ্দমার মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু পকারতগুলি শুধু বিবাদ মিটিয়াই নিশ্চিত নহে। প্রাণীমোহে কাহারও হুতরের দশা হইলে, রোগ ব্যাধি হইলে, পকারতকে মাংসাঘ করিতে হয়; অসমর্থ অসম্পন্ন লোকের মৃত্যু হইলে, দাঃসংকারাদিও আয়োজন করিয়া দিতে হয়।

বিচারপ্রথা প্রশংসনীয়; পকারতপ্রথাটা অতীত প্রশংসনীয়। সেই দুঃখ মণিপুরে বড়ই কম। লিলাভে সামর্থ্য নাই, স্রোভাবে অর্থ কাহা-কেই দিতে হয় না; ততরূপ কষ্ট পাইতেও হয়

না। রাজধানীতে একটা কারাগার আছে—তাহাতে শতাবধি বন্দীও থাকিতে পারে; কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র কারাগারও বানি পড়িয়া থাকে। মণিপুরে যোগে হয় কেবল ‘শ্রুতে’ শুভরতা শ্রুতি। মণিপুরের বিচারে কারাগার অপেক্ষা বৈদ্যগুরুই পদার অধিক।

সৈন্য সামন্ত

মণিপুর কুন্দ রাজ্য; নিজ মণিপুর উপত্যকায় ১ লক্ষ ৩০ হাজারের অধিক লোক নাই। পাষাণী বন প্রভৃতি লইয়া দুই লক্ষ ২১ হাজার। মণিপুর চারিদিকেই পর্বতপ্রাচীরে বেষ্টিত; পথ ষাট অধিক নাই। নাগা, কুকি প্রভৃতির অভিযান হইতে রাজ্য বন্ধা করিবার কাজ অধিক সৈন্যের প্রয়োজন নাই। ব্রুটিশ-চমুর গতিরোধ করিতে পারে, এমন সেনা মণিপুরে কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারে না। আর, ইংরেজই বা অধিক সৈন্য রাহিতে দিলেন কেন? হুতরাং মণিপুরে আছে ৫৬ হাজার পদাতি সৈন্য, ৫০০ আশাঙ্গ পোললাজ বা কামানী সৈন্য, আর ৪০০ আশাঙ্গ কুকুগুয়ার সৈন্য। হটর বলেন, ইং ছাড়া ১০০ আশাঙ্গ কুকিপটন আছে। কিন্তু এখন কোন কোন এলোইণ্ডিয়ান সহযোগী বলিতেছেন, কুকিসঙ্গ আছে ১০ হাজার। কোথায় ১ শত, আর কোথায় ১০ হাজার। রহস্ত বুলিলাম না।

কুকি মণিপুরীরা বীর সাহসী যুগপ্ত; পার্শ্ব-ভাগে তা বিশেষতঃ। তাল না পাপক, এরূপ গুরু করিতে অনেকেরি পারে। বনুক বারসেরও উহার বৃহত জানে। ইংরেজের কাছেও মণিপুর-রাজ মধ্যে মধ্যে বনুক ও দুই একটা কামান উপ-হার পাঠাইয়াছেন। তাপাশি, মণিপুরের অস্ত্রবল অতি দুর্বল; যোদ্ধাগণও প্রবল নহে। ব্রুটিশ সিংহের কাছে মণিপুরী মহিষদিগকে যে শেষে যেখান গড়াইয়া গড়িতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান বিভাটের কথা পরে কহিতেছি।

মণিপুরে বিভাট

মণিপুরে বৌর বিভাট—চারিদিকে ঘোর আশঙ্কা। আসামের টাকশালের ইংল্টন, পাইলস নিজে বন্দী; সবে আছেন সেনাপতি স্কান, সর্গাতিগকে একেই গ্রিম্‌উড, সেনানী সিম্‌সন এবং তার-

শিতাণের মেলুকিল। মেজেক্টর কবিন্সেরও নাকি কোন খোজ খবর নাই। বন্দীরা জীবিত আছেন কিনা, সে বিষয়ে বিশদণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরেজরাজ উত্তেজিত হইয়াছেন। চারিদিক হইতে সৈন্য হাইতেছে; মণিপুর পৌছিতে কিং অনেক মিলস্‌ বটিল; পথ অনেক, পথ দুইটি। সমগ্র মণিপুর রাজ্য বিচলিত; সেনাপতি টাকেশ্বর প্রাথমপনে লাগিয়াছেন। তাঁহার অনেক উপকূল সহ-কারী আছেন, স্বাধীনতা মুচিয়া হইবে, হুতরাং সর্ববর্ষেরি প্রতিজ্ঞা—যে প্রাণ দিলেন। ইংরেজ বলিতেছেন, মণিপুরে ৩০০৫ হাজার বোকা প্রস্তুত হইয়া আছে। মণিপুরে, ইংরেজ বিনা যুদ্ধে অধিকার করিলেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। দুই একটা বোরতর দুই হইবে; মণিপুরে শোণিত-প্রাধান হইবে। তাহার পর ইংরেজ ‘বিকারী হইলেন সত্য, মণিপুরীদিগের সর্বদান হইবে সত্য, কিন্তু বিভাট যে সবে মিটিবে না, তাহাও অধিকতর সত্য। বিভাটের কথা ভাল করিয়া কহিবার জন্য তাহার কারখণ্ডা পঠিত-দিগকে জানাইয়া রাখা উচিত। সেই কারখণ্ডের কথাই এইবার কথিত হইতেছে।

কারণের কথা

পুর্বেই বলিয়াছি, বৎসর চারি হইল, মণিপুরের রাজা চন্দ্রকীর্তি ইংলোকে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। প্রথমপনে তিনি দুই পক্ষে ৩টা পুত্র রাখিয়া যান। নতুনপক্ষে শূরচন্দ্র প্রভৃতি পাতকী; দ্বিতীয় পক্ষে কুলচন্দ্র, টাকেশ্বর, কুলচন্দ্র এবং আর একটা। প্রথমপক্ষের শূরচন্দ্রই শিতার মুজুর পর রাজা হইয়াছিলেন। রাজা হইয়া তিনি বৈমায়েয়দিগকে উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; ফোটে বৈমায়েয় কুলচন্দ্রকে মন্ত্রী করিয়াছিলেন। মধ্যম টাকেশ্বরকে সেনাপতি করিয়াছিলেন।

তিন বৎসর এইরূপ ব্যবস্থার রাজ্য করিবার পর, বিপাত আশিন মায়ের প্রথমমই, শূরচন্দ্র টাকেশ্বর হইলেন। মধ্যম বৈমায়েয়—সেনাপতি বিশেষ-জিতের বিদেষভাজন হইয়া, শূরচন্দ্রকে লিপনে প্রজ্ঞিত হইল। মন্ত্রী কুলচন্দ্র এবং তাঁহার সূত্রো-বরষকও কাজেই সেনাপতি মধ্যম সহোদরের সঙ্গে যোগ দিতে হইল।

ষ্টিক বি' কারণে মধ্যম বৈমায়েয়, শূরচন্দ্রের

উপর মহসা বিরূপ হইলেন, তাহা স্থির করা যায় না; কেন না প্রকৃত সহজ কাহারই মুখে প্রকাশ পায় না। কিন্তু অনেকই অবগত আছেন, সেনাপতি ট্যাকেন্সজিৎ সৰ্ব্ব ভাটার অপেক্ষা চতুৰ, সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং রাজনীতি-বিশ্বজ্ঞ; আর 'বীরপুংকব' বলাইই তিনি শূরচন্দ্র কর্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

ট্যাকেন্সজিৎ কিছু 'উগ্রপ্রকৃতি' লোক, মধ্যে মধ্যে উগ্রভাৱও পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু অসামান্যতাময় সহযোগীরা এখন তাঁহার উপর যে সৰ্ব্বলক্ষ্য নিষ্ঠাভাবি বোধের কারণ করিতেছেন, তাহাতে মহসা বিবাস করা যাইতে পারে না। কিন্ত ইহারা অনেক কথা কহিবেন; পূৰ্বে একই কাহারই মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

ট্যাকেন্সজিৎ বহুদূর প্রকৃতি লোকই হইল, বটেশ পলিতিকেল একেট গ্রিম্‌উডের সহিত কিছু তাঁহার সন্মিলন ছিল। 'আজ নব্বই, বধুন তিনি রাজা শূরচন্দ্রের বিরুদ্ধে বড়দর করেন, তখন পলিতিকেল মহাশয় শূরচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই; কেহ কেহ বলিতেছেন, বরং তিনি ট্যাকেন্সজিৎকে পক্ষেই সহায়ত্বিত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এ কথা সভ্য কি না তাহা ভগবানই জানেন; আর সেনাপতি ট্যাকেন্সজিৎ পলিতিকেল গ্রিম্‌উডের উদ্দেশ্যে পাঠিয়া শূরচন্দ্রকে নির্দোষিত, করিয়াছিলেন কি না, তাহাও ভগবান জানেন। কিন্তু জনবর এখনও সে বিষয়ে পলিতিকেল গ্রিম্‌উডকে দোষী করিতেছে।

সে বাহাই হউক, আপনি মাসের ৬ই তারিখে রাজা শূরচন্দ্রকে সেনাজেয় ট্যাকেন্সজিৎকে জয় বিধি হইতে হইল, তাঁহার প্রাণ লইয়া টানটানি পড়িল। সে সময়ে যদি পলিতিকেল গ্রিম্‌উড চেঁচাই করিতেন, তাহা হইলে, হত শূরচন্দ্রের সেরূপ দুৰ্দ্ধশা ঘটিত না। তিনি পড়িলেন বিপাকে। সেনাপতি ট্যাকেন্সজিৎ হস্তে সেনা, তাঁহার পক্ষই প্রবল। রাজ-পুংকবের ভিতর দ্বিধারা তাঁহার পক্ষে সেনা না দিয়াছিলেন, তাঁহারও ভীত চকিত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই শূরচন্দ্র একেবারেই হীনবল হইয়া পড়িলেন, সেনাপতি বৈদ্যজ্ঞানের হস্তে তাঁহারে সমাহার এবং সপরিবারে বন্দী হইতে হইল। তখন আর প্রতিকূলতা করিবার অবসর

রহিল না। শুনিতে পাই, শূরচন্দ্রকে বন্দাবনপ্রাচীর নাম করিয়া, সিংহাসন ছাড়িয়া গিয়া আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন তিনি বলিতেছেন, 'আমি একেবারে জয়ের মত সিংহাসন পরিত্যগ করি নাই। বধুন মণিপুর ছাড়িয়া শিশচ্যারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন পলিতিকেলের কাছে সিংহাসনভালের পত্র পাইলাম। আমি ইচ্ছাপূৰ্ব্বক সিংহাসন ছাড়িয়া আসি নাই।' এ বিষয়ে বীমাংসার এখন প্রস্তাব হইব না; হইলে ফলও পাইব না। এখন কথা, হইতেছে উপস্থিত বিষয়টী লইয়া।

শূরচন্দ্র সারোবরপাশে সঙ্গ লইয়া সপরিবারে কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বড়লাটের কাছে আশ্রয় লইলেন। ইংরেজ রাজের সাহায্যে পৈতৃক আশ্রয় লইলেন। করিবেন বলিয়া আশা করিলেন; প্রার্থনা করিলেন। আশা ও প্রার্থনা কিন্তু পূর্ণ হইল না।

বড়লাট শূরচন্দ্রের আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু মণিপুর বিষয়ে উদারমান রহিলেন না। মণিপুররাজার সহিত আসামবাসিন্দেবের সাক্ষাৎ রাজনৈতিক সম্বন্ধ; বড়লাট আসামের ট্যাক কনিশ্বর হুইটন সাহেবকে কলিকাতায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। হুইটন কলিকাতায় আসিলে, তাঁহার সহিত বড়লাটের মণিপুর বিষয়ে অনেক পরামর্শ হইল। 'এখানেই গিম্‌উড-মুখে এবং এখানেই গিম্‌উড-পত্রে প্রচার হইল; 'হুইটন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—চাকর আইনের আলোচনা করিতে; অল্প উদ্বেগ নাই।' 'ফলাফলসম্মতঃ প্রস্তাভঃ সম্মতঃ প্রাক্তনা ইব।' রাজনৈতিক রহস্য এইরূপেই গুপ্ত করিয়া রাখিতে হয় বটে।

হুইটনের মণিপুরযাত্রা।

মণিপুর যাত্রা বড়লাটের আদেশ লইয়া হুইটন আসামে প্রভাৱস্থ হইলেন; হইয়াই কিন্তু মণিপুর যাত্রা করিলেন। প্রকাশ, তাঁহার সঙ্গে চলিল ৪৭ জন গুৱাখা সৈনিক, এবং পাঁচ মিত্র সেনানী। ডাকার প্রভৃতি অনেক ইংরেজ রাজপুংকব। হুইটন সৈমধ্যে পাঁচ মিত্র সমাজিয়ারে ৮ই জেড ২১ নং মার্চ মণিপুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ১১ই জেড পলিতিকেলের প্রাচীরে বসিয়া দরবার করিলেন; দরবারে বন্দাবন রাজা কুলচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি হাজির হইলেন

না। বড়লাট ৮ই জেড হুইটনকে যে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় মণিপুরে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

বড়লাট আদেশ করিয়াছিলেন, 'সেনাপতি ট্যাকেন্সজিৎকে বন্দী করিবে। শূরচন্দ্রকে নির্যাসিত করিবার সময়, বাহারা ট্যাকেন্সজিৎকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাও বিধেও বন্দী করিবে। কুলচন্দ্র যদি এই ব্যপস্থায় সম্মত হন, তবে তাঁহাকেই সিংহাসনে রাখিবে; অস্বস্তা হইলে স্তব্ধরূপে বধ্যতা করিবে।'

হুইটন মণিপুরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, আদেশ-প্রতিপালনের আয়োজন হইল; হস্তান্তর কুলচন্দ্র আর হুইটনের দরবারে আসিতে মাংস করিলেন না। 'সহোবর বন্দী হইলেন, আমারই বা দুৰ্দ্ধশা না ঘটবে কে বলিল?' বোধ হয় এরূপ মনে করিয়া কুলচন্দ্র দরবারে আসিতে পারেন নাই, আর সেনাপতি ট্যাকেন্সজিৎকে বন্দী করিয়া দিবার ইচ্ছা থাকিলেও ততদূর সাহস যে, কুলচন্দ্রের ছিল না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। বশতঃ সেনাপতি ট্যাকেন্সজিৎ মণিপুরে মধ্যে প্রধান পুংকব; তিনিই তখন প্রকৃত রাজা।

সেনাপতির উদ্দেশ্যে অভিযান।

কুলচন্দ্র দরবারে হাজির হইলেন না; সেনাপতি ট্যাকেন্সজিৎ আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন না; বেরিয়া হুইটন জেয়ে প্রভ্রমিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সেনাপতি কর্ণেল স্কীনের উপর আদেশ হইল; 'যাও, রাজপ্রাসাদ হইতে সেনাপতিককে গ্রেপ্তার করিয়া আন।' রাজা কুলচন্দ্রকেও গ্রেপ্তার করিবার আদেশ হইল কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু আমাদের পাঠকগণ অন্যান্যসেই অনুমান করিতে পারেন।

হুইটনের আলস্য কর্ণেল স্কীনকে তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য করিতে হইল। রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিবার জন্ত তৎক্ষণাৎ যুদ্ধসজ্জা হইল। সেনাপতি তাঁহাকেই বেরিয়ার অভিযান করিলেন; কর্ণেল স্কীনও উদারমান রহিলেন না। কত ঠান্ডা অভিযানে চলিল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু ইংরেজের মুখে প্রকাশ, ২৫০ জন গুৱাখা লইয়া, রাজ-

প্রাসাদ আক্রমণ করা হইয়াছিল। হুইটনের সেনা ছিল পলিতিকেলের রেসিডেন্স-ভবনে। রাজপ্রাসাদ তাহার উত্তর পশ্চিমে। এইবার রাজপ্রাসাদও রেসিডেন্স-ভবনের অবস্থানাদি-বিষয়ে একটী অভ্যাস দিয়া রাখি।

মণিপুরের রাজপ্রাসাদ প্রশস্ত প্রাচীর জড়িয়া আবৃত্ত। প্রাসাদটাই যেন একটা নগর। যত বড় কড়-রাজপুংকবের ভবনও এই প্রাসাদের চারি পার্শ্বে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের চারিদিকে প্রাচীর, প্রাচীরে মুদ্রা হইলেও, একান্ত স্বচ্ছতা নহে। রেসিডেন্সের দিকে প্রাসাদ-প্রাচীরের বাহিরে পুরণিা আছে। রেসিডেন্স হইতে বাইবার সমস্ত সেই পুরণিা পার হইতে হয়। প্রাচীরের উপর কামান আছে। পুরিা পার হইয়া ফটকে ঢুকিতে হয়; সেই ফটক দিয়া কিয়দূর গমন করিলে, আবার ফটক। এই প্রাচীরের ভিতর প্রকৃত প্রাসাদ। প্রাচীর চারিদিকে। ডিন দিকে তিনটা ফটক—ফটকের কজু কজু রাজপথ। উত্তরদিকে ফটক বা রাজপথ নাই। মণিপুরের হত রাজপুংকব রাজনীতি-বিজ্ঞ।

পলিতিকেলপ্রাসাদ হইতে রাজপ্রাসাদে; বাইবার মধ্যস্থলে রাজধানীর সর্বপ্রথম রাজপথ; তাহার বিস্তার ৩০ ফুট। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ পূর্বে পলিতিকেলভবন। প্রায় মধ্যস্থলে প্রাসাদ; চারি দিকে প্রাঙ্গণ। পলিতিকেলপ্রাসাদের উত্তরদিকে কুল; কুলের পশ্চিমে হাসপাতাল। বড় ফটকের পশ্চিমে পটনের বারিক। পলিতিকেলের রক্ষী সৈনিকগণ এই বারিকে অবস্থান করিয়া থাকে। পলিতিকেলপ্রাসাদের পূর্বদিকে অবশ্যল। তাহার দক্ষিণে, প্রাচীরের বাহিরে, একটা নাপদস্তা। সর্ব-দক্ষিণে ৬০ ফুট প্রশস্ত পুরিা। পলিতিকেলপ্রাসাদের পশ্চিমে দিকে গোলা বেলিবার প্রবল চত্বর। পলিতিকেল-প্রাসাদের বাহিরে পশ্চিম দিকে বাজার। বাজারের আরও পশ্চিমে আরও নাপদস্তা। রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দিকে কহিয়ার পথ, পূর্ব দিকের পথ যিহাছে ক্রমের দিকে, টামু পথান্ত। এই পথের ধারেকী লেংটাংবালের বাঁটা। রাজ-প্রাসাদের অবস্থান 'বিষয়ে পাঠককে এরূপকণ অভিজ্ঞতা জন্মিল; এখন চান অনুমান-সেনা-সম্মত সবে যাও।

১১ই জেড ১১ই জেড—কোন দিনে, সেনাপতিককে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত, অভিযান হইয়াছিল,

হুইজেন প্রভৃতি বলায় প্রাপ্যপ্রাপ্ত আছেন
কি না, তাহা ভাবিয়াই জ্ঞানার আশ্রয় হয়তাই।
ইহাংশের প্রাপ্য বহুদেবে হয়। ধর্ম্মিণে, মণিপুরে
অনুই একবারে পুড়িয়াছে, স্বাধীনতার কথা
বলিতছি না—সেতার গুণিয়াই আছে; মণিপুরের
বিশেষের আশ্রয় করা ভায় যদিও; কবে কবে
বলিতেছেন, হুইজেন প্রভৃতি মণিপুরী সেনাপতি
বলী করিয়া রাখাচ্ছেন। নতুন, ইংরেজের ভাষা
আশ্রয়ের পক্ষে একই অমূল্য সক্তি রাখিয়া
লইয়া ইহাওঁদিকি জাতিয়া গিয়েন। নিরীক্ষিত
মহারাঙ্গও এখানে এই কথা বলিতেছেন। কথায়
কথায় নির্ভর করা হইতে পারে। আর এগুল
কর্তব্য নির্ভর করিতে বই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কি পোহাতির এলোইগুয়ান সংবাদদাতা
এ আশাতেও ছাই দিতে চানেন।' তিনি বলেন,
মণিপুরের সেনাপতি 'অনেক দুদিন, ছাইতেই রাঁচি-
বুসকে' বিবর্তি হইয়াছেন; অনেক দিন হইতেই
বুদ্ধসকল কষ্টক্ৰিয়িতেন; আর কলিকাতা পর্য্যন্ত
তাহাদের ধবরাধবর চলিতেছিল। এলোইগুয়ান
সংবাদদাতাও, নিরাসিত 'মহারাজকেও যত্নে
টানিতে চান, তাহা তাঁহার কথার স্পষ্টই বুঝ
হইতেছে।

মণিপুর অনেক দিন হইতে বড়বয়স মুদ্রাসঙ্কীর্ণ
চলিয়াছে, কলিকাতা পর্য্যন্ত বকবাক হইয়াছে,
আর পলিটেকনিক গ্রিমউড মণিপুরে থাকিয়া তাহা
জানিতে পারেন নাই; এখানে বড় লাঠি বা তাঁহার
কোন রাঙ্গাপুঙ্খ জানিতে পারেন নাই; ইহা ত
মহল্লাে বিবাস করিতে পারা যায় না! ইংরেজের
গুপ্তনীতিই আছে জানিতে পারেন না, অস্তের গুপ্ত
নীতি ইংরেজ জানিতে পারেন না, ইহা কিরূপে
মনে করি ?

নির্ধারিত মহারাজ বসেন, আমাকে মণিপুর
পাঠ্যেই ফিটাই সময়েই মিটিতে পারে, মণিপুর
এঞ্জার আমাকে বেবস্ট না ভক্তি করে। কিন্তু
ইহায়েৎ, ইহার কথাও এখন কর্পাত করিবেন
না, তাহা স্থির। পাছে বড়লাট নির্ধারিত মহা-
রাজের স্বজ্ঞাত বাক্যে বিরল্য করুন, তাই কি
সোহাস্তার এলোহিৎমান সংবাদদাতা নির্ধারিত
মহারাজকেও, যড়য়ে 'টানিয়া, বড়লাটের
বিদ্রোহবাস করিতে চাহেন? অভিনবের
সৌভ নেবির্য আমরা ইহা স্থিরইহা স্থির। ইহায়েৎ
যে, এখন আর কাহারই মান্তিকথা কর্পাত

করবেন না, তাহা স্থির। মণিপুর আক্রান্ত এবং
মণিপুরী-প্রজাতিগণকে বিধ্বস্ত করা হইবে; মণিপুরের
বর্তমান রাজা কুলচন্দ্রকে বিনা হইতে হইবে;
তৎসহোদর সেনাপতি, টীকেশ্বরজিতের দফা রক্ষা
হইবে। তৎসহযোগীদের ভবিষ্যৎ দুর্দশা ভাবিলে,
দাঁদোচাদের স্বপ্ন দেখিতে হয়; মণিপুরের ভবিষ্যৎ
ভাবিলে অন্ধকার দেখিতে হয়।

ইংরেজ জোরে যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন। চতুঃদিক
সেনা সজ্জিত হইয়া মণিপুর উদ্দেশে যাত্রা করি-
তেছে। বাহা কোন যুদ্ধে কোন নাই, এমার ত্যাত
হইতেছে। রাজপুত্র সখের সেনা মণিপুর যাত্রা
করিয়াছে। কোনদিকেই অস্ত্রহানি হইবে না।
কুইটমের সঙ্গে সঙ্গে সেনা গিয়াছিল বিয়াই
বিজাত ঘটয়াছে। তাই গার্মসেট এখন বাত
পারিতছেন, ভত ভৈম মণিপুরের দিকে চালাইয়া
দিতছেন। জমের পর ঐহুপই হইয়া থাকে।
রোগের প্রথমে উদাসীন থাকিবা, অনেকই শেখ-
কালে ডাক্তারে বাড়া পুরিয়া কেগেন।

সৈন্তযাত্রা ।

তিন দিক দিয়া অভিযান হইবে। মণিপুরের উত্তরে নাকচাংগেশের প্রান্ত সীমায় ইংরেজের কথিয়া ছাউনি। অভ্যন্তরে সেখাংই প্রধান রক্ষাল। বঙ্গের দিক হইতে বড় সেনা বাই-তেছে, সঙ্গেই গিয়া কথিয়া উপনিহত হইবে। আমায়ে প্রধান সেনাপতি জেনারেল কলট সেই দিক বাজা করিয়াছেন। তিনিই মণিপুরাভি-যানের প্রধান ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কুইটনে পূর্ব লেফটেন্যান্ট কুইটন তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন; পিতার উদ্দেশ্যে পুত্র বাহিনে।

কাছাড় হইতেও মণিপুরের দিকে দ্রুত অগ্র-
 যান হইবে। কাছাড় বন নোনা বাহে প্রায় সকলেই
 জম্ভাকো প্রভৃৎ হইয়াছে। এ সেনার "প্রধান
 দল কেনো সেনাপতি হইতে থাকিবে, তাহা এখনও
 জানিতে পারি নাই। আরও ব্রহ্মের ওপর হইতে—
 টামুর ছাউনী হইতেও—সৈন্যগণ্য, হইবে।
 হইক্টু, সৈম্ভুৎ মণিপুর বাহা করিলে পর,
 আসামের দিক হইতে কাকিল ২০০ নাই হইয়া
 মণিপুরের দিকে গিয়াছিল; ব্রহ্মের টামু হইতেও
 কামান গাণ্ঠি কড়ক টামু হইয়া মণিপুরের দিকে

[illegible]

বঙ্গের সেনা শীমারে গোয়ালন্দ হইতে যাত্রা করিতেছে। তৎপত্র ব্যারন বাহিয়া, ইহাঙ্গিকের উত্তরে নিগ্রিটিন নামক স্থানে পৌঁছিতে হইবে। নিগ্রিটিন পৌঁছিতে অল্পের ঝগড়া লাগিলে। নিগ্রিটিন গোলাঘাটের ১৭৮৫ মাইল উত্তরে। সেখান হইতে কথিয়া ১১৭ মাইল। স্থলপথ তিন পথ নাই; পথ দুইখন নাই। কথিয়া হইতে বিমপুত্র ১৫৫ মাইল। হুতরাং নিগ্রিটিন হইতে বিমপুত্র ২২২ মাইলের কম নহে। দুইন পথে সম্ভ্রান্তানা মুহূৰ্ত্ত ব্যাপার নহে। পথও অতীত বড় বড় কামান থাকিবে। কথিয়ার পক্ষেও ততটা প্রশস্ত নাই। চোতা যে, রোজ ১২ মাইলের 'অধিক' হইতে পারিবে। একপা আশা করা যায় না। হুতরাং ২২২ মাইল পার হইয়া বিমপুত্র পৌছিতে, ১৮১৯ দিন লাগিবে। জলপথে গোয়ালন্দ হইতে ৮ দিন; পরে ১৯ দিন। ৪র্থ ১ মাসই লাগিবে। এত বিশেষ প্রার্থনার নহে; কিন্তু উপায়ান্তর নাই। কাছাড়ের শিগড় হইতে বিমপুত্র ১২৬ মাইল, পথও অপেক্ষাকৃত সুখম, শুধাশি ১১ দিন লাগিবে। কাছাড়ের হইতে সেনা থাকিলেই অভিযান শীঘ্র ও সহজে হইবে। কিন্তু সে অঞ্চলে 'অধিক' সেনা নাই। টামুর পথ আরও 'অল্প'; ৫০০০ মাইলের 'অধিক' হইবে না। টামুর সোনার বিমপুত্র পৌছিতে ৫৬ দিনের 'অধিক' লাগিবে না; কিন্তু সে অঞ্চলেও 'অধিক' সেনা নাই। ব্যারন টামুর পথ অল্প পক্ষে মুহূর্ত্ত হইলেও

উপসংহার ।

তিন সেনা তিন দিক হইতে গিয়া একসঙ্গে মণিপুরের উপর পড়িবে। তখন মণিপুরকে সম্পূর্ণতঃ কব্ধিত হইতে হইবে। অনেকেই বলিতেছেন, ত্রিপুরাধিপতি বৃষ্টি-বাহিনীর রণবাদ্য দূর হইতে শুনিয়াই, মণিপুরী সেনারা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে; চারিদিকের পাহাড় পর্যন্তে পিয়া গিরি-

অথবা বন জঙ্গলে আশ্রয় লইবে। নিম্নাঙ্গত মহারাজ ও তাঁর কন্যা বলিতেছেন— আমাদের কিছু বিষয়, সেনাপতি তাঁকে—কিন্তু বিবাহ হইবে—সীমন্ত-পূর্ণ করিবেন না। সুতরাং সকল প্রকারেই দুটিশ চমুর আশ্রয়বাড়ী পাইবাই পলায়ন করিব না। হুই একটা ভাষণ দ্বারা না হউক, ইহা আমরা মনে করি না।

কিন্তু বীর রস অধিক দিন থাকিতে পাইবে না; বীর সৈন্যই করুণে পরিশত হইবে। তন্মূলক এবং বীতশ্রম রসেরও অভিনয় হইবে। যদি হুই-উন প্রভৃতিকে দুটিশ-সেনানীরা মজাব না দেখিতে পান, তাহা হইলে নিশ্চিতই অশ্রুমুক্তি ধারণ করিবেন। দুটিশ-স্বল্পে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বড়ই বলবতী। সেনাপতি কলৈটকেও তখন প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া ভাষণমুক্তি ধারণ করিতে হইবে। মণিপুরের একেবারেই সর্বনাশ হইবে, শত শত মণিপুরী প্রজাকে, দুটিশ-যুদ্ধে অব্যাহতি পাইলেও, দুটিশ-বিশেষের কাছে গ্রাস দিতে হইবে; মণিপুরী-শোণিতে বরাকনদী শোষিত হইবে, হুই ত গোপটাক জয়কণ ও রক্তমুক্তি ধারণ করিতে হইবে; রাজপ্রাসাদ সমভূমি হইবে, মণিপুর সর্বকে ভাষণ নরকে পরিণত হইতে হইবে; সে ভাষণচিত্র যেন নগ্নে প্রতিভাত হইতেছে; সে জয়বিহারী চিত্রায় জীবন এখনই বিপরী হইয়া ধাইতেছে।

কাহার সোয়ে—কাহানু পাপে—এট সর্বনাশ-বটীয়া উঠিল তাহার নীমাংসা আমরা করিব না। কিন্তু ইংরেজ যদি মণিপুরের সিংহাসনাদিকারবিশেষে পরিচিত ঔদাসীভ অবলম্বন করিয়া থাকিতেন; যদি বর্তমান রাজা কুলচন্দ্রে মহোদর সেনাপতি টীকেপ্রজাতিক জেণ্ডার করিবার চেষ্টা করিয়া; অস্ত্র-শাস্ত্র ইত্যদেপ কন্য না হইত; তাহা হইলে যে, এ বিশিষ্ট উপস্থিত হইত না, ইহা স্থির। মণিপুরের কাহারও অনেকবার সিংহাসনাদিকার নাই। অনেক বিভ্রান্তি ঘটয়াছে—হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেকবার উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু ইংরেজরাজ আর কখনও এরূপ বিভ্রান্তি ঘটাইতে পান নাই; নিপাত্রিযুদ্ধের পূর্বে কখনও বিভ্রান্তি ঘটান নাই, পরেও ঘটাইতে পারে নাই। সহ্যরাণী যখন ধোমণ্য করিয়াছিলেন, “আমি কাহারও রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিব না—আমার রাজপুরুষদ্বিগণকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিব না;” তখন মণিপুর রাজ্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে কেন? বাহা এতকাল হয় নাই, এইবার

নাগপাণ্ডিত—তাহা করিতে নাছিলেন, তাই এই বিভ্রান্তি—এই বিবদে বিপরীত। তাই এই সর্বনাশ উপস্থিত। অপরান যে ইংরেজকেই মরণ করিবেন; আর ইংরেজকেই মরণেই যে আমরা আনন্দিত হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মণিপুরের সর্বনাশ যে যে—উনকই যুদ্ধের কাছে দেখা—হইতে হইবে, তাহা সূর্য হস্তরাং আমাদের রাজত্ব আরও আরও হইতেছে!

মানচিত্র।

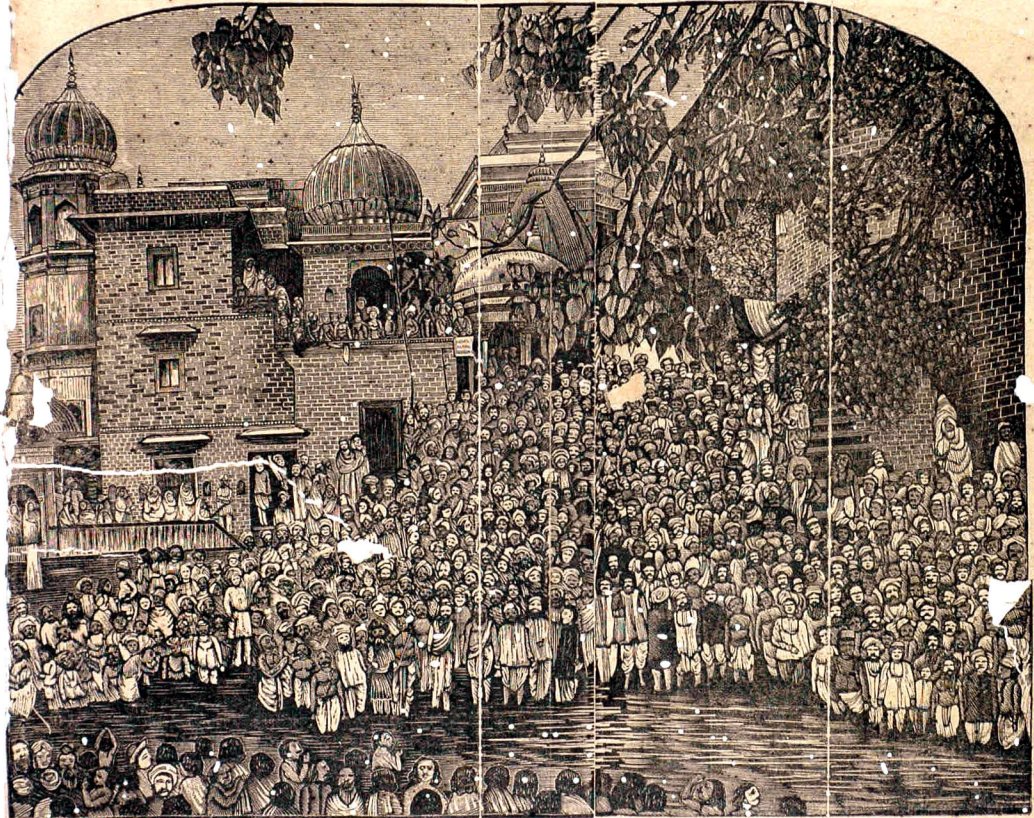
এতক্ষণ মণিপুরের কথা কহিলাম, এইবার মানচিত্র দেখাইব। ঐ দেশ, মানচিত্রে পূর্ণপ্রাঙ্গে পর্যন্তরূপে কক্ষণ মণিপুর রাজ্য। মণিপুর নর-শোণিতে শোহিতকর্ণ হইয়াছে; আরও হইবে। কিন্তু অবিলম্বেই ইহাকে অভিশেকে কক্ষণ হইয়া ধাইতে হইবে। সেই আশঙ্কায় যেন মণিপুর এখন হইতেই কক্ষণ ধারণ করিয়াছে। ঐ দেশ, মণিপুরের উত্তরে—নাগপ্রদেশ বা নাগাপাহাড়, ঐ বানোই কহিয়ার সেনানিবেশে ইংরেজ-সেনার প্রধান আড্ডা। নাগ-প্রদেশের পশ্চিমে বাশিয়া ও জয়ন্তীয়ার পাহাড়; মণিপুরের ঠিক পশ্চিমে কাছাড়-প্রদেশ; কাছাড়ের পশ্চিমে ত্রিহুট। ঐ দেশ, বাশিয়া জয়ন্তীয়ার উত্তরে আসাম—কামরূপ। মণিপুরের দক্ষিণে বুশাই সেনুপ্রভৃতি অসত্য জাতির বাস, ময় জঙ্গল। তাহার পরেই নবাধিকৃত ব্রহ্মদেশ, মণিপুরের পূর্বেও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ-পশ্চিমে বহুদূরে বঙ্গদেশ, সাগরের উপকূলে চট্টগ্রামের সীমা।

মানচিত্রে স্পষ্ট দেখিতেছে, মণিপুর পূর্বে—আবৃত। পূর্বেতে মধ্যে মধ্যে উপত্যকা। অনেক-তলি নদ নদীও প্রবাহিত হইতেছে। মণিপুরের ভৌগোলিক কথা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কথিত হইয়াছে, পঠক মানচিত্রে মিলাইয়া লও।

মণিপুর রাজ্যের রাজধানী—সদর মণিপুর, পূর্ণ প্রাঙ্গে, ঐখানেই সময়ের অভিনয়-ক্ষেত্র। ঐ অভিনয় ক্ষেত্রেই এখন সকলকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইদানিচিত্র নক্ষত্রে থাকিলে মণিপুরের কথা সংক্ষেপে এবং বিশদরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।



হরিদ্বারে মহাকুন্ড ।



অপূর্ণ অনিচ্ছনীর দৃশ্য ।

জন্মভূমি।

১ম ভাগ।

বৈশাখ। ১২২৮।

৫ম সংখ্যা।

লৌহ।

(৪)

পূর্বেই বলিয়াছি—সেকালে বালেশ্বর হইতে কলিকাতায় লৌহ আমদানি হইত। ১৯০৮ সালে কাশ্মির হার্মিটন বলিয়াছেন যে, এই সময়ে বালেশ্বরে বড় বড় জাহাজের নোঙ্গর ঢালাই হইত। এখানে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসিদিগের লৌহাবু কারখানা ছিল। কিন্তু নিজ বালেশ্বরে কেবল ঢালাইয়েরই কাজ হইত, লৌহ গড়জাত হইতে আসিত। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, বালেশ্বর, কটক ও পুরী জিলার পশ্চিমে ১৮টা ছোট ছোট রাজ্য আছে। তাহাদিগকে ১৮ গড়জাত বলে। ইহাদিগের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ ও কেউন্ডর সর্ষের চেয়ে বড়। গড়জাত মহল, পর্ষত ও জলদায়। অনেক দিন হইল, আমি একবার ইটিয়া ৬ জনস্বামী গিয়াছিলাম। মেদিনীপুর জিলার নারায়ণগড় পায় হইয়াই এই সময় পার্শ্বত-প্রদেশ দেখিতে পাই। যত ঝাই, পশ্চিমদিকে ততই পাহাড় দেখিতে পাই। ছোট্টপাপপুর ও উড়িয়ায় গড়জাত হইতে এ অঞ্চলের সমস্ত নানদীগুলি উদ্ভিত হইয়াছে, যথা—দমোদর, রূপনারায়ণ, কাঁদাই, হুবর্ণরখা, শালিন্দী, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, মহানদী ইত্যাদি। এই গড়জাতে লৌহের আকর অনেক আছে। তালচড় বলিয়া স্থান পাথুরে কয়লাও আছে। সেই কয়লার সঙ্গে লৌহের আকর থাকে। অসুলে কঙ্করাই নামক স্থানে পূর্বেকালে অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত, ও কটকের বাজারে ইহা টাকায় আটনের করিয়া বিক্রীত হইত। এখন

এখানে লৌহ হয় কি না, জানি না। গড়জাতের লৌহ-আকর শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ লৌহ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে ইহার সহিত ম্যাগনেসিস মিশ্রিত থাকে।

উত্তর-পশ্চিমাবলে মুন্ডাপুরে আজও লৌহ প্রস্তুত হয়। কিন্তু লৌহারদিগের অবস্থা বড়ই মন্দ; একারণে উল্লের অর পর্যন্ত হওয়া তার হইয়া উঠিয়াছে। এখানে বিদ্যা-সিদ্ধিতে লৌহের আকর আছে। পার্শ্বত জলপ্রভাতেও লৌহবালা দেখিতে পাওয়া যায়। বৃন্দেল-খণ্ডের নানা স্থানেও লৌহ নিষ্কৃত হইয়া থাকে। বিজাপুর নামক স্থানের আকর সর্বোৎকৃষ্ট। নিম্নে বাধা জিলায়ও নানা স্থানে লৌহ ভাটি আছে। গোরহাই, দেওরি ও শিকড় এই সকল স্থানের আকর লইয়া লোকে লৌহ প্রস্তুত করে। গোরহাইয়ের নিকটে একটা পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উপর হইতে লোকে আকর সংগ্রহ করে। আলাউদ্দুল্লের কীর্তিমন্ত মহোদয় হইতে একবার আমি গঙ্গার পাড়ি করিয়া কাঁসি বাহিতেছিলাম। চতুল নদীর ধারে ছালা করিয়া লোকে অনেক কাঠের কয়লা লইয়া বাহিতেছে দেখিলাম। কয়লার আকার স্নান, কাঠের কয়লার মত নয়। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—“ও কিসের কয়লা?” তাহারা বলিল,—“বাঁশের কয়লা।” আমি বলিলাম—“বাঁশের কয়লা কি হইবে?” তাহারা বলিল—“ইহা দিয়া পাথর গোড়াইল, পাথর হইতে লৌহা বাহির করিল।” এখানে লৌহা করিতে বাঁশের কয়লা ব্যবহার হয়। আমাদের কঙ্করারো বাঁশের কয়লায় কাজ করিতে ভাল বাড়ে। কাঁসির দ্বিগুণ লাগতপুর খিলায়ও লৌহা হয়। সলদা নামক একটা স্থান আছে; সেখানে এক প্রকার বিস্তৃত হিমালীট

যায়; তাহা হইতে শোয়া করিয়া
নে প্রেরণ করে। উপরপ্রশিমা
প্রদেশেও বহুকাল হইতে শোহা
মিডেছে। হিমালয়ের তলভাগে
মুখ করিতে করিতে হাফি নানা
গ্রাছ। একবার কালাহুড়ি নামক
দুই তিন দিন থাকিতে হয়।
লৌহের আকার দেখিয়াছিল।
সপেক্ষ, কালাহুড়ি, গোয়ালহুড়ি ও দেওচৌরি
নামক স্থানের লৌহ-আকার হইতে লৌহ বাহির
করিবার জন্য দিনকত পর্যবেক্ষণ অনেক আয়স
করিয়াছিলেন, অনেক টাকাও খরচ করিয়াছিলেন।
এই উদ্দেশ্যে হুইটাই ইংরেজ-কোম্পানিও এখানে
পেঁচাতিয়া করিয়া। কিন্তু নানাকারণে খরচ পোয়ায় না।
তাহার মধ্যে একটি কারণ এখানে উল্লেখ করি।
দেওচৌরি নামক স্থানের লৌহ-আকারে শতকরা
৫০ ভাগ লৌহ, ১৬ ভাগ আলুমিনিয়াম, ১৮ ভাগ
সিলিকন—বাকি অপরাপর পদার্থ। এত অধিক
পরিমাণে আলুমিনিয়া আছে বলিয়া আকার উত্তম
নয়; কারণ আলুমিনিয়াকে বাহির করিয়া দেওয়া
যায়না। ইহার সহিত সিলিকা মিশাইয়া গিলে,
আলুমিনিয়া গলিয়া সিলিকার সহিত মিলিত হয়।
সিলিকা বায়ুকর মূল সত্তা, কিন্তু লৌহ-আকারের
সহিত কেবল বায়ুকা মিশাইয়া পোড়াইলে ভাল কাজ
হয় না। তাই, বাহ্যার দেওচৌরি আকার লইয়া কাজ
করিয়াছিলেন, তাহার গোয়ালহুড়ি হইতে আকার
হানিয়া দুই আকারে মিশাইয়া পোড়াইয়াছিলেন।
কাজ, গোয়ালহুড়ির আকারে সিলিকা অধিক পরিমাণে
থাকে। গোয়ালহুড়ির আকারে শতকরা ৪২ ভাগ
লৌহ, ৩০ ভাগ সিলিকা, ৪ ভাগ আলুমিনিয়া।
দুই আকারে মিশাইবার উদ্দেশ্যে এই যে, দেওচৌরি
আকারে আলুমিনিয়া গলিয়া গোয়ালহুড়ি আকারের
সিলিকার সহিত মিশিয়া হুইটাই ব্যবহার একবার
লৌহকে ছাড়িয়া বাহির হয়ইয়া বাইবে। কিন্তু
গোয়ালহুড়ি হইতে আকার আনিতে অনেক খরচ
পড়িল, তাহার কাজ বন্ধ হইবার প্রধান কারণ।
ক্রমাগত ও গড়গোল—হমালয়ের আর একটি
পরিণামে শিমদুর। এখানে আর রাজার রাজধানী নাম
নাচম। নাহনে রাণা একটা লোহার কারখানা
বুলিয়াছেন। বিদ্যাত প্রবলীতে এখানে কার্য হয়।
থাকে। কিন্তু সেখানে হইয়াছে এই, আকার কারখানাতে
দূর হইতে আনিতে হয়, কয়লাও নিকটে নাই।

হিমালয়ের আরও পশ্চিমভাগে, কাশ্মীর, হুল
প্রভৃতি স্থানে অনেক লৌহের আকার আছে; কিন্তু
কিছু লৌহ বাহির হয়ইয়া থাকে। তাহাতে কড়া
হাত প্রভৃতি অগ্রাণি প্রস্তুত করিয়া লোকে বিক্রয়
করে। হিমালয়ের নীচে পঞ্জাব প্রদেশে বিলম
জিয়ার কোট-কিরাণা নামক স্থানে হিমটাইট-
আকার প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। সিলিকা
বহু জিয়ার কালাগাণ নামক স্থানেও লৌহের
আকার অনেক। এখানে কিছু কিছু লৌহ
প্রস্তুত হয়। পেরেক, লৌহ-কলস, লৌহেরে হাড়ি
প্রভৃতি অগ্রাণি করিতে এই লৌহ বিধেয় উপযোগী
বলিয়া প্রসিদ্ধ। পেশোয়ার জিয়ার বজৌর
নামক স্থানে লৌহ-বাথুকা হইতে লোকে লৌহ
করে। বস্তুক করিবার নিমিত্ত কাথুলে এই
লৌহের বড়ই আদর। কিন্তু পঞ্জাবে নানা স্থানে
লৌহের আকার থাকিলে কি হইবে? এখানে কঠোর
কি কলবার বড়ই অভাব।

মধ্যপ্রদেশের লৌহ-আকার বহুকাল হইতেই
প্রসিদ্ধ। এখন এই দিক দিয়া রেল হইয়াছে।
সেই রেলের শাখাপ্রাধা অধ্যক্ষকে বাইবার কথা
আছে। সে নিমিত্ত ও অন্যদের লৌহ-আকার
এখনে কাজে লাগিবার সম্ভাবনা। পূর্বকালে
সমলপুর হইতে কটকে লৌহ আসিত।
সমলপুরের নিকট কদরবগা নামক একটি স্থান
আছে, সেখানও অপরিয়ায়া এখানে অনেক
লৌহ থাকে। রেডাকোলা, কোনালোই, রামপুর
প্রভৃতি স্থানেও সেকালে অনেক লৌহ হইত।
এখনও যে হয় না, তাহা নহে, তবে অনেক কারিয়া
সিরাগিলে। সমলপুরের লোহাকারেরা একস্থানে
চিরদিন বাস করে না, কাঠের অগ্রভুল হইয়াই
অন্ত স্থানে গিয়া ভাটি নির্মাণ করে। সমলপুরে
হীরাও পাওয়া যায়, অজ্ঞাত ধাতুও আছে। এখানে
প্রাচীনকাল হইতে অনেক লোকেই বাস করে
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। সমকাজেই
সৌভাগ্য-হৃতগা আছে, কাহারও বা লাভ হয়,
কাহারও হয় না। ধাতুকারিগণেরও তাহারি হইত।
হৃতভাগ তাহারি ভাবিল, সৌভাগ্য-হৃতগণের কোন
অধীশ্বর দেবতা থাকিলেন, যিনি প্রসন্ন হইলে
লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে লাভ হয় না। ত্রয়ে
তাহারি জানিল, এই দেবতাসীর নাম পোতেশী।
আজ পর্যন্ত ধাতুকারেরা তাহারকে পূজা না করিয়া
কোন কাজ করে না। সকলেই বোঝে হয় জানেন,

সমলপুর বঙ্গপ্রদেশ, এখানে গোণ্ড, কল, শবর
প্রভৃতি নানা জাতির বাস। এ অঞ্চলে ত্রয়ে স্থান
চিম্বুদিগের প্রবেশ হইল, তখন তাহারা এই
পোতেশী দেবতাকে লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইলেন।
ধাতুকারেরা তাহার কাছে ছাপ ও মণির বলি
দিয়া থাকে। ঝাশ পুতিয়া চিলের ডগার দেবতার
উদ্দেশ্যে মাংস বলিয়া দেয়। ত্রিশ প্রভৃতি পাকি-
পাখাদিতে আসিয়া সেই মাংস লইয়া যায়। করে
কোথায় হয়তো একশও মাংস চিলের মুখ হইতে
মাটিপোড়িয়া গিয়াছিল, আর ঠেংকনে তাহাতে
একধানি বড় হীরক বিধিয়া গিয়াছিল। কোনও
ভাগ্যবান ব্যক্তি হীরক হইতে সেই মাংসখানি
হুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। তাহার এই সৌভাগ্যের
কথা লইয়া অবজ্ঞাই চারিদিকে হুলস্থল পড়িয়া
থাকিলে। রামটী ভ্রমণ করিতে গেল তদুপরে
যাইতে লাগিল, ততই যে নানা অলংকার বিকৃত
হইয়াছিল, সে আর বিচিত্র কথা কি? আরো
উপজায়ে নিম্নাবলি কি করিয়া য়া পাইয়াছিলেন,
তাহা বোধ হয় সকলের মনে আছে। সে গয়ের মুখ
হয়তো এই সমলপুরের লক্ষ্যপূজা। বিলাসপুর
জিয়ার অনেক লৌহের আকার আছে, কিন্তু এখানে
অধিক পরিমাণে লৌহ হয় না। মাঝুলা জিয়ার
অমরকোট, উমেরগুয়ানি, রামপুত্র, মোয়াই প্রভৃতি
স্থানে লৌহ বিক্রয় হইয়া থাকে; আর এই লৌহ
অপরাপর জিলায়ও প্রেরিত হয়। ভাণ্ডারী জিয়ার
লৌহ-আকার হইতে গোণ্ড, গোয়ারা, পলাও
ধীরস জাতি লৌহ করিয়া অস্ত্র হানে প্রেরণ
করে। হুলস্থলপের নানারূপ লৌহের আকার দেখিতে
পাওয়া যায়। নবোটা, পানাহুড়ি প্রভৃতি স্থানে
ইহা হইতে অনেক লৌহ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত
হইয়া থাকে। এখানে হিমটাইট জাতীয় আকারই
অধিক। হুস্তি পরগণার এক প্রকার রুম্বল লৌহ-
বাথুকা আছে; তাহার নাম “খাণ্ড”; ইহা হইতে
লোকে কড়া হাত প্রভৃতি প্রস্তুত করে। জবলপুরের
লৌহ-আকারে শতকরা প্রায় ৪৬ ভাগ লৌহ, বাকি
অপরাপর পদার্থ। কোলি নামক স্থানে এক
প্রকার হিমটাইট পাথর আছে। তাহাকে চূর্ণ
করিয়া অলংকারি মাংক এক ব্যক্তি বৎ প্রস্তুত
করেন। সেই বৎ বিক্রয় করিয়া তিনি বিলক্ষণ লাভ
করিতেন। পাহাড়ি নদীসমূহেরে জল ক্রমেতে
করিয়া যায়। সেই জল-স্রোতে ইল কল বসাইয়া
ন। প্রেরণে বলে সেই কলের ঢাকা ঘুরিতে

থাকে; তাহার সহায়তায় তিনি পাথর গলিয়া লন।
হিমালয়ের অনেক স্থানে দেখিয়াছি, লোকে নদীর
প্রোতে জাঁতা বসাইয়া সেই বলে ময়না গলিয়া
লয়। জবলপুর জিয়ার পলি বলিয়া একটা স্থান
আছে। সেখানে প্রায় দুই শত হাত পরিমিত
গর্ত করিয়া লোকে তাহা হইতে লৌহ-আকার
বাহির করে। নরসিংহপুর জিয়ার তেজুকড়া ও
অমরগানি নামক স্থানের লৌহ বহুকাল হইতে
প্রসিদ্ধ। এখানে লোকে পাহাড়ের গায়ে গর্ত
করিয়া ভাটি নির্মাণ করে। এই সকল ভাটিতে
দুই প্রকার লৌহ প্রস্তুত হয়;—বাঁচা লৌহ ও
অপরিভক্ত ইপ্পাত। এই ইপ্পাতকে পুনর্বার
পোড়াইয়া ও গিটিয়া লৌহ করিয়া লয়। সামান্য
সামান্য কলের সহায়তায় এখানে একবার লৌহ
প্রস্তুত করিবার কলন হইয়াছিল। সেই নির্মানে
নিমিত্ত কতকগুলি লৌহখণ্ড একবার প্রেরিতও হইয়া
ছিল। সাপেরে বিয়াস নদীর উপর যে পুল আছে,
তাহা এই লৌহ দ্বারা নির্মিত। বিপ্লবে পাকি না,
একপ লৌহ এখন আর এখানে যে কি না।
মধ্যপ্রদেশে চান্দা জিলা লৌহেরে জন্ম দায়
একটি প্রসিদ্ধ। এখানকার আকার অতি উৎকৃষ্ট;
তাহাতে প্রায় ৯০ ভাগ লৌহ থাকে। দেবল
গামের নিকট গণ্ডেশ্বর পাহাড় লৌহ আকারে
পরিপূর্ণ। এমন ক্রি, সমুদ্র তাত্রবর্ষে প্রবলিত হয়
যত লৌহেরে প্রয়োজন, তাত্রা এই পাহাড় হইতেই
উদ্ধৃত হইতে পারে। তেজতাতী ওজরাতি,
লোহার, পিপলগ্রাম, বহুপুর প্রভৃতি নানায়ানে
লৌহের আকার প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।
কিন্তু অপরিমিত লৌহের আকার থাকিলে কি
হইবে? এখানে পোড়াইবার প্রয়োজ বড়ই অভাব।
কাঠের কলস হুস্তাণ্য হইয়াছে। নিকটে অন্ততঃ
নানা কয়লা পাথুরে কয়লা আছে সম, কিন্তু
সে কয়লা ভাল নয়। তাহাতে কার্কেলের তাল
কম, ধাতব ভাগ অধিক। কাঠের ছাত থাকার
ভালরূপ অধি হয় না; কয়লার ধাতু ভাটনী
ছাই হয়। নীচই ভাটিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলে।
বিদ্যাত মতে অধিক পরিমাণে লৌহ করিবলৈ
নিমিত্ত একবার এখানে পরীক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু
এই কয়লার দোষে পরীক্ষার ফল ভালরূপ হয় নাই।
পরীক্ষার নিমিত্ত ১৬ হাত উচ্চ একটি কড় ভাটি
নির্মিত হইয়াছিল। বিদ্যাত এখানেতে ভাটীর
ভল-ভাগটি অধিষ্টক দ্বারা গঠিত হইয়াছিল।

ভাটী শুকাইলে তাহার প্রায় বার আনা তপ কাঠ দ্বারা প্রথম পলিপুত্র করা হয়। সেম নামক একদী মাঘে এই পলিকা করিতেছিলেন। তিনি সেই কাঠে আশ্রণ লগাইয়া গিলেন; গিয়া, তাহার উপর এতদূর পরিমাণে কাঠের কল্যা চাপাইয়া গিলেন। বহন করিয়া উত্তরমূৰ ধরিল, তখন তাহাতে একমণ পাথরে কল্যা, অধমণ ঘোষাআকর ও দশমের চূর্ণের পাথর একমণে চালিয়া গিলেন। ভাটী যেমন জলিতে লাগিল, তেমনি মেষে মাক্ষর বার বার কল্যা, আকর এবং চূর্ণ মলিয়া বিতে লাগিলেন। এইরূপে ভাটী ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। ২৮ ষষ্ঠীর পর ভাটীর গাধের ছিন্ন দিয়া তরল ভাবে সৌম্যমণ্ডল পণ্ডিত্যে আরম্ভ হইল। ভাটীর নিম্নভাগে সৌহ জমিতে লাগিল। সাহেব-সেবিলেন, সৌহ কল্যা হইয়াছে বলি, কিং তলনাকর পাথর করে নাই। বিলাতি মতে সৌহ প্রস্তুত করিতে হইবে, সৌহ তরল হওয়া চাই। তরল করিবার জন্য তিনি তাই আরও কল্যা ও আকর চাপাইয়া গিলেন, আর কতবেগে জ্বাটা চালাইতে আদেশ করিলেন। এত উত্তাপ হইল যে, তাহাতে অগ্নি-ইষ্টক পৰ্যন্ত গলিয়া গাইল, ভাটীর তল-ভাগ গলিয়া গাইল, কিন্তু সৌহ তপুও গলিল না। ক্রমাগত কল্যা ও আকর দিয়া এত সৌহ জমিল যে, তাহা ভাটীর গলায় গিয়া ঢেঁলিল। তখন সেম মাঘে করেন কি, আশ্রণ নিবায়ী গিতে আদেশ করিলেন। শীতল হইলে ভাটী ঝুঁকিয়া সেই সৌহখণ্ডকে বাহির করিয়া হইলেন, সৌহ ঝুঁপ প্রায় ৩৫ মণ ওজন হইয়াছিল। কল্যার ছাউ প্রায় সমিত মিশ্রিত হইয়া প্রাচীল ভলিয়া, ছাউ একমণে গলিয়া জলেদ মত হয় নাই। বাহা হউলো লোহ বড় মণ হয় নাই; কিন্তু বিলাতি প্রথা-নীতে টিক কাড়-হইল না। পাথরে কল্যা ভাল নয় বলিয়া হয় নাই। বিলাতে এই কথা লইয়া বাসাবাদ হইয়াছিল। তাহাতে এই ষ্ট্রি হয় যে, আরোবার পাথরে কল্যা মণ হইল, একটু কৌশল করিয়া ব্যবহার করিলে, সে কল্যার কাজ চলিতে পারিল। বস্তুর জ্ঞান, চান্সে তাহার পর সৌহ নিবায়ন করিতে বিশেষ কোন ব্যয় হয় নাই।

বেঙ্গল উত্তরে, দক্ষিণ অঞ্চলেও সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে সৌহের আকর আছে। নাসাজপ্রদেশে জিঞ্চিপার্মি প্রভৃতি স্থানের নিকট আজিও রানি

রানি সৌহমল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় পূর্বকালে এই সকল স্থানে অনেক সৌহ প্রস্তুত হইত। কল্যার অভাবে বহু হইয়া গিয়াছে। পূর্বকালে বুলিয়াছি যে, মাগোমের পিরিসমুখ চুপক আকরে পরিপূর্ণ। কল্যার অভাবে তাহা হইতে অতি অল্পই সৌহ নিষ্কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু মাগোমের চুপক প্রস্তর লইয়া সেকালে অনেক সৌহ হইত। ৩০ মংসর পূর্বে এই প্রস্তর হইতে সৌহ ত্ৰাহির করিবার নিমিত্ত সাহেবদিগের একটি কোম্পানী ছিল। দক্ষিণ ভারতে মোটোমটো নামক স্থানে ত্ৰাহিরিদের কারখানা ছিল। মাগোমের আকর হইতে অতি উত্তম ইশ্পাত ত্ৰাহিয়া তাহার বিলাতে পাঠাইতেন। পিপ-আইরন, অর্থং ঢালা সৌহ প্রস্তুত করিয়াও ত্ৰাহিয়া বিলাতে পাঠাইয়া-ছিলেন। বিলাতের লোকে সে লোহকে বড়ই ভালবাসিয়াছিলেন। এমন কি, কোমর কাহারও এরূপ ধাবুয়া হইয়াছিল যে, ইশ্পাত করিতে ভারত-বর্ষই ইলঙকে সমুদয় সৌহ যোগাইতে পারিবে। ত্ৰাহিয়া হইলেনের নিকট আর চুপক পাথরের সৌহ কিনিলেন না; এখন হইতে ভারতবর্ষ হইতেই কিনিলেন, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। বিদেশী-দিলকে টাকা বিল কেন? আমোদের প্রজা ভারত-বাসীদিগকে সেই টাকা বিল। হাতে পরমা হইলো, তাহার আমোদের কলের কাপড় আরও অধিক কিনিতে পারিবে। উত্তরাধী লাভ হইলে, কিন্তু কল্যার অভাবে মাগোমের চুপক-প্রস্তর হইতে সৌহ নিষ্করণ কাজ অধিক দিন চলিল না। মাল্লাজ অঞ্চলে আরও যে কত স্থানে সৌহের আকর আছে, তাহার কথা আর কত বলিব। মাহিগুয়ে আমি কোন স্থানে সৌহ-নিষ্করণ কাজ দেখিয়াছি। নমিগুপ্ত পর্বতের মাগর উপর একবার দিন কত বাস করি। ইহা-এখানে জনশ্রুত; কেবল হই তিনটা বাসগাও তাহার তত্ত্বাবধানেবের নিমিত্ত এক আটটা থানামা আছে। পূর্বে হাইদার আলি ও টিপু হুগতান আসিয়া এখানে কখন কখন বাস করিতেন। নমিগুপ্তের নিকট চিক-বালাপুর্বে, চিডাবাটী নদীর উৎপাত-স্থানে আমি অনেক সৌহের আকর দেখিয়াছিলাম। সেই সৌহ হইতে আজ-মাক্কা কল করিবার নিমিত্ত একটি শৈলী-বর্ষক কারখানা খুলিয়াছেন। ত্ৰাহির কারখানা দেখিতে তিনি আমাকে লইয়া গিয়া ছিলেন। আরম্ভপটনের নিকট কাগেরী নদী

ধারেও আমি অনেক সৌহের আকর দেখি-
য়াছি। মাহিগুয়ে সেকালে অতি উত্তম ইশ্পাত
হইত। এই ইশ্পাত বিলাতেও প্রেরিত হইত।
কিন্তু শেষ এই, সকল ইশ্পাত সমান ভাবে প্রস্তুত
হইত না। সেই জন্য ব্যবসা চলিল না। হাইদ্র-
াবাদের নানা স্থান বহুকাল হইতে ইশ্পাতের জন্য
প্রসিদ্ধ। নির্খাল, হিমুতি, কোন-মসুমুহ, মৃতপার্মি,
কোণ্ডাপুর প্রভৃতি স্থানেই অধিক পরিমাণে সৌহ ও
ইশ্পাত হইত। তুরস্ক ও পারস্য হইতে ব্যবসা-
দারেরা আসিয়া সেই ইশ্পাত কিনিয়া লইয়া
বাহত। ইশ্পান্য ও দমাস্ক নগরের জাপ-
বিখ্যাত বহুমুখ্য আর-শর এই ইশ্পাত হইতেই
লোকে প্রস্তুত করিত। মোহাই প্রদেশের রয়গিরি,
কোণ্ডাপুর, রেবা-কাবা, কাটিবার, কচ প্রভৃতি স্থান
সৌহ লোহের আকর। কিন্তু আর কত বলিব।
ভারতবর্ষের সর্বস্থানেই সৌহের আকর পড়িয়া
রহিয়াছে। সামান্য আকর নয়, অতি উৎকৃষ্ট
আকর। এরূপ আকর পাইলে বিলাতের লোকে
আপনাদিগকে অতি ভাব্যমান মনে করেন।
তাহা হইতে সৌহ উদ্ধৃত করিতে হইলে যে
সমুদায় বস্তুর আবশ্যক, তাহা আমাদিগের অভাব
আছে সত্য। কিন্তু এককালে বিলাতেও
এইরূপ অভাব ছিল। বুদ্ধিলোহ ইংরেজেরা
সেই অভাব মোচন করিয়াছেন। এই কথাকে বিয়
বাধা, বিপদ, অভাব আছে বলিয়াই মনুষ্যজাতি আজ
এই দৈর্ঘ্যও প্রভুপাতি। সেই বিপদ হইতে রক্ষা
পাইবার নিমিত্ত, সেই অভাবকে মোচন করিবার
নিমিত্ত, মনুষ্যের উদ্যম ও উৎসাহ। সেই বিপদ,
সেই অভাব মনুষ্যের বুদ্ধি-বুদ্ধির মূল। যদি
গুণেরে বড় চর্চা হইত, যদি হস্তী মত বল হইত,
যদি ব্যাঘ্রের মত দন্ত থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যকে
আর প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত ভাবিতে হইত না।
ভাবনা অভাবে মনুষ্যকে তাহা হইলে আজ জড়
পত্তর জায় থাকিত হইত। ভাবনাই বুদ্ধি-মার্জনের
একমাত্র উপায়। নদীর পলিতে একদার হইত
মুঠা বীজ ছড়াইয়া দিয়া গাইলেনও বাহারা প্রচুর
শস্য লাভ করিতে পারে, তাহাদের মনে ভাবনা
ভাবনা হইতে আসিবে? সেই ভাবনামূলক হইত
ভারতবর্ষতনের প্রধান কারণ। তাই বলি,
ভারতে যে ক্ষুধা আসিয়াছে, সেজন্য নিতাও ক্ষুধ
হইবে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিপদ, বাধা বিঘ্নের
সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ কর দেখি।

আকর হইতে সৌহ বাহির করা কি, সে কথার
আভাস পূর্বেই দিয়াছি। সৌহের আকরে কেবল
সৌহ থাকে, তাহা নহে। ইহার সহিত অক্লিভেন,
গন্ধক, নিগলিকা, আর্সেনিক, মস্করল, মস্করপ্রভৃতি
অপরূপ নানা বস্তু মিশ্রিত থাকে। সেই সকল
বস্তু হইতে সৌহকে পৃথক করিয়া লওয়া বড়ই
কঠিন কথা। পৃথক করাই সৌহাকারিগণের
কাজ ও ভাণ্ডারিগণের বিদ্যা। আকরে যদি কেবল
সৌহ ও অক্লিভেন থাকে, তাহা হইলে সৌহকে
পৃথক করিয়া লওয়া ততটা কঠিন কথা নহে।
তাই, পূর্বকালের লোকেরা কেবল এই প্রকার
আকর লইয়াই কাজ করিত। ভারতবর্ষের সৌহ-
নিষ্করণ-কাণ্ডও প্রায়ই সর্ব্বদে এইরূপ আকর
লইয়া হইয়া থাকে। বিলাতে তাহা নহে। বিজ্ঞান-
শাস্ত্রের প্রভাবে বিলম্বের লোকেরা অপরূপ
বস্তু হইতেও সহজে সৌহকে পৃথক করিয়া লইতে
পারেন। ভারতের সৌহাকারেরা স্ততি উৎকৃষ্ট
অক্লিভেন মিশ্রিত আকর না পাইতেন কাজ করিতে
পারেন না; বিলাতের লোকেরা অতি নিম্নট নাম-
ল্যামিশ্রিত আকর হইতেও সৌহ বাহির করিয়া
লইতে পারেন। ভারতের সৌহ-ক্ষণে
তাই অবনতি, বিলাতে তাই উন্নতি। অক্লিভেন,
সৌহকে গরীয়া রাখিয়াছে। হুইটকে বিক্সিন
করিতে পারিলেই আমরা সৌহী পাই। তাই
একশে গেষিতে হইলে, সৌহ অপেক্ষা কাহার সহিত
অক্লিভেনের অধিক প্রায়। সেইটা আনিয়া
গিলেই অক্লিভেন তাহার কাছে থাকে, সেই
একটা পড়িয়া থাকিবে। সৌহ অপেক্ষা অক্লি-
ভেন কার্ণকণে অধিক ভাল বাসে; তাই কাজে
কার্ণকণ আনিয়া গিলে, আকরের অক্লিভেন কার্ণকণে
প্রবেশ করে,—আকরের সৌহ পৃথক হইয়া পড়ে।
কাঠের কল্যার অধিক পরিমাণে প্রস্তুত আছে।
তাই মাহুয়ে কাঠের কল্যা ও সৌহ-প্রস্তুত হইতকে
এক সঙ্গে রাখে। কিন্তু উত্তাপ না পাইলে কল্যা
অক্লিভেন লইতে পারে না। গরিতে উত্তাপ না
পাইলে আকর হইতে অক্লিভেন বাহির হইতে
পারে না। তাই মাহুয়ে, কল্যার আশ্রণ দিয়া
রাখে। কল্যা প্রথমে ব্যায়, অক্লিভেন লইতে
পারে। হুইটের মিশ্রিত অক্লিভেন অক্লিভেন ও গুড়ি
হয়। এইরূপ কাণ্ডকে আমরা সাধারণ ভাষায়
সোঁতা বলি। গুড়িয়ার সময় কল্যা হইতে উত্তাপ
বাহির হয়। সেউ উত্তাপের বলে আকরের সৌহ

ও অন্ধ্রজেন পৃথক হইয়া পড়ে। উত্তাপ অধিক না হইলে কিছু তাহার। পৃথক হয় না। তাই মাছেরে মদ্যনা উত্তাপটুকু জিতরেই রাখিতে চেষ্টা করে। উত্তাপটুকু পাছে বাহির হইয়া যায়, সেজন্য কাঁচা দিয়া লোকে চারিধার খিঁচিয়া দেয়। তাহাতেই ভাঁট বলে ১ মায়াত্র কাঁচা দিয়া খিঁচিলে তবুও কিছু উত্তাপ বাহির হইয়া যায়। সেজন্য বিলাতের লোকেরা একপ্রকার মুক্তিকার আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই মুক্তিকা দিয়া তাঁহারা ইট প্রস্তুত করেন। ইহাকে অজি-ইষ্টক বলে। অজিয়া উত্তাপেও হয়। সহজে গলিয়া যান। তাই না। আর ইহা দিয়া ভাঁট গড়িলে উত্তাপ বড় অধিক বাহির হইয়া যায় না। এজন্য সেখানকার লোকে এই ইষ্টক দিয়া ভাঁট গড়িয়া থাকেন। সহজে কল্যাণ ওমে ওমে গুলিলে যে উত্তাপ টুকু বাহির হয়, তাহাকে আকর হইতে অন্ধ্রজেন বিক্রয় হয় না। তাই, সেই আওমে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত পৰিচালিত করিয়া দিতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই ভাঁচা দিয়া লোকে কল্যাণ দিয়া থাকে। এইরূপে উত্তাপ অধিক হইলে, আকরের অন্ধ্রজেন পৃথক হইয়া কার্পণে প্রবেশ করে, আকরের লৌহ পৃথক হইয়া পড়ে।

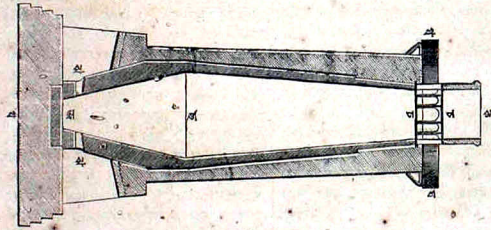
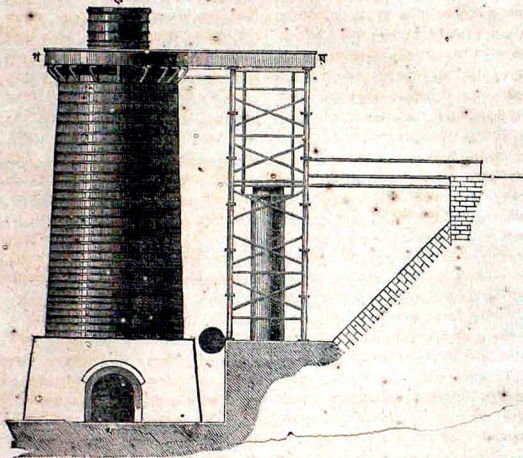
তবেই হইল, অতি উৎকৃষ্ট লৌহ-আকর হইতে লৌহ বাহির করিতে হইলে, প্রথমেই ইষ্টকি বস্ত্র আশপশু, কল্যাণ ও বায়ু। ভারতের নানা স্থানে যে লৌহ-আকর বৃথা পড়িয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, কল্যাণ নাই। সেখানে ভারতভূমি বোধ হয় এত জনাকীর্ণ ছিল না; বিশেষায়িতপের সহিত এত অধিক বাসনা-বাণিজ্য ছিল না। বিশেষে পাহাড়াইবার নিমিত্ত এত অধিক সুবিধাজনক সমুদ্রের আশপশু ছিল না। সুতরাং এত অধিক ভূমি কর্তৃক হইয়াও কিছুমাত্র আশপশু কল্যাণ ছিল না। তাই এখানে পতিত-ভূমি, সেখানে পোতা, ওখানে ধন, এইরূপ চারিধার ছিল। পতিত-ভূমি আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পোতা অভাবে গরু সার অন্ধ্রজেনের হইয়াছে। যেখানে সেমিবার্ণা ছিল, আজ সেই বানে জনপূর্ণ অন্ধ্রজেন প্রদেশের হরদুই জিলা। বনে কল্যাণ নিয়াছে, তাই কল্যাণও অভাব হইয়াছে। তাহাও বড়, আবার বাবা কিছু বন আছে, তাহার উপরও রাজ্য সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। বনবিভাগের কর্তৃপক্ষদের বিনা অনুমতিতে কোথাও

একটা কাট কাটবার যো নাই, এক পাখি কলি খেড়া দিয়ার যো নাই। বনের উপর গরবমতে যে এরূপ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন তাহা নিত্যমুখ কল্যাণ নহে। এরূপ না করিলে ভারতে একবারেই বন থাকিলে না। বন না থাকিলে অনার্য হয়, ভূমিতে বস সুখিত থাকিতে পারে না। ইহার ফলাফল অতি দূরদেশ পর্যন্ত ব্যটিয়া থাকে। এমন কি, হিমালয়ে বন না থাকিলে, একদুই বনদেশেরও অক্ষয়ল হইবার সম্ভাবনা। যেমনি দেখাযিচ্ছিল, নীলগিরি নামগিরি ও পশ্চিমঘাটের পর্বতসমূহের অধিক বন লোকে বন কাটাকাটা একবারে প্রস্তরময় করিয়া ফেলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বনসর পরিণয় এই সকল পর্বতে প্রথম বাস, তার পর ছোট ছোট পাছ, তার পর বড় বড় বৃক্ষ, এইরূপ হইয়া তাহাদিগের পাতা পড়িয়া, পাতা পড়িয়া কলমে কলমে হইয়াছিল। পাহারের উপরে গাছের শিকড়ের দ্বারা সেই সকল মাটি আঁকি ছিল। এখন লোকে বন কাটাকাটা সেই মুক্তিকার কামি চান পড়িতে গিয়াছে। কিন্তু গাছের শিকড়ের দ্বারা সেই অস্তিত্বিত হয়, আর মাটিগুলি বহির জলে জমেই হইয়া যায়। সুতরাং হইয়া নদীতে গিয়া পড়ে; নদী মুখিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে, পাহাড়ে পাহার বাহির হইয়া পড়ে। যখন মুক্তিকা থাকে, তখন বহির জল অনেক মাটিতে বসিয়া যায়। এখন পাহারের জল আর কি বসিবে? সেই দুষ্টি হয়, আর জল জলভয়ে একবারে হাইয়া নদীতে পড়ে। পাহাড়ে আর রস থাকে না। বর্ষাকালে পড়ে। হাইয়া যাঁহা লোকে ভূমিতে বর্ষাকাল বা রস থাকিত, তাহা চুয়াইয়া-চুয়াইয়া করণ হইতে, অনেকগুলি করণের জল জুটিয়া নালা হইতে; অনেকগুলি নালা পড়িয়া নদীগুলিকে জীবিত রাখিত। নদীগুলি যে সকল জনাকীর্ণ গ্রাম সমুহ দিয়া বহিয়া যাঁহা, সেখানকার ভূমিকে বিন্দু রাখিত; মাঠ খাঁট খেতে খেতে মালা সজাই যিচ্ছিল। বর্ষাতে তাই এখন অনেক বান কেবল প্রস্তরময় ও শুষ্ক, বর্ষা শুষ্ক, নদী শুষ্ক, দূরদেশে জনপদ ভূমিত ও তৃণপূর্ণ। ভূমধ্যমাগের মন্টা নামক একটা দ্বীপ আছে। বনে কল্যাণ একদিনের জন্য আমি সেই দ্বীপে বাস করিয়াছিলাম। দীপের ভাব দেখিয়া আমার রেধ হইল যে, বন শুষ্ক হইয়া এখানেও এই দশা ব্যটিয়াছিল। প্রকৃত তাহাই। শেষকালে এখানকার লোকে জাহাঞ্জে

করিয়া নিকটস্থ সিগিল দ্বীপ হইতে মাটি আমদানি করিতে হইয়াছিল। এই মাটিতে পাহাড়ের প্রায়ে বসাইয়া তাহা কর্তৃত্বাধী করে। তাই বসি, বন রক্ষা করা রাজার কর্তব্য কর্তব্য মনো পরিণমিত হইয়াছে। এদিকে কিন্তু বন বাহিরে গিয়া কল্যাণ অভাব হইয়াছে। এক রাস্তায় বন দুইহায়ে লোহাকারদিগের আর অন্য স্থানে বাহিরের বড় স্থান পাই। সুতরাং বন দুইহায়ে তা লোহার কাজে ব্যবহৃত। এক সময়ে বিলাতেরও এই বসায় বাজা ছিল। চারিশত বৎসর পূর্বে জর্মানি, পোলি প্রভৃতি দেশ হইতে ইংলণ্ড অনেক লৌহ ও ইয়াং আমদানি হইত। ইংলণ্ডের রাজা মনে করিলেন, এতো ভাল কথা নয় যে, অন্য দেশের লৌহ লৌহ দিয়া আমার প্রজাবাদের নিকট হইতে স্বর্ণ লইয়া যাইবে? তাই তিনি বিশেষ হইতে বিলাতে লৌহ আমদানি করা একদিনের রহু করিয়া দিলেন। কিন্তু লৌহ না হইলে তা আর কাজ চলে না। কাজেই বিলাতের লোকে নানাধানে ভাঁট খুঁজিতে লাগিল। তখন পাথুরে কল্যাণ দিয়া কি করিয়া লৌহ বাহির করিতে হয়, লোকে তাহা জানিত না; কাঠের কল্যাণ দিয়াই সর্বত্র লৌহ বাহির হইত। দেশের গাছ কাটা লোকে ইংলণ্ডকে একবারে প্রদূষণ করিয়া ফেলিল। অপরোচা ও রোহিণ্ডগুও রেলগাড়ির কল পূর্বে কাটা পড়িত। তাহার রোহিণ্ড যে অপরোচা এইরূপ বৃক্ষনা হইতে বসিয়াছিল। বাহা হউক ইংলণ্ডের রাষ্ট্র এদিকেজেন দেশ বৃক্ষনা হইতেছে দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি উভয় ভাঁট কাটা ও গাছ কাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু লৌহ চাই, লৌহ না হইলে কাজ চলে না। আমরা যেরূপ একপথ বন্ধ হইয়া যাঁহা লৌহ একবারে প্রচুর বৃক্ষনা দেখি, আনবারা হইয়া পড়ি, ইংলণ্ডের লোক তাহা নান। এক পথ বন্ধ হইলে, তাঁহারা অল্প পথের ভায়েক। যখন গাছ-কাটা বন্ধ হইল, তখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, অল্প কি উপায় লৌহ বাহির করিতে পারে। ইংলণ্ডে পাথুরে কল্যাণ আছে, সুতরাং তাহা দিয়া সকলই লৌহ বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়। এই চেষ্টা হইতে লাগিল। কতলোকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই সফলতা হইতে পারিলেন না। ১৮৮৮ খঃ জুজি সাহেব পাথুরে কল্যাণ দ্বারা উত্তম লৌহ বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু কল্যাণের সর্বত্রই আছে। প্রচলিত বস্তু বড় ভাল, ইহার উপর আর কোন উন্নতি চলে না, এইরূপ সকলকেই ধারণা। প্রাচীন কালে যে কত উৎকৃষ্ট ছিল তাহার তো কথাই নাই। সে কালের জন্ত কে না জাহার জল ফেলিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া দেন? কিন্তু ভাল হইলেও “কাল” কাহারও জন্ত বসিয়া থাকে না। বালক-কাল ভাল, যৌবনকাল ভাল, তা বয়স। কি আমার চিত্রবাণ্য, চিত্র-কৌশল থাকিবে? পৃথিবীর অবস্থাও সেইরূপ। কাল অগ্রসর হইতেছে, পৃথিবী-পরিবর্তন হইতেছে। সেই কালের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও চলিতে হইবে। ইংলণ্ডের লোক সে সময়ে সে কথা বুঝিলেন না। পাথুরে কল্যাণ দিয়া লৌহ বাহির করার প্রথালা ভুল সাহসের কাছে ভাঙিয়া শিথিলেন না; সুতরাং বিশেষ হইতে লৌহ আসিয়া বিলাতে লৌহাকারদিগের উৎসাহ দিতে লাগিল। যেরূপ আজকাল ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের বিলাতের লৌহ-নিষ্কাশ-কার্যও প্রায় একবারে ধ্বংস হইয়া গিয়া। ১৮১০ খঃ জুজি সাহেব জার্মান নামক একজন ইংরেজ পুনরায় পাথুরে কল্যাণ হইতে লৌহ বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। তিনি আমাদার কারখানায় এই প্রথালা প্রচলিত করিলেন। পাথুরে কল্যাণ মোহ এই যে, ইহাতে কার্ণ ছাড়া গন্ধক, ক্ষয়প্রাপ্ত প্রভৃতি অপর্যাপ্ত, অন্তিরক প্রথা থাকে; আকর পোড়াইবার সময় সেই ভ্রম লৌহে হাইয়া প্রবেশ করে; সেই সমুদ্র ভ্রম কিরূপে দুইহায়ে করিতে হয়, তাহা লোকে জানিত না; সেই জন্ত পাথুরে কল্যাণ ব্যবহার হয় নাই। পাথুরে কল্যাণকে কল্যাণ করা হইলে, অনেকটা দোষের ভায়ে দৃষ্টান্ত হয়; সম্পূর্ণরূপে হয় না। তবুও ১৯০০ সাল হইতে কোকে ব্যবহৃত “আরম্ভ” হইয়া লৌহ-কার্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। পাথুরে কল্যাণ ও কোক দিয়া আকর হইতে প্রায়ে অপরিসীম লৌহ বাহির করিয়া নাই, পরে তাহাকে পরিশুদ্ধ করিবার উপায় বিলাতের লোকে জন্মে আবিষ্কার করিলেন। লৌহ পরিশুদ্ধ করিবার প্রধান উপায়কে “পাডলিং” বলে। পরিশুদ্ধ করিবার উপায় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে কল্যাণ ও কোক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইতে লাগিল। আর বিলাতে “লৌহ-নিষ্কাশ-কার্য” দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল।

কল্যাণ যদি আমাদার-আপনি ভাঁটের ভিত্তি ও



পূর্বেই বলিয়াছি যে, যদি আকরে কেবল লৌহ ও আয়রেনে থাকিত, তাহা হইলে তাহা না ছিল না। অক্সিজেন হইতে লৌহকে পৃথক করিয়া লওয়া বড় কঠিন কথা। মনে, আকরের অক্সিজেন বস্তু মিশ্রিত থাকে; তাহা দিগে মধ্য গন্ধক ও ফসফরাস বস্তুই অপেক্ষারী। বিলাতের আকরে প্রায় এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। আর আকরের বিষয় এই যে, দুই স্থানে যেখানে প্রচুর পরিমাণে লৌহ প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ ক্রিস্টলা ও ও দক্ষিণ-স্ট্রামোন্ড-শায়ার, সেইখানকার লৌহের আকর সর্ব্বের চেয়ে নিকট। আকর নিকট ঈষ্ট, কিন্তু সেখানকার মতুষ্যের বুদ্ধি-কৌশল আবার সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট। তাই স্বভাবের নিকটতা, মানব-বুদ্ধির উৎকৃষ্টতার নিকট পরাভব মানিয়াছে। বুদ্ধিগণে তাহারা গন্ধক ও ফসফরাসকে লৌহ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। তার পর গন্ধক ও ফসফরাস ছাড়া লৌহ-আকরে মৃত্তিকা অনেক থাকে। এই মৃত্তিকায় সিলিকন ও আলুমিনিয়ামের ভাগই অধিক। যেমন লোকে কার্পাস দিয়া আকর হইতে অক্সিজেনকে ভুলাইয়া বাহির করিয়া লয়, তেমনি আর একটা পদার্থ-সিরা সিলিকন ও আলুমিনিয়ামকে ভুলাইয়া লইতে পারে। যার সে পদার্থটা চূন। লৌহ-নিষ্কাশ-কার্যে এই জন্ত চূনের ব্যবহার হয়। ঐ কথা রাষ্ট্রপঞ্জের লৌহকারখানার বিষয় বলিবার সময় উল্লেখ করিয়াছি। আকর গলাইলে, অক্সিজেন নির্গত হইয়া ঘাইলে, যদি সিলিকা প্রভৃতি বাষ্পীভূত ও মৃত্তিকা লৌহের সহিত অধিক পরিমাণে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সে লৌহ অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হয়। তাই আকরে চূন মিশাইয়া দিলে, সেই সিলিকা প্রভৃতি সবসমুহ ঘাইয়া চূনের সহিত মিশ্রিত হইয়া, কামার মত এক প্রকার স্রোতের উৎপত্তি করে। তাহাকে শ্রাপ বলে, আমরা ইহাকে লৌহ-মল বলি।

বিলাতি মতে লৌহ প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই;—প্রথমে উত্তীর্ণ ভঙ্গপ্রবণে প্রায় দুই মণ শুক কাঠ সাজাইয়া দিতে হয়। তাহার উপর প্রায় ২০ মণ কোক কয়লা রাখিতে হয়। তাহার উপর আকর ও চূন একমুদ্রে থাকে-থাকে রাখিতে হয়। কাঁচা পাথুরে কয়লা বা কোক কয়লা এবং তাহার উপর চূন ও আকর,—এইরূপে পাঁজার মত থাকে-থাকে সাজাইয়া উত্তীর্ণ উত্তরার ততীয়াংশ পর্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হয়। এক্ষণে কাঠে অগ্নি

দিয়া বাতাস দিলেই তাঁটি ধরিয়া উঠে। তাঁটির ভিতর কয়লা ও আকর যত পুড়িতে থাকে, ক্রমাগত সেই পরিমাণে আরও কয়লা এবং আরও আকর ঢালিয়া দিতে হয়। এই প্রণালীতে সাজাইলে নীচে কাঠ ও কয়লা এবং তাহার উপর ক্রমাগত যত্নে যত্নে আকর ও কয়লা থাকে। নীচের কাঠ ও কয়লা ধরিয়া উঠিলে তাহাতে উত্তাপ হয়। তাহাতে লৌহ উত্তাপ দিয়া আকরে লাগে। তাহাতে আকরের অক্সিজেন পৃথক হইয়া পড়ে। নীচে কাঠ ও কয়লা পুড়িয়া যে, কেবল উত্তাপ বাহির হয়, তাহা নহে। সেই কাঠ ও কয়লার কার্বন অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয়; মিশ্রিত হইলে কার্বনিক অম্লবাপের উৎপত্তি হয়। তাঁতার বায়ু প্রবল বলে এই কার্বনিক অম্লবাপ উপরে উঠিতে থাকে। কার্বনিক অম্লকে উপরে তাড়িত করিলে বিলায়ই লোকে জাঁতা তাঁটির ভঙ্গপ্রবণ বসাইয়া থাকে। সে উদ্দেশ্য যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁটির গায়ে আর কোথাও জাঁতা বসাইলে চলিত পারিত। কার্বনিক অম্ল উপরে উঠিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে আকর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অক্সিজেন অবস্থান করিতেছে। কার্বনিক অম্ল—কার্বন, ও অক্সিজেন, এই দুই বস্তুর মিশ্রণ হয় বটে, কিন্তু অক্সিজেনের দ্বারা এখনও ইহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় নাই। উত্তাপের সহিত অক্সিজেন শাইলে, কার্বনিক অম্ল আরও ইহা গ্রহণ করিতে পারে। তাঁটির উপরিভাগে আকর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেখানে অক্সিজেন অবস্থান করিতেছে, সেইখানে আসিয়া ইহা অক্সিজেনকে দেখিতে পায়। তাহা গ্রহণ করিয়া লয়। এইরূপে অক্সিজেন লৌহ অক্সিজেন-শূন্য হইয়া পড়ে। যদি আকরে কেবল অক্সিজেন ও লৌহ থাকে, তাহা হইলে এইখানেই কাজ বন্ধ করিয়া দিলে চলিতে পারে। কারণ, অক্সিজেন গিয়াছে—এখন কেবল লৌহ-রহিয়াছে। আমাদের লৌহের আবগার, আমরা অন্যান্যসে সেই লৌহ বাহির করিয়া লইতে পারি। কিন্তু যেখানে আকর ভাল নয়, সেখানে তাহাতে অক্সিজেন ছাড়া অপরাপর দ্রব্য থাকে; সেই অপরাপর দ্রব্য এখনও বাহির হইয়া যায় নাই। এখন তাহারিণকে, বাহির করিতে হইবে। তাই আকরকে আরও নীচে আগিতে দিতে হইবে, আরও ভাল দিয়া ইহাকে একবারে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। গলাইয়া ঘাইলে, ইহা চূনের সহিত মিশিয়া

পরিমানে বিস্তৃতভাবে বাহির হইয়া আসে। ইহাতে বাঘা কিছু অমার ভাষা থাকে, তাহা উত্তপ্ত করিয়া পিটসেই বাহির হইয়া যায়। কিন্তু, বিস্তারিত বড় কারখানা; বাছিয়া বাছিয়া অল্প স্বল্প আকার লইলে তাহার কাজ চলে না। কাঠের কয়লা দিয়া একপ্রকার কাঠালাইতে হইলে পুষ্টি বস্তুশূন্য হইয়া যাইবে। সেই জন্য সেখানে নিকট পানীয় ও নিকট পোড়াইবার জন্য ব্যবহার করিতে হয়। সেই জমাই সেখানে উঠি হইতে যে পোহ বাহির হইয়া আসে, তাহাতে বিশেষরূপ অন্তরিকর ব্যব্যাদি মিশ্রিত থাকে। পরে পডলিং করিয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। কাচ গলিবার জন্য কৈশিক লোকে, তন্দুর করে, পডলিং করিবার জন্য স্নেহরূপ একটা চক্ৰক্ষেপ তন্দুর নির্মাণ করিতে হয়। এই তন্দুরের একদ্বারে অগ্নি জালাইবার স্থান, আর বারের পিগলোই থাকে। এই পিগলোহে কেবল অগ্নির উত্তাপ বায়ীরা নামে, অগ্নি ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ অগ্নি স্পর্শ করিলে ইহাতে পুনরায় করণ্য হইতে অন্তরিকর পদার্থ বায়ীরা মিশিবে। কেহ কেহ তন্দুরের পিগলোবের সহিত লবণ প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইয়া দেন। অস্থমান, যে তাহাতে গন্ধক ও কক্ষরস মিশ্র বিদ্ধি হইয়া যায়। অগ্নির উত্তাপে বধন লৌহ গলিতে আরম্ভ হয়, তখন বাহা হইতে ছোট ছোট বৃহৎ বাহির হইতে থাকে। এই বৃহৎ প্রথম প্রথম ভাসা-ভাসা উপর হইতে উঠে, আর উড়িয়াই কাটিয়া যায়। ক্রমে ইহা অধিকতর ভিতর হইতে বাহির হয় এবং এই সময় ভীষ্মত লৌহ দ্রুতগতি বাকে। মাঝে মাঝে ইহা হইতে বোয় নান্যবর্ণের শিখা উদ্ভিত হয়। লৌহেতে যে কার্পণ থাকে, সেই কার্পণ পুড়িয়াই এই শিখার উৎপত্তি। বড় বড় লৌহের তাত্ত্ব দিয়া এই সময় গলিত লৌহকে তন্দুরের ভিতর বন বন নাড়িতে হয়। এই ভয়ঙ্কর উত্তাপের নিকট দাঁড়াইয়া গলিত লৌহকে ক্রমাগত সঞ্চালন করা বড়ই পরিভ্রমের কাব্য। একজন মানুষ অগ্নির উপরই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাই দুই জন লোকের আবশ্যক। একজন শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, আর একজন তাহার হাত হইতে তাত্ত্ব লইয়া কাচ ঢালাইতে থাকে। তাত্ত্ব মূর্ত তন্দুরের উত্তাপে কোমল হইলে ইহা জলে ডুবাইয়া পুনরায় শীতল করিয়া লইতে হয়। এইরূপ নাড়িতে নাড়িতে তন্দুরের ভিতর

দ্রবীভূত পদার্থরাশি ক্রমে গাঢ় হইয়া আসে। ইহার ভিতর এক্ষণে দুই প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, এক দানাদার, দ্বিতীয় তরল। দানাদার পদার্থ গুলি বিস্তৃত লৌহ, তরল পদার্থটা সিলিকন প্রভৃতি অসার দ্রব্যসমূহ। বর্তমানে উত্তাপ হউক না, অসার বিস্তৃত লৌহকে একবারে গলাইতে পারা যায় না। লৌহের সহিত অক্সিজেন দ্রব্য মিশ্রিত থাকিলে তরল পদার্থ বায়। পিপলোহেতে অক্সিজেন দ্রব্য মিশ্রিত ছিদ্ৰ বুলিয়া তাই বুলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে তন্দুরের অভ্যন্তর উত্তাপে সেই সিলিকন প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ তরল হইয়া বিস্তৃত লৌহগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; বিস্তৃত লৌহ-দানার আকারে সেই তরল পদার্থের মধ্যে অবস্থিত করিতেছে। দানাদার গুলি বায়ে যে কিছু গন্ধক বা কক্ষরস লাগিয়া থাকে, তাহা তাত্ত্বর সঞ্চালনে দ্রবীভূত সিলিকন দ্বারা বোত হইয়া যায়। নাড়িতে নাড়িতে তরল লৌহ-দানাদার গুলি তরল পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া তাল-বন্ধিতে থাকে। তখন পডলিকাটা তাত্ত্বকে তন্দুরের ভিতর এক পাশে রাখিয়া পিপলোহে তন্দুরের উপরে দুবাইয়া-দুবাইয়া তালটাকে বড় করে। তালটা বড় হইলে, আর অনেকগুলি তাল প্রস্তুত হইলে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া আসে। যেমন অগ্নি বস্তুর ভিতর জল থাকে, তেমনি এই লৌহ তালের ভিতর দ্রবীভূত সিলিকন প্রভৃতি পদার্থ থাকে। সেই জন্য তালগুলিকে কলের হাতুড়ির নিচে রাখিয়া নিগড়াইয়া ফেলিতে হয়। তালগুলি কিন্তু এখনও বোয় লৌহভিতর, বোয় উপায়গত। তাই লৌহে নির্ণীত গাড়ি করিয়া তালগুলিকে লোকে কলের হাতুড়ির নিকট লইয়া যায়। কলের হাতুড়ির নিচে রাখিয়া তন্দুয়া চাপ দেয়। বেগের কাণ্ড, হাতুড়ি গুলিও সেইরূপ। এক একটা হাতুড়ি শত শত হস্তীর বল ধারণ করে। জল অথবা ন্যায় বস্তু পরিচালিত হয়। ইহারা যদি আপন-নিপের সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ করে, তাহা হইলে এক্ষণে চূর্ণ করিয়া গলিত পাবে। আবার এক্ষণে এরূপ ধীর ও শান্তস্বভাব যে আরও কেবল অগ্র-ভাগটা পান্সিয়া দিতে বলিলে, তাহাও পান্সিয়া শান্ত হইতে পারিবে। এ সকলই মহাপ্রাকৃতিক শক্তির মনুষ্য-বুদ্ধির লীলা। লৌহজালগুলি ক্রমাগত ক্রমে গড়ই কর্তন হইতে থাকে, ততই হাতুড়ির বন বন চাপে ইহা হইতে সিলিকন প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ দূরে

নিষ্কপ্ত হয়। তাহার কাছে কেহ দাঁড়াইতে পারে না। বাহারা কাছে থাকে, প্রাণ পাড়াইবার ভয় লৌহনিষ্ঠিত বস্তু দ্বারা মাথা হইতে পা পর্যন্ত আচ্ছাদিত হইয়া, তখন কাজ করে। এক্ষণে পডলিং কাজ সমাপ্ত হইল। ইহা দ্বারা ঢালালৌহ পরিষ্কৃত হইয়া পোট-লৌহে পরিণত হইল। কলিকাভার বাজারে ব্যবসাদারেরা এই লৌহকে 'রিকাইড' অর্থাৎ 'পরিষ্কৃত' নাম দিয়াছেন। সুইডেন দেশের চুবক আকার হইতে কাঠের কয়লা দ্বারা প্রস্তুত উৎকৃষ্ট সুইডিশ-লৌহ এখন আর অধিক পরিমাণে এক্ষণে আমদানি হয় না। রিকাইড লৌহে দ্বারাই সকল প্রকার ভাল কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার চেয়ে নিকট পোট-লৌহকে কলিকাভার ব্যবসাদারেরা 'ইগিশ' নাম দিয়াছেন।

পডলিংের পর পোট-লৌহ যে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইল, তাহা বলিতে পারা যায় না। এখনও ইহাতে কার্পণ প্রভৃতি অপদারপ দ্রব্য অতি সামান্যভাবে মিশ্রিত থাকে; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। এই লৌহে সকলপ্রকার কাজ হইতে পারে। কেবল, যে সকল লৌহনিষ্ঠিত বস্তুকে দারুণ বল সহ্য করিতে হয়, সেই সকল বস্তু পরিষ্কৃত করিতে হইলে এই লৌহকে আরও একটা পরিতত্ত্ব করিয়া লইতে হয়। বারবার উত্তপ্ত করিলে, ইহার সেই স্বসামান্য কার্পণ গাঢ়তর পুষ্টিয়া যায়। আর পিটলে উত্তাপে রাখা কিছু সিলিকন প্রভৃতি অসার দ্রব্য থাকে, তাহা বাহির হইয়া পড়ে। পোট-লৌহে হাফসে একেবারে দ্রবীভূত হয় না, গঠন পরিবার জন্য দ্রবীভূত হইবার আবশ্যকও নাই। কারণ, লৌহের এই আচরণ গুণ আছে যে, হইতে উত্তপ্ত লৌহ একজ পিটলেই দ্রবীভূত মিশিয়া একগুণ হইয়া যায়। এইরূপে বড় বড় লৌহনিষ্ঠিত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু বড় বড় ইচ্ছা তত বড় লৌহ-নিষ্ঠিত দ্রব্য, বড় ইচ্ছা তত বুল করিতে পারা যায় না। অস্ত্রায় বড় ও অস্ত্রায় বুল একগুণ লৌহ করিতে হইলে অনেক তালি ছোট ছোট লৌহগত জুড়িয়া করিতে হইবে। অনেকগুলি লৌহ জুড়িতে হইলে, সেই লৌহ গুলিকে বারবার পোড়াইতে ও পিটতে হইবে। বারবার পোড়াইতে হইলে, এই বড় ভাষে হয়, বাহির অক্সিজেন বায়ীরা পাছে ইহার সহিত মিশ্রিত হয়। যে অক্সিজেনকে উঠি করিয়া কয়লা পোড়াইয়া আকার হইতে বাহির করিয়া দৌড়াইয়া হইয়াছে, এক্ষণে তাই ভাষে

আবার পাছে সেই অক্সিজেন পিয়া লৌহতে প্রবেশ করে। তাহা হইলে যে আকার ছিল, পদার্থটা পুনরায় লৌহ ও অক্সিজেন, সমন্বিত সেই আকার হইয়া দাঁড়াইবে। পোট-লৌহকে প্রথম কয়েক বার পোড়াইলে যে ঘটনা হয় না; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে, পোট-লৌহ অনেক পরিমাণে পরিষ্কৃত হইলেও ইহাতে এখনও কার্পণ ও সিলিকন বৎসামান্যভাবে মিশ্রিত থাকে। অক্সিজেন এই সময়ের বস্তুকে লৌহ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। প্রথম বার-কত পোড়াইবার সময় বায়ুর অক্সিজেন 'তাত্ত্বদ্বিগুণ' মনুষ্যে পাইয়া, তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হয়, লৌহকে স্পর্শ করে না। কিন্তু পোড়াইতে পোড়াইতে এই সকল দ্রব্য ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসে, তখন কাছের আর কাছাকেও না পাইয়া অক্সিজেন বায়ীরা লৌহকে সঞ্চালন করে; সেই জন্য যতবার মনে করি, ততবার পোট-লৌহকে পোড়াইতে পারি না। বার-বার পোড়াইতে না পারিলেও এদিকে অনেকগুলি লৌহকে একজ সংযুক্ত করিতে পারি না; সেই জন্য বড় বড় ইচ্ছা তত বড়, বড় ইচ্ছা তত বুল এক গুণ পোট লৌহ নিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই জন্যই সাহেবেরা দ্বিতীয় লৌহ-স্তম্ভ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন। অল্প দিন পূর্বে হইয়া। এত বড় লৌহগত নির্মাণ করিতে পারিলেই না, এখন বোধ হয় করিতে পারেন। ইয়াঙ্কনগের সুইডিশ জাহাজ সকল বুল লৌহপ্রস্তুত দ্বারা আঁত, যে, ভক্তপক্ষীরে পোলাওনি তাহাকে ভেদ করিয়া গুলিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অল্প দিন গত হইল সকলেই মনে করিতেন যে, সিকি বাত বুল ইহার চেয়ে অধিক পুরু লৌহপ্রস্তুত প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। কিন্তু বিলাতি শত শত কোটি আছে, যাহারা সর্বমুখই এই চিন্তা করেন যে, প্রাচীন ভাবান্বিত যা প্রাচীন ক্রমায়াদি অপেক্ষা আরও কিসে ভাষা হইতে পারে। পূর্বে বিলাতি নানারূপ কুমস্বার ছিল, নৃত্য বস্তুর উপর বিলম্ব রাখা ছিল। অত কোন বিশেষ কুমস্বার বন্ধক না বা থাকুক এ সম্বন্ধে এখন আর একবারও পারি না। নতুন বস্তুর আবিষ্কার করা যাহারা চিন্তা ও নিয়ন্ত্রণ কুবেন তাহাদিগকে এখন আর কেহ পরিহাস করে না। এখন সন্মুখ একটি নতুন বস্তু আবিষ্কৃত হইলে আপদের সহিত তাহা সকলেই গ্রহণ

করেন। গ্রন্থ করিলে তাঁহাদিগের ধর্ম লোপ হয় না। জনব্রাউন নামক একটী লোক মনে করিলেন, যে কি কথা? সিকি হাতের চেয়ে তুল লৌহ-পত্র কেন হইবে না? আমি শুভা করিব। তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিলেন—গবর্ণর আফ্রিকার নিকট আমি আপনাদিগকে অঙ্কিত তুল লৌহ-পত্র প্রস্তুত করিয়া দিব, আপনাদিগকে সেই তার দিন। এরূপ কার্য করা অসম্ভব বলিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না; তাবিলে, এ লোকটা বাতুল। জনব্রাউন মরুর আবেদন করিলেন যে, আমি নিত্য আপনাদিগকে এইরূপ লৌহ-পত্র প্রস্তুত করিয়া দিব, অথবা আমাকে দাম দিতে হইবে না। আমি এইরূপ লৌহ-পত্র প্রস্তুত করি, তাঁহার উপর আপনাদিগকে পোতা মারিয়া দেখুন, যদি তাহাকে ভেল করিয়া পোতা যায়, তাহা হইলে আমাকে দাম দিবেন না; যদি না যায়, তাহা হইলে আমাকে দাম দিবেন। গবর্ণমেন্ট একথা শুধুত্ব হইলেন। সেইরূপ লৌহ-পত্র প্রস্তুত হইল, জনব্রাউন আবার, মূল্য পাইলেন, তিনি ধন্যবাদ করিলেন, তারাদের নিকট পূজা হইলেন, খ্রীষ্টমহারাজি তাঁহাকে নানা উপাধি দ্বারা ভূষিত করিলেন। এক্ষণে সেও বৃদ্ধ তুল, বড় বড় লৌহ-পত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এরূপ কার্য প্রশস্ত ঘরের ভিতর সম্পন্ন হয়, সেই ঘরের চারিদিক একবারেই পকে না। তাঁহার ভিতর অগ্নিজন প্রবেশ করিতে পারে না।

লৌহের বিষয় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইলে এক-বানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া যায়। দুই চারি কথার মাফিক মনে করিয়াও প্রবক্তা এত বড় হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এক কথা লইয়া আর পাঠকগণকে জ্ঞাতান করিব না। লৌহের রূপা একপ্রকার শেঁক কর্তব্য। তবে এই কথা মনে করিয়া দিই যে, বিজ্ঞানের সহায়তায় বড় বড় লৌহের কারখানা একবারেই চলিতে পারে না। প্রথমে আকরকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহাতে কি কি পার্থক্য আছে, তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। কারখানা চলিবার মত সেই আকর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে কি না, তাহা দেখিতে হইবে। সে আকর অল্প আকর নিশাইতে হইবে কি না, বিজ্ঞানের সহায়তায় তাহা স্থির করা আবশ্যক। নিশাইবার আকর আবার

মূল্য কি না, তাহা জানিতে হইবে। আকরের সহিত ক্রিপ্প রূপের আংশক, সে চুপ কাতে আছে কি না, পোড়াইবার ভয় কি আছে, সে করণ্য ক্রিপ্প, এইরূপ পুণ্যমুখরূপে অহস্কানও মীমাংসা করিয়া লইলে তবে কাজ চলিতে পারিবে। তাহার পর উচিত নির্দেশ করিয়া কম-কম্বা বসাইয়া কাজ আরম্ভ করিলেও পদে পদে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক। দশ লক্ষ টাকার কম মূল ধন লইয়া কাহাকেও আমি লোহার কাজ করিতে পরামর্শ দিই না। বিলাতি ঘরে কাঠখানা ছিল যে যদি ধর্মলোপ না হয় তো বিদ্যাদিগের কোম্পানির কাগজ আছে, তাহার যদি তাহা বেশিয়া এই কাজে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে অন্যান্যসেই লাভ হইবে পারে। এ দেশের অনেক পরিষদ লোকও প্রতিপালিত নাই। টাকা না খরচ করিলে টাকা হইবার সম্ভাবনা নাই।

(সমাপ্ত।)

ত্রিভৈলোকানাম মুখোপাধ্যায়।

গো-মড়ক।

জন্ম পাঠের সংক্রামক পীড়ার অনর্থকর। সংক্রামক পীড়ার বস্তু—কোন এক স্থানের কোন এক শ্রেণীর একটি জন্ম আক্রান্ত হইলে, সেই পীড়াক্রমে সেই স্থানের সেই শ্রেণীর সকল জন্মকে প্রায় আক্রমণ করে। যথের বিষয় অধিক সংক্রামক পীড়ার এক শ্রেণীতেই আবদ্ধ, অর্থাৎ একশ্রেণী হইতে জন্ম শ্রেণীতে বিস্তার করে না। মনুষ্যজাতি-মধ্যে বসন্তরোগ অভিশ্রম সংক্রামক ও মারাত্মক, কিন্তু ইহা মনুষ্যজাতিতেই আবদ্ধ। বিবৃটিকা রোগও এইরূপ। পোজাতি মধ্যে ক্রমশঃরোগে অভিশ্রম সংক্রামক, পালের মধ্যে একটি গরুর এই রোগ হইলে, ক্রমে ক্রমে সকল গরুই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু বর ও শুভ্রা করিলে, এই রোগের প্রায় মরে না এবং ইহা পোজাতি হইতে অল্প জাতিতে বিস্তার করে না। অর্থাৎ আমরা যে রোগের আলোচনা করিব, তাহাও কেবল পোজাতিতে আবদ্ধ, কিন্তু ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ও মারাত্মক। বাঙ্গলাদেশে পোজাতি এরূপ শত্রু

আর নাই। ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া সুকঠিন। বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ গরু এই প্রলম্ব শত্রুর হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিতেছে। ইহাতে কৃষক, গোয়াল, গৃহস্থ, সর্বশ্রেণীর লোকের যে কত ক্ষতি হয়, তাহা আর গণিয়া জানাইতে হইবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, আমাদের দেশের লোক ইহার প্রতিবিধান বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃশেষ। আমরা চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই রোগের আবির্ভাব, বিস্তার ও চিকিৎসা-প্রণালীর আলোচনা করিতেছি এবং আলোচনার ফল প্রকৃপ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট সাহায্য থাকা, গো-মড়ক নিবার অসম্ভব হইলেও, ইহার প্রাচুর্য, বিস্তার ও তজ্জনিত ক্ষতির পরি-মাপের হ্রাস করা, আমাদের নিজের সম্পূর্ণ আশ্রয়। কিশোর ইহা আমাদের সম্পূর্ণ আশ্রয়, অর্থাৎ তাহাই আমাদের বন্ধন।

আমরা যে মারাত্মক সংক্রামক রোগের উল্লেখ করিতেছি, নানা স্থানে তাহার নাম প্রায়ের নাম। তন্মধ্যে দুইটা নাম প্রধান, যথা শুটী ও বসন্ত। যদিও লোক ইহার বসন্ত নাম দেয়, কিন্তু ইহা প্রকৃত বসন্ত নহে। প্রকৃত বসন্তও অভিশ্রম মারাত্মক; কিন্তু মূলের বিষয়, উহা অতি বিরল। অতএব উল্লিখিত রোগের বসন্ত নাম দেওয়া বড় ভুল; সেই জন্ম আমরা ইহাকে শুটী বলিয়াই উল্লেখ করিব।

চিকিৎসার শুটীর কোন উপশমই প্রায় হয় না। ইহাতে গরুর কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হয় মাত্র। সেই জন্ম শুটীরোগজাত্যে গোমহিষের চিকিৎসা শুভ্রার বিক্ষার প্রকারে দেখাশোনা সংক্রামক আলোচিত হইবে।

কোন পালে শুটীরোগ উপস্থিত হইলে, পালকে-পাল গরু মরিতে, আমরা প্রচক্ষে দেখিয়াছি, কমাচিং হই একটা ঘরে; কিন্তু ইহাকে নিম্ন নাম যায় না। আমাদের দেশের গোয়াল, বৃষক ও গৃহস্থ কেবল অতৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকে, তাহাতে একটা গরুর শুটী হইলে, পালের কোন গরুটী বাগ পাড়ে না; অনতিবিলম্বে সকল শুটীই সেই ঘরে আক্রান্ত হয় এবং সংক্রামক দেখা যায় যে, গোপাঞ্জাত গরুগণের মধ্যে শতকরা ৭৫টা মরে, বাকি ২৫টা মরে; এবং একশত গরুর মধ্যে ৭৫টা মরে, ২৫টা বাকী ২৫টা কতক দিনের জন্ম শুটী দ্বারা বঁচিয়া পড়ে। ইহা শুটী পাল হইলে, বাকী

২৫টার মধ্যে ২৫টা শুটীতে সকল শুটীই সে 'বিদ্যনের' জন্ম অকর্মণ্য হয়। উপরে বলা হইয়াছে, চিকিৎসার এ রোগের প্রায় উপশম হয় না। অতএব যাহাতে রোগের আবির্ভাব না হয়, অথবা তাহা দূরীভূত এবং রোগের আবির্ভাব হইলে, যাহাতে উহা বিস্তার করিতে না পারে, সেই সকল উপায়-অনুপায় বিধেয়।

যেপোজাত্য গরুর সহিত কোন প্রকার সংস্রব না হইলে, এ রোগ জন্মে না। সেই জন্ম সংস্রব বন্ধ করিতে পারিলে, এই রোগ কোন প্রকারে আবির্ভূত হইতে পারে না। এক্ষণে কথা হইতেছে, কি প্রকারে সংস্রব বন্ধ করা যাইতে পারে? যে সকল গৃহস্থ দুই চারিটা বা দশ পঁদরটা গাভী পুষ্টিমা-ধাকেন এবং উহাদিগকে মাঠে চরিতে পড়ে না, তাঁহাদের পক্ষে সংস্রব বন্ধ করা অতি সহজ; কারণ, তাঁহাদের গাভীর সহিত অপর লোকের গাভীর আদৌ কোন সংস্রব নাই। তবে তাঁহাদের এ কাজটা বিষয় জানিয়া রাখা উচিত। যদি তাঁহারা নূতন গাভী জন্ম করেন, বন্ধন বেন নূতন গাভীকে পূনর দিনের মধ্যে পুণ্যতন গাভীর সহিত মিশিতে দেওয়া না হয়। কারণ, নূতন গাভীতে শুটী-রোগের দীর্ঘ সুপ্ত অবস্থায় থাকিতে পারে এবং পূনর দিনের মধ্যেই উহা প্রকাশ পায়। পূনর-দিনের মধ্যে যদি রোগ প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে, গাভী নীরোগ। সকল সময়ে এরূপ সতর্কতা আবশ্যক করে না, বন্ধন পড়াতে এই রোগ দেখা দেয় এবং দাম দান্নান মাসে, বন্ধন এই রোগ প্রায়ই আবির্ভূত হয়, তখন এরূপ সতর্কতা অবগনহীন না করিলে বিশেষ বিধি হইবার সম্ভাব।

যে সকল গৃহস্থ মাঠে গরু চরিতে দেন, তাঁহাদের পক্ষে সংস্রব-দোষ একপ্রকার বন্ধ করা অসম্ভব। তবে যে সময়ে গ্রামে ও নিকটবর্তী স্থানে রোগ দেখা দেয়, সে সময়ে বন্ধনই গরুকে পালে চরিতে ছাড়িয়া দিবে না। গৃহস্থ বাথাল রাখিয়া পুষ্টিমা-ধাকেন, রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। যে মাঠে গোপাঞ্জাত গরু চরিয়া গিয়াছে, তাহাতে নীরোগ গরু চরিলে, উহার সেই রোগ হওয়া নিতর্য্য এবং বাকী ২৫টা কতক দিনের জন্ম শুটী দ্বারা বঁচিয়া পড়ে। ইহা শুটী পাল হইলে, বাকী

অভিজ্ঞান শকুন্তল ও পদ্মপুরাণ।

(২)

মহর্ষি কবেই তপাবনে মহারাষ্ট্র হ্রদন্তরে
সহিত শকুন্তলার গাঙ্কর্ষ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।
রাজা নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য,
দ্রুহস্ত তখন না, শকুন্তলাকে গাঙ্কর্ষ-বিবাহের
শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া দিয়া, তাঁহার চিত্তপ্রসাদ-উপাদানে
সম্মত হইয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি শকুন্তলাকে অক-
শানে সম্মত করিতে পারেন নাই। “অভিজ্ঞান-
শকুন্তল”র এই ভাব, উপাখ্যানে অবশ্য সেই
ঐতিহাসিক-ব্যাপার। উপাখ্যানের দ্রুহস্ত কাহিনীকে
নিশ্চিতই ভুল মনে করেন নাই;—নহিলে একথা
বলিলেন কেন,—“তপসী কাঁপল এই ষট্মা শুনিয়া
কি করিলেন?” মহারাষ্ট্রের দ্রুহস্ত ইহাই ভাবিয়া
ছিলেন,—“তপোযুক্ত ভাবনা কণ আশ্রমে আসিয়া,
এ সমস্ত প্রবণ করিয়া, কি বলিলেন, কি করিলেন?”
নাটকের দ্রুহস্তকে একথা ভাবিতে দেখি নাই।
উপাখ্যানে বাহা প্রকৃত, নাটকে তাহা প্রকৃত না
হইলেও, প্রকৃতিকে ছাড়িয়া যায় নাই। যিনি সরল
বিশ্বাসে, গাঙ্কর্ষ-বিবাহের প্রকৃত্য উপস্থাপন করিতে
শায়েন, তিনি একগু ভাবিতেও না পারেন। পূর্ব-
প্রেমের পূর্ণনিষ্ঠা-ব্রাহ্মণের অন্তঃসত্তারী কল্যাণ, ঘটনা-
কল্পে পড়িয়া দ্রুহস্তকে এইরূপে করিত।
যে ঘটনাক্রমে পড়িয়া নিরপরাধা সভা শাস্তি “ডেন-
জৌনাল”কে প্রাপ-প্রিয়তম ওৎসবের হস্তে প্রাপ-
নির্দোষ করিতে হইয়াছিল, তাহা বুলিলে ওৎসবের
প্রতি আর মোহ সেওয়া ঘটনা উঠে না। তবে বাহা
জান, তাহা ভালই—“বাহা মন, তাহা মনই।
দ্রুহস্তের প্রিতা ক্রীতি থাকিলে, দ্রুহস্তকে কখনই
একগু ভাবে বিবাহ করিতে দিতেন না। কাহিনী
যে আনন্দজনক-স্বভাবের সম্ভব নাই। নাটকের
দ্রুহস্ত নাই তাই—প্রিয়বাদকে ভাবিতে হইয়াছিল;
নহিলে প্রিয়বলা কেন একথা বলিলেন,—“পিতা
কণ একথা শুনিয়া কি বলিলেন?” উপাখ্যান বা
নাটকে কাহাওও দুর্বলতা ফলভীয়া হয় নাই। মহর্ষি
কণ আশ্রমে প্রত্যাপিত হইয়া একথা শুনিয়াছিলেন
কট; কিন্তু বিরক্ত হন নাই। উপাখ্যানে এইরূপই
উদ্দেশ্য।

“একনিমিত্তক-বিপ্র কণোহপ্যাসমমগমম।”
শকুন্তলা তু পিতরং প্রিয়া নোপগম্যম অম।

বিজ্ঞায়াঃ চ তাং কণো দিব্যজ্ঞানেন মারিষ।
উবাচ ভবানু প্রীতাঃ ত্রীড়মানাঃ শকুন্তলাম।
পুণ্যবা ভক্তে রহসি মামনাভাষা যঃ কৃতঃ।
তস্য সর্ব সমাবেষো নাসৌ ধর্মোপশ্রাব্যকঃ।
কল্লিষ্ঠ হি গাঙ্কর্ষে। বিবাহঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
সকামায়াঃ সকামতঃ নির্ময়ো রহসি যুজ্যতঃ।
মহাশো নো মহারাষ্ট্রঃ পুরুষপপ্রীতপনঃ।
যং পতিঃ প্রতিপাদ্য যং ভজন্যমং শকুন্তলে।
ময়ামি নিত্য। হৃদ্যসীং যং প্রণয়ানং যুগলং।
মহাশো চিত্তঃ শ্রেষ্ঠো যাদোবৎ মনঃকম্মঃ।
বরং যংদৃশ্যং গোচরে নান্যমাশোকায়ামি তে।
ভেনোয়ঃ নিশ্চিতো রাজা ময়ামি সতুষো বরঃ।
স যদি যদ্যপ্যপাত্য যামগুহ্যং করে নৃপঃ।
অভাব্যনর্ঘপূজ্যতমং ন মমাত্মনুধারীমসী।
মহাশা পুত্রপুত্রং পুত্রপুত্রং যঃ মহাশাঃ।
হি হম্যং ভোক্তব্যং ভুজ্যং ভুজ্যং যাদোবৎ মনঃকম্মঃ।
খামিগম্যপাত্য যামে যংনয়নদ্বিত্যতঃ।
পরমাত্মাত্ত্যক্ত্য চক্রং নমঃ মহাশাঃ।
একগু ভাবিত্যক্ত্যঃ নিত্যং চক্রবর্তিনঃ।
তত্তঃ প্রকাল্য পাসৌ বা সমিধায় ফলানি চ।
যো পবিত্রং পতন্ত্যমিত্রবরীং তং শুচিগিহা।
দেব মর্যাদৌ রুচো রাজা পৌরষঃ পুরুষাতমঃ।
স তদ্যামিত্রপাত্য যাম্যং কুরুধর্মি পিতঃ প্রজো।
প্রদান্য কুরু ওৎসবী সামান্ত্যত মনোভবঃ।
পুত্রাংগলং, যশঃকণ্ড, ত্রিতার আযার।
ভাবার্থ—ইহার পর মহর্ষি কণ আশ্রমে
সমাপত হইলেন। লজ্জাবতী শকুন্তলা পিতার
নিকট গাইতে পারিলেন না। কণ বিশ্বাস্য
মামস্ত অগত হইয়া প্রীতমনে লজ্জাশালিনী শকু-
ন্তলাকে বলিলেন,—“তুমি আমাকে তাহা বোঝার
পুরুষসে সহিত যে মর্গ্যপ করিয়াছ, ইহাতে তোমার
মর্ঘ্যমান হইয়া নাই। ক্ষত্রিয়ের গাঙ্কর্ষ-বিবাহ শ্রেষ্ঠ
বলিয়া উক্ত। নির্দোষ হানে সকাম কামিনীর সহিত
সকাম পুরুষের যে মর্গ্যপিত মর্গ্যপ, তাহাকেই
গাঙ্কর্ষ-বিবাহ কহে। মহাশা মহারাষ্ট্র দ্রুহস্ত পুরু-
ষসেই প্রদীপিত। শকুন্তলে। তিনি তোমাকে ভজন্য
করিয়াছেন এবং তুমিও তাহাকে পুরুষপ ভজন্য
করিয়াছ। তোমাকে কাহার হস্তে মর্গ্যপ করিব,
সত্য প্রায়ার এই চিন্তা হইবে। দাবানলে যেমন
সুখ নষ্ট হয়, সেইরূপ এই চিন্তার আমি নষ্ট
হইতেছিলাম। তোমার মনুষ্য পাত্য কোথাও দেখি
নাই। দ্রুহস্তকেই তোমার পোষা পাত্র মনে করিয়া

ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি যখন স্বয়ং
আসিয়া তোমার পণিগ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর
কিভাবে অতর্কিতরূপে জ্ঞাত স্বস্তর লঘুতা পীকার
করিতে হইল না। তোমার মর্গ্যে মহাশা মনো-
ভাপ পুত্র জন্মিলে। ঐ পুত্র এই সামরমেখলা
পুত্রী ভোগ এবং বনামে বংশ প্রতিষ্ঠা করিলে।
বিশেষের প্রতি বর্ণনাভায়েন সেই মহাশা চক্রবর্তী
রচক সর্গর অপ্রতিহত হইবে। শুচিগিহা শকু-
ন্তলা তাঁহার পাদপুঞ্জ দ্বারা, ফদাণি আনয়ন
করিলেন এবং মহর্ষি উপকটি ও পিতৃভাবিত
হইলে পর, বলিলেন,—“প্রজো! আমি সেই পৌর-
বাজকে বিবাহ করিয়াছি, ইহা তোমার অনুমোদিত;
ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। এখন প্রার্থনা,
সেই সামান্ত্য মনোভবিত প্রতি প্রসন্ন হও।”
মহারাষ্ট্রের এখানে ঠিক এই। নাট-
কেরই বা কোন নয়? কিন্তু নাটকের এখানে
এই ভাব কি অপূর্ণকোষের একটি হইয়াছে,
তাহা “অভিজ্ঞান-শকুন্তল”-পাঠক মনেই অবগত
আছেন। নাটকের শকুন্তলাকেও লজ্জা মস্তক
অবগত করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। মহর্ষি কণ
ত্রিকালজ্ঞ। তিনি সবই জানিতেন,—সবই বুঝি-
তেন। দৈববলেই মহর্ষি বুঝিয়াছিলেন,—শকুন্তলা
ও দ্রুহস্তের নির্দোষ সঙ্গিন্য অবগতহারা। তাহার
উপর দৈববশে। ত্রিকালদর্শী যোবনলম্বণী মহর্ষি
কণকে দৈববশে শিরোধারী করিতে হইয়াছিল;—
তুমি আমি কোন কদম কটীকটীক। সেই অগ্নিহো-
ত্রে, অগ্নিহোত্রে যে অগ্নির সখীয়া মহা আরাধন-রূপে
মহা-আদেব উচিত হইয়াছিল,—
“দ্রুহস্তমনিমিত্ত তেজো ধন্যমং ভূতরে ভূবঃ।
অগ্নিহোত্রে তন্নয়ঃ প্রজ্ঞামিত্রাং শমীমিহ।”
তাহা’কে উপেক্ষা করিতে পারে? যে সামন্ত-
রূপে মনোনি আশ্রম-মর্গ-কণোহ উপদানের নিমিত্ত
বিলয়ে বেগমের নিমিত্ত, তিনি বেগমের অবহেলা
করিয়া, মর্গ-মর্গ-মর্গের ভাবনা লইয়া, বিব্রত
হইলেন কেন? “বাহা দেবতারা আশ্রমে, তাহা
অবগতই সাধিত হইবে। এই ভ্রমই শকুন্তলার
প্রতি মহর্ষি কণের এত প্রসন্নতা। এখন বুঝি
বাহা, উপাখ্যানে যে শেখ-কণার আভাসমাত্র,
নাটকে তাহার বিশেষণ। কি দ্রুহস্ত কৌশলে প্রি-
য়তা ও অনুগ্রহের কল্যাণকরভাবে, সেই দৈব-
শক্তি অসুপ্ত-বিশেষণ হইয়াছে এবং কালিদাসের
আলৌকিক কৃতিত্বই বা তথায় কিরূপ মনোভবিত

হইয়াছে, অভিজ্ঞান-শকুন্তল-পাঠক ভিন্ন কে তাহার
মর্গ-এখানে সম্মত হইবে? দ্রুহস্তের ভক্তকামিনার
মহর্ষি কণের নিকট উপাখ্যানের শকুন্তলা মুখ
মুটিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নাটকের
শকুন্তলা কল্যাণ তাহা করেন নাই,—করিতেও
পারেন না। উপাখ্যানে শকুন্তলা বর চাহিলেন,
মহর্ষি কণও বলিলেন,—
“প্রায়ঃ এত ততঃ পূর্বমেনে ভবিতমিহ।
অকণাঃ পৌরবো রাজা বর্ষায়া চ বিশেষতঃ।
কই দশমি-বংশ তৎমহা কণায়া মা চিহ্নম।”
পদ্মপুরাণ, বর্ষাও, দ্বিতীয় অধ্যায়।
ভাবার্থ—হে ভবিতমিহ। রাজা দ্রুহস্ত পরম
দার্ষিক; আমি পূর্বেরই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি;
তবাপি কি বর দিব বল?—
“ততো ধর্মিষ্ঠিতাং বরো রাজ্যভাষণং তথা।
শকুন্তলা পৌরব্যাঃ দ্রুহস্তভিত্তমায়াম।”
পদ্মপুরাণ, বর্ষাও, দ্বিতীয় অধ্যায়।
ভাবার্থ—শকুন্তলা করিলেন, পৌরব্যাগের
রাজ্য মনে অশ্লিষ্ট ও ধর্ম মস্তক হয়।
ইহার পর উপাখ্যানে মহর্ষি কণের আশ্রম-
বিরমাদি বিবৃত হইয়াছে। এইবার পাঠক বুঝিলেন,
এ সমস্ত গল্পমো কালিদাস কতদূর কৃতিত্বহীন,
কটনা-ভাগ্যের কালিদাসের কৃতিত্ব না থাকিলেও,
সেই টুকুর সামান্যে কি কটনা-কৃতি উৎকৃষ্ট
বিশেষণ চাইতই রমিত হইত। সেইটুকুর
ভ্রমই ভূতর কণের বিব্রতত্ব। নাটকের লক্ষণমহো-
দেব, তেজো, যুগ, রাজাশ্রম ও অভিজ্ঞান-পাঠক
কালিদাস নিমিত্ত অগ্নিহোত্রে কণের আভাস
ও শক্তি দেখাওই সাধিত হইয়াছে।
এখন পদ্মপুরাণোদ্ধৃতি বিবরণটুকু মনোবোধ্য
মুখিত পাঠ করুন।—
“পরেহনি ক্ষুদ্রো যাত্রেপরিবেশে শকুন্তলা।
ন সোচে মনঃ শান্তিঃ চিত্তভীরা মনোভবিত।
কণং নিশাংবল্লাহা হৃদ্যপ জ্ঞাপিতবে।
লিগেণ চ নগেন ক্ষাঃ নালাপাণ সর্বাঙ্গনৈঃ।
কণং বিলোক্যামাস বিপত্তান বোলোকোনা।
য্যাতরী জগতীনাং কণং প্রাপ্তমেনোরথা।
আশ্রমে ধর্মিষ্ঠিতাং ধান্যগিহিতলোনা।
একনিমিত্তক-বিপ্র কণোহপ্যাসমমগমম।
আজ্ঞাপ্যাম্যমপং কণং দ্বিজসম্মতম।
দ্রুহস্তকটীক-বিপ্র কণোহপ্যাসমমগমম।
বিলোক্য কণং মাং প্রাপ্তমিহিহ তেজোবর্ষমিহ।

ইহাউসে বসাতায় ন প্রাপ্যাতিমিসংক্রিয়াম্ ।
তপোবান্ধবকোপাত শপাশ ক্লেভানো মুনিঃ ॥
যং ত্বং চিত্তমুদে বালে মনসাহনজবৃত্তিমা ॥
স্মিরয়তি চ ত্বং বৈ অতিশৌ মৌসমানানীম্ ॥
ইহাউসমুকে বচনে ক্লেভাদে হুর্সাসা তরা ॥
সখী শ্রিয়বদা নাম ভূশ্রাব ক্লেভভাতিম্ ॥
তরঙ্গম সাধন্য পাশাদিকৃতমকায় ॥
প্রসাদমাসাম মুনিঃ মুক্তি তরুণং গতা ॥

পদপূরাণ, স্বর্ণধ্বং, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভাবার্থ—পরদিন মহাবি কং প্রস্থান করিলেন ।
শঙ্কুভাঙা বিরহভাঙা হইয়া গড়িলেন ।
তাহার মনে আর শান্তি নাই,—কেবল মহারাজা
হুম্মজার চিত্তা তাহার চিত্তে জামরক । কখন
দীর্ঘপাশ,—কখন ধ্বাতনে শমন,—কখন বা কং দ্বারা
মুক্তিবাধন ।—সখীসিগের সহিত বাধ্যতাপন্ন নাই ।
কখন বা তিনি কোল-কোচনে চারিদিকে চাটাইত
কহিলেন,—কখন হুম্মজের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া,
তাহাকে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতছেন,—
আবার কখন বা ধ্যানমগ্নিত-কোচনে ধ্বাতনে
শান্তি । এমন সময় ক্রমশ তপোমুক্তি হুর্সাসা কবি
কখন আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি দূর
হাতে উটকোরগের কহিলেন,—“কে এই পরচিহ্নে
আছে ? চাচিয়া দেখ, ভোজনান্বী অতিথি উপস্থিত ।”
বাবরবার উটকোরগে এই প্রকার আশ্রমপূর্বক
অতিথি সংস্কার না পাইতা, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, এই
বলিয়া শব্দ দিলেন,—“হে বাগে ! তুমি যেমন অতি-
থির কথায় উত্তর দিলে না, তেমনই একাগ্রচিত্তে
বাহার ব্যাধ করিতেছ, সে তোমায় ভূগিয়া ঘাটবে ।”
হুর্সাসা কবি ক্রোধে এইরূপ অশ্রুপাশ প্রদান
করিলে, শঙ্কুভাঙার সখী তাহা শুনিতে পাইলেন ।
শ্রিয়বদা তখনই পৌড়িয়া গিয়া; কবির চরণতলে
মস্তক পাতিয়া, পাদানন্ত্রি ক্রিয়ায় বীহার সন্তোষ
বিধান করিল ।

নাটকে শঙ্কুভাঙা-দম্বী শ্রিয়বদাকে কবির কোপ-
শান্তি করিতে হইয়াছিল, উপাখ্যানও তাহাই
হইয়াছে । উপাখ্যানের শ্রিয়বদা কবির চরণতলে
পড়িয়াছিলেন,—

“পৌরবৃত্ত ইয়ং রাজা হুম্মজস্ত মখীভূতঃ ।
বিধামিত্রাশ্রজা বাজা সেনেকাপঙ্গসঃ হুতাঃ ॥
কুন্ত হুহিতা মেহা পালনাং যুপতিতঃ ।
চিত্তবস্তী পতিঃ মুখী বিরহশে যুধিষ্ঠিরঃ ॥
ন কিঞ্চিৎভিজনাতি ন ভবান্ধবৈ মসংকৃতঃ ॥

নবজ্ঞানার পরীক্ষা তখনই ক্ষম্ভমুখিত ।
যথা ন বিমোহেরাজা শাপাত্ত ক্রম তপস ॥

পদপূরাণ, স্বর্ণধ্বং, দ্বিতীয় অধ্যায়।
ভাবার্থ—ইনি পৌরবৃত্ত হুম্মজের মখীবি ।
বিধামিত্রের আশ্রজা—সেনেকাপা কজা;—মহাবি
কবির পালিতা কজা । ইনি বিরহে যমোহিত হইয়া,
পতিচিন্তায় নিমগ্ন থাকতে কিছুই জানিতে পারেন
নাই ; অবজা বা গর্হবশত যে আশ্রমের সংস্কার
করেন নাই, তাহা নহে ; অতএব অহুগ্রহপূর্বক
কথা করেন,—বাজা যেন ইহাকে বিমুখ না হন ;—
শাপ সংস্বরণ করুন ।

কবির চিত্তসমরতা, তাহাকে হইয়াছে, শ্রিয়-
বদার কথায়,—উপাখ্যানও নাই হইল ।

“ততঃ প্রমোহে হুর্সাসাঃ প্রাহ শাপাত্তকারণম্ ॥
বিশ্রান্তস্ত রাজ্যভোগমহে ভবতিযত ॥
প্রিয়মুদে নুপা বাবরজিহ্বানো ন পরতি ॥

ইতি কুন্তা শ শাপাত্তঃ গৃহীত্যা সংক্রিয়ং যথৌ ॥

পদপূরাণ, স্বর্ণধ্বং, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভাবার্থ—হুর্সাসা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—
“অতঃপর রাজাকে কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখান না
হইলে, তখন রাজা শঙ্কুভাঙাকে বিমুখ হইয়া
ধাবিবেন ।” কবি এইরূপে শাপাত্ত করিয়া সংক্রিয়া
প্রদর্শনপূর্বক প্রদান করিলেন ।

মহাকবির নাটকে ‘অভিজ্ঞান-তরুণ’ উৎ-
পত্তি এইখানো,—কৃত্তিব এখানে নহে । কৃত্তিব
বৃত্তিগণে, উপাখ্যানে আরও একই অঙ্গরস হইল ।
কেল সন্তো নহে—নাটক ও উপাখ্যানে পুষক
উপলব্ধি এইখানে অনেকটা হইবে । অজ্ঞ উপা-
খ্যান-বিবৃতি গ্রন্থ করন, তার পর মহাকবির
সৌন্দর্য্য-শক্তি আরও আভাস পাইবে ।
উপাখ্যানে এইমাত্র আছে ;—

“অথ তজাত্ত্বা গতাঃ রাজ্যেপ্তেন্তজা ভূতঃ ।
শীঘ্র বিকলে পক্ষে বর্ধতে য় শিনে দিলে ॥
কথাগপি ভগবান দুষ্টা মোহেয়ঃ সমুপস্থিতম্ ॥
মুদৈ পরময়া ক্রমঃ পূর্ণাভিলাষিতঃ জিতম্ ॥
সত্তার্য্যতি বহানি মূদানি চ বহানি চ ॥
অথ তাং সমুদয়ে সানি গর্তে ক্ষুতিপূর্ণেশ্বরি ॥
উভাত ভূতবান কথো মুনিগণমধ্যমাণম্ ॥
কজা পিতৃহৃদে তৈব হুচিরং বাসমর্জিত ॥
লোকোপগমঃ সুমহান জাগতে পিতৃবহানি ॥
নাট্যে পতিভিগুণিতাঃ তর্কশ্চ পরমাং পতিঃ ॥
সৈবতঃ শুদার্য্যশ্চ পতিঃ স্ত্রীবাং পরং পদম্ ॥

যং প্রমোহামি দেবি ত্বং ভবিতা স মহাবল ॥
রাজপুত্রো বনে বাহ্যতায় নাপ্যচিহ্নো বিধিঃ ॥
অতঃপ্রা প্রেময়ধামি নিকটং ভ্রুত জুহুতম্ ॥
পত্নাঃ প্রোহা হি নারীবাং পরাঃ সৌভাগ্যমুদাতা ॥
পদপূরাণ, স্বর্ণধ্বং, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভাবার্থ—শঙ্কুভাঙা রাজার সহকারে গর্ভভীতা
হইয়াছিলেন । অন্যজ্ঞত সেই গর্ভ ভরুকালের শবীর
মত শিনে দিলে বর্ধতে হইতেছিল । ভগবান কং
শঙ্কুভাঙার বোধ উপস্থিত দেবীরা, পরম আশ্রাণ-
সহকারে অভিলষিত বস্তুমানি আশিয়া দিলেন
সমস্ত মাতা গর্ভ উগ্ৰতি হইয়া উঠিলে, মহাবি কং
মুনিগণমধ্যমাণামি শঙ্কুভাঙে সপোধান করিয়া
কহিলেন, চিরকাল কজার পিতৃহৃদে রাখা উচিত
নহে । পিতৃহৃদে লোকোপগমের সম্ভাবনা ; কিশ-
বৃত্ত পতিই নারীর পরম পতি,—পতিই নারীর পরম
তপজ্ঞা ও পতিই নারীর অর্ঘ্য, পতি ও পরম পতি
দেবি । তুমি যাহাকে প্রথম করিলে, সে মহাবল-
সম্পন্ন হইবে । রাজপুত্রের বনে থাকা উচিত নহে ;
অতএব তোমাকে স্বামিসমীপে প্রেরণ করি
পতিপ্রেমই ত্রার পরম সৌভাগ্য বলিয়া উল্লি-
খিত হয় ।

নাটকে শ্রিয়বদার মুখে এইরূপ কং-কথা
অনবদ্যর নিরুপিত হইতেছে । নাটক-কলেবর-
বিশ্বাক্ষ-অজ্ঞে, নাটককারকে এই পথ অনেক সময়
অবগপন করিতে হয় । কালিগণকে তাহাই
কহিতে হইয়াছে : এক দৃষ্টে এই কথা হইল ।
সখী শঙ্কুভাঙার প্রতি সখীস্বরের প্রেমোদ্যোগিতা এবং
পতি-গৃহ-গমন-যোগ্যতা পিতৃ-গৃহবাসী গর্ভভীতা
কজার প্রতি পিতার করুণতা, তুহীনি একপ্রেম-
এক মস্ত্রে প্রদর্শিত হইল । তবে ‘পূর্বানে কবির
কথায়, শঙ্কুভাঙা যে উত্তরবৃত্ত দিয়াছেন, নাটক
তাহা নাই । উপাখ্যানে শঙ্কুভাঙা বলিলেন,—

“পিতৃহৃদেয়গৃহীতামি পতিশর্বাভাব্যতাঃ ।
নানুজ্ঞাং প্রার্থয়ে তুভ্যাং দেহভজন্তরায়ং তব ॥
ন জ্ঞানে কো ময়া গর্তে রতভাষ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
যতজ্ঞস্যা ন শরোনি শাস্ত্রমেকত্র মারিণ ॥
তদন্যেব গমিষ্যামি রাজ্যবৈশ্বত চান্তিকম্ ॥
শঙ্কুভাঙা পিতৃবৈ মার্য্যবৈশ্বতক্রমে ॥
অনুজ্ঞাং দেহিঃ যে তাত তপস্যা তপসোনিম ॥
পদপূরাণ, স্বর্ণধ্বং, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভাবার্থ—পতিশর্বাভাব্যতাই, অ কথা ভনিয়া
আমি অনুগৃহীত হইলাম । পিতা : পাছে তোমার

সেহু হারাই, এই ভয়ে আমি আজ্ঞা প্রার্থনা করি
নাই । জানি না, আমি কোন পুরুষোত্তমকে গর্তে
ধারণ করিয়াছি । তুমি তাকে আমি এক
কালে গ্রহণিতে পাইলাম । অতএব যথার্থ আমি
রাজ্যমসীপে গমন করিব । আমাকে অহুগ্রহপূর্বক
অনুজ্ঞা দিউন ।

“তজ্জু বা ভগবান কং দেহপ্রসববিপ্লুতঃ ।
অনুজ্ঞাপী মুনিনস্তান মুনিপিত্তং সুভূতঃ ॥
উভাত পরয়া স্রীত্যা প্রেমায়ামি শঙ্কুভাঙম্ ॥
তরুণ্যং যাদ কল্যাণ্যঃ কল্যাণঃ তরুণ ভয়ম্ ॥
আশ্চ বাক্যং মনেঃ শ্রাব্য প্রোমোহঃ ক্রিয়ারলোচনম্ ॥
আশীতিরূপাতিঃ প্রাণুতঃ শঙ্কুভাঙম্ ॥
বিচিহ্নরপ্যাত্তবৈঃ কেশবদ্যুতিভিত্ত্য ॥
প্রভোঃকর্তনসমাপ্তিঃ হরিত্রাউতঙ্গমপিত্তঃ ॥
ভূদয়ামার্য্যভাঙা মুনিপত্নাঃ শঙ্কুভাঙম্ ॥
ভক্ততে চা মহাভাগা বিধামিত্রহুতা সখী ॥
নিতরাং গর্ভিনী বাল্য চক্রেণশেব বিচ্যুতা ॥
অথ কলমতাপস্যাং হরিণাং বর্য্যবদাম্ ॥
উভাত কং প্রোমোহী মুক্ধবদ্যাম্ মুদঃ ॥
মুদ্যাকং পরমপ্রোহা বাসিন্তর্য্য হুতা মম ॥
মর্ষে ক্রুরত কল্যাণং যথং যাতু শঙ্কুভাঙম্ ॥
ইতি দর্শনোদ্যোগ্য কং মতিমতাং বরঃ ॥
আহুয় পৌতরীং বজ্রাং সখীকাতাঃ শ্রিয়বদাম্ ॥
উভাত শ্রাব্য বাজা শিরো চাপি মনোভরতী ॥
যাত মুদঃ মখীতরুণ হুম্মজঃ পুং প্রতি ॥
ইমং শঙ্কুভাঙা রাজা সমর্গ্য পুংদেব্যেয ॥
ইতি তয়া বচঃ শ্রাব্য পৌতরী চ শ্রিয়বদা ॥
মুনিন শাধ বঃ শ্রিয়বদা শারদত্যা মুনিঃ ॥
তথেতি অতিশ্রাব্য মুনরাজাং যমুদ্বহ ॥
শঙ্কুভাঙা পুরুষোত্তমঃ প্রতিপদেব ॥
অথ দৃগ্গিবস্তত্ত্বং পিতা যোহং ববাসিরি ॥

মুদ্যাকং চেতুঃ মুনোবাক্য ব্যক্তি যঃ পুরয়াঃ ।
তালোকা সমুদ্রা পথি যুতী শঙ্কুভাঙা ॥
নিভম্বিনী গর্ভসত্তা ন শেকে দ্বিগুণ জন্ম ॥
কং মধ্যাক্ষমণ্যে প্রাণা প্রাতীং সরসতীম্ ॥
মুনঃ শিরো চ মধ্যাক্ষমিয়া চক্রেবর্য্য তৌ ॥
শ্রিয়বদা পৌতরী চ সিল্পন তজ্জগাহতুঃ ॥
শঙ্কুভাঙা পিতৃবৈ মার্য্যবৈশ্বতক্রমে ॥
শ্রিয়বদাকং ক্রজ অভিজ্ঞানাসুদৌরমম্ ॥
বাহুঃ সরগতীতোমসপাহতঃ ফলোচনাঃ ॥
শ্রিয়বদা তু ত্বং পুং বনানীকমধ্যাতঃ ॥
যামস্বতরতী তাবং পপাত মিলিবে হিজ ॥

প্রিয়বদা ভিয়া তইজ বৃত্তান্ত ন গ্রহণেয়ং।
শব্দভূমি তং সঠা পত্রাঙ্গা পি নিবৃত্তা।
ততঃ রাজা চ তে মর্ষে সমুপাধি বিম্বিৎ ত্রিগায়।
হৃদয়প্রবাসেন্তরিত্ত্বাচ চ তাপসৌ ॥”

পশুপুংগব, বর্ণপণ্ড, ভিত্তীয় অধ্যায়।

ভাবার্থ—“শব্দভূমির কথা ভুলিয়া, ভাবমান কথ

মেহেরা-চিত্তে অজ্ঞাত, মূনি ও মুমূক্ষুরাণিরকে

করিলেন, “যাদি শব্দভূমিকে খামি-গুণে পরিগণিত

আমারায় অমৃতমিত্ত দান ও কল্যাণ বিধান করুন।”

ওষধিগীর্য মূনির কথা ভুলিয়া প্রেমোক্তিরপ্রয়োনে

শব্দভূমির প্রত্যাহর্জন, সমুপাধি ও ব্রহ্মভূতৈল সময়েত

কেশবজাদি বিবিধ ভাভানে ভূমিতা করিয়া অমৃতকুল

আশীর্ষপ্রদোৎপন্ন হইলেন। শব্দভূমি পানকর

শশাঙ্কবৈশাখ্য শোভা ধারণ করিলেন। তখন কথ

মূনি দরবিপণিত অশ্রুধারে কীর্তিতে কীর্তিতে পুষ্প,

লতা ও হরষীপিকের বলিলেন,—“তোমার সকলে

আশীর্ষকারী কথাম্বার পরম প্রেম-পালিতা শব্দভূমি

গমন করুক।” তাহার পর তিনি বৃদ্ধা, গাভরী, সখী

প্রিয়বদা ও মহাভক্ত শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন,—“তোমারাও

দুহস্তেয় নিকট গিয়া, শব্দভূমিকে দাঁধার, হস্তে সম-

র্পণ করিয়া ফিরাই এস।” মূনিবচনের কথা ভুলিয়া

গৌড়ীয়া, প্রিয়বদা ও শিষ্য শাশবর এবং শারদ্য

তীহার, ভাভা শিরোবার্ধপূর্ণক শব্দভূমিকে সঙ্গে

লইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে নানা চূর্ণকণ দৃষ্ট

হইল—“দক্ষিণে, শূণ্যলদম্বই চাঁদ্যার করিতেছে,—

বামে মৃণ্মল চলিয়া যাইতেছে,—ধুমিধিত্তি বায়ু

বহিতেছে। পরে এই সব দৃশ্যকণ দেখিয়া শব্দ-

ভূমি উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি ধর্ত্তভারে ও নিতম-

ভারে জ্ঞত যাইতে পারিলেন না। অনন্তর মহাশঙ্ক

ভায়ে উদ্ভিত হইলেন, শিষ্যদ্বয় রসবতী নদীতে

তৎকালোচিত কর্তব্য সমাধা করিলেন। প্রিয়বদা

ও গৌড়ীয়া প্রস্থান করিলেন। শব্দভূমি

প্রিয়বদার হস্তে গজুরীর ক্রম করিয়া, দান

করিবার নিমিত্ত পৈতৃভীতে অবস্থান করিলেন।

প্রিয়বদাও অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া মনে বস্ত্রাকল

মধ্যে হাঙ্গন করিলেন, অমনি জলে পড়িয়া

গেল। তিনি ভয়ে শব্দভূমিকে একথা জানাই-

লেন না। শব্দভূমিও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে

হুসিয়া গেলেন। অনন্তর সকলে জানাত্তে অগ্নিধি

ক্রিয়া সমাধাপূর্ণক হৃদয়ভূমির সমুপস্থিত

হইলেন।

এই হইল উপাখ্যান-বিবৃত্তি। এখন কাহি-

ন্যাসের কথাই, এইখানে কর্তৃক, তাহা বোধ হয়

আর বেশী বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। উপাখ্যান

যাহা বুঝা গেল, নাটকে তাহাই আছে। উপা-

খ্যানের অভিনয় হয় না, হৃদয়ও উপাখ্যানে যাহা

হয়, নাটকে তাহা অভিনয়ের উপযোগিতাবে

সরবিস্তৃত করিতে হয়। তাহাতেই কাহিন্যাসের

অমূল্য কৃতিত্ব। ভূমিতে উপাখ্যান যাহা বর্ণিত

—তিনি তিল করিয়া নাটকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে

আবার উপাখ্যানে যাহা নাই, নাটকে তাহার প্রদে-

জন হইয়াছে। উপাখ্যানসম্বন্ধে বলিলেন,—“শব্দভূমি

বাহিনীতে হইবে, ধ্বনিপথীরা আদিয়া আশীর্ষক

করিলেন।” নাটককার তাহার বিশাল চিত্রপটে

আঁকিয়া দেখাইলেন,—ধ্বনিপথী করিপু, তাহার

কিরূপ আশীর্ষক করিলেন, এবং কি বলিয়াই বা

করিলেন। কেহ বলিলেন,—“ভূমি পাটেশ্বরী হও”—

কেহ বলিলেন,—“ভূমি বীরসম্মানিত হও”—আবার

কেহ বলিলেন,—“ভূমি সোমসাহাবী হও”—এ সময়ে

ইহা অপেক্ষা আর আশীর্ষক কি আছে? করি

কৃতিত্বপ্রভাবিত পরিচয় আর অধিক কি দিবে?

ইহার পর উপাখ্যানকার শব্দভূমিকে জানাইলেন।

উপাখ্যানকার যাহাতে সাজাইলেন, নাটককারের

তাহাতে তুলি নাই। শব্দভূমি আত্ম-পালিতা

ধ্বনিবাহী হইলেন ও তেজঃরাজ্যবীরা। রাজ্যবীর

যোগে অলঙ্কার না হইলে, শব্দভূমি-রাজ্যবীর শোভা

হইবে কেন? তাই তেজঃরাজ্যবীর প্রিয়বদা-

বলিয়া ফেলিল।

“আহরহেইৎহঃ ক্রবঃ অমমহলপেহেৎ পমাহগেহিঃ

দ্বিপ্সাহীর্ষ্যদিত্ত

আত্মমহলদিত্ত পুশ্যাদিত্তিত্ত অলঙ্কারে প্রিয়বদা

কৃত্ত নহে—চাহে রাজ্যভোগ্যবীর সৌন্দর্য্যমান

অলঙ্কার। অত্যা কি? অঙ্গুর উপাখ্যান-সম্পন্ন

মূনিবর কথের অভাব কি? অঙ্গুরই বা কি?

নিমগণ ধ্বনির আদেশে ক্রমশঃ সংগ্রহ করিতে

গিয়া অলঙ্কারিক অলঙ্কার সংগ্রহ করিলেন।

এমন না হইলে তৎপ্রভাব কি? মহাকবি

কাহিন্যাদি নদী লিখিতে বসিয়া, তৎপ্রভাবের

এ পরিচয় দিতে বিম্বৃত হইতে গুলেন কি?

অলঙ্কার তে মিলিল,—সাজাইবে কে? সাজাইবে

সখী প্রিয়বদাও অনঙ্গরা। কোথায় কিরূপে কি

অলঙ্কার পরিতে হয়, ত্রি-আত্মপালিতা করিয়া

নিরলঙ্কার ধ্বনিবাহী তাহার কি জানে। দ্বনি

বিচিত্তেই মৌল্য অলঙ্কার চিত্রিত রমণীর আশ্রয়ে ই

শব্দভূমিকে সাজান হইল। তবুও বলিলে, কাহি-

ন্যাসের কৃতিত্ব কোথায়? বুঝিলে না,—নাটক ও

উপাখ্যানে প্রভেদ কি?

এইবার বলিয়া! এ বিদ্যাকে সন্দ্বিধানসূর কৃতিত্ব

কি,—জানিতে চাও তুচ্ছমান্য বাবুর “শব্দভূমি-ভণ্ড

মনোনিবেশে পাঠ কর। সে কৃতিত্বের পরিচয়

দেওয়া এখানে পুনরুন্মেষভায়ে। আর বুঝিতে চাও

—“অভিজ্ঞান-শব্দভূমি”র চর্য্য অষ্টটা ভাল

করিয়া, সংস্কৃতর নিকট উপদেশ লইয়া, পড়িয়া দেখ।

স্বপ্নে পোষিত, স্বপ্নেই পালিতা, অপর্য্যাপ্তির্শিখা

কত্বেক বিদ্যা, দিতে অজ-অজ-লগ্ন বনবাসী

ধ্বনিও মন করিপ বিচলিত হয়, তাহার সঙ্গীত

চিত্র দেখিতে চাও ত দেখিবে কাহিন্যাসের “অভি-

জ্ঞান-শব্দভূমি”। উপাখ্যানে তোমার সে চিত্র কে

উপাখ্যান বলিতেছে,—শব্দভূমিকে বিদ্যা দিতে

মহাবীর চক্রে জল আদিয়াছিল, নাটক বলিতেছে,—

“যাহাভূমি শব্দভূমিতে ধ্বনিং সন্দ্বিধান-কর্ত্তা

অন্তর্লক্ষ্যভরণ্যোপায়ো বিপত্তিঃ তিত্তাজ্ঞানং পদম্।

বৈকরণ্য মন ভাবদীপ্তমশমেহে হোদ্যবরশৌক্যঃ

পীড়ান্তে গৃহিণঃ কথং ন তন্ময়ানিহবহুর্ধনং বৈ”।

ভাবার্থ—“আজ আমার প্রিয়বস্ত্র আমাকে পরি-

তাপ করিয়া যাইতেছে। জল আজ হৃদয়ে পরিপূর্ণ।

যৌব-প্রবাহে আমার আর কাহা যাবি হইতেছে না?

কি বলি, কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না; চক্ষু

আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। জানি বনবাসী,

আমারই যখন এরূপ অবস্থা, তখন না আমি সামান্য

গৃহস্থের কষ্টা-বিষয়ে কি না নিরাশ্রয় যাবনা হয়।”

যখন অঙ্গুর-অপালা-সম্পন্ন ধ্বনির এরূপ

অবস্থা, তখন কোমল-প্রাণ শব্দভূমি, প্রিয়বদাও

অনঙ্গরার কথা কি আর বলিতে হইবে? শব্দভূমি

আমাদের সুখ, দুঃখ, লজা, সখী, পিতা ঐত্বভুক্ত

পরিচয় করিয়া যাইতেছেন বলিয়া, অবিরল অশ্রু-

ধারে পুথিরা ভাসাইতেছেন,—আমি মহাবীর কথ

শোক-প্রবাহে ভাসমান হইয়া, শব্দভূমিকে হৃদয়

চিত্রে সাত্মনা করিতেছেন।—এ জীবন্ত শোক-

সাম্বন্ধপূর্ণ চিত্র জগতে আর কোথায় পাইবে? সে

অঙ্গুরানি আভ্যন্তরীণ ভাবচিত্র প্রকটিত হইয়া

সমুদ্র স্পর্শে উদ্ভাসিত হইয়াছে কেবল যখননাটকের

মহা কালের। আবার উপাখ্যান বলিতেছে,—

“করার পিতৃহবে বহুনি ধাকা উচিত নহে।”

নাটকে তাই বলিতেছে। অধিক নাটক বলি-

তেছে,—“ওজনদের সেবা করিলে, সপথীর সঙ্গে

সখীর ব্যবহার করিলে,—সখী তোমার প্রতি

হৃদয়বাহার করিলেও, তুমি তাহার প্রতিফলচারিত্র

হইও না। তুমিও যেরূপ প্রতি অমৃতকলা থাকিবে।

হৃদয়কল্যাণে অপর্য্যাপ্ত হইবে।”

এখানে উপাখ্যান আত্মমহিলীকরণকে যাহা না

শিখাইল, নাটক আজ তাহা শিখাইল। এমন চরিত্র

চিত্রের সমুদ্রাঙ্গা আজ আর কোথায় আছে কি?

উপাখ্যানে আছে,—শব্দভূমির সহিত প্রিয়বদা

চলিল,—নাটকে তাহা নাই। নাটকের শব্দভূমি

প্রিয়বদাকে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু এমি বলিলেন,—

“অনঙ্গরার প্রিয়বদাকে উপদ্রুত পাত্রে অর্পণ

করিতে হইবে। তাহাদিগের তোমার সঙ্গে যাবনা

কর্তব্য নহে।” এ কর্তব্যভা-প্রতিদ্বন্দ্বের প্রকটনও

কাহিন্যাসের কৃতিত্ব-পরিচয় পঞ্চমকে আরও

প্রকটিত হইয়াছে।—রাজপুত্রাসের প্রকটিত হৃদয়

ও বিদূরক মাধব আদি। দেখিবার হৃদয়বীর

বিদ্যা-সঙ্গীত। পঞ্চমকের প্রারম্ভেই এ চিত্র কেন

বল দেখি? উপাখ্যানে কথিত আছে—“রাজা

হৃদয়বীর বহু-পত্নী; বহু-বর্গক পুত্রবৈকল্য

উপাখ্যানকার আভায়েও বুঝান নাই; মহাকবি

নাটকে তাহা দেখাইলেন। কাহিন্যাসের কৃতিত্ব

কেবল তাহাতেই নহে। হৃদয়বীর অভিলাপ-

সঙ্গার এই গানেই হইয়াছে। কথ কবির প্রতিভা-

প্রভাপ। রাজা হৃদয়বীর গান শুনিলেন,—

কিছু ভাবি আশিল শুনানতঃ। গান শুনিলেন,—

রাজা জাবিলেন কেন?—

“কি হু হু গীতমাত্যবী ইষ্টজনবিরহাতুতঃ পি

বলম্বতঃ কীর্ত্তাহমি। অর্থাৎ—

রম্যনি বীক্য মুরাংগং নিশমা শব্দান্

পুত্রহুত্বেকা ভবতি যং হৃদিতোতঃ পি জগতঃ।

অর্থাৎ—যদি মনুষ্যের হৃদয়ে হৃদয়বীরের

ভাববিরহি জননান্তর্য্যসৌন্দর্য্যমি।”

অর্থাৎ। গান শুনিয়া রাজার এমন হইল কেন।

পূর্ণকল্যণকল্পজলিত হৃদয়ভাঙ্গা স্মৃতিমান। বীর

বীরে আশিয়া প্রকাশ হইল,—জ্বর আত্মল হইল

কেন? কেন এমন হইল? বুঝাইতে হইবে—কি?

হৃদয়বীর অভিলাপ-ফলের অর্থাৎ সঙ্গান এখানে

কি? অভিশাপ-ফলের বিষ-সঙ্গার হইল,—দেশ-প

কৌক নাগিল,—স্বপ্নের স্মৃতিভাঙ্গা আশিয়া পড়ি।

কাহিন্যাস ভিন্ন এই তত কে বুঝিতে পারে?

অজ্ঞানের বিধ্বরূপদর্শন।

(নীতি-বইতে অন্তর্ভুক্ত)

অজ্ঞান কহিলেন;—

সর্বদেব আর ভূত চরাচর
পরাধানে ধাতা দেবের ঈশ্বর
দিব্য কৃষ্ণিগণ উপনিবস
হেরিতেছি দেব তোমার দেখে। ১৫

বহুবাক-মুখ-শোচন-উদর
পূর্বনিস্ত তব রূপ বিধেবর।
হতেছে -সর্বজ নরনগোচর
অজ্ঞ-মধ্য আদি বিধি নহে। ১৬

গলা-চক্রাধারী কীরীট-ভূষিত
ভেজঃপুঞ্জ সর্ব-লিঙ্গ বিভাসিত,
অনলার্কিত্রাজি দৃষ্টীর অতীত
অপ্রমেয়রূপ হেরি যে তব। ১৭

জ্যোত্স্ব পদম অক্ষর অবয়ব
প্রপঞ্চ বিসের তুমিই আশ্রয়
নিভাধর্ম পাতা বৃক্ষিহু নিশ্চয়
সনাতন ব্রহ্ম হুইই দেব। ১৮

তুমি সঠি স্থিত লয় বিবর্জিত
অনন্ত-প্রভাব-বার-সমাধিত,
শশি হৃদ্য নেত্র মুখাধি ভূষিত
তব ভেঙ্গে যেন জগৎ দহে। ১৯

একা তুমি দেখি ব্যাপ্ত সর্বস্থল
স্বর্ণ-মস্ত দিক গগনমণ্ডল
হেরি এ অদ্ব্যত মূর্তি উগ্রোজ্জ্বল
জিতুবন আজি হুইই নহে। ২০

ভবে প্রেরণঃ তোমানে পশিছে
করঘোড়ে কেহ অভয় মাগিছে
বস্ত্র-জুতি-বাসে তোমার পূজিছে
সিদ্ধ আর বত মহাবিপদ। ২১

বিখ্যাত আশিত্য রুদ্র বহু আর
সাধ্য বিগদেব অসীনোহ্মার
বায়ু পিতৃ সিদ্ধ বন্ধাতুর আর
তোমার দর্শনে যে ভগবদ। ২২

বরবাক্স-নেত্র-পার্বত্য-উদর
ভীম-পাণ্ডুরক মূর্তি ভয়ঙ্কর

হেরি চরাচর কাণে বর খর
ভীম-মহাবাহো। আমিও হেরি। ২৩

মানাবর্ণ দীপ্ত, দীপ্ত-নেত্রবর
নাজোপাণী ব্যাক্ত-বদন-কুহর
হেরিয়ে তোমারে কণ্ঠিত অস্তর
ঐর্ষ্য শান্তি-বিক্ষো। লজিতে নারি। ২৪

অলম্বার-মিত ধোর-বিভীষণ
ভীম-পাণ্ডুরক কাল-বদন
হেরি দিশাহারা অস্থিত মন
ভক্তপ্রতি হও প্রসন্ন দেব। ২৫

ভূপথগ সহ ধার্ত্ত্যবাহুগণ
এই ভীম কর্ষ যোগে যশোধন
মতে অদ্বাদী মুখ্য যোগধন
বদন-বিবরে পশিছে তব। ২৬

দশন-বিকট-বদনে তোমার
প্রবেশিছে বেগে, চূর্ণ শির-কার
দন্ত-সাক্ষ-স্থলে কেহ বা আবার
সেহিতেছি লগ হইয়া রয়। ২৭

নীতি প্রোত যথা বেগে কলধরে
প্রধাবিত হ'য়ে প্রবেশে মাগরে
ভেমতি প্রাণপু ওমুখ বিবরে
পশিছেছে নর বীরেন্দ্রচয়। ২৮

যথা মৃত্যুরে পতঙ্গ-সকলে
কাঁপ দেবে বেগে জলন্ত-অনলে
মরিতে ভেমনি এরা দলে দলে,
পশিছে ওমুখ বিবরে তব। ২৯

তুমি ওহে বিদো। প্রাসিছ মানব
প্রাণপু-বদন বিস্তারি মাধব।
উগ্রভেদ্য তব চরাচর সব
কবিতোছে আজি সমস্ত দেব। ৩০

মহারূপ বেশে কে তুমি দেখেই।
নমে দাস পদে কহ সবিবেশ
মাধব আদ্য। তোমা জ্ঞানিতে বিশেষ
জানিা কোন প্রবৃত্তি তব। ৩১

“তনু পার্শ্ব” দেব উত্তরিলা তব
“লোক-দ্বারকা” কাল-আমি ভবে
নাশোন্মাত আজি প্রতিযোদ্ধা মবে
নাই নশ তুমি;—নাশিব সব। ৩২

অতএব উঠ লভ যশোরামি
ভুজ জয়-রাঙ্গা অরাতিবিনামি,
রেখেছি পুষ্করি সরসেরই নামি,
হও মার্জি তুমি নিমিত্ত তার। ৩৩

ভীম যোগ কর্ষ জয়ধ্ব আর
অন্ত যোগধোনে বহুছি সম্ভার
তজি শোক রূপ হও অমোঘার
বিজয়ে সম্ভেহ নাহিক আর। ৩৪

কেশবের বাধী করিয়া অবন
কণ্ঠিত কীরীট ভয়ে ভীত মন
করঘোড়ে তার বন্দিয়া চরন
গদ গদ ভাবে তখন কা। ৩৫

“তনু রূপ” তব মহিমা-কীর্তন
মস্তক জুবন নত সিদ্ধগণ
ভয়ে রক্ষেগণ কতর পলায়ন
যথার্থ যে ইহা বিচিত্র নয়। ৩৬

জ্ঞানও তুমি অষ্টা গুরুতর
সদমং ব্রহ্ম পরম অক্ষর
কেননা নমিবে তোমায় অমর
হে জগদ্বিধাসি অনন্ত দেব। ৩৭

আদিসেব তুমি পূরুষ পূবাব
একমাত্র তুমি বিশ্বের নিধান
জ্ঞাতা স্তের তুমি স্থপতি স্থান
চরাচর তুমি ব্যাপিয়া সব। ৩৮

বায়ু অগ্নি যম পাণী নিমগ্নপতি
পিতামহ পিতা তুমি প্রমগ্নপতি
চরণে তোমার সমস্ত প্রগতি
পুনঃ বার বার তোমায় নমি। ৩৯

সমুখে পশ্চাতে চৌদিকে তোমার
হে সর্বস্বরূপ। করি নমস্কার;
অসম্ভব-বীৰ্য্য-বিক্রম তোমার
সর্বব্যাপী তাই মর্শ্ব হে তুমি। ৪০

ঐর্ষ্য মহিমা না জ্ঞানিয়া তব
সম্যক্তাব মূলে করি অহতব
মোহে-প্রমে “রূপ” হে সম্ভে “দ্বারক”
সম্ভোধি তোমায় বাসোচ্ছিত কত। ৪১

আহারে বিহারে অব্যয় শরনে
বন্ধুগণ মাগে কি একা বিজনে

কতই বসোচ্ছিত বিধ্বপ-বচনে
শ্রম হে অচ্যুত। সে দেব যত। ৪২
জগদেব তুমি হে প্রভাববান
পূজনীয় পিতা গুরু পরীদান
নাহি কেহ বিধে তোমার সমান
অধিকের কথা বাহুর দূরে। ৪৩

পিতা যথা পুত্রে, হৃদয়ে সখায়,
প্রেরণীরে পতি ভোম্বরে ক্রমায়,
গদগদ করি প্রমাদি তোমায়
সেইরূপ-সেই। অময় মোহে। ৪৪

এ অপূর্ণরূপ হেরিয়া, তোমার
হুট কিছ ভীত হৃদয় আশ্রয়
প্রদন হইয়া এ দাসে আবার
পূর্ণরূপ দেখা দাঁও হে দেব। ৪৫

কীরীটভূষিত গর্গ্যচক্রধারী
মাধ সেইরূপ দেখিতে মূঢ়ারি
হে সহস্রবাহো। বিধ্বরূপধারী
চতুর্ভুজ মূর্তি ধর হে তব। ৪৬

কহিলা দেবেশ “তনু নরোত্তম”
দেবাইহু তোমা হ'য়ে হুটতম
তোমায় আদি বিধ্বরূপ মম
হেন রূপ কেহ দেখেনি জ্ঞার। ৪৭

বেদ অবয়ব, যজ্ঞ ঐহুতান
কর্তার-তপম্যা জিহা কর্ষ দান
করিয়াও কেহ হে কৃষ্ণপ্রদান
দেখেনি এরূপ কভু জ্ঞার। ৪৮

হেরি মম রূপ বোর বিভীষণ
হ'ওনা বাধিত বিধোহিত-মন
নিভীক-স্থলয়ে হে সূক্তজনকন
হেরি মমরূপ পুষ্করি মত। ৪৯

এত বলি পুনঃ ত্রিমূর্ত্যবদ
নিজ পূর্ণমূর্ত্তি করিলা ধারণ
সৌম্য-বদধরি অজ্ঞনে তখন
করিলা আশ্রয় নিভীক-চিত। ৫০

শ্রীনাথচন্দ্র রায়।

বৃটিশ-শিব।

হে বৃটিশ! আমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানলোক প্রদান কর, নতুবা আমরা ত গোলাম; তোমার উইলসন-ম্যাকম্যুর জিলেন বলিয়াই আমরা এখন বেদের রূপ জ্ঞানিতে পারিয়াছি; পূর্বপুরুষ-গণের অসভ্য মরল-ক্লমের পরিচয় পুরায় পুরকিত হইয়াছে; বর্ষের ক্লমকণের আন্দক-নীতি ক্লমসম করিয়া গুলিয়া গিয়াছি। প্রভু যে! বৈভ্য-নামের কাহাকে বলে, বুঝিয়াছে; দেবতা কীর নাম তাহাও জ্ঞানিয়াছে।—কিছু হে ইংরেজ! হে মেষেশ্বর! অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তুমি এখনও প্রকাশ কর নাই; প্রকাশ করিয়া 'জ্ঞানোজ্জ্বল শলকা' দ্বারা এই 'অজ্ঞান-ভিম্বিকা' জাতির চক্ষু-ক্লমীয় কর।

অন্ত বিষয়ের 'কথা ছাড়িয়া দিতেছি'—মি বেল-পুসোবে সর্বত্র প্রবৃত্ত, সেই বৈরাগিকের মহৎকর্ম, কে? সভ্যতার অনুমোদনে, বিজ্ঞানের অবিরোধে, পাণ্ডিত্যের সাহায্যে, শিব বলিয়া বিবেচনা করা যায় কাহাকে? হে অসুর! বেলেই ইহাই বলিয়া দিও; আমাদের চিরদিনের উজ্জ্বল চরিতার্থ হউক। 'কে? কিছু ত বলিলেন না। প্রভো! বুঝিয়াছি বহু জ্ঞান সর্বল কথা বলিতে, ই কথাটুকু কিছুতেই বলিবে না; অন্ততঃ তবদীন জ্ঞানীরা তোমার চক্ষ উপরভুক্ত ভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান না হইতেছি। 'ত্রিকূট, অর্ধদ্বাদশ ভক্ত-রূপের নিকট আশ্রয়-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; পণ্ডিত বলিয়াছিলেন;—আমিই দ্বৈশ্বর; কিন্তু অজ-জ্ঞেয়, নিকট, অবিদ্যার নিকট তিনি একলা কণ্ঠন বলেন নাই *। ভব! বুঝি আমরা আপ-নার তত-ভক্ত অজ্ঞিত হইতে পারি নাই; বুঝি, তত বিশ্বদী-এখনও আমরা হই নাই; তাই সে কথা এখন বলিবে না; না বাল, নতি নাই। তোমারই প্রসাদে তোমাকে বলিতে আমি ত পারিয়াছি। 'কৌশলসম্মত' অমর্যেব ক্রে, তাহাও বেশ 'বুঝিয়াছি। সেই টুকু এখানে প্রকাশ করা যাক।

আমি বিশেষ পথ্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছি—যে ইংরেজ। তুমিই সেই মহাদেব। শুধু 'রক্ত-পির-নিত' বলিয়াই হে বৃটিশ! জ্ঞানোত্তে কোন জাতি তোমাকে পূজনন * না বলিয়া থাকে? হে সর্বপতি! তুমি কি কপালভং নহ? তোমার আপোনা অধিক কপাল আর কাহার আছে, বল দেখি? রাজ্য, সম্রাট, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি, শৈশ্য-সামন্ত, বণ-বিজ্ঞান—সকল বিষয়েই তোমারই সম্মান কপাল-স্রোত, এই ভাষাতেই দেখ না কেন? তুলসীও ধারণ করিতে আসিয়া অস্বিতীয় শাসনও গ্রহণে অধিকারী হইয়াছে। হুতরাং হে সর্বপতি! ভাণ্ডারানু ইংরেজ। তুমিই ত কপালভং? হে হুরাসাগর-নিমগ্ন! অজম বারুকী-পান-নিপুণ! মহা-জাতি! তোমার চক্ষু-চক্ষু সোহিত অধিনির্মিত নানাবর্ণ—অন্ততঃ সময়ে সময়ে দেখিয়া আমরা তোমাকে সম্পূর্ণভাবে বিরূপা বলিয়া স্থির করিয়াছি। হে সুশিলাপ্রদানে ভারতের প্রাচীন কুমুদ-স্বার বিশোপ-কারিন! বুজের ভুবনবিজয়ী 'অধিষ্ঠা' পরমো ধর্ম! যাহা দূর করিতে পারে নাই, যখনই জোর-জবর-দ্বন্দ্ব! যাহা নিবারণ করিতে পারে নাই, তাহা তোমার অসীম ক্ষমতায় সাধিত হইয়াছে। তোমার অধিকার-ভুক্ত সকল আশ্রিত প্রায় যাপ্যভক্ত প্রতীক্ষী হইয়াছে; যজ্ঞ আর নাই বলিয়াই হয়; হুতরাং তোমাকে 'জৈতুন্যদী' ত বলিবে। হে স্বার্থসিদ্ধান-মক্ষ! তোমার উগ্র-ভাস-সুসম্পূর্ণ অধিকারের আমোদে নান্দ, পোচর হইয়াছে। আর ক্রৌন্দানকারে, স্টেট-চেলেটে বা ইজি-চেলেটে তোমার সংযাপন-সুখ-দুঃখী ধামুজি দর্শনেও বহবার চরিতার্থ হইয়াছে। হে মহাদান্য! তোমাকে কপলীও বলিতে পারি। কপলীও ধন, কপলীও ধন। কপলীও বা কড়ি তুমি গ্রাহ্য না কর; তাহার সেই বসন্তকর্ণ তুমি দেখিতে না পার, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সভ্য হে, তোমার রাশি রাশি স্বর্ণপুন্ড্রও বহুরাশি কপলীও। এইজন্যই আমাদের দেশের পণ্যমাত্র সামান্য-কুল অনেকেরই এখনও টাকাকড়ি পাঠাইতে বলিয়া থাকেন। যেমন ধন থাকিলে ধনী বলা যায়। এইজন্যই কপলী কড়ি বা রূপান্তরিত কপলীক পর্ব-মুখা তোমার আর্হ! বলিয়াই তোমাকে কপলী বলিতেছি; কিন্তু রূপ কড়িও না। হে পরজা-

গ্রন্থ-চতুর। তুমি বিশ্বমর্দনও বটে। লোকে বলে, সমাজের প্রতি তোমার দৃষ্টি একরূপ ও বিজ্ঞান-প্রতি অন্ধরূপ,—সমান কণ্ঠন নহে! হে পরজাতি রাজ-জাতি! তুমি এই ভারতের মহেশ্বর ও মহাদেব ত বটেই। হে চাট-বদন্ত! অনেক তোমাদের মঙ্গল-সম্পাদন করিয়া থাক বলিয়া তুমি শত্রু ও শত্রু। তুমি নিজে সাক্ষ্য মঙ্গলপক্ষ, তোমার অমঙ্গল হুজুপি নাই; অতএব হে ভব! হে শিব! তোমাকে নমস্কার। হে ভারতেশ্বর! এই অসভ্যদেশের যখন তুমি অধীশ্বর; তখন তোমাকে অন্যায়ে সন্তোষের বলিতে পারি। ভারতবর্ষীয় ভূত ভিত আর কি হইতে পারে? হে ক্রমবিকাশ-সম্পন্ন! 'ধন, ন্যাসে কল যে যাদা' এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করতে কে নীলবর্ণে রঞ্জিত ভূ-ভাগকে সোহিত করিয়া লইয়াছে; তাই তোমাকে সকলে নীল-সোহিত বলে। হে বহুভুজ! তুমি দিশম্বরও বটে, বহু আরও অধিকার হইবেও হইতে পার। দিক্ শব্দে দশ, দিশম্বর শব্দে দশধানি বস্ত্র-সম্পন্ন; তোমার যে হাটিকোট পেটীলন কলার প্রভৃতি লইয়া দশধানি বস্ত্র অঙ্গবরণ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে শিববিজ্ঞান-সুশিবিজ্ঞ। যে কীর্তি বিস্তার করিতেছ, তাহাতেই তুমি মৃত্যুশব্দ। 'কীর্তিধ্বজ' স্ফুটাইতি। বিশেষতঃ তোমার এই জাতির ক্ষম কলাচ হইবে না বহু বৃদ্ধিই হইবে। হে সুক্ষ্মবর্ণিন! তুমি অসম্মত বাক্য কল্পে ঘরের বাহিরের ধ্বংস রামিয়া থাকা, তাহাতে তোমাকে 'সর্বজ্ঞ' না বলিয়া থাকা যায় না। হে হিন্দুরাজ-প্রভো! বর্জমান অধিকার-শেষী রাজাই বিবেচনাসীল, প্রায়-পতি; তুমি তাঁহারিগণের পতি, অধিপতি ত বটে, বিশেষ নাম যখন 'সিংহ' তখন আমরা মূলকর্ত্ত তোমাকে পশুপতি না বলি কেন? হে শাসক-জাতি! শূল-কীর্তি তোমার হাতেও ভিতর, মনে করিলেই কালাভিক্তি মূলে গুটিতে পার, কীর্তিকাতে স্থলা-ইতে পার। শূলে দেওয়াও বা, আর কীর্তি দেওয়াও তা, ও একই কথা; স্বক্ষ ভাবিলে কীর্তিকেও শূল বলা যায়। তবে তোমাকে মূলপালি বলিতে আপত্তি ত হইয়াই আছে। হে ইংরেজজাতি! তোমার কেহ না কেহ যখন ভারতে বাস করিতেছেন, তখন তোমাকে ঋণানবাসী না বলি কেন? ভারত ত

এখন ঋণান। হে কৌশলযুক্ত-প্রিয়! কত শত পূর্ব-নগর যে তুমি বিনষ্ট করিয়াছ, তাহার ইংরা নাই; তাই হে, পুরারি। ভূভিবিদ্যলগ্নেতে তোমাকে স্তব করিতেছি। হে একদন্ত-প্রভো! তোমার ইচ্ছাক্রমে চতুরতা বলন্তর অভিনা পূর্ব হইতেছে না; জায়া হইলেও তাহা চর্য করিয়া গিয়া থাক; অতএব হে কামনাশন! এসর হও; তোমাকে নমস্কার। হে গলহস্ত-প্রদান-সিদ্ধন্ত! তুমি আপনার মাথার (Head) নাকনি কড়াই অর্ধকৃত গোপাঙ করিয়া রাখিয়াছ; মনে করিলেই অর্ধকৃত প্রদান কর; এতদূর কি তোমাকে অর্ধকৃত-মৌলি বা চন্দ্রশেখর বলিতে পারি না? মৌলি বা শেখর শব্দ মঙ্গলকও বোধ হয়। হে উন্নতিপ্রিয়! হে সর্বমামাসভুক্ত! যখন ধর্মকে দূর করিতে শিখিয়াছ, তখন তোমাকে নিরীক্সবে বুঝাসন-বলা হাইতে পারে। বুধ শব্দে ধর্ম আর অসন শব্দে দুরীকরণ। আরো হালের পণ্ডিতগণের মতে ত অজ্ঞ অশ্লব উট্টিয়া গিয়া ইংরাজী বর্ণমালা প্রচলিত হওয়া উচিত-ভাষা হইলে ত আর কোন কষ্ট থাকে না; 'স' শব্দে গোল মিটিয়া যায়। আমরা উল্লেখের বলিতে পারি ইংরেজ। তুমি বুঝান; গোলামদ্য বোধ হয় ত;—না হয় Brisasun কৃত শত বুঝ যে তোমার উদ্বাহ হইয়াছে, তাহার কি লেখা কোনো আছে? হে অজগবানম! অজলোকে বলে, অজগব শব্দে পিনাক—শিবের কব। 'সে কথা কাঙ্কেরই' নহে। জ্ঞানমণ্ডল ও গোহৃদ ধর্ম তোমার ক্ষম উৎসব হয়, তদীয় মাংসলোভ বন্ধ লাল্যগিত হয়, তাই তোমাকে শাস্ত্রে অজ-গবানম বলিয়াছেন। আর কৃত বলি, যখন তুমিই শিব; তখন তোমার নাম হে তোমার পক্ষে খাটিয়ে ইহা আর আশ্চর্য কি? তবে চুই একটা বলি অমরণের অবিদ্যাই বোধ হয়, তাহাও ভক্ত অসংলগ্ন নহে; বিদ্যাগিণির বিদ্যার অভাবের পরিচয় মাত্র।

ব্যক্তির মতো কেবল দেখিতেছি, শিব, পূর্বে সবেকগণের—আশ্রিতগণের নিকট হইতে প্রিয় গ্রন্থ করিতেই বলিয়া বর্ণনা আছে—আর এখন হে পশুপতি! হে ভূতনাম! মন-কলিরে আশ্রিতগণের সন্তকে আপনাই প্রিয় প্রদান করিয়া থাক। এইই দুর্গ কলির মায়া। হে দ্বৈশ্বর! হে কালকূটকী! মৌর্যগণ!—আন-নাকে ভক্তিতে নমস্কার করিতেছি; প্রায় হইন।

এই শিব-বহুত অত্যন্ত গোপনীয়; আন্তিক বার্ষিক বিনীত এবং পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট ইহা কদাচ প্রকাশ্য নহে। নাস্তিক, অধার্মিক, শঠ, মুর্থ এবং হুঁসীনীতপন্থিক ইহা উপদেশ দিবে। যে ব্যক্তি জিম্মা, এই মহাবহুত পাঠ করেন, তাহার অস্তিত্ব সন্ধান নশ, হুস্মান্দার নাম, উন্নতি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

ইংরেজের পরত্নী গমন।

পৃথ্বীভূমি ভারতে সতী-রমণীর মাধ্যম্য চির পরিকল্পিত। সতী-রমণী হিন্দুর চক্ষে মানবী নহে—প্রত্যহই দেবী হিন্দুর চক্ষে অসত্য নরকের কটী অপেক্ষা দুর্ভাগ্য—সে সমাজ-বহিষ্কৃত, সর্বত্র হেয় ও সর্বথা অশুশ্রু। সতীত্ব রমণীর শ্রেষ্ঠত্ববর্ণ—অমূল্যমান—সারস্বত। তাই কবি বিবিরছেন—

“সতীত্ব মোনার নিধি বিবিরত্ব ধন।

কাশ্মিনী পেনে রাণী এমনই রতন”।

ইংরেজের চক্ষে—কিন্তু সতীত্বের আদর নাই বসিলই চলে। ইংরেজ আমানের রাজা, তাই স্বঘাটা বলিতে বড় সম্বোধ্য হয়—হওঁরাও উচিত। কিন্তু যে দিন-কাল পড়িয়াছে, তাহাতে একথা স্পষ্টতরো না বলিয়া থাকার যায় না। ইংরেজের মধ্যে যে সতী-রমণী নাই এমন-কথা আমরা বলি না। তবে, হিন্দুর ঘরে ঘরে সতী; রমণী বাহাতে সতীত্ব বন্ধা করিয়া জীবন বাপন করিতে পারে, তাহার জন্ম হিন্দুসমাজ বহুবধ নিয়ম-বিধি নির্দিষ্ট করিয়াছে; ওষ্টিক, ইংরেজের অনেক ঘরে অসত্য; রমণী বাহাতে সতীত্ব বন্ধা করিয়া জীবন বাপন করিতে পারে, তাহার জন্ম ইংরেজ-সমাজ বিশেষ কোন নিয়ম বিধি নির্দিষ্ট করে নাই, বরং ইংরেজ-সমাজ অসত্যকে রীতিমত পাণ্ডিত্য দেখে না—অসত্যকেই প্রশংসা দেয়। রাজ-শক্তি-সম্পন্ন ইংরেজ আমানিগকে কিস্তা বর্ষের বলু; কিন্তু সতীত্ব বন্ধা না করিলে রমণী যে প্রকৃত যথেষ্ট আধিকারবর্তী হইতে পারে না—সতীত্ব না থাকিলে যে রমণীর রমণীত্ব ঘোণা হয়—একথা যে জাতি না বুঝিতে পারিয়াছে, এ শিক্ষা যে জাতির সামাজিক

রীতিনীতি ছন্দস্বন্দ্ব করা হইতে না পারিয়াছে, সে জাতি যে প্রকৃতই সত্য ও উন্নত, তাহা আমরা মানিয়া লইতে পারিলাম না। রাজ-শক্তি-সম্পন্ন বসিয়াই ইংরেজ বাহাতে নিজের সামাজিক রীতিনীতিগুলি ছোর করিয়া হিন্দু-সমাজে চালাইতে না পারে, তজ্জন হিন্দু-মতেরই ঐকান্তিক চেষ্টা ও বহুত করা উচিত; এবং ঐকর চেষ্টা ও বহুত বাহাতে বাস্তবিকই করা হইতে পারে, তজ্জন ইংরেজের সামাজিক রীতিনীতির উপর হিন্দুর ঘে ঘুবা আছে, সেই কথা বাহাতে আরও বলবতী হয়, সেমতায় বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। এই উদ্দেশ্যে অধ্যা আমরা পরত্নী-গমন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের মত ও ধারণা-বিষয়ে ইংলণ্ডের একজন রুচিরত্ব দস্তাভ-স্ব ব্যক্তি কি লিখিয়াছেন, তাহা জানাইতেছি।

কিছুদিন ইংলিষ বিলাতের একজন ধ্যানতামা ব্যক্তি প্রকৃত আদালতে পরত্নীগমন কার্যেরে অপরাধী সাব্যস্ত হন। ইহার নাম পার্শেল; ইনি একজন প্রধান দলপতি—লক্ষ লক্ষ মেয়ে ইংলিষ আত্মদত্তব্য, দেবতার ভায় ইহার সেবা ও আশ্রয়-পালন করিতে। ইহার এক সম্মতা যে, বিলাতের প্রধান প্রধান রাজ-পুরুষগণ সময়ে সময়ে কাণ্ড উল্কারে জন্ম বাধ্য হইয়া ইহার ধোমাসুদি করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। গত ৩৫ বৎসর হইতে বিলাতের প্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন বাহাদুর ইহার বিশিষ্ট পুষ্টপোষক হইয়াছিলেন। বহন আদালতে এ ধেন পার্শেল-বাহাদুর পরত্নীগামী বিনা সাব্যস্ত হইলেন, তখন তাহার দুপুর কতক লোক চট্টয়া গেল, তাহার প্রাধাত্য স্বীকার করিতে সম্মত হইল না, এমন কি গ্লাডষ্টোন প্রকৃত বড় বড়লোক তাহার সমিত এক হাসনে বসিতে কুস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। পরত্নীগামী, সতীত্বাপহারী হাতে অমত্যা ধাক্কা হইতে পারে না; সে সমাজে প্রধান “আন পাউজে” পারে না; সে যেন আর নিজের কাশা-মুখ সমাজে না দেখায়—ইহার ঐকর কথাই বলিতে লাগিলেন। ইংরেজ-সমাজ-সভারকণ তারপরে বলিয়া উঠিলেন—“পার্শেলকে সমাজ-চ্যুত করিতে হইবে; পার্শেলকে দলপতি বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। তাহাকে ধোরতর অপরাধের গুণ পাউজে হইবে।”

যদি পরত্নীগমন সম্বন্ধে দেশের সকল বা অধিকাংশ লোকের এইরূপ মত হইত, তাহা হইলে আমরা ইংরেজকে কতক সত্য বলিতে পারিতাম,

তাহা—হইলে বিবাস হইত যে; সামসারিক সকল হইলের মূল দাম্পত্য-প্রণয় ও দাম্পত্য-বন্ধনের সার কথা ইংরেজ জানেন ও বুঝেন। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বাহারা পরত্নীগামী সতীত্বাপহারী দলপতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা অল্প—তাহারা নিজ সমাজের রীতিনীতি আচার-পদ্ধতির উপর সন্তুষ্ট নহেন, তাহারা ইংরেজ-সমাজে রমণীর সতীত্ব রক্ষিত হইবার জন্য নিয়ম বিধি প্রবর্তিত করিতে চানেন—তাহাদের চক্ষে ইংরেজ-সমাজের সতীত্ব ও উৎকর্ষের আশংকা নহে, বরং ইংরেজ-সমাজের ধোরতর ছাত্র-জনক চালা-চলনের তাহারা বোর প্রতিবাদী।

বিলাতে (Fortnightly Review) “মটমটালি রিভিউ” নামে একখানি প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র আছে। অনেক বিখ্যাত বড় লোক ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসের ঐ পত্রিকায় বিলাতের একজন ধ্যানতামা সভ্যতাব্যবসায়ী লোকের একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহাতে স্ববিবাস ইংরেজ বা সাধারণ ইংরেজ-সমাজ পরত্নীগমন কি চক্ষে দেখে, তাহা স্পষ্টরূপে বিবৃত আছে। আমরা এখানে নিম্নলিখিত অংশটী উদ্ধৃত করিতেছি;—

“The British nation, therefore, as a nation, demonstrably regards matrimony simply as a civil contract. It has nothing mysterious in it; nothing essentially indissoluble; it has no reason to advance, except that of practical expediency, why any marriage should not be wound up like a limited liability company. . . . A nation, then, which treats marriage simply as a civil contract, whose law sanctions divorce, and whose church marries divorced persons; has no logical right to condemn adultery as such, except on the ground that it is more or less inexpedient. In part, a man who lives with another man's wife, if tried by the only standards to which such a nation has a right to appeal, is open to the same censure, and

except for accidental circumstances, to the same censure only, that is incurred by a man who marries his deceased wife's sister.”

ইহার ভাবার্থ এই—দুর্বিবাহে কোনরূপ দণ্ড-বন্ধন আছে, ইহা সাধারণ ইংরেজ বা ইংরেজ-সমাজ স্বীকার করে না; তাহাদের চক্ষে বিবাহ একটা সামান্য চুক্তি মাত্র। যতদিন উভয় পক্ষই চুক্তি-পত্র মানিয়া চলিতে ইচ্ছা করে, ততদিনই চুক্তি বলবৎ থাকিবে; বিবাহ-বন্ধন যে স্বেচ্ছা-ব্রতী, ইহা ইংরেজ-সমাজ বলে না। কেন যে বিবাহ-বন্ধন অসত্য চুক্তির মতন ভঙ্গ করা হইতে পারে না, সে বিষয়ে ইংরেজ-সমাজ কোন দৃষ্টিই দেখাইতে সম্মত নহে; যদি কোন চুক্তি থাকে, সে কেবল সুবিধা অসুবিধা লইয়া। * * * * * যে জাতি বিবাহকে সামান্য চুক্তি-পত্রের আদায় বিবেচনা করে, যে জাতির আইনে দাম্পত্য-বন্ধন-ভঙ্গের বিধি আছে, যে জাতির ধর্ম-বাজকেরা দাম্পত্য-বন্ধন-ভঙ্গের পর অন্মন বদনে পরিত্যক্তা স্ত্রীর বধা-নিয়মে বিবাহ দেয়,—পরত্নীগমনকে পাপ ও অশুদ্ভ বসিয়া নির্দোষ করা সে জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। বাস্তবিকই, সে জাতির চক্ষে মৃত্যু জঘ্যার ভগিনীকে বিবাহ করা যে পাপ, পরত্নীগমনও সেইরূপ পাপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

পরত্নীগমনে কামুকতা বা অপবিত্রতা ভাব যে থাকিতেই হইবে, একথা ইংরেজ-সমাজ বিবাস করে না। লেখক প্রবন্ধের এক ছন্দে বলান;—

“The connection between sensuality and adultery is exactly the same in kind as the connection between drunkenness and murder. Murder is in many cases produced by drunkenness; adultery is in many cases produced by sensuality; but neither of these acts need be produced thus; and they are both due constantly to causes that are exactly opposite. Murder is often the result of as much coolness as ever went to the drafting of any Act of Parliament; and adultery is often the mere incident of an

প্রেমের মহান মধুরমূর্তি—প্রাচ্য-ভাষ্যবৎ, সৰল হৃদয়িত প্রকৃতি, যেনে,—উহার প্রাণ্ড, বর্ণনা, মধ্যম-স্থূৰ্ণবৎ স্রোতিঃ উপনিষদে; ততঃ উপর এক বিরাট রূপমূলক। ততঃ পঞ্চম বৎসর। পূর্ব-প্রেমের প্রসন্ন, প্রাণমূলক, স্বর্গকোণ-বৎসর। অতঃপূর্ব-উজ্জ্বল-সময় "তব কাব্য-সাহিত্যে। প্রেমের পার্থিব ভাবের মধ্যেও বৈশ্বকোণে বিস্তৃত বাণ প্রস্রাবিত।

জন্মভূমি "স্বর্গাদি গরীয়সী।" কিন্তু কেন, জন্মভূমি এত সুখী?—স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ কেন? এত মহান, এত মধুর, এত মনোহর, "এত প্রাণ-মন-মুগ্ধকর, এত পবিত্র কেন, জন্মভূমি?" কি ঐশ্বরিক ইচ্ছাশাল তাহার মধ্যে যে জন্মভূমি "স্বর্গাদি গরীয়সী।" বিপদ, ব্যাধি, দানিষ্ঠ্য, স্নানচারণ, অর্থহীন, অসুখ-শুশ্রূষা, অকর্মণ্যতা, অস্বাস্থ্য, অশেষ ঈর্ষ্যা-পোষে জন্মভূমি দানিষ্ঠ্য, বিপদঃ; বিপদের পর বিপদ, বিভ্রাটের উপর বিভ্রাট উপস্থিত হইতেছে—প্রতিদুঃখেরে হাফা-কারের উপর হাফাকার উল্লিখিত হইতেছে, তথ্যতঃ তোমার এই জন্মভূমি সর্বপৃথিবীর হৃদয়ভাগী হৃদয়ভূমি হইতে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ—এই শ্রেষ্ঠত্বের হেতু কি? প্রবাসী জন্মভূমির স্মৃতি-মাগেও স্বর্গ-স্থল অসুখ-করেন—অসুখম, অনিচ্ছানীয় আনন্দ উজ্জ্বল উজ্জ্বল হন, ইহার কারণ কি? কারণ কি, তাহাও কি আর বলিয়া বুঝাইতে হয়? কারণ ত আর কিছুই নাই—প্রাণ—প্রেম, প্রেম, প্রেম। জন্মভূমির অন্তরে—নাহিলে, সর্বদা-শরীরে, তাহার প্রতি অণু পরমাণুতে, তাহার নামটিতেও প্রেমের পবিত্র গরীবি জোড়া বসে; তাই জন্মভূমি নিঃশব্দ হইলেও শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, কদাকারও সুসংগীত হইলেও সুন্দর হইতেও সুন্দর; তাই জন্মভূমি নাহিলে কেবল বস্তুনিষ্ঠত্বের এমন কিছু মায়াশ্রা নাই যে, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। ফল কথা এই যে, প্রেমধারা, সর্বদা পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ হয়। প্রেম আশ্রয়। উচ্চতর কিছুই এ পৃথিবীতে নাই। প্রেম উচ্চতর হইতেও উচ্চ।

ধর্মকথা "বিবাস" বহুকাল হইতেই বিশিষ্টতা লাভ করিয়া আসিতেছে। বিবাস বস্তুতঃই বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, উচ্চমানীয় এবং অত্যন্ত আশঙ্কনীয়। বিবাসের বলে কত নারী বিবাসীর কথায় প্রচলিত চলে, পুরুষ নত-শিরে সমসীয়া দাঁড়ায়। স্নিগ্ধ এতাদৃশ পরিত্র যে বিবাস, তাহা অপেক্ষা অনেক

অধিকতর পরিত্র প্রেম। কারণ প্রেম লক্ষ্য, বিবাস উপলক্ষ্য; বিবাস সাধনা, প্রেম সিদ্ধি। উপলক্ষ্যের অত্যাশঙ্ক্য আছে—সাধনা সর্বতোভাবে শিরঃ-হীনায়; কিন্তু উপায় বা উপলক্ষ্য অপেক্ষা লক্ষ্য এবং সাধনা অপেক্ষা সিদ্ধি যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই।

ধর্ম জগতে বিবাসের প্রয়োজনীয়তা কি? শাস্ত্র এবং ধর্ম-বিবাসের সফলতা কি? সফলতা এই যে, বিবাস বিপেক বিবেচনার দিক আকর্ষণ ও অঙ্গসর করে—আমাদের পরমাচার অসুখগামী করে। আত্মকে পরমাচার অসুখগামী করার অর্থ কি? অর্থ এই যে, আত্মা পরমাচারকে প্রাপ্ত হইলে, আত্মা পরমাচার হইলে, পরমাচার্য্য ভুলে, পরমাচার্য্য বিনোদ হইলে। উক্ত শাস্ত্রকার এবং সাধকের পরমাচার প্রেম করণ, পরমাচার-প্রেম প্রকাশ, অতঃপূর্ব সাধনা অপেক্ষা সিদ্ধি যন্ত্রণ শ্রেষ্ঠ, বিবাস অপেক্ষা প্রেম উচ্চ শ্রেষ্ঠ। দাননীলতা অপেক্ষা প্রেম শ্রেষ্ঠ; প্রাণ প্রেম এবং পূর্ণপ্রাণি, দাননীলতা অতঃপূর্ব প্রাণ; প্রেমের বহুবিভাগের মধ্যে দাননীলতা একটা বিভাগ নাই। দাননীলতা যখন তাহার প্রকৃত সত্ত্ব অসুখের প্রেমের অন্তর্গত এবং প্রেমের দ্বারা পবিত্রীকৃত, তখনই তাহার মায়াশ্রা, মনুবা প্রেম-পরিপূর্ণতা অসুখ, অকর্মণ্যতা, অর্থ-পাশঙ্ক্য, বাহিক আড়ম্বরের আলাড়িত দাননীলতা কিছুই নয়। তাহা মানব-প্রকৃতির বিবিধ বিকারের মধ্যে একটা বিকার—একটা তাপাস্য—একটা ক্রোধ এবং প্রসন্ন। "অনার" উপাধি উপাধি-বাহিনী ইহা নই যে সকল "দান" দুঃখ-পোষিত হইয়া থাকে, তাহা উপরোক্ত প্রকৃতির দাননীলতারই অন্তর্গত; সে দান একটা দৃষ্ট—জন্মভূমির একটা দৃষ্টা দেখা।

পরন্তু আর এক রকমের দাননীলতা আছে, সেটা যুব সন্তান মনুষ্যের বস্তুতঃই তাহা। একটা পদার্থ এক সন্তান কতি—একমুখি চাইলে দান জন-সাধারণের মধ্যে যত্নবৎ প্রচলিত। সেটা যে কিছু মন্দ বলিতে পারি। তাহা নহে; বরং তাহা যত আরও অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত হয়, ততই মনুষ্যের পুণ্য। তবে বলিতে পারিমাণ এই যে, একপ্রকার দান করা স্মৃতি মনুষ্য—তাহা না করা অস্মৃতি মনুষ্য। একপ্রকার দান দান-দ্রিক পদার্থ মনুষ্য দান-উপলক্ষ্য অসুখ-উপলক্ষ্য কেনে আমরা ক্রমে ক্রমে জন্ম করিয়া অন্তঃকরণটাকে আশ্রয় কর

১৩৬

১৩৬

হই। দাতার পক্ষে এ দান যুব সন্তানদের পূণ্য-সম্বন্ধ বটে, যদিও গ্রহীতার পক্ষে উহা বিলম্বন সফল, কিন্তু কুখ্যার দুঃখের দিকে আবার প্রকট হয়, ব্যাধি হই, প্রকট হই যদি তাহার প্রতি আমাদের দয়ার উদ্বেক হয়, তাহা হইলে হয় তাহাকে আমরা প্রাণপণে সহায়তা করি, না হয় তাহার জন্ম কিছুই করি না। তা চিরপ্রচলিত "মুক্তি-ভিক্ষা" ক্রমে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

অতঃপূর্ব পর উদ্ভাটনা। উদ্ভাটনা কত বড়ই উচ্চ অঙ্গের শক্তি। সে শক্তিদ্বারা "শব্দমাধন" পর্যন্ত হইতে পারে। উদ্ভাটনা অতঃপূর্ব চেনে। সন্ধারের "সন্ধার" পর। উদ্ভাটনা নির্দ্বন্দ্বক সন্ধার করে; অসাড় প্রাণে আত্মন "জগিয়া" দেয়। উদ্ভাটনা মানব প্রকৃতিতে উচ্চ হইতে উচ্চত। প্রাণে উদ্ভাট করি, উদ্ভাটনা এবং পবিত্রতা প্রতি তাহার অবিচ্ছিন্ন আশ্রয় করিয়া দেয়। উদ্ভাটনা-শক্তি এবং কনিষ্ঠ-শক্তি প্রকৃতির অতি আশ্চর্য্য, অতি প্রাণ-নীয়া এবং পূজনীয়া প্রতিভা। "কিৎ এ প্রতিভাও, প্রেমশূন্য হইলে, প্রকৃত পার্থক্য মণ্ডিত পণ্য। নহে। উদ্ভাটনার অন্তরালে যদি প্রেম না থাকে—প্রীতি, বৈর, একপ্রাণতা না থাকে, তবে তাহা কত বড় যে একটা বিষম বিভ্রম। ইহা দাঁড়ায়, তাহা বাহ্যই বাহ্য। সে উৎকট উদ্ভাটনা-বিভ্রম আর কিছুই নয়; কেবল কতকগুলি নরক, ভয়, কঠিন, কষ্ট, অসুখ, আশঙ্ক্য, আশঙ্ক্য ও অসুখিত বিনোদিত।" সমাধি। তদ্বারা উদ্ভাটন ত হয় না, উপরন্তু কেবল নির্যাতনই বটে। সেষ্টপূর্ণ বলিয়াছিলেন—

Though I speak with the tongues of men and of angles and have not Love, I am become as sounding brass or a tinkling cymal.

কবিত্ব-শক্তি সর্বদেও এই কথা। প্রেম-বিরহিত হইয়া কবিত্ব জন্মিতেই পারে না। কবিত্বও কোনও কালে কোথায়ও জন্মে নাই। কবিত্ব্যাপ্তিরও নহে।

এখন দেখা যেল, প্রেম সর্বমূল্যধার, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তি আধার। প্রেম-পরিপূর্ণ হইলে মনুষ্য করিলে, ততই যত্নের পর যত্ন পাইলে; বর্ষা যুগের সমস্যা ততই পূর্ণ—প্রতি হইলে। বর্ষা যুগের কাল হইতেই প্রেম-সিদ্ধি বসিত হইতেছে, কিন্তু তাহা হইতে কখনই "সুখ"র পর "বিষ" উদ্ভূত হয় নাই। চিরকালই বসি বসি উদ্ভূত হইয়া আসিতেছে। এতাবৎকাল যত মনুষ্যবান মানিক

প্রেমের অমলা-নিধি হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহা অসংখ্য, মধুর-বাপ্ত। যত পার, তাহা সংগ্রহ করিয়া, কষ্টে ধারণ কর, "বহু" হ্রাস কর, প্রতিদৈনিক জীবনে তাহার প্রয়োগ কর, সাধনা কর,—জীবন সফল হইবে। প্রেম-শিক্ষা হইলে আর কোন শিক্ষারই প্রয়োজন হইবে না। সকল উপদেশের সার উপদেশ প্রেম। বাবতীর ধর্ম-উপদেশও নীতি-উপদেশ, "প্রেম" এই একমাত্র শব্দে মধ্যে নিহিত এবং লুপ্তপ্রায়। উহা উদ্ভাটন কর, আপনা হইতে আসিয়া সব উপস্থিত হইবে। প্রেম "শব্দে" সাধনা আরম্ভ করিতে করিতেই মুখ এবং শান্তি প্রাপ্ত হইবে, সে সাধনা সমাপ্ত করিতে পারিলে "সিদ্ধি" সমাপ্তও আসিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। প্রেমের প্রথম সাধন আরম্ভ, অসুখত-হইবে—

"আত্মবৎ সর্বভূততঃ।"

"আত্মবৎ সর্বভূততঃ" অসুখত হইলে—আর কোন উপদেশেরই আবশ্যক হয় না। তখন মানুষ জ্ঞেয় মোহে মোহে অস্বাভাবিক দুঃখ রিপু কটর আক্রমণ হইতে সাধনার তারতম্য অসুখেরে সুনামিত-বিত্তবাস্তব অস্বাভাবিক পায়। যখন আত্মবৎ সর্বভূততঃ, যখন "তোমার মত আমি, আমার মত তিনি", এই জানের উদয় হইল অর্থাৎ যখন আত্মবৎ প্রেম অস্তিত্ব প্রতি প্রাণন করিতে শিখিলেন, তখন আর তাহার উপর জ্ঞেয় করি, কাহার জ্ঞেয় মোহ করি, কাহার উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক? নিজের জ্ঞেয় "তোমার নিজের যে প্রেম ভালবাসা, সেই প্রেম ভালবাসা যখন হৃদয় সর্বভূততঃ নিঃশব্দ করিয়াছে, তখন আমি তোমার অপেক্ষা নিঃশব্দও নাই, শ্রেষ্ঠও নাই অতঃপূর্ব তখন তুমি বসি আমি; অতঃপূর্ব কিংকরের আর তখন তুমি আমার প্রতি আত্মা ও অস্বাভাবিক করিবে। যদি কর, সে আত্মা এবং অস্বাভাবিক তোমার নিজের প্রতিই বসিবে। তবে জ্ঞেয়টি যত পাজি জ্ঞেয়টি বটে। নিজের প্রতিও সময়ে সময়ে নিজের জ্ঞেয় হইয়া থাকে; কিন্তু সে জ্ঞেয় আত্মোত্তরিতই একটা উপাধান।

"আত্মবৎ সর্বভূততঃ" ইহার পর আত্মপূর্ণ-বিজ্ঞে-শূন্যতা। ইহা এই প্রেমের প্রাকটিক; পরমার্থবাদী, সর্বভূততঃ সাধনীয় শিক্ষা। এ শিক্ষার শিক্ষিত হইলে এবং "আত্মবৎ" বোধ থাকে না; সর্বদা "আত্মা" আর "আত্মবৎ" বোধ

প্রেমের এই শিকাই জানের উচ্চতা হইতে উচ্চ-
আকাজক; ইহাই 'অবৈতন্য' ইহাই 'অপবর্গ'
ইহাই স্রবস্ত্র-স্রবরে বিলীন হওয়া—মুক্তি, স্বর্গ
এবং বৈতন্য

কিছু এ সকল অতি গুরুতর কথা;—
এ অবস্থা, প্রেমের প্রথম সাধনা-সাধক;—সে
সাধনা সকলের ভাগ্যে শীঘ্র সম্ভব নয়; অতএব
প্রেমের নিম্নতর অধিকারই আপাততঃ আমাদের
আয়োচ্য। নিম্নতর সোপান বিয়াই উচ্চতর শৃঙ্গে
আরোহণ করিতে হয়; কিন্তু হ্যা নিম্নতর অধি-
কারই বা আমাদের কলঙ্কন অধিকারী।

জনের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে জানের পথ
দৃষ্টি, হৃদয়, জ্ঞান—কিন্তু প্রেমের পথ প্রসন্ন,
পরিকার এবং সুখভর মাধ্যম। পরম জ্ঞানের চরম
ফল—প্রেম; প্রেম নহিলে পরমেশকে পাওয়া যায়
না—প্রেমের পায় যদি এসে ভাই—পারিলে না
কেন, অশ্রুই পারিলে—এস ভাই। প্রেমের পথে
পরম নিধির উদ্দেশে যাবিত হই; প্রেমিক হইতে
পারিলে পরমায়ার দর্শন লাভ করিতে অধিক দেরি
হইবে না।

সেতো প্রচার করিয়াছিলেন,—এক রকমের প্রেম;
তালনা শ্রীক্ষ করিয়াছিলেন,—ভিন্ন প্রকার;
শঙ্করাচার্য এবং দ্বৈতমার্শির উপদেশে প্রেমের বহুতর
প্রকৃতি এবং বহুতর পথ; পরম স্টেটপল এবং
চৈতন্য মহাপ্রভুও ভিন্নভিন্ন পথ আবিষ্কার ও প্রচার
করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু মুগ্ধত প্রেম একই পন্থা
পার্শ্ব। রাধা শঙ্করাচার্যের অবৈতন্যতা, তাহার
দৈশার ভৈতন্যতা; পরম তাহার চৈতন্য প্রভুর মন
রম। প্রেমের মানসিক প্রেমই শ্রীক্ষের মহান
প্রেমের নামান্তর। একই অমৃত্যুর কবিতা সুধিলে
সে ভাব স্বভাব এক বিশ্বও অমৃত্যু হইবে; তবে
সে ভাব যদি গভীর, অতি, গুহ্য ভাব হইবে;
সাধক-হৃদয়ই সে ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে
সমর্থ হন।

শ্রীক্ষের দর্শ, শরীর, সমন, সংহাস, সমস্ত
সমস্ত উদ্দেশে সবিধ, পরীক্ষ, প্রেমের প্রবল-
তা এবং অত্যন্ত অসাধারণ তরঙ্গাঙ্কুর, চরম
হইতে চরমতর উন্নতি; তাহা পূর্ণ-প্রতিফল ও
ইন্দ্রিয়াক্রান্তি আবার নহে। ওহা অল্পপ্রের গুণ
ভাব; তাহা Abstract এর 'concrete' আকার
abstract এর concrete অমৃত্যু, এবং concrete
এর abstract অমূল্যল পদার্থবাহক নহে,
অবৈতন্যক নহে। একথা অধিক বিস্তার

করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে। ব্যবহারের
বিকৃতির জন্য মহাভাব নিজে দায়ী নহে।
অধর্ম ধর্মের 'লোহাই দিলে, ধর্ম মারা পড়ে না';
অধর্মের পঙ্কত প্রেমের 'সোহাই দিলেও প্রেম
মারা পড়ে না; পরম তাহার ধর্মের এবং প্রেমের
প্রাথমিক—প্রবল পরাক্রমই প্রমাণিত হয়। অচিৎ
অধর্মের মধ্যেও যদি ধর্মের সর্বসম্পাদক নামটীও
সম্ভব থাকে, তাহার অধর্মও শরৎ শরৎ; ধর্ম
পরিণত হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক। কোল
মাত্র প্রাথমিক পরিত্যাগেও যদি প্রেমের পরিণত
নাম উচ্চারিত হয়, তাহাতেই বা একান্ত স্ফূর্ত
কি? তাহা আপাত-দৃষ্টে অশ্রুই অতি নিদ্রুণ,
এবং অত্যন্ত অপ্রচিকর হইবে; কিন্তু দূরদর্শন ও
হৃদয়দর্শন দৃষ্ট করিলে অনিষ্টের মধ্যে ইহাই অবি-
দিত হইবে। যোগ-আনা অনিষ্টকারিতার অভ্যন্তর
যদি ইষ্টকারিতা হইত সামান্য ভাষায়ও নিমিত্ত
থাকে, তাহাতে ভূমি দোষারোপ করিতে পার না।
অনিষ্টকারিতাকে দোষারোপ অবশ্যই করিলে;
কিন্তু ইষ্টকারিতা হইলে অপরাধ কি? সাংঘাতিক
হিসাবেই কথটা কসামালা করিয়া দেখ না কেন?

প্রেমের আকাজক অনন্ত। প্রেমের আকাজক
এককণ। অন্যের এবং একীকরণের আকাজক
হইতেই উচ্চ এবং নিম্ন অধিকারী ভেদে প্রেমের
ভিন্ন ভিন্ন ভাগ, বিভাগ, রসাদিকল্পনা এবং প্রচার
বা প্রেমের ভাব, বিভাগের 'বহুতর বহুতর' নাম এবং
গ্রাম। সান্ত্র অনন্তের অজন্ত অংশ। সাধনা নাম
আরম্ভ হয়; আরম্ভ করা অজ্ঞার ও অস্বাভাবিক
নহে; আনন্দ আনন্দ স্টেটপলের উপদেশে অমু-
শীল করিয়া প্রেমের কয়েকটা অপেক্ষাকৃত সহজ
সাধনীয় সত্য স্বয়ং জীবনে প্রতিভাত করি।

প্রেমকে নিম্ন প্রকার করিলে ত্রুটিয়া সাধারণতঃ
নিম্নাধিকারিত মাত্র প্রকাশ দিয়া প্রাপ্ত হইবে।

১। ধৈর্য—প্রেম ধৈর্যশীল। প্রেমি-
কের প্রাণে কতই না সা আহার প্রেমের জন্য।

২। দয়া;—প্রেমিকের হৃদয়ে দয়ার
হৃদয়তো প্রবাহিত হয়।

৩। মহত্ত্ব;—প্রেম-কনন ও কাহারও
কিছুতেই ঘেঁষে ঘিষা করে না, করিতে পারেই না।

৪। নম্রতা;—বিনয়;—এই প্রেম-
পরিবার কলীত হয় না। আশঙ্কিত কলীত
তাহাতে থাকিতে পারে না।

৫। শিষ্টাচার;—প্রেমিক অশিষ্টা-
চরম করেন না।

৬। নিঃস্বার্থপরতা;—প্রেম স্বার্থ-
বর্ষ অমৃত্যুকান করে না।

৭। মিতপ্রকৃতি;—প্রেম ক্রোধ ও
কুপ্রকৃতি উদ্ভাব করে না।

৮। চাহুরী-বিহীনতা;—প্রেম
পরের দানি নাই।

৯। সরলতা;—প্রেম শৈশুস্বভাব স্বভাব
উন্নতি। সত্যাত্মকতা।

এখন দেখ এই, ধৈর্য, দয়া, মহত্ত্ব, বিনয়,
শিষ্টাচার, নিঃস্বার্থ-পরতা, মিত-স্বভাব, চাহুরী-
বিহীনতা এবং সরলতা, এই সকল স্বরূপের সমষ্টি-
তেই সমগ্র সত্য; এবং এই সকল স্বরূপ সম্ভাব-
শীল হওয়াই পূর্ণ মহত্ত্ব। আরও দেখ, এই
সমগ্র স্বরূপই প্রত্যেক এবং প্রত্যেকতঃ সান্নিধ্য,
ইহারা প্রত্যেক জীবনে এবং সুস্থ্যাবে সাধারণ
সম্বন্ধযুক্ত, ইহারা তোমার সমুখ উপস্থিত; ইহারা
'অমৃত্যুর' গিরিরই অঙ্গভূত, এই বর্তমান মুহূর্তও
'মাধ্যম্যক'; ইহারা তোমার অত্যন্ত অমৃত্যবর্তী
কণ্যকার সহিত বিভাজিত; ইহা গিরির উপকারিতা।
এবং সুখচিত্র সফলতা উপলব্ধি এবং উপলব্ধি
করিতে তোমাকে তোমার অজানিত অমৃত্যুর ভ্রম
অপেক্ষা করিতে হয় না। পরিকার পথ পারে, কিন্তু
ইহা কলিই ইহারা তোমাকে স্বার্থ-বর্ষ প্রদান
করিতে পারে; এই মুহূর্তই ইহারা তোমাকে পঙ্কত
হইতে মহত্ত্বকে উন্নীত করিতে পারে।

আমরা ভাবনামে ক্রি এবং আশু-জগতে প্রীতি-
সম্বন্ধে অনেক উপদেশের কথাই শুনিয়া থাকি
এবং সে সকল উপদেশ অতি উপায়ের এবং উপ-
কারী তাহাতেও সন্দেহ নাই; তবে কথটা কি তা
জান যে, একটা অমৃত্যুই সমস্ত উপদেশ অপে-
ছাও শ্রোয়। ধর্ম অমৃত্যবর্ষ অমৃত্যবর্ষ; স্বর্গ সদা
কালই সামান্য। ধর্মরাষ্ট্রো ও ধর্মরাষ্ট্রো দাম্ভ-
র্য্য বা উচ্চতর কিছুই নাই; উহার প্রাত্যহিক
জীবনেই প্রত্যক্ষীকরণীয়—তোমার এই বর্তমান
মুহূর্তই অমৃত্যুত;—এই ধানই, এই জীবনেই
কলিও পদাধিকারিত;—তোমার এই বর্তমান
প্রতি দৈনিক কার্য এবং কল্পনা সমষ্টি-সত্যবয়মতা
এবং সাধিকতাতেই সিদ্ধ হয়।

পূর্ণতঃ প্রেমাত্মক উপরোক্ত সেই সত্যবয়মতা
এখন আপন একই আলোচনা কর।

১। ধৈর্য—প্রেম অতি ধৈর্যশীল; রীতভা
উহার এক অমৃত্যু স্বরূপ। অবিচলিত, নির্ভর, গভীর
প্রেম স্বভাব প্রতীক্ষাশীল। আহার প্রেমের প্রাণে
কতই না সা। প্রেম কতই না প্রতীক্ষা করে; কতই
না যত্ন করে। এক দিন, দুই দিন, দুই সপ্তাহ দিন,
দীর্ঘকাল, স্বরূপ জীবন, প্রেম, প্রতীক্ষা করিয়া
কটাইয়া দেয়—অচল, অচল। আহার প্রতীক্ষা
অমিত্যুত প্রভব হইয়া আহারতত্ত্ব পানন করে;
কিন্তু অধীর হইয়া আহারবিমুগ্ন হয় না। প্রেম
অপেক্ষা করে, আশা করে, দিখান করে—সর্ব
সম্মিত্যুর সহিত সন্ম করে; প্রেমের ভ্রম শীঘ্র
নির্গীতন, কষ্টদানসম, পৃথিবীতে কেইদই নাই,
কিছুই নাই। প্রেম প্রকৃততর রূপে, অমৃত্যুর রূপে,
অন্তর অপেক্ষা করে।

২। দয়া। দায়ী দায়ী প্রেম হৃদয়,
সদা শূন্যবস্ত। প্রেমের কোমল প্রাণ-বলক গিয়েই
চায়, পাইবার প্রত্যাশা করে না। পৃথিবীতে যুগ
যুগীতন—স্বর্গ পৃথিবী প্রেমের আধিক্যে। দুইই
সুখ-সমীপ প্রেই উপকরণ। প্রেমের করণার প্রবল
উজ্জ্বলিত।

পৃথিবীতে যুগ অপেক্ষা প্রেইতর পার্শ্ব যদি
কিছু থাকে তাহা পূর্ণ। জীবনক, পূর্ণাঙ্গীল-করা
জীবনের অধিকারদীন নহে; কিন্তু মহত্ত্ব তাহার
পরিণতি এবং পার্শ্ব মহত্ত্ব মাজকে—জীবনকালই
স্বর্গী করিতে সমর্থ। আর সে যুগ—সেই সার্ব-
ভৌমিক যুগ আমাদের ব্যক্তিগত দয়া দ্বারা সাধা-
নীয়; স্ত্রী হইতে পারে। এই পাপ পৃথিবীতে—
এই স্বার্থ-প্রাণিত পৃথিবীতে, দয়াই হওয়া এমনও
অসম্ভব উদ্দেশ্য নহে। দয়া তোমার অমৃত্যবর্ষ
জগৎ উদ্দেশ্যকে হইতেই হয়, দয়া-উদ্দেশ্যকে হইতেই
হয়, দয়ার দূর হয়—কত আশুভি, প্রেমই না
পৃথিবী হইতে পলায়ন করে—কত ভাষাই না
সাধনা-মালিশে বিধোত হইয়া যায়। দয়ার একটা
কাণ্ড, একটা কথা, দয়ার কবিকাম্য, স্টা-
মোটেই, হৃদয়ের শতধারা ছুটাইতে পারে। দয়ার
ওত শক্তি। এখন সেই-দয়া, সেই স্বকাম্য, সর্ব-
কেশবের সত্যাত্মক প্রেমেরই অজন্ত অংশ, প্রেম
হইতেই পূর্ণতঃ সত্যাত্মক এবং প্রাথমিক পদবিত্ত।
তালনা শ্রীক্ষ সর্ব প্রাথমিক অমৃত্যু
ভিত্তি, জীবন। তৎও ইহা অতীত আশ্রয়

বিষয়, আর বড়ই দুঃখের ও নজর কথা যে, আমরা যে হতভিম দয়ালু ভাষা অপেক্ষা আরও একটি অধিকতর দয়ালু হই না। আমরা দয়ালু হই না অথচ কত সহজই না, আমরা দয়ালু হইতে পারি। অহা! এমতসারে 'দয়া' কতই না, আশংক্য! দয়ার পাত্র কতই না অসংখ্য! রাজা মহারাজা হইতে নীন দুখী—দয়ার প্রার্থী কে নয়, দয়ার আশংক্যকাতার নাই? আর দয়া কত যে নীল বর্ণাধারাদেব মনবর্ষ হয়, তাহা কেই বা না দেখি-
য়াই? কেই বা না জান, দয়া অজ্ঞাতরূপে কার্য করে, অবিচলিতভাবে, আত্মবান—চিত্তপটে অঙ্কিত থাকে! দয়া অজল পরিমাণে—আত্মপ্রতি-
শোধে প্রবৃত্ত হয়। দয়ার জ্বালি প্রব্রণ যে প্রেম, তাহা কখনই অকৃতকার্য হয় না। প্রেম সন্তোষ, প্রেম সুখ, প্রেমই জীবন; প্রেমেরই জীবনের জীবনী-
শক্তি। প্রেম যে স্থলে, পরমেত্বের সেই স্থলে। যিনি প্রেমময়-দায়, পরমেত্বের তাহার নিয়ত নিষ্ঠকৃত। প্রেমিক, পরমেত্বের প্রিয়পাত্র। প্রেমেরই পরমেত্ব। তাই বলি, প্রেমিক হও, প্রেম কর। ব্যক্তি-নিষ্ঠাশেবে, অথবা ও অব্যক্তি-
নিষ্ঠাশেবে, দ্বার্য ও সন্তোষের নিষ্ঠাশেবে, নান্য-
পাত্তে পন্য-নিষ্ঠা হইয়া, স্বপ্নমাত্রা বিশ্বাস না করিয়া প্রেম বিতরণ কর। প্রেম বিলাপ ও স্টাও, অকালসে প্রেমের 'হরিলুট' দাও। বিলাহবার
কল্পই প্রেম, 'হরিলুট' বিহার কল্পই হরি। সে পুরুষ যত বড়ই বিলাহিবে, ততই বাড়িবে; অতএব
আর বিলম্ব করিও না। এখনি উঠ,—এই মুহূর্তই
অকাল হও। নির্দয়কে তে উহা অজল পরিমাণে
সিবেই, কিন্তু ধনকে দিতেও তুলিও না,—দানীর
প্রতি যত একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিও, কাহার কালো
প্রেমের বড়ই কাহার। পরন্তু তোমার সমকক্ষকে
প্রীতিপ্রদানে সতত সন্তুষ্ট করা চাই। একাধারী
হু কটন, আশংক্য কার্যে আমরা বিলম্ব অথবা
করিয়াও থাকি।

সদৃশসে সন্তোষ উৎপাদন কর। সন্তোষ পৃথিবী
জন্মকাল হারাইই না। এ জীবন কলঙ্কের জড়
বল দেখি। আর সময় নষ্ট করিও না।
৩। বহু। প্রেম হিংসা-দেব-বৈদ্য, এতলে
প্রেমের প্রতিযোগিতার কথা। প্রেম প্রতিযোগিতার
এসর, পরিতৃপ্ত। তোমার সংস্কারগণ সন্তোষ
সন্তোষে সন্তোষ করিতেছেন; হতভিম তোমার
অপেক্ষা, তিনি অধিকতর উত্তমরূপে সে কার্য

সামান্য করিতেছেন, কিন্তু তাহা দেখিয়া তুমি
সুখীভূত হইবে না, বিবেচনা-বিচলিত হইবে না।
কিছু—

৪। বিনয়। বিনয়-নমিত হইয়া আত্ম অসুস্থতা
অবহর অন্তর্যমণি রাখিবে; প্রতিযোগিতার প্রতিভার
প্রীতি ও প্রভু হইবে। তোমার শক্তি অসমার
সংস্কারের পর সংস্কার করিবে, কিন্তু তাহার জল
কলঙ্ক ও যেন পথ করিও না; নিম্নত আত্মপান
করিবে। আত্মরিক দয়ালু সান্ত্বিত্য থাকিবেই
পারে না, প্রকৃত প্রেমের অর্থজ্ঞানের আদৌ
অভাব।

৫। শিষ্টাচার। প্রেম শিষ্ট, শান্ত, সভ্য এবং
ভাল। প্রেমিক ব্যক্তি কখন অজল ও অশিষ্ট হইতে
পারেন না; তাহি শিষ্টই অশিষ্টতা ও সামান্য-
নিয়মে অজল হইতে না। তুমি প্রেমিক অথচ সামান্য-
নামিত, অস্মার্কিত ও সভ্যতার অশিষ্টতা ব্যক্তিক
অস্মার্কিত তত্ত্ব শিষ্ট-সভ্য বসাইয়া দাও,
সেখানে—তিনি আদৌ অস্মার্কিত করিবেন না,
প্রকৃত দয়ালুগাহী-স্বাধারে মনোবর্ষই আদৌ আকর্ষণ
করেন। প্রেমপূর্ণ জগৎ হইতে শিষ্টাচার বৃত্তই
কিন্তে হয়। কারাদান কহিবেন, 'স্বপ্ন-কবি
হারসের দ্বারা ভ্রমলোক সমগ্র ইউরোপে বিভীষিত
নাই'। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই
না—দায়ালু প্রভাবী-বৈদ্যালক অশিষ্টতা অস-
মার্কিত কলঙ্ক হইলেও প্রেম-ভাষ্যমাসার পরিপূর্ণ-চিত্ত
ছিলেন; তাহার প্রেমপূর্ণ সরল জগৎ হইতে কবিতা
তাঁহার অজ্ঞাতেরই উৎপাদন হইত; নীলতা ও
শিষ্টাচার স্বভাবেরই বিকাশ বাত করিত। স্বরল
দর্পিতের কটীর হইতে রক্তাক্ত প্রাণাদ পৃথক
সর্বদাই শিষ্টাচারে সমভাবে আত্ম হইতেন।
অথচ তিনি অশিষ্টতা অস্মার্কিত কলঙ্ক।

৬। বিশ্বাসিতা। প্রেম আত্মপূর্ণ অসুস্থতান
করে না। বাহ্য তাহার নেহাত শিষ্ট, তাহাও
আকাজকা করে না। তুমি তোমার নিজের অধিকার
সংরক্ষণ করিতে সম্পূর্ণ অধিকার। সে অধিকার
তোমার স্বভাবকৃত; কিন্তু যে অধিকার নিম্ন অধিকার
মাত্র। আত্ম-অধিকার বর্জন করিবাস্মার্কিত তোমার
উচ্চতর অধিকার। ইহা উত্তর নীতির কথা এবং
কিন্তু উচ্চ অধিকারের বিনি অধিকারী, তিনি—কিন্তু
ও প্রশংসিত ব্যক্তি। আত্ম-অধিকার সর্বস্বত্ব
পরিবর্তে বর্জন করা সার্বভৌম। সত্যায়নী স্বপ্ন।
কিন্তু কেবল আত্ম-অধিকার বর্জন করিয়াই প্রেম

পরিবৃত্ত হয় না; আত্মকেই একেবারে বর্জন
করে। প্রেম নিজস্ব ও রাখেই না, 'নিম্ন' কেই
সমর্পণ করে। অধিকার বাহিরের বস্তু—অতএব
আত্ম-অধিকার বর্জ্য অলোকে ত্যাগ করিতে পারে,
কিন্তু আত্ম-ত্যাগ, আত্মদান একা প্রেম-ব্যতীত
আর কেহই করিতে পারে না। তবে বল দেখি,
প্রেমের চেয়ে নিম্নস্বপ্নপত্রতা আর কোথায়।

৭। শিষ্ট-প্রকৃতি। প্রেমিক-জগৎ কিছুতেই
কপিত হয় না; তাহা সদাই সরল, সদাই হৃদয়িত;
আনন্দে, আনন্দে এবং ক্ষুধিত সদাই পরিপূর্ণ।

এই আনন্দ, আদর এবং ক্ষুধিত—সম্প্রদেয়তা
সরল হৃদয়িত স্বভাব—সকল ধর্মের, সকল ধর্মের,
সর্বপ্রকার মানবীর সাহায্য এবং উপায়। ইহার
প্রভাব এবং বিরোধিতাবে, ধর্ম কর্ম এবং সামান্য-
মাত্রই পও হয়।

'স্ব-মেজাজ' বড়ই বিষম বস্তু। উহা বিদ্যুৎ
নিম্ন অপেক্ষাও সাংঘাতিক। উহা স্বর্গের সজ্জন্য
স্বাধারেও সংসারক অনর্গল পরিবর্ত করে। কোন
পত্রের সহযোগে কোন সন্তোষই সজ্জন থাকে
না—তিল্লিতেও পারে না। কোপ-প্রবণতার বিবাক-
নিম্নসে জর জর হইয়া অধিরে মরিয়া যায়।

অমিত-প্রকৃতি—কোপস্বভাব। ধর্মিকের
অধর্মিক, এ অধর্মের উচ্ছ্রেন্দ্র না করিতে পারিলে,
ধর্মিকের পন্থা ধর্মেরই উৎপাদন হইত না। ধর্মিকের
এই অধর্ম, কি না অমিত স্বভাব, তাহাকে কিরূপে
ভুয়া, তাহা কে না জানে। মেজাজের মিত্রতা
এবং কলঙ্কতার উপর স্বভাবই হইবে; পরকলঙ্কতার
সমস্ত শুভাশুভ এবং সুখ-দুঃখ নির্ভর করে।
অথচ এ কথাই অলোকেই বর্ণন না, অতি দুঃখ
বোধে উদ্ভাসিত হইবে।

তুমি ধর্মিক, পুণ্যপায়স, ভ্রতনিয়ম-রত, সভ্য-
বানী—অলোকে সন্তোষ তুমি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তুমি
কিন্তু কোপস্বভাব, কলঙ্কভারী এবং কলঙ্ক
নামিকারো লোকেই যেন আছে। 'বিষ্ট-বিষ্ট' তোমার
তোমার অভ্যাস; মুহূর্তেই তোমার 'মেজাজ'
কাটিয়া 'চোতরি' হইয়া পড়ে। তোমার আশ্রয় এবং
উচ্ছ্রেন্দ্র এবং বাধ্যতাপ্রাপ্ত; কিন্তু তুমি তোমার
উচ্চ অভ্যাস বা স্বভাবের দাস। তোমার সইওণের
সমস্ত দ্রব্যাংগ-বিলে ও বলিতে যায়—

'তা একই বিষ্টবিষ্টে ভৈত ময়'—কিন্তু নিচর
জানিও এই বিষ্টবিষ্টে স্বভাব এবং কলঙ্কভারী
তোমার সর্বস্বত্বের মূল; তোমার সর্বস্বত্বের মূল

মানবীর অতি ভয়ানক অন্তর্যমণি। সুখ বিষয়চিত্র
লইয়া স্বর্গে বহিয়াও সুখ নাই; স্বর্গের বিস্তৃত
বায়ুও তদুদার বিলাক ও বিবিলিত হয়।

পাপ সাধারণতঃ হই ভাগে বিভক্ত করা বাইতে
পারে—সাধারণিক ও মানসিক। শারীরিক-পাপ
বহু মনের ভাল, (কারণ, তাহা হইতে অশেপাকৃত
নীল এবং সহজে নিস্তার পাইবার উপায় আছে)।
কিন্তু মানসিক পাপ অতি সম্ভ্রান্তিক; তাহা হৃদয়
স্বর্গীয় পথ-গামী, অসুখপূর্ণ জগৎ প্রদায় চিত্ত অতি
সাংঘাতিক মানসিক পাপ; উহা সর্বদাই মানসিক
পাপের মূলধনি। উহা অতি দ্রুত শারীরিক পাপ,
হৃদয়সক্তি ও বৈজ্ঞানিক অপেক্ষাও শোচনীয়।
তাই এই মানসিক মহাপ্রভাবকে বুদ্ধিগণকে
সম্মানে করিয়া দৃষ্ট বলিয়াছিলেন—

I say unto you, that the publicans
and the harlots go into the Kingdom
of heaven before you.

স্বভাবই উহা অতি উৎকট বিষম জর। উহার
অভ্যন্তরে হিংসা, ক্রোধ, অহংকার, অহংকারতা,
নিষ্ঠুরতা, আত্ম-নিষ্ঠার পরিমা, প্রতি-স্বর্গে ও
প্রতি-স্বর্গে উচ্চ অভিমানে, কলঙ্কতা জীবনরূপ
বিদ্যমান। পরন্তু উহার এতৎক অভিব্যক্তিতে
অধর্মের, কাট্রি, অসভ্যতা এবং স্বাধ-পরতা
যেন মুক্তির হুয়া প্রকাশিত হয়। সাধবান!
সাধবান! যেন এ হৃদয়িত রাস্তা তোমাকে
আত্মসম না করিতে পারে। জগৎ প্রীতি
উন্নত উন্মত্ততা থাকিলেই স্বতঃ মিত্রতা, মিত্রতা
প্রবাহিত হইবে, মিত্র স্বাধারে হৃদয়ান্তি দৃষ্ট ও
হৃদয়িত করিতে পারিবে।

৮। হাতু-বিহীনতা ও সরলতা। প্রেমের
এই দুই উপাদানের বিষয় অধিক কিছুই বলিতে
হইবে না। প্রেমের চতুরতা চলে—সত্য, হাতু-
চর্মে অভাবাই প্রেম। সন্দেহের কেন্দ্রের মধ্যেই
চাক্ষুণ্য, চাতুরী; প্রেমের পদক্ষেপে তাহার
অস্তিত্ব নাই। সন্দেহের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে হৃদয়-
জগৎ হৃদয়িত হইয়া পড়ে; কিন্তু বিশ্বাসের বিশাল
রাস্তা ততোধিক প্রাণ হয়, স্বহৃদয়িত 'ভক্তাভি'
হয়, সার্বভৌম লাভ করে; চাতুরীর চাক্ষুণ্য তাহার
পাশে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রেমের পুণ্যপ্রদায়
সামসামিকতার স্থিতিলা ও স্বর্গ-পত্রের বাতাস
হইতে তাহা স্বরূপে অব্যক্তি করে। ভাল বাসা
হৃদয়িত ভাব জুলিয়াও ভাবে না; ছলে ও কৌশলে

সংস্পর্শে আনিতে পারে, পটী মেরুপ হইলে, পতি তাহাকে কোনরূপেই সংস্পর্শে আনিতে পারে না। স্ত্রীজাতির দ্বিত্ব স্বভাবঃ চকুল; তাহার উপর আবার অনেক-বিষয়ে সেই চিত্ত অর্পণ করিতে পারিলে, আরও চকলতম হইয়া উঠে। এই চিত্ত-চাকলা হইতেই ভীকতা, বিধাস-বাতকতা, বধনা এবং অসত্য অধর্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব—এই রমণীচিত্তের স্বাভাবিক চাকলা হইতে কবিবার রক্ত পাতিতরা রক্ত দ্বারা তাহাকে দূতরূপে বন্ধন করিয়া স্থির রাখিবার ব্যবস্থা কথিগণ করিগণ নেন। যে কোনরূপে হউক না কেন, পাতিতরাত্মক, ব্রহ্মমাত্রাও শিথিল হইলে, পতি ভিন্ন নিজের স্বাভিত্ত্য কোনরূপে মনে জাগরক বুঝিলে, কখনই রমণীর চিত্ত স্থির হয় না, হইতেও পারে না।

এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

‘পতি স্ত্রীং পুংখযজ্ঞে ন ব্রতং নাপুণোষিতং।
পতিঃ স্ত্র্যভ্যন্তে যজ্ঞং তেন বর্গে মধীরতে।’
তবে নিজের বহুতত্ত্ব ভুলিয়া, আত্মকামনার জগজ্জালিয়া, আপনাকে বানাইই ব্রতচারিত্রীমুখি যোগ করিয়া, ব্রত-নিয়মাদি অহুতান করা স্ত্রীজাতির কণ্ডুয়া। ইহা না হইলে পাতিতরাত্মক শিথিল হয়। ব্যভিচার-মহাপাপ, তাহাত ‘স্রীপুণ্ডরীক কণ্ডবাই নহে। যে সকল শাস্ত্রীর সংকার্য আছে, তাহাতে পতন্তর্য্যই লিপ্ত হওয়াও স্ত্রীজাতির পাতিতরাত্মক ও চিত্তচাকল্যের হেতু। স্ত্রীজাতির এই চিত্তচাকলা হইতেই, চকলচিত্ত ভীক অধার্মিক সম্মান-সমুত্তি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাতেই সমাজ অধঃপতনোদ্যম হয়। এ বিষয়ে একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহা বর্ণনা করিতেছি, প্রশ্ন কর।

পূর্বকালে বলিপুত্র-অহররাজ যশ, ‘ত্রিপুর’ নামক পণনকালী-সুজ্ঞের নগরের আশ্রিত্য প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বেগবশক পরাজয় করিলেন; তখন তাঁহার অনন্যোপায় হইয়া দেবদাসিগণ মহাদেবের শরণার্থী হইল। ততবৎসল মহাদেব ত্রিপুর-নিগোপে মগত হইলেন যতঃ; কিন্তু ত্রিপুরবাসিনী রমণীগণের পাতিতরাত্মকতা-ধারণ করিয়া স্বর্ণমাতা চিত্তিত হইলেন; অনন্তর নারকেয় মারগ বরিশামাত্র তিনি উপদ্রব হইয়া বলিলেন,—

‘আজ্ঞাপয় মহাদেব স্মিতার্থক্য মূর্তো অশ্বম।

কিং কাঁচাই নয়া দেব কর্তব্যং কথয়ত মে।’

যে যেন। মহাদেব! আজ্ঞা করুন,—আমাকে

কি জ্ঞাত অশ্বম করিয়াছেন ও কি কাঁচাই বা আমাকে করিতে হইবে?

তখন মহাদেব বলিলেন,—

‘পাঙ্ক নারদ উত্তরং যতঃ ত্রিপুরং মহং।
বাণশ নানবশক্যং স্ত্রীং গয়া তং মুকু।’
তা কর্তব্যবোধাত্তর প্রিয়ভাগ্যপরমায়া সমা।

‘তর্মাণ্যৈ বৈ তেজসা তত্র জমতে ত্রিপুরং নিবি।
তত্র গয়া তু বিশ্রেষ্ঠ মতিভায়া প্রত্যোদয়।’

‘ভাবার্থঃ,—‘নারদ। অহররাজ বাবের ত্রিপুর নগরে তোমাকে হাটিতে হইবে,—তথাকার রমণীগণ পতিভিচার আশ্রয়, পতিবৈধি সেবতা জান কর; ত্রিপুরনগর তাঁহাদিগের প্রভাবসেই গগনে ভ্রমণ করে এবং চকুলে।’ অতএব তুমি নীচ গিয়া সেই রমণীগণেরে বৃদ্ধি একই অস্ত্রাঘা করিয়া দেও।’

দেবস্ত চরম-শ্রদ্ধা মুনিস্তবিত্তবিক্রমঃ।

স্ত্রীং বাৎ দধনশাশয় প্রাশ্রিত্যঃ পুংঃ প্রজিঃ।

নারদ মহাদেবের কথা শুনিয়া তত্বমূলে মাহারাজের চিত্ত-ব্যতিক্রম হটাইবার জন্ত সত্বর ত্রিপুরে প্রবেশ করিলেন। ত্রাক্ষরের দ্বার অবারিত; নিমেষতঃ কথিগণের। নারদ, অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কথা-প্রসঙ্গে বধ, বস্ত্র, নন্দনা, যাহাতে অশ্রুকা থাকেন, এই সকল ত্রুত্রে কথা বাণেশ্বরী কথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে নারদ নানাবিধ ব্রতের কথা বলিয়া তাঁহার—কাজেই সকল ত্রিপুরবাসিনী মহিলায় জলর পতি হইতে বিলম্বিত করিয়া দিলেন।

ততো হৃষ্টহৃদয়া অমৃতোৎপমানদাঃ।

পুরে জিহ্মং সমুৎপন্নং বাণশ তু মহাত্মনঃ।

এইরূপে পতন্তর্য্যে অর্থাৎ আপনার স্বপ্ন ও আপনার প্রতি বশপ্রভাবের অশ্রুত্বতা কামনা-করিয়া ব্রত নিয়ম করিতে ত্রিপুরবাসিনী রমণীগণের জলররাজ্যে সমীর একমাত্র আশ্রিত্য আর বহিল না। তাহাতেই মহাত্মা বাবরাজের নগরে জিহ্ম উৎপন্ন হয়। তৎপরে দেবদাসিগণ অনার্য্যসেই সেই ত্রিপুর দাখ করেন। কিন্তু ত্রিপুরবাসিনী রমণীগণের পাতিতরাত্মক এইরূপে দূষিত হইতে থাকিলেও পূর্বকালীন পুরুষগণ আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত নহে। তাহাতে এইমাত্র ফল হইয়াছিল যে, যেনে শিবের অহুত্রে—ত্রিপুরের—কিন্দার্য্য অধমিত ছিল। সুদূর ত্রিপুর দখ হয় নাই।*

* মৎস্যপুরাণ ১৮৮ অধ্যায়।

ঈশ্বরের অনেক কাঁচাই লোকসিকার্য্য। নচেৎ মনে করিলেও তু ত্রিপুর দাখ হইয়া হাটিতে পারিত। এত আড়ম্বর করিলে কেন?

এখন দেখা যাক উপরি লিখিত ঘটনায় আমরা শিথিলে পারি কি?

১। যে দেশ * বহুতর ধর্ম্মশীল স্রীপুরুষে শোভাভিত, তাহা প্রকৃত জয় করা কাঁহারও মাত্য হইবে।

২। প্রকৃতপক্ষে জয় করিতে হইলে সে দেশের ধর্ম্ম নাম করিতে হয়।

৩। দেশের ধর্ম্ম লোপ করিতে হইলে, সেই দেশীয় স্ত্রীজাতির ধর্ম্মলোপ যন্ত্রে করা উচিত; তাহাতে চেষ্টা সত্বর ফলবতী হয়।

৪। প্রভাব পর পুরুষের ধর্ম্মলোপ করিবার জন্ত আর প্রায়সে হাটিতে হয় না বটে, কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্মলোপ হইবার আগে জল করিতে চেষ্টা করিলে, চেষ্টা সফল হইলেও দেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না।

৫। দেশ বা সমাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা থাকিলে; আরও কিছুদিন অর্থাৎ পুরুষের ধর্ম্মশীল স্বত দিন না হয় তত দিন অপেক্ষা করিতে হয়।

উক্ত (১) (২) সিদ্ধান্ত বদন-ধর্ম্মলোপদেষ্টা মহারাজা-প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর মহাদেব সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি কামের-বশে ধর্ম্ম ও কামেরদিগকে বলপ্রকাশ পূর্বক বদন-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উৎকর্ষ বদনবাতের প্রয়োজন বিষয়করূপে দিয়া গিয়াছেন। পরকমে ধর্ম্মশীল আনিলে যে ধর্ম্ম হয়, ইহা স্বতন্ত্রাদিগেরও বিধাস ও উপদেশ। ইহাও যুগ কামণও এই।

অনেকের মতে, অধনকার নবা মৃত্যু হইলে-রাজ, এই সকল সিদ্ধান্তগুলি দেশ বুলিয়াছেন। বুলিয়াই বুলি কালোচিত প্রক্রিয়া অহুতারে দেশের ধর্ম্মলোপ করিতে ব্যগ্র।

বহু বিপুল বিভিন্ন-ভাষাভাষী ভারতসমাজে ইংরেজরাজ অনেকগুলি দেশ-নারদ ছাড়িয়া দিয়া-ছেন। এ নারদগুলির শিলা-সীল্যও ইংরেজের অন্তর। নারদের দল করলেন এখন ভারত-রমণীর ধর্ম্মলোপ করিতে শিখিবে চেষ্টা করিতেছেন। স্ত্রীপাণী-নতার প্রশংসা, অসংখ্য-প্রশংসা মিশ্র, বাক্যবিধারের

অর্থবশ, যৌবনবিদ্রোহের খোদনাম, কাণোপদ্রুত-লোপাভ্যাস প্রকৃতিপ্রদান, স্রীম-স্ত্রীর সমান অধিকার-ব্যাপন, বিবাহেরই অর্থ ইতিহাস-চরিত্রার্থতা; পাতিতরাত্মক সম্পূর্ণ বিবাহী এই-ধর্ম্মলোপ ব্যাপারে নারদগণ, স্ত্রীজাতির মন ভুলাইতেছেন। আত্মজান-পুণ্ড হইয়া সমীর ব্রতচারিণীমুখিরূপে ব্রত নিয়ম করিবার কথা—ভারতরমণীর মজ্জায় মজ্জায় বিলম্বিত হইয়াছে। যুতরাং সে কাঁচাই আর পাতিতরাত্মক-ব্রতের, সম্মাননা নাই; বিজ্ঞতা ইংরেজেরও সে উপায়ে ভুলাইবার প্রকৃতি নাই। এখন ব্রতন পথা। এই দেশের নারদগণের সহযোগী আদার পাতীর ও পাদিগী। কাল বুলিয়া উদ্দেশ্য অহুতারে এখন আরও অধিক কাঁচাই-পরাটা। রমণীর ধর্ম্মলোপের চেষ্টা হইতেছেই; সূচক মত্রে পুরুষেরও বহুতর হয় তাহাতেও উদ্যোগ আছে। দিব ধরিতে ব্যাক্ত করিয়াছে। রমণী, মজ্জিত-ব্রত, পুরুষও ভরিত-ব্রত। ধর্ম্মশীল সমাজ, অধর্ম্মশীল হইবার উপক্রম হইয়াছে। অধিনবর হিন্দুসমাজের বিনাশের পথ দেখা গিয়াছে। দাঃ-র পূর্বক ত্রিপুরে বাধা ব্যক্তিহীন; এই সমাজেরও সেইরূপ হইবার স্বত্বপাত হইয়াছে। আর কিছুদিন এইরূপ চলিলেই ভারত সমাজ-দাখ হইবে।

বারুইকলা বামা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নবম্বার চট্টাপাধ্যায় একজন উদ্যমশীল যুগ। লোপা-পাড়ায় মণিচ্ছেদ বহু। সহপাঠীদের সঙ্গে যুব সভাব ও সভা। শিক্ষকের প্রভি শ্রদ্ধা-ভক্তিও অতুলন। নবম্বারের শিষ্টাচার ও সৌজাত্য, তাহার সদাশাসন ও শ্রিয়াদিগত, সবসেই মূহ। সত্যতা তাঁহার চিত্র-মহচরী, ভিন্ন তাঁহার অস্তরে ভূষণ, অস্বিকারিতা তাঁহার চিত্র-অভ্যাস। নবম্বারের বাড়ী বলিহারি মাতা। তিনি কামবশে পিতৃহীন, মাসারের মধ্যে মাতা-ও-কম সহোদর। নবম্বারচাকলা-কলেজ অধ্যায় করেন। কি কার্যের প্রবেশিকা পটীকার উত্তীর্ণ হইলেন, এই তাঁহার একীকৃত ইচ্ছা। দিন নাই, রাত নাই, আপনার বিদ্যা-অভ্যাসে নিরুক্ত। পটীকার সময়

* দেশই বদন আর সমাজই বদন, ও একই কথা।

জয় ত্রিভু কেহ মাতী পাথরের করে ন।

উপস্থিত হইল; আরও বহু, আরও অভিনিবেশ-পূৰ্ণক পড়িতে লাগিলেন। শেষে পরীক্ষা দেখা গেল। বৎসাময়ে গেলোতে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইল। নবকুমার প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়াছেন। পরিচয় সাক্ষর হইয়াছে দেখিয়া, নবকুমারের মনে আনন্দ ধরে না, 'শিক্ষক' এবং 'আত্মীয়' ধরনের কোনও নিবন্ধিত হইয়া গিয়াছেন। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া নবকুমার দ্বিতীয় উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। একটা বৎসর বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শেষে নবকুমারের লেখা-পড়া কথায় তার হইয়া উঠিল। নবকুমারের পিতা বিশেষ সদর্পিতপন লোক ছিলেন না, চাকরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছিলেন, এতদিন তাহাতে কোনপ্রকারে চলিয়াছিল, কিন্তু এখন সমস্যাচল্য পণ্যস্ত তার হইয়া উঠিয়াছে। নবকুমারের মাতা বড়ই বিধব, বড়ই দুঃখিত। তাঁহার ঐকান্তিক চাকরি নবকুমারকে ভাল করিয়া লেখা-পড়া শেখান। 'সে মাহুষ হইলে তাঁহার সন্তান দুঃখ-দুঃখিত' এই মনে করিয়া তিনি সেট না বাঁধাও ছেলটাকে লেখা-পড়া দিয়াই তৈরি করিতেন; কিন্তু ক্রমে অচল হইয়া উঠিল। যাহা কিছু দেখি ছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি চমকে আঁধার বেহিতে লাগিলেন, কিন্তুপ সূন্যার চালাইয়ে, এই ভাবিয়া তিনি অক্লান্ত হইলেন। এদিকে 'তাঁহাদের সমস্যার একটা শেষোক্তির অবসার কথা তিনি পত্রকে বলিয়া তাঁহার শোচনীয় উদ্ভাষণে উক্ত আত্মীয়ের সমাধি করিতে চাহেন না। কিন্তু নবকুমারের বুদ্ধি সান্ত্বিত্য উক্ত, তিনি মাতাকে সঙ্গীত 'বিন্দনা' সেখানি তাহার কার্য সম্বন্ধেই লক্ষ্যমত করিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমে কোন কথা উপাধন করিলেন না। শেষে একদিন উপস্থিত অবসর বিবেচনা করিয়া মাতাকে বলিলেন, 'না আমার আঁরি লেখা-পড়া হইতেছে না, আমি চাকরির চেষ্টা করিব; চাকরি না করিলে, বোধ হয় আমাদের সমস্যা আর চলিবে না।' পুত্রের এই কথা শুনিয়া মাতার চক্ষু-অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, কষ্ট রোধ হইয়া গেল; তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে মনে ইহা সবেম বুলিলেন যে, সেই দিন হইতে তাঁহার পুত্র সমস্ত হৃদয়ের আশার জাগ্রাস্তি দিলেন। 'সেই দিন হইতে নবকুমার লেখা-পড়া পরিচাল্য করিয়া, চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চাকরির দার্জ্ঞ আরও পরম

ছিল না বটে, তথাপি একজন পুত্র-পোষক না থাকিলে চাকরি যেটা ভার হইত। নবকুমারের কোন ছবি-ধাই নাই; তাঁহার সহায়ও ছিল না, সম্পত্তিও ছিল না। তিনি একাকী এই হৃদয়ের সমস্যার সম্মুখে ভাসমান তখন ভ্রাতা ইতস্তত বিচরণ করিয়া কোথায় লাগিলেন। কুল-বিন্দনা পাণ্ডা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিল। যেখানে চাকরি-খারির সমস্যা পান, নবকুমার দরখাস্তবহুত তথায় গিয়া উপস্থিত হন। কেহ বলে—'তুমি কেবলমাত্র জ্ঞান হইতে বাহির হইয়াছ, আদিকের কাজ কিছুই হয় না, তুমি এখন শিক্ষানবিশী কর, তাহার পর দেখা যাইবে।' কেহ বলিলেন—'তোমার হাতের লেখা তত ভাল নয়, এখনও কিছুদিন-হাত পাকাও, তবে চাকরির উমেনারী করিও।' এইরূপে নবকুমার প্রতিনিয়ত বিকল-মনোভাব হইয়া দিলিয়া আসিতে লাগিলেন। কিন্তু তার যথিগা চাকরি চেষ্টা হইতেছিল না। এক দিন চাকর কোন আফিসে কর্মস্থালির কথা শুনিয়া নবকুমার দরখাস্তবহুত সেখানে উপস্থিত হইলেন। অনেক মানদার পর আফিসের বড়দারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নবকুমার তাঁহার মুখেদরখাস্ত-খানি দিয়া আপনার হৃদযত্ন কাহিনী মজাইতে করিলেন, কিন্তু কিছুতেই বড়দারের মন কলহিতই পারিলেন না। সেই কালের প্রার্থী খোদ বড়দারের এমন পরমাভ্যাস—তালক। তাঁহার জন্ম স্থান বিশেষে অসুখের, আবার সে জুটী হুতীয় পক্ষের। হুতরায় সে উপত্যকা একবারে আর্থ্য প্রকর, তাহা আর বিকল হইবার যো নাই। এদিকে নবকুমারকে কি বলিয়া বিদায় দেন, বড়দার তাহাই ভাবিতেন। কর্মস্থলীয়ের মধ্যে নবকুমারের দাগোই অবিক। তিনি প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যাহাতে লেখও ভাল, তাহার পর তিনি বড় শ্রমীল এবং সফলতর। এদিকে বড়দারের 'শ্রাণক কোন এক স্থলের চতুর্ধ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া লেখা-পড়ায় ইস্তফা দিয়াছিল। কিছুদিন নানা-সময় নানাপ্রকার বধ্যবাহিনী করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু নবকুমার তাঁহার কাগ-সিদ্ধি পথে এক বিঘ্নে অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছেন। যাহা হউক, বড়দার নবকুমারের দুর্য্যাক্ত পড়িতে পড়িতে ভাবিতে লাগিলেন, বাস্তবিকই

নবকুমার এই পদের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু তিনি কি করিবেন, যুগে যে সমাজধর্মীর ভ্রম তাঁহার দৃষ্ট্যে এতদ্রুপে অপ্রাকৃত রহিয়াছে, কাজেই আদারী প্রায় মনস্তান্তর নিমিত্ত আপনার কর্তব্য-জ্ঞানকে বলি দিতে হইল। 'শেষে নবকুমারের দরখাস্তখানি এদিক এদিক দেখিয়া অতি-শুদ্রপত্তীরদরে বলিলেন—'সেখ বাপু! তোমার হাতের লেখা তত ভাল নহে, তুমি আফিসের কাজও কোন না, তোমার অপেক্ষা একজন অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন; হুতরায় তুমাকে এক কাজ দিবার জন্য মাঝেমাঝে অনুরোধ করিতে পারিব না। কিন্তু কোন সময়ে আমার হুঁকম হইলে তোমার জন্ম চেষ্টা করা যাইবে।' এই কথা শুনিয়া নবকুমার নিতান্ত হতভিম হইয়া গুহে গিরিলেন। তাঁহার মনে মনে এরূপ আশার সম্ভার হইয়াছিল যে, হয় ত বিখ্যাত অদৃষ্টল হইয়া এবার তাঁহার—এই উপস্থিত দায়িত্বভার হইতে রক্ষা কামের, কিংবা আশা তাঁহার একবারে ভুল-শায়ী হইল। তিনি 'বাল্যকাল হইতে স্পষ্টদৃষ্টি ছিলেন, কোন কারনে আশাতত হইলে, তিনি মজ্জা সে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে জানিতেন না। সেই জন্ম পুনঃপুনঃ বিকল-মনোরথ হইয়াও তিনি আপনার অভ্যুত্তীর্ণাবদ-বিষয়ে পশ্চাৎপন্থ হন নাই। সে যাহা হউক, হুতরায় পুনঃ পুনঃ হুতরায় পুর্বেকি চাকরিতে যোক নিরুক্ত হইয়াছে। কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ কার্যে নিরুক্ত হইয়াছেন, এ বিষয় কাহারো জন্য নবকুমারের মন খতই উৎক্লেশ হইল। শেষে শুনিলেন, আফিসের বড়দারের শ্রাণক সেই পদের সৌরভবুজি করিবার নিমিত্তই নিরুক্ত হইয়াছেন। কর্মস্থলীয়ের মধ্যে বৃদ্ধ যে সমাজধর্মী-প্রচারের হাত হইতে এড়াইতে পারিয়া-ছেন, ইহাই যথেষ্ট। অনুরোধের ক্ষেত্রে নবকুমারের মনস্তান্তর, মর্দক চেষ্টা, নিরুক্ত হইতে লাগিল। অকস্মেৎ তিনি কোন এক যক্ষুর পরামর্শে একখানি অনুরোধ-পত্রের জন্য কলসেরে অধ্যাপকের নিমিত্ত গেলেন। অধ্যাপক তাঁহাকে বিশেষ চিনিতেন এবং তাঁহার সন্তোষের জন্ম মনে মনে বিশেষ মেহও করিতেন। নবকুমার তাঁহার নিকট ঐয় হুতরায় কব্দা সন্দর্ভই 'প্রকাশ করিলেন এবং যাহা হইতে তাঁহার একটা চাকরি হয়, তাহার উপায় করিয়া তাঁহারের আসন বিপন্ন হইতে যেন রক্ষা করেন। নবকুমারের অধ্যাপক একজন সাহেব, তিনি বড় দয়ালু। 'ছাত্রের হৃদয়ের কাহিনী শুনিয়া বলিলেন,—

ঢাকাতে তাঁহার কোন আত্মীয় বা বন্ধ নাই, তবে কলিকাতায় এক সওদাগর-অফিসের বড় সাহেব তাঁহার একজন পরম বন্ধ; যদি সেখানে তাঁহার চাকরি করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত সাহেবকে অনায়াসে একখানি হুঁকমের পত্র দিতে পারেন। নবকুমার চাকরির জন্ম সন্দর্ভে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন; কলিকাতা তাঁহার নিকট বৃহৎস্থল হইলেও তিনি তথায় যাইতে কিছুমানা কষ্টকর নহেন। এই কথা শুনিয়া অধ্যাপক তাঁহাকে আশ্বাস অনুরোধ-পত্র দিলেন। নবকুমার প্রীতি-প্রাণেচিহ্নিত তথা হইয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সর্বল বটনাই তাঁহাকে জানাইলেন। নবকুমার বৃহৎস্থল আত্মীয়-স্বজন-বহিরা গমন যাত্রা, মাতার সে ইচ্ছা একবারেই নাই; কিন্তু কি কারণে, নবকুমার কোন মতেই ছাড়েন না। তিনি মাতাকে বড়ইয়া বলিলেন যে, এতদিন কর্মের জন্ম চাকর্য কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে সফল হইতে পারিলেন না। কলিকাতা যুর বড় সাহেব, অনেক আফিস, আদালত আর অন্যান্যসেই একটা চাকরি হইতে পারিলে। আর যখন সাহেবের অনুরোধ-পত্র পাইয়াছেন, তখন তাঁহার চাকরি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; হুতরায় তাঁহার কলিকাতায় যাওয়াই বিধেয়। এই স্থির করিয়া তিনি কিছু স্বার্থ সংগ্রহ করত একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য সমুদ্রভ্রমণের যুগ হইতে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। সেখানে তাঁহার একজন সহস্বপাঠী লোক ছিলেন, তিনি সন্ধান করিয়া তাঁহার বাসায় গেলেন। সেখানে একদিন অবসান করত পরদিন উদ্বিগ্নিত সওদাগর আফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি নবকুমারকে অত্যন্ত বাতস্ত্র-যত্ন করিলেন। তদনন্তর তাঁহার অধ্যাপকের কাগজ জানিতে পারিয়া বড় লজ্জিত এবং হুতরায় হইলেন। যাহা বলিলেন, তাঁহার আফিসে আপাতত কোন কর্মই বালি নাই, থাকিলে অবশ্যই তাঁহাকে একটা কর্ম করিয়া দিতেন। তবু যদি তিনি ছাড় ছাচেন হইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি নিমন্ত্রণ একটা চাকরি পান। চাকরির হস্ত নবকুমার সর্বস্ত্র-যাযাবর জন্ম প্রস্তুত আছেন। সাহেবের প্রণয়ন তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। সাহেব বলিলেন, কলিকাতা হইতে প্রায় ৩০০২ ক্রোশ দূরে হুগলুর

নামক গ্রামে একটা নৌগের হুঁটা আছে। হুঁটার সাহেব তাঁহার আশ্রয়। তাঁহার নিকট ৪০ এবং ৫০ টাকা বেতনে হুঁটী কর্তৃক থাকি-আছে। ভাষায় উপস্থিত লোক পাণ্ডুরা যায় নাই বলিয়া তাঁহাদের পক্ষ নিম্নোক্তের, কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি কোন লোক স্থির করিয়া পারাইতে পারেন নাই। যদি নবকুমার তাঁহার পত্র লইয়া বাইতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার চাকরি হইতে পারে। নবকুমার দেখিলেন, এত পরিশ্রম, এত কষ্ট করিয়া তিনি চাকরি আশ্রয়ে দূরদেশে আসিলেন, যখনও কিংবা তাঁহার প্রতি বাদ নাহিগেল—চাকরি নিলি না। আবার তাঁহাকে আরও দূরদেশে বাইতে হইবে। কিন্তু নবকুমার কি করিলেন!—তাঁহার ত কোন উপায় নাই। তাঁহার ঘরে অন্ন নাই, পক্ষ আহার্যনা—কিন্তু শ্রীমতী জননী, দেহময় দেহদার অজ্ঞাতে কষ্ট পাইবে এ চিন্তা তিনি মনে স্থান দিতে পারেন না। তাঁহাকে সেই ‘অপরিচিত আশ্রয়-জন-বিরহিত মূলপুত্র’ নিঃশেষ হইতে হইবে। বাস্তবিক অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর। সেই চিন্তায় ভুগাই শত শত লোক উম্মত্তের স্রায় চারি দিকে মরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার জন্ম কত লোক বিশেষে পিতা দৃশ্যহস্তে প্রাপ্য দিতেছে। কেহ বা অপর গণ্য অপ্রাণিত-বিশিষ্ট অশেষ গৃহিত কাজ কল্যাত প্রাপ্য তার বাড়াইতেছে। এই অমের জন্মই প্রতিদিন কত প্রবন্ধনা, কত প্রত্যঙ্গনা, কত চুরি-ডাকাইতি যে হইতেছে, তাহার আর ইহা নাই। যাহা হউক নবকুমারের মূলপুত্র বাগাই স্থির হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নবকুমার জন্মের নিকট হইতে যুগারি-ম-পত্র পাইয়া বাসায় বিরিলেন এবং কি উপায়ে মূলপুত্রের বাইনে তাহারও পাপাশ্রয় চানিয়া আসিলেন। পরদিন প্রত্যয়ে চাকরকে সঙ্গে করিয়া পদ্মার তীরে আসিলেন। নৌকাযোগে গন্তব্য স্থানে বাক্স করিলেন। নৌকাধানি প্রত্যেক ভেল ককৃত নবকুমারের কল-কামের চণিতে লাগিল। অপরূপকন্যাদিতী কল-শব্দের শোভা দেনে আত্ম আত্ম ধরিতেছেন। কত বায়িজ-পোত, কত ভিঙ্গা, কত পাসি নদীযে আসমান রহিয়াছে। প্রভাতের সূর্য্যোদয় সূর্য্যমণ্ড

বায় হিল্লোলে ভাণ্ডারী-বন্ধ কীত করিয়া চলিতেছে। কখন বা রঙ্গমণী রঙ্গ করিবার জন্ম একটা কুম্ভ তরঙ্গ ছাড়িয়া দিতেছে। তৎকালে যেন আশ্রয় পাইয়া আর একটা কুম্ভ তরঙ্গ তাহাকে ধরিবার জন্ম তাহার পশ্চাৎ বশ্যং ছুটিতেছে। তাহার পূর্বাৎ আর একটা; আবার একটা;—এইরূপ অনন্ত তরঙ্গমালা। ছুটাছুটা ককৃত গাছা-বিশালযে কীত। ককৃত লাগিল। ওদিকে পদ্মক-দিকারী অসদ্য শম্পুপ গ্রামল যুদ্ধ কতই শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির এই সকল নন্দনভিরাঙ্গ প্রীতিভর দৃশ্যে নব-কুমারের মন নাই। তিনি একমলে আশ্রয় ভাণ্ডারী ভাবিতেছেন। একবার ভাবিতেছেন, এত ব্যয়, এত কষ্ট পীকার করিয়া কর্তৃক পাইবার প্রত্যাশায় কল-কাতায় আসিলেন, কিন্তু বিবাহের বিভ্রমের সেখানে কোন ফলই হইল না। আবার কোথায় মূলপুত্রের বাইতেছেন। সেখানে পঞ্চাঙ্গি, যদি তখনও কর্মফলি নাই,—লোক নিম্নরূপ হইয়া গিয়াছে; তখন তিনি কি করিলেন! এত ঘর, এত কষ্ট, এত ব্যয়—সকলই নিমল হইবে। দাতা সত্যই অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি বড়ই প্রতিকূল, তাঁহাকে বিভ্রিত করিবার জন্মই কত জাল পাতিতেছে। ঈদৃশ-গভীর চিন্তায় তাঁহার অনেক সময় অভিযান্ত্রিত হইল। মধ্যাহ্নে বৎসিকিং আশ্রয়টি করিবার পক্ষ পুনরায় পূর্ণ চিন্তা তাঁহার মন্থর পরিবার করিল। ক্রমে প্রভাকর সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রম সমাপন করত বিশ্রামান্তরে অস্ত্রাঙ্গ-চুড়ায় আত্ম প্রাধনের জন্ম নিভান্ত ব্যস্ত হইলেন। প্রদোষকালীন সন্মীরে তরঙ্গালি নতশির হইতে লাগিল, বেগ হইল যেন দিবাকরকে বিদায় দিবার জন্ম তাহার। সকলে প্রবৃত্ত; মস্তকে অভিযান করিতেছে। যাহা হউক সন্ধ্যার প্রাকালে নবকুমারের নৌকা একটা বাটে আসিয়া লাগিল। নবকুমার তীরে উঠিয়া জালিলেন, মূলপুত্র এখনও পাঁচকোষ। সমুদ্রে একটি যুগ্মতরঙ্গ প্রান্তর, তাহার পর গ্রাম-গ্রামটা পার হইলে মূলপুত্রের হুঁটা। তাঁহার ভূতা বলিল,—“বাপু! স্ত্রীনিয়াজি, এখানে বড় ডাকাইতে ভয়, সন্ধ্যা না হইতে হইতেই একটা পাহার হইয়া সমুদ্রের গ্রামে কাহার বাড়িতে আশ্রয় না লইলে, নিশ্চয়ই আত্ম সন্মারদের ডাকা-ইতে হাতে পড়িতে হইবে, আপনি শীঘ্র চলুন।” নবকুমারের তরঙ্গ-বৃন্দ, গৃহ হইতে কখনই বর্হিত হই নাই, কোথায় কি আছে—না আছে, তাহা তিনি কিছুই অবগত নহেন। তথাপি তিনি ইহার মধ্যে

রংমারের নানাপ্রকার তরঙ্গবর্তে পড়িয়া, অনেক নিশ্ফলত করিয়াছেন, মনেও অনেক দৃঢ়তা জন্মি-য়াছে। ডাকাইতের নাম শুনিয়া তাঁহার মন কিছু বিচলিত হইল। বটে, তথাপি সাধারণ মানুষের সেই বৃদ্ধ-হীন, জন-হীন, শোভা-হীন প্রান্তরের মধ্য গ্রামোপ দিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। প্রান্তর পার হইয়াই একটা গ্রামে উপনীত হইলেন। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া উল্লিখিত, গ্রামটা অতি সামান্য, অধিকাংশই কৃষকদের বাড়ী। নব-কুমার রাতিপ্রাপন করিবার জন্ম হইলে অস্বেষ্ট করিতে লাগিল। বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিতে একধাণি বাড়ী দেখিতে পাইলেন। বাড়ীধানি বেশ বড়, চারি দিকে মুক্তিকার প্রান্তর, তাহার উপর বিচালির চান। বাড়ির দরজা কিছু উচ্চ এবং বুর মস্তক। দরজার দুই পার্শ্বে দুই খানি ঢালা, তাহার রঙাওক উচ্চ। বাড়ীর ভিতর কয়েকখানি অতি পরিপাটি ঘরের বর। প্রাঙ্গণটি অতি বিস্তৃত এবং পরিবার পাঠশালা। এমন কি, এককিছু সিন্ধুর পড়িলেও তাহা অনায়াসে উঠিয়াই দৃষ্টে পড়া যায়। প্রাঙ্গণের একধারে সারি সারি কয়েকটা ধোনের মরাই। মরাইগুলি লোপা-পোতা। বাড়ী-বর দেখিয়া নবকুমারের মনে হইল, কোথ-হয় গ্রামের মধ্যে এই বাড়ীধানি কোন ভজলকর হইবে, হুতর্য এখানে আসার লগ্ন্যও পোতা। এই স্থির করিয়া তিনি বাহিরের একখানি চালায় কক্ষল গিয়াই বসিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, প্রাঙ্গণ বাড়ীর কাহার মস্তকে দেখা যাইতে নাই। মনে করিলেন, হয় ত কার্য্যমুহুরে গৃহস্থানী মনান্তরে পিয়া থাকিলেন; আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে সন্ধ্যা হইবে; এই ভাবিয়া তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ ইঁকা হাতে তামাক বাইতে বাইতে গৃহস্থের আশ্রিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধের বয়স ৫০ বৎসর হইবে; বর্ণাঙ্কুরিত, কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ। দেখিলে নেহাত চাচা বলিয়া বোধ হয় না। নব-কুমারকে সেইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ কিছু প্ৰহেলভানে বলিল,—“তুমি কেহ বাপু! এখানে বসিয়া আছে?” নবকুমার একই কাতর-কণ্ঠে বলিলেন,—“আমি ভ্রান্ত—অভিযা।” বৃদ্ধ সেই ভাবে বলিল,—“এখানে তেমনপুত্রের বাড়ী হইবে না বাপু। তেমনা ছাড়া কোন স্থানে থাকে।” নবকুমার বলিলেন,—“আরো কিছু আহ্বানদি করি-না, কেবলমাত্র এখানে শুইয়া থাকিব।” বৃদ্ধ

তাহাতেও সম্মত নহে, মনান্তরে বাইতে বলিয়া মে-গৃহস্থেরে চণিয়া গেল। নবকুমার দেখিলেন, এখানে থাকা তাঁর পোষা-ইচ্ছা নাই। এ-দিকে সামান্যর উপস্থিত, কোথায়ই বা যান, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে দেখিলেন, একটা স্ত্রীলোক সন্ধ্যাক্ষী হইতে বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া মরাইয়ের সামুখ্যে স্থানটি পরিদর্শন করিতে, আর এক একবার নবকুমারের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। রমণীর বয়স প্রায় পঞ্চাশবর্ষ হইলে, দেখিতে শ্রামবর্ণ, বর্ণাঙ্কুরিত, মুখপানিতে সরসতা ও এবং কোমলতা মাঝা রহিয়াছে। রমণী শিখোচ্ছা হইলেও কিছু বেশ বস্ত্র। সে নব-কুমারের প্রতি মগ্ন মগ্নে যে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে ছিল, সে দৃষ্টি অতি হৃদয়োৎসাহ; কুচিভা এবং আশ্রয়শুভ। প্রথমত নবকুমারের মনে হইল, এ আবার কি! কিন্তু রমণীর মুকল্ল দৃষ্টিতে তাহার মনের মত ভাব জি আর কিছুই অনুমিত হইল না। যাহা হউক, রমণী চকিতে ভ্রাম বাহিরে আসিয়া একবার এদিক, একবার ওদিক, চারিয়া, পুনরায় বাড়ীর ভিতর চণিয়া গেল। আবার কিরিয়া আসিয়া মরাইয়ের সামুখ্যে পায় কর্তব্য ব্যপ্ত হইল। কিন্তু এক একবার নবকুমারের প্রতি চাহিতে লাগিল। সে দৃষ্টি কল্পনা-বৃত্তক-ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক, স্ত্রীলোকটি তীরবার বাড়ীর ভিতর চণিয়া গেল, আবার কিরিয়া আসিল। এবার মরাইয়ের নিকট অধিকক্ষণ না থাকিয়া বাহিরে আসিয়া চতুর্দিক ভাস করিয়া দেখিয়া, নবকুমারকে সম্বোধন করত বলিল,—“ঠাঙ্গুর! আপনি জানেন না যে, আজি কোথায় আসিয়াছেন; কিন্তু ভয় করিলেন না, ভয় করিলে সর্জনশ হইবে—আমি যাহা বলি, তাহা মনেযোগেপূর্বক শুনুন। আর যদি সেই মত কাজ করেন, তাহা হইলে এ বাড়ী-হয় ত রক্ষা পাইবেন, নতুবা আপনীর বাঁচিবার কোন আশা নাই। এবার যখন বাড়ীর কড়া আসিলেন, তখন বলিলেন যে, আপনীর বাড়ী বাস-দেখপুত্র এবং আপনি আমার বাপ রামহরি মলের গুহু। আমার সঙ্গে দেখা করিতে এখানে আসিয়া-ছেন। আমার নাম বামা, আবার কেতে বাঁচাই। এই সকল কথা যদি আপনি ভুলি করিয়া শুইয়াই বসিতে পারেন, তবে এ বাড়ী রক্ষা পাইবেন; নতুবা

আপনার বাঁচবার আর উপায় দেখি না। আপনি যদি এখনই এখান হইতে পলাইয়া যান, তাহা হইলেও আপনি নিরাপদ নহেন; আপনাকে নিশ্চয়ই ধরিয়া আনিয়া আপনার প্রাণ বধ করিবে। আপুনি পলাইবেন না, ভয়ও করিবেন না; বাহা বলিলাম তাহা বাড়ীর কর্তাকে বুঝাইয়া বলিবেন।" এই কথা বলিয়া রমণী ক্রতপনে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

এই ভয়ের লোমহর্ষণ কথা শুনিয়া, নবকুমারের সর্বসম্বন্ধীয় কটকিত হইতে লাগিল। তিনি যে কি করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতছেন না। এ স্থান হইতে পলাইয়া গেলেও নিরাপদ নাই; হয়, এ বাড়ীর যেকোন ধরিয়া আনিবে; না হয়, আর কোন নরাকৃত-দুখ্য-হস্তে পড়িয়া প্রাণ বাঁচিবে। নবকুমার এই প্রাণলঙ্ঘিত বিপদে পড়িয়া ভাবী অমঙ্গল-চিত্রায় অতীত কাল হইলেন। কিন্তু এই বিপদে সেই অনানুযায়্য ভয়হারা নীনমুগ্ধ ভিন্ন আর কেহই নাই ভাবিয়া একমনে তাঁহাকেই ডাকিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবকুমারকে দেখিবামাত্র সে রহমতি ধারণ করত বলিল—“কি ঠাকুর! তুমি এখনও যাও নাই? আমি এইমাত্র বলিয়া গেলাম, ‘আমার বাড়ীতে তোমার থাকা হইবে না, তুমি থাখা ইচ্ছা চাইয়া যাব’।” আমি শ্বেষিতেছি তোমাকে তাড়িয়া না গিলে তুমি যাইবে না।” নবকুমার এবার কিছু গভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন,—“তুমি স্বস্তি রাখা করিও না, আমি যাইতেছি; তবে যদি আমার একই নামান্ত উপকার কর, তাহা হইলে ভাল হয়।” বৃদ্ধ বলিল,—“কি উপকার করিতে হইবে?” নবকুমার—“আমার বাড়ী বাসদেশে পুণ্ড। স্বপ্ন এই-প্রাণে আসিবার কথা হয়, তখন আমার শিখ্য রামহরি মল-ব্রহ্মা দিয়াছিল, যদি আমি এই প্রাণে আসি, তাহা হইলে তাহার কন্ডার সঙ্গে এক-বার যেন অতি অবশ্য সাংঘ্য করিয়া যায়। রামহরির কন্ডার নাম বামা, কিন্তু তাহার পতনের নামসী আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বামার শব্দের নাম স্বরূপ থাকিলে আমি সেইখানেই যাইতাম। বাহা হউক, তোমার এখানে বাড়ী, তুমি যদি তাহার নাম জান, তাহা হইলে বলিয়া দেও, আমি এনই ত্রাণ যাইতেছি।” এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কিছু যেন অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—“আপনি বাসদেশে পুণ্ড হইতে আসিতেছেন? রামহরি আমারই বৈবাহিক,

আর তাঁহার কন্যা বামা আমার মধ্যম-পুত্রবধূ। ঠাকুর! আপনি আমার বৈবাহিকের গুরু, তাহা আমি জানিতাম না। এ কথাটা যদি আপনাকে বলিতেন, তাহা হইলে এত ষোল হইত না। বাহা হউক, আপনি কিছু মনে করিবেন না। আপনার আজ রাতে কোনখানে বাইবার দরকার নাই, এইখানেই থানুন।” এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল এবং তাহার মধ্যম বধূকে ডাকিয়া বলিল,—“সেজ বুটনা! তোমার বাপের গুণ এসে-ছেন, তুমি নিজে পিয়া তাঁহার পা ধোওয়াই দেও।” তীক্ষ্ণবুদ্ধিমানী বামা সেবিল, তাহার উত্তরে মল কল্যাণেছে, আর কোন চিন্তা নাই। শব্দের এই কথা শুনিয়া বামা একখটা জল এবং এক খানি গামছা লইয়া বাহিরে আসিল। প্রথমে নবকুমারকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পা ধোওয়াইয়া দিতে লাগিল এবং খেলাপ একেবারে পড়িয়া পড়ে তিনি ন্যাং নান এই ভয়ে হাঁককে এই অকস্মাৎমধ্যে সে তাহার পিতৃহরণ এবং শব্দের স্মরণ করিয়া পড়িয়া বাড়ীর মধ্যে পুনরায় চলিয়া গেল। অবতিবিলম্বে সে আবার নবকুমারের জন্ত কিংবা জলধারায় গিতে আসিল, কিন্তু আর কোন কথা বলিল না।

নবকুমার সমস্ত দিন পরিশ্রান্ত, উষ্ণায় শুককট এবং হ্রদ্যনিধায় আভুত। জলযোগের পর যদিও কিছু শান্তি পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু নানাবিধ চিন্তাতে তাঁহার হৃদয় উদ্বেগিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সত্য সত্যই কি বামা দূর-দাম্পিত্য-মেঘ-মমতা-পূর্ণ রমণীর? সে প্রকৃত কি তাহাকে বিচাইয়া জন্ত রমণী-স্বপ্নের অপর অসমীয়া কন্ডার পরিচয় দিতে বসিয়াছে? না তাঁহার নিধন সাধনের জন্ত একপ্রকার জাল বিস্তার করিতেছে? আবার আকিঞ্চেহন, যদি তাহাকে হত্যা করাই তাহাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এক্সপ লম্বারও কোন অপেক্ষা নাই; কোন গুণ হানে বলিয়া গিয়া মায়ায়া কেমিলেও নন পাগে নিটিয়া যায়। এককাল কতন্ত-হৃদয়বধকারী চিত্রায় তিনি কত যে যগা ভোগ করিতেছেন তাহা—কিন্তু—শেষ কথা দিই না। বাহা হউক ক্রমে “সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, যার দ্বারা তিমিরাবরণ”। আরও হইয়া

নিশাচর পিশাচদের হৃদয়ের প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে নবকুমার দেখিলেন, ফিরি সারি সাতজন শোক পানের বজরা মাথায়া করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের কালান্তর খসেন ছায় বিকট মুক্তি দেখিয়া নবকুমারের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি বুঝিলেন ইহারাই—বৃদ্ধের পুত্র, পান বিক্রয় করিয়া হাট হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহারা নবকুমারকে অতি করুণপূর্ণে ভাব-বিকল-পূর্ণে বলিলেন—“আমি ত্রাঙ্গণ অতিথি—ইহা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন কিছু ব্যস্তপূর্ণে বলিল—“ত্রাঙ্গণ, অতিথি? ভালই, কত-ক্ষণ আসা হয়েছে?” নবকুমার ইহার কি উত্তর যেন তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে গৃহস্থানী সেই বৃদ্ধ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার মধ্যম পুত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল—“তিনি তোমার শব্দের গুরু, তোমরা সকলেই ইহাকে প্রণাম কর।” পিতার এই কথা শুনিয়া পুত্রেরা কিছু ধমত হইয়া নবকুমারকে প্রণাম করত তাহারা সকলেই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বৃদ্ধের মধ্যম পুত্র, নবকুমারকে আসিয়া বলিল—“বাড়ীর ভিতর পুত্রের উদ্বেগেই হইয়াছে আপনি আসিয়া রহই করুন।” এই কথা শুনিয়া নবকুমার শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার পা কপিতে লাগিল, ভাবিলেন। এবার বুঝি বাড়ীর ভিতর লইয়া তাঁহার প্রাণনিদান করে। তিনি প্রথমে পাক করিবার নিত্য আস্ত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু দেখেন যে, তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না; কার্কেই তাহাকে বাড়ীর ভিতর রাখিতে হইল। বাড়ীর ভিতর দেখিলেন, অনেকগুলি অতি পরিপাটি ঘর; সকলেই লেপা-পোঁতা, কোন কোন ঘরে বিদ্যালয়ে আলিঙ্গনা-দেখাও হইয়াছে। নবকুমারের সে সকল সেবিবার সময় নাই, তবে তাঁহার হৃদয় বিকশিত হইতেছে, তিনি কাঠপুতলিকার ছায় দেখেন তাহার স্বকনের উদ্বেগেই হইয়াছে, সেখানে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। বামা সেখানে তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি স্বকনে করিতে বসিলে, সে তাঁহার কাপের সমস্তাও হইয়াছে লাগিল। সেখানে আর কেহই ছিল না বলিয়া বামা অতি দীরে দীরে বলিতে লাগিল,—“ঠাকুর! আজ নারায়ণ আপনাকে বড়ই বিচাইয়া দিয়ানেন।” যদি আপনি মন্ডার পদ আসিতেন, আমার শত-

চেঁটেতেও আপনার প্রাণ রক্ষা হইত না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার শব্দের সাথ ছেলে, তাহারা সাত জনই জুকাইত। দিনের বেলায় পান বিক্রয় করে, রাতে অসহার পুণ্ড-বিক্রয় করে প্রাণ বধ করিয়া, তাহাদের সকল লুটপাট করিয়া লয়। এই বাড়ীর মধ্যে একটা ঘর আছে, সে ঘর আপনাকে দেখাইব, তাহার ভিতর এই সকল হতভাগ্য শোকদের কল-কোলনে লইয়া গিয়া বস করে। আমি যদি কোন প্রকারে ইহাদের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারি, তাহা হইলে প্রাণ-পণে ইহাদের কবিত বিপন্ন পথিকের প্রাণ বিচাই-বার চেষ্টা করি, কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, আমারও প্রাণের ভয় আছে; যদি তাহারা ঘৃণাক্ষরে জানিতে পারে যে, আমার কোঁশনে তাহাদের শীঘ্রই পলাইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আমাকে কাটায়া ফেলিতে তাহারা কিছুমাত্র সন্মুচিত হইবে না। ইহারা এত কোঁশলময় যে, আমার ছায় ব্রীলোকেও সামান্য বুদ্ধি তাহাদের কাছে অতি সহজেই পরাস্ত হয়। আমি ইহাদের কাওগারখানা দেখিয়া জীব-মুগ্ধ হইয়া আছি; কি করিব, কোন উপায়েরিক করিতে পারি না। আমার পিতা যদি ইহাদের বাহ্যার পূর্বে জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে এ ডাকাতদেরেরে কখনই আমার বিবাহ দিতেন না; কিন্তু এখন ত আর কোন উপায় নাই। আমার শ্বশুরী এই ডাকাতদের সঙ্গে থাকেন, তাহাদের কাণ্ডে সহায়তা করেন বলিয়া যে আমি কত দুঃখিত, তাহা আপনাকে কেমন্ করিয়া বলিব? কিসে আমার শ্বশুর মন সুখ হইতে স্বপ্নেই আসিবে, তাহার জন্ত কত দেবদেবীর নিকট প্রার্থনা করি, প্রসন্নোক্ত শ্বশুর পায় ধরিয়া তাহাকে এ মুহুর্তে পরিতাপ করিতে কতই ব্যস্ত-ব্যস্ত-করি, তাহাও মনও করে, কিন্তু তিনি স্বপ্নে তাঁহার ভাইয়ের মনে মিলেন, তখন তাহাদের প্রসন্নোক্তার কখন বা তাহাদের ভয়ে, আবার তিনি লিখধারী হন। আমি তাঁহার জন্ত যে কি করিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না? আমার হিংস্র স্বরের মেয়ে, হার্মী ভিন্ন আমলের পতি-মুক্তি নাই, যদি আমা-দের ইহকাল, হার্মী আমলের পরকাল—এই, হার্মী বিবধখানী বলিয়া তাহাকে যে পরিতাপ করিয়া বাপের বাড়ী যাইব, এ কথা মনে করিলেও গাপ-শব্দে। আপুনি ত্রাঙ্গণ, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমার শ্বশুরী যেন সুখ পরিতাপ করিয়া

হার প্রদান করিলেন। ভগবান্, নারায়ণ মনোহর বনমালা এবং লক্ষী অমলা রত্ননির্মিত মকরাকৃতি মুণ্ডল প্রদান করিলেন। ইন্দ্রানী ভগবতী মুগ্ধ-প্রকৃতি বিম্বমালা-ধরুণা। দুর্গা-সুহৃৎপতি বিম্বকাকি প্রদান করিলেন। বর্ষসেব বর্ষ, যশঃ-ও-বিশুণ বর্ষ-রুকি প্রদান করিলেন।^১ অশ্বিনেব বস্ত্রির জায় শুভ বস্ত্র প্রদান করিলেন এবং বায়ু-মি-মুগুর প্রদান করিলেন। এই সময়ে শত্ৰু ব্রাহ্মণ অহুরোষ নামোদাস-মানবিত মনোহর কুম্ভ-সদৃশ অস্ত্র করিলেন। সেই সদৃশ প্রবলে মুরাহরণে মুখিত-প্রায় হইয়া চিত্রিত পুতলিকর-ম্ভায় রহিলেন। স্বপকাল পরে তাহার সাংজ্ঞাভাত করিয়া কেবলমাত্র রাসমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। এই রাসমণ্ডল তখন জলানুর্গ ও রাধাকৃষ্ণ-বিহীন।^২ এইরূপ অল্পত ব্যাপার দর্শন করিয়া গোপ-গোপীপাদ, সুগুণ এবং চিত্রপন কাতরতরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাৎপরে ব্রাহ্মা ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, কুম্ভ রাধিকাসহ ভবীভূত হইয়াছেন। বুদ্ধিতে কি ভাই! ইহাই সেই বিম্বপাশ্বিতা স্বয়ং বিম্বরূপা বৃষেশ্বরী ভগবতীর উৎপত্তি-ভব।

ইহাইই পরে মনে পড়ে, আবার সেই বৈষ্ণব-চূড়ামনি তপঃপ্রভাবশালী অতুল-কীর্তিস্থল ভগীরথের সেই অল্পভম পবিত্র কীর্তি-কথা। তাহারই তপঃপ্রভাবই ত পবিত্রতাপাবনী পদ্ম। বৈষ্ণব পুত্রিয়ার করিয়া, কৈশোরে ত্রিশূলার-জটাভূতে পতিত হইয়া-জিহ্বেন, তাহারই তপঃপ্রবলে স্বরেশ্বরী স্বরেশ্বরী মনোহরের সেই দীর্ঘ-জটা ভেদ করিয়া হিমাচলের গভীর গহবরে প্রস্রিত হইয়াছিলো—অবশেষে তাহারই সাদনকুলে জগৎ-গহবর হইতে নিঃসৃত হইয়া, আস্ত-নিপাত্ত হইতে দুর্গাকি মন্তনমন্তকে উত্থাপন-ভব-ভঙ্গে হৃদয়-হস্তিনাপুরে নিষ্পেক্ষ করিয়া, কাল-কাল-নৈ এই ভাবতভূমির এই পবিত্র হরিবারে প্রথম আবির্ভূত হন। এই ভাই সেই “হরিদ্বার”!

নাম ও মাহাত্ম্য।

নৃতকাল পদ্ম—ভূত কাল “হরিদ্বার”। সে যে অনাদি অনন্ত কাল। নাম কেবল “হরিদ্বার”।^৩ “পদ্মদ্বার”ও ইহার অন্ততম প্রসিদ্ধ গোপাধিক নাম। মাহাত্ম্যে ইহা “পদ্মদ্বার” নামেই উল্লিখিত আছে।

দুর্গবংশভিত্তিক ভীষ্মের নিকট মহাবিশ্ব পুত্ৰশ্রী বলিয়াছেন,—

“ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ নমস্কৃত্য মহাবিশ্বম্।
পূর্ণকালেণ যৎ তুলাং পদ্মদ্বারং ন সংশয়ম্।
তত্ৰাভিষেক্য কুম্ভীত কোটীতীর্থে সমাধিতঃ।
লভতে পুত্রগীকৃত্য কুলপুংসু মনুষ্যভয়েৎ।
উদ্যোক্ত্যং রাজনীং তত্র গোমহাস্ত্রফলং লভেৎ॥

মহাভারত, বনপর্ক, ৬৪ অধ্যায়।

তাৎপর্য—যে ধর্মজ্ঞ। মহাবিশ্ব হিমাচলক-নমস্কারপূর্বক পদ্মদ্বারে গমন করিলে। এ পদ্মদ্বার স্বর্গদ্বারের তুল্য, তাহাতে সংশয় নাই। সমাধিত হইয়া তত্রস্থিত কোটী তীর্থে গমন করিলে; তাহা হইলে পুত্রগীকৃত্য যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও কুল উন্নয়ন করিতে পারে এবং তথায় এক রাজনী ব্রত করিলে, মছল গো-নামের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

পুণ্যভেৎ ও আছে—

“দশাশমেধিকং পুণ্যং পদ্মদ্বারং তেষু বহু।
নদাশ্ব ললিতা তত্র তীর্থং মায়দুরী ভভা।
মন্তপুণ্যম্ ২২।১০

নারদ-পুরাণের ৩৬ অধ্যায়েও হরিদ্বার মাহাত্ম্যের সবিস্তার ৬ হুবিস্তার বিবরণ বিবৃত আছে।

হরিদ্বার নাম বলিয়া, অনেকে “স্বরদ্বার”ও বলিয়া থাকেন। বিদগ্ধী বিদ্যাকীর্তনের বিদ্যায়—সৈম্ব-মণ্ডনী ইহার “হরিদ্বার” নাম বিদ্যাছেন; আর সৈম্ব-কুম্ভ ইহাকে “স্বরদ্বার” বলিয়া থাকেন। “হরিদ্বার”ই হউক বা “স্বরদ্বার”ই হউক, অথবা “পদ্মদ্বার”ই হউক,—নামে কি আসে যায়? যে হরি, সেই হর, সেই গদা। মনুস্মৃতির নাম-ভেদে মৃত্তিকের ভৈত নয়? মৃত্তিকের,—নাম ভেদ,—যেহাউ হউক,—সাধন-পাশ্চাত্য কোথায়? সাধনের ফলই এক। সে ফলও অদ্বীম।

একবার কষ্ট স্বীকার করিয়া, কোন রকমে ভক্তিভূক্ত মনে, একাগ্রচিত্তে, হরিদ্বারে গমন করিতে পারিলে আর জন্মজন্ম থাকে না। তবে বৎসপুত্রকালে সে গমন ঘটয়া থাকে। “হরিদ্বারে” গমন বড়ই দ্রুত।

“সমুদ্রং যুগত। গঙ্গা জিহ্বা যেনৈব হৃদ্যত।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসংগমে”।

কুর্ক, ৩৬, ৩২।

ভ্রাগো যাকিলেই হরিদ্বারের নাম ঘটয়া থাকে। প্রবৃত্তি থাকিলে কিছুই স্থলভূত মনে হয় না। হরি কি বন? কলিকাতা হইতে রেল যাইলে দূরত্ব

পাঁছড়ে ৪৮ পদী মাত্র লগে। মুরশিদাবাদ হইয়া হরিদ্বারে যাইলে, ২৪০ ক্রোশ পথ বাইতে হয়। আর বীরভূম-হইয়া যাইলে ৪৮০ ক্রোশ বাইতে হয়। দিল্লী হইতে ৫৮০ এক লাক্ষা^৪ হইতে ১০৫০ ক্রোশ। তামার সরকার বাহাদুরের অভি-বড় বিশাশী হিমা-নিপুণ হটীর সাহেবই বলিতেছেন,—
“উত্তর-পশ্চিমের সাধারণপুত্র জেলায় হরিদ্বার।
অনুগোচ্য ২২ ৫৩ ৩” উত্তর এবং দ্রাবিণা ৭৮ ২২ ৫৩ পূর্ব। ঝড়কি হইতে ৮০ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব এবং নিম্ন সাধারণপুত্র-সহর হইতে ১১০ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব।

সাধক ভক্ত হিন্দুর কথা ছাড়িয়া নাও। তাহার চক্ষেও হরিদ্বারের দলিলাই^৫ অমরক-হিন্দুর অপেক্ষা অনন্ত কোটি গুণ অধিক মূল্যবান বলিয়া প্রতিমান হয়। হরিদ্বারের নামেই তাহার প্রাণ পূর্ণ প্রেমে পুণ্যকিত এবং ক্ষয়-কলর আনন্দ-গলনভাবে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সাধক মগধর্মে যে কি হয়, তাহা কি বলিব? অভি-বড় ভক্তক অবিশ্বাসী অহিন্দু যে, সেও যদি একবার হরিদ্বারের সেই স্বভাব-সুন্দরী-প্রকৃতি বরষাবিনীর প্রতিমাধানি দর্শন করে, তাহা হইলে “তাহারও প্রাণ-প্রাণ বর্ণনিত হইয়া যায় এবং তাহারেও-সম্বলিত হইয়া মস্তক অবনত করিতে হয়। একবার হইলে পরে-প্রাতীর বোরি^৬ পুত্র-দ্রাবিণ-পরিবাহিতী কুল-কুল-মানিনী ভাগীরথীর পার্শ্ব^৭ তাকাইয়াই, তাহারে বিদ্যায়-বিকারিত-গোষ্ঠনে বলিতে হইবে,—
“কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় বাইতেছে।
কোথা আদি, কোথা অন্ত ভাগ।
একবার মনুর চক্ষুমাশিনি^৮ যামিনীতে রানবাতে ঝড়িয়ায়, উল্কে, নীল, আশে-পাশে, সমুদ্রে, পর্বতে দৃষ্টপেক্ষ করিলেই বলিতে হইবে,—“অবাক! একি এ।
পর্বতে চলে। রূপে চলে। জলে চলে। সর্ব্বভেদে চলে। একি এ অল্পত বাপায়। এ যে বিব-ব্রাহ্মণের অনন্ত রত্ন-ভাগুর। নিসর্গস্থকীর আনন্দকামোচ্ছা বিচিত্র রহস্যময়।”

হরিদ্বারের এমন সুন্দর গুণ সে যে নাই, এমন অত্যাগ জীব এখনও খসকো আছে। ভাগো হয় ত হরিদ্বার দেখা করেন পর্বতে। এমন মাহুসও অনেক থাকিতে পারে। এপ্রাণ অম্বাহার “হরিদ্বারে” পুত্রাত ও বর্তমান বিবরণ যথামাত্র বর্ণন করিয়া দেখাইতে পারিলে উপাস্তে হইতে পারে। এমন সাধক মগধর্মে যে স্থলভাগ, এ অকিঞ্চিৎকর বর্ন-

পাঠে সে টুকু অবশ্য অন্ততঃ; তবুও কতকটা তৃপ্তি-সুখারের সন্ধাননা।

নামের বিচার।

হিন্দু হরিদ্বারে যায়, কৃত-পাপ ক্ষয় করিতে এবং নতন পুণ্য গণক করিতে। অহিন্দু যায়, প্রকৃতির মোহো দোষিত এবং প্রাচীনতর পদমাণ নির্বির করিতে। এমন অনেক অহিন্দু উত্তপদময় ব্যক্তি পূর্বে গিয়াছিলেন এবং যিনি যেরূপ পারিলেন, তিনি এতৎসম্বন্ধে সেইরূপ বিবরণ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হটীর সাহেব বলেন,—“হরিদ্বারের প্রাচীন নাম অমরকপিল। তাহার মধ্যে “কপিল” অস্ত-ভম। কপিল মুন্নি নামেই এই নাম।” আব্বার তৈমুরলঙের সরিষার—“ইতিহাসলেখক সরহুমান বলেন,—“কপিল”-পরিবাহের নিকট পরমতুল্য হইতে গঙ্গার উৎপত্তি।” বাঙ্গালার ভূতপূর্ব-রয়েল ইঞ্জিনিয়ার কনিহাস সাহেব বলেন,—“ইহার পূর্বে এ কথা কেহ জানিত না।”

মহাভারতে “কিজ “কপিল-বট” তীর্থের উল্লেখ আছে। বোধ হয়, এই “কপিলাবট”কেই কপিলা বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে। কিজ মহাভারতে “পদ্মদ্বার” ও “কপিল-বট”র নাম পদ্ম-ভারে উল্লিখিত হইতেছে। অরো “পদ্মদ্বার”—তাহার “কনকগ”—তাহার পর “কপিল-বট”। মহাবিশ্ব পুত্ৰশ্রী বলিয়াছেন,—

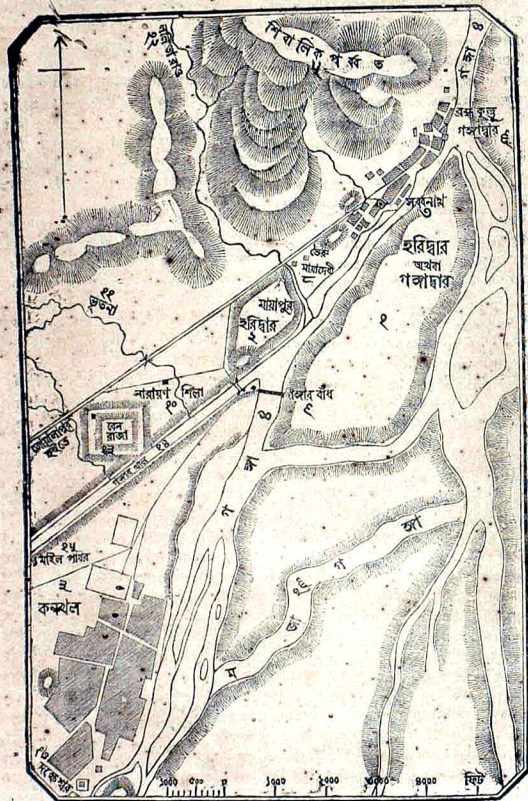
“ততঃ কনকগে দ্বারী ত্রিরাষ্ট্রোপাশিতো নরঃ।
অন্যেদমবাপ্রোতি পূর্ণলোকক পজ্জতি।
কপিলো বটঃ পৃচ্ছেৎ তীর্থসৌ নরাধিপ।
উদ্যোক্ত্যং রাজনীং তত্র গোমহাস্ত্রফলং লভেৎ॥”

মহাভারত, বনপর্ক, ৬৪ অধ্যায়।

তাৎপর্য—তদনন্তর কনকগে গুণনপূর্বক ত্রিরাষ্ট্র উপাশ্য ও গমন করিলে, মহাশ্ব অগমেধ যজ্ঞের ফল এবং পূর্ণলোক প্রাপ্ত হয়। যে নরাদিপ! তীর্থসৌ ব্যক্তি তাহার গৈর “কপিল-বটে” গমন করিলে। তদায় এক “দ্বিগং উপাশ্য কপিল” নামক গো-নিম-জনিত ফল লাভ করিতে পারে।

কেহ কেবল বলেন, যে হরিদ্বার, সেই মায়াপুর। আব্বার অনেকেরই ভাষা স্বীকার করেন না। তবে যাহা “হরিদ্বার”, তাহাই “পদ্মদ্বার,” একথা সক-

হরিদ্বারের মানচিত্র।



লেরই, স্বীকৃত। এতৎসম্বন্ধে একধাণি মানচিত্র
স্থানান্তরে সম্মিলিত হইল। মানচিত্রখানি দেখি-
লেই কথাটা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

যে সকল আধুনিক ইতিহাসলেখক বা ভূবেদা হরিদ্বার
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা এই,—“হরিদ্বার”
আধুনিক নাম। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব রয়েল ইন্ডি-
য়ান কনিংহাম সাহেব তাঁহার ভারতীয় প্রাচীন
ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থে (১) লিখিয়াছেন,—“হরিদ্বার
আধুনিক নাম;—আবুবিহান এবং রসিদ-উদ্দীন
কেবল গঙ্গাহারের কথা বলিয়াছেন। মোঘলসম্রাট
আকবরের সময় ‘হরিদ্বার’ নাম শুনা যায়। তৎ-
সময়ের ইতিহাসলেখক আবুল ফজলের মতে হরিদ্বার
গঙ্গাতীরে অবস্থিত—দৈর্ঘ্যে ১৮ ক্রোশ ব্যাপ্ত। (২)
হুয়ান সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক
হিউয়েনসাঙ উক্তর ভারতে ভ্রমণ করেন। তিনি
বলেন, তখন তিনি ‘হরিদ্বার’ নাম পান নাই। তিনি
“মায়াপুর” লিখিয়াছিলেন। এই মায়াপুর বর্তমান
হরিদ্বারের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে। মানচিত্র দেখুন।
হিউয়েনসাঙ হরিদ্বার নাম নাই পান,—কোন
কোন পুথিতে ‘হরিদ্বার’ নামের উল্লেখ আছে।

“ভূগোলিকাননে গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে পদে।
বন্দারবা হরিদ্বারে তীর্থরত্নে বা যথা ৪”
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণসংখ্য, ১.৪৩।
যাহা হউক, নাম লইয়া এখন পোল করিবার
প্রয়োজন কি? মায়াপুর যে হরিদ্বারের নিকটবর্তী
প্রাচীন তীর্থ স্থল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

“মায়াপুরহলকান্দা পর্বতভাগিঃপুত্রা নৃপ।”
ব্রহ্মবৈবর্ত, ২২. ৩৬।

“হরিদ্বারের” নিকট গঙ্গার “অগ্রতম পূর্ব-শাখা
অলকানন্দা এখনও প্রবাহিত হইতেছে। (৩) মায়-
াপুরেও অলকানন্দ পর্বত হইতে নিঃপত্ন বহিয়া কথিত
হইতেছে। হিউয়েনসাঙ ‘গঙ্গাহারের’ অস্তিত্ব স্বীকার
করেন। তাঁহার বর্ণিত প্রাচীন মায়াপুরতত্ত্বের
একথা প্রতিপন্ন হইবে। নিম্নেই তাহা প্রকটিত
হইল। ‘গঙ্গাহার’ ও ‘হরিদ্বার’ একই বলিয়াই
মকলে স্বীকার করিতেছেন। হরিদ্বার হইতে যে

মায়াপুর স্বতন্ত্র, পূর্বোক্ত “মায়াপুরের” গোকে
ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এ গোকে “গঙ্গাহার”
ও “মায়াপুর” স্বতন্ত্র বলিয়া লিখিত হইতেছে।
যাহাই হউক, মায়াপুর অতি প্রাচীন স্থান।

প্রাচীন মায়াপুর।

চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ এই মায়াপুরেই
বিদ্যাভিলে। তিনি ইহাকে “ময়লো” বলেন।
এই “ময়লো”র ভদ্রাবশেষ এখনও মায়াপুরে পাওয়া
যায়। “ময়লো” অর্থ ময়ূর। এতৎসম্বন্ধিত
মানচিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, মায়াপুর
“হরিদ্বার” বা “গঙ্গাহার” এবং ক্রনবন্ধের মধ্যবর্তী
এই “মায়াপুর”কে ময়ূরপুরও বলা যাইতে পারে।
ময়ূরের নামে এই “ময়ূরপুর” নাম। এখনও
নিকটবর্তী জঙ্গলে স্তম্ভসংখ্য ময়ূরকে বিচরণ করিতে
দেখা যায়। মায়াপুরে “মায়াদেবী”র প্রাচীন
মন্দির আছে। এই “মায়াদেবী” নামে “মায়াপুর”
হইয়াছে, এ বিশ্বাসও অনেকের আছে। হিউ-
য়েনসাঙ বলেন,—এই সময় গঙ্গার নাম “মহাভদ্রা”
ছিল। বহুসংখ্যক লোক গ্রাম করিতে আসিত।
“ময়লো”র পুত্রিদি প্রায় ছই ক্রোশ এবং এই নগর
বহুজনাকীর্ণ। জেনারেল, কনিংহাম মায়াপুরের
ভদ্রাবশেষ দেখিয়া বলেন, হিউয়েনসাঙের কথাই
ঠিক। “ময়লো” সম্ভবতঃ হিউয়েনসাঙ ‘লিখিয়া’
গিয়াছেন;—

“ময়লো গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত। এখান
হইতে কিঞ্চিদূরে “গঙ্গাহার” নামে একটা মন্দির
প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের ভিতর একটা পুষ্করিণী
আছে। গঙ্গা হইতে বরাবর একটা খাল দিয়া
এই পুষ্করিণী জল সাপরাহা হয়। এই পুষ্করিণীর
পাশ পাশের বটান এবং পাঁখতলি হুগুর কৌশলে
বসান।” কনিংহাম সাহেব বলেন,—“জমি স্বতঃ
মায়াপুর দেখিয়াছি। এই মায়াপুরেই ‘ময়ূরপুর’
বা ‘ময়লো’র ভদ্রাবশেষ দেখা যায়। তবে এই
ময়ূর এখন গঙ্গার “পশ্চিম” পারে অবস্থিত।
‘ময়লো’-গঙ্গার পূর্বপারে কেমন করিয়া হইল, বলা
যায় না। হয় ত হিউয়েনসাঙ ভুল করিয়াছেন।
‘গঙ্গাহার’ মন্দির এবং পূর্বতলেশ্বর মন্দির যে
খাল ছিল-বলিয়া কথিত হয়, তাহার আদৌ
চিত্র এখন পাওয়া যায় না। তবে এখন হরিদ্বারের

(১) Cunningham's ancient Geography
of India vol I. 354.

(২) Glatwin's AinAkbari II 516.

(৩) বিপ্লবকালে আধার্বের মানচিত্র।

বাড়ীঘর দেশে দেশে ধারনা হয়, ঐ ধার্না বুলিয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর বাড়ীঘর তৈয়ারি হয়।

কান্দোবন মতে ‘মালো’র ‘অবিক্রান্ত’কে হিয়াভবিন্যাসের ভুল হয়। আমরা হঠাৎ ভুলটা স্বীকার করিতে পারি না। কান্দোবন নদীর প্রোত পরিবর্তিত হয়। এ স্থলে গঙ্গার প্রোত যে ছিল নাই, তাইই বা কে বলিতে পারে? পুরাণ-বর্ণনা মত করিলে বুঝা যায়, কান্দোবন হইতে খলয়ায় বহিতে হইলে যখন পার হইতে হইত, এখন উত্তর আর তা হয় না। কান্দোবন কি না হয়? তাই ভ্রমভুক্তি বলিয়াছেন,—

“পূর্বা দ্বার প্রোতঃ পুণিনমরনা তত্র সরিতাং
বিপদ্যাসং যাতো দনবিরভাবঃ ক্ষিপ্রসংগতঃ।”

যাহা হউক, এ ত্রুটি এখন নিশ্চয়োত্তম। “অম্বর পুরের” অভিধানেব আঙিও দেখিতে পাওয়া যায়। মানচিত্রে ‘সর্সনাথ’ বলিয়া যে চিহ্ন রহিয়াছে, ইহারই আধুনিক সর্সনাথের মন্দির। এই মন্দিরের নিকট একটি নদী পদ্মায় মিশিয়াছে। এই নদীপট হইতে বেরান্দার প্রাচীন দুর্গ পর্যন্ত এবং তাহারই সমীপস্থিত ইহার প্রবেশের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। নদীর শেষ নীচায় প্রায় ৩ হাজার ফুট হইতে পারে। উত্তর মীমাংসা দক্ষিণ হয় গিয়াছে। তাও প্রায় ১ হাজার ফুট হইবে। ইহার মধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত আছে, ঐ দুর্গই বেরান্দা-কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহা প্রায়তন ১৫০ বর্গফুট হইবে। এতদ্ব্যতীত কন্যাস্থল উচ্চ ভবন প্রাচীর দেখা যায়। মানচিত্রে ‘খালের-সেতু’ চিহ্নিত দেখিতে পাইলে। ইহারই উপর সর্সনাথের উচ্চ প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত। নারায়ণদীনা, মায়াদেবী এবং ভৈরবের নামে তিনটা প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মানচিত্রে দেখে— ‘কেবল প্রাচীন দুর্গটির ভগ্নাবশেষ নহে, প্রাচীন প্রাচীর মুদ্রাঙ্গি এবং মন্দিরসমূহের চতুর্দিক নিম্নস্থ বিবরণের প্রতি-নিম্নস্থ ভগ্নাবশেষের ইহার প্রাচীরের প্রতিপন্ন হয়। নারায়ণদীনার মন্দির ৯০ ইঞ্চি-ইষ্টকে নির্মিত। ইট পুস্ত হইবে ২৫ ইঞ্চি বাহুরে চতুসকোণ। এই মন্দিরের চারিদিক অনেক চতুর্দিক প্রাচীর এবং ভয়-যোজিত প্রতিমূর্তিও নিম্নস্থ আছে। কন্যাস্থল মাঠের বলুন, তিনি এই সপ্তক প্রাচীর প্রস্তরনির্মিত মণ্ডে যৌদ্ধের একটি প্রতিমূর্তি পাইয়াছিলেন। এই মূর্তির চতুর্দিক নুকের

অমৃতমি শিখের মূল মূল প্রতিমূর্তিও নিহিত ছিল। মায়াদেবীর মন্দিরের দ্বারদেশে যে কয়েকটা কথা লেখা আছে— তাহাতে বোধ হয়, এই মন্দির ১১ম কি ১২ম শতাব্দীতে নির্মিত। মায়াদেবীর ভিন মস্তক—চারিটা হস্ত। এক হস্তে নরমুণ্ড, এক হস্তে চক্র এবং অপর হস্তে ত্রিশূল। দেবী বেনে অস্ত্র উত্তোলন করিয়া কাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেবীর পাশেই ‘অষ্টভুজ সেন-মূর্তি’। বিহিত্তে শিব-লিঙ্গ এবং একটি দুর্গ-মূর্তি। ‘সর্সনাথ-দেবীর মন্দিরে’—বুদ্ধ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ বটমূর্তিতে ধ্যাননিমগ্ন। তাহারই পাশে হইতে দণ্ডায়মান এবং হইতে উভয়দ্বার্যমান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

হরিদ্বার তীর্থক্ষেত্র।

অজ্ঞাতনী মনন বন্ধুর পর্বতভ্রমণের পাদদেশে,—
গঙ্গার দক্ষিণতীরে এই হরিদ্বার সহর প্রতিষ্ঠিত। এই পর্বতভ্রমণের নাম ‘মিথিলিক’ পাহাড়। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বেই কথিত ভূভাগ। এই কথিত ভূভাগ পূর্বে পার্শ্ব গভীর জলস্রবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জলস্রাবের সহরের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আসিয়াছে। পর্বতের মাধ্যম সর্বত্র পথের ভিতর হইতে গঙ্গা-প্রোত মন্দির হইয়া সমস্ত ভূভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। স্বত্বকর্তৃক স্থলাক স্থলে গুপ্তের জগদগণিত পর্বত-প্রবী মস্তক তুলিয়া গিয়াছে। উক্ত স্থলস্রবের মধ্যে হইতে দুই বা ততোধিক ক্রিয়মান হইতে দেখা যাইতে যেন, যেন এই সকল পরিবর্তন মিত্র-নীতিবোধজ্ঞান নীলবর্ণের রঞ্জিত। গঙ্গার অপর পারে ‘চাঁদী’ পাহাড় মনে ভেল করিয়া উঠিতে হইয়াছে। এই পর্বতের শিরোদেশে একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের নাম চণ্ডীমন্দির। ইহার উপর একটি ত্রিশূল ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে এই ত্রিশূল নড়ে পড়িয়া যায়; কিন্তু আর স্থাপিত হয় নাই।

এখানে গঙ্গা অশ্রুতগণি শাখায় বিভক্ত;—
মধ্যে মধ্যে ধীপাকারে ভূখণ্ড নিহিত। এক একটা ভূখণ্ড এখন উচ্চ যে, অতি-বড় প্রাচীরের তল ভায়ায় উপর উঠিতে পারে না। পর্বতের মধ্যে সমগ্র সর্বত্র পথে ভায়ায় পথ। তবে হরিদ্বারের প্রান্ত পথ কখন কখন জলে ভুগিয়া যায়। গঙ্গার পানি আচ্ছন্নপ্রাণ প্রাণত হইয়া। একটা শাখা হরিদ্বারের কিঞ্চিদধিক উত্তর হইতে বাহির



হইয়া ‘হরিদ্বার’, ‘মায়াপুর’ এবং ‘কন্যাস্থল’ পথ আছে। ‘কন্যাস্থল’ের কিঞ্চিৎ নিম্নে মূল নদীতে মিশিয়াছে। ‘কন্যাস্থল’ এবং ‘মায়াপুর’ের মধ্যে এই শাখার কোন স্থান হইতে গঙ্গার খালে জল আসিয়া থাকে।

দন-কন্যাস্থল-বাখিলা প্রভৃতির হিসাবে হরিদ্বার এখন অসংখ্যকৃত অনেকটা উন্নত। উৎসবের দিনে তখনক সমগ্র ইহার লোকসাধ্যা ‘খানা কা’ যায় না। অমৃতমি সমগ্রও ব্যবসা-বাখিলা যুদ্ধে বহুসংখ্যক লোকের সময়ান হয়। উত্তর এবং ‘পাচাতা’ দেশ হইতে বিবিধ দ্রব্য এখানে বিক্রয়ার্থে আনিতে, হইয়া থাকে। দিল্লী, লক্ণৌ, এলাহাবাদ, প্রান্তিত নগর হইতে অনেক লোক এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকে। পূর্বে হরিদ্বারের উপর পাহাড়-পথে ওরসের আড্ডা ছিল। পার্শ্বত প্রবেশ জমী ভাড়া দিয়া তাহাদের নিকট ক্রীতদাস বিক্রয়ার্থে আনীত হইত। ১০০ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্যন্ত দাস বিক্রীত হইত।

এখানকার পথবাট এখন কতকটা বিস্তার। ১৭৭২ বৎসর পূর্বে এখানে কেবল একটি রাস্তা ছিল। তাহা দৈর্ঘ্যে ১০০২ হইতে এবং প্রস্থে ১০ হাত মাত্র। অধিকাংশ বাড়ীর উপরতল ইষ্টকনির্মিত এবং নিতল প্রস্তরনির্মিত ছিল। ইয়াও ২২০২ বৎসর পূর্বে ব্যাস্তাবাট এবং বাড়ী-ঘর-দ্বারের অবস্থা অনেকটা শোচনীয় ছিল। এখন বাড়ী-ঘর-দ্বার অসংখ্যকৃত জল এবং রাস্তা-বাট কতকটা পরিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত। যে রাস্তা ১০২০ হাত লম্বা ছিল, এখন তাহা তাহার দ্বিগুণ হইয়াছে। রাস্তাগুলি সেই এক। অমৃতমি তাহাদের পথ-বাটের সহিত তুলনায় এখনকার পথ-বাট অতি হয়ে বলিয়া মনে হয়। গাড়ী-যোগাট পরের কথা, ‘একা’ও চল না।

মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ এখন অধিবাসী ২৫,১০৬ জন হইবে। হরিদ্বার, জোয়ান-পুর এবং ‘কন্যাস্থল’ হরিদ্বার-মিউনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত। নিজ হরিদ্বার সহরে প্রায় ৪ মাস ছেলেদের বাস। ১৮৮১ সালে ৩০৬৪ জনের বাস ছিল বলিয়া নিবন্ধিত হয়; ১৮৯১ সালে ৭৭৭১ ঠিক হইয়াছিল। ১৮০০ শত লোকের বাস। ‘মিউনিসিপালিটির বাসময়িক আয় ২২ হাজার টাকা হইবে। প্রত্যেক মানুষের আয় দশ, দশান

আপাঙ্গ ট্যাক্স পড়ে। পুণ্ডিয় আছে, জাকসর আছে,—দশ কিন্তু তৃতীয় প্রেমীর। মায়াপুরে টেলিগ্রাফ আফিসও আছে। এখানকার ‘শোভার হাট’ সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তাহারে হইতে এখানে প্রায়ই উট-ও-গোড়া বিক্রয়ার্থে আনীত হয়। উটের দর প্রায় ৪০ টাকা এবং গোড়ার দর ২৫০০০ টাকা। সরকার বাহাদুর দেশী সৈনিকদিগের জন্য এখানে হইতে গোড়া ক্রয় করিয়া থাকেন। বিলাতী-বিশাস-বিদ্য এখানেও প্রবেশ করিয়াছে। বিলাতী জিনিষ মাছা চাহিলে, তাহাই মিলিলে। বা মন-স্থলন। বিলাতী-বিশাসে আত্ম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রও কল্পনিত। ‘পদ’, দানা, ছোলা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয়। পুলিশের এবং সত্বরের খাছোয়াতিসপক্ষে গবর্ণমেন্টের পূর্বাঙ্গপক্ষ অনেকটা ধরদৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। উৎসবের সময় মোকান-দার, ব্যবসায়ের প্রভৃতি এখানে জমী ভাড়া দিয়া কিছুদিনের জন্য দর-বাখিলা থাকে। মিউনিসিপালিটি তাহার ভাড়া আদায় করেন এবং ষাট সমুদ্র, সাতা, পাইখানাও অমৃতমি কাফে করুক-টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। অধিবাসীদের বাড়ী-ঘর ছাড়া, ষাটের উপর প্রস্তর-নির্মিত দানস্কৃতও তেতনা বাড়ী আছে, সে-ও বড় ছোট-ছোট।—
‘হাপতা-কাফে’ যেমন প্রশংসনীয় নহে। এখানে পাহাড় কাটয়া নানা দেহমাধুর নিমিত্ত হইয়াছে। পাহাড় কাটয়া মন্দির,—আবার ‘পাহাড় কাটয়া পাহাড়ে’ আছে সোপান,—এক একটা মন্দির, এবং একটি গিরিগুহাও।

‘হিজিকাণ্ডি’ নামক পাহাড়ে নিম্নে দানদাত। পাহাড়টা নদীর দিকেই ছুটিয়া গিয়াছে। ইহা ‘হরিদ্বার’ বা ‘হরিদ্বারিকাণ্ডি’ ষাটামনে প্রসিদ্ধ। ‘পদ্যসার’ের মন্দির ইহার কিঞ্চিৎ নিম্নে প্রতিষ্ঠিত। এই ষাটে প্রস্তরখণ্ড, হরিদ্বার চতুর্দিক হইতে আছে; হরিদ্বার চতুর্দিকস্থ মন্দিরগুলি ইতি-পূর্বে জলের ভিতর ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। ষাটের উচ্চ প্রাচীরে আর একধনি ‘দীপাবলি’ প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারই নিকটে একটা ক্ষুদ্র মন্দির একটা কূপ আছে,—তাহারই নাম ত্র্যমুকুণ্ড। পূর্বে কূপ-নদী বড়ই কূপ এবং সংকীর্ণ ছিল। চারজন লোক পাশা-পাশি দিয়াইতে পারিতাম। উপরে ৩৪ ফুট উচ্চ।—
নিম্নে ৮৬ ফুট উচ্চ। ৭৩৫১ রাজ্য সিঁড়ি ছিল। উৎসবের সময় ষাটে পূর্বে ভ্রমণক-হুগুনা ঘটিত।

অসংখ্য বাড়ির মতো প্রত্যেকেই সর্বাঙ্গে রান কবির জুড়ি খাওয়া হইত; সুতরাং সকলেই একত্রে এক-দিকে ঘাটের নিক্রে দৌড়িয়া যাইত। সেই সময় জরাজীর্ণ করিয়া অনেকের পড়িয়া-শিখিয়া যাইত এবং অনেকের দুখিয়া মরিত। এই অধিকাংশ দেখিয়া; মহারাজ মানসিংহ একটা ঘাট নির্মাণ করাইয়া দেন। (১) সে ঘাটও জন্মে নষ্ট হইয়া যায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই ঘাট এখনও দুর্গম হইয়া উঠে যে, প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক লোক মারা পড়িত। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এক সৈন্যবর্গ সমাহরণীয়া বাড়িয়াছিল। সেই দুর্গটনয় প্রায় ৫০০ জন লোক বিনষ্ট হয়। এই দুর্গটনা নিবারণ উদ্দেশ্যে যে সময় যে সকল সিপাহী প্রহরিলগ্নে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের অনেকেরই এই সৈন্য-স্বেচ্ছায় সে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। এই সব দেখিয়া বর্গসভায় পর বৎসর বর্তমান ঘাটটা প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইঞ্জিনিয়ার কমিটি ছিল, বিজিউ এই ঘাট প্রস্তুত করিবার ভার পাইয়াছিলেন। সেকেরা আজও তাঁহাকে 'জুড়ি সাহেব' বলেন। এই ঘাটের প্রস্থ ৬০টা ধাপ এবং ইয়া প্রস্থে ১০০ ফুট। (৫)

মেলা।

হরিদ্বারের মেলা অসংখ্যাপার। সে মেলায় সে মহাসমাবেশে প্রচণ্ডে নী-দেখিয়া অপরূপ হইত। এখানে বাড়ীর সমাগম অবিরল। বান্ধবী, মহালাভা, দশহাড়া-প্রভৃতি পর্বসময়ে বাড়ীর সংখ্যা বেশী হয়। মচাচার ২০ লক্ষ লোক দেখা যায়। প্রতি পর্বোপলক্ষে এক একটা মেলায় অধিবেশন হয়। সাতা শৈশাখ মেলায় জাকটা সর্বলোকের আর্দ্রক হইয়া থাকে। এ মেলা তামসিক নহে—পূর্বসাহিক। আকাজকা গঙ্গা-জনি—কল-পাপখানন। বার বৎসর অন্তর কুন্তমেলা হইয়া থাকে।

বার বৎসর অন্তর 'বৃহস্পতি কুন্তে' প্রদেশ করেন। গুণ-বৎসর ১১শে মাস ৪০ দণ্ডে বৃহস্পতি কুন্তে গমন করিয়াছেন; থাকিবেন, এই

বৎসর ২২শে মাস ৪৬ দণ্ড পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে কুন্তমেলায় অনুষ্ঠান হয়। গুণ চৈত্রে বাল্মণে কুন্তমেলা হইয়া গিয়াছে এবং বৈশাখে হরিদ্বারে হইল। শৈশাখ মাসে হরিদ্বারে কুন্তমেলায় অনুষ্ঠান চির-প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ। জর-পূরণে কুন্তমেলা হইয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে একটী ভক্তবাগ্য বুধিয়া হার অনুষ্ঠান করিত হয়। কুন্তমেলায় বাড়িমাংখা গ্রিক করা যায় না। কে গ্রিক করিলে ৭ সোকে-সোতেই অগ্নিমান পড়ি;—নিরবধিই বাত-প্রতিষেদ। এই আশিষ্টকৃত,—এই যাইতেছে,—'হির, ক্রত, চকল, অচল,—অনন্ত-বিস্তার, অনন্তায় শোক-সমুদ্র। অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত অবতরমর ডেউ গথিয়া কি কেহ কিছু নিম্ন করিতে পারে? তবে অতি সাহসিক সাহেবমণ্ডলী সে পক্ষে কখন কখন চেষ্টা করিয়া থাকেন। গণনিয়ম গ্রিক করিয়াছিলেন,—সেবার ২০ লক্ষের উপরও বাড়ী সমাবেশ-হইয়াছিল। আমরা যদি ৫০ লক্ষ বলি, তহা হইলেও আশিষ্টগণকে কেহ অসত্যাবারী বসিতে পারেন না। এখানে পঞ্জাব ও রাজপুতনা হইতেই অধিকাংশ লোক আসিয়া থাকে। পোখামী বৈরাণী, যোগী, এবং উদাসী যে কত আসে, তাহার পরিচয় হয় না। পোখামীর সংখ্যা সর্বলোকেরা অধিক। মুন্সী রত্নসিংহের সময় ইহারা প্রত্যেক প্রাণাধিত ছিল। ইহারা কসম-অধিক করিত এবং শাস্তিহস্তের ভীরু হইত। বৈরাণীরাও কম কসমতাপ ছিল না; তবে পোখামীর নিকটে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কোশানী বর্ষ মেলায় আসিয়াছিল কখন, তখন সৈন্যাদিগের তথ্য-গোচর নিম্নে হয়। পোখামীদের তখনও ক্ষমতা ছিল। এই পোখামীদের অনেকেরই সম্রাটপদে আসে। অনেকেরই অসামান্য নিপুণতা বিরাগী; কেহ কেহ বাবিজ্ঞা-ব্যবসায়ী; অধিকাংশই আবার কৃষি-নিপুণে জীবিকা নির্বাহ করে। পশ্চিমবঙ্গের পোখামীরা শৈব। তাহারা লালবসে রঞ্জিত যুগল পরিধান করেন। মেয়াদী বৈষ্ণব। পোখামী এবং বৈরাণীদের মধ্যে কখন কখন বিবাদ ঘূসা-ঘাওয়া হইয়া থাকে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ষোড়শের যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় ২৭ শত লোক মারা পড়ে। ১৭৬৫ সালে শিখেরা দেশ পোখামীদের হস্তা করিয়াছিল। তৈমুর লজ দিল্লী আক্রমণ করিবার পর হরিদ্বারের অনেক বাড়ী প্রাণাশ রুত। হরিদ্বারের মেলা

সমাপনাতে অনেকেরই বাড়িয়ার প্রদেশে কোদারনাথ ও বৈদ্যানাথের মন্দির দেখিতে যায়।

কনথল।

হরিদ্বারের সহিত কনথলে গুণসম্মত। অগ্রে কনথল—পরে হরিদ্বার। হরিদ্বারের একজোড়া নিয়ে কনথল। এই কনথলেই দক্ষযজ্ঞ-ব্যাপার অস্বস্তিত হইয়াছিল, ইহাই পৌরাণিক প্রসিদ্ধ। কনথলে প্রক্ষে কলোই সেই সভাপুত্রের 'আদর্শ' মহাদায়ী আধ্যাত্মিক সভা, কোথায় কেমেনেদে নিলা অরণ্যে আশ্বিনিসর্জন করিয়াছিলেন, তাহাই কানিতে ঐ-এ-সুখ্য হয়। কিং হায় সে কত কালের কথা!—ও-এ-সুখ্য নিবারিত হইবে কিংবা? তখন কনথল কনথলের সভা-মাংখা; অরণ্যে অদ্বৈত বিপুল পুণ্যক-রিক্তাভিত হইয়া উঠে; আর কেবল সেই কনথলের পবিত্র বস্ত্রাশ্রিত সর্বাঙ্গে মাখিত এবং বস্ত্রাঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যও কনথল অতুলনীয়, সুতরাং একান্ত সন্মানীয়। বাড়ীঘর স্থলর ও স্থপতিত। বাড়ীদের শাকিবারা জন্ত অসংখ্য মন্দির ও বাড়ী আছে। এইসকল বাড়ী মন্দির প্রভৃতি অসংখ্য নির্মিত। সাধু দার্শনিক মহাশয়গণ, বাড়ীদের স্থলর জন্ত এই সকল বাড়ী, মন্দির নির্মিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের মোপান নদীর নিকটে। কোনটা উচ্চভূমারমাণ্ডে, কোন কোনটা নীচে। বা নানা বৈচিত্র্যের পবিত্র মূর্তি অধিক। দেখিলে অতি-বড় অনাচারী অধিক ও বিমোহিত হইয়া যায়। এইখানে স্থাপত্যের কীর্তিকর্মণ উচ্চগৌরবে বিরচিত হইয়াছে। এইখানে স্থাপত্যের স্বাক্ষর-কার্যের অসীম মহিমা কিরণ প্রত্যেকভাবে প্রচ্ছুতি হইয়াছে, তাহা যিনি দেখিবলেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। 'আহা! সবই স্থলর'—সবই বৈষ্ণব!—সবই পরিকার!—সবই পরিচ্ছন্ন!! উচ্চ মধ্যমভূত হুচ্চ-স্থপতিত পৌরাণীয়া সগর্ভে স্থলর প্রবল-প্রবাহে,—অবিরল চকল-চকলে, পর্বত-মার্গার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ভিনদিকের পর্বত-বৈষ্ণব! মরি মরি! স্বভাব-সৌন্দর্য্যের কি অতুলনীয় অদর্শ! মানচিত্রে কনথলের নিয়ে 'দক্ষেশ্বর' নামে যে চিহ্ন দেখিতে পাইবেন, কথিত আছে যে বনোই দক্ষ্যত্র অস্বস্তিত হইয়াছিল। এইখানে একটা মন্দির আছে। এই মন্দিরের চূড়া, একটা ভদ্র

বটরুমের চাপে ভাদিয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখে একটা সমুদ্র-প্রাঙ্গণ পূর্ব দেখিতে পাইবেন। সেই প্রাঙ্গণে একটা খড়ী পৌরাণ্যমান আছে। ১৬৭০ শকে অর্থাৎ ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মৈসালের রাজা এই খড়ীটা উপহার দেন।

মেলায় দৃশ্য।

এবারকার কুন্তমেলায় মহোৎসব সাক্ষ হইয়াছে। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে যে, সে কি মহা-দৃশ্য! সে মহা-ভাব জুলিবার মধ্যে! মনে হয়, মেলায় এই হাংগেজের মরি,—যদি না মরি, আর—যেন কহিতে না হয়। অসংখ্য মৃত্যুর মধ্যে কেবল উত্তরবে,—'জয় পশুমাচারী কী জয়'। সেলে সেলে বড়-উচ্চাণে বান করিতেছে;—দলে দলে রান কবিরার জন্ত উচ্চাণে ছুটিয়াছে। জ্বাঝর অসংখ্য লোক ভাগীরথীর কটীর-কক্সরম কুলে বসিয়া, একবার পরপাশে তাকাইয়া, আবার উচ্চ-নৌতে-দৃষ্টিগোচর করিতেছে। কেবল না হয়। কোথাও দেখিলে—অসংখ্য লোক, নিপুর্ণ সলিলভাটী;—নৌলকধারী ঘাটের নিকট রীর-স্বিত্তভানে সমাগত নিতীক মংস্কল্লংক* নানাবিধ ভোজ্য এবং বিতরণ করিতেছে। কোথায় দেখিলে—অসংখ্য লোক, সেই গিরিওদার* মন্দিরের শিকট সমুদয়ে হইয়াছে। কেহ মন্দিরের ধারে, কেহ মোপানে—কেহবা রাসার ধারে। কোথাও দেখিলে,—যদি রের সম্মুখে ধান-নিময় যোগী মুক্তির-নয়নে বসিয়া আছেন। দেখা-খোঁসি টোনা-টোঁসি অবিরাম। কোথাও বা গিরিদিহারী, মকটমণ্ডলী, কখন বাড়ী-দর্শকনিপুণকে ক্রুটিভয়ে ভ্রম দেখাইতেছে, কখন বা কাহিনীয়া কাহীয়া পথিকের সম্মুখে উঠিতেছে পড়িতেছে এবং কখন বা বাড়ীর ভাঙে মিথিয়া হাই-তেছে কোথাও বা মিঠাই মোগুর অগণিত সৈন্য, লোকের সোকারা*। কোথাও বা খুলের লোকের 'স্বত্বক স্বত্বক স্থলর ভাগুর। কোথাও বা কল-মেলের অধুর্ক বাহার। কোথাও উল্লস সম্মানী পথে

* কীকো কীকো ঘাটের কাছে মাজ আসে। এই সকল মডেক অধিকাংশের মধ্যে নৌলক স্থলনি। চাড়া অসংখ্য ইন্দ্রাণিকের ধরিয়া নৌলক পরাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ সকল মাজ কেহ ধরে না বা মারে না।

পতিত,—কোথাও অনারুদেহে লিপ্সব সম্যাসী
কর্তৃকশায়ায় শায়িত। এই সব দেখিয়া কতক
কিছুক্ষণ সাধব-বিবিস্তাওঁ পথান্ত ত্যক্ত হইয়া
পড়িয়াছেন। কোথাও জীবন্তিগ-কন্যার, ক্লম-ক্লম-
কেশ, দ্বি-দ্বি-বন্যে ভিখারিণ কাতর কল-কল
ভিঙ্গা চাহিতেছে। কেহ ভিঙ্গা দিতেছে, কেহ
না দিতেছে। চতুর্দিকে কেবল অবিচল কল-
কল শোকশব্দেতে বোলাহল। মস্তকোপায় মনন
আরবে পূর্ণন পূর্ণ। এ দুই যে না দেখিরাছে;
বলিতে হয়, তাহার জ্ঞান বৃথা।

এবার বোধ হয়, বাস্তবিকের সংখ্যা কোটির কম
নহে। পাঞ্জাবী, পাহাড়ী, হিন্দুস্তানী প্রভৃতি কে
কত আদিয়াছিল, তাহার সংখ্যা কে বলিতে? তবে
বাসনানী-কর্ণপোকা কন বটে। অসংখ্য সম্যাসী,
যোদী, উদাসী, বৈরাগী, দলে দলে আদিয়া-
ছিলেন। কপির রাজা, সিদ্ধিহার রাজা প্রভৃতি
কত রাজা মহারাজ এই মেলায় পূর্ণাঙ্গাঙ্গ করিয়া
গেলেন, তাহার ইহতীকা? ধর-তরবারি-হস্তে লুণ-
ধিক উল্লস নাগা সম্যাসী, ৫০০০ হাজার, জুনাগড়ি
সম্যাসী, ২০ লক্ষ উদাসীন, ব্রহ্মচারী ও পরমহংস
“ভয়-পদমাসী কী জয়” রবে হরিবার প্রকম্পিত
করিয়া তুলিয়াছিল। ৭ হাজার মেঘন গিয়াছিল।
১৫১৬ হাজার পুণ্ড্র-প্রবর্তী নিত্য পাহারা দিত।
পুণ্ড্র-প্রবর্তী ছাড়া একদল সৈনিক পুণ্ড্র কামান-
মুখিও গিয়াছিল। সুরকার প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট
হইতে—এক আনা করিয়া পয়সা লইয়াছিলেন।
দ্বারাবারী-বন্দে, ৫০০০ তামা পুণ্ড্র ও প্রভৃতি হইয়া-
ছিল। রাতি ৩টা হইতে পরদিন বেলা ১টা পর্যন্ত
দান-দামায়ে চলিয়াছিল। এখন সাধু-সম্যাসী,
বিরাদী, যোগীর দল,—তাঁহার গর গৃহঘরে দান,
দেখায়ে রাখা সমস্তক আনিতেছিলেন; কিন্তু
কেনা পায়, টাঁককে, অত সৈন্য লইয়া আনিতে
দেশে গুণ হয় নাই। এখন নাগা সম্যাসীগণকে তর-
বারিগর হাতিতে নিষেধ করা হয়; কিন্তু তাঁহাদের
নিরীক্ষিত্য নিষেধ-রহিল না। এবার ৭ জন সম্যাসী
গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিয়াছিলেন। হুইটন মাত্র বন্ধা
বাহিয়াছেন। ওয়ারানবী ধামের সেই শতাব্দিক-
পুণ্ড্র, বহুত্যা মিত্তকানকশায়ী মস্তকায় শত
বৃক্ষের বন ধারণ করিয়া মহানন্দে মহা-দান করিয়া-
ছিলেন। ভাসু,—বুধে, ব্যাপার কি। আবার বার
বৎসরের জন্ত নিশ্চিন্ত

মণিপুরে বিভাত।

আর সন্দেহ সংশয় নাই; হুইটন প্রভৃতিকে
সত্য সত্যই প্রাণ দিতে হইয়াছে। আমায়ের চাঁদ
কমিশনের হুইটন, তাঁহার পার্শ্বের কজিল, মণি-
পুরের পণ্ডিতকে একটু গ্রিমউড, সেনানী কর্ণেল
স্টান, তাঁহার সহকারী গিম্ফন এবং টেলিগ্রাফের
মেসজিও ওভিয়েন—কয়জন সাহেবকেই মণিপুরে
প্রাণ দিতে হইয়াছে। কিন্তু সাহেব কয়জন যে, হত হইয়াছেন,
দিকেরে প্রাণ দিতে হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তথ্য
পাওয়া যায় নাই। পলায়িত সৈনিক সেনানী এবং
অজ্ঞাত হুই জনের মধ্যে যিনি যে গুলি ডনিতেছেন,
তিনি তাহাই প্রচারিত করিতেছেন। সেই আশা-
রিকার নির্ভর করিয়া নানাভাবে নানারূপে মীমাংসা
করিতেছেন। কিন্তু সাহেব কয়জন যে, হত হইয়াছেন,
সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নাই; মণিপুরের
বর্তমান রাজাও নাকি হত্যার কথা বলিয়া
পঠিয়াছেন।

ক্যাপ্টেন বনু দমল লুইয়া, গ্রিমউডের মহিষকে
সঙ্গে লইয়া, মণিপুর হইতে কাছাড়ে পলাইয়া
আদিয়াছেন। আদিয়া বাসিয়া গিয়াছেন, তাহা
বুঝা যাইতেছে; হুইটন যে, সুব্রাজ-সেনাপতি
টীকেশ্বরজিও প্রেস্তার করিলেন, তাহা মণিপুরের
টীকেশ্বরজিও প্রাণেই জানিতে পারিয়াছিল। কোন কোন
এংলেইণ্ডিয়ান পত্রসম্পাদক বলিতেছেন,—এক
সংবাদ কলিকাতা হইয়াছে। সেই সংবাদকে বলিয়া-
ছিল,—মণিপুরে শীঘ্রই একটা ব্যাঘ হত হইবে।
ইহাতেই নাকি বুঝিতে পারা গিয়াছিল,—ব্যাঘ
অর্থাৎ টীকেশ্বরজিও হত হইবেন। কিন্তু কলিকাতা
হইতে কোনরূপ সংবাদকে বা স্রষ্টাৎকৃতিক
সংবাদ না দেখেও হুইটনবাহার উদ্বেগ মণিপুরী-
দিগের জ্ঞানিতে বাধিত ছিল না। হুইটন, সেনানী
ও সৈন্য লইয়া, বাহিতেছেন দেখিয়া-মণিপুরীরা ইংরে-
জের মন অভ্যস্তিক বুঝিতে পারিয়াছিল; টীকেশ-
্বরজিও সাধারণ হইয়াছিলেন। তাহার গর যখন
হুইটন মণিপুররাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখায়া
প্রদায় লোকজন রাখিয়া—তার আফিসে উইগি-
মহাকে রাখিয়া—সদয়ক সাধারণে মণিপুরনগরে
প্রবেশ করিলেন, তখনই সেনাপতি টীকেশ্বরজিও
বুঝিলেন, পতিক জ্ঞান নহে। তিনি চতুর, দূরদর্শী

ও বুদ্ধিমান লোক। নিজে সাধারণ হইলেন;
আর সহস্রকেও সাধারণ করিলেন। ইংরেজকে
কিছু বলিবার যো নাই; মণিপুরে দুর্গপ্র, ইংরেজ
প্রশ্রল।

তৎপরে হুইটন, সৈন্যে মণিপুরনগরে প্রবেশ
করিয়াই, যখন লুপ্তরে দরবার বহায়াইর আজ্ঞা
দিলেন; দরবারে রাজা ও সেনাপতিকের হাজির
হইতে ভয় দিলেন; তখন সেনাপতি টীকেশ্বরজিও
নিশ্চিত বুঝিলেন, আমাদের প্রেস্তার করাই হুই-
টনের উদ্দেশ্য। রাজা কুলচন্দ্রও বুঝিলেন, মণি-
পুরের ভাণ্ড অঙ্গসম হইয়াছে। তথাপি কুলচন্দ্র
হুইটনের আদেশ শিরোধার্য করিলেন। নিজে
দরবারে হাজির হইলেন। কিন্তু হুইটন তাঁহার
স্বামল ছিলেন না। বরং কেহ কেহ বলিতেছেন,
ইংরেজের সৈনিক সেনানীরা তাঁহার উপর ধ-
নঞ্জর রাখিলেন। যারবার দরবার বলিল; কিন্তু
সেনাপতি টীকেশ্বরজিও একবারও হাজির হই-
লেন না। কে বল সাধ করিয়া সিংহের বিপরে
প্রবেশিতে চায়? টীকেশ্বরজিও প্রেস্তার করিয়া
অজই যে, দরবারে আসোজন হইয়াছিল, তাহাতে
ত আর সন্দেহ নাই। আর টীকেশ্বরজিও যে, তাহা
বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও ত নিশ্চিত।

টীকেশ্বরজিও দরবারে হাজির হইলেন না; সাধ
করিয়া সিংহের মুখে আত্মসমর্পণ করিলেন না;
বেশিয়া সিংহদুত হুইটন সিংহদুত ধারণ করিলেন;
সেনাপতি টীকেশ্বরজিও তাঁহার প্রাসাদ হইতে
ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। হুইটনের
আদেশে সেনাপতি স্টান প্রাসাদজামে সৈন্য
পঠাইলেন; জেনেলেবরী বাসকে, সেনা সমি-
ত্যাচারে সুব্রাজ-সেনাপতির বীরত্ব, আক্রমণ
করিলেন।

বুটম পক্ষে, পলায়িত সৈনিকেরা একব্যকো
বলিতেছে; বুরাজের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া
আক্রমণকারী সৈনিকেরা বুরাজের অস্ত্রপূর্ব
মহিলাদিগকে—বালক বালিকা ও শিশুদিগকে
পৃথক—কাটিয়া ফেলিয়াছিল; তাহাতেই বুরাজ
অর্থ আক্রমণে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ছিলেন;
তখন শেষে হুইটন প্রভৃতিকে কাটিয়া ফেলিত
হইল গিয়া ছিলেন; কেননা তিনি বুঝিয়াছিলেন
ইহাঙ্গিরের আদেশেই স্টান ও শিশুগণের আ-
স্রিত হত্যা সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহাঙ্গিরের
ক্যাপ্টেন বনু উদ্বেগে, প্রাসাদজামে পদা-

জিত, হইয়া, ইংরেজসেনা বেসিজেসিতে আসিয়া
আশ্রয় লইলে, মণিপুরীসেনা প্রত্যাক্রমণে বাহির
করিল; তাহার আশ্রিয়া বেসিজেসিতে অবরোধ
হইল।—বেসিজেসিভন অধিকার করে করে, এমন
সময়ে হুইটন প্রভৃতি বাহিরে আত্ম হইলেন;
তথায় গিয়া মণিপুরী সেনাপতির সহিত কথাবার্তা
কহিতে লাগিলেন। আর সেই সময়ে তাঁহার বদি-
ভানে রাজপ্রাসাদে নীত হইলেন। ইংরেজ বনি-
তেছেন, তাহার পরই হুইটন প্রভৃতি হত্যা হই-
য়াছে, কিন্তু উভয় পক্ষে যে, বিবাদ ঘটয়া হইয়াছিল।
তাহাও বনু অধিকার করিতে পারেন নাই।
কে জানে, স্টান ও শিশুগণের হত্যা উপ-
লক্ষেই হুইটন প্রভৃতির সহিত মণিপুরী সেনা-
পতির সেই সময়ে বিবাদ ঘটয়া হইয়াছে? কেহ
কেহ বলিতেছেন, এই বিবাদ উপলক্ষেই সেনাপতি
হুইটন প্রভৃতিকে হত্যা করিয়াছিলেন। বেসি-
জেসিভন ডে-ক্লারক রমিকশাল বহু বলিতেছেন,
হুইটন প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা হইয়াছিলেন।
কথাটা যে, একবারেই অসম্ভব, তাহা কিন্তু
স্বীকার করিয়া? রাজা কুলচন্দ্রও ত বলিতেছেন,
ইংরেজ-সেনা বেসিমিয়ারি নথ-ভদ্র বসিয়াছিল
হইয়াই, মণিপুরীরা ক্ষিপ্ত হইয়া হুইটন প্রভৃতি
হত্যা করিয়াছিল। কলত হুইটন প্রভৃতি প্রাণে
বশীকৃত হইয়া, পরে নিহত ভাবে হত হইয়াছেন,
ইহা এখন আমাদের অসম্ভবচিত্তে বিশ্বাস করিতে
পারি নাই।

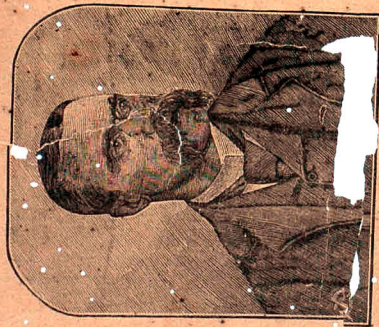
হুইটনের সঙ্গে ছিলেন কজিল, স্টান, গিম্ফন
এবং পণ্ডিতকেল গ্রিমউড। ইহারা হত এক
সঙ্গেই হত হইয়াছেন। টেলিগ্রাফের মেসজিও
এবং ওভিয়েন হানান্তরে বশীকৃত হইয়াছিলেন;
বোধ হয়, সেইখানেই হত হইয়াছিলেন। মনে
হইতেছে, তাহার অঙ্গরক্ষা করিতে গিয়াই মণিপুরী
সৈনিকদিগের হাতে হত হইয়াছেন। কোন কোন
পলায়িত সৈনিক-বলিতেছে, পুথ সাহেবলোকের কাটা
হাত পা দেখিয়াছিল। কথা সত্য হইলে, উহার
যে, মেসজিও এবং ওভিয়েনের ছিহ হস্ত পদাদি
দেখিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে হ্রাস সন্দেহ নাই।
টেলিগ্রাফের উইগিমস ছিলেন মেসজিও থানা
ভিত্তিক কহিয়া ফিরা গিয়াছেন; তাহার আশা-
মিত্তাও প্রচারিত হইয়াছে। আমরাও অতি সংক্ষেপে
সেই আখ্যায়িকার আভাস দিতেছি। উইগিমস
বলিতেছেন,—

আসামের চাককিশানর মিঃ কুইটন সাহেব।



মণিপুর-যুদ্ধে নিহত।

নৈজাধ্যক্ষ স্কট সাহেব।



মণিপুর-যুদ্ধে নিহত।

কলিকাতা সিলেট ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬/এম. ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০৩১

জন্মভূমি।

১ম ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ। ১২২৮। } ৩ষ্ঠ সংখ্যা।

স্বতীশাস্ত্র বেদমূলক কি না?

বঙ্গবাসিন হইতে বঙ্গদেশে বেদচর্চা নাই। শুধু বঙ্গদেশেই বা কেন? বেদের প্রকৃত চর্চা কোন দেশেই নাই বলিলেও অত্যাধিক হয় না। মিথিলা ও মহারাষ্ট্রে বেদের নাম মাত্রে বহুল প্রচার থাকিলেও অর্থ বুঝিয়া বেদপাঠ অতি অল্প লোকেরই করেন। কেননা অর্থ বুঝিবার আবশ্যকতা ইহারা ততটা বোধ করেননা। বেদপাঠগ্রন্থ—

“হস্তাশ্রুতিঃ স্বরাদভ্যস্তা ন বেদফলমশ্রুতে।”
এই শাস্ত্রীয় বচনের উপর নির্ভর করিয়া বেদপাঠে হস্ত স্বর স্থির রাখাই একমাত্র কর্তব্য বোধ করেন। অর্থ গ্রহণ বুঝক আর নাই হউক। কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান উচিত অর্থজ্ঞান ব্যতীত হস্ত স্বর স্থির রাখা বড়ই কঠিন। সম্প্রদায় দ্বারা, অর্থজ্ঞান-হীন ওরমিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রম-প্রমাণে, পুস্তকের মাসেক-তিক চিহ্নের (বহুদ্বারা বেদপাঠগ্রন্থ, হস্তমুদ্রা ও স্বর জ্ঞাত হইয়া থাকেন) ব্যতিক্রম মনেই রাখে। এতদ্বারা একেবারে যে না ষটীয়াছে তাহাও নহে। এসময়ে ধারের রাজপুত্র শ্রীমুক গণেশশাস্ত্রী এক বিস্তৃত গ্রন্থ নিখিলাস্তিত। সে গ্রন্থ আজিও মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু তাহাই হউক, চৈতন্য বিদ্যুতের নাই। ব্রাহ্মণ্যের বেদাধর্ষচর্চা যেমন কথিয়া আগিতছিল, সেইরূপই কমিতেছে। কিছু দিন এইরূপ ভাবে চলিলে, ভারতের বেদ ভারতের সম্পূর্ণ হুগুণেই হইবে; সন্দেহ নাই। দেশে অধিকারীর কাছে বেদের এই হুগুণ; কিন্তু বিদেশে অনুদিকারীর কাছে বেদের বেশ আদর। ইউরোপে

অনেক স্কুলেই এখন বৈদিকচর্চা হইতে চেষ্টা করিতেছেন। ‘আগোচনাও অনেকটা ইহাও। কিন্তু বিদেশে বেদের এই আদর, ডিপ্লোমারিগের নিকট যেমন চালানো স্থান, শৌনিকের হস্তে যেমন শুক-সারিকার বা দ্বিগুণে দ্রব্যের নিকট যেমন পবিত্রের আদর তদ্রূপ। বিদেশী বিশ্বদ্বিগুণ, বেদের আদর করেন,—মহাযোের ‘আগিন অবস্থার গ্রন্থ বলিয়া ও অদ্বতা কৃষ্ণের মূল সঙ্গীত বলিয়া। শাস্ত্রে কথিত আছে,—

“ঐশ্বর্য-বিজ্ঞানবদনং ত্রয়ী ন ত্র্যতপোচারা।”
বেদ, ত্রী শ্রু ও অধম ত্রিজ্ঞের অধরণোধ্য ও নহে। অধ্যয়ন ত পরের কথা। যাঁহা উনিতে শ্রুয়ের পণ্ডিত অধিকার শাস্ত্রে প্রকৃত হয় নাই; শ্রু অধুনা নীচতম জাতি ব্রহ্ম তাহা পাঠ করিয়া শাস্ত্রীয় নিয়মের কারণ উদ্ঘাটন করিয়া পিত্তেছে। পূর্বে সাধারণের বুঝিবার উপায় ছিল না, শাস্ত্র, ত্রী শ্রুতিকে বেদগুণে অনুধিকারী করিয়াছেন কেন? এখন কি উপায় হইয়াছে। পণ্ডিত-বেদ স্কুলেজাতির বেদমূলক, বিকৃত, ব্যাখ্যা, বিকৃত সমালোচনা দেখিয়া-ভনিম্মা শাস্ত্রের তাৎপর্য একই তলাইয়া দেখা উচিত।

“বিভক্ত্যজ্ঞাতং হেতুকা সাম্যক প্রাধিক্যতি।”
“অজ্ঞানজ্ঞানিগের নিকট বেদের মার খাইবার” ভয় বিলম্বন। ইহাদের দেখেদেখি, বঙ্গ বোরে প্রদেশেও এই জাতীর বেদপাঠ্যক প্রাচুর্য আর কাল অনেক। ইহাতে যে শুধু বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা ও বিকৃত সমালোচনা ইহাও তাহা নহে; পরন্তু এই সকল বেদসাধারণ-বিলোড়ী মহাপুরুষগণ, তারপরে বলিতেছেন, “স্বতীশাস্ত্র বেদমূলক নহে; বাস্তব-বিবাহ, দর্শনসাধন, স্ত্রীজাতির অবতারপ্রথা

প্রভৃতি বস্তুর ধর্ম ও নিয়ম বর্ণনামত নহে;—
স্মৃতি শাস্ত্রকারিগণের উহা কখনোমাত্র।

এখন দেখা যাক “স্মৃতিশাস্ত্র” সম্বন্ধে একটা
সেবারো কথা কিয়ৎ কি? কিন্তু এ বিষয়ের
নীতিমালা স্বতঃসহজ নহে। সমুদয় বৈদ্য কৃষ্ণ
হইলে একটা কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায় নাই, কিন্তু
তাহা বর্তমান কালে ঘটিতেই পারে না। হস্তরাজ্য
আমরা পূর্বাচার্যগণের পদানুসরণ করিয়া দেখিব
তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্রে কিরূপভাবে প্রয়োগিত;—

পরশসূক্তমহিতর বাধ্যাকর্ত্তা মাধবাচার্যের নাম
বোধ হয় অনেকের জানেন। তাঁহার ছাত্র সর্গশাস্ত্র
পণ্ডিত, সমস্ত সংসারের মধ্যে অতি অমূল্য জ্ঞানগ্রন্থ
করিয়াছেন। তিনি সকল বিষয়েই প্রায় গ্রন্থ রচনা
করিয়ছেন। বায়ুপ্রদীপ (ব্যাকরণ), কামাখ্য
(কোটিগ্রন্থ), সর্গসন্দর্শন-সংগ্রহ, দর্শন পরামর্শ-
ভাষ্য (স্মৃতি)। তৎপ্রতিষ্ঠাই এই সমুদয় গ্রন্থই এক
একটা বিশেষ এক একটা অমূল্য রত্ন। ইহারিগণের
নাম বিদ্যারামস্বামী। মাধবাচার্য বিজয়নগর-রাজের
কুল-ভক্ত ও মন্ত্রী ছিলেন। রাজা বুদ্ধন তাঁহাকে
বেদভাষ্য রচনা করিতে আদেশ করিলে, তিনি পীর
জাতা সামান্যচার্যকে সেই কার্যের ভার দেন।
কেহ কেহ বলেন, এই সামান্যচার্য ও মাধবাচার্য
একব্যক্তি। আবারও এই মত। সামান্যচার্য উপর
বলিয়া মাধবাচার্যেরই নামান্তর সামান্যচার্য।
—মাধবাচার্য, স্কৃত সর্গসন্দর্শন-সংগ্রহে “শৌভ-
সম্মান-ভুক্তিকৈশিক্ত” বলিয়া আশ্ব পণ্ডিত
ছেন। ১৩৭৭ সনতে মাধবাচার্য বর্তমান ছিলেন।
ছয় শত বৎসরের প্রাচীন সর্গশাস্ত্রজ্ঞ এই মহা
পণ্ডিত, পরশসূক্তমহিতর ভাষ্যরচিত স্মৃতিশাস্ত্রের
বেদমূলকতা সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, প্রথমতঃ
তাঁহারি প্রদর্শন করাইতেছে;—

মাধবাচার্য, প্রথমতই পূর্ণপক্ষ করিয়াছেন;—
পরশসংসর্গহিত বাধ্যা করবার অযোগ্য। কেননা
এই স্মৃতি বৈদমূলক নহে। পৌরুষে অর্থাৎ
মহুদ্রাকৃত স্মৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে
বৌদ্ধিক স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়।
“ইত্যং বসন্ত” “ন হ্যায়ং প্রাগৈবমুজ্জীত” প্রভৃতি
বৌদ্ধিকসম্বোধক অজস্রমূল্য পালন করিতে হয়।
বসন্ত: কিন্তু মহুদ্রাকৃত অষ্টপ্লুতক সিন্ধাত্তঃ উপর
কখনই বিশ্বাসস্থাপন করা যাইতে পারে না। কারণ—
“প্রমুদেয়াবৃতিবিদ্যাং পুংসাং জ্ঞান্যাসিন্দুগতং।
চোদনান্দ্রপল্লবশ্চৈব অস্মাত্রাজ্ঞা প্রণামতাঃ”।

ভাষ্য:—সমুদয় পক্ষ অনেকেই অসত্যবাদী;
যাহারা সত্যবাদী, উন্নতপ্রাণ সত্যবাদী ভাস্কর্য্যগণেরও
আছে। অষ্টপ্লুতক বিবিধাদে সন্নিহিত অধিকার
নাই। তবে প্রকৃতভাবেই মহুদ্রাবাক্যের প্রামাণ্য।
প্রজ্ঞা হয় মহুদ্রাবাক্য প্রমাণবোধে গদ্য করিলে;
না হয় না করিলে।

কিছু বৈদ্য-অঙ্গীরবেদ্য, দ্বিধর-প্রকৃতিত,
মহুরাজ্য অজ্ঞাত। বৈদমূলক ধর্ম প্রামাণ্যিক ও
যে শাস্ত্র বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাও প্রামাণ্যিক।
যাহা বেদত্যাগ্যত্যাগী নহে, বা বেদবিগত, সে সমুদয়
শাস্ত্র ও ধর্ম সম্পূর্ণ অপ্রামাণ্যিক। পরশসংসর্গহিতা
যে বৈদমূলক এবিষয়ে যখন কোন প্রমাণ নাই;
তখন এ অমূল্যক অসীকরণোপদেশক শাস্ত্রের
বাক্য্য করিবার প্রয়োজন কি? এই পূর্ণপক্ষের
উক্তর তিনি বহুং বাধ্য করিয়াছেন, তাহা এই;—

১। “পরশর ব্যাক্তমসিক ছিলেন, স্কৃতও
তাঁহাকে, অসত্যবাদী ও ভাস্কর্য্যগণের দোষেই
যায় না। পূর্ণকারিকা গরা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে
যে, মহুদ্রাশ্ব অনুতত্ত্বা ও প্রমাণাদিসূত্র, অতএব
তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস-করা যায় না। পরশর যদি
উক্ত পোষাক্রান্ত না হইতেন, তবে তাঁহার কথায়
বিশ্বাস ও প্রামাণ্য জ্ঞান না করিলে কেন? তিনি যে
অপ্রামাণ্যিক ছিলেন তাহা প্রকটন করিবার জন্য তপী
জন্মসম্বন্ধে শৌর্য্যশিক ইতিহাস—ভাষ্যকর্ত্তা উক্ত
করিয়াছেন, তাহার সারসংগ্রহ এই;—বিবাসিত্রের
মতই বসিষ্ঠের বিবাস নহে, তাহাতে বিবাসিত্র,
বসিষ্ঠের একশত পুত্র নয় করেন। এ সমস্ত তাঁহার
কোটিপুত্রবৎ অসংসৃত ছিলেন। বসিষ্ঠ কিন্তু তাহা
জানিতেন না। বসিষ্ঠ পুত্রশোকে কাত হইয়া মৃত্যু
কামনায়া আত্মা ত্যাগপক্ষ বহির্ভূত হয়। তাঁহার
সেই কোটিপুত্রবৎ অষ্টপ্লুতক ও অবশিষ্টভাবে তাঁহার
অনুসরণ করেন। কিয়দূর গিয়া বসিষ্ঠ অকাল
বেদকনিষ্ঠিতে পাইলেন এবং তাঁহার কোটিপুত্রের
হরের ছায় বোধ করিয়া বিমিত্তভাবে পশ্চাৎগণে
চলিয়া দেখিলেন। গৃহস্থলেন, তাঁহার পুত্রবধূর
পক্ষাইতে বেদধর্মনি নিষ্পত্ত হইতেছে। এইরূপে
তিনি পীর-বংশ লোপ হয় নাই জানিতে পারিয়া
অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সাহিত্য-পুরাণ-রচয়িতা
এই পরশর অনুসরণের সেই পুত্র। পুরাণায়মার
পরশর আভ্যাসিক; ইতরাজ্য ভ্রমারি বোদ্ধব্য।

২। বেদের পরশশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। বেদ
বিধি;—মহু ও ব্রাহ্মণ—মহু ব্রাহ্মণবাক্যকে বেদে।

ব্রাহ্মসনৌ শাখায় শতপথ ব্রাহ্মণের দুহস্তাব্যাক্ত
উপনিষদে কবিত্ব আছে;—নিখিলাধিপতি রাজার
জনক পদম ব্রহ্মকর্ত্তা ছিলেন, তদানীন্তন স্থাবিধাত
পণ্ডিতগণ ও তপোনিষ্ঠ ঋষিগণ একত্রিত হইয়া
তাঁহার সমাজে ব্রহ্মবিষয়ক বিচার করিলেন। এই
প্রস্তাবে পরশরের নাম পাওয়া যায়। কথা—

“স হোবাচ ব্যাসঃ পারশরায়ণঃ।

“পরশরপুত্র ব্যাস বলিতে মাগিলেন।”
ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণ ও মন্ত্রভারতের প্রণেতা
হইয়াও, বেদ-বিশ্বাকর্ত্তা হইয়াও, যখন উক্ত শ্রুতি-
বাক্য্য “পরশর” নামে পরিচিত হইয়াছেন,—
কিন্তু অল্প কোন বিশেষণে বিশেষিত হইল নাই,
তখন পরশর যে একজন “অভিভাব্যভাসদামস”
সুখীভাব মাননীয় মহাবি ছিলেন, তাহাও কোন
সূত্রহই ধাক্কিতেছে না। আবার ব্রাহ্মসনৌ
সাহিত্যের বংশ-ব্রাহ্মণ, ওদ্যাদিশাস্ত্রকারের নামে—
ব্রহ্মকোষে পরশরের পৌত্র দুষ্টকোষীয়গণ “হুত-
কৌমিকঃ পারশরায়ণঃ” বলা হইয়াছে। দুষ্টকৌমিক
একজন হুত্রাঙ্গি বৈদমন্ত্যপ্রাপ্তক হইয়াও
এই ভ্রমারক্ত তাঁহাকে “পারশরায়ণঃ” এই
বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। বেদের “মিকট
এইরূপ সমস্রাণে পরিচিত মহুদ্রমূলক পদসত্য
বাসিত্য ও ভ্রমপ্রমাণদি বোধ যাক্কিতে পারে না।

বসিষ্ঠ অত্রি রাজ্যবাক্ত প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের
সম্বন্ধেও এই বুদ্ধিই অস্বলবনীয়। বসিষ্ঠ ও
অত্রিসম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সাহিত্যের এইরূপ উল্লেখ
পাওয়া যায়।

বসিষ্ঠসম্বন্ধে কথা,—

“অথো বা ইত্মং নাপনম-তঃ বসিষ্ঠঃ প্রত্যাক-
নপশত। সোহবতীং ব্রাহ্মণঃ তৈ ব্রাহ্মণি যথা
বৎপুত্রোহিতাঃ প্রজ্ঞাঃ প্রজনিত্যন্তে অথ মেত্রেভ্য
কথিত্যো না প্রবেচ ইতি। তথা এতান স্তোম-
ভ্যাম্ভান তথা ততো বসিষ্ঠোহহোহিতাঃ প্রজ্ঞাঃ
প্রজ্ঞায়ন্ত তন্মহা বসিষ্ঠো ব্রহ্মকর্ত্তাঃ।”

অত্রিসম্বন্ধে—
“অত্রিসদ্যাদৌর্দ্যায় প্রজ্ঞাং পুত্রকামায় সরি-
চাত্তেহস্তং। নির্য্যদ্যৈ শিথিল্যো যাতাম্যাস স এতৎ
চতুরাশমশ্রুৎ তথাইংং। সোহযজ্ঞত ততো বৈ
তত চত্বারো বীরা অজ্ঞায়ন্ত সুরোহতা হৃদ্যতা
স্বকর্ত্তাঃ স্বকর্ত্তাঃ।”

তৈত্তিরীয় সাহিত্য।

উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিজে তাহার একটা উক্তত হইল।

“অথ হ্যবজ্ঞানব্রাহ্মণে ত্যে ভার্যে বহুব্রহ্মণঃ।”
মাধবাচার্য্য, এইরূপে সামান্য-মান-মহুদ্র
অনুভাসিতার্থি বোধ ঋষিগণের ধাক্কিতেই পারে
না ইহা প্রমাণ স্বতঃ তৎসম্বন্ধে অপ্রামাণ্যিকত্ব
সম্বন্ধে দূর করিয়া পরশর ও অপরপর সম্ভিতর
বেদমূলকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি বলেন,
স্মৃত্যুক্ত সমস্ত বিধি, যিগি ও এখন বেদে দেখিতে
পাওয়া যায় না, তথাপি উহার সকল ভবিষি যে
বেদমূলক, তাহিহয় সম্বন্ধে নাই। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ,
ভূতযজ্ঞ, মহুদ্রযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ—এই পূর্ণ মহা-
যজ্ঞের বিধি স্মৃতিশাস্ত্রে আছে; ইহা বৈদমূলক।
কারণ বেদে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বসিষ্ঠ।
“পদক ইত্যে মহাযজ্ঞঃ। সত্যতঃ প্রত্যয়ন্তঃ।
দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো মহুদ্রযজ্ঞো ভূতযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ
ইতি। যদগৌ জুহোতাসি সমিধং তদেবযজ্ঞঃ সাক্তি-
ভেদে, যং পিত্রেভ্যঃ স্বধাক্কিতেহইতমং পিতৃযজ্ঞঃ
ইত্যাদি।” (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)।

মাধবাচার্য্য পুত্র বলিয়াছেন,—বেদের অনেক
শাখা বিলুপ্ত হওয়াতে, স্মৃত্যুক্ত অনেক বিধি
মূল-বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। না দেখিতে
পাইলেও তথা বৈদমূলক বা অপ্রমাণ নহে;
—বৈদিকঃ মধ্যমাদানি বোধ যাক্কিতে পারে না।

সম্ভাব্য বৈদমূলক্যঃ স্মৃতিয়াং মানতোচিতাঃ”
বেদজ্ঞ ঋষিগণের স্মৃত বলিয়া এই বৈদমূলক,
শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই সমান জ্ঞান করেন বলিয়া;
ধর্মশাস্ত্রের সকল অংশই যে বৈদমূলক, ইহা বিলম্ব
সম্পন্ন নয়। হস্তরাজ্য কদাচ অপ্রমাণ নহে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—
“শ্রুতিং পশ্যি মুনয়ঃ যরস্তি চ তন্ম স্মৃতিম্।
তন্মহা প্রামাণ্যমভ্যং প্রামাণ্যঃ প্রপীতঃ স্মৃতিম্।
শ্রুতি-সাংখ্যিকংকারিও মুনিগণ করিয়াছেন;
স্মৃতিও সাংখ্যিকগণের স্মৃত শাস্ত্র; সর্গশাস্ত্রের
কথিগণ যখন উভয়েই ভূতলেন প্রচাণ করিয়াছেন,
তখন উভাই (শ্রুতি-স্মৃতি) প্রমাণ। অতএব—
“যে ন মস্তেত তে হুতং হেহুশ্রুতসম্যগায়ঃ।
স ময়ুভিঃ হিকার্যো মাস্তিক্যো যেনানিকঃ”।

(মহু)
কিছু, মহু, দুহস্তাব্যাক্ত নাম বেদে ভূরি ভূরি
আছে। এতদ্বিধ অপর স্মৃতিকারগণের নামও বেদে
আছে। মাধবাচার্য্য তাহা স্মৃতিত্ব না দেখাইলেও
আমরা জেনে তাহা দেখাইব।

“যে ব্যক্তি বৃহৎশাস্ত্র অস্ত্রয় করিয়া প্রতি-
স্মৃতি অবলোকা করে, সেই বৈদ্যনিম্নক নাস্তিককে
বাৎসব বুদ্ধিত করিয়া দিবে।”

“ধর্ম্ম জিজ্ঞাসমানানি প্রমাণ পরম স্মৃতি:
দ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র তৃতীয় লোকসংগ্রহঃ।”

(মহাভারত অমৃত্যুশাস্ত্র পূর্ব ১)
ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে হইলে স্মৃতিকে প্রথম-
প্রমাণরূপে, স্মৃতিকে দ্বিতীয়প্রমাণরূপে ও লোকা-
চারকে তৃতীয়প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে।

বিশেষতঃ বেদ যখন বিলুপ্তহীন,—

“যে বিকিন মনুরবৎ তত্ত্বজ্ঞঃ” মহা যাহা
কিছু বলিয়াছেন, তৎসমস্তই হিতকার। অন্তঃ-
বাহ্যার বৈদ্যকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহা-
দিশের মনুষ্যই অমৃত্যু করিবার পোতা নাই।
তবে সেই মনুর সমানার্থক, অবিদ্যার স্মৃতি না
মানিবে কিরূপ?

আর এক কথা এই যে, কলিগণ পরম ধার্মিক
ও বৈদ্য ছিলেন। বেদকে তাঁহারা স্বপ্নেরে সমান
মান্য করিতেন; অন্তরের সহিত গুজা করিতেন;
বাহ্যার বৈদ্যকত্ব কর্তৃক করিত, তাহাদিগকে সমাজ-
বহিষ্কৃতও করিয়া দিতেন। কেইবা ব্যাধিরে, কোন
নাথদিকির উদ্দেশে, সৌ স্বার্থনিশ্চয় বনবাসী
কলিগণ, স্বপ্নশীত ধর্ম্মশাস্ত্রে বৈদ্যবিরক্ত, বৈদ্যব-
মোচিত কার্যপ্রণালী—তাঁহাদিগের চক্ষু অন্ধরূপে
প্রতিভাত হইলেও, সাধারণকে বন্ধন করিবার
জন্য ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রচার করিতেন। এই সকল
মুক্তি প্রদর্শন করিয়া মাদব্যচার্য্য স্মৃতিশাস্ত্রের বৈদ্য-
মূলক প্রতীপচন করিয়াছেন। যিনি বেদের
আমাধারন ভাষ্যকর্তা, সর্লশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মনো-
পন্থিত; তিনি অন্যায়সে স্বাকার কল্পিতছেন,
বেদের অনেকাংশ লুপ্ত—আমরা সন্মুখ হইতে অগত
নাই; সেই উদ্ধৃত স্মৃতির সন্ধান লব দেখিতে পাই
না। আর একজন বাহ্যার বেদের ইহারাজী অস-
বাদ পড়িয়া বা পলিমনসে নিয়মিত বা স্কৃত
নৃস্বত উকার সাহায্যে বেদ পাঠ করিয়া দ্বিগুণে
পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা সগর্ব্বের বলিতেছেন,
আমরা বেদ দেখিতেছি, স্মৃতিশাস্ত্রে অবিদ্যারই
কাজনিক; বেদের সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক অতি
ক্লান্ত।

যে যাহা বদ্বক; কলে এই যে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত
সকলবিধি এখনকার বেদে পাওয়া যায় না বটে;
কিন্তু তাই বলিয়াই বেদমূলক নহে একথা কখনই

বলা যায় না। বেদ এখন কি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়?
যে এক কথার কথা হইবে “এ বিধি বেদে নাই।”
এখন কথেরে মাত্র শাক্য শাস্ত্র পাওয়া যায়,
কিন্তু কথেরের ছিল বহু শাখা;—

“বিভেদ প্রথম বিপ্র লৈল কমেদপাদপম্।
ইন্দ্রপ্রমত্তে প্রদাদ্যাহাশ্রয় চ সাহিত্যে।”
চক্রবর্তী সা বিভেদাং বাহাদিগিঃ সংহিতাম্।”

৩ অং ১৪ অং ১৭/১৭

কথেরী বহু শাখার কথা ইতিপূর্বে বিষ্ণু-
পুরাণনি শাস্ত্র কথিত আছে। যজুর্বেদের এখন
১২ টা মাত্র শাখা পাওয়া যায়, যজুর্বেদের কিছু
সমুদ্রবিশিষ্ট প্রধান শাখা, অবান্তর শাখা—১১।
“সমুদ্রবিশিষ্ট প্রধান শাখাঃ সপ্তবিশংমহামতিঃ।
বৈশম্পায়ননামসৌ ব্যাসশিষ্যচকার বৈ।”
বিষ্ণুপুরাণ ৩ অং ১১ অং ১১

“সমুদ্রবিশং সপ্তবিশংমহামতিঃ।
ব্রহ্মাণ্ডে হু একাবিকমলময়শ্চামিমা আপত্তযোক্তা
উক্তাঃ।”
ত্রৈলোক্যের টীকা।

সমুদ্র ধরিলে সামবেদেরও সহস্র শাখা; তন্মধ্যে
৭টি শাখা কেবল এখন দেখিতে পাওয়া যায়।
“স্বামবেদতরোঃ শাখা ব্যাসশিষ্যঃ স জৈমিনি:
জৈমণে যমে যন্ত্রেয় বিভেদ শ্রুত তমম।”
এই উপনিষৎ।

“সাহস্রং সংহিতাত্তেদং হৃকর্ম্ম তৎস্বতন্তুতঃ।
চকার তদ্রূপভক্ত্য জগ্যাহো মহাত্মনী।”
বিষ্ণুপুরাণ ৩ অং ১৬ অং ১৩

অবশ্যবেদেরও বহু শাখা; তন্মধ্যে নমস্করক,
বেদকল, সংহিতাকল, আদিসকল ও শাস্ত্রিকল—
এই পাশ্চাত্য প্রধানে। এখন ইহার ছুটি মাত্র
শাখা পাওয়া যায়, তাহাও দুর্বৃত্ত।

“অথর্ববৈদ্যঃ স মুনিঃ হুমন্ত্রমিত্যুত্বাতি:
শিষ্যমধ্যাপয়াম কবকঃ সৌম্যং তদ্বিদ্।”
কবকঃ সৌম্যশিষ্য তথা পণ্ডার্য দত্তবান।
দেবশ্রুত শিষ্যাত যোদোদো ব্রহ্মবলিগুণ্য।
শৌক্যমনিঃ পিরপাদগুণ্যো মুনিসত্তমঃ।

জ্যোত্স্না ব্রহ্ম শিষ্যঃ কৃত্য মৈত্রিক সংহিতাঃ।
পার্জত্যিঃ কৃত্যাদিশং তৃতীয়া শৌক্যো দিগ।
শৌক্যকৃত শিষ্য কৃত্য দদ্যবোক্ত বভবে।
দ্বিতীয়ঃ সংহিতাং প্রাপ্যঃ সৈক্যায়নমজ্ঞিনে।
শৈক্যো বৃহস্পত্যকঃ ভিন্না বেদো দিগা পুনঃ।

নমস্করকো বৈদ্যঃ সংহিতানি তথৈব চ।

চতুর্থঃ জামদগ্নিসঃ শাস্ত্রিকলঃ পঞ্চমঃ।
শ্রৌতাস্থকর্ণান্যতো সংহিতানাম বিকলকঃ।”
বিষ্ণুপুরাণ ৩ অং ১৬ অং ১৩

প্রাচীন শাস্ত্রকারীরা সংবৎসরে বেদের যে সকল
ভাগের কোন না কোন কালে অক্ষিত ছিল, বলিয়া,
অস্মিত হইবে; আমরা স্থির বলিতে পারি, মাদব্য-
চার্য্যও বলিয়াছেন,—স্মৃতিশাস্ত্রের অনেকবিধি
তাহারাই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।

দেশের নানাবিধ বিপর্য্যয়ে, বৌদ্ধ-জৈন-বন-
বিপ্লবে প্রভৃ বেদ কেন, সকল বিঘয়ের প্রভৃই
বিলুপ্ত হইয়াছে। পানবির পূর্বের “আপনিগি-
শকটায়ন” “যাতি” গোলবা প্রভৃতি স্মরণে কথিত
ও বি-ইউ-চক্র প্রণীত “ব্যাকরণ বর্তমান ছিল,
তাহা এখন নাই। বাস্তব পূর্বের প্রায় ২০ বানি
নিষ্কলিঙ্গ ছিল, তাহার একবানিও এখন পাওয়া যায়
না। মূল্যপানি প্রভৃতির মৃত কল স্মৃতিশাস্ত্রের
নাম দেখা যায়; পুস্তক কিং তন্মধ্যে অতি অল্পই
আছে। আলম্বারিকদিগের শিখিত কাব্যগ্রন্থও এখন
সম্পূর্ণ মিলে না। নরীণ গ্রন্থেই বনং এই
ভুক্তনা, তখন সেই যুগকৃত্যভাগ্যত প্রাচীনতম বেদের
শাখা যে বিলুপ্ত হইবে, ইহাতে আর বিত্ত কি?
বেদের শাখাবিলোপ হইবার কথা শুধু মাদব্যচার্য্য
নহে, সাংখ্যপ্রচনভাষ্য-কর্তা বিজ্ঞানব্রহ্মও
লিখিয়াছেন:—

“ভরুতিভক্ত্য” যদি চ কালপুত্র। সা প্রতি-
রিত্যনি প্রত্যকতো নোপগত্যতো তদ্যাপ্যার্যি-
বাক্য্য প্রকৃত্যত্যা। নমস্কৃত্যেচ অর্যো যাত্রা
বিনাশিত্যিঃ ইতি।

সাংখ্যদর্শনের মূলমন্ত্রে লিখিত আছে যে,
পরমাং জ্ঞা ইহা প্রতিসমত। ভাষ্যকর্তা বৈদ্য-
বেদ-বিশিষ্ট হইয়াও সেন্দ্রিষ্ট যুক্তিগণা নাই—
তাই তিনি বলিয়াছেন, “আচাধ্যার বাক্যে না হই-
করিতে হইবে, তিনি যখন প্রতির কথা জুগিয়াছেন,
তখন সেন্দ্রিষ্টে অবলুই উহা ছিল, কালক্রমে বিলুপ্ত
হইয়া গিয়াছে। মহা স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে—

“যঃ কতিং কচ্চক্রিচ্ছ্য” মনুনা মন্ত্রকর্তিতঃ।
ভাষ্যার্থঃ—মন্ত্র, যাহার যে ধর্ম্ম-কর্ত্তন করিয়া-
ছেন, তৎসমস্তই বেদোক্ত। অজ্ঞ কালের কথা নহে,
যখন যটক্রিশং বার্কি ব্রহ্মকৃত্য করিয়া যৎকয় অধ্য-
য়নং বাক্য্য দ্বিষ্ট, যখন ভাস্রণ দেবপাঠ না করিলে

শ্রাব্যঃ “দ্ব্যার, পাত হইতেন—সেই সময়ের শাস্ত্র,
মহাশক্তিগত স্মৃতি লিখিত হইয়াছে; “মানবীয় ধর্ম্ম
সমুদয়ই বেদোক্ত। তথাপি অবিদ্যা। উক্ত ধর্ম্ম
বেদে না থাকিলে, যখন শাখা লোপ হইয়াই,
সমগ্র বেদের রীতিমত প্রচার বিলুপ্তবলীতে ছিল,
তখন এই কার্যনিক কথা—যোরতর অসত্য কথা—
কি কখন লিখিত হইতে পারিত? না—সেক্সপ কথা
লিখিলেও মহাশক্তিগত এত প্রতিভা ভারত সম্রাট
গুপ্তিত? কখনই না। আরও দেখ, কলিপ্রবর্ত
ধর্ম্মশাস্ত্রকে আমরা “স্মৃতি” বলি; আমরা কেন, মহা
যাজ্ঞবল্ক্য শৌত্রে প্রভৃতি সনসেই স্মৃতি বহনো।
বেদোহাবিলো ধর্ম্মমূল্য স্মৃতি-শীলে চ তদ্বিদ্।

মহা ২মঃ।
অতি স্মৃতি সদ্যচার্য্য ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য ১মঃ।
বেদো ধর্ম্মমূল্য তদ্বিধাঃ স্মৃতি-শীলে। পুত্রিম ১মঃ।
“আর্য ধর্ম্মশাস্ত্রের এই সর্বস্বাদিগিসি, স্মৃতি” নাম
দেখিয়াই ত তাহার বেদমূলকত্ব স্থির হইতেছে।
যে বিঘয়ের দ্বারা হইবে, পূর্বের তৎসমস্তক অতাবিধ
জান চাই। প্রত্যক্ষ হইবে, অযুমান উক্ত, আর
শীঘ্র বোধই হউক, এই জাতীয় কোন জ্ঞান
বালিকে মরণ হইতেই পারে না। প্রথম অমৃত্যু-
(প্রত্যক্ষাণি), তাহার পর সন্তান, সংসার হইতে
স্মৃতি। স্বপ্নগত উপদিষ্ট ধর্ম্ম যদি তাহাদিগের
কল্পিত হইত, তাহা হইলে উক্ত ধর্ম্মসংগ্রহ শাস্ত্রের
কল স্মৃতি হইবে কেন? আমরা পক্ষে দেখো নাই
কেন না স্মৃতি অন্যান্য উক্ত ধর্ম্মের কথা যথো
হইলে, তাহাদিগের সাংসার হয়, সাংসারের পর
সেই ধর্ম্মবিশেষ স্মৃতি। তাহারই ফল ধর্ম্মশাস্ত্র,
এই জগত উত্তর নামান্তর “স্মৃতি।” এই সকল
পর্থাগোচনা করিলে স্মৃতিশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ বেদমূলক
বলিতে হয়।

স্মৃতি-বেদমূলক না হইলেও কতি নাই; বেদ
মাদ্যার বাক্য, সেই অচিৎ-প্রভাব পরমেশ্বর আর
শিষ্টকর্তা পুরুষস্বয় মূর্ধগিণ—আমাদিগের
নিকট উভয়ই পরমপুত্র। উভয়ের বাক্যই
আমাদিগের শিরোধার্য্য, উভয়ের আদেশই আমাদের
প্রতীপাল। তথাপি যে বিচিট্রক করিমা,
অজ্ঞপ্রদা তাহার উদ্দেশ্য নহে। স্মৃতিশাস্ত্র
বেদমূলক নহে বলিয়া: বাহারা ক্রুণিত এবং
আনন্দিত, তাহাদিগের হৃৎস্ব হইবে অপরদেবই ইহার
উদ্দেশ্য।

সেক্ষপীয়র বড় কি কালিদাস বড়?

ইংরেজের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্ষপীয়র, আর নব্যবিদ্যুর শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। কে বড়, কে ছোট, এই বিষয় সমগ্র জাতির দিতে হইবে। কিন্তু ক্রীষ্ণ কেম্ব্রিজ বঙ্গোপাধ্যায় এক উত্তর দিরাছেন,—সে উত্তর আমার পছন্দ হয় না। 'সেক্ষপীয়রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।' মত। মতাই কি কালিদাস শুধু ভারতবর্ষের কবি, আর সেক্ষপীয়র জগতের কবি? এ উত্তরে আমরা 'সমস্ত' হইতে পারি না। চন্দ্রনাথ বায়ু কালিদাসকে মেখে উঠাইছেন,—'তারা বেশ!।' 'মেঘা-বিমান-বিহারী কল্পনাশীল মহাবীর হুন, আমায় ও অনিন্দে' নির্দন্দ করি না। তবে সেক্ষপীয়র বড় কি কালিদাস বড়, ইহা ঠিক করিতে কে?

ইংলণ্ডে প্রকৃতি দেবীর বড় একটা মদুর হাত নাই—সেখানে প্রকৃতি শীত-ভীতা, 'দ্রিষ্টাধা'। এখানে যেমন নন্দ্যাক্ষরকে শনি-বেশা শোভা পায়,—বিরাটধিরিপুর, 'কপি-ক-ব-সংস্কৃত কাননধারি' চিত্র হরক করে,—প্রতি মারুপুণ্ডিত উজ্জনে বিহরণ-সমুদ্র স্বকায়ের মন-প্রীত হয়,—ইংলণ্ডে সেসব শোভা নাই। প্রকৃতি যেখানে শীত-ভীতা। যদি তবু কল,—চন্দ্র হাঙ্গে, সূর্য্য কিরণ দিয়ে; তাহা গোপীজ্ঞার ভ্রমের জায় নাই,—জামাইয়ের সেরেতে তুলনা করে। সেক্ষপীয়র এ বেনে বাহু প্রকৃতি শোভা দেবীয়া বড় মুহূর্ত নাই—প্রকৃতি ব্রহ্ম-উজ্জনে তিনি কালিদাস-জনের রূপে উপমা বুদ্ধিয়া বেজন নাই। 'মানব-প্রকৃতি' সৌন্দর্য্য, মনুষ্য-তাহার চক্ষে পরিচায়িত, কিন্তু সমস্ত মনুষ্য-প্রকৃতির মধ্যে। তিনি 'কবিত্বলা পুঙ্খ দর্শন করেন নাই'—ইহাও যেমন আমাদের দেশের রাজ-ব্রহ্ম পুঙ্খ-ব্রহ্ম-জন্মে ন্য, সেইরূপ নিখাত-নিরুপাধীপাশিয়ার মত কবিত্ব যে দেশের অধিবাসী নহে। সেক্ষপীয়র আক্সিাছেন—'বড়। যদি উক্তা দেখিতে চাও—যদি মনো-লক্ষ্যে বিদ্যাদামের ধর নর্তন দেখিতে চাও—যদি ভালোয়ার রূপে বিরূপে হু-ব্রি বিলুপ্ত হয়,—সেরাজ বিরূপে উল্লভের লক্ষ্য-পকাশ বায়ু আনন্দ করে,—বীরের সুখিত ভ্রম নিকট বিরূপ ছিন্ন শরদায় মেঘের জাঘ সৈন্যরাশি

উজ্জ্বালায়, যদি দেখিতে চাও, তবে সেক্ষপীয়র এসব সমগ্রই পাইবে। রঙ, বস্তু, প্রায়ই কাল, আত্মপাত, শিশির, ব্রহ্ম, তেজ, অশনি,—একটা এক সেক্ষপীয়র।—এ সব বাস্তবিকতার মধ্যে—অন্তঃপ্রকৃতির। তবে কালিদাস বড় কি সেক্ষপীয়র বড়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। 'মেঘ বড়, কি রঙ বড়,—মানবল বড়, কি জলপান বড়,—কোকিলের পৃথক স্বকায় ভাল, কি ঔপু-পঙ্খ-ব্রহ্মের শোভা ভাল, কে বলিবে? কে বলিবে নিবেদিত বাল-ভার হৃদয়, কি নব-বসন্তানিলচাপিত ময়ূর-চারণপৌরোচিত রক্ত বর্ণনা হৃদয়? কে বলিবে পাণ্ডবধারী অর্জুন বড়, কি বীশাধারী নারদ বড়? কে বলিবে মজ্জিত বড়, কি এসুকায়াল বড়?—ইহার। হুই ভিন্ন উপকারে নিমিত্ত, ইহার কে বড়, কে ছোট, তাহা বলিবে হয় না। যদি বল ইহার উভয়েই কবি, তবে একেই পুরো 'লোক, ইহারের তুলনা কবিত্বাংশে একেই হইতে পারে,—এ কথা ভুল, ইহার। হুই ভিন্ন জিনিষ নিমিত্ত, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের শতবোজন হলে, ভারতীয় কবিত্ব, ইংলণ্ডীয় কবিত্বের শতবোজন হলে। নামে শুধু মিল থাকিলে হইবে কি? তবে এ পর্য্যন্ত বলা হইতে পারে, সেক্ষপীয়র সমস্ত পাঠ করিলে বুঝা যায়, প্রতিভা ইহা হইতে বড় হইতে পারে না। যে সব উপকরণে রূপি তাহার নাট্যমত রচনা করিয়াছেন, সে সব উপকরণে সেই নটিক গুলি হইতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আর রচনা হয় না।—কালিদাস যে দেখে বিহার করিয়াছেন, যে দেখে শ্রীত হৃদয় উপমা দিয়া তিনি সজ্জিত করিয়াছেন,—এ দেখে তিনি নিজে নিরুপমা,—তাহার উপমা আর নাই।

যদি বলিবে, সেই অস্পষ্ট-শক্তি-বিশিষ্ট, স্বকায়-চিত্র-অস্বপ্নপটু, জন্ম ওয়বস্তার বড়, কি সেক্ষপীয়র বড়, তবে বরং একটা উত্তর দেওয়া হইত। যদি 'পিল, জীব, মারোলা, ফিলিপু, মেজোয়ার, মাতালি, বোমেট, দেক্টার, ইহারের সঙ্গে নাট্যাংশে সেক্ষপীয়রের' হাঙ্গে হাঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবে, তবে সমস্ত হইত। এলিজাবেথিয়ান কবিত্বগুরু ছাড়া দিয়া মৌলি যে বিদ্যোভেদে গ্রাফ বহিষণ কি শিলারের প্রতিভা ব্রহ্মোপায় সাহিত্যাকাশ চর্চাকৃত করিয়া চণিয়া পেল,—সেই বহিষণ কি শিলারের সঙ্গে সেক্ষপীয়রের তুলনা করিয়া, যদি তাহা দিগকে

সেক্ষপীয়র বড় কি কালিদাস বড়?

সেক্ষপীয়রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নির্দেশ করিতে, তবুও স্পষ্ট সঙ্গত হইত, সে তুলনা এক দেখে। 'ভিন্ন দেখে তুলনা দিলে উপমালাপ হইতে হয়।' সেক্ষপীয়র 'অনুভূত-প্রতিভাশালী।' 'ঐ দেখ, করিওলেনাস যোদ্ধা, একক সহস্র যোদ্ধাকে ভিড়ে ধাঁড়াইয়া। সহস্র যদি তাহাকে বধ করিতে উন্মত্ত,—তাহার একটা জীবন বুলি পূনের মত ভোর-বিহেৎ-তেজের উজ্জ্বা যায়। প্রবল-উজ্জাল-ভরসালা-সংকুল ধোর-পতীর-স্বাটিকোপালিত সমু-দ্রে মধ্য অর্ধ-পাতের জীবননাশের আশঙ্কা; আর অল্প করিওলেনাসের জীবননাশের আশঙ্কা এক। বৃদ্ধ সিনেটরারূপে তাহাকে পরাভব মানিতে কত অহময় করিতেছেন—তাহাকে সেই রক্ত-অ-মানব-জোহ-প্রাণী ভিড়ে মধ্য হইতে আনিত কে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু করিওলেনাস নিরাক্রম,—নিমেষে, জোহে দ্বীত হইতেছেন। যে মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা বড় বেশি, সেই মুহূর্তে অহময়কারী বৃদ্ধ বন্ধুর হস্ত জোহে-জোহ করিয়া, অসি-নির্দাসিত করিয়া একটা মাত্র বুলি করিলেন,—সেক্ষপীয়র সেই একটা কথাই তাহার, চরিত্র আঁকিলেন—

Cor.—(Drawing his sword)
No; I'll die here.

এই বীরত্ব মাতার নিকট পরাজ। পৌরক, দেখ দেখ—এখানে হুগ দিয়া বিধি শঙ্কায়গুরু কর্তন করিতেছেন। ঐ যে বীর বহুরাণে কি পাঁপায়,—মাতার নিকট সেই অল্পের যোদ্ধা জিত। একবার সেই স্বর্গীয় ব্রহ্মপৌরক দেখ, দেখ। বীরের মানে, বীর মাতৃসেহের দেবদামিতের নিকট বুলি দিতেছে। কিন্তু সেই মান বিদগ্ধন দিতে মানী মাতার নিকট বাসপালা-বস্ত্র বসিতেছে—

Well, I must do't:
Away my disposition, and possess me
Some harlot's spirit! My throat of war
Is turned
Which quired with my drum into a pipe,
Small as a ewe, or the virgin voice
That babies lull asleep!
Mother! I am going to the market place;
Shide me no more!—

কিন্তু সে বাক্যের বুঝ। সেক্ষপীয়র—তোমার

কথার উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে আঁকিবেন না। তিনি যে যুগ দিয়া তোমার কথা বাহির করাইলেন,—সেই যুগ-কিছাই কথা ভর করাইলেন,—তোমার চরিত্র ঠিক রাখিলেন। করিওলেনাস মন বোম হইতে নিরাসিত হন, তখন যে কথা বলিয়াছেন,—তখন পঞ্চ-বচন কি কেহ ভুলিয়াছে?

You common cry of curs!
whose breath I hate,
As reek of the rotten fens,
whose loves I prize
As the dead carcases of unburied men
That do corrupt my air—I banish you!
And here remain with your uncertainty!
Let every ravine shake your hearts!
Your enemies, with nodding of their plumes
Fan you into despair!—Despising,
For you, the city, thus I turn my back.
'There is a world elsewhere.'

আর ঐ বচ, মাকবেথ থাকিলে উচিত নীল নন্দ্যপাখিক মুখ চাউতে বলিয়া,—শির করিত তাহার পদক্ষেপে লেন রূপাশিত, নিরা বেন তাহাকে বজ্রাশ্রম দেখিয়া শিরহিত,—অতুল করিয়া চোলের জায় রাজ-প্রাণনাশ মদম করিয়া ছুটিল। সেই ভাবের কথা অহুতানের প্রাণকে একবার ওড় বলিয়া পেল,—

"Thou sure and firm-set earth
Heave not my steps, while way they seek,
for fear,
Thy very stones prove of my whereabout,
They'll bow and bring me down."

"Let not heaven peep
through the blanket of the dark
To cry, Hold, Hold!
কি ভাবের পুঙ্খ! বনস্কায়ের বৃত্ত-সংবাদ মধ্য-বেধ ভূনির, তখন তাহার মুখে দর্শনশাস্ত্রের মত বাহির হইল—প্রকৃত হৃদয়ে, প্রকৃত অহুতানে, মহুয়া দর্শনিকের উৎপাদ করে।—এই জীবন কলভুয় কতবার ভবিষ্যৎ,—এ কথা হুই মাক-বেথের মুখে একবার শুন;—

"To morrow, and to morrow,
and to morrow,

*Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief
candle!*

*Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour.*

*upon the stage;
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
signifying nothing."*

একটা ক্ষুদ্র-বয়স্ক বীমিত-ভোজী বীর ডেভেন-
নাকে ভাঙি, বাসিন্দা ডেভেনমাকে বধ করিল,—
নিজেকে বধ করিল। কিন্তু সেই উন্নত স্বভাব-সেবা-
ইহা বয়সী নিম্পুত্র কবি স্বভাব-ভাঙিত কত সুন্দর
কুহুমখানি ছড়াইয়া ফেলাইলেন,—তাহা সে-ই সেবি।
ওখেলো ক্ষুদ্রবর্ণ কবাকার, সেই ক্ষুদ্রবর্ণ যোদ্ধার
হৃদয়-প্রস্তুত ডেভেনমার মূর্তি কত সুন্দর হইয়া
বিস্তৃত হইয়াছিল। ওখেলো পায়ল হইয়া একবার
বলিচ্ছে—

*—She could lie by an emperor's side
and command him tasks! World hath
not a sweeter creature!"*

—আবার বলিচ্ছে—
*An excellent musician,
She can sing away the savageness of a
bear!*

আর যখন মাক্সরিথানে, মর্শপীড়ায়, অধিষ্ঠিত
দুর্জয়, পিতার প্রতিষ্ঠিত আর যন্ত্রভায়ে প্রতিষ্ঠিত
বেম্বা দেখাইতেছেন, তখন সেই কয়েক ভয়ে
সেকপীড়ার সমস্ত প্রতিভা সমস্ত বিকাশ
পাইয়াছিল; সেই কয়েক ছন্তে,—বজ্রের তায়
কর্তার, কুহুমের তায় কোমল, ধর্মের তায় জলন্ত
কথা ছড়াইয়া আছে। রূক্ষাণা প্রবন্ধে যন যন
ইহা বৈকী উদ্ধৃত করি নাই। উদ্ধৃত করিয়া সেক-
পীড়ার প্রতিভার শোভা দেখাইতে, হইলে অন্ততঃ
হামলেট, কিলিয়ান, ম্যাকবেথ, ওখেলো। এই
চারি জনা পুস্তকসম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে হয়। এই
তথ্য-ভাণ্ডার মহাশয়ের প্রতিভার দর্শন, প্রতিভার
স্বভাব, প্রতিভার উজ্জ্বল রাজসিক ধর্ম। এই-
প্রকার ভিত্তি—আত্মাভিমান-প্রসূত ভালবাসা।

সেকপীড়ার ইংরেজ জাতির দর্শন। যে মন জাতি
রাজসিক ধর্মের উচ্চে পৌঁছে নাই, সেকপীড়ার
ভাষাধিসের দায় পড়িল।

সেকপীড়ার বড়, কি, কালিদাস বড়? কিন্তু
বলিবার মতাজাত, রামায়ণ,—হুই বিপুল কাব্যতরু,
ধর্মতরু,—কল্পতরু—বাঁধা চাও তাহাই পাইবে।
ইহাদের কাণ্ড মৌরবানু,—কুপ যুগান্তের অমর,
অনৃত্তাণ্ডের, যদি মহাপ্রাণের সমস্ত বিধ সমুদ্র-
ভাঙতে প্রস্তুত করে, তবে বোধ হয় প্রাণ-অবসানে
ভারজন্যই সেই দুই অমৃতপ্রাণের সমস্ত বিধ
লইয়া আবার উঠিবেন। এই দুই হাতবুক হইতে
মদন-কুহুমের কয়েকটা "ফুল-মুটিয়াছে"—তম্বায়ে
কালিদাস-পুণ্য মর্শপ্রস্তে। সেই পুণ্যতরু-ধর্মের রস
এখন করিয়া কালিদাস পুণ্য প্রকৃতি হইয়াছে,—
তাহার প্রতিভার নবীন উজ্জ্বল বর্ণ।

সেকপীড়ার পুথিবীর কবি—কালিদাস, স্বর্গের
কবি। কাণ্ড, নির্দ্বন্দ্ব মনঃকুহুম আর কোথায়
হুইত সোমনঃমান-সহবীর আর কোথায় হুইত
সেই শেখন প্রতিষ্ঠিত মনে কত কাণ্ড? এই
বিষয়মায় কালিদাসের চক্রে কুহুম-উদ্যান।
মক্ষিকা হইয়া কালিদাস ইহা হইতে বর সঞ্চয়
করিয়াছেন। অমর হইয়া উপন্যাসদ্বারা গুণ-
করিয়াছে, নবোন্মিত চন্দ্র হইয়া কালিদাস
মাহিভাষকে হামিয়াছেন;—ডেমন হামিয়ে আর
কে জানে? বসন্ত বায়াকির রামায়ণরূপ মহাশয়
হইয়াছিল, তখন বোঝা পিয়াছিল,—যদি এই
তরুর ফুল হয়, তবে তাহা লইয়া পিঙ্গল্য হামিয়ে।
সে শোভা প্রতিষ্ঠিত আর ধর্মের দী। "যদি
ইহুয়েও ফুল কেটে; যদি বর্জুর বৃক্ষে চন্দন
ওরতে পুণ্য হয়, যদি পূর্ব-কুহুমের কয়েক মংগল
দ্রব্য হয়, তবে তাহার হুইনা কৌশল? কালিদাস
ইহুয়েও ফুল,—বর্জুর-চন্দনের-তরু অখুর্ষ পুণ্য,
তাই কালিদাস আত্মবিশি। সমুদ্রচিতা শকুন্তলার
মল্লিক লিখি লাবণ্য কি মূর। কি হল্যগ্রাহী।
সেই যে দুহস্তের চিত্ত চান্দাশুক-রচিত কেবল তায়
পশাং, রাবিত হইতেছে অখচ বাধা হইয়া শবীর
পুরোভাষে অগ্রসর হইতেছে; সেই উদ্যমানবিহা-
বিশীর পদাঘর রূপ কুহুমবীর হইতেও শৈলান-রম্য
কমলিনীর তায় দীপন্যাস হইতেছে, আর তদ্বিধে
কামের কুহুমধার এবং ইন্দুর নীরশক্তি, বজ্রময়ের
তায় রাবীর হাম্য বিধ করিতেছে,—এ বিচ্ছেদ,
এ প্রেমকাহিনী কত হৃদয়, চম্ভ ভরিয়া দেখ সেবি।

নিরিবিচারিণী পার্শ্বী স্তন-ভিন্ন-বদনা হইয়া ক্ষুণ্ণ
চলিতেছেন, শকুন্তলা কণ্ঠ উদ্গারিণী সমস্তা শিব-
দেব মনসে প্রতিষ্ঠিত সন্নিধির তায় দর্শনকে
উজ্জিত করিয়া চকিতে ঠাঁইহইতেছেন,—এসব
চিত্ত যদি একবার পড়িয়াছেন, তিনি ভুলিবেন না।
বসন্তের তায় এ সৌন্দর্য্য তাহাকে বাবজ্ঞান
মুগ্ধ করিয়া আমন্ত্রণ করিবে। বসন্ত-প্রিয়-মণি
কামের সঙ্গে, হিমাদিশিখরে উন্নীত হইল,—
তাহার আগমনে মাখবীলতা গুরুপূর্ণ হইল,—
কল্পতরু পুষ্টি হইল, বজ্রের আরা নাগরসের শোভা
আগন্তু মাহার হইল। বসন্ত,—সাব্যপ্রবালো-
লানচাকুরণ নব-চূত-কুহুমশরের দ্বিকোণপত্রিত তায়
যেন কামদেবের নামাঙ্কির সরিষের গাছের দাগে
অশোকপুষ্পের রঞ্জিত দল্য পুথিবীর যক্ষ পড়িয়া
কামকর-মাধবিত দুবতীর উরসের শোভা প্রকটিত
করিয়াছিল; বহুফুল হুটিয়াছিল; পাতা কালী
দ্বারা সেই তপোবন মুগ্ধ করিয়াছিল—সেই
সময়ে নন্দীর শাসনে মুগ্ধ করিতে বাইরা হুটিল
না; বসন্তের সন্নিধি-সম্মুখে হুটিতে বাইরা নিম্পুত্র
হইল; পাতা যুগলিত পর ছড়াইতে বাইরা মুগ্ধ
হইল; বিরেক মুগ্ধ হুটিতে বাইরা লুটিল না,—সমস্ত
বনপ্রদেশ, আম্রোখের ভাষা নিবর্তিত হইল।
পার্শ্ব বোয়ী বৈবদ্য-ক্রম-বেদিকার সমাধানে।
তিনি ধ্যানস্থ। তাহার দুই করণবল অজ-
হাষিত; তাহা প্রথম উপাধিকার তাহ হইল।
ইয়িরিয়ারোহেতু তিনি অমরী-মহাস্ত্র অমু-
প্রভায়ে তায় শিব, নিরুপস্থ জগদ্বির তায় শাল্য,
নিহত নীরশিতার তায় নিম্পুত্র। কাণ্ডের
যদি সেকপীড়ার ওখেলো না আঁকিতে পারেন,—
সেকপীড়ার জগৎ শিবচিত্র আঁকিতে হার মানিবেন।
আর সেই ১২০ প্রোকে উপকার অমৃত নীলো,
সৌন্দর্যের রসপায়, ভাষার অমৃত্য ভাঙার,—বসন্ত-
করমুগ্ধ দেখতুক কে পড়িয়াছে এবং পড়িয়া
ভুলিতে পারিয়াছে।

কালিদাসের প্রতিভা কবিত্বপূর্ণ। সে যেন
একধারে ভবনগুণ, বীণার নিকল, কুহুমের গন্ধ,
কুহুমের শোভা। সৌন্দর্য্য-বহির্ভবে কালিদাসের
রাজ-মিহাশ্রবণে নিষ্ঠ-অজ কবিগণের রাগের সৈ।
ভারত-ভাঙারে কহিব লুটিত, মোমানা
লাজিত, অগণিত রত্নরাশি এদেশ হইতে নীত
পদার্থ—কবিত্ব-হুইলে শোভানো।
ভগবানের ক্রীড়-সৌন্দর্য কৌতুভময়ি পর্য্যন্ত এদেশে

হইতে অপর্য্য। তথাপি এই দলিত লাজিত
দেশে হিন্দু আজ অষ্টমত বসনের লাজনী ভুলিয়া
মাহিভের শব্দ রত্নমণি শ্রীভিত্তিক নেত্রে দর্শন
করিলে। শব্দের ভাঙ্গ শিরে পড়িল—হিন্দু আজ
হিমাদিশিখরের তায় নিম্নকে উচ্চ জ্ঞান করিলে।

যদি তবে কহিবেন। কৌতুভমণিরাশি।
কহিবর কৌতুভ, ভাষে,—রান হয়। সে সুন্দর
কুহুমযোধ্য। কিন্তু যে রত্ন অবিনশ্বর, বাহার লক্ষ্য
নাই, লুটী হইলে বাহার গৌরব রক্ত-হৃদয়,—হৃদয়
বাহার সিংহাসন,—এই সেই রত্নরাশি, হিন্দুর যজ্ঞ-
চিরদিন বিরাজ কর।

ক্রীড়ানোশচন্দ্র মেন।

জাতিবিচার।

বিশ্বকোষের চক্রে আম্রোখের সবই মল। বিদে-
শীয়-ভক্ত স্নেহমণি বসন্তের নব্যা শিকিত-পায়ের
চক্রেও তাহাই। "কু-মাহার" বলিয়া একটা কথা
উঠিয়াছে, তাহা ত আম্রোখের সকল ভাবে, সকল
কার্যে, সকল বাহ্যারে এবং সকল পদ-
পাশ্বারে ওস্তপ্রভভারে বিজড়িত,—ইহা তাহাদের
জাতিও বোঝে কবি আত্মরিক বিশ্বাস। আম্রোখের
জাতিও-প্রভেদে সেই কু-মাহারের একটা অবি-
ভাষ্য ও অসদাধারণ লীলাবন্ধে। নব্যা শিকিত-পদ
বলেন, স্নেহে যখনগণ বসেন, সকলই ঈশ্বরের
স্বষ্ট, ইহার মনে আবার জাতিভেদ কি? ক্রান্ত-
মজির ক্রি, বৈশ্ব-শুজ কি? কায়স্থ-বৈশ্ব কি?
হাতি-মুচি কি? ডোম-চাণাল কি?—এ প্রভেদে
কেন?—এ উচ্চ-নীচ-জ্ঞান কেন? ব্রাহ্মণ জাতি-
লগ্নে শর্শ করিতেও সমুদ্রচিত্র হয় কেন? বৈশ্ব-
পার্শ্ব আম্রোখের নিভাঙ্গ অগণিত বোধ করিয়া
দান কেন কেন? এই কামরিক উজ্জ্বলতা নীচ
জাতির অম্র প্রাণাণ্ডে, গ্রহণ করে না কেন?—
তিনি চাণালের স্রষ্টা, তিনি আম্রোখের স্রষ্টা,
তিনিই সকল জাতির স্রষ্টা। যখন স্নেহাই একের
মহান, তখন তাহাতে ভাইয়ে এই পার্থক্য করিবার
প্রয়োজন কি? তাই ব্রাহ্মণ। মনের মোহ একটু
কমাইয়া লও; চিরশিকিত কু-মাহারের
স্বন্দর; শৈব-ব্রহ্মের সাদারিক, আর আম্রোখের
করিতে অভ্যাস কর। আপনাকে অত উচ্চ

কবিত্রয়ের মধ্যে তুলনা করিতে বিরত থাকে? সেই প্রশ্ন সম্বন্ধে উদাস, উচ্চাধিকার প্রাস—অনলের এবং কবিত্রয়ের দেখা গিয়া থাকে? তবে কেন অমিকে কবিত্রয়ের আদি উদ্দেশ্যভূমি না বলিব? এই কুলভাক্ষাংশর অনলের প্রভাব-বর্ধক ও মূলকারণ হইয়াছে আমরা ব্যাধকে ত্রাসক ভাবিয়া পুনরিত বহিরাও।

কল, স্বভাবঃ সিন্ধু মধুর বেগমসম্পন্ন এবং কবিত্রয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। অপর জ্ঞান পুণির্গণ কল ও জলের স্বভাব। সমস্তের অনুর বলা কল দ্বারা হইয়া থাকে। তাই আমরা জলে বৈশ্বকরের অমূল্য প্রতিমা দেখিতে পাই। কার্য-তৎপর, সিন্ধু মধুর-স্বভাব-সম্পন্ন কলিমূল্য সহকী বৈশ্বকর মধ্যে জলের-তুলনা যেওনা অসম্ভব।

পুণিবী—বাৎসবিক এবং জল এই দুইয়ের সম্পূর্ণ পুণী ও প্রতিচ্ছবি এই পুণিবী হইতে। পল-চারণ করিবার স্থান পুণিবী ভিন্ন আর নাই। পুরুষের পুণিবী হইতে ভূমির উৎপত্তি; “স্বাঃ ভূমিঃ” পুণিবী। তাই বলি, ত্রিবিধ-সেবক, চরম-স্বাধিকার ভবনবৈশ্বকর শীতলযোগ্যের শূভজাতির অপরিষ্কৃত আদ্যতক পুণিবীতে বর্তমান। স্বতঃ পুণিবীকে শূভ কল আদরত নহে।

আকাশের পটী স্বীকার কর আর না কর, ত্রাসকের উপপরিপ্লবিত মৃত্যুমান মূর্তির অমূল্য ছায়াই আকাশে দেখিতে পাই। ইহাই জাতি-ভেদের বীজভাষা। এ সমুদ্র হুও এই বংশ, মোহায়, নিজাব্ব, তামস। স্বপ্নের উদ্দেশ্যসিদ্ধি কেবল এই জ্ঞান-বর্ধকজিত জড়পটী দ্বারা কোন জন্মেই হইতে পারে না। ইহা উন্নত স্বপ্নের আদর ও উপাদান। অতঃপেক্ষা কিকিছুই অক্ষুণ্ণ-জ্ঞান-মূল্যম্পন্ন প্রভাব-বিভেদ-মূল কল-বিশ্বকবিত্রের জাতি-ভাষার উপাদানে যে-চাক্ষুর্যের প্রকাশ পায়। অপরভাষ্যে-বিরাজ করিতেছে, তাহার একই উন্নত প্রতিমা পুণি এই স্বপ্ন-রূপে দেখিতে পাই। তাই স্বজ্ঞানধন পবিত্র স্বপ্ন-কালে ত্রাসক, উন্নতমূল্যক কলমাজি-স্বপ্নিত তৃণবীর তল নারিকেল ধর্ম্মস্বপ্নক কবিত্রের, নীবার পবের্গে প্রভৃতি শাশ্বতীয় তৃণবলিত বৈশ্বক এবং মলভাবাপন্ন সামান্য তৃণ বাকিতে শূভ্র বৈশ্বক একই পুণী ভাবেই দেখিতে পাইয়া যায়। অপরভাষ্যে, স্বপ্নক ত্রাসক, পট মাল প্রভৃতি মহানন্দ-শক্তিক কবিত্র-কলপপুণ্যমোহিত অস্ত্রাসার-দম্পন আশ্র-পনমাসি তত্ত্বধর্মকে বৈশ্ব

এবং অপরিত্র শোভাভান শাকটিক প্রভৃতি কলমূল্য শূভ্র রনিত যেন স্বতই প্রবর্তি হয়। স্বপ্নকতা ও স্বপ্নকো নিগদ্য করিকে তাহারিদের মূখ্যেও এইকাল পবিত্র উপকারী (১) সমার অপরিকিত উন্নত (২) পোষক ও স্বপ্নকর (৩) এবং বাৎসব উপপাদনীয় নিগদ্য অপরিত্র সামান্যমূল্যক (৪) এই চার শ্রেণী দেখিতে পাই। প্রথম শ্রেণী ত্রাসক, দ্বিতীয় কবিত্র, তৃতীয় বৈশ্ব এবং চতুর্থ শূভ্র ইহা বলাই বাহুল্য। এই উপপাদ্যে ত্রাসকাদি জাতিভেদের অল্পদ্রব্যতা। স্বপ্নকতার পরিভাষ্য এই স্বপ্নিতে হইল না। দ্বিতীয় জীবকিত্র ত্রিগুণ যোনি। কট পতঙ্গ ও পক্ষীর মধ্যেও পুণ্যকট চারি শ্রেণী দেখিতে পাই। যেমাত্র-নিয়মাম্বারে ইহাতে কবিত্রভাব বৈশ্বকদের অসেকটা প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রাসক্য পুণ্যকট এবং অক্ষুণ্ণ শূভ্রভাবও পুণ্যকট। ইহাধিদের মধ্যে বলাসম্পন্ন জাতি সমাজভাষি আছে। ইহাধিদেরই কবিত্র ও বৈশ্ব বলা হইতে পারে। কবিত্রদের নীচবল ও বৈশ্বের ধর্ম্মস্বপ্ন এই স্বপ্নিতেই প্রথম প্রকাশ। ত্রিগুণ যোনির উন্নত পটী পুণ্ড। পটঙ্গকে চাক্ষুর্যভাব আরও পরিষ্কৃত। শাশ্বক ও তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শাশ্বক বলিয়াছেন,

“ব্রাহ্মণ্যৈব পাপং কুলসেকং দ্বিপ্রাকৃতম্।

একত্র সমীচিতিং বৈরজতং তিষ্ঠতি।”

“তামি ও হুও এই বংশ; মাত্র, ভাগ কল হইয়াছে; এক ভাগে বংশ-মূলক মূল ও অপর ভাগে মূল-মূলক হয় বিদ্যমান।” মহাভারতেও চারুনা-পাণনে লিখিত আছে—

“গোবতা ও ত্রাসকের মূল্য সমান—উভয়েই এক জাতি” হুতরাং পটঙ্গলে মল্যে গো-জাতিতে ত্রাসক, মাজিগি কতিপয় পলমধর্ম্মজাতিকে দ্বিতীয়, মনে ভাগ প্রভৃতি জাতিকে বৈশ্ব এবং উষ্ট্র অথ বর্জ্ঞাদিকে শূভ্র বলা হইতে পারে। পবিত্র বর্জ্ঞাদান গোজাতির ত্রাসকের আদরত শাশ্বকও আছে। সিন্ধু শার্দ্দল প্রভৃতি বীর এবং মলভাসম্পন্ন, হুতরাং উপপাদ্যিক কবিত্র বলিতে বাৎসব কিং? মল্যে ছাপ—পোষক ও স্বপ্নক জাতি, তাই উক্ত জাতিকে বৈশ্ব বলিতেছি। আর ভাবাবীর উক্ত অখাদিক শূভ্র বা বলিন কেন?।

কবিত্র ও সিন্ধু-সাদৃশ্য আছে বলিয়াই নব্য কবিত্রপণের পুণি “সিন্ধু” উপাধি প্রচলিত

হইয়াছে। এইখানে দেখিতে পাই চাক্ষুর্য স্বপ্নের দ্বিপত্রাধা। কবিত্রের পরিকল্পিত এখানে সর্বকোণে অধিক। মহত্বের সঙ্গে প্রায় ফুল।

উৎকৃষ্ট জাতির অজ্ঞতা, জড়তা ও অধ্যাকারিতা নিবন্ধন শূভ্র জাতীয় স্বপ্ন, কট, পতঙ্গ, পক্ষী ও পটঙ্গল, প্রায়ই তাহারিদের সেবার নিমুক্ত থাকে না। এতদ্বিলম্বি ইহাধিদের শ্রেণীসমুচিত জাতিভেদও আছে। যেমন অপর, বট, শার্দ্দল, হুতী, সিন্ধু, ইত্যাদি। তাই নব্য শিক্ষিতগণ। বিশেষায়ণ। বন দেখি, কট, স্বপ্ন, পটঙ্গল এই জাতিভেদ, এই মহাত্ম্যের ভাষ্য কে করিয়া দিয়াছে? কাহার কলম্বুতরে এই পার্থক্য সাধিত হইয়াছে? অজ্ঞত এই জাতিভেদের তাৎপর্য পটঙ্গল বুঝে না; বুলিতে পারেও না। তাই বলিয়া কি জাতিভেদ নুই বলিব? ঐশ্বরের অভিজ্ঞার প্রকৃতি নিয়ম আদর। সামগ্র্য মানব কি বুলিব? কিন্তু উপরে, বাহা দেখিলাম, জাতিভেদের যে অংশই ছায়ায় রক্ষা প্রতিপাদন করিতে গিয়া মল্যে মল্যে স্তম্ভিত হইলাম; তাহাতে কি বুলিতে পারি না।—অজ্ঞত এইখানেও বলিতে পারি না, জাতিভেদ ঐশ্বরের অভিজ্ঞত, প্রকৃত নিয়মের অজাতিচারী অংশ। ভূমি ও ভাই। শাশ্বক না, শাশ্বকের মোহাই ও বলি না। বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে অধ্যবোন কর, স্তম্ভিত সহিত অধ্যবন কর; তাহার প্রচীন শাশ্বকের সঙ্গে একবার অধ্যবন দেখি;—বর্জ্ঞক জাতিভেদ-মত কি না, বুলিতে পারিব; শাশ্বক মতভাবী কি না, ত্রাসকের স্বার্থপরমোহিত হুত্বক মত কি না,—জানিতে পারিব। বলাধির জাতিভেদে আকারপার্থক্য আছে বটে; কিন্তু বাহু আকারই কি কেবল আকার? আকার কি আর নাই? অর্থক আছে। আছে বলিয়াই ঐশ্বর্য পটঙ্গলকেও পরিষ্কৃত হন নাই। ইহা দ্বিতীয় আকারের নাম প্রকৃতি বা জাতির আকার। অল্প স্বপ্নিতে এই আকারের সমাক্ষুণ্ণত না হওয়াহইলে পরিস্ফুটন মহত্বাধিক। সুবহুভেদে আকার-পটন হইলেও, যে পার্থক্যে জ্ঞানকে বৈজিত্য—যে জিতব্রত ও শুণ্ড্যদেবের জোরে স্বপ্নক অর্থ কল্যে বোদ্ধাশ্রি; সে পার্থক্য, সে শুণ্ড্যদেব দেবতার নাই। সেবতা হুত্বই বিভেদ, আদরই মূর্ত্যোয়ারা। মহত্ব চেষ্টা করিলে সেবতা হইতে পারে, সেবতা চেষ্টা করিলেও মহত্ব অশেষা উৎকণ্ঠ পাইতে পারেন না; যে উৎকণ্ঠ

মহত্ব পাইতে পারে; তদপেক্ষা উৎকণ্ঠ ও আর নাই। সমার পদ পাইতে হইলেও সেবতাকে অনেক কাল ভুলিতে হয়। তবে কি না আপাততঃ সেবতা হওয়াতে অনুভব অশেষা বশি আছে।

শ্রেণীভাষ্যের আকারের কথা বলিতেছিলাম। তাহার দুইজন মহত্বই হইয়াছে। আভ্যন্তর আকার পটঙ্গলতর নাই; ত্রাসকের বাহা আছে তাহা না থাকিবার মধ্যে। কটপটঙ্গাদির প্রকৃতি অশেষা-কৃত মল্যে উন্নত। অজ্ঞত শ্রেণীর জাতিভেদ বাহু-আকার-পার্থক্যের সহিত বিজ্ঞিত; মহত্বসম্বন্ধে তাহা নহে; হইলেও সে পার্থক্য অভিশ্রয় দ্রুতম। মহত্বের জাতিভেদ কেবল আভ্যন্তর আকারের পার্থক্য;—এখানেও জ্ঞানশ্রিতীর অপরিকল্যে পরিচয়। কোন গুণ কারণে “জড় জীব” সমকল্যেই জাতিভেদ ঐশ্বরের, জাতিভেদ। তাহার পরিচয় কোন মল্যে বাহু আকার নাই, কোন মল্যে কেবল আভ্যন্তর আকার নাই। সেমোক হুত্বই জাতিভেদের পুণ্ড; চাক্ষুর্য স্বপ্নের মহান অজ্ঞান। এইকল সিন্ধু বতঙ্গল না হইয়াছে; ত্রাস তত্ত্বধর্মই অপরিত্র, অল্প স্বপ্নি করিতে প্রবর্ত। এই আভ্যন্তর আকারও পটঙ্গপক্ষীর বাহু আকারের দ্বায় বংশম্পর্শপণ্ডে। তবে—তৎপালনে বাহু আকারের দ্বায় দ্বায়ত্ব ও পরিবর্তিত হইতে পারে। এদ্বায়র বিনে সে অসোবলের কথা না, ভুলিলেও হয়। তরুণ সিন্ধুশাবক, অনাহারে, সিন্ধু হুত্ব হুত্বই কেন কাড়র হউক না, কিন্তু সিন্ধুশাবক, সিন্ধুশাবকই থাকে। তাহার সে উদ্ভোজ্ঞল স্তম্ভিত বৈশ্বক জীবিত হইয়া আসিলেও, বিনিত দস্তর কাল বনন-হুত্বের লাল-নিম্নাশ্রি রসনা সামান্যপ্রাণি-গণের ভাতি উৎপাদন না করিলেও, তখন তাহার স্বপ্নকত্বাদির নথরনিকর হইতে বিজ্ঞত বলাক্ত মূল্যকালজি, স্বপ্নক-পদবীর শোভাবর্জন না করিলেও, মোকে তাহাকে-সেই সিন্ধুশাবকই ভাবে। আর সামান্যদমন স্বতই কেন উষ্ট্রপট হউক না, সেতই কেন বীজম প্রকাশের আদ্যসর স্বপ্নক না, মোহিত লাগুন কীততর করিয়া স্বতই কেন উৎপাদিত স্বপ্নক না, তাহার স্বপ্নক জ্ঞানিতে কিন্তু কাড়র বাহু থাকে না। রাসত বা কেন সিন্ধুশাবকও স্বতই কেন বলিত হউক না, স্বপ্নল সিন্ধুশাবকের সমান সমান পাইতে তাহারও অধিকার নাই। সেহু স্বতই কেন নিষ্ঠুর হইয়া বাহু না, তথাপি

রাসদ-নন্দিনী অগ্নেশ্বরী মৃগাদা। তাহার অনেক
অধিক। এই ভূতই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—
“কঃ পরিতাপ্য হুতাং গাং হৃৎকালপর্যন্তং ধরীম্।”
“হৃৎ-মো পরিতাপ্য কঃ হৃৎকাল পর্যন্ত
বোধনো কাহার প্রবৃত্তি হয়?”

অন্তরিক আকারের একটি সৰ্ব্বত্র ব্যাপ্তিগেণ পত-
পঙ্কাজ জাতিভেদ প্রধানতঃ বাহু আকার লইয়া।
তাই, তাহারিণের বাহু আকার কখনই অস্ত্র জাতিকে
আশ্রয় করে না। সূক্ষ্ম, প্রসন্ন ভিরোহিত হইলেও
বাহু আকার বতপক্ষ, সেই জাতি বনিতা। তাহার
পরিচয় তত্ত্বময়। মনুষ্যের জাতিভেদ—আন্তরিক
লুকার লইয়া, হুতাং তাহাও অস্ত্র জাতিকে
আশ্রয় করে না। অতঃপর, বতই কেন, সাদৃশ্যপালী
কষ্ট না, “আন্তরিক আকারে পরিপূর্ণ, হুত না,
অন্ত জাতির আকার অধিকার করিতে কিছুতেই
পারে না, ক্ষত্রিয় বা শূদ্র, ক্ষত্র্যপবলে স্ব স্ব আন্তরিক
আকার সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ করিলেও, পুত্র রাসদনন্দন
ও হস্তিধারক যেমন দুর্বল সিংহবাহনের সমজ্ঞতি
হইতে পারে না, তরুণ অধ্যাত্ম-দুর্বল ব্রাহ্মণের
প্রকৃষ্ট পুরুষও তাহারিণের অধিকার-ভুক্ত হইতে
পারে না। তবে সমজ্ঞতি-প্রধান হইতে পারে।

যেহেতুও রোগে বা ক্ষিমে অত্যাচারে যেমন ব্রাহ্ম-
কারের নিরোধ (মুহু) বটে; সেইরূপ নিরোধ
পাশে প্রাণস্বাদি জাতিও আকার বিস্তৃত হয়,
ইহাকেই জাতিপাত বলা যায়। বতক্ষণ এই জাতি-
পাত না হয়, ততক্ষণই তাহাকে বংশপরম্পরাগত
পত্ৰজ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করিলে। সৰ্ব্বগুণ (১)
ব্রহ্মগুণ (২) রক্তসমোদগ (৩) এবং তমোগুণ (৪)
এই চারিটা প্রধান উপদ্রব বর্ণচতুষ্টয়ের আন্তরিক
আকার প্রদানে উপযোগী।

“সত্যজিহ্বাশ্রিত্যঃ পূৰ্ণং সিংহকোর রূপে জগৎ।
অজায়ত দ্বিধেয়েণ সৰ্বভাজিনা মুখং প্রজাঃ।”
বক্ষসে রক্তসমজিহ্বাখিবা বৈ ব্রহ্মভোজিনঃ।
রক্তমা অমরা চৈব ধমুজিহ্বাস্তথাকজিঃ।
পত্ন্যমস্তাঃ প্রজা ব্রহ্মা নন্দনং যক্ষসমম।
তমঃপ্রধানস্তাঃ সৰ্বাঃ চাতুৰ্ভুজমিদম ততঃ।

কার্ণব,—নাতসমস্ত প্রজা জগৎ, যদি করিতে
অভিজানী হইলে, তাঁহার মুখ হইতে সৰ্বগুণ
প্রকৃতিসম্পন্ন প্রজা উৎপন্ন হন। বক্ষস হইতে
ব্রহ্মগুণ প্রকৃতিসম্পন্ন, উরু হইতে রক্তসমোদগ
প্রকৃতিসম্পন্ন এবং পদতল হইতে তামস প্রকৃতি-
সম্পন্ন প্রজাপ্রাণের উৎপত্তি হয়। মুখপাত প্রজা

ব্রাহ্মণ, বক্ষসসম্পন্ন প্রজা ক্ষত্রিয়, উরুপাত প্রজা
বৈশ্য এবং পাদসম্পন্ন প্রজা শূদ্র।

ব্রাহ্মণ অথবা হইলেও প্রধান জিহ্বাবিশিষ্ট
হইলেও তাহার সৰ্বগুণপাত প্রকৃতি, রোগবিশিষ্ট
ভৌতিক-মেঘের দ্বারা বহিনভাবে থাকে; আর উক্তম
হইলে প্রভাত-প্রহর শাস্ত্র শতাব্দের দ্বারা পুৰ্ব্বিমা-
রজনী-বিক্রান্ত শতাব্দের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিকৃত
করিত। ক্ষত্রিয় উক্তম হইলে তাহার ব্রহ্মগুণপাত
প্রকৃতি সেই অর্শেই সমগ্রিক উজ্জ্বলতাতা ন্যস্ত করে।
কিন্তু সৰ্বগুণ-প্রতি প্রকৃতি আসিলে কোথা হইতে?
তবে তাহাতে সৰ্বগুণেরও সমাবেশ হইতে পারে,
এই পূর্ণতা; কিন্তু তাহাতে কি হয়—তত্ত্ব তরুণ
হইলে সিংহ হয় না; তত্ত্ব নথী হইলেও সিংহ হয়
না; তত্ত্ব বৃকশী হইলেও সিংহ হয় না; সক্ষম
অথবা সার্থী একবারে মিলিত হইয়া চাহি।
সৰ্বগুণ-মেঘে রোগাণ অগ্নিপ্রজ্বলিত নিশ্বাস হইলেও
ব্রাহ্মণের সার্বিক প্রকৃতি ক্ষত্রিয়ের হইতেই পারে
না। তত্ত্ব-নিশ্বাস অস্ত্র জাতিসম্পন্নও এই নিয়ম
জানিবে। এই ত গেল বর্ণের রূপ।

প্রতিভোমজ সত্ত্বজাতিক ঈশ্বরের স্বষ্টি না
হইলেও ঐশ্বরিক কাৰ্য্যভিতে যে ভিত্তিতে অধ্বস্তিত
প্রতিভোমজ চাণ্ডালদি জাতি যে এত নিকট হই-
য়াছে, তাহার কারণও সেই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া
বহিয়াছে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণীয় সহযোগিতা চাণ্ডালের
উৎপত্তি। পুৰুষেই বলিয়াছি, আন্তরিক আকার
বা প্রকৃতির নশ আন্তরিকপাত একই কথা।
শূদ্রসদ্বিনী ব্রাহ্মণীয় ও ব্রাহ্মণী-সদী শূদ্রের আন্তরিক
আকার তখন বিনষ্ট; নবপ্রকৃতি আসিয়া সে স্থলে
অভিভবিক; সে প্রকৃতি পাণ্ড তমোগুণ; বৃষ্টি পূর্ণ-
প্রকৃতি প্রোতযোনি। এই পাণ্ড-তমোগুণ-প্রকৃতি
সম্পন্ন নরপশুভয়ের সমান সেই প্রকৃতির উত্তরাধি-
কারী; তাহাকে শূদ্রসেপা অধমতম জাতি না
বলিব কেন? একটা আদর্শ মাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত
কইল। সকল জাতিসম্প্রদেই এইরূপ প্রকৃতির
প্রভেদ পুষ্টিয়া লইবে। এমন যত্ন রাখিবে, জাতি
ভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রোত বা প্রকৃতির অধ্যাক্ষিকারী
নিয়ম। ইহা কার্য্যনিষ্ঠ, আমাদের কুসংস্কারও
নহে। স্বপ্ন-প্রকৃতির উদ্ভিত সন্দেহে ইহারও
উদ্ভিত হইয়াছে। শরীরভেদে জাতিভেদ, পশু-
পক্ষী। মহাশয় জাতিভেদ, প্রকৃতিভেদেও প্রকৃ-
তির পার্থক্য বংশভেদে। কিন্তু নিদারুণ পাশে
বংশ-প্রকৃতির বিনাশ হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

নবরসামুদ্র।

রস ত্রিবিধ। আস্থান, আধ্যাত্মিক ও
কাম্যাস্থা। আস্থান রস—কুট, তিক্ত, কষায়, লঘু,
কষ ও মধুর। আধ্যাত্মিক রস—শান্ত, দানু, সখ্য,
বাৎসল্য, মধুর ও প্রেম। কাম্যাস্থান রস—
বীর, করুণ, অমৃত, হাস্য, ভয়ানক, রীতিময়, রৌক-
ও শান্ত, এই নয়টা অঙ্গস্বর শাস্ত্রের অন্তর্গত।
এই কয়েকটা রস উদাহরণস্বরূপ সংক্ষেপে প্রকাশ
করিলাম বলিয়াই ইহার নাম ‘নবরসামুদ্র’।

আদিরস।

নায়ক ও নায়িকার বিষয় বর্ণন।
আদিরস কহে তাই পণ্ডিত হইল।

উদাহরণ।

মহানায়ক শরীরক্ষণ পুষ্করপর সূর্যের রস,
মহানায়িকার উক্তি।

কৃষ্ণ-মালিক-জন্ম।

কাল, ভাল, আলো কর গোহলে।
হাসে, ভালে, নাশে, হুগ অরুণে।
বাটে, মাঠে, গোটে, সেখা, হুবেলা।
রসে, ভসে, মসে, ফিরে সে রূপা।
হুয়ে, চালে, বাঁধে, সেই ত্রিভঙ্গ।
নীতি, নীতি, ভীতি, নাই কি রঙ্গ।
বীণী, হারি-বীণী, ধরে বসনে।
ছলে, চলে, রাঁধে, লগা মলনে।
খুগ, হুগ, মগ, ভালে সঙ্গীতে।
দুশে, রসে, ভাসে তার ভদ্রিতে।
মলা, মালা, রাধানাম বীণীতে।
নীরে, ভীরে, ফিরে যথৈ ভাসিতে।
গানে, ভানে, কাশে, টানে আই গো।
লাগে, বাজে, কাগে, নাহি যাই গো।
হুগ, শঠ, নষ্ট, রঙ্গ সহে না।
ঠারে, মারে, কারে কিছু কহে না।

বীররস।

বন বস্ত্র অস্ত্রস্বর বিষয় বর্ণন।
বীররস ভাসুরে বসনে সুখণ্ড।

করুণরস।

শোকে লোকে মোহিয়া করয়ে হুগু খেই
শান্ত্রে কহে পণ্ডিত করুণরস সেই।

স্বপ্ননাথার ছিন্ন নাসিকা গর্শন করিয়া, লম্বাপতি
রাখণ্ড-কোণে উদার হইয়া খীর বস্ত্রীয় প্রতি
কহিতেছেন।

আশ্রয়কার কথা একি শুনি মেরে সাধ।
কে কাটে ভয়ানক নাসা কে বীর এমন।
তুসেছি রামার ভাই লখা কাটে নাসা।
থলুগে নিকটে থাখা দ্বায়সের জাঁক।
আমর পামর ছুটা কোথাকার নর।
তারা কি জানে না আমি লঙ্কার ঈশ্বর।
লঙ্কার উদ্ধার রবে শঙ্কায় কে রয়।
উদ্ধার পড়িলে কাটি কে না করে ভয়।
কে না মম বন্ধীভূত কে না মম দাস।
কে না, করে রক্ষা এই লঙ্কার নিহাস।
ভাসুর হুগর, গণি ছারে দেয় ভাতি।
অপথলে শমন, শশাক ধরে ছাতি।
বগ্ন-রক্ষ কি নর কিম্বর বেগুণ।
কেনা মম-গুণ গায়, কেনা না-ভেসে রান।
কে না জানে দর্প মোর কেনা মম সেটা।
এ-মান ইরন করে ভিখারী হু বৈটা।
আজ্ঞা মোর শঙ্কায় অনন্ত ছাড়ে তার।
উল্লাতগা রুক্মিণী এ লঙ্কার হুয়ার।
কে মোর নিঃকট করে কিসের গৌরব।
শামিতে নাশিবা পুরি কটাক্ষেই সব।
কে কোথা আমার কাছে পাইয়াছে জর।
চণ্ডী পাড়ে দেবগুণ দণ্ডি পাছে—ভয়।
কেনা ব্রহ্মা কেনা শিব কেনা সে কেশব।
অস্যাগা-শান্দ-মিচ্ছ আমিহি ত সব।
মনে কবি যদি কুবি কুবি করি পাণ্ড।
কটাক্ষে পালন কুবি কটাক্ষে নিপাত।
কোটী ছটা জটধারী কোটা রাখে আর।
পাছেছে মাতঙ্গ-কোণে পতঙ্গ এনার।
যথিত কে পারে আর দণ্ডি হুই জনে।
দণ্ডিত এখন চল দণ্ডক কাননে।
দেহের দেহে দেহের-মোরে শরাসম শর।
সাজ সাজ মাজ রবে সাজ রে ময়ুর।

উদাহরণ।

রামচন্দ্রের আজ্ঞাসারে লক্ষ্মণ জানকীরে বন-
বাস দিয়া অযোধ্যায় প্রতিগমনকালীন শোকসাগরে
নিমগ্ন হইয়া নয়নজল বিসর্জন করত এই চিন্তা
করিয়াছিলেন।

কেমনে জানকী তাকে অযোধ্যায় বাই।
কি করি উপায় কিছু ভাবিয়া না পাই।
কি লেখি কি ভাবি কি বলি কায়।
সোণার অযোধ্যাপুরী আঁধার সেধায়।
আমারে দেখিলে লোক কবে পরপার।
লক্ষ্মী ভোগ্যিয়া এল লক্ষ্মণ পামর।

সত্যজন মাতৃহীন বালকের মত।
সজায় এসিয়া শূন্য কান্ধিতেছে কত।
জানকী কুলের লক্ষ্মী জানে সমুদয়।
অস্থির বিদ্রূহ মত কেহ স্থির নয়।
তাহারা আমাকে লেগে কহিলে বিস্তর।
লক্ষ্মী ভোগ্যিয়া এল লক্ষ্মণ পামর।

রমণীকুলের সার রত্ন বিসর্জন।
রমণী মণ্ডলে কত করিছে রেচন।
“হা হা সীতের! হা হা মাতঃ! হা ছানকী!” রব।
করিয়া নয়নজল তাসাইছে সব।
আমার লক্ষ্মি সবে কহিলে জামর।
লক্ষ্মী ভোগ্যিয়া এল লক্ষ্মণ পামর।

হায় রে, জানকী কেন বিসর্জিছ বনে।
আজি যে বিজয়া যেন অযোধ্যাভবনে।
যাইতে করিছে মন কেমন কেমন।
কে আছে আমার মত দ্বিষ্ট এমন।
জাণ-জাজ্ঞা পাণ্ডিতে ও মাতৃ-বধ ঘটে।
শক্তিতে হাল না মুহা এই জন্ম বটে।
আমারে দেখিলে লোক কবে নিব্বর্তন।
লক্ষ্মী ভোগ্যিয়া এল লক্ষ্মণ পামর।

কুলের পরাভি সীতা কুলের রমণী।
রামচন্দ্র বনে তাঁরে দিলেন আপনি।
সে দেখে তাঁহার নহে সে লোম আমার।
আমি না আনিলে বনে কে আনিত আর।
এই ভাবি কহিলেন রাম দ্রুতব।
লক্ষ্মী ভোগ্যিয়া এল লক্ষ্মণ পামর।

কি না পারে করিতে এ পাপায়া লক্ষ্মণ।
নগ্নপতি আমার কণ্ঠি জনকীর বন।

যে কুলেতে কীর্তি হয় সগরের সিঁদু।
যে কুলেতে কীর্তিমান রত্ন বশ-ইন্দু।
যে কুলেতে কীর্তি গণ্য ভগীরথকৃত।
যে কুলেতে হরিশ্চন্দ্র কীর্তিধামকৃত।
যে কুলেতে কুলকীর্তি সম্বলনসেবন।
সে কুলেতে মম কীর্তি লক্ষ্মী-বিসর্জন।

অদ্বৈতরস।

অবতন-বটনা বর্ণন যেই হক।
তাহারে অদ্বৈতরস পণ্ডিতেরা কয়।
উদাহরণ।

শ্রীমন্ত সদাগরের কন্ঠে কানিনী দর্শন এবং
কাণ্ডারীর প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি।
একি একি অঙ্গপল হের রে কাণ্ডারী!
কালীদাহ-কমলে কন্ঠে কায় নারী।
কে কোথা-দেখেছ বন আশ্চর্য এমন।
পুনঃপুনঃ প্রাণে আর উদ্গার-বারণ।
হাসে আর প্রাণে গজ, তাগে ম'রে যাই।
এমন আশ্চর্য কত চক্রে দেখি নাই।
এইত আশ্চর্য এক নারী প্রাণে গজ।
আবার আশ্চর্য কালী-দেহেতে পঙ্কজ।
পঙ্কজে পঙ্কজমূর্তি কেঁ বামা এমন।
পঙ্ককে পঙ্কজ রূপে বলকে কিরণ।
কেশরিনির্মিত কটি কত শোভা পায়।

একে চাকচক্ষুসনা বিদ্যাবরা তায়।
হের দেখে চিত্ত-বরণে কত জ্যোতি।
এ যেন কনকপায়ে শশাঙ্কের ভাতি।
কমলে কনকলপ শোভে কি তরুণ।
বেতাল-নিধনের ঘেন উদ্বিগ্নে অরুণ।
জলে দেহপ্রতিবিম্ব উজ্জলে কি হার।
নীরসের কোণে যেন বিদ্রূহ বেলায়।
কনক-মণ্ডাল ক'র প'র কর-স্তল।
জ্যোতিতে মলিন হয় জলের কমল।
রাম-রসভাস্কর নয় উৎসমতুল।
বরণ কনক-স্তরে মিশ্রিত হিঙ্গুল।
ভুরুভক্তি দেখিয়া এমন অহমাবি।
ভয়েতে বীরিষ্ঠা যেন কামধেনু ধানি।
কে এ বামা-মমোরা কিস্ত ভাস্করী।
অনিবার ঐ যেন সে প্রাণে স্বয়ং করী।

হাস্তরস।

চন্দ্র রত্ন প্রসঙ্গ বইয়া কাব্য বেই।
পণ্ডিতে বলিয়া থাকে হাস্তরস সেই।

উদাহরণ।

কলিকালে প্রায় সমস্তই হাস্তরসপূর্ণ। বেথানে
হাস্তরস, সেই থানেই নব্য ভব্য সভা মহোদয়গণের
মহৎ রচিত আবির্ভাব। সেই রচিতেই ধর্মপক্ষে
উপস্থিত অসুচি, প্রকাশ পাইতেছে। কলিতে
হাস্তরসের মত-সুখই বৌ-বাবু।

কলির বৌয়েরা বিদ্রি মা হয়েছে বাদী।
বাপের মাথায় মোট কেটে যায় চাদি।
বাবুর টায়েতে বড়ি ইষ্টাকীন পায়।
মুখিখানি কোল-খানা মুক্তি-কোট পায়।
সম্পর্ক বৌয়ের সঙ্গে আর সব ফাঁক।
কালের চক্রে ঘুরে দে-পাণ্ডে দে-পাণ্ড।
হট হাট শব্দ মুখে বিন্যা চমক-পায়।
কেবল বৌদের কাছে জুজু-অবতার।
জাতি গেছে থানায় বিদ্যায় গেছে কুল।
এরহিত কলিযুগে হাস্তরসময়।

ইতিাদি।

ভয়ানকরস।

যা দেখিয়া যা ভয়ানক ভয়ে কাঁপে কায়।
পণ্ডিতেরা ভয়ানকরস কহে তায়।

উদাহরণ।

চামুণ্ডাবীর রক্তজালে জাসিত হইয়া শুভ্রসৈন-
গণের পরস্পর লগলগি।—
কেহে, সমরে বিলাসে, বন বন হাসে,
অশুর বিনাশে, রঙ্গে।
মরি, ক্রিয়া রূপছটা, নব যমঘটা,
বন রক্তছিটা, অশ্রুে।
কিবা, ভয়ানক ভয়ী, কেহ নাহি সঙ্গী,
যেন, রে মাতঙ্গী, ক্ষিপ্ত।
যেন, বিরোধে জয়ন্তী রূপে নামে ধ্যাত,
মুখে শাশকান্তি লিপ্ত।
করি, দ্বন্দ্ব কটাক্ষ, নামে শত্রুপক্ষ,
দুবিজা তেলোকা কর্তী।

বামা, রঙ্গিণী-আদর্শ, গভীর কি-হর্ষ,
নাহি পায় স্পর্শ, অগ্নি।
করে, সমরে কি পুষ, নাহি পুষ-ভঙ্গ,
ভগ্না বধীশ হস্তা।
জামে, অশুর উচ্ছিন্ন, নহে কিছু ভিন্ন,
ওঁহা সে ছিন্নমস্তা।
রঙ্গে, নাহি কোন লজ্জা, নাহি কোন যজ্ঞা,
প্রাণে নবমজ্ঞা, রক্ত।
রণ, রঙ্গিণীর কাম্পে, অগ্নিদল, কাম্পে,
করে বামা দন্তে, ভক্ত।
বিদ্রূহপণ্ডিতজ্ঞঃ।

যামিনী, রঙ্গিণী, কানিনী, হের রে।
যন্ত্রতা ও কড়া, কি, জতে, সমরে।
রুখিণে, হারিছে, ভাসিছে, কি রঙ্গে।
ভাবনা, মগনা, ছন্দনা, ভগ্নে।
কি ভঙ্গা, উল্টা, ও স্টা, কেহ না।
সমরে, বিহরে, নাহি রে, ভূতনা।
কে গুটা, বিকটা, কি ছটা, লাভনা।
অগ্নি, নানিনী, তরুণী, ও কটে।
চিনি না, জানি না, ললনা, ও কার।
খরিছে, মারিছে, করিছে, চাঁৎকার।
কে জানে, এ রঙ্গে, কি কণ্ঠে, উদয়।
অকালে, অকালে, বিবরে, হৃদয়।
কে বাণা, চকনা, চপনা, সন্ধানী।
কি দীপা, ও দীনা, নূরীনা, যোড়নী।
চরণ, বরণ, অরুণ, মেঘাতি।
পলকে পলকে রুলকে, কি জ্যোতি।
ঈশকে, সূরকে, চমকে অধনী।
এ গদা, সর্পলা, ভীমা, রমণী।

উপজ্যোতিষ্কঃ।

এ ভাল নারি রণরঙ্গমানে,
মুমুখমানে গলদেশ মারে,
রক্তে কি শোভে তনু-মেঘনীলা,
মাজে কি পক্ষে নব-বাধহলা।
কৃশাধু ভালে বির অঙ্গ বাধা,
রক্তে কি নাচে ভনি নাশি বাধা,
অপেক্ষে লগে অকালে কি সজ্জা,
কে হেন বামা কত নাহি লজ্জা।

বীজসংসার।

দ্ব্যবস্থিত আর স্থপিত বিষয়।
তাহাতে বীজসংসার পদ্ধতিতর। কয়।

উদাহরণ।

তৎকালীন মধ্যে ব্যাধ কালেকতর ভাড়া মুম্বা
ব্রহ্মসী জগদগুরু দেখিয়া রাগে ও বিনয়ে
কহিতেছে—

পর্যায়।

‘কে তুই মুম্বারী নারী ব্যাধের আশ্রয়।
ও তোর বদনে যেন উদয়ের উদয়।
মুম্বারি যুগের রূপ যে দেখি গো তোর।
আসিতে পথে কি তোরে দেখে নাই তোর।
পাক্কা তেলোহাচ বেনে দুই খানি ঠেট।
অথবা তুলনা দিতে মিউরীর ধোঁট।
নাকটী বশীর মত কাণ হুটী বক।
কপালে মিস্ত্রবিন্দু রাঙ্গা টুক টুক।
বাতাবি গেরুর মত হুঁখানি গ্যাল।
হাঁদ খানি মণ নয় চাঁদ খানি ভাল।
কাণের নিকটে টানা জুকুর কি জোর।
লাজ নাড়া পাখী যেন চকু হুটী তোর।
সেখিতে হাতীর ভুড় তোর উরুদেশ।
স্বাত্তল চাকা মাগে পাতগুলি বেশ।
ঠাটখানি মাল নয় পাটারগী প্রায়।
ব্যাধের মলিনে কেন এলি গো ঘোঁরায়।
চোদিকে গড়র বুক ছড়াছড়ি সব।
অস্থি লয়ে খেওখেই ফুস্কুরের রব।
কেউ কেউ শিরাসের ডাকে লাগে ভয়।
কই পই শহুনি উড়িতে সমুদ্র।
কই কই কাটিছে পোকায় পচা মাস।
চট চট রকতে হুঁড়র চারিপাশ।
পট পট পটুটী ছাখিছে ফুস্কুর।
বপটাতলা ছড়াছড়ি দেখ মা প্রচুর।
সরুসাই পুচাপুচে মুখে উঠে জল।
হুগুগে পায়ের লোক পলায় সকল।
মাংসের কতানি বরে গড়াইয়া যায়।
ঝাঁকে ঝাঁকে কাক আসি টুকরিয়া যায়।
এ বরে আসিয়া তুই কি দেখিছ চেয়ে।
বোঝ করি হবি কোন বাসনের মেয়ে।
বোঝে তোর রূপ সজ্জা যে কাল উপট।
এখনি বণিবে লোক এ কোন ফুলট।

রৌদ্রসংসার।

রুদ্রভাব বাহাতে প্রকাশ সমুদ্রয়।
সেই কাব্যে রৌদ্রসংসার মুনখণ কয়।

উদাহরণ।

মহাশ্য বিখ্যামিত্রকে সমস্ত দান করিয়া মহা-
রাজ হিরিচন্দ্র প্রথমতঃ বনবাসী হইল। তদনন্তর
দায়নের দক্ষিণা জন্ম বিখ্যামিত্রের ধোরতর শাসনে
সমাপ্ত হইয়া কানীর মণিকবিরার বাটে জগদ্বান
করিয়া ও ভিল্লাজীবা হইয়া যারপর নাই মহাপ্রভ
ভোগ করিয়া থাকেন। কথা ছিল ত্রিশংখ বিবসে
দানের উচিত দক্ষিণা দেওয়া হইবেক। সেই দিন
রুদ্রভাবে ভগবান বিখ্যামিত্র সেই স্থলে উপস্থিত
হইয়া মহারাজ দক্ষিণাদানে দক্ষিণা চাহেন—

আমীরাজ মহারাজ ত্রিশ দিন যায়।
এই বিখ্যামিত্র সেই দক্ষিণাটা চায়।
আর না বিলম্ব হয় শীঘ্র দিন যিনি।
দিন দিন কলিই বলিবে দিন দিন।
উচিত দানের সঙ্গে দক্ষিণা বিদায়।
দক্ষিণা কি ধারে চলে এত বড় দায়।
তুমি হলে মহারাজ রাজস্বক্ষেপণ।
আমি দান কত দিন গণিব হুকুর।
বামের টোকে আর দ্রুত দেন কত।
দিলেইত চলে যাই ভিক্ষকের মত।
এইত দুর্গম পথ এই গৌড় তাত।
এখানে এসেছি তু নাহি দৃষ্টিপাত।
দ্বিবার কথায় কোন বিমুখ এখন।
বধায় ভাবেন বুনি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
আমি বিখ্যামিত্র তব সে বামণ কই।
নষ্ট হন পাছে তাই পট কথা কই।
এখানে মঙ্গল যদি চান মহারাজ।
কণ দিন শীঘ্র দিন কথায় কি কাজ।
এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মভেজে সমুদ্র শুকায়।
স্বর্ঘ্যবল সমাপ্তি সর্বদা ইয়ায়।
ইন্দ্র চন্দ্র অক্ষর বরণ যায় মানে।
সেই বিখ্যামিত্র বন্ধ হুহু এক দানে।
বার বার আসি আর কিরে যাই বর।
এক আশুপাণ্ডি ব্যাধ আমার উপর।
এই তথ্য করি তবে দেখন এখন।
জানিবেন বিখ্যামিত্র বাসন কেমন।

শান্তরস।

কাম ক্ষোভ আদির প্রশম হয় যায়।
কার্যহলে ঋষি কহে শান্তরস তায়।
উদাহরণ।

ও মোর পারম মন গত হয় দিন।
চুলে ত মর না তুমি শমন অধীন।
দিনকরহুতদন্তে ব্যাকসিক কর।
নিকট বিকট সেই দিন ভয়ঙ্কর।
নাম মূদ্রিবে হবে শমন ধরায়।
চরাস্তর স্বাক্ষরার দেখিবে ধরায়।
কোথা হবে দারাহুত কোথা হবে মর।
সংসার মায়ার বাজি কেবল নখর।
‘ধামার’ বলিয়া বারে করিছে স্নেহ।
চিতায় হইবে তথা নখর এ দেখ।
মাটিতে নিশাংবে মাটি জলে যাবে জল।
তেজোতে বাইবে তেজ বিমিত সকল।
শূদ্রে শূদ্রে পবনে পবন অংশ যাবে।
আমি আমি শূদ্র-খুজে তখন না পাবে।
তুমি যাবে প্রাণ যাবে সব যাবে মুখে।
ক্রমেতে হু-রিন বই নাম যাবে মুখে।
কি কাজ করালি মোরে কি কাজ করিলি।
এমন রসিক নাম বিদগ্ধন দিলি।
রসবিন্দু নাই ইহে নামমায়ার।
সে দেখ আমার হটে দোষেতে তোমার।
ভক্তির রসেতে রসি যদি থাক ঠিক।
তুমিও রসিক হবে আমিও রসিক।
রসিকের দেহে থাকি এই কর সম।
ব্রজের রসিকে ভজ রসিকেশ্বরন।
রসিকে রসিক কর ভাবিয়া সে যার।
নবুবা রসিক নামে কাক কি আমার।
তাল নাই নাম তাল-পুহুর যেমন।
আমার রসিক নাম জানিবে তেমন।
এ নাম সন্দের সাধী সঙ্গে সঙ্গে যাবে।
আমিও মদিব স্নানি নামও যুাবে।

শ্রীসরিকচন্দ্র রায়।

অগ্রদ্বীপ।

নবদ্বীপের আর অগ্রদ্বীপও একটি বঙ্গের
প্রাচীন স্থান। পূর্বকালে পুণ্ড্র-তোয়া ভাগীরথী
নিশাল-কারা ছিলেন এবং বিভিন্ন-পথান-লখনে
প্রবাসিত হইতেন, তাহা বোধ হয়, পাটক্লিপের
অবদিত নাই। তাৎকালিক ভাগীরথী-প্রবাহ-
পথের সম্রিক্তস্থ অনেকগুলি স্থানের নামের সঙ্গে
দ্বীপ, ‘মহু’, মাপর ও ডাক্তা প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানগুলির
মধ্যে কতগুলি ভাগীরথীর বর্তমান স্রোতের
তীরবর্তী এবং কতগুলি বা দূরে সমুদ্র। কতক
প্রাচীন কালে ভাগীরথী বধন ‘বুহু’, জল-স্রোত
ছিলেন এবং অল্পপথে প্রবাহিত হইতেন, কংকলের
মাধ্যম সময়ে সময়ে—অগ্রে পশ্চাতে—এই সকল
গ্রাম, নগরী, সংস্কারিত হইয়া থাকিবে। অগ্রদ্বীপ
তাহাদিগের অন্ততম।

১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে অন্ধিত ভানডেন ক্রকের
মানচিত্রে ‘অগ্রদ্বীপ’ ‘খুগদিয়া’ নামে উল্লিখিত হই-
য়াছে। এই মানচিত্র বানির প্রতি লক্ষ্য করিলে
বিলম্ব একটী প্রান্তিক্রম বিষয় আমাদের দৃষ্টি-পথে
পতিত হয়। উহাতে অগ্রদ্বীপ ভাগীরথী অন্বেষ-
িত বামতীরে এবং গাভিপুর মুনিগুহুলে ‘অন্ধিত’
‘রহিয়াছে। এই নগরদ্বয় এক্ষণে উক্ত নদীর দক্ষিণ
তীরে অর্ধ জলস্রোত হইতে অনেক অন্তরে
সম্মিত। কিন্তু এই নগর দুইটি অধুনা এককি
ক্ষুদ্র বিল দ্বারা বিভক্ত ও আর একটী বুহু অর্ধ-
বৃত্তাকার গাল বা বিল কর্তৃক বেষ্টিত দেখিতে পাওয়া
যায়। (১) অধ্যাপক ব্রহ্মমান সাহেব বলেন যে,

(১) ‘‘Hugdia is Agradi.‘‘ Van den
Brouckes map gives here an interesting
particular. He marks Tlagdia on the
left bank of the river, and Gasiapur
(Ghaziapur) on the right bank. Both
places ‘lie now far from the right bank,
with only a small lagoon between them
and a large semi-circular lake round
both.’ Vide Journal of the Asiatic
Society of Bengal - Vol. XLIII
1873 P. 220.

বঙ্গাঙ্গার অস্থায়ী স্থানে বৈষ্ণব সেবিতে পাওয়া যায়, সেইসঙ্গে এই বিলটি ভাগীরথার প্রাচীন পূর্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পরে যে এই পরিবর্তনটি সংঘটিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (২)

উল্লেখ্যকৃত সাহেব তাঁহার পুস্তকে অগ্রদ্বীপকে 'আলদাঙ্গ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রেনেল সাহেব যখন তাঁহার মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তৎকালে অগ্রদ্বীপ ভাগীরথীর বামতীরে সমিষ্টি ছিল। কাহারও কাহারও মতে এই পরিবর্তনটি আরম্ভ কালে সংঘটিত হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে যখন যেন্নারি মার্টিন সাহেব এই স্থান পরিদর্শন করিতে যান, তখনও তিনি অগ্রদ্বীপ ভাগীরথার বামতীরে সংমিত দেখিয়াছিলেন। (৩) ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামের নামকরণ—কার্টোয়াস—নিম্নকাসিমের সৈন্যদল ইংরেজদের কর্তৃত্বপূর্ণরূপে হয়।

প্রায় সার্ব্ব তিন শতাব্দী হইতে প্রত্যেক বৎসরের চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপে অতীব উৎসব ও সমারোহ-সহকারে বার্ষিক মেলা হয়। এই সময়ে উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী গোপীনাথ বিগ্রহকর্তৃক শোভাযাত্রার শ্রাব্দ সম্পাদিত হয়, তত্ত্বপক্ষেই এই মেলায় সন্দেহ নাই। কলিকাতা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে বহির্ক ও বৈকানী-সমরগণ অনায়াসে বিবিধ জাতীয় পণ্য-দ্রব্যাদি লইয়া মেলা-ক্ষেত্রে সমাগত হয়। এই মেলায় অত্যন্ত ন্যূনসংখ্যার পক্ষসংমিত সহস্র তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারী যোগের সমাগম হয়। সাত দিবস কাল ব্যাপিয়া এই মেলায় গতি হয়। এই লোকসংখ্যা-দৃশ্যের প্রথম দিকেই শ্রীশ্রী গোপীনাথ তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা শোভাযাত্রার শ্রাব্দক্রিয়া সম্পন্ন

করিয়া থাকেন। (৪) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মেলায় সমাগ এই স্থানে এক লক্ষ লোক সমবেত হয়।

বহুলাংশ হইতে অগ্রদ্বীপ গ্রামের অন্তর্গত থাকা-মধ্যেও শ্রীশ্রী গোপীনাথ দেবের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা কালাবধি এই স্থান প্রাচীন। শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেবের শিষ্য শোভাযাত্রার কর্তৃক সাধু তিন শতাব্দী পূর্বে শ্রীশ্রী গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ যমিন শ্রাব্দ জলকর্ষণ হইয়া শ্রীমূর্তি আজও ভক্তদেবের মন-প্রাণ পবিত্র করিতেছেন।

অগ্রদ্বীপের সহিত যে শোভাযাত্রার বিশেষ সমিষ্টি সম্বন্ধ; তাঁহার বিষয় ক্রিষ্ণে বিবৃত করা উচিত।

হরি-নামস্তু হুইহিতে হুইহিতে, হরি-তন পান রাখিতে গাঁহিতে,—অষ্টমৈ, নিত্যনাম, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ-পরিগত হয়। শ্রীশ্রীভক্তদেবের নবদীপনাম পরিচয় পাইয়া তীর্থ-যাত্রার বিভিন্নত নাই। পূর্বাভ্যাসে ততালিনী ভাগীরথীর বামতীরে বর্তী পথাবলম্বনে জাহ্নবীর তটে তটে তাঁহারা পবিত্র স্থান অন্বেষণে হিমালয় অধিবাসন করিবার মানস করিলেন।

এবং জাহ্নবীকুলে তাঁহারা রান্নাবি-ক্রিয়া পরি-মাপন করিতেছেন, এমন সময়ে ভক্তগণের শ্রীগোবিন্দচন্দ্র যোগে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ কাশ-কলোত্তর ছিলেন, তাঁহার নিমিষ্ট বাস-স্থানের বিষয় কেহ অবগত ছিলেন না। তবে এখানে একটা ক্রান্তি আছে যে, অগ্রদ্বীপে অনতিদূরবর্তী বৈষ্ণবত্যা-গ্রাম (৫) তাঁহার ভবন হইল,—অগ্রদ্বীপে সেই গ্রাম মধ্যে 'বোবা'-উপাধি-যাত্রী কাহ্নবিশিষ্টরূপে গহিয়াছে; অতএব বলেন, গোবিন্দ সেই বংশসম্বৃত। বাহাই হউক, তাৎকালিক অবস্থায় গোবিন্দের বিশেষ সমাগ ছিল, তিনি নিম্নলিখিত, সুদৃশ্যশ্রী পুরোক্তকৃত। তাঁহার প্রকৃতি অতীব উষ্ণ; জলর অচল-ভক্তিপূর্ণ এম

(৫) Vide Statistical Account of Bengal Vol II p. 55 & 56 by W. W. Hunter Esq.

(৬) ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান "সাদৃশ্যবিশ্ব" নামক পুস্তকে গোবিন্দ যাত্রী বৈষ্ণবত্যা বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু "জিহ্না-বংশাবলী-চরিত্রে" কলিকাতা ব্রাহ্মণ্য বিদ্যা উল্লিখিত, সেইসঙ্গে গণনা দান।

দ্বৈব-অসীম বিশ্বাস ছিল। তৎপ-সম্পাদী চৈতন্য দেবের ধর্মে মাত্রই তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া গোবিন্দের ধারণা জন্মিল। শ্রীভক্তদেবের দীপ্তিময় মূর্তি হইতে স্বর্গীয় তেজঃ বিকশিত হইতেছে তিনি দেখিতে পাইলেন; তিনি মহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া কান্দিয়া বলিয়া উঠ-লেন,—“প্রভো! আমি সংসার চাহি না, হৃৎ-কোষভিলাষ রাখি না, ধন-মান প্রত্যাখ্যাত কিছুই লিপা নাথি, তোমার প্রতি এইমাত্র কৃপা কর—যে, তোমার সর্ব অলম্বন করিয়া কেবল জ্ঞ চরণস্থল সেবা করিতে পারি।”

ভক্তদেবের মুখনিঃসৃত এবং বর্ধি বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তদেবের অতীব প্রীত হইলেন। গোবিন্দের বৈষ্ণব্য পূজা করিবার জ্ঞান তিনি সাংসারিক হৃৎ-ভোলাপরি নানা প্রকার উজ্জ্বল ছবি তাঁহার সমুখে ধারণ করিলেন। কিন্তু কোনপ্রকার প্রলোভন তাঁহার মন বিচলিত হইল না, হিমালয়ক-কাল জলপ হইয়া গেল। 'গোবিন্দ, কদিলে প্রতিষ্ঠিত বলিলেন,—“প্রভো! আর এ দাসকে মোহাঙ্ককারের অতল জলে নিমেষ করিও না। মসার, হৃৎ, ধন, মান, ঐশ্বর্য,—তোমার চরণে দেও।—হান দেও প্রভো! তোমার ঐ শব্দ-পঙ্কজের মূলে।”

ভক্তদেবের অতীব প্রীত হইয়া গোবিন্দকে আশ্বিনন করিয়া বলিলেন, “চিন্তা নাই, ভক্ত, আমার মধ্যেই থাকিলে; কিন্তু নিম্নকম-ত-পালন যাত্রার পক্ষে অসমর্থ, যে সকলী, যে যাত্রার-বাসনা পরিচায়িত করিতে পারে নাই,—এই আমায় তীর্থযাত্রার স্বপনাদি হইতে পারিবে না।” তুমি যত্নপূর্ণ এই সমসার বহির্গত হইয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্যে আমার সঙ্গী হইতে পার।”

সকলের চান যে গোবিন্দের কর-কবলিত হইল; তিনি মহোদ্যমে ভক্তদেবের পদে পুণ্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “দেব! অজ হইতে নিম্ন-ব্রত অলম্বন করিয়া; আজ হইতে এই পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর পূর্বাভ্যাসে তোমার সঙ্গী হই-লাম।” সেই দিবস হইতে গোবিন্দ ও মহাপ্রভু ভক্তদেবের তর্পণশ্রীতমের মধ্যস্থতা আর আমায়

এইরূপে পদপ্রভে ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্তদেব-সহকারে গোবিন্দদেব কলিকাতার নির্মলসলিলা পরিবেষ্টিত প্রদ্বার-কূলপাশে অগ্রদ্বীপে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আহারাদি

সময়ে সমাহিত হইল, কিন্তু মনস্তত্ত্বের সামগ্রী কিছু আর সে বিষয় ছিল না। ভক্তদেবের মুখপানে চাহিয়া, ভক্তদেবের বলিলেন, “আজ আর মন-ভক্তিপূর্ণ কিছু জটিল না।” ইহা শ্রবণে ভক্তদেব সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। কারণ, নিম্নক বৈষ্ণব্যের সঙ্গ নাই, কলি কৌশল কে কি পাইবে। কিন্তু গোবিন্দ এখনও কামনা-বিরহিত হইতে পারেন নাই; অতএব করোড়ে নিমেষন করিলেন, “প্রভো! আমার নিকট হরীতকী আছে, যত্নপূর্ণ অহমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেরার জ্ঞ অর্পণ করি।”

ইহার প্রত্যক্ষদে ভক্তদেবের জিজ্ঞাসা করিলেন, “চাচিমাংজ তুমি কোথা, হইতে হরীতকী পাইবে?”

গোবিন্দ উত্তর করিলেন, বাহার একাধি কলি রিয়াছিল, ইহা তাত্ত্বার অপরূপ।

এই বাক্য শ্রবণে গোবিন্দদেবের অপর প্রান্তে দ্বৈব হারসেবা বিস্মারিত হইল। তিনি বলিলেন, “স্বপ্নমি! ভক্তির সামগ্রী অবশ্যই গ্রহণীয়, অতএব প্রীতির সহিত তোমার হরীতকী গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে, তোমাকে আমাদিগের সঙ্গ পরিচায়িত করিয়া পূর্বে প্রত্যাপনন করিতে যেন।

এই বাক্যে গোবিন্দের সন্তোষ হইল, সহসা অশনিপাত হইল, জ্বলে শোশ বিদ্ধ হইল, দর নিখতিত খারে চক্ষু গিয়া অর্ধ প্রবাহিত হইতে লাগিল। করোড়ে সকাতরে গোবিন্দ বলিলেন, “প্রভো! এ দাসের কি অপরাধ হইল, শ্রীভক্ত-সেবার কি ত্রুটি হইয়াছে, আমার প্রতি এ কঠোর আদেশ কেন হইতেছে?

গোবিন্দদেবের মধ্যে বলিলেন, “গোবিন্দ! তুমি যাত্রা কর! ভক্ত এবং হরি-ভক্তদের সম্পূর্ণ অধিকারী, কিন্তু সংসার-বাসনা এখনও পবিত্র হইয় নাই, তুমি গৃহে কিরিয়া যাও,—সমসারের শিষ্ট পাকিয়া দ্বৈবপোষা। করিও, তাহা হইতে তোমার শ্রাব্দ হইবে।”

গোবিন্দ সজল-নয়নে, অতি কাহারও বলিলেন, “প্রভো! আমি বিশুদ্ধ সুরিয়াছি,—সমসারে কিছু জ্ঞ নাই, তোমা ব্যতীত এ সংসারে আর আমার কিছু নাই, সর্বত্র পরিচয় করিয়াছি, সমসারে আর কিরী না।”

ভক্তদেবের মেহ বচনে, অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন, “গোবিন্দ তুমি কলি টিক অলম্বন।

(২) “The lake as elsewhere in Bengal is the old bed of the river, which now follows the shorter route along the chord of the loop. This change, therefore, took place after 1600.” Vide contributions to the History and Geography of Bengal by H. Blochman Esq. M. A.

(৩) Vide Calcutta Review Vol I p. 525 26 Dear 1846.

করিতে পার নাই। যদিও কোন অবাধি সমগ্র কর নাই বটে, কিন্তু হরাতকৌটি সঙ্গর করাই ভোমার পক্ষে বিষম হইয়াছে। অন্য হরাতকৌটি সঙ্গর করিলে, কলা হয় ত আর একটি অভিনব সঙ্গরের সৃষ্টি হইবে, এইরূপ কামনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে। কামনাই গন্তব্য পথের কণ্টকবরণ হইয়া সর্বদা উপস্থিত কর। ভোমার সেই কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ভাশ প্রাপ্ত হয় নাই। আমায়ের গন্তব্য পথের এবং ত্রস্তের পক্ষে ইহা ঘোর অসিদ্ধকরকরণ; অতএব তুমি আপাতত আমায়ের মঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাও, ভোমার আশা সম্পূর্ণ হইবে।

এই বাক্য শ্রবণে গোবিন্দের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আশা-ভরসা সমস্ত এককালে অতল জলে ডুবিয়া গেল, তিনি আর কিছু না বলিয়া কেবল মহাপ্রভুর মূখ পানে চাহিয়া রৌদ্রন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব অনেক প্রকারে প্রবেশ দিয়া বলিলেন, “সুপ পরিত্যাগ করিতে বলিলাম বলিয়া এরূপ ধন্যই তাহাও না যে, তুমি আমার অন্তর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে। গৃহে প্রত্যাগমন কর, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি সন্মত করিয়া থাক, তুমি আমার লক্ষ্য স্থান রহিলে, ইচ্ছা ভোমার পূর্ণ হইবেই হইবে।”

আবার গোবিন্দ পৌরসের চরণ-প্রান্তে অবলুটিত হইয়া কণিজ্জ কানিতে বলিলেন, “প্রভু! আমার ভাগ করিলে, কিন্তু এ অবশ্য যেন ভাবিয়া সঙ্গর দেখা পায়। গৃহে আর কিরিত না; যেখানে আছে আমি প্রভু-সঙ্গ হারাইলাম, যেখানে আমার আশালোক-প্রদীপ্ত হৃদয় শোরাগন্ধারে সমাহরণ হইল, সেখানে আমার মূগ্ধসম অদৃষ্ট ভাঙ্গিল, সেই হানেই জীবনের অবশিষ্টকাল, অতি-বাহিত করিব। গদ্যর এই পবিত্রনীর-তীরে, এই অগ্রদূতের ভোমার এই দাসস্বাস্থ্যবাসের নীল-কুটার থাকিলে, প্রভু! হৃদয়টি স্বধন অমর্যাদাযুক্ত মনে পড়ে, তাহা হইলে এই কুটারে আসিয়া দর্শন দিও।”

আশাশূন্য বচনে চৈতন্যদেব বলিলেন, “গোবিন্দ! ভক্তিসংস্কারে ভোমার হৃদয়-মন্দিরে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখ; ভোমার ভবিষ্য-জীবন আলোকে বিভাসিত। গৃহে যাও—অথবা এখানেই থাক, আর এক দিন ভোমাকে আমি দেখা দি, সেই দিন ভোমার আশা পূর্ণ হইবে।”

পৌরসদের প্রবেশ-বাক্যে কণিজ্জ আশস্ত হইয়া গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু! সে কতদিন পরে? কতদিন ভোমার দর্শন-স্থল হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে?”

মহাপ্রভু বলিলেন, “কবে ফিরিব তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু একটি কথা মূগ্ধ গুরু, যে নিমিত্ত জীবনে ভোমার কোন অলৌকিক অভিনব ঘটনা সংঘটিত হইবে, তখন জানিও আমার আপদন মরিতক হইয়াছে। আর হৃদয়টি সেই অলৌকিক ঘটনার কোন সামগ্রী প্রাপ্ত হও, আমার আপদন কাল পর্যন্ত তাহা বহরসংস্কারে রাখা করিবে, তাহার কোন প্রকার পরিবর্তন করিবে না; আমি আসিয়া যাহা কর্তব্য করিব,”

তখন মহাপ্রভু অজ্ঞাত ভক্তবলে পরিবৃত্ত হইয়া হরিগুণগান বাহিতে বাহিতে এবং হরিগোবিন্দ বলাহতে দিলহিতে, অগ্রদীপ-ধামকে পূজাতে রাখিয়া এবং ভক্ত গোবিন্দকে শোক-মাগরে ভাসাইয়া তাঁর-পৃষ্ঠদেশে পুনর্বার বর্ণিত হইলেন। গোবিন্দ, মৃদুগ নয়নে তাঁহার আশাপথ পানে চাহিয়া থাকিলেন।

পৌরসদের বিদায় হইলেন,—পথপানে চাহিয়া গোবিন্দ অবিরল অশ্রুমেঘেচন করিলেন। একবার ভাবিলেন প্রভুর চরণ ধরিয়া কানিলে কি তাঁহার দয়া হইবে না, সঙ্গে লইয়া বাইবেন না? আবার ভাবিলেন প্রভুর নিষেধ বাক্য,—সঙ্গে থাকিলে প্রভুর ব্রতপালনে অধিব্যক্তক বাটতে, অমনি নিঃশব্দ হইলেন। যদিও গোবিন্দের ধন্যমাপদের অভাব ছিল না, তিনি এক জন মূগ্ধমণ্ডলী গৃহে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমসারে গৃহে বহিবার আর প্রবৃত্তি হইল না,—গোবিন্দ আর গৃহে ফিরিলেন না। অগ্রদীপ-নিম্ন-প্রাচীরে উত্তর-দামিনী ভাগীরথী তীরে একখানি ক্ষুদ্র কুটার নির্মাণ করিলেন। সেই পবিত্রতীর, তাঁহার আশ্রয় হইল। সেই হানে উপবেশন করিয়া ভক্তিব্যোগে হরি-সামান করিতেন। কল্যাণিনী জাহ্নবীর কল্লাল শব্দের সহিত স্তম্ভের মিশাইয়া হরিগুণ গান করিতেন এবং যথা সময়ে হারো হারো হরিনাম কীর্তন করিয়া ভিজ্ঞা করিয়া উদর পূরণ করিতেন।

এইরূপ বহুদিন কাটা গেল, চৈতন্যদেবও ফিরিলেন না, এবং কোন, অলৌকিক ঘটনাও সংঘটিত হইল না; দৈন্যশ্রমেই আসিয়া ক্রমশঃ হৃদয়কান্দ খেরিতে লাগিল। গোবিন্দ ভাবিলেন,

মহাপ্রভু! গুণি আর ফিরিলেন না। কত সমাদৌ কত প্রবচনারী আইসেন—যান, কিন্তু কেহই প্রভুর কথা বলিতে পারেন না। তিনি এইরূপ উরিখভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর কাটাইলেন। মৃদুসম সমুপস্থিত,—কল-মূল ও নট প্রাচীরে জংখ হাতুসম, ভাগীরথীর কায় দীপ্ততা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সময়ে একদিন গোবিন্দ ভাগীরথীর গাশিলে আশ্রয় নিশ্চিন্ত করিয়া হরিধামে নিমগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা দ্রব্য আসিয়া-পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। চাহিয়া দেখিলেন না, হস্ত দ্বারা সরাইয়া দিলেন। ধামে মগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু ঐ বস্তুটি যখন এইরূপ এক বার, দুই বার, তিন বার আসিয়া পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল, তখন মনম উদ্ভোজন করিয়া দেখেন, এক খানি কুম্ভবর্ণ শব্দাচ্ছে কর। “যায়, যার একাক্ষরক যাব্যন্ত ভক্তিবিষয়ে দেখিয়া ঐ কাঠ বাসকে জল হইতে তীরে উঠাইয়া রাখিলেন। এই সময়ে কি যেন এক অভূতপূর্ব ভাব তাঁহার অন্তরে উদয় হইল, সর্বদ্বন্দ্বের গোমুক্তি হইল এবং ঐ ক্ষুদ্র কাঠখানিকে তাঁহার স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণে তার-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যাহা হউক, গোবিন্দ, জল অবতরণপূর্বক পুনর্বার ধামে গমন হইলেন। যথ্য সময়ে উপনীত পরিসমাপ্ত করিয়া কুটারে ফিরিয়া আসিয়া প্রাচ্যাতিক নিয়মাহুসারে ভিজ্ঞা করিয়া আনিয়া আহারাদি সমাধান করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ—আবার সমস্ত জগৎকে গ্রাস করিলে—গোবিন্দ হরিনামের মানা হেস্ত হরিনাম করিতে করিতে অদূর-প্রবাহিত জাহ্নবীর নদর গুহুগুহু নাদ শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সমস্ত শরীর যেন অগল্যসার আচ্ছন্ন করিল,—অসময়ে নিজা আসিল। নিম্নায় আভিভূত হইয়া গোবিন্দ এক অত্যন্ত অসুস্থ পদ দেখিলেন। দেখিলেন যেন, তাঁহার সেই আধার কুটার দ্বারা

জ্যোতিষত বিভাসিত এবং মৌর-ভরাগ্নিতে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল। সেই জ্যোতির দায়িত্ব, গোবিন্দ দেখিলেন, এক মহাপুরুষ গুণায়মান,—হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; বর্ণ জগদ্রথ-গায়াল; মস্তকে জ্যোতিষ্য-কিরীট পরিমোহিত। তিনি নিম্ন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—“গোবিন্দ! জ্ঞাত হইও না, তুমি মহাশক্তি যে শব্দদ্বারা কাঠ ভাগীরথীকুলে জুগিয়া রাখিয়াছ, সত্যক তাহা কুটারে আনিয়া রাখা

কর, ভোমার প্রভু আপত্তপ্রায়; আমিলে, তাহাকে দিও।” এই বলিয়া দেবমূর্তি অন্তহিত হইলেন,—জ্যোতিষ্য কুটার হইতে অপরূপ হইল; গোবিন্দেরও মোহনিতা ভাঙ্গিল। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখেন, কুটার যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার, কিন্তু স্বর্গীয় সৌরভ-রাশিতে চতুর্দিক আমোদিত।

গোবিন্দ আধার কুটারভ্যন্তরে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। প্রব্রজত বৈকুণ্ঠী তখনও যেন ঐ কুটার মধ্যে প্রতিপন্নিত হইতেছিল। বোধ হইল, কে যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—“গোবিন্দ জ্ঞাত হইও না! গোবিন্দ জ্ঞাত হইও না! গোবিন্দ জ্ঞাত হইও না! গোবিন্দ জ্ঞাত হইও না! কুটার হইতে বর্ণিত হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখেন বোর-ভিজিয়া বানী,—জগৎ যেন সমস্ত অন্ধে কাগিয়া মাগিয়া বহিয়া গিয়াছে। কুটার-নিম্ন-প্রবাহিত ভাগীরথীর মূগ্ধশব্দ-গন্তও ঘোর-তমসারূপ; কেবল শীতলপরি অনন্ত-সমস্রিত নীল শৈশব-গগনে অমাব্যাস তারকারাজি অদম উজ্জ্বল হীরকের প্রভা বিন্দু করিতেছে এবং জাহ্নবীর গুহু-শব্দ-বদকে প্রতিফলিত হইতেছে। গোবিন্দ একাকী চলিলেন। পূর্বোক্ত শব্দগাহের কাঞ্চলক খানি আনিবার জন্ম ভাগীরথী-গর্ভে অবতরণ করিতে লাগিলেন। যথাগানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সৈকত-মধ্যায় কাঞ্চলিমা “নিপতিত রহিয়াছে। গোবিন্দ কাঞ্চলিমা সমগ্র উদ্ভোজিত করিয়া বহো-পরি রক্ষা করিলেন। কিন্তু উহা এক্ষণে আর পূর্বের ভায় গুহুভার-সম্পন্ন নহে। দীর্ঘশ্রু-বিন্দুপে আসিয়া কুটারপাশে অবশ্য করিলেন এবং কাঞ্চলিমা এক-পার্শ্বে সংস্থাপিত করিলেন। গোবিন্দের হৃদয় প্রথমতাপূর্ণ হইল; যে রজনীতে তাঁহার আর নিদ্রা হইল না,—অর্ধ নিদ্রিত, অর্ধ জাগরিত অবস্থায় আত্মনিহিত করিলেন।

রজনী প্রান্তে নবোদিত-দিক-র-করোভাসিত কুটারভ্যন্তরে ঐ কাঞ্চলিমা ভালরূপে পল্লবলম্ব করিতে গিয়া গোবিন্দ বি দেখিলেন—দেখিলেন, উহা এক্ষণে আর সে শব্দাচ্ছুর কাঠ নহে, এক্ষণে উহা গুহুভার-সম্পন্ন সমৃদ্ধকর কৃষ্ণ-শিশা। গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। বাইবার পূর্বে চৈতন্যদেব যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত তাঁহার মন-পথে সমুদ্রিত হইল। প্রস্তর জলে ভাসিয়া আসিয়াছে, ইহা অপেক্ষা অলোক-মামাঙ্ক

বন্ধনা কি-হইতে পারে। ভাবিলেন, এইবার হস্তে তাঁহার অস্ত্র গ্রহণ কর।

সেই নিম্ন হইতে প্রতি বিষম, প্রতি বোকার, প্রতি দ্রও, প্রতি-পঙ্গবে, গোবিন্দ, মহাপ্রভুর অপমান প্রভীকা করিতে লাগিলেন। একদা বৈরাগ্য তৃতীয় প্রহরের সময় গোবিন্দ গ্রামাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনবার হরিমাম করিয়া দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে যথার্থ পাইলেন যে, বহুসংখ্যক অতিথি তাঁহার দ্বারে সমুপস্থিত। এই সময়ে প্রায় মাঝেই ভিকা হইতে বিরত হইয়া, দ্বারের দ্বিধা-রূপে রূতপদে চলিলেন। চলিলেন যেন কি এক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া।

দ্বারের দ্বারে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
দেখিলেন যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, তাঁহার সেনতা চৈতন্যদেব, হস্তলবঙ্গকারে তদীয় দ্বারে অতিথি। তাঁহার আশ্রমের সীমা যুলি না, হৃদ সাগর উল্লসি। উল্লি, আনন্দ-রূপে নন্দন-প্রসঙ্গ হইতে ক্ষণিক হইল, প্রভুর চরণাবলম্বের প্রাপ্তে পূণ্য-বল্লিত হইয়া প্রভুর চরণ-বন্ধনা করিয়া পলায়ন করে বসিলেন, “প্রভু! তোমার দর্শন বিহনে বড়ই বাসনা পাইতেছি, আজ আমার স্তম্ভভাঙে। ভক্তিলো! এই তোমার চরণ দর্শন পাইলাম।”

চৈতন্যদেব, গোবিন্দকে আদর্শন করিয়া বলিলেন, “গোবিন্দ! আমি তোমার জন্ত অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম। বহা বলিয়া নিয়াজিলাম, তাহার কি কিছু ঘটয়ছে?”

চৈতন্যদেবের “বাইবার পর হইতে এ পর্যন্ত বাহা ঘটয়ছিল, গোবিন্দ তাহা আনন্দোপায় বিবৃত করিলেন। ভংগের প্রস্তরখণ্ড দেখাইয়া বলিলেন, “প্রভু! এখন আমার উপায়?”

গোবিন্দদেব বলিলেন, “আর চিন্তা নাই, ভগবান তোমার উপায় করিয়াছেন। তোমার মঙ্গলের জন্তই ঈশ্বরকর্তৃক এই প্রস্তরখণ্ড প্রেরিত হইয়াছে।”

গোবিন্দ কয়েকদিন নিবেদন করিলেন, “প্রভু! আজ্ঞা করুন, এখন আমার কি করিতে হইবে?”

চৈতন্যদেব বলিলেন, “ঈশ্বা হইতে একটী বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করি, তুমি উহার সেবাহই হইবে। ইহার জন্ত তোমাকে কিছু প্রায়শ পাইতে হইবে না; কল্য প্রভাতে এক ভাঙ্গর আসিবে, তিনি এই প্রস্তর হইতে ত্রিধ্ব-বিগ্রহ

নির্মাণ করিবেন; অর্থাৎ এই সমাপ্ত অতিথিদিগের সম্মত কর।”

পরম আপ্যায়িত হইয়া গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ তিনবার বাহির হইলেন, ঈশ্বর-রূপার অঙ্গকলন মথোই অতিথি-সেবার উপযোগী সমস্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেন। তদুদ্যায় অতিথিসেবা করিয়া, হরি-জগদ্বিন্দ্যের পরামর্শে যে দ্বিগুণ অতিথিতে করিলেন। চৈতন্যদেবের স্বাধীনপ্রাণ পরমিগুণ প্রভাব-সময়ে ভাঙ্গর উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাজী এমনি নহে; কেহ তাঁহারে চিন্তেন না। কথিত আছে, সেন-মুর্তি নির্মাণ করিবার জন্ত বিশ্বকর্মা মহাযজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়া ছিলেন। চৈতন্যদেব ভাঙ্গরকে ব্রহ্মশিলা দেখাইয়া দিলেন। ভাঙ্গর বিগ্রহ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত বিশ্ব, অতিথিতে ছিল, কিন্তু প্রস্তর যেমন তেমনি মলিন—ভাঙ্গর, কাঁচা, কিন্তু প্রস্তর, অর্থাৎ শিলার কিছুমাত্র জয় হইল না। এইজন্য সমস্ত রাত্রি কাটয়া গেল, কিন্তু পর দিন প্রাতে সকালেই দেখিতে পাইলেন যে, নন্দমুর্তী-প্রাণন মুঠাম মুঠাম বহুসংখ্যক প্রস্তুত রহিয়াছে। ভাঙ্গরকে কিছু আর কেহ দেখিতে পাইলেন না।

কোন পুস্তকে (১) উপরোক্ত ব্রহ্মশিলা-সঙ্গকে এইরূপ প্রণামিত বর্ণিত হইয়াছে:—

“কথিত আছে, চৈতন্যদেবের মনন করিতে করিতে গোবিন্দ বাসায়ের রাজ-প্রাসাদে সমুপস্থিত হন। সমগ্র রাজকলনটি প্রস্তর দ্বারা রচিত, কিন্তু এই প্রস্তরখণ্ডে বিবর্তনের ছায়ে মহাশয় প্রস্তুত ছিল। চৈতন্যদেব দেখিবামাত্রই ব্রহ্মশিলা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। মুসলমান নৃপতিগণ নিকট দরবার করিয়া প্রস্তরখণ্ড নিলিত করিয়া হইলেন এবং গোবিন্দকে উদ্দেশে ভাঙ্গরখণ্ড-ভাঙ্গাইয়া দিলেন।” (২)

উক্ত শিলা-সঙ্গকে এইরূপ উক্ত আছে:—

“মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার হস্তলিপি করিয়া, ইহা যে ব্রহ্মশিলা, তাহা নির্ণয় করেন। হস্তলিপি তালিক্রম দ্বারা বিশেষ। একটী মূলধ্বাংসীকারে

(১) “সান্দু-জীবন” আদিকাণ্ড ২২ পৃষ্ঠা।

(২) বর্তমানের রাজ্যভক্ত-এইরূপ শিলায় নির্মিত, প্রস্তুত আছে, এবং গোবিন্দ বাসায়ের প্রাসাদ হইতে সন্নিহিত করিয়া লওয়া হয়। উক্ত শিলায় এইরূপে ভাঙ্গিয়া থাকে।

তিন দিবস তালিক্রম-ক্রমাণি ও সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, পরে তাহার হস্তে একধাণি খড়ি দিয়া পৌর প্রবেশের উত্তর নির্মিত বসিতে হয়। বর্ণা বাহুল্য যে, হুমারী অক্ষর-পরিচয়-মুখা। সে সেই খড়ি দ্বারা বাহা শিখিয়া যায়, তাহাই সেই প্রায়ের উত্তর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ হস্তলিপি-ব্রত করিয়া তিনটি প্রশ করেন, তাহাতে গোপীনাথ-দেব ব্রহ্মশিলা কি না? এই প্রশের উত্তর নির্মিত হইয়াছিল। “ব্রহ্মশিলা। অপর দুইটি প্রশের উত্তর এতদে অনাবশ্যক।

কেহ কেহ বলেন, মহারাজ গিরীশচন্দ্র এক ব্রহ্মদৈত্যের মুখে ইহার স্বরূপতা অবগত হন।” (৩)

ত্রিমূর্তি প্রস্তুত দেখিয়া গোবিন্দ কয়েকটি স্বপ্ন করিলেন। চৈতন্যদেব গোবিন্দকে বলিলেন, “এই মুর্তি হইতে তোমার ত্রিধ্ব এক পাংকতি মলন-কার্য সম্পন্ন হইবে। জীবনাবস্থায় এই বিগ্রহ সেবার করি, যখন ইহালাক পতিতায় করিতে, তখন ইনিই তোমার সন্তান হইয়া তোমার ত্রিধ্বকেই বা শ্রান্ত করিয়া সম্পাদন করিবেন। জীবনাগ্রে মহোৎসব পূর্বসংকল্পে অস্ত্রোত্তীর্ণ, স্নানকৃত পূজা সেই নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে; তোমার জীবনাগ্রে এই বিগ্রহ দ্বারা তোমার সন্তানের কার্য সম্পন্ন হইবে।”

এদিকে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতে লাগিল। নানা দিক দশ হইতে শিখণ্য আহৃত হইয়া সমাপ্ত হইলেন। দেশীয় ধন্যতা ব্রহ্মলিপি উপহারদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং নানা স্থান হইতে আহৃত, অনাহৃত, বহাহৃত ব্যক্তিগণ আদিত্য উপস্থিত হইতে লাগিলেন। শুভ দিনে, শুভ দণ্ডে, তৎক্ষণে গোবিন্দদেব অতিথকে করিয়া গোপীনাথ নামে এই ত্রিমূর্তি অগ্রদ্বীপে গোবিন্দেব শুভ সঙ্কল্পে সমাধিপূর্ণ করিলেন—গোবিন্দের পর্ব-দ্বার বেলগণে পরিণত হইল।

চৈতন্যদেব যথাসময়ে শিখণ্য-সমভিযাহারে বিদায়গ্রহণ করিলেন। গোপীনাথ-বিগ্রহের সেবার গোবিন্দকে নিমুক্ত রাখিলেন। জীবনাবস্থায় তিনি বহুসংখ্যক শিখাংসর এবং স্তব গণিত করিয়া ছিলেন। মহাসমারোহ-সংকারে গোপীনাথদেবের সেবা সম্পাদিত হইতে লাগিল। ত্রিমূর্তি-প্রতিষ্ঠার পর গোবিন্দ বহুদিন জীবিত ছিলেন। জীবনের

(৩) “সান্দু-জীবন” আদিকাণ্ড ২২ পৃষ্ঠা।

অন্তিম দিনে, সন্তান কয়েক, সন্ত পুত্রের গোবিন্দ তাঁহার শিখাংসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—
“প্রিয় শিখণ্য! আমি চলিলাম। শিখণ্য-বিগ্রহা-নিগমে প্রভুর সেবা করিও। যদিও ফকৈ-সন্তান্যার মধ্যে শ্রদ্ধাধারি নিয়ম নাই, তথাও মহাপ্রভুর আজ্ঞা—গোপীনাথদেবের দ্বারা আমার শ্রদ্ধা-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াও। আর এক কথা, আমার মৃতদেহ দাহ না করিয়া এই দেহ-প্রাঙ্গণে বহুপূর্ণে সমাহিত করিও।” এই কথা শেষ হইলে, হরিমাম করিতে করিতে শিখণ্য-পরিবৃত হইয়া গোবিন্দ-চন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে গোপীনাথের মননপ্রাপ্তে বিদ্যুৎ বৃষ্টি প্রায় দেখা গিয়াছিল। সময়েও শিখাংসকণী বহুসংখ্যক গোবিন্দদেবের দেহমুর্তি সমাহিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে আশ্রম দিন সমাপ্ত—পূর্ণা যাত্রা, বাকরী পূর্ণা দ্বা-একাদশীতে, গোপীনাথ বিগ্রহকে প্রাচীর বাস পরিধান করিয়া অঙ্গলিতে কৃষ্ণমুঠা প্রদত্ত হইল। আশ্রম আসনে সন্মতিয়া গোপীনাথদেব ভক্ত-প্রভু গোবিন্দের প্রাচীরে সমাধিপূর্ণ করিলেন। সেই দিবস হইতে এতাবধি প্রাচীর বঙ্গের এই মহোৎসব ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। প্রায় সাত ত্রি-শতাব্দী বিবৃত হইল, গোবিন্দদেবকর্তৃক গোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা সমাধিপূর্ণ হইয়াছে।

গোবিন্দের শ্রদ্ধাংগণকে যে সেনা হইল, তদ্বিধে আমার পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই উপলক্ষে যে সকল জনগণ সমবেত হন, তাঁহারা গোপীনাথের পিতৃকর্তার আত্মকল্যাণে অর্থপ্রদান করিয়া থাকেন।

পাহিলির ভূমিধিকারিগণ প্রথমে অগ্রদ্বীপের ভূমিধারী ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রাজা রঘুবাহুসহ সময়ে একবার এই মেলোতে পাঁচ ছত্র জন বাজী হুত হয়। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবের কন্যোত্তর হওয়াতে, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী ভূমিধিকারীর উল্লিখকৃত ভিক্ষা-করি-লেন,—“এই গ্রাম কাহার জমীদারীর অন্তর্গত?” পাহিলির ভূমিধারী উক্ত নবাবের কন্যাবধি দর্শনে নিমিত্তভাঙ হইলেন; সেহেতু ঐ গ্রাম তাঁহার প্রভুর; উক্ত বিষয়-প্রকাশ পাইলে, পাঁচ ছত্র বিমম

রক্ষা প্রাপ্তি বাক্যে, তাহার মধ্যে কোনক্রমেই, নির্ণয় করা হইতনি। বিশেষ্য হইতে উক্তভাষা অব্যয়ীভূত। কিংবা পূর্বে আমরা এই উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সত্য। কিন্তু হির করা বাক্য। তবে পূর্বে যে প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ক্ষিত্রীণ-বা-মারীচী-চরিত এবং অপরীক্ষাণী জনক দিক্খিত বাজির নিকট হইতে প্রাপ্ত। সেই ক্রম অমরীচি প্রাপ্ত-যোনা বাক্য হির করা যায়।

১. বোরনাথ দত্ত।

বেদান্তদর্শন।

(৬র্থ প্রস্তাব)

৬র্থ সূত্র—

আভাস।

আমরা বেদ মানি কেন?—ইহা নাস্তিকের কূট-নিকট-পূর্ণ প্রশ্ন নহে, হুতাশের আত্মিক প্রশ্ন নহে। সরল বিবাসীর সরলজ্ঞানের প্রশ্নমাত্র। ভুল-শিষ্য, গুরুর নিকট গুরুতম তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সাপেক্ষে যে রূপ প্রশ্ন করে, এ প্রশ্ন তত্রপ। “আমরা বেদ মানি কেন?” মহাবি জৈমিনি, পীঠ সীমান্দ্য-দর্শনে ইহার উত্তর করিয়াছেন,

“আভাসত ক্রিয়ার্হত্যা।”
ক্রিয়ায় প্রমাণ, কর্মোপদেশক বলিয়া আভাস অর্থাৎ বেদ বলিয়া।

ধর্ম মানবের প্রকৃততম বস্তু; ধর্মের অভাবে মনুষ্য, ইহজগৎ পশুভাষ্য-প্রাপ্ত হয়, ধর্মের অভাবে সামান্য মানবও দৈত্যরূপে গণ্য হয়। ধর্ম হারাই নহিলেই মনুষ্যত্ব। ধর্মবলই মনুষ্যের সর্বপ্রধান বল। এই মনুষ্যরূপে অপরিত্রিত অজ্ঞাত দেশে ধর্মশূন্যতা বা থাকিলে দেশের সীমা থাকে না। এক ধর্মের অভাব সকল অভাবের মূল। আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য, রোগ, শোক, হিংসা—পথে পথে। ধর্মশূন্যের কোন অভাবই থাকে না।

এখন ধর্মের মূল কি? কি উপায়ে এই ধর্ম লাভ হয়? এ প্রশ্নের উত্তর, সম্পূর্ণ উত্তর না হউক, মোটামুটি উত্তর হিন্দুধর্মেই জানে। অমৃত্যুতাই ধর্মের মূল। ক্রিয়া হইতেই ধর্ম লাভ হয়। ক্রিয়া

না করিলে ধর্মপ্রাপ্তি হয় না। সেই অমৃত্যুতায় কথা—ক্রিয়ার কথা বেদে আছে। স্মৃতি যে সমস্ত ধর্মার্থক উপদেশ দিয়াছেন, বেদ ভ্রমসমস্তেরই মূল। স্মৃতি মন্ত্র মাত্র। পূর্বে কোনরূপ অমৃত্যুত না থাকিলে মন্ত্র হইবে কিপক্ষে? প্রশ্নম অমৃত্যুত, তাহার পর মন্ত্রের উদ্যোগ হইবার কারণ জটিল এই ন্যস্তার হইতে স্মৃতি হইয়া থাকে। প্রত্যেক অনুমান, শাস্ত্রবোধ (আপ্তবাক্য) এই তিনটি বা আরও কয়েকটি অমৃত্যুত-পরাচ্য। আত্মকজনাকে স্মৃতি বলা যায় না। হুতাশ স্মৃতিকার ধর্মগণের অমৃত্যুত হইবার মূল, বেদ—আপ্তবাক্য। এই ক্রম শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“বেদো ধর্মমূলম্”
গৌতম।

“বেদোহাথিগো ধর্মমূলম্”
মন্ত্র।

অমৃত্যুতের উপদেশক, ধর্মকারণের আদেশক বলিয়া বেদের প্রমাণ্য; এই ক্রমই আমরা বেদ মানিয়া থাকি।

বেদ না মানিলে, অমৃত্যুত অবহেলা করিতে হয়, ধর্ম হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। তাই বেদ মানিয়া থাকি এবং বেদ মাত্র কণা উচিত হুতাশ বেদের যে যে অংশ বিধিবাক্য নহে, ধর্ম প্রবর্তক নহে, তাহা নির্বন্ধ—মানিবার আবশ্যকতা নাই। জৈমিনি পূর্বোক্ত সূত্রের অপর অংশে বলিয়াছেন,

“আনর্থক্য মতদর্শনাম্”
আভাসের সৌকল্য অংশ ক্রিয়ার্হ নহে; কর্মোপ-
দেশক নহে; তাহা অনর্থক।

হুতাশ যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মকে সপ্রমাণ করিবে, তাহাও নির্বন্ধ—অর্থমাত্র। কেননা, যে ক্রিতি ত কর্মোপদেশক নহে। আর কর্মোপ-
দেশক না হইলেইহীত-অর্থমাত্র। হুতাশ ব্রহ্মের প্রমাণ বেদে নাই।

তবে এক কথা আছে এই যে, কর্মোপদেশক ভিন্ন—বেদের, অপর সকল অংশ—নির্বন্ধ হইলে, “দৌলেনিরুদ্ধঃ সোহমিরদোদীনঃ” ইত্যাদি বৈদিক উপাখ্যানাংশ এবং “ইহে যোজ্যেইতঃ” ইত্যাদি সমুদ্র মন্ত্রও নির্বন্ধ হইয়া পড়ে। তাহা হইলেই ত দেখিতেছি “ঐক বাজতে গাঁ ওজড়।” বেদের সার্থক হইবে কতকগুলি অংশ, এই ক্রম জৈমিনি আর একটা সূত্র করিয়াছেন,—

“বিদিতা কেকবাক্যাতঃ স্তব্যর্থেন বিধানাং হ্যমঃ।”

আর বিধির পোষক কতকগুলি অংশও বিধির সচিব একবাক্য বলিয়া সার্থক; বেদের সেই সকল অংশ অর্থবাক্য নামে ব্যবহৃত। “সোহমিরদোদীনঃ” ইত্যাদি বৈদিক উপাখ্যানাংশ সেই অর্থবাক্য অন্তর্গত। ব্রহ্মত যে মানবজলমন্তুত, তাহাই উক্ত বেদবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। “বর্হিষি ম দেয়ঃ” কৃশে রৌপ্য দিবে না বলিয়া যে নিষেধ আছে, উক্ত উপাখ্যান দ্বারা তাহার সূত্র হইল। রৌপ্য অশ্রুসন্তুত, তাই অপরিত্র; অপরিত্র বলিয়াই কৃশোপরি রৌপ্যাদানের নিষেধ আছে। উক্ত উপাখ্যানে নিষেধের হেতু ক্রিয় হওয়াতে, নিষেধ-বাক্য সর্মবিক শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। এই জগৎ শাস্ত্রে কথিত আছে,—

“কচিতিবিশ্বিকেরবাসীদন্তী স্ত্যাবিত্তিকপটভ্যতে।

অর্থদাতা না থাকিলে, বহন ব্যয় ও প্রচুর আয়াসসাধ্য কার্যে প্রবৃত্তি, শুধু বিধিবাক্য দর্শনে কঠো পোষকের হইত? অনেক স্থলেই বিশিষ্ট অর্থদাতাদের নিম্ন হইতেন। তাই সেই-সেই বৈদিক অংশ যথোপযুক্ত স্মৃতি-নিদা দ্বারা বিধি-নিষেধক সর্মবিক শক্তিসম্পন্ন করেন। এই উপকারের জগৎই যে অশ্মিতুংও সার্থক। আর মন্ত্র—ক্রিয়ায় ও ক্রিয়োপদেশের দ্বারক বলিয়াই—মন্ত্রকও সার্থক বলিতে হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

“মন্ত্রেরেবার্হঃ স্ত্যাব্যঃ”

অর্থ—মন্ত্র মন্ত্র দ্বারা কর্তব্য।

এইত পেল বেদের প্রমাণের বা সর্মবিকদের কথা। এখন তোমার দর্শিত ব্রহ্মপ্রমাণ স্মৃতি উপাখ্যানাবিধির অর্থবাদ হইলে, এক সার্থক হইতে পারে; নতুবা নির্বন্ধ। হুতাশ “তুৎসমি” প্রকৃতি দেববাক্য ও তৎপারার্থের পরিচায়ক বেদবাক্য, কর্ম বা উপাসনা কর্তার ব্রহ্মক-খ্যানরূপে জন্ম-বাদমাত্র। এই সকল স্মৃতি-অংশকে নির্বন্ধক বলি। উপাখ্যানাবিধির অর্থকল্যাত্মক অর্থ-বার্হরূপে সার্থক বলাই উচিত। উক্ত স্মৃতি সমুদ্র স্ত্যাব্যে ব্রহ্মপ্রতিপাদক ত হইতেই পারে না। কেননা, ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত; সিদ্ধান্তপ্রমাণ কোন না কোনরূপে হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বিশেষতঃ প্রতিপাদন, লোকের প্রবৃত্তি-নিরুত্তির কারণ হইতে, পারে না। প্রবৃত্তি, নির্বৃত্তির কারণ হইলে, পুরুষার্থ সার্থকও হয় না।

যেমন “অধিহিমত ভেবজম্” হিমের তীব্র অগ্নি, ইহা প্রাকৃতিক, হুতাশ “অধিহিমত ভেবজম্” এই বাক্য “অধিবাক্যমাত্র। সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন এই বাক্য দ্বারা হইয়াছে। ইহা প্রতিপাদন না করিলেও নীচে অধিবাক্যের সকলেই করিত। বাক্যের অধিবাক্য না জানে, তাহারও করে। কাজেই অধিবাক্যের প্রবৃত্তির কারণ—এই বেদ-বাক্য বা বেদকৃত প্রতিপাদন নহে। তন্ত্রক তোমার প্রদর্শিত ব্রহ্মপ্রমাণ-স্মৃতি ব্রহ্মপ্রতিপাদক নহে; কর্মবিধি বা উপাসনা-বিধির পোষক অর্থবাদমাত্র। অতএব ব্রহ্ম, শাস্ত্রযোনি নহে—এই পুরুষদেব সিদ্ধান্ত সূত্র—

“তৎ তু সমম্বয়ঃ”

স্মৃতিতে পদের অর্থ।

তৎ (ব্রহ্মের প্রমাণ) তু (উত্তর) মৎ (অর্থও) অম্বয়ঃ (বেহেতু তাৎপর্যের বিষয়)।

ব্যাখ্যা।
উক্ত পুরুষদেব এই উত্তরে যে, সর্মবিকসিদ্ধান্ত, জগতের উপনিষদ-স্মৃতি-গণ কারণ ব্রহ্মের প্রতিভা প্রমাণ; কেননা, ব্রহ্মই ত স্ত্যাব্যবাক্যের তাৎপর্য, বিশ্ব। যে বিষয়ে যে বাক্যের তাৎপর্য, সেই বাক্যই তাহার প্রমাণ, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। মনে কর, “অপসমেন যজ্ঞোঃ” এই বাক্যের তাৎপর্য—অপসমেন যাজ্ঞক ধর্ম; আর এই ধর্মের প্রমাণও উক্ত বাক্য। সেইরূপ ব্রহ্ম-বিষয়ে যে বাক্যের তাৎপর্য, তাহা ব্রহ্মসম্বন্ধে—প্রমাণ না হইবে কেন? সেই সমস্ত বেদবাক্য—“সদেব সৌম্যোমম্বয়ঃ আদীনঃ” (১) “একমেবাদিত্যম্” (২) “আত্মা বা ইদমেক এবাৎ আদীনঃ” (৩) “তসোততঃ ব্রহ্মাপ্রসন্নমপরমমন্ত্রসমবাহমঃ” (৪) অম্বয়ঃ। ব্রহ্ম

অর্থমেন যাজ্ঞক অপর্যন্ত স্মৃতি ধর্ম;—উক্ত

ক্রিতির অর্থ।

(১) যে সৌম্য। এই জগৎ, উপনিষদ পূর্বে ব্যাবহৃত

অর্থ ব্রহ্মসম্বন্ধে ব্যবহৃত ছিল। আত্মোপাখ্যান।

(২) ব্রহ্ম, এক অবিভীর্ণ অর্থ, সত্যাত্মক-ব্রহ্মাত্মক-গুণত-ব্রহ্মত্ব। আত্মোপাখ্যাননিবন্ধ।

(৩) পূর্বে একসময়ই ব্রহ্মবান ছিলেন। ব্রহ্মত্ব

উপনিষদ।

(৪), মায়াময় ব্রহ্মসম্পন্ন এই ব্রহ্ম, কার্যকারণসূত্র

জ্ঞাতব্যবজ্ঞিত এবং অবিভীর্ণ। ব্রহ্মবাক্য উপনিষদ।

(২)

শেখিন সকলে, সংগ্রাম-সাগরে
 তুরঙ্গের সম অসীমবিজয়।
 অশ্বিষ চূর্ণিণ, গরবে উন্নত
 দ্বন্দ্ববার উট প্রাতি-স্বাক্ষালনে।
 প্রাণিষ নগর, ভূধর, কাশ্মীর
 যত বশ আছে সেগিষ সে মাম।
 কি শক্তি জড়ের, মুখে প্রাণী সনে—
 মহাপ্রাণী সনে করবে সংগ্রাম।
 শলাঘাতে বঁট, বাঁধা বিষ্ট আদি,
 পুঁটে করি পথ করি প্রসার।
 তুম-সেন ললি, এতত্ত্ব সক্রত,
 স্পাশেদের জ্বলে লজ্জিয়া মাপর।
 উপাডিয়া দৈলি, গহন অরুণা
 ভেগি গিরি-গাত্র অনলাভ করি,
 হু অগ্রদর, কে রোথিবে গতি,
 কার যেন শক্তি স্তব্ধ ভিতরে?

(৩)

বট্টে বীরে এবে, করি সংগ্রাম,
 বীরমাত্রোভ্যাগ বটে বহুদ্রাম।
 কোন বীর বসে, বহুধার মাথে,
 রত-রসে, হও অগ্রসর পর।
 কোথা পানদীক, বাহ্যাকা, রোমক,
 কাহোজ, কিয়ত, চীন-অধিরাজ।
 ঝাপ ঝাপান্তরে, দেখা যেনা সৈনে,
 বীরের স্নানস্থানে কে জাগিবে আর্জ।
 ঘোষ বহুদর, নৈরব, বাজি,
 কে উঠাবে শির উঠক সন্ধরে।
 নতুবা, মাওক, রণে, পরিহার,
 পানিষ শরমো, রম্বিক কাউরে।
 ধাও ধাও সনে, দিয়ন্তের গতি,
 হও অগ্রসর হও অগ্রদর।
 বীর পদ-ভরে, কাঁপায় মেরিনী,
 বীর কর্তব্যে বিদারি অঙ্গর।

শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিভাষ
 বিদ্যাবিরোদ

ইশ্পাত।

পেটা-সৌহ বতই কেন বিস্তৃত হউক না, তবুও
 তাহাতে একইখানি কার্শণ রহিয়া যায়। সে কার্শণ
 ইহু সহজের দ্বারাভূত হয় না। তাহাকে দূর করিবার
 আশংক্যও নাই, বরং রাখাই ভাল। কারণ, কোন
 বস্তু গড়িবার জন্য সৌহকে পোড়াইতে হইলে,
 বায়ুর অগ্নি-নে বায়ীয়া সমূহে কার্শণকে দেখিতে
 পায়, তাহারই সহিত মিশ্রিত হয়, সৌহকে বড়
 আক্রমণ করে না। সৌহকে বিশেষরূপে আক্রমণ
 করিলে সৌহ পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাই,
 একশত সেরে সিকি সেরে পর্য্যন্ত কার্শণ থাকিলেও
 সে সৌহ পেটা-সৌহ, পেটা-সৌহের যে সকল গুণ
 আবশ্যক, সে সব গুণ তাহাতে থাকে। পেটা-সৌহ
 কোমল, হাপরে দ্রবীভূত হয় না, দান-মারিলে ভাঙ্গিয়া
 যায় না, কিন্তু অতিশয় বল প্রয়োগ করিয়া টানিলে
 ছিঁড়িয়া যায়। সিকি সেরের চেয়ে বতই কার্শণের
 ভাগ অধিক হইল, ততই এই সকল গুণের পরিবর্তন
 হইবে, সৌহ ততই কঠিন হইবে, ততই হাপরে
 দ্রবীভূত হইবে, ততই বা মারিলে ভাঙ্গিয়া বাইবে,
 কিন্তু টানিলে ছিঁড়িলে না। তখন আর, আমরা
 এ সৌহকে পেটা-সৌহ বলিতে পারি না। তখন
 আমরা ইহাকে পেটা-সৌহ বলি। একশত সেরে সৌহ
 কেবল আধসের কার্শণ থাকিলে, সে ইশ্পাত কোমল
 হয়, একসের কার্শণ মিশাইয়া দিলে, তবে ছুরি
 কাঁচি নির্ধামের উপযোগী কঠিন ইশ্পাত প্রস্তুত
 হইয়া থাকে। আবার তাহার অধিক কার্শণ দিলে
 সৌহ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া পড়ে। শতকরা
 দুই সেরের অধিক কার্শণ থাকিলে, সৌহ এক-
 দ্বারাই ইশ্পাতের সীমা পার হইয়া অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ
 হয়, তাহাতে বা মাটিয়া কোন দ্রব্য পড়িতে পারা
 যায় না, ভাঙ্গিয়া যায়, আর বাগরের উদ্ভাঙ্গ সে
 সৌহ সহজে গলিয়া যায়; হস্তরাং সে সৌহ পুনরায়
 আবার ঢালা-সৌহ হইয়া পড়ে। তবেই হল,
 কার্শণ একেবারেই না থাকিলে কি শতকরা
 সিকি সের পর্য্যন্ত থাকিলে, সে সৌহকে পেটা-
 সৌহ বলে; কিন্তু সে সৌহ অতিশয় কোমল;
 তাহাতে ভাং করিয়া কোন বস্তু কাটিতে বাইলে,
 কাটে না, ধার চুইয়া যায়। তাই বখাচরোজন
 কার্শণ মিশাইয়া কঠিন করিয়া লইতে হয়। কার্শণ-

মিশ্রণে-সৌহ কঠিন হইয়া ছুরি কাঁচি গড়িবার
 উপযুক্ত হইলে তাহাকে ইশ্পাত বলে।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে প্রকার উৎকৃষ্ট
 ইশ্পাত হইত, এরূপ আর মুসলিম হইতে না। আবার
 ভারতবর্ষের মধ্যে যেবার ইশ্পাতের জন্ম
 প্রসিদ্ধ ছিল। পারস্ত, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে
 মাহলেকরা আসিয়া এখান হইতে ইশ্পাত জন্ম
 করিয়া লইয়া বাইতেন। ইশ্পাহান ও দমাহম
 নদীর জগৎবিখ্যাত অঙ্গ-স্রষ্ট্র এই ইশ্পাত হইতে
 প্রস্তুত হইত। এই ইশ্পাত-প্রস্তুতের প্রকরণ
 এইরূপ। আধ সের সৌহ ধরে, এরূপ অনেকগুলি
 ছোট নুচি কর্শকারেরা প্রথম গড়িয়া লয়। সৌহকে
 কাঠি ছোট খণ্ডে বিভক্ত করিয়া কাঠের নুচির সঙ্গে
 এই নুচির ভিতর রাখে ও আকম্পণাতা দিয়া ঢাকিয়া
 দেয়। তারপর কাণা দিয়া নুচির দ্বারা একেবারে
 বন্ধ করিয়া দিতে হয়, যেন বায়ু তাহার ভিতর প্রবেশ
 করতে না পারে। কাণা ওকাইলে ২০-কি-২৫ টা
 মুচি লইয়া কুস্তকারের পোয়ানের মত পোয়ানের
 ভিতর সাজাইয়া দিতে হয় ও সেই মুচিগুলিকে
 প্রভুর পরিমানে কাঠের কল্যা দ্বারা আবৃত করিয়া
 দিতে হয়। এখন পোয়ানে আশ্রিত দিয়া দুই বটী
 দ্বিয়ার জাঁতার বাতাস দিলেই নুচির ভিতর সৌহ
 গলিয়া ইশ্পাতে পরিণত হয়। অর্থাৎ সৌহকেপ্রস্তুত
 সহিত নুচির ভিতর যে কাঠের নুচি থাকে, অধির
 উত্তাপে সেই কাঠ হইতে কার্শণ বাইয়া সৌহে
 মিশ্রিত হইয়া সৌহকে ইশ্পাতে পরিণত করে।
 এইরূপে ইশ্পাত প্রস্তুত করা অতি সহজ কার্য
 বটে, কিন্তু ইহাতে একেবারে অধিক ইশ্পাত প্রস্তুত
 হয় না। স্বচ্ছদী মুচি পোয়ানে পোড়াইলে হয় ত
 কেবল চারিটা মুচিতে ভাল ইশ্পাত হয়, বাকি
 ১৬ টার ইশ্পাত ব্যাবাহিক নিরুপ্ত। কোনটীতে
 হয়ত কার্শণ অধিক হইয়া ইশ্পাতে চেয়ে
 কঠিন হইয়া পড়ে; কোনটীতে হয়ত কার্শণ
 কম হইয়া সম্পূর্ণ ইশ্পাত হয় না; কোনটীতে
 হয়ত সৌহের কেবল অর্ধেক ভাগ উত্তপ্ত সেই
 ভাগটাইই কার্শণ লইয়া ইশ্পাত হয়, বাকি সৌহ
 রহিয়া যায়। বাছিয়া বাছিয়া ভাল ইশ্পাত লইয়া
 সে কালের খাত চলিতে পারিত। এখন সৌহা
 ও ইশ্পাতে ব্যয় অধিক, পচটী মুচির
 চারিটা মুচি ফেলিয়া দিতে হইলে এখন আর
 কাজ চলে না। একেবারে অধিক পরিমাণে ইশ্পাত
 ক্রিতে না পারিলে আর খরচ শোয়ায় না। তাই,

এ দেশে সৌহানিকর কাণ্ড ঘেরপ একেবারে বিসৃপ-
 প্রায় হইয়াছে। ইশ্পাত-প্রস্তুত-কার্যও সেইরূপ।
 মাইশুর হইতে একবার বিলাতে এই ইশ্পাতের
 আমদানি হইয়াছিল, কিন্তু সকল গুণের ইশ্পাত
 সমান নয় বলিয়া ইহার শীতই দুর্নাম হইয়া গড়িল।
 সেখানকার লোক এই ইশ্পাতবৎগুণকে একজ-
 গলাইয়া সমান ভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া
 ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। সেখানে মাস্ত্রাজ-
 অঞ্চল হইতে কিছু কিছু ইশ্পাত বিলাতে বাইত।
 তেওঁও ভাবায় ইশ্পাতকে উঠক বলে। ভারতবর্ষের
 ইশ্পাতকে তাই বিলাতের লোকেরা উঠক-খিনিয়া
 জানিতেন।

বিলাতে ইশ্পাত প্রস্তুত করিবার প্রাণী এই-
 রূপ। এখানকার লোকে কাচ পলাইবার তন্তুরের
 খায় তন্তুর নির্মাণ করেন। তন্তুরের তলকালে
 অগ্নি জ্বালাইবার কুন্ড স্থান থাকে, তাহাতেই-
 তন্তুরের উপরিভাগ উত্তপ্ত হয়। এক একটা তন্তুর
 প্রায় দশ হাত দীর্ঘ, আর ইহাতে প্রায় তিনশত
 মল সৌহ ধরে। প্রথম এক অঙ্গুলি তুল করিয়া
 সেরে কাণা চূর্ণ তন্তুরের মধ্যেতে বিছাইয়া দিতে
 হয়। এই কলমার উপর সৌহশলাকাগুলি সাজা-
 ইয়া দিতে হয়। অল্প দিন পূর্বে ইশ্পাত ক্রিতে
 কেবল উৎকৃষ্ট হুইডিল সৌহ ব্যবহার হইত।
 এখনে কিছু ভাল বিলাতী সৌহও ব্যবহার হইয়া
 থাকে। সৌহকে প্রথম শলাকা-আকারে পরিণত
 করিয়া তারপর তন্তুরে রাখিতে হয়। শলাকা-
 গুলি তিন চারি অঙ্গুলি চওড়া, প্রায় এক অঙ্গুলি
 পুরু। এরূপ সৌহশলাকা সাজান হইলে, তাহার
 উপর আবার কল্যাচূর্ণ দিতে হয়। আবার তাহার
 উপর আবার এক খাঁক সৌহশলাকা সাজাইতে হয়।
 এইরূপে থাকে থাকে কল্যাচূর্ণ ও সৌহশলাকা
 সাজাইয়া তন্তুরী পরিপূর্ণ হইলে পর, বামুকা বা
 নুতিকার মত পুরাতন ইশ্পাতের বঁজা, মিশাইয়া
 সৌহকল্পকে ভাল করিয়া ঝেঁপিয়া দিতে হয়।
 সাজাইবার সময় গাটকতক সৌহশলাকার গোড়া
 তন্তুরের একটা বাহিরে রাখিতে হয়; কেন না ইশ্পাত
 প্রস্তুত হইবার সময় দুই একখানিকে বাহির করিয়া
 দেখিতে হইবে, ভিতরে কাজ কি প্রকার চলিতেছে।
 এখনে তন্তুরের তলকালে অগ্নি প্রস্রুতি করিয়া
 সাত হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত সৌহ-শলাকাগুলিকে
 সোয় উত্তপ্ত রক্তকর করিয়া রাখিতে হয়। বহি
 নরম ইশ্পাত করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে,

মাত দিন, আর কঠিন ইশ্পাত করিতে হইলে, দশ দিন পর্যন্ত এই ভাবে রাখা আবশ্যক। কারণ, যত অধিক দিন এইরূপ উত্তপ্ত রাখিলে, কয়লা-চূর্ণ হইতে কার্বন বাহ্যি ততই অধিক লোহের সহিত মিশ্রিত হইবে। দিন পত হইয়া যাইলে, ভিতরে ইশ্পাত হইয়া থাকিলে এইরূপ বৃত্তিতে পারিলে, এক আবর্জনি লৌহ-শলাকা বাহির করিয়া দেখিতে হয়, ইশ্পাত হইয়াছে কি না। ইহার ভিতরে হয় তো কার্বন যায় নাই, ভিতরে হয় তো লৌহ রহিয়া গিয়াছে, তাই লৌহ-শলাকাকে ভাঙ্গিয়া ভিতর পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, বেন মার্জ না থাকিয়া যায়। ইশ্পাত হইয়াছে পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইলে, তখন অধিক উত্তাপ জন্মে হ্রাস করিয়া মাত দিনের মধ্যে একবারে নিবাহিয়া দিতে হয়; অধি নির্মাণ হইলে, তদুপরীত হইলে, ইশ্পাতের শলাকা-গুলিকে বাহির করিয়া লইতে হয়। এখন এই শলাকার উপর ফোকার মত লৌহ-কলা উত্তিত হইলে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহেতে কতটুকু কার্বন প্রবেশ করিয়াছে, বিচক্ষণ লোক এই ফোকার আকার দেখিয়া বুঝিতে পারেন। শলাকার উপরিভাগে যত কার্বন থাকে, ভিতরে কিন্তু তত কার্বন প্রবেশ করিতে পারে না। তাই, বহির্দেশে কঠিন, মধ্যদেশে অপেক্ষাকৃত কোমল রহিয়া যায়। সেজন্য এই ইশ্পাতকে পুনরায় ছোট ভাগে ভাগ করা আবশ্যক। শলাকা-গুলিকে ছোট ছোট খণ্ডে কাটিয়া মুচিতে গলাইলেই সে কার্য সম্পন্ন হয়। গলাইতে অভিশ্য উত্তাপের প্রয়োজন, অনেক কয়লা পুড়িয়া যায়, আর খোরতম উত্তাপে মুচিগুলিও অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। এত মুচি লব্ধ হইয়া যায় যে, শিল্পিত নদীর লোকে এই পুরাতন মুচি দিয়া উদ্ভাটনাদির প্রচারি নির্মাণ করিয়া থাকেন। শিল্পিকলপন হইতেই রক্তারের ছুরি কাঁচ এদেশে আবাদনি হইয়া থাকে। এক ইশ্পাত অধিক ব্যয়, পড়ে সত্য, কিন্তু গলাইয়া গেল ভাণ্ডার করিলেই ভাল ইশ্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদি শস্তা করিবার মন হয়, তো লৌহ-শলাকাতে ছোট ছোট খণ্ডে কাটিয়া অধিক উত্তপ্ত করিয়া একত্র গিটিয়া লইলেও কাজ চলিতে পারে।

ভাল ইশ্পাত, করিবার নিয়ম গেল এই। ইশ্পাতের লোকে কিছু এই ভাবে কাজ করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ইহার

চেয়ে সহজ উপায়ে ইশ্পাত প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বিধিমাতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক লোকে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া, দীন দুঃখী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—একবার উষ্ণিতে গলাইয়া আকারকে লিপ লৌহে পরিণত করিতে হয়, তার পর সেই লৌহকে পড়িলে দ্বারা পরিষ্কৃত করিতে হয়, তার পর আবার সেই লৌহকে কার্বন মিশাইয়া ইশ্পাত করিতে হয়। অর্থাৎ একবার পিপলোই হইতে কার্বন দ্রব্যভুক্ত করিয়া, দিই, আবার কার্বন মিশাইয়া ইশ্পাত করি। এ বিত্তপ পরিপ্রস কের ? পড়িলেও সময় সমুদয় কার্ণবটুকু বাহির করিয়া না দিয়া, ইশ্পাত করিতে বতহুইর আবশ্যক, ততহুই রাধিয়া ছাড়িয়া দিলেই ত হুই এইরূপ ভাবিয়া পিপলোই হইতে তাঁহারা একেবারেই ইশ্পাত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই, পিপ লৌহেতে কেবল যে কার্বন থাকে তাহা ত নয়, ইহাতে সিলিকন, গন্ধক, ফসফর প্রভৃতি অপরাপর পদার্থ থাকে। ইশ্পাত করিতে হইলে লৌহ হইতে যে সমুদয় দ্রব্যগুলিকে দূর করা আবশ্যক, তাই পিপলোই প্রয়োজন। তবে যেখানকার আকার, ভাল, সেখানে বিস্তৃত কাঠের কয়লা দ্বারা লৌহ প্রস্তুত হয়।

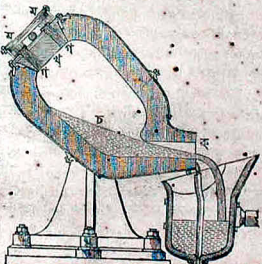
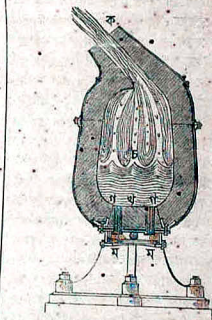
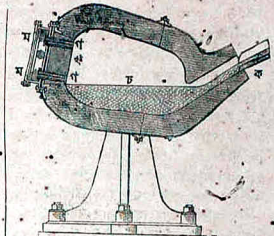
ক, সেখানে লৌহে বড় অসার দ্রব্য না। সেই জন্য ইশ্পাত করিবার নিমিত্ত সেখানে পড়িলেই করিতে হয় না। কিন্তু বিলাতের অন্ধুর মন্ড, সেখানে পাথরে কয়লা ব্যবহার হয়, তাই সেখানকার পিপলোই নানা অসার দ্রব্য থাকে। এই নিমিত্ত হুইয়া পড়িলে না করিয়া একেবারেই পিপলোই হইতে ইশ্পাত করিতে-চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন না। তবে তাঁহাদের পরিস্রব যে একেবারে বিফল হইয়াছে, তাহা নয়। এইদের মধ্যে, বেদেমার নামের পিপলোই হইতে একেবারে ইশ্পাত করিবার যে প্রণালী অবিকার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আজ মুল্যের ইশ্পাত অনায়াসে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেখানে ভাল ইশ্পাতে মূল্য একটাকা, সেখানে এই ইশ্পাতে প্রস্তুত হইয়া আনা। এ ইশ্পাতে দ্বারা ছুরি কাঁচ প্রস্তুত হইয়া কাজ হয় না সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা কলের গাড়ির রেল প্রভৃতি মোটা কাজ হইতে পারে। লোহার কলের চেয়ে সে রেল দশগুণ দৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

বেসোমার-প্রণালীতে ইশ্পাত প্রস্তুত করিতে হইলে উৎকৃষ্ট পিপলোইয়ের আবশ্যক। ইহাতে কার্বন অধিক থাকা চাই। যে দ্বয়বর্ষের পিপলোইতে শতকরা তিন কি চারিভাগ ক্রমদীসরূপে কার্বন থাকে, তাহা বিশেষ উপযোগী। শতকরা ৩ হইতে ৩ ভাগ সিলিকন থাকা ভাল, যথাসামান্য ম্যাঙ্গেনিস থাকিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু গন্ধক ও ফসফর বতহুই কম হয়, ততই ভাল। যে পিপলোই একশত সেরে ১০০ ছটাক ফসফর, কি তিন ছটাক গন্ধক অধিক থাকে, তাহাতে বেসোমার প্রণালীতে ইশ্পাত প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। সচরাচর বেসোমার প্রণালীতে ইশ্পাত প্রস্তুত করিতে যে পিপলোই ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ এই পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়—

কয়লারূপে কার্বন—	০.৪৭
ক্রমদীসরূপে কার্বন—	২.৭২
সিলিকন—	২.৮৪
ফসফর—	০.০৮
গন্ধক—	০.১৪
ম্যাঙ্গেনিস—	০.৬০
অবশিষ্ট লৌহ—	৯২.৮৫

১০০০০

এই কার্যের নিমিত্ত পূর্বে হুইডিশ পিপ অনেক ব্যবহৃত হইত। এখনে নিজ বিলাতে হিমাইটাই আকার হইতে যে উৎকৃষ্ট পিপলোই নিষ্কৃত হইয়া থাকে, তাহাই অধিক ব্যবহার হয়। এমন কি, বেসোমার প্রণালীতে জড় উৎকৃষ্ট পিপ প্রস্তুত করা এখনে একটা নতুন ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কার্যে সহস্র সহস্র শ্রমিক প্রতিপালিত হইতেছে। একজন একটা ভাল কাজ করিলে কত গিকে তাহার কল কলে, তাহার ইমজা নাই। এই পিপলোইকে কুহ-একটা হাপরে একেবারে জ্বাভূত করিতে হয়, তাহার পর এই জ্বাভূত বায়ুকে বড় একটা পাত্রে ঢলিয়া দিতে হয়। এই সামান্য পাত্রটিই বেসোমার সাহেবের বুদ্ধিকৌশলের প্রকাশ। এই পাত্রের তিনবাশি চিত্র এখানে প্রদত্ত হইয়াছে। ক ইহার মধ্য, ব ইহার তলভাগ; গ—ব ইহার তলভাগের ছিদ্র। এইরূপে গার একশত ছিদ্র ইহার তলভাগে থাকে। এই ছিদ্রসমূহের সহিত জাতার বায়ুর সংযোগ থাকে, ইহাদের মধ্য দিয়া প্রবল ঘর্ষণে জ্বাভূত বায়ু পাত্রে ভিতর প্রবেশ করে।



মুখোঁতে হইবে। “কক্কী”-চরিত্র “অভিজ্ঞান-শুটকান” বৈরাগ্য; “উত্তর-চরিত্রে”ও সেইরূপ।
মোট কথা, “কক্কী”র বৃহৎ ও বিস্তৃত হওয়া-টাই।
নিয়েল বৈষ্ণবদ্বারা রচ্যোক্ত, ভাষ্য। ভাস্করমতীর
সংবাদ লইবার তার “কক্কী”কে সিবেন কেন?।

কক্কীর পর বৈজ্ঞানিক ও প্রতিভাবীর সমাশ্রয়।
এ সমাবেশেই কখন রাজকীর ব্যবস্থার পরিচয়ক-
রা। রাজা কি আর সত্য সত্যই চিরপরিচিত
অধিবেশকগৃহের পথটুকু চিনিতে না? তবে প্রতি-
বারিকপে দেখাইতে হইল কেন? “রাজ-কায়দা”
দেখি তুমি কালিদাস অবসর পাইয়া এইখানে এইটুকু
বোঝাইয়াছেন; এছাড়া বুঝাইয়াছেন—রাজা-প্রজার
কর্তব্য-সম্বন্ধ। “রাজ্যের গুরুভার ভাবিয়া, ভাবনা-
ভাবাজ্ঞান-দ্বয়ে হৃদয় হেন মহারাজকেও অহুচর-
বর্ষের স্বর্গে ভরা গিয়া চলিতে হইয়াছিল। উপা-
খ্যানেও এ পরিচয় পাইয়াছি। কালি-
দাসের ইহাই কতিপয়। এইখানে নাকি ও
উপাখ্যানে বোর অসামঞ্জস্য। এইবার সামঞ্জস্য
আসিয়া গিলি। এ সামঞ্জস্যও অসামঞ্জস্যের দ্বারা
পরিচালিত হইবে।

নটকে রাজ-অমতি অপেক্ষায় শকুন্তলা
প্রভৃতিকে রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল;
উপাখ্যানেও করিতে হইয়াছে। উপাখ্যানে আছে—

“রাজ্যের সমাসমুদ্র কখনোই সন্ধ্যাতে ।
উচ্চকণ্ঠে প্রতিহারে তুমি রাজে নিদেয় ।
কালপাত লেখেন রাজদ্বারনিধিপতে ।
মিতো তব শাব্দ-দ্ব-শাব্দই তসমাজে ।
হুতা তজ্জ কল্যাণি যে আছে চ বিজগিত্তে ।
প্রতীহাসন্তো গতা রাজে সর্বং স্বদেশে ।
রাজা পুরোদগম প্রাধ পৌতম্য স্থিতি চিন্তন ।
কখনোতি মনে শিখো স্ত্রীভিরেতাভিপাত্তে ।
আপাতবিহ সংপ্রাপ্তো ভগবৎপতি বিপুলত্ব ।
কিং কল্যাণমে কলিঙ্গাধিপঃ কুরুতঃসনয়ম্ ।
ন জানাতি হি দুষ্টায়াঃ দুঃসত্যঃ রামগণকম্ ।
কিং বনে পশুপতাকা নিমগ্নমুনি কামম্ ।
বাসন্তে ব্যাঘ্র-সিংহাভ্যাঃ শ্রিতো বলদঃ ক্রয়াতান ।
মগদাশিখা তবদ্রুতঃ পূর্ববাসিন ।

“সমাসমুদ্র” এই কথাই সন্ধান করা হইতেছে,
“বাস্তবসমুদ্র”। ভগবান “সেব” “বাস্তবসমুদ্র” নিকট
শকুন্তলার উপাখ্যান—কৈরল-বিশ্ব কল্যাণচিন্তন-
পদপূরণ। তাহাই সমাবেশিত হইয়াছে।

কিং বা বস্তুকালক্রম প্রভবন্তি ন কামেন ।
ভোগ্যোহাবিনাভাবানুভবিতো তপোবদনঃ ।
দেয়াগ্গপতিতঃ সৌর্যঃ মুনিমঃ দ্বৈতকারণম্ ।
বিদ্যোনিম তপোবৎ বাহি পুঙ্খ ভূপদনো ।
পাশ্যাসীন পুঙ্খস্ত বিখ্যাত্তিভিসমক্ৰিয়াম্ ।
বাসয়মুনি বীথ্য শৃণুতে তাঃ শ্রিতস্তথা ।
চেতিমশেববিকাপি তদ্যন্তান্তি বিবৃতা তৎ ।
বিজ্ঞাপয়ামি পুনঃবিচার্য কয়োম্যহম্ ।

পদপূরণ, স্বর্ণপঙ্খ, ও৩ অধ্যায়।

ভাবার্থ—রাজ্যের সমাগত হইয়া কথ-শিখায়
প্রতিহারকে বলিলেন,—“রাজকে শীঘ্র গিয়া বল,
কালপাতের আদেশে তাহার দুই শিখা শাব্দ-দ্ব-
ও শাব্দ-দ্ব এবং তাহার কল্যাণ ও দুইটা ব্রাহ্মণ-রমণী
আসিয়াছে।” প্রতিহারী রাজসমীপে বসল কথা
নিবেশন করিল। রাজা মনে মনে চিন্তা করিয়া
পুরোহিত পৌতম্যকে বলিলেন,—“মুনি-শিখ্যের
ব্রাহ্মণের মতিত আসিয়াছে, ইহার কারণ কি,
আপনি গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। কোন রাজস কি
কথাগণে বিশ্ব উপপত্তি করিয়াছে? সে কি রামগ-
ন্য কল্যাণকে জানে না? ব্যাঘ্র সিংহাদি ভা-
গন্তরা কি মুনিগণের শাসন না মানিয়া, বালক-
বৃদ্ধ-বলিতারা প্রতি অত্যাচার্য করিতেছে? আমি
এখন নগরে রহিয়াছি, আমি ত নৃপতি কি নাই?
অথবা বনে কল্যাণি উৎপন্ন হয় নাই;—তাই কি
আহার্যের মুনিগণ কট পাইতেছেন? বাহাই
হউক, আমি স্বাধ মুনিগণের এ দুঃখের কারণ বল
করিব; আপনি গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। পাশ্যাদি
প্রধান ও আভিষাস-কার সম্পাদনপূর্বক তাহারের
সকলকে স্বর্গহে স্থাপন করুন। তাহারের বিশেষ
কোন কথা থাকিলে আমাকে জানাইবেন; আমি
বিনেচনাপূর্বক তদনুযায়ী কার্য করিব।

নটকেই দুঃসত্যকেও ভাবিতে হইয়াছিল,—
“কিং তাবৎ ব্রাহ্মণ-মুণ্ডপাতপদ্যমঃ বিতস্ততো দুষ্টত্ব-
ধর্মব্রাহ্মণচর্যে কেমচিদ্ভিত প্রাণিব্রাহ্মণচর্যেই।
আহোবাং প্রদোষে মমাপচরিত্তেবিতস্তিত্তো বীরধা-
মিত্যাক্রমব্রহ্মপ্রতৎসমপরিচ্ছেদ্যঃ সো মে মনঃ।”

ভাব সেই একই, তবে “আমার পাপে” এ
বিনয়-শিষ্টাচারের পরিচয়টুকু ব্যাভা তাপ। দুঃসত্য
ত আর এটুকু অসম্বদ নহে। অথবা “রাজার
পাপে রাজা নষ্ট” এ প্রতীতিটুকু দুঃসত্যের দ্বারা
নৃপতিত, থাকাই বা অসম্বদ কি?

নটকেও না, উপাখ্যানেও তাই। তবে শকু-

ন্তলাদির সমাগম-বিশেষে নটকে ও উপাখ্যানে
একটুকু ঐক্য আছে। নটকের এই ধানে শকু-
ন্তলাদি, পুরোহিত ও কক্কীর সঙ্গে একেবারে
সত্য প্রবেশ করিয়াছে; উপাখ্যানে কিন্তু
অন্তরূপ। উপাখ্যানে এরূপ আছে;—

“ইতি তদ্যাকামদায় পুরোহাঃ স তপোবনঃ ।
পুত্ৰাদানি পুত্রস্ত্য হারমাগতম্যং জিজ্ঞ ।
রাজ্যাকং সর্বমার্চষ্ট দদধ শকুন্তলাম্ ।
অন্তঃসত্ত্বাঃ মহাতাপাঃ শিরঃ প্রচ্ছদ্য বাসমা ।
আত্মোদয়াঃ শ্রেয়কামানি ব্রহ্মচর্যঃ পুংঃ ।
প্রগচ্ছ ত মুনীঃ কেষঃ স্তবনী জনতত্ত্বা ।
অন্তঃসত্ত্বাঃ কল্যাণি লজ্জয়াসুখী হিতা ।
পদপূরণ, স্বর্ণপঙ্খ, ও৩ অধ্যায়।

ভাবার্থ—পুরোহিত রাজার কথা ভাবিয়া,
পাদ্যাদি গ্রন্থপূর্বক দ্বারদেশে গমন করিলেন।
ভিনি রাজার কথাগুলি ত্রিবিধভাবে বলিলেন এবং
দেখিলেন, অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলা বস্ত্রভূষাসম্বন্ধে
কল্যাণে শনিবল্যবৎ সোভা পাইতেছেন। এমন
পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—ঐ লজ্জাননমুখী
অন্তঃসত্ত্বা স্তবনীট কে?

পুরোহিতের কথা শিখয় বলিলেন,—
“বিশ্বমিত্রস্ত্য চেগঃ যেনকপারসমভূবন ।
কথেন পালিতা রাজাঃ দুঃসত্য মইপতেঃ ।
সৌম্যঃ প্রবেশিতা ত্রুদনঃ বৎসম্ মুগমদম্যম্ ।
অষ্টম্ ভূপতেস্ততো নারী স্ত্রীবিহ রূপিতা ।
রাজে নিবেদনরতঃ তত্তব্যস্তঃ স্বা-রাজঃ ।
নেমঃ রাজা দ্বারদেশে স্তাব্ধমর্থা মইপতেঃ ।

পদপূরণ, স্বর্ণপঙ্খ, ও৩ অধ্যায়।
ভাবার্থ—ইনি নেনকার গভস্ত্যাতা বিশ্বমিত্রের
কন্যা—কথের পালিতা রুহিতা এবং মহারাজ
দুঃসত্যের রাজ্যী। মহর্ষি কং ইহাকে রাজবাটীতে
প্রেরণ করিয়াছেন। এই সুলোচনা, স্ত্রীবিহ তত্তেজ-
ধারণ করিতেছেন। শীঘ্রই রাজাকে সমাগম দিন,
মহারাজ-পত্নীর আর এখানে থাকা উচিত নহে।

এই সকল কথা ভাবিয়া, পুরোহিতকে রাজার
নিকট সমাগম লইয়া বাইতে হইয়াছিল; আবার
কিরিয়া আসিতেও হইয়াছিল। নটকে ইহার
প্রয়োজন হয় নাই। অভিনয়-লোকপট্ট এইটুকু
পরিচয়গণ করিতে হইয়াছে। পরিভাষক হইলেও,
নটাত্তেই কতি হয় নাই।

অথবা আদেশে সমাগত ব্রাহ্মণাদিকে আরও
অনেককণ দ্বারদেশে গাড় করিয়া রাখা রাজনীতি।

শুশল কবি কালিদাস-নিচয়ই শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ
অর্থব পৌরব-রাজ্যচরিত্রাভিত মনে করিয়াছিলেন।
মনে করীত ত কিছু প্রমাণ বা প্রকৃতির বহির্ভূত
নহে। এরূপ মনে করণ বরং মায়াবাহী দ্রুকা বার।
যাহা হউক, উপাখ্যানে-কিন্তু এইরূপই আছে,
“পুরোহিতপুত্রাকর্ষ্য প্রবেশিত মতীপদম্ ।
গতা নিবেদনায়ামঃ স্তবস্ত্যঃ মুনিভাষিতম্ ।
দুঃসত্যভূতঃশ্রুতা কিস্মিত্যঃ পরমাঃ গন্তঃ ।
উভাত ভ্রান্তিঃ তদ্বনঃ কল্যাণী কুনা নৃপঃ ।

নেমঃ স্তবস্ত্যঃ স্তবঃ কৃৎসে বিবাহিতা ।
গণিকা কাপি বিপ্রশ্রুঃ স্থলেনে সমুপপাতা”।
পদপূরণ, স্বর্ণপঙ্খ, ও৩ অধ্যায়।

ভাবার্থ—পুরোহিত এই সকল কথা ভাবিয়া
সমগ্রসে রাজার নিকট বাইলেন এবং মুনি-কথিত
সত্য কথা নিবেদন করিলেন। শাপপ্রদেব বিমুখ-
চেতন রাজা এই কথা ভাবিয়াও কৃষ্ণিক করিয়া
বলিলেন, আমি কোথাও কাহাকে বিবাহ
করিয়াছি, তাহাত স্মরণ হয় না; বোধ হয় কোন
কোথা ছলনেনে আসিয়াছে।

তবুও কিং পুরোহিত ছাড়িলেন না। ভিনি
বলিলেন—

ন তথা দুঃসত্যঃ রাজমন্তঃসত্ত্বা বদাদনঃ ।
অনুজানিবি রাজেন্দ্রঃ স্তবস্তিকমুদয়নঃ ।
বিলোক্য গমঃ রূপঃ বদিত্তে স্তবস্তিকমুদয়নঃ ।
প্রবেশনাত্য স্তবস্ত্যঃ নারী স্ত্রীবিহ রূপিতা ।
স্বাত্মমর্থা ন চ দারি স্যোতস্ত্যস্তী দিশিষ্টিয়া ।
যদি নাপি স্মৃতিস্ত্যঃ স্তবঃ প্রকৃত্য তথাপি তে ।
বিলোকা ভবিতা নাত্তবস্তবশনালিনাঃ ।

পদপূরণ, স্বর্ণপঙ্খ, ও৩ অধ্যায়।
ভাবার্থ—সেই বদন্ত্যঃ অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন;
তাঁহাকে বেগার মনে দেখাইতেছে না। অসম্বদিত
কলন, নিকট আমি। আবার দেখিয়া যদি মনে
পড়ে, অসম্বদে প্রবেশ করাইলেন। ভিনি
দ্বারদেশে গাড়িয়া থাকিবার যোগ্য নহেন। তিনি
আপনার কথা না পড়ে, কিন্তু রূপ দেখিলে,
অন্তরূপ দেখিতে আপনীর আর শাসনা হইবে না।

উপাখ্যানে যাহা উক্ত হইল, তাহা অধিবাগ
করিবার যোগ্য নাই। নটকেই দুঃসত্য প্রকৃতপক্ষে
শকুন্তলার রূপ দেখিয়া নিমোহিত হইয়াছিলেন।
সেইরূপ দেখিয়া ভিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন,—

“ইদমপিতমৎসং রূপমশ্রিতবীতি
প্রথমপরিগৃহীতঃ স্ত্র্যম বেতি ব্যস্তম্ ।

লম্বর ইব বিভাজ্যে কৃষ্ণমজ্জবায়ঃ
ন চ বসু পরিভোজ্যে নৈব শ্লেগ্নিমা হাতুম্ ॥
উপাখ্যানে পুরোহিত বলিলেন, শকুন্তলার
রূপ দেখিলে, অল্প রূপ আর দেখিতে লাগলো। হইবে
না। নাটকে স্পষ্টই দেখা গেল, রাজা, শকুন্তলার
নিম্নল্লভ অল্প রূপ-সৌন্দর্য্যাবলম্বনে বিশ্রিত
হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিবাহিত পত্নী বলিয়া
স্বীকার করিলে পারিলেন না। প্রতিহারীও হইলেন, “আর কেহ
একরূপ দেখিলে নিম্জই হইলেক পরি-
তাপ করিতে পারিত না ॥” উপাখ্যানের পুরোহিত
বাধ্য বলিলেন, কাঁচও কিং তাহা ঘটিল না।
উপাখ্যানে আছে,—

“ইতি রাজানীতেনাত্যমজ্জাজ্ঞাতো দিল্লোভমঃ
আনাময়মাস মুনী তাঃ ত্রিহুগ্ধ হৃদয়গাঃ ॥
আশীর্ভবমুদ্যোজ্যাহ কথমিথো মহামতি ॥
উভযুঃ কবলশেষ নিখরো জগতপতিতঃ ॥
তামাশিবা বহুসিদ্ধা গ্রীহ দানাবল্যেওজ্জ্বলঃ ॥
তৎশুণ্ধ মহারাজানন্তরং কবুর্ভবসি ॥
ইং শকুন্তলা নাম বিখ্যামিত্রজ্ঞানসি ॥
মেনকাসমসমাজ্ঞাতা পালিতা হুহিতা মম ॥
সুপরিচারিণ্যরোহা গাধার্ষেণ মহীপতে ॥
বিধিনা বৃথাহীতভ্রমামহাজ্ঞাঃ বিনঃপি হি ॥
তৎ সারথিতং গুপ্ত মতে কল্পিত্যপামায়াঃ বিধিঃ ॥
তব সা বিভত্যৈতোকো বস্তং নারহীট্যেত মম ॥
মহিষী রাজরাজ্ঞ সাক্ষাৎ শ্রীতির রূপিণী ॥
সেরপ্ৰপুত্র তাং রাজ্ঞ কল্যাণি মহিষী তম ॥
জনন্যিতি বৎ প্রভুমিহ রাজা শকুন্তল ॥
চক্রবর্তী রাজরাজো মহাশাঃ স ভবিষ্যতি ॥
ইতামিহা নিম্জতা ভাঃ ওজ্জ্বলা মহাপাণ্ডাঃ ॥
ইয়ঃ প্রিয়বল্য নাম সখী চাচা মুনো হতা ॥
ইয়ক ব্রাহ্মণী বৃদ্ধা রাজ্যো পৌতমবখজা ॥
রাজ্ঞ বরমিহয়াতা অনন্ত পদমিহাভ্যুতঃ ॥

পদ্মপুরাণ, পূর্ণপণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।
ভাবার্থ—পুরোহিত এইপ্রকার অতুলনসূচক-
রাজার অসমতা লইয়া, মুনিগণ ও হৃদয়গা রীলো-
দ্বিপকে আনন্দ করিলেন। কথের দূর শিখা রাজাকে
আশীর্বাদ করিয়া উপবেশনানন্তর করিলেন, আমা-
দিগের গুরুদেব কব আশীর্বাদপূর্ণক যথা বলিয়া
গিয়াছেন, তাহা শুনিম; তাহার পর যাহা কর্তব্য
করম। তিনি বলিয়াছেন,—“এই শকুন্তলা নিখামিত্র-
হতা, মেনকাস গর্তজাতা এবং আমার পালিতা।
আপন পদ্মপ্রসঙ্গে, পদ্মপুত্রাধানে, আমার

বিনাময়মজ্জাত ইহার পানিগ্রহণ করিয়াছেন; তাহা
জ্ঞানই হয়গছে, ইহা কল্পিত-বিধি। ইনি এখন
সাক্ষাৎ লক্ষ্যারপিতা রাজসমিধী, যিশেষতঃ ভবদায়
তেজঃবান করিতেছেন; আমায় পৰ্বহুটরে ইহার
কথা উচিত নহে। হে রাজন্! আপনরা এই
বাল্যিকি মহিষীকে গ্রহণ করকম। ইনি যে পুত্র প্রসঙ্গ
করিলেন, সে রাজচক্রবর্তী এবং মহাশা হইবে।”
রাজাকে এইসম কথা বলিয়া, শিখ্যাপন প্রিয়বল্য
ও পৌতমীর পরিতাপ দিয়া গিলেন। তারো
প্রিয়বল্যকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি শকুন্তলার সখী
ও মুনির কন্যা এবং পৌতমীকে দেখাইয়া বলিলেন,
ইনি পৌতমীর পত্নী। আমায় ওকর আমলেন
এই শকুন্তলাকে লইয়া এই বানে আসিয়াছি।

উপাখ্যানের এই ভাব; নাটকেরও তাহাই।
তবে উপাখ্যানের এইটুকু নাটকে বিশেষিত হই-
রাছে। উপাখ্যানে গাধা অর্থাৎ, নাটকে
তাহা স্পষ্টীকৃত; উপাখ্যানে গাধা সংঘমিত, নাটকে
তাহা বিফারিত। উপাখ্যানে ছই শিখের মধ্যে
যাহা যাক হইল, নাটকে শুদ্ধিমান শাখর হইয়া
বলিবার ভার লইয়াছেন। অভিনয়ে ত আর ছই
জনে এককালে এত কথার কহিতে পারেন না।

শাখর ব বা শারদ্য আর কখন রাজপুত্রীতে
আসেন নাই এবং রাজপুত্রীর এত জনসমাগমও
দেখেন নাই। শাখর ব বিমিত হইল।
যিনি নিরন্তর নির্জন নিবিড় বনে বাস করিতেন,
আত্মমে ছই চারিজনদের বেষ্টী ব্যস্তমস্ত লোক
গাধার বন্ধন মনসোচয় হই নাই, যদি কোন সময়
পরিশাখার আশ্রম লাগিত, তাহাই নিরাইহে বৈকি-
লোক একত্র সমবেশ হইত, তিনি তাহাই দেখি-
ছেন; তদ্বিত করনই জনতা গাধার নন্দনোচয়
হয় নাই, আজ রাজবীজিতে হঠাৎ জনতা দেখিয়া
নির্জনপাত্রী সেই মুনির মনে আর কি ভাবের উদয়
হইবে? কি ভাবের উদয় হয়, তার-ত্রী-কৃত-অন্তরু-প্তি-
শক্তিমান কবি কালিদাস ভিত্তি তাহা কে বুঝিতে
পারে? তাই কালিদাসের শাখর ব বলিলেন,—

“তথাশীলং শব্দং পরিচিতিবিবিক্তেন মনসা
জ্ঞানার্থীণং যন্ত হতবহুপতীতঃ গৃহবিন।”
শারদ্যও তাহাই বলিলেন। তিনি কিন্তু আরও
বলিলেন,—
“অভ্যাক্রমিৎ সত্যঃ তদ্বিত্তিচরিতং প্রবৃক্ক ইব শৃণুতু
বহুশব্দং দৈবগতিভ্রমমিহ স্বপ্নসাদিনমদৈমি।”
শারদ্য বিয়ানসমক, তাই বিয়ানসমক যাক্জি

সবই বিপরীত দেখেন। রাজপুত্রীর জনসমাগম
দেখিয়া তিনি মনে করিতেছেন, নিজে সত্য,—অপরে
অসত্য; নিজে সচি,—অপরে অসচি; নিজে
প্রবৃক্ক,—অপরে নিদ্রিত এবং স্বয়ং দৈবগতি,—
অপরে অসত্য।

এ উচ্চারণের উচ্চতম উপমা আর কোঁথার
পাইবে? এমন উপমা যে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের
পরে পরে প্রকটিত। নহিলে, “উপমায় আলিদাম”
অভিযন্তাই হইবে কেন? কনি দায়া বুঝেন, ভাষায়
তাহাই বুঝান। বাহা মতভারত পাই নাই—
পাই পূরণেও পাইলাম না,—নাটকে তাহাই
পাইলাম। ইহা কি কম কঠোর কথা? কঠোর
আরও বুঝা হইবে, শকুন্তল-প্রত্যখ্যান বাপারে।

উপাখ্যানের শিখ্যায়ের কথা শুনিয়া রাজা
বলিয়াছিলেন,—
“কতি সতীহ পথিকাঃ জমস্তি কামসেবয়া।
রাজরাজ্ঞ মহিষী কা নো ভবিষি নিম্জতি।
তাম্ভাধা-বিবিধাঃ সন্তি তাঁপান্যশকুন্তরূপিণঃ।
তামামগ্রথেষ্টবং সমাঃ তাত্তিত মন্তি চ।
ভুক্ততে বিপুলান ভোদান পথিকাকরপার্কীতান।”

পদ্মপুরাণ, পূর্ণপণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।
ভাবার্থ—কত বেড়া আছে, এই কামসেবয়া
জন্ম করে। রাজরাজ্ঞ মহিষী হইতে কাহার
নাম অভিলষ হয়? এমন ব্রাহ্মণও অনেক আছে,
বাছারা কপট ভাস্পসেহ, উৎকর্ষ গথিকাগর সহিত
জন্ম করে এবং তাহাদের উপার্কীত বিপুল ভোগ
সম্ভোগ করিয়া থাকে।

শিখ্যায় নৃপতর্যক্য শিখ্যো কবত তাপসো।
মেপতুরিবহেধ্যোঃ পনভাতাপসমগাঙ্গ্যসি।
ইহাকু ভো গভে জুজো তাঁপসী ত্রকরাবদিনো।
পোতমস্তুত্রো প্রমাতাধাবানবাস্যং চে চেখ্যামি।
স্ব সা পৌতমী বৃদ্ধা জগায়া জগতপতিতম।
নৈবমর্হসি ভো রাজন্ বিখ্যামিত্রমহ্যং প্রতি।
এবং গাধাবাপাশ্রম ক দৃষ্টা গথিকা হয়।
অন্তঃসহা মহাভাষা বহা রাজন্ শিখ্যাতো।
সমাহিতেন মনসা স্বর পশু চ ব্রহ্মকীর্য়।
ইহাকু মোচায়ামসা শিরঃস্থানবনয়ম্ ॥

পদ্মপুরাণ, পূর্ণপণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।
ভাবার্থ—রাজার এই কথা শুনিয়া, শিখ্যো
আপ দিয়া কহিলেন,—ইহার বিধে মোচায়ামপাং
অন্তপত্ত হইতে হইবে। এই বিধে সেই ব্রহ্মকীর্য়
ভাস্পসহ সত্যোৎ প্রসঙ্গ করিলেন। পুরোহিত

তাঁহাশিগকে প্রসন্ন করিয়া বৃগুহে লইচ গেলেন।
তৎপরে বৃদ্ধা পৌতমী নিবটম্ব হইয়া কহিলেন,—
“মহাভাষা” শিখ্যামিত্রপুত্রীকে একরূপ কথা বলিলেন
না। কোঁথার কোঁথৈবশার এ প্রকার গাধা
দেখিগিলেন? আপনি এই মহাভাষাকে বিবাহ
করিগিলেন, ইনি এখন অন্তঃসহা। ভাল করিয়া
মনে করুন ও হৃদয়কে দেখুন;” এই বলিরা
তিনি শকুন্তলার অন্তর্ভবন মোচন করিয়া গিলেন।
ইহাতে রাজার মন ফিরিল না। রাজা

বলিলেন,—
“গৌরবং কুলে জাতঃ সত্যং মার্গে কৃতাসমুদ্রঃ।
ন বয়ঃ রূপমাগ্রেণ পথিকানাং জ্ঞামাহে ॥”
পদ্মপুরাণ, পূর্ণপণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।
ভাবার্থ—আমরা পুত্ৰবংশে জন্মিহি এবং
সংযুগে বিবরণ করি, বৈশ্যার রূপমাত্রে ভুলিবার
পাত্র নাই।

“এবং বসতি ভূপালে ত্রীভূতবৎ মানসি।”
নিয়মশেখন চ হুগ্ধেন তরো বুর্বেণ নিম্জলা।”
পদ্মপুরাণ, পূর্ণপণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।
ভাবার্থ—রাজার কথায় লজিত ও হুগ্ধবিত
হইয়া শকুন্তলা হস্তের তায় স্থির হইয়া গিলেন।

উপাখ্যানে বলা গেল,—শিখ্যোরা শকুন্তলাকে
একরূপ করিয়া জন্ম রাজাকে বুঝাইলেন;—রাজাও
কিছুতেই কিছু ভুলিলেন না। নাটকেও ইহাই
দৃষ্ট। তবে উপাখ্যানে দ্বিগীতাম না, কথমিহাঙ্গর
কি সমার মূল্যলেন রাজাকে বুঝাইয়া গিলেন এবং
রাজাও বা কি অকাট্য মুক্তি-প্রদানে এতাত্মখ্য
করিলেন; নাটকে তাহা দৃষ্ট। নাটকে যে চরিত্র-
বিশ্লেষণ হইয়াছে, উপাখ্যানে তাহা দৈব। অসৎ
উপাখ্যানে তাহা অন্তর্ভূত নহে। উপাখ্যানের
দৃষ্ট গাধাশে; নাটকের দৃষ্ট চরিত্রের মনস্বলো।
নাটক পড়িলেই বুঝা যায়, শিখ্য হইলেনও মুনি-
শিখ্যোরা কন্যাত্তে কোথৈবশ্যাম” জন্ম জ্ঞায়ামঃ
আবার তেমনিই বীর-প্রশান্ত ওজ-পত্নীর গিরিম
জাতীয়পুত্র। নাটক পড়িলে বা অভিনয় দেখিলে
স্পষ্টই চক্ষুর উপর দেখিতে পাইবে—মানসভরত
মহা-তরুণ অতুল-তরুণলগনপার উদ্বিগ্নকৃষ্ণ কবির
বাক্য কল্পিত অর্থাৎ শিখ্যামিত্রমসহ হুগ্ধস্তর জ্বলয়ে
নিহিত হইয়াছে। “পথিবাক্য ঐশিয়, শকুন্তলকে
প্রত্যখ্যান করণ অভিশাপের অস্বাধ মল।
অভিশাপের অন্তগম সত্যোৎ জিহ্বাববিক্রীণ বীর-
কেশরী হুগ্ধও জ্বলয়ে। প্রত্যকার বা প্রতিবিধান

করিয়াছিলেন। উর্দুশা, পূর্ণচিহ্নিত, সহজজ্ঞা, মেনকা, বিবাহী ও হুতাশী 'এই ত্রয় অমরা সর্গপেণী। শ্রেষ্ঠা; ক্রীড়াসের মধ্যে একা হইতে উৎপন্ন। মেনকা অমরা দেবলোক হইতে হুতলে আসিয়া বিশ্বাসিত-সুন্দর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরে হিমালয় পর্বতের গ্রায়ে আমাকে প্রসব করিয়া সেই অসক্তজাত মেনকা পরের সম্ভবনে দ্বার্য্য পরিভ্রাম্যে পূর্বক বনন করিয়াছিলেন; বা আমি পূর্বজন্মে কি, পাপ করিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে মাতাপিতা আমাকে পরিভ্রাম্য করিয়াছিলেন, এখানে আপনিও পরিভ্রাম্য করিতেছেন।

বাচের বাজী।

মোহিনী একটা কড়া লইয়া বড়ই ব্যতিশ্রুত। মোহিনীর বড়ই কষ্ট। একখানিমাড় ছোট বাজী আছে। নিম্নে একখানি বর রাখিয়া সমস্ত বাজীটা লাড়া দিয়া তাহাকে জীবিকা-নির্বাহ্য করিতে হয়। কাজক্ষেপে শুভয়ান হইয়া থাকে। আজ কালের রকমে বজার বিবাহ দিবার কোন উপায় নাই। কি হবে? বজার বসন ২২ বার বসন উঠাই হইয়া ১০ বের হইল। জাত বায়, উপায় কি? যেন কিছু খুঁজিা লাগিল।

বীরেশ্বর শোষের এক বৎসর হইল গৃহ শূন্য হইয়াছে। মোহিনী কড়া সারদা—তার তারি পছন্দ। হুতাশী আসিয়া বলিল, এমন কি বরযাত্রী ও কড়া-বাজীর গাইখরচ দিয়া সে বিবাহ করিবে। মোহিনী আত্মদে গদ-গদ, —খণ্ডাশপথের মধ্যম ভিন ষটা জল ঢালিত, এখন নয় ষটা ঢাশে। বিবাহের দিন স্থির হইল। পাত্র-হরিদ্রার সামগ্রী আসিল। বর সোজাশপথে—প্রভাতী এখাণ্ডী পাত্রে। তাতে কি এসে গেল? জাত রক্ষা হইল ত। বিশেষ বীরেশ্বরের বৈরত ব্যবহার—কেবল একজনের জাত রক্ষা করিবার জন্যই সে বিবাহ করিতেছে। একপা পাড়ে কড়া দান করিলে কিছু বিশেষ ক্ষতি নাই। পাত্র হুপাড়। মহাবেবেকও লোভ পূর্ণে কড়া-দান হইয়াছিল। ভূতীর মা'র সোজাশপথের জামাই এনে হমেরে সোনা মার।

সকলই বিধাতার ফের। পাত্র-হরিদ্রার সামগ্রী আসিল,—প্রতিবাদিনীগণের আনন্দের সীমা রহিল

না; মোহিনীর চক্ষে একশ্রুৎ জল পড়িল। সম্ভার পর পাত্র আসিল,হমের মনে একই দুঃখ হইয়াছে;—বিবাহ করিয়া ত কড়া আনিবেন; কিন্তু শান্তভীরু শশা কি হইবে; একে বিধবা স্রীলোক—বসম তেমন রক্ষণ না—তিনি কলঙ্ক পেরে স্রানিবেন—তার পর লোকের নিন্দা করিবে; স্বতঃস্বে জরুক স্বরূপ বাজীদানী তাহাকে দেওয়া হউক;—তিনি শান্তভীরুকে বাজী আনিয়া দানের ছাত্র সেবা করিবেন।

সকলের মন সুরান নয়—বীরেশ্বর বাবুর যেমন সয়ল অন্তঃকরণের প্রস্তাব—মোহিনীর একজন হুশী মন্যভূতা তাই, নামটী বড় ভাল নয়, সেবারান বা হোড়োয়া বলিয়া লোকের ডাকে; কুরট্ট লোক কিনা—প্রস্তাবটা বড় ভাল মুখি না; বলে—মোহিনি, তুমি সর্বদান করতে বসেছো? তুমি নাকি বীরেশ্বরেরকে বাজী নিধে দিতেছ? মোহিনী বলিল, 'না—জামাই একটা কথার কথা বলেছেন—ভালই বলেছেন, তুমি তাই লোকান লইয়া ব্যতিশ্রুত; তাই বসন, বাজী লিখিয়া দাও, আমি ভরপ পোষ্য করি।' আমি কি, তোমার মত না,নিম্নে কোন কাজ করি? তুমি বলেছ, বীরেশ্বর মল পাত্র নয়, তুই বিবাহ দিতে সমস্ত হইয়াছি।'হোড়োয়া বলিল, 'আমি ভাল মুখি নাই;—বীরেশ্বরের মতলব ভাল নয়।' মোহিনী বলিল, 'উপায়? পাত্র-হরিদ্রা লইয়াছে, তাহা না হইলে লোভ যাও।' একপা কথারাজী হইতেছে, এমন সময় বীরেশ্বর বাবুর নিকট হইতে একখানি পত্র আসিল,—বর্মি বাজী না লিখিয়া দেওয়া হয়, তিনি বিবাহ করিবেন না, তিনি তার এককরে বর নয় যে, পাত্র-হরিদ্রা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত যাবে; না হয় আর নাই বিবাহ করবে; তাই বলে কি নুতরা শান্তভীরু একা মুখি হইতে থাকিবে; তারি বাকি বিবাহের ভর নাই? ক্রমে স্থির হইল বাজী না লিখিয়া দিলে বিবাহ হইবে না। কি হবে, জ্ঞাত যায়। জামাই বাজী লইয়া কাকি গেরে বিক; মোহিনী না হয় বাদুদী-ব্রতী করিয়া থাকিবে। কিন্তু হোড়োয়া বেশ কপাল, কপাচ হইতে পারে না। হোড়োয়া বয়স দ্বাদশ করিয়া পত্র লিখিল—মোহিনী যুবতী নয়, কস্তার বিবাহাছে। বাজীদানি ভাড়া দিয়া, হোড়োয়াও পরবিবাহের হইবে; মহাশয়ের কোন চিন্তা নাই, কোন নিশা কারণ নাই; মোহিনীর চরিত্র আদর্শ-চরিত্র;—সাত আটটা সন্তান কাগ্রাসে পতিত হইয়া এই কড়াটা মাত্র বাচিয়া আছে; শোকসন্তাপিতা বয়ঃস্থা বিবাহের নিভৃত চিন্তায় কোন কারণ নাই।

বর মহাশয় উরু-চরিত্র,—কোনরকমেই এ সকল মুখিবেন না। স্রীলোক কেনকেনই বিবাহের পাত্র নয়, তা সভ্য সন্ন্যাসনায়েই স্থির করিয়াছেন; রায়স অধিক হইলে কি হয়? যেমী কথাতের কাজ নাই, বাজী লিখিয়া দেন, বীরেশ্বর বিবাহ করিবেন, নচেৎ নাই। মোহিনী প্রাণ সমুদ্রা: হোড়োয়া অকূল পাথার ভাবিতহই; এমন সময় হোড়োয়াও পত্র আসিয়া বলিল, 'বাবা বিবাহ না—তেরে বাচের? বা হোড়োয়া-বলিল, 'যাবু ত কি হবে?' পত্র উত্তর করিল, 'হেমচন্দ্র বহু নামে আমার' একটা লুফু লুফু টুয়েন্টটপিশ পাশে করিয়াছে; তার পিতা-মাতা কেহই নাই; পৈতৃক একখানি বাজী; সম্পত্তির মধ্যে বিদ্যা; সে পত্র করিতে আসিয়া মারথাকে দেখিয়াছে। এ যে বর্মি ভাগিয়া যায়, হেমচন্দ্র মারদায়ে বে করিতে প্রস্তুত।' হোড়োয়াও খর হাত রাড়াইয়া পালিল। হেমের সহিত মারদার বিবাহ হইল। বীরেশ্বরের দুঃখের সীমা নাই না।

বীরেশ্বর লোকের কাছে বলেন,—ভাল হইয়াছে, হেম তাহা আশীর্ষ্য, হেম মারদার যোগ্য পাত্র, তার বিবাহ করিবার মত ছিল না, কেবল জাত যায়, এই নিমিত্ত সমস্ত হইয়াছিলেন,—হেমের সহিত বাজী বিবাহ হয়, এই ভাব নিভাত হইল। বাজী লিখিয়া দিবার প্রস্তাব তাঁর জলমান, সম্বন্ধ না—ভান্ডিলে হেমের সহিত বিবাহ হইবে না; এ সকল কথা হেমের সহিত বিবাহ হইবার পর শুনা বাইতে লাগিল; কিন্তু হেমের সহিত ভতবাহিনী হইবার অন্তে তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, তিনি কন্যাস্রীষ্ট-অঙ্গের নালিস করিবেন। শুনা যায়, এই রকম নাকি সভ্য হইয়েরগিরের মধ্যে কি আছে।

ভববিবাহ সম্পন্ন হইল। বীরেশ্বর সন্ধ্যায় হেমের পৈতৃক বাজী বীরেশ্বরের বাটতে লগল। যে বয়ে হেম শরদ কঁপে, বীরেশ্বরের বাজী হইতে যদি কেবল কোক স্নেহ বয়ে—বাইতে ইচ্ছা করে, সহজে পায়ে। ইট বেরন পুজোর দালান—সেই পাশে বর হইবার সম্ভাবনা ছিল; সেই জায় ইট বেরন আছে। ইট পরিষ্কার উঠিয়া বাহলে চিলস ব পড়ে। তার পর সিন্ধিতে নামিলেই ভাইসে মারদার শোবার ঘর। মারদার শোবার ঘরে গিয়া বীরেশ্বরের কোন প্রশোক রাখিয়া আসিতে পারিলে এবং তাহা কোন প্রশোকের প্রশংসা করিতে পারিলে, লোকের মনে একটা সন্দেহ জন্মাইতে পারে।

এই ২১শাখ হেমচন্দ্রের পাত্র—প্রতিবাদী

স্রীলোকেরের জোজ। এসংবাদ বীরেশ্বর বাবু তার মাদার নিকট তুলিয়াছেন। মারদার এক দাসী ছিল। বীরেশ্বর 'প্রভাতী' নামের দাসী; একদিন হুই টাকা কলহাইল, তাহাতে সে রজ্জী হয় নাই; দিন দুই হইল পরে একবারে ৫০২ পদশা টাকা কলহাইল; লুসুদতি দাসী রজ্জী হইল। বীরেশ্বর মনে-করিয়াছিল, সেই ঘরে পরিভ্রাম্য করা পড়িলেই যথেষ্ট; কিন্তু তাহা অশেখা যদি তিনি স্বয়ং সেই ঘরে ধরা-পড়েন এবং তাহাকে মার না থাকে হয়, তাহা হইলে হেমের আর-পদশমেরে সীমা থাকে না।

হুয়েপাও উপস্থিত। বীরেশ্বর সংবাদ পাইয়াছেন, ৫২ তারিখে হেমের মনিবের বারাকশপেরে বাগানে ইংরেজেরে বল ও সশার; তাহাকে সেই বাসে থাকিতে হইবে। শুভসংবাদ দাসী আসিয়া দিল। দাসী মুচকে মুচকে 'হাসিয়া বলিল,—মহাশয়! তারি হুয়েপা; বাবু ত বাজী-ধারনে না;—প্রভা বিধান—সকাল সকাল খেয়ে—বীর বিধানার আপনি শুনে থাকুলেই—মা-ঠাকুরাণে দোর দিয়ে শোবার পিত্র, কিন্তু মহাশয়।—যে কাজে আমি যাত দিচ্ছি, ৬ ভতীর অনন্ত আমার চাই। কথা তুলিয়া বীরেশ্বর উত্তর; দাসীকে অনন্ত, হার ইত্যাদি না মুখে আসিল, তা দিতে বীকার করিল। কি চমৎকার প্রয়োগ। মারদা বড় হাতছাড়া হয়ে ছিল; এইবার—স্রীষ্ট-বাক্ষসেই—কি না হয়? এই দিকে ত বড় ঠিক, মারদার বঁতুর সর্বদান করন করিয়াছিলাম, কাজে তাহা অপেক্ষা শতগুণ হইল। পরে তিনি আপনি ঢাকা বাজাইয়া বেড়াইলেন। কিন্তু হেমের শোরতর লজ্জা ভিন্ন অন্য কোন সাজা হইল না। সে টুয়েন্টটপিশ পাশে করিয়াছে; দশ হাজার টাকা পুস্তকায় পাইয়াছে; কোন মহাশা ঠাকুর বাড়ীতে চাকরী লাভ করিয়াছে। ঠাকুরের সেক্সার বড় উচ্চ,—দশ বিশ হাজার গ্রাহ করেন না। হেমের বিবাহ-কথা শুনিয়া তিনি বর্লন, হেয়ে এম,এ, বর; অন্তত এ বিবাহে পাঁচ হাজার টাকা পাইবে। এক বাজীতে যোগে বিবাহ করিয়াছে, বাবু বাজীতর জ্ঞাত বাইত, এই সংবাদ শুনিয়া ঠাকুর তাহাকে তিন শত টাকা বেতনে প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং দশ হাজার টাকা তার পার্শ্বভোগ্যে বরখার দিতে সম্মত হইয়াছেন। বীরেশ্বর ভাবিল, এ টাকা কিরূপে হস্তান্ত হই, হেম বড় কথার মাহুস, একটা বাজী রাখলে হয় না?

বিশ হাজার টাকার কোশানির কাগজ হইলোঁসে আছে, তাহা যেমত প্রবাহিত; সারদার কলঙ্ক হইল না; সোহানীর বাড়ী গেল না। যেমত প্রবাহিত হইল না। লউন, মকলই প্রকাশ হই-
রাছে। অশমানের একশেষ। বীরের প্রবাহিত এই দশ।
সকলেরই অর্থ এই দশ। হয়। অর্থ কেহ
কোন বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে; কিন্তু যে পাঠক।
যদি তাহার মনের অবস্থা দেখেন ত, বিশেষ অর্থ
প্রয়োজন হইলেও আপনাদি ওরূপ অর্থ উপার্জন
লাভসা হইবে না।

মন্দভাগ্য মণিপুর।

১৫ই বৈশাখ সোমবার মধ্যাহ্নসময়ে মণিপুর-
নগর ইংরেজ সেনার অধিকৃত হইয়াছে। তিন
সেনা, তিনপথে অভিযান করিয়া, একদিনে রাজ-
ধানীর ভিন্ন ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল; একসময়েই
তিন সেনা সহরে প্রবেশ করিয়াছিল। নগর
প্রবেশে সেনা বা সেনানীগণকে কোনরূপ কষ্ট
পাঠিতে হয় নাই; রাজধানীর অধিকারে মণিপুরী
সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই; বৃটিশ কামা-
নের স্বাধীনতা কাহাকেও উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই;
বৃটিশ বন্দুকগুলি টোটার অপব্যয় করিতে হয়
নাই; বৃটিশ কষ্ট তবাবি স্থ্যালালোকে প্রতিফলিত
উজ্জ্বলিত করিতে হয় নাই; বৃটিশ সৈনিক সেনানী
দিগের বসন্তকাল মণিপুরী প্রজাবন্দকে দেখাইতে হয়
নাই।

জনপদ জনশূন্য পড়িয়া ছিল; সহর বেন শ্রাণ-
নের আকার ধারণ করিয়াছিল। রাজা ব্রজেন্দ্র,
বুরাজ চৌধুরী, কৃষ্ণী কৃষ্ণকান্ত, চতুর্থ অজয়-
সিংহ সকলেই রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন;
সভাসদ, সেনাপতি, সেনানী, পালজিত কেহই
সহরে দেখেন না; সৈনিকেরা স্ব স্ব ঘাটে প্রস্থান
করিয়াছিল; প্রজারা রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন
করিয়াছিল; হাট বাজার লোকদিগের দিগন্ত
ছিল না।

রাজধানী নির্জন—নিশুঙ্ক, চারিদিকে ভয়ঙ্কর;
মণিপুরে বেন লঙ্কাও হইয়া গিয়াছে। অস্ত্রাগার
ভয়ঙ্কর, রাজপ্রাসাদ ভয়ঙ্কর; অস্ত্র ইংরেজের

রেসিডেন্সিয়াল পুরী হইতেই ভয়ঙ্কর পানপত
হইয়া আছে। রেসিডেন্সিয়াল ভবন পণ্ডিত হইয়া
ছিল ২৪শে মার্চের যুদ্ধে; রাজভবন ভয়ঙ্কর
পণ্ডিত হইয়াছিল রাজা ও রাজসহোদরদিগের
পলায়নসময়ে বা পলায়নান্তে।

রাজধানী কখন দখল হইয়াছিল, তাহার এখন
ও সিন্ধাভূত হয় নাই। কেহ বলিতেছেন,
পলায়নের সময় বুরাজের আদেশেই অস্ত্রাগার
দাহিত হইয়াছিল, প্রজ্ঞানিত অস্ত্রাগারের অধি-
শিখাই সগিহিত রাজপ্রাসাদকে দখল করিয়া দিয়া
ছিল। কেহ বলিতেছেন, রাজা ও বুরাজের অমৃত
সহচর ও পাত্র সিন্ধিদিগের ভিতর গৃহবিধা উপস্থিত
হইয়াছিল, গৃহবিধায়ে লঙ্কাও লুপ্ত হইয়া
ছিল। কেহ বলিতেছেন, রাজা ও রাজসহোদরদিগের
পলায়নের পর নগর উপনগরের যত দূরলোক
পুরীপ্রাসাদ লুপ্ত হইয়াছিল, লঙ্কাওও তাহারাই
সম্পন্ন করিয়াছিল।

এইরূপই নানা মুখে লঙ্কাওয়ের নানা কাহিনী
পোনা বাইতেছে; নানা লোক নানা জনের উপর
নাশপায়নের আরোপ করিতেছে। আমরা কিন্তু
কোন কথাই নীমাংসা করিব না; অস্ত্রাগার শত্রু
হস্তে দিয়া যাওয়া অপেক্ষা যে, তাহা দখল করিয়া
কেলা, রাজনীতি ও সমাজনীতির মতে প্রকৃষ্ট পদ
নয়, তাহাও আমরা বলিতে পারিব না; লঙ্কাওয়ের
কারণ-নির্দেশে আমরা যত্ন হইব না; প্রাচীন রাজ-
ধানী মণিপুর হইলে, সহসা এইরূপ শোচনীয়
অবস্থা গ্রস্ত হইল, ইহাতেই আমরা ব্যস্ত; বড়
দুঃখিত এবং ব্যথিত হইয়াছি।

লঙ্কাওয়ে রাজধানী ত্রীণী হইয়া গিয়াছে;
এ মণিপুরকে আর সে মণিপুর বলিয়া চিনিতে
পায়া যায় না। বেন "বহুপতে: ক গতা মনুরাপুরী;"
নে সে মনুরাপুর নাই; মনুরাপ সে বহুপতেও নাই।
নে "মহুপতে: ক গতা মনুরাপুরী;" বেন রত্নপতি
রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যাও ইংলোকে হইতে
চলিয়া গিয়াছে।

মন্দভাগ্য মণিপুর। এক রাজা নির্মলিত,
অন্ত রাজা বন্দীভূত; মণিপুরের স্বাধীনতা ভিঙ্গিদের
হস্তে ভিঙাইতে হইল। ইংরেজ-সেনা রাজ্য অধি-
কার করিয়াছে; ইংরেজ রাজপুত্রসেবাই বোম্ব হইয়,
রাজ্য শাসন করিবেন; আর যদিই ইংরেজের
নির্দিষ্ট রাজা শূন্যভবন বা তাহার পুত্রকে
কিন্তু অত কোন মনোমত ব্যক্তিকে মণিপুর-বিজা-

সনে অধিবেশিত করেন, তাহা ইংলেণ্ডে মণিপুর আর
খানদেই হইবে না; ইংরেজের রেসিডেন্ট বা প্রতি-
নিধি প্রকারান্তরে রাজ্য করিবেন। আরক্ত
বহু পণ্ডিত বিশাল বিস্তৃত ভূমিভাগে একমাত্র
স্বাধীন বিজাতি ছিল; এতদিনের পর তাহাও
বিশৃঙ্খল হইল—মন্দভাগ্য মণিপুরের থাকা না থাকা
সমান হইল। সকলই বিধাতার নির্দয়; সমস্তই
কষ্টের ফল।

অভিযানে যুদ্ধবিগ্রহ।

ইংরেজসেনা তিনপথে অভিযান করিয়াছিল।
উত্তরের পথে কাহিমা-সেনার সৈন্যপাভা-ভার লইয়া-
ছিলেন জেনেরল কলেট; মণিপুরের পথে টামু-
সেনার সৈন্যপাভাভার লইয়াছিলেন জেনেরল
গ্রেগো; আর পশ্চিমের পথে কাছাড়-সেনার
সৈন্যপাভাভার লইয়াছিলেন বর্ণেল রেবিং।
হুই দিকে হুই জেনেরল; একদিকে এক
কর্ণেল।

উত্তরে কাহিমার পথে কলেটের সেনাকে হুজাপি
কাহারও সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হয় নাই;
কোন থানায় কোন বাটীতে কোন মণিপুরী
সৈনিক সেনানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়
নাই। মণিপুরী হুজাপি শূন্য পড়িয়াছিল;
ইংরেজসেনাও উত্তরের পথে অবাধে আগিতে
পাইয়াছিলেন।

পশ্চিমের পথে কাছাড়-সেনাকে মণিপুর-সীমায়
গিয়া, একটা সেতু বা একটা দুর্গ অধিকার করিবার
সময়, মণিপুরী সেনার সহিত একই আঘাত যুদ্ধ
করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধে কিন্তু মণিপুরীসেনা বৃটিশ
কামানের কাছে শেষে পরাজিত হইয়াছিল;
ইংরেজসেনাও তখন: মণিপুরের দিকে অগ্রসর
হইতে পারিয়াছিল। কাছাড়ের পথে বাটমত
যুদ্ধ যে একটাও হইয়াছিল, তাহাও আমরা শুনিতে
পাই নাই।

কিন্তু টামুপথে ইংরেজ-সেনাকে কষ্টে অভিযান
করিতে হইয়াছিল। বরবার অগ্রসর হইয়া, ইংরেজ
সেনাকে শেষের কাছে আর একটা যুদ্ধ করিতে
হইয়াছিল। অভিযানের পূর্বে শোবলের বীর সেই
এট প্রকৌণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া যে পেলেন

অঙ্গসংখ্যক মণিপুরী সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া,
অভিযানের সময়ও প্রভূত ইংরেজসৈন্যকে
সেই পেলেন সেই অধিকসংখ্যক মণিপুরী সেনার
সহিত আবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মণিপুর-
বিজাতি এখানে এতটাই প্রকৃত হইল।

এ যুদ্ধে মণিপুরীসেনার কত যোদ্ধা ছিল, তাহা
ঠিক জানিতে পারি নাই। ইংরেজ-পক্ষের কেহ
হইক বলিতেছেন, মণিপুরীসেনার ৩০০০ যোদ্ধা
ছিল; কেহ কেহ বলিতেছেন, ১২০০ যোদ্ধা ছিল।
ইংরেজ পক্ষে কত পটন ছিল, তাহাও ঠিক জানিতে
পারি নাই; কিন্তু লোক যে অল্প ছিল না, তাহা
সহজেই অনুমান করা যায়। ইংরেজ নিজেই
বলিতেছেন, দুইটা কিছু, ভাষ্যমুক্তি ধারণ
করিয়াছিল।

মণিপুরী যোদ্ধাদিগের শৌর্য বীর্য সাহস এবং
বল-কৌশল দেখিরা, বীর বৃটিশ সেনানীগণকেও
বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। যুদ্ধে একজনও মণি-
পুরী সৈনিক পৃষ্ঠদর্শন করে নাই; যুদ্ধে ইংরেজ
সৈনিকদিগকেও বিষম বিজাত গোহাইতে হইয়া-
ছিল। বীর বৃটিশ সেনানীরা মনে করিয়াছিলেন,
গোতককে গোয়ার শকেই মণিপুরী সেনাকে পরা-
জিত ও বিধ্বস্ত করিবেন। কিন্তু যখন ভাষ্য-
নয়ন প্রসূত হইল—অভিনয় যখন ক্রমে গাঢ়
হইয়া উঠিল, তখন বৃটিশ সেনানী ও সৈনিক-
দিগকেও অন্ধকার দেখিতে হইল। মণিপুরী সেনার
সে সময়ে এমন যোদ্ধা ছিল না যে, স্বপ্নের রণে
ভয় দিবার কল্পনা করিয়াছিল। সমুদ্র-সমরে
কোন মণিপুরী সৈনিকই হতসাহস হয় নাই;
যুদ্ধভয় মনে ইহাদিগের কাছে ভয় পাইয়া পলায়ন
করিয়াছিল।

বৃটিশ-পক্ষে কামান বন্দুকের ভাষ্য বিজয়,
পাণ্ডাভা প্রথমা বর্ণনা, বীর বৃটিশ সেনানীগণের
বর্ণকোশল; মণিপুর পক্ষে কামান বন্দুকের আঘা-
বা আশিষ্য ছিল না, মণিপুরী সৈনিকের হস্তে
বর্ণা চাইই বিজয় করিয়াছিল—চাল বর্ষাই
মণিপুরী সৈনিকদিগকে বিষম সময়ে সাহায্য
করিয়াছিল। পাঠক। বসন্তকাল মণিপুরী
যোদ্ধার প্রাচ্য বীরবেশ দেখিরা, বিস্মিত হইও না।
এই যেই মণিপুরী যোদ্ধা বৃটিশ বীরদিগকে ভাট
চিহ্ন এবং বিজিত করিয়াছিল; বর্ষাকালের
হাতে সামান্য অস্ত্রশস্ত্রেও অসামান্য কাৰ্য্য সম্পন্ন
করিয়া থাকে।



পেলেলের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষে কত সৈনিক হত, কতই বা আহত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত তথ্য পাই নাই; কিন্তু হত বড় বড় বীরসেনানী যে, গুরুতর আঘাতে আহত হইয়াছিলেন; তাহা আমরা ইংরেজের কাছেই ভূমিরাছি। শোবালের বীর গ্র্যান্ট এই যুদ্ধে কণ্ঠদেশে আঘাত পাইয়াছিলেন; অত্যন্ত আরও পাঁচ সাতজন বৃটিশ সেনানীও গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। শুধু পাঁচনের প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বীর সেনানীদের ভিতরও অনেকে আহত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ হতও হইয়াছেন জনব, ইংরেজ-পক্ষের অনেক যোদ্ধাকেই শমনসরনে পাঠাইয়া দিতেছে; কখনও বা শতাবধি লোকের মৃত্যুসাংবাদ প্রচার

করিতেছে। কখনও বা একটা গোটা বেজমেন্টের নিধনবাস্তা ঘোষিত করিতেছে। আমরা কিন্তু 'এ সকল জনরবে আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। ইংরেজ যখন বলিতেছেন, যখন অধিক লোক মরে নাই, মণিপুর-পক্ষেই লোকসংখ্যের একশেষ হইয়াছিল, তখন আমরা তাহার কথাই নিরোধার্থ্য করিতেছি। আর এ যুদ্ধে যে, আমাদের সিপাহীরা, আমাদের শৌর্য বীর্য, সাহস মহিমতা ও বীর-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিল; দিয়া, বৃটিশ সেনানীরা ও সেনাপতিগণকে আনন্ডিত করিয়াছিল, ইহাতে আমরাও আনন্দ অত্যন্ত করিতেছি।

রাজবংশের পলায়ন।

ইংরেজসেনা রাজধানী অধিকার করিবার পূর্বেই রাজা, যুবরাজ-সেনাপতি, তাঁহাদের ছই সহোদর, পাত্র-মিত্র সকল, সম্প্রদায়ের রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। বিক্ষুব্ধকিন্ধা বৃটিশ সেনার তিন পক্ষে অভিমান হইতেছে, ভূমিরা হয় ত মণিপুরী সৈনিকেরা হতসাহস হইয়াছিল। তিন পক্ষে ১১০ হাজার বৃটিশসেনা অভিমান করিতেছে; সবে দ্বিগুণাধিক সৈনিকসংখ্য। হয় ত মণিপুরী সেনা নীরা মনে করিয়াছিলেন, তিনপক্ষে ত্রিশ হাজার বৃটিশ যোদ্ধাই অভিমান করিতেছে; হয় ত মণিপুরের শান্তিপ্রিয় রাজা কুলচন্দ্র প্রথমাবধি যুদ্ধ-বিগ্রহে বাঁটারপ হইয়াছিলেন; হয় ত যুবরাজের সহিত রাজার মতভেদ হইয়াছিল; হয় ত রাজাহু-চরনিদের ভিতর গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকবিধ কারণেরই অনুমান করা যাইতে পারে। রাজবংশের পলায়নে যে গুরুতর কারণ ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরেজের পক্ষে আপাততঃ অনভিলম্বিত হইলেও, মণিপুরী রাজবংশের পক্ষে পলায়ননী যে নিত্যন্ত মন্দকার্য্য হইয়াছিল, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে, তাহা কখনই বলিতে পারা যায় না।

ইংরেজের সেনা ও সেনানীরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য লালসায়িত হইয়াছিলেন; অদম্য সকলেরই ক্ষিপ্ত হইয়াছিল; মণিপুরপ্রবেশে যুদ্ধ বিগ্রহ হইলে যে, সৈন্যপাণ্ডের একশেষ হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বীরবর যুবরাজ-সেনাপতি—তীক্ষ্ণজিহ্ব, বোধ হয়, যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু শেষে বোধ হয় তাহাকেও কোষ্ঠের আদেশই নিরোধার্থ্য করিতে হইয়াছিল। রাজা ও যুবরাজকে পলায়নে উদ্ভাত দেখিয়াই, বোধ হয়, মণিপুরী সৈনিক ও সেনানীদিগকেও অপর্য্যাপা-য়ন করিতে হইয়াছিল।

যুদ্ধ হইলে যে, মণিপুরী সৈনিকেরা অপ্রাণ থাকিতে রণে ভঙ্গ দিত; সেনানীরা যে, শৌর্যবীর্য ও সাহসের পরিচয় দিতে রুজিত হইতেন, ইহা ত সন্দেহ মনে করিতে পারা যায় না। মণিপুরী সৈনিক হীনবল নাহে, তাহার দেখ যেন শৌর্য নিশ্চিত, তাহার সাহসও অসীম। পার্শ্ব। ঐ মণিপুরী সৈনিকের জিহ্বা দর্শন কর; দেখিলেই রুজিতে পারিবে, উহার বলবিক্রম কিরূপ; দেখিলেই

তোমার মনে হইবে, মণিপুরী সৈনিক দখাব বীর। উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; উহার বল যেন দেহ ছাড়িয়া উৎখলিয়া পড়িতেছে; উহার পদভরে যেন মেদিনী কণ্ঠিত হইতেছে; উহার হস্ত যেন তরবারি ধারণের জন্য সদাই বহুমুখি হইয়া আছে; যথেষ্ট যেন দস্তে দস্তে প্লেবন হইতেছে।



কিন্তু এরূপত মণিপুরী বীরবিপাকেও বিনা যুদ্ধে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। যত্নী না থাকিলে যত্ন চলে না; যত্নী না থাকিলে রাজ্যভঙ্গ চলে না। সেনাপতি না থাকিলে সৈনিকদিগের সমরকার্য্য

চলিবে কেন? মস্তক না থাকিলে দেখে অচল, শিউ না থাকিলে বড়ী অচল, সেনাপতি না থাকিলে সেনা অচল। সেনাপতির অভাবই মণিপুরী সেনাদের প্রধান দুর্বল বিন্দু। গিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল, তাই ইংরেজ-সেনা বিনা যুদ্ধে অব্যবহাজপুত্রীপ্রবেশে কৃতকাণ্ড হইয়াছিলেন।

পলায়নের সংবাদ।

ইংরেজসেনা ১৫ই বৈশাখ মণিপুর-সম্বন্ধে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছে, প্রাচ্যাদপুত্রী শূন্য, নগরে জনমানব নাই। শুভ নগরে নহে—নগরের চারি-পাশে তিন ক্রোশের মধ্যে ইংরেজ একটাও বন নারী দেখিতে পান নাই। নগরবাণী, উপনগরবাণী, প্রাচ্যবিল্লিপনগরবাণী সকলেই চলিয়া গিয়াছে; গৃহ, প্রাসাদ, উটান, সমতটী শূন্য পড়িয়া আছে। চারিদিক নিঃশব্দ নিঃশব্দ; কেবল ইংরেজ-সেনার কোলাহলেই ইংরেজসেনার কণ্ঠস্বরের হইতে লাগিল। ইংরেজ-মুখে শুনিতেছি, নগরের সেই শূন্যতারে তাঁহার হৃদয়েও আঘাত লাগিয়াছিল।

ইংরেজ-হৃদয়ে কেন আঘাত লাগিয়াছিল? যে মণিপুর ছই মাস পূর্বে হুগ্ধসম্মানে হাজ কর্তৃত্ব ছিল, সেই মণিপুর শূন্য পলায়ন হইয়াছে বলিয়া, ইংরেজের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল কি? রাজা ও রাজসহোদরদিগকে পরাজেতে বহিতে হইয়া, যখন যখন বন্ধুগণের ভ্রমণ করিতে-হইতেছে বলিয়া, ইংরেজের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল কি? অশুশ্রীশ্রদ্ধা রাজ্যনিবাসিগণকে সামান্য বন-চারিদিকেরে ভ্রাম্য কন বনে ফিরিতে হইতেছে বলিয়া কি ইংরেজের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল? নগর উপনগর এবং জনপদের যত বন নারী পৈতৃক বাসভবন পরিভ্রাম্য করিয়া, অনাবারে অস্বাভাব্য কোন অজ্ঞাতপ্রবেশে কষ্ট পাইতেছে, এইজন্য কি ইংরেজের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল?

জ্ঞানিনা, কোন উপার-স্থল ইংরেজের মনুষ্য-ময় হৃদয়ে এইজন্য আঘাত লাগিয়াছিল কি না; কিন্তু ভনিত্তি, পুত্রীপ্রাসাদ শূন্য দেখিয়া, রাজবংশ ও পরামিত্রদিগকে পলায়িত দেখিয়া, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার অবসর হইল না বলিয়াই, ইংরেজ-সেনানীদিগের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল; এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইল না বলিয়াই, ইংরেজের মত এদেশীয় সংবাদপত্র শোকে ভ্রমে সর্বজননয়ন

হাঝাকার করিতেছে। দেখিয়া ভনিয়া আমরা অবাক হইলাম। বীরছন্দসের এইরূপ সংকীর্ণতা দেখিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম।

১৫ই বৈশাখ ইংরেজসেনা রাজধানী প্রবেশ করিয়াছে। রাজা ও রাজসহোদরের সাহচর্য মণিপুরে তাহার পূর্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন। কেহ বলিতেছেন, রাজবংশের বনবাস হইয়াছিল ১৫ই বৈশাখ; কেহ বলিতেছেন, আর ছই এক দিন পূর্বে। রাজবংশকে যে সহসা এবং অগত্যা নির্বাসিত হইতে হইয়াছে, তাহা কিছ কিছু দেখিয়াই বুঝা বাইতেছে। সহসা বজা আসিলে গৃহস্থ বেগে কেবল সস্তান-সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করে, সেখানে বর্ষা তর্য লোকের যেমন ভক্ত প্রাণ লুইয়াই পলায়ন করিত; মণিপুরের রাজবংশও সেইরূপ ইংরেজসেনার আপমান-বাজী পাইয়া, ভক্ত প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছেন।

কহিবার পথে সেনাপতি কলৌ রাজাকে যে পত্র লিখেন, পুত্রীপ্রবেশের পূর্বেই তাহার উত্তর পাইয়াছিলেন। ইংরেজসেনাপতি রাজাকে লিখিয়াছিলেন,—“এখনও ভাল চাও ত, শীঘ্র আসিয়া আমাদের সঙ্গে আত্মসমর্পণ কর। আমরা তের যে সকল লোক এখনও বন্দীভাবে আছে, তাহাদিগকে আমরা কাছে পাঠাইয়া দেও; গৃহ-নিগ্ৰহের চেষ্টা করিও না। আমাদের পরণামত হইয়া পড়িলে, তোমার অপরাধের বিচার হইবে; কিন্তু বিচারেতে তোমার প্রাণরক্ষা হইবে কি না, তাৎপক্ষে কোনরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারিতেছি না; আত্মসমর্পণ না করিলে—প্রতিকূলতা করিলে—কিছু তুমি কিছুইই প্রাণরক্ষা পাইবে না।”

এ পত্রের কিরূপ উত্তর আসিতে পারে, তাহা পাঠক সচেতনই অনুমান করিতে পারিতেছেন। সেনাপতির পত্রে যদি প্রাণরক্ষার আশা দেওয়া হইত, তাহা হইলেও হয় ত, রাজা কুলচন্দ্র আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সে পক্ষে যখন কোন সম্ভাবনাই আশঙ্ক্য দেওয়া হয় নাই, তখন রাজার পক্ষে পলায়ন ভিন্ন ত গত্যন্তর ছিল না। যখন ধরা পড়িলে যে দশা, যখন ধরা দিলে সেই দশা; তখন কে বল, সাধ করিয়া ধরা দিতে আসিলে? রাজা কুলচন্দ্র কি সেনাপতি-পত্রের উত্তরে নমস্তর পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন নাই। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—“ইংরেজসেনার পতিভ্রমে ভনিত্তি পারি, সেরূপ সমতা আমাদের নাই; হুতর্য

রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। ইংরেজ-রাজের সমিতি আমাদের চিরকাল যে বন্দ্যতা ও সন্তান ছিল, হুতর্যবন্দ্যতা যুগ্মা তাহার ব্যতিক্রম হইল দেখিয়া, আমি-বাহার পর নাই ব্যথিত হই-লাম। এখন অগত্যা রাজধানী ছাড়িয়া চলি-লাম, যদি আমার সুকিন্দারদের সুযোগ দেখি, তাহা হইলে নিশ্চিতই ইংরেজরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।” ইংরেজ সেনাপতিরা এ উত্তরে “চটতে পারেন। নির্দোষ লোক কিছ এ পত্রে মণিপুর-রাজকে কিছুনাও সের দিতে পারিবেন না।

সেনাপতি কলৌ রাজাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, পরে রাজার কথাই কহিয়াছিলেন; পুরাজসেনাপতি টাকেন্সব্রিতের কোন কথাই বুঝাপি করিত হয় নাই; তাঁহার উপরই বহুমতর বিরোধ।

তাহাকে পাইলেই অতি নিরুত্বকোষে নিপীড়িত ও ব্যাপ্যকিত করা হইবে, ইহাই সেনা-বিশ্ব হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ কুলচন্দ্র কি—মধ্যম টাকেন্সব্রিতকে ইচ্ছাপূর্বক ইংরেজের করে সমর্পণ করিতে পারিতেন? করিলে যে, তিনি রাজস-পিশাচেরও অন্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন। হুতর্য আত্মসমর্পণ করা তাঁহার পক্ষে এতদবধৌই অসম্ভাব্য হইয়াছিল, পলায়ন ভিন্ন গত্য-ন্তর ছিল না। রাজা ও রাজসহোদরের হত্যার হইয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন। ইংরেজসেনা রাজ-ধানীর উদ্ধারকে হইবার পর যে, উদ্ধার পলায়ন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর কিছুনাও মনেহ নাহি।

পুত্রী-প্রবেশ।

ইংরেজের ভিন্ন সেনাই এক্ষমত পুত্রীপ্রবেশ করিল। গিয়া দেখিল, পুত্রীমধ্যে জনমানব নাই, মণিপুর সেনা মহাশূন্য। ইংরেজই কলৌতেছেন, পুত্রীপ্রবেশের পর এক একটা করিয়া সমস্ত নগর মধ্যে ২০টামত মানুষ দেখিতে পাইলেন। উহার্য বোধ হয় ইহালোকের আশা ছাড়িয়া নিয়া, পর-লোকে গন্ত প্রগত হইয়াছিল; কিন্তু পরলোকে উদ্ধারিত হইতে হয় নাই। সেনানীরা ভূত্বিক দ্বারা সংগ্রহ করিতেছেন। একস্থানে কতকগুলি ছিন্ন শব্দক ভূমধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছে; ইংরেজ বিশ্ব করিয়াছেন, এ এনি মুইউনিয়ারি মুণ্ড। এক স্থানে কতকগুলি নরহস্ত উন্মোচিত হইয়াছে; ইংরেজ বিশ্ব করিয়াছেন, এ এনি মুই-

টানাদির দেহ। মৃত্যুর মাসাদিক পরে দেহহীন মুণ্ড এবং মুইউনি দেহ দেখিয়া, কিরূপ এরূপ নিশ্চয়ত্ব হইল, তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু দেখ-মুণ্ডের যথাবিধানে সমুদ্র হইয়াছে, হুইউনিদিগ প্রোক্তকৃত্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্তকৃত্য ইংরেজসেনার অারও উত্তীর্ণ হইয়াছিল—বলবতী প্রতিহিংসা আরও বলবতী হইয়াছিল। তখন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার যোগ্য ছিল না; প্রতিহিংসার যাহারা পাত, তাহার্য সেনা-নিঃশব্দ ছিল; ইংরেজসেনা এই জন্য আরও জলিয়া উঠিয়াছিল।

প্রতিহিংসা বাড়িতেছে।

ইংরেজ গিয়াছেন শূন্য মণিপুরে; কিছুই করিতে পারিতেছেন না; সমরসিঙ্গা যৈ পরিত্রপ হয় নাই। অধার চারিদিকেই অর্নিট দর্শন। যে বেসি-ডেমি-ভবনে এক সময়ে ইংরেজ রাজনীতিকেরা মণিপুররাজার রাজার মত বিরাজ করিয়াছিলেন, মণিপুরের রাজাদিগকে ইহিতে পরিচরিত করিয়া-ছিলেন, সেই বেসিডেমিভবন ভয়মুপ। মণিপুরের রাজা ইংরেজের কাছে যে কামান উপঢৌকন পাইয়াছিলেন, সেই কামানেই মণিপুরীসেনা ইংরেজের বেসিডেমিভবন উড়াইয়া পুড়াইয়া দিয়াছে। দেখিয়া ইংরেজসেনা প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। বেসিডেমিভবনে কিল্লাস মুই ইংরেজের সম্মাখি ছিল; সেই সম্মাখিকের উৎখাত হইয়া-ছিল। সত্যদেহত্যা হয় উপর পড়িয়া ছিল। ইংরেজ সেনানীদিগের পারশা হইয়াছে, এ সমতটী মণিপুরীদিগের কাণ্ড। অদূরে বেসিডেমিভবন প্রতি-ক্ষিত উন্মাদ উপস্থান; সেনাদের ছিল ভূত্বকুপের বেসিডেমি ভাংর কেময় কলৌতেছেন একটা শিশুর সমাধি। উন্মাদ উপস্থান ছিল ভিন্ন—শিশুর গ্রামাধি উৎখাত হইলে বলিতেছেন, এ সমতটী মণি-পুত্রীদিগের অত্যন্তর চিহ্ন। হয় ত তাহাই ঘটে; হয় ত মণিপুরীসেনা ইংরেজবিরোধে ক্রোধ হইয়াই এই সকল অত্যাচার করিয়াছিল।

কিছ একপক্ষ সেনাপতি টাকেন্সব্রিতকেই, ভক্ত কুলচন্দ্র, সমস্তকুলের সেনা কলৌ উদ্ধার ভ্রাম্যসংগত হইতেছে, তাহার নিদার উপারস্থল ইংরেজেরই করা উচিত। কিন্তু জনতার অসম্মাখি কাণ্ড নাই; কলৌ-বিরোধের যত অত্যাচার যত

কুইটনে ভারযোগে সংবাদে আদান প্রদান চলিয়া ছিল, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় নহে—ইতালীয় ভাষায়। সকলকে অন্ধকার রাখিবার জন্যই এইরূপ কৌশল অব্যবহৃত হইল। নোবকে বুঝাইবার চেষ্টা হইল, কুইটন মনিপুর হইয়া তৎক্ষণে করিতে বাইতেন। তাই টামুর পক্ষে কুইটনের জন্ম ৪০০ মুঠে মজুর যোগাড় করিয়া রাখিতে বলা হইল। বহুসংগোপন দেখান করিয়া করিতে হয়, কুইটনের আদেশে তখন সেইরূপই করিলেন; কোন দিকেই জ্ঞাত হইল না।

“তদনন্তর মনিপুর হইতে কাছাড়ের পথে কুইটনের কাছে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; ওদিকে গ্রিমউডও শীকারে বাহির হইলেন। যুবরাজ-সেনাপতি টীকেস্জি গ্রিমউডের পরমবন্ধু ছিলেন, দুই জনে বৃদ্ধি-মতাব-ছিল; শীকারে টীকেস্জিও গ্রিমউডের সাহায্য করিলেন, তাঁহার সঙ্গে নইলেন। শীকারে দুই দিন মিন কটাইয়া তাঁহার পর গ্রিমউড কুইটনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

“ইইটনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরই গ্রিমউড তাঁহার মুখে প্রথমে জানিতে পারিলেন—“অভিযানের উদ্দেশ্য কি। কুইটন তখন রহসি বহুজ্ঞাত করিলেন। বলিলেন; “যদি তাঁহার আদেশে আমি যুবরাজ-সেনাপতি টীকেস্জিওকে, গ্রেপ্তার করিবার জন্যই মনিপুর বাইতেছি, তাঁরাই আদেশমত আমি সেখানে গিয়াই দরবার করিব, দরবারে রাজা ও টীকেস্জিওকে আহ্বান করিব, মনোজ্ঞত টীকেস্জিওকে দরবারেই বসী করিয়া নির্দাসিত করিতে হইবে। আর একারণে ভার ভোঝাকেই লইতে হইবে।

“কুইটনের মুখে এই ভাষন কথা শুনিয়া গ্রিমউড যেন একবারে আকাশ হইতে পড়িলেন; তিনি একবারে হতবুদ্ধি হইলেন। টীকেস্জিরের সহিত গ্রিমউডের অসুবিধা সম্ভব, টীকেস্জিরেরের সহিত গ্রিমউডের যাবহারে গ্রিমউড ও তাঁহার পত্নী দুই জনেই বাধিত। বন্ধু টীকেস্জিওকে গ্রেপ্তার করিয়া নির্দাসিত করা হইবে, আর, সেই নিষ্ঠুর নিদাশনাতকতার কার্য গ্রিমউডকে প্ররোচিত হইবে; ইহাতে তিনি কেন—তাঁহার জ্ঞান আছে, সেই হতবুদ্ধি হইয়া উঠে। একারণে ভার গ্রিমউড অস্ত্র কোড়ে হাতে দিতে বলিলেন। কিন্তু কুইটন কিছুতেই তাঁহার অস্ত্র পরণত করিলেন না। (বোধ হয়, লর্ড লেন্সডাউন গ্রিমউডকে

দিয়াই যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিলে।)

“হতবুদ্ধি গ্রিমউড কুইটনের কাছে বিদায় লইয়া মনিপুরে ফিরিয়া গেলেন; গিয়া প্রায় পঁচাত্তর সপ্তক লাগু অবগত করিলেন। কিন্তু সাধারণ করিয়া দিলেন, যেন—একথা কেহ না জানিতে পারে। গ্রিমউড-পত্নী ভনিয়া পণ্ডিত অশোক ও অমিক ভাতী এবং বিখ্যাত হইলেন; কিন্তু ওমরীয়াও তাঁহার নির্ভর করিয়া বসিলেন, কুইটন উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে বুঝাইয়া শুকায়। যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিবার ভার অস্ত্রভুক্ত প্রদান করাইলেন।

“২২শে মার্চ কুইটন সঠাস্তে মনিপুরে গিয়া রেসিডেন্সিয়ালে ‘অবতীর্ণ হইলেন; ইহায়াই দরবারের আয়োজন করিলেন। ওদিকে গ্রিমউড-পত্নীও আসিয়া কুইটনকে কাতরহরের বলিলেন, “আপনি যে ভার আমার পুত্র উপর অর্পণ করিতে চাহেন; তাঁহার পক্ষে তাহা বহন করা অসম্ভব। যুবরাজ আমাধিপণের পরম বন্ধু; আপনি ক্ষমতার হাতে এই ভার সমর্পিত করুন।” কিন্তু কুইটন রুমারী কাতরবাক্যেও কর্ণপাত করিতে পারিলেন না। (যে পক্ষে আসে সেই যে, তাঁহাকে সপল কাট করিতে হইতেছিল।)

“ওদিকে নির্দিষ্ট সময়ের দরবারের আয়োজন হইল; রাজা ও যুবরাজ দুই জনেই দরবারে আসিলেন; কিন্তু তখনও কি একথানা লেখ্য পত্রের অস্বাভাব্য হুয়নাই বলিয়া, দরবারের কাজে বিঘ্ন, করা হইল। দেড় ঘণ্টা বিলম্বের পর তখন দরবারের ঘণ্টা পড়িল; কুইটন দরবারে বার বিবার জন্ত সজ্জিত হইলেন। কিন্তু তখন যুবরাজ চলিয়া গিয়লেন।

“রেসিডেন্সির চারিদিকে ইংরেজের বাসা বাসা সৈনিক ও সেনানীরা সমস্ত প্রহরিকারী নিরস্ত্র হইয়াছে, রেসিডেন্সির আট ঘাট রক্ত করা হইতেছে। সেখানে প্রবেশ-নির্গমের পথ, সেই বাসেই বশস্ত সৈনিক অবস্থিত করিতে আদি হইয়াছে; রেসিডেন্সির এমন ঘর নাই, এমন ঘর নাই, যেখানে সমস্ত সৈনিকের অবস্থিত না হইতেছে। বিবি গ্রিমউডের শয্যাগৃহটা পর্যন্ত সৈনিকেরে বর্ধিত হইয়াছে।

“দরবার ও যজ্ঞস্থল যুবরাজ দেখিয়া ভনিয়া বুকিতে পারিয়াছিলেন, পতিক ভীল নাহ। দর-

বারে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়াই, বোধ হয়, তাঁহার সঙ্গেই উত্তেজিত হইয়াছিল। তিনি বিশেষে অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলেন; রাজা একাকী দরবারের জন্ম দেখিয়া রহিলেন।

“দেড় ঘণ্টা পরে দরবারে বিসবার সময় কুইটন যখন শুভিলেন, যুবরাজ চলিয়া গিয়লেন, রাজা একাকী উপস্থিত আছে; তখন তিনি তখনকার দরবারে ‘আসা রহিত করিলেন। (যে মনে মনে বুকিতে পারিলেন, যুবরাজ যত অভিমুখি বুকিতে পারিয়াছেন, তাই আরও জলিয়া উঠিলেন।) যুবরাজ চলিয়া গিয়লেন বলিয়া, কুইটন যুবরাজের সহিতও সাক্ষাৎ করিলেন না। তিনি অবমানিত-রূপে ২০-২০টা কাল দরবারের বাহিরে বলিয়া রহিলেন।

“দরবারের এ আয়োজন বিফল হইল। অপরাহ্নে আবার দরবারের উদ্যোগ করা হইল; কিন্তু যুবরাজ সে দরবারেও উপস্থিত হইলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন, আমার শরীফ অসুস্থ। পরদিন ২৩শে মার্চের প্রাতে আবার দরবার করা হইল; কিন্তু যুবরাজ অসুস্থতার কথা বলিয়া পাঠাইয়া, সে দরবারেও অসুস্থপন্ন হইলেন। আবার আর এক দরবারের আয়োজন হইল, তাহাতেও যুবরাজ উপস্থিত হইলেন না। তখন কুইটন বুকিতে পারিলেন, দরবারের চাকুরী আর থাকিলে না। তিনি গ্রিমউডকে যুবরাজের কাছে পাঠাইলেন; তাঁহাকে কি বুকিতে হইবে না বলিতে হইবে, তাঁহারও আশেষ করিয়া দিলেন।

গ্রিমউড-যুবরাজ সংবাদ।

“অগত্যা গ্রিমউডকেই যুবরাজের কাছে যাইতে হইল। গ্রিমউডের যুবরাজ আশ্বিনীসান্না—“আপনাকে জ্ঞাত; তিন বৎসরের জন্ম মনিপুর ছাড়িয়া যাইতে হইবে; তিন বৎসর পরে যদি আপনি নিজের সন্তানবাহারে ভারত-পর্বতমণ্ডকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তবে আপার স্বদেশে ফিরিতে পারিলেন। আপনি প্রস্তাব হইল, অশ্বিনীয়ে পুত্র কন্যা এবং আশ্বিনীসন্তানের কাছে বিদায় গ্রহণ করুন। অবশিষ্ট আপনাকে মনিপুর ছাড়িয়া নির্দাসিত হইতে হইবে।”

“যুবরাজ, গ্রিমউডের মুখে এই কথা শুনিয়া,

একবারে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কাতরহরে বলিতে লাগিলেন,—“কি অপরাধে আমাকে পৈতৃক রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আমি ত ইংরেজ রাজের কাছে কোন অপরাধেই অপরাধী নহি। কেন তবে আমার প্রতি এরূপ নিরোধ?”

গ্রিমউড কোনরূপ উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন কোন না, ইংলিশমানের আশ্বিনীকালধনকে সে বিষয়ে কোন কথা কহেন নাই। উত্তরই বা গ্রিমউড কি দিলেন। কুইটন যে, বড়লোকের আদেশেই, যুবরাজকে বন্দী ও নির্দাসিত করিতে গিয়াছিলেন, গ্রিমউড কথার তাহা না বলিলেও, যুবরাজ তখনকারেই তিরোহিত হইল, তিনি নির্দাসিত হইতে অসম্মত হইলেন। গ্রিমউডও আশ্বিনী কুইটনকে সেই কথা অবগত করিলেন।

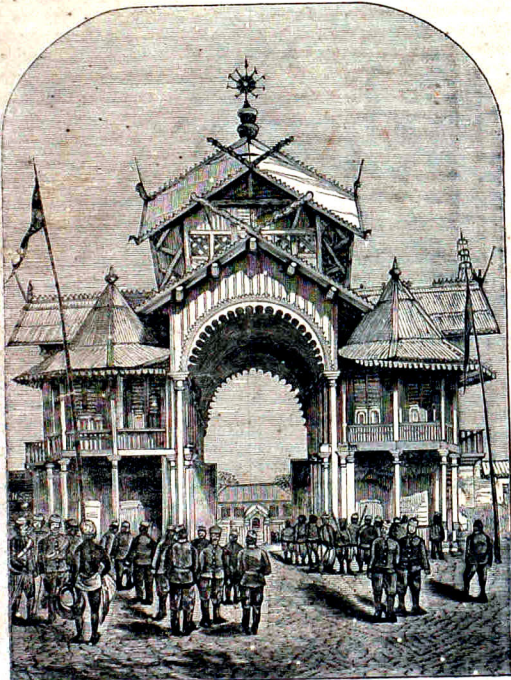
এইবার যুদ্ধ।

গ্রিমউড ফিরিয়া আসিবার—পরই কুইটন যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত সৈন্যসমূহ করিতে বহিলেন। কেবল ধান সৈন্য সজ্জার ভার লইলেন; ঘুটশ সেনানীরা সৈন্য লইয়া যুবরাজের প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। তখন মনিপুরীসেনা ইহাওতে বিশ্বদেবের আশ্রয় উদ্দেশ্যে হইয়া উঠিল। একারণে সেনা প্রাসাদাভ্রমণে গিয়া যুদ্ধে পরাস্ত হইল; সেনানী রেককোবের সেখানে সাংঘাতিকরূপে আঘাত হইলেন। পরাজিত, ইংরেজসমূহ রেসিডেন্সিতে পলাইয়া আসিল। উত্তেজিত মনিপুরী সেনাও আসিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করিল; রেসিডেন্সি ভাঙিয়া করিল; মনিপুরী কামানে রেসিডেন্সি ছারখার হইয়া গেল। এ যুদ্ধের কথা পূর্বে কথিয়াছি; অস্ত্র আর কহিব না।

যখন রেসিডেন্সি যাব, মনিপুরীসেনা রেসিডেন্সির ভিতর আসে আসে, যেমন সময়ে কুইটন হতজিৎ হইয়া, যুদ্ধ থামাইয়া, বিজ্ঞানী শাসনসামান্যি-নিয়মের সহিত সজ্জি করিতে জালিয়াই হইলেন। গ্রিমউড নিষেধ করিলেন; তিনি সঠাস্তে রেসিডেন্সি ছাড়িয়া, সেখা হইয়া দূরে পর্বতগুহায় গিয়া আশ্রয় লইতে পারাশ্রয় দিলেন, সেপাওতি দিয়া এই পরামর্শে অস্বমনোদ করিলেন; কিন্তু ইংলিশমানের লোক বলিতেছেন, কুইটন কাহারই পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া, দাঁড়ি জন্ত, রেসিডেন্সির

বাহিরে পমন করিলেন। প্রিন্সউড, ব্রীম, সিম্‌সন এবং কলিন্স তাঁহার সঙ্গে পেলেন। ইহার কয়েকই রাজ প্রাসাদে উপনীত হইলেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, যুবরাজ পাত্র মিত্র এবং সহোদরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেখানে ভাষাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কথা বাতী কাহার সহিত কিরূপ হইল, তাহা জানিবার ঘো নাই; বাহার মুখে ইংলিশমানের

লোক সকল কথা ভনিয়াছেন, প্রিন্সউড প্রাণ লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাঁহার মুখেই সকল কথা ভনিতো পাইতেন। কিন্তু হায়! প্রিন্সউড সিরিতে পারেন নাই, সোলডাউন ও কুইটনের সেরিবে হাঁহাকে বিনা পাগে প্রাণ দিতে হইত। সুতরাং রাজপ্রাসাদে কাহার সহিত কিরূপ কথা হইয়াছিল, জানিতে পারা যায় নাই।



ঐ দেয় পাঠক, রাজপ্রাসাদ—সিংহদ্বার। যে প্রাসাদের এক সময়ে ত্রীমুখির সীমা ছিল না, সে প্রাসাদের আজ শোচনীয় দশা! মণিপূররাজ্যের শোচনীয় দশা; রাজধানীর শোচনীয় দশা; রাজপ্রাসাদের শোচনীয় দশা; রাজবাগানের শোচনীয় দশা; রাজপুত্রবর্গের শোচনীয় দশা; আর মণিপূর রাজ্যের যত প্রকারের আজ শোচনীয় দশা! কাহার কি পাগে, কেন প্রকার কি নিগূহে মণিপূরের এ দশা ঘটিল, তাহার নীমাংসা আমরা করিতে পারিব না। বাহার ইচ্ছায় মর জনপদ হইতেছে, জনপদ মর হইতেছে, ধনী দীন হইতেছে, দীন ধনী হইতেছে, রাজা ভিখারী হইতেছে, ভিখারী রাজা হইতেছে—সেই ইচ্ছাময়ই বলিতে পারেন, মণিপূরের কেন হঠাৎ একপ্র শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইল!

উপস্থিত অবস্থা।

মণিপূরের উপস্থিত অবস্থা শোচনীয়। নগর উপনগর, উপনগরের উপকণ্ঠ সমস্তই জনশূন্য। সেনাপতি কলেট এখন মণিপূরের রাজা। তিনি ভয়-সৈন্তে দ্বিবি উপায়ে নির্ভর করিয়াছেন। দেশটাকে নিরস্ত্র করা হইতেছে। ধোনা হইয়াছে, কেহই আর নিজের ঘরে বন্দুক ভরবারি রাখিতে পাইবে না; ৭ দিনের মধ্যে সকলকেই নিরস্ত্র হইতে হইবে, অন্তর্গত ইংরেজের হাতে অর্পণ করিতে হইবে। ৭ দিনের পর বাহা কাছে বন্দুক বা ভরবারি পাওয়া যাইবে, তাহাকে হয় প্রাণদণ্ডে

দণ্ডিত, না হয় চিরনির্বাসনে নির্বাসিত করা হইবে। এইপেল ভয়। পশ্চাত্তরে ধোনা করিয়া সকলকেই অস্ত্র দেওয়া হইতেছে। “বাহায়া কুইটনাবির হত্যার, বৈগিডেমির দায়ে ও লুণ্ঠনে লিপ্ত ছিল কিন্তু ইংরেজের সমাধিক্ষেত্রে উৎপাত করিয়াছিল, কেবল তাহাদিগকেই মার্জনা করা হইবে না; আর সকলকেই অস্ত্র দেওয়া হইতেছে। সকলে আসিয়া স্ব স্ব ভবনে অবশ্যে বসবাস করুক।” কিন্তু এ ধোনায়ায়ও তাড়ন ফল হয় নাই; হুই এক জন লোকে নগর উপনগরের দিকে যাওয়া আসা করিতে পারে, অধিকাংশই কিন্তু পাছাড়ে পুরুতে চলিয়া গিয়াছে। অস্ত্র ধোনায়া করিলেই লোকের মন ভয়ানক হয় না।

অপরবাদিদের নিস্তার নাই; কিন্তু কে অপরবাদী কে নিরপরাধী, তাহার ত এ ভীষণ সংস্কার সময়ে সম্যক সিদ্ধান্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। ক্রমক কাহার ভাণ্ডো কি ঘটে, তাহার স্থিরতা নাই; হুতরান নিরপরাধ নিরীহ লোকের ইংরেজের অস্ত্র ধোনায়া ভয়ানক হইতে পারে নাই। তাই নগর জনপদ এখনও জনশূন্য।

ভনিতছে, যিনি কলিকাতায় আছেন, সেই রাজা শুরচন্দ্রের এক রাণী পুত্রাদি লইয়া মণিপূরে ছিলেন; পুত্রটার বয়স ১০ বৎসর। বিজ্ঞানের সময় ইহারার কোন গুণ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইংরেজ নাকি ইহাদিগকে অস্ত্র দিয়া স্বাস্থ্যে আনিতে বলিয়াছেন। রাজা শুরচন্দ্রের একরাণিও পুত্র কন্যা লইয়া মণিপূরে কেন রহিয়াছেন, তাহার রহস্ত আমরা এপর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই।

মণিপূরের মহারাজ শুরচন্দ্র।



(যিনি এক্ষণে কলিকাতায় কাকুড়াছার বাগানে আছেন।)

মণিপুর এখন নিরাপন্ন নহে। বিজিত রাষ্ট্রা
বিজয়িনী সেনায় পরিবেষ্টিত হইলে কোন কালে
নিরাপন্ন হইয়া থাকে? মণিপুরের পূর্বাংশকে
কালে হইবে কিনা সন্দেহ। সংকেতিত রাজ্যের
ধ্বংস হইতে এখনও অনেক বিলম্ব। রাজ্য এখন
অরাজক; ব্যবস্থা বিরূপ হইবে, তাহা এখনও
ঠিক বুঝা গাইতেছে না। রাজবংশ নির্মূলিত,
পলায়িত বা বন্দিভূত। রাজ্য ও রাজসংস্থার পরিচয়
কিছুই স্থির করিবার সো নাহি।

সিংহরাজ উত্তেজিত, বিচলিত, প্রতিবিম্বায়
প্রজলিত; কোপমত্ত সহজে হইবে না। বন, জঙ্গল
পর্বত-বন্য চারিদিকেই দূত ছুটিয়াছে; দশর
ইংরেজ-সৈন্য চারিদিকেই ধান-অভিধান করিতেছে;
ভীত চকু চারিদিকে; ওগু ব্যক্ত চরণল চারিদিকে
দুখিয়া বেড়াইতেছে। নিভৃত পাইবার সম্ভাবনা
বুড়ি অন্ন; রাজবংশের পরিণাম শোচনীয়।

মহারাজ বন্দী।

মণিপুররাজ্যে পা দিতে না দিতেই ব্রিটিশসেনা-
পত্নীরা সোণাণা করিলেন—“যে ব্যক্তি রাজা, যু-
-

রাজ, ব্রহ্মমন্ত্রী টাঙ্গাল-জেনেরল, যুববার নিরঞ্জন
সিংহ এবং অপর দুই এক ব্যক্তিকে ধরিয়া দিতে বা
ধরাইয়া দিতে পারিবে, সেই ঐচ্ছুর পুরস্কার
পাইবে।” পুরস্কারের হার নির্দিষ্ট হইল, রাজা ও
যুবরাজের প্রাণেরী জন্ত ৫ হাজার করিয়া, যুববার
নিরঞ্জনকে জন্ত ১ হাজার, অপর কয়েকজন জন্ত
২ হাজার করিয়া। এরূপ সময়ে এইরূপই হইয়া
থাকে!

পুরস্কারের সোণাণা হইল, চারিদিকে চর প্রেরিত
হইল। পথে বাটে বাটে মাঠে উপত্যকায় অধিকৃত
বনে জঙ্গলে নদীতীরে ভ্রমপ্রান্তরে—উত্তরে দক্ষিণে
পূর্বে পশ্চিমে—চারিদিকে চর ঘুরিতে লাগিল।
অসামানী সৈনিকেরা ধাবিত হইল; পলায়িতসেনাও
উদাসীন থাকিল না। মাথা কুচি লুণ্ঠাই সকলকে
সেই যে অসুস্থকান চলিতে লাগিল। পূর্বদিকে
ব্রহ্মমায় চিনপ্রদেশও বৃষ্টি চরের হাও ডোয়াইতে
পারিল না। অসুস্থকান যেমন চলিতে হয়, চলিতে
লাগিল। ইংরেজের অসুস্থকান; অর্থের অভাবে
নাই, সামর্থ্যের জট নাই। জিন জমেই বাড়িয়া
উঠিতেছে; বেরূপেই হউক, পলায়মান মণিপুরী-
লোক ধরিতেই হইবে।

মণিপুরের মহারাজ কুলচন্দ্র।



(“বিনি একগুণ বন্দী হইয়াছেন।)

সংবাদ আসিল, রাজা কুলচন্দ্র অব ছাড়িয়া,
শিরিকায় অশ্রয় লইয়াছেন; তিনি পলাইয়াছেন
কৃষ্ণপ্রদেশের দিকে। যুবরাজকেস্তু জিহের কিঞ্চ
সন্ধান নাই। ব্রহ্ম মন্ত্রী টাঙ্গাল জেনেরল নিরঞ্জন
আছেন। ইংরেজের বেড়াভাল এড়াইয়া যাওয়া
মহল নহে। সংবাদ আসিল, যুববার নিরঞ্জন
সিংহ ধরা পড়িয়াছেন; যে ব্যক্তি কুইটনের হত্যা
করিয়াছিল, মিরণ্জাও নামে সেই মণিপুরীও গৃত
হইয়াছে। দিন কতক পরে আবার সংবাদ
আসিল—ব্রহ্মমন্ত্রী টাঙ্গাল-জেনেরল গৃত হইয়াছে।
সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ—মহারাজ কুলচন্দ্রকেও
মণিপুরীরা ইংরেজের হাতে অর্পণ করিয়াছে।
মহারাজ নিজে ধরা গিয়াছেন, কি তাহার প্রজ্ঞা
তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছে, কিম্বা ইংরেজের চরগো
তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত করা
মহল নহে।

মহারাজ ইংরেজের হস্তে পড়িয়াছেন, ব্রহ্ম মন্ত্রী
টাঙ্গাল এবং যুববার নিরঞ্জনও অত্যাচারিত পান
নাই; হত্যাকারী সম্বন্ধে মিরণ্জাও নামা মণি-
পুরীকে গোপন করা হইয়াছে। যুবরাজকে ধরিতে
পারিলেই কার্যসিদ্ধি হয়। সকলেরই চিন্তা হইবে,
কিছু সামরিক এজলাসে। কেহ কেহ বলিতেছেন,
সঙ্গে একজন বিলিগিয়ানও থাকিবেন। এরূপ
বিচারে কিছ বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্রও
আপত্তি করিতেছেন; উত্তেজিতচর সেনানী-
দিগের কাছে ইঁদারা স্থিতিচরের সন্ধান করেন না।

অপরাধের আলোচনা।

বিচারে বিলম্ব আছে, যুবরাজকে না পাইলে
বিচারের স্থবিধা হইবে না। ইংরেজসেনাপতি-
দিগের মতে তিনিই মূল আসামী; কিন্তু অং-
রাধ বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে। ইংরেজ
করিসাদী, মণিপুরের রাজা যুবরাজ প্রভৃতি আসামী;
বিচার হইবে ইংরেজের সামরিক এজলাসে।
বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্র ভারতের
ইংরেজগণকে—বর্ধমেটকেও—আসামী করিতে
চাহেন।

মণিপুর বিভাগে যুবরাজের উপর বেরূপ অং-
রাধের আরাপণ করা হইয়াছিল; এপর্যন্ত তাহার

একটীক অংগুনীর প্রাণাণ পাওয়া যায় নাই। লর্ড
লেসলভউন বা তাঁহার সেনাপতিরা কোনরূপ
ওগুপ্রমাণ পাইয়াছেন কি না, তাহা ত এ পর্যন্ত
থাক ঘাই নাই। কোন কোন বিলাতী সংবাদ-
পত্রের মধ্যে—ব্রহ্ম প্রমাণে নির্ভর করিতে ত
মণিপুরী আসামীদিগকে মুক্ত করিয়া, লর্ড লেস-
লভউন ও তাঁহার অত্যাচারগণকেই অভিযুক্ত করিতে
হয়। বিলাতের পার্লামেন্টে লর্ড পিপ্পন এবং
কর্ণেল সোম্যান প্রভৃতি ভারতের বর্ধমেটকেই
সোমী করিতেছেন; বিলাতের অনেক সংবাদ-
পত্রের কাছেও ইঁদারা আধিক বোমী। লর্ড লেস-
লভউন কুইটনের মণিপুর না পাঠাইলে, তিনি
যুবরাজকে ধরবার জন্ত যুদ্ধের আদেশ না করিতে
ত আঁর এরূপ মহাবিভ্রান্ত হইত না।

লেসলভউনকে কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হইয়াছে।
কৈফিয়ৎ, বিলাতে পৌছিল, পার্লামেন্টে বিচার
হইবে। পার্লামেন্টের বিচারে বড়লটি লেসলভউন
এবং তাঁহার প্রু স্টেটসমেন্টের লর্ড ক্রম্বকে
নিম্নলভভাবের অত্যাচারিত পাইতে দেখিলে, আদ্রা
যুবী হইব; কিন্তু কিরূপে যে, ইঁদারা নিম্নলভ-
হইবেন, তাহাও আমরা এখনও বুঝিতে পারি
নাই। বিবি গ্রিমউড বিলাত-বারা করিয়াছেন।
তিনিও ত সোমানে যুগপতি পক্ষসমর্থন উপলক্ষে
গৃত কুইটন এবং জীবিত লেসলভউনকে সাধারণের
কাজে অভিযুক্ত করিলেন।

এখনকার মণিপুর-বিচারে কি বিলম্ব করা
হইবে না? পার্লামেন্টে মূল অপরাধের বিচার
না হইলে, লেসলভউন সোমোনকার বিচারে অত্যা-
চারিত না পাইলে, মণিপুরী বিচারের আয়োজন করা
উচিত নহে। বিলাতের বড় বড় সংবাদপত্র
বলিতেছেন; “ভারতের বর্ধমেট বেরূপ মণিপুরের
রাজা ও যুবরাজ প্রভৃতির উপর ওগুতর অপরাধের
আরোপ করিতেছেন, তাঁহারাও সেইরূপ কুইটনার
উপর ওগুতর বরং বোরতর অপরাধের আরোপ
করিয়াছেন। ভারতের বর্ধমেট-মণিপুরের যুবরাজ
প্রভৃতিকে কুইটনার হত্যা জন্ত অপরাধী করিতে
চাহেন; যুবরাজ প্রভৃতিও প্রাসাদাক্রমণ, গৃহদাহ,
ক্রীড়াতা, শিতহত্যা, মণিরভল-দেহতার অবমাননা
প্রভৃতি অপরাধে ইংরেজ-সেনানীদিগকে অত্যাচারী
করিতেছেন। ইহাদের অভিযোগও সমগ্র পৃথিবীর
সমুদ্রে প্রচারিত হইয়াছে; সমগ্র পৃথিবীকে ত
সন্তুষ্ট করিতে হইবে।” হুতরাং ব্যাপার ওগুতর।

বহুল। তাহা কখনই হইবে না। এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে আরও অনেককণ বৃথাহঁতে লাগিলেন। প্রকৃতই আমার এই জীবনচরিত লিখিবার ইচ্ছা ছিল না। এ সংসারে যেমন আশিরাহি, তেমন চিলাসা ঘাইবে—কাজকে কলমে নাম ও রূপ অঙ্কিত করিবার প্রেরণা ছিল না। ‘কিছু শ্রীচক্রে যোগেশ্বরের বহুলা মহাশয় তাহা হঠিতে বলেন না। তাঁহার কথা, তাঁহার উপদেশ, তাঁহার আগ্রহে উৎসাহিত হইয়া, আমি অগত্যা আমার জীবনচরিত লিখিতে বসিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার নাম শ্রীচর্তুলাল হরদ্বাপাধ্যায়। পিতার নাম শিবব্রহ্ম বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার পৈতৃক বাস এলাহাবাদের অন্তর্গত তড়া-সাঁতপুর গ্রামে। কিন্তু এক্ষণে আমাদের দেশের বাস একবারে উল্লিখিত হয়। বাস্তবিকভাবে কি না তাহাও জানি না। আমি এখন এলাহাবাদে বাস করিতেছি।

আমি যেমন সামান্য-লোক, আমার কাহিনী তদন্তকণ মামুদ নহে। আমার জীবন কামিয়ার বিচিত্রতায়। এই জীবন-চক্রের নানা আকর্ষণে পড়িয়া কত ভ্রমারিক, কত অদ্ভুত, কত শোকাবহ ঘটনা ঘটয়াছে। কত বিপদে পড়িয়া, কত অসম-সাহসিক—কত দুঃসাহসের কাজ করিতে হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এক সময়ে এরূপ বিপদ-কালে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তাহা হইতে জীবন রক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু অকুণ্ঠে অসম্ভব ক্রমে, অসম্ভব দুঃখ আছে বলিয়াই, বোধ হয় সে সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।

ইংরেজের দস্ত গিলাহী-নুকের কালে রণক্ষেত্রে আমি শিপাহী-দস্তারি হইতে আরে আরোহণ করিয়া শিপাহী-শিবিরের সহিত সমুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কখন বা যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ-সৈন্যদলের প্রাণ রক্ষার জন্য অগ্রদূত হইয়া, আমি নিজে বিধ্ব আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি। অসংখ্যবারে নানাকারি দিক্ আমার প্রাণে এখনও বর্তমান। কখন বা শিপাহীদল আমাকে বন্দী করিয়াছে।—আমাকে তোপে উড়াইয়া দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে;—অঙ্গবানের কুপায় আমি কেবল

প্রাণ পাইয়াছি। একদিন আমার পায়ের ভীমের ভায়া বন্ধ ছিল।—একদিন পাশোয়ান-পোরা আমার কাছে একদিন বৈসিত ভয় করিত। আমি যুদ্ধ-বিপ্লবী বিশ্বাসবলিয়া একদিন ইংরেজ-সৈন্যদলের প্রাণ আমার নাম-কর্তন করিতেন। একদিন আমিই নাইনি—তালে এক দল নতুন বেশনা সৈন্য গঠিত ছিল।—তাহারিগণের সমস্ত-বিপ্লবী হস্তিগুণ করি। গিলাহী-নুকের অসম্মান, একদিন বেরিলির কাসেগীর মিঃ ইংলিস সাহেব আমাকে বলেন,—‘হুগাঁদাস বাবু! আপনার যদি অভিভূত হয় তাহা হইলে, গরবহঁতে লিখিয়া আপনাকে জায়গীর দেওয়াইতে পারি।’ আমি উত্তর দি,—‘জায়গীর আমি চাহি না,—ইংরেজের লুণ বাইয়া আমি কর্তব্যকর্ম করিয়াছি;—কর্তব্যকর্ম করিয়া পুরস্কার লইতে নাই।’ ২১ বৎসর পূর্বে ক্রেনারেল ট্রপ (C. Troup) আমাকে যে সার্ভিসিক্রেট দিয়াছেন, তাহা এই,—

“Mr Alexander promised to give Durgadas a Tashildarship, but as his services were required to assist in the raising of a new cavalry corps at the foot of the Hills, he was made over to Colonel Crossman, with whom he was present at the actions of Churpoora, Sittargunge, Budaree, and Russolpore, and was wounded. I have never heard of a Bengali being so brave. He is a respectable, honest, and clever man. I can recommend him for the highest situation in any office.

উপরে আর ইংরেজী-র মূলভাষা এইরূপ,— ‘ক্রেনারেল সাহেবের সঙ্গে ইনি অনেককাল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; যুদ্ধ ইনি আহত হইয়া ছিলেন। বাঙ্গালী বৈ, এরূপ সাহসী হইতে পারে তাহা পূর্বে আমি জানি কখন-তিনি নাই। হুগাঁদাস বাবু সর্কারি, কার্যদক্ষ, সমস্ত ইত্যাদি।’

আজ আমি গরিব, হুস্তান্ত্র বৃদ্ধ এবং অক্ষম বটি,—কিন্তু এ জীবনে একদিন যুদ্ধ ছিল, অসম্মান্য ছিল, মান ছিল, গরম ছিল, ভায়া-দলদলও একদিন আমার অঙ্গপত-ছিলেন। তাঁহার কুপায় বিপুল দুঃখ, অক্লান্ত আনন্দ উপভোগ্য করিয়াছি। আমি পথে বাহির হইয়া, আগে-পিছে আমার, অস্বাভাবী-

সৈন্যও একদিন দ্রুত। আমার গাড়ী ছিল, খোড়া ছিল,—আমার একটা বোড়ারই মুখা ছিল, চারি হাজার টাকা। পর্বমহোৎসবের তাম্র-প্রাপ্ত একজন নবাব আমাকে সেতার শিখাইতেন। বায়ায় বসিয়া, দুইখণ্ড পঞ্চাঙ্গন লেপনের পাড় পড়িত। কিন্তু আজ সেই ভায়া-সেতারি বিভ্রমনার সে যুগ, সে ঐশ্বর্য, সে বিহবৎ, সে মান, সে মর্দানী সকলই চলিয়া গিয়াছে। গত জীবনের কথা মনে হইলে এখন তাহা সকলই স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হয়।

ইংরেজের অভিভূত, ইংরেজের আদালতে ইংরেজের বিচারে, আমি শেষদশায় ইংরেজের কারাগারেও বাস করিয়াছিলাম। এই দুঃসাহসি পিতৃ-বক্তির জীবনের ঘটনা অতি অদ্ভুত।

শ্রীচর্তুলাল কার্যোপলক্ষে পলিমেন্টে আসিছেন। তিনি ৬ সংখ্যক ইংরেজগার অস্বাভাবী রেজিমেন্টে কাজ করিতেন। রেজিমেন্ট এক হানে স্বাধীনতা থাকিত না। বাকলিই পিতাকে নানাস্থানে ঘুরিতে হইত। ১৮৫৬ সালের কাব্রিক মাসে যখন তাহার রেজিমেন্টে হুগলিতে হইতে তিন কোশ অন্তর কর্ণাল নামক স্থানে ছাউনী করিয়াছিল, তখন আমার জন্ম হয়। তখন হইতে নিমাত,—নিমাত হইতে সন্কার-বাকর,—তথা হইতে কামিয়ারে আসি। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া শাতিপুত্র ঘাইতে হয়। তখনওও অধিক দিন থাকা হটেমুই, তারার পর পুনরায় কামিয়ারে উপস্থিত হই। এখানে আমার আশ্রয় ছিলেন, তথায় থাকিয়া আমি বেনারস-কামেলে অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। ১৮৬৪ সালে পিতা দমোদরে বালি হন;—আমাকেও তথায় বাইতে হয়। সেখানে দুই বৎসর থাকিয়া আমাকে পুনরায় কামিয়ারে আসিতে হয়। হুগলীতে ১৮৬২ সালে আমাদের সকলকে শোক-সাগরে ডুবায়া। পিতৃদেহ ইংলন্ডে পরিভ্রমণ করেন। তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর। আমার তিন সহোদার ছিল। আমি সর্বকোষ্ঠে। পিতার লোকান্তর হইলে অশ্রুইই বৎসরের সকল ভার প্রায় আমার উপর পড়িল। তখন আমার তরুণ বয়স, জ্ঞান যুদ্ধিকারই অধির-বৃত্ত। এগিকে সমুখের অপর অনন্ত সমসার-সমুদ্র। কিরূপে এই হস্তার সমসার-সমুদ্র পার হইব, তাহাই তাহিয়া, অস্বাভাব্য হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি জানিতাম না যে, মৃত্যুকালে পিতৃদেহ কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। যে টাকা তখন জননীরা হস্তগত হইয়াছিল,—তাহাতে, আমার চাকরি না হইলেও, আমাদের বক্ষণে দিনপাত হইতে পারিত। কিন্তু আমার দারিদ্র্য অসম্ভব ছিল,—হৃদ মায়ের হৃদয়ে পঞ্চাঙ্গ-বাটী কাল নগণ ছিল,—আর তাঁহার গহনাগুলি আছে; ইহা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের নাই। না আমার, তখন কেবল কাঁচিদের কাটিতেন;—এবং আমার পানে চাহিয়া আপনা-আপনি বলিতেন,—‘কেমন করে এ সমস্তার চালাবো?’ আমার তখন বয়স অল্প—পনের বৎসর মাত্র—মায়ের চক্ষে অবশ্যই তখন বর্ষ ছেলে-মানুষ বোধ হয়, এই কারণেই আমাকে পিতৃ-সম্বন্ধে টাকার কথা ব্যর্থকরেও বলেন নাই।

এক দিন মাকে বলিলাম,—‘মা! আমি চাকরি চেষ্টায় আছি। আমি যদি ২০, টাকাও মাহিহা হই, তাহা হইলেই আমাদের সমসার এক রকম চলে যাবে।’ মা ঠিক এই কথাগুলি বলেন, ‘না বাছা! তুই হুশের ছেলে,—তুই এর মধ্যে চাকরি কি করি?’ তুই এর মধ্যে কি শিখি যে, চাকরি করতে পারবি?—তোর এখন কিছুতেই চাকরি করা হবে না।’ বর্তমান আমার এই গহনা-পাতিগুলি আছে, ততদিন তুই একটু বড় হ,—একটু শেখাখাড়া বেশী করে শেখ,—তার পর চাকরি করিস এখন।’ ত, আমার মা, পান্না আছে, তাহাতে তিন বৎসর বেশ লভ্য। তোর কোন ভাবনা সেই।

চাকরি সন্ধ্যক জননীরা সহিত আর কোন বাসাবস্থান করিলাম না। কারণ আমি বুকিয়ার, আমি আর বেশী কথা কহিলেই মা কাঁদিয়া হাট করিবে।

বাহ্য হউক, চাকরি করার লালসা মনে বড়ই লবণভী হইল। শেখাখাড়া কল্যাণি দিলাম। মনে মনে বলিলাম,—‘আমি কি এতই পাণ্ডুরূপ হই, মায়ের গায়ে গহনা-চোটা টাকার আমাকে উত্তর পূরণ করিতে হইবে?’ তাহা কখনই হইবে না। চাকরি কিরূপে এই হস্তার সমসার-সমুদ্র পার হইব, তাহাই তাহিয়া, অস্বাভাব্য হইলাম।

জন্মে এক, শুক্রে, তাক—নানা লোককে বলি,—কি চাকরি শিখি না। প্রত্যহ সমুদার সমুদার

বুনিয় মিয়া বেড়াই,—কিছু চাকরি বুঝিয়া পাইলাম না। তখন আমার তপু, জপ, তন্ত্র, মন্ত্র—এ সমস্তই চাকরি হইল। বলা বাহুল্য, জননীর আশোচরে, এই চাকরির চেষ্টা করিতে পারিলাম। সেই সময় বেনারস হইতে ৭ জোশ মুরে হুলতানপুর নামক স্থানে ৮ সংখ্যক ইংরেজের ক্যাপ্টেনের একজন ছাড়াই কিনিয়াছিল। তিনিলাম। তখনকার অফিসে একটা চাকরি ছিল। আমি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া, তাঁহার সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া, একবারে তাঁহার বাড়ী উপস্থিত হইলাম। প্রথমে এডজুটেন্ট আফিসের বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্মস্থানির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—“চাকরি বাধি ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে লোক ভর্তি হয়।”

এখন আর কোন কর্ম বাধি নাই।” এতদূর আসিয়া কোন কল দর্শন না দেখিয়া বড় হতাশ হইলাম। তখন-মহারাজ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই বিবেচিত হইল। এমন সময়ে হঠাৎ মনে হইল, যদি কষ্ট করিয়া এতদূর আসিলাম, তবে এই রেজিমেন্টের সেনা-নায়েকের সঙ্গে কেন একবার সাক্ষাৎ করিয়া বাই না? এই স্থির করত বড় সাহেবের বাসালয় নমোণে উপস্থিত হইয়া আড়ালগিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞানিলাম, “সাহেবের নাম পেন্সেন্টের চাঁচা; আর তখন তিনি” মনে নিম্নত আছেন। আমি সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যখন বাড়ী হইতে বাজা করি, তখন একখানি দরখাত, যুগে যে প্রথম সেই পথ্য পড়িয়াছিল। তাহার একখানি সার্টকিট এক-পিতারও হইখানি প্রশংসাপত্র সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল। এইখানি ময়লা করিয়া আমি চাকরি পাইবার প্রস্তাভ্যায় উদ্দেশ্য করিতে আসিয়াছি। বাহা হউক অতি উৎকর্ষ সাহিত সাহেবের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে চাঁচার সাহেব-খানার কনিষ্ঠা আসিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিবারাত্র আসিতে এগত হইয়া সেলাম করিলাম। সাহেব আমাকে বলিলেন—“What do you want boy?” অর্থাৎ “বালক! তুমি কি চাও?” আমি বলিলাম—“আমি চাকরির প্রার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি।” এই কথা বলিয়া তাঁহার হাতে সার্টকিট-সহ দরখাত পিলা। সাহেবের দরখাতখানি এক পিতার সার্টকিট পড়িয়া বলিলেন “তুমি শিবচন্দ্রের পুত্র? তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া বড় দুঃখিত

হইলাম। শিবচন্দ্র আমার নিকট অনেক দিন চাকরি করিয়াছেন। বাহা হউক কোথাকার চাকরি খালি আছে?” আমি বলিলাম, “এডজুটেন্ট আফিসে একটা কর্ম খালি আছে।” সাহেব,—“এ সংবাদ কি তুমি নিশ্চয় জান?” আমি,—“আজ্ঞা হ্যাঁ।” এই কথা শুনিয়া সাহেব আমাকে সঙ্গে-বাসিয়া এডজুটেন্ট পেন্সেন্টের মেকেন্সি সাহেবের বাসালয় উপস্থিত হইলাম। চাকরি খালির কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় মেকেন্সি সাহেব বলিলেন, তাঁহার আফিসে একটা কর্ম খালি ছিল বটে, কিন্তু সমুদ্রি তাহাতে একজন লোক নিযুক্ত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া চাঁচার সাহেব বলিলেন, “যে লোকটিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, যে কর্তৃক উইলুড তাহা কি দেখিয়া লজ্জা হইয়াছিল?” চাঁচারের কথায় মেকেন্সি সাহেব কিছু অশ্রুপাত হইয়া বলিলেন, “আমার আফিসের বড় বাবু তাহাকে আনিয়াছেন, তাহাকে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয় নাই।” এই কথা শুনিয়া চাঁচার সাহেব বলিলেন, “তোমার বাবুকে এবং আমার বাবুকে পরীক্ষা করা হউক; যে উপযুক্ত হইবে, তাহাকেই নিযুক্ত করা উচিত।” পরীক্ষার কথা শুনিয়া আমার মনে আশার সম্ভার হইল। ভাবিলাম, “পরীক্ষার উত্তম হইলে অবশ্যই চাকরি পাইব। বাহা হউক, আমার উত্তর পরীক্ষা দিবার জন্ম বসিয়া সেলাম। চাঁচার সাহেব একখানি পুস্তক হইতে শ্রুতি-নির্ণয়ের জন্ম করয়ে ছত্র বলিলেন। আমি সপল কথা গিনিয়া করিয়া দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার তাহাতে কোন ভুল ছিল না। আর এদিকে এডজুটেন্ট-আফিসে নব-নিযুক্তি বাবু শ্রুতি-নির্ণয়ের প্রথম আর শেষ দৃষ্টিয়া গিয়া, চূপ করিয়া বসিয়া আছেন। চাঁচার সাহেব তাঁহার কাগজ দেখিয়া, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—“দেখ মেকেন্সি! তোমার বাবু কি করিয়াছে! যে কিছুই জানে না, এমন লোককে রাখিবার প্রয়োজন কি? বাহা হউক, তুমি বালক দুর্ভাগ্যবশত নিযুক্ত কর।” চাঁচার সাহেবের কথা শুনার্থে মেকেন্সি সাহেবের তাঁহার আফিসে চলিয় টাকা বেতনে আমাকে নিযুক্ত করিলেন।

১৮১১ সালের অক্টোবর মাসের শেষে আমার এই প্রথম চাকরি হইল। বলা বাহুল্য, এই বৎসর চাকরি পাইয়া মনে মনে যার-পর-নাই আনন্দিত হইলাম। তখন মনে কত যে স্বপ্নের তত্ত্ব উঠিয়া

ছিল, তাহা এখন কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু এদিকে এডজুটেন্ট আফিসের বড় বাবু শ্রীকৃষ্ণ বহু-নাথ বহু মনে মনে কিছু চিন্তিলেন। তাঁহার আশ্রিত লোকের চাকরি না হইয়া আমার হইল, ইহাতেও তাঁহার বিরক্ত হইবারই কথা। কিন্তু তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিবার উপায় নাই। একে আমি পরীক্ষার উত্তম হইয়াছি, তাহাতে আমার আমি বড় সাহেবের আনীত লোক; কাজেই তাঁহার মনের আশ্রয় বনেই চাপিয়া রাখিতে হইল। আমার ত সেখানে কর্ম হইল, কিন্তু সেই দিনই হুজুম আসিল যে, আমাদের রেজিমেন্টকে হুলতানপুর হইতে পঞ্চাবের অন্তর্গত দানৌ বাইতে হইবে। ১৮১১ সালে ৮ই নবেম্বর আমাদের তথায় বাইবার দিন স্থির হইল। মেকেন্সি সাহেব আমাকে তখন জবাবিয়া বলিলেন, “রেজিমেন্টকে দানৌ বাইবার হুজুম হইয়াছে, তুমি কি সেখানে বাইবে?” বাল্যকালবধি পিতার সঙ্গে নামোচ্চ-শোভাভরে গিয়াছি। অনেক দেশ, অনেক নদীর ইয়ার মধ্যে দেখিয়াছি। বিশেষত বাল্যকাল হইতেই শরীরে বিলম্বক সামর্থ ছিল, সাহসও কিংবা ছিল; হুতরায় মেকেন্সি সাহেব বলিবারাত্র আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম। দানৌ বাইতেও শীঘ্রত হইলাম, কিন্তু নিজের কাছে তখন টাকা-চাকরি ছিল না। এমন কি, একটা পয়সাও নিকট ছিল না। আমি মাসের ভর করিয়া সাহেবকে বলিলাম, “যদি বেতনের স্বল্পতা আমার কিছু পাই, তাহা হইলে আমার বিশেষ সুবিধা হয়।” এই কথা শুনিয়া সাহেব আমাকে তিন মাসের বেতন আশ্রয়ে দিতে আদেশ করিলেন। এদিকে বড় সাহেব, (চাঁচার) চাঁচার নিজে হইতে ৩০ টাকা দিলেন। চাকরির টাকা আমার সেই প্রথম হাতে পড়িল। একবারে ২০০ টাকা পাইয়া মন বড়ই প্রমত্ত হইলাম। তখন আমার মনে কত ভাব, কত কথা উদয় হইতে লাগিল, তাহা কেমন করিয়া বলি!

আমি মাতার সহিত একবার দেখা করিব বলিয়া, সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলাম। এদিকে বাটতে কান্দা-কাটনা গজিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র যে, আমি পলাইয়া গিয়াছি, সম্ভাব্য সাভিয়া দেশে দেশে ভয়ংকর করিচ্ছে। জননী ও একবাবের সন্তপ্রায় হইয়াছেন। প্রথমে বাড়ী চুকিয়া মাতাকে প্রশংসা করিলাম, দেখাওঁ তাঁকার উদয় সমুদ্রে বাধিয়া গিয়ালাম,—মা! আমার এই

চাকরীর টাকা—তুমি লও।” মা কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন—“আমার টাকায় কষ্ট নাই,—তুমি আমার, বেঁচে থাক।” মাতা একটু প্রস্তুত হইলে, তাঁহার নিকট আমার চাকরির সকল কথা আদ্যোপাধ্যত বলিলাম। তিনি শুনিয়া একবারে অধঃস্থ হইলেন। এত অল্প বয়সে, বিশেষে অপরিচিত স্থানে হইতে কেহো তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। তিনি আমাকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন যে,—“আমার এখন চাকরি করিবার এবং তাঁহারের সকলক পরিচাল্য করিয়া দেশান্তরে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। বাহা কিছু সম্ভাবন আছে, তাহাতে অনেক দিন আমাদের হৃৎ প্রজ্ঞপে কাটিয়া যাইবে, এক্ষণে খোঁপাড়া পরিচাল্য করিয়া অর্ধোপার্জন কর। আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই।” তুমি মাতাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম এবং বলিলাম, দানৌ বাইবার জন্ম সাহেব আমাকে অগ্রিম বেতন দিয়াছেন এবং কর্মস্থানে বাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি, হুতরায় আমাকে বাইতেই হইবে। মাতার তখন বিশেষ প্রতীতি হইল,—আমি নিশ্চয়ই চাকরি করিতে বাইব, হুতরায় অনর্থক বাক্যব্যয় করা নিম্প্রয়োজন বলিয়া চূপ করিয়া রহিলেন। মা ভাবিলেন,—“যদি আমি সম্মতি না দি, তবে বিদেহে আমায়, আমার না বলিয়া পলাইয়া যাইবে।” কাহেই এবার মোদালাসন পূর্বক অল্পকালি প্রথম প্রকাশ করিলেন। বাস্তবিক এবার মায়ের লজ্জাভন না পাইলে কিছুতেই বাইতে পারিতাম না। কারণ, প্রথমবার পশারনের পর, মায়ের বেশক অবস্থা আশ্চর্য দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, আমি কি নিষ্ঠুর! শেষে মা বলিলেন,—“তুমি এই একান্তই বাবি,—তবে আর একটা দিন থেকে যা। আমি তোকে ভাল করে খাওয়াব, পাখি, খেঁচো।” মা সেদিন মনের মতো প্রায় পিঠা রকম ভরকারি রাধিলেন,—পায়স পিঠেও, কীর দই—সমস্তই প্রস্তুত করিলেন। আমার তিন ভাই একত্র সন্ধ্যা আহার করিলাম।

৮ই নবেম্বর কর্মস্থানে বাজা করিলাম। আমি নিজের ধরনের জন্ম কিছু টাকা মায়ের নিকট হইতে লইয়া হুলতানপুরে উপস্থিত হইলাম। পরদিন রেজিমেন্ট দানৌ বাজা করিল। একদিন আমার আশীর্বাদে ছাড়িয়া করিয়া আছি, পেন্সেন্টের চাঁচার সাহেব আমাকে বলিলেন, “বাবু! আমার নিজের কিছু হিসাবপত্র আছে, তাহা তুমি রাখিতে পারিবে।

আমি বলিলাম “আজ্ঞে হাঁ, আমাকে আদেশ করিলে রাবিন।” সাহেব—“তবে তুমি আজ হইতে আমার হিসাব রাখিও, আমি তোমাকে মাসিক ১৫ টাকা দিব।” সেই দিন হইতে আমি সাহেবের নিকটের হিসাবপত্র রাখিতাম। কয়েকদিন মধ্যে রেজিস্ট্রেটের দিল্লী পৌঁছিল। বীচার সাহেব, আমাদেব রেজিস্ট্রেটের ডাক্তার সাহেবকে বলিলেন, “তাঁহার ইদাম-পাতালের হিসাব কে রাখে?” ডাক্তার সাহেব বলিলেন, “সেইজন ডাক্তার সেরূপ উপযুক্ত নহে, কাজেই তাঁহাকে দুকল হিসাব রাখিতে হয়।” সাহেব বলিলেন, “তোমার আর কষ্ট করিতে হইবে না, আমার এক বাবু আছে, সে বেশ উপযুক্ত; মাসিক তাহাকে কিছু দিও, সে তোমার ইদামপাতালের লেখা পড়ার কাজ করিয়া দিবে।” এই কথা ইদাম-পাতার সাহেব, আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং মাসিক মেরের সাহেবের সমুখে বলিলেন “এক বাবুকে মাসে মাসে ১৫ টাকা দিও, তোমার ইদামপাতার কাজ করিয়া দিবে।” সেই দিন হইতে আমি ইদাম-পাতালেরও কেরাঈ নিযুক্ত হইলাম। দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আমরা বোহিতক উপস্থিত হইলাম। প্রায় প্রতি রেজিস্ট্রেটে একটা মেনু থাকে; সেখানে ইংরেজ কচকারীরা আহার্যি করিয়া থাকেন। আমাদেব রেজিস্ট্রেটেও একটা মেনু ছিল। মেরেক্সি সাহেব, তাহার সেক্রেটারী ছিলেন। আমরা যখন দিল্লীতে ছিলাম, একদিন বড়সাহেব, মেরেক্সি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেসের হিসাবপত্র কে রাখে?” তিনি উত্তর করিলেন “আমি রাখিয়া থাকি।” বড় সাহেব—“কেন তুমি হিসাবকে নিলে হয় না?” মেরেক্সি সাহেব—“হাঁ, এখন হইতে দুর্গা-পূজা হইয়াছে। এই কাজ করিবে এবং তজ্জ্ব তাহাকে মাসিক ১৫ টাকা দিব।” আমার—আমার ১৫ টাকা বাড়িল। বড় সাহেব হইতে আমায় ১৫ টাকা বেতন পুঁজি হইল। “ইহা যে বীচার সাহেবের অগ্রহণ এবং অশেষ দয়ার লক্ষ্য হইয়াছিল তাহা কবাই বাহ্যিক। আমার প্রতি, সাহেবের এতাদৃশ অকল্পনীয় লক্ষ্য তাঁহাকে কত হৃদয়ানুগীত, তাহা বলিতে পারি না।

কথামতে আমরা হাদ্দীতে উপস্থিত হইলাম সেখানে পণ্ডিত্য খদ্যাবাও পরিচয় করত আমি সকল কাজ হৃদয়শক্তি নির্বাহ করিতে লাগিলাম। কিসে সাহেব সন্তুষ্ট থাকেন, কিসে আমার নির্দিষ্ট কার্য হৃদয়শক্তি প্রদান হয়, এই

চিত্তা অগ্রহণ আমার মনে জাগ্রিত থাকিত, সেজন্য কাজকর্মের কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিত না। আমি যখন যে কাজ করিতাম,—তখন ঠিক নিজের ঘরের কাজ করিতেছি মনে করিয়াই প্রাণপনে তাহা করিতাম।—বৈদ্যসভারী চাক্ষুশের দ্বারা কখন কাজে যোজা-মিলন হিতমান। কাজ করায়েই আমার আনন্দ ছিল। এইরূপে অভিনব উদ্যোগ, অগাধ পরিশ্রম এবং মৃত্যু অব্যবসায়ের সহিত আমি কাজ করিতে লাগিলাম। এই ভাবে তিন চারি মাস কাটয়া গেল। তখন পূর্বদিল্লী মাভাকে আমার নিকট আনিলাম। তিনিও শ্রদ্ধে হাদ্দীতে বাস করিতে লাগিলেন।

পূর্বে রেজিস্ট্রেট একরূপ নিয়ম ছিল, দেশীয় মৈনিকদের চিঠি-পত্রের উপর বড়-সাহেবের দস্তখত করিয়া দিলে বিনা মাহুলে তাহা যথাস্থানে পৌঁছিত। আমাদেব আদমির বড় বাবু (বাবু হুদাখান বিশ্ব) সেই সকল পত্রের উপর (Prank) লিখিত্য বিষয় লিখিয়া দিতেন, তাহাতে সাহেব দস্তখত করিতেন। যত্ন বাবুর সময় ছিল না, আর তাঁহার মেজাজও কিছু রুক্ষ ছিল, সিপাহীরা তাহার নিকট গেলে তিনি বড় “বিরক্ত” হইতেন, একজ্ঞ তাহার তাঁহার নিকট না যাইয়া, আমার কাছে আসিত, আমি তাহাদের পত্রের উপর লিখিয়া দিতাম। এত দিনে সাহেব আমার লেখা অবগতই বেশ চিনিতেন। এক দিন সাহেব অজ্ঞান-পূর্ণে এই সকল পত্রের দ্বার করিতে করিতে দেশীয় কচকারীদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এই সকল পত্রের বড় বাবুর লেখা থাকে না, ছোট বাবুর লেখা থাকে কেন?” তাঁহার বলিলেন “অজ্ঞে বাবুকা মেজাজ শক্ত হায়া; আওর ছোটো-বাবুকে মেজাজে মোলায়মতা হায়া, ইদুয়াসু সিপাহী গোপ উনুকে দাস হায়া হৌ।” একথা শুনিয়া সাহেব জঙ্ঘম পালন, এই কাজের জন্ত বড় বাবুকে (সে ২০, টাকা দেওয়া হইত, তাহা আজ হইতে ছোট বাবুকে দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য এই কথা শুনিয়া যত্ন বাবু আমার উপর মনে মনে অভিশপ্ত বিরক্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতে আমার কোন ঘোরাই ছিল না।

পরম রূপে হাদ্দীতে তিন অভিবাহিত হইতে লাগিল। বড় সাহেবের জাণাবাসা কখন জুলিবার নহে। সিপাহীরাহের সহিতও আমার বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মিল। বিশেষ আমি প্রাক্ষণ বলিয়া সকল সিপাহী আমাকে মাড় করিত। তদন্তের সহিত

নির্দিষ্ট সময়ে আমার সময়-বেলা হইত। আমার অশ্বারোহণ, তরবারি সকলান, বন্ধু ধারণ দেখিয়া সিপাহীরা চমকত হইত। জন্ম সিপাহীরাহের সঙ্গে নানারূপ সম্পর্ক পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম,—কেহ ভাই, কেহ বাদা, কেহ বুড়া, কেহ ঠাণ্ডা, এইরূপ সম্বন্ধস্থ হইলাম। এখন, যেমন, রেজিস্ট্রেট মাধারথ নিয়ন্ত্রণের লোকই প্রবেশ করে—পূর্বে সেরূপ ছিল না। তখন সন্ন্যাস কন্যার উচ্চচরিত্র হিন্দুস্তান সামরিক-বিভাগে প্রবেশ করা পৌরব মনে করিতেন। তাঁহাদের শরীর শক্তি যোগ্য, মনের বলও তদনুযায়ী। আহার্যি কোন ভাগ সামগ্রী পাইলে, তাহার অগ্রে আমাকে তাহার অংশ দিতেন। আমাকে বহুমান দেখিয়া আধিক-তা ভাল বাসিয়াছিলেন। আমি তখন সর্বদা হিন্দু-স্ত্রী বেশে মজ্জিত থাকিতাম; কথা বলিতাম ঠিক হিন্দুস্তানিয়ার ভাষা; হঠাৎ দেখিলে, আমাকে বাদালা বালিয়া কেহ চিনিতে পারিত না। কোন কোন সিপাহী আমাকে বলিত—বাবু! আপু বাদালা বাদুস নেহি হোতে; বাদামাসে এতদি হুং (বল) নেহি হোতে। কায় আপু সচমুৎ বাদালা হৈয় হু? আমি হাসিয়া এই ভাবে উত্তর দিতাম,—“নাহে বাবু! আমি বাদালাই হই। কেন, বাদালারি গায়ে কি জোর হ’তে পারে? নাহি?—আমা আপুলা আরও অধিক বদমান বাদালা আছেন। তাঁহার এক একজন তোমাদের দল-বিশি জনকে এক এক কৌল নিকাশ করিতে পারেন।” আমার এই রজিত কথা শুনিয়া সিপাহীরা গণ বিম্বিত হইত এবং পরস্পর মূখ চাটয়া-চাহি করিত। আমি মনে মনে হাসিয়া ইহারের মজা দেখিতাম।

বালককাল হইতেই খোড়া চড়িবার আমার গুণ সম্বলিত। হাদ্দীতে মেসেরের লজ খোড়া-চড়া শিখা করিবার তখন একটা স্থল ছিল। বীচার সাহেবকে বলিয়া আমি সেই স্থলে ভর্তি হইলাম। একবৎসর কাল আমি খোড়া-চড়া প্রকৃত প্রস্তাবে শিখা করি। স্বয়ং বীচার সাহেব বিশেষ ঘরের সহিত আমাকে খোড়ানোড়ি শিখাইতে লাগিলেন। জন্ম অশ্বারোহণে একরূপ পারদর্শী হইলাম যে, সৈন্যদল মধ্যে আমার মান্য অস্ত্রারোহী আরা কেহই তখন রহিলেন না। আমি অশ্ব-আরোহে দিক্—হইলাম। বড় বড় দূরত্ব-খোড়া সোজা করিতে লাগিলাম। রেজিস্ট্রেটের সাহেব,

বিবি, সিপাহী—দেশিয়া শুনিয়া সকলে বিস্ময়গণিত হইলেন।

মা আমাকে মনের সাথে ধর্য্য বৃন্দীয়া শাওয়া-হতে লাগিলেন,—আমি গুরুপুত্র, বলিষ্ঠ, কষ্টভী হইতে লাগিলাম। এইরূপে ছই বৎসর কাটিয়া গেল।

বিড়াল।

বিড়াল বাঘের মাসী। ঠিক মাসী-না হউক, ছই জনে সম্বন্ধ নিকট। জাতি এক, কারণ ছই জনেই ‘কার্ভিডোরা’ অর্থাৎ মাংসভোজী। বংশ এক, কারণ ছই জনেই ‘ফেলিনি’ বা সিংহবংশীয়। হৃদয়ানু ছই জনের খুদ্রদোষের, রূপ-গুণে, বিশেষ মাদৃশ আছে। তবে ছোট আর বড়, কম আর বেশি, আমি বলি। বিড়ালের অশ-মৌলভের বিষয় আমি কিছু বলিলাম না, কারণ সকলেই ইহা চক্ষে দেখিতেছেন। তবে কৌল একবি নিরাপল করিয়া বেধার রীতি এদেশ হইতে বিদেশের ‘অন্তর্হিত হইয়াছে, তাই এ সম্বন্ধে মোটামুটি ছই চারি কথা বলা আবশ্যক। বিড়াল-বংশের শরীরটা চারি অঙ্গে বিভক্ত করিলাম,—মুখ, গা, পুচ্ছ, পা। মৃত্তনী আর কিছুই নয়, কেবল একটা গোলাকার হাড়ের বাস। এই বাসের ভিতর মস্তক থাকে। বাসের পর্দায় দিকে হাড়ের গায়ে একটা ছিঁজ আছে। সে ছিঁজটা মাংস ও চর্মা দ্বারা আবৃত, তাই আমরা দেখিতে পাই না। তাহাও বটে, আবার এই ছিঁজের মধ্যে একটা হাড়ের নল কোড়া আছে। এই নলের পিঠের উপর নিয়া, বরাবর পুচ্ছ পর্যন্ত নিয়াহে। মস্তকও যে পর্দা, এই নলের ভিতরও সেই পর্দাখ থাকে। অনেকগুলি আয়তী হাড় পায়ের-পায়ে সংযুক্ত হইয়া এই নলটিকে প্রস্তুত করিয়াছে। এই আয়তী হাড় হাড়গুলি পিঠের শিরদ্বারা। মধ্য হাড়ের পিঠের শিরদ্বারা একটানি হাড় নয়। পিঠ মধ্য হাড়ের বধন এই হাড়ের আয়তীগুলি পুচ্ছ গড়িতে থাকে, তখন ইহার জন্মে লুপ হইতে লুপ্ততর হয়, আর নিরৈক হইয়া আসে। পুচ্ছের মুখে ভাগে একবারে হাড় থাকে না। মুখের সমুখ, হাড়ের বাসার তলভাগে, বাহিরের দিকে

২. বন-বিড়াল।



আমাদের দেশে প্রচলিত বিড়ালের কথনই অভাব ছিল না। বটীদেবীর ইহা আমাদের সামগ্রী, কীরাহু বাহন। তাই রূপান্তরিত হৃতকালীয় পুজা-প্রকরণে বটীর ধ্যানে বিড়ালের উল্লেখ আছে,—

অভাববহুতঃ কৃষ্ণমাজ্জার সংহা

কনকচন্ড্রিগাভীঃ সর্পপুত্রৈঃ ক্কাভীম।

স্ববহুনিগবৎকাঃ সিব্যমালাপ্রাচাঃ

বটপিতৃপবিত্রাসাঃ নৌমি যথাঃ সহাসাম্।

পূর্বকালে বিলাতে কিছু বিড়ালের বড়ই অভাব ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্বদেশ হইতে বিলাতে প্রথম বিড়াল গিয়াছিল।

অনিম ভাষ্য বিড়ালের নাম 'পুসে'। পুসি ভাষায় ইহাকে 'পুখা' বলে, পারস্যে 'পুখী'। সকলে মনে করেন ব্রিটেন যৌগে যে সমুদ্র প্রাচীন ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাতে বিড়ালের কোনও নাম ছিল না। এই ভাষা-নামই তাহাতে গৃহীত হইয়াছিল। সে স্তম্ভ আইরিশ ভাষায় ইহাকে 'পুদু' আস/ভাষায় 'পুখ' ও গেলিক ভাষায় 'পুইস' বলে।

বিড়াল রাগিলে কোঁস কোঁস শব্দ করে বলিয়াও তাহার এরূপ নাম হইতে পারে। কারণ যে জন্তু যেরূপ ডাকে তাহার সেইরূপ নাম দেওয়ার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। কাগ, কোরিস, কুকুট, বট-কণাক প্রভৃতি পশুজাতি নাম এই নিয়ম অনুসারেই হইয়াছে। তাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সেই

সকল নামের এত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। একজন রাজা বিড়াল-বর্ষাৎ একবার একটা আইন পাশ করেন। এই আইনে বিড়ালের মৃত্যুও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যে বিড়াল-ছানার চকু মুটে নাই, তাহার মৃত্যু এক পোনি। ইহুদ্য ধরিতে শিথিলে

এক কুকুটের নাম লেখ—ইয়েজিতে 'ককু' ওরবা ভাষায় 'কোকোলা', ইহা ভাষায় 'ওককো', জুবু ভাষায় 'কুকু', ফিনিশ ভাষায় 'ককো' ইত্যাদি। প্রাচীন পারস্য বসীরা কুকুটের বিশেষ সম্মান করিতেন। কারণ সকালবেলা ডাকিয়া ইহারা লোককে জাগাইয়া দেয়; মাথুসে দিনের পদ্ম-কর্ণের প্রভব হইতে পারে। হুতরাং এরূপ পশুকে ডাকের মত নাম দিলে তাহার অপমান হয়। তাই প্রাচীন জেও-আবেস্তা গ্রন্থে নিমিত্ত হইয়াছে,—

"The bird who hears the name of Paradaid: O holy zathustra ;

Upon whom evil-speaking men im-

pose the name Kaharkatak. (কুকুট)

ইহাদের বালাক বালাকাতা বিলাকে 'পুখা' বলিয়া ডাকে বলিয়া, সে কথাটা যে ভাষিগণ জানে হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার কিছু নিশ্চয় নাই।

ইহার কোঁস কোঁস শব্দ হইতেও এ নাম হইতে পারে। বাঘা হউক অথি শব্দ বৎসর পূর্বে বিলাতে বিড়ালের বড়ই অপ্রভু ছিল। বিড়াল-রক্ষা, বিড়াল-বিজয় বিষয়ে সেখানকার রাজারা নানারূপ আইন করিতেন। ওয়েলস দেশের হাউয়েল নামক

একজন রাজা বিড়াল-বর্ষাৎ একবার একটা আইন পাশ করেন। এই আইনে বিড়ালের মৃত্যুও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যে বিড়াল-ছানার চকু মুটে নাই, তাহার মৃত্যু এক পোনি। ইহুদ্য ধরিতে শিথিলে

তাহার মৃত্যু হইবে। যে সকল বিড়াল রাজার গোলাবড়িতে ইহুদ্য মারিত, তাহাধিগকে চূরি করিলে চোরকে একটা মেষ দ্বারা ছানাত্ত জরিমানা দিতে হইত। ভেড়া না দিয়া তাহার বদলে গম দিলেও

তাহার পরিমাণ এইরূপে স্থির হইত;—লোকে গাড়ি বাধিয়া বিড়ালটাকে এরূপ ভাবে ঝুলাইতে হইত; যেন তাহার মস্তক বাইরা মাটিতে লাগে। তাহার পর সেই দেহের উপর গম ঢালিয়া দিতে হইত।

যতগুলি গম দিলে পুচ্ছের অঙ্গভাগ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে, ততগুলি গম বিড়াল-চোরের জরিমানা হইত।

বিলাতে এখন এত বিড়াল হইয়াছে যে, ছানা হইলে বাহিয়া ফেলিতে হয়। কনি মনসার গাছ লইয়াও এদেশে এইরূপ রহস্য ঘটাইছিল। কনি-মনসা এদেশের গাছ নয়, আফ্রিকা-অঙ্গল হইতে ইহা এদেশে আসিয়াছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, কোনও এক সাহেব প্রথম এই গাছ দক্ষিণ অঙ্গলে

লইয়া আসিলেন। অস্ত্র পাছের মত ডাল নয়, পাশা নয়—কিছুই নয়। তাই এই অশুভ্র পাছকে তিনি

অতি যত্নে, অতি সাবধানে বাপানে পুতিয়াছিলেন।

গাছটা বাপানে বাড়িতে লাগিল, আর প্রতিবাসীরা ইহার অশুভ্র রূপ দেখিয়া হিমায় ফাটিয়া মরিতে

লাগিল। কেহ কেহ ইহার দুই একটি ডাল রাগিতে চূরি করিয়াও লইয়া যাইল। এইরূপে চারি দিকে

গাছ-মনসার গাছ হইতে লাগিল। সেই 'আপরের পাছ-মনসার লক্ষ লক্ষ বিঘা ভূমি মুড়িয়া বসিয়াছে।

আর এখন ঘর করিয়া চাষ করিতে হয় না, আপনা-আপনিই চাষাদিগের ক্ষেতসকল অধিকার করিয়া

লইতেছে। তাহার জালার কৃষকেরা বাহ্যবাস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জলে ডুবাইলে মরে না, আঙনে

পোয়া পড়িলে মরে না, মাটিতে পড়িলে মরে না। তাই এই কৃষকদের প্রজ্ঞাধিক লইয়া কি করিলে

কৃষকেরা ভাষা ঠিক করিতে পারিতেছে না।

আমি পশ্চিম খাট-পর্কতে সেবিয়াছি, অনেক উর্করা ভূমি এই কনি-মনসা দ্বারা অধিকৃত হইয়া একবারে

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক প্রকার ধরপোষক এই-রূপ আদর করিয়া লোকে অস্ত্রলিঙ্গা দেশে লইয়া

গিয়াছিল। দেখানে এখন এ ধরপোষ পশুপালক দ্বারা এত বাড়িয়াছে যে, কৃষকদিগের শস্ত রক্ষা করা

হইয়া পড়িয়াছে। বিড়াল লইয়া প্রাচীনকালে মিসর দেশেও এইরূপ বিলাপ ঘটাইয়া। সেখানকার

লোকে বিড়ালকে দেবতা বলিয়া মানিত, বিড়ালের

জন্ম মন্দির নির্মাণ করিত, পূজা করিত, আর মরিয়া খেলে ইহার পেটের ভিতর নানারূপ মন্থনা দিয়া

'মমি' করিয়া, মহা সমারোহের সহিত পোর দিত।

বিড়াল মারিলে মথাপাতক হয়, সেখানকার লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। 'ডাইয়েগোভাস মাইহলস'

বলিয়া একব্যক্তি বলেন যে, একবার আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে রোম দেশীয় একজন সেনানী সৈবক্রমে

একটা বিড়াল মারিয়া ফেলিয়াছিল। এই সর্বনাশের কথা শুনিয়া মহন্ত মহন্ত লোকে জোখ-উকীণ-নয়নে

তাহার বাড়ী খিরিয়া ফেলিল। হুতরাং রোমীয়ের প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত রাজা সৈন্ত প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু সকলই বৃথা হইল, বিড়াল-হত্যাচারী সেই বধু বধু করিয়া লোকে রাস্তার ফেলিয়া দিল।

এখন আর মিসর দেশের যে অবস্থা নাই। এই আলেকজেন্দ্রিয়া নগরের পথে পথে কতই না

আমি ভ্রমণ করিয়াছি। এখন সে মিসরও নাই, বিড়াল-উপসাগর সে প্রাচীন মিসরবাসী নাই।

বাঘা হউক মিসর দেশে বিড়ালকে এইরূপে ধরেন সহিত রক্ষা করিতে করিতে, অবশেষে ইহাদিগের

মাথায় অধিক হইয়া পড়িল। এমন কি, ক্রমে লোকের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল যে, মিসর দেশ

খিরি বিড়াল-সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। তাই মিসরবাসীরা সেখানকার পণ্ডিতদিগের নিউট বিন্দু

প্রাধানী করিলেন,—মহাদায়ন। এখন উপায় কি? দেশ যে বিড়ালে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

মিসর যে-রাস্তায় লাইতে বসিল। আরবা সামান্য মহুয়া এক্ষণে কোথায় বাই? সেখানকার

পণ্ডিতগণ পুথি গুলিয়া রাবরা গিলেন যে, বিড়াল বড় হইলেই পুজা, তখন তাহাকে মারিতে

নাই। বিড়াল-ছানাকে মারিতে কোন দোষ নাই। তখন সেখানকার লোকে বিড়ালের ছানা হইলে যে

দুই একটি দেবতা করিবার নিমিত্ত আদর হইত, তাহাই রাধিয়া বাসিকলিকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া

ফেলিতে লাগিল। পণ্ডিতদিগের মুক্তিহীন মিসর দেশ দেবতাদিগের উপদ্রব হইতে এইরূপ উদ্ধার

হইল। কথিত আছে যে, পুস্তক বিড়ালের দ্বারাও অনেক দেব-শাকল ধ্বংস হইত। সকল দেশেই পুস্তক-বিড়াল, ছানা মারিয়া যেনে। লোকে বলে মারিয়া যায়; বাহিতে কিছু কখন দেখি নাই।

বাঘা হউক, এই ভয়ে বিড়ালী আদর প্রাণে

কাল সেখানে ছানাগুলিকে লুকাইয়া রাখে। তাই 'বিড়াল ছানা নাড়া নাড়ি' কথাটা হইয়াছে।

৩। মিসর দেশের বিভাল।



গ্রিক-ইতিহাস বোঝা মধ্য পণ্ডিত হেরোডোটাস মিসরদেশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন;— “পিতা-বিভাল নিজেই যদি না আপনায় ছানার গুলিকে হত্যা করিতেন, তাহা হইলে মিসর দেশে বিভালের সংখ্যা বড়ই অধিক হইয়া পড়িত। প্রেম করিয়া বিভালী শাবকগুলিকে আঁত মাঝখানে লুকাইয়া রাখে, পাছে বিভাল চোর পায়। কিছু বিভালও পুত্র, খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহাদিগকে বাহির করে, বাহির করিয়া তাহাদের প্রাণ নষ্ট করে। সেবনিকার নোকে কিছু বিভালের প্রাণ-রক্ষা করিতে সততই চেষ্টা করিয়া থাকে। যদি কাহারও ঘরে আতপ-লাগে, তখন আর সব ফেলিয়া কিসে বিভালের প্রাণ রক্ষা হইবে, নোকে সেই চিত্রতেই বোঝভর ব্যগ্র হইয়া পড়ে। কিং কি আশ্চর্যের বিষয়, বিভালেরা ঐ সময় নোকের পা পালিয়া, কি মাথা ডিম্বাইয়া আঁতের কাঁপে। তখন চারি দিকে হাফাকার পড়িয়া যায়। দুঃখে, শোকে, বোকে ভুরু কামাইয়া ফেলে। ক্ষুর মরিলে আরও বিপত্তি, সকলকে মাথা হইতে পা পর্যন্ত

সর্বস্বতীর কামাইয়া ফেলিতে হয়। বিভাল মরিলে মিসরবাসীরা মুতলহ মন্দিরে লইয়া যায়। মুতলহকে লবণ দ্বারা স্বথাবিধি প্রস্তুত করিয়া বুখস্তিনগরে তাহার সমাধি-ক্রিয়া সম্পন্ন করে।” মিসর দেশে মহাশয় দেহও কলশা দ্বারা রক্ষিত হইত। সেখান-কার বায়ু তত্শির নীরস, হুতরাং ঐ সকল দেহ পচিয়া যাইত। তত্ হইয়া মাতীর নীচে এখনও অনেক দেহ রহিয়াছে। মাটী খুঁজিয়া রাজা-প্রজার অনেক দেহ পাওয়া গিয়াছে; আর ইউরোপের লোকেরা তাহা লইয়া জাহাজে রান্ধিয়াছেন। এই সকল শুক্ন মহাশয়দেহকে “মমি” বলে। তিন মহন্ত বৎসর পূর্বে ঐ মমিরা জীবিত মহাশয় ছিল। তখন তাহারা কত কথা কহিত, কত চিন্তা করিত। বিভাল, ক্ষুর, ও ক্ষুস্তার প্রকৃতি দেবতাপ্রের পূজা করিয়া কতই না মর্শ্ব সঞ্চয় করিত। মিসর দেশে এইরূপ অনেক বিভালেরও মমি আঁতের ভিতর পাওয়া গিয়াছে। সে বিভাল দেখিতে ঠিক আমা-দের বিভালের মত নয়। সেই বিভালের একখানি চিত্র এখানে দিলাম।

মিসর দেশের নোকে বিভাল পূজা করিত বলিয়া কেহ যেন তাহাদিগকে উপহাস না করেন। প্রাচীন মিসরবাসীরা বিভালা বুদ্ধিতে বিলম্বন উন্নতি লাভ করিয়াছিল। যখন সমগ্র জগৎ তিমিরময় ছিল, তখন এদিকে ভারতবর্ষ, এদিকে মিসর, কেবল এই দুইটী দেশ জ্ঞান ও ধর্মে বিবুদ্ধিত ছিল। তবে মিসরবাসীরা বিভাল, ক্ষুস্তার প্রকৃতি জন্ত জানোয়ারকে পূজা করিত বটে। ঐ সকল জন্ত জানোয়ার যে ইহকালে হুৎ ও পরকালে সঙ্গতি প্রদান করিতে পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগের একান্ত বিশ্বাস ছিল। জন্তরা সকল কথা বুদ্ধিতে পারে, মহাশয়ের চেয়ে তাহাদিগের বুদ্ধি অধিক, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তাহারা দলকই জানে, অন্তরের এইরূপ বিশ্বাস। তাই, যেমন মহাশয় মাছুষের সহিত কথা কয়, জন্তদিগের সহিত অনেকে সেই ভাবে কথা কহিয়া থাকে। যখন এই ভাবে কথা কয়, তখন তাহারা মনে করে—প্রতি কথাই জন্তদিগের জ্ঞানদয় হইতেছে। একবার রাজপুতানায় চিতা-বাথ লইয়া হরিণ নীকার করিতে গিয়াছিলাম। চিতা বাথের ঢক্ক-চুলি ছিল। দূরে হরিণপাল দেখিয়া চিতা-রম্বক সেই ঠগি খুলিয়া বাথকে ছাড়িয়া দিল। বাথ বাইয়া হরিণের পালেষ্ট উপর পড়িল, কিন্তু না পড়িতে পড়িতে হরিণ সব ছুটিয়া পলাইল। চিতা একটীকেও ধরিতে পারিল না। তখন বাথের আর বাথের পরিসীমা নাই। ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল, পুঙ্খ সজ্জরে মাটিতে আঁত করিতে লাগিল; ইচ্ছা, সমুখে বাথকে পাই তাহাকেই ধরি। তখন রম্বকেরও সেই জোখাফা বাথের কাছে বাহিতে ভর হইল। আশ্চর্য আশ্চর্য জন্মে জন্মে অগ্রসর হইতে লাগিল, আর দূর হইতে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল,—“এত রাগ করিতেছি কেন বাচ্ছা? হুই চিতা, তোর বাপ চিতা, ভোর দাদা চিতা, তোর মাতা পুঙ্খ চিতা, সামস ও বিক্রমে তোদের চেয়ে আর কে আছে পুখিরাতে। এবার না হয় হরিণ পলাইয়াছে, এর পাত কত হরিণ ধরিবি। আয় বাবা, ধরে বাই।” রম্বক এইরূপে চিতার সহিত কথা কহিয়া তাহাকে নীতল করিল। আমেরিকার পুরাতন অধিবাসীরাও যেহেতু সহিত এইরূপে কথা কহিয়া থাকে। কি হোয়াচর সহিত এইরূপে কথা কহিয়া থাকে। আর বলায় মাছুষে খাবার দেয়, আর কিশক শব্দ করিয়া তার পর মারে, এহুটী শব্দ প্রায় সকল পাণ্ডিত জন্তই বুদ্ধিতে পারে। তাহার পর ক্ষুর প্রকৃতি বুদ্ধিমান

জন্ত আরও নানা শব্দে অর্থ বুঝিতে পারে। আমরা বিভালকে “বায় আয়” কি “পুশ পুশ” বলিয়া ডাকিলে কাছে আসে, “বা” বলিলে-দূরে যায়। স্পেন দেশের নোকে বিভালকে “মিজ মিজ” বলিয়া ডাকে। জুপে জুপে ” বলিয়া তাড়াইয়া দেয়। স্পেন দেশের একটা মঠে অনেকগুলি আঁত মিসর বিভাল ছিল। পাছে চোর চুরি করিয়া লইয়া যায়, মঠ-বাসীরা সেই ভয়ে এই বিভালদিগকে ঠিক বিপরীত ভাষা শিক্ষা দিয়া-ছিল। তাহারা “মিজ মিজ” বলিয়া বিভালকে তাড়া-ইয়া দিত, “জুপে জুপে” বলিয়া ডাকিত। বিভালেরাও তাহাই শিখিয়াছিল। চোরেরা কিন্তু এ মর্শ্ব জ্ঞানিত না; হুতরাং চুরি করিতে আসিয়া তাহারা বিভালকে বেই “মিজ মিজ” বলিয়া ডাকিত আর বিভাল পলাইয়া বাইত। এই সকল দেখিয়া কাহ্নেই প্রাচীন কালের অনেক মহাযাদুগণকে মনে মনে স্থির করিতে হইল যে পশুও না পড়িয়া পড়িত, বাসনা ইংরেজি প্রকৃতি নানা ভাষায় ইহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ইহারা সর্বদাই প্রত্যক্ষ দেখিতেছে। তার পর আর ইহাদের পাখীও মৌনভাব দর্শনে নোকে আরও বিশ্বাস্যপন্ন হইল। ইহাদের মধ্যে একটা কথা নাই। কথা না কহিয়া ঠাণ্ডে ঠাণ্ডে মত প্রকাশ করার যে কৃত কল, তাহা আর কি বলিব। তা যদি করিতে পারি তো আমি তুমিও পূজা পাই। মূর্খ কালিদাস পক্ষা হুস্বা রাজকতা লাভ করিয়াছিল। এই উপায়ে সেখানে পশুরা সকল দেশেই পূজা পাইয়াছিল। সর্প শুে সকল দেশেই পূজা পাইয়া থাকে। আমেরিকার অধিবাসীরা মনে করে যে, সাপ মারিলে ভূত হইয়া হত্যাকারীর বিশেষ অপকার করে। তবে না মারিলে না, কাহ্নেই নানারূপ তুচ্ছতা করিয়া মারিতে হয়। সাপ দেখিলে প্রাণের তাহাকে সোম্য কাটা, তার পর আরও বিশেষরূপে প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার সমুখে একটুখানি তামাক ফেলিয়া দিতে হয়। এই সব করিয়া তার পর তাহার লেজটা হরিণ মারিলে আর কোন দোষ নাই। সাপ মারিয়া ভূত হয় নহা মস্তানায়দিগের মনে এ কথাটা বিশ্বাস না হইলেও হইতে পারে। কিছু তথি মস্তানের যোগে, হার বিশেষে, কোন ব্যক্তি যে ভূত না হয় তাহা বলিতে পারা যায়। ভূনিয়াছি, একবার একটা কলিকা (হিলিম) নাকি ভূত হইয়াছিল। হুতরাং কলিকাতা জমাকের কাট পড়িয়া বুদ্ধিয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে ভাল

করিয়া ঘুম বাহির হইতে ছিল না। তাই, যাহার কলিকার সে রাগ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। “গরম অবস্থায় আমাকে কান্নাকাতি কেন!”, আছাড় মারিয়া আমাকে ভাঙ্গিয়া মারিয়া ফেলিল; আমি সিকি পুনরায় ছিলি বলিয়া আমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এই কথা মনে করিয়া কলিকার বড়ই অভিমান হইল। অপশ্রান্ত মুখা বশত তাহার সঙ্গাতি না হইয়া ছিলিমান ভুত হইল। ভুত হইয়া সেই লোকটার গায়ে সে ক্রমাগত হেঁকা দিতে লাগিল। শুইয়া আছে, গরম কলিকার হেঁকা, বসিয়া আছে, কলিকার হেঁকা, উঠিতে বসিতে কেবল কলিকার হেঁকা, অবশ্য দেখিতে কিছুই পাওয়া যায় না। ভুত আর বল কে কবে দেখিতে পায়। এরূপ কিবা রাত্রি ছেঁকা বাইয়া বাইয়া লোকটী অস্থিচর্য সার হইয়া গেল। অবশেষে একজন সোজা নিয়া আনিয়া। মৃত অস্ত পড়িয়া, অস্ত্রা বাধিয়া বোজা বসিলেন—“তুমি যে গরম কলিকারকে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, সেইটী এখন শুইতে হইয়াছে। ভুত হইয়া তোমার উপর এরূপ উপভব করিতেছে। তাহার পর রোজ্জার বিদ্রোহ চেষ্টাতে কলিকা ভুত শান্ত হইল। তবে লোকটার প্রাণ বিনষ্ট। পাকিবন্দ। রাগ করিয়া ছিলি কখনও ভাবিবেন না। মিছা-মিছি কেনে সুখে বিপদে পড়িবেন।”

ভরক মারিয়াও ভরক ভূতের প্রীতি-মাধনের অস্ত্র আমেরিকাবাদীরা বিধিগত চেষ্টা করিয়া থাকে। ভূতদের মৃতদেহকে মাধ্যমের রাখিয়া সকলে মিলিয়া তামাক ধায়, তাহার মুখেও হুই একবার নলটী দেয়। তামাক বাইয়া ভরকভূত গরম প্রীতি লাভ করে, হত্যাকারীদের উপর আর কোন উপভব করে না। আফ্রিকাদেশের কাক্রিয়া হস্তি-মাংস ভক্ষণ করে। হস্তীকে নব কাটা চাই; আবার বন করিলে পায়ে হস্তি-ভূত তাহাদের উপর উপভব করে সোপ ভাত। তাই মারিয়া মৃতদেহের প্রতি নানারূপ ভাবি বিনতি করিতে হয়। মৃতদেহকে বুসাইয়া বলিতে হয় যে, “বেশ, আমরা তোমাকে কানিয়া ভনিয়া মারি নাই, ‘সেবা’ এ কাণ্ডটা হইয়া গিয়াছে। যে ভক্ত-আত্মা-দ্বিদের অপরাধ লইও না।” কথাগুলি যদিও ঠিক নয়, তথাপি করা যায় কি? প্রাণের দায় হুই একটী নিশ্বাস কথা না থাকিলে চলে না। হস্তি-ভূতকে সন্তুষ্ট করিবার ভজ কেহ বা হত্যাকারীর

সহিত কপটসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। তাহার পায়ে হুই বা আশেপাশে আশেপাশে মারিলে হস্তি-ভূত বুঝিতে পারে যে, আত্মরক্ষার যথাবিধি দণ্ড হইয়াছে। তখন আর কাকাকেও কিছু না বলিয়া হস্তি-ভূত প্রেত-দেশে প্রস্থান করে। সাইবিরিয়া দেশে নামোদে বলিয়া জাতি আছে। তাহারা ভরক মারিয়া মৃতদেহকে মিছা-মিছি করিয়া বলেন—“আমরা তোমাকে মারি নাই, রশের লোকের মারিয়াছে, আমাদের অপরাধ লইও না।” আমেরিকার আমিসোরা ভরক মারিয়া তাহার মাংস খায়, কিন্তু মৃতদেহকে রং মাখাইয়া পুজা করে। সাইবিরিয়া দেশে যাহুত জাতিও ভরকের পূজা করিয়া থাকে। যে বনে ভরক থাকে, সেই বনের কাছ দিয়া যাইবার সময় তাহারা ভক্তিবাদে কয়েকটি নমস্কার করে, আর বলে—“ভরক-ভূতা মহাশয়! আপনি বীর-পুরুষ। আমাদে প্রতি রূপা রাখিবেন।” তাই বলিতেছি, বিভাঙ্গ-পুজা বিষয়ে হামিরার কথা কিছুই নাই। পৃথিবীতে এরূপ কোনে জন্ত নাই যাঁহা এক কালে না এক কালে, এক দেশে না এক দেশে মনুষ্যের উপভব হয় নাই। শৃগাল, কুকুর, হাঙ্গর, কুস্তীর মাংস পক্ষী পাখিদি পৰ্যন্ত হয় এ-আজি নব সে-ভাঙি, ভিন্ন ভাঙি দেশে দেশে প্রায় সমান জন্তই মনুষ্যের আরাধ্য হইয়াছে। তবে বিভাঙ্গের কোন কি?

কিছু হুয়ের বিষয় এই যে, যে পতঙ্গীরা এক দেশে আদর, তাঁর আবার অন্য দেশে অন্যায়। মিনি এক দেশে আমোদ্য, তিনি অন্য দেশে ভোতা। শয়তানকে জানেন তো? ইনি অস্ত্রাভ নেভা-দ্বিদের সহিত স্বর্গে বাস-করিতেন। ঈশ্বরের সহিত হইবার বিরাম উপভবিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইনি সরলতা-চাল-ভোগ্যার লইয়া ঈশ্বরের সহিত দুষ্টও করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সহিত দুষ্ট করিতে পারিবেন কেন? তাই স্বর্গ হইতে ঈশ্বর হইতাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। আবার কেহ বলেন যে, ঈশ্বর ও শয়তানকে কখনও হুই হয় নাই। ঈশ্বর আদর ও হবারে বসি করিয়া সকল দেবতাকে আশেষ করেন যে, “তোমরা এই দুইটী ইনমানকে ভনিয়াও কর।” সকলেই স্বীকার করিলেন, কেবল শয়তান ও তাহার দল স্বীকার করিলেন না। তাই তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে ঈশ্বর তাড়াইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, শয়তান অধোদার মনুষ্যের কাতে

কাছে ঘুরিতেছে। যুগেযোগেই মনুষ্যের আস্থা ধরিয়া নরকে লইয়া বাইতেছে। মনুষ্যকে নরকে ভোগে করিতে দেখিলে শয়তানের মন বিশেষ প্রীতি লাভ করে। অজ দিন গরম হইল বিভাঙ্গের নোকের মনে এক ধারণা ছিল যে, বিভাঙ্গ শয়তানের চোলা। শাশা বিভাঙ্গ তো বটেই, আর কাণো বিভাঙ্গের তো কথাই নাই। যদি শয়তানের চোলা না হইবে, তাহা হইলে ইহার এত প্রাণ কঠিন কেন? বিভাঙ্গের লোকে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিভাঙ্গের একটা প্রাণ নয় মাত্রী প্রাণ। অস্ত্রাভ কুকুর কেবল মাত্র একটা প্রাণ থাকে, হুস্তাং এক বা মারিলেই সব মূরাইয়া যায়। বিভাঙ্গের একটা প্রাণ নহিলে, তবু আরও আটটা থাকে। একে একে নয়টা প্রাণ বধ করিতে না পারিলে আর বিভাঙ্গের মৃত্যু হয় না। ঠিক নয়টা প্রাণ আছে কি নাহে আটটা আছে, এদেশের লোকে তাহা কখনও হিসাব করিয়া দেখেন নাই। তবে বিপদের যে কঠিন প্রাণ তখন একশেই জানেন। একবার কাণপুরে আমি একটা হুস্তাং বিভাঙ্গকে স্বরে বধ করিয়াছিলাম। ভাহাকে প্রথম বড় বড় ছিটা-গুলি দিয়া মারি। তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না। কিছুমাত্র ভাত নী হইয়া সে আমাকে আক্রমণ করিতে আসিল। বপুক পুনরায় সীকার পুরিয়া গেল আর একবার তলি করি। তাহাতেও তাহার মৃত্যু হইল না। আমাকে পুনরায় আক্রমণ করিতে আসিল। অবশেষে আমি নিজেই তাহাকে বধ হইতে বাহির করিয়া দিলাম। বিভাঙ্গকে স্বরে বধ করিয়া মরিতে যাওয়া বড়ই বিপদের কথা। সে যে যেকোন মাসী এই অবস্থায় তাহার বিলম্ব পড়িয়া পাওয়া যায়। ভনিয়াছি একবার একজন লোক একটা হুস্তাং বিভাঙ্গকে স্বরে বধ করিয়া বলিতে-“তুমি রোজ রোজ হাড়ি খাও। এবার তোমাদের বাপে পাইয়াছি। এখন কোথায় বাইবে? এইবার তোমার প্রাণ বধ করি।” এইরূপ হুমকির বক্তৃতা ভনিয়া বিভাঙ্গ কি করিল? বক্তৃতা-স্বাধীন-লোকপু হুস্তাং শিঙাল টাউনহাঙ্গার লইয়া যাহা করে, বিভাঙ্গ তাহা করে নাই। বিভাঙ্গ খোমোজ বধন করে নাই, কবরভাল দেখে নাই, কিবা-বিয়ের, হিয়ারও” বলে নাই। বিভাঙ্গ টপ করিয়া লোকটীর টিট ধরিল, “গুলাং জুতোরার শিরা ছিড়িয়া দিল, ক্যারোটিভ থমনি ও নিমোপাষ্ট্রিক বা ভেগম রায়েত

নথ বমাইয়া দিল। তাহাতেই লোকটার মৃত্যু হইল। এরূপ অবস্থায় বিভাঙ্গ কখন কখন চন্দ্রতে পিয়া থাথা মারে, তাহাতেই চন্দ্র একেবারে অন্ধ হইয়া যায়। তাই বলি, বিভাঙ্গকে স্বরে বধ করিয়া কেহ যেন মারিতে না যান। কুকুর ও শৃগাল কামড়াইলে খেঁপে বন্ধের কাঁধ থাকে, বিভাঙ্গের কামড়ে সরেপ বড় ভয় নাই। স্পিণ্ড বিভাঙ্গ রচিত দেখিতে পাওয়া যায়, আর বিভাঙ্গের কামড়ে স্পিণ্ড হইয়া মাহুৎ ঘরিতে যায় ভনিতে পাওয়া যায় না। তবে যে বিভাঙ্গের কামড়ে জলাতক বা হাইড্রোফোবিয়া রোগ একেবারেই হয় না তাহা নহে। বিভাঙ্গ অপর একটা বিভাঙ্গের সহিত বড় অধিক বিক্রমের সহিত গুল্ক করে না। কেবল ভাননক শব্দ করিয়া ডাকে, অধিক কামড়া-কামড়ি করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিবাদের সময় পায়ে একটা জল দিলে জোথ কিছু হুপি যায়, তাহা দ্বারা উৎসাহিত হইয়া মূকুর, দিকে কিংবা পরিমাণে মনোনিবেশ করে। লোককে বলে যে, পায়ে জল দিলে বিভাঙ্গ ভাবে যে, কামড়াগেয়ে নিম্ন উদ্ভাসন করিয়া বিভাঙ্গ তাহাকে অপপ্রতি করিয়া দিল। বসুন, এ অপমান কাঁড় প্রাণে সফ হইয়! তাই প্রাণ যায় আর থাকে, সাহসও উদ্ভা-মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। শরীর অপপ্রতি হইয়াছে এ চিন্তা বিভাঙ্গের মনে উদয় হউক আর নাই হউক, জ্বলে উপর ইহার বিলম্বের লোম— তাহার কাণে এই যে, অপরাধের উদ্ভাঙ্গের শেষে খেঁপে বং-মায়াস্ত তৈলাক পদার্থ থাকে, বিভাঙ্গের শেষে খেঁপে থাকে না। বিভাঙ্গের গা তক্ত বলিয়া ইহা বলিলে তাড়িত হুস্তাং করিত হয়। শীতকালীন রাত্রিতে ইহার কাণের অগ্রভাগ হইতে তাড়িত-অধিকার বাহির করিতে পায়। যায়। তৈলাক পদার্থ থাকিলে শেষে জল বসিতে পায় না, জল পারিলে শেষে নষ্ট হইয়া যায় না। বিভাঙ্গের শেষে তৈলাক পদার্থ নাই বলিয়া জল পারিলে ইহার শেষে অপকার হয়, দেখিতেও ঠিক—“জিহ্মে-বিভাঙ্গের” মত হয়। তাই বিভাঙ্গ জলাক ভয় করে, গায়ে জল দিলে ইহার রাগ হয়। শেষে তৈলাক পদার্থ নাই বলিয়া কৃলা কালা হইতে মারিয়া থাকিতে পায় না, বিভাঙ্গা ফেলিলেই পড়িয়া যায়। পারতপক্ষে কুয়ের নিকট যায় না বলিয়া বিভাঙ্গ কখনও স্ব-হিয়ারও” বলে নাই। বিভাঙ্গ টপ করিয়া লোকটীর টিট ধরিল, “গুলাং জুতোরার শিরা ছিড়িয়া দিল, ক্যারোটিভ থমনি ও নিমোপাষ্ট্রিক বা ভেগম রায়েত

না। ইহার রূপের ছটা আপনা আপনিই বাহির হইতে থাকে। বিভালের রূপের নিশা করিলে তাহার প্রাণে ক্রিষ্ণ রং হয়, মনে কি রং হয়? তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে তোতোলের নামে বিভাল কেন এই সমস্ত অস্ত্রযোগ উপস্থাপ্ত করিয়াছিল? তোতোল একটা যুধু নাম। এক জনদের বাড়িতে বিভালির পাশয় তোতোল বাসা করিয়াছিল, তিন চারিটা ছানা হইয়াছিল। বিভাল তাহা জানিতে পারিয়াছিল। ছানাগুলির খুকোমল, মাংসের স্ফাপনে রসনাতে পরিতৃপ্ত করিতে বিভালের মনে বড়ই মুগ্ধ হইল। কিন্তু যুধুর সাগ্ন: বিভাল বিনা যোবে যুধুর ছানাগুলিকে কি করিয়া ধায়? তাই, একদিন পদতরে পুণিবা কপিত করিয়া বিভাল বাইশসেখানে উপস্থিত হইল, আর দুই হইতেই আরম্ভকরনে কর্ষণচনে বলিতে লাগিল;—

“তোতোল বরে, তোতোল বরে?” যুধু ভয়ে ভীত হইয়া বিনীতভাবে উত্তর দিল—কেন থ মাগি!” হুই, নাকি বশেছি যে, ‘আমার বটামশানা চক্ষু ছুটো, বটনের মত কানহুখানা, হাত-হুজুর লেজটা?’ যুধু বলিল;—না মাগি! তা কেন বলিবে? ‘আমি বলিয়াছি যে, ‘আমার পক্ষর মত চক্ষুহুটো, খঞ্জনির মত কানহুখানি, পাখের মত লেজটা।’ এরূপ মিষ্ট কথা শুনিয়া কার না প্রাণ মিতল হয়, রাগ বলিয়া যায়? তাই বিভাল আর কিছু বলিতে পারিল না। কেবল “তাইতো বটে, তাইতো বটে” এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যুধুর ছানার মোত তে আবার পরিতাপ করিতে পারা যায় না! তাই আবার তার পর দিন সেইরূপ রসাতলয়া আসিয়া তোতোলকে ঠিক সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। তোতোলও ঠিক পূর্ণদিনের মত উত্তর দিল। এইরূপ বিভাল প্রত্যহ আসে আর তোতোলকে নিশ্চিন্দা বলিয়া কাহুতি মিনতি করিয়া বড়ই কিসিয়াই দেয়। তোতোলের প্রাণে কিংবা বড়ই ভয় হইল। বিপদ সমূহ। বিভালের মোত জনমই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, মিষ্ট কথা আর যে জ্বল না। তাই তোতোল ছানাগুলিকে জিজ্ঞাসা করিল—“রাহাদসক! তোরা কি এখন উদ্ভিত্তে শিখিয়াছ?” ছানাগুলি বলিল, হা, না। আমরা এখন একটু একটু উদ্ভিত্তে শিখিয়াছি।” তোতোল বলিল “কি, একটু উদ্ভিত্তা আমরা দেখাও দেখি?” ছানাগুলি উদ্ভিত্তা মাকে দেখাইল।

তখন তোতোল নিশ্চিন্দ হইয়া বাসায় বসিয়া রহিল। যে দিন ঘের বিভাল আসিয়া পূর্ণবৎ জিজ্ঞাসা করিল—“তোতোল বরে, তোতোল বরে?” “কেন? বরে থাকিব না তো যাব কেবার?” “তুই নাকি বলিয়াছিস?”—“বশেছি তো বশেছি তো।” এই কট উত্তর শুনিয়া বিভাল যেই ছানাগুলিকে ধরিতে বাইল, আর তাহার উদ্ভিত্তা গেল। বিভাল মুখে বামাটা চাটিয়া চুটিয়া ফিরায়া গেল। তোতোল বলুক, কিন্তু তাহার মাসীর ঠিক পক্ষের মত চক্ষু নয়। ‘তার মাসী হয় কি না?’ বহে বশঃ সে একথা বলিয়া থাকিবে। আমরা কিন্তু বাহা মতা তাহাই বলিব। তোতে লের মাসির চক্ষু এরূপ পঠিত যে ইচ্ছা করিলেই কন্দিনিকা বুদ্ধিত বা প্রসারিত হয়। স্বাক্ষরে ইহা বিলম্বল প্রসারিত হয়, তখন যেন চক্ষু-হুটা জ্বলিতে থাকে। শীকার করিবার সময় তোতোলের মাসীর ক্রিয়ণ কাণ্ডকাই হয়, ক্রিয়ণ চক্ষুর শোভা হয়, তাহা পরের চিত্র জানিতে পরিদর্শিত হইল। বিভাল, ইহুর প্রভৃতি শীকার পাইলে থানিক দূর তাহাকে লইয়া খেলা করে, তার পর মারিয়া ফেলে। শুনিয়াছি, বাঘেও এইরূপ করিয়া থাকে। বিভাল কিন্তু পাখী পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলে, পাখীকে বিধায় নাহি, সে দৈবাৎ উদ্ভিত্তা বাহিতে পারে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, বিভাল যখন অপর বিভালের সহিত খণ্ডা করে, তখন তুমুল সাংগমে ঠিক বড় প্রবৃত্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে নিত্য মর্মান্বিত রূপ হইলে বোভের যুদ্ধ ঘটয়া থাকে। এরূপ শুনা গিয়াছে যে একবার দুইটা বিভালে খণ্ডা করিয়া উভয়ে উভয়কে কামড়াইয়া একেবারে বাইয়া ফেলিয়াছিল। আবারও বেশে বিলকেনি নামক স্থানে এই ঘটনাটা ঘটয়াছিল। সেখানে দুইটা বিভালে বোরতর যুদ্ধ হয়। সাধারণ রক্তি যুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে মাংগাম এরূপ তুমুল হইয়া উঠে যে, এও বহে হইতে এক খণ্ড মাংস কামড়াইয়া ভক্ষণ করে, ও এর বহে হইতে একখণ্ড মাংস ভক্ষণ করে। এইরূপে পরস্পরে কামড়া-কামড়ি খাওয়া-খাওয়ার চলিতে লাগিল। প্রত্যন্তকমে সেখানকার লোক সব উদ্ভিত্তা দেখিয়া যে, এ-ও-উদ্ভিত্তিক একবারে বাইয়া ফেলিয়াছে, ও এ-বিভালটিকে একবারে বাইয়া ফেলিয়াছে। দুইটা বিভালের চিত্র পর্যন্ত নাই। কেবল মাত্র লোকের একটু একটু ডাণা সেখানে পড়িয়া

৪। তোতোলের মাসী; পাখী ধরিবার চেষ্টায় আছেন।



রহিয়াছে। এই বিভালকে তবুও লোকের আপা-টুকু পড়িয়াছিল, কিন্তু আমাদের দেশে সাপে, সাপে যুদ্ধ হইলে তাহাও থাকে না। সাপ দুইটা যদি সমান-পরাক্রমশালী হয়, আর সমান-দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ করিতে করিতে এও লোকের বিভাল-ভাইনগিরেও বিশেষ লইয়া কতিব। আরম্ভ করে। আস্তে আস্তে গিলিতে গিলিতে, এ গুরে গিলিয়া ফেলে ও এর গিলিয়া ফেলে। বাকি আর কিছুই থাকে না, ধরাধামে কোন সাপটারই চিহ্ন মাত্র থাকে না। নিয়মের মতোও এ রহত দেখিতে পাওয়া যায়। বিষয় লইয়া আলা-লতে মোকদ্দমা করিতে বাইলে, দুই গণকেরই ভাগ্যে এই ঘটনা প্রায়ই ঘটয়া থাকে। যাহা হউক সেকালের যুধুর ধর্ম-মতে বিভাল শয়তানের চেম্বা। যখন বাহাদুরের আশা, ভক্তি কিছু নয়; তাহাদের

কির বিধায় ছিল যে; শয়তান নিজেই বিভালের রূপ ধরিয়া হুড়াগা মহাধাণিকের নরকামিতে ডুবািবার নিমিত্ত ছাত্রাণ পাকচক্র করে। লোকের মন করিবার নিমিত্ত, লোকের শরীরে পীড়া উপস্থিত করিবার নিমিত্ত, লোকের পদ-মুছুরি মারিবার নিমিত্ত বিভাল—ভাইনগিরেও বিশেষ লইয়া কতিব। তাই পূর্বকালে বিলাতের লোকের বিভালের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন। মিসরবাসীদিগের বিনি বেবতা, মিসরবাসীরা বাহার, সেবার জন্ত সর্বস্বান্ত হইত, বিলাতের লোকের সেই বিভালকে অকথা যখন-বিধা মারিয়া ফেলিতেন। জাহাঙ্গীর উপরে বিভাল আমোদ প্রমোদ করিয়া লাফালাফি করিলে, নাগরিকেরা, নিশ্চয় বুঝিত যে অধিলগ্নে তুমুল খড় উদ্ভিত্তা তাহাদিগের জাহাজ ডুবািয়া দিব। তাহা না হইলে দুই বিভালের এর আনন্দ কেন? তাহাদের

না এক ভাবে তাঁহার গম বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই
জনিত পাওয়া যায়। বিড়ালী পরম সুখে স্বয়ং
ভিত্তর বসিয়া আছেন, হৃৎকরের ক্ষিত্র সে আদর নাই,
কিন্তু বহিরে ভিত্তর ঘাইতে পান্দা না, সেই হৃৎকরের
দিন অনাথা মুখাতি হৃৎকরী মনুষ্যমনে ধাবকের
জগৎ বহিরে দিকে চাহিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া
ক্লান্ত হইতে ছিল। তাই বিড়ালী স্বয়ং ভিত্তর
হইতে তাহাকে বলিলেন—

“উপনিষৎ উপর পূরি পড়ে, ভিজিলে যাকে বা।
আমি যেন বাসে আছি মহারাজের মা।”

কুর্তর তখন চুপ করিয়া রহিল। সৈবক্রমে আমা-
দের পরম পুত্রনোয়া বিড়ালীট সেই রাতিতে গৃহ-
স্থের হাড়ি হাওয়া ফেলিয়াছিলেন, কারণ বঙ্গ-মাসের
শরীরে জন্ম সমককরই হইয়া থাকে। এত-মুখ
গৃহস্থের শুভজ্ঞান নাই। সে পরদিন প্রাতঃকালে
ভিত্তরে দ্বিরা বিচালির দীর্ঘা দ্বিরা দ্বিরা বিদায়
করিবার জন্ত টানিয়া লইয়া ঘাইতেছিল। হৃৎকরী
ছাই গোদার উপর বসিয়া আধোপাশ্য সমুদয় রহন্ত
বেঁধিতেছিল। অরশেবে সে বিড়ালীকে স্তম্ভাসা
করিল—

“ক’ল যে বড় তনেছিলাম চাট্যা চাট্যা কথা।
বিচালির দড়ী গলায় দিয়া যাওয়া হুজু কোথা।
বিড়ালী উত্তর করিলেন—

“এখন বস্বে দিয়েছি মন।
তুলসীর মালা গলায় দিয়া যাতি বুলবন।”
মাঝ, মাঝ, সমসারের উপর কি বৈরাগ্য।

শ্রীজৈলোকানাপ মুখোপাধ্যায়।

প্রেমের বিধারা।

“আয় ভাই। কে তোরা নাইদি,
প্রেম-স্বরূপী-জলে, অবলাসি হুহলে,
হে মন প্রাণ মুড়িবি।
পপ-তাণ্ডে জরজর, চিত্তাধিপ ময়র,
ব্যানল কত বাড়াবি।
অয় এ শীতল-বারি, চাণি শিরে অনিবারি,
তাপ কুয়া হাসি এড়াইবি।

হরির করুণা-বলে, হরির চরণতলে,
ইহারও উজ্জব নিরুপন।

কত মত যোগধোয়া, প্রাণপন অস্বাধো,
গর্হ ত্যজে এ তাঁরধন।
এ নবীরও তিন ধারা, হৃৎগমা-হৃৎগমাকারা,
কিন্তু কোন্ করয়ে ধারণ।
অধ-উচ্ছ-মধ্যভাগে, কোণা ধায় কোণা লাগে,
কত বেগে কে করে গণন।

পাতালে যে ধারা চলে, সেহে তারে মনে বলে,
কত বেগে সেই ধারা ধায়।
তারি তেজঃ স্বধাতবা, ভগমল তরু লতা,
মহামায়ে ‘হুম্মে হামায়।

মধ্য ধারা প্রেমমান, মধ্য সন্থী অবিরাম,
যে ধারায় জীবন মুড়ায়।
নিরমল অবিরল, বসন্তের রাসমুখ,
চিত্ত বহে মলয়ের বায়।

উচ্ছ্বাসে কে পরশে, ভক্তিত-চন্দন রসে,
চল চল তরঙ্গ তথায়।
শেবের সন্কার রসে, হৃৎধরবিরে
উজ্জলিয়া দেবার ধায়।

ত্রিধারায় একই নদী, একই গঙ্গা ডাকি যদি,
ত্রিভাষায় হলে উপশম।

একই প্রেম-মান বলে, অবলোকে করতলে,
ধর্ম-অর্থ-কর্ম-সমাগম।

ত্রিধায়া মিলন বলে, কি হৃৎকর সিদ্ধান্ত,
ত্রিমানস তথায় একটে।

বিলু পায় যে অন্তরে, বাতুলে নৃত্য করে,
উজ্জলিয়া হুরিলায় রটে।

আয় ভাই মনে-যদি, পাই সেই হৃৎকরী,
নিরবধি করি আকিঞ্চন।

অভিমান-ঐরাবতে, ভাসায়ে বিধম প্রোভে,
প্রবাহিত তারিতে ভূন।

রক্তভাব পরিহরি, বেহে মাণি অজ ভরি,
রসে করি মনে সমুদয়।

প্রাণ মন মুড়াইবে, শূন্যতা ঘরে যাবে,
পূণ্যভাষে হৃৎগামিন।

শ্রীশ্রীদাদপ্রসাদ স্মৃতিভাষ

বিদ্যাধিনোয়

স্মৃতির বিলাতী-টোল।

মহর সরবরাস। সেয়ে ছেলে পৃথগ্ন উদ্ভূত।

নৃতন স্মৃতির টোল হুহে। ওমা! ভুলেই তানি,
আমাদের ‘নদে’সেই টোলেবী একজন উইচ্যা।
আমিত ভুলে অবাক! কিন্তু দিল এসে আধ-আধ
কবার বলেন কেমন তোমার ত বশেছিলুম, নদীরাম
আমার। তেমন নয়—মামরে তুধের বাবে,—এখন
নদে আমার হিন্দুর চুচামণি। ভুলে বড় খুশী
হলোম।—ছেলে গিলে নাই,—একটি ভায়ে।

বাই হউক, বাপ মা পিণ্ডি পাবে। আমার ত্রী থর
খুশী হইবেই। একটি হিন্দু জন্মাবে পৃথিবীর তার
কমে যায়; পত, পশী, কীট পতঙ্গদি পরিব হয়;—
বলতে বলেন নদীরাম এসে হাজির। প্রাণম করে

পায়ের গুলো নিল বটে, কিন্তু তার চেহারাটা মুক্ত ভাল
লাগল না। পায়ের হরিণের চামড়ার টুটু কটে, পরনের
পোশাক নেই, গায়ের নানাবর্ণী কোট, মাথায় হীরে-
বোঁটার ছাট। মনে করলুম, এ কোন্ দেশী হিন্দুমানী।

নানাবর্ণী, হীরেকণী, হরিণের চামড়া শুক রঙে;
কি ছাট কোট কেন? আমি বড় মুখ-ফেঁদে
মাড়ায়, বললেই কেনুম,—‘নদে! আমার কি কোন চা
ধরচিল?’ এই দিলির কোঁপ কোঁপ, কামা। ত্রীর

গর্জন। আর নেয়ে—‘টান-টান হুহে মামাণো!
হিন্দুধর্মের জন্ত আঁপরি।’—‘মামো! প্রাণ দিবি,
দিবি,—হাটিকোট কেন?’ আমার ত্রী তর্জন-
গর্জনে কুপে বলতে লাগল,—‘বুড় হলে বাবা-বুড়

পর্জনে কুপে বলতে লাগল,—‘বুড় হলে বাবা-বুড়
পর্জনে কুপে বলতে লাগল,—‘বুড় হলে বাবা-বুড়
পর্জনে কুপে বলতে লাগল,—‘বুড় হলে বাবা-বুড়

কিন্তু পরিবারের পৃথগ্ন-গর্জন। বাপে আত্মজ্ঞাতির
এমন বেটাউৎসেও কম। নদে বলল, ‘মামা!
তোমায় পাঞ্জ স্মৃতির টোলে’য়েতে হবে। সেখানে
বড় বড় পিণ্ডি একত্র হবে। যাক্তে আত্মজ্ঞাতির

সন্ধান থাকে, হিন্দুধর্মের মার মার—লোকের হৃৎকর-
গাঠী হয়, টোলের ভাটচাণ্ডা মহাশয়ের। সেই-কার্য
করেন। মুম্বী হিন্দুধর্ম পূণ্যভাষিত হবে।’ একথা
ভুলে আমার মনে বড়ই আনন্দ হ’ল। দিন দিন

টোল ত সব লোপ প্রেতে লাগল, আবার স্মৃতির
টোল। কি আনন্দের বিষয়। নদে বলল, ‘মামা বড়
বাগ’—অয়েলিগটন খোয়ারে জলের কলের কাছে

টিকানা দিলে গেল।—বয়ে ‘মামা’। সন্ধ্যার
পরেই টোল হুহে।

আমি তড়াতড়ি সাংস্কৃত্য দেবেরি টানওয়ে
ক’রে, তথায় উপস্থিত। দিলি বঙ্গবাসি। কিন্তু
টোলের পৃথগ্ন দেখে আমার মাথা টলে গেল;—
একজন কাপালী-ওয়াল, একটা সাহেব, দুটা খান-
ওয়ালার জুটী, আর আধা-কিরিচি আধা-মাহেরে
পরিপূর্ণ। কোথায় যাব সব টেবিল চোয়ার।
স্মৃতির টোল দেখে আমার স্মৃতিতোপে গেরে
গেল; ভাবলেন পালাই; পালাবার কি তা আছে।
হুপাসে, গেরে বসলো। সেহুহাওয়ের চোটে
হাত টাটোরে গেল। কাপালী-ওয়ালী অধ্যাপক
হয়ে বসল। তখন বক্তৃতা শুরু হ’ল।

কাপালীওয়াল হাত মুখ নেড়ে বলতে লাগল,—
ম—‘আমাদের বাবহা।’ আমন-পীড়ি হইবে
ঠায়বপুত্রা কর্তে দেওয়া। কোন মতে উচিত-
নয়। পুত্রায় কর্তে চোয়ার কিংবা ইল থাকা আবশ্যক।

তিনি অর্থোক্তিক কথা কখন ক’রেন না। ধারের
বাড়ীর পুরোহিত নরহই বঙ্গসর বয়সে আমন-পীড়ি
হইয়া ‘বসিয়া বাতোরণ-প্রস্তবন আর্দ্রন-পীড়ি হইয়া
বসিতে, দেওয়া নিত্যন্ত নিরুত্বতা, হুতর। ইহা

সামান্য হইল যে, চোয়ার বা ইলে বসিয়া পুজা
হইবে। মিলে দেখা হউক। যে হুহে অগ্রকাশ
নাই, আমন-পীড়ি হইয়া বসিলে বাতোরণোক্তিক
হইবে। দুটাত্ত—দামের বাড়ীর নরহই ‘বঙ্গবের’

পুরোহিত-দাম্পণ্য অন্তরে বসি, কামি-
পীড়ি হইয়া পুজা করিলে বা পুজা করিতে গিবে,
তাঁহাদের উত্তরেই মাত বঙ্গসর দীপান্তর। কিন্তু

ইহা সন্ধ্যা থাকে যে, মাসিকিওটের সম্মতি-
ব্যতীত এ ইনস্পেক্টর ভিন্ন সেহই তদারক করিতে
পারিলে নয়।

২ম—প্রাতঃস্নান। প্রাতঃস্নান করা কোন মতে
উচিত নয়। বাজুয়েদের বাড়ীর বিমলী কি একশত
দশ বঙ্গসর বয়সে প্রাতঃস্নান করিয়া বাড়ী আসিয়া

দূর-বিস্তার প্রাণ ভাগ করে। ধারা নিবদ্ধ হউক,—
যে হেতুক অগ্রকাশ-নাই যে, প্রাতঃস্নান করিয়া
পুজা দিলো কিয়ের কারণ। ভাগ হইয়াছে, অত-
এই যে প্রাতঃস্নান করিলে বা করিতে বাধ্যতা

দিলে, তাহাদের উত্তরেই চৌধুরবঙ্গসর দীপান্তর।
এ বিষয়ের বিচার মাসিকিওটের নিকট হইবে এবং
ইনস্পেক্টর তদারক করিলে।

৩ম—মোচারবস্তু। দেখা যায়, মোচারবস্তু

বাঁহীয়া চিনিবাস জুতাধারের ওলাওঁটা হইয়াছিল, অতএব তিনি মোচারখটে বাইনেন বা প্রস্তুত করিবেন বা খুঁহিতে সম্মতি দিবেন, তাঁহাদের কঠিন পরিশ্রমেয় মূহিত তিন বৎসর, হরিবপুড়ী। ম্যাথিফ্রেটের নিকট দরবার হইবে। ইনস্পেক্টর তদারক করিবেন।

৪৬—একাদশী। যে হেতুক অগ্রকাশ নাই যে, বিবাহারা মরিয়া থাকে, হুতরাং একাদশী তাহার কাম। অতএব যে একাদশী করবে, তাহার চৌদ্দ বৎসর হীপান্তর হইবে এবং পূর্বে নিয়মে তদারক হইবে।

৪৭—দশমুটার নিকট জুতাশোলাই। যে হেতুক অগ্রকাশ নাই যে, দশমুটার নিকট জুতাশোলাই করাইশে পায়ে ফোড়া হয়—এবং হুতরকার হইবার সম্ভাবনা। প্রমাণ—কৈবর্তদের পূজনবায়ার রালক। তাহার জুতা দশমুটার শোলাই করিয়াছিল। শোলাইয়ের তিন দিন পরেই হুতরকার বেগে প্রাণ যায়। হুতরাং যে দশমুটার নিকট হইতে প্রাণ শোলাই করাইবে বা করিতে অসম্মতি দিবে, তাহাদের উভয়ের দশবৎসর হীপান্তর হইবে। তদারক উপরোক্ত নিয়মে হইবে।

৪৮—অন্তর্জাল। যে হেতুক অগ্রকাশ নাই যে, অন্তর্জাল করিলে নুহা হয়, হুতরাং যে ব্যক্তি অন্তর্জাল করিলে বা অন্তর্জালে মরিবে, তাহাদের ব্যবজ্ঞান হীপান্তর হইবে। তদারক পূর্বোক্ত নিয়মে হইবে।

৪৯—বিদ্যাবান। তনুয়াই আমার হৃৎকম্প হাল—আর ভণিতে পুরিশাম না। যা থাকে কপালে, একদোড়ি।—সোড়ি সোড়ি ॥ নিকটে আমার এক বন্ধু বাটা ছিল, সেখানে উপস্থিত হইলাম। বন্ধু বলিলেন, “একি? এমন অবস্থায় কেন?” আমি বলিলাম, “ভাই! নুন মুরির টোলে গিয়াছিলাম।” আমার বন্ধু হাউ-হাউ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। আমি তাহিলাম এ আমার কি?

বন্ধু বলিলেন,—“ভাই! সর্বশাসন হইবেছে।” ইতিমধ্যে দেখি, একজন জ্ঞানদার পাহারাওয়ালার মার নিয়ে বাবুর লৈকখানায় উপস্থিত। বন্ধু তৎক্ষণাত জ্ঞানদার সাহেবকে আতর্জন করিয়া বদ্বাইলেন। তখন জ্ঞানদার সাহেব, আধা-ধিকি-আধা-বালগারি বসেন, “ইহার ওয়াছে পরজা কি? এ—তা নিজেছে—একটা বাছার নিয়ে—জান জ্ঞান জ্ঞান পাহারাওয়ালার খুব মাল—উরদী, কিছু

দেখেন বাবু।” আজ আট রোপেয়া পাহারাওয়ালার দর; আর বৈশাখ মাস, মার্চি-যুক্তি কি না? শর শর একটা পাহারাওয়ালার কাম আছে। একটা পাহারাওয়ালার আট টাকা নেন—আমার বন্ধু বড় জ্ঞান পাহারাওয়ালারিকে পোনেন। আর একটা বড় পাহারাওয়ালার বেছে নিলেন, আর আট টাকা দিয়ে জ্ঞানদারকে বিদায় করে দিলেন। আমার বন্ধুর পুত্রতান বাসামা, নুন ও শুকুড়িতে তওয়া দিবে, পাহারাওয়ালার সাহেবকে তামাক আনিয়া দিল; জ্ঞানদার ভিগেতে হাটো-পান আনিয়া দিল। আমার বন্ধু তর্জনে গর্জন করিয়া বলিলেন,—“জলখাবার কই?” বাসামা বলিল,—“মাতা কুরুশ নিজে প্রস্তুত করেছেন।” আমার বন্ধু গলগল দী-রুতরাসে বলিলেন,—“জলখাবার ত আনিবেছে, জল-রুটা বানাইবে কি পুরীওটা আনাইব?” পাহারাওয়ালার সাহেব হাটো-পান চিবাইতে চিবাইতে, শুকুড়ি টানিতে টানিতে বলিলেন,—“দুখী, দুখী, রাবুড়ী, আগর ইমুলি—বালগারি বেগোকে তেঁতুল বলে।” আমার বন্ধু বলিলেন,—“যে আছে।”

আমি তাহিলাম, আমার বন্ধু খেগিগায়ে। আমি বলিলাম,—“ওহে চাটোছে। এ ব্যাপারখানী কি?” আমার বন্ধু বলিলেন,—“তুপ! সর্বশাসন না।—জেনেওনে কি জিজ্ঞাসা করছ?” আমি উত্তর করিলাম,—“আমিত কিছুই জানি না। আমি অসমত-নোপোলে পদপতিনাৎ দর্শন-বর্তে গিয়াছিলাম, সবে কাল আসিয়াছি।” আমার বন্ধু বলিলেন,—“ভাই! আইন পাশ হইয়াছে।” “এ কি আইন হে। যে, জামাই-আলরে পাহারাওয়ালার খাওয়াইতে হয়?” তখন আমার বন্ধু বলিলেন,—“খাওয়াইতে হইবে কি?—জামায়ের সঙ্গে শোয়াইতে হইবে।” এবার নিশ্চয় করিলাম,—আমার বন্ধুর মস্তিক বিকল হইয়াছে। আমি বলিলাম,—“ভাই! পাহারাওয়ালার খাবার, তা জোড়াক করি-তেছে, নিজের কিছু ভাব, চিনিবাস। জোড়াক আছে ত?” আমার বন্ধু বলিলেন,—“তোমার দরকার? এখনও কিছু বুঝিতে পার নাই?” আমি বলিলাম,—“সোহাই ভাই! আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।” আমার বন্ধু বলিলেন,—“আমার কভার রয়স এগার বৎসর এগার মাস ২৮ দিন। এই দিন-আটকে বিবাহ হইয়াছে। আজ যোড়ে জামাইকে আনিয়াছি তাই পাহারাওয়ালার দরকার।” আমার আর সখিল না।—

আমি বলিলাম,—“তুমি জামায়ের সঙ্গে পাহারাওয়ালারকে শোয়াইবে নাকি?” আমার বন্ধু বলিলেন,—“হী। আমি বলিলাম,—“এইবার বুঝিয়াছি।” তাহিলাম,—“কি সর্বশাসন। আমার বন্ধু কি একে-বারে জ্ঞানদার হইয়াছেন?” আমার মনোভাব বন্ধু বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—“দেখছি, তুমি কিছুই বোঝা নাই।” কোনকরবে এই সর্বশাসনে কথা রসে,—“তুমি হিন্দু কিসেরে বুঝিতে পারিবে যে, বার বৎসরের পূর্বের কভার পড়ি হইলে জামাতা হীপান্তর—বাইবে,—বার বৎসর পূর্বের পূর্ভাধান-সংস্কার হইবে?” আমার কভার বয়স ১১ বৎসর ১১ মাস ২৮ দিন আর ছুই দিন হইলেই বার বৎসর পরিপূর্ণ হয়। শুভদিনে জামাই যোড়ে আনিয়াছি; আজ যদি বি-জামাই একধর জতে। দুই, আর পাহারাওয়ালার যে বর না থাকে, তাহা হইলে জামাই হীপান্তর।” তাহিলাম আমার বন্ধুর মস্তিক বিকল হইয়াছে। এইবার তখন পাহারাওয়ালার সাহেব শুকুড়ি টানিতে টানিতে রসে,—“বাবু! আশনার শোস্ত সব বর্ণকে, সাহেব গোচ দেখলো যে, জামাই লোক বড় ঝাড়াপ আছে। এমনিগুড়ো জামাইকে সাত বড় ঝাড়াপ আছে। এমনিগুড়ো জামাইকে সাত ভতে দিল,—বদমাইনী না করে, মূর্খক অয়রণ না যায়।” তখন আমার বন্ধু নুন আনি বদ্বাইলেন, আমি জগদীশ্বরকে মন্ত্রণ করিয়া বলিলাম,—“মাগো জন্মভূমি। তোমার মন্ত্রণে এত সয়।” বন্ধু এই বলিয়া আমার গলা ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র।

পীত-বসন ধর-বারিঙ্গ-নয়ন,
হৃদ-বধন ধন-নিমক-বরণ।
অমর-পদ্মারি-কুন্তল-ভার,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ১
মৃত-গোবর্ধন বঙ্কিত-ধেনে,
কর-পরিবর্তিত-মোহন-মোহে।
বিবিক্ত-মুগ্ধ-ভিন চিত্ত-বিহার,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ২
অপলুত-পোষণ-পরিবেশ,
কৈতব-বিরহিত-ভক্তি-জোয়।

কণ্ঠ-বিলম্বিত-বনমূল-হার,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ৩
কালিঙ্গ-পার্ক-কন-কৃত-নন্দন,
মর্দিত-রিপু-মূল শান্তি-নিধান।
মৃগ-কলপের নিমিত্ত-মার,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ৪
গোধন চারণ গোপশিষ্টক সহ,
রাধা-রাধিত-চরণ-সরোজহ।
শ্রীকৃষ্ণন-নিত্যবিহার,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ৫
রাধা-কৃষ্ণপুত-ভাব-বিকার,
কুটুম্ব-মাস-চাক-হুহার।
গোপী-সহ-কৃত-রাস-বিহার,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ৬
মৌলি-রচিত-শিখি-পুঙ্খপীড়,
শমিত-বিভাজন-কমোদপীড়।
চরিত-সম্পদ-সৌরভ-সঙ্গ,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ৭
সংস্কৃত-পুতন কংস-বিনাশ,
বহু শুভকর সাহ-হুতায়।
হৃদ-ন-বন্ধিত সৈন্ত-বিহার,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ৮
দীর্ঘললিত শরী লম্বন ধূট,
রত্ন-বস শেখর কাম-বিশট।
মেঘ-মধুর-কুঞ্জ-বিহার,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ৯
পদম-হৃদাংশন ভীতি-বিদূর,
গোপ-ময়িক-গণ-বাহুভ-পুর।
ক্রীত-গুণ-শোভিত-কুণ্ডল-ভার,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ১০
গোপী-গুণ-গুহ-চোরিত-গব্য,
ক্রু-জন-নয়ন-বিরোচন নধ্য।
ভকু-হৃদয়-ধন নৌজাকর,
জয় জয় হৃদয় নন্দ-সুমার। ১১
নিধিল-গুণাকর সর্গদাতা,
অহুত-মোহন-দূরিত-বাহ।
কৃষ্ণ মে সংস্কৃত-তাপ-শিতার-
মতি করুণায় নন্দ-সুমার। ১২

শিবজী ও শম্ভুজী।

(মহারাজা ইতিহাস হইতে সংগৃহীত)

ক্রেণ অধাব্যায় ও সাহসের সহিত শিবজী সামন্ত অথবা হইতে আপনাকে মহোত্তর করিয়া দিচ্ছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তিনি মহাপ্রতাপশালী মোঘলের মহাশয়-প্রতাপের সময়, হুবিশাল মহারাজার কাণ্ডে বশীভূত করিয়া যখন তাহার অধিপতি হইয়াছিলেন। শিবজী কোন-ও এরূপ অভুলনীয় কাণ্ডেতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অনেক ইতিহাসলেখকই তাহার বিচার করিতে প্রয়াস পাঠাচ্ছেন। তথাপি আক্ষেপের বিষয় এই যে, হেঁচকে নির্দোষরূপে সেবিষয় মত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। বরং তাহার চরিত্রকে আরাধিত হইতেকে ঐতিক্রিয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে কান্ড, কথা কথিয়াছিলেন, তাহা পক্ষপাতপূর্ণ ও ভ্রান্ত। কিন্তু তাহা এত সংশ্লিষ্ট যে, তাহাতে শিবজীর চরিত্রকে কেবল একদমশত্রু রূপিত হইয়াছে। শিবজীর মৃত্যুর পর আরাঞ্জীর বলিয়াছিলেন, 'শিবজী একজন উচ্চশ্রেণীর সেনানায়ক। আমি যে সময় ভারতবর্ষের প্রচৌর রাজা সুলতান করিমর জয় দুই বছর করিতেছি, সেই সময় সেই ভারতে এক নতুন রাজ্য স্থাপন—কেবল এক শিবজীরই সহজে সাধিত হইতে পারিয়াছিল। আমির চেন্ডেরা উনবিংশতি বৎসর ধরিয়৷ ক্রমশঃ তাঁহার দমনের চেষ্টা পাইয়াছে, তথাপি তাঁহার রাজ্য ক্রমশঃই বাড়িয়াছে।' আরাঞ্জীরের সন্দেহা সেনাপতি, শিবজী সন্তকে অশ্বপুত্রক বিস্তারিত বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাও অস্বাভাবিক ও নিষ্পক্ষপাত হইবেও অসম্পূর্ণ। তাঁহার মত এই, 'শিবজী যুদ্ধে আমরক, রাজ্য, শাসনকার্যে দক্ষ, সাধু এবং ধর্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তির বহু ছিলেন।' তিনি বিজয়নার সহিত উদ্ভেদ স্থির করিতেন এবং দৃঢ়তার সহিত তাহা সম্পন্ন করিতেন। সন্তস্ত বিষয় মাঝেই বহুদূর পর্যন্ত তিনি পরামর্শ গ্রহণতেন এবং মনে মনে বিশেষ আলোচনা করিয়া, যে পরামর্শটা তাঁহার কার্য-সাধনের সর্বোৎকৃষ্টভাবে উপযোগী, সেইটাই গ্রহণ করিতেন। তাঁহার গুণ অভিশ্রুয় সঙ্গ, কল্পশ্রম হইলে পর, লোকে জানিতে পারিত; পূর্বে পারিত

না। বৈদেশিক ইতিহাস-চরিত্রাণে তাহাতে এই অংশকা গোপন ভাষাই অধিক দেখিয়াছেন। তাঁহার বুলত বসেন,—শিবজী বৃত্ত, প্রবন্ধক, নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। ধর্ম-বিষয়ে তাঁহার ধ্যান ক্রমাগতের আশ্রয় ছিল। নিত্যক শৃংখল উদ্ভেদক-সাধন বিষয়েও শিবজী, সেনা ভবনাকে আপনাকে মহান মনে করিতেন। প্রায় যুদ্ধ অপেক্ষা গুপ্ত-হত্যা ধর্ম শত্রু নিন্দন করা শিবজীর অধিক পছন্দীয় ছিল। পরাজিত বন্দীদের উপর তিনি ক্রিয়পরমায়ণে সদায় হইলেনও যদি বুঝিতেন যে, কেহ বীর হন লুকাইয়া দারিদ্ৰ্যের ভাণ করিতেছে, তাহা হইলে তাহার উপর কোন প্রকার নিষ্ঠুরতাই বাকী রাখিতেন না; গণের মধ্যে তাঁহার অশো-কিচ্ছা মাস্থ ছিল। এমন কোন বিপদ ছিল না, যাহাতে পতিত হইয়া শিবজী প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করিতে বিলম্ব করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ইয়ত্তা ছিল না। সু-পরিচয় তিনি য-পূত্র ছিলেন এবং য-পুত্রের য-পিতা ছিলেন।

যাহা হইলে বৈদেশিক ইতিহাস-লেখকগণ গ্রাহক-দেখাবে দেখিয়াছেন, আমরা সেভাবে তাহাকে দেখিতে পারি না। সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া মোঘলরাজ আশ্রয় অতুষ্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। আরব সাগরের উপকূলস্থ ইরোশিয়ান-পথ আশ্রয় উদ্ভব হইয়া ক্রমশঃ বশীভূত করিতেছেন। আবিদীয় দিল্লী-জাতীয়রা কখনো অত্যন্ত দুর্বল হইয়া অবস্থিত করিতেছেন। মানসী মারাজের প্রধান শাখা বিজাপুর-সাল্লা ভবনও দক্ষিণপাতে দারুণ ও প্রতাপের সহিত বর্তমান রহিয়াছে। চতুর্দিক এইরূপ প্রভুত ও প্রতিকূল জাতিগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়াও, শিবজী কিপ্রকারে একাকী এক মারাজত রাজ্যের স্বাধীনতা হইয়াছিলেন, সে বহুত তেজ, কল্য হ্রাসনা। শিবজী যিৎ কেবল দান্যভিগাণী ও রাজ্যভিগাণী হইতেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানের আত্মকর্তৃত্ব করিতেন ও তাহাদের বশীভূত হইতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বিপরীতই করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে তাঁহার আরাঞ্জীরের প্রিয়পাত্র হইবার বড়ই যত্না হইয়া ছিল। আরাঞ্জীর দক্ষিণোক্ত অবস্থান-কালে যখন শিবজী বীরত্বের কথা কর্ণপোতের করিলেন, তখনই তিনি পিতৃদেহাসন অধিকারোপলব্ধে যে ঘোর জাতবিবাদ কখনা করিতেছিলেন, তাহাতে শিবজীকে

প্রধান মহায় করিবার মানসে এক আশাশ্রম পত্র প্রেরণ করেন। শিবজী তখন 'পুনায়' অবস্থিত করিতেছিলেন; তিনি মাহাদী-পুরের পত্রাবান পাইয়া একটা ক্ষুদ্রের সমস্ত বৈধিা গিয়া দান-বাসীদেয় সমুদয়ে ছাড়িয়া দিলেন। এই বিজয় আরাঞ্জীর যাবজ্জীবন ভূগিতে না পারিলেনও তাঁহার কিছুই মনে পড়েন নাই। বরং পুনঃপুনঃ শিবজীর নিমিত্ত তাহাকে বিজয় ও আপনান সহ করিতে হইয়াছে এবং বাবারায়ে মানস-সম্মানার্থে খাছ আহার শিবজী অনেকবার পর্যাপ্ত গুণের সহিত উপভোগ করিয়াছিলেন। কলঙ্ক, শিবজী মুসলমানের পরম বিদ্বেষী। মুসলমানের হৃৎ শিবজীর হৃৎষের উৎস-স্বরূপ। বৃত্ত, প্রবন্ধক, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তহত্যাকারী শিবজী ছিলেন বটে, কিন্তু কেবল বিধি-সমুদয়ে, কারণ এই সঙ্কট-প্রতি বিধিপন্থক বহুসংখ্যক ছিল, হতবাক হইবার মধ্যে একা শিবজীরা না থাকিলে চলিলে কেন? যাহা হউক, আমরা দেখাইলাম, শিবজী কেবল দন-বা-রাজ্য চাহিতেন না। কেহ বলিতে পারেন যে, তিনি আশ্রয়কার জয় ভিত্তি ধারণ করিতেন। তাহাও হইতে পারে না, কারণ আশ্রয়লগ্নাভি যদি শিবজীর উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহার বৈর-দুর্ভাগী আশ্রয়ের ভাণ অসম্ভবী হইত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার বৈর জয় হইতে মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সমান। চিত্তেরের রাণীকরণের ভাণ, মন্ত্রী রাজ-বন্দী রাখার প্রবন্ধকে, তাঁহার বীরকার্যকলাপের উদ্দেশ্য মনে করা যাইতে পারে না। কারণ তিনি উক্ত রাণীকরণ-সম্ভূত হইলও এক কতি-মাথা সমুদগম ও পুরুষহত্যকম তাঁহার পিতৃকুল চাকরী-ব্যবসারী ও ভিন্ন-সেনাপতী ছিলেন। তাঁহার পিতা বাহাজীর সামান্য মাত্র বিষয় ছিল। তাহাতেও শিবজী অধিকারী ছিলেন না; কারণ মাহাজী, শিবজীর বিমাতা ও তামারজাত পুত্র অম্বজীরই পক্ষপাতী ছিলেন।

শিবজী যেতখন মহৎ হইয়াছিলেন, তাহা আর কিছুই নহে, পতীর স্বজাতি-প্রেম। এই প্রেমাসক্ত তাঁহার আশ্রয় রায়মান-স্বরূপ ছিল। এই অনুভব-বলেই, জয়-কর-কল্যাণ হইলেনও, তাঁহার বিশাল জায় অবসর হইত না, যেসব অক্ষমদ টুনাতেই তাঁহার প্রথম বুদ্ধি রতনই তিনিরাবৃত্ত হয় নাই এবং পতনোদ্ধার বজ্র হইতে অব্যাহত হইবার কৌশলও তাঁহার নন্দনগর্ভনং হইয়া উঠিত। তাঁহার

সমস্ত কার্যে, সমস্ত থাকে, যুদ্ধে, সন্ধিতে—সকল সময়েই স্বদেশ-বাংসানের বিমল জ্যোতিঃ স্তব্ধ হইতে ছুটিয়া বাহির হইত। জনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার চতুর্দশ অপরিস্রব জীবনী দীপ্তিতে সত্যত উজ্জ্বলিত থাকিত। বালাকাল হইতে তিনি মাতঃক-শাস্ত্রভক্ত; তিনি রায়মণ ও মহাভারতের কাহিনী জনিতে অসুন্দর ছিলেন। পিতা তাঁহার প্রতি-কুল হইলেনও, তিনি তাঁহার প্রিয়কারী ছিলেন এবং পুত্র বা যুদ্ধপন বিদ্যারী হইলেনও, বিরোধ পরিত্যাগ মাঝেই তিনি তাহা করিতেন। আভ্যন্তরীণ গৌল-যোগে তিনি মহাপুরুষের ভাণ সহ করিতেন। কারণ তাঁহার মানস, দুইক-স্বরূপ—একমাত্র উদ্দেশ্য—স্বজাতিবৈর পরাশ্রয় হইতে মুক্ত করা—কর্তৃক আরও হইয়া আর মনস ছিক ভুলিয়া গিয়াছিল। উৎসাহ, তাঁহার বাসন, বিলাস কিছুই ছিল না। উৎসাহ, পরিভ্রম ও প্রিয়ময়ন্য তদুপরি দ্বারা তাঁহার আশ্রয়-শক্তি অব্যাহত ছিল। স্বর্ধাভিহরণ ও স্বজাতি-প্রীতি অত্যাশ্রয় এবং থাকতেই কইচারী ও সেনা-বর্ধক বশীভূত রাধিবার জয় তাহাকে প্রচুরের সহিত কষ্টেরতা এয়াগে আশ্রয় মনে করিতে হয় নাই। কর্তব্য কর্মে ক্রটি করিলে তিনি তাহাখিনিতে উক্ত সংখ্যক যরণ করিয়া গিয়া উৎসাহিত করিতেন। এমন দ্রি, তিনি অনেক শত্রুকে এই শুদায় বীভূত করিয়াছেন। মোঘলপক্ষীয়-চৌধুরী রাজা জায়সিংহের স্তব্ধ তিনি মাতৃকুল-বিদ্বেষনা করণই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এবং অনেকই মনে করেন যে, জয়সিংহের পুত্র রায়সিংহ-আহমদুল্লা না করিলে তিনি দিল্লীতে আরাঞ্জীরের দস্তী হইতে কখনই পলায়ন করিতে পারিতেন না।

এই সকল গুণ ব্যতীত শিবজীর আশ্রয় অনেক-গুণ ছিল। তিনি সচিব ও সেনাপতিগণের সহিত প্রামুখ্যচিত্তে মিলিত হইতেন। ভ্রাতা ও দক্ষিণোক্ত ইচ্ছা ছিল না। পরাজিত শত্রুর নগর প্রায় উৎসাদ করিয়া তাহাদের নিমন্ত্রণ প্রজ্ঞাপনের বর্তপাত করিয়া তিনি কখনই পায়দ-স্বত্বের পরিচয় দেন নাই। তাঁহার সুরকার্যে বায়ুলীলতা বোম্বাইয়ের ছায় অবসর হইত না, যেসব অক্ষমদ টুনাতেই তাঁহার প্রথম বুদ্ধি রতনই তিনিরাবৃত্ত হয় নাই এবং পতনোদ্ধার বজ্র হইতে অব্যাহত হইবার কৌশলও তাঁহার নন্দনগর্ভনং হইয়া উঠিত। তাঁহার

বৈদেশিক ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে কেবল এলফিনষ্টোন যাহা শিবজীর মহাত্মা বৃত্তিতে

সমূহের মধ্যে দশতী গঙ্গার উত্তর ও পূর্বদিকে অবস্থিত এবং অবশিষ্ট নয়তী উক্ত নদীর ব-দীপের নদীভাঙ্গারে প্রসারিত। পরকার সাত্যনী, শোকাংক নয়তী বিভাগস্থলের অন্তর্গত। ভাগীরথীর পশ্চিম-দিকে—ভাগীরথী এবং সরস্বতী স্রোতস্তরায়ের মধ্যস্থিত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড—উত্তরিয়া সরকারের অতি অসামান্য মাত্রায় সংযুক্ত ছিল। অত্যানয়ে চক্ষিণ পরগণা, নদীয়া বিভাগের পশ্চিমাংশ, ময়ূ-সিন্দাবাদী বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ; এবং দক্ষিণে জয়গড় হাকিমের নিয়ন্ত্রণাধীন পণ্ডিত লইয়া সাত্যনী সরকারের তুল্যাম ছিল।

দশতী নদীর উত্তর-পূর্বাংশে দেখে ক্রোড়ারিক সাত্যনী বা সপ্তগ্রাম অবস্থিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে সপ্তগ্রাম বাসায় রাজকীয় প্রবাসের পদাভি-পিক। রোমায়ণ, এই স্থানকে গায়োদ-ক্রেয়ীয়া নামে অভিহিত করিতেন। অতীত প্রাচীন কাল হইতে গ্রীক ও রোমীয়, এবং অসংখ্যক আনিক সময়ে পূঁই-পিত্ত প্রভৃতি অস্বাস্থ্য রোগের পীড়িত হইয়া সপ্তগ্রামের সহিত বাসিতব্য ব্যবসায়ের সম্মিলিত ছিলেন।

ক্রোড়ারিক সরস্বতী পুরাকালবধি প্রবাহ করিয়া বহু বহু শতাব্দীকাল পর্যন্ত কান-কলনানে প্রবাহিত হইয়া ইক্ৰবাশালিনী—সৌখমালা-মণ্ডিতা মহানদীর সপ্তগ্রামের পূর্ব-প্রকাননকার্যে মিলিতা ছিলেন। কিন্তু জলপ্রপাত-বিভাজিত গোলাই এবং বাণি-কর্তুক উক্ত নদীপতি পূর্ণ হইতে থাকে। এই-রূপে গোপস্বতীতীরে বোহায়ে সরস্বতী নদীপতি ভরাট হইয়া আসা প্রবৃত্ত সপ্তগ্রামের পতন আরম্ভ হয়। পূর্বে জলজোতঃ সপ্তগ্রাম হইতেই দক্ষিণাভিমুখে সরস্বতীপথে প্রবাহিত হইয়া, কলনিপিত্ত স্রোতঃ সম্মিলিত হইত। ত্রিকূট ভোলানাং চন্দ্র তাহার জলধরস্রোতঃ নিখারিছেন কে, পুরাণকালে জাহ্নবী স্রোতঃ সপ্তগ্রাম হইয়া জাহ্নবীর নিকট বসিয়া বহিত হইত। হটরসাহেব বলেন, পূর্বকালে সরস্বতীর একটি শাখা আম্ভার দক্ষিণে দক্ষিণে নদের সহিত সংযুক্ত হয় এবং প্রধান স্রোতটি বোতোকিনিক উদ্যানের কিকিরিয়ে শাখায় গামের নিকটে ভাগীরথীর মিশ্র-সিল্পিত হয়। সরস্বতী এক সময়ে অতীত বিশালপথে ও পরজন্মশালিনী ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা শীর্ণকার (খালমাজে) ও কাঁধ-স্রোতঃ-পরিণত হইয়াছে। এখন দেখিতে পাওয়া যায় ভাগীরথী-স্রোতঃ দ্বন্দ্বী প্রভৃতি হইয়া প্রবাহিত। পূর্বে কাল এই সরকার

স্রোতস্তরায় সপ্তগ্রামপদ-বিনোদ করিয়া আনন্দপূর্ণ, আমৃত্যু, আনন্দ এবং তমোমুক্ত প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিয়া জীমকপদ্রোমে বহমান ছিল। যুরোপীয় লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত স্রোতকে 'সাত্যারিয়ার' (নদী) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ সরস্বতী নদীর কাণ্ড হুহং বর্ধক প্রবৃত্ত এবং সপ্তগ্রাম তৎকালে অতীত প্রবৃত্ত-নামা ছিবা বলিয়া উক্ত লেখকগণ বহমান নদীকে এই নামে অভিহিত করিয়া থাকিলেন। সরস্বতীর নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া জননিবি পণ্ডিত তাৎ-কালিক জাহ্নবী-স্রোতকে ভাগীরথী কহিত এবং ঐ সময়ে তদনী-স্রোতও বিভিন্ন পথাবলম্বনে প্রবাহিত হইত। ভাগীরথীর তাৎকালিক স্রোতঃ-পথের মধ্যে আমাণিগের ও প্রবন্ধের বিশেষ সম্ভব না থাকায় উক্ত বিষয়ের আলোচনা সম্ভবতঃ বলিয়া-এখানে পরিত্যক্ত হইল। কলে সরস্বতী যে প্রাচীন বাসায়ার একটি হুহং এবং প্রবিন্দ্যনাম স্রোতঃখিনী ছিল, সে বিষয়ে অসম্ভব মনেই নাই; এবং তৎসমুদ্রে তুরি তুরি প্রবান প্রাপ পাওয়া যায়। স্রোতঃপরিভ্রাতঃ সরস্বতীপতি বনন করিয়া সময়ে সময়ে অনেক নৌকাভাঙ্গার জীব তরুণ, শূন্যনাদি এমন কি মৃতিকার বহু মিল্লতঃ, হইতে বহু বহু অশ্বতীতরী মাঙ্গলেরও ভ্রম্যবশেষ সমুহ উল্লেখিত হইয়াছে।

কালের কটোর পরিবর্তন বশবর্তী হইয়া সপ্তগ্রাম আনিক ময়রুমে নিম্নতঃ বলিলে অস্বাক্ষি হয় না। এক্ষণে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ যাতীত সপ্তগ্রামেই পূর্বকালীন প্রবর্তা এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ-প্রকানন করে-এক প্রাণ বিশেষ কোন চিত্র পল্লিত হয় না। একবিন জনগণ যে স্থান বর্নন-লাগায়ার রাখিল হইত—দক্ষিণে—আনন্দক শাখাও জান করিল, আজ সেই স্থানেই নাম পণ্ডিত যেন ধরাম হইতে বিস্ময়প্রায়, কেবল উহার মুখি উইহাসিক পাঠকগণের মস্তিষ্কে অবস্থিত রহি-রাহিত। কেহই আর ভ্রমেও এখন সপ্তগ্রামে পদার্পণ করেন না, তবে কোন গবেষণাপ্রায় ব্যক্তি অনুসন্ধিষ্ট হইয়া অথবা কোন কল্মকারী কো-হ-লুপ্তি চরিতাকর্ষণ মনসে কড়াচিৎ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকিল।

উপর যে মন্দিরটির কথা উল্লিখিত হই-য়াছে, অসংখ্যক এত, রুকমান-সাহেব তৎসমুদ্রে একরূপে নির্ধারিতঃ—'নিম-বঙ্গের প্রাচীন রাজ-

ধানীর প্রাচীনস্থের চিত্রবরূপ কেবল মাত্র এই মন্দির এবং উহার সান্নিধ্যে 'কয়েকটি সামান্য সমাধি-গণ্ড' মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। মন্দির-গাও-সান্নিধি শিলাখণ্ডে ফোটিত আছে যে, সৈয়দ ফকর-উদ্দীন, কাশিমান-সমুদ্রোৎসবকর্তা স্বাম্ভা-নগর হইতে এতদগণের আগমন করেন। ঐ মন্দিরকে প্রাচীর-তলু মুদ্রকার ইষ্টক দ্বারা প্রথিত এবং ঐ প্রাকার-নিচয়ের গায়ের আভ্যন্তরীণ বহিঃপ্রদেশ আরবীর প্রণালীর কারুকার্যে সুন্দর-রূপে অলঙ্কৃত। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রাচীরেই একটি বৃহৎ মিহরাব (হুল্লী) আছে, উহা দেখিতে অতীত হুদুদু। কিন্তু পশ্চিম প্রাচীরের উপরি-ভাগ ভগ্ন হইয়া পতিত হওয়া বশত মন্দির-মধ্যবর্তী স্থানের অঙ্কুর প্রস্তর এবং বাগিচা পশ্চিম হইয়া রহিয়াছে। ফলে পূর্বকাল পশ্চিম-দিকের কাংশ পরিদৃশমান হয় না। উহার বিশাল তলি-এবং কলম (পল্লু) পাঠান-জাতির পদবী-গু-নির্দ্বন্দ্ব-প্রণালী অস্বাভাব্যে বিনির্মিত। মন্দিরভাঙ্গুরে প্রবেশ করিত হইলে ভিতরের দিকে প্রত্যেক দ্বারের শীর্ষদেশে একটি করিয়া অঙ্কুরাকৃতি কারু-কার্য আঁকত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের বহিঃপ্রদেশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সান্নিধ্যে একটি প্রাচীর-পরিবেষ্টিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়; উহার মধ্যে তিনতী সমাধি-গণ্ড ও গুপ্তায়াম রহিয়াছে। কথিত আছে,—ঐ গোরহান-জয়ের নিয়ে সৈয়দ ফকর উদ্দীন; তাহার সহধর্মিণী এবং যোদ্ধার দেহাধি-গুলি সমাধিভূত, যে প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে। হুটী দীর্ঘাকৃতি স্কন্ধবৎ প্রস্তরও, ঐ বেষ্টিত প্রাচীরভাঙ্গুরের উত্তর-প্রাচীর-গার হইতে চতুঃ-ভায়ে সংযুক্ত। আর একটি ঐ জাতীয় চতুঃকোণ শিলা-খণ্ড—ঐ প্রাচীরভাঙ্গুরে সংলগ্ন; কিন্তু ভূতীয়া বশত উহার মধ্যস্থল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত স্থানে প্রাচীরে এরূপ একটি ছিদ্র হইয়াছে যে, একদা তাহার মধ্যে সৈমিত্তিক প্রভলিত দীপ রঞ্চিত হইয়া থাকে। যে প্রস্তরখণ্ড-নিচয়ের কাণ্ড উৎসেপন করা হইল, উহাতে পারত-ভায়াং লেখা খোদিত রহিয়াছে; কিন্তু উহার সহিত কথিত সমাধি-মন্দিরের কোন সংলগ্ন নাই। ঐ তলি বেষ্টিতস্থানের মধ্যে বেকসল আলীন, তাহা নির্বাক করা হুকটান। এই তিনতী খোদিত প্রস্তর

খণ্ড কোন একটি বাহুরের লইয়া দ্বিগুণ রক্ষা করা নিত্যতঃ প্রয়োজনীয়। যে সময়ে সপ্তগ্রাম এবং জিরেপিয়া রাজকীয় প্রাসাদ-সমুদ্র ভগ্নপ্রায় হয়, সম্ভবতঃ সেই সময়ে কোন ধর্মপুত্রায়ণ ব্যক্তি কর্তৃক ঐ খোদিত প্রস্তর খণ্ডের এই খাঁর স্থানে সময়ে সংরক্ষিত হইয়া থাকিলে। ফলে অনেক-তলি খোদিত শিলাখণ্ড জালের দ্বারা মন্দির ও সমাধি-মন্দিরের দীপাভাঙ্গুরে অথবা ফকর-উদ্দীন-কৃত বেষ্টিত মধ্য, হয় স্থাপিত কিংবা প্রাকৃতিক দেহে সংলগ্নতায় পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উহারা ঐ মন্দির এবং সমাধি-স্থান-নিচয় এক প্রকার বাহুরের পরিণত হইয়াছে। ফকর উদ্দীনের, সমাধি-মন্দির-পাঠেও এক স্থানি প্রস্তর সংলগ্ন আছে। উহাতে বাহা লিখিত হইয়াছিল, 'তাহা' এরূপ অস্বাক্ষি যে, উহা পাঠ করা হুকটান। কিন্তু স্থাপতি ঐ লেখাচিত্র সমস্তে মুকুতিত হইত, তাহা হইলে কোম হুই উহা পাঠ করা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারিত।

শিখরীয়া নামক শৈলেন্দর সমুদ্রকর্তী অনতিদূরে দশ বার স্থানি পশ্চিম-দিক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কটীর সমষ্টিগির পদীগ্রামই আনন্দিক সাত্যনী। গ্রাউন্ড বোডের নিকট একটি শুভ্রতর শীর্ষাকৃতি পরিদৃশমান হইতেছে,—এককালে উহা অতুল ইক্ৰবাশালিনী এবং অতীত হুদুদু রাজস্বাসাদের শোভা সম্পাদন করিত।

মাহমুদার রাজত্বকালে গোঁড়, হুর্বাগ্রাম এবং সপ্তগ্রাম প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে উক্ত নৃপতি কর্তৃক সঙ্কল্পিত নিশ্চিহ্নিত হই। নিশ্চিন-কালে প্রস্তরে ফোটিত লিপিসমূহ ঐ সকল মন্দির-পাঠে সংযোজিত হইয়াছিল। যদিও এক্ষণে ঐ মন্দিরভাঙ্গুরে কেবল ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি কথিত প্রস্তর-লিপিসমূহ নিম্নেই হয় নাই। ঐ প্রস্তরলিপি-গুলি সম্ভবতঃ অতীত হুদুদু আরব্য অক্ষরে খোদিত। সপ্তগ্রামে যে ফোটিত শিলাখণ্ড বাণি দ্বারা হওয়া গিয়াছে, সামান্যতঃ তাহার অবিকল অনুবর্তী পাঠকগণের অবগতির জ্ঞা আমনি নিয়ে মিলিয়ে কল্পনাম।

'সূর্যশর্মিণী' লিপ্যন্তর ইঙ্গলবলেন, নিম্নেই এই সকল লোক স্মরণীয় মন্দির নির্মাণ করিল, দ্বিগুণা দ্বৈব এবং শেখর-সৌন্দর্য্যে বহমান রাবীন, এবং প্রাচীন সাধারণ করেন, তখন দশ প্রধান প্রধান, এবং দ্বৈব যাতীত কাহারও ভয়ে

ভীত হন না। তাঁহারাই কেবল, বোধ হয়, সেই শ্রেণীভুক্ত যে খেতিয়ক ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের ইচ্ছামুতাবে পচারিত হন। ঈশ্বর বলেন,—
 “তাহার পোষ্য চতুর্দিকে বিভাজিত হইল, এবং তিনি মুক্ত হইতে সকলের উপকার করেন, তিনি কত দূরত্ব রূপে বলেন “অরুণ্ডই বাসতি।
 ঈশ্বরের আধিকার-ভূত, আরা মাতার মনুষ্যপাত হইও না।” মহাদম বলেন,—“ঈশ্বরের মঙ্গলদিগের উপর সারকিত হইক,— তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার জন্ত রসমের বর্গে একটা বাটী নির্মাণ করিয়া দেন।”
 * * * তিনি দয়াময়ের সাধ্য প্রাপ্ত হন, তাহার * * * প্রমাণ ও সামান্য দায়ী, ইন্দ্র-
 ও মনুষ্যমানের সাহায্যে, নগির-উদ্-দুনিয়া জাভিন আলুল মজাকফর (মহাদম)। সাহ, রাজা,—ঈশ্বর তাহার দায়ী ও রাশাদান ট্রাস্টারী করুন, এবং তাহার অবস্থার উন্নতি করুন। মহৎ, উচ্চ এবং উদার-প্রকৃতির সুখিও বী উপাধিয়ারী বী দায়ার নির্মিত হইয়াছিল—সম্পূর্ণনিমিত্ত ঈশ্বর তাহার রূপা এবং তাহার অসুখের পরাকাষ্ঠা নির্ভর, তাহাকে অজ্ঞানত্বের বিপর হইতে রক্ষা করুন। ১৮৩১ সালে (খ্রীষ্টাব্দ ১৮১৭)।

প্রাচীন সাতর্থা সঙ্কল্পে লং হায়েব ফেরপ নিবিশ্বাসের, তাহা নিয়ে প্রকটিত হইল,—
 “ঈশ্বর সমগ্র হইতে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালার পুটু সঞ্জিরের আশ্রয়নকাল পর্যন্ত সাতর্থা গণিত করিয়া দখল ছিল। এখানে ইহার প্রাচীন মত বের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত প্রায় বাকিলে অস্বাভাবিক হইতে হয় না।” উইলফ্রেড এ হান সপক্ষে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—“গ্যাট্রুস রেলিয়া আশ্রয়ক সপ্তগ্রাম” ভগ্নাবী মন্দির-ট দিগেশিত। এই হানটী প্রথিতনামা তীর্থযাত্রার মধ্যে পরি-
 পুষিত এবং পূর্বকালে বাঙ্গালার নৃপতিগণের বাসস্থান ছিল। কথিত আছে—এই মহাপ্রাণীর আশ্রয়ন এতাবধি প্রুপ্তশ্রু ছিল যে, একত্রিত শব্দানি গ্রামের বিস্তৃতি হইলেই গ্রাম ক্রটিতে সমর্থ হইত। এই নগরের ভগ্নাবী প্রথম গ্রাম বুদাই, বেহেতু এ সাতর্থা গ্রাম সাতজন গৃহিকে উদ্দেশ্যকিত হইয়াছিল, এবং এই সাতজন গৃহির ব্যবহারের জন্য একটু একটা গ্রাম সংরক্ষিত ছিল।”

সপ্তগ্রামের সাদৃশ্যে ভাগীরথীর একটা বিরাট

নদীয়ার স্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। “অধির, রোমক, ভোপিশ্রু, সৌরবলন, বর, সন্ন এবং ছাতিম নামক কানাইক বিশিষ্ট প্রায়বস্ত্রের সাতর্থা গুহ ছিলেন। ইহার সর্বশেষ সপ্তগ্রামে বাস করিতেন এবং ইহাদেরই নামানুসারে গ্রামসমূহের নামকরণ হইয়াছিল। এই সপ্তজন মহাত্মা গুহি ছিলেন। কথিত আছে,—এই সপ্তগৃহিণের অভিমুখ্যতা প্রায় সপ্তগ্রামে স্থানান্তরিত হইল।”

জন্মপুত্র পুত্রি ইতিহাসমতে সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে এইরূপ নিবিশ্বাসের।
 “রাধিকাতী-সমুহের প্রবেশ ও নিষ্কলম হইবার নামক এই বন্দর বিশেষ স্থানোপস্থান নহে বলিয়া চট্টগ্রাম অংশক অমসম্যাক বাণিজ্যপোত-সমুহের-বতায়ত হইলেন ও সাতর্থা একটা অস্তাব মুহু ও প্রেত মহাপ্রাণী।”

এই নগর সপক্ষে পূর্বকাল এইরূপ বলেন :—
 “সুদূরপ্রাচীন-মুসলমান জাতি আশ্রয়তাবীরে—নগরনিচের পক্ষে ইহা একটা স্থলর নগর ছিল; এবং জ্ঞান্যদি সকল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া বাহিত; কিন্তু সময়ে সময়ে (পাটনার) “অদানবর সাক্ষিত।”

ফ্রেডারিক নামক জৈনক ভ্রমণকারী ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার আশ্রয়ন করিয়াছিলেন, তিনি সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিয়া উক্ত স্থান সপক্ষে এইরূপ নিবিশ্বাসের।

“গোবিন্দাভিলাষে বহু দেশে দেশান্তর হইতে “বিকরণ” এই স্থানে আশ্রয় একত্রিত হইয়া থাকেন।” তিনি সপ্তগ্রামের দক্ষিণ ভাগীরথী-তীরবর্তী বেতড় নামক একটা স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানের বিবরণে সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে যাহা লক্ষ্য হইয়া যায়, তাহার বর্ণনামুতাবে এখানে সপ্তগ্রামের বর্ণনা করা যাউক।—“জোয়ারী সপ্ত-বেতড় হইতে কয়েক ষষ্ঠা বাহিয়া হইয়াই সমগ্র গ্রামে উপনীত হইয়া যায়, কিন্তু এ স্থান হইতে কোন প্রকার বৃহদাকার বাণিজ্যপোত আর নদীর উপর-ভাগে গমন করিতে পারে না, যেহেতু এই স্থানের উপরে নদীর গভীরতা অত্যন্ত অল্প। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যকারী-সমূহ সপ্তগ্রাম পর্যন্ত গিয়াই অবস্থিত করিয়া থাকে।”

ফ্রেডারিক সাহেব—বেতড়ের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—“বেতড়-নিমিত্ত নদীপথে, অসামান্য জাহাজশ্রেণী পরিশোভিত এবং নদী-তীরবর্তী

স্থলোপরি সাংখ্যাতীত পণ্যশালা-সমষ্টির বিস্তৃত বিপণি দৃষ্টপূর্ব পুতিত হইয়া থাকে। বৎসরে যে সময়ে বাণিজ্য কার্য পূর্ণাঙ্গাধার পরিচালিত হইয়া থাকে এবং জাহাজসমূহ অবস্থিত করে, সে সময়ে এই স্থানের সোকেরা এবং ব্যবসায়ি অন্ত্রাগরে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ব্যবসায়িক এতাবধি পূর্ণদ্রষ্টার রচনা করিয়া থাকে যে, উদ্ভূতী বাণ্যবিক্রী একটা হস্তান্তর পরীক্ষা দক্ষ্য হয়। কিন্তু যখন নগর বাণিজ্যপোত সমগ্র এ স্থান পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়া যায়, তখন এ সকল সামগ্রিক ব্যবহার উপলক্ষে নিশ্চিত হুটার-নিচর অধিসংযোগে ভ্রমী-ভুক্ত করা হয়। আগানী বন্দর আবার উল্লসে পূর্ণদ্রষ্টার হুটার রচিত ও বিলম্ব হইয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর অগস্ত্য-বন্দর হইতে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রাকারের ৩০, ৩৫ খানি নৌকা-সমষ্টি চাউল, বিবিধ প্রকারের তুলাজাত বস্ত্র, লাক্স, ঘাট্টে পরি-মাণে চিনি, কাপড়, তেল এবং অস্বাভাব্য পণ্যাদি বিক্রীত হইয়া করিয়া লইয়া গিয়া থাকে।”

যে সময়ে সপ্তগ্রাম ঐশ্বর্যশালী ছিল, সে সময়ে বেতড়ও ভাগীরথী-তীরবর্তী একটা বিখ্যাত স্থান ছিল। বাণিজ্য-জ্ঞান্যপূর্ণ ভৌতী সপ্তগ্রাম হইতে বাইবার পূর্বে বেতড় হইয়া বাহিত। তৎকালে প্রভিৎসবর কোন কোন নির্দিষ্ট সময়ে—এখানে গণিত বিখিত, তাহা পুর্বেই উক্ত হইয়াছে। বিদেশীয় বিকরণ এই পণ্যাবিক্রী হইতে একত্রেমজাত, নানা দিগদেশোপিত বিবিধ পণ্য জ্ঞান্য লইয়া হইত। কবিরূপ-১৫টাতেও প্রত্যেকের ষ্টম্বে সেবিতো পাওয়া যায়।” এই পুস্তকে “দশদ্রিষ্ট (মিহ্ম-মাতা)” মধ্যে যে সকল ভাগীরথী কৃষ্ণবর্ণী হানসমুহের বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে বেতড় অন্তর্ভুক্ত। যে স্থলে উক্ত স্থানের নামোল্লেখ আছে, সেই অংশটি নিয়ে উদ্ধৃত করা গেলো—

“স্বয়ং বিহেতু তরিতিলক না য়।

চিত্রপুর সাধাণি যে এড়াইয়া যায়।

কলিকতা এড়াইল বেগিয়ার বায়।

যেতেড উত্তরিল অধবান বেগার।

বাগালার ভাংগালিক বিভাগসমূহের বঙ্গদেশের পটনামাণেবের মধ্যে সপ্তগ্রাম প্রধান মহানগর এবং বঙ্গরসমূহের গুণগ্রহী বা স্বীকৃতিস্বরূপ ছিল, ইহা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই নদীকূলবর্তী মহানগর তৎকালে প্রায় সমগ্র সমুদ্রসংস্রিত

বাণিজ্যজাত পণ্যাব্যাদি আনীত হইত। ফলে পূর্বকালে প্রাচ্য-প্রদেশে সপ্তগ্রাম একটা বাণিজ্য-সময়ে জাতি, বেহেতু দেশলেশান্তর,—চীন প্রভৃতি আশ্রয়-বেতড় অন্তর্ভুক্ত দেশ, এবং সুদূর জলদির অপর প্রান্তস্থিত বাণিজ্য এবং যুরোপ মহাদেশ হইতে সমাজন্য এই বিকরণ তাহাদের দেশস্থ নানা প্রকার পণ্যাদ্য বিভিন্নর করিবার জন্ত বৃহদাকার সমুদ্রপোত-সমূহ লইয়া সপ্তগ্রামে সমাগত হইত। নগর-নিচ-প্রবাহিত স্বরস্বতী-নদকে বৃহদাকার সমুদ্র-পোত এবং সুদূর ও বৃহৎ নৌকাদি এরূপ সুনির্ভুক্ত থাকিত যে, মহাসা এ দৃষ্টের প্রতি দৃষ্ট নিমেষকরিলে নদী ক্রি জনপদের গৃহশ্রেণী তাহা নির্ভর করা হইত। নদী-বন্দর এরূপ ভাবে আরও থাকিত যে, উহার পরগণ্যবাহ সংলগ্ন পরিদর্শন হইত না। এখান নূরমুহম প্রবেশ করিলে স্থানে স্থানে জনতাধ্ব বাহার এবং বহুমুখ্য জব্যপূর্ণ বিপণিবিশিষ্ট দেখিলে এ স্থানকে কমলাপায় ক্রি-আশ্রয়-ভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইত। রাজস্বের নিবাসিত বোকা-প্রাণী প্রবাহিত হইত, জনতা ভের করিয়া জ্ঞান্য পণ্যবিক্রয় পক্ষে অতী কষ্টসাধ্য বলিয়া জ্ঞান হইত। বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যগার সকল-মহাকোমত করিয়া নদীতে গড়ায়মান ছিল; ধনীদিগের প্রামাণ্যত্বা আটগিরাজি ও দেশমন্দিরিত “অলকারের জা নগরের শোভা সোমসন করিত। প্রেত-বিভ্রদের কর ও ক্ষুদ্রাদির রাজস্ব লইয়া এক সমুদ্রায় হইতেই যৌগের নাব্য প্রতি বৎসর বার লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। কর-সমূহকে (তৎশুলকার) আট লক্ষ মুদ্রা-এবং করিতেন। ফলে বাণিজ্যভিলাষে এই নগরবাসী বিকরণকর অজ্ঞেয় হইতে হইত না। তাহা সাতর্থা-নিমিত্ত শতাব্দী পুর্বে কবির মুদ্রামাত্র চক্রান্তী তাহার গ্রন্থে এইরূপ নিবিশ্বাস প্রদান।

“সপ্তগ্রামের বেগে লং কোথাও যায়।

হলে এসে হুই যোক নানা ধুপ পায়।

তীর্থমধ্যে পূণ্যতীর্থ অতি অল্প পায়।

মস্ত কণ্ঠস্বাণী বলিলে সপ্তগ্রাম।”

সাহেজী নামক পুত্রজ এবং সপ্তগ্রামের পতন সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার অর্থবাদ নিয়ে

সম্বন্ধিত হইল—

“বৎসকে হদধন হদধীশ” নৃপতি কবুৎ

শাসিত হইত, তৎসময়ে বাণিজ্যভিলাষে সপ্তগ্রামে

সমাগত কতকগুলি যুরোপীয় বিক (পণ্যগীজ)

যথায় অধুনাত উৎসানগর সুবিধিত, তথায় আশ্রয়

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে আমদান করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি দমা তাঁহার-
আগমন পক্ষে অতীব সুবিধাশ্রিত বলিয়া বোধ হওয়া
প্রাকৃতিকভাবে উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিয়া সপ্তগ্রামে
বাসীকৃত করিতে পানেন, সেই হেতু হংগলীতে এক
খণ্ড ভূমি জয় করিয়া উহার উপরে, গৃহাশ্রি নির্মাণ
করিবার আকাংক্ষা ছিলেন। কালক্রমে অল্প
বাস্তানার শাসনকর্তাদিগের আমোদোদ্যম ও মৃত্যু
বশত বহুসংখ্যক পটুগীজ আসিয়া এইস্থানে বাস
করিতে থাকেন। থাকিতে থাকিতে কিছু দিনক
গত হইলে, যথেষ্ট মিসিয়া উইহার ক্রমশঃ সূক্ষ্ণ ও
সূক্ষ্ম প্রান্তর-বেষ্টিত বাসিজাগার (হুটী) নির্মাণ
করেন। সুবিধামত, আনার উৎক্ষেপ কামান এবং
অস্ত্রাভ্যুদয়াদি উপকরণাদি যাহা যথুৎ ও
সুবিধিত করিয়া লন—কার্যে উহা একসপ্ত গুণে
পরিণত হয়। এই প্রকারে হংগলী নগরে পটুগীজ-
গণের বাসিগণ অবস্থিতি করা প্রবৃত্তি অরকাল-
মধ্যে সপ্তগ্রামের বাসিজাগার হইয়া হংগলীতে
আনীত হয়। হুতরাং বাসিজাগার অবনতিসহকারে
সপ্তগ্রামেরও পত্তন আরম্ভ হয়। এইরূপে ১৬০২
খ্রিষ্টাব্দে হংগলীনগর রাজকীয় স্বত্বের পরাধীন
হইল।—রাজ-কার্যালয়-সমূহও সপ্তগ্রাম হইতে
পটুগীজদিগের নবু স্থাপিত হইল। হংগলীনগরে স্থানান্ত-
রিত হয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পত্তনো-
দয় সপ্তগ্রামে অরকাল মধ্যে শ্রীভর হইল। প্রাচীন
কল্প সপ্তগ্রামের প্রায়েরে বাধা কিছু ছিল, সমস্তই
পটুগীজগণ অপর্যব করিয়া হংগলীতে লইয়া গেলেন
সেইকথা সত্ত্বেও মোগল-প্রতিনিধি শাসনকর্তা—দিদারী
বানসহ সাহসেবীর সান্নিধ্যে অভিযোগ উপস্থিত
করিয়াছিলেন।

উপরে সন্নিবেশিত সাহসেবীর নামক গ্রন্থ-ইহাতে
অনুমান্য পাঠে কোন কোন পাত্রেয় একজন দ্বি-
ভাষীতে পারে যে, পটুগীজদিগের অর্থবান্ধবগণ
হংগলীনগর রাজকীয় স্বত্বের পর অঙ্গ হইয়াছিল।
বাহ্যতে এই ভ্রমে পত্তিন তা হইল, সেইহেতু পটুগী-
দিগের অধিকৃত জয় উক্ত স্বত্বকারী সংশ্লিষ্ট
ইতিহাস নিয়ে প্রকৃতিত হইল।—

সম্রাট সাহসেবীর দ্বিতীয়-সিংহাসনাক্ত হইয়া
তাঁহার প্রিয়পাত্র ক্রিশ্চন বী। বোম্বেনকে রাজ্যের
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। কিছুকাল
গত হইলে ক্রিশ্চন বী। দেখিলেন যে, পটুগীজগণ
ওগণতে দুর্গাশ্রি নির্মাণ করিয়া বিলম্বন সূক্ষ্মকল্পে

সুস্থাপিত হইয়াছেন—বাস্তানার নান্য স্থানে
আশ্রয়াদিগের আশ্রিত্য বিস্তার এবং বিবিধ প্রকারে
তাঁহার শাসনানীত প্রকারের প্রতি উৎসাহিত
করিতে কিছুমান কৃতিত্ব ঘন নাই। এই সমক
করিতে উদ্বিগ্ন করিয়া ক্রিশ্চন বী। বানসহের
সান্নিধ্যে পটুগীজদিগের বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত
করেন। এক্ষণে মগল রাধা আরম্ভক যে, যৎকালে
মুঘল সাহসেবীর দ্বিতীয় বিপক্ষে বিদ্রোহবাল
প্রজন্মিত করেন, সেই সময়ে দ্বিতীয় সিংহাসন
অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে পটুগীজদিগের নিকট
অনিতি সাহায্য প্রার্থনা করেন,—তাঁহার রাজ্য অতীব
দাত্তিকতা সহকারে অগ্রাহ্য করা হয়। এই ঘটনা
হইতে সাহসেবীর দ্বন্দ্বকক্ষে পটুগীজ-জাতির
প্রতি বিদ্বেষ আরোপিত হয়। ক্রিশ্চন বীর নিকট
ইহা-দিগেরে শপথ এবং অত্যাচারের কথা
বল্যত হইয়া পুরুষমতি জাগরিত হইল—নিম্নোক্ত
দ্বিগুণত প্রজন্মিত হইয়া উঠিল। পটুগীজদিগের
কর্তার সন্তোষের সীমাত্যন্তর হইতে বিভাতিত
করিবার জন্ত সম্রাট ক্রিশ্চন বীর প্রতি অঙ্গ
প্রদান করিলেন। বহুদিবস-ব্যাপিত সংগ্রামের
পর ক্রিশ্চন বী। ছলে নলে এবং কৌশলে হংগলীর
পটুগীজ-দুর্গ অধিকার করিলেন, বহু জীবন এবং
প্রভুত অর্থ ব্যয়ইয়া, হংগলী নগর ও পূর্ব অপর্য-
বৃত্তি পশ্চাতে রাখিয়া অবশিষ্ট পটুগীজগণ প্রহান
করিলেন। এই সময়ে—১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে হংগলী-
নগর, মোগল-সাম্রাজ্যভগ্নত, বাস্তানার রাজকীয়
স্বত্বের পরাধীন হয়; এবং মুঘলনাশ-শাসনানীত
সপ্তগ্রামেও রাজ-কার্যালয়-সমূহ হংগলী-নগরে
স্থানান্তরিত হয়। সম্রাটের আদেশমুতাবে এই
সময় হইতে হংগলীতে একজন কোমন্ডার স্থায়ী-
রূপে নিযুক্ত হয়। ফলে সপ্তগ্রামের প্রকৃত
পত্তন এই সময় হইতে ঘটিতে হইবে।

মোগল দ্বারা সমস্ততী-নদী-গর্ভ পূর্ণ হওয়া
সপ্তগ্রামের পত্তনের একটা প্রধান কারণ বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ কারণে অনেক
প্রাচীন নগর—শস্য সমৃদ্ধিত হইয়াছে,
সেবিত পাওয়া যায়। বাস্তানার প্রাচীন রাজধানী
মৌর্যের নিম্ন-প্রাচীর, নদী-প্রোত আবদ্ধ হওয়ায়
উক্ত নগরের পত্তনের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া
থাকে। অস্ত্রান্ত পটুগীজগণ যখন ভারতবর্ষে
প্রথম আশ্রয় দিল, তৎকালে কাষাই একটা
সুপ্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, কিন্তু এখনে জলনিম্ন

অদুর্গাশ্রি উক্ত স্থান হইতে দূরে গমন করা
বশতঃ এই নগরের পত্তন হইয়াছে। কবিত্ব আছে
যে, মোগল-শাসনকর্তাদিগের কর্তৃক হংগলীর নিম্ন-
প্রাচীরে স্রোতের গভীরতা সম্প্রতিত হয়। ফলে
যে স্রোত পূর্বে সপ্তগ্রাম-নিম্নে বহমান ছিল, এক্ষণে
এ প্রায় হংগলীপার-পার-প্রকাশনে নিযুক্ত।

ওয়ার উৎকৃষ্ট নামক জমিনে বন্দোজ সোমনা-
পতি পটুগীজদিগের অধিকার লিখিয়াছেন;—

“১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম পটুগীজদিগের
একটা প্রধান বাসিজাগার ছিল। মুঘলশাসন-সেতুর
কর্তৃক নির্মিত একটা দুর্গের ভিত্তিমূল সাতগাঁ-সেতুর
সরিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। নগর-মধ্যে
গৃহাশ্রি নির্মাণ করিবার জন্ত এই ভূখণ্ড ভূমিসাং
হয়। পূর্বে সপ্তগ্রামে হংগলী-নিবাসী (হুতরাং) ১)
ওগণাদিগের গ্রাম্য বা উদ্যান-বাটিকা সকল
ছিল। তাঁহার দিবা ত্রিঘণ্টার সময় চু চুড়া হইতে
কতিপ উদ্যান-বাটিকা-সমূহ পাশদ্বারের গমন
করিতেন এবং আহারাদি সমাপনান্তে উক্ত স্থান
হইতে প্রত্যগত হইতেন। সাতগাঁ-সেতুর নিকট
একটা প্রাচীন মন্দির (সমারিক ও ৭) দেখিতে
পাওয়া যায়, উহার নিম্নে “মাসমানির জমিন
সেনাপত্যক সমাধিকৃত হইয়াছেন।”

সপ্তগ্রামে ইক্সরেডের উপরে যে সেতুটি-বিদগ্ধিত
হইয়াছে, উহার সরিকটে যে একটা প্রাচীন
মন্দিরকে ভদ্রাংশেই দেখিতে পাওয়া যায়, উহার
পার্শ্ব করকবর্তি স্থল সমাধিকৃত মূর্তিপ্রোত হইয়া
থাকে। কবিত্ব আছে, পাণ্ডুরা অস্ত্রিত হিউ-নুপতি
এবং সাহ স্ত্রিগণ সহিত যে গৃহ হয়,—বাহী পাণ্ডুরা
যে-সুত্র নামে খ্যাত—সেই সমগ্রক্ষে নিহত মুঘলনা
সেনানীগণের দেহ-যষ্টির উপর ই-গুণি নির্মিত।
অন্যান্য পটুগীজ বস্তুর নিকটে সপ্তগ্রাম-দুর্গের
ভিত্তিমূল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একটা বিশাল
জলরাশি সমুদ্র অদূর বিত্তকরায় সরস্বতীর উপরে
পর্যবেশ একটা মুদ্রা যত্নে লোপী শিক্তের পননা-
বর্মণে একটা ভূতীয় দ্বন্দ্ব সাপে নির্মিত হইয়াছে।
পটুগীজগণ হংগলীতে বন্দর স্থাপিত করিয়া যেমন
সপ্তগ্রামের বাটিকা বিশাল স্থায়ীকৃত, ইংরেজ-
দিগের কর্তৃক কলিকাতা স্থানান্তরী স্থাপনে
ভেদনি হংগলীর বাসিজাগার বিনষ্ট হইয়াছে।—ফলে
এখন ইংরেজশাসনাধীনে কলিকাতাই—বাস্তানার
প্রধান বাসিজাগার—ও রাজকীয় বন্দরের সীমান্তবর্তী

সপ্তগ্রামের অনতিদূরে “মহামুদা-সামানক একটা

স্থান ছিল, সাতগাঁর সৌভাগ্যের মিনে উক্ত স্থানটিও
একটি শস্যায় নগরের মধ্যে পরিণত হইত।
কবিত্ব আছে,—এই নগর এবং সপ্তগ্রামবাসীদিগের
মধ্যে সাদা সন্দ্বন্দ্য থাকুক্ চলিত, তাহাতে প্রায়
সাতগাঁবাসীদিগেরই ভয়লাভ হইত। তাহাতেই
সপ্তগ্রামবাসিগণ আশ্রয়দিগের চতুঃপাশ, বৃদ্ধিভার
এবং উদ্বিগ্ন-বহুতা ক্ষমতার পরিচয় দিবার এক
প্রাধান্য স্থাপিত করিবার জন্ত মহামুদা-নিবাসী-
দিগের প্রতি অগ্রাহ্যতাপ্তক বাক্য প্রয়োগ করিয়া
বলিতেন।—

“সাতগাঁয়ের কাছে মামুদাবাগী।”

হুতরাং মাহেব এক স্থানে লিখিয়াছেন যে,
“বিনত শতাব্দীর একদশীর প্রধান হুতীওগালগণ—
প্রাচীন শ্রেণী বা শ্রেণীবদীয়েরা—কলিকাতানগরী
স্থাপিত হইবার প্রাথমিকালে সপ্তগ্রাম হইতে এই
স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। অন্যান্য
সপ্তগ্রামে ইহা-দুর্গের কৃষ্ণশক্তি স্বামিত হইয়াছে।”
হুতরাং মাহেবের যে মাতৃ অস্থানকারের
উপরে প্রকৃতিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমবশত। তিনি
“জগৎশ্রেষ্ঠ”দিগের শ্রেষ্ঠ এবং অজ্ঞাত—ইহা
“শ্রেষ্ঠ-বাসক”দ্বিরে শ্রেষ্ঠ, এই দুইটা লইয়া গোল
বাহাইয়াছেন। হুতরাং মাহেব বাসিজাগার “বিনত
শতাব্দীর বাস্তানার-প্রধান হুতীওগাল” বলিয়া
কল্পিতকল্পে, তাঁহার মূর্তিবিদ্যার আশ্রয় ঘন, এবং
ও সম্প্রদায়ী সুবিধাতে জগৎশ্রেষ্ঠদিগের বস্তু।
বিশেষ শতাব্দীতে ইহা-দ্বারা বাস্তানার প্রধান শ্রেণী
ছিল। ইংরেজ-শাসন-কালে এক্ষণে যেমন
“বেদন ব্যাক,” বাস্তানার অস্তিম মুঘলনাশ-শাসন-
কর্তাদিগের মূর্তিবিদ্যারই জগৎশ্রেষ্ঠদিগের
গৃহ সেইকল্প ছিল। কেবল ইহাই নহে, এক্ষণে
যে “সকল কার্য বেদন-ব্যাক, কলকৌ এবং
টাকশাল কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে, উ সময়ে
এই কার্যসমূহ জগৎশ্রেষ্ঠদিগের দ্বারা সম্পাদিত
হইত। “শ্রেষ্ঠ-ব্যাক”দিগের শ্রেষ্ঠগণ কখন হুতী-
ওগাল ছিলেন কি না বলিতে পারি না। হুতরাং
দিগের হুতীওগাল-কার্য থাকিলেও তাহা নিতান্ত
নগণ্যই ছিল, যে-কিছু কর্তব্য নির্দেশ নাই।
কলিকাতা-নিবাসী শ্রেষ্ঠ-ব্যাকদিগের মধ্যে অনেক
ই পূর্বে সপ্তগ্রামে বাস ছিল। ইহা-দিগের মধ্যে
অধার্য নাই ছিলেন, তাঁহার বর্তমানগামী ছিলেন
এবং বাস্তানার দুই ছিলেন, তাঁহার দ্বন্দ্ব ঘন কাল
জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ইহা-দিগের মধ্যে

অনেকেই এই ব্যবসারে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইংরেজ-সম্রাটকে কলিকাতায় ইহা-নিগিরে কেহ কেহ 'অম্ভাচ্চ' রাজকীয় এবং উচ্চ জাতীয় বণিকদিগের মুহুর্দ্দ কার্যেও নিয়ুক্ত ছিলেন।

কলিকাতা-নিবাসী শেঠ-বসাকদিগের মধ্যে অধিকাংশই বিলম্বন ধনাঢ্য ছিলেন।

সমুদ্রগ্রামের শ্রীশম্ভরকালে উক্ত 'হানে বহু-সংখ্যক গন্ধবনিক, স্বর্ণবনিক এবং তত্ত্বাবাদিগের বসতি ছিল।' ইহা ব্যতীত বর্ণকার কাঞ্চককার প্রভৃতি 'অম্ভাচ্চ' শিল্পীদিগের বাস ছিল।' জন-বাণিজ্য গন্ধবনিক, স্বর্ণ-রৌপ্যাদির ব্যবসায় স্বর্ণ বনিক এবং বস্ত্রাদির ব্যবসায় তত্ত্বাবাদিগের হস্তে দ্রুত ছিল।

সমুদ্র-স্রোত দ্বন্দ্ব হইয়া বাণিজ্যের ব্যাঘাত হওয়া প্রভৃক্ত তত্ত্বাবরণ হুতাশ্রী গোবিন্দপুর গ্রামেয়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। অনেকে বলিতে পারেন যে, সমুদ্রগ্রামের পড়ন তত্ত্বাবরণ হগলীতে বাস না করিয়া এখানে আসিয়া কেন বাস করিলেন? এই সম্বন্ধে ব্রহ্মদেব মাহেব বাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্মে এখনে সরিষেনিত করিলেই উক্ত প্রদেশ উত্তর প্রান্ত হইবে; থাং-তত্ত্বাবর জাতি শেঠ-বসাকগণের এই স্থানে বাস করিবার কারণ এই যে, মেরিনীপুরের অন্তর্গত ওলদাঙ্গদিগের তাত্কাংকিক বাণিজ্যস্থান হানাহুল ও পুটী-লীজ-নিগিরে ব্যবসার স্থল হগলীর মধ্যবর্ত্তি-স্থলে অথচ নদীর তীরে (ভালীয়ার তীরে) হুতাশ্রী গোবিন্দপুর অবস্থিত। এখানে বলা আবশ্যক যে, সমুদ্র-স্রোত দ্বন্দ্ব হইবার পূর্ব ১৩৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে সমুদ্র-গ্রামের দুর্দ্দবার হুতপাত হয়। কলিকাতায় স্থবিধ্যাত মলিক (স্বর্ণবনিক-জাতকৃত) দিগেরও পূর্ববাস সমুদ্রগ্রাম। ইহার প্রথমে সমুদ্রগ্রাম হইতে পটীল উপনিবেশ ও রাণিজ্যস্থল হগলী এবং ওলদাঙ্গদিগের উপনিবেশ চুঁচুয়াতে স্থানান্ত-রিত হন, তৎপরে ইংরেজাধিকার-ভুক্ত কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। সেই সময় হইতে অব্যাহতিও এই রাজধানীতে অগ্নিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

যৎকালে মৌলমান-শাসনকর্ত্তার-সমুদ্রগ্রাম বাস করিতে এবং রাজকীয় কার্যস্থল মগল উক্ত নামে স্থাপিত ছিল, সেই সময়ে রামচন্দ্র রায় নামক জটক বঙ্গীয় কাঞ্চক সমুদ্রগ্রামে কোন রাজকীয় কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার ভদ্রানন্দ,

ওষাভদ্র এবং শিবানন্দ নামে তিন পুত্র। বিক্রমাদিত্য এবং বসন্ত রায় শিবানন্দের বংশ-সম্ভূত। অসীম কন্যাতালী স্থবিধ্যাত বংশোদ্ভূতের স্বাধীন নৃপতি প্রতাপাদিত্য এই বিক্রমাদিত্যের পুত্র। এক সময়ে ঠাহাকে স্বাধীন করিবার জন্য দিল্লীর সম্রাটকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, সেই প্রতাপাদিত্যের পুত্র পুত্রক রামচন্দ্র সমুদ্রগ্রামে একটী সামান্য কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সেই সমুদ্র-গ্রামের এখন চিহ্নমাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীঅধোবরানখ দত্ত।

নৈশ সঙ্গীত।

বেশ্য। এতৎকাল।

নিশি যোজ্ঞিতর প্রায়।

কি জানি কি আশে,

মালিন্য হুবিশে,

হামি হামি আসি জ্বল জ্বল।

পরিধান ভুজ কোমুদী-বসন,

দুয় হুসরাজি অঙ্গের ভূষণ,

তারার-হারে বেরা কবরী-বন্ধন,

ভুজ হরিজানী কঠোরশোভা পায়।

কনক-কীর্তি চারু শশধর,

উজলি অথরে মুছিছে আঁধার,

নিগাম মূহণ মগন মমোর,

হয়ে বেশে হেগে চলছে কোথায়।

মোহন যেশমা শোকে ভোজবিনী,

ঝিরিকা-সঙ্গার নৃপনের পনি,

কোবিলের পুরে বাজারে বাসিনী,

মধুর মদনী, মন হারে যায়।

চাহিলে হুচাক প্রহুয় অননে,

পূর্বে কথ্য কত জাগে এ জীবনে,

কিরে যেতে চায় এ প্রাণ সে স্থানে,

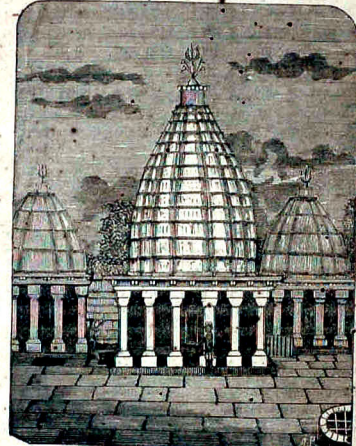
ছিল রে আমার সে সব যথায়।

ও রূপ মাহারী মদিরা সমান,

পাশে একবার মত্ত হয়ে 'প্রাণ,

আরও ভাং-আশা হবে না পূরণ,

নিমাই করছে পাগল আমার।



বৈদ্যনাথ।

‘বয়! বয়! হর! হর! শিব! শতু!’

ক্রি-লোক-পারম জিগ্মসার তীর্থ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে, সাধক-ভক্তকুল, একবার আত্ম-প্রাণে, মুক্ত-কণ্ঠে, ভক্তি-গদগদ-স্বরে, বিমল-নন্দন-কন্ডরে এবং পুণ্য-কটকিত-কলেবরে এই প্রাণ-ভরা পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, ভক্তবৎসল ‘ভগবানকে ডাকিয়া থাকেন। তাই ‘আমরাও এই প্রবন্ধ-প্রকটনের পূর্বে একবার প্রাণ-ভরিয়া ডাকিয়া লই,—‘বয়! বয়! হর! হর! শিব! শতু’। ষাধারণ নামে প্রবন্ধ, তাহারই নামে অবশ্য সর্গসঙ্গিক লাভ হইবে।

উপরে ঐ ‘বাবা বৈদ্যনাথের’ পবিত্র’ মন্দির অঙ্কিত রহিয়াছে। এই পুণ্যতম শ্রীমন্দিরের মধ্যেই ‘বাবার’ ভক্ত-বসন্ত দেব দ্বিজত, ‘লিঙ্গ-মূর্তি’ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত দেবিয়াই

প্রাণ, পবিত্রতার গুণ বিকাশে পুণিকৃত হইয়া উঠে; মাধব-সন্দর্ভে কি যে, মাধবী ভাষা নুসেন। এখন একবার প্রতিকৃতি দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করুন।

‘বৈদ্যনাথ’ সর্বদে ‘বাঙ্গালা-ভাষায় প্রবন্ধ-রচনার প্রয়োজন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক বিষয়ই আছে;—কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ধারাবাহিকরূপে যথাক্রমে কেহ কিছুই বলেন নাই। ‘বাপার’ কল ও ভারতবর্ষীয় ‘রেলওয়ে’ নামক পুস্তকে ‘বৈদ্যনাথের’ উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু প্রকটনের পূর্বে একবার প্রাণ-ভরিয়া ডাকিয়া লই,—‘বয়! বয়! হর! হর! শিব! শতু’। বৈদ্যনাথের মাধাভা এবং তৎসংক্রান্ত প্রাচীন পৌরাণিক ও ‘আধুনিক ঐতিহাসিকতত্ত্ব যথার্থ-রূপে বর্ণন করিতে গেলে, এক খানি-দুই-তিন খানি হয়। এ প্রবন্ধে অবশ্য সে স্থান নাই, তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রকটিত হইল। ইহা বাঙ্গালার পাঠকদের

কতকটা প্রীতিপ্রসূর হইতে পারিবে। বাহার্য্য এ পর্যন্ত “বেদ্যনাথ” দর্শন করেন নাই, তাঁহার্য্য এ প্রবন্ধ পড়িয়া তৎসম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন; “আর বাহার্য্য “বেদ্যনাথ” লেখিয়া নয়ন-নয়ন নার্বক করিয়াছেন; এ প্রবন্ধ পাঠে তাঁহারের অনেকেরই সেই পূর্ব প্রেমানন্দের সুখ স্মৃতি জাগরিত হইতে পারে। ইহাও কম লাভের কথা নহে।

বস্তুর “বেদ্যনাথ” যে বিব-বিখ্যাত এবং সর্বজনকৃত পক্ষের তীর্থক্ষেত্র, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। চারিদিক এখান কাটলে “বেদ্যনাথের” এত প্রসিদ্ধি;—

(১) “বেদ্যনাথ” মহা পীঠ স্থান। দক্ষ-ভবনে সতীত পবিত্রক সেই নারায়ণের হৃদয়নিয়ন্ত্রক বগু-বিমণ্ডিত ইহায়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রভাস্ত হইয়াছিল। যে যে স্থানে তাঁহার স্বর-প্রভাস স্নাত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান “হাঙ্গী” নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ ৫১টি পীঠস্থান আছে। কবি ভারতচন্দ্র, পীঠমালায় উল্লেখ্যে, “সঙ্গ-চূড়ামণি” তত্ব হইতে লিখিয়াছেন,—

“বেদ্যনাথে স্থলয় ভৈবং বেদ্যনাথ।
সেবী তাংহে জয়হুগী সর্গসিদ্ধি সাধ”।

অম্বদামস্থল, পীঠমালা।

এই “বেদ্যনাথের” সেবীর স্থল পতিত হয়। এই জন্ম ইহার নাম “হাঙ্গীপীঠ”। এখানে জগৎ-পতি মহাদেব বহুদিন পর্যন্ত সত্য-শোকে নিমগ্ন হইয়া, সতীর সেই ঈশ্বালাম্বর্য্য স্থলয় বসন্তময় দারব করিয়াছিলেন। সেই নিত্যনয়ন নিত্য-শ্রেয়সম-নিঃসঙ্গ কৈলাস-মহেশ্বর, বেদ্যনাথের আশান-ক্ষেত্রে সতীর প্রেম জাগাইয়া, জগৎ-মাতাইয়া, পূর্ব প্রভেদে মত্ত হইয়াছিলেন; আবার এই স্থানে চিতানলে সতীর “হৃদয়স্থি” জ্বল করিয়া, সতী-প্রেম উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই জন্ম ইহার স্বপ্ন নাম,—“দ্বিতাত্বনি”। অজ্ঞাত পীঠ-স্থানে যেমন এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-ব্যবহেলের স্বক্টা-মজ্জাক্ত স্বরূপ-যোগ্য মন্দিরস্থি সান্নি-স্বরূপ বিদ্যমান আছে, বর্তমান কালে “বেদ্যনাথ-ক্ষেত্রে” দেব সব দেখা যায় ন। মতা-পীঠস্থান বসিয়া, এখান আর দাপক ভক্তস্বপ্ন “বেদ্যনাথ” দেখিতে যান ন। যান তত্ব উক্তস্বপ্ন পতি তীর্থ-ক্ষেত্রে বসিয়া। তীর্থ-ক্ষেত্রেই হউক, আর পীঠস্থানেই হউক; দারব দারব, এ কণ্ঠস্বর কলিকাতা, “বাবা বেদ্যনাথ” ছাড়াও দেখাও।

(২) এইখানে ভগবান ভবানীপতি স্বেচ্ছা-তীর্থ নিদ্ররূপে আবর্তিত হন। ভগবান দ্যাবস্থানে, দ্যাবস্থান নিদ্ররূপে, দ্যাবস্থান নামে আবর্তিত হইয়াছিলেন। যথা,—

“দ্যোতিল্পে সোমদ্যাবস্ত্রীশৈলে মরিকাভর্জম্।
উজ্জৈভ্রাতা মহাবাহুশা ওঁকারমমরবধেব।।
কোপাঙ্গ হিমবৎপৃষ্ঠে জডিতাং ভীমশঙ্করম্।
বারাণসজক বিশেষশ্চ ত্র্যম্বকং শোভমীশ্বরে।
বেদ্যনাথং চিত্রাত্মনৌ নানোৎসবং হারিকীরনে।
সৌভরকে তু নারায়ণং দৃশ্যশোভং শিবালয়ে”।

শিবপুরাণ—বেদ্যনাথ-মহাভাষ্য।

অর্থাৎ মৌর্যপুত্র সোমদ্যাব; ত্রীশৈলে মরিকাভর্জম্; উজ্জৈভ্রাতা মহাবাহু; অমরবধে ওঁকার; হিমালয়ে কোদার; ভানিকানে ভীমশঙ্কর; বারানসীতে বিশেষ; শোভমী-তটে ত্র্যম্বক; চিত্রাত্মনে বেদ্যনাথ; দারাবার নারায়ণ; সৌভরকে রামেশ্বর; শিবালয়ে দৃশ্যশোভং।

(৩) এই সব কারণেই “বেদ্যনাথ” মহাতীর্থ। বাহায়ে এবং প্রাচীনকাল বস্তুর এই তীর্থ অধিভাষ্য এবং অতুলনীয়। তারকেশ্বর ত পবিত্র স্থান। বারানসীক্ষেত্রে অগৌক “বেদ্যনাথক্ষেত্রে” বাহায়া প্রেত। তেমার আমার কথা নহে; শাস্ত্রেই আছে।

“অম্বিন ক্ষেত্রে সূতা যে তু সূতপ্যাসেরস্বল্পজ্ঞায়া।
পূর্নবাসীতপ্যাসাং পাপপুণ্যভোগ্যো যদি।
মাহাশ্চ ত্র্যম্বকং প্রাপ্য বেদ্যনাথং দর্শনম্।
ন করেতি নরো যন্ত তত জন্ম নিরর্থকম্।

অজ্ঞাত কৃষ্ণাপানাম বিলাসার্থধনিনাং।
তীর্থস্থি কৃত্যতাপানাম বিলাস কামিনীনাম।

কালো বিহিততাপানাম বেদ্যনাথং দর্শনাম।
বিলোভো জায়তে নিপাত্যত ক্ষেত্রে হৃদয়গ্ৰনাম।

বেদ্যনাথং পাপানাম বহুলোভো ভবিষ্যতি।
পশুপুত্রায়, পাতালখণ্ড, বেদ্যনাথ-মাহাভাষ্য, ৫ম অধ্যায়, ১—১৫।

বেদ্যনাথক্ষেত্রে, জল,—বস্ফাজল; মৃত্তিকা,—

কাঞ্চন।

জলং গঙ্গাজলং যত মৃত্তিকা যত কাঞ্চনম্।
বেদ্যনাথমাহাভাষ্য, ৫ম অঃ, ২২।

“বেদ্যনাথ” ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, “বেদ্যনাথের” পূজা করিলেও তত্বতঃই সর্গপাপ তিরোহিত হয়; “বেদ্যনাথ” বাই এবং “বেদ্যনাথের” পূজা করিব

বলিয়া খেঁ মনে করে, তাহারও পাপ থাকে না।

স্বয়ং “বেদ্যনাথ”ই রাবণকে বলিয়াছিলেন,—

“বেদ্যনাথং ধর্মিযামি পুণ্যয়িযামি তৎ পুনঃ।

ইতি সত্তাবতে যৌ বৈ সোধসি পাপাং প্রমত্ততঃ।

অত্রাপত্য তু বৈশ্ণবো পূজনীয়ঃ রাবণ।

যেহাং পাপানি নশস্তি বহুজন্মকৃতাপানি।

মর্কটানাং কথং যতি পাপানিবিপ্লবী কৃতম্।

বেদ্যনাথমাহাভাষ্য, ৬র্থ অঃ, ২০—২৫।

ইহা অগৌক এ তীর্থ-মাহাভাষ্যের পরিচয় আর অধিক কি হইতে পারে? এত অসীম মহিমায় বলিয়াই ত, প্রতিদিন “বেদ্যনাথ-ক্ষেত্রে” অগণনত ব্যতী হাওয়া থাকে। কেবল বাহায়া কেন, উক্তর-পক্ষি, পক্ষা, মাজ্জা, বোহাই প্রভৃতি ভারতের সমস্ত প্রাণীই এখানে বেদ্যনাথ-ক্ষেত্রে আসিয়া পবিত্র হইতে পারে। বিশেষ বিশেষ পক্ষিপালকে এ যেন ভূমিনেও লক্ষ্যকি ব্লোক মনেতে হয়। এই তীর্থ-ক্ষেত্রে আজ কাল প্রায় দিনত পুরোহিত-পরিবার, ব্যতীত কান্যালে প্রতি-পালিত হইতেছে। ইহার এখান পাঠাত দ্বিতীয় কূটবে।

(৪) “বেদ্যনাথ” বাহায়ায় একটা প্রধান বাহায়া-প্রদ স্থান। অনেক অধিবাসী ভক্তক সোকেও কেবল বাহায়া-মুখায়েমণে এই স্থানে আসিয়া থাকে। তীর্থসেবী ব্যক্তি-মণ্ডলী এখানে প্রায় ১০১২ মণ্ডার অধিবাসক থাকেন। তবে সেবী-কৌতুহীলমিকে বাহায়া-প্রত্যাশায় কিছুদিন ধরিয়া পুষ্টিা থাকিতে হয়। অনেকেরই কেবল এই স্থানের খাটে এখন এখানে আধিক্যে বাস করিতেছে। কলিকাতাবাসী মহাভক্ত অগৌক নদী, মযে মযে এখানে আসিয়া বাহায়ামুখ ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকেরই এক প্রকার “বাহায়া”ও প্রবৃত্ত ভাগিয়া থাকেন। এই জন্ম এখানে অধিবাসীরা কিছু আধিকা হইয়াছে। এই হারি-লোকাক্ষিক্যমতই হউক বা আর যে কোন কারণেই হউক, ইহার বাহায়া-প্রাণী মাল্কর পূর্ণপোষণ করতকি হার হইয়াছে। অধিবাসি-মণ্ডল্য ১০ মন্থরেন কম নহে। পুরুষ প্রায় ৫ মন্থর এবং স্ত্রীলোক ৫ মন্থর হইবে। প্রচুরিত বাহায়ামুখায়া শক্তির হার হইয়াছে বলিয়া, এখানে এখন অধিবাসীদের জন্ম হইয়াপাতালাদির প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। অধিবাসীর আধিক্যবলে “বেদ্যনাথ” বা “বেদেশ্বর” এখন একটা মহানুভাব প্রাধান্য বহন বলিয়া পরিগণিত। হুজুরা বিভালায়, পূর্বে।

দিশায়া প্রভৃতি বহায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাষ্ট্রেণা বাহায়ায়, কম হইয়াছে বটে; তত্বও কিং বিশায়া বসন্ত-মণ্ডল্য, বসন্ত-বসন্ত-মণ্ডল্য দার্কিষ্টের “শেতা বাহায়া” গঙ্গালো; এখান-কার বাহায়ায় প্রেত এবং হুলত।

“বেদ্যনাথের” প্রসিদ্ধি প্রমাণ করিবার জন্য উপরে যে কারণ কর্তী উল্লিখিত হইল, তাহার মধ্যে যেমন ও রীতিগতই হইবার মাহাত্ম্যও প্রাচীনত প্রতীক্ষা হয়। প্রাচীনত প্রতীক্ষা করিবার অজ্ঞ প্রমাণ এখনও কৃতকটা প্রচলিত আছে। এ প্রমাণও পৌরাণিক। এ প্রমাণের পরিচয় দিতে হইলে “শিবপুরাণ” ও “পশুপুরাণের” আশ্রয় লইতে হয়। “পশুপুরাণের” পাতাল-বধেও “বেদ্যনাথ-মহাভাষ্যে” ইহা বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। আসিয়া গঙ্গাপূর্ণার আশ্বানৈনই আশ্রয় লইলাম। (১)

হেতুপ্রত্যয় একদিন লক্ষের দর্শনান চিত্রা করিতে লাগিলেন, মহাদেবের চিত্র-প্রায়ত ডিম্ন এই স্বর্ণলক্ষ্মীর পূর্ণপ্রতিম অঙ্গভূত। এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি মহাদেবের আরাধনায় যত্ন কৈলাস পূর্ণিতে গমন করেন। তিনি যে সময় কৈলাসে উপস্থিত হন, সেই সময় ভগবান জিহোচন ভগবতী পার্বতীর নিকটেই ছিলেন। ভগবতীও সেই সময় কি জন্ম অভিমাম করিয়াছিলেন। রাবণ, ভগবানের নিকট বাইতে উঠিত হইলে, ধারকলে গদগামনি মনো, তাঁহাকে তাইতে নিষেধ করেন। রাবণ—ক্রোধ-কম্পিত কলবেসে, নদীকে তৎকথায় আক্রমণ করিয়া দূরে নগ্নন-কাননে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় সমস্ত কৈলাস পূর্ণিতে বিভ্রান্ত হইয়া উঠে। পার্বতীও ভীত-চিহ্নে অভিমাম পরিভাগ করিয়া, তৎকথার পরে মরণ-হইত হইলেন। মহাদেব, মনোবৃত্তি দ্বারা কৈলাসকে মুহুর্তের মধ্যে চাপিয়া রাখিলেন এবং নদীকে আক্রমণ করিলেন। ইত্যকুরে রাবণ দারব উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো! নদী আমাকে আদিত্তে নিষেধ করিয়াছিল। শরণাপত্ত-ভক্ত-গঙ্গাপতির নিকট রাস্তায়, নদী নিষেধ করিবার ক্ষেত্র তাই তাহাকে ধরিয়া দূরে নগ্নন-কাননে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি। প্রভো! এ দীন-দীনীর প্রতি প্রসন্ন হউন। এই নদীয়া রাবণ মহাদেবের পূর্বে।

(১) কলিকাতা এমিটাইট মোনাইটস হস্তবিলি পূর্বে।

স্বয়ং জ্ঞতি করিলেন। মহাশয়ের তুল্য হইয়া বর নিতে চাহিলেন। রাবণ তখন বলিলেন, “আমার, সঙ্গে জ্ঞাতন, আপনাকে আমার লঙ্কার চিরকাল থাকিতে হইবে।” মহাশয়ে বলিলেন, “তাহা হইতেই পারে না; তবে তুমি আমার এই জ্যোতিষের ‘লিঙ্গ’ লইয়া, যাও। যে দ্বাদশী ‘লিঙ্গ’ আছে, তাহারই সাফল্যে নিবারণ। তুমি একটি ‘লিঙ্গ’ লইয়া যাও; কিন্তু একটি কথা আছে,—তোমাকে এদেশের বহির লঙ্কার বাইতে হইবে; যদি পশ্চিমোখে কোথাও ‘লিঙ্গকে’ রাখিয়া যাও, তাহা হইলে ‘লিঙ্গ’ তথা হইতে এক পদও নড়িলেন না এবং তথায় জন্মের মতন রহিয়া বাইলেন।”

যে প্রভাত লঙ্কা হইতে ইস্রায়েল গাতাত্যত করিতে পারে, তাহার পক্ষে ইহা—দুষ্কর, কিন্তু রাবণ তাহাভেই সম্মত হইলেন। তিনি তখন আসেন না করিয়াই লিঙ্গ উন্মোচন করিতে প্রসঙ্গ হইলেন। পার্শ্বতী বলিলেন,—“তুমি আসেন না করিয়া, ‘লিঙ্গ’ ত্যাগিতে চেষ্টা করিয়া না।” রাবণ লজ্জিত হইয়া, আচমনার্থ জল প্রার্থনা করিলেন। পরক্ৰমে, তাহাকে স্বেচ্ছামগ্নিত জলদান করিলেন। রাবণ তাহাভেই আসেন করিয়া, ‘লিঙ্গ’ উন্মোচন করিলেন। আসন্মের সময় সেই মেঘ-রাগের উলসহই লিঙ্গ রাবণ ‘লিঙ্গ’ তুলিয়া লইয়া লম্বাজি-মুখে আনিতে লাগিলেন। ওখানে স্বেচ্ছায় সেবেশে, বর্ননাশ। মহাশয়ের যদি রাবণের লঙ্কার চিরকাল ভুবস্থিত করেন, তাহা হইলে রাবণ-বিক্রমের আর কখন উপায় থাকিলে না। এই সম জ্যোতিষ, তাহার কোন উপায় থাকিলে না। বিষ্ণুও তাঁদীপকে অঙ্গ দিয়া, ব্রাহ্মণকে ‘হরিশ্রীপীঠ’ হস্তে করিয়া জল দিয়া দাড়া করিলেন। পশ্চিমো রাবণের উপর সেই মেঘ-প্রসাররূপে পবিত্র হইল। অম্ব পুরাণে কবিত আছে, এইখানে বসন রাবণের উপরে প্রবেশ করিয়াছিল। বাহা হউক, এই বাসে রাবণ নিরাক্ষর প্রসার-পীড়ায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু কি করেন।—কোন রকমে তা আর ‘লিঙ্গকে’ নামাইতে পারেন না। এমন সময় ব্রাহ্মণবশে বিস্তারিত হইয়া উঠিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণবশে বিষ্ণু আদিয়া উপস্থিত হইলেন। রাবণ তাকে দেখিয়া বলিলেন, “মহাতাভা! অম্বপ্রসারক একদণ্ড যেহীরা বলিলেন, ‘মহাতাভা! অম্বপ্রসারক একদণ্ড এই ‘লিঙ্গ’কে, আমি হই দণ্ড দায়ব করিতে প্রস্তুত একদণ্ড কেন, আমি হই দণ্ড দায়ব করিতে প্রস্তুত আছি; দিন আমি দরিদ্রা থাকি।” রাবণ মহা সমস্ত

হইয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে ‘লিঙ্গ’দান করিয়া এক জ্ঞান দূরে গিয়া প্রসার করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রসারের আর বিদায় হইল না। হুই দণ্ডও ক্রান্ত হইলে, ব্রাহ্মণকণ্ঠি বিষ্ণু; যদানিয়ে মনঃপূত করিয়া সেই ‘লিঙ্গ’ সেই হরিশ্রীপীঠে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—

“শিব সন্ততি সন্ততি ক্ষেত্রেঃস্থানি সর্ষকালকে।

সাব্যনম্পকারা বিনাশায় চ রক্ষসাম্।”

বৈদ্যনাথমাহাত্ম্য, ২য় অঃ, ৬০।

শিব। সাবলিঙ্গের উপকারার্থ এবং রাবণবিশেষের বিনাশার্থ, এইখানে চিরকাল অবস্থিত কর। এই কথা বলিবারাত্র, ‘লিঙ্গ-লিঙ্গ’ সপ্তপাতাল ভেল করিলেন; ‘হরিশ্রীপীঠে’ স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া বৈদ্যনাথের অপর নাম, ‘হরিশ্রীপীঠ’। (২)

এদিকে রাবণ প্রসার করিতে বলিয়া আকাশ-বাণী ভবিলেন;—

“উৎখাতমি যো লিঙ্গং শিবং পুণ্যমাখ্যতং।

স্থাপিতং যেন কোমপি তত্ত্ব বশমগম্যত ভবেৎ।

বিহং ক্রোতাং যো লিঙ্গং কেনোপদ্যপাটিতং পুত্রা।

তত্ত্ব বশমগম্যতমুচ্ছিন্নমিতং দরশমগম্যতং।

ইহায়াং বশং তত্ত্ব চিত্তনায়কং যেন বৈ।

কোমপি স্থাপিতং লিঙ্গং চাননীশং ন ত্রুটিং ॥”

বৈদ্যনাথমাহাত্ম্য, ২য় অঃ, ৬০-৬১।

যে বশিষ্ঠে স্থাপিত ‘লিঙ্গ’ উন্মোচন করে তাহার বশমগম্য হইবে; এই আকাশ-বাণী ভবিল। রাবণ ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আরও ভবিলেন,—‘কি ভাবিতছ, দিগ্ধা দেখে, সে ব্রাহ্মণ আর নাই। ‘লিঙ্গ’-পুত্রী চাণ্ডীয়া বসিয়া-ছেন, আমার নড়িলেন না।’ এই সময়ে রাবণের প্রসার-মেঘে চিত্তাক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি যেখানে প্রসার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে এক নতুন উপজগতি হইল। বৈদ্যনাথের দরিকটে “কুরু-নাশা” নামে যে নদী আছে, কবিত হইয়া হইয়া সেই নদী। বাহা হউক, রাবণ আকাশ-বাণী ভবিল। তৎ-নদ্যাং উত্তোলনে; পরে যেখানে ‘লিঙ্গ’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেইখানে বাইরা দেখিল,—যে ব্রাহ্মণ নাই; কেবলমাত্র ‘লিঙ্গ’ প্রতিষ্ঠিত; আর একটা

(২) আত্মকাল থেকে বৈদ্যনাথ বলিয়া জানা। হিন্দুধার্মিক বলে, ‘বৈদ্যনাথ’। ন্যস্তরূপে ক্রিষ্ণ ‘ব্রাহ্মণ’। ‘বৈদ্যনাথ’ ‘ব্রাহ্মণ’। ‘কৈতবল’ ‘হরি-ভজন’ ‘ভক্তিমাত্র’ এবং ‘বৈদ্যনাথ’ নাম পাণ্ডুরাম।

ভিল তথায় পাঁচাইয়া আছে। ব্রাহ্মণ-রূপী বিষ্ণু (৩) ‘লিঙ্গ’ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এই ভিল (৩) সমুদ্রাভি দেওয়াছিল। ‘দে অঙ্গ পাঠের অভাবে মুখে করিয়া গঙ্গা-জল ‘আমিয়া ‘লিঙ্গ’দানকে’ নাম করাইয়াছিল। রাবণ ভিলকে জিজ্ঞাসা করিল,—‘হে ভিল! কখন সে জ্ঞান কোথায়? কে এই ‘লিঙ্গ’ প্রতিষ্ঠা করিল? এই ‘লিঙ্গ’-পুত্রদের কবিত বা কি? রাগেরে কথা ভাবিয়া ভিল বলিল,—‘সেই ব্রাহ্মণ বসি; বিষ্ণু; তিনি এই ‘লিঙ্গ’ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।’ ভিল আরও বলিল;—

“বিষ্ণুমা স্থাপিতং লিঙ্গং পুত্রদেবো বিনামতঃ।

মোহচিত্রৈর্নৈব কালেন লুক্ককালো ভবিষ্যতি ॥”

বৈদ্যনাথমাহাত্ম্য, ২য় অঃ, ৬০।

বিষ্ণু-স্থাপিত ‘লিঙ্গ’ পুত্রদেব নামে, তাহার অচিরে সর্বকাল সিন্ধু হইবে। রাবণ এই কথা ভাবিয়া তখন বুঝাবুদ্ধিতে ভাবের পরে শিবের সমুখে পতিত হইয়া স্বয়ং-জ্ঞতি করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া রাবণের পদ যত কাড়িয়া গিতে উদ্যত হইল। শিব তখন হুই হইয়া বলিলেন;—

“রাবণ! আর আমি নড়িল না। তবে তুমি এখন আমার যথার্থোয় পূজা কর এবং হরিশ্রীর হইতে জল আনিয়া আমার দান করাও।” রাবণ তাহা-ই করিলেন। অবশেষে তিনি সেই ‘লিঙ্গ’ ত্যাগ-দ্বারা একটা জল ধনন করিলেন এবং নানা তীর্থে জল আনিয়া সেই কূপে ঢালাই দিলেন। এই কূপে নাম চন্দ্রপুত্র। শিব-লিঙ্গের নাম হইল, ‘রাগবেশ লিঙ্গ’। (৪) ‘লিঙ্গ’

(৩) এই ভিল পাণ্ডুরাম অর্জুনব্রত-জন্মকালে করিয়া ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে।

(৪) একটা গাঁওতালী এমনি আছে যে, এই রাগবেশের নাম, ‘রাগবেশ’ নামে পরিচিতি হয়। এতদ্ব্যতীত এই গাঁওতে প্রতিষ্ঠিত আছে, পুরাকালে এই পবিত্র ক্ষেত্রে নিষ্ঠিত একটা ছত্রের বাহুর কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; এই স্থানে কেবলমাত্র ও পাণ্ডুরাম ছিল। বসে জলগলে নীতভাষায়া থাকিত। ব্রাহ্মণগণ জমী চাষ করিতেন। নীতভাষায়া নীকারকরিত এবং গো-নাশক হইয়া। ব্রাহ্মণেরা শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন এবং নীতভাষায়া তাহাদের পুত্রলুক্ককাল-ভক্তিতে ভীর্ণানি পাণ্ডুর পুত্র ভক্ত। কমে ব্রাহ্মণগণ দণ্ড অলস হইয়া পড়েন। তাঁহারা বিদ্যাবাদী এবং বেত্মাজ্ঞানী। বিষ্ণু নামে এক গাঁওতালী নীতভাষা হইতে চট্টায়া গার। সে প্রতিষ্ঠা করিল, প্রভা-বিশেষে মায়া লাগি মাতিয়া তখন জলদগ্ন করিল। প্রভাৎ দেও তাঁহা করিয়া। এতদিন সে শিবের মায়া

পুরাণে’ কবিত আছে, রাবণ নিতা ‘লঙ্কা’ হইতে এই ধ্বংস পূজা করিতে আনিবেন। শিবপুরাণে আর এক কথা দেখে আছে যে,—রাবণ প্রসার করিয়া সিরিয়া ‘আমিয়া, শিবতদ্বকে তুলিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন প্রকারে তুলিতে না পারিয়া ‘লিঙ্গ’দেবের একমনি মুষ্টিগাত্যত করেন যে, তাহাতে লিঙ্গের মস্তককে কতকটা ভাঙিয়া দিলেন। বৈদ্যনাথ-কালে “বৈদ্যনাথের” এইজন পুত্র-মস্তক ভটিত দেখা যায়।

পরপুত্রগণ উক্ত আছে;—রাগবেশের পর, বিষ্ণু ‘বৈদ্যনাথ’ ‘আমিয়া, ‘লিঙ্গ’দানকে’ পূজা করেন এবং সাগর-সমুদ্রের জল আনিয়া দান করান। পরে রাবণ রাগবেশের জল আনিয়া দান করাইয়াছিলেন। বৈদ্যনাথের একমনি মাছায়া যে, হু-নাম যখন হুগীরের নিকটে বৈদ্যনাথ-মাছায়া কর্তন করিতেছিলেন, তখন হুত হুতু-সৈন্তের মস্তক হইতে একটা পুত্রক নির্গত হইয়া মূলভাত পড়িল। এতদ্ব্যতীত রাবণের পুত্র হুগীরের হুগীর নিদ্রায় করিয়াছিল। এক বিধক-বিশেষে দর্শন করিয়া ‘আমিয়া সেই হুগীরে প্রবেশ করিল। বিধকের করণেই হুগীরে দিবাঙ্গুর দায়ব করিয়া কর্ণভক্ত করিয়াছিল।

পুত্রপূরণে রাগ-দশরথ সংবাদে ইহাও বিবৃত

নাগ্নি মারিতে জুলিয়া গিয়া বহিতে বসে, কিন্তু তাহার সে কর্মই মনে পড়ায় যে তাহা জুলিয়া গিয়া যথায় নাগ্নি মারিবার জন্ত পৌঁছিয়া গেল। সেই সময় সেই হুই হইতে এক দিবাঙ্গুর উভিত হইয়া বলিলেন, ‘সে’, একজন অম্ব তুল্য জুলিয়া আমাকে মারিতে গিয়াছে; আর আমার পুত্রক ব্রাহ্মণেরা আমাকে জুলিয়া হুয়ে দেখা নকরিয়া বাইতেছে; আমাকে একটা বাহাও একটুকু জল দেয় না।’ তখন সেই দিবাঙ্গুর আবার বলিলেন, ‘বিষ্ণু তুমি কি চাও?’ বিষ্ণু বলিল, ‘আমি দশপতি; আমার গো-নাশক বশর্ষ আছে এবং আমি দশপতি; হুগী অশেষ। আমি কি চাও? তবে তোমার নাম যেমন শীঘ্র আমার নামও তোমারই হউক এবং আমার নাম তোমার মস্তকের নাম হউক।’ নিদ্রাকূপে বলিলেন,—‘তৎপাণ্ডুরাম। আর হইতে আমার নাম বৈদ্যনাথ হইল।”

Annals of Rural Bengal P 101.

এ বর বিদ্যাজ্ঞান; পুরাণেই বৈদ্যনাথের নাম আছে। বিষ্ণু কবি সেবেশে বুঝা যায়, ইহা হই দণ্ড দায়ব মারজ। পুরাণেই আছে, পৌত্তিগ মূর্তির হলে শিবলিঙ্গ স্থান করাইয়াছিল, তাহার নাম হইতে এই বৈদ্যনাথ নাম হইয়াছে।

আছে;—অবিশ প্রত্যহ কৈলাসে বাইসা শিব দর্শন করিতেন। এক দিন শিব লুকাইয়াছিলেন। শেষে শিবের দর্শন পাইয়া তাহার-অপেক্ষে রাগণ একটী নিশিগল লইয়া আসিয়া হাঙ্কিণীতে স্থাপন করেন। এই পূজার ইহাও উল্লিখিত আছে যে, কাশীনাথ দিবোদাসের অত্যাচারে শিব কানী পুণ্ডিত্যগ করিয়া কৈলাসে আসিয়া লুকাইয়া ছিলেন; পরে তপস্বীতে অবস্থার কশাতে প্রত্যাবর্তন করেন।

“পুরা হরো দিবোদাসভয়তস্ত্যাকশাশিকঃ।
অশ্বিনক্ষেত্রেতপস্তপ্তাঃ প্রাপ্তঃ কাশ্যবিসুদ্ধিমাং।
বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য ৩ অঃ ২৬।

পশুপূজা-পাঠে জানা যায়,—এখন বিষ্ণুই বৈদ্যনাথের প্রকৃতরম মন্দির নির্মাণ করেন।

“এবং শ্রীশঙ্করাজ্ঞামায়াং হরিণা ক্রমতঃ।
বৈদ্যনাথক প্রাসাদে রচিতঃ প্রস্তরৈঃ ভটকৈঃ।
বৈদ্যনাথমাহাত্ম্য, ৪র্থ অঃ, ২০।

এই সময় দক্ষিণে বটকৈউর, বামে কালিকা দেবী, সমুখে পতী পৌরী, হৃদয়, গণেশ, নারিকী প্রভৃতি-প্রতিষ্ঠিত হন।

বটকৈ দেবমন্দির পূর্বে শালোক্তদর্শনম্।
হৃদয়মাদাস বৈদ্যনাঃ প্রীতিসজ্জনক ভক্তম্।
কেতর বক্ষক পাণ্ডজঙ্কর ভক্তদলকম্।

বিষ্ণুও দুর্গেশোকানাথ কালিগুণ্ড শাসকম্।
লিঙ্গম বামপূর্বে তু কালিকাং বৈদ্যহারিকাম্।
হাপরিষ্ঠা ভক্তকামাদিকাঃ বিশ্বদক্ষিতাম্।

সমুদ্রে কামাণ্ড পৌরী পতী সাংহ্যাপদম্।
গাত্রায়া দক্ষিতা দেবী বৈদ্যঃ শাস্ত্রমুদ্র তু বা।
তত্তজ তমস্যাঃ রামিনাশকো দ্রুমণিঃ ভক্তঃ।

হাপিরো বাসেনাপি সোরনাম্। কামিনীশকঃ।
ততো ব্রাহ্মণ লোকানাম্ ভক্তাত্ত কলমণ্যঃ।
হাপিতান্তেন বীরেণ লোকোপকারিণা মুখা।

তত্তজ বিশ্বদলপান্যো নাপিকাঃ রিগদানম্।
হাপিতো ভক্তপাশান্যো ছেদকঃ মুদ্যালিগতঃ।
বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্য, ৩ অঃ ৬৭-৭১।

হুয়ের মহাদেবের অভিশাপে বিবর্তক হইয়া-
সহন, এক দিন প্রবেশকালে মহাদেবের নিট
সকল দেবতা উপস্থিত ছিলেন; কেবল ছিলেন
না হুয়ের। তিনি বিবর্তক-স্তনী স্ত্রীতে আসক্ত
ছিলেন; কালিয়া হুয়েদে অভিশাপ দিলেন,—তুমি
বিবর্তক হও।

এদোবাকলে মাধুরস্তনীশাসক্তমানসঃ।
মভক্তিমুখপ্তহস্তো যতো মাধুরনামকঃ।
তব কামলিনেব রমকণী মম প্রিয়ঃ।

বৈদ্যনাথমাহাত্ম্য, ৪ অঃ ১০। ১৪।

বিশ মহাদেবের পরম আদরশীল। মহাদেব স্বয়ং
রামলক বসিয়াছেন।
“স্বর্ণখিণ্ডে জলং দেবঃ মম প্রীতিকরঃ পরঃ।
বৈদ্যনাথমাহাত্ম্য, ৩ অঃ ৬৪।

এই ত গেল অসমতম পৌরাণিক প্রমাণ। এখন
কথা হইতেছে, এক বৈদ্যনাথ, তাহার
প্রমাণ কি? “বৈদ্যনাথ”-আরও ত হই এক হানে
আছেন। এক “বৈদ্যনাথ” আছেন দক্ষিণাতিতে।

বৈদ্যনাথও তাহার উত্তরে আছে। (৪) আর এক
“বৈদ্যনাথ” আছেন, পঞ্জাবের ‘স্বির-গ্রামে’। (৫)
এ “বৈদ্যনাথের” প্রসিদ্ধিও কম নহে। যাহা হউক;
বদেব “বৈদ্যনাথ” যে রাবণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, তাহারও

পৌরাণিক প্রমাণ আছে। বর্তমান “বৈদ্যনাথ”
ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক বিচিত্র-বিশুদ্ধি আলোচনার
প্রত্যয় প্রতিপন্ন হইবে। অগ্রে বর্তমান “বৈদ্যনাথের”
স্থিতি বিস্তৃত আলোচনা করা যাক।

“দেওবর” বা “দেব-বর” একটী ক্ষুদ্র সহর।
এই ‘দেওবর’ের মধ্যেই বৈদ্যনাথ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত।
“দেওবর” কলিকাতার পশ্চিম একশত ক্রোশ জল
পাশিস্থরের ঠিক দক্ষিণ এগার ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

প্রাকৃতিকালেক পৌরাণিকের স্মেলে চড়িলে সম্ভার সমস্ত
“বৈদ্যনাথে” কলিমা যায়। ব্রাহ্মকথা ২১ ২২ ৩৩
উত্তর এবং দ্রাবিণা ৮৬ ৪৪ ৩৬ পূর্ব। মূলমান-
রাজকেশে শেষ অবস্থায় দেওবর বীরভূমি জেলার
অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন সীওতালা পরগণার অন্তর্ভুক্ত
এবং ঠিক পূর্বপ্রান্ত-স্থিত। এই কয়টী পরকৃতময়
ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার ঠিক উত্তরে একটা
বন এবং উত্তর-পূর্বে একটা ছোট পাড়াও দেখা
যায়। এই পাড়াতেই নাম নন্দন-পাহাড়। পূর্ব
দিকে প্রায় ২১ ক্রোশ দূরে জিলাট নামে একটা বড়
পাহাড় আছে। এতদাত্যন্ত দক্ষিণ-পূর্বে “জামি”
ও “পারায়” নামে, দক্ষিণে “জল-জুয়ারি” নামে,
এবং দক্ষিণ-পূর্বে “দিখিয়ারা” নামে পাড়া;

বৈদ্যনাথ-মন্দির হইতে ৬ ক্রোশ দূরত্ব। স্থানের
মধ্যে “ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। সহরের ঠিক
পূর্বপ্রান্তে “যমুন-ঝোড়” নামে একটা ক্ষুদ্র
নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার প্রস্থ ২০ ফুট।
বন্দরের আধিকাংশ সময়ই ইহা শুক থাকে।
এই নদীর এক পোয়া পশ্চিমে “খালোটা” নামে
অল্প একটী নদী প্রবাহিত। এই নদী জম্মার
দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে। ইহার প্রস্থ কোন
স্থানে ১০০ হাত এবং কোন স্থানে বা ২৫০ হাত।
বর্ষাকালে ইহাতে সামান্য মাত্র জল দেখা
যায়; গ্রীষ্মকালে জল কিছুই থাকে না; এমন
কি, তখন প্রায় এক ফুট বাগি পড়িয়া জল
বাহির করিতে হয়। এই নদী হাজারবাবের
পাহাড় হইতে উদ্ভিত হইয়াছে এবং দুবির
কিয়ারা বীরভূমে সিউড়ি পুরে ময়ূরাক্ষী নদীতে
নিমিয়াছে। এই সহরের সমস্ত “সকল-মোহের”
জল ইহাতে গিয়া পড়িয়াছে। এমনও দেখা যায়,
এই নদীর জল সামান্য মাত্র রহিয়াছে—কেবল
মাত্র পা দুই; ক্ষীণকর্ত পূর্বে বেশ-জল এত বাক্স
যাছে যে, মানুষ ডুবিয়া যায়। শ্রোত এত প্রবল
হয় যে, সীতার দিয়া প্রায় হওরা দুহুর। এমনও
বাটয়া থাকে, মানুষ হাটীয়া পর হইতেছে, এমন
সময় হঠাৎ প্রবল শ্রোত আসিয়া ভাসাইয়া লইয়া
পেলা। উক্তদে “দলত” নামে একটী ভদ্রল আছে।
একজন ফকীরের নামেই ইহার নাম হইয়াছে।
ইহাতে লতা-শব্দেব বোপ পড় নাই। প্রায় তিন
কোশ দক্ষিণ-পূর্বে “তপোবান” নামক বিজন পাহা-
ড়ের গল্লরে একটী “শিবলিঙ্গ” প্রতিষ্ঠিত অর্ন্তে।
এখানে পূর্বে তপস্বিপথ তপতা করিতেন। “তপো-
বন” পাশদেশে মন্দিরাধি প্রতিষ্ঠিত। উপরে
বাহিয়ার হৃদয় পদ নাই। তত্তজ পাহাড়জ লোকের
মাধ্যম ব্যতিরেকে উঠা দুহুর। উঠিলে কিজ
আর গিরিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, পূর্বতের
পরিকার প্রস্তরে বসিয়া ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন
থাকি। পুরাণেও এই “নন্দন” পাহাড় ও “তপো-
বন” কথা উল্লিখিত আছে।

“বৈদ্যনাথ” নিকটে দেবনন্দনপুত্রতঃ।
বর্ততে সর্কলোকান্যো মদানন্দনন্দনম্।

যশিন্দু বিলম্বণা বাগী বর্ততে, নির্মলোকম্।
অবিরে ত তজাঙ্ক রুচিরতঃ তপোবনম্।

যশিন্দু ব্রহ্মদেবদেবতঃ বিহিতঃ পরমঃ তপঃ।
তত্তমপি পুণ্যোপবনং পবিত্রং ধর্মবর্জিনম্।

(৪) “মাহাত্ম্যঃ বৈদ্যনাথে হু মহাকালে মহেশ্বরী”
৪ অধ্যায়।
(৫) Cunningham's Archaeological Survey
of India Reports 1872—73 Vol V. 183

তপোবনক কোনপি দৃষ্টতে পুণ্যযোগ্যতঃ।
বৈদ্যনাথক ক্ষেত্রাগন্তমতঃ তপোবনম্।
দুঃখঃ তীর্থহিতং দেব কৃতং পুণ্যং বৃক্ষকং।
পারমিতরমাত্ম্যক বৈদ্যনাথক লিপ্ততঃ।

বিস্তৃত তত্ত মথো তু বর্ততে তৎ তপোবনম্।
“বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্য, ৪ অঃ, ২০-২২।

“বৈদ্যনাথ-তীর্থে” প্রাচীনর প্রমাণ যেরূপ হইল।
এখন ইহার বর্তমান মন্দিরাদির অবস্থা পর্যালোচনা
করা যাক। বৈদ্যনাথের শ্রীধর্মমাহাত্ম্য সাধক-
ভক্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের হৃদয়-আকর্ষক। পরকাল-
প্রত্যাশী হিন্দুর পবিত্রতাই প্রার্থনীয়। “বৈদ্যনাথে”
দেহ-মমের প্রতিক্রিয়া লাভ হয়। পবিত্রত-বিমানে
অন্ত কোন তীর্থ বৈদ্যনাথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।

বৈদ্যনাথের মাহাত্ম্যে সৈমন-ভক্ত-বাহিনী হিন্দু
মথ; স্বাস্থ্য-মুখে অহিন্দু অধিকা ন্যেমনই মুগ্ধ।
ভক্ত যান, “বাবা”র পবিত্র মুষ্টি দেখিতে; অন্তর
যায়, কেবল বৈদ্যনাথের স্বাস্থ্য-মুখ ভোগ করিতে।
মন্দিরাদির পঠন-প্রকৃত্তিতে যেমন আত্ম-শুদ্ধি শক্তি-
নাই। এখানকার মন্দির প্রকৃতিতে স্বাপত্যের দুহু
কার্যের যেমন উক্ত পৌরবও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।
প্রতিষ্ঠা কেবল পবিত্রভার। এখানকার চারিটা দ্বার

হিন্দুর একান্ত মর্যাদনীয় এবং অবশ্য দর্শনীয়।
(১) বৈদ্যনাথের মন্দিরমুখ।
(২) হারালমুরির মন্দির।
(৩) তপোবনের পঞ্জারাদি।
(৪) নন্দন পাহাড়।

“হারালমুরি” বৈদ্যনাথের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত
এখানে আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত অনেকস্থান মন্দির
এবং কতকগুলি, প্রাচীন প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া
যায়। এই মূর্তির মধ্যে ছিটীর আছে এক
যোগী নাম যোগিগত আছে। শ্রীচিরাগত দাস
নামক এক ব্যক্তি এখানে বাস করিতেন। ইনি
৫০ বৎসর পূর্বে এই সকল মন্দির প্রকৃত্তে কাটাইয়া
ছিলেন। কথিত আছে, দ্বারপ এই ব্যক্তি লাঞ্ছ-
ন। রূপী বিষ্ণুর হস্তে “শিবলিঙ্গ” অর্পণ করিয়াছিলেন।
বিষ্ণু এই “শিবলিঙ্গ” দেখমহে স্থান করে
এখন এনে যে “লিঙ্গ” দেখা যায়, ইহাই সেই
বিষ্ণু-প্রতিষ্ঠিত “শিবলিঙ্গ”।

“তপোবন”র উত্তর-পূর্বেই “তপোবন” অবস্থ
বৈদ্যনাথ-বাটী মাঠেরই এ “তপোবন” অল্প
দর্শনীয়। বৈদ্যনাথ-পূজার কোটী ব্রহ্ম-পূজার ফল
এবং তপোবন ভ্রমণে বৈদ্যনাথ-পূজার ফল হয়।

“কোটিশিখরান কলং বৈদ্যনাথঃ পুণ্ড্রমণ্ড।
বৈদ্যনাথার্চনামূলং তপোবনপরিভ্রমণং।”

বৈদ্যনাথ-মাধ্যস্ত, ৬ অং, ২১।

তপোবনে পদব্রজে বাহিত হয়। যে না যায়, সে
মন্ডবুজি।

“বৈদ্যনাথস্ত শিষ্ণস্ত কৃত্য যাত্রান্ত যো নরঃ।

তপোবানং ন গচ্ছন্ত পন্ড্যাস চ চিৎসিতবান্।”

বৈদ্যনাথ-মাধ্যস্ত, ৬ অং, ২২।

তপোবনে হাঁটল নকন-পর্ষতে বাহিত হইবে;

না হইবে বৈদ্যনাথ-পুঞ্জায় ফল লাভ হইবে না।

“অত্র গতা কৃত্যো বেদনপনং পর্ষতেভ্যতনম্।

ন পশতি স মন্ড্যাস রাধেপার্শ্বনাভবনং।

পুণ্ড্রং নাপ্রোতি নিত্যংই সভ্যমন্তেয়োক্তম্।”

বৈদ্যনাথ-মাধ্যস্ত, ৬ অং, ২৩।

এই অংশবোনে “পুণ্ড্র-কুট” নামে একটা কূপ

আছে। এই প্রাচীন পাহাড়ে হুইটী দিয়ে গঠিত

আছে। একটা কৈলনায় এক ঘরে গোশা,—

“ত্রৈবেণারাম পাতং”, অপরটা হুই ছত্তে লোশা,—

কিছু অপরিষ্কার ও অব্যবহা।

ইতিপূর্বে যে ত্রিকুট পাহাড়ের উল্লেখ হইয়াছে,

তাহার দর্শনীয়। ইহার তিন শৃঙ্গ। ইহাযে একটি

বহনো আছে। সেই গজদেবের ভিত্তি একটি ছোট

প্রাচীন পরিভ্রমক ছাঁচ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে “চিত্রকুট” নামে মহাদেবও প্রতিষ্ঠিত

আছেন।

এইবার বৈদ্যনাথের বর্তমান মন্দিরসমূহের

প্রতিষ্ঠা। ইহাদের মধ্যভাগে বৈদ্যনাথের মন্দির

অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকেই অন্যান্য চতুর্কোণ চত্বর

আছে। এই চত্বরের চারিদিকেই অস্ফাট

বিহীন। মন্দির গিয়াছে। গোমায় কোটী

অবস্থিত, তাহা বুঝাইবার জন্য স্থানান্তরে তাহার

আশ-আশোখা সরিষেশিত হইয়াছে। চত্বরের

পূর্ব দিকে রাজ-পথ। এই দিকটি উত্তর-দিকের

দীর্ঘ ২২৬ ফুট। ইহারই দক্ষিণ ভাগে একটা

বিমান-কাঠা দৃষ্ট-কটক আছে। তাহার উপর

নন্দ্যুৎখান। এ নন্দ্যুৎখান এখন বড় বয়স্কত হয়

না; ইহার কতকটা একটা একতলা বাড়িতে বন্ধ

হইয়া আছে। ইহার দিক উত্তর-কর ভিত্তি গুণে

এখন নন্দ্যুৎখান। চত্বরের দক্ষিণ দিকের

সদৃশ-বিশারি সারি সোকান। ইহার দৈর্ঘ্য ২২২ ফুট।

পশ্চিম দিকের দৈর্ঘ্য ২১৬ ফুট। ইহার মধ্যে একটা

দরজা আছে। সেই দরজা দিয়া একটি হুই ডি পথে

যাইতে হয়। উত্তর দিকের অনেকটা, অপর পাণ্ডুর

বাড়িতে ব্যাপ্ত। উত্তর-পূর্ব দিকে একটা বাক

কটক আছে। ইহার পথে মোটা মোটা ধান

মণ্ডিরে যাইবার ইহাই প্রধান পথ। উত্তরদিকের

দৈর্ঘ্য ২২০ ফুট। চত্বরের চারিদিকেই প্রাচীর।

সমস্ত চত্বর চুনাবের পাথরে বানান। মোক্ষপুত্রের

একজন ধনাঢ্য বণিক এই পাথর গিয়াছিলেন।

এবার এই পথত। রাহাশ্বরে বৈদ্যনাথের মন্দির

এবং তৎসম্মুখিত দ্ব্যস্ত বিবরণ প্রকাশ করিব।

জাতি-বিচার।

(২য় প্রস্তাব।)

তদ্ব দৃষ্টান্তে স্বাভাবিক হয় না; হুই ও প্রমাণ

ধীকা চাই। না হ'লে, কবির দৃষ্টান্ত, কবির উপমা,

জগতে কত বস্তুকে কত কি করিতে পারিব।

নয়নে দৃষ্টান্ত কলমে; লক্ষণের দৃষ্টান্ত ভাষায়;

নয়নের দৃষ্টান্ত ঋণে—এইরূপ কতই আছে, তাই

বলিয়া কি বর্ণাই কমলের, সকল গুণ, সকল ভাব

বহনো থাকিলে, ভ্রমেরই যাই গুণ পশ্চাতে থাকিলে,

না, ঋণের চতু-পক, নয়ন অক্ষর করিলে। তাই

বলিতেই, শুভ দৃষ্টান্তে স্বাভাবিক হয় না। দৃষ্টান্ত

অনুমানের অন্তর্ভুক্ত হইতে, কিন্তু অনুমানের বাস্তবতার

শক্তি তদ্ব করিতে হইবে।

কিন্তু তদ্ব করিতে হইবে।

কিন্তু “কেননা” সম্পূর্ণ উত্তর করি নাই। চেষ্টা

করা যাই, এখন কেননাও উত্তর করিতে।

পূর্বেই বলাইয়া, প্রাকৃতিকের প্রকৃতি সাত্ত্বিক,

অভ্যন্তরে রাস্তমিক, বৈশেষের রাজাস্তম-রাস্তমিক

হইবে শুধুরে ভাস্তমিক। এই কথাই হই “কেননা”

উত্তরের ভিত্তি। এই প্রাকৃতিক-বৈশেষের পরিচয়

আমরা উক্ত বস্তুদ্বয়েরে বণ, কাণ ও অবস্থা দ্বারা

প্রাপ্ত হই। শব্দের কথা জুলিলে এ পরিচয়

প্রাণে ভাবিতে হয় না; কিন্তু শব্দের কথা

জুলিল না; যৌক্তিকের নিষ্ঠা আশ্রয় রাখা—তদ্ব

জ্ঞানোদয়, প্রদর্শন করি না; দেখাইব কেননা হুই;

তোমার মতে অনুমানের কারণাই তোমার মত

গত করিব। জাতিবৈদ্যে প্রকৃতিবৈদ্যের পরিচয়

পাইতে হুইকি হুইকি পথে প্রতিষ্ঠ হইয়া ওপ-

কাণ্যবিক পার্থক্য নিজেও দর্শন করিব। মনে কর,

এই ভাবতে বা এরিয়ানাতো কতগুলি অসত্য বর্ণের

মুখ্য বর্তমান; কাহারও কোন জ্ঞান নাই, আর

বস্তু মনুষ্য বা আত্ম মানে; পরিধানে কিছুই নাই;

আভাস কাহাকে বলে, জ্ঞানে না; দেখে—নন-জরল

পাহায়ে-পর্ষতে, নন-নরী-প্রশ্ন-কণ্ডার, চন্দ্র-সুখ্য

তারা-এই; আর দেখে—মেঘ-দূরী-উদয়-অপস, নিহা-

বায়-মহা-ভক্ত; বিশেষ ভ্রমের-চিত্তা নাই, ভাষা

নাই, ভাষা নাই, বৈদ্য নাই, সাহিত্য নাই, নারিক

নাই, দর্শন নাই, জ্যোতিষ নাই, স্মৃতি নাই, বৈদ্যক

নাই; আছে কেবল মহাবীরে ভ্রম চক্ষু মনুষ্য-নহু-

বর-কণ, বস্তু-উদয়-মস্তক; পশুর না জ্ঞান নাই হইতে-

বিকট ক্ষুদ্র ভাষ্য শূন্য নাই হইতে, বস্তু-সার নবর-

নিবরণ নাই হইতে; কিন্তু জ্ঞান বস্তু বিচেননা নাই হইতে-

পদ-কণ, কাগজের পরিচয় ও প্রকৃতির অব্য-

ভিত্তি নিম্নে, এই পদ-সম্বোধের মনুষ্যবিককে উচিত

সৌভাগ্যে দিকে এক এক পদ অসত্য করি; তখন

কোন স্থানেই কোন জ্ঞানান নহুয়া ছিল না;

হুইনা; শিক্ষার পরিবর্তন বা উন্নতি কিছুমান হয়

নাই;—কেবল কাগজের পতি ও প্রকৃতির নিয়মই এই

হইবে। জ্ঞান—এখনকার সময়ে হুইনা; হুইনা

যা প্রাণী—মানবগণেরে ওপসেই অপ্রকৃতির থাকিয়া

ইহাখানিক অলপো উন্নতি দিকে নিয়োজিত

করিলেন। তৎকালিক মনুষ্যগণের, সকলেরই

ও সমান উপকার, সমান উপায়, সমান অবস্থা ও

সমান ভাব হইলেও দ্বারা-সকলেরে অল্প জ্ঞান-

বহুই অধিকার হইলেন, তাহারিগণকে অসুখই শ্রেষ্ঠ

ও শ্রেষ্ঠ-প্রকৃতি-সম্পন্ন বস্তুতে হইবে। তোমার

মতামতেরে আমি বিনা তর্কে ধরিয়া লইলাম, রাস্তা-

আপনাবিককে সর্বশ্রেষ্ঠ করিবার চেষ্টাই জাতিভেদ-

প্রকার পট্র করেন; কাজেই তোমাকেও বস্তুতে

হইবে, সর্বত্রই উন্নতি হয়, জ্ঞানবায়েরে পরিচয়

হই রাহুগণের;—পশুভাষায় জ্ঞানবায় মানব-

গতবায় মধ্যে একমাত্র আত্মপ্রকৃতির স্বাভাবিক

উৎসবোয় দ্বারা সর্বপ্রাণেরে জ্ঞানবায়সম্পন্ন

হইয়াছিলেন তাহারাই রাস্তা।

এখন ত স্থল, কলম, চতুর্পাশ, পাঠশালা

ছড়াছড়ি; দর্শনিক, বৈদ্যক, জ্যোতিষিক, ইয়াসকর,

সাহিত্য-বিশারদ, বৈজ্ঞানিক, রসায়নিক, এবং

অন্যান্য পদ-পত্রেরে ছড়াছড়ি; এখন

পড়িলেই হুইল, মিথিলেই হুইল; এখন দ্বারা

শিক্ষা হয় না, যে অতি নির্দোষ; অতিস্থল বিষয়

হইতে স্ফূর্তন বিষয় পর্যন্ত সমস্তই এখন উপদেশ

পাওয়া যায়, সে বিষয়ে জ্ঞান হইবার উপায়ও

অস্তুভ্য জ্ঞানি যায়; এখন কোন বিষয় ভাবিতে

হইবে, হুইনা না হয়, অপরকট গুণে বসিয়া ত ভাবা

যায়; বস্তুশাণ্ড-উদ-ভা, করকেপারাই নতন বস্তু-

ভাষা, ব্যাপ্তভাষি—এ সমুদয় এখন আর শিক্ষাবি-

দিককে প্রায়ই বিচলিত করে না। শিক্ষাবিদিককে

নিয়মই বস্তুের অভাবে সীতে কাঁপিলে, বিমানবি-

দিককে অর্ধ-বস্তু হইতে, স্থানান্তরে অভাবে বস্তুগত-

ভাষ্যে বস্তু-বিদিকেরে, সৌক্যবায়েরে অভাবে

পশুগণেরে সূচক হইতে এখন আর হয় না। এখন

রাশি রাশি গ্রন্থ, প্রচুর স্থাষা, নবর-গ্রন্থ-পট্র,

হুইনা পরিচ্ছদ—সকলই হইয়াছে; এ সময়ে

শিক্ষিত না হওয়া অপেক্ষা শিক্ষিত হওয়াই ত সহজ

বোধ হয়; তথাপি শিক্ষিত হইলে জ্ঞান হয়।

কিছু সেরে হুইল পূর্বকালে যে সময় দ্বারা

উপভোগ্য অবস্থা আর, গো হইতে হুই ও হুই হইতে

হুই-নন্দীতালির উৎপত্তি বস্তুের অসত্যের জ্ঞান, তখন

গীহারই সমান উপকারেরে সম্পূর্ণ ছিল, তখনও

ক্রমে উন্নতিভাষে করিয়া সকল জ্ঞান মোদন

করিয়াজেন, তাহারে প্রকৃতি কত বড় উচ্চ বস্তুতে

হইবে। জ্ঞান—এখনকার সময়ে হুইনা; বস্তু

আত্মভিমনে দ্বীত মানবমণ্ডলী দ্বারা অপর

অনন্ত কত বস্তুতেও অপরায়; সেই জ্ঞান্য-বিজ্ঞান-

যোপ—অপরেরে কলকণ্ড সাহায্য না পারিয়া গীহার

উজ্জ্বল করিয়াছেন, বস্তুকে তাহারে প্রকৃতি কত

উচ্চ। অব্যামান-গোত্র ঈশ্বর সম্বন্ধে গীহার

গণেরা, পৃথিবী মূলক জাতির মস্তিষ্কে পশ্যন্ত

করিয়া রাহিগণে এবং রাহিগণে; বস্তুকে তাহারে

প্রকৃতি কত উচ্চ। গীহারের মস্তিষ্ক হইতে দর্শন,

বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, কাব্য-পুত্রা—উচ্চ হইয়া কত

কেনেবের কত উপকার সাধন করিয়াছে ও করিতেছে

তাহারে-প্রাকৃতিকে অতি উচ্চ না বলিয়া কেন

পাশও থাকিতে পারে? তাই তোমার মতে বস্তু

মিলাইয়া আমিও বস্তুপ্রতিষ্ঠা, জ্ঞানবায় ত মুত নষ্টের

গোত্র; জাতিভেদে ত ব্রাহ্মণই করিয়াছে; সকলের

সাথে সমান শ্রেণীর লোক হইয়াও এখন তাহারে ক্রমে

ক্রমে নিম্ন প্রকৃতি-বল উচ্চাধিকার লাভ করিলেন,

করিয়া আপনাবেরে প্রকৃতির পরিচয়েরে পুনর্জন্ম হই-

লেন, তখন সে হুইয়াসী পূর্বকালে টিরানি

বস্তুদ্বারা থাকিতে, সমাজের হিতেরে জ্ঞান

মঙ্গলেরে জ্ঞান সেই প্রকৃতিকে মন প্রকৃতির অধীনতা

হইতে পরিত্রাণ করিতে তিনিই জাতিভেদ প্রথার
বলি করেন। এই উক্ততম প্রকৃতি-সম্পন্ন মহা-
পুরুষমণ্ডলীর অব্যবহিত পরেই যাহারা জ্ঞান-
সম্পন্ন হইয়াছিলেন; তাহারাও ক্ষত্রিয়। পৌকরা
করিমান, এই ক্ষত্রিয়-বাক্ষ্য পুরুষকে বিবাহ
হইবে কেবল এই প্রাশস্ত নহিয়া। কিন্তু তাহাতে
কিছু বৃদ্ধি কি?

ব্রাহ্মণগণের আত্ম-প্রাণাত্ম-সম্বন্ধগণের কার্য অনু-
মাত্রা ছিল না; যদি তাহারা দ্বার্ষে ব্যাঘাত পড়ি-
তেছে বলিয়া বিবাহে প্ররক্ত হইতেন; তাহা হইলে
তাঁহাদিগকে ঘোষা করা চলিত; কিন্তু তাহারা
সে ক্ষমতা বিবাহ করেন নাই। বিবাহ যে কেন হয়,
তাহা বলিতেছি।—প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়-
গণের^১ জ্ঞানোন্নতি দেখিয়া মন করিলেন, ইহারাও
উচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অতিলেই আমা-
দের সমকক্ষ হইবে; কাহারও বা আপনাদিগের
সমকক্ষও ভাবিলেন। তাহাতে তাহাদিগের
আনন্দের সীমা রহিল না। সেই পুণ্যময় সময়ে
মমুস্বয়ের উন্নতি দেখিলেই তখন তাহাদের আনন্দ
হইয়াছে কথা। সমকক্ষ তুল্যাবস্থা মাননমণ্ডলী
পাইলে, মান-জ্ঞান-সম্পন্ন মহাবীরে সমতা বৃদ্ধি
হইলে, তাহাদের যে কত আনন্দিত হওয়া সম্ভব,
তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না। এক
বার ভাবিতে পার, আমরা কাহারোমধ্যে বড়
বিশেষণ একাকী অবস্থিতি করিবার সময়ে
যদি কোন দাসদারীর আচার সম-প্রকৃতি ভূম্য-
জ্ঞান-বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যাদলীর সেবা পাই, তখন
আমাদের মন কিরূপ আনন্দ রসে আধুস্ত হয়।
আদি কালের সেই ব্রাহ্মণগণকে কল্পিতোন্নতি
দেখিয়া যে তদপেক্ষা শত সহস্র গুণে আনন্দ
হইবে নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? এইরূপ আন-
ন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমুপ-
স্থিত হইলেন। নান্দিত্য ও সম্ব্যতি বিষয় পর্য্যায়
লোচন। কল্পিলেই একবার সমতা উপলব্ধি
হইবে। ব্রাহ্মণকন্ডার সহিত ক্ষত্রিয়ের বিবাহ

হইতে স্পাদিল। সকলেরই যখন সমান অবস্থা—
পুণ্ডরাক ছিল, তখন যাহা থাক, পরে একজন ব্রাহ্মণ
বা জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া উঠিলে তঁহার নিজ জ্ঞান
অসমাপ্তিক্রমে জ্ঞানবর্জিত জাতিকে সমুদ্রাশ্রয় করিতেন
না; তাঁহারা ভাবিতেন, হুহুতার উক্ত প্রকৃতি ন্যাস-
মসংগে নীচ হইয়া যাইবে, দৌহিত্যে শিশুপুরুষের
অনুমান করিবে; কিন্তু তাহাদিগের কড়াগ্রহণ
করিতেন। তাহারা বলিতেন, ঐ প্রকৃতিই পরাসী,
দ্রোণাকৃতিতে আরম্ভ করিতে, আপনাদিগের আনন্দ করিতে
শুংপ্রকৃতি বড়ই পাই। তাই নীচ প্রকৃতিতে উন্নত
করিবার জন্ম তাহারা জ্ঞানবর্জিত জাতির কড়া
বিবাহ করিতেন। আত্মবিশেষ প্রকৃতি বাহাতে
অনন্ত না হয় এবং অপূরণে প্রকৃতি উন্নত হয়,
সে সময়ে তাহাদের বিশেষ লক্ষা ছিল, ‘অর্থাৎ
সেইরূপে হইক উন্নতজাতির বৃদ্ধি করাই তাহাদের
উদ্দেশ্য ছিল।’ পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের জ্ঞানোন্নতি
দেখিয়া, মানস প্রকৃতি যৌথ কন্ডার বিবাহও ক্ষত্রি-
য়ের সঙ্গে নির্যাসিলেন। দেখানী ও ব্যাধির
বিবাহ ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ। কিছুকাল পরে
অধস্তন ব্রাহ্মণ, মানস প্রকৃতি,—না, এ প্রকৃতিও
আমাদের সঙ্গে সমান নহে; তখন হইতে ক্রমে ক্রমে
পুণ্ডরাক, অকেন-ভাব পরিহার করিত গাণিলেন।
যখন দেখিলেন, এ প্রকৃতিতে জ্ঞানার্জনী এবং উচ্চা-
বনী মলিক প্রচুর পরিমাণে আছে বটে, কিন্তু তাহা
দেখা-দেখি; একজন আদর্শ না হইলে সে শক্তির
উন্মেষ ইহাদিগের হয় না। যখন দেখিলেন, জ্ঞান
ও ধনের মধ্যে ইহার ধনকে অধিক ভালবাসে;
ক্ষত্রি ও ক্রোড়ের মধ্যে জ্ঞানই ইহাদের বিশেষ
‘প্রকৃতি-সম্পত্ত’; যখন দেখিলেন, ইহার সম্বন্ধের
ভাষা, অপমানের বৈরা; অসক্তির বদ্ধ, শাস্তির
উদাসীন; আলাঙ্করণে স্নেহক, নিশ্চয়তার উপে-
দক; যখন দেখিলেন, পর-পর্যায়ের দৃষ্টপ্রকাশকে পুরুষের
পরমাধো মনে করে, পর-পর্যায়ের দৃষ্টপ্রকাশকে পুরুষের
উচিত কর্তব্য মনে করে; ব্রাহ্মণজাতি তখনই বুঝি-
লেন, এ প্রকৃতি আমাদের নহে; আমাদের সঙ্গে ইহা
মিলিল না। তাহিলেন, ইহাদিগের সহিত সমভাবে
সম্বন্ধ রহিলে আমাদের প্রকৃতি ক্রমে বিনষ্ট হইতে
থাকিবে। যে সময়ইহুৎ থাকিলে স্মৃতি নাই, যে
সময়ইহুৎ তাহারা অন্যমনসে গম্য করিতে পারিবেন
বলিয়া বুঝিলেন, তাহাই বলায় রাখিলেন—ক্ষত্রিয়ের
কড়া বিবাহ আপনাদের মধ্যে প্রচলিত রাখিলেন।
যেই শূদ্রের উপলব্ধি এরূপ নিম্ন মন করিবার পূর্বে

হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের উন্নতি লাভ হইবার পরেই
যে মানবগণ, উপদ্রিষ্ট বিদ্যা গ্রহণ এবং কৃষি পত-
প্রাণে ও ব্যক্তিগত, উচ্চাবনী-মলিকগণের পুণ্ডরাক,
তাঁহাদের মন হইল বৈশ্য। অবশিষ্ট মানব-
গণ, যাহাদের উচ্চাবনীশক্তি একবারেই হইল
না বা পরিচিন্তা কার্যে হইল, এবং উপদ্রিষ্ট
উক্ত বিদ্যা গ্রহণও গ্রহণেও অসার রহিল,
তাঁহারাও শূদ্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। এক্ষণ হইলে,
মুদ্রিত ব্রাহ্মণগণ বুঝিলেন, সমাজ কিরূপে পঠিত
করিতে হইবে। ক্রিষ্টপন সকলের উন্নতি হইবে
নিশ্চয় এই আলোচনার প্রবৃত্ত হইলেন।

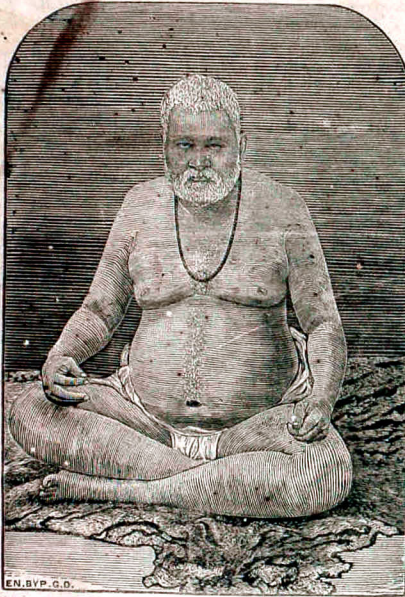
বিশেষ বিচারের ফলে বুঝিলেন, বর্তমান মানব-
মণ্ডলীতে চারিটা বিভিন্ন প্রকৃতি প্রবিষ্ট।
প্রকৃতি অনুসারে জাতির পার্থক্য ধরিতে গেলে
এখন চারি জাতি হইয়াছে। উক্ত প্রকৃতির উচ্চ
ভাব বর্জিত ও বর্জিত এবং নীচ প্রকৃতির উচ্চ
কৌন্য বাহ্য মত চলিলে হইতে পারে। অবিলম্বে
প্রত্যক্ষ কি হইল। তাহারা দেখিলেন, ব্রাহ্মণের
প্রকৃতিই এখন মর্দেকী, শূদ্রগণ অল্প প্রকৃতি
উচ্চতা সম্পাদিত জন্ম এইটিকে আদর্শ করিলেন,
ব্রাহ্মণকে সমাজের স্বর্গদ্বারী করিলেন।

সেইকাল মসংগে নীচ-প্রকৃতি উক্ত প্রকৃতিতে পরা-
ভূত করে; সেইকাল মসংগ বর্জিত এবং প্রকৃতির উচ্চতা
সম্পাদনা আহা-ব্যবহার ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে নির্দিষ্ট
হইল। প্রকৃত জাতিভেদ এই সময় হইতেই প্রবর্তিত
হয়। এই সময়েই চারি জাতির চারি প্রকৃতি যে যে
গুণে পঠিত, তাহা বিশেষরূপে আলোচিত এবং
বিস্তারিত হইল। ‘সমগ্র লঘু প্রকাশকুণ্ডিত’ মত
গুণ লঘু অর্থাৎ অনালভ্য অমোঘ পুষ্টিতির কারণ,
জ্ঞানের সূচন, এবং স্বধ্বক, তাই সমা সম্ভাব্য-
বলল, জ্ঞানময় ব্রাহ্মণ-প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র-সম্ভব-
বলিয়া নিম্নজ্ঞান হইল। ‘উপনিষদগণ চক্ষুর রজঃ’
রজঃপ্রণ, দ্বার্ষ্য-প্রবর্তক এবং চাক্ষুসাদান; এই
জন্ম সত্যত-উদ্যোগী, পর-পর-মোক্ষালাঙ্করণ
কোষ-অভিমানো উদ্বেজিত, ক্ষত্রিয়জাতির প্রকৃ-
তিকৈ রাজসিক বলিয়া নির্ধারিত হইল। বৈশ্য-
প্রকৃতি রাজসিক-তামসিক বলিয়া বিবেচিত হইল।
কেননা, উহাতে রজোগুণের ও তমোগুণের ভাব
বর্তমান। বৈশ্যের উদ্যোগ আছে, পর-পর-
মোক্ষালাঙ্করণ আছে, কোষ আছে, অভিমান আছে,
কিন্তু উদ্যোগের বিষয় সীমাবদ্ধ; ‘অসমাপ্তকাল
কাণ্ডে উদ্যোগ নাই, বিশেষ জ্ঞান-সাধন কাণ্ডে

উদ্যোগ নাই, আকাঙ্ক্ষার সীমা না থাক, কিন্তু
ইহু-সিদ্ধির জন্ম প্রায় পর্য্যাপ্ত পূর্ণ, বৈশ্য-প্রকৃতির
অভ্যন্তর; কোষ অভিমানের ও তীব্রতা নাই,
ঔৎকট্য নাই। বৈশ্য-প্রকৃতি শুধু রাজসিক হইলে
এরূপ হইত না। ‘গুরু বরকসমং তমঃ’ গুরুত্ব
এবং-আবর্তকতা তমোগুণের সাধ্য। তমোগুণ
থাকিলে জড়তা; অলভ্য, প্রমাণ, মোহ, অভ্যাস
এবং সকল ‘মনোবৃত্তি’র অবসাদ হইয়া থাকে।
‘স্বার রজোগুণের’ সাধ্যত পূর্ণ বলা হইয়াছে।
এই বৈশ্যের অধিক মিত্রণ বৈশ্য-প্রকৃতি সমুচিত
বলিয়াই ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রের প্রকৃতি হইতে
বিভিন্ন। আর শূদ্র-প্রকৃতি তামসিক; মনোর-বৈজ্ঞ
নাই, উচ্চাবনী ‘কি’ নাই এবং জ্ঞানের প্রবৃত্তি
নাই। তবে ইহা বাহ্য আদর্শক যে, সকল প্রকৃতিই
ত্রিগুণাত্মক; কেবল সেই সেই গুণের আধিক্য
অনুসারেই সাদিক রাজসিক তামসিক ব্রাহ্মণের
হইয়া থাকে। পালা সোমবার একই বাদ থাকিলেও
‘তদান্না নির্মিত বস্ত্র’ ‘স্ববসের’ বলিয়াই প্রসিদ্ধ হয়।
‘অধিকেন তামসো ভবতি।’ প্রকৃতির উপযোগী
বৃত্তি ও আহাঙ্গানির কথা পূর্বে বলা যাইবে।

ক্ষত্রিয়গণ, পূর্বে জ্ঞানিয়াছিলেন, যাহারা এবং
ব্রাহ্মণেরা একই জাতি, তবে আমরা বিচারী
তাঁহারা তাহা মনে, প্রভেদ এই ইচ্ছামাত্র। এখন
কিন্তু বুঝিলেন, তাহাদের সংস্কার ও চিন্তা অনুসৃত;
ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে নিম্নজাতি করিয়া দিতেছেন।
কার্য-কারণ ভাব বুঝিলেন না; সমাজের হিতাধিকার
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না; কেবল দেখিলেন,
আপনাদের আপাত ভাব। ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয়কে
একজাতি করিলে, ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির ত আর উন্নতি
হইবেই না, বরং সম্ভাব্যে ব্রাহ্মণ-প্রকৃতিই নষ্ট
হইতে থাকিলে। শুধুই ধাতুকোষে বসি জরিলে
যাহা ব্যাঘাত বাড়ে না, ক্রমেই মরিয়া যায়। এই
প্রকৃতি মানস সমাজের পৃথক শক্তি—এমন কি,
অভিনব নিমোহের ধাম পর্য্যাপ্ত কৃষিক দৃষ্টবর্তী
হয় না, ব্রাহ্মণগণের সমাজ-হিতকার এইরূপ মনে-
ভাব না থিরা রজোগুণ-পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণ কোষে
জন্মিয়া উদ্বেজিত। অসুখীলেন কোষ, সীমা অতি-
কৃত্য, করিল; ক্ষত্রিয়গণ, বাহবল ও অন্তরবলের
মাধ্যমে জ্ঞানাদিগকে বাচি করিতে উদ্যোগ হইলেন।
মত শত জ্ঞানময় শমস্ত-কালনী অপোদান ব্রাহ্মণ-
পুণ্ড্র, দ্বিগুণ ক্ষত্রিয়গণের রূপাণ-ধারায় নিপতিত,
হইয়া নীরবে স্বর্ণমণে প্রস্থান করিলেন। এই

^১ এই ক্ষত্রিয়-সংজ্ঞা বৈশ্য-সংজ্ঞা হইতেই নাই।
পরে হইয়াছিল; তা হইক, আমরা কিন্তু ক্ষত্রিয়-সংজ্ঞা
অন্যমনসে ব্যবহার করিতে পারি।



EN. BVP. G.D.

স্বামীজীর হরিদ্বার-যাত্রা।

৩ম প্রস্তাব।

ঐ উপনিষদে যে নয়ন-মনোহর প্রতিমূর্তি, উহা কাহার? ঐ যে নর-ভূত গুপ্তার ভাব-স্নেহ, প্রীতি ও করুণার সহিত মাখামাখি করিয়া মুখ-মণ্ডলে বিরাজমান-রহিয়াছে। ঐ যে বিষ্ণুরাজ, স্নেহ-মণ্ডলে বৈরাগ্যের ছটায় সহিত বিশিষ্ট পূর্ণ অমায়িকতা পরিকূট রূপে দীপ্তি পাইয়েছে।

ঐ যে কৌশলিন্যায়-সম্বল আজ্ঞাস্বিত-রাজ বৃষ-স্বক বর-বপুতে হেজারতা ও শাস্ত্রময়তা, চিত্র-বিরোধ ভুলিয়া যুগে বসি করিতেছে। ঐ অরবিন্দ-মুখের নয়ন-বসন্তে রেখমাখা দৃষ্টিতে কাহার হৃদয় ভগ্নিস্নেহে আশ্রিত না হয়? ঐ প্রকৃতি-কোমল অখণ্ড ভীষণত-বসন্তের স্নেহ-দুর্গত শরীরে বৈদ্যা কাহার মনে দেবতার শরীর-ধারণ-সমক্ষে সংশয় থাকে?

পাতক! জননে, এ প্রতিমূর্তি কাহার? ভারতবর্ষের সৌরভের দল-বজ্রদংশি-গাথার রূপায় আজও বিরহসমাজে প্রচারিত হয়; মীমাংসা,

একান্ত, সংখ্যা, পাতঞ্জল, ন্যায় এবং বৈশেষিকের গুঢ় তত্ত্ব সুবিধে হইলে ধাঁধার রূপা ছাড়া অন্য অস্ত্র উপায় নাই; সেই সম্মানসিকুলের সর্বাঙ্গীভা, ভারতের প্রধান প্রধান অধ্যাপকদেরও অধ্যাপক; কাশ্যাপ, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জমশুদ, কান্দি, দ্বার-তাহা, বাঘ্যা ও আমেরি প্রভৃতি দেশের নরপতি-গণের পরম ভ্রাতার অধিভায় ভাজন; ধর্ম্মরত্ন-প্রাণ-ত্রিবিজ্ঞান-মহাশক্তি-স্বামীজীর ঐ নয়ন-মনো-প্রাণ-হর প্রতিমূর্তি উপরে দীপ্তি পাইয়েছে। কি রাজা, কি নরিস, কি পণ্ডিত, কি মুখ, কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী—যিনি একবার স্বামীজীর ঐ মূর্তির মূর্ত্তি মনোমগ্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার সীমাবদ্ধতা-বিন্যাস-প্রবণ করিয়াছেন, আর্ধ্যগণের আর্ধ্য মতভার জীবন্ত ছবি তাঁহারাই দেখিতে পাইয়া-ছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিশুদ্ধমন সহস্রতা-স্বামীজীর জীবন-বৃত্তান্ত যে, কত অলৌকিক বিষয়বস্তু ঘটনায় পরিপূর্ণ, তাহার শিশুর বর্নন করিতে গেলে, একখানি হুতং-পুস্তক হইয়া পড়ে। সে জীবনীতে কত যে, শিখিয়ার পদার্থ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমান দু-বছরের প্রবল আধিপত্যের প্রবাহে পড়িয়া, কি উপায় অবলম্বন করিলে, লৌকিক ও পারলৌকিক ভ্রম-ভয় উপস্থিত হইতে পারা যায়,—তাহা শিক্ষা করিতে হইলে, বর্তমান কালে ত্রিবিজ্ঞান-স্বামীজীর ভ্রম পরম পবিত্র আশ্রয় আর একটাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। অন্য আমরা এ স্থলে স্বামীজীর অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিলাম।

প্রায় অকীর্তিবর্ষ হইল, স্বামীজী স্থপতির কায়-বুদ্ধ ভাঙ্গন-হলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভারত-বর্ষের দলিল-প্রবন্ধে হায়দ্রাবাদ-রাজধানীতে স্বামীজীর মাতুল, তত্ত্বাত্ত রাজ-সরকারে বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত কার্য করিতেন। রাজধানীতে যে সকল বহু-ব্রতের আশ্রয় থাকিতেন, তাঁহার সকলেই স্বামীজীর মাতুলের প্রতি বিশেষ ভ্রাতা-প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শের তত্ত্ব মণ্ডলে ও বিপদে অনেক অস্বস্তি কাহার মনন করিতে সক্ষম হইতেন। এই সকল-কারণে তাঁহার ভ্রম সর্বদাই রাজ্যের উচ্চপদস্থ শিল্পিত ও সভা কর্মচারিগণে অনন্তর থাকিত। এই প্রকার ব্যবহার-নিমিত্ত শিল্পিত-লোক-সেবিত মাতুলগণের স্বামীজীর বাবা-জীবন, মাতুলের বহু-বচন শিকাগ্রামী অবলম্বনে, অতি হৃদয়-রূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সেই সময় স্বামীজী

কেবল ঘরোয়া ভাষা ও নানাবিধ অন্তঃচালনা শিক্ষা করিতেন এবং সর্বদা ব্যবহার-কৃশল লোকপণের সম্বন্ধে সন্তোষপূর্ণ শিল্প হইতে কার্যগত শিল্প সমর্থিত পরিমাণে আশ্রয় করিতেন। বালাকুলেই তাঁহার অমায়িক প্রতিভা ও কার্যকুশলতা দেখিত। নগরবাসিন্য বিখ্যাত হইতেন ও ভগবানের নিকট ইঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেন। এই প্রকার উদ্ভাস-ও উদ্ভাসের সহিত বালাজীবন অন্তর্ভুক্ত করিয়া যখন স্বামীজী যৌবনে পদার্পণ করিলেন, সেই সময় তাঁহার মাহম, স্বাক্ষরন ও কার্যকুশলতায় তিনি হায়দ্রাবাদ-রাজ-সরকারে সৈনিক-বিভাগে একটা উচ্চ-পদে প্রবিষ্ট হইলেন। অরমিন সৈনিক-বিভাগে কার্য করিতে-করিতেই, উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের সহিত কোন সামান্য কারণে ঈর্ষা গোলাযোগে উপস্থিত হওয়া, স্বামীজীর চিত্র বিরক্তভাব ধারণ করিল। ভবিষ্য জীবনের যথোপায় দৈর্ঘ্য সেই দিনই স্বামীজীর রিম্মতিতে দীর্ঘ শান্তিময়ী প্রতিমূর্ত্তি একবার দেখািয়া দিল। স্বামীজী প্রতিভা করিলেন “দরবার হইতে এ গোলাযোগে মিটিয়া গেলে, আমি নিশ্চয়ই সম্ভারের স্বর্গত ছাড়িয়া শান্তিপথের পথিক হইব, একদিনও বিলম্ব করিব না।”

এতদিন যে প্রবাহে জীবনের ঘটনাজ্যোত বহিতে ছিল, সে প্রবাহ কিরিতা গেল। উপর-দরবার হইতে সকল গোলাযোগে মিটিয়া গেল; স্বামীজীর প্রতিভা পালন করিবার অবসর উপস্থিত হইল। পরদিনই ক্রোধকে কিছু না বলিয়া, বালা-মহচরণের নিকট অশ্রুপরিপ্লুত লোচনে অভিমুখি বিদায় গ্রহণ না করিয়া, জনের প্রথম বিকাশ দিন হইতে সেই বিন পথকে যে হানবৎকি, হইতে প্রিয়তম বলিয়া জান ছিল, তাঁহার মায়ার দৃষ্টান্ত না করিয়া, মেঘসুপ্রাণ ও স্বর্গজন্মের ভবিষ্য রিরজ্ঞত্ব চুপরাশির অপেক্ষা না করিয়া, স্বামীজী বিরক্তহৃদয়ে হায়দ্রাবাদ নগর পরিত্যাগ করিলেন।

স্বামীজী যখন ভ্রমচারিগণের হায়দ্রাবাদ-পরি-ত্যাগ করিলেন, সেই সময় বাপোয়া-বান কাহারে বলা, ভারতের লোক তাহা জানিতেন না। আজ কাল যেমন অনেক কানেই ইংরেজ রাজ্যে শাসনের তত্ত্ব শাখির পূর্ণ জ্ঞান পরিচয়মান হইয়া থাকে, সেই সময় ভারতবর্ষে অজ্ঞতা দেখিত যেনে তাহা ছিল না। অনেক দরবার মণ্ডিত ওজন

অনেক সাধু পবিত্রকে প্রাণ দিতে হইত। অনেক
মুন্ডাবাক তরবারে কার্যকুশলতার তখন
বহিষ্কৃত পবিত্রের সর্বপ্রকার প্রায়ই সম্মতি হইত
নামোজী হাময়মুবাণ 'পবিত্রত্যাগ করিয়া উত্তর
পবিত্রের পথে আসিতে, আসিতে অনেকবার
দুঃখ ও তরবারে হাতে পড়িয়াছেন। এমন বি
হুই তিনবার তাঁহার জীবন-সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে
কিন্তু তিনি যি আলোকিক দৃষ্টি-দৃষ্টির ওপরে যোগ
সকল বিপর হইতে পবিত্রত্যাগ পাইয়াছেন।

এইপ্রকার পথে নিত্য নিত্য নতন নতন
বিপদ্বারিধিতে পতিত হইয়াও তাঁহার প্রতিজ্ঞা
কাণ্ডে অন্তঃকরণের স্বভাবসিদ্ধ দৈর্ঘ্যে বিলীন হই
না; বরং তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের বল দিন দি
নকপাঙ্কর শশিকলার ছায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইকার পথে বহুতর দেশে সখ করিয়া
 বাসীরা প্রসারিত ছায়ায় উপস্থিত হইলেন
 তৎকালে যিহুদে সাম্রাজ্য হইতে নির্গত
 দেশেশ্যেয়ারায় বাস করিতে বলিয়া, নানাদিগ
 হইতে বহুতর পণ্ডিতগণ তথায় রাজসম্মান্যকাজ
 করিত্ব হইতেন। বাসীরা যিহুদে বিদ্যাক্ষেত্রে
 সৌখ্য বিলম্ব দেখিয়া, বহুতর পরিগ্রহ করিয়া
 তথায় পাবনি-ব্যবসায়, পুতলি-নৃনাভ্যায় ও শে
 ষত্বিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন
 ঐরা অসামান্য প্রতিভা-বলে উত্তমগ্রাধে বিদ্যে
 মুগ্ধপতি লাভ করিয়া, যোগেশিকা ও মনন উদ্ভে
 দের সহায়ার্থিতমুদ্র প্রদান করেন। পথে নানা
 দেশে সখ করিয়া গুরুরাজ প্রায় তিন মাস, হইয়া
 উপস্থিত হইরা, কথ্যনে দম্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া
 ব্রহ্মদেব ও যোগেশিকার উপস্থূক্ত হান বিবেচ
 করিয়া, তথায় অবস্থিত করিতে গাণিগণে

হরিবর- অবধান কালে নিপতব্যবাপী হৃদয়
 হিমালয়ের ওন্দান্তর গহবিরে পবিত্র কলকানন।
 প্রসঙ্গ-পুণ্যসিমালা ভাগীরথীর পবিত্র সমীপে
 দিন দিন তাঁহার মূর্ত্তরে প্রণাম ধৈর্য্যে ও ধর্ম্মোপা-
 শান্তির পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি পাচররূপে অঙ্কিত ক-
 ণিল। এই প্রকার দশ আট বঙ্গের পবিত্র ভূ-
 মিসংলব, বিহিত জরজর্য ও বিহিত যোগশি-
 ভাবে তখন স্বামীজী সেলেন্স-তাঁহার পূর্ণ
 পূর্ণ সৈর্যের আধার হইয়াছে, সংসারের নাবিক
 তাহাতে আর চাপিয়া হইবার সোভান নাহি ;
 সুকলেশ-মহাব্য-কপাতেতে মোহন প্রাণে-
 কৃষ্ণদেব ধৈর্য্য অঙ্কিত হইবার আর কোন আ-

নাহে, তখন তিনি বেদান্তাদি দর্শন অধ্যয়ন ও সম্রা
শাসন করিবার জন্য কানী আজিমখে যাত্রা করিলেন।

স্বামীজী ব্যাবসায়ের কলিত্তে পৌঁছিয়া ভাঙ্গীরঘাটতে দশাশ্রমের ঘাটের উপর, এক দেবোবায়ে অবস্থিত কুঠিতে লম্বাশনে। সম্যাস-এক কথার পূর্ববর্তী তিনি কলিত্তে সমগ্র তাম্রাশা-অধ্যয়ন করেন। এই দৃশ্যের সুপ্রসিদ্ধিমাত্রা কবিশ্রী সমাজভাণ্ডার পরদশম-গোড়োঘারী। বর্ণিতদেখা দশাশ্রমের-ঘাটের উপর অষ্টশা-বায়ের দশশ্রীপ অবস্থান করিতে। গোড়োঘারীর ভ্রাতৃ অশ্বশ্ব-শা-পাদদশা সম্যাসী সেই সময় জাতকর্মে আর কে-একর কত দেবোবা ও মৌমাশা-শ্রুত অধ্যয়ন করি-বারত্ব করিলেন। স্বামীজী ত্রুতপুষ্টিদ্বারা-ই-ইয়া, গোড়োঘারী অশ্রণ শিশু অপেক্ষা ইয়া-প্রতি আদর প্রকাশপুষ্টি একত্রে বাস্তবিকি কপি-এখের সুকৃতি তরুণিত বিশদভাবে দুখাই-নাগিলেন। এইপ্রকার অবস্থায় স্বামীজী,—বেশা-দর্শন, চিত্রশ্রী, অষ্টশ্রুতি, বাস্তবিক,—অশ্রণ-প্রকৃতি দুর্যধিমা গ্রন্থ সর্বল অজ্ঞকাল মনোপ-করিলেন। স্বামীজী অদ্বাদশ প্রতীতি, সম্য-তীর তৈরায়, প্রত্যাদিক সমান্নিতিত্ত। এই-ধার স্বাবসায় প্রকৃতি সদগুণিত্ত,—পল্লিমো-প্রদেশের বসন্ত মনোপিত্তের প্রায়ই আভোচ। ইয়া উঠিল। দেশ-দেশান্তর হইতে আসত পতি-মণ্ডলী উঠিল স্বামীজীর সহিত আকাং-কিরিষ শাস্ত্রে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন এবং প্র-অনেকে কথার বিচারশক্তি ও অসৌকিক-পুষ্টিতে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার নিকট গাঠ-পাঠ-স্বীকার করিতেন। এইপ্রকার স্বামীজীর যথো-নিম্ন দিন যখন ভক্তপূজার মনিকালর ভ্রাতৃ পরিপূ-দিত্তা করিয়া নিকুম্ভকাল অস্বাভাবিক পরিপূ-হইতে লাগিল, সেই সময় গোড়োঘারী পার্শ্বি-বেধ পল্লিমো করিয়া নিম্ন চিত্রম যুগু গ্রন্থক-ইয়া সেই সময় গোড়োঘারী শ্রুত আসনে বি-সংকারণের সহিত শ্রীবিজ্ঞানপদ-দশত-স্বামীজী উপদেশন করাইয়া গুণভক্তার বিশেষরূপে প-প্রাণন করেন।

শুগ্ধীতনামা গোড়ামীর গৌরবালঙ্কৃত অ-
 বিস্তৃতি হইয়া, স্বামীজীর যশোময় জীবন দিন
 অধিকতর উজ্জ্বলতা লাভ করিতে লাগিল।

অবস্থায় স্বামীজী সর্বদাই উপযুক্ত
বসনধরনের গুঢ় রহস্ত উন্মোচিত ক
লাপিলেন। ইহাশুদ্ধি পণ্ডিত ৩ তা
পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় মহো
পণ্ডিতপ্রবর হনৌ নী, মৌমিত্রি
প্রকৃতি অবেশ শাস্ত্র পণ্ডিতনি
নিকট বোদ্ধান্ত ও মীমাংসা-শাস্ত্র
ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্র সাধারণ
স্তাহারা বিশেষরূপে অবগত অছেন
পণ্ডিতগণ পণ্ডিতমানে পণ্ডিত
বিশ্বসামাজিক বস্তু সাধারণে অধি

এই সময় উক্ত পশ্চিম-প্রদেশে
প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ-সমগ্র-তী-খানী,
শ্বশুরের মুলোচ্ছেদ বাসনায়া, নিজস্ব অ
অসমর্থ কন্যা করিয়া, অশিক্ষিত ব
লোকদিগকে চিরন্তন ধর্মঘর্ষ হইতে
ঐক্য হইয়ে এবং নানাভাবে বিচল
ধরানো ও মধ্যস্থি লোকগণকে চি
হইতে বিচ্যুত করত নিজ মত্রে আ
এইপ্রকার বিদেশভ্রমণ করিতে ক
সমগ্রতী কানীতে উপস্থিত হইলেন।
সহিত মাগধ, কবিরা ইচ্ছা প্রক
এই সময় স্বর্গীয় মহারাজ ঈশ্বরচাঁ
সিংহ-বাহাদুরের বন্ধ-সিংহাসন অ
ছিলেন। তিনি স্বামীজীর নিকট এ
যে, দয়ানন্দসমগ্র-তী যে প্রকার
বেদবিক্ষেপ যত, প্রচার করিতেছে
তাহাকে যদি-কানীতে প্রকৃত বিচারে
করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের
ষ্টের সম্ভাবন। অতএব আপনি যদি
এ ব্যক্তির সহিত নিজের সুপ্রতিষ্ঠিত
বিচার করিতে আসেন তবে এবং সম
হইয়া বিচারের-প্রকৃততর আদায়িক
তাহা হইলে আমি আবার কৃতার্থ
কানী যথারোহের এ প্রার্থনা স্বা
হইলেন। নির্দিষ্ট দিনে বিচারমণ্ডা
কানী মহারাজ, সভায়, উপস্থিত হই
পতিতমতলীকে অত্যাধনাধূরিক সভায়
এমন সময় শ্রমীজী সভাভবে উপস্থি
স্বামীজীর ছাত্রভ্রমণ ৩ তারিখের
শয়ের সহিত প্রথম বিচার হয়।
সমগ্রতী সেই বিচারে পরাজ হইলেন।

পার্মি-ব্লকে
পা নুইহেতে
চরণ তর্করত,
চক্ষু স্নায়রত,
বদনভা শাস্ত্রী
স্বামীজীর

স্বামীজীর সহিতই বিচার করিতে ই
কিছু অশুভবেশে সে বিচারেও
বিবিধরূপে পদাশ্রয়ইয়া বোম্বে মে
দশী পত্রিত্যাগ করিলেন। ইহা
কোনদল সমর্থতা আর কখনও
বিচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, মহাপুত্র
পাণ্ডব রথীন্দ্র সিংহ স্বামীভোক্তা কার্যে
এক বিহিতকল্পে তাঁহার পুত্র
পাণ্ডবের প্রতি কি হাজা হাজা
কিয়ার পূর্ণ দানীকি হইলেন,
প্রাণান্ত কোন বিষয়ে বিদ্যমান না
নার নিত্য নিরীক্ষাভিত্তিক বোধিয়া
বলিত্তি অশ্রুণ কহিলেন, “আজু কার্য
জামশ্রী অযোগ্যিত প্রাপ্ত হইলে
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণপণ শত্রুধোদন না
হইত, এই অশ্রু অশ্রু হইয়া কহিলেন,
ভাষ্যের স্থানান নপতপ্তপণ ব্রহ্ম হই
অদ্যদুর্ভাগ্যক দৃষ্টি নিবেগন করেন, তা
শীঘ্র ভাষ্যের স্থানান সার-সম্পন্ন হইয়া
পাইবে না।” ইহার পরেই মহাপুত্র
কানীতে একটা সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন
শায়ে, ব্রাহ্মণকণ বিহিতকল্প ব্রহ্ম
সম্পদা ছাত্রপণপণ অযোগ্যিত কহিলেন
সেই পাঠশালায় অযোগ্যসকল সার
নিমিত্তই মাদিক অর্থ-নাশক ও প্র
কল্প জন্ম বিহিতকল্প ভাষ্যের ব্রহ্ম
যেওয়া হইল। মহাপুত্র রথীন্দ্র সিংহ
সংস্কৃত বিদ্যালয় এখনও কানীতে
রখিয়াছে। আর সেই খণ্ড বিদ্যালয়
সংস্কৃত-বিদ্যা গ্রন্থ কবিত্তেই
সংস্কৃত অধ্যয়নে ইহাণের নিত্য
হইয়া থাকে।

সম্ভব-শিখার প্রতি স্বামীজীর প্র
এবং অর্থাৎ-শান্তি ত্রাণ-মণ্ডলীর
নিম্নে জাবাঙ্গা বেষ্টিত, দ্বারভাঙ্গা
স্বামীজীর প্রীত্যক্ত কণিত্তে 'আর
পাইশা'। 'হাপন করিয়াছেন। 'আর
আজই শত বিদ্যার্থী স্ত্রীভাষ্যয়ন কর
প্রায় বহুতর-ছাত্রই ৩০, টাকী
পাইয়া থাকেন। স্বামীজী নিজের
পাইশাখানায় জাবাঙ্গা করিয়া

পাশ্চাত্যের প্রভুত্বের স্বাক্ষরময়ী ছায়া নিশ্চিত
হইয়া—দর্শকদিগের অপরূপ আনন্দ—উৎপাদন
করিতে লাগিল। কল পূর্ব-সমাপ্তিও শাখাশাখা
সম্ভা-সমীপের সফলিত হইয়া স্বামীজীর সংস্কারের
জন্ম বুঝাঙ্গির যেন অসীম উৎসেপ প্রকাশ
করিতে লাগিল। পল্লীসমাজ দ্বিধাধিকৃত বিচলিত
করিয়া গগন সমুদ্রে বায়ুতরঙ্গে নিজ নিজ স্বর-সহরী
নিশাধিতে নিশাধিতে কোথায় প্রকাটিতে আরম্ভ
করিল। এক একটা তাত্কা পগন প্রান্তরের
এপানে ওপানে আস্তে আস্তে দেখা দিতে
লাগিল। সন্ধ্যারূপ পশ্চিম গগন হইতে তখনও
অস্তহিত হয় নাই।

প্রভুতি-সেবীর এতদূশ মনো-মোহকর ভাব
বিলোকন করিয়া স্বামীজীর সুস্বাধিকরণের ক্ষয়
অন্ততঃপূর্ণি আনন্দ ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া
উঠিল। স্বকলেই তখন স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা
করিলেন যে “অব্যোধ্যা ত এখান হইতে দুই
ক্রোশের অধিক নহে, সন্ধ্যার সময় চলিতেও
আমাদের কোন কষ্ট হইবে না। যদি আপনি
অমুখিত করেন ত আমরা সকলে পরস্পরেই
অব্যোধ্যায় গমন করি; কারণ গাড়ীতে যাইলে
প্রভুত্ব ও অনির্জনচরী শোভা আমরা সমুদ্র-
রূপ ক্ষয়ক্ষয় করিতে সমর্থ হইব না। স্বামীজী
উত্তর করিলেন, “তোমাদের প্রস্তাব অতি সস-
মান প্রকৃষ্টি ও সম্মতির শোভা বিলোকন করিয়া
আমাকে ইচ্ছা হইবেছে যে, আমিও পরস্পরে
যাই; কিন্তু ল্পদগণের আশ্রয় বুঝাব্যায় উপ-
নীত করিয়া আমার হাঁটবীর সামর্থ্য কাড়িয়া লইয়া-
ছেন। নতুবা আমিও তোমাদের সহিত হাঁটিয়া
অব্যোধ্যায় প্রবেশ করিতাম।” অনন্তর স্বামীজীর
আশ্রমের সন্ধ্যারীপাড়ী ফিরিয়া দেখিয়া হেল
কেনন পুরোক্ত বয়েলী চারিখানি গাড়িতে
আজ্ঞাকার্য্য অধ্যাপি উঠাইয়া দিয়া সকলে স্বামীজীর
পশ্চাতে পরস্পরে অব্যোধ্যায়মুখে যাত্রা করিলেন।
স্বামীজী ছিলেন একখানি শিবিকাতে। রাতি প্রায়
১০ মাসে সাতার সময় সকলে অব্যোধ্যায় উপ-
বিত হইলেন।

স্বীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

রাধানাথ।

গোলাপহুন্দরী প্রকরণ।

দ্বিতীয় অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কিসে কি হয়, তাহা ভাল বুঝা যায় না।
কেন হয়, কেনও করিয়া হয়,—তাহাও স্থলস্থল
হয় না। অথচ হয়। ঐ পূর্বমীর শশধর যোল
কণায় পূর্ণ,—কিন্তু প্রতিগন হইতে ক্রমে ক্ষয়
করাই; নিদ্রি নিয়মে, নিদ্রি পরিণামে, আলো-
কের ক্ষয়,—অন্ধকারের উদয়। অন্তিমে আশ্রয়
কিছুই নাই, কেবল খোর অন্ধকার। আবার
ভক্তগণের অন্ধকারের ক্ষয়, আলোকের উদয়।
আবার সেই নিদ্রি নিয়মে, নিদ্রি পরিণামে
অন্ধকারের ক্ষয়, আলোকের উদয়। অন্তিমে
পূর্বমীর কিছুই নাই,—কেবল আলোক, আলোক,
আলোকে! “অনন্তকালই এই ভাব।” গোপা-শোক-
জ্ঞা-জ্ঞান নাই, নিরা-তলা-আলত-ওগানী নাই,
কৈবল্য-বৈদ্য-বাহ্য নাই।—বাজ-বল-বাহ্য-
বিদ্যাত নাই,—সেই একই ভাব। নিদ্রি নিয়মে,
নিদ্রি পরিণামে, নিদ্রি গতিতে কেবল
ক্রমে-বৃদ্ধি দেখে নাই, উচ্চ-নীতি দেখে নাই, নরম-
গরম দেখে নাই। কেন এমন হয়,—কেন
ভারত হয়—কিছুই ত বৃষ্টিতে পানি না।—প্রভাট
প্রভাতে নিদ্রাত্তরে পর পর প্রকোপন করিয়া পৌ-
পূর্বদিক পরিবার,—স্বর্ঘ্যেব উদিত হইতেছেন,
আমি ইহাই অস্ত্রত মৌহিনী বৎসরকাল মিলে
দেখিতেছি—একটা বিনের জল কোণে ব্যতীত
নৌক নাই, বা শুনি নাই। অশীতিবৎসর কাল
আমার পিতামহ ঐক্লবী হইত দেখিয়াছিলেন।
ওগানে হেটীয়া এবং আন্ধার,—উভয়েই স্বা-মরপ
পূর্বদিক হেটীয়া দীর্ঘকাল করেন। যমরাজ
যুধিষ্ঠির, বা প্রজ্ঞা রামকৃষ্ণ এ নিয়মের কোন
ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেন নাই। চরিত্রন একই
ভাব। বারমাসে ছয় কড় বেশ পণ্ডিত্যের আশি-
তেছে, ঘাইতেছে,—কখন শীতে ধর-ধর কম্প-

মান,—কখন গ্রীষ্মে আইটাই-হুইকট। কখন
ধরাতল মরুভূমিবৎ শুষ্ক, কখন বা বিশ্ব প্রান্তে
শেষ ভাসমান। নিয়ম ভঙ্গ হইবার যো নাই,—
বারমাসেই নিদ্রি নিয়মে ঐক্লব। দিবস সাণা,
রাতি কালো,—অনন্তকালই এতর।

এই মজল সংসার-মজার কারিকর কে?
কল-কখন বিকল হয় না,—একই ‘দমে’ অনন্তকাল
অবিচলিত একইভাবে চলিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই দার্শনিক ভাট্‌ঘর একখানি ধর্মগ্রন্থ প্রবচন
করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাধীনচেতা,—নিম্প্রভ-
বলে, বিবেচনা-বলে এবং বিবেক-বলে বাহা ভাব
বুঝিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বাহা-প্রবে গণিবদ্ধ করিয়া-
ছেন। তাঁহার অস্তর পরামর্শ লন নাই,—
মুনিম্বর মস্তত্যে ত্রাণ করেন নাই,—বেশ
তাঁহাদের জ্ঞান এবং বিবেক বাহা বলিয়া গিয়াছে,
তাহাই তাঁহার করিয়াছেন। ভাট্‌ঘর গ্রন্থ-প্রবচনের
পূর্বে বলিতেন,—“সমগ্র ভাট্‌ঘর আমরা জন্ম
করিয়াছি; শোকের রীতি-নীতি শুধুকে পৌ-
রাহি,—পতনের হুমিন হয় প্রত্যক করিয়াছি।
হুতরং, আমরা বৃষ্ণ-জাতির্গণ ‘ভৌমরতি’ গ্রন্থ মত
প্রভৃতির কথা গ্রন্থ করি কেন? তবে যে যে স্থলে
আমাদের মতের দৃষ্টি মত মিলিল,—
তখন আরও মতকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে
পারিব না।”

সে বাহাই হইক, দার্শনিক ভাট্‌ঘরের ধর্ম-
গ্রন্থের সমগ্ৰ-সংগ্রহ এইরূপ।

প্রথম অধ্যায়।

কামিনী মস্তকের পালকাত্ত মণি,—পূর্ণায়,
রত্নায়, বরুণায়, রমণায়, কনয়, পুণ্ডরায়, অনির্ক-
চনায়। কামিনীই সারাসংসার, পরাপংসার, সন্তি-
ধরাত্ত, কামিনী যদি না থাকিত, তাহা হইলে
সংসার অজল হইত। এহেন নারী-জাতি কোনও
রূপে, কোনও কারণে, কোনও সময়ে, কোনও
স্থানে, মারিতিক, মানসিক বা আত্মিক—অথবা
আত্মভৌতিক, আত্মদৈবিক, বা বৈজ্ঞানিক কষ্ট,
ঘরবা, পীড়া, বৈদিক, জালা,—কখনও, বন-
কন—কটাই, কুইহুই,—আবা-আবা, উচ্চ-উচ্চ,
হায়-হুই, গোলাপ-গোলাপ,—ইত্যাদি রূপ ব্যাপার

শীতে না দেখাইয়া সর্বতোভাবে প্রেরয়। বোধ
হয়, হুণীপংসার অধিগিত নাই, ক্রমশঃ প্রাণতঃ
কামিনী-কুল বৃদ্ধিও হইল। ইদানীং—এমনও শুনা
গিয়াছে, কোন কপোত—বা কাকিল, কোন
কামিনীর নিকট দিয়া উড়ীন হইয়া গেলে, সেই
পক্ষীর পক্ষের প্রাণতঃ সেই কামিনীর কোমল
অঙ্গে বিঘর্ষ বাধা জন্মিয়া থাকে।—একই বেগে
বায়ু বাহিলে, কোন কোন কামিনী উড়িয়াও
গিয়াছেন,—কোন কোন ইতিহাসে এক কথাও
লিখিত হইয়াছে। নিদ্রাতে কোন রমণীর গায়ে
কোটা পড়িয়াছে, মোক্ষমূল্যের বেগে একথাও ত
পাওয়া যায়।

এতলে বোধ হয় বৃদ্ধিই বুঝা গেল। কামিনী
পদার্থটী কি? পদার্থের একবার নিয়ম হইলে,
আর ভাসনা কি আছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

“উদ্বিগ্ন কামিনী-কুল,—কাহারও হীলোক
হইলেই যে, স্ত্রী, নারী, রমণী, কামিনী, ভানিনী,
ললনা, মালা প্রভৃতি পদবাচ্য হইলে—তাহা
নহে।—জরাগ্রস্তা, স্বর্গভুক্তা, পুরুষকী, কোইনা-
মুখী বৃদ্ধাপা; নারী-জাতি মধ্যে গণ্য নহে। আবার
এবধিক স্ত্রুতপারিনী শিশু-কণ্ডা,—পুণ্ডম বা
নরমবয়সী বাণা—নারী-জাতি মধ্যে গণ্য নহে।
চতুর্দশ হইতে ক্রিষ্ণ নান চরিত্র বৎসর পর্যন্ত
স্নাই নারী-জাতি—ইহা যেন সকলের জ্ঞান থাকে।
এই নারী-জাতি আবার তিন ভাগে বিভক্ত। ১ম
১৪ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক নারী-জাতি
উক্তনা, ১৯ হইতে ২২ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক নারী-
জাতি মধ্যমা, ২৩ হইতে ক্রিষ্ণ নান চরিত্র বৎসর
পর্যন্ত বয়স্ক নারী-জাতি অধ্যমা। এই উক্তম,
মধ্যমা, অধ্যমা—এই তিন শ্রেণীর রমণীকে বর্ণা-
নিয়মে উক্তম, মধ্যমা, অধ্যমা রূপে পরিগ্রহণ,
পরিপালন এবং পরিচর্যা করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তমা-নারী অর্থাৎ চতুর্দশ হইতে ঊনবিংশ-
বৎসর বয়স্ক নারীই স্বর্ণশ্রেণী-দেবী-স্বর্ণরূপী। হুতরং
কোটার মনে কট প্রেয়া বা ভৌম কোন কার্যে
ব্যাকৃত জ্ঞান—মানসের কর্তব্য নহে। উক্তমা
নারী স্বাধীন। বেচ্ছা-চারিত্রী হইলে—পুরু-
ষের গণে গোঁড়াভা এবং বহু চরণাভাও বিহ-
শেও, পুরুষের কোনও প্রতিবাদ করিবার অধিকার

নাই। 'অতিথ্য' দূরে বাড়িক, কেবল দক্ষিণপাশে চাপড় খাইলে, পুরুষকে 'তৎক্ষণাৎ' বামপাশে উত্তমা নারীর অঙ্গে বাড়াইয়া দিতে হইবে;—এই মতে বলিতে হইবে,—ওহে উত্তম! আমার বামপাশে কি অপরাধ করিল, আপনার কোমল-করিতমু-কর্জিত হৃদয়ে আঘাতের আদান-করিতে সক্ষম হইল না। বিশেষ, একটা গাওঁ চড় মারিয়া আপনি অর্দ্ধেক কাঁধা মশামুর করিয়াছেন; দ্বিতীয় পাশটিতে চড় মারিয়া আপনি অর্ধ কাঁধা মশামুরকে হুমসায় করুন;—এতৎ আপন কাঁধা করি নব্বুন আপনার 'আধকপালে' ধরিতে পারে। তখন আপনার অধকপালে-রূপ বিঘ্ন মাঝব্যাখ্য নেশিয়া আমি কেবল জীবমুত হইয়া থাকিব।'

চরম অধ্যায়।

উত্তমা নারীর বিবাহ করিবেন না। কেবল প্রিয় বালিক পার্বে, বসিয়া পতি প্রণয় শিখা করিবেন। ইহার সাধারণ নিয়ম। বাহারা এ নিয়ম প্রাণোপালন করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম,—তাঁহা নিগূঢ় কোন কোন মহাবী 'অত্যন্ত' নারী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। পবিত্র প্রণয় কথিতা পাকা হইলে, বিবন্ধ-সুখি বিশেষরূপ বিকশিত হইলে,—উনিবিশতি বৎসর বয়সের শেষভাগ হইতে বিবাহ-কাণ্ড আরম্ভ হওয়াই প্রার্থনীয়। ইহার পূর্বে বিবাহ হইলে, পিত্তা হর্ষণ রূপ, এবং ভারতাকারে যক্ষম হইবে। হৃদয়ব্যাপার বিশুদ্ধের এক-বিবাস এই যে, 'অষ্টমবর্ষে কস্তার বিবাহ দিলে শ্রৌতগানের মহাফল হয়; নবমে চৌথিতী, দশমে কস্তকা, তার পর ব্রজস্ব-কাল।' আমাদের উত্তমব্রজ শতাব্দীর সভ্যতার সূত্রে, উনিশ বৎসরে কস্তার বিবাহ করিলে, যদি শ্রৌতগানের প্রকৃত ফলফল কিছু থাকে, তবে তাহা শাত কাণ্ড বার। আমাদের পশ্চিম বংশেরের কুমারীকে চৌথিতী বলা গিয়া থাকে। আর, ব্রহ্মিণ কস্তকা প্রোক্তা,—অতঃপাশ ব্রজপশা।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিবাহার বিবাহ সর্কারে, সর্কার-কর্ম পরিভাগ করিয়া, সম্পন্ন করিতে হইবে। পতি পক্ষের পাঁচিলে, এ নিয়ম ত সর্বদা-সহিত বটেই,—আপতি পতি দুইপক্ষে থাকিলে, পর-পুরুষের সহিত স্ত্রীর বিবাহ সম্বন্ধে সদা স্তব্ধ-বদ্যক। অমিক কি,—পতি প্রভাতে পাণ-চালি করিতে-করিতে গোলাদীপ

পুষ্ট গিয়াছেন, পতির এরূপ অস্থপরিহিত কালেও স্ত্রীর দ্বিতীয় পতির পানিগ্রহণ সময়-বিশেষে নিভাত নিম্নদ্বীয় হইবে না। অমিক আর কত বলিল, পতিতী নিয়-ধরে; পাণ্ডে কোড়া, গুণিবার যে নাই; এজন সময় উপর ধরে অস্তপতির আশ্রয়-গ্রহণ-কালিত্তী স্ত্রীর স্বভাব, সভ্য-সমাজে নিরুদ্ধ শশ ধরার ছায়া সোয়া-আমোদ হইবে। আর বৈদ্য বসিতে মুখ ব্যাধা করে। পতির সহিত সতী-নিমাণোমে এক শয্যায়া শায়িতা। পতি নৈশ ডাকাইয়া নিদ্রিত, সতী দীর্ঘ নিদ্রায় ফেলিয়া আগরিত। সুতরাং সতী যদি দীর্ঘ দীর্ঘে থিল খলিয়া, বহির্দেহে আগমনপূর্বক অস্ত পুরুষের কর-কমল ধারণ করেন, তাহা হইলে, স্বচীন-বিশেষে, উহা কিঞ্চিৎদূরও ঘোষাবহ হইবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপরে বাহা লিখিত হইল, তৎসমস্তই ঈশ্বরের আদেশ। আদেশ ত বটেই, কিং এতদতিরিক্ত ইহা বিধান, বিবেক এবং স্ত্রীসমাজে স্ত্রীস্বত্ব নারীপদের কাম্যদিত্তে অদ্ব সঙ্গী হইতে থাকে। এমনও শুনা গিয়াছে,—এই অধিহারা অনেক নারীর ঘরে ভ্রমীভূত হইয়াছে। কেব বা এই প্রেমীর কোন কোন নারীর বেহ এই আশ্রমে বাড়ি-জলিতে দেখিয়াছেন। ঐ আশ্রমটা বড় যারাপ-পাল। ঈশ্বরের আদেশপালন ভিন্ন নারীভক্তি এই প্রজলিত হস্তাশন হইতে বাঁচিবার অস্ত উপায় আর নাই। এমন সমস্ত-পর স্ত্রীম, জ্ঞানবশের পর নিদ্রা,—রাত্রির পর বিদ্রা,—এ সমস্ত স্বপ্ন-বিশ্ব-অবস্থাভাবী নিয়ম; তেমনি অত্যন্ত নারীপদের পক্ষে ঐ আশ্রমটা স্বভাবসিদ্ধ অবস্থাভাবী আশ্রম। যখন নারীর কষ্ট, স্বস্ত্রণ বা দগ্ন হওয়া, পতিপন কাল পুরুষের পক্ষে একটা নিষিদ্ধ, তখন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে নারী ঐ কষ্ট যেন-তেন প্রকাশ্যে,—ছলে বলে-কৌশলে,—যে কোন উপায়ে হউক, দূর করা পুরুষমাত্রেই একান্ত সর্বব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

অত্যন্ত নারীপদ অত্যন্ত কারণেই পতিভাগ করিত পাইবে। পতি,—উত্তমরূপ ইহাঙ্গেরী-লেখা-পড়া জালিলে,পরিভাগ করিতে হইতে পারে; পতি—কেবল সংস্কৃতভিজ্ঞ সতীক ভাটীচাড়া ব্রাহ্ম হইলে, পরিভাগ হইতে পারেন; পতি,—দীপ্ত-প্রাণে সমতায়ে গায়ে পরিবাহ, পাণ্ডে এটাকিন

রাধিতে মন্থন না হইলে পরিভাগ হইতে পারেন; পতি,—ত্রীকো একাকিনী পুণ্ডিঘোটার সেবিত্তে না দিলে, পরিভাগ হইতে পারেন; পতি,—ত্রীকো স্বাধীনভাবে যন্ত্রস্বাভাসে পুরুষ-বন্ধুগণের সহিত বিভ্রম করিতে না দিলে, পরিভাগ হইতে পারেন; পতি,—স্ত্রীর উপর পূর্ণ হইবার পূর্বে অহায়াদি কাণ্ড সম্পন্ন করিলে, পরিভাগ হইতে পারেন; উল্লিখিত স্থলে, পতি পরিভাগ করা না-করা নারী-জাতির ইচ্ছাভাবী রহিল। কিন্তু কালো-রঙের পতিকে বহু বক্তিতে বিবে না; নীল-রঙের পতিকে গোয়ায়ে উল্লিখিত দিলে না; ভূমা-নিদ্রিত আলু-কাণ্ড-রঙের পতিকে সে পাড়া দিয়া পথ চলিতে দিলে না। যে পতি মেটে-মেটে রঙ, তাহারে রামা ধরে ছোঁড়া নাহুরে ভুগাইয়া রাখিলে; যে পতির মুখে বসন্তের দাগ, তাহাকে কিসে কাছে আনিতে দিলে না; যে পতি উজ্জ্বল মাংসবর্ণ বলিয়া পরিচিত, তাহারে ব্রজ শ্রীমতীর শয্যা বাটে পার্বে এতদ্বাদি পাণ-ছোট কোড়াকারের পুরাণ তক্তাপোষের উপর শয্যা প্রকৃত করিলে। পলায় গরগও কোমরে বাত, পাণ্ডে পোদ—এমন পতির মুখ পানে ঢাকাইলেও,—নারী জাতি উপর, পানপূর্ণ করে। 'গদা-বৈদ্য' পতিকে ঢাকাঢাকা পানপূর্ণ, দেশ হইতে দূর করিয়া দিলে;—তৎপরে এক নগর-সক্টা-জন করিয়া, ঈশ্বরের সহিত প্রেমোলাপপূর্বক পতি-বিভাগ-কর্জিত মনাকর্ষ দূর করিলে। যে পতির ইহাঙ্গেরী উজ্জ্বল ভাল নয়, যে পতির শৈলি কবিতা কর্তব্য নাই, যে পতি প্রেমসঙ্গীত এবং প্রেমোলাপে পারদর্শী নহ,—এমন পতি,—ত্রী শৈশ-জামলে, বর্ফিতা হইয়া রাত্রি আভিঃ প্রহরের পর গৃহে প্রত্যাপনন করিলে,—যদি রাগ ক্রমে বা রাগের লক্ষণ প্রকাশ করেন, অথবা সামান্য-সংস্পর্শে কোন ক্রোড়া করেন, তাহা হইলে, সেই স্ত্রীর তৎক্ষণাৎ স্ত্রীয় প্রাণপাত্তকে পরিভাগ করাই পরম ধর্ম। পতি অসুখল থাকিলে, বুকে বা দিয়া দখিলে,—ইপারি থাকিলে, সুখে সেপ চাপা দিয়া রাখিলে;—মাথা বোয়ার অস্থ থাকিলে, স্বর বেলে বসাইয়া রাখিলে। পতির একবাছি চুলে পাঙ্কিলে, মাথা নেড়া করিয়া খোল চালিয়া দিলে। পতি কোন স্ত্রীচরিত্র-কথা যুগ দিয়া উজ্জ্বল করিলে, চিত্তকে পোড়াইয়া, পান উক্টকে করিয়া, তৎপরেই পতির মর্মহাসনে ছোঁকা করিল।

ভাতঘরের ধর্মগ্রন্থের এই সংক্ষিপ্ত-পর পাঠ

করিয়া, প্রকৃত মূল ধর্মগ্রন্থটা যে, কিন্তু উত্তমরঙের, তাহা বিজ্ঞ পাত্রকণ অবশ্যই জয়দ্রুম কুরিয়া থাকিবেন।

ভাতঘরের মূল সর্কারকর্ম উপলপ্তাশন লোক। কিন্তু রাশনী, ভাতা ভিন্ন উত্তম ধর্মগ্রন্থের নিয়মাবলী অস্ত কোন ভাতা বিশেষ আশ্রায় সহিত অনুদানন করেন নাই। ইহাতে ভাতঘরের ছুপের পরিসীমা ছিল না। সে বাহা হউক, প্রকৃত ধর্মগ্রন্থের উপর ভাতঘরের অধ্যা বিধান, অতঃপাশ তত্তি-এং, অনন্ত ভালবাসা ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হুজুরী এবং তাঁহার স্বামী পোহলকে প্রথম দেখিলাম। ভাতঘর স্থির করিয়াছিলেন,—শ্রীশ্রীমতী মহাদেবী হুজুরীর পতি কখনও পোহলো মুচি হইতে পারেন না। ঢাক ঢোল বাজাইয়া সৌকর্য বিবাহ হইলেও হুজুরী কখন আলৌকিক বা আধ্যাতিক বিবাহ পোহলো মুচির সহিত সম্ভাবিত নহে। স্বর্গীয় চন্দ্রের বিনল হৃদা, কখন কি, পার্শ্ব, পচা পাকের নিকট ভিত্তিতে পারে? অবলা নগিনী কখন কি পতীর 'গর্জনকরা' গভীরের গাত্র-মাটিয়ে একাসনে উল্লিখিত হইতে পারে? মরি। মরি। শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের অমলবল কেশুমুদ্রাশির দ্বারা এই কোকো-মুচিগুণ সোম্বরের রাণা, কি চিরদিনই অবিভক্ত হইতে থাকিলে? ধনির নিয়মায় গর্ভে কি এই কোহিমুরূপিত হুজুরী অনন্তকালই লুপ্তায়িত থাকিলে? এই প্রজন্মলার মালা অসুদিনই কি এই বক্তৃপের বানরের গলপেলে লিপ্সিত থাকিলে?

তাহা কখনই হইবে না। হইতে পারে না। হইতে দিব না।

সেই শ্রীশ্রীশ্রীমতী স্বামীদার-গৃহে হুজুরীকে প্রথম সম্বন্ধন করিয়াই সেমি ভাতঘরপলের মনোবলো মনসভাই এই ভাবই হুজুরী হইয়াছিল। তখন তাঁহার আরও ভাবিয়ারছিল,—'এখন উপায় কি? হুজুরী হুজুরীর দূর করিয়া উপায় কি? হুজুরী দিয়া কোহো-মুচি-এই বা সংপথে আনিবার উপায় কি?' বলা বাহুল্য, ভাতঘরকে অমিক ভিত্তি করিতে হইল না। হুজুরী প্রকৃত পোহল,—উত্তর পূর্ণ-বহিয়া, অম বাহিবার গালা, সহজেই কলিকাতা আদিত্তে পীকৃত হইল।

কলিকাতা আসিয়া পোখল হারাইয়া গেল। পোখলকে হঠাৎ একপ হারাইয়া ফেলা—ভাড়াঘরের অভিশ্রাব ছিল না। এমন কি, পোখলকে সে দেখিয়া ভাড়াঘর বিশেষ চিন্তিত হইলেন; এবং সেই রাতে নানাশ্রমে পোখলকে পুটিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইলেন না। রাতি প্রায় নয়টার সময় শ্রুতমনে তাঁহার গৃহে প্রত্যাপিত হইলেন। তাঁহার আশ্রয় একটা বৃদ্ধের রমণীর কাছে-কানে কি কথা বলিলেন। ক্রমশঃ আরও দুইটা রমণী সমাগণা হইলেন। একটার পরস পর; অষ্টমটার বদন বর্ণিণী। তখন ঐ তিনটা রমণী এবং ভাড়াঘর—এই পাঁচজন একটা সভা আহ্বান করিলেন। সভায় ঊরুপ ফুলারস কাপে-কাপে কথা চলিতে আছিল। ধীরে-ধীরে কথা কহিতে কহিতে ক্রমশঃ দ্বন্দ্ব একটী দৃষ্ট, হইয়া পড়িল। ৩২ বয়ীরা বলিলেন—“মেয়েটা বড় শাঙ্কর।”

২১ বয়ীরা। নেহাৎ পাড়াগায়ে মেয়ে—কিছু জানেন না।

২৬ বয়ীরা। আমি অনেক খোঁজামোর কর্তে, তবে দুটা-একটা কথা কহিবেছি।

৩২। মুখটা সহাই ছোট করি থাকে,—নেহা সহাই স্তম্ভিত।

১৮। আমি যদি ছুটি হাসি-খুসি আমোদ-প্রমোদের কথা পাড়ি,—তবে সে আরও লজ্জিত হয়—আরও চুপ করে মুখটা বুজে থাকে। তবে আমাকে কিছুতেই পরাবার তাহা—আমি তার সঙ্গেই হারাই মর্যে কতকটা ভাব করে ফেলি।

২২। আমি তাকে ইজি-চেয়ারে শুইয়ে রাখলাম; এবং একটা গোলাপী ফিলি-ডেলি-লিমা, মুরিকা-ফলের মালা একপাছি পলায় পরাইয়া দিলাম। বললাম,—ভগিনি! এই চেয়ারে শুয়ে-তবে একটী খুশির কদ,—আমি নিজে তোমার বাথার নিজে—আসি। আমার কিরিয়া আসতে আরম্ভকটা মাত্র দেবী হয়েছে—আমিয়া দেবি, ফলের মালাটা গলা থেকে গুলে—টানমেনে ঘরের দেয়ালে ফেলা দিওতে; আর নিজে ইজি-চেয়ারে হইতে নানিয়া খাটাইকরা সেক্টর উপর ভয়ে গুমিয়ে পড়তে। পা-পোনাটকে মাথার বালিশ করতো। আমিতু দেবীয়াই অবাহ! ভাবলাম,—এ কোথাকার মেয়ে গো?

ভাড়াঘর একপ নানা কথা শুনিয়া একটী বিষয়

হইলেন। শেষে বলিলেন,—কেন চিন্তা নাই,—একটী শিখায়া-পড়াইয়া কহিতে হইবে; ক্রমশঃ বেশ সকল সংশয়ের হইয়া আসিলে; একদিনে রোমন-নগর নির্মিত হয় নাই। জন্মমাত্রেরই অর্জুন পাণ্ডাব-বারী হয় নাই। একদিনে কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত রেলপথ বসে নাই। সের্যে ধর,—যেই ধর—অবশ্যই হুফল-কলিবে; এখন যুক্তি এই—হুফলনয়নীকে অন্য রাস্তে তাহার স্বামী-গোছের নিকটস্থ হওয়ার বিষয় বলিয়া কাজ নাই। এই কথা কুরঙ্গকে বুঝাইয়া বলিলে যে, তোমার স্বামী নিয়ন্ত্রণকে বজ্জলে শুইয়া রাখে। আর, এককথা,—অন্য রাস্তে হুফলের সহিত অধিক কথা কহিবার আবশ্যকতা নাই। পাশে যে, ক্রান্ত হইয়া আসিলে,—নিম্না গিয়া প্রম দূর করুক। বেবেল তোমাদের একজন মাত্র রমণী হুফলের কাছে গিয়া শয়ন করুক। সভায় স্থির হইল,—বাহার ব্যয় যোগ বসায়, তিনিই গিয়া হুফলের নিকট অল্প রাস্তে শয়ন করিবেন।

সেই যেমতীরমণীর নাম শ্রীমতা চামেলি। চামেলি বড় আশ্চর্যে ক্ষেপে। হাসি, তামাসা, লক্ষ-ক্ষপ, গাল-গল্প লইয়াই তিনি কতকটা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন।

ভাড়া প্রায় সাড়ে নয়টা। চামেলি লাফাইতে-লাফাইতে গিয়া হুফলের গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, হুফর আড়ষ্ট হইয়া চকু মুদিয়া শুইয়া আছে। তারি আলো দপ দপ করিতেছে। চামেলি গৃহে প্রবেশমাত্র অমনি হুদিয়া বাসির আলো কিরিয়া দিলেন। কান্নাং করিয়া বেগে হুফর রুদ্ধ করিয়া ঘরে বিয়া দিলেন। গলায় আগোজ একটী গল্ভীয়া করিয়া বলিলেন,—“আমি পুরুষ মাংস—আমার খাটে স্ত্রীলোক ভয়ে কে?”

হুফল-নয়নী চমকিয়া উঠিয়া বাসি জড়সড় হইয়া বলিলেন। ভয়ে ধতমত খাটয়া অর্জুজিত হয়ে বলিলেন,—“আমি,—আমি,—এই ওঁরা আমাকে এখানে ভাঙে বুললেন, তাই আমি ভয়েছি।”

চামেলি। বড় অজ্ঞাত। এ গভীর রাস্তে পুরুষের শয্যা দুবটী স্ত্রীলোক একাকিনী শয়না!—ইহা অতীব লোক-বিপর্জিত কথা।

হুফর। (কাতর স্বরে) আমি এর কিছুই জানি না—আমাকে মাগ করুন,—আমি এখন বিল গুলে বাহিরে যাচ্ছি।

চামেলি। হঠাৎ তাহাও-হাৎ প্যারে না। তুমি বিল গুলে বার হইবে,—আর সেইখানে দর-দার টিক পাশে যদি কোন লোক দাড়িয়ে থাকে,—তাহা হইলে সে, মনে মনে সন্দেহ করে আমার এবং তোমার উভয়েরই কলঙ্ক ঘটতে পারে।

হুফর। হেঁরা, তবে আমি কি করবো? তোমার পাশে পড়ি,—আমাকে উপায় বলো দাও।

চামেলি। উপায় ত কিছুই দেবী না। এক উপায় আছে। তুমি আজ রাত্রে এই ঘরেই থাকো। খুব ভোরে তোমাকে উঠিয়ে দিব,—মুখন কেউ কোথাও থাকবে না—এমন সময়,—খুব ভোরে—পাছে-পানায় রাত থাকতে-থাকতে দরজার বিল গুলে তোমাকে আস্তে আস্তে বার করে দিব,—কেউ তোমায় দেখতে পারে না।

হুফরী। (কান-কানু স্বরে) আমি তা পারবো না,—হেঁরা,—তোমার ছুটি পাশে পড়ি,—তুমি আমাকে বিল গুলে দাও,—আমি, শীঘ্রিগরি বাইরে যাচ্ছি।

চামেলি। ভয় কি? ভয় কি? আমার কাছে তোমার এ রাস্তে কোন আশঙ্কা নাই! আমি তোমার ভাতা—তুমি আমার প্রিয়তমা ভগিনি। ভাতা-ভগিনীকে দুইজনে একত্রে একান্তে বিভাবরী বাপন করিব,—ইহাতে কোন চিন্তা নাই। অথবা তুমি যদি একপ অভিল্যাপ কর,—তাহা হইলে আমি খাটের নীচে,—তম্বা শুইয়া থাকি, তুমি উপরে থাক। ভগিনীর জ্ঞা ভাতা কোথা ককিত সন্দেহ নাই?

হুফর। আমাকে রক্ষা করুন,—আমাকে রক্ষা করুন।

চামেলি বুঝিলেন,—“এ মেয়ে বড় কম মেয়ে নয়” যেরূপ সূচনা করিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় এইরূপ হুফর কায়দা হুফলজ্ঞে করিতে। তখন কোঁহুক দূরে রাখিয়া চামেলি বলিলেন,—“আচ্ছা, আচ্ছা,—ভয় নাই,—আমি উপায় বিধান করি-তেছি।” এই বলিয়া চামেলি মাচ-বুফরের উপর দিয়ালেশোয়ারে কাটা পিয়া দপ করিয়া আলো কহিয়া—“বাড়ীটা জালিলেন,—মেঘে বিলুপিত করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—“গেছা গেল—তোমার পুরুষমাংসকে একবার দেখে-তখন লও,—তবে খাইও।”

চামেলির সঙ্গে কুরঙ্গের ইতিপূর্বে পরিচয় হইয়াছিল। হুফর, চামেলির সঙ্গেই ইতিপূর্বে

দুই একটা কথা কহিয়াছিলেন; অতঃ কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতে সাহসী হন নাই। চামেলির বর্গে যোগ রূসর হইলেও, নৃন্দকৃত্য; চামেলির রূপাচল হইলেও এবং কথা-প্রোতপত্তী খরঙ্গ-নাট্যী হইলেও, মনটা বড় সরল, মেলাক বড় কোমল ছিল। প্রথম সাক্ষাতেরই—সরস্বতী, হুফরের সহিত চামেলির অল আলাপ হইয়াছিল,—একটী যেন ভাল গিল।

বাতিলালা হইলে, হুফর পর-পুরুষের পরিবর্তে, চামেলি দ্বিরি সহাজ মূখ দেখিয়া, দেখে প্রাণ পেলেন। মনের আচ্ছাদ গোপন করিয়া, বাহ্য রূপ দেখাইয়া হুফর বলিলেন,—“দিলি। তোমার বেশ কাজ যাহোক! আমাকে এমন করে কি ভয় দেখাতে আসছে?”

চামেলি। (হাসিয়া) হুফর! তুমি কি রাগ করো? যদি তুমি আমার উপর রাগ করে থাক, তাহলে আমি যে, যেটে এলাত প্রভৃতি গরম মসলা দিয়ে এক ড্রিপ পান সঙ্গে এনেছি,—এ গুলি সব তোমাকে খাওয়ায়।

হুফর। (হাসিয়া) না দিদি! আমাকে আর বা’ সাজা দিতে হয়, দাও,—কিছু পান আমাকে—আর খেতে পারবো না। তখন ছুটি পান খেয়েই আমার জীবন বা হয়েছে।

চামেলি। আচ্ছা, পান না খেতে পার, তবে ভাল করে একটী আতর-গোলাপ-লাবেণ্ডার-ওড়ি-কলম মাখ।

হুফর। দিদি! তাও পারবো না।—ও ওগাভে বড়ই গুপ্তক।

চামেলি। আচ্ছা, তবে একটা পান পাও। হুফরমণী একটী-আধট পান গাহিতে জানি-তেন। তাঁহার পিতৃশ্রমে অনেক ওগাভা পায়ক আসিত; তাহার পান করিত; হুফরের পিতা বাজাইত; হুফর সে সব একসঙ্গে ভণিতেন। এইরূপে শুনিয়া তম্বিয়া হুফরমণী সাজিতে কথঞ্চিৎ স্থপরিপক হইয়াছিলেন। তাঁহার ভালবোধ তাম্বু স্থপরিপক হইয়াছিল। তাহার ভালবোধ তাম্বু কাটা ছিল না।—তবে পলাটা-মিষ্ট ছিল এবং বসন্তও কাটা ছিল,—ইহাতেই হুফরের পান অনেকের কাছে অতল বর্ধক ছিল। সে যাহা হউক, পান গাহিতে জানিলেও, এসময় হুফর উত্তর দিলেন,—“না,—আমি পান গাহিতে জানি না।”

চামেলি তখন হাসিমুখ মুখে তীর কটাক করিয়া ক্রটিম রূক্ষতবে বলিলেন,—“তুমি কি আমার

একটা কথাও রাখেন না? পান খেতে বললাম—
তুমি খেলেন না। আতর-গোলাপ দিতে রাইশাম,
ওজন করে কাটিয়ে দিলে; তেঁতার মুখে পান
একটা শোনার ইচ্ছা হলো,—তা বড় কি-না
গান জানি না। ভাই! বুঝা পেলে, তুমি আমায়
ভাল বাস না।

হুসর। না,—বিদা, না—
চামেলি। আচ্ছা,—তুমি যদি আমায় সত্য-
সত্য ভাল বাসিয়া থাক, তাহলে তখন-তখন তুমি
আমার সঙ্গে যুব ধানিক গর-সর কর—রাতি ৪টা
পৃথক্ জেপে আমার হৃদয়ে হামি-গুণির মজার-
মজার কথাবার্তা কই,—পাড়গোরে হই একটা
নুন নুন শোলোক তুমি আমাকে শুনও—অবশ্য
বুঝিবে—তোমার ভালবাসা আছে। তবেত
বুঝিবে,—হুসর আমার ছোট বুনীর মত!

চামেলি এই কথা বলিয়া হুসরনুনার গল হুই
টিপিয়া গেলেন এবং আপন কবাববন্ধ হইতে একটা
আবুত্বস্ত গোলাপফুল বুজিয়া লইয়া হুসরের বক্ষে-
পরি সন্ধ্যাবে আঁতর করিলেন।

হুসর যেরূপে আঁতরে গিয়া গেলেন; বলিলেন,
“পর আমি বিশেষ কিছুই জানি না। তা, আমি
বা জানি, তা আমি সমস্ত রাত জেগে কাঁতে রাজি
আছি।”

হুসরকে রাত জাগাইতে, হুসরের সহিত
গভাঙ্গি করিতে,—অথচ ভাতরয়ের নিষেধ ছিল।
কিন্তু শ্রীমতী চামেলি-স্বস্তী অনেক সময় অনেক
কাজ উঠা রকম করিয়া থাকেন। বিশেষ, হুসর
আজ নুতন আমদানির সামগ্রী। সেই হুসরের
সহিত প্রাণ তরিয়া মনের কথা কহিতে না পাইয়া
চামেলির অন্তরাত্মা এতদূর ছটিকি করিতেছিল।
একদিন হুসর তীব্রার সহিত পর করিতে প্রস্তুত
বুজিয়া, চামেলির প্রাণ পুলকিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হুসর এবং চামেলি উভয়ে সেই গ্রন্থশস্ত,
প্রাণের পরী-স্বাতি। রাতে, হুসর শয্যার উপর পান
করিলেন। হুসরের একশ শয্যার শয়ন—এই
প্রথম। কাজেই তাঁহার বাহ-বাহ টেকিল। কিন্তু
উপায় নাই বুজিয়া, অগত্যা ইহাকেই অংশ-শয্যা
বলিয়া, শয়ন করিয়া রহিলেন। চামেলি তখন

হুসরের দক্ষিণ করের তর্জনী, নিম্ন করদ্বারা দ্রুত
করিয়া, আপন বৃদ্ধাঙ্গুরের সাহায্যে, সেই তর্জনীর
নখ-কোষে মধ্য-মধ্য বুটিতে শাস্ত করিলেন।

হুসর তখন পৃথক্ জানিতে পারেন নাই,—
“ইহারা কে? এ কথার—বাসীতে আসিয়াশুন?
ইহারা কি করেন?” এই সকল বিষয় জানিবার
জ্ঞতা তাঁহার মনে বড়ই কোমল, জন্মিগালে।
কিন্তু কিরূপে একবার প্রস্তাবনা করেন, তাহাই
ভাবিতে লাগিলেন। এ, ও, তা—সাত-সত্তর
ভাষিয়া কুহুহই—এখনে কথা আরম্ভ করিলেন।
বলিলেন,—“দিদি! আমার কাছে শুনে তোমার
কোন কাজ হয়নি ত?”

চামেলি। (হাসিয়া) আমি আজ যেমন
মুখে শুনে আছি, এ জন্যে একটা দিনও ডেমন মুখে
শুইতে পাই নাই।

হুসর। কেন দিদি? আমি গরীব মানুষ,
আমার কাছে শুনে তোমার কি হয়?

চামেলি চমকিয়া উঠিলেন, ধাতের উপর বসি-
লেন; বলিলেন,—“ও হো! বড় ইলিয়া গিয়াছি।
যে আসল কথাতীর জন্ম আসিয়াছিলো, তাহাই
বলিতে ভুলিয়া গিয়া, আমিই নিজে মজা করে
ধাতের উপর শুনে বসেছি।”

হুসর। কি দিদি?—কি কথা দিদি?

চামেলি, বৃহদাঙ্গুর-মুখ-ভাবে দ্বন্দ্ব-হাসিয়া,
হুসরের কোণের কাছে আপন মুখ লইয়া গিয়া
বলিলেন,—“ভাই! তোমার কর্তী নীচের ঘরে
শুনে আছেন। বাবু অনেক সাধ্যসামান্য করে তাঁকে
উপরে আনিয়েছেন,—তোমার কাছে এক ঘরে
শুতে বসেন; তিনি কিন্তু কিছুতেই রাজী হেলেন
না। তিনি বলেন, আমি এখানে বেশ আছি,—
আমি এই বাসনিই থাকি;—আমি আর উপরে যেতে
পারবো না। তাঁর এই কথা শুনে, আমার খেদ
হলো তিনি রাগ বা অভিমান করে নীচে শুনে
আছেন। তাই হুসর। তুমি যদি তাঁকে নিয়ে
ডেকে আনো, বা হাতে ধরে নিয়ে এনো, তাহলে
অবশ্যই তাঁর অভিমান দূর হবে—তিনি নিশ্চয়ই
এখানে আসবেন।”

হুসর। (যোড়হাতে) দিদি! আমি তো
একাজ কিছুতেই পারবো না। দিদি! তোমার
পায়ে পড়ি;—তুমি আর ওকথা আমাকে বসো
না। একা আমি এখানে বেশ আছি।

চামেলি। (যে যে হাসিয়া উঠিলেন) পান!

কাছে এলে তোমার এত ভয় হয় কেন? পুরুষ
বসতি রমণী-জীবনে কখন ভয় হয় কি?

হুসর। দিদি! ও-বাক্য আমি ভাল
বুঝতে পারি না। সে যাহোক দিদি—তাঁকে
আর এ ঘরে এনে কাজ নেই।

চামেলি তখন নিম্ন করাতুলীর দ্বারা হুসরের
করাঙ্গুলী দৃঢ়রূপে দ্রুত করিয়া বলিলেন “ভাই!
আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি। বাবু বলে দিয়ে-
ছিলেন, আমি তোমার ধর্মীক ডাকিবার কথা;
তাতে তুমি যদি স্বীকার না হও, তবে আমাকে
তোমার কাছে ভুইয়া থাকিবার আজ্ঞা করেন। কিন্তু
তোমার সঙ্গে কথা কইতে-কইতে আমি সে সব
কথা ভুলে যেলাম। পরে মনে পড়লো,—তাই
এখন বললাম। তাই। তোমাকে আমি এত ভালু
বাসি যে, তোমার মুখটা দেখে তোমারই কথা
তোমাকেই বলিতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম।”

হুসর। দিদি। তুমি যখন আমাকে এত

ভালবাস, তবে তুমিই আমার কাছে থাকো—

চামেলি। তবে তাহাই হউক।

হুসর। আঃ—বাঁচলাম।

চামেলি মনে মনে বলিলেন,—“আমিও বাঁচি-
লাম। মেয়ে নয়ত,—কে কি আর কি? তো-
সোয়ামি কি আছে যে, এখানে আসবে? সে
বেধা থাকিলে গেছে, কি মরে গেছে—তার গ্রিস্-
কি? বাহোক ভায়ে ভায়ে এবার রজ্জা পেয়েচি।”

হুসর। দিদি! চূপ করে বৈলে যে—

চামেলি। চূপ করে নেই,—এই তোমার কথাই
ভাবছি।

তখন চামেলি, হুসরের পাশে, পুনরায় শয়ন
করিলেন। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব।

হুসর ভাবিতে লাগিলেন,—“আমি কোঁধা
আসিলাম? ইহা-রাই বা কে? সম্ভবত ইহা-রা
রাজা, না হয়, জমীদার হইবেন। এলেবড় বাড়ী,
এত লোকজন,—অবশ্যই ইহা রাজবাড়ী হইবে।

“ইহারা কি জাত? আমি মূর্খের মেয়ে। দেশে
আমাদিগকে কেউ ছুঁইত না;—আমাদের ছায়া
নাড়াইত না। আমরা চিরকাল লোকের পাতের
উঁঠো খেয়ে বাড়াই। তাই কিজানি,—এরা কি
জাত? এদের রাজার মেয়েরা আমার সঙ্গে বসে
একত্র খেলেন,—অধিক কি, পাত-পাত টেকা-
কৈ হালো, কোন রকম আশ্রিত-কানো না—
সেই বাউর দের বড় (চামেলি) আমার সঙ্গে

এক-বিজ্ঞানায় শুইয়া রহিলেন। এ কি রকম ধারা
বুঝি না।

“বোধ হয়, ঐরা জেতে মুচি-ই হ'বেন। আচ্ছা,
মুচি হ'লে চাক-টোল কৈ? কাঁপড় বুনিবার তাঁত-ই
বা কৈ? সে সব শু শু কোথাও কিছুই দেখিতে পাই
না। বোধ হয়, ঐরা যুব বড়দামহয় মুচি।—চাক
টোল ঠা তাঁতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ঐরা
যাবদা-বাগিচা করেন, আর থাকেন। ছেলে-
শোনার বাবার কাছে শুনেছিলো, কান্ধাতার মেথ-
রের রাজা আছে; সেই রাজার ডেউলা চক-
মিলাল কোটা আছে, পাড়ী-শোড়া আছে—তাঁরা
বোধ হয়, ঐরা মুচি রাজা হবেন। কিন্তু তাঁরা
কথা এই,—যে ছুটা বাবু আমাদের ঘরে গিয়া-
ছিলেন, তাঁরা ত কর্তার (জমীদারের) সঙ্গে এক
বিজ্ঞানায় বাঁধেছিলো। মুচি ছাড়া বড়দামহয়
হ'লেও, কর্তা কখনই মুচির সঙ্গে এক-বিজ্ঞানায়
কাজেনা। তবে ঐরা কি জাত? কিছুই শু
বুঝিতে পারিতেছি না।

“না হয় ইহা-রা মুচি-ই হইলেন”—কিন্তু হঠাৎ
আমাকে এত ভাল বাসিলেন কেন? মেয়ে-পুরুষ
সকলেই এত অধিক আদর করিতেছেন কখন?—
আমাকে ভাত, গুটি, পাঁটার মাংস, ক্ষীর, সন্দেপ,
নই—বাইতে দিরাছেন। সোনার কাক্সরা একখানি
বকলকে জামা (বউ)।—মুদ্রুজ রত্নের একখানি
উত্তম মিহি কাপড়, পাখার সোনার গোলাপ ফুল—
পরিতে দিরাছেন। দোঁতামার ঘরে, ভাল ধাতের
গিলাহ, উত্তম বিজ্ঞান পাতিয়া—আমাকে শুইতে
দিরাছেন। আমি উঠিলে কেঁ হই যে, আমাকে
এত মেহ, এত আদর, এত সন্মান? এ কি রকম
কাণ্ড,—আমার ত কিছুই লক্ষ্যস্বর হয় না!

“আচ্ছা, ইহা-রা কি, রকম?” শোলাগদেহের
ষ্টেশনে নামিয়া সেই বাবু ছুটা আমাকে একখানি
আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার।
আমাকে বলিলেন,—“দেখ, ইহা কুলিগালা ম'হর।
বড় শক্ জাগ্রা। আমরা যা বলিব, তাহাই
করিতে হইবে। আমাদের কথা না শুনিলে,
তোমাকে কয়েকটে এরূপ বিপদ পড়িতে হইবে।
তাঁদের এ কথা ভানিয়া আমি ভয়ে জড়ম হই
কেন উত্তর কর্তে পাল্লাম না,—ভাবলাম, বিপদ
আমাকে এনে, মিসেওনা বলে কি? আমি চূপে
করিয়াই রহিলাম। তখন একজন বাবু আমাকে
বলিল,—“দেখ, আজ হ'তে তোমার নাম হুসরনুনা

হইল। এখানে হুজুরী নাম বলিলে, তোমাকে সকলে ঘৃণা করিবে। অতএব কুরসনসরী নামটা মূখ্য করিয়া রাখ।" এ কথা শুনিয়া আমার ধড়ে আঁশ আসিল,—ভালিলম, আমার নাম কুরসনসরী হউক না, তাহতে ক্ষতি কি? কিন্তু এখন একটা বৃষ্টি* মনে হইতেছে,—আমার নাম হইল। কল্যাণমানে কেন?

"সে বাহক, বাবু হই জনের ব্যাভার এমন কেন? আমি খোড়-গাড়ীতে বসে আছি।—হুজুরী হুজুরী এসে আমাকে তেমন করে তৈশিয়া ধরিলেন কেন? আমি স্ত্রীলোক—উইরা পুরুষ মহাশয় স্ত্রীলোকের অঙ্গে ঠেকাঠেকি করিয়া করিয়া হুই জন পুরুষ কবিলেন কেন? মেয়ে আমি যদি যথ হুটিয়া বা বলিভাম, তাহা হইলে, মোহ যথ, ওই হুইজন বাবু আমাকে আরও তৈশিয়া ধরিতেন। তখনকার উইদের ব্যাপার দেখে যা ওঁর ওঁর করে কাপতে লাগিলে।"

"আজ্ঞা, উনি (স্বামী মোহুল) বইসেন-খোড়-গাড়ী বাহিরে বসিয়া; আর—উইরা আমাকে হুইলেট গাড়ীর ভিতর বসাইয়া। কেন—গাড়ীর ভিতর ত বান ছিল—উইকে শুকত ও গাড়ীর ভিতর লুটিলে হইত? আর, যা' বস-আবার, তা'সব আমাকে উইরা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ওঁকেতে একটা বাহর কোমরপ বৃত্ত করেন নাই। বহু পথের মাঝে ওঁকে অনেকবার, তুচ্ছ-ভাল্লিচুই করিতে বোঝাইল। বহন আমি খোড়গাড়ী হাতে ওঁদের বাড়ী নামি, তখন আমাকে সফলভাবে আমার কাটায়া দিলেন;—তখন পড়াতে চাহিয়া দেখি,—না, উনি আসে হুইরাটার ভায়া গাড়ীর পেছনে বসিয়া আসিলেন। '১৪ ওঁকে তখন কেউ কিছুই মেনে না। কেন—আমার এমন কিষ্ট হ'ল। যে, তা আর মুখে বলা যায় না।"

"এ বাড়ীক-কর্তা কে? গিহি কে? বউই বা কাহার? কিউতীই বা কাহার?—এত বো-নী, কিকি-ক্যাচা ছেলোপিলে ত কাহারও দেখি না! ইইরা সবই রাজা নাকি?"

কুরসনসরী এইরূপ নানা-বিষয় ভানিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই গ্রহণ করিতে পারিলেন না। চামেলিগর ভাবনা অস্বস্তিক জন্মাইলেন,—"তাই! চুপ কর রহিলে যে।" মুখের পছন্দে না কি? কুরসন না গিহি, দুমাবো কেন?

চামেলি। তবে তাই। তোমাদের দেশের গল্প বল না?—

কুরসন না গিহি। আগে আমি গল্প বলতে পারবো না,—তুমি আগে বল, তার পর আমি বলবো।

এইরূপ স্থির হইলে, চামেলি তখন কথা আরম্ভ করিলেন। রাজি প্রায় ১১টা।

মণিপুরে মহাবিচার।

কুরসন মণিপুর প্রবল বুটাম-সিংহের আনুগত্য হইয়াছে। বুটাম-সেনাপতি কলৌ এখন মণিপুরের রাজা। বুটাম-সেনায় এখন মণিপুর পরিপূর্ণিত, বুটাম-সেনানীরা মণিপুরের রাজকাণ্ডে নিযুক্ত। কিন্তু মণিপুর এখনও অরাজক। রাজা কুচেল, বুটাম-সিংহের পুত্র, আর হুই মহোদর—চারিজনই এখন বুটাম-হস্তে বন্দী; আন্যদের ঠিকুরারাজ্যে, আপনাদের কারাবাসে আশ্রয়। নীচের-গল্পখাপ চ'লা চলিতেছিল।

মণিপুরের অধিপতি—প্রজাবর্গের পুজিত—রাজা কুচেল বন্দী; বুটাম-বিচারালয়ে অধিষ্ঠিত। মধ্যম মহোদর—বুটাম ট্যাক্সেসকিওর বিচার হইয়াছে। হুইজন বুটাম সেনানী এবং একজন বুটাম সিবিলায়ন বিচারকগণে নিযুক্ত হইয়াছেন। একে একে সকলেই বিচার হইবে। বৃদ্ধ মন্ত্রী টাঙ্গালের বিচার হইয়াছে; বিচারে প্রাণপণের আশঙ্ক হইয়াছে। হুইজন মণিপুরী সৈনিক এবং হুইজন নিম্নরাজ্যের কানী হইয়া গিয়াছে। একজন মণিপুরী সেনানীর কানী-বহুত্ব হইয়াছিল; ভারতের বড়গাট ভাষার কানী মজুর করিয়া, চির-নির্যাসনের বন্দনা করিয়াছেন। বিচার আরও অনেকের হইতেছে; প্রাণপণ আরও অনেকের হইবে। মহাবিচারে মহাজঞ্জেরও অভাব হইবে না—কলিম হুইজল নহে।

পুত্রস্বার-সোমবার ফল হইল কি, মণিপুরের রাজস্বয় নিষিদ্ধ-প্রোগাতিত হইয়া, পতঙ্গ-বুটাম-বল্লভ উপরী প্রজাবর্গেই আনিয়া পড়িলেন, তাহার মীমাংসা করিব না; করিয়ে ফলও নাই। এখানে রাজা বুটাম প্রকৃষ্টিত জন্ম হলিয়া বাহির হইল, পুত্রস্বারের সোমবার হইল। ব্রহ্মবিজ্ঞাতে বেরুগ ইংরেজ

বড় বড় ব্রহ্মজ্ঞপিরের মুণ্ডের জন্ম পুত্রস্বার সোমবার হইয়াছিল; বিলায়ের লোকের মুখিলেন, মণিপুরী রাজস্বয়স্বেরাদিগের মুণ্ডের জন্ম, সেইরূপ পুত্রস্বার-সোমবার হইয়াছে। পার্লেমেণ্টে সংবাদপত্রে প্রতিবাদ হইল। ভারতের লিট-দপ্তর হইতে কৈলিহাং শেখ, "জীবন্ত স্রাসামীর প্রেষারী জন্ম পুত্রস্বার সোমবার হইয়াছে, মুণ্ডের জন্ম নহে।" এথমে সোমবার দাবী করা হইয়াছিল; তৎপরে টাক্সকনি মনুরকে; শেষে বড় লিটকেই বাড় পাতিতে হইয়াছে।

হুইটন গ্রিমউড প্রকৃষ্টিত করজন বড় বড় বুটাম রাজপুরুষ মণিপুর হতে হইয়াছেন। তাই বিলাতের বড় বুটাম-দপ্তর বিচাতিত হইয়াছে, তাই মণিপুরী বিচারের মূর্ত্যেথমে বুটাম পার্লেমেণ্টের প্রকৃষ্টি হইয়াছে; তাই ভারতের বড়গাটের বড়গাটের লোকে অবস্থি হইতে হইয়াছে; তাই বড়গাট ও তাঁহার মন্ত্রমহাময়ের সাফাই পাহিয়ার জন্ম বিব্রত হইয়াছেন; তাই এখন সোমবার মনোমানে হুইয়াছে; তাই মণিপুরী আদালতগণ বিচারের পুরুষ অপরাধী বলিয়া নির্দেশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে; তাই মণিপুরে মহাবিচারের আয়োজন হইয়াছে; তাই মণিপুরে মহাবিচারের আয়োজন হইয়াছে; তাই মহাবিচারের ফল নিম্ন বড়গাটকে বিচিত্র অপরাধীর গুণে কার্যে পরিণত করা হইতেছে না।

বিলাতের প্রতিবাদে অনেক হইয়াছে; বলা সাজে গুলিয়াছে; মৃত্যু হুত বখারীতি পাঠিত হইতেছে। দেবতা যেমনই হইল, পুরোহিত তৎপার বাহারাই হইল, তাহাত আর দূরের লোক দেখিতে আসিলে না। বাহিরের লোকের সেবিলে কেবল চালচিত্র, আর শুনিবে শম-কণী। "যেখানে চারু সোমবার বড় বড়, সেইখানেই মহাপুজার উত্তম কীটুই।

বিচারে কিছু মণিপুরী পক্ষে কতিকোই নাই, সাক্ষীদিগকে জেরা করেন, মণিপুরী পক্ষে এমন উপযুক্ত লোক নাই। বুটাম ট্যাক্সেসকিওর বিচারে কালে কৌহলির অভাবে অনেক বিচারী বটিয়াছিল। ইনিই মহাজঞ্জের প্রধান পণ্ড; তাই বিচারের বিবরণী নিম্ন দিন একপাশে প্রশ্নিত হইয়াছিল। এমোইগুয়ান বড়গাটকে কিছু এক হুইয়েই বান চলিয়াছিল; সকলেই ট্যাক্সেসকিওর অপরাধী করিবার জন্মই যত ছিলেন। এমোইগুয়ান সংবাদপত্রের দূত মহাজঞ্জেরা মণিপুরে আসেন যেন শুক বড়গাটের; ওকালত করিবার

জন্ম। যেন বড়গাট লেশম-জউনই বিচার হইতেছে, যেন বুটাম জাতি ও বুটাম পার্লেমেণ্টের কাছে তাঁহার পক্ষে ওকালতী করিবার জন্মই সকলে স্রুতী হইয়াছেন।

ট্যাক্সেসকিওর বিচারে পলিটিকেলের ওয়ান কোরাণী রনিকালিয়া সাধা, রাজবাড়ীর কোরাণী বামাচরণ সোমবারাধ্যায় সাক্ষ্য দিলেন, ইংরেজ সেনানী টেটরটন ও টুটার সাক্ষ্য দিলেন। মণিপুরী পলটনের বড় সৈনিক শাউকে সাক্ষ্য দিতে হইল। রাজ-বাড়ীর জয়্যাদ ও কামারকে পদুস্ত হাজির করা হইল। সোমবারের চেরী হইল, মখন রাজার জয়্যাদ হুইটনগিরি হ'তা করিয়াছে, মখন রাজবাড়ীর কামার তাঁহাদিগের পায়ে শিকল পরাইয়া দিয়াছিল, তখন রাজা ও বুটাম সৈন্যগণেই অপরাধী। অপরাধ যে, সকলেই টাঙ্গাল জেনেরলের উপরই আক্রোশে করিয়াছিল। তাহা কিজ এমোইগুয়ানদিগের মনপুস্ত হয় নাই। বলা দেখিয়া ডাল কাটিলে লাভ কি? ট্যাক্সেসকিওর যে, বড় গাটের বিচারে যত অনিষ্টের মূল।

মহাবিচারের কথা আর কহিব না; মহাজঞ্জের ভাবনা আর ভাবিতে পারি না। মণিপুরী রাজ-বর্গের বর্তমান অবস্থা হুইজল দেখিলে, দপ্তর কাটায়া যায়। রাজপুত্রীর অবস্থা ভাবিলে তরুসুই হইতে হয়। রাজ-পুত্রীরবর্গের হুইজল হইতে শিগাল কুরসন করিয়াছে; ইহাদিগের পরিবান চিড়িলে পাপাণ-হুইজলও বিনীত হইয়া যাইতে হইবে।

মণিপুরের স্বাধীনতা চিরদিনে মল তিরোহিত হইল। বড়গাট সোমবারজন বিলাতহইলেন—"স্বাধীনতা তিরোহিত হইয়াছে অনেক দিন।" বিলিতেছেন, নজীর টানিয়া দেখাইতেছেন, "৪০ বৎসর হইল লর্ড ডেংহরী রাজা চমুকৌশির ভায়া মণিপুরকে পদপাত করিয়া গিয়াছেন।" মিতর ভিত্তর কখন কি হইয়াছে না হইয়াছে, তাহা আমাদের মত মানুষ জ্ঞানের অভ্যঙ্গ; কিন্তু বিলাতের বড় বড় লোকই এখনও বলিতেছেন,—"মণিপুর বুটাম রাজস্বর সজিত হইলও কখনও অস্বিভত হয় নাই।" ভারতের তৃত পুরুষ বড়গাট লর্ড ট্রিপল পয়ং এখনও এই কথা বলিতেছেন—"মণিপুরের রাজা ও বুটাম প্রকৃষ্টিত একরূপ বুটাম বিচারের অধীন করা বিধিসম্মত হইয়াছে কি, ইহার বুটাম আইনের অধীন কি, সে নিষিদ্ধও মতসকল চলিতেছে। মণিপুরের যদি স্বাধীন রাজ্য বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে,

উপস্থিত বিচারে দোষ বিহীন হইবে; কিন্তু সে বড় কথার আলোচনার আদানপিরের অধিকার নাই। ডেলহরী বসিতে, “জোর যার, মুখও তার।” অনেক বসেন, লেগডাউন ডেলহরীরাই পূজা করিয়া থাকেন। যে মাগে ডেলহরী স্ত্রীর ভেত্রে অহসন হয় ত, লেগডাউন সেই মাগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

মণিপুরের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ছিল, না ছিল, এখন আর তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে লাভ নাই। মণিপুরের বিরুদ্ধে অবস্থা হইবে, তাহা লইয়াই এখন সকলে চিন্তা করিতেছেন। ইংরেজ রাজ ঘাচা করিবেন, তাহাই হইবে; যেখানে অসু-কো-নিগ্ৰহের সম্বন্ধ, সেখানে আর দাবা-দাওয়ার কথা বুলিব কেন? যাবস্থা যেরূপই হউক, ব্রহ্মের মত থাকে মনুষ্যই হউক আর কাহারও মত-বোনানী নগণ্যই হউক, মণিপুর যে আর স্থানীয় থাকিবে না, তাহা স্থির হইয়াছে। মণিপুর যে, অস্ত্রপূর্ণ রাষ্ট্র নরনারীদিগের শীলাক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বিলাতের মত বড় বড় সংবাদপত্র, যত বড় বড় পত্রিকো বসিতেছেন,—“মণিপুরের অধিবাসী ইংরেজকে ভয় করিবে, কিন্তু বিধান বা তুলি করিবে না; মণিপুরের যুবজাতের রাষ্ট্রের লক্ষ্যই বিনষ্ট হইল; যেখানে ছিল যুবের দায়, এখন সেখানে হুগুণের জন্ম।” আসরা হতভুক্ত হইয়া আছি।

অর্দ্ধনারীশ্বর।

জ্ঞান শিবশঙ্কর গৌরকর্ণের আশ্রিত-বসন-পরিহারি। এক চরণ শুষ্ক, আর চরণ তব যাবক রাগ নির্মিত। এক লাগ তব কঁহ বা পন্নক কভ সন্দরার্থ যুগলি। আর ভাগ বিহু কভ ক্ষুণ্ণ মণিসন ভূপকল বদলি। ভাম ভূলাঙ্গর এক করে তঁহ ভসন রাজত হোদি। আর করাশূন্য উঠত নৃশাধি ভরজনে বন পেরি। চন্দ্রপূর্ণ সোচন—এক, অপর পুন কাঙ্কসে উজ্জলি। আশিরোপরি বিকটজটায়ত আকি চিত্রের বিনাঙ্গি। জয় পঞ্চানন রূপ বিশোদন গৌরীকর্ণ নিশাদি। নিরর্থ নরন মুনি নিঃশত বিরাজত ত্রিভুগত বাসাদি।

মহাবিদ্যা—মাধন।

পৃথ্বী মহাবিদ্যা—ভৈরবী-ধান।

উদ্যানভাসুহজ্ঞকান্তিমূৰ্ণকোমাং শিরোমালিকাং
রক্তাশিষ্যপয়োধরাং জপপটং বিদ্যামভ্যাজি বরম।
হস্তাভৈরবপতীং ত্রিনেত্রবিলসজ্জারবিনশ্রিয়ং
দেবীং বহুবিদ্যাং ভগবতমুখ্যতীং বন্দে সমকল্মিভাম্ ॥

ব্যাখ্যা।

বশে শ্রীভৈরবীমূর্তি বড়ই শোভিত।
স্থবীরা রত্নবর্ণা রক্তোৎপলশ্রিত।
রক্তবর্ণ ক্রৌঞ্চ পরিধেয় কি সুন্দর।
এক হাতে অঙ্কমালা শোভে নিরন্তর।
এক হাতে পুঁথি এক হাতেতে অস্ত্র।
এক হাতে বাদান শুষ্ক সুধাময়।
মুণ্ডমালা দলমল গলদেশে পোনে।
কর্ণময় আভরণ মণি তার কোলে।
ত্রিনয়নী অর্দ্ধচন্দ্র লগতি-কলাকে।
মস্তকে মুকুট শরী কোমুদী চমকে।
মুখে মুছ হাসি পরিধান রক্তপায়।
পদ্মোদার পার্শ্বপদে উজ্জ্বল প্রকাশ।

মানস পূজা।

এম বা ভৈরবী দেবি দ্ব্যংগ-পঞ্চজ্ঞে।
যতনেতে করি পূজা তব পদরঞ্জে।
কি দিক বাহিক ত্রয় সমস্ত নিষ্কল।
সে কলো পুঞ্জিয়া কেবা পায় মোক্ষ কল।
অস্ত্রস্বয়ং জন্মে পুঞ্জি অস্ত্রস্বয়ং ধন।
প্রথমে অর্পণ করি পান-পুষ্প মন।
মন দিয়া সেই পূজা সেই পূজা সার।
বাহু পূজা পূজা নয় অঙ্গিকে তোমার।
সুমন-রসোত্তে করি রসনা অর্পণ।
চার মাধোত্তে দিহু সঁপিয়া শ্রবণ।
অগ্নি দিহু, ও-রক্ত মাদ্রী মধ্য হানে।
নামা দিহু আশাপথ পাদপঙ্ক জাপে।
জানমতে পূজা যত পদ কৌন্দল।
জ্ঞানেশ্বর-পঙ্ককে পুঞ্জিহু পদ ॥

৫ম ভাগ।

শ্রাবণ

১২৮।

৮ম সংখ্যা।

জাতি বিচার।

(৩য় প্রস্তাব।)

বাস্যলাপাঠক বাঙ্গালী বড় জটিল ও
ছোড়া-ভঙ্গ লাগিতেছে। “একে ত যে-আড়া
বে-চপ বিষয় তাহাতে আবার এ কেমন একতর
লেখা; এর বেই খুঁজিয়া পাই না; উপস্থিত নাই।
উপসংহার নাই, একতরের একটানা চলিয়াছে
যেন বর্ষার ঝাল। প্রথম প্রস্তাব না হয় কতক
বুঝিলাম—মাথার খেলাই হউক, আর কলনের
লালাই হউক, যোজ্জ্বল যেন একসঙ্গে ছন্দস্বয়
করিলাম; কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবটি একেবারে নিরেট;
কি বল—কি কও; কিছুই বুঝি না। এরূপ কত
অনুযোগ যেন ভুনিতে হয়, তা আর কথা যায় না।
জানি পড়ে না, অনেকে; তবু এই। কাজেই একটু
পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইল।

একজন জাতি ভেদের বিপক্ষ এবং একজন
সম্পদ আবার কথার ভাবটা বুঝিয়া দিতেছে,
মনোযোগ কর।
জাতি—বিপক্ষ। “জাতিভেদ ঈশ্বরভিপ্রোক্ত
নহে; স্বর্গ প্রবেশিত ব্রাহ্মণের কল্পিত মাত্র।
জাতি—সম্পদ। ভূত, তপ, বৃদ্ধ, পণ্ড, পক্ষী—
চারিই যখন কোন না কোনরূপে জাতিভেদ বর্ণ-
মান; তখন যে উহা ঈশ্বরভিপ্রোক্ত, তখিনে সন্দেহ
নাই। এই সমুদয় জাতিভেদের—ভায়া মনুষ্যের
জাতিভেদ কোন মানুষের, কল্পিত নহে।

জা-বি। জাতিভেদ ঈশ্বরভিপ্রোক্ত হইলেও,
উহা শুধামুসারে নির্দিষ্ট; বংশানুসারে নহে।

জা—স। জাতিভেদ সর্বত্রই বংশানুসারে;
মানুষের বেলায় তাহার ব্যাভিচার হইবে কেন?”
প্রথম প্রস্তাবে ইহারই আলোচনা।

জা—বি। “জাতিভেদ একরূপ আছে বটে, সে
দৃষ্টান্তে হিন্দুদের এই কল্পিত কিম্বদিকার জাতি-
ভেদের দিহি হয় না। প্রকৃতি ভেদে জাতিভেদ,—
কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঈশ্বরভিপ্রোক্ত
হইলে, ভূমি যেরূপ প্রকৃতিভেদে দর্শাইছে, পণ্ড
পক্ষী জাতিভেদও তদনুসারে হইত। দ্বিতীয়ত
জাতিভেদে স্বর্গের ব্রাহ্মণের উদ্যারি না হইলে
ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রিয়ে বিবাদ বাধিবে কেন? এ বিবাদ
কেবল ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা-মূলক বৈত নয়। তাই
বলি মিহা স্তেনং? কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া
অত উক্ত নীচ বিচার কেন?

জা—স। জাতিভেদ না হয় ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠাই
হইল; কিন্তু জাতিভেদের প্রবন্ধক ব্রাহ্মণ, স্বার্থপর
নহেন; তাহারো নিঃস্বার্থ দেশহিতার্থী ও সমাজিত
মঙ্গলের নিষ্ঠাতা জাতিবাদী। ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রিদের
বিরোধেও ব্রাহ্মণের মাথাখা পরিচুত; কোন
স্থলে স্বার্থপরতার রক্ত মাত্র নাই। আর মানুষের
কল্পিত হইলেই যে ঈশ্বরভিপ্রোক্ত হইবে না
এ কেমন কথা। ইচ্ছামুসারে অনেক জাতিপ্রায়ই
তাঁহার উচ্চ-প্রবেশিত প্রাণীর দ্বারা সৃষ্টিত হয়।
বিশেষতঃ জাতিভেদ দ্বারা যখন সমাজের উন্নতি
ভিন্ন অবনতি নাই, তখন তাহা/না মানিয়ে কেন?
উদাহরণ দিতে চাও কেন?”

দ্বিতীয় প্রস্তাবে এই বিষয় লইয়াই বিচার
বিদ্যক। এখন জাতিভেদের বিপক্ষ-দল শতমুখ;
প্রাকৃতিক মতই বর্ণা ও উন্নতি যে জাতিভেদের
সাধ্য ফল ইহা ভুনিতে পাইয়াও দ্রষ্টব্য;

সে বিষয়ে কোন কথাই নাই। যে-ই জন্মিছে জাতিভেদ উঠাইবার কোন মুহূর্ত আছে কি? অমনি বিশ্বমেশ্বর যেন ব্যাকর 'সোনার হইয়া উঠিছে। তাহারিয়ার পৌটাকর কথাই পরিচয় দি—

“জাতিভেদ উঠাইবার আবার মুক্তি নাই? যদি জগতে একটামাত্রও মুক্তিপ্রদ পার্থক্য থাকে, তবে তাহা জাতিভেদ-পরিহার; ইহা আমরা মূলতঃ বলিতে পারি। আমরা যে এত অসহ হইয়াছি; সন্তা উদ্ভিষ্টদের চক্ষে আধারা যে নিগ্রোরা সমান মর্যাদাসাম্পন্ন, পারের পোয়বেও বঞ্চিত, জুলুম মর্যাদাও অসমিকার্য হইয়াছে; আমরা যে, সকল বিষয়ে পরম্ব্যাপকী, পর-পদানত, দাসজাতিরূপে পরিণত হইতেছি,—বলিতে পার, গোড়া হিন্দুগণ! জাতিভেদ-নির্গণ।—ইহার কারণ কি? আমাদের জান-বিজ্ঞান যুগ হইল কেন? অর্থ-সামর্থ্য-পারায় হইল কেন? অর্থ-বাহ্যজ্ঞা শূন্য মিশাইল কেন? জুলুম সামর্যাইল হইল কেন? প্রাণ বন্ধনকুল হইল কেন?—বলিতে পার কি? আমরা ত দিকাল এমন ছিলাম না, তবে এখন এমন হইলাম কেন?—

হুদা, তুমি ত বলিবৈ না, বলিতে গেলেও প্রকৃত কারণের উল্লেখ করিতে পারিবে না; কিন্তু যে দুঃসন্দর্ভ—অপকৃপা—বিবেচক-বুদ্ধ-তোমরা কি বলিবে না, এক জাতিভেদই সমুদায় অনর্থের মূল?

না ধর্ম-চরিত্রতো কল্যাণ সঙ্গ্য: কল্যাণি—

অর্থম্ করিলে পলকিণে যে তাহার ফল হয়, তাহা নহে; তবে ফল যে ফলিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাতিভেদ-সম্বন্ধেও আমাদের ঠিক সেই কথা মনে হইতেছে। জাতিভেদ বিবরণ, অল্পে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অনেক কাল; কিন্তু কল বর্ধন ধরে নাই। পারা বহিলে, তাহা কখন না কখন হুটুবেই। পালাকিণে একদিন না একদিন তাহার প্রতিক্রিয়া পাইতে হইবেই। দার্পণের হইয়া পরকে ঠিকাইতে গেলে কলানকল না কোনকালে আপনাকে ঠিকিত হইবেই। বিদ্যমানের হইয়াই ইন্দ্র।

রাজ্যার পাশে রাজ্য নষ্ট, কর্তার পাশে গৃহস্থ “নষ্ট” কর্তার হুই ঠিক; ভাস্কর অক্ষার্য করিল, এতদিনে তাহার কলভোগ—সমস্যার নিম্নানুসারে সমাজ-প্রকৃ ভ্রমণকর করিতে হইতেছে; প্রকৃ ভ্রমণার্থের কলভোগ এক-প্রকৃ ভ্রমণের মধ্যে সমাজের বদলকে করিতে হইতেছে। সেই অক্ষর্য জাতিভেদ প্র-
তিষ্ঠিত করে। আমরা যত সব একজাতি হইইম,

ভাস্কর-ভ্রমণ-বৈশ্ব-শূন্য সকলে পরস্পরকে পরস্পর ভাই ভাই ব্রহ্মণ্য-নিগদন করিতে পারিত, উচ্চাভিলাষী জাতি, অস্ত্রেয় সম্প্রদায়—নীচবোলে ঘৃণ্য নামিকা কৃত্তিক না পরিচয়, যদি সকলের উন্নতির দিকে, সকলের সমান অধিকারের দিকে, সকলের লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে কি আশাধিকারের এত অসংযতন হইত? বন্ধনই না। তাই বলি, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখনও একবার দেশের দিকে দৃষ্টিপাত কর; অন্ধ হিন্দুগণ! জননী জন্ম-ভূমির দিকে একবার বিরিয়া চাও; জননী দারপ দুঃখ-দশনেও কি তোমার দার্পণ স্বয়ংভাষ্যম্ কঠিন-জুলুম দণ্ডকালের জন্তও বিগলিত হইবে না? ভাই! এই বোড়বোড় করিতেছি, এসব হও; আর সকল পারিলাম প্রথা বজায় রাখ; ক্রম-কালের অন্ধকারে ঘুলিতে থাক—কিন্তু এইটী আশাধিকার তিলা দিতে হইবে। জাতিভেদটী উঠাইয়া দেও।

বেশিবে—ভারত আমার হাতিবে, যুধের ক্রম-আবার মুচুবে, উন্নতির সোঁত আমার মুচুবে, মাতা জন্মভূমির চিরদুঃখ মোচন হইবে। বিশেষ আশংক্যের বিষয় এই যে,যাহার এত অসমতমর ফল, তুমি কি না সেই জাতিভেদ-পরিহারের মুক্তি নাই বলিয়া আফালন কর। ভাই ধর্ম তোমার বিবেক শক্তি!

এইরূপ কত কথাই শুনি; তুমি আর হাসি। কিন্তু এখন শুধু হাসিলে চলিতেছে না; কাজেই কিছু বলিতে হইবে।—যাংকর ন্যায়গ। সতাই কি ভাবিয়াছে—জাতিভেদ আমাদের অননতি কারণ?—না, আশাধিকার ভুলাইতেছে? যদি সত্য ভাবিয়া থাক, তবে মহাজনে পণ্ডিত হইয়াছে, অর্থ-ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তে তাহা প্রতিপাদন করিতেছি। জাতিভেদ পুণ্যভাজ্য বর্ণিত-বিজয়ে সমাজে আশিষত্যা কতিয়দিন, ততদিন আমাদের অননতি হয় নাই; জাতিভেদ ইমনল হইতে আরম্ভ করাইতে ক্রমে আমাদের অননতি হইয়াছে; জাতিভেদ উঠাইলে আমাদের অন্তিতা পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। কথ্যচিত্রে একটী প্রণিধান কর। পূর্বেরই বলিয়াছি, জাতিভেদের যত প্রকৃতিভেদ: প্রকৃতিভেদের পরিচয়ও পূর্বেরই বিয়াছি। এই প্রকৃতি বলা অর্থ্যং যাহার যে প্রকৃতি তাহারে অননত হইতে না দেওয়া বড় মজ্ঞ কথা নহে; আহারে দায়ম, বিবাহে দায়ম, ব্যবহারে দায়ম সর্বত্র আশঙ্ক্য। অতক-ভরণ্য(১) অগ্ন্যে পান্য, (২) অগ্ন্যাপান্যম, (৩) অর্থব্যকালে

গমন, (৪) অসংসংসর্গ, (৫) অদম্বেশে গমন, (৬) হত্যা (৭) বিধিত কর্মের অমুষ্ঠান না করা (৮) এবং অজ্ঞাত নিমিত্ত কার্যের অমুষ্ঠান (৯) চতুর্ধর্মের প্রকৃতির অননতি হইয়া থাকে। অতি তামসধে পরিবর্তিত সকল প্রকৃতির চরম অব-
নতি। তামস প্রকৃতিরও বটে। আমরাজনীর গাঢ় অন্ধকার—নিবিড় কলমলল মধ্যম্যে প্রাণচিহ্নের হইয়া থাকে; অন্ধকারেরও মহাঅন্ধকার আছে। উক্ত অন্ধকারমূলে প্রাণিগণের দাষ-ধৌর্য-অম-
মারে অননতি নামান্বিতা বৃষ্টিতে হইবে। এতদ্বির যাহার যে প্রকৃতি, তদনুসৃত আহার বিহারাদিও কর্তব্য। নিয়-প্রকৃতি-সদত আহারাদি পাপজনক না হইলেও তদান্য প্রকৃতির অননতি হইয়া থাকে,—
যেমন দাষিক-প্রকৃতির পালে, অতিকৃত, অত্যন্ত, ধায়া, ক্রিপণ আহার কোন প্রকৃতির পৌষক—ভাষা কথিত হইতেছে,—

আহা: সত বরোহাঃ শূন্থপ্রীতি বিবর্জনা:।
বতা: বিদ্যা দ্বিরা হৃদ্যা আহার: দাষিক-প্রিভা:।

আহু: জ্ঞান, বল, আরাগা, হৃষ এবং প্রীতির বিবর্জক, মনু রসপুত্র, হৃদিক, রমণীয় আহার, দাষিক প্রকৃতির প্রিয়।

কটম লণাভ্যাক তাক্করক বিদাহিন:।
আহায়া রাজসক্টো দৃষ্ট শোকাময়প্রভা:।

একটি কষ্ট, আত্ম, অতি লবণ, অত্যাধ, অতি তাক্ক, অতিক্রম এবং অতি বিনাই (সর্বপাদি) —
হৃদ-শোক-পীড়ক—এই সমস্ত ধায়া, রাজস প্রকৃ-
তির প্রিয়।

যাতনামং পরতমং পুতি পুণ্ড্রিষিতকং যং।
উচ্ছিন্নপিচামেধ্যাং তোল্লমং তামাগ্রিমং।

নিপাড়িত মার, দুর্গন্ধকর, পুণ্ড্রিষিত, উচ্ছিন্ন এবং অজ্ঞাত ধায়াও অতি শীঘ্র অধাদি, তামস প্রকৃতির প্রিয়। রাজস-তামস প্রকৃতির প্রিয় আহারের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত না হইলেও তামাগ্রিমের মিশ্র প্রকৃতিরও উক্ত আহারের বিষয় পর্যাশোচনা করিলেও অতি শীঘ্র, নিপাড়িত মার, অত্যন্ত প্রকৃতির আহার উক্ত প্রকৃতির প্রিয়; একরূপ, অতি দুর্গন্ধ, অতি পুণ্ড্রিষিত বহুভিই এবং অতি অভক্ষ্য ভোজন—নিভাত-নিভকৃত তামস প্রকৃতির প্রিয়—বলা যায়। না হয় এপ্রিয়ের বীরাংগা পরে করি। শুধু আহার নহে, বস্ত্র তপ্তা-
দাদানিসম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা।

অক্ষকাজিক্রিষ্টাভ্যাক বিধিযুগৌ য ইজ্ঞাতে।
যষ্টব্যমোদিতং মনঃ সমাধায় স দাষিক:।

অশুভ কণ্ডব্য বিবেচনার, কলাকাজ্ঞা না করিয়া শাস্ত্র অমুসাধে যে বস্ত্র করা যায়, তাহাই দাষিক প্রকৃতির অমুষ্ঠান।

আস্তান্ধায় হৃ ফলং দস্তাধিপটিচৈব যং।
ইজ্ঞাতে ভ্রতু শ্রেষ্ঠ ভয় বজ্রং বিজি রাজসমং।

যে ভরতশ্রেষ্ঠ। কলাভিষ্টাশ্রম পূর্বক বা আস্ত্রো-
কণ্ঠ্যপার্থ্য যে বস্ত্র করা হয়, তাহা রাজস প্রকৃতির ফল।

বিদ্বিহীন মস্তাধীন মস্তাধীনমাক্ষমং।
প্রজাবিরহিতং বজ্রং তামসং পরিচক্ষতে।

বিদ্বিহীন, অদানদানীন, মস্তাধীন, উপদুল দক্ষিণাইন এবং প্রজাপুত্র বজ্রকে তামস বলা যায়।

যেবিরহিতক প্রাজ্ঞাশ্রমঃ শৌচমার্জসমং।
সক্ৰচ্চাৰ্যমহিংসাক শারীরং তপ উভয়তঃ।

অহরহেপকং বাক্য: সত্য প্রিগাহিত যং।
ব্যায়াম্যাতাসমং চৈব ব্যায়ম তপ উভয়তঃ।

মন:প্রদায়: সৌম্যং তপোমায়বিশিষ্টমঃ।
ভাব সংক্রান্তিত্রাত্তং ভৌম্য মানসমুচক্ষতে।

তপ্তা জিহব; শারীরিক, বাচিক এবং মান-
সিক। শেব, ধিক, গুরু এবং জ্ঞানীর পূজা, শৌচ, মাল্য, প্রস্কর্প এবং অহিংসা—শারীরিক বাচিক বলিয়া কথিত। অপরের সুহৃদেপক, প্রিয়-হিত-
সত্য মুখ্য কথন ও পণ্যাদিগাদিসই দাষিক তপ্তা। মনোর প্রীতি, সৌম্যতা, সৌম্য, আশ্বাসন এবং ভাবতত্ত্ব—মানস তপ্তা নামে অভিহিত।

অজ্ঞা পরা তপ্ততপস্তপ্রিগাহিত নৈদে:।
অক্ষকাজিক্রিষ্ট তপ্তৈ: দাষিকং পরিচক্ষতে।

কলাকাজ্ঞা শূন্য হইয়া পরম প্রজাসম্বন্ধের একাধিক যেই প্রিয় তপ্তা অমুষ্ঠান করিলে তাহারে দাষিক বলা যায়।

মংকর মান পূজার্থং তপো নস্তেন চৈব যং।
ক্রিয়তে তপৈ প্রোক্তং রাজসং চক্ষাঃকৃতং।

যেই তপ্তা অতি প্রাণশীল, সমানিত এবং পুঞ্জিত হইবার জন্ত বা দস্তব্যগো অমুষ্ঠিত হয়, তাহা হইতে তাহারে রাজস-বলা যায়। রাজস তপ্তা নিম্নে অন্তিত।

মৃতপ্রাণেব্যায়না যং পীড়য়া ক্রিয়তে তপ:।
পুরুতাত্যাদানার্থং বা ততামসমশ্রুতং।

অন্যপ্রাণিত ক্রমের আশ্রয়ে বা পর বিদ্যাদর্শ যে তপ্তা কৃত হয়, তাহা তামস।

করেন, তবে তাঁরাই বা কি বলেন, একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহারা সেবা গ্রহণও কি বলিতে চাহে জাতিভেদ সন্ধান করিল।

অধিক দিন কষ্ট পাঠিতে হইবে না, যেহেতু আমারে অনিয়ম, ব্যবহারের অনিয়ম, খাটুপত্রের বাড়িতেছে; তাহাতে শীঘ্রই জাতিভেদের মূলচ্ছেদ হইবে। বিতরুণায় স্বস্ত, চক্ষু হইয়া ক্রমে ভূমিদাস হইবে।

জাতিভেদ থাকায়, বিভিন্নজাতির পরস্পর প্রথমে যে ব্যাঘাত ঘটতেছে? তাহাও নহে। ওস্তান্তে পিতা হইতে জন্ম হয় না? ভালবাসা হয় না? তাহা হইলেও পিতাপুত্র সমান সমান হইতে হয় ও এক শিশুই ইহার হইতে হয়, প্রথমেই বাতির বন্ধ ও স্বাভাবিক একসনে বনাইতে হয়। তাহাতে তোমাদের অস্মিতত নহে। তাই বনি ব্রাহ্মণ, মুখকে পূনঃ দেখে করিলে, তাহার হিতাধানে ব্যবস্থা করিলেন; শূদ্র ব্রাহ্মণকে পিতার জায় দেখিলে। পুত্র যদি রোষে পড়িয়া পিতার নিকট কুপরা চাহে, পিতা কি কখন তাহা দিয়া থাকেন? পিতা হুগুণে ব্যবহার করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি পিতা পুত্রে বিরোধ হয়? অপ্রণয় হয়? ভালবাসার ভ্রষ্ট হয়? তবে শূদ্র বৈদ পড়িতে পায় না বলিয়া রাগ করিলে কেন?

এই ব্যাপ্য চিরদিন ছিল, লোকের মনে ষ্টকা ছিল না। প্রথমেই অত্যাচার কিছুমান ছিল না। এখন কথা কহিতেছে, তোমারা; অপ্রণয় বনাইতে চেষ্টা করিতেছে তোমারা; ইহার শূলক কৃষ্ণগণের মতো তোমারা। পশ্চাত্তরে দেখে, জাতিভেদ না থাকিলে কি অবনতি না হয়, উচিত হয়, তখন একটা পেল কেন? রোম পেল কেন? দেশে অবনতি পেল কেন? এই জন্ত বার বার বলি, ভূমি জাতিভেদের বিনাশ হও, জাতি নাই, কিন্তু বৃত্তি উঠাইও না, জাতিভেদ জাতীয়-অন্যত-কর, একথা মুখে আনিও না।

জাতিভেদের আর একটা ফল প্রত্যক্ষ কর; আমাদিগের শাসনসভা জাতিভেদ অনুসরণে অস্বাভাব্য দূর করিতেছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে এই জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত না থাকায়ই তৎকাল শাসনায় লোকের প্রতিদ্বন্দ্ব-দোষ অত্যন্ত। সভ্য বটে, তৎকালীয় একজন একজন পৃথিবীর কুসংস্কৃত্য আখ্যাত; কিন্তু সে সংখ্যা খুব কম। জাতিভেদ না থাকায় বৃত্তির বিশেষ

বন্ধনভাবে এক জাতিগণের অর্থশিলি জমিতেছে, আর এক জনকে কলকর্ষের সম্বন্ধও জাতি দ্বারা হয়। মনে কর, ইংলণ্ডে জমীদার, চাকুর এবং বণিক—হয়ত এক ব্যক্তি; জমীদার-বণিক ও চাকুর-বণিক ও সম্ভাচারই দেখা যায়। দলবানের ব্যবসা করা সহজ; ধনবান যে বিষয়ে অধ্যবসায়ের সহিত বাণিজ্য করিয়া কৃতকার্য হইবে, দরিদ্র প্রতিযোগিতা করিয়া সেইরূপ অধ্যবসায় সে বিস্ময়ের বাহিনী। কিন্তু কল কৃতকার্য হইতে পারে? অসমানের প্রতিযোগিতা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই জলেই জল বিচিতেছে, এক এক কোশানি সেরায়ে চাটুরো? ও জমীদারের নাম বহুতর হইতেছে। কেবল বণিকও অল্প অনেক আছে। তা হউক, দেশে যদি জমীদার ও কিছু মোটা-চাকুরের সংখ্যা হয় ২০ হাজার; তাহার পর হাজার যে বাণিজ্য লিপ্ত ভবিষ্যে কোন সম্ভব নাই। যদি জাতিভেদ থাকিত, বৃত্তির বন্ধন থাকিত, তাহা হইলে এই দল, বাণিজ্য কর্তৃক বিকল হইয়া যতেনেই হউক, দরিদ্রের হউক, যে স্বপ্নর অত্যাচার মোচন করিতেছেন; ইহারা তাহা না করিতে পাইলে, সেই স্বপ্নর অত্যাচার থাকিত, স্বতরাং এই অভাব মোচনের জন্ত পনের হাজার না হউক আর পাঁচ হাজার দরিদ্র লোকেরও ত জীবিকা-সংস্থান হইত। একটা কল্পনা করিয়া সহজ ভাবে ভাবিয়া দেখ, মনে কর, ইংলণ্ড দশ হাজার লোক;—তাহার ২০০ জন ব্রাহ্মণ, এক হাজার কল্লিঙ্গ, দুই হাজার বৈশ্য, বাকি মুসলম ও ইহুদীজাতি ১০০ ব্রাহ্মণের মধ্যে, ১০০ জন ব্রাহ্মণের বৃত্তি—শিল্পোৎ, প্রতিগ্রহ, বাজন; তদ্বারা অপর জাতির-বৃত্তির ব্যাঘাত হয় না। সমুদ্র কল্লিঙ্গেরও জাগ-জমীদারের মত শাসন কর্তার ও সৈনিক বিভাগের চাকুরী দ্বারা প্রতিপালিত হয়। কৃষি, বাণিজ্য, কল্যাণ প্রভৃতি করি। পরেই বিদেশে যেরূপ চলে তাহাতে ২০ শত লোকের বেশ জীৱিকা নির্বাহ হয়। সুতরাং বৈশ্যগণ এবং আপদ্যুত কল্লিঙ্গগণ এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অস্বস্থিত; শূদ্রগণ কৃতকার্য হইতে বাধ্য পায় কেন? কেহ কেহ কৃতকার্যও করে। ইতর জাতির ইতর বৃত্তি। যা হউক আমাদের কষ্ট কাহারও নাই। এখন জাতিভেদ কমবার কথা ছাড়াই দেও; শুধু দশ হাজার লোক ইংলণ্ডে বাসী; ব্রাহ্মণ কেহ নাই, সংখ্যানুসারে পানবী দশ জনের বেশী নহে। উক্ত ১০০ জনের বৃত্তিও অপরদের ন্যায়। না ইংলণ্ডে, সম্ভব না তাহাভিক

জমীদার, চাকুরে অর্থাৎ বৃত্তি বন্ধন থাকিলে বাহ্যিক ভবিষ্যে বা মুখ হইত, বাণিজ্যাদি করিত না, তাহারাও উক্ত ২০ শত বণিকের অন্তর্নিহিত। যে ২০ শত জন-কল্লিঙ্গ-বণিক-বণিকের বাণিজ্যাদি করিয়া ব্যাপৃত করিয়া সমাজ, সকলের আবার যোগাযোগিতা, তাহার প্রায় অস্বাভাব্য হইত। বৃত্তি বন্ধন ব্যতিক্রম্য পূর্ণ হইল, তাহা হইলে, বৃত্তি কেন-এক-ও-গিক করা না, সহজ লোকের অন্তঃ পীড়িত লোকের অসদৃশ্যমান ভূমি কিছুই করিতে পারিলে না। ইংলণ্ডের এখন জাতি এই দশা; এখনও যদি উভয়দেশে প্রভাবিত হইত প্রভৃতি করা যায়, নিয়ম করিয়া বৃত্তি দ্বারা করিয়া দেওয়া হইত, কোশানি-সেরায়ে চাকুরে জমীদারের পরিবর্তে রাজা প্রভৃতি হইয়া দরিদ্রবণিকের সেরার করিতেন—(অবশ্য ইহা অসম্ভব ঘটনা, ফলের দিকে লক্ষ রাখিয়া) কল্লিঙ্গের দ্বারা বুঝাইতেছি তাহা হইলে ইংলণ্ডে, অন্যান্য হইতে অনেকটা অস্বাভাব্য পায়, এ বিষয়ে অগ্রহাঙ্গ সম্ভব নাই।

প্রভৃতি-ভেদে জাতি-ভেদে মানিলে, বাহার উত্তম প্রকৃতি সেই ব্রাহ্মণ, বাহার অধম প্রকৃতি সেই শূদ্র; বংশের মধ্যে আর আর কি? এইরূপ ব্যবস্থা মুখেই ত চলা উচিত।

ইহার বিরুদ্ধে আমার যে যে বক্তব্য আছে, শুধুমাত্র ব্রাহ্মণকে যে জাতীয় প্রকৃতি; হাজার উত্তম হইলেও কল্লিঙ্গাদি বংশে যে জাতীয় প্রকৃতি নাই; বংশ-ভেদে প্রকৃতির এইরূপ বৈজ্ঞানিক কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বিভীষিকা: বৃত্তি বন্ধন ব্যাঘাত; জাতিভেদের অবাস্তব প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষাকৃত বহুলভাৱে অসদৃশ্যমান; তত্বদেশে জাতিভেদে যে বৃত্তিবিশিষ্ট বৃত্তির ব্যাঘাত আছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। মনে কর, একজন 'ভাল দলী' বৈশ্য, লোকপরিচিত হইলে, বাণিজ্য বেশ চলিতেছে; কিন্তু তার পুত্রের প্রকৃতি গ্রিক বৈশ্যের ভায় নহে; কিংবা তার ভগ্নতম্না আছে; অমনি তাহাকে বৈশ্য হইতে হুতরাং বাণিজ্য হইতে পারিত করিতে হইবে, একি কম অসামঞ্জস্যের কথা? বিশেষতঃ এই নিম্নোক্তসময়ের জাতিভেদ স্বীকার করিলে, কল্লিঙ্গের আধিক্য, কল্লিঙ্গ বৈশ্যের আধিক্য, কল্লিঙ্গ শূদ্রের আধিক্য, কল্লিঙ্গ বা ব্রাহ্মণের একবাক্য গোপ পণ্ডিত হইতে পারে। এ অস্বাভাব্য বৃত্তিবন্ধন বিভ্রান্ত মাত্র হইয়া উঠে।

শেষ্ঠপুত্র—ব্রাহ্মণ হইলেও বাণিজ্য করিলে, শূদ্র

পুত্র, ব্রাহ্মণ হইলেও দাণ্ড করিলে,—এরকম নিয়ম ত আর হইতে পারে না। যদি দাণ্ডই করিল, তবে ভাটাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানা হইল কেন? এবং তাহাতে বৃত্তি বন্ধনের শৈথিল্য বিলম্বন ঘটে; বাহ্য বৈশ্যপুত্র ব্রাহ্মণ যদি বাণিজ্য করিলে, কল্লিঙ্গ ব্রাহ্মণপুত্র ব্রাহ্মণকে বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিলে কি বলিয়া? এই দুই ব্রাহ্মণের যদি কোন অংশে পার্থক্য থাকিত, তাহা হইলে, তাহাতেই আমি বলি, ব্রাহ্মণপুত্র ব্রাহ্মণ হইয়া থাকিলে; আর বৈশ্যপুত্র, জাতি বংশ উভয়ের বৈশ্য। আমাকে পরামর্শ করিলে কি করিয়া?

তৃতীয়তঃ সামাজিক বিশুদ্ধতা। যে ব্যক্তি, পিতাকে অতিসম্মত ব্রাহ্মণ দেখিয়াছে, সে আপনার বাটার চাকুরে পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজ করিতে ও আপন হস্তে শূদ্র হইতে সম্বন্ধে রাগ করি কি? না অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত বৈশ্যপুত্র, সেই শূদ্রপুত্রকে ব্রাহ্মণ বলিতে প্রবৃত্ত হয়? দুই চারিজন শুভঙ্ক—না হয়, ব্রাহ্মণ বলিল; দুইচারিজন নান্দয় অস্বাভাব্য হইলে, কিন্তু একরূপ সমাজেই রাগ করিতে যাওয়া পাপ-লাগি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহার দল সমাজ বিশুদ্ধতা। সেই জন্ত জাতিভেদ বংশভেদ করা হইয়াছে। জাতিভেদের মূল যে প্রকৃতি-ভেদ, তাহা বংশে অল্পত্ব রাখেই বিন্দুত উপদেশ ও উপায় নির্ধারণ শব্দে আছে। বিবাহ-বিচার আচারাদির বিচারও এই জন্ত। সুতরাং প্রকৃতি-ভেদের তত্ত্ব ব্যবহারই ছিল। এখন বটে, নয় পড়িয়াছে। শাস্ত্রের ব্যাঘাত উপদেশ রক্ষা না হওয়াতেই এই গোপনযোগে দৃষ্টিগোচর।

ইংরেজ-কল্লিঙ্গের উদ্ভাবনী শক্তি, জাতিগণের দার্শনিক এবং আধুনিক মুসলিমের আধুনিক অনেক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হুতরাং বৃত্তিমাত্র ও প্রত্যক্ষ শক্তি। তাহারা বাহ্যনিক প্রকৃতিভেদ, প্রকৃতি-পুত্র প্রকৃতি ব্রাহ্মণ কথা বিচার প্রয়োগন নাই। তবে বৃত্তি-বন্ধনের উপকার স্বীকার করি বটে, সে জন্ত দললক করিয়া এক এক দলে এক এক বৃত্তি ব্যবস্থা স্বতন্ত্র রাখিয়া, সকল জাতিই পরস্পর বিবাহ, আহার ব্যবহার প্রভৃতি কার্যে জাতিগোলে দৃষ্টি কি? আট-শট বন্ধন কেন? বিশেষতঃ তাহাতে বিবাহবিভাজ্য দুটিয়া যায়। এখন অনেক জাতিতে কল্লিঙ্গ কায় কম, কল্লিঙ্গের ভাগ বেশী, তাহালাই বংশ গোপনপদ্ধতির অর্থাৎ বংশপাত্রের হুল্লভানিবন্ধন

অথবা পূর্ণ-প্রভতির হস্ত হইতে সমাজ সম্পূর্ণ
রক্ষা পায়।”

“এ কথা বলিতে পার না; রত্নবন্ধন করিতে
যেলেই, আট বাট বান্ধিতে হইবে। মনে কর,
বাঁজি-রত্নি বড়ই লাভজনক, ‘গলফার্মাসি’
বার্মিজো। রূপকর্মও কম নহে, ‘ডবল’ রূপ-
কর্মণী। চাকুরী—মন্দের ভাল, ‘ডবল’ রাজ-
সেবারী। ভিকারীজ কোন কর্মের নাই, ‘ভিকারী’
‘মেন’ ‘মেন’ চা। ব্রাহ্মণের-নিষ্ঠুর-রূপি—‘ভিকারী’
কমি পায় না; উৎকর্ষ রূপি উৎকর্ষের
কথা ত এ আসরে পাড়াই যায় না। সকলের
সঙ্গে সকলের যদি সর্বশাশে সমভাবে চলিল,
তবে যে হল ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ উক্ত ব্রাহ্মণের প্রধান
বুদ্বি, তাহাকে দৃষ্টিত অপর্যাপ্ত ভিন্ন আর
কি বলিব? আর যে দলবাক লাভ-শুভ কষ্টের
একটি রূপকর্মে বাধ্য করিবে বা ক্রিপণে
বিভীতঃ—‘মৈত্রিক তবের’ গুণ একটা সর্বত্রই
থাকে। তেমনাদের প্রিয়-শিক্ষক সাহেববিশেষ
নহেও আছে। তেমনাদের নিয়মে অনেক ব্যক্তিই
সচরাচর এক রূপকর্মসম্পন্ন পুত্রও অপর রূপ-
কর্মসম্পন্ন নৌহিত হওয়া সম্ভব। এখানে কোন
বুদ্ধির উপর যে কায়ার আত্মিক অসুযোগ
হইবে, মাতামহ বুদ্ধির উপর কি পিতৃবুদ্ধির উপর,
তাঁহা ত বলা যায় না। তবে কোমলপ্রীতি এইরূপ
বলা যায় যে, যে বুদ্ধিতে কষ্ট কম, লাভ বেশী—
তাঁহাতেই তাঁহার অসুযোগ হয়। যেখান দ্বিধাই
হইবে, উত্তরভিত্তি শুষ্ক উৎকর্ষই বা কেন, বৃদ্ধি-
কর রূপকর্মেই কেহ যে অগ্রসর হয়, এমন ত
বোধ হয় না। বিশেষতঃ প্রকৃতিভেদকে ব্রাহ্মণ
কথা বলিয়া উড়াইলে চলিল না। প্রকৃতিভেদ না
মানে কে? সং, অসং, জড়, পণ্ডিতের ভেদ, এক
প্রকৃতি ভিন্ন আর কোন রূপ জানা যাইবে? শুষ্ক
বাহুযিয়ে উজ্জ্বল শক্তি থাকিলেই যে রোহি-
প্রকৃতি-মণ্ডল হইবে একই কোন কথা নাই।
এখনকার অনেক ব্রাহ্মণের দ্বারা অনেক গোপ-
ন্য কথা হইতেছে, তাঁহাদের অনুভূতি প্রকৃতির উচ্চ
নীচতা বুঝা বড় কঠিন। আর বুদ্ধিমত্তা, তাঁহাও
যে ভেদভেদে হয় না এমন নহে; শাস্ত্র জ্ঞানকে
ত একমুখে জানাই বলিয়াই হবে। এই অজ্ঞান ত
রজস্বম্যাদ্বৈতের কাটা। সুতরাং বুদ্ধিমত্তারও বৈল-
ক্ষ্য আছে। সাধিক বুদ্ধি একরূপ, অপর বুদ্ধি
অন্যরূপ।

বিবাহ-বিভাত অপনয়ন সময়ে যে দ্বিগ্ন নিয়াজ,
তাঁহাও অস্বিকার। এক বঙ্গীয় স্থানীয় ব্রাহ্মণ
ভিন্ন আর কোন সম্প্রদায়ের কথা যখন অব্যাহতি
থাকে না, তখন পথের বঁড়ই কেন চাপাচাপি হইত
না, কড়া ও শুষ্কতার মধ্যে যে অসমান কথা নাই,
ইহা স্থির; এখন অল্পজাতির মধ্যে বিবাহ ব্যাপার
প্রশ্নে করিলে, কন্ডার দর অর্থাৎ কন্ডাকর্তার
পূর্ণ গ্রহণ সময়ে একটা কেলেক্সারী ঘটবে। কেন
না অনেক ইতর জাতির পুরুষসংখ্যা এখনও
বেশী আছে। সকলের সঙ্গে বিবাহ চলিলেও
থাকিলে। সুতরাং পথের ভার, কন্ডাকর্তার থাকে না
পড়িয়া বরকর্তার থাকে পড়িবে, প্রভেদ এইটুকু মাত্র।
বিভাত দুই হইবে কিরূপে? আর স্থানীয় ব্রাহ্মণের
দায় ত কৌল্যের—মেলবন্ধের বন্ধন শিথিল
করিলেই দৃষ্টিতে পাবে। তাহা আর জাতিভেদের
সঙ্গে সমন্বয়ে জড়িত নহে।

ফলতঃ বিবাহ-বিভাতের মধ্যে বিবাহ-বিভাতের
একোপাই সম্বন্ধ নাই; পাশের সঙ্গেই বনিত
সম্বন্ধ; সুতরাং জাতিভেদ উঠাইলে, মুচি মুখাক্যাস
সকলেই পাশকরা ছেলে বুজিবে; বিবাহ-বিভাতও
বাড়িবে।

তবে এক আপত্তি করিতে পার বটে, যে, উৎকর্ষ
সাধিক আহার্যাদি ও উত্তমাদি প্রকৃতি নির্মিত
কথা ক্ষেত্রবিশেষেও ব্রাহ্মণাদি চারুকর্ণের
প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। তত্ত্বের আমরা বলিতে
পারি, জাতিভেদ উঠাইতে গিয়া শেষে যদি তর্কের
বাড়িবে, আর আমাকেও জাতিভেদ প্রতিষ্ঠা করি-
তেই উদ্যত হও; তাহাও আমাদের ক্ষতি কি? তবে
জাতিভেদের উৎকর্ষ সিদ্ধি তাহাতে হয় না; প্রকৃত
জাতিভেদের মূল, স্রেজ সমাজ নাই।—মূল পণ্ডিত
তথ্য হইতে পারে না। সে দেশের জল বায়ু, প্রাণ-
প্রকৃতির বায়ু, আশ্রয়মান কালের বায়ু;
মস্তিষ্কের বিকৃতি, অর্থাৎ অবিকার বৃত্তিই এই
জাতিভেদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান আছে।

জাতিভেদের প্রকৃত উৎকর্ষ মুক্তি, তাহা ত সিদ্ধ
হইবার যোঁই নাই। অব্যাহত উৎকর্ষ বৃত্তি য-
হাতেও ব্যাহত—প্রজা বিপর্যস্ত বৃত্তি সম্ভব। যে
প্রকৃতি ব্রাহ্ম জাতিভেদ হয়, সে বিজাতীয় প্রকৃতি,
ক্ষেত্রের নহে। কায় উচ্চারণ লইয়াই মস্তিষ্কের
বিকৃতি সহজতঃ অস্বস্ত করা যায়। অপর
দেশের জল বায়ু প্রকৃতিও জাতিভেদের মূল পোষক
নহে। আর একটা মূল দৃষ্টিতে বুঝিয়া লও, পৃথিবীর

এতকারের পর—কত জাতির উন্নতি অবনতির
পর, বাহারী বহির্বিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধন
করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি, যে নিত্যত অমনত,
জাতিভেদের—এই চারুকর্ণাকার জাতিভেদের যে
নিত্যত অম্পূর্ণযোগী, তাহা কি আর বলিতে হইবে।
জাতিভেদকে—আমরা, ধর্ম, অধ্যাপ-বিজ্ঞান, সমাজ-
শৃঙ্খলা ও উন্নতি—এই ক্যাটার সমষ্টি মনে করি।
যাহাদের জাতিভেদ নাই, তাহাদের ধর্ম নাই; জাতি-
ভেদ না থাকিলে, অধ্যাপ-বিজ্ঞান কোন মতেই
হয় না। সমাজ-শৃঙ্খলা ও উন্নতি জাতিভেদের
অংশ মাত্র।

এই জাতিভেদের যে যে অংশে ব্যাহত হইয়াছে,
যে সংস্কারকল। যদি ক্ষুদ্রি ছাড়া—ক্ষুদ্রক
ছাড়া, সেই সমুদ্র অংশ পূর্ণবর্তিত ও সংস্কৃত
করিয়া জাতিভেদকে পূর্ণবর্তিত ব্রাহ্মণ রাখিতে
চেষ্টা কর; তাহা হইলে জানিবে আমাদের উন্নতি;
নতুবা কর্মেই ইহার অবসাদ ও আমাদের অবনতি
অস্বস্তিকর।

সামাজ্য কাণ্ডের উপসংহারে, একটা কথা
বলা আবশ্যিক; বসন্তে হৃদয়, মেসেস্ত শত্রু,
গ্রীষ্ম, কল, দিবসে আলোক, রজনীতে অন্ধকার,
এইরূপ কাল বিশেষে বস্ত বিশেষের প্রাকৃত্য
হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম। এখন বলিগুণ, ইহা ব্র-
ভেদের প্রাকৃত্যের সময় নাই। এখন জাতি-
ভেদের মূল—প্রকৃতি, কালবশে মান; সর্বগুণ
অবমান, তেমনগুণ বিজ্ঞান। এই জ্ঞান পূর্ণ পূর্ণ
হইতে কোন কোন অংশে—এই মূলে ব্যাহত
পরিবর্তন হইয়াছে। অহুশোম ক্রমে বিবাহ, মূলের
নথো দান গোপাণাদির আর ভোজন, ক্ষেত্রজাদি-
পূর্ণ-ব্যবস্থা প্রকৃতি করিয়া নিয়ম, পূর্বে প্রচলিত
ছিল; এখন তাহা নিসৃত্য হইয়াছে; তখন প্রকৃতির
ভেদ ছিল, নিয়মবাহী সমাজকে আশ্রয় করিয়া
প্রকৃতির অধীন করিবার ক্ষমতা ছিল, পূর্ণ বিশেষ
বসন্ত পূর্ণের অস্বস্তিকর সং পরিবার সমার্থ ছিল;
ক্ষেত্রজাদি পূর্ণের প্রকৃতিও উপপাদকের আধার
আশ্রয়সময়ে উন্নত হইত, সেই জ্ঞান পূর্ণকালে তাহা
নিম্নিক হয় নাই। অজ্ঞাত নিয়ম সমাজও এইরূপ
জানিবে। এখন মেরুপটী ঘটে না। এখন অসমাপ্তিক

পূর্ণও তদুৎপন্ন গুণ পিতার সর্ব হইত না।
‘সামুলোমোন বর্নান। জাতিভেদাম্মা’। ‘সামুল’
সজাতি হইত।

কাল, যাহাতে কোনপদ তমঃ সম্বন্ধ না হয়, তদ-
যায়ী ব্যবস্থা—এখন শ্রবণের সময়।
‘অধিক’ কথা, ‘আর’ শিথিল না; নব্য শিক্ষিত
সংস্কারক দল, যেন কথাগুলো একটু আলোচনা
করেন।

তর্কের ধাত্তিরে যাই বলি, বসন্তে কিজ পড়ই
জাতিভেদের স্রষ্টা; ইহার প্রথম মূল প্রকৃতি
দেখাশাক;—
লোকাকর্ষে বিবাহগত, মুখ্যবাহুকাপাতঃ।
ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়ং বৈশ্বং শূদ্রক নিরবর্তনং।

শ্রীপকানন তর্করত্ন।

দেবযোনির প্রাকৃত্য।

ভারতের আর মানুষ নাই, মানুষের সম্বন্ধ নাই;
সবাই অমানুষ, যাহাদের সচিৎ ভাবের সম্বন্ধ,
তাঁহারাও অমানুষ। অমানুষ বলয় নেন কেহ
রাগ না করেন—অমানুষের সহজ অর্থ ধরিলে
একটু রাগ হইতে পারে বটে; সত্য হইলেও ‘রাগ’
হইবার কথা বটে; কিন্তু আমি সে অর্থে ‘অমানুষ’
পদ ব্যবহার করি নাই। অমানুষ অর্থ্য দেবযোনি।
এখন ভারতে প্রাচীন অধিবাসী সকলেই দেবযোনি।
রাজা-প্রজা সবাই দেবযোনি। দেবযোনি ভারত-
বাসী হওয়াতে এবং ভারতবাসীর রাজা হওয়াতে,
মানুষ ভিত্তিতে না পারিয়া কোথায় দৃষ্টিতে কে
জানেন। দেবযোনির অধিনামে মানুষের, সেই পুরা-
ন পচা ভারতের ভারতও দৃষ্টিতে, রূপক
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। হৃদয়ের জোৎস্না মুগ্ধতাছে।
আনন্দের উৎস অবিরত প্রবাহিত। এখন আর
যে পৃথিবীর ভারত নাই, মানুষের ভারত নাই,
ভারত এখন দেবযোনির; বৃষ্টি ভারত এখন
ধরতীর।

“বাসী বর্ননা ত করিতেছে ভাগি; কিজ ভরন
ডায়া মিথ্য কথা গিথিতেছ কিরূপে। দৃষ্টিতে ভরন
এখন ২৫ কোটির অধিক” মহাত্মা বর্তমান; অথচ
হুনি অস্বস্তিকর সহজ ভার্য শিথিয়া যাচ্ছে,
‘ভারতের আর মানুষ নাই’ তেমনার ভায়া সম্যাবাদী
এককলেশক দেশক জন আছেন।”
“বাপুজি। অত বাপা হইও নী; আগে ভদ্র,
তলাইয়া বুঝ, তার পর না হয়, যাহা ইচ্ছা বসিও।

না বুঝিয়া না হুগিয়া হঠাৎ একটা কথা বলা কি ভাল? তাই বলি আমার কথাটিকে আগে একবার শুনি।

আমি বলিতেছি, ভারতের ২৫ কোটির অধিক লোক আছে হুগি, তাহারো কিছু মানুষ নহে; বাহাদুরিকের তুমি মানুষ বলিতেছ, আমি তাহাদিগকেই দেখাইনি বলিতেছি।

অভিধানে কথিত হইয়াছে,—

“বিদ্যাধরোহপসরো-বক্ষ-বক্ষো-গক্ষর্ক-কিররাঃ।
শিশ্যচো ওহকঃ সিন্ধো ভূতেশ্বর্যো দেবেযোনিরঃ।”

বাসাদা ভাষায় আর অনুবাদ করিব কি, এই দশবিশ দেবেযোনি, নাম বিদ্যাবার প্রকৃতি, মূলের স্রোত হইতেই তাহা বৃদ্ধা হইতেছে।

প্রথম দেখা যাক, ভারতের অধিবাসী প্রজাজাত—এই দশবিশ দেবেযোনির মধ্যে কোন নামে অভিহিত হইতে পারে,—

দেবেযোনির পরিচয়ে প্রথম বিদ্যাবর্ণের নাম দেখিতে পাই, তাই দেখিতেছি ভারতের লোক বিদ্যাবর্ণ কি না?—ভারতের চির-অধিবাসী আমরা আপনাদিগের পুরুষ-পদস্বাপাত বিদ্যাকে মাটা করিয়া, অবিদ্যা-স্ববিদ্যার আশ্রয় প্রগ্রহ দিতেছি—আমাদিগের বিদ্যাবর্ণ হইবার এই এক কারণ ত রহিয়াছে। তা ছাড়া বাসাদী বলিয়া আমাদিগের বিদ্যাবর্ণ হইবার আরও একটা কারণ আছে। আমাদের যত বিদ্যা সবাই অশুভ, কথায় বিদ্যা প্রকাশ করিতে আমরা বড়ই মগনপ্ত। আমাদিগের জ্ঞান চরম-শক্তি লগ্নতে আর নাই।

আমরা অপসর; নিম্নে না বলি, রাজা প্রকারান্তরে সবাই আমাদিগকে বলিতেছেন ‘অপসর’। হে হিন্দু! হে ভারতবর্ষীয়! তোমাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে, এখন ‘অপসর’। বাসাদিগের জ্ঞানের বর্ধক্য করিবার ভয় দেখাইয়া এক রকম শব্দিই বলিতেছেন, যে পুরাতন জাতি! এ উনিবিশ শতাব্দী; তোমাদের থাকিবার উপকল্প সময় নহে এখন ‘অপসর’। যার ভাষায় বাহা অপসর একই অপভ্রংশ হইলেই তাহা অপসর।

আমরা বক্ষ। রাজা মূখে না বলুন, তাঁহার মনের ভাব আমাদের প্রতি সেরস, তিনি আমাদিগকে দের্পণ ভাবে বুঝেন এবং আমারা বাস্তবিকও যাহা, তাহার রাজ্যের ভাব—(Jacks) জঙ্কু অর্থাৎ যক্ষ। রাজভাষা অনুসারে আমরা যখন বক্ষ, তখন আর কাহারও কথাটা কহিবার ঘো আছে কি?

আমরা বক্ষও বটে; কেননা আমরা বক্ষু। পাথরের চিবি না হইলে এত অসাড়, জড়, স্পন্দহীন হইব কেন?

আমরা গক্ষর্ক; গক্ষর্ক-নগরের উপর যখন আমাদের অস্তিত্ব, তখন আমরা আপনাদিগকে গক্ষর্ক বলিয়া পরিচয় না দিব কেন?

আর আমরা যে কিম্বদ—কিম্বদুস্ক, তা লগ্নতে কে না জানে? পুরুষকার থাকিলে অবশ্য কিম্বদুস্ক হইতাম না।

কির হিবিধ; এক অশু-মুখ আর এক অশু-বেহ। আ আমরা দুই প্রকার কিম্বদই বটে।

এদিকে আমরা বাজার মন্ম হই, ‘হুতুমুখো’ আমাদের মধ্যে কেহই নাই অশু-মুখ হওয়ার এই এক কারণ; হুতিয় কারণ, আমাদের নিজের আর মুখ নাই; যত একরূপ বক্ষ, কোন হানে মুখ পাইবারও ঘো নাই; তাই আমরা অশু-মুখ।

আমরা ইংরেজের বাহন বলিয়া অশুবেহ এবং ইংরেজ প্রভুর প্রবেশের আমাদের ঘেহ লুই হইলেও কথা কহিবার ঘো নাই, কহিলেও ফল নাই; কেননা আমাদের বেহ আমাদের নিজেরই নহে; কাঙ্ক্ষেই আমরা অশু-বেহ বলিয়া পরিচিত।

আমাদের মধ্যে আজ কাল শিশ্যচও অনেক। আমাদের-বিশারদ-বাবুসকল পৈশাচিক ভাব এখন অনেকের।

আমরা ওহকও হইয়াছি। একে ত ক্রমেই প্রকাশ্য হইন যেন অস্তিত্বপুঙ্খ হইয়াই ওহক বলিয়া পরিচয় দিবার পাত্র হইয়াছি, তাহাতে আমরা

আমাদের হুগি একটা চির অধিকৃত বস্তুর ‘কাকরা,—ওপ্ত, অশুভ, বুরি বিলম্বই হইয়াছে। বিলম্ব হউক আর নাই হউক, আমাদের কাছে ওহু ও ত হইবে। আমাদের ঘরে ঘরে আগে কামো বিরাগ-মানা ছিলেন, এখন তাঁহার ঘে ‘কা’ ওহু; বলা চলে—‘অভ্যন্তরে’—অন্তরে বাহিরে। পূর্বে কপিলা আমাদের অনেকের ছিলেন, এখন ‘পীলা’ বহু লোকের

দেখা যায় ইত্যাদি।

আমরা সিন্ধ; সিন্ধ—এখন মনের তাপে। সাহেবেরা বলেন হুতের তাপে।

আমরা ভূতও বটে; পৌরব অভ্যুত, বিদ্যা-বুদ্ধি-ভাতি, অভ্যুতের কবলে নিমগ্ন; সেই জন্ম আমরা ভাতি, আমরা ভূত। আর সাহেবেরা আমাদিগকে ভূতও বলেন, ভূতও বলেন।

ভারতের অধিবাসী প্রজাগণ—অনেকেই দশবিশ

দেবেযোনির নামেই পরিচিত। তিন চার প্রকার দেবেযোনির-লক্ষণ ত সকল প্রজাতেই মিলে। এই লক্ষণ প্রকার কথা।

ভারতে প্রবাসী অধিবাসী রাজজাতি সম্বন্ধে এবার দেখা যাক, তাঁহারা কিম্বদ দেবেযোনি?

আমাদের রাজজাতি ইংরেজ; ইংরেজ এখন পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যাকর্জার অতি হিন্দুপু জাতি, হুতরাজ বিদ্যাবার আখ্যা পাইবার সম্পূর্ণ উপকূল।

নেপোলিয়ান এক দিন তাঁহার পসার মাটা করেন, জিলিন, কপদার বা ‘অপসর’ করেন। মহানেশালী বদলবর্জিত ইংরেজকে কপদার ওহু ও অসুত নহে।

আহার ব্যবহার দেখিয়া ইংরেজকে অনেক রাক্ষস বলিয়াও থাকে, দেখা আমরা তনি না। ইংরেজই আনন্দে গক্ষর্ক বলিয়া কখন কখন পরিচয় দেন।

যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আমরা Gun ধর্ম; তাহারা অমনি সত্যের কাজকর্তে বলে, না প্রভু, রক্ষ। এইরূপে নিজস্বতে ও পরস্বতে ইংরেজজাতি গক্ষর্ক ও বক্ষ নামে অভিহিত হইবার পাত্র। আর তাঁহারা যে কিম্বদ, হো না জানে কে? আমাদের ‘কিম্বদ’ ইংরেজই বটেন।

কিম্বদ, কিংপুরুষ, রাজপুরুষ, বলিয়া আমরা ইংরেজকে প্রীতিভক্তি-উপহার প্রদান করি। ইংরেজ সিন্ধ, এখন সকল কার্যে। তাই তাঁহাকে সিন্ধও বলিতে পারি। ইংরেজের মধ্যেও অনেক

হতুভাষা ওহুভাবে অবস্থিত, অনেক হুর্দ্ব ত ভূত পিশাচরূপেও পরিচিত হইয়া আছে।

তাই বলিতেছিলাম, এখন ভারতের রাজা-প্রজা, প্রবাসী-অধিবাসী, অধিকারী-সংসর্গী, সবাই দেবেযোনি। পদস্বপ্ত ভূতলগ্নশ্য না করা দেবেযোনি লক্ষণ; তা আমাদের সম্পূর্ণ হইয়াছে—এখন আমরা আর মাটিতে পা দিই না, রাজজাতিও দেখাই না। এখন বুঝিলে ত ভারতে আর মানুষ নাই।

মহুয়াই যখন নাই—তখন ‘মহুয়াধ’ থাকিলে কিরূপে? অতএব আর মহুয়াধ কাহারও নাই বলিয়া কেহ যেন আক্ষেপ না করেন। মহুয়াধ অতি সামান্য বস্তু,—দেবেযোনিতে মহুয়াধ থাকিলে কোথা হইতে? ভাঙ্কায় ভিক্রমস, অমৃতত বিরম, চমলে বৃক্ষ, কখন কি থাকিতে পারে? ওখাপি কতিপয় দেবেযোনি আশ্চর্য্যেরা হইয়া ভসের ঘোরে ও ঘোরে ঘোরে মানুষের ধর্ম বজায় রাখিবার

জন্ম চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে কিছু তাঁহাদের

অবনতি ভিন্ন উন্নতি নাই। দেবেযোনি হইয়া মানুষের ধর্মপালন। ইহা অপেক্ষা ‘শোরতর ভূতলগ্ন’ আর কি আছে? যে দেবেযোনিপাল।

জাত হুইও না, ‘বাস্তবপ্রকৃতির অহসরণ কর; পূর্বে যাহারা মহুয়া ছিল, তাহাদের দেখাদেখি অতবড় ওহুতত কার্য করিতে আছে? যাহারা মহুয়া ছিল, তাহারা মহুয়াধর্ম অবলম্বন ও রক্ষা করিয়া গিয়াছে।

তোমারা ত মহুয়া নহ, তোমাদের সে প্রয়াস কেন? মহুয়াপায়ের আচার ব্যবহার এখনকার ভারতে চলাইতেই বা চেষ্টা কেন? ভারত ত এখন তোমাদের—দেবেযোনির নিবেদন।

যদি একান্তই সাধ হইয়া থাকে, মানুষের ধর্ম পালন করিতে, মহুয়াপায়ের আচার ব্যবহার ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিতে, তবে যে ভারতবর্ষীয়। উন্নত হইয়াও আবার অবনত হও, তাক্ষন হইয়া চাওলে জাতি ভেদ, দেবেযোনি হইয়াও পুনরায় মহুয়া হইতে যত্ন কর; তবে বাসনা পূর্ণ হইবে। নচেৎ

“তয়ানভঃ পুশ্পতু” কোরকেন”

ত্রিপকানন তর্করত্ন।

জীবদেহের বর্ণনাস্থা।

জীবদেহের বর্ণনাস্থা।

জীবদেহের বর্ণনাস্থা।

জীবদেহের বর্ণনাস্থা।

জীবদেহের বর্ণনাস্থা।

জীবদেহের বর্ণনাস্থা।

জীবদেহের বর্ণনাস্থা।

জীবদেহের বর্ণনাস্থা।

পদার্থ মাত্রই অবশ্য কোন না কোন প্রকার বর্ণপোষিত হইবে, নতুবা তাহা দর্শনের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। দর্শনের পক্ষে ইহা আবশ্যিক, দুইতদপার্শ্ব-সমিত অলোক-রশ্মি দর্শনকারীর চক্ষে প্রাণিত হইবে, নতুবা দর্শন সম্ভব হয় না। বর্ণ ও বর্ণ-বিবেকের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া, তাহার পরিণতি, এবং কোন পক্ষে, কি নিম্নে, কোন প্রণালিতে, সেই পরিণতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কতকটা ব্যাখ্যা হইতে পারে। কতকটা বলিতেছি, কেন না বর্ণ-বর্ণবিচ্ছিন্নতার আনন্ত্য এবং বিশেষ বিশেষ পক্ষে দৈহিক বর্ণপরিবর্তির বিষয়ক সৌন্দর্য পূর্ণাঙ্গোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, প্রত্যেক যুক্তিগত স্থলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অসম্ভব—অস্তুত: বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায়, অসম্ভব। যাহা সম্ভব, যতটা সম্ভব, তাহাই সম্বন্ধে হুই চারিটা কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি।

পূর্বসূচ্য প্রাণিতত্ত্ববিদেরা জীবতত্ত্বের আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় জীবদেহের বর্ণের পরিপন্থ বড় একটা অভাব বোধ করেন না। বর্ণবিজ্ঞে তাহার একটা আশ্চর্যকর বা আকর্ষক ও বা ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লইতে। তাহার বিবেচনা করিতে যে, বিহঙ্গম, কীট, পতঙ্গ ও কুমহের বর্ণের জ্ঞান, তাহার যৎ-যত উপযোগের জ্ঞান, মনুষ্য-মনুষ্যের কৃষ্ণি সাধনের জ্ঞান, হইতে হইয়াছে; না হয় কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় সৌন্দর্যিক নিয়মের কল। জীবের জীবন-প্রণালীর সহিত তাহাদের শারীরিক বর্ণের যে কোন প্রকার সংস্রব বা সম্বন্ধ আছে তা বাখ্যিত পারে, এরূপ চিন্তা তাহাদের মন কখন বাহ্য পায় নাই।

এ বিষয়ের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, বর্ণের নীতি ও বৈজ্ঞান্য মান্য-সমক্ষে আলোক ও তাপের অব্যবহিত লক্ষ। উৎপাদন পক্ষে অতি উজ্জ্বল-বর্ণপোষিত পক্ষী, পতঙ্গ ও গুপ্তের বাহ্যতা দেখিয়াই যে, এই প্রকার, সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যে প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে, তাহা নানারূপে দেখা যায়। মরুভূমিদানী জীবদিগের মধ্যে উজ্জ্বল বর্ণের নিত্যক অভাব পরিগণিত হয়, অথচ মরুভূমিতে আলোক এবং তাপ উভয়ই বহুপরিমাণে প্রবাহ। আলোক এবং তাপ—বর্ণদৃষ্টির কারণ হইলে, মরুভূমিদানী জীব সকলের বর্ণ অবশ্যই সর্পাঙ্গোচনা প্রোক্ত হইত। তাহা বর্ণন নহে, পরন্তু প্রকৃত অর্থাত্য তথ্য-পটীত, তখন আলোক ও তাপের আধিক্য বর্ণনই

বর্ণের জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, উষ্ণ-কটবর্ণের অন্তর্গত প্রদেশসমূহে, অতি উজ্জ্বল-বর্ণের অনেক কীট যেমন দেখা যায়, তেমনই আবার এমন শব্দ সহস্র শ্রেণীর পক্ষী ও পতঙ্গ পরিগণিত হয়, যাহাদের বর্ণে উজ্জ্বলের নাম গন্ধও নাই। আবার একটা কথা এই যে, এমন অনেক শ্রেণীর পক্ষী আছে, যাহারা পৃথিবীর অতি সর্বত্রই বাস করে—যেমন হংস, বাজ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে যাহারা উষ্ণপ্রদেশ বাস করে, তাহাদের মধ্যে হিমপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ-প্রদেশবাসী উজ্জ্বল জীবের অধিকতর বর্ণবিপ্লব পরিলক্ষিত হয় না। বরং হংসজাতীয় জীবের মধ্যে উষ্ণপ্রদেশ অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ এবং হিমপ্রধান প্রদেশেই অধিকতর বর্ণবিপ্লব পরিগণিত হয়। অতএব বুঝা গেল যে, আলোক ও তাপের আধিক্য বা অল্পতা জীবদেহের বর্ণসংস্থানের নিয়ামক নহে।

ডায়ট্রেন মাছেরের পরিপ্লম ও ঘন জীবদেহের বর্ণ-বৈজ্ঞান্যের ব্যাখ্যা অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সাংঘাতিক হইয়াছে। তিনি এই সাধারণ তত্ত্ব নির্দেশ করেন যে, জীবের স্বাভাবিক বা ধর্ম-মাত্রই সেই জীবের পক্ষে হিতকর বলিয়াই পরিণত করিয়াছে; হিতকর না হইয়া যদি অনিষ্টকর হইত, তাহা হইলে কখনই তাহার স্বাভাবিক বিধান হইত, না—কঠোর, নির্ণয় প্রাকৃতিক নির্দোষ নিয়মবশে তাহার নিয়ম প্রচলিত হইত। বর্ণ যখন জীবদেহের একটা স্বাভাবিক ধর্ম—অনেক স্থলেই বেশী-বিভিন্নপে একটা প্রধান নির্দেশ—তখন বর্ণও যে হিতকর—তাহা নিয়মের বশবর্তী, ইহা বর্তমানেই অসম্ভব। পঙ্গদ্যতী প্রাণিতত্ত্ববিদেরের ত্রিংশদধর্মিক কালের অনুমানাদি এই কথা অতি দৃঢ়পক্ষে সমর্থিত ও বিশদপক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে।

জীব-শরীরের বর্ণ যে, জীবের শুভাভ্যন্তের সহিত নিগূঢ়ভাবে জড়িত; শুভাভ্যন্তের দ্বারা—মতি-সাধারণ এবং এরূপে দেখা যায়। ব্যাঘ্রাঘ্য প্রত্যেক জাতীয় জীবের বর্ণ প্রায়শ: স্থির, অধুর্মি বর্ণনপীত, অযচ্ছিন্ন। জীবের যে জাতীয় বর্ণ বর্ণ, উজ্জ্বলতা প্রত্যেক জীবের ঠিক সেই বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—যে জাতীয় বিভিন্ন বর্ণে পরিণতিতে, উজ্জ্বলতা প্রত্যেক জীবের অধিক বর্ণই বর্ণসংস্থান, সেই বর্ণ-বৈজ্ঞান্য, পরিগণিত হয়—কোনটি কোন বর্ণই ইহার ব্যাখ্যা বলিয়া থাকে। অথচ সেই জাতীয় জীবই মনুষ্যকর্তৃক

পালিত হইতে থাকিলে তাহাদের বর্ণসম্বন্ধে এরূপ বর্ণবিপ্লব আর দেখা নাই। তখন তাহাদের বর্ণ পরিণতি, বস্তুবিশ্বাস সেই নির্দিষ্ট পথ ভাঙিয়া কত নতুন পথ অবলম্বন করে; কত নতুন পথে অগ্রসর হয়। হা যে, তাহা ত প্রতিনিয়তই দেখা যাই-তেছে। হুই একটা দৃষ্টান্ত লইয়া কথটা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাইবে।

গ্রীষ্মপ্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণপ্রদেশে, ব্যাঘ্র-বাহ্য বিহঙ্গম ও শুভ্রপাখী জীবদিগের মধ্যে যেত-বেত আভ্যন্ত বিবল। অথচ এই সকল জীবের দৈহিক সংস্থানে এমন কিছুই নাই, তাহা ইহাদের যেত-বেত-লাভের পক্ষে অন্তরায় হইতে পারে। বরং দেখা যায় যে, এই সকল জীবই মনুষ্যকর্তৃক পালিত হইলে অতি সহজেই যেত-বেত প্রাপ্ত হয়। গৃহ-পালিতাবস্থায় যেত-মুগিক, যেত-মার্জার, যেত-অগ, যেত-ক্যাভ, সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা ব্যাঘ্রবাহ্য সেই মূল বর্ণের এখনও অধিকারী, তাহাদের জায় এই যেত-বর্ণশাখীরাই এবং বংশধরিক ও বংশধরিত্বই হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এই সকল যেত-বর্ণধারী জীব এত স্থলত, এমন সহজ-প্রাপ্ত, এত সচরাচর দৃষ্ট হইত না। তবেই প্রতি-পন্ন হইতেছে যে, এই সকল জীবের যেত বর্ণ প্রাপ্তির পক্ষে ইহাদের প্রকৃতিগত অন্তরায় কিছুই নাই। যাহা বলা গেল, তাহাতে বরং ইহাই প্রতি-পন্ন হইতেছে যে, বর্ণ সম্বন্ধে ইহাদের পালিতবৃত্তি হইবার দিকে ইহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে।

উপরে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, তাপ-প্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ব্যাঘ্রবাহ্য পক্ষী ও শুভ্রপাখী শ্রেণীর যেত-বর্ণ জীব আভ্যন্ত বিবল। বিবল হইক, কিন্তু একেবারে প্রাপ্তাপ্য নহে। কীচিৎ দেখা যায় নহে; তবু দেখা ত যায়। ব্যাঘ্রবাহ্য যেত-বর্ণের হস্তী, ব্যাঘ্র, বিবল, শবক, বাঘ এবং আরও অনেক জীব—কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে; অথচ কখন ইহাদের একটা বংশ-প্রতিষ্ঠা, একটা শ্রেণীপটন হয় না।

যেত-বর্ণের বহুজীব চিরকালই দ্রুতপা। কেন এরূপ হয়? গৃহপালিতাবস্থায় জীবদেহের যেত-বর্ণের এত আধিক্য এবং ব্যাঘ্রবাহ্য এত বিবল-তা—কেন এরূপ হয়? অল্প ইহাই অনুসন্ধান, ব্যাঘ্রবাহ্য এই সকল জীবের মধ্যে এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম বা শক্তি বিদ্যমান আছে? যাহার প্রভাবে যেত বা শুভ্রাধিক্য এমন প্রকৃষ্টা বর্ণধারী জীবের বংশধর হয় না; এবং পালিতাবস্থায়, যে

কারণেই হউক, সেই নিয়ম বা শক্তির কার্য হইতে পায় না—ব্যাঘ্রবাহ্য তাহার কার্যপন্থ মুক্ত; পালিতাবস্থায়, শুদ্ধ। এখন দেখা যাক, সেই নিয়মই বা কি, তাহার কার্যই বা কি প্রকার? কি রূপে তাহা যেত-বর্ণ বহুজীবের ধর্ম সাধন করে? বর্ণ ও পালিত জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জীবন-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই বুঝা যায়।

বহু ও পালিত জীবের অবস্থাজাত প্রভেদ এই যে, বহু জীব স্বতঃস্ফূর্ত শত্রুবেগিত এবং প্রত্যেক শত্রুত শত্রুতা সাংঘাতিক—সেই শত্রুত-সাধনই তাহাদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়; পালিত জীবের ধরিতে গেলে সহ্যই একমাত্র সম্ভাবিত শত্রুত—সেই ‘আবার মাঘের শত্রুত’ বৈ নহে। বহু জীব সত্যত বিশপ; পালিত জীব প্রায় নিরপন্ন। বহুজীবকে আশ্রয় দিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়; পালিত জীবকে মনুষ্য দ্বারা করিয়া থাকে। পালিত জীব সম্বন্ধে নির্দোষ কাল মনুষ্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়; বহু জীব সম্বন্ধে সে ভাষা বর্ণ প্রকৃতি দ্বারা করিয়া থাকেন। অতএব ইহাই উপলব্ধি হয় যে, শুভ্রবর্ণ; বহু জীব যে এত বিবল, তাহা প্রাকৃতিক নির্দোষতার ফল; পালিত জীবের মধ্যে শুভ্র বর্ণের প্রকৃতি দ্বারা প্রাকৃতিক নির্দোষ-রোধের ফল। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্দোষে যে অথবঃ স্বাভাবিক সম্পাদিত হয়, জীবন সম্বন্ধে তাহা অগম্যতার পক্ষে হিতকর বলিয়াই হয়; যে শুভ্রের তাহা হয় না, জীবন-সংগ্রামে তাহা অগম্যতার পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়াই হয় না। দৈহিক বর্ণ-বিশেষণে স্বাভাবিক ও পুষ্টি এবং বর্ণান্তরে অস্বা-স্থিত ও বিলোপ, জীবের এই ইতিহাসের বংশধর। কেনম করিয়া দৈহিক বর্ণের উপর জীবের শুভাভ্যন্ত নির্ভর করে, তাহা ক্রমে বুঝাইতেছি।

জীবের শত্রু জীব। জীব-জগতে পরস্পরের মধ্যে খাণ্ড-খাণ্ড সম্বন্ধ বিদ্যমান। যাহারা খাদক এবং যাহারা খাদ্য, উভয়ই আত্মরক্ষার জ্ঞান আশ্রয়-গোপন করিবার উপযোগী হয় একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহারা খাদ্য, তাহাদিগের পক্ষে খাদক-জীবের লক্ষ্য আকর্ষক করিবার জ্ঞান আশ্রয়-গোপন প্রয়োজনীয়। যাহারা খাদক, তাহাদিগের পক্ষেও যেমন আকর্ষিত তত্ব জীবের সমীপবর্তী হইবার জ্ঞান আশ্রয়-গোপন করিবার ক্ষমতা করা আবশ্যিক। ইহার অন্তরে এক শ্রেণীর জীব ভলিত হইয়াই লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়। আর এক শ্রেণীর জীব অনাধার বা অজ্ঞাহারে দ্রিষ্ট

হইয়া যরিয়া যায়। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিতে যে বর্ণের আধিক্য, তাহার সহিত তৎপ্রদেশবাসী জীবের দৈহিক বর্ণের সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যশূন্য থাকিলে এই আশ্চর্য্যগোচন কার্য্য সহজেই হৃদয়রূপে স্পন্দন হইতে পারে। স্বয়ং তাই। এ বিবরণনা এমনই সুন্দর ও তৃপ্তকর যে, যাহার পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়, সে ক্রমে তথা লাভ করে। তাহাকে, তাহা লাভ করিতেই হয়; না করিলে বলা নাই। সেবতার এ বিষয় অপরূপভাৱে বলা নাই।

পারিপার্শ্বিক জীববৈচিত্র্যের সহিত জীবসমূহের বর্ণের কোন সুন্দর ও বিস্ময়কর সম্বন্ধি ও সামঞ্জস্য, চিত্তকর দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করিলেই তাহা সহজেই লক্ষ্যমত হয়। আভিভূতপ্রাণন প্রদেশে, যেখানে প্রচলিত সকল প্রকৃতিতেই তুয়ার-মণ্ডিত—অমল সপ্ত বর্ণের অনেক জীব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে, কতকগুলি সমস্ত বসন্ত বর্ণসমূহা শ্বেত বর্ণ থাকে; আর কতকগুলি কেবল শীতকালীন সময়ে শ্বেত বর্ণ প্রাপ্ত হয়। বাহার, শকল প্রভৃতিতে যেত থাকে, তাহাদের মধ্যে ভূজ, মশক, চোটের এবং গ্রানুলও'দেশীয় কালকন নামক বাজ পক্ষীই উল্লেখ করা হইতে পারে। এই সকল জীব বারমাসই তুয়ার-ধবলিত প্রদেশে বাস করে। যাহার শিশির সমামানে শ্বেত বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্ব্যতীত শৃগাল ও আরমাইন এবং ট্যুটুমিান নামক পক্ষীগুলি উল্লেখ করা হইতে পারে। ইহার প্রায় ষষ্ঠ সমুদ্র সমুদ্রের তুয়ার-ধবলিত প্রদেশে আশ্রয় লয় এবং অবস্থান করে। ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, এইরূপ বর্ণ-সংস্থান, এই সকল জীবের রক্তার উপাধিভূত—যে সকল জীব অল্প জীবের ব্যাখ্যাস্থানীয়, তাহার সহজে অনেক দূরী অতিক্রম করে; যাহার মাংসভোজী, তাহার অলসভিভাবে থাকা জীবের সমীপস্থিত হইয়া আক্রমণ করিতে পারে। যাহার কোন শীতকালে শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহার যে শীতপর্বে তুয়ার-ধবলিত প্রদেশে চলিয়া যায়, তাহার কারণও সহজেই বুঝা যায়। শীতকালে তুয়ার-ধবলিত প্রদেশে তাহাদের আশ্রয়গোচন, হুতরাং আহার্য্য, অতি সুন্দর সমৃদ্ধিযুক্ত হয়; কিন্তু অল্প সময়ে তাহার বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়া এরূপ প্রদেশে তাহাদের তাহাদের রক্তার কারণ না হইয়া বরং ফলস্বরূপে কাণ্ড হইবে; কেননা, পারিপার্শ্বিক বর্ণবিচিত্রতার সহিত তাহাদের দৈহিক বর্ণের সৌন্দর্য্যশূন্য না থাকা, তাহার সহজে শত্রুকর্তৃক পরিলক্ষিত ও ভক্ষিত

হইবে। হুতরাং ইহার শীতপর্বেই স্থানান্তরে চলিয়া যায়; তাহা না করিলে ইহাদের বংশলোভ হইয়া বাইত। জীবসমূহের বর্ণ যে, রক্তার উপাধিভূত প্রদেশে প্রাকৃতিক নির্ধারিত হইয়া উপাধিভূত, এই সকল জীবের আশ্রয়গোচন পরিবর্তন তাহার অতি সুন্দর উদাহরণও সমর্থক। এই তত্ত্বের আরও একটি সুন্দর প্রমাণ এই যে, এই প্রদেশবাসী যে সকল জীবের রক্তার অল্প উপাধিভূত, বাহাদিপক্ষে আশ্রয়কারী জন্তু শরীরের উপরে অল্প নির্ভর করিতে হয় না, তাহাদের বর্ণও শ্বেত নহে। এই প্রদেশে এক প্রকার মেঘ আছে, তাহাদিগকে কলুরি-মেঘ বলা হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত হইয়া বাস ও বিচরণ করে। সুখপট না হইলে, অল্প কোন জীব, ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে সহজে সাহস করে না এবং দলবদ্ধ থাকিলে ক্রিয়া তৎপ্রদেশবাসী যে কোন শত্রুর আক্রমণ হইতে আশ্রয়লাভ করিতে বিলম্বন সমর্থ। আশ্রয়কারী জন্তু পারিপার্শ্বিক বর্ণ উপাধিভূত করা ইহাদের পক্ষে সমর্থ নিষ্প্রয়োজন। ইহার তাহা উপাধিভূত করে নাই।

এ বিষয়ের অত্যন্ত দৃষ্ট উদাহরণ, এতৎপ্রদেশ-বাসী রেনেল নামক বাসজাতীয় পক্ষী। নিরক্ষিত তুয়ার-ধবলিত প্রদেশে বাসনিবন্ধন ইহাদের কুম্ভধর্মের কোনকার্য্য হওয়ার ঘটে নাই। আলোচ্য-তত্ত্বের আলোকে ইহার ব্যাখ্যা সহজেই করা যায়। এই জাতীয় পক্ষী বিলম্বন বলবান, কোন শত্রু হইতে কোন প্রকার আশঙ্কা নাই; হুতরাং শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার জন্ত যে বর্ণ লাভ করা ইহাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ইহার পণিত মাংস-ভোজী, হুতরাং বলপূর্ণতা আহার্য্য জীবের সমীপ-বর্তী ইহাদের জন্ত আশ্রয়গোচন নিষ্প্রয়োজন। ইহার গ্রাম্যপ্রধান দেশে, যেখানে অরণ্যমণ্ডিত পর্বত-বিহীন হয় না, যেখানে পাদপ সকল পক্ষী দেখা যায়, বাহাদের পাতের প্রাধান বর্ণ-প্রাধান। এই প্রাধান্য যে, তাহাদের রক্তার উপাধিভূত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার যখন রক্তার থাকে, তখন ইহাদের গ্রাম্যকাজ-সেই বংশ-সামান্যতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে—শত্রুর দৃষ্টি তখন তাহার সহজেই অতিক্রম করে।

* Darwinism. By Alfred Russel Wallace. p. 191.

মল্লভূমির অধিকাংশ অধিবাসী জীব-জন্তুর বর্ণ বাসুকার ছায়। স্থান ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। যখন ইহার আহার্য্য জীবের প্রত্যেকটি ভুজি পাতিয়া অবশিষ্ট করে, বর্ণ-সামঞ্জস্যের গুণে তখন ইহার প্রায় অস্বপ্ন-ভাবে থাকে। পারিপার্শ্বিক বর্ণের সহিত শরীরের বর্ণ এমন নিশিচয় খাপ খেয়, অনুরবর্তী জীবও তাহাদের সাহায্য উপলব্ধি করিতে পারে না। উক্ত ইহার অস্বপ্নের দৃষ্টান্ত। মিসর-দেশীয় বিভাল বাসুকা অথবা মৃত্তিকার ছায় বর্ণগণিত। অষ্ট্রেলিয়া-দেশীয় কাস্কার নামক জীবের বর্ণও তদ্রূপ। অনেক অল্পমান করেন যে, বস্ত্র অঙ্গের বর্ণ প্রথমে বাসুকা বা মৃত্তিকার ছায়া ছিল। টি স্ট্রায়াম সাহেব এক স্থলে বলিয়াছেন যে, মল্লভূমিতে, যেখানে বৃক্ষ নাই, সুদৃঢ় বৃক্ষ বেশ পান নাই এবং ভূগুপ্ত সমতল, হুতরাং জীবের আশ্রয়গোচন কোন উপাধিভূত নাই, তাহাদের প্রত্যেক পক্ষীর পক্ষের উপাধিভূত, মল্লভূমির শৃঙ্গপাখী জীবমাত্রের পাতাবরণ এবং টিকটিকি ও সর্প সমূহের চর্ম বাসুকার ছায়া বর্ণগণিত।

আবার দেখা যায় যে, যে সকল নিশাচর জীব রাতিকালে আহার্য্যবেশে বাহির হয়, তাহাদের পাত অতি নিম্ন-বর্ণগণিত। ইন্দ্র, টুক, বাহুড় প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তমূল। রাতিকালে ইহাদিগকে সহজে দেখা যায় না। ইহাদের বর্ণও যে রক্তার উপাধিভূত হয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

প্রাকৃতিগত পান্যের উজ্জ্বল ও বিভিন্ন বর্ণ-সম্ভান দেখিয়া হুতরাং মনে হয় যে, ইহাদের বর্ণ-বর্ণ রক্তার উপাধিভূত হয়। এমন বর্ণ-বৈচিত্র্য শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে আশ্রয়গোচন বেন-রূপ সাহায্য করে না। তবে ইহাদের বর্ণমণ্ডল হয় কেমন করিয়া? বাস্তবিক ইহাদের রক্তার অল্প উপাধি না থাকিলে এমন মনোবর্ণকর বর্ণ নইয়া জীবন-সংগ্রামে ইহার রক্তা পাইত কি না, তাহা একে বলিতে পারে। কিন্তু ইহাদের রক্তা অল্প উপাধি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহার পাত উজ্জ্বল, তখন ইহাদের পতি অতিমাত্র চকল ও ক্রম, হুতরাং সে অবস্থায় সহজে হুত হয় না। ব্যাকুলেই আশ্রয় সন্ধান ইহাদের প্রজাপতি ধরিবার জন্ত বল ভুটুটিয়া, করিয়াছি, এবং সকলেই জানি, তাহাদিগকে বলা কেমন করিতে। ইহা ছাড়া,

বদিও ইহাদের পান্যের উপরি ভাগ অতি বিচিত্র, কিন্তু পান্যের নিম্ন ভাগের বর্ণ অতি মলিন; এবং যখন ইহার বিশ্রাম করে, তখন পান্য দৃষ্ট উজ্জ্বল ও মল্লভূমি করিয়া বিশ্রাম করে। হুতরাং সে অবস্থায় পান্যের বর্ণ-বৈচিত্র্য ঢাকা থাকে বলিয়া মনোবর্ণকর হয় না। ত্রিভাঙ্গ জীবের বর্ণও বিচিত্র, অনেক স্থলে সেই জীবের আশ্রয়-কর্তৃত্ব নিশ্চিন-শ্রুত। অতএব এমনও হইতে পারে যে, তাহাদের বিভিন্ন বর্ণ এই হিসাবে রক্তার উপাধি-রূপ হয়।

কতক জীব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অল্প শ্রেণীর জীবের বর্ণ-সংস্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া জীবন-সংগ্রামে রক্তা পাইয়া যায়। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে; সে সকলের বিস্তৃত অবতারণা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা একটীকাত্র দৃষ্টান্ত দিয়াই আপাততঃ স্মরণ হই। আমেরিকার প্যোটিমাল প্রদেশে এক প্রকার ভীত-বিষম বর্ণ আছে; তাহাদের দেহের বর্ণসংস্থান একটু অসামান্য রক্তমণ্ডী প্রবাল-লোহিত 'জনির' উপর কুম্ভধর্ম দেখা-শ্রেণীতে ইহার বর্ণিত। এই শ্রেণীর শত্রু, ভীত-বিষম বলিয়া শত্রুকর্তৃক প্রায় আক্রান্ত হয় না। এই প্রদেশেই সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষর এক শ্রেণীর সর্প বাস করে, তাহার অধিক, অথচ তাহাদের শারীরিক বর্ণসংস্থান অধিকশ্রী বিষম প্রকারের ছায়া। নিম্নের বলিয়া শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু পূর্বোক্ত বিষম শ্রেণীর বস্তুকর্তৃক প্রায় বাঁচিয়া যায়। ইহাদিগকে বিষম জাতনে বৈজ্ঞানিক করিতে সাহস করে না*। এই বর্ণসামঞ্জস্য, যে প্রাকৃতিক নির্ধারনে অঙ্গুরণের দ্বারা উপাধিভূত, তাহার প্রমাণ এই, এইপ্রদেশে সর্প, গুপ্তধির আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজাপতিরা অনেক ইরূপে বস্তুকর্তৃক রক্তার দ্বারা অক্রান্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর প্রজাপতি আছে, তাহাদের শরীর হইতে এক প্রকার হুগুগ, কটুপাল সর্প নির্ভত হয় বলিয়া, তাহার পশিপদেই সন্ধ্যাভা এবং সেই জন্ত পশিপদকর্তৃক আক্রান্ত হয় না। আর এক শ্রেণীর প্রজাপতি আছে, তাহাদের শরীর হইতে কোন

* Wallace's Contributions to the Theory of Natural Selection. p. 101.

রত্নকেশ কালিদাস লিখিয়াছেন,—

“দ তীর্থী কপিথাং সৌভাগ্যে ভবিষ্যদসমুভূতিঃ।

উৎকলপাণিতপথঃ কলিঙ্গভিত্তিষ্যে যথো ॥”

রত্ন কৌতু দ্বারা সৌভাগ্য প্রস্তাব করিয়া কপিথা নদী (৩) উত্তীর্ণ হইলেন এবং উৎকল-দেশবাসী রাজাসিংহের সাহায্যে পথ অবগত হইয়া কলিঙ্গভিত্তিষ্যে যাত্রা করিলেন।

মহিমা-সময় তত্ত্বের মতে,—

“জগদ্বারং পূর্ণভাগং কুমারীরাষ্ট্রং শিবং।

কলিঙ্গদেশঃ সংপ্রোক্তো বাসমণ্ডপরিষরণঃ।

কলিঙ্গ-দেশমারাজ্য পঞ্চাষ্ট্রযোজনং শিবং।

দক্ষিণজং মহেশানি। কলিঙ্গঃ পরিকীর্তিতঃ ॥”

জগদ্বারের পূর্ণভাগ হইতে কুমারদীর তীর পর্যন্ত কলিঙ্গ-দেশ, এই স্থানের বৈষ্ণবকো বাসামণ্ড-মতাবলম্বী। আবার কলিঙ্গ-দেশ হইতে দক্ষিণে ৪০ যোজন পর্যন্ত কলিঙ্গ নামে কথিত হইয়া থাকে।

এই দেশ আমাদের রাজ্যের মত। এখন দেখা যাক, প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণ কলিঙ্গ-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। প্রিন্সি ভিন্সিটি কলিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, ১ কলিঙ্গ, ২ মোগোল-লিঙ্গম, ৩ মাকাকলিঙ্গী। ইহার মধ্যে কলিঙ্গী, মণ্ডি, ও মগিরি নিম্ন ভাগে এবং মোগোল্যাস পূর্বভাগে নিকট। (*Pliny, Hist. Nat.*, vi, 21).

এখানে সকলই বিভ্রান্তা করিতে পারেন, মণ্ডি ও মগিরি কোথায় এবং মোগোল্যাস পূর্বভাগে বা কোথায়?

মণ্ডি জাতি এখন মুণ্ডা নামে বিখ্যাত;—এই জাতি এখনও ছোটনাগপুরের দক্ষিণ-অংশে বাস করে। (*Campbell's Ethnology of India*, p. 150-1) এই জাতির অনতিদূরে উড়িষ্যার পার্বত্য প্রদেশে কক নামক অসভ্য জাতি বাস। (*Imperial Gazetteer of India*, Vol. viii, p. 506 দেখ।) এই অসভ্য জাতিই প্রিন্সি-বর্ণিত মগিরি বলিয়া সম্ভবতঃ ধারণা করা যায়। কক জাতিও অপকলিঙ্গের সম্যক মূল বলিয়া কখন কখন পরিচয় দেয়।

মোগোল্যাস পূর্বভাগে আমাদের পুরাতন ‘মালাবার’। প্রিন্সি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, এই মোগোল্যাস

(৩) কলিঙ্গ নদীর বর্তমান নাম কপাই। এই নদী বর্তমান বেগুনীপুরের দক্ষিণ দিশা প্রবাহিত হইয়া মুঙ্গোল-দ্বীপের বিগিত হইয়াছে।

পূর্বভাগে মোগলদেও শব্দই জাতি বাস করে। আত-পূর্বকাল হইতে উড়িষ্যার পার্শ্বভাগ প্রদেশে শবর জাতির বাস ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বল্প পুরাণের উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে, নীলাচলের নিকটেই শবরগণের ছিল, সেইখানে শম্ব-চক্র-গদাধর বিষ্ণুমূর্তি বিরাজ করিতেন। যথা—

“শালতনয় লিখন্তুঃ স্বং পশস্তাং পাশপানশমু।

অত্যতুতঃ নিবসতি সাক্ষাতমুহূর্তো হরোঃ ॥

উপত্যকারানাক্রান্তঃ সমস্তদার্দ্র্যনিঃ কিংঃ ॥”

দর্শন শবরগণেরই ঠিকতা পরিভোষিত।

কেতুজ দীপস্থানং যৎ যাত্যং শবরদীপকম ॥

দর্শন বিষ্ণুভক্তান্তান্ত্য শম্ব-চক্র-গদাধরানু।

অতঃ বিশ্বাবস্মান শবরঃ পলিত্যকঃ ॥ ইত্যাদি।

অতএব প্রিন্সি-বর্ণিত ‘শবরী’ জাতি পুরাণ-কথিত শবর জাতি আর-কিছুই নয়। অল্পে উল্লেখ্য আর অস্ত্রাতি পাল লহরী রাক্ষসের মধ্যবর্তী একটা উচ্চ গিরিশৃঙ্গকে মালা বা ‘মাল্যাবর্ত’ বলে।

সম্ভবতঃ পূর্বকালে এই রাক্ষসের সমস্ত গিরি-মালাকেই ‘মাল্যাবর্ত’ বলিত। এই গিরিমালাই ‘মাল্যবাসী’ নামে প্রিন্সিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাও পুরাতনক ‘মাল্যাবর্ত’ পূর্বভাগে বলিয়া থাকার কারণ কোন দোষ পড়ে না। যাহা হউক, বিলকল কোথায় হইতেছে যে, প্রিন্সি উড়িষ্যার পশ্চিমাংশকে কলিঙ্গ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

২য়, মোগলগিঙ্গ। আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্র লাল আম্বিক ‘মগাকলিঙ্গ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সেন্ট-মার্টিন এই স্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“মহুত্রে মগ নামক এক প্রকার অসভ্য জাতির নাম পাওয়া যায়। ইহারা আজ্ঞা জাতির সহিত একত্র উল্ল হইয়াছে। প্রিন্সি এই জাতিকে গহরার এক বংশদ্বারবাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পলিঙ্গ-সম্ভবতঃ কলিঙ্গ শব্দের রূপান্তর। গহরার ধাঁপে এই জাতির বাস থাকা উদ্ভাবক মনঃপলিঙ্গ বলিত।”

(*Étude sur la Géographie Grecque et Latine de l'Inde*, par P. V. de Saint Martin, p. 271-278)

আমাদের মতে, উক্ত উভয় মতই সঙ্গত বলিয়া যোধ হয় না। আমরা তেগু-জাভায় মোগাকলিঙ্গ

শব্দ দেখিতে পাই। তৈলঙ্গদ্বীপের উচ্চারণ অহু-মারে এই শব্দ ‘মুহুগলিঙ্গ’ হইয়া থাকে। তেলঙ্গ-কলিঙ্গ-কিঞ্চ-কিশ্ব’ দেশে ‘খালিগাম’ (*Śi-ya-ki, Bh. v.*) এখন দেখা যাক ‘কোব-উ-তো’ দেশ কোথায়? কাঞ্চিহাস্য সাহেবের মতে, ইহারই বর্তমান নাম গঞ্জাম। (*Cunningham's Ancient Geography of India*, p. 613), কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়া যোধ হয়। বিখ্যাত চীনভাষাবিদ স্ত্রাবলিনস্ বলেন ‘কোব-উ-তো’ শব্দের সম্ভবতঃ নাম ‘কোন্সযোগ’ জুলিয়া স্থির করিয়াছেন (৪) কিন্তু আমাদের বিশ্বচন্দ্রনাথ—‘কোন্সযোগ’ না হইয়া ‘কঙ্ক-যোগ’ হওয়াই অধিক সম্ভব। প্রাচীন কাল-হইতে বর্তমান কটক প্রদেশে কক ও যোধ নামে দুইটা পাশাপাশি ক্ষুদ্র অঞ্চল প্রবল রাজ্য ছিল। এই দুইটা রাজ্যের মধ্যে যোধ রাজ্য সমধিক প্রাচীন। কটকের প্রাচীন রাজধানী চৌধারের নিকট হইতে এখনকার অতি প্রাচীন জ্যাকবাবাদ পাহাড়া গিয়াছে, তাহার কোটিভ অঙ্গশান পাঠে জানা যায় যে, এই ক্ষুদ্র জেলা ত্রিকলিঙ্গ-রাজ ভগবন্তপুরের শাসনামল ছিল। (৫) ভগবন্তপুর পুত্রের নাম শিবগুপ্ত, তিনি উৎকল-রাজ যশোবন্তকেশরীর সমসাময়িক, অহুশাসন-পত্রাঙ্গসারে

‘তাঁহার রাজত্বকাল ৪৭৯—৫২৬ খঃ।’ হুত্বাং ত্রিকলিঙ্গরাজ্য ভগবন্ত চীনপরিভ্রাজকের অনেক পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার সময়ে যোধ তেলার অথবা অবতীর্ন ভাগ ছিল।’ রোধ হয়, তেলার অনেক পূর্বে অথবা হিউএন সিয়ঙ্গের সময়ে যোধ, কক-মঙ্গের অধিকারভুক্ত হইয়া ‘কঙ্ক-যোগ’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কঙ্করাজ্য সমান্ত ভূমণ্ডে অধিপতি হইলেও তাঁহার প্রভাব নৈক্যত মন ছিল না। কঙ্করাজ্য হইতে উর্দ্বার, এখানে প্রচুর পরিমাণে বাঘ জমিয়া থাকে। কঙ্করাজ্য কলিকাতা ও কটক-দ্বারা বিস্তৃত চাটাল রপ্তানী করিয়া থাকেন। (৬) হিউএন সিয়ঙ্গের মতে কঙ্কযোগ হইতে ১০০ যোজন গমন করিলে কলিঙ্গদেশ পাওয়া যায়। তাহা হইলে গঞ্জাম প্রদেশই কলিঙ্গ-দেশ হইতেছে। কাঞ্চিহাস্যের মতে ধর্মিলে গঞ্জাম, রাজ্য প্রায় ছাড়াইয়া বাইতে হয়। যাহা হউক, চীনপরিভ্রাজক গঞ্জাম প্রদেশ হইতে বৈ, কলঙ্গ আরম্ভ

কলিঙ্গমত তত্ত্ব ইহাই ‘তৈলঙ্গ’ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

‘ত্রৈলোক্য সমরভা গোশোণী মধ্যভাগতঃ।’

ত্রৈলোক্যেণ দেবেশি। ধান্যভাগতঃ পরাঃ ॥

চীনাগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া চেলোব্রাজ্যের মধ্যভাগ পর্যন্ত তৈলঙ্গ দেশ। হে দেবেশি! এই স্থানে যোদ্ধাকো ধান ও বেদ্যাসন-ভগবতঃ।

কলিঙ্গর বা তৈলঙ্গের বর্তমান নাম তৈলঙ্গ বা তেলিঙ্গন। এই জনপদ মাস্তকর উত্তর-পশ্চিম নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পূর্বম পর্বত এবং পশ্চিম ত্রিপুরা, কোমারী, কুপ, বিঘর ও চলা পর্যন্ত বিস্তৃত, এই স্থানে তৈলঙ্গ বা তেলু-ভাষী হিন্দুজাতি বাস।

৩য়, মকাকলিঙ্গ। ইহা সম্ভবতঃ মগাকলিঙ্গের রূপান্তর। প্রাচীন হিন্দুগণ বর্তমান আরাকান প্রদেশকে মগদ্বীপ এবং তাহার অধিবাসীদিগকে মগ বলিয়া জানিতেন। কেহ কেহ এই মগদ্বীপকেই (আরাকান) প্রিন্সি-কথিত মকাকলিঙ্গ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

পুত্রের সমুদ্র শতাব্দীতে চীন-পরিভ্রাজক হিউএন সিয়ং কলিঙ্গদেশে আসন করেন। তিনি লিখিয়া

ছেন ‘কোব-উ-তো হইতে একশত কোশের অধিক (১৪০ বা ১৫০ লি) গমনের পর আসার কলিঙ্গ (কলিঙ্গ-কিঞ্চ-কিশ্ব) দেশে ‘খালিগাম’ (*Śi-ya-ki, Bh. v.*) এখন দেখা যাক ‘কোব-উ-তো’ দেশ কোথায়? কাঞ্চিহাস্য সাহেবের মতে, ইহারই বর্তমান নাম গঞ্জাম। (*Cunningham's Ancient Geography of India*, p. 613), কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়া যোধ হয়। বিখ্যাত চীনভাষাবিদ স্ত্রাবলিনস্ বলেন ‘কোব-উ-তো’ শব্দের সম্ভবতঃ নাম ‘কোন্সযোগ’ জুলিয়া স্থির করিয়াছেন (৪) কিন্তু আমাদের বিশ্বচন্দ্রনাথ—‘কোন্সযোগ’ না হইয়া ‘কঙ্ক-যোগ’ হওয়াই অধিক সম্ভব। প্রাচীন কাল-হইতে বর্তমান কটক প্রদেশে কক ও যোধ নামে দুইটা পাশাপাশি ক্ষুদ্র অঞ্চল প্রবল রাজ্য ছিল। এই দুইটা রাজ্যের মধ্যে যোধ রাজ্য সমধিক প্রাচীন। কটকের প্রাচীন রাজধানী চৌধারের নিকট হইতে এখনকার অতি প্রাচীন জ্যাকবাবাদ পাহাড়া গিয়াছে, তাহার কোটিভ অঙ্গশান পাঠে জানা যায় যে, এই ক্ষুদ্র জেলা ত্রিকলিঙ্গ-রাজ ভগবন্তপুরের শাসনামল ছিল। (৫) ভগবন্তপুর পুত্রের নাম শিবগুপ্ত, তিনি উৎকল-রাজ যশোবন্তকেশরীর সমসাময়িক, অহুশাসন-পত্রাঙ্গসারে

‘তাঁহার রাজত্বকাল ৪৭৯—৫২৬ খঃ।’ হুত্বাং ত্রিকলিঙ্গরাজ্য ভগবন্ত চীনপরিভ্রাজকের অনেক পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার সময়ে যোধ তেলার অথবা অবতীর্ন ভাগ ছিল।’ রোধ হয়, তেলার অনেক পূর্বে অথবা হিউএন সিয়ঙ্গের সময়ে যোধ, কক-মঙ্গের অধিকারভুক্ত হইয়া ‘কঙ্ক-যোগ’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কঙ্করাজ্য সমান্ত ভূমণ্ডে অধিপতি হইলেও তাঁহার প্রভাব নৈক্যত মন ছিল না। কঙ্করাজ্য হইতে উর্দ্বার, এখানে প্রচুর পরিমাণে বাঘ জমিয়া থাকে। কঙ্করাজ্য কলিকাতা ও কটক-দ্বারা বিস্তৃত চাটাল রপ্তানী করিয়া থাকেন। (৬) হিউএন সিয়ঙ্গের মতে কঙ্কযোগ হইতে ১০০ যোজন গমন করিলে কলিঙ্গদেশ পাওয়া যায়। তাহা হইলে গঞ্জাম প্রদেশই কলিঙ্গ-দেশ হইতেছে। কাঞ্চিহাস্যের মতে ধর্মিলে গঞ্জাম, রাজ্য প্রায় ছাড়াইয়া বাইতে হয়। যাহা হউক, চীনপরিভ্রাজক গঞ্জাম প্রদেশ হইতে বৈ, কলঙ্গ আরম্ভ

কলিঙ্গমত তত্ত্ব ইহাই ‘তৈলঙ্গ’ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

‘ত্রৈলোক্য সমরভা গোশোণী মধ্যভাগতঃ।’

ত্রৈলোক্যেণ দেবেশি। ধান্যভাগতঃ পরাঃ ॥

চীনাগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া চেলোব্রাজ্যের মধ্যভাগ পর্যন্ত তৈলঙ্গ দেশ। হে দেবেশি! এই স্থানে যোদ্ধাকো ধান ও বেদ্যাসন-ভগবতঃ।

কলিঙ্গর বা তৈলঙ্গের বর্তমান নাম তৈলঙ্গ বা তেলিঙ্গন। এই জনপদ মাস্তকর উত্তর-পশ্চিম নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পূর্বম পর্বত এবং পশ্চিম ত্রিপুরা, কোমারী, কুপ, বিঘর ও চলা পর্যন্ত বিস্তৃত, এই স্থানে তৈলঙ্গ বা তেলু-ভাষী হিন্দুজাতি বাস।

৩য়, মকাকলিঙ্গ। ইহা সম্ভবতঃ মগাকলিঙ্গের রূপান্তর। প্রাচীন হিন্দুগণ বর্তমান আরাকান প্রদেশকে মগদ্বীপ এবং তাহার অধিবাসীদিগকে মগ বলিয়া জানিতেন। কেহ কেহ এই মগদ্বীপকেই (আরাকান) প্রিন্সি-কথিত মকাকলিঙ্গ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

পুত্রের সমুদ্র শতাব্দীতে চীন-পরিভ্রাজক হিউএন সিয়ং কলিঙ্গদেশে আসন করেন। তিনি লিখিয়া

(৪) Julien's 'Houen Thsang', iii, Pl.

(৫) Indian Antiquary, vol. v, p. ৫৭.

(৬) Sterling's orissa, p. ৪.

বনিয়া স্বীকার করিতেছেন, ইহাই অধিক বৃদ্ধিশ্রুত বনিয়া ঘোষ হইতেছে। এই মত স্বীকার করিয়া লইলে মহাকবি কালিদাসের বর্ণনার সাহিত্য সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়। চীন-পরিব্রাজকের মতে, কলিঙ্গ-রাজ্যের ভূ-পরিমাণ প্রায় ৩০৭ ক্রোশ (৪০০০ মি.)। অকবরের রাজত্বকালে কলিঙ্গ-দণ্ডপং নামে এতটা সারকার ছিল, উহা উড়িষ্যার অন্তর্গত। তখন এই স্থান ২৭৭ মাইল বিস্তৃত ছিল। (আইন-ই-অকবরী)। এই ত বেল মাথেক কথা, এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ কি বলেন, তাহাই জানা আবশ্যক।

কোলকরক সাহেবের মতে, গোদাবরী নদীর তটস্থ প্রদেশ কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত (৭)

কানিংহাম বলেন “হিউএন্স সিয়ঙ্গের সময় কলিঙ্গ-রাজ্য গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৪০০ হইতে ১৫০০ ল অর্থাৎ ২০০ হইতে ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তৎকালে ইহার ভূমি-পরিমাণ প্রায় ৮০০ মাইল ছিল। যদিও ইহার চতুর্দশাঙ্গ, উক্ত হয় নাই, কিন্তু এই রাজ্য, পশ্চিমে অজ্ঞ ও দক্ষিণে ধনাকট রাজ্যের সহিত সন্নিহিত ছিল। ইহার প্রান্ত-দীপা দক্ষিণ-পশ্চিমে গোদাবরী এবং উত্তর-পশ্চিমে ইন্দ্রাবতী নদীর মাথা গুণিয়া দ্রাবী ছাড়াইয়া যায় নাই। এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড মল্লের পর্তুগের দ্বারা সমাকীর্ণ ইত্যাদি। শিলা-লিপিবিশিষ্ট স্থলটমের মতে, কলিঙ্গ—গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যে (৮)

আমাদের মতে মহাভারত ও হরিবংশের সময়ে কলিঙ্গরাজ্য বর্তমান তমপুকের সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (৯) এখনকার মেলিনীপুর, উড়িষ্যা, গঙ্গাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উৎকল-রাজ প্রবল হইয়া উঠিলে উৎকল কলিঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র হইল। (বিপর্যয়ে উৎকল শব্দ দেখ)। তদবধি কেবল গঙ্গাম ও সরকার কলিঙ্গের অন্তর্নিহিত রহিল। হুটের দশম ও একাদশ

(৭) Cobbroke's Essays, vol. ii. 179.

(৮) E. Hultzsch's South Indian Inscriptions, p. 63.

(৯) হরিবংশে “অশ্বাশ্ব কলিঙ্গাভ্যামলিঙ্গকঃ”

(২৪৮ অং. ৩৫ শ্লোক)

এই বলে ভারসিগ (বর্তমান তমপুক) সহ কলিঙ্গ উক্ত তৎকালে, হুইন সাংকীর্ষিতজনগণ বনিয়া মতেই স্বীকার করা যায়। টেমেলির মতেও গঙ্গাসাগরের দিকটো কলিঙ্গ রাজ্য (Indian Antiquary vol. xiii. 363 দেখ)

শতাব্দীতে চালুক্য-রাজগণের প্রবল প্রভাবে কলিঙ্গ-রাজ্য উত্তরে উৎকল ও দক্ষিণে চোলমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে তৈলঙ্গ পর্যন্ত এই কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মুসল-মানসিগের আক্রমণ-কালে কলিঙ্গ-রাজ্যের ভূমি-পরিমাণ অনেকটা কমিয়া আসে। সেই সময়ে উৎকল ও তৈলঙ্গ (তেলিঙ্গন) স্বতন্ত্র হইল। মল্লের পর্তুগের উপরিষিত সামান্য ভূভাগকে লোকে কলিঙ্গ বলিত। প্রকৃত কথা, তৎকালে কলিঙ্গ নামের বোধ্য হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখনকার বর্তমান মানচিত্রেও কলিঙ্গ-রাজ্যের উল্লেখ নাই, কেবল সমুদ্র-তটস্থ কলিঙ্গ-পটন ও গোদাবরী মোহানা-বিন্দু কলিঙ্গ নগর যেন সেই কলিঙ্গ রাজ্যের চিহ্নরূপে ধারণা করিয়া দিতেছে। কলিঙ্গ-রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন অবস্থা মণ্ডতে অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু এখন যে সব ছাড়াই কলিঙ্গ রাজ্যের প্রাচীন নগরাদি ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব ব্যতীত কোন প্রত্নতত্ত্ব হইল।

মহাভারতবিদে কলিঙ্গ-রাজ্যের হুইটী প্রধান নগরের উল্লেখ আছে—মণিপুর ও রাণপুর। বৌদ্ধ শাস্ত্রে কলিঙ্গের এই হুইটী প্রাচীন নগরের নাম পাণ্ডুরা যায়—মণ্ডপুত্র, সুভানবতী। জৈন দিগের হরিবংশ নামক গ্রন্থে কাশ্মীর-নগর নামে একটা নগরের উল্লেখ আছে। প্রাচীন শিলা-লিপিতে কলিঙ্গ নগর, পিঠপুত্র, বৌদ্ধপুত্র প্রভৃতি আরও কয়েকটা প্রাচীন নগরের উল্লেখ দেখা যায়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

মণিপুর আবিষ্কার।

কলিঙ্গ-রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম মণিপুর। মহাভারত পার্শ্বে জানা যায়, পূর্বে এইখানে চিত্রাঙ্গদার পিতা চিত্রবাহন রাজত্ব করিতেন, তৎপরে অর্জুন-পুত্র বক্রবাহন রাজত্ব করেন। এখন জিজ্ঞাস্য সেই প্রাচীন মণিপুর কোথায়? তাহার বর্তমান অবস্থিতি নিরূপণ করা যাইতে পারে কি না? অথবা তাহার বর্তমান নাম জানিবার উপায় আছে কি না?

এখন মণিপুর লইয়া বড়ই বোলবোলা। ইহা দিন পূর্বে আসাম-প্রান্তে যে মণিপুরের রটনে

প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের মানচিত্র।

ইহার প্রধান নগর মণিপুর।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সংগৃহীত।



যে যে নামের তলভাগে রেখা টানা আছে, তাহা মহাভারতায় অথবা পৌরাণিক।

বংশাধা' বাক্সিয়া উদ্ভিদ্ধাছিল,—যেখানে মণিপুর-সেনাপতি চীকেন্দ্রজিৎ আপন ধন-প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, আক্রমে মণিপুর-রাজ ইতরেজ-করে নদী, যে মণিপুর আজ রাজ-শুভ স্থান-প্রায়; দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদপত্রগণ সেই মণিপুরকেই বঙ্গ-বাহনের রাজ্য বলিয়া বোষণা করিতেছেন। তাহার দিগের এই ধারণা, এই অমূলক বিবাস সম্পূর্ণ জন্মায় বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে। কারণ এই মণিপুর যে, মহাভারতের মণিপুর নয়, তাহা সহজেই আমরা সেবাইতে পারি।

পুত্র চৈত্রমাসের জন্মভূমিতে মণিপুর-শ্রবণ-লোক-নিবাসিন,—এই যেখানে বাইতে গাঙ্গিল, অর্জুনকেও সেইখানে বাইতে হইল, সেইখানেই বুদ্ধ করিতে হইল। চারিদিকে দুরিদ্ভা অথ প্রাগ-জ্যোতিষে অর্থাৎ আসাম-রাজ্যে পিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়া ভগবতের পুত্র বজ্রহস্তের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে বিজিত হইয়া বজ্রহস্ত অর্জুনের বশতা স্বীকার করিলেন এবং অর্জুনকর্তৃক অশ্বপেদে অমরিত হইলেন। আসাম হইতেই অশ্ব মণিপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। অর্জুন জানিতেন, স্বীয় পুত্র বজ্রহস্ত মণিপুরে রাজত্ব করিতেছেন। (জন্মভূমি ২২৫—২৬ পৃষ্ঠা)। প্রকৃত-লোক হইতেই আমাদের প্রাচীনতম বর্তমান মণিপুর-রাজ্যকেই বঙ্গবাহনের মণিপুর বলিয়া করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের প্রাগজ্যোতিষ হইয়া মণিপুরে বাহিয়ার কথা কোথাও উল্লেখ নাই। মহাভারতে আশ্বপেদে পর্কে লিখিত আছে, অর্জুন প্রাগজ্যোতিষ-বাসিন বজ্রহস্তকে পরাজয় করিয়া সিন্ধুদেশে উপস্থিত হইল। পরে সৌভদ্রপঞ্চকে বধন করিয়া নানা স্থান অতিক্রম করিয়া মণিপুরে আসিয়া করেন। স্বা—

“এবং নির্জিত্য তান্ বীরান্ সৈন্যধান্ স ধনজ্ঞান।
অথবাণ্ড ধাবন্ত্য তং হুয় কাচার্যজিৎ হমঃ”
সত্যো মুগমিলাকণা যথা সেন্য পিনাকবহুঃ
ভসাত তং তথা বীরো বিধিবদ্যজিৎ হমঃ”
স চ বালী যথেষ্টেন তপস্তান্ দেহান্ ধাব্যন্তম্।
নিচতরা যথাকাম্য কপ্প পার্শ্ব বর্জম্।
ক্রমেণ স হস্তধ্বজং বিব্রন বৃক্ষবর্তঃ
মণিপুরং প্রাপ্তঃ সৈন্যসামান্যং সহপাণ্ডবঃ”

অথবশ ১৮ অঃ, ৪৪—৪৫ পৃঃ।

এইরূপে মহাবীর অর্জুন সিন্ধুদেশের বীরপক্ষে

পুত্রাজয় করিয়া পুনরায় পাণ্ডব-হস্তে সেই কামচার-অশ্বপেদ পণ্ডাৎ পণ্ডাৎ ধামান হইলেন, তখন তিনি যথেষ্ট অর্থধামী পিনাকপাণি বৈশম্বেয় মহাদেবের জ্ঞাপা শোভা পাইতে গাঙ্গিলেন। পরে সেই অশ্ব দেখেছায়ারো নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে মণিপুরাধিপতির রাজ্যে উপস্থিত হইল, তখন অর্জুনও তাহার সহিত এই স্থানে গমন করিলেন।

মহাভারতের এই বর্ণনায়ারো জানা যায় যে, প্রাগজ্যোতিষ (আসামের) পর প্রাচীন মণিপুর ছিল না, তাহা হইলে কামচারী অশ্ব প্রাগজ্যোতিষের পর সিন্ধুদেশে বাইয়া তৎপরে মণিপুরে আসিত না। প্রাগজ্যোতিষের পর বঙ্গবাহনের রাজত্ব থাকিলে মহাভারতের অবশ্যই উল্লেখ থাকিত, অতএব বর্তমান মণিপুর বঙ্গবাহনের রাজ্য হইতে পারে না।

তবে বঙ্গবাহনের মণিপুর কোথায়? মহাভারতের এক স্থানে লিখিত আছে,—

“অশ্ব-বশ-কামেশ্বঃ বানি তীর্থানি কামিচিৎ।
জগাম তানি সর্গানি তীর্থান্যায়তনানি চ।
দৃষ্ট্বা চ বিধিবৎ তানি ধনকাপি নপো ততঃ।

কলিঙ্গরাষ্ট্রবাসেবু ত্রাঙ্করাঃ পাণ্ডবরাণ্যবঃ।
অভ্যাজ্ঞায়া কোত্তরমুপবর্তন্ত ভারতঃ।
স তু তৈত্তরভাষ্যাতঃ কুন্তীপুত্রো ধনজয়ঃ।
সহায়ৈরভ্যুতঃ শুরঃ প্রবেদী যত্র সাগরঃ”

স কলিঙ্গদেশে ত্রিভুজা দেশানায়তনানি চ।
স্থিরি রমণীয়ানি প্রেমমাধো যদে প্রভুঃ।
মহেন্দ্রপর্বতং দৃষ্ট্বা ভাগ্নৈরধুপশোভিতম্।

সমুদ্রতীরে শর্নবর্ধনপুংষং জগাম হ।
তত্র মণিপুরে তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
অভিগম্য মহাবাহুরতপজ্ঞমহীপতিম্”

কাণ্ডিক ২১১ অঃ, ১—১১ পৃঃ।

অশ্ব, বশ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদ যে সকল তীর্থ, দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রম আছে, অর্জুন সর্গত গমন, দর্শন ও ধনধান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহযাত্রী ত্রাঙ্করাঃ কলিঙ্গ-রাজ্যের দারৈশব পর্বতস্থ আসিয়া তাঁহার অমৃতমি লইয়া প্রত্যাহৃত হইলেন। কুন্তীপুত্র ধনজয় অতি অমরাত সহায়-সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কলিঙ্গ দেশ ও তৎপারক পুণ্য-তীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া যুগ্ম হৃদয়বানী দেখিতে দেখিতে চলিলেন। ভাগ্যদগ-পরিচেষ্টিত মহেন্দ্র পর্বত নিরীষণ করিয়া এহাদ্বারের উপকূলগামী মণিপুরে গমন করিলেন

এবং সোদানকার দেবালয় ও পুণ্যতীর্থ সকল সম্বলন করিয়া মণিপুরের রাজার নিকটে উপনীত হইলেন। এইখানে অর্জুন মণিপুর-রাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিলেন, তাঁহার পরেই বঙ্গবাহনের জন্ম।

যে হউক উক্ত বিবরণ পাঠে স্পষ্টই বোধ হইতেছে,—কলিঙ্গ-রাজ্যের অস্বাভি মহেন্দ্র-পর্বতের পরে মণিপুর উপকূলে মণিপুর। মহাভারতের বর্ণনায় মণিপুর একটা বৃহৎ রাজ্য বলিয়া বোধ হয় না; বরং একটা বৃহৎ নগর বলিয়াই বোধ হয়। শাস্ত্রিপক্ষে কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদার নাম পাওয়া যায়, তৎকালে রাজপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল,—

“কলিঙ্গবিশ্বে রাজান রাজ্ঞঃচিত্রাঙ্গদঃ চ।
শ্রীমদ্রাজপুং নান নগরং তত্র ভারতঃ”

শাস্ত্রিপক্ষ, ৪ অঃ, ২ পৃঃ।

এই চিত্রাঙ্গদ কাহার পুত্র? মহাভারতের তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহার কল্পার স্বয়ম্বর কালে পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত কোরব ও ভারতের সকল প্রধান রাজাই কল্যাণাভার উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইখানে বোধ হইতেছে, পঞ্চপাণ্ডবের সহিত কলিঙ্গ-রাজ চিত্রাঙ্গদের অথবা কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধে জন্মই যেন তাঁহার। কলিঙ্গ-রাজকন্যা পাণ্ডিগ্রহবার্ণ উপস্থিত হন নাই।

রাজা জিতাদ্রপ সন্ততঃ চিত্রবাহনের পুত্র এবং চিত্রাঙ্গদার ভাতা ছিলেন। কলিঙ্গের প্রধান নগর রাজপুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং মণিপুরে চিত্রাঙ্গদা অবস্থিত করিতেন। এতদ্বারা অনুমান করা যায় যে, মহাভারতের সময় রাজপুত্র ও মণিপুর উভয়ই কলিঙ্গরাজ্যের প্রধান নগর বা রাজধানী রূপে বিদ্যমান ছিল। রাজপুত্রের বর্তমান নাম কলিঙ্গরাজ্য, মহেন্দ্র পর্বতের উপর রাজপুত্র নগর থাকায় বোধ হয় রাজমহেন্দ্র নাম হইয়া থাকিলে। পঞ্চ পদ্যম্ বষ্ট সপ্তম শতাব্দীর শিলালিপিতে এই স্থান ‘রাজমহেন্দ্রপু’ নামে উক্ত হইয়াছে।

কিৎ কলিঙ্গের অপর প্রধান নগর মণিপুর কোথায়? বর্তমান উত্তরসরকারে চিকাকোল নামে একটা জেলা। মুসলমান বাশাখারিগণের সময়ে এই জেলায় রাজমহেন্দ্রের গীমা পর্বত প্রায় ১৬০০ ফুট উচ্চ ছিল। তৎকালে ইহার প্রাচীন রাজধানীকে মুসলমানেরা ‘কবে’ ‘মহু-মহু-মহু’ আবার ‘কবে’ ‘মহু-মহু-মহু’ বলিত। (Hamilton's East-India Gazetteer, vol. I, p. 417.)

এই নগর ১৮১৬ উত্তর অক্ষরেখায় এবং ৮৪ পূর্ব দ্রাঘিমায়া অবস্থিত। বর্তমান চিকাকোল নগরের এবং কতিপয়জনদের পার্শ্বে সিন্ধুকে তীরে এই নগর রহিয়াছে, যক্ষ বা মনমুহুর সম্ভবতঃ মণিপুরেরই অপভ্রংশ। কলিঙ্গ-পতনের পার্শ্ব এই প্রাচীন বর্জই মহাভারতের মণিপুর, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বকালে এখানে হিন্দু-স্বাভি ‘দেবীধার’ অনেক ছিল, কিন্তু বিধবী মূল্যমানেরা হিন্দুদিগের সেই প্রাচীন কীর্তি সকল লুপ্ত করিয়া দেই সমস্ত যুগ্মা যন্ত্রেরে যুগ্মই মসজিদ সকল নির্মাণ করিয়াছে। এখন প্রাচীন-হিন্দু-কীর্তি চহ্ন মাত্র নাই।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বহু।

প্রেমারা-প্রলয়;—জয়ার আসরে যুবরাজ।

আমাদের ভাবী ভারতের যুবরাজ ‘প্রিন্স অব ওয়েলস’ প্রেমারার পীড়নে এতদূরে ভ্রম্যক প্রপীড়িত। বিবাহিত সমুদ্রে ‘হুজুর’ পড়িয়া গিয়াছে; বিবাহিত ‘সংবাদ-পত্র-সম্পাদকেরা’ প্রিয় প্রিন্সকে অতি অসহ্য ভাবে মাজনন করিতেছে। দ্যুত-ক্রোড়া-উপলব্ধে তাঁহার কলঙ্ক হুঙ্গা ও কেলসবারী রটনা করিতে থাকে। কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে; ‘ঠায়ে-ঠায়ে’ কত কথাই কহিতেছে; ইমার-ইকিতে অসহ্য পাতক আরোপ করিয়া,—প্রেমারার জ্ঞাৎ প্রাণতঃ ভাবে তাঁহার পুত্র নেন কমাখাত করিতেছে। কি ভানাক! নিমি বৃট্ট-সিংহাসনের অবসারহিত উত্তরাধিকারী,—যিনি ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট,—বিলাসী, সম্রাটীয় এঞ্জার হস্তে তাঁহার আজ এই অর্পমান,—এত লাঞ্ছনা ও কলঙ্ক রটনা! কি ভয়নাক!

কবে হইতেছে;—
“মুসলমান বৈমনতর তাহারের ‘মমাজের’
‘বিহীন’ হাড়ে কবে সমুদ্র পূর্ববী ডোয়
‘যুবরাজ’ ভোমনি তর প্রেমারা! ‘হুজ’ কবে কবে
‘পার্ক’ ‘মহু-মহু-মহু’ বলিত। (Hamilton's East-India Gazetteer, vol. I, p. 417.)

অশার কেহ বলিতেছে;—
“যুবরাজ জুয়া খেলায় এতই আসক্ত যে,
সভার-নিষিদ্ধ পথও সেহি উল্লেখনা বর্তিত
“তিনি থাকিতেই প করেন না; যুবরাজের শরীর
তব্ব হইয়াছে, তবুও মারারাজি ‘কার্ট টেবিলে’
‘কাটিয়া যায়। যৌনে অনন্তর অনিচ্ছাতরো
‘খায়া নই করিয়া, এই পরিভ্রম, বয়সও
‘অনার প্রেমারা-খেলায়। * * *।”

পুনঃ কোণে কুংসাজীরা রটনা করিতেছে;—
“জুয়াড়ারাই যুবরাজের প্রিয়পাত্র। রুসদে
‘তিনি কল কাটান। যারা মারারাজি সমস্তে
‘মাস পিটিতে পারে,—‘দুলা’ ‘পলিম্বার’
‘সমলোটা’—তারাই তাঁর অমুগ্রহ-ভাজন।
‘বায়লন্ড, নিম্ন, পিটো প্রভৃতি তাঁহার
‘ইয়ার। এই সব ইয়ারদের সম্ব হইতে
‘তাকে এখন অন্তর করা অসম্ভব। আরও
‘কিছু কাল পুর্কে,—ক্রিয় যখন ভারত দুখ
‘করিয়া প্রত্যাহান করিল, তখন সময় বহু
‘চেষ্টা করিল, উহা হইতে পারিত। এখন
‘আর উহা সম্ভবে না। যুবরাজ এখন
‘প্রবীণত্বে উপনীত; তাঁর খাতা ভয় হইলেও
‘কু-অভ্যাসগুলি দূর হইয়া গিয়াছে; এখন
‘সে সব ছাটারি করিয়া পবিত্র পৃথ্বী-শ্রোক
‘হওয়া বড় সহজ নয়।”

এই রকম কত কথা, কত কুংসাই যে লোকে
রটাইতেছে, তাহা আর কি বলি। এংলো-ইণ্ডিয়ান
সম্পাদক স্ট্রুৎসেরাও বন তাঁটা জুড়িয়া গিয়াছেন;
আটহাতে ইংলণ্ডের উচ্চ জীবনের কুংসা জারি
করিতেছেন; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে করিতেছেন আর
একটা অতি উপদেশ কাণ্ড;—সে কাণ্ডটা, তাঁদের
এধানকার ভারতীয় আশ্রম-সমাজের সভ্য জাতির।
তাঁরা আর তাঁদের এংলো-কিরিচী-সমাজ “শালা
বংশে, গজাবলে, খোজা, তাঁরা ধর্ম-পুণ্য বিধিষ্টি
অম্বলদে খোদ; ‘জীভা নাই, কোঁকু নাই, ইল্লির-
কোভ আদো নাই;—ভক্ত, শান্ত, সাধু, হুশীল,
সম্ভাসী বলিলেও হয়; ইংরেজ-বাক্য ইণ্ডিয়ান
হাইসে,—অতিরিক্ত অমোদ-প্রমোদে প্রতাপান;
কিছ হায়। আসিয়া’ কেবল বখিয়ার,—‘হর-
বিন্দু-পরেশানি’ সংঘম, অর্দ্ধাঙ্গ, আর উপবাস;—
‘পন্নায়’ কথা মনে হলে কেবল কাহারি আসে;—
বৌদ্ধ বাহা বিদ্ধি, তা কেবল ‘কালো আশ্রমি-
গোলাক অদ্ব আর তাম্রাশাক গুণ জনিত; জীভা-

সে ত “একমুদ্রসেই” অভাব,—‘গিমবালা’ ‘পোলা’
‘আণ্ডা’ একই “সেমটেনিস” আর ‘রাবর’—তা
রাবার কেহ “বর” করে না; জুয়া খেলে বটে, কিন্তু
জুয়াচুরী করিয়া ‘কেহ ‘আখ-অখমা’ সম্ভোষণে
উল্লেখ্যী হয় না। পুনঃ এংলো-ইণ্ডিয়ান সমা-
জের সভ্য অন্তঃস্থানী। ‘কাণ্ড তর্কার “লৌজিক”
বলিয়া একটা রময় পরাধের “চরম অভাব;—
“কবার জোরে ক্যামিন” বলিলেও চলে। সমাজে
এক শৈল-বাসে উভাই সমান;—ক্রী-বেশের
দায়ক হুজিক;—জটিও কোথাও এক আধে উজন
বিলাহিতা বিরজি,—তাঁরা ‘হামি-সহবাসে’ ঈদুতা
বটে, কিন্তু আত্মীয় অন্তরঙ্গের বিরহ-বেদনায় নিরন্তর
কাতরা; হৃতরায় বিলাতি ডাকের আগমনই তাঁদের
মাগাধিক আন্তরঙ্গ একবার বিনির্গষ্ট। অন্তর
আত্মবিক্রম সামাজ্য;—ইতালি ইতালি।

“পাইওনিয়র” প্রবীণতা এবং পরিতাপ সহকারে
প্রকাশ করিতেছেন—যে, “সমস্তদের জায় ‘শৈল-
বাসেও হুশ নাই;—পুঙ্খ পাশা, নারী অম্ব এবং
অরসিকা; কেলেস্কারী কিসেই বা হইবে; তবে এক
‘আম্ব বিন্দু কি আর তাহা হয় না; তা হয়; ক্রীদার-
কাশে ‘শৈল-নিরাশে এক আধটা সাময়িক কুংসা
‘রটে; কিসে কি কিছুই নয়; বিলাতি বাজীর বিজিতি
অগার হিয়াবে প্রয়াসের এ প্রমাণ তথা ‘সমুদ্রে
পোষণ মত।”

* * * The occasional catastrophes
one hears of out here, * * * are pitiful
affairs compared to the rich and Roman
profusion of the Revelation that are pro-
vided for the British public by its leaders
hereditary and elected.”

“Pioneer” 14th, June 1891.

সাহু সাহু সাহু। “হরবিন্দেই কেরুণ্ণ”
এংলো-ইণ্ডিয়ান, সামাজিক সভ্যদের এ
সংসারে আশি সমুহ হুখী। পরন্তু তাহার দুর্ভাগ্যের
জন্ম আশি পরম হুখী; সে সমাজে রমণী-রয়ের
রক্তপের দ্বন্দ্ব সতিশয় মহাভূতি জানাইতেছি।
“Oriental excess” অর্থাৎ প্রাচ্য প্রমোদাভি-
শয়ের প্রতাপায় সপ্ত সমুহ পার হয়ে এযে কি—
না ‘গেজ-বড়ি-খাণ্ডা’ আর ‘খাণ্ডা-বড়ি-খোঁড়ো’
মশালটা, বাবুজি, ধানসান্য; ‘আয়া’—আর আয়া,
ধানসান্য, মশালটা, বাবুজি। অকালে অকালে

ভল্লপীষ। অপর্যাপ্ত নেটের বাজারের বস্ত্র খান-
সামান্য খাণ্ডায়, কিন্তু নেহাত নোংরা, নিষ্প্রিয়ালে
তৈল পণ্ড।

রক্ত বাউক। খোকার করি এংলো-ইণ্ডিয়ান
সমাজ—বিত্তক, পবিত্র, পরিমিতাচারী, সংযত-
ইন্দ্রিয়; কিন্তু পরের পাগে কথো উপস্থিত হইলেই
যে, আয়-পুণ্যের আকালন করিতে হইবে, এ যেমন
কিছু বা এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় তথা করিতেছেন।
তিনি ‘হিল্লি অব’ ওয়েলসের অপর্যাপ্ত কায়ার,
এংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের মহিমা শোষণ করিতে
হুজিত হইতেছেন না। ইহাতে এক দিকে যেমন
বাক্যভক্তি অভাব, অপর দিকে তেমনি ‘আখ-
অখকারের উজ্জ্বল প্রকাশ পাইতেছে। যুবরাজ,
জুয়া খেলেনা বলিয়া যেন তাঁহার একবারেই জাতি
পরিচ্ছেদ। বস ‘জনাখেরে’ কল্পে জুয়াটা তাঁহার নিম্ন
অপর্যাপ্ত রটাইতেছে। কিন্তু যুবরাজ যে, জুয়া খেলেন
বা জুয়া খেলার অর্থব্যয় ব্যহার করেন, এমন কোন
প্রত্যক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যুবরাজের নাম
অখকার এই ‘জুয়ার’ বড়ইমু জড়িত,—তত টুকুতে
ছদ্মস্বাপার কিছুই নাই এবং তাহার জন্ম
সৈনিক সপ্তগ্রন্থ হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়াও
যাইতে পারে না। কথা তালিল, কথা অমূল্য
দিতে হয়; বিনি আছ বাবে কাল সম্রাট হইবেন,
সৈনিক সপ্তগ্রন্থ হইতেও তিনি অপর্যাপ্ত বলিয়া
বিরোধিত; ‘সৈনিক লিগ’ হইতে লোকে তাঁহার নাম
কাটিয়া দিতে চায়।।। সম্রাতি, তোমার স্বর্ণলাভ
হটুক, এমন সম্রাতি আমরা চাই না।

দূতের সর্বমর্ন করিতেছেন। দূত সর্ব
হুশের আকর তাহা জানি। আমোদে রাজ-
নৈতিক ইতিহাসে সে প্রমাণ যেমন আছে, তেমন
আর কোথাও নাই। দূত জরিপ্রমু হইলেও
নৃপতিগণ দূত-ক্রোড়া এড়াইতে পারিতেন না;
কারণ দূত-হুজের আশ্রয় গ্রহণ না করা, নৃপতি-
দিগের পক্ষে কাপুস্কর্য লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত
হইত। কাজেই হিন্দু রাজপল, পরশ্বরের মঠে
দূত-ক্রোড়া করিতে ‘খায়া হইলেন। ধর্মপুঙ্খ
যুধিষ্ঠির খং সে ক্রোড়া করিয়াছিলেন। নিম্নে-
খর রাজা নল, সে ক্রোড়া করিয়াছিলেন। ইংরাজ
উত্তরই দূতের পরাজয় ইংরাজ রাজ্যজট হইয়াছিলেন,
সে হৃত্ত কাল। এধানকার আদম কাল এযে, সে,
রাজ্যদিগের মধ্যে দূত-ক্রোড়া আদ্যি কাল হইতেই
চলিয়া আসিতেছে। পরে যে কোনও ক্রোড়াই

হটুক, এক পক্ষ জিতিলে অপর পক্ষ হারিয়াই
থাকে; এক ক্ষেত্রে একজনে দুই পক্ষের ত আর
জিত হইতে পারে না; এবং তাহা হয় না বলিয়া
ক্রোড়া মাত্রই নিম্নোন্নত হইবে। সে খায়া হটুক, রাজা-
রাজভরা চিরকালই দূত-ক্রোড়া করিয়া থাকেন;
আমাদের ‘প্রিয় অব ওয়েলস’ তাহা দূত-ক্রোড়া
করেনই। সেজন্য তিনি তাঁহার হিন্দু প্রজাতিরদের
নিকট তাদৃশ অপর্যাপ্ত নহেন। তবে হিন্দুদিগকে
যদি অপর্যাপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দাও, তা হলে অল্প
নাচার, আছি। তোমরা তোমাদিগের জাতীয়
যুবরাজের প্রতি জগদ্ধ ব্যহার করিলে তাহারা কি
করিতে পারে?।

ভনিত পাই, কিন্তু বিলাতি সমাজে জুয়া-খেলা
প্রথক প্রচলিত। বিলাতি প্রতাপদের নিকট গল্প
ভনিতাই,—এমনা প্রায় সব প্রভুই খেলেন।
সামাজ্য সৈনিক হইতে সামন্ত-সেনাপতি, অরল ও
ভিক্ট হইতে ভাড়াবীর বোটা,—জুয়া না খেলেন
কি? সৌমিষ বাবু য়াহারা, তাঁহার ত খেলেনই।
এংলো-ইণ্ডিয়ান নবাবেরাও প্রেমায়ার পরিপক।
জুয়া এবং যুগ্ধী ইহানীতন সভ্য সামাজিক জীবনের
সর্বপ্রধান উপকরণ।

ইউরোপীয় সমাজে প্রেমারা অর্থের রকম প্রচলিত;
কিন্তু প্রেমারায় অর্থনৈতিক ভয়ানক নিম্নোন্নত। আনা-
করে কণে কি? প্রেমারাও প্রবৃত্তনা প্রায় একই
কথা। অন্তত ‘ভাদাদের এমনসব সর্বাধিক
নাথামাথি যে, প্রেমারা হইতে অর্থনৈতিক প্রায়ই
তকান করা যায় না; এবং তজ্জনই প্রেমারা,
প্রেমারা। যেমন ক্রোড়া “কস্তা” যেমন জুয়ার
‘জুয়াচুরী। জুয়া এবং জুয়াচুরী বা জুয়াচুরী আনা-
ধের বাপালা অভিবাসে একই অর্থব্যয়ক;—জুয়া
হইতেই জুয়াচুরী কথা জন্মিলে। কিন্তু ইউরোপীয়
সমাজ অতি বড় সভ্য কি না, তাই জুয়া
খেলেন, কিন্তু জুয়ার জুয়াচুরী মনেন না। আসল
কথা এই যে, জুয়ার যিনি না জিতিতে পারেন, তিনিই
তাঁহার জয়ী প্রতিযোগীকে জুয়াচুরি ঠাওরান; কিন্তু
নিজে মর্ন জিতেন, তখন আর জুয়ার মর্ন জুয়া-
চুরী কিছুমান থাকে না; তখন জুয়া-খেলা জীবন্ত
সর্বের হুপবিজ লীলা। ‘খায়া হটুক, বিলাতি
সমাজে জুয়া জুয়াচুরী এবং দূত-ক্রোড়া চাটুরী
অম্বলদে নিম্নোন্নত—একবারেই অমূল্যকাল;—তাহা
প্রাশিচিকের ‘অতীত মহাপাতক। ইষ্টানের বাই-
বেলে যেন ‘সর্বপাপ মাফানো—

"All manner of sin and blasphemy
Shall be forgiven unto thee"

সৌগান সাহেবদের সমাজ-সংহিতায় 'তাহার উত্তর দেয়—

"হুঁ সর্ববিশ্ব মহাপাতক মার্জনীর ঘণ্টে, কেবল
"একটা নয়; দ্বৈতা জুয়ার জুয়াচুরী এবং তাস-
"বেলার চাতুরী। কারণ এটা মহাপাতকের
"উপরেও অতি পাতক; এ পাতক, ইহলোক
"পুণ্যলোক কোথো মার্জনীর হইতে পারে না।"

বিলাতি সমাজ-সংস্কারক বিষ্টার ষ্টেড বলেন যে, বিলাতি সমাজ—

"তুমি তোমার বন্ধুর এক মাত্র কভার সতীহ
"হরণ করিয়া তাহার সর্বস্বান কড়াকড়ি তোমার
"প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষকে কলঙ্ক কলঙ্কিত করিয়া
"তোমার পৃষ্ঠপোষক-জীবনের হৃৎশাণ্ডি নিম্নে কর,
"সেই সৌন্দর্য সমাজ তোমার প্রতি বাহুনিপতিত
"করিলে না, বরং তোমারি সে ঘোলের জন্ত যদি
"কেহ তোমাকে নিম্ন করে, সমাজ, সেই নিম্ন
"কর্তার প্রতি ক্ষমাহস্ত হইবে, কিন্তু যদি তুমি
"তাস খেলিতে বাইয়া 'হাত-চালাকী'র চাতুরী
"লগা ছেকরাটা পাঁচ-পাঁচিও নোট খিতিয়া লও
"কারে তবে জুয়া-চাতুরী প্রকাশ হয়, তাহা
"হইবে, তোমার সামাজিক জীবন শেষ হইল;
"তুমি সামাজিকরূপে সমাজচ্যুত হইবে।"

বিলাতি সমাজের এই রীতি বিলাতের উপকারক
বিশিষ্ট সমাজক বিবৃত করিয়াছেন। আমরা আর
আশ্চর্য্য বর্ণন; আর আমরা বিলাতি সমাজের
বিষয় জানি না কি। অভিজ্ঞদিগের নিকট অবগত
হইয়া যাহা কিছু শিখা।

যে জন্ত আমাদের জ্যেষ্ঠ বুরাজ সামাজিক
নির্মাণে সহিতকর। সে "জ্ঞাতা" অতি সামান্য।
গম্ভীরা আমরা কেবল তদ্বিষয়, পার্থক্যে কন্যাই
দিতেছি।

কিছু দিন হইল, এক দিন বুরাজ কোনও
বিশিষ্ট ব্যক্তির পরীক্ষানির্বাহে নিমগ্নে যান। বুর-
জের সহিত তাঁহার পারিষদবর্গ এবং আরও
কতকগুলি ভ্রমলোক নিমগ্নে পমন করেন। নিমগ্ন
কর্তার বাটতে বুরাজের সঙ্গী ও বৃদ্ধগণের মধ্যে
জুয়া-খেলা হয়। খেলা হয় বুরাজের নিকট "হুঁ"।
যে কয়েক "কাত"ে খেলা হয়, তাহার মধ্যে যার
গর্জন কানি এক "কল্", যার গর্জন কানি সৈনিক
পুষ্প, গণ্যমাত্র ভ্রমলোক, "জর" উপাধি-বিশিষ্ট—

সমাজে প্রতিপত্তিশালী ও নিমগ্ন; বুরাজের
সহিত তাঁহার দশ বৎসরের আলাপ পরিচয়। জর
গর্জন কানি জুয়ার বাজীতে কিছু বেশী বেশী
জিতেন; বিজিতবিশিষ্ট তাহারে সন্তোষ হয়।
বিজিতবশে যোগদানে গর্জনের খেলা দেখিয়া চাতুরী
ধরবার "জ্ঞাত জুয়াড়ী" পক্ষা খেলোয়াড় খেলোয়াড়
বসান। খেলোয়াড়গণ গর্জনের চাতুরী ধরেন। গর্জ-
নের তাস তামিরা এবং দিবার "হাত-চালাকীতে"
চাতুরী ধরা পড়ে। বুরাজের নিকট অবগোচর
অসহিষ্ণু হয়। বুরাজ গর্জনকে ডাকাইয়া প্রমত্ত
তথা জাপানের জন্ত অনুরোধ করেন। গর্জন
চাতুরীর কথা সম্পূর্ণপ্রাপ্ত এবং সত্যেজ্ঞ অস্বীকার
করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ "নাছোড় বান্ধা"
শীড়শীড়ি করিয়া গর্জনকে একটা "এগ্রিমেন্টে"
স্থায়র করিতে বাধ্য করেন। সে এগ্রিমেন্টের
"সত্ত্ব" এই যে, গর্জন ইহ জীবনে আর বখাও
তাস স্পর্শ করিবেন না। উত্তর পক্ষে প্রখ্যাত-প্রতি-
শ্রুত যাহা, এ বন্দনা কেহ কোথো প্রকাশ
করেন না, আখ্যানে যোগদান রাখিবেন। কিন্তু
হায়! শুধু কথা যোগদান রহিল না; অল্প দিন অভি-
বাহিত না হইতেই অস্বীকার ভঙ্গ হইয়া গেল। যে
সর্বকালে খেলা দিয়াছিল এবং ইহারো যোগদানে
পরি করিয়াছিলেন, তাঁজাদের মধ্যে মুকুণদের স্রায়
কয়েক জন মৃত্যুও ছিলেন। হুয়াড়ী হুয়াড়ী
স্বলত স্বভাব বসন্ত কথাটা চাপিয়া রাখেতে পারি-
লেন না; কুংসাগ্রিও কেলেঙ্কারী-প্রকাশক
"সোয়াইটা" সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠাইলেন।
সমাজে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জর গর্জন
কানিও পড়িলেন মহাশুশ্রূষে। মান যায়, সন্তান যায়,
সৈনিক-বিজ্ঞানে নাম কাটা যায়, বিবাহের দশক
হইয়াছিল তাহাও যায়। গর্জন কানি অগত্যা
আলালন্তের আশ্রয় লইলেন; "মানবাধিকার"
নাগিল করিলেন। এজেন্দার দিলেন যে, "জোর
জরাজপিতে এগ্রিমেন্টে তাঁহার স্বাক্ষর লগা হইয়া-
ছিল।" বজতঃ তিনি জুয়া-চাতুরী করেন নাই।
কেবল জুয়া-খেলায় সন্তান বুরাজের নাম জড়িত
হইবে এই আশঙ্কায়, বিপাকে, পড়িয়াই তিনি
"প্রোমারপক্ষে" সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মকদ্দমার
এক দফা কাণ্ড। কেঁদো কেঁদো মাকীর জ্বোদনবন্দী,
দ্বয় ত্রিভুং মাকীরূপে কাট-গড়ায় লড়াইমান্য,
সমাজে তাঁহার শত্রু, সমবাদপত্রে তাঁহারে সাম্যা-
তিক আক্রমণ; ইত্যাদি ইত্যাদি। মোকদ্দমা হইয়া—

ছিল চিত্রজিৎস কোলরিজের নিকট; গর্জন মোকদ্দমার
হারিয়াছেন। গর্জনের সৈনিক নাম কাটা গিয়াছে,
সন্তান গিয়াছে; সাব গিয়াছে; যায় নাই কেবল একটা
জিত কোমল বস্ত্র; তাহা তাঁহার বান্দকা হুয়াড়ীর
স্রায় এবং হস্ত। মোকদ্দমার পরেই গর্জনের বিবাহ
হইয়া গিয়াছে। বিপদে পড়িয়া গর্জন আপনা
হইতেই ভুত সন্তক ছেদনের আবেশ করিয়া-
ছিলেন; কিন্তু হুয়াড়ী বড় লম্বা, গর্জনকে মান্তনা
করিয়াছেন, পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সখ্যাম্বিলি
হইয়াছেন। গর্জন গৃহস্থীক হইয়া স্থবী হইল;
কিন্তু সর্বত্রই বুরাজদিগের দেখিতেছি, এবার বড়
ছবৎসর।

অভিজ্ঞানশকুন্তল ও পদ্মপুরাণ।

(৪)

উপাখ্যানের শকুন্তলা শরৎকালের প্রথম-মুহুর-
কর সূর্য্যসম জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে, কখন বা কুই-
কথ্যাত, কখন বা স্থির-নিম্ন-মুহুরসাপিত, নানা
বাগ্মিহাসে অধীর অর্ঘ্যে সমহাঙ্গন হৃদয়কে
অনেক কথা বলিলেন;—নানা ভীতপ্রদ প্রবল
ভঙ্গনা-ব্যপক এবং নানাজান-পরিমার্জিত সারগর্ভ
সবন উদ্দেশ-বচনে, রাজার ক্রমে ক্রমে হুয়াড়ী;
রাজা কিন্তু কিছু ভুলিলেন না;—কিছুই বুঝিলেন
না;—বরং পূর্ণপোষকা ত্রিভুতর ক্রোধ-বেগে
অধীর হইয়া বলিলেন;—

"ন গর্ভভজানামি ত্বিঃ মতেজমার্জিতম্।
অসত্যভাষা। ন্যায়ঃ কথ্যে প্রকৃত্যন্তে বচঃ।
যেনকা নিরুজ্জ্বলোশ বস্ত্রী জননী তব।
যায়সি হিমবঃপ্রবেশে নিম্নাভ্যামিবে চোজ্জ্বলিতা।
স চাপি নিরুজ্জ্বলোশঃ ক্ষয়োনিঃ পিতা তব।
বিশ্বামিত্রো ব্রাহ্মণবস্ত্রকঃ কামাশং গতঃ।
যেনকাপদ্যসয়া শ্রেষ্ঠা মহর্ষীণাং পিতা চ তে।
অতঃপতং কথ্যং তং পুংস্কলীর প্রভাসম্।
অশ্রুঃস্বামিব বাক্যং কথয়ন্তী ন লজ্জসে।
বিশেষতো মৎসকাস্ত্রং হুতপদসি গণ্যভ্যাম্।
ক মহর্ষিঃ ক চৈবোঃ পদ্যসয়া; সা চ যেনকা।
ক তবমেব কুপণা তপসীবিশেষধারিণী।
হনিত্রী চ তে যোনিঃ পুংস্কলীর প্রভাসম্।
বৃদ্ধকঃ কাম্যপাং কয়াচিচ্ছনিতা হসি।"

সর্বমেতৎ পরাবাক্যং মে বৎ ত্বং বদসি তাপসি।
নাথঃ ত্বমভিজ্ঞানামি যথেষ্টং প্রত্যভ্যং।
পদ্মপুরাণ, বর্ণনপুং, তৎ অধ্যায়।

ভার্য্য:—আমা হইতে তোমার গর্ভ হইয়াছে,
এ বিধর আশার বিদিত নহে। স্ত্রী-কাজি স্বভাবতঃ
মিথ্যাবাদিনী; কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে।
তুমার জননী যেনকা বস্ত্রী,—তাহার গতা নাই।
সে তোমার নিম্নাভ্যামের স্রায় হিমাগলের পরে পিতা-
তাপাং-করিয়াছে। ক্ষয়োনিঃ তোমার পিতা-
কথ্যাত-নির্ভর;—তোমার সেই পিতা বিশ্বাসের
ক্ষয়িৎ হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে অভিজ্ঞা এবং কাম-
বৎ হইয়াছিলেন। যেনকা যেমন অপরামর্ঘ্যে
প্রধান, তোমার পিতাও তেমনিই হর্ষমিমে প্রেত।
তুমি তাহা পিতা-মাতার অপত্তা হইয়া; কিরূপে
পুংস্কলীর মত কথা করিহেও? এই প্রকার
অনুরোধ বাক্য প্রণোদ্য করিয়া তোমার কিলঙ্কা,
হইতেছে না?—বিশেষতঃ আমার নিকটে। রে
ভুত তাপসি! এখানে হইতে দূর হও। কোথায়
উগ্রভাষা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কোথায় অজ্ঞার যেনকা,
আর কোথায় বা তাপসমেধবাসিণী তদ্বাপু কৃপা-
পত্নাবা রমণী? তুমি অতি নীচতাব্যবহিত জন্মিহেও;
সেই জন্ত তোমার গাতা কথা বলিতেছ। কোন
রমণী বৃদ্ধজ্ঞানসে কাম্যপাং তোমার জন্ম দিয়াছে।
তুমি যাহা বলিতেছ, সন্তুষ্টই—আমার অপরি-
জ্ঞাত। আমি তোমার টনি নাই। তুমি যথেষ্ট
গমন কর।

দুর্দশা-শাপানভিজ্ঞা ও আশ-পাথিত-বিপত্ত্য
শকুন্তলা, রাজার, সেই যোর মর্শ্যাজিত ব্যাক্ত
ভবনামিত্য প্রচারিত হুগোভ্যন্তর কণীর মত, সন্তান
পতীর গর্জনে গর্জিয়া উঠিলেন। এবার তিনি
পূর্ব্বাশেকা কটোর-কুইতর ত্রীত-ভুক্ত জালাময়
বাপো যেন কলকে কলকে অনলগাহি উদ্গিরণ
করিতে করিতে এবং বিবদিত, শাণ্ডিত শোষণময়
কটোর কটাকপাতে অবিরণধারে, বিধ বধ করিতে
করিতে, মুহুর্কণ্ডে বলিলেন;—

"রাজঃ সর্বমপায়সি পরিচ্ছিন্নামি পশুসি।
আশ্রমে বিশ্বমাত্রাপি পশুপদী ন পশুসি।
মেনকা ত্রিভেদোৎসবঃ ত্রিংশপদঃসহনকাম্।
নৈকোহবিচ্ছিতো জন্ম রাজসে তব জনতঃ।
জিতবদসি রাজসে অন্তরীক্সে চরাম্যম্।
আবরোহন্তরঃ পশু যেনঃ সর্বপয়োহি।"

মহেশ্বর হৃদয়েজ যমজ বরপুত্র চ।
 তনুভাজনমুখ্যমি প্রভাবং পুত্র মে নৃপ।
 সত্যং জনবাহুঃ হৃৎ প্রবধ্যামি তে নৃপ।
 নিদর্শনং ব্রহ্মবাহি ন কোপ্য কৰ্ত্তৃমহি।
 বিরূপো বাবাদর্শে হ্রস্বং বৈব পুত্রাভি।
 মন্ততে তদবদাশ্রয়নমন্তোভাঃ রূপবন্তমহ।
 বদা তু হুমধ্যমপে বিকৃত্য পত্ন্যভেদনঃ।
 ভ্রমন্তব্যং বিদ্যাদিগ্ধ যমেব সোমের নরঃ।
 বহু ভাজনমপ্তোহে ন স নিদ্রতি কণন।
 অতীব জনন দুর্হীচো ভবতীহ বিকখনঃ।
 মুখ্যে হি কলভতা নৃপাং এত্যা বাচঃ শুভাত্ততাঃ।
 অন্ততঃ বাক্যমানন্তে পূর্বমিবি শূকরঃ।
 প্রাজ্ঞত জনতাং পুংসাং শূরা বাচঃ শুভাত্ততাঃ।
 ওৎসবঃ কাম্যদন্তে হংসাঃ কীরমিবাশ্রয়ঃ।
 অশ্রুত পবিত্রন দারুণাঃ হি পরিতপ্যতে।
 তথা পরিব্রজমানঃ কীষ্টা ভবতি দুর্জনঃ।
 অভিব্যাসা থা বুদ্ধান মন্তে গচ্ছন্তি নিবৃতিম।
 এবং সজ্জনমানুজং মূৰ্খো ভবতি নিবৃতঃ।
 হৃৎকণ্ঠে জীবন্ত্যকোষজঃ মূৰ্খা গোহাদুর্শিষ্টঃ।
 বহু গাঢ্যাঃ পঠিঃ সন্তঃ পরানাস্তবাবিধান।
 অস্তে হৃদয়েন লোকে কিমিদমন্ত বিদ্যতে।
 যজ দুর্জন ইত্যাহ দুর্জনঃ সজ্জনং যজম্।
 সত্যধর্মচ্যুতাং পুংসাঃ জুড়ান্তাশিবিমামি।
 অমান্তিকোহুয়াগিজতে জনঃ কিং পুত্রান্তিকঃ।
 পরমপাত্য বৈ পতং ন মমতি বরতাহে।
 তন্ম দেবঃ শিঃ স্বপ্নিন চ লোকাপহৃণাত্তে।
 পুত্রন্তে ভবিতা রাজনপুত্রস্ত মদাওঃ।
 চক্রবর্তী রাজাজ উক্তমঃ সর্ঘ্যধিনিম্ম।
 স হঃ নৃপসিদ্ধির্দল ন পুত্রং তজ্জমহি।
 আয়ানি সত্যং যৌ চ পালয়ন পৃথিবীপতে।
 বরঃ কুপশ্যাত্যাপী বরঃ বাপিশস্য ক্রতুঃ।
 বরং ক্রতুশতাং পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতায়ম্।
 অরমোদপল্লব সত্যক তুল্যা হুম।
 অরমোদপল্লব সত্যক সত্যোভিচিত্রতে।
 রাজন সত্যং পরংসক্ সত্যক সময়ঃ পরম।
 মা ত্যাক্যঃ সময়ঃ রাজন সত্যং সত্যমন্ত তে।
 অন্ততে চেৎ অসমস্তে শ্রদ্ধাবানি ন চেৎ স্বয়ম্।
 কথন্তেপ্রায়ঃ গচ্ছে বাত্মশে নান্তি সত্যতঃ।
 স্বতঃসি বা মহারাজ শৈলরাজ্যবৎসকাম।
 চতুর্দশমিন্দুকীং পুত্রো মে পালয়তি।
 মূনেঃ কথং বৈ বাক্যং ভবিতা কথমত্যা।

বাহু গুপ্তপুণঃ স্বর্গপতঃ, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ:—রাজন অস্তের সর্ঘ্য-প্রমাণ দেখও
 দেখিতে পাত, কিন্তু নিজের বিশ্বপ্রমাণ দেখ দেখি-
 যও দেখ না। মেনকা দেখেযের প্রধান এবং
 দেবগণ তাঁহার অমৃতপতঃ; অর্থাৎ তাঁহার জন্ম
 অপেক্ষা আমার জন্ম শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তুমি পৃথি-
 বীতে বিচরণ কর, আমার অন্তরীক্সে বিচরণ করিয়া
 থাকি। শতগুণে মন্তে ও সর্ঘ্যে যেমন, ততোধিক
 ও আমাতে তেমন প্রভবঃ। রাজন! আমার
 প্রভাব দেখুন। মহেশ্বর, হৃদয়ে, যম ও কপে
 পুর্বেও গমন করিতে পারি। এই লোকপাশাস সত্য,
 তাহার নিদর্শন বসিতছে, আপনি রাগ করিবে
 না। বিরূপ ব্যক্তি বাহৎ আদর্শে খ-রূপ অবলোকন
 না করে, তাহৎ আপনাকে অল্প অপেক্ষা রূপবন্ত
 মনে করে। যখন আদর্শে নিজ বিকৃত মূখ্য দর্শন
 করে, তখন স্বয়ং আপনায় নোচতা অবগত হয়।
 প্রকৃত রূপবান ব্যক্তি কাহারও নিদ্রা করে না।
 অতীব দুর্হীচ প্রবেশ করিলে, আশ্রয়গ্রহী হইতে
 যায়। শূকর যেমন বিষ্ঠা গ্রহণ করে, মূখ্য যেমনই
 শুভাভবন মতো বহু অশুভ বাক্যই গ্রহণ করিয়া
 থাকে। আর হংস যেমন নীর ত্যাগ করিয়া, ক্ষীর
 গ্রহণ করে, তথা তেমনই দুর্ব্যাক্য ত্যাগ করিয়া
 ওৎসবিত্তি বাক্য পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। সাধু
 যেমন পরপরিবাদ করিয়া পরিতপ্ত হন, অসাদু
 ভবিতা ইহা সঙ্গত হয়। হ্রস্বন বুদ্ধিপূর্ণের
 অসিদ্ধি বাক্যই মেন্ম নিবৃত্ত হন, মূখ্য ওমহী
 সজ্জনের নিন্দা করিয়া পরম অপ্যারিত্য হয়। ইহা
 অপেক্ষা লোকে অধিক হাভের বিষয় আর কি
 আছে? যে দুর্জন, সে স্বয়ং সজ্জনকে দুর্জন বলিয়া
 থাকে। যাহার সত্য নাই, স্বপ্ন নাই, সে ক্রম
 সর্গের ভ্রায়। আন্তরিকের কথা কি, নান্তিকেরও
 তদ্রূপ ব্যক্তি হইতে উভয় হইয়া থাকে। সত্য
 যে ব্যক্তি স্বয়ং গর্ভ উপাদান করিয়া, আমার সত্য
 নহে বলিয়া থাকে, দেবতারা তাহার শ্রীনাশ করেন
 এবং তাহার সমস্ত লোক ভ্রষ্ট হয়। রাজন! তুমি
 অশ্রুত পুণ্যনি পূর্ণাশ্রয় রাজাজ-চক্রবর্তী ও সর্ঘ্য-
 ধুজাগ্রপ্রাণ পুত্র জন্মিলে। আপনি এই পুত্রকে
 ত্যাগ করিবেন না। রাজন! আখ্যা ও সত্যদর্শের
 রক্ষা কর। সে, এক শত পুত্র অপেক্ষা একমাত্র
 বাপী শ্রেষ্ঠ; এক শত বাপী অপেক্ষা একমাত্র বজ্র
 শ্রেষ্ঠ; এক শত যজ্ঞ অপেক্ষা একমাত্র পুত্র
 শ্রেষ্ঠ এবং এক শত পুত্র অপেক্ষা একমাত্র সত্য
 শ্রেষ্ঠ। সহজ অরমোদ ও সত্য পরম্পর কুলায়

ধারণ করিলে, অরমোদ-সুহৃৎ অপেক্ষা সত্য অতি-
 রিক্ত হইয়া থাকে। রাজন! সত্যই পরম ব্রহ্ম। সত্য
 অপেক্ষা সমস্ত শ্রেষ্ঠ। আপনি সেই সময় বা সত্য
 পরিহার করিবেন না। আপনার সত্য সঙ্গত
 হইবে। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, এবং
 যদি মিথ্যাই আপনার প্রিয় হয়, তবে আমি পিতার
 আশ্রমেই গমন করিব। আপনার ভ্রায় মিথ্যারাদী
 জনে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহারাজ!
 আপনি আশ্রয় না দিলেও, আমার পুত্র
 শৈলরাজ্যবৎসমা চতুর্দশ এই মৌনিক পালন
 করিবেন। মহর্ষি কবের বাক্য তখনও মিথ্যাই হইবার
 নহে।

সান্দী-সত্য পতিব্রতা কামিনীর প্রতি কুলটার
 কলঙ্করোপ! শকুন্তলার ভ্রায় পতিগত-প্রাণা রমণীর
 পক্ষে কষ্টকর হওয়াৎ অসম্ভব নহে। উপাধ্যানে
 শকুন্তলা-চরিত্রের যে ভিত্তি প্রথম হইতে দেওয়া
 আসিতেছে,—বর্তমান ক্ষেত্রে, এ বিষয় বিপর্যয়-
 ব্যাপারে তাহার অস্তিত্ব নাই। অস্তিত্ব মনে ছে,
 “অভিজ্ঞান-শকুন্তলে”র চরিত্র-চিত্র। অভিজ্ঞান-
 শকুন্তলের সেই কুসুমিত-কলেবরা, ক্ষুদ্রত্ব বদনা,
 লজ্জাবতী-বাহনন, স্বভাব-সলঙ্কা, চিত্র-আশ্রম-
 পাণিতা, বিভ্রান্তা শকুন্তলা ও জ্যোৎস্বাশ্রিত
 দীর্ঘচন্দ্র-বিভুক্তিত কষ্টের-কটুবাক্যে হৃদয়স্তম্ভন
 বাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও ত ভাবাবদী।
 সত্য-সত্যই ত শকুন্তলা পরিত্যক্তা—

“অন্যজ্ঞ অন্তোহা হিঅগ্নাশ্রম্যেণ কিল সন্তঃ
 পেচ্ছমি। কো বাণ্যো অথকল্যায়বাসেদিশো
 তিগচ্ছানকুলাবাসমসু বহু অম্মহারা ভবিস্যামি।”

কেবল কি ইহাই? এখানে শকুন্তলা যত কথা
 বলিয়াছিলেন, শকুন্তলা যদি হৃদয়কষ্টকর এইরূপ
 প্রত্যাখ্যাত না হইয়া, সাধনসম্ভবে রাজ্যবাহী-
 রূপেই পরিগৃহীত হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়,
 সারা-জীবনে তিনি একাক্ষেপে ইহার শত্যাশের
 একাংশ কথাও ভাবিতে পারিতেন কি না মনেহ
 প্রতি বৎ লালনা-ভাওয়ান এমনই হওয়াৎ অসম্ভব
 নহে। সেই অসুখশাস্তা সম্রাট-মহিষী একান্ত
 রত্নখণ্ডা জৌপানী, বস্তুর স্বামী প্রভৃতি শুভজন-
 মনুষ্যে রাজ্যভার মানে, এতদী মর্যাদাও আভি-
 নাদে কি না বলিয়াছিলেন? সিংহাসিনী-রাজমহিষী
 “হারমিনী” নিজ নির্দোষী প্রমাণার্থে রাজসম্মান
 মূলকভাবে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, স্বভাবতঃ
 “অপিত্রি-বৈও বোধ হয় তাহার কাণে দ্রাবত

স্বীকার করিতে হয়। (১) বেশী বলিতে হইবে কেন?
 বাসিন্দী-বীর সীতারামের বাসিন্দী বলিতা “রমা
 শকুন্তা মাশে লুভাইমি।” কত কথা না বলিয়া-
 ছিলেন? (২) কিন্তু পতিপ্রাণা শকুন্তলার মুখে
 “অনার্থা” কথা ভাবিলে বিমিত হইতে হয়। বাসিন্দার
 “শক্তিমা” সমাশোচ্যেরা এই কথায় শকুন্তলা-
 চরিত্রে বোধ কলঙ্ক বিলম্বন করিয়াছেন। কলঙ্কেরই
 কথা বটে; কিন্তু কাণিগানের কৃতিও এইখানে।
 কবি ইহাতে বুঝাইলেন; শকুন্তলা যদি মেনকা-
 গর্তে জন্মগ্রহণ না করিয়া, পৌত্তম্যগর্তে জন্মগ্রহণ
 করিতেন, তাহা হইলে এমন কথা কিছুতেই বলিতে
 পারিতেন না। শকুন্তলা পবিত্র আশ্রম-পালিতা
 চরিত্রের পরিচয় বরাবরই দিয়া আসিয়াছেন;
 উপনিষত ক্ষেত্রে কিন্তু গর্ভ-দোষের পরিচয় দিয়া
 ফেলিলেন। এইই কলঙ্ক করি কৃতিত্ব।

যাহা হউক, এইখানে উপাধ্যানে এবং
 “অভিজ্ঞান-শকুন্তলে”র শকুন্তলা-চরিত্রে সামঞ্জস্য
 অনেকটা পরিলক্ষিত হইল। তবে উপাধ্যানেকার
 লোকশিক্ষাশ্রমিত হইত কথায় ভুবতাব্যাপ্য করিয়া
 ছেন,—কবির তথা আশ্রয়ক হয় নাই। নাই
 উটক,—কল সেই একই হইল,—শকুন্তলা প্রত্যা-
 খ্যাত হইলেন। উপাধ্যানের হৃদয়, শকুন্তলার
 কথায় বিচলিত না হইয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

“কিং নাপগতি পুংস্ক্যা প্রমদেব সুহৃৎকঃ।
 বাহি হং গচ্ছ বাচোঃ দুর্ময়িভি মাং জনঃ।”

পদপুণ্যঃ স্বর্গপতঃ, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ:—পুংস্কীরা এইরূপে কি না সুহৃৎক
 প্রয়োগ করিতে পারে? মিথ্যা বাণ্যভূষের প্রয়োজন
 নাই। তুমি প্রমদ কর। অত্যা, লোকে আমার
 দোষ দিবে।

ইহার পর উপাধ্যানে বাহা আছে,—সাতকেও
 তাহাই আছে। যাহারা পদপুণ্য পাঠ করেন নাই,
 তাঁহার্য বুলেন, এইখানে কাণিগানের কলঙ্ক-কৃতিত্ব
 অসুপ্ন। প্রকৃতপক্ষে কি তাহা নহে। নাতকতে
 এই আছে,—রাজা যখন একান্তপক্ষে শকুন্তলকে
 প্রত্যাখ্যান করিলেন, শকুন্তলা তখন শাস্ত্রব্রতের
 সন্তিত্ত কথাসনে বাইতে উদ্যত হইলেন; শাস্ত্র-ব্রত
 কিন্তু শাস্ত্রমিহিতা শকুন্তলাকে লইয়া বাইতে

(১) Winter's Tale Act III Sc II.
 Shakspeare.

(২) বর্ষমন্ত্র প্রণীত সীতামায়। ৩য় বও ৩য়।

সম্মত হইলেন না। তখন শাস্ত্রধর, শারদ্যত এবং গৌতমী শত্ৰুশালকে রায়ায় চলিয়া গেলেন। রাজাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে পুরোহিতের উপদেশে তাঁহাকে পুরোহিত-গৃহে রাখাই প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন। পুরোহিত যখন শত্ৰুশালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, তখন স্বর্গ হইতে এক মন্দরী দিবাধ্যান আনিয়া শত্ৰুশালকে ভূগিয়া লইয়া অন্তর্ধান করিলেন। উপাধ্যানে কি আছে, দেখুন।

রাজা যখন একান্ত শত্ৰুশালকে পরিভ্রাণ করিলেন, তখন পুরোহিত বলিলেন,—

“শত্রু ইচ্ছামি তে মন্ত্রঃ পুং রাজন্ মহামতে।
বাৎ প্রমথমাত্রৈব নারী তিষ্ঠত তে গৃহে ॥
যদি তে মনুষ্যঃ পুত্রঃ কামিতোবা প্রমোদ্যতি।
ততস্তবৈব ভার্য্যেতি বৈজ্ঞান্যমনন্তম্ ॥
শালিবোজা হি যস্যেত ন কদাচিত্ত্ব বাহার্য্য ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—মহারাজ! আমার কণা শুধুই যে পণ্ডিত এই রমণী প্রমথ না করেন, সে পণ্ডিত ইনি আপনার ঘরে থাকুন। যদি এ কামিনী আপনাকে মনুষ্য পুত্র প্রসূত করেন, তাহা হইলে ইহাকে আপনার ভার্য্যা বলিয়া জানিব। শালিবোজ হইতে কখন বাহার্য্য জন্মায় না।

রাজা বলিলেন,—

“মেধা শুভ্রাস্তম্যেতি যম বাসমিহাচিহ্নতি।
সংসর্গদ্যপি পুংকল্যেয় দ্বয়স্তি কুশস্তিঃ ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—পুংকলীর সংসর্গে কুশলমস্তীরা দ্বিভূত হইতে পারে; অতএব ইহাকে-অস্তপুত্র স্থান দেওয়া উচিত নহে।

পুরোহিত বলিলেন,—

“অশ্রুতমরাতোহসি রাজরাজোহপি ভূতলে।
অভ্যন্তর্য্যন্তো প্রভা রাজন্ মে জ্যাততথিকা ॥
ইয়ং মান্দী বরাকোহা কথেন পরিপল্লিতা।
বাক্চিয়ারমতো রাজন্ নাহং মজে মনাপি ॥
বাৎ প্রমথমেজ্ঞ বাসরেহং নিজালসে ॥
প্রমথং সতি কল্যাণং যসরেং প্রীত্বাসি ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—আপনি রাজরাজ হটেন, কিন্তু নিম্নস্বভাব। এই কারণে আপনার সন্তানের প্রতি আমার বড় প্রভা হইতেছে। আর এ কামিনী মন্দরী কথকর্ত্ত্ব্য প্রতিপালিতা, হতরো ইহাকে

জ্ঞাপ্যশেষে ব্যতিচারিণী বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ॥ প্রমথকাল পর্যন্ত ইনি আমারই গৃহে অবস্থিত করুন; পরে ইহাকে আপনিই গ্রহণ করিলেন।

“ইত্যাঙ্কু পৌতমে ব্রহ্ম শাস্ত্রায়িতা শত্ৰুশালম্।
বৃথচ্ছায়েত তং নেতুং যিনামগুণচক্রমে ॥
সাত্ চাপি মুকুতং বৎ সততী মূর্ণচোদনা ॥
শটেন শটেনোপিতং তমগুণগুণং প্রচক্রমে ॥
এতমিচ্ছান্তে বিপ্র মেনেকাপসঙ্গাং বরা ॥
তোজোজগা যোমমধ্যাং তুতিপাতং পপাত সা ॥
কিমিৎ কিমিৎ চিত্তমিতি জগৎপ্র সর্গস্তঃ ॥
সত্যোহুৎ চ সার্ক্যে তেজসা ধবিত্যু চ ॥
আলোকনেশ্যপারেক্ষ্যে দুঃপ্তে ভবমিচ্ছলে ॥
শত্ৰুশালং সমাপ্য অতঃকালং পরায়া ॥
অবশং বিজগাহে সা তং কেমাপি ন ক্ষিতম্ ॥
এবং গতং তু হুতম্ ॥ বেনমাগ ততো কুশম্ ॥
দেবেন চরিতং মায়ামনুধ্যাত তদা নৃপঃ ॥”

ভাবার্থ,—এই বলিয়া পৌতম শাস্ত্রানুসারে শত্ৰুশালকে নিজ গৃহে লইয়া বাহিরের উপক্রম করিলে, শত্ৰুশাল মুকুতকে রোদন করিতে করিতে বৈদগ্ধ্যবিক্ষেপে তাঁহার অশ্রুবামিনী হইলেন। এমন সময় তেজোজগা মেনেকা বিছায়ে যোমমধ্যা হইতে পড়িয়া হইলেন। সত্যং সর্বলোকে বিদিত হইয়া, কি ও কি ও বলিয়া উঠিলেন। মেনেকার তেজে ধবিত হওয়াতে, তাঁহার আর দেখিতে পারিলেন না। দুঃপ্ত ভয়ে বিব্রল হইয়া উঠিলেন। মেনেকা সত্য শত্ৰুশালকে জোড়ে ধারণ করিয়া অশ্রু-ময়লা পালন করিলেন। কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। একেবারে ঘনি উপস্থিত হইলে, দুঃপ্ত লৈবমায়ী ভাবিয়া অতিমাত্রা বিম্ব হইলেন।

পাঠ্যমেন অথবৈ-অন্যত্র মিল,—অনিম্ ॥ যা কিছু পঠন-প্রণালীতে বৈত মম। উপাধ্যান ও নাটকের পঠনে অমিল থাকিবেই ত। নাটকে শত্ৰুশাল ও মেনেকার অন্তর্ধান-ব্যাপার বেশগোপন হইয়া। পুরোহিত রাজসভায় প্রবেশ করিয়া অন্তর্ধান-ব্যাপার বর্ণনা করেন। এইটুকু কেবল অসম্মত-সৌখ্যসাক্ষ্য।

শত্ৰুশাল প্রত্যাহাত হইলেন; ইহার পর উপাধ্যান ও নাটকের তুলনার সমালোচনা করিতে গেলে, দর্শনাংশে আবার সেইরূপই সামঞ্জস্য দেখা যাইবে; বুঝা যাইবে, যথাস্থানে কল্যাণ-কর্ত্তব্যের যে

প্রতিষ্ঠা অনেকেরই নিকট পরিচিত, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বলিয়াছিত ত,—কৃতিত্ব কেবল কবিত্তে এবং চরিত্র-চিত্র-অঙ্কনে। অজ্ঞে উপাধ্যানের নিরুতি হইবে ॥

“একদা স মহাপাণো মরিত্তিরি দ্রষ্টব্যঃ সহ ॥
প্রজ্ঞানো বৈকুণ্ঠং বৃদ্ধং ব্রহ্মা নগরে দ্বিজ ॥
ভক্ত রাজকটঃ কশিন্দু দৃঢ়মথ্যং ধীরম্ ॥
দণ্ডেন ভাঙয় প্রব্রুচ্যোক্তিঃ সমংকর্য্যং ॥
রাজাতবধমেতরৈ বৎ ত্বং তোরিষং ছল্যং ॥
অতো বধাংমথ্যপং ত্বং মামি নৃপান্তিক ॥
ইত্যাঙ্কু তং করেপুংহ ভাঙয় বহু মূর্খনি ॥
রাজাভিকমুপানীয় রাজানিমমমত্ৰীম ॥
এব ধীরবরো রাজাংশেরাশিত্যাদৃষ্টমহু ॥
ত্বয়ামচিহ্নিতং লোকং ক্রীড়িতং রজননিষিতম্ ॥
বিক্রেতুমধ্যাতঃ পাণো মম দৃষ্টো মহাপতে ॥
রাজা তৎ প্রাঃ দর্শেষৎ হুতো লগ্নমিহ যয়া ॥
কথ্যাতমমতং তে দন্তং জানীহি সাশ্রোতম্ ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—এই বলিয়া পৌতম শাস্ত্রানুসারে শত্ৰুশালকে নিজ গৃহে লইয়া বাহিরের উপক্রম করিলে, শত্ৰুশাল মুকুতকে রোদন করিতে করিতে বৈদগ্ধ্যবিক্ষেপে তাঁহার অশ্রুবামিনী হইলেন। এমন সময় তেজোজগা মেনেকা বিছায়ে যোমমধ্যা হইতে পড়িয়া হইলেন। সত্যং সর্বলোকে বিদিত হইয়া, কি ও কি ও বলিয়া উঠিলেন। মেনেকার তেজে ধবিত হওয়াতে, তাঁহার আর দেখিতে পারিলেন না। দুঃপ্ত ভয়ে বিব্রল হইয়া উঠিলেন। মেনেকা সত্য শত্ৰুশালকে জোড়ে ধারণ করিয়া অশ্রু-ময়লা পালন করিলেন। কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। একেবারে ঘনি উপস্থিত হইলে, দুঃপ্ত লৈবমায়ী ভাবিয়া অতিমাত্রা বিম্ব হইলেন।

পাঠ্যমেন অথবৈ-অন্যত্র মিল,—অনিম্ ॥ যা কিছু পঠন-প্রণালীতে বৈত মম। উপাধ্যান ও নাটকের পঠনে অমিল থাকিবেই ত। নাটকে শত্ৰুশাল ও মেনেকার অন্তর্ধান-ব্যাপার বেশগোপন হইয়া। পুরোহিত রাজসভায় প্রবেশ করিয়া অন্তর্ধান-ব্যাপার বর্ণনা করেন। এইটুকু কেবল অসম্মত-সৌখ্যসাক্ষ্য।

শত্ৰুশাল প্রত্যাহাত হইলেন; ইহার পর উপাধ্যান ও নাটকের তুলনার সমালোচনা করিতে গেলে, দর্শনাংশে আবার সেইরূপই সামঞ্জস্য দেখা যাইবে; বুঝা যাইবে, যথাস্থানে কল্যাণ-কর্ত্তব্যের যে

প্রতিষ্ঠা অনেকেরই নিকট পরিচিত, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বলিয়াছিত ত,—কৃতিত্ব কেবল কবিত্তে এবং চরিত্র-চিত্র-অঙ্কনে। অজ্ঞে উপাধ্যানের নিরুতি হইবে ॥

“একদা স মহাপাণো মরিত্তিরি দ্রষ্টব্যঃ সহ ॥
প্রজ্ঞানো বৈকুণ্ঠং বৃদ্ধং ব্রহ্মা নগরে দ্বিজ ॥
ভক্ত রাজকটঃ কশিন্দু দৃঢ়মথ্যং ধীরম্ ॥
দণ্ডেন ভাঙয় প্রব্রুচ্যোক্তিঃ সমংকর্য্যং ॥
রাজাতবধমেতরৈ বৎ ত্বং তোরিষং ছল্যং ॥
অতো বধাংমথ্যপং ত্বং মামি নৃপান্তিক ॥
ইত্যাঙ্কু তং করেপুংহ ভাঙয় বহু মূর্খনি ॥
রাজাভিকমুপানীয় রাজানিমমমত্ৰীম ॥
এব ধীরবরো রাজাংশেরাশিত্যাদৃষ্টমহু ॥
ত্বয়ামচিহ্নিতং লোকং ক্রীড়িতং রজননিষিতম্ ॥
বিক্রেতুমধ্যাতঃ পাণো মম দৃষ্টো মহাপতে ॥
রাজা তৎ প্রাঃ দর্শেষৎ হুতো লগ্নমিহ যয়া ॥
কথ্যাতমমতং তে দন্তং জানীহি সাশ্রোতম্ ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—এই বলিয়া পৌতম শাস্ত্রানুসারে শত্ৰুশালকে নিজ গৃহে লইয়া বাহিরের উপক্রম করিলে, শত্ৰুশাল মুকুতকে রোদন করিতে করিতে বৈদগ্ধ্যবিক্ষেপে তাঁহার অশ্রুবামিনী হইলেন। এমন সময় তেজোজগা মেনেকা বিছায়ে যোমমধ্যা হইতে পড়িয়া হইলেন। সত্যং সর্বলোকে বিদিত হইয়া, কি ও কি ও বলিয়া উঠিলেন। মেনেকার তেজে ধবিত হওয়াতে, তাঁহার আর দেখিতে পারিলেন না। দুঃপ্ত ভয়ে বিব্রল হইয়া উঠিলেন। মেনেকা সত্য শত্ৰুশালকে জোড়ে ধারণ করিয়া অশ্রু-ময়লা পালন করিলেন। কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। একেবারে ঘনি উপস্থিত হইলে, দুঃপ্ত লৈবমায়ী ভাবিয়া অতিমাত্রা বিম্ব হইলেন।

পাঠ্যমেন অথবৈ-অন্যত্র মিল,—অনিম্ ॥ যা কিছু পঠন-প্রণালীতে বৈত মম। উপাধ্যান ও নাটকের পঠনে অমিল থাকিবেই ত। নাটকে শত্ৰুশাল ও মেনেকার অন্তর্ধান-ব্যাপার বেশগোপন হইয়া। পুরোহিত রাজসভায় প্রবেশ করিয়া অন্তর্ধান-ব্যাপার বর্ণনা করেন। এইটুকু কেবল অসম্মত-সৌখ্যসাক্ষ্য।

শত্ৰুশাল প্রত্যাহাত হইলেন; ইহার পর উপাধ্যান ও নাটকের তুলনার সমালোচনা করিতে গেলে, দর্শনাংশে আবার সেইরূপই সামঞ্জস্য দেখা যাইবে; বুঝা যাইবে, যথাস্থানে কল্যাণ-কর্ত্তব্যের যে

প্রতিষ্ঠা অনেকেরই নিকট পরিচিত, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বলিয়াছিত ত,—কৃতিত্ব কেবল কবিত্তে এবং চরিত্র-চিত্র-অঙ্কনে। অজ্ঞে উপাধ্যানের নিরুতি হইবে ॥

“একদা স মহাপাণো মরিত্তিরি দ্রষ্টব্যঃ সহ ॥
প্রজ্ঞানো বৈকুণ্ঠং বৃদ্ধং ব্রহ্মা নগরে দ্বিজ ॥
ভক্ত রাজকটঃ কশিন্দু দৃঢ়মথ্যং ধীরম্ ॥
দণ্ডেন ভাঙয় প্রব্রুচ্যোক্তিঃ সমংকর্য্যং ॥
রাজাতবধমেতরৈ বৎ ত্বং তোরিষং ছল্যং ॥
অতো বধাংমথ্যপং ত্বং মামি নৃপান্তিক ॥
ইত্যাঙ্কু তং করেপুংহ ভাঙয় বহু মূর্খনি ॥
রাজাভিকমুপানীয় রাজানিমমমত্ৰীম ॥
এব ধীরবরো রাজাংশেরাশিত্যাদৃষ্টমহু ॥
ত্বয়ামচিহ্নিতং লোকং ক্রীড়িতং রজননিষিতম্ ॥
বিক্রেতুমধ্যাতঃ পাণো মম দৃষ্টো মহাপতে ॥
রাজা তৎ প্রাঃ দর্শেষৎ হুতো লগ্নমিহ যয়া ॥
কথ্যাতমমতং তে দন্তং জানীহি সাশ্রোতম্ ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—এই বলিয়া পৌতম শাস্ত্রানুসারে শত্ৰুশালকে নিজ গৃহে লইয়া বাহিরের উপক্রম করিলে, শত্ৰুশাল মুকুতকে রোদন করিতে করিতে বৈদগ্ধ্যবিক্ষেপে তাঁহার অশ্রুবামিনী হইলেন। এমন সময় তেজোজগা মেনেকা বিছায়ে যোমমধ্যা হইতে পড়িয়া হইলেন। সত্যং সর্বলোকে বিদিত হইয়া, কি ও কি ও বলিয়া উঠিলেন। মেনেকার তেজে ধবিত হওয়াতে, তাঁহার আর দেখিতে পারিলেন না। দুঃপ্ত ভয়ে বিব্রল হইয়া উঠিলেন। মেনেকা সত্য শত্ৰুশালকে জোড়ে ধারণ করিয়া অশ্রু-ময়লা পালন করিলেন। কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। একেবারে ঘনি উপস্থিত হইলে, দুঃপ্ত লৈবমায়ী ভাবিয়া অতিমাত্রা বিম্ব হইলেন।

ভাবার্থ,—ধীরব নিবেদন করিল,—মহারাজ! আমি ধীরঃ; মংজয়াজ আমার উপকীর্ত্তি; আমি চৌচোয়ং বা-দ্বর্ত্ততার নামও জানি না। আমি সন্ন্যস্তী নদীতে জাল ফেলিয়া মংজ ধরিয়া পাই। একদা জাল ফেলিয়া মংজ-লাভ-প্রত্যাশায় সন্ন্যস্তী-তীরস্থ তপস্বীকে বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক যুৎসব বোহিত মংজ জালে পড়িল। তখন জাল উত্তারণপূর্ব্বক সেই উৎসব বোহিত দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া, তৎকথ্যং বক্তা যারা তাহা ছেন, কর্ণাম। তাহারই ভগ্নে এই অঙ্গুরীয় পাইয়াছি। ইহা কাহার, জানি না। ইহাই নগরে বিক্রয় করিতে আনিয়াছিলাম। আপনার তট প্রামাণে আবদ্ধ করিয়াছে।

রাজা বলিলেন,—

“পরি পণ্ডামি কক্কেতং কিংকরমুপরীকম্ ॥
হসেতমুণ্যমগুংহ যুৎসেবৈব ব্রজলয়ম্ ॥”

পদ্মপুরাণ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—দণ্ডও দেখি, এই অঙ্গুরীয় কাহার ও কি প্রকার; ভূমি ইহার মূল্য গ্রহণ করিয়া বগুয়ে থাম কর।

“ইত্যাঙ্কু পানিনাথায় বারদামা স পণ্ডিতঃ ॥
নিপত্তিঃ নৈত্রোভ্যাং তারকোশ্রবণবিদ্যঃ ॥
প্রভাসীয়া তামলমুখ্য তথা পাক্ষরক্ষম্ চ ॥
গৌড়ানক সর্পঃ তদুচ্ছিত্তো নিপত্তাৎ ॥
তদা পুরোহিতমাত্যো ভূমমুদ্রিততঃ ॥
উথাপ্য তং মহাপাণো নিবেশ্য চ বরাসে ॥
লক্ষ্যমজ্ঞং শটেনপর্ণেন প্রপ্রক্কেতঃ কিমিৎ বৎ ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—এই বলিয়া হস্ত-প্রসারণ করিয়া রাজা জাল গ্রহণপূর্ব্বক যেমন দেখিলেন, তখন নৈত্র-মুণল হইতে দৃঢ়ধরিত-ধারায় অশ্রুশ্রাবণ পণ্ডিত হইল। আহুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা যথং হওয়াতে, তিনি মুচ্ছিত হইয়া তৎকথ্যং বক্তা আসন্ন করিলেন। পুরোহিত অমাত্যেরা এই ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক উদ্ভিগ্নচিত্তে রাজাকে উপাধিত ও আসনে বসাইলেন। পরে রাজা সজ্ঞাতাভ করিলেন, তাঁহার। তাহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! ও কি।

“দুঃপ্তমুণ্যং সন্ন্যাস্তং প্রেষয়ীতামলমুদ্রম্ ॥
নিপত্তিঃ স্বীকৃত্য অশ্রুশ্রাবণমুদ্রম্ ॥
প্রত্যাখ্যাত বারোহা মলমুদ্রাণ্যেণ যথায় ॥
তদ্যম বা হসেতোব অঙ্গুরীয় দর্শনাম্ ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—এই বলিয়া হস্ত-প্রসারণ করিয়া রাজা জাল গ্রহণপূর্ব্বক যেমন দেখিলেন, তখন নৈত্র-মুণল হইতে দৃঢ়ধরিত-ধারায় অশ্রুশ্রাবণ পণ্ডিত হইল। আহুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা যথং হওয়াতে, তিনি মুচ্ছিত হইয়া তৎকথ্যং বক্তা আসন্ন করিলেন। পুরোহিত অমাত্যেরা এই ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক উদ্ভিগ্নচিত্তে রাজাকে উপাধিত ও আসনে বসাইলেন। পরে রাজা সজ্ঞাতাভ করিলেন, তাঁহার। তাহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! ও কি।

“দুঃপ্তমুণ্যং সন্ন্যাস্তং প্রেষয়ীতামলমুদ্রম্ ॥
নিপত্তিঃ স্বীকৃত্য অশ্রুশ্রাবণমুদ্রম্ ॥
প্রত্যাখ্যাত বারোহা মলমুদ্রাণ্যেণ যথায় ॥
তদ্যম বা হসেতোব অঙ্গুরীয় দর্শনাম্ ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—এই বলিয়া হস্ত-প্রসারণ করিয়া রাজা জাল গ্রহণপূর্ব্বক যেমন দেখিলেন, তখন নৈত্র-মুণল হইতে দৃঢ়ধরিত-ধারায় অশ্রুশ্রাবণ পণ্ডিত হইল। আহুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা যথং হওয়াতে, তিনি মুচ্ছিত হইয়া তৎকথ্যং বক্তা আসন্ন করিলেন। পুরোহিত অমাত্যেরা এই ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক উদ্ভিগ্নচিত্তে রাজাকে উপাধিত ও আসনে বসাইলেন। পরে রাজা সজ্ঞাতাভ করিলেন, তাঁহার। তাহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! ও কি।

“দুঃপ্তমুণ্যং সন্ন্যাস্তং প্রেষয়ীতামলমুদ্রম্ ॥
নিপত্তিঃ স্বীকৃত্য অশ্রুশ্রাবণমুদ্রম্ ॥
প্রত্যাখ্যাত বারোহা মলমুদ্রাণ্যেণ যথায় ॥
তদ্যম বা হসেতোব অঙ্গুরীয় দর্শনাম্ ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—এই বলিয়া হস্ত-প্রসারণ করিয়া রাজা জাল গ্রহণপূর্ব্বক যেমন দেখিলেন, তখন নৈত্র-মুণল হইতে দৃঢ়ধরিত-ধারায় অশ্রুশ্রাবণ পণ্ডিত হইল। আহুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা যথং হওয়াতে, তিনি মুচ্ছিত হইয়া তৎকথ্যং বক্তা আসন্ন করিলেন। পুরোহিত অমাত্যেরা এই ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক উদ্ভিগ্নচিত্তে রাজাকে উপাধিত ও আসনে বসাইলেন। পরে রাজা সজ্ঞাতাভ করিলেন, তাঁহার। তাহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! ও কি।

“দুঃপ্তমুণ্যং সন্ন্যাস্তং প্রেষয়ীতামলমুদ্রম্ ॥
নিপত্তিঃ স্বীকৃত্য অশ্রুশ্রাবণমুদ্রম্ ॥
প্রত্যাখ্যাত বারোহা মলমুদ্রাণ্যেণ যথায় ॥
তদ্যম বা হসেতোব অঙ্গুরীয় দর্শনাম্ ॥”

পত্রপুত্রঃ, স্বর্গপুত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

ভাবার্থ,—এই বলিয়া হস্ত-প্রসারণ করিয়া রাজা জাল গ্রহণপূর্ব্বক যেমন দেখিলেন, তখন নৈত্র-মুণল হইতে দৃঢ়ধরিত-ধারায় অশ্রুশ্রাবণ পণ্ডিত হইল। আহুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা যথং হওয়াতে, তিনি মুচ্ছিত হইয়া তৎকথ্যং বক্তা আসন্ন করিলেন। পুরোহিত অমাত্যেরা এই ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক উদ্ভিগ্নচিত্তে রাজাকে উপাধিত ও আসনে বসাইলেন। পরে রাজা সজ্ঞাতাভ করিলেন, তাঁহার। তাহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! ও কি।

“দুঃপ্তমুণ্যং সন্ন্যাস্তং প্রেষয়ীতামলমুদ্রম্ ॥
নিপত্তিঃ স্বীকৃত্য অশ্রুশ্রাবণমুদ্রম্ ॥
প্রত্যাখ্যাত বারোহা মলমুদ্রাণ্যেণ যথায় ॥
তদ্যম বা হসেতোব অঙ্গুরীয় দর্শনাম্ ॥”

তয়া বহুত্বং মাং প্রাপ্য মেম তেজো ধনয়াম।
নানুতং তত্ত্বং যৈ কিস্কিন্দৈব্যানুতং কৃতম্।
বৃণত্যাচারিণ্যামে সৈব কথাস্মৈ কথিতা।
পার্ষ্ণবেষে বর্ষণে নিরুধেঁন বিবাহিতা।
উষিতকং তয়া সাক্ষিঃ প্রতিজ্ঞাতকং মর্ষবা।
বলেন তত্ত্বগ্ৰেণে নরিতো যত্রাঃ প্রতি।
অভিজ্ঞানকং মে দন্তেন তত্ত্বদ্বাপুরীকম্।
কোমপি দেবযোগেন সর্গং তদ্বিহৃতম্ ময়া।
হস্ত পাংসু তত্ত্বং ভূরি ময়া নিরুপগুণম।
আদরপ্রসবা ভাৰ্য্যা ত্যক্তা দেবহুতপোম।
অনুকূপো ন মে ধাতা নরকায় চ নিরুতিঃ।
প্রতিজ্ঞাপূৰ্ণকং পাণিযুতী বহিনকথিতা।
শ্রীরাণি সমাপত্য স্বয়মেব কুপারিতা।
অপরুতী মহারাজ যথা কোমপি বর্জিতঃ।
তথা ময়া পুণ্ডরিকা পত্রা মাণী নিপিত্তা।
যাচমানা সৈবগ্ৰেয়াঃ দূরদেবে বিবর্জিতা।
কেনোপারসো জাতা বিদ্যাবিজ্ঞাতা সত্য।
কেনো পালিতা কভা চারুশীলা তপস্বিনী।
চিত্তান্ধেরিবায়াতা কামমপরিভূতং স্বয়ম্।
ময়া নিরাকুতা বাতা অন্তঃসভা হুগোচরা।
কলহান্নাং কানীনঃ সংপ্রদানেহুতাপিত্তা।
উন্মূলিতা ময়া তত্রী প্রসোষাস্তী নরোত্তমম্।
সংস্তাঙ্গপদেনোজায়ঃ নরচাপাতিবক্তব্য।
বচাংসি গুণসর্গাণি ব্রিহত্তি স্মৃতিনি মাম্।”

পত্রপূরণ, স্বর্গপণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

ভাবার্থ—রাজা প্রিয়মত শতশুলকে দ্বার
কর্ত্ত নার্মনিবাস ত্যাপ করিয়া, অশ্রুশ্রিত্তি-বাক্যে
কহিলেন, হস্ততাপ আমি বরারোগকে প্রত্যাখ্যান
করিয়াছি। অসুদীর্ঘ দর্শন করিয়া, তৎপ্রযুক্ত নিরতি-
শ্রম শ্রেণে উপস্থিত হইতেছে। তিনি আমার তেজ
ব্যাপ্তপূৰ্ণক আমাকে যথা বলিয়াছেন, তাহার
কিছই মিথ্যা নহে। আমিই মিথ্যা বলিয়াছি।
আমি অরণ্যে যুগা করিতে গিয়াই কণাশ্রমে গমন-
পূৰ্ণক নিরুধসংহারে গাৰ্জ্জবিলানে তাঁহাকে বিবাহ
করিয়াছিলাম এবং তাঁহার সহিত বাস ও প্রতিজ্ঞা
করিয়াছিলাম—চতুর্দশ বৎসরব্যয়ে তেমাংকে নগরে
নইয়া বাইব। অভিজ্ঞানবরপণ আমার এই অসু-
দীর্ঘ বাস করিয়াছিলাম। অনিবার্য দেবযোগবলে
তৎসমস্তই আমার স্মৃতিপত্র পরিহার কর। হায়।
নির্দয়-হৃদয় আমি শুক্লতর পাপ করিয়াছি। দেব-
হুতাসদৃশী আদর-প্রসবা ভাৰ্য্যাকে প্রত্যাখ্যান
করিয়াছি। বিবাত্য আমার প্রতি অসুত্ব হইলেন

না; নরক হইতেও আমার নিভুতি হইবে না।
সেই গম্ভীরগণি অসুগ্রহপূৰ্ণক স্বয়ং সমাপত্য
হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আমি প্রতিজ্ঞাপূৰ্ণক
পারিগ্রহণ করিয়াছিলাম। ওরূপ অস্বাভাব্য তাঁহাকে
ত্যাগ করিলাম। সেই পরমপত্রিকা, পুণ্ডরিকা মাণী
বারংবার ব্যগ্রতা-সহকারে বাচঞা করিলেন,
দূর হইতেই তাঁহাকে বর্জন করিলাম। সেই
চারুশীলা তপস্বিনী, অপরঃশ্রেষ্ঠা সেনকার গর্ভে
কত্রিঃশ্রেষ্ঠ বিদ্যাবিজ্ঞানে ওরূপে কলিয়া, দ্ব্যব-
শ্রেষ্ঠ কবের হস্তে প্রতিপালিতা হইয়াছেন। শতবার
মাঙ্গল্য চিত্তাম্বির ভায় আদরন করিবার জন্ত
স্বয়ং সমাপত্য হইয়াছিলেন। সেই হুগোচরা
অন্তঃসভা হইয়াছেন। তথাপি, আমি তাঁহাকে
প্রত্যাখ্যান করিলাম। শতদিন কলহতার ভায় অভীষ্ট
অপাধান জন্ত, উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি
তাঁহাকে উন্মূলিত করিলাম। তাঁহার গর্ভে নরো-
ত্তম পুত্রের জন্ম হইবে। সেই মর্যাপরিভ-
জ্ঞাশীলী জ্যোৎস্নাচিত্ত-লোচনে যে সকল গুণসর্গ
কথা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত স্মৃতিপত্রে সম্মিলিত
হইয়া, আমাকে অত্যাচার্য্য করিতেছে।

“এবং বিলম্বমান তৎ রাজানঃ পৌত্রেমোহব্রবীৎ।
তৎযাতং নানুশোচত সমাপস্য পরস্তপ।
করিতকং ময়া তত্ত্বং তুষ্টি তত্ত্বাঃ হুললম্।
সুদ্রপালকীণী তানি রাজী অবিতুমর্হতি।
স। হি মেনকয়া জাতা চারুশীলা মনস্বিন।
দেবীবা নামানারী তয়া রাজনং বিবাহিতা।
কিছুত্বং মহাবাচ্যং প্রত্যাখ্যাত্যতি হরি।
তৎস্তুষ্টীকে ন শোচন্তি বনস্তপঃ হতপ্রিয়ম্।
তত্ত্বং ব্যাপ্যত ব্যক্তং প্রিয়মপ্রিয়মেব বা।
যৎযাতং তস্মাতং বান্ধন নাহশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।”

পত্রপূরণ, স্বর্গপণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

ভাবার্থ—রাজা এইপ্রকার বিবাপ করিতে
লাগিলেন। পুত্রোদয়ে তাঁহাকে আমার বিদ্যা
কহিলেন, মহারাজ। আমি তৎকালে বলিয়াছিলাম,
এই দেবীরাণি নিশ্চয়ই আপনাদি ভাৰ্য্যা; ইহার
অস্বাধানা করিবেন না। প্রত্যাখ্যাননে যে ঘটনা
সংঘটিত হয়, তাহা অভাব বিষয়াবহ। তাহা
সোপরি কে না শোক করিতেছে এবং বলিতেছে,
আমিরা হস্তশ্রী হইলেন। যাহা হটক, ভাল বা
মন্দ, শ্রি বা অশ্রি, যাহা হইয়াছে, তাহা হই-
য়াছে, পণ্ডিতেরা তজ্জন্ত শোক করেন না।

উপাখ্যানে বাহা শুনিবেন, নাটকেত তাহাই

আছে। তবে বাবর ও পুলিশ-চরিত্রের পরিচয়
দিবার জন্ত হুই এখানে বহুতর প্রবেশক অব-
তারণা করিয়াছেন মাত্র। কবি বিদ্যাকের অব-
তারণায় যে বাস্তবসাম্যতা-বশস্তির পরিচয় দিয়াছেন,
ইহাশ্রমেই সে শক্তির ও কতক পরিচয় পাওয়া
মায়। মন্যভাষা-পুলিশের চরিত্র কলঙ্কশূদ্ধ নহে,
এ কথা হুই সহজ বৎসরের পুর্কের লোকও যে
বুঝিত; কবি, কৌশলে এখানে তাহাও কতক
বুঝাইয়াছেন। এইটুকু কবির কৃতিত্ব। ইহার
পর অতুল কৃতিত্ব বিরহ-ব্যাপার। অসুদীর্ঘ দর্শনে
ত্রিভুবন-বিজয়ী শিশুবিজয় মহারাজ হুগুস্ত শত-
শতাব্দ বিরহ-শোকে যে ক্রিষ্ণ কান্তর হইয়াছিলেন,
উপাখ্যানে অবশ্য তাহার বিশদ বর্ণনা হইয়াছে;
কিঞ্চ নাটকের বিশাল চিত্রপটে যে বিরহ-মুদ্রিত
জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আর ইহ-জগ-
তের কোন সাহিত্য-সংসারে নাই। উপাখ্যান
অবলম্বনীয় হইলেও,—নাটক অতুলনীয়। উপা-
খ্যান আদর্শ হইলেও,—চিত্রিত-সমাবেশে কালিদাস
অধিভূত। এখানকার “কৃতিত্ব বুঝিতে” হইলে,
“অভিজ্ঞান-শতশুলে”র বট অক্ষ সর্ষসে পৃথগ-
উদ্ভাটনা করিতে হয়। আভাসে কৃতিত্ব বুঝাইতে-
হইলেও, সংক্ষেপে কয়েকটি কথা একান্তই বলিতে
হয়। হস্তরাজ্য বাস্তবত্রে তাহা বলিবার ইচ্ছা
রহিল।

দুর্দিনের নিশীথ।

নাগ নিচোলা দিয়াছে ঢাকিয়া
বুধি ধরা আর পদনের গায়ে।
গাঢ় নোল যেন কঠিন-পদম,
আরো গাঢ় যেন তরুজলে ছায়ে। ১
যোগে কাপে যেন পুঞ্জ পুঞ্জ করা
জৌড়া করে কালো ভাঙ্গা আঁধার।
ঘমকি দাঁড়ায় নিশাচরণ,
যেন বা স্তব্ধ হেরি মে আকার। ২
গুমে গুমে যেন হৃৎকার সব
এগয়ের অধি জলিবে বলিয়া।
সহস্র ফুলিগে জলি একবারে
উঠিবে বা সারা গগন ছাইয়া। ৩

গরমাপুর্ষ, বেন বিবনম
নাহি শ্রুত কোবা তিলপরিমাপ।
স্বরণ বহুধা; একমুখি যেন
পূর্ণ এক দেহ পূর্ণ এক প্রাণ। ৪
খোর কলো মেঘে ছেয়ে দশবিধ
কালিমাধা দায়া অজয় ঢালয়ে।
করিত্ত ভাঙার হুল হুল দায়া
স্বস্তমারি যেন পাঁখা গায়ে গায়ে। ৫
“বী বী বী” শব্দ- ভরা বিশ্বময়,
জগতে একই নিম্নানের ধ্বনি!
খোরা বিভাবরী- কালজুগলী
হারাজেছে আজ শির শোভা মণি। ৬
তারকারও বিদ্যুৎ চিরায়ে ছড়িয়ে,
হুৎ গলা গগনের ভালে।
ফুলফুলহীন উপবন বেন,
পদসার যেন বজ্রবায়ুকালে। ৭
গরজে বান্দীনা সঘন হুসুরে,
ভয়ে চমকিত যামিনীর প্রাণ।
কঠোর নথরে বহুধার ছলি
আঁচড়ি কুণ্ডলি ব্যাভ ধাবমান। ৮
মাড়াসকলীন নিমিত্ত বিহগ,
নিম্ন মৌদীনা নিমিত্ত মৌদী।
জাগিয়ে দুমায় তরু মারি মারি
দাঁড়িয়ে দুমস্ত শেখরী অই। ৯
কেবল বারনা বর বর করে,
দিবা রাতি ওর কিছু নাহি ভেদ।
পাখান পীড়নে কতই না জানি
প্রাণে খোরা ওর নিদারন বেদ। ১০
ঢালে নিভাবরী ছিগ্ন করিয়া
শোকাঙ্কুর প্রাণে কতই আঁধার।
আলোবোরা হান নিভিড অরণ্যে,
নৌল সিদ্ধলক্ষ্য কত ঢালে জ্বার। ১১
হুৎ ভরা বলি এত কি প্রান্তর,
এত ধানদীর জগত-ছবি।
অহো—কি যুগ্ম! চাহিনীক যুগ্ম,
হেন ভরা হুৎ চাহিছে কবি। ১২

শ্রীশারদাস্ত্রসাদ শর্ম্মা।



শ্রীদর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।*

আমার জীবন-চরিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একপ্রবন্ধে আমি বড়লোক। আখ্যাত মাসের জন্মভূমিতে এক প্রবন্ধ—তার পর বঙ্গবাসীর সম্পাদকায় প্রস্তুত—সেই এক প্রবন্ধ—সুতরাং একপে আমি বড়লোক।

আমি বড়লোক—কেননা, অনেক ব্যক্তি আমার ঠিকানা জানিতে চাহিতেছেন ও এশাহাবাদের কোন্ পাড়ায়, কোন্ গলিতে, কোন্ ঘরে আমি

বাঁকি,—আমি এখন কি থাই, কি পিরি, কি করি,—এ সকল বিষয়ের প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্ত জয়ভূমির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি পত্র আসিয়াছে। পরে কেহ আমাকে অর্ধসাহায্যের আশা দিয়াছেন; কেহ বা আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন; কেহ বা আমাকে আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া, আমার মুখে গজ শুনিতে অভিল্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সকলকে বিনীতভাবে বলি,—আমার আর ঠিকানা জানিয়া কি করিবেন? আমি আজ এখানে, কাল এখানে—আজ এ-পাড়ায়, কাল ও-পাড়ায়—আজ এ-বাড়ীতে, কাল ও-বাড়ীতে। আমার পাকা

ঠিকানা—সেই অনন্তধাম—সেই শমন-শমন। এ ব্যসে, ইহ-মংসারে আর কাহারও সহিত আলোপ-প্রণয় করিতে প্রস্তুতি যং না। দেখে বল নাই, মনে বল নাই, মেজাজ ঠিক নাই, ক্ষুধি নাই—এখন এ ভব-বন্ধন হইতে যত শীঘ্র আমি মুক্ত হইতে পারি,—ততই আমার পক্ষে মঙ্গল। তাই নিবেশন, আমাকে কেহ পীড়াপিড়ি করিবেন না।

যাহারা এই বৌন-নরিরের দুষ্ট দেখিয়া, অর্ধ-সাহায্যে মুক্তহস্ত—তাঁহাদের আমি মহৎ জ্বলয়ের তুমুল প্রাণশ্রম করি। কিন্তু তাঁহাদের দান করিবার শক্তি থাকিলেও, আমার গ্রহণ করিবার শক্তি কৈ? দেওয়া সহজ, লওয়া কঠিন। আমার ললাট-লিপিতে বিধাতা এ সময় অর্ধেপার্জন লিখিয়া না রাখিলে ত আমি আর এখন টাকা লইতে পারিবাঁ? কেইক মরলেরই জানা উচিত—একপে আমার পোড়া শ'লমাজ পলাইবার সময় উপস্থিত। এ সময় আমার হাতে টাকা আসিলে কেন? এ দারুণ ভুগাময়ে, আমার এমন কি অভাবনীয় পূর্ণায় শক্তি আছে যে, বন্দারা আমি টাকা-গ্রহণে সমর্থ হইব? টাকাই যদি আমার হাতে আসিলে,—তবে এত টাকা—সেই অভুল বিভব—সেই বিপুল মঙ্গলি বিনষ্ট-হইবে কেন? আমি টাকার সমুদ্র দেখিয়াছিলাম,—আমি হুর্বা-প্রদারিনী কামমেহু পাইয়াছিলাম;—যদি একপে পুনরায় আমার হাতে অর্ধপম হওয়াই ঈশ্বরের অভ্যুপেক্ষ ছিল, তবে সে সমুদ্র শুধাইবে কেন,—সে কামমেহু পলাইবে কেন? বলিতে এক ছাট্টায়া যায়—তবে, কিঞ্চিদধিক এক বৎসর হইল, আমার উপযুক্ত পুত্র—মাতাইশ বৎসরের পুত্র অকালে কাশপ্রাসে পুট হইবে কেন? একদিনের একটা ঘটনা শুধুম। এই এভাবে কেন নবাবত ব্যক্তি আমার অভাব জানিয়া আমাকে কুমুদী টাকা দেন। আমি সে টাকা হাতে করিয়া লইয়াও তাঁহাকে কিরিয়া দিলাম,—বতলাম,—খাঙ্ক—এখন খাঙ্ক—আমার বিশেষ কষ্ট হইলে, আপনাদের নিকট পত্র লিখিয়া ঐ টাকা আনাইবাঁ? ধরে আসিয়া জী নিরুত ঐ গর করিলাম। জী বলাবান—বোশ—আজ যে, আমার হাতে কিছুই নাই—একটুও পণ্য নাই—যদি ওবেলা আটা আঁ বি ধরে না পাওয়া যায়, তবে সকলকে উপন্যাস করিতে হইবে।

আমি। কৈ, তুমি একদা পূর্বে আমাকে বল

নাই কেন? তোমার হাতে যে একটুও পণ্য নাই, তাহাই বা কেন করিয়া জানিব?

জী। তোমাকে সূত্রানি-পয়সার কথা বলিয়া লাভ কি?—এই জন্তই বলি নাই। আজ এমন সুযোগ ঘটিলে, জানিলে কি বলিতাম না? আচ্ছা, তুমি হাতে টাকা পাইয়া কেবল দিলে কেন? জানত, আমাদের বারমাসে অভাব।

আমি। জানি সব,—তুমি সব;—কিন্তু টাকা-ওলা হাতে লইয়া আমার বুকটা কেনম খড়স খড়স করিতে লাগিল। সে সময় কেনম যে, হুর্দুচ্চি হইল যে, হঠাৎ টাকাওলা দেখত লিলাম। সেই ভয় দোকটীও একই অপ্রকৃত বা বিরক্ত হইলেন।

দিন যেমন করিয়া হউক চলিয়া গেল। দিন কখন ঝটল থাকে না। তবে আধপেটা—পুরা পেটা—আর সিকিপেটা—এই বা তারকতা! পর দিন স্বামি সেই বাবুর বাসায় আহারাতির পর পুনরায় উপস্থিত হইলাম। ইচ্ছা ছিল,—তাঁহার নিকট হইতে টাকাওলা অন্য চোহ-কাম—বুজিয়া চাহিয়া লইব। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—বাবু নাই—কেন গুরুতর কার্য্যাহারে যে হঠাৎ যদেশ চলিয়া গিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম,—টাকা দেওয়া সহজ, কিন্তু লওয়া কঠিন।

সে যাহাউক, অর্ধ সাহায্য ছাড়া, আমাকে কেহ কেহ দেখিতে চাহিয়াছেন। সড় এবং দেবতা—এ উভয়ই দর্শনার সামগ্রী। আমি অশ্রুত-দেবতা নাই;—তবে কি আমি সড়? সকলের নিকট নিবেশন,—আমি ওরূপ ভাবে কাহারও নিকট দেখা-দিত্তে লাগিলাম না। লোকের সহিত দেখা-সাথ্য করা শুভ্র জিনিস—এবং সহজ কাজ। কিন্তু এই যে দেখানো, বা দেখাইয়া যেড়ানো বড়ই গুরুতর কর্ম্ম। আমি রমাবাই নহি যে, অমুক রাজাবাবুর মজলিশে বসিয়া মুখ-বুকে শ্রীমজপত উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। আমি মণ্ডলবাক্যও নহি যে,—সদীত-রসে লোকের মন মহাইতে সমর্থ হইব। আমাকে দেখিয়া বা আমাকে লইয়া, লোকের যে, কি হইবে তাহা আমি বুঝি না। এই কেহ হইবে মনে করিয়াছেন,—আমি একজন মন্ত-বীর। আমার মাথা আকাশে ঠিকিয়াছে, আমার পদতলে মেদিনী কাটিয়েছে—বস্ত্রত এখন ব্যাপার কিছুই নয়। হুজুর আমাকে সড়-দেবার মত

* নম্রাতি শ্রীকৃষ্ণ হুর্বাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বহুসংখ্যে তাঁহার একদমি ফটোগ্রাফ আনাইয়াছি। তাঁহার মনোজ্ঞ ফটোগ্রাফ ছিল; কিন্তু একপে এখানে কিংবা তাঁহার নিকট মজ ফটোগ্রাফ নাই। এখানে তাঁহার বৌবন স্মরণের চিত্র। বোহ ধর, বঙ্গদেশ-হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এ ফটোগ্রাফ তুলাইয়াছিলেন। এ ফটোগ্রাফ হইতে উপর তাঁহার মূর্তি খোদাই করা হইয়া আমরা এখনও তাহা অক্ষত করিলাম। জ, ম,

শেখিয়া লাভ কি? আমি কুম্ভ-জীব-কুম্ভ মাথায়।
জন্মভূমি মঙ্গলাব, কলিকাতা যুঁহাবার জন্ম
আমাকে বিশেষ অহুত্যা করিচ্ছেন;—এখন কি
শাখের পৃথক পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এখন (১৯ ই
আবাত) বড় সময়। আমি প্রাণ মাসে যাইব।
সেই সময় সকলেরই সহিত দেখা-মিলন হইবে।
বাজে কথা বুঝাইল—এখন জীবনচরিত শুদ্ধন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আবার জন্মী লইয়া পোষোষণ বাধিল।
১৮৮৩ সালের শেষে পর্বনমেন্ট হইতে এই হুকুম
আসিল, আমাদের রেজিমেন্টে ব্রহ্মদেশে যাইবে।
এই সংবাদ রেজিমেন্ট-মধ্যে প্রচার হইল। আমি
বাসায় আসিয়া মাতাকে এ সংবাদ দিলুম। তিনি
ইহা শুনিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং চাক-
রিতে ইন্তকা দিবার জন্ত আমাকে বাবাবাবু অহুরোধ
করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে নানা প্রকারে
মান্ত্বনা করিয়া বলিলাম,—ব্রহ্মদেশে গেলে আমার
ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। আমার
উন্নতির পথ রোধ করা তাঁহার উচিত নহে।
বিশেষতঃ বড় মায়েব আমাকে মাখিক বড় করেন,
যখন তাঁহার সঙ্গে বাইতেছি, তখন আর ভয়ের
কোন কারণ নাই; তিনি নিশ্চিন্তাশ্রমেই আমাকে
বিদায় দিলেন এবং আর্থসীল করলেন—আমি যুগ্ম
শরীরে দেশে প্রত্যাপন হইয়া আবার তাঁহার
স্নেহের দর্শন করিব।

কিন্তু মায়ের মন ইহাতে লাগত হইবে কেন?
তিনি চোখের জল কলিতে লাগিলেন। বিশেষ,
তখনকার (১৮৮৩ সালের) ব্রহ্মদেশে আর এখন-
কার (১৮৯১ সালের) ব্রহ্মদেশ অনেক তফাৎ।
তখন ব্রহ্মদেশ প্রকৃতই মগের দখল ছিল।—মুম্বই
পার হইয়া, তাহাকে চড়িয়া তখন অতি অল্প সংখ্যক
বাহালীরাই ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন। বাহালীর পক্ষে
এখন যেমন ইংলণ্ড, তখন তেমনি ব্রহ্মদেশে ছিল।
আরও এক কথা, আমি তখন ক্রিলাম পঞ্জাবের অন্ত-
র্গত হাসি নগরে। হাসি হইতে বাঙ্গালা দেশ তখন
‘নির্মল মঙ্গল’ নামে আদ্যা যাইত না। কারণ সে সময়
বেশপথ হয় নাই—ইটাপথে আসিতে হইত।
এখন রুটুন—হাসি হইতে ব্রহ্মদেশ ‘ভদ্রলু’।
সুতরাং মায়ের চোখে জল আসিলে না কেন?
মায়ের তখন ইচ্ছা, আমার বিবাহ দিয়া, বড় লইয়া

দূর করেন। এদিকে কোথা বিবাহের সম্ভব, ওদিকে
কোথা ব্রহ্মদেশ। কাজেই জন্মী দিশা-দিশা
হইলেন। কিন্তু এদিকে আমার দেশ-অমঙ্গলের
বাসনা বলবতী;—মগের দেশ, মগের দেশ, মগের
দেশ-সুখ, মগের রীতি-নীতি দেখিবার ও জানিবার
কল্পে আমি উৎকণ্ঠিত;—বিশেষ চাকুরী ছাড়িয়া
ঘরে নীরবে বসিয়া থাকিবই বা কিরূপে? আর
ওদিকে বড় মায়েবের অনুরোধ ব্রহ্মে। এই সব
নানা কারণে আমি ব্রহ্মে যাওয়াই স্থির করিয়া
মাতাকে অনেক বার্মা-বাহালী,—বাঙ্গালী,—জয় কি
না? আমি আবার শীঘ্র কিরিয়া আসিতেছি।
ব্রহ্মে কোন যুক্ত-বাস্তবতা নাই;—সুতরাং প্রাণের
কোন আশঙ্কা নাই। বিশেষ, পট্টনের সমস্ত সৈন্য
এবং বড় মায়েব, আমাকে লইয়া বাইবার জন্ত
বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপ মাতাকে
আমি বুঝাইলাম এবং আরও অনেক বুঝাইলেন।
অগত্যা জন্মী তখন প্রসন্ন হইলেন। এত অল্প
বয়সে আমায় একপ্রকার অদম্যত সাহস এবং বিশেষ
আত্মবিশ্বাস ইচ্ছা দ্বন্দ্বিতা বলবতী দেখিয়া—মাতা অশ্রুধার
নিম্নায়গণ হইলেন এবং অগত্যা ব্রহ্মে যাইবার
অনুমতি প্রদান করিলেন।

বিদায় প্রদান হইল, কিন্তু মন বড় ব্যাথা
হইল। মায়ের চোখের জল দেখিয়া বহু শব্দে
আমায় চোখ দিয়াও জল পড়িতে লাগিল। মা
বলিলেন,—‘বাছা, খাওয়া মাখার কখনও কষ্ট করিও
না,—মগের আচার করিও—তোমার শরীর যাহাতে
ভাল থাকে,—তাহা করিও।’ আমি মনে মনে
করিলাম,—‘মা, তোমার মত এত বড়, এত আত্মর
করিয়া বিশেষ আমাকে কে খাওয়াইবে বল?’
মুখে মাতাকে বলিলাম,—‘হী, তা ভাল-বাইবার
চেষ্টা করিব কেন?—ভাল করিয়া না বাইলে, শরীর
টিকিলে কেন?’ আমার বিবাস্য মাতা যেমন উত্তম
রন্ধন করিতে পারিতেন, তেমন উত্তম রন্ধন একান্তে
আর কেহই করিতে পারেন না। এখন ‘মহারাজ’
‘রাছোনে’, ‘গাঁসু’ ‘রাছোনে’—‘পুজারী’ ‘রাছোনে’—
বিবাস্য মানী ‘রাছোনে’—এখন আত্মর অনেক
হইয়াছে,—বড় দিগন্ত চৌকম হইয়াছে,—কিন্তু
রন্ধন বা মেরচনী হয় না। এখন রন্ধনের পুস্তক
হইয়াছে,—সেই পুস্তক পড়িয়া নব-বয়স রন্ধন শিক্ষা
করেন,—বাহাদুর হিতকরী সভায় বাসিলাপথ-পায়ে
লিখিয়া রন্ধনের পরীক্ষাও সে—তাই বলি, জাঁক-
জমক এখন অনেক হইয়াছে,—কিন্তু তেমন রন্ধনী

আর হয় না। মা আমার ইংরেজী জানিতেন না
বাহালীও জানিতেন না, কখন কোন পাক-প্রণালীর
কোভাবও পড়েন নাই, কখন কোন রন্ধনের পরীক্ষাও
দেন নাই,—‘অচ্চ’ তিনি যেমন শীঘ্র-হস্তে সহজে,
পক্ষ সময়ে, হুমিষ্ট রন্ধন করিতেন, তেমনটা আর
কেহই পারেন না। যাহা হউক, এখন আর সে
চুখ করিলে কি হইবে। সে দিন, সে কাগ পিয়াছে।

এদিকে ব্রহ্মদেশে যাইবার জন্ম রেজিমেন্টে
সর্বপ্রকার উত্তোণ আরম্ভ হইল। বাবু যখনই বহু
ব্রহ্মে বাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া দুই মাসের
ছুটির জন্ম দখলাস্ত করিলেন। তাঁহার দখলাস্ত যত্ন
হইল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সফল কাজ আমাকে
করিবার আদেশ হইল। আমি সে কাজ করিতেও
পূর্ণাঙ্গ-পদার্থ হইলাম না। বহুদূর যাত্রায় যাইবার
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যথুরায় আমার কোন
আত্মীয় থাকিতেন। আমি এই সুযোগে মাতা,
ভগিনী এবং দুইটা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার বাড়ি-
ঘাটে যথায় পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।
জয় ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের
রেজিমেন্টে ব্রহ্মে যাইবার জন্ম কলিকাতাভিষে
যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমাদের রেজিমেন্টে, হানে হানে ছটুনি
করিয় শেষে তিন মাসের মধ্যে কলিকাতায়
পর্যাবৃত্তে শিবির সমিবেশিত করিয়া তথায়
আমাদের প্রায় একমাস কাজ অবস্থান করিতে হয়।
আমাদের রেজিমেন্টে ৫৮৪ জন সওয়ার এবং চারি
জন পদব্র্হ ইংরেজ কর্মচারীও ছিলেন। ইহা বাতায়
আর অনেক সোক-লম্বারও ছিল। আমাদের কলি-
কাতায় অবস্থান-কালীন এক একবার এক একজন
হীমার আসিয়া একশত পা ততোধিক সিপাহী লইয়া
আইত। এইরূপে পঁচাব্বিশ পাচাব্বিশ জনকে
আমাদের রেজিমেন্টের অধিকাংশ লোক চলিয়া
গেল। শেষে জাহাজে প্রায় একশত জন সিপাহী
এবং সেকেন্ডারী মেকেঞ্জি সাহেব যাত্রা করেন।
এই জাহাজে আমি ছিলাম।

ব্রহ্মে যাইবার সময় হিন্দু-সিপাহীরা বড়ই বিস্মিত
বাইয়াছিল। জাহাজে জলপূর্ণ গিলে ছিল, সেই
জল তহবিলে পান করিবার কাজ হয়। হিন্দু হইয়া

সেই ছত্রিশ-জাতিপুষ্ঠ জল পান করিতে তাহার
কোন মতে পারিত হইত না। সিপাহীরাও চক্ষু-বর্জক
করিয়া একপ্রকারই বলিল,—‘আমরা কোম্পানীর পুন
খাইয়াছি মত; কোম্পানীর জন্ম প্রাণ দিতে প্রস্তুত
আছি; কিন্তু জাতি কিছুতেই দিব না। ইহার জন্ম
মহা হলুদপুত্র ডাখিয়া যায়। প্রধান সৈন্যভাষ্যকে
এ সংবাদ জ্ঞাপন করা হইল। তিনি এই আদেশ
করিলেন, হিন্দু-সিপাহীরা যাহাতে সন্তুষ্ট হয় তাহাই
দেনে করা হইল। তদনুসারে তাঁহার কৃপার দ্বারা
৭৫ বড় লাগা কিনিবার হুকুম হইল। সিপাহীরা
জাহাজের একটা প্রকোষ্ঠে পদাঙ্কনে পুত করিয়া
তাহারা আপন হস্তে ভাগীরথীর নৃত সলিল
জালাতে পূর্ণ করিয়া সেই প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিল।
আর একজন সিপাহী শমশের সেই প্রকোষ্ঠদ্বারে
পাঁহারা দিতে লাগিল। এই যোগ্যযোগের জন্ম
সকল হিন্দু-সিপাহীদের সর্বক্ষেত্রে ব্রহ্মে বাইতে
হয় এবং মুসলমান ও অজ্ঞাত সিপাহীরা অকস্মে
গিয়াছিল।

এখানে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, এখন
যেমন কোন সিপাহীকে নিযুক্ত করিতে হইলে
তাহাকে একপ্রকার শপথ করান হয় যে, সন্ধার
বাহাদুর দেখানো বাইতে বলিলেন,—‘মুম্বইর
এপার কিংবা অপর পারের ইউক—তাহা নিয়া
আপণিতে বাইতে হইবে। পূর্বে এরূপ প্রত্যা-
বন্ধ করিয়া সিপাহী নিযুক্ত করিবার নিয়ম ছিল
না। বোধ হয় পূর্বোক্ত ঘটনায় পর হইতেই
এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সে যাহা
হউক, আমরা যে জাহাজে ব্রহ্মে যাই, তাহার নাম
‘আদ্যাবা’। আমাদের জাহাজ আর একবার
পোতা পোতাতে—মদে মগলপ ছিল। সেই বাপায়ী
পোতা আমাদের জাহাজকে টানিয়া লইয়া যাইত।
আমাদের জাহাজখানি অতি একাঙা, তিন-চারি ভা
বাড়ী ভায় উচ্চ এবং তদনুরূপ প্রশস্ত। সেখানে
ছোটখাট গ্রাম বলিয়া ভ্রম হয়। জাহাজের প্রথম
তল (নিম্নতাল) আর ছোট বড় ১২৫ টা বেটেক,
তাহার সহিত সওয়ারও থাকিত। উপরে অনেক
ছোট ছোট। তাহা পদব্র্হ কর্মচারী এবং জাহা-
জের অধ্যক্ষের জাহা নিদিষ্ট ছিল। আমি বাসের
জন্ম উহার একটা কমনা পাইয়াছিলাম। পূর্বো-
ক্তাতি বাসপোতা আমাদের সৈন্যভাষ্যকে সেকেন্দ্র
সাহেব থাকিতেন।

শীমারস্ত্র ফোকের সঙ্গে আর আমাদের

জাহাজের লোকের সঙ্গে রুখা কবিবার এক উপায় ছিল। উভয় জলবান এক একখানি বেড় বা তক্তা ছিল। ঈমারের লোক, যদি আমদানের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সেই বেড়ে লিখিলে খাতিয়াসি, তাহা ঈমারের উপর ধরিত, আমদানের জাহাজের খাতিয়াসি তাহা দেখিতে পাইয়া সাংকেতিক সংবাদ দিত। উক্তর দ্বারা সময় সাংকেতিক তদন্তরূপ বেড়ে লিখিয়া খাতিয়াসির দিতে, তাহারা তদন্তরূপ দেখাইত। এইরূপে আমদানের উভয় পক্ষে তাহা হইত। বাহা হইত, যে দিনে আমদানের জাহাজ কলিকাতা পরি-
ত্যাগ করিবে, সেই দিন আমি নানা কার্যে ব্যাপ্ত ছিলাম; অন্য-সামগ্রী ক্রয় করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, কলিকাতায কোন আত্মীয়ের বাসায় গিয়া যে আহারাদি করি, সে অপ্রকাশ্য হইত না। অন্যদিকে জাহাজে উঠিলাম, জাহাজ ছাড়িয়া দিল। পূর্বেই বলিয়াছি, জাহাজের একটা প্রকোষ্ঠ আমি পাইয়াছিলাম। পাঠে আমায় সামুদ্রিক শীতা বৃষ্টি, এইরূপ সাহায্য আমাকে সর্বদা তাহা থাকিতে বলিয়াছিল; কিন্তু আমি আপনায় জিনিষপত্র কামায়া রাখিয়া ডেকের এক পার্শ্ব একখানি কাঠাসনে বসিয়া কোঁতুল পরিভ্রমণ করি। ইত্যন্ত চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি জাহাজের পটভাগে আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, এক খানি ছিন্ন তাহাতে বঁধা রহিয়াছে। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য কিছু নিকটবর্তী হইলাম। ছিপে কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। তাহারা জাহাজে সৈন্য, তপসসহায় ধর্ম্মার জন্ত কোথায় বাইতেছে। কথা-প্রসঙ্গে তাহারা জানিল, আমি তৎকাল পর্যন্ত অনায়াসে আছি। ইহা শুনিবামাত্র তাহারা আমাকে তাহাদের ছিপে আসিতে অনুরোধ করিল। আমি কাঠের সিঁড়ি দিয়া অবতীর্ণ হইলাম। সেখানে হাইবামাত্র তাহারা আপনাদের বন্ধন করিবার নাই গঙ্গাজলে যেতে করিয়া আমার হস্তদের উন্মোচন করিয়া দিল। সমস্ত দিনের পর আঁতুপ্তির সহিত আবার করিলাম। জাহাজে তাহারা বলিল, যে মনে তাহারা যন্ত খাতিয়া থাকে, তাহার নিকটবর্তী হইয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র আমি তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিতে গেলাম। অনেক সিঁড়ি উঠিয়া পটভাগ করিয়া দেখি, ছিপ-খানি প্রায় ৫০০ শত-গজ দূরে রহিয়াছে। দেখিবা-
রাত্র মন্তক তর্কিত হইতে লাগিল; চারিদিক যেন

অন্ধকার দেখিলাম। অতি কষ্টে জাহাজে উঠিয়া বিস্ময় করিতে লাগিলাম।
আমাদের জাহাজ ঘোরতর অনন্তদেশবাগিনী ভাগীরথার বিশাল বক্ষ ভেদ করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে অনন্ত-কোঁড়ায় প্রোতবিনীও যেন অনন্তসাপ-ব-সন্তা-বাগিনীকে আমদানের সঙ্গে কল-কলরবে চলিতে লাগিল। অস্বাভাবিক সত্যে আমরা ডায়মণ্ডহারবার পার হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। ইতিপূর্বে আমি যার কখন সমুদ্রে দেখি নাই। সেই গভীরদামি-জলধি-শোভা দেখিয়া, অনেকক্ষণ পড়ি রিমোহিত হইয়া রহিলাম। জগৎ-সংসারকে মলিন করিয়া দিন-মণি অন্তর্মহিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা, তিমিরা-ব-গর্ভে অব-গতি হইয়া দেখা গিল। রজনী শিশি-শোভনা ছিল বলিয়া, অধ্যাকর দৃষ্টি অতি রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমুদ্রে স্থল-বিশ্বত গভীরতম ব-ফেন উত্তাল-তরঙ্গস্রোত প্রবলগতি প্রবাহিত করিয়া অনুরোধকে প্রবাহিত। এদিকে মন্তকোপরি হ্রদীল অন্ধের মন্তকমালা-পরিমোহিত মণিকলা আপন সৌন্দর্যে আপনি বিভোর। বিভিন্ন সময়ে অস্থির বিভিন্ন শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। একদিন হঠাৎ একটা ঘোড়া বলিয়া গিয়া বড় গোল বাধাইয়াছিল। ঘোড়ার জাহাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাইয়া করিতে লাগিল। সাহসে ইয়ারি কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না। ইহার কিরূপ বিবেচনা করা গাইবে/তাহা জানিবার জন্ত আমরা বর্ত্তে গিয়া সৈন্যধ্যক্ষকে জানাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ারকে গুলি করিয়া হতুম দিলেন। একজন সিপাহী তাহাকে গুলি করিল। গুলি আঘাতে ঘোড়ার ডেকের উপর পড়িয়া গেল; কিন্তু তখনও তাহার প্রাণবায়ু বর্ধিত হইয়া নাই। তাহাকে সেই অবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ঘোড়ার ভাগিতে পড়িতে অনন্তসাপের গিয়া মিলিল। এ দৃষ্ট দেখিয়া আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইল। আর একদিন সেই তরঙ্গময় জলরাশির উপর দূরপ্রাণে একটা জলন্ত বুল-বুলগোলা হইল। জলন্ত ইতি-পূর্বে কখনও দেখি নাই। দেখিলাম, একটা বায়ুময় গুত্তাকৃতি ব্রহ্ম মেঘে মিলিত হইয়াছে। এই অন্ধিম দৃষ্ট দেখিয়া, আমরা ক্রিষ্ণ-ব্রহ্ম উভয় হইয়া রহিলাম। অতি দ্বারা এ সংবাদ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেওয়া হইল, তিনি ইহা বিশিষ্টরূপে

অবগোকন করিয়া জলপ্তস্তের উদ্দেশে কামান ছুড়িতে বলিলেন। কামানের গোলা লাগিয়া জল-প্তস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তাহার পর আর কিছুই দেখা গেল না। এইরূপে বিশ্বপতির বিশ্বকার্য ইহারেই কামানে পরাস্ত হইল। আমি আমাদের জাহাজের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জলপ্তস্তে গোলা মারিয়া কি লাভ হইবে? তিনি হামিয়া বলিলেন, ঐ জলপ্তস্ত আমাদের জাহাজ অন্যায়সে বিপর্যাস্ত করিয়া দিতে পারিত। আমি শুনিয়া বড়ই আশ্চর্যগত হইলাম। জলপ্তস্তের যে এক সন্ধ্যা আছে, তাহা আমি পূর্বে জানিতাম না। আর একদিন সমুদ্রে সামান্য ঝড় উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। ইহা ব্যতীত আর আমরা কোনরূপ আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত-প্রসিদ্ধিত হই নাই।

সমুদ্রপোত যখন হোমিতে দুলিতে ঘোরতর বারিধ-বন্ধ বিপরীত করিয়া বাইতেছিল, তখন ঝাঁক ঝাঁক উড়ান মন্ত একস্থান হইতে উড়িয়া অপর স্থানে বাইতেছিল। বর বর শব্দে জাহাজের ঢাকা জল কাটয়া বাইতেছিল, তাহাতে স্তূর্য্যরশ্মি পড়িত হওয়াতে মত সূর্য্য-মণি-মুক্ত-প্রভালাগা সমুদ্র হইয়া বারিধিতে-আবার বিলীন হইতে লাগিল। এই সন্ধ্যা নানোভিদ্ভা শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা ১১ দিনেই বেগেই পৌঁছিলাম। সেখানে আমাদের ১০১৫ দিন অপেক্ষা করিতে হইল। তাহার পর ছোট ঈমারে ছোট জাহাজ বর্মিয়া ইরানবী নদী দিয়া গিয়া ব্রহ্মদেশের বিঘেট মউ নামক স্থানে শিবির সারিবেশিত করা হইল। ইতিপূর্বে মগের মুসুরের নাম খ্যাত ভূমিাছিল। কখন দেখি নাই, কখন আমিও নাই; এখানেই সন্ধ্যা ক্রিমি নৃত্য, সন্ধ্যা বিহুই আমার প্রপরিচিত। কিন্তু যথের বিষয় এই, সেখানে দার্পণ করিবামাত্র কোমর-নিবাসী ত্রিহু বানু কুম্ভনাথ বন্যোপাধায়ের সহিত অনন্তর হইল। তিনি সেখানে কিসেরবিগেট-স্টেশনে গোমস্তা ছিলেন। কোন বাদাশী সেখানে গেলে তিনি অতি সন্ধ্যে তাহাকে আপনায় বাড়ীতে আনিবেন। আমিও তাহার বাড়ীতে অতি সাধারণ গৃহীত হইলাম।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজ প্রায় ৩৭ বৎসর অতীত হইল, আমি ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলাম। সে দেশের চাল, চলন, রীতি, রীতি বাহা-তখন দেখিয়াছিলাম, তাহার অভাস এখানে দিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ব্রহ্মদেশবাসীদের বস্ত্রাধি-পরিধান-প্রথা কিছু আশ্চর্যজনক, দেখিলে হাত সংবরণ করিতে পারা যায় না। পুরুষদের দুটির পরিসর প্রায় ২ ফুট আর নারী ১২-১৬ হাত। ঐ বৃত্তিকে তাহারা 'পুচ্ছা' বলে। সেই পুচ্ছা নরীয়া প্রথমে কোমরে একটা গ্রন্থি বা গাঁট দেয়, তাহার-পর এক ফের তাহাতে জড়াইয়া সমুদ্র কাপড় সসংগৃহ একটা পুঁটল করিয়া বঁধিয়া রাখে। অবশ্য ইহা দেখিতে কিরূপ হাজোদোপন, তাহা মহাজেই অরুণেদ্য মগেরা উক্ত পুঁটল অত্যন্ত ভাল বাসে। ইহাদের জাহ হইতে কাটদেশ পর্যন্ত উন্নি-চিহ্নিত। উক্তির একরূপ শন-সারিবেশিত যে, যদি কেহ উল্লম্ব হইয়া থাকে, তাহা হইলে দূর হইতে এক-
গোথ হইবে যে, সে নীলবস্ত্রের জাম্বিয়া পরিয়া রহিয়াছে। উক্ত উক্ত দ্বারা তাহারা নানা প্রকার বস্ত্র-জজ্ঞাতে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের এক-জনকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিল 'এই বস্ত্র থাকিলে মাগে কামায়া না, এ বস্ত্র থাকিলে কলমদ্য হয়, এ বস্ত্র থাকিলে অমিতে দাহ হইবে না।' এই প্রশ্নার বহুবির ভিত্তি আশ্চর্য। আমার ভিত্তি ভিত্তি রূচি অনুসারে উক্ত বিভিন্ন রঙ্গের আছে। কাহার বা কল, কাহার বা নীলবস্ত্রের উক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে নীল বস্ত্রের উক্ত-অধিক। মগেরা যে কেবল জজ্ঞাতেই উক্ত পক্ষে এমন নহে। অনেক আবার হাতে বস্ত্র-বস্ত্রও পরিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আর একটা প্রথা বলিয়া। ইহারা গোপা দাড়ি রাধিতে বড়ই অনিচ্ছুক। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, সেই গোপা দাড়ি উঠিতে লাগিল, অমনি তাহারা সোমো দিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। কয়েকই গোপা দাড়ি আর উঠিতে পারা না। হস্তাং পুরুষের মুখ রমণী-মুখের জায় দেখা হয়। তবে এমন কথা বলিতে না যে, পুরুষ মাতেরই গোপা দাড়ি উঠে। তাহাদের মধ্যে যদি শতকরা দুই এক জন শাশ্রল হইল, তাহা হইলে যথেষ্ট হইল বলিতে হইবে। এদিকে আবার পুরুষেরা স্ত্রীলোকের স্ত্রী মাধার্য দীর্ঘ বেশ রাখে-এই তাহাদের চুলের

প্রতি বরও অসামান্য। সর্বদাই চুলগুলিকে পরি-
কার রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এক্ষণ দেখা
গিয়াছে যে, বহি ক্রমের মণ অতি দুরবস্থায় হয়,
তাহা হইলে আশ্রমের আহার স্কুলে রাখা গিয়া ২৩
টাকা আসে। অবশ্য ভাল হইলে তাহার পরিমাণ
করে। পুরুষেরা মাথার চুল একধানি ৩৪ হাত
বুকমণ্ডলনের ঢাকর দ্বারা মাথার চরিত্রিকে একত
করিয়া রাখে। ঐ চারের নাম 'পাঁও বাঁও'।
তাহাদের চুল কবরীর আঁঠু রাখা থাকে না,—খোলাই
থাকে।

তন্মধ্যে জীণোবদের পরিষেব রত্নের নাম 'খমি'।
সে কাপড় অধিকাংশই যেসময়ের হইয়া থাকে।
তাহাদের কাপড় পরিবার রীতি এইরূপ,—তাহারা
দিনও কাপড় লাগে, প্রথম এবং শেষ খণ্ড লাল
কিন্তু বেঁকানো রঙ্গের মালুর, আর মধ্যের খণ্ড বেগ-
মের হয়। এই তিনখণ্ড কাপড় একত্র গোলাই
করিয়া তাহার পরিমাণ করিয়া থাকে। একটী
সন্ধান হইলে, বুক ফের গিয়া কাপড় পরে না, ক্ষতীর
কাপড় পূর্ণকৃত রাখে। তখন হইতে তাহাদের
বন্ধন অনুভব হইতে থাকে। কেহ কেহ মেরজাই পরে।
তাহার দ্বারা কিছু বড় রাখে, এমন কি, হাত হইতে
এক বিস্তৃতি স্থলিতে থাকে। জীণোকদের মধ্যে
লজ্জা-সময় কিছুই নাই; জীর, স্বামীকে দেখিয়া লজ্জা
নাই, ভায়ে-ভাইবৎ এক ভাবে গিয়া কথাবাদী
কহিতেছে, মাথার কাপড় গিয়া লজ্জা-নিবারণের
প্রয়োজন হয় না। সবই একাকার। জীণোকদের
কবরী পশ্চাদ্ভিকের দ্বারা থাকে। তাহাদের বাহার
নিবার লজ্জা সপুল্প ভাল গুঁজিয়া দেওয়া হয় এবং
এক একখানি রঙ্গিণ যেসময়ের বা স্ত্রীর কমালা হাতে
কিন্তু গলায় বাঁধিয়া ব্রহ্ম-রঙ্গিণীরা বাহার গিয়া
থাকে।

এ দেশে বাজ্য সামগ্রী অধিকশই পাওয়া যায়।
কিছু ব্রহ্ম-বাসীদের আহার অতি ক্ষুদ্র। তাহারা
মৎস্যের পচহিয়া কাঁদার ছাত্র করে, তাহাকে তাহারা
"নপি" বলে। ইহাও এরূপ ভয়ানক দুর্বল যে, মাতৃ-
দুহ পর্বতস্থ হইয়া যায়, কিন্তু মৎস্যের নিকট
এই "নপি" অতি উপানের খাবা বলিয়া পরিগণিত।
ইহারা সমগ্রার পরিবর্তে এই "নপি", সমস্ত তর-
কারিভে গিয়া থাকে। আম, ভাজ, কাঁঠাল, বীশ
এবং আরও নানাপ্রকারের পাতের কচি কচি পাতা
লইয়া দিয়া করে। শিঙ হইলে লণ এবং নবির
শোলা দিয়া অতি উৎকৃষ্ট আহার্য প্রস্তুত করে।

মণেরের অভক্ষ্য কিছুই নাই। এমন পক্ষী
নাই যে, তাহার মাথার মাংস ধায় না এবং
এমন লালচর বা লালচর কীর্ণ নাই যে, বাহানের
মাংসে তাহার কীর্ণলান্দ তৃপ্ত না করে। হাতী,
ঘোড়া, উট, গাধা, শূকর, গো, মেষ, মহিষ;
যত প্রকার জন্ত, বিব্রষ্টতা স্বজন করিয়াছেন, তাহা
বোধ হয়, এই মণেরের বাহ্যের ক্রমই হইয়াছিল।
নবীরা অস্বিত্ত হইয়া, বাহা হউক, তাহার দ্বারা
পাইলে আর মারিয়া বাইতে চাহে না। আমাদের
বেকিমেন্টে বোয়োর পীড়া হইয়া প্রায় প্রত্যহই
২৪টী করিয়া কীর্ণলান্দে বিক্রিত লাগিল। ওলিকে
প্রাতঃকাল হইয়ামাত্র দেখি, প্রায় ২০০ শত মানস-
গোপুল মণ, দা হাতে করিয়া দরদারালার নিকট
বসিয়া আছে। ঘোড়া আশ্রমল হইতে ফেলিয়া
নিষায়াত তাহার দুলে টানিয়া লইয়া গিয়া কাটাও
দ্বারা খণ্ড খণ্ড করত আশ্রমের মধ্যে ভাগ করিয়া
লইত। কখন কখন কমিসেয়িটের হাতী বা
হয়ল মণিলে তাহার উৎকৃষ্টই বিভাধ করিয়া লইত।
তাহারা যদি সাপ পাইত, তাহা হইলে তাহার মাথা
কাটায়া আশ্রমে পোড়াইয়া উল্লসং করিত। মণেরা
অতিময় অম-প্রিয়, রুটি কাহাকে বলে, তাহা জানিত
ন। আমি যখন ছিলাম, তখন বেশিকাছি,—তাহারা
অতি প্রত্যয়ে, সূচ্যেয়া হইতে না হইতই এক
ইন্ডি ভাতও অল্প ইন্ডিভে পাতার বেগ লাগে।
গালাব কলাই করা কাঠের পাণে সেই ভাত মন্দি-
রের ছায় বেছে, কয়েকটী কাঁচের বাটিতে নানাপ্রকার
পাতার বেগে ধানের চিত্রিত রাখিয়া ভাতের দুধ-
মুগা, দুধক-মুগা, পুত্ৰ-কম্বা তাহার চতুর্দিকে থিরিয়া
আহার করিতে বসে। আমি হিন্দু এবং আমাদের
মেশের প্রথা অতি স্বতন্ত্র, স্ত্রীরও এ দৃষ্ট আহার
ভাল লাগিত না। ইহার গানও সুপারি, বাইতে
অতিশয় ভাল বসে।

ব্রহ্মদেশ-বাসীদের বর-বাড়ী তখন বীশ এবং
বাসের দ্বারা ই নিমিত্ত দেখিয়াছিল। বহুর
মধ্যে অতিশয় সিল্প বলিয়া তাহারা মন্ত বা মাচার
উপর শয়ন করিত। একধানি বড় ঘরে পিতা-
মাতা, পুত্র-পুত্রব্য, ভাতা-ভাতব্য একত্র শয়ন করে;
কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী অতি পুত্ৰ
মশারি দ্বারা বধ্যমান থাকে। মশারি ও পুত্ৰ এক
কোন কাহাকেও দেখিতে পায় না, সেগুলি এক
একটী প্রকাণ্ড বলিয়াই বোধ হয়। তাহাদের
পিতল-কাঁসার তৈজস পাত, নির্দুর্ক-বাসা কিছুই

নাই। আসবাবের মধ্যে কেবল এক একটী মোটা
কাপড়ের বলা গলদেশে বোধান থাকে শূন্য
কম্বা তাহা বিছানায় রাখিয়া নিভা যায়। স্ত্রীর
তাহাদের চোর" ডাকহইতে বিশেষ ভয় নাই।
যা। হউক, তাহার বাসের স্বরগুলি এত সন্নিকটে
কম্বা যে, একধানি ঘরে আশ্রম গাণিলে সকল
বরগুলি পুড়িয়া যায়। ঘরে আশ্রম লম্বিলে
মণেরের ভয়ের বা ভাবনার মধ্যে কারণ নাই।
যে আশ্রম গাণিলামতে সেই মহাশয় অসুপার
বলা এবং মশারিট লইয়া তাহার বাহিরে বৈশা-
নদের রঙ্গ দেখিয়া হারিতে থাকে। দেখিতে
দেখিতে বাসের বুর একবাহের ভয়ময়্য হইয়া যায়,
কোন প্রকার চিহ্ন থাকে না। দুই চারি দিবস
পরে দেখিবে, তাহার পুস্তের ছায় আবার বাসের
নতন বর-বাড়ী নির্মাণ করিয়া গাণিতেছে।

ব্রহ্মদেশে জীবাধীনতা যথেষ্ট আছে। অধি-
কাংশে কীর্ণলান্দেই সম্পাদন করিয়া থাকে।
বাহুরে ভ্রম-মামরী ক্রম-বিভিন্ন তাহারাই করে,
আর পুরুষেরা মজুরী করে। আমি যে সময়ে
গিয়াছিলাম, ঊন হু, টাকার ৪ পাঁচি পাতা
বাইত। যে দেশে গাভী অনেক, কিন্তু দুগ্ধ-দোহন-
পদ্ধতি তাহার অগণত ছিল না। মণিপুর হইতে
কয়েক জন ময়রা গিয়াছিল, তাহারা দুই ঘোহন
এবং শিষ্টায় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। মণেরা
হুতকে যে, বাগীর নাই কথা করত, একা আমি
তনিয়াছিল। এক দিন কতকগুলি মণ-কুলী
আমাদের বাসায় কাজ করিতেছিল। আমি কৌতু-
ক্যের জন্ত একটুই খি অনিয়া একজন কুলীর
নাকে লাগাইয়া দিলাম, সে তৎক্ষণাৎ "তে নালে, তে
নালে" (বড় দুর্বল) বলিয়া উঠিল এবং নাজানিকি
দুর্ভিক্ষয় জিনিস তাহার গান কে দেখতা হইয়াছে।
একপ্র ভাব প্রকাশ করিয়া নামিকা বার বার ঘোত
করিতে এবং মুখিয়া ফেলিতে লাগিল। অতি দুর্ভিক্ষয়
শিপি" বাহাদের উৎকৃষ্ট আহার্য, তাহাদের নিকট
দুস্তের দ্রষ্টব্য অবমাননা দেখিয়া হুজ মৎস্যের করিতে
পারিলাম। তাহদের পর, আমি তাহাকে
একটুই পরিচায়ক হইয়া বাহারি জন্ত ইচ্ছিত
করিলাম। সে ভাবিল, অন্য আমি আবার রক্ত
নত কোন ভয় অনিয়া থাকিব, এজন্য সে তাহা
বাইতে কোন মন্ত গম্যত হইল না। শেষে যখন
আমি কোর করিয়া তাহার মুখে চিনি দেখান
দিলাম, সে তাহার খাদ পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া

আরও থাকিতে চাহিল এবং বলিল যে, ইহা তাহার
জীবনেও কখন যায় নাই। আমি যে সময়ে তদীয়
গিয়াছিলাম, তখন তদীয় ভ্রাতার ওড় ভিন্ন আর
কোন প্রকার শিল্প ক্রম পাতা বাইত না।

সম্পন্ন পরিচ্ছেদ।

আমি প্রায় সর্বদাই ইরাবতী নদীর তীরে
ডেড়াইতে গাইতাম, কখন বা পার হইয়া আর
পারেও গাইতাম। সেখানে লঙ্গনের দুগ্ধ অতি
রমণীয়, অতি শোভাময় অতি চিত্তামোদী।
দেখিলে নদন এবং মন তৃপ্তি লাভ করে, প্রুপ্রশস্ত
জঙ্গনের ভূভাগে ছোট ছোট সমগ্রির কতই পুশ-
দুশ, মাটি হইতে ৩৪ ইঞ্চি উচ্চ, তাহাতে অধিক
পাতা নাই, কেবল শুষ্কক প্তবকে মনোহর পুপ
সকল প্রকৃষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। দেখিলে বোধ
হয়, বৃক্ষদ্বার অশ্রু বহুদুঃখবিশ্রুত নানা বর্ষের
গালিতা বিজাইয়া দিয়াছে, আর শোভাময় বহুমতী
একল ফুলফালায় শমন করিয়া দাখিতেছে। ব্রহ্ম
নানা স্থানে উচ্চ নিরেট মন্দির (Pagoda) দেখিতে
পাওয়া বাইত। অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে
শোভা নদন করা হইয়াছে। তাহার ভিতর
হইতে মোহার বা লঙ্গার বুদ্ধদেবের মূর্তি পাওয়া
গিয়াছে। আমার বোধ হয়, সুপরিচয় নবির নির্মাণ
করিবার সময় এক একটী মূর্তি হুত তাহা গাথিয়া
যায়। আমি সেখানে অতি আশ্চর্য একটী মন্দির
দেখিয়াছিলাম। তাহার নাম এক্ষণে আমার চিত্ত
খণ্ডে নাই, বোধ হয় সন্ধ্যাসংকে। কিহা মাতোভেও
হইবে। তাহার নির্মাণকৌশল অতি বিচিত্র
এবং আশ্চর্যজনক। মন্দিরটি অতি উচ্চ; তাহার
চারি দিকে প্রুপ্রশস্ত রোয়াক, তাহার উপর এই
মন্দিরটি নিমিত্ত। সেই রোয়াকের উপর উঠিতে
প্রায় ৩০০ টা পিঁড়ি আছে। সিঁড়ি আকৃষ্ট কাঠের
শৃঙ্গের উপর বসিত। শৃঙ্গগুলি অতি সুন্দর মোহা-
নীয়া কাজকরা। মন্দিরটি যে কষ্ট উচ্চ, সে কথা
বিশ্বাস প্রয়োজন নাই। তবে তাহার রোয়াক এত
উচ্চ যে, তাহার উপর হইতে নির্মাণে দুষ্টিনিম্পেক
করিলে মন্তক সুর্য্যি হয়। উচ্চ মন্দিরে যে অতি
ইহালাকার বস্তু আছে। একপ্রকার বস্তু আমরা
জীবনে কখন দেখি নাই। বস্তুটির আশ্রিত এত
শুভ যে, তাহার ভিতর ৪ জন লোকের ঘান
অন্যায়সে হইতে পারে এবং ২০২২ জন লোক

হাতাহাতি করিয়া ধরিলে তাহার আয়তন পায় না। স্বাভাৱি প্রায় ৭৫ ইঞ্চি পুরু এবং বোহা হয় ৫০/৬০ মণ কিংবা ততোধিক ভারী হইবে। আমি যেদিন এই বলির দেখিতে যাই, সেদিন আমার সঙ্গে একজন সওয়ারি বায়, তাহার সঙ্গে তাম্বুর খোঁটা বাঁধার একটা মুতুর ছিল। সেই মুতুরের দ্বারা স্বাভাৱি আঘাত করিতে এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ হয় যে, তাহাতে আমার কণ্ঠ একেবারে যেন বধির হইয়া গিয়াছিল। সেখানে আরও একটা অপেক্ষাকৃত ছোট স্বাভাৱি ছিল। ইহারেও তাহা লইয়া বাইবার জন্য বিশ্বর চেঁচা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই স্তম্ভকর্তৃ হইতে পারেন নাই। স্বাভাৱি জাহাজে উঠিবার জন্য কপিলক লাপান হইয়াছিল, উঠিবার জন্য কপিলক বল প্রয়োগ করিলে জাহাজের একদিক নামিয়া বসিয়া গেলেন, তথাপি স্বাভাৱি একদিক হইতে উত্তিত হইল না। নদীতীরে একটা শিলার স্বাভাৱি টাঙ্গান ছিল, তাহা ভাঙিয়া দেওয়াতে নদীর ধারে পড়িয়া যায়, সেটাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য হাতী পর্যন্ত নিয়োজিত করা হইয়াছিল, তথাপি তাহার কিছুই করিতে পারে নাই। মনোবের মধ্যে একটা প্রবান আছে যে, নদীশ্রম সময়ে মন্দিরের চুড়ার কখন কখন আলো জলিয়া থাকে। তাহা যে, কোথা হইতে এবং কি প্রকারে হয়, তাহার বিবরণ নাই। যাহা উদ্ভট গভীর রাত্রে মন্দির-চূড়ার আলো জলিয়াছে, এ কথা দৃষ্টি হইয়াবাত্র মনোব গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মন্দিরদেহে মূখ করিয়া দ্বিধরোপ-সন্ম করিতে থাকে।

ওরফেশে বিবাহের প্রথা আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। অধিকাংশ স্থলে পিতা-মাতাকে রাজি করিয়া কিছু অর্থ দিলে, তাহারা তাহাদের কন্যাদের অর্পণের হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে। আমার জীলাকোবা ইচ্ছা করিলে পুর্ন্থ খমাকে উপাধৃত অর্থ দিয়া পুন্থের পিতা-মাতার নিকট আনিতে পারে। আমাদের রেজিমেন্টে প্রায় দুই শত সওয়ারি উরুচুপ মণ-রমণীকে জয় করিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকের আবার সন্মানাঙ্ক হইয়াছিল। কিন্তু এদেশে আসিবার সময় তাহারা অপর-অপর পিতা-মাতার নিকট চলিয়া গেল। আর রেজিমেন্টে এরূপ হইয়া গিয়াছিল। যে, কেহই ওরফেশের জীলাক সঙ্গে লইয়া বাইতে পারিলে না; হুতরা ইচ্ছা থাকিলেও কেবল মণ-রমণীকে লইয়া বাইতে পারে নাই। কেবল রোসাল-

দার নিজাম বাঁ মাহেবদের অনেক বলিয়া করিয়া একটা জীলাক লইয়া যাঁতে পারিয়াছিল। ত্রিশ বড় বড় খোড়া দেখিতে পাই নাই; ছোট ছোট টাউ Pony খোড়াই অধিক। এ সকল খোড়া এত ভ্রুত-গতিতে কখনো যায় যে, আমাদের খোড়া সৌভাগ্যে তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারে না। ওরফেশ হইতে আসিবার সময় আমি দুইটা খোড়া জয় করিয়া আনিয়াছিলাম। একটার মূল্য ৮০০, অপরটার ১২০০ টাকা। ত্রিশে যে খোড়াটা ৮০০ টাকা জয় জয় করিয়া আনিয়াছিলাম, বেনারস কলেজের অধ্যাপক জেম্‌স বার্ট ষ্যালেনটাইন এল, এল, ডি, মায়েবেকে ৭০০০ টাকায় সেটাকে বিক্রয় করি। অপরটা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছিলাম। বাক্সবানের সঙ্গের এবং গানালের এই খোড়ার দাম চারিহাজার টাকা দিতে দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তখন তাহাদের দিতে সম্মত হই নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষে সিপাহী বিদ্রোহের সময় একজন বিদ্রোহী, সিপাহী আমার বাড়ী লুণ্ঠনের সময় সে খোড়াটা লইয়া প্রস্থান করে।

ওরফেশে অবশ্য-কালীন আমি একদিন ইরানী নদীর তীরে কষ্টম-কলেজের লো মায়েবের আফিসে গিয়াছিলাম। টেবিলের উপর কতগুলি হুঁয়ারের বহি পড়িয়াছিল। আমি দুই একখানি লই বেগিয়া হাঁজ সম্ভরণ করিতে পারিলাম না। সে মায়েবের কাছে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমার হামিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম। হুঁয়ারের বহিতে মিল নাই, ভ্রমে পরিপূর্ণ। মায়েব নিজে আসিয়া সেই সকল বহি বেগিয়া বলিলেন,—সত্য বটে, হুঁয়ারে সব ভুল রহিয়াছে। তখনস্তর মায়েব প্রামাকে বলিলেন,—ব্যস্ত। যদি তুমি এখানে আসিয়া প্রত্যহ এক স্বাভাৱি করিয়া এই সকল হুঁয়ার দেখ, তাহা হইলে আমি তোমাকে মাসিক ২০০০ শত টাকা করিয়া দিতে সম্মত আছি। মায়েবের এ অহুসার আমি যে, অতি মন্তোবের সহিত রক্ষা করিয়াছিলাম, এ কথা বলাই বাহুল্য। এইরূপে ত্রিশে আসিয়া আমি মাসিক ৩৬৫ টাকা পাইতে লাগিলাম। ১৮৬৬ সালে আমাদের রেজি-মেন্টকে ওরফেশে পরিভ্রমণ করিতে আদেশ হইল। এবার আমাদের তানপুর্ণ-পর্ণ পড়িয়া আসিতে গেল। অবধারিত সময়ে আমরা কলিকাতা আসিয়া উপনীত হইলাম; তথা হইতে বারাকপুর যাইতে হয়। তথায় প্রায় ২৫ মাস অবস্থান করিলে পর পুনরায় আমরা হুলতানপুরে যাইবার আদেশ

পাইলাম। হুলতানপুরে আমরা তিন-চারি মাস থাকি। এই সময়ে আমি বেনারসে আসিয়া প্রথম দ্বারপরগ্রহ করি। রেজিমেন্টে এখানে অধিক দিন থাকিতে না ধর্মকর্তে, আমাদের বেরিলী ব্যবহার হইয়া যায়। ১৮৬৬ সালে বেনেশ্বর মাসে উক্ত স্থানে উপস্থিত হই; সেখানে প্রায় তিন বৎসরের জন্য ছাউনি করিতে হয়।

চাতকী।

যায় চাতকিনা, চায় মুখ পানে,
পায় হুতানে, যেরে ফুয়প্রাণে,
নবন ধ্যানে ধ্যানে।
কিরে পাপলিনী নীরে না চালা লো।
আমি-বলি নুক ধরি ধার,
(নেত্র) ককু মনে পুড়ি পড়িয়ে তাহার।
তত চায় বারি স্বধার-বাইর,
কাতর-প্রাণে সে ভবিষ্য নারী।
মরম-মায়েব নিমিষিমে জলি,
কুণাই তাপে, হৃদি-ফুল-কলি,
মায়েব জলবে "জলবে" বলি।
চাতকী যায়, পাছে না চায়,
ধায় উড়াই হইয়ে যায়।
"দে ফটিক জল", বলে সে কেবল,
কাতরে কোমল গল পায়।
ফাটয়ে হৃদি মধু ছড়ায়।
চাহে চাতকী প্রেমিকি ধার,
যেরে ঘরে সে পাপলী পারা,
আকুলী ব্যাকুলী কতরে তার।
আপনা ধার, পূর্বে মাতার।

নব নীরবে কি শুণ জানে,
কনি শুনি ধার মানা না যানে।

শ্রীকদারনাথ চৌধুরী।

এ এক নূতন খেলা।

(১)
আমি বলি বলি বলি—এ এক নূতন খেলা।
রেখে যে তোর 'চৌ প্রাঙ্গণি',
সারা দিনে অই খেলিষি থাকি,
মাতার 'বেহন' মজার জাত-হাত হইয়ে ফেলা।

পুতুল টুতল রেখে গিয়ে,
চল বহুলের বনে গিয়ে,
"বৌ-বৌ, বৌ" খেলি মোরা ফুল সন্ধ্যাবেলা।
আমি বলি বলি বলি—এ এক নূতন খেলা।

(২)
আমি বলি বলি বলি—এ এক নূতন খেলা।
"নৌ ভাই তুমি-ছুই বড়,
কীচল টেনে আঁচল কর,
তোমার কেবল যেমতী গুলে উল্লা ক'রে ফেলা।"
চুপ চুপ চুপ—কসনে কারো,—এ এক নূতন খেলা।

(৩)
আমি বলি বলি বলি—এ এক নূতন খেলা।
"না—না, আমি তোমার সনে,—
ধাব না আর বহুল-বনে,
চোখে মুখে হুকি হুকি ফুল দে-মার ডেলা।"
চুপ চুপ চুপ—কসনে কারো,—এ এক নূতন খেলা।

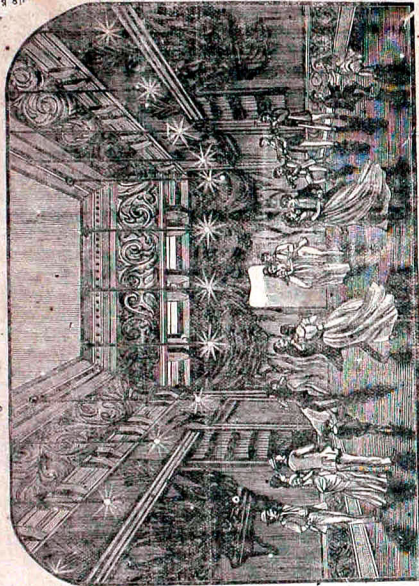
(৪)
আমি বলি বলি বলি—এ এক নূতন খেলা।
"তোমার কেবল হুয় বোঁজা,
কাশে গোঁজা—বৌপায় গোঁজা,
আমি অমন হইতে নারি ফুলের বোঁকা—মেলা।"
চুপ চুপ চুপ—কসনে কারো,—এ এক নূতন খেলা।

(৫)
আমি বলি বলি বলি—এ এক নূতন খেলা।
"তোমার সনে গেলে, ছাই,
সকাল আভাতে জলে ছাই,
তুমি ত ভাই নাহি জানি দিলির কেমন বলা।"
চুপ চুপ চুপ—কসনে কারো,—এ এক নূতন খেলা।

(৬)
আমি বলি বলি বলি—এ এক নূতন খেলা।
"তুমি কেবল বনে যেয়ে,
মুখের পানে থাক চেয়ে,
লজ্জা করে,—আর যাবনা নিভি সন্ধ্যাবেলা।"
চুপ চুপ চুপ—কসনে কারো,—এ এক নূতন খেলা।

(৭)
আমি বলি বলি বলি—এ এক নূতন খেলা।
"তুমি বড় লম্বাছাড়া,
ছেড়ে দেওনা খাড়া খাড়া,
আঁচল করে বহুল পাছে ফেলিষি ডাকে মেলা।"
চুপ চুপ চুপ—কসনে কারো,—এ এক নূতন খেলা।

হাতাহাতি করিয়া
শকটী প্রায় ৪০
মণ কিংবা
এই



সাহেব বিবিদের সাধারণ বল-নাচ।

প্রোত ও পরী।

(মাহাত্ম্যে সম্বন্ধে)

ত্রিহরি স্মরণ করিয়া প্রোত ও পরীর পবিত্র নৃত্য পুনঃ কর্তন করিব। গান্ধী প্রভৃতা প্রতিবাদ প্রস্তুত করিবে, করুন; কিন্তু পুনরুজ্জ্বলিত পাপ গ্রহণ করিবেন না। সত্য মিথ্যা জানি না, সমা-
চোচনাও কিছু করিব না; সংবাদ-ম্বাহক—কেবল
সংবাদ বহন করিব।

শাস্ত্র-বিস্কন্ধ হয়, পাপী সাহেবেরা প্রতিবাদ
করুন। হিন্দু—উপনিষদ শাস্ত্রি, কিছুই জানি না।

অতএব প্রতিবাদ করি না; সাহস করিয়া সমর্থনও
করি না; আশঙ্কা উভয় দিকই করি।

যেটা যে দেশের দেশাচার, সেটা সে দেশে
সম্পূর্ণা পালনীয়ই হইয়া থাকে। তাহার প্রতিবাদ
করা বুঝা; তাহাতে উপহাস করা অস্বাভাবিক। যেটা
যে দেশের দেশাচার, সেটা অজ্ঞ দেশে হাতকর,
দুখা ও লজ্জাকর হইলেও, সে দেশে সর্পিতভাবে
এবং যোগ জানা-রকমে বশুভীকৃত—তাঁহার সম্মান
করাই নিম্ননীয় এবং সেহাত অসামাজিক। সাহেব-
দের সমাজে এমনতর অনেক রীতি আছে, যাঁহা
আমাদের চক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর; পক্ষান্তরে আমা-
দের সমাজেও হয় ত এমনতর কত ব্যাপার থাকিতে

পারে, যাঁহা সাহেবদের চক্ষে নেহাত (নাংরা)।
অতএব সামাজিক বিষয়ে উভয়েরই পরস্পরের প্রতি
সম্মত-চিত্ত হওয়া উচিত। একের দেশাচার বা
জাতীয় ব্যবহার দেখিয়া অন্যদের উপহাস করার
অধিকার নাই; দেশাচারে হস্তক্ষেপ করাও দূরের
কথা। কিন্তু সাহেবেরা সেটা বড় বুঝেন বলিয়া বোধ
হয় না। তাঁহাদের নিকট অস্ত্রের যাঁহা কিছু, সম্বই
অসভ্য এবং আপনাদের নিজেদের যাঁহা কিছু সম্বই
হুমত; সাহেবিক মানন-প্রকৃতি ইহা একটা
প্রধান দোষ বা গুণ। এক হিসাবে এটা দোষ,
অন্য উপায়ে হিমা; আর এক হিসাবে এটা
গুণ, সেটা সর্বজনীন হিমা।

সাহেবদের কোনও কিছু দেখিয়া আমরা একটু
বুড় হাঙ্গ হামিলেও তাঁহার মর্যাদা চটিয়া যান;
কিন্তু আমাদের কত কিছু উপরেই না তাঁহার।
সাংঘাতিক আঘাত করিয়া থাকেন। এই বড় কল্যাণ
আমাদের কত কালের অনুষ্ঠান—ওর গম্ভীর গণ-
ধান ব্যাপারটা তাঁহার শাক ময়ূর-মাই করিলেন।
কিন্তু আমরা যদি বলি, সাহেবেরা সপোত্রা বিবাহ
করিতে হুগুটি অর্থচালিকা-বিবাহে সম্মত নহেন,
যদিও শেষেরটা আত্মীয় সম্বন্ধ এবং সুমিষ্ট মনস্ক—
এখন কত সাহেব চারুক হস্তে আমাদের প্রতি
বারমান হইলেন। মনুষ্য-প্রভৃতির সম্বন্ধটা একবার
দেখুন।

গর্ভদান উঠিয়া গিয়াছে, যাউক; গর্ভদানের
খোঁড়াইয়া করিয়া গত্যশোচনা করি না। যৌবন-
নিষেক মন্য বাবু নেহাত নারাজ হইবে না ইহাও
জানি; কারণ বস্তুতঃ সে জিনিষ খানা কিছু মন্দ
নয়—হাল আইনে আরও অতি জীয়াত ভাবেই
আসিয়া জুটিলে। ভবে কি না কথাটা হইবেছিল,
দেশাচারের, জাতীয় ব্যবহারের বা শাস্ত্রীয়
সংস্কারের। কিন্তু সে কথা এখন যাউক; আসল
কথাটা আনুন।

আসল কথাটা আর কিছুই নয়, সেটা সাহেব-
দের একটা দেশাচার; সে দেশাচারটা গ্রীষ্মের
সামাজিক “নৃত্য”—নিত্য এবং নিমিত্তিক “নৃত্য”।
কিন্তু পাঠক—প্রিয় মহাশয় আপনেন না। আপ-
নারা হাসিলে তাঁহাদের অসার আপনাদের প্রতি-
পাতা উপহাস করিতে পারেন। সামাজিক ব্যাপারে
পরিহাস-রসিকতা, প্রবীণতার লক্ষ্য নহে; পাটী
গাছিয়া “উত্তরে কাটাছাড়া” অস্বাভাবিক হইলে
বিশ্রুত: ইহাও উপায়তার সহিত আপনাদের

অনুদান করা উচিত যে, সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যক্তি-
গত স্বাধীনতার চালনা করা চলে না; যাঁহা আবহ-
মান কাল চাহিয়া অনুদিত হইতে তাঁহা সম্ভার এবং
সংস্কারের শব্দই চেষ্টা সম্বন্ধে “ওর” বলিতে উৎ-
পাটিত হইতে পারে না এবং তাঁহা উপহাসেরও
বিষয় নহে।

সাহেবেরা নাচেন অর্থাৎ নৃত্য করেন। জী-
পুরুষে—পুরুষে এবং পুরনারীতে, পরপুরুষে এবং
পরনারীতে—গলাপলি করিয়া, বা বৈশাখের দি করিয়া।
অঙ্গে অঙ্গে মিলিয়া অর্ধ উলঙ্গ বা অত্যন্ত টাইট
অঙ্গে, প্রায় প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ অবয়ব এবং
পূর্ণ মৌলিক্য প্রদর্শন করিয়া নৃত্য করা ইউরোপীয়
সামাজিক রীতি। এ রীতি আদিম কাল হইতে
ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত—আবহমান কাল
ইহা চলিয়া আসিতেছে—তাঁহাদের সম্ভার
শব্দই ক্ষুদ্র, পরে পরে ইহা বর্ধিত এবং বিকশিত
হইয়া উন্নতির উক্ত হইতে উন্নতর গায়ে উন্নতি
হইয়াছে—নৃত্যের নানা প্রকার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-
শব্দ—লাগিত এবং লাগবা কতই না আবিষ্কৃত
হইয়াছে। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার, সংস্কারের
পর সংস্কার—ক্রম-বিকীরণের অনিবার্য নিয়ম।
সাহেব ইউরোপীয় নৃত্য আজ প্রায় পূর্ণবে অর্থাৎ
পারকক্ষনে উপস্থিত।

নিত্য, নিমিত্তিক, পারিবারিক এবং সামাজিক
নাচন নাচা, ইউরোপীয় রীতি, ইংলণ্ডীয় পদ্ধতি;
কাজেই আমাদের মনন মহাশয়েরা নাচেন। না
নাচিলে কেবল অসমিক নৃত্য, অসামাজিক বলিয়া
তাঁদের অধ্যাত্য হয়। কাজেই মননেরা নাচেন।
জল, মাজিষ্টার, কলেজের নাচেন—বিশ্বাসের
গবর্ণর নাচেন—আমাদের বড় লাট, ছোট লাট,
মেজো লাট, প্রবীণ সমীচীন শাসিতগণ সেনা-
ব্যবস্থাপন কর্তৃক নাচেন; আমাদের সামাজিক
ও সামাজিক শাসনের সহিতকার বিশিষ্ট-বুদ্ধি ওর-
গম্ভীর-প্রকৃতি ব্যবস্থাপকগণও তাঁকাল না নাড়িয়া
নাচিয়া থাকেন। আমাদের রাজপুরুষেরা নাচেন—
রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাজবধূরাও নৃত্য করেন।
জল নাচেন, জলকৈ-পটীরা সঙ্গে; অয়েট নাচেন,
জল-কমল সঙ্গে; জল-পটী নাচেন, হুত কৈনও
“নীলদ্বার” হুতের সঙ্গে। নৃত্য হুবহু-প্রিয় বটে,
কিন্তু হুত ব্রূতা, প্রৌঢ় প্রৌঢ়ারাও বেশ প্রাণোত্তর।
মহিত নাড়িয়া থাকেন। নৃত্যের সময় হুতবে
কিছু বাধে না; একই আমের হুতী কড়া, প্রৌঢ়

নহেন; কমনওয়েলথ ইংরেজ-শেষকণ্ঠ মোহাবতরকে
আমার উন্মাতাকে 'The Land of the Rising
Sun' আবার কেহ বা 'Emerald Isles' বলিয়া
ডাকেন; হাঁহারা কবি-কমলার ধার ধারেন না,
হাঁহদের প্রকৃতি নীরস, হাঁহারা বিলাসিনীগণের
প্রদর্শনের মস্তককে 'ভোমরা' বলিয়া সম্বোধন
করেন, তাহারা আমার উন্মাতাকে জাপান
বলিয়া ডাকেন। অতএব পশ্চাত-প্রকৃতি হৃদয়
পাতকে হৃদয় হউন, আমি উপভাস লিখিয়া
হৃদয় অমরত্ব লাভ করিতে বসি নাই।

ফ্রান্স ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে লইয়া।

জাপান বা উন্মাতার রাজ্য।

রাজ্যধানি নিত্য ছোট নহে, গ্রেট ব্রিটন ও
আয়ারল্যান্ড অংশে বা, জার্মান সাম্রাজ্য অংশেও
বড়। পরিমাণ ফল ২৫০০০০ বর্গ মাইল। লোক-
সংখ্যা ৬০ লক্ষেরও অধিক। উন্মাতার রাজ্য
প্রকৃতির দৃষ্টিতে, বৃহৎ কৃষ্যমোহন। ওক, পাইন,
দেবদারু প্রকৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, আর অশ্বশি
প্রকারের মোচনশোভনীয় বৃক্ষ সমস্তই পরিপকিত
হয়। যেখানে উষ্ণ জল, সেখানে কমলিনী না
বাঁধিবে কেন? পান্ডের অভাব নাই। সুগন্ধ
ফুলেরও অভাব নাই। কিন্তু কি জ্ঞান জানি না,
পূর্বকল্পিত কোন পাণ্ডে বিবেচনা পাই না, এই
পার্বীর অন্তর্যমাতাকে রুচিৎ মুরকঠ বিহরের গলিত
বস্ত্র শুনা যায়, রুচিৎ নির্বিড় বৃক্ষজ্যায় ভাৱত-
বর্ষের দ্বায় উজ্জ্বল-বিশিষ্ট পক্ষী বেধিতে
পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা।

এখন উন্মাতার আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৃহৎ
উপস্থিত হইয়াছে। এখন পার্শ্বদেশীয় বসিন্দা
নিদ্রায় গুলিয়াছে, 'মৌহ-অব' চলিয়াছে, তড়িত-
বাক্য ছুটিয়াছে; এখন ইউরোপীয় পাত্রা বর্ণা-
শ্রেণী, ইউরোপীয় শিক্ষক, জ্ঞানপোষক পিতৃগণ কবি-
হেতু, কিছু প্রদানমানে এখনও প্রাচীন রীতি-
নীতির আদিপাত্র কিং-পরিমানে পরিপকিত হয়।

এক রমণীর রাজ্যে বাস করিয়া সমসার-সেবা-
বর রমণী কনককান্তি কমলিনী; রমণী পলার হার,
গৃহের প্রাপ্তি, মস্তকের মুদ্রিত, মুদ্রিৎ মধ্যমণি;
রমণী বহুস্তম্ভে স্থান-উন্নয়ন, নৈশাধার বিমল
জ্যোৎস্বা, —স্বতন্ত্র—

উন্মাতার-রমণী,

এই লেখকের সর্বপ্রথম বর্ণনায়। উন্মাতার-রমণী
কণ্ঠপাত্কা পায়ের দিয়া হেলিয়া 'হুলিয়া গল্পে-
গমনে গমন করে, অচ্যুত কুলাঙ্গার নহে বৎ তাহার
বিরোধিত, যেন একটা হুমজিত বিলাসী তিনে
পুতুল। বর্ণ উজ্জ্বল পৌর, চক্ৰ সটান, ভাসমান,
উজ্জ্বল-প্রতিবিম্বিত। উন্মাতার-রমণী প্রত্যন্ত অর্ধে
বিলাসিনী। এখানে একটা 'কিন্ত' বাহ্যিক করিতে
হইল, উপায় নাই—কিন্ত দিতে মিশি, চেয়ে কাজল।
আর প্রতিপত্তি তাহার ধর্ম-মোড়া লুকাইয়া রাখি-
ছেন—জ্ঞান কাম। হুয়া পার্শ্বকো জলুপিত করি-
ছেন—সেই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু স্থির হউন।
নিবিড় কুম্ভার সূচিক্রম কেশ এক অভিনব ও হৃদয়-
ভাবে মস্তকের পশ্চাৎভাগের একপাশে সম্বদ্ধ।
মস্তকের মাথাভাগে সিঁহি বাই, সিঁহির হানে তিন
চারি অস্থি পরিমাণ প্রাপ্ত কেশবদ্ধ ক্ষুদ্রভাবে
পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহার হই পাশে স্নেহ
বজ্রভাবে একবার ক্রিয়াক্রমে চুল আঁচড়ান। পশ্চাৎভাগ
বাহ্যিকও দেখিতে পাওয়া যায়। নাসা অমরত,
শরীর-বন্ধন দ্বীপ, বর্জ্যকান্তি। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
স্বাধীন পৃথক কায়ে দেখিলে হৃদয় বলিয়া বোধ
হইবে না; অথচ মুখমণ্ডলে এমন একটা গলিত
লালসা, চাল-চলিত ও বাহ্যিকের এমন একটা মনো-
হর মূর্তিমালা আছে যে, তাহা দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ
না করিয়া পারে না। রমণীগণ অলংকার-প্রিয়। নহে।
মুখে পাঁচটা বাহ্যিক প্রথা বিলম্বন প্রাপ্তি; বহু-
বয়ের বিভাঙ্গিত পাত্রাদির সহিত মুদ্রাঙ্কিত
মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করেন, দিব্যমোকে
বিস্ময় হইতে পুষ্টি আকৃত হইতে থাকে। কিন্তু

পুরুষদিগের মুখাকৃতি

ভাবশূন্য, লাবণ্যহীন। আকৃতি বর্জ্য, অস্বাভাৱিত
বুল, মস্তকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ কেশ স্বতন্ত্র-রঞ্জিত।
নিরোপীয় লোক মস্তকের মধ্য ও অগ্রভাগ মুগুন
করিয়া পশ্চাৎভাগের কেশধার্য বৈবিক্ত কর; বেশী
মোম দ্বারা স্থায়ীকৃত করিয়া মস্তকের হই পাশে
বন্ধন করে।

“কাইমনো” ও “ওবি”

জাপান দেশের জাতীয় পরিচ্ছদ। “কাইমনো”
জী-পুষ্ম উত্তরেই ব্যবহার করে। জীমোহের
“কাইমনো” স্বতন্ত্র হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিলম্বিত,

এবং অথবা নির্দিষ্ট পশ্চাৎ হইতে সমুখভাগে একরূপ
চূড়ভায়ে আবদ্ধ যে, তদ্বারা ক্রত গমনের ব্যাধি
জন্মে। “কাইমনো”র উর্দ্ধভাগে কিংবদন্তি কাটা,
তদ্বারা মস্তক ঘেষন করা হইতে হয়। “কাইমনো”র
সহিত যে ছুটী হাতা সমুখক থাকে, তাহা দিক্চির
স্থিতি, অলংকার পক্ষে—যাহা চাট, তাহাই পাইবে;
বত ইচ্ছা হয়, তত বার, তাহা পূর্ণ হইবে না।
টাকা, পসরা, রমাল, চিকিটী, খান্না, খেলনা, খাণ্ড
জ্য শব্দ প্রকারের টুকুটুকু জিনিষ, সেই অর্থাৎ
স্থিতির মধ্যে পুঙ্খায়িত থাকে। এই হাতা বত
প্রশস্ত হইবে, তত হৃদয় হইবে; কোন কোন বিলা-
সিনীর হাতা মাটা স্পর্শ করিয়াও যায়। জাপান
দেশীয় কবিগণ ইহার সৌন্দর্য্য ধ্যান করিতে করিতে
হতভান হইয়াছেন। জগতের চক্ৰ পরিভ্রম করি-
বার ক্ষমতা উন্মাতার স্বর্গ, অতএব জাপান দেশে
স্বতন্ত্রভাবে প্রথা কেন থাকিবে? ওবি এক প্রকার
সভাপ্রবেশ-নিষেধ, ইহাও জী-পুষ্ম উত্তরেই ব্যবহা-
র্য্য। পুরুষদিগের “ওবি” এক হস্ত পরিমাণ
প্রশস্ত জীদিগের এক হুট প্রশস্ত, —১০/১২ ফিট দীর্ঘ।
ইহা দ্বারা হুই বার কটিলে বেষ্টন করিয়া তাহার
প্রান্তর্য পশ্চাৎভাগে একটা ছোট-বাট বাগিলে
বন্দ করিয়া বন্ধিত হয়। “ওবি” গ্রহি-বন্ধন জাপানী
রমণীর একটা প্রধান শিক্ষার বিষয়। এখন একবার
মঞ্চকাল

বালক-বালিকার ক্রীড়া-কৌতুক

দেখি। ঐ দেখ, কতকগুলি বালক-বালিকা
গোলায় আছে। সহস্রা একটী বালকের শীড়া হইল,
সে বীরে বীরে শয্যা শুইল; বীরে বীরে সন্মুখ
ইতাকে দেখিয়া বলিল। সকলেই স্তম্ভ, চিত্তিত,
বিম্ব। একজন বালক-ভালক রোগীর শরীর
পর্যায় করিতেছে, আর অন্তর-ভায়ে মাথা নাচি-
তেছে; বস শক ব্যাহিতে ধরিয়াছে; উত্তম বায়ান
হইতেছে; কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। রোগীর
অবস্থা-মগ্ন হইতে মগ্ন হইল, মূর্খ কাল উপস্থিত
হইল—সেখানে কাল-নিমজ্য চক্ৰ ঘুরিত করিয়া। তখন
ক্রীড়াশীল বালকগণ, অস্ত্র নটে গায় রাম-গস্তার
বনে শব বন করিয়া লইয়া চলিল। বালকের
একটি বৃক্ষশাখাচিত্ত ব্যবহার জাপান ভিত্তি অস্ত্র কোন
দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। বালক-বালিকা
একরূপ ঘোলকলা-পূর্ণ ক্রীড়া বিবাহেরও অভিনয়
করিয়া থাকে। বুড়ি-উড়ন, খোতোজলে কাণ্ডের

কল-চালানও জাপান দেশীয় বালক-বালিকার
ক্রীড়া। এখন একবার প্রেমের অভিনয়—

বিবাহের সভা

দেখা যাক। প্রশস্ত কব্জের এক পাশে বয়স্কাত্তি,
অপর পাশে পীতা-পক্ষ উপস্থিত। কলম্ব মধ্যভাগে
বিভক্ত আদ্যে বর উপস্থিত। বয়স ২২ বৎসর
হইবে। হেট মুখ মুগ্ন বধা নাই। সমুখে এক
খান টেবিলের উপর একটা হৃদয় পানপাত্র
জাপানের হৃদয়ময়ী জাতীয় হুয়া “শাকী”—আর,
একখানা টেবিলের উপর একটা দেবদারু বৃক্ষের,
পুষ্পিত ফুলবৃক্ষের এবং কলম্পপুটে রক্তচালের মূর্তি
স্থাপিত। এই সমস্ত জ্য বৃক্ষ-বৃহতীর সৌন্দর্য্য,
দীপ-জ্বাল ও হৃদয়প্রকাশক শুভ সাক্ষ্যকিত চিহ্ন।
হুইটী হৃদয়জাত রমণী আর একটা লজ্জাশীল
রূপবতী রমণীকে সঙ্গে করিয়া ঘীরে ঘীরে
সভাপ্রবেশ প্রবেশ করিল। তৃতীয় রমণীর আশা-
মস্তক শুভ হৃদয় পানপাত্রের আবেশ, পরিষে
বস্ত্র বৃক্ষের ছায় শুভ। ইনিই পাত্রা। ঘোড়ী
রূপা। মনচরীপন্ন পাত্রীকে পাত্রের সমুখে
বসাইল। তৎপরে প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সম্মুখে
আবারীয় জ্য স্থাপিত হইল; শাকীপূর্ণ পানপাত্র
খন ঘন বুরি। আসিতে লাগিল। পানপাত্রের ঘন
পড়িয়া গেল। আহারান্ত রক্ত-কটী উঠিয়া গেলেন;
পরক্ষণেই বিবাহের নবীন-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া
সভা-ওপরে দেখা গেলেন; কিন্তু পাত্রার অস্ত্র
সেই পূর্বের শুভ দেখাদি উদ্ভাবনা এখনও রহি-
য়াছে। আ। এই কমণীয়-কামিনী-হৃদয় যে
নিম্ন শুকরাইয়া হইবে, জীবন-রক্তজ্বরি শেষ অভি-
ময়ের দিগ—বনন ইহার শব্দেই শাখাশ্রেণীর নীত
হইবে, তখন এই যামুগু আদ্যর, প্রেমাম্বলিনের
এই হৃদয় নির্দুশ, সেই শব্দেই হৃদয়ে আকৃত করিবে।
এ নির্দুশ-প্রথা এ দেশে কে প্রচলিত করিল?
জ্যোৎস্বা-বিবোত স্থবিল সরোবরকে এ নির্দুশ
কাল-ঘোরের ছায়া কে দেখাইল? সে যাহা হউক,
“শাকী” পান আশ্রস্ত হইল। পাত্রা পান করিলেন,
পাত্র, পাত্রের পিতা—সভা-হৃদয়, কলম্ব জ্যে
বাতার পান করিলেন। তৎপরে সমস্ত জ্যে
শাকীপূর্ণ পানপাত্র নবীন দম্পতীর মুখের নিকট
ধরিয়া; উভয়ে একত্রে “শাকী” পান করিলেন;
আজ এক একত্রে হৃদয়-হৃদয় ভোর করিলেন।
শাকী-পানই জাপান-দেশীয় বিবাহের শেষ অঙ্গন;

তত্ত্বিৎ শব্দটি স্থান কিংবা জী-আচারের বাস্তব্যের কোন সম্ভবই দেখা যায় না। পাত্র ও পাত্রীর অভিভাবকত্বই বিবাহের ঘটনাকালি করিয়া থাকিলে।

উষাবতী রাজা কুম্ভমের রাজ্য।

কুম্ভমের খেলা, কুম্ভমের খেলা, কুম্ভমোৎসব, কুম্ভমোৎসবের উষাবতী কুম্ভমরাজী। উপায়ে দেখিলে, কুম্ভমের খেলাও পুরুষ, কোথাও রমণী মূর্তিতে বিবিধভেদে পুরুষ-কুম্ভম পরিধান করিয়া দূর হইতে দূরতর ভ্রম জন্মাইতেছে; কোথাও কোন বৃদ্ধ বৃদ্ধ-বৃদ্ধকন্যারূপে বিস্তারিত রহিতেছে। কোথাও সোতর নিয়মি লোক চলিয়া বাহিতেছে। কোথাও না একজন বৃদ্ধা শ্রমল কুম্ভমজ্ঞানিত স্থানে বসিয়া জন-বাহিন করিতেছে; সাদাক্ষ-শোহিত স্বর্গ অস্ত্র যাইতেছে; চীনদেশীয় রমণী ঝাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা কোন মহাবীর অষ্টদল সৈন্যের সহিত বোর মধ্যস্থানে প্রবৃত্ত; সঙ্গযোগের যেত, একটা বৃদ্ধী রমণী চিত্র বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া নিকটে বসিয়া জ্বায়ে। পাটকা বিবাসন করিলেন কি এই সর চিত্র, ভগ্ন-ভগ্ন-মাতা ও বিবিধ বর্ণের কুম্ভমের অপূর্ণ সামন্তিন, সাজেছেন, ও সংকল্পনের মত; কবির কল্পনা যাহা ধারণা করিতে অক্ষম হয়, উদ্ভাসিত পূজ-কল্পনায় সেই অপূর্ণ দৃষ্ট পট্র করিয়া নয়ন মন মোহিত করিতেছে।

আমাদের দেশে যেমন পাটকা, জাপান দেশে সেইরূপ

"জিনরিফিসা" বা "কুম্ভমা।"

"কুম্ভমা" তৈরিক কাপড়-মণ্ডিত;—ভিতরে মকল-মোড়া বসিবার আসন; পাখীর ছায়া নর-বাহক বহন করে। উড়িয়া-বেহারাণিগের ছায়া কুম্ভমা-বাহকগণ উচ্চ শব্দ করিয়া জন্ত পবিত্রে চলে।

জাপানবাসীদিগের কতকগুলি

সংস্কার

সম্প্রদেয় ওড়কতক কথা বলিল। সেখানে ভূত-প্রেরণের বড়ই দোঁরাহা; ভূতেরা কখনও নরজন্তু, কখনও বা শূণাল মূর্তিতে, আবার কখনও বা মনো-মোহিনী রমণী মূর্তিতে-ভিতর করিয়া থাকেন। কেহই প্রাণোত্তর বহুর বাহির হয় না। প্রেত-সামান *Spiritualism* বহু প্রচলিত আছে। বিবাহের দিন বর কস্তার-গাল অথবা বেগুনী রঙের বস্ত্র ব্যবহার করা নিষেধ, করিলে বিচ্ছেদ অনিবার্য।

রাজ্যেতে লবণ আনিতে নাই। দ্রাবর জাল লইয়া মৎস্য ধরিতে চলিয়াছে; পথে কোন পুরোহিতের গৃহস্থে স্নান করিলেন বৃত্তিতে হইবে। কাপড়-মোড়া জানাবার পক্ষীর ছায়া পড়িলে, সে দিন গৃহে অতিথি আসিলে। উত্তর-পশ্চিম কোণে সকল অম্বলের নিদান। গোলাগুণের বাটা বা খানার উপর চার জন চালিয়া দিলে, বিবাহের দিনে বড়ই দ্রব্যোপ-হার। বালক পোড়া ভাত খাইলে, বসন্তরোগী বালিকার সহিত ভাতের বিবাহ হয়। গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাচুর্য্য হইলে, গৃহস্থেরা আরম্ভে এই মর্মে লিখিয়া দেয়, বর্ষা;—'এখানে বালক-বালিকা একটুও নাই।' শীতকালের এই বিভ্রাটপ পাট করিয়াই কিরিয়া যায়। শিশু দর্পণে দেখিলে, যৌবনে এই যমজ সম্ভানের পিতা হইবে। ভাদ্রাশি মাসেতে পুত্ৰিয়া রাখিলে নুতন পিতা হয়। গ্রহযের সময় কৃপণ মৃৎ চাকিয়া রাখিতে হয়; তাহা না করিলে হৃৎ ও চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিয়. বর্ষণ হইয়া কৃপালক নষ্ট হইয়া যায়। স্বপ্নে হস্ত হস্তা ও অর্থ হারান মূলজন, কিন্তু স্বপ্নে অর্থ পাইলে পদের বিধারী হইতে হয়।

১৮৬৮-প্রতীক

হইতে উষাবতীর নবগুণ আরম্ভ হইয়াছে। অষ্টাঙ্গগানের বোর তত্ত্ব ১৮৬৮-অঙ্গে উষাবতীর পুরাতন বৈশ্বজ্ঞা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া দিল; প্রশান্ত মার্গেরে যুবীল বহন হইতে অল্পমাত্রা-বিমণ্ডিত একটা নুতন রাজ্য সহসা শির উল্লেখন করিয়া জগৎকে চমকিত করিল। রাশম হস্তা হইতে

মিকাডো রং

জাপানের-রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া-ছিলেন। জাপানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গিগ ধর্মের মধ্যবিন্দু অমোক্ত্য, বাদনা। প্রশিষ্টক উষাবতী। ভারতবর্ষের ছায়া জাপানে দেবোৎসব হইয়া-ছিল। বহুদূর উদ্ভিদনী নামক দূরত্ব অপর কর্তৃক উৎপাদিত হইয়া উষাবতীর শরণাপন্ন হইলেন। উষাবতী অম্বরাজকে বহন করিয়া লজ্জা মিকাডো-নামক দেবতার মর্তীধানে (অর্থাৎ জাপানে) প্রেরণ করিলেন। দেবোৎসবের বোর সন্ধ্যায় হইল; অম্বরংগ পূর্ণায় করিয়া মিকাডো

স্বয়ং জাপানের রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। সেই মিকাডোর বংশধর বৈশ্বজ্ঞাসমুত্তর জিম্মুত্রে জাপানের মহস্ব মহস্ব শাসিনের পুত্রিত হইয়া থাকেন, এবং জাপানের বর্তমান রাজবংশের সেই জিম্মু-ত্রেবর বংশে জন্ম। বৈশ্বজ্ঞাসমুত্তর বিদ্যাই জাপানে জাপান-রাজের এত সম্মান; এইজন্য দর্পণ, তরবারি ও প্রস্তর, পেশান্তির এই পনিতি চিত্রের জাপান-রাজ, ধারণ করিতে অস্বীকার।

রাশম শতাব্দীর পর হইতে মিকাডোর ক্ষমতা হ্রাস হইয়া সম্রাজ্ঞারূপে ক্ষমতা হ্রাস পাইতে লাগিল, এবং ১৮৬৮ হস্তান্তে মিকাডো বংশীয় এক ব্যক্তি প্রকৃত রাজশক্তি প্রাপ্ত করিয়া বসিল; টোকা-গুয়া রাজগণ সোপান নামে খ্যাত হইলেন। রাজ-শক্তির ভায়া চলিয়া গেল, কিন্তু মিকাডো এখনও ছায়া লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। জাপানের রাজশক্তি ইরেক্ষ দিখা বিভক্ত হইয়া গেল; মিকাডো-বংশ কায়োটো নগরে ও সোপান-বংশ জেকো নগরে আপন আপন গির্বহানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গির্বহ-বংশ দুইশত বৎসর নিক্সিবাদে রাজশক্তি পরিচালন করেন। ১৮৬৮-অঙ্গে সোপান-বংশীয় শেষ রাজা কিরি রাজকাব্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তৎকালীন মিকাডো-বংশীয় রাজা প্রজ্ঞার সাহায্যে পূর্ব রাজশক্তি প্রাপ্ত করিয়া পুনর্বার জাপানের একে-রূপ হইলেন। জাপান রাজ্যে নবগুণ আরম্ভ হইল। এখন জাপান-

গর্বঘর্মেটের গঠনপ্রণালী

সম্প্রদেয় কিছু বলিল। মিকাডো সর্ম্ময়র রাজা। প্রধান মন্ত্রী, সহকারী মন্ত্রী প্রভৃতি লইয়া একটা কাব্য-রকী সভা আছে। দেশের প্রকৃত শাসন মন্ত্র-মন্ত্রের ভার এই সভায় হস্তে। ব্যবস্থাদি প্রণয়ন ও পরিবর্তন লজ্জ একটা ব্যবস্থাপক সভাও আছে; কিন্তু প্রতীম কাউন্সিল, অর্থাৎ পূর্বের মন্ত্রী, সভার অধ-মুক্তি ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভা কোন বিধি প্রচলিত করিতে পারেন না। কৌশল শূন্য জন্ত বৈদে-শিক, আর-বর, সামরিক, সামাজিক, শিখা, পুত্ৰ, বিচার, উপনিবেশিক, রাজ-পারিবারিক ও আভ্য-ন্তরীণ ইত্যাদি বিভাগে গর্বঘর্মেট বিভক্ত। ইউরোপীয় ব্যবস্থার অনুকরণে ১৮৭৯-অঙ্গে জাপানে পরিয়া যৌতট প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং সম্রাজ্ঞের প্রতিনিধি-পণ প্রতিনিধি-প্রণালী অনুসারে নিক্সিচিট হইয়া রাজকাব্য পরিদর্শন ও পরিচালন করেন।

সেনা-সংখ্যা

শান্তির সময় ৩৭ মহস্ব ও রক্তের সময় ৫০ মহস্ব, এবং বর্ম্মজী অর্থাৎ বিশেষ বিশিষ্টাদিতে সাহায্য করিবার লজ্জ আরও ২০ মহস্ব সেনা আছে।

দুর্ভৃত্তি ও অন্যান্য জাহাজ

২৭ থানা হইবে। বরভৃত্তিসমূহ প্রায় দেশের ভোপ দ্বারা স্বরূচিত। জাপান সেনা ইউরোপীয় নিয়মে পরিচালিত; ইউরোপীয়, অস্ত্র-শস্ত্রে সমজ্ঞিত জাপানবাসে

পুলিশ

কর্ম্ম ও কর্তব্যপারায়ণ;—সংখ্যার ২০-মহস্বেরও অধিক হইবে।

ডাক-বিভাগ

ও সম্পূর্ণ ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত। মণি-অর্ডর, রেজিষ্টারী, টিকিট, সেভিল্য ব্যাঙ্ক, সংবাদ-পত্রের মোরক প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের দেশে ও ইউরোপীয় ডাকবিভাগে যে সমস্ত সু-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, জাপান-ডাক-বিভাগে তাহার অভাব নাই। ১৮৭৯-অঙ্গে জাপান-ডাকবর দিয়া ৫,৭৭,৭২,৩৩ থানা পর ও সংবাদপত্র প্রেরিত হয়; তদ্ব্যে সংবাদপত্রের সংখ্যা ১,১২,৫০,০০০ হইবে। জাপানে ৫০০ শতের জাপানি ডাকবর ও ৫০০ শতের অধিক সেভিল্য ব্যাঙ্ক আছে।

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ

লাইন দ্বিগুণপ্রতিবে দেশময় বিস্তারিত হই-তেছে। জাপান-সংবাদপত্রের দ্বারা লিখিত ভাষের সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। রেলওয়ে লাইন-গুলি ইংরেজি মন্যম দূরত্বগে নির্মিত। দুজানি প্রস্তুত করিবার লজ্জ হইল।

মিতি

আছে। একটীতে মোট প্রভৃতি ও দ্ব্যস্ত্রীতে গোঁয়া ও বর্ম্মজী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। জাপান-দেশীয় রৌপ্যমূল্যকে "জেন" কহে। পাঁচ জেনে এক জর্ঘ-মুদ্রা। জাপান-দেশীয় এক "বর্ম্মজী" আমাদের দেশের ১০ রৌপ্যমুদ্রার তুল্য। ১৮৭৯-অঙ্গে জাপানদেশে প্রথম

সংবাদপত্র

প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯-অঙ্গে সংবাদ-পত্রের সংখ্যা

১১১ বানা ও পার্শ্বসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ছিল। কোন দেশের প্রকৃত অবস্থা অসংখ্য হইলে; সেই দেশের বিধি-ব্যবস্থা মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতে হয়। জাপান-দেশীয়

দণ্ডবিধি আইন

পাঠ করিলে, তৎক্ষণীয় সামাজিক অবস্থার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। উকীল মোকদ্দার বা বন্ধ-বান্ধবের সহায়তা গ্রহণ করিতে, সাক্ষীর প্রেরিত গ্রহণ করিতে, বা সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত করিতে, আসামীকে আদালতী নহে। পিতা মাতার বিরুদ্ধে অপরাধ ভিন্ন অনেক অপরাধ হইতেই অর্থদণ্ড বা দ্বা। মুক্তি লাভ করা যায়। বৃদ্ধ ও বালকদিগের প্রতি জাপান-দণ্ডবিধির বড়ই কৃপাভূতি; ইহার। অধিকাংশ অপরাধেই অর্থদণ্ড প্রদান করিয়াই মুক্তি লাভ করিতে অধিকারী। আবার ৭ বৎসরের মৃদুমন্দ বালক ও ১০ বৎসরের অধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধকৃত কোন অপরাধেই অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। জানকৃত কোন ও শিশু-হত্যার শাস্তি প্রাণদণ্ড; তাকু অস্ত্রাধি-সহ হত্যার জন্য প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। একপ দণ্ডহত্যার স্তূতকার্য হইলে হত্যক কর্তৃক অস্ত্র-কার্য হইলে কাঁদী দ্বারা প্রাণ বন্ধ করা হয়। সাধারণ দণ্ডহত্যার দণ্ড-চিরনির্বাসন। স্বামী মনের স্থখ নিত্যাধীন জীবন-প্রভার করিতে পারে, তাহারে তাহার কোন অপরাধ হইবে না, বরূপাত না হইতেই হইল। কিন্তু জী, স্বামীর গায়ে হাত তুলিলে তাহার একপ দণ্ড কঠোর অমঙ্গল কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। স্বামী তাহার ভ্রাতা জী ও তাহার উপপতিকে অবশ্যে হত্যা করিতে পারে; কিন্তু সেই অভিচার-সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পরে জী নিঃশ্রু মনের মধ্যে তাহা সংশ্লিষ্ট না হইলে, তাহা অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইবে। পিতার প্রহারে বালকের মৃত্যু হইলে, পিতার দণ্ড ১৫ বৎসর কারাবাস; আবার পুত্র যদি নির্যাসিত সময় পর্যন্ত পিতৃ-মাতৃ-মৃত্যু-জনিত শোকাচ্ছন্ন ধারণ না করে, তাহা হইলে তাহারে আত্মনির্বাকারও ভোগ করিতে হইবে। নিরাশ-প্রণয়ের দারুণ দংশন সহ করিতে না পারিয়া প্রাণ-বিপুল যদি আত্মহত্যা হইতে চেষ্টা করে, এবং চেষ্টা নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে ১০ বৎসর কারাবাস। অধিকনের ব্যবসায় করিলে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু কোলারী-ও দেওয়ানী বিধিসমূহ একই নিয়ম পরিবর্তিত ও

পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জাপান-দেশের অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষা

বিস্তার হইয়াছে। ১৮৭৭ অব্দের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, উক্ত সনে নিম্নলিখিত স্থল ২৫,৪৫২ ও ছাত্রসংখ্যা ২১,৬২,৬৬২ ছিল, তথ্যে ১৮,৯৪,১০২ বালক এবং ৫৬৮২২০ বালিকা। শিক্ষক-সংখ্যা ৪৮,২৬৭—শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৮৫৫। মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৩২। এই মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বায়োলজি, ফিজিক্স, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কৃষি, কলা, প্রাকৃত-বিজ্ঞান, রুবি, যন্ত্রবিজ্ঞান, বাণিজ্য, জমাখরচ, নীতি-বিজ্ঞান, ব্যবস্থা, ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চ আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, রুবি, বাণিজ্য, নো-টালন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য উচ্চশ্রেণীর স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে। শিক্ষক প্রকৃত করিবার জন্য নর্মাল বিদ্যালয় আছে। বালিকাশিক্ষার শিক্ষাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে। পাশ্চাত্য স্বতন্ত্রদের তরঙ্গ উচ্চলিয়া উঠিতেছে। এখন জাপান-রাষ্ট্রের

আয় বায়।

১৮৮০ দৃষ্টকালে ১,১১,৩০,০০০ টাকা আয় ও ব্যয় তুল্য ছিল। আমদানী ও রপ্তানী তত্ত্ব, ভূমির রাষ্ট্র, ইনসুর ট্যাক্স, আবগারী, তামাক, ট্যাক্স, যানট্যাক্স, রেলওয়ে, তুলার কল, মিউ ইত্যাদি আয়ের প্রধান উৎস। জাপান এখন সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তখন

উৎপাদন প্রণালীর

মধ্যে রেশম, রেশমের কাট, চা, দাঙ্গ, তামা, তামাক, কপূর, মেঘ প্রভৃতিই প্রধান। এই সমস্ত উৎপাদন পরিষেবিত জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে সূতা, তুলা, উলের বস্ত্র, বোঁহ, বিবিধ কল, কেরোসিন, চুবি, কাঁচ, প্রভৃতি গ্রহণ করে। জাপান দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষেত্র জাপানবাসী দেশীয় বাণিজ্যের উচ্চ স্তরে সঞ্চে বীজপ্রকৃত হয় নাই। জাপানে বৈদেশিক বাণিজ্য এখনও দেশীয় বাণিজ্যের বিনাশ মাঘন করিতে সক্ষম হয় নাই। জাপানের গৃহে গৃহে এখনও ভাত ও চডাকার দ্রব্য শল শোনা যায়; গৃহকৃত হৃদয় বস্ত্র, বাহু ও বস্ত্র-নির্মিত বস্ত্র-নির্মিত হৃদয়

প্রাণদণ্ডে বীরের স্বপ্ন।

পাত্র ও গৃহসামগ্রী এখনও জাপানি পদ্ধতিতে শোভা বর্ধন করিয়া থাকে।

সিন্ধু ধর্ম

জাপানের প্রচলিত ধর্ম। একদিন বৌদ্ধধর্মের বড়ই আধিপত্য ছিল; কিন্তু এখন তাহা নিত্যান্ত নিম্নেস্তর অবস্থায় অবস্থিত করিতেছে। আর্যেস্তর জাপানের একমাত্র আরাধ্য দেবতা; রাজা সেই দেব-বর্মসম্পন্ন বসিলা রাজ্যভাঙ্গার দিন সিন্ধুধর্মের একটা প্রধান অনুজ্ঞা। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোরিয়া উপদ্বীপ হইতে বৌদ্ধ প্রচারক আসিয়া জাপানে বৌদ্ধধর্মের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। রাজপুং-গণ এই নবধর্মে দীক্ষিত হইলেন; ক্রমে ক্রমে রাজ্যময় বৌদ্ধ মন্দির শির উত্তোলন করিল; বহু-শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম জাপানের আধিপত্য বজা করিল। কিন্তু প্রায় দুই শত বৎসর হইল চীন হইতে পণ্ডিতপ্রবর চুই-এব্রহিমিত এক নতুন বৈজ্ঞানিক সংস্কার বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি কম্পিত ও দুর্বল করিয়া তুলিল। ১৮৬৮ অব্দের রাজনীতিক বিপ্লব সেই বিশাল বৌদ্ধ ও সিন্ধু ধর্মকে আরও বিচলিত করিল; এদিকে ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী নৌকা, মিথ, হার্ট পেশবার প্রভৃতির প্রবর্তন, — জটিল পাশ্চাত্য নীতিবিশেষের পরিচয় করিতে লাগিল। সিন্ধু-ধর্মমন্দিরে কোন দেববর্মী প্রভিষুক্তি পুঞ্জিত হয় না। মন্দিরস্থ দেবীর উপর একধাণা দ্রুপদ, গোহি, শাকি পাত্র ও বিবিধ ফল মূল দেবিত্তে পুত্তয়া যায়। গোহি-পুত্র ভক্ত বস্ত্রধারী জাপান-বাসীর বিবাহ, যেখানে গোহি উপলব্ধ হয়, সেখানে বৈবাহিক পূর্ণাঙ্গী না করিয়া পারেন না। টোহিহি বৃক সিন্ধুধর্মবল্লীদ্বিগের একটা পুণ্যনয় দীর্ঘ। বিচালি-নির্মিত রজ্জ আর একটা সমানের জিনিষ। সিন্ধু ধর্মের বাজকগণ বস্ত্রক মুগুন করে না, বিবাহ করারও তাহাদের পক্ষে নিষেধ নাই। এখন ভগবান ভিন্ন জাপানের

ভবিষ্যৎ-পট

কে উত্তোলন করিতে পারে? কিন্তু প্রাশস্ত মাপ-বের দল হইতে স্বর্ধকীরীরা উদযাতী বেরপ স্বাধীন চেষ্টায় ধীরে ধীরে শির উত্তোলন করিতেছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত ও স্তম্ভ হইতে হয়।

প্রাণদণ্ডে বীরের স্বপ্ন।

আঃ! এদিক স্বপ্ন আঁধি দেখাইনি মোরে, অগ্নি নিজে, দেখাইনি অগ্নি হুগুণে। স্বপ্নম্বে এ উপন্যাস, বিধি-বিধিস্ত, তাই তোরেও নহে এ তো জগত্ জন ১

“বীর-বংশে বীরসনে বেশিয়া সঙ্গ্রামে, বীরের শচায় মোরে দিবে ভবিষ্যের ৭” কেনে দেব উজ্জ্বল হেন দেববাণী প্রতিবর্ণ সিন্ধু-তার অসুরের দ্বারে। ২

বীরবংশে মরি—যদি প্রতিবেশী-করে, বীরবংশে প্রহারের নিম্ন অবসার। প্রাণ তরি আত্মকীর্ণ করিয়া তাহারে কণ পর্মিত আঁধি লব, প্রাণ-অন্তর। ৩

জীবন্তে মরণ মোর ঘৃণা-লজ্জা-ভরে, বৈজ্ঞানিক সংস্কারে রজ্জ বন্ধ ঘুগে শুনি, কাঁদা দিবে। হায় বিকৃ মাতৃশের করে মাতৃশের অপমান এও ৭ একি বাঁধি ৪

এ লজ্জা, এ অপমান, ঘৃণাকে কি কহু? হায় ভ্রাতা, বীরবংশে পাব কি মরিতে? কি দেখানি আর-বার দেখারেন্দ্রপদ, আয় নিজে, এই-শেষ—এ অন্ধ আঁধিতে। ৫

হৃদয়ে আর কেন গিলিরে জীবন? হৃদয়ে এ শেষ জ্ঞা কেন জালাইনি? না, চাটিনা তেরে ও কৃপা; মাছ প্রাণ মোর, জাপান স্বাক্ষর করে হন বলি। ৬

তুচ্ছ মাংসপিত্ত লয়ে করে যদি খেলা জুজ, নাচ, হিংস, পণ্ড, কক্কর অথবা। আর আমি নাই, কিহা না আছে আমার হেথা কিছু, এ অলীক সংসারের কাঁদে। ৭

আরও আমি ৭ নিজ রাজ্যে—রাজপুত্রী ময়ে, নিজ বন্দিকারপারে, নিজে শৃঙ্খলিত। এও কিরে কথা? না—না, নাই নাই আমি, মত আমি, শত্রু আশা করি নিশ্চলিত। ৮ কারারও তো ছাড়া থাকে, এও দেখি ছাড়া, জগত্ যশের দেহ দুকাত্রে এছায়ে। নিষেধি এখনো হায়, উজ্জ্বল যি দেখা, বলিও না, তম্ব হোহু দলিও না পারে। ৯

কে জায়ে বিচারশুভ্র এহেন অপাত্তে ?
সুখ আশিষ্যতা যথা নীচের বিরাজে।
নাথি ভাষ্যে ধর্ম-বিদ্যে, নরক-ও মঙ্গল,
পদাশ্রিত করি হেন সৈন্যভারভাষ্যে। ১০
অথো! প্রতারণি স্বপ্ন, ন্যায় প্রবন্ধ,
এই তো জীবিত আমি অখান, জাগ্রত।
নাথি, যে অখান বলে? কে বিচারে যোয়ে?
কোথিত অখান আমি, নতুন ত মৃত। ১১
হায় বেব চক্রবর্তী, ভক্ত-বংশল,
তনিয়ে না সৈবকর, এ অখিমি কথা।
বাক রেশ নাথি দাল, জানে হুই প্রভু,
মহেনা এ আশিষল, মরমের বাধা। ১২

প্রীয়ারদ্রাশ্রাদ্দ শর্ম্মা।

ভারতের কৃষি-উদ্ধার ও ডাক্তার ভেলকার।

বঙ্গদেশের অনুরোধে, বিলাতের ভারতমন্ত্রী, ভারতের কৃষি-উদ্ধারক, কৃষি-রসায়নজ্ঞ ডাক্তার ভেলকারকে ভারতবর্ষে পাঠান। তিনি চৌদ্দ মাস কাল ভারতবর্ষে বাস, ভারতের সকল প্রদেশ পরি-
ভ্রমণ, বহুদেশ কৃষি-প্রণালী পর্যালোচনা ও ভারতের পশু-কৃষি-কর্মচারীদের সহিত কৃষি-আলোচনা করিয়া বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার কৃষি-আলোচনার ফল, বিবরণী-আকারে বিলাতে প্রকাশিত হইবে; এখনও যা নাই। তবে তিনি ইতিমধ্যে লণ্ডনস্থ 'রাজকীয় কৃষিবিদ্যা'র অর্জল বা বায়োস্কোপ পত্রিকা ভারতীয় কৃষি-সমক্ষে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধ সম্রাট আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

কৃষিবিদ্যে আমাদের বরাবর বিশেষ অজ্ঞানতা, তাই বহু-আশা করিয়া ডাক্তার ভেলকারের প্রবন্ধ পঠিত করিতে বলিলাম; মনে করিলাম—না জানি, একান্ত গভীর ভারতের কৃষি-উদ্ধারার্থে কি মহৎ পরামর্শ না দিয়াছেন, কি গভীর গবেষণার পরিচয় না দিয়াছেন; কিন্তু প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বড় হতাশ হইতে হইল। তিনি 'নিজেই বলিয়াছেন—
"মহারাজার ভারতমন্ত্রী, দুইটি উদ্দেশ্য সাধনার

আমাকে ভারতবর্ষে পাঠান—১ম, বাহাতে ভারত-বর্ষের কৃষির উন্নতি হইতে পারে, ভারতবর্ষে গমন-পূর্বক ভ্রমণসম্বন্ধান করিয়া, তথিথ্যে সুক্লি-প্রদান—
২য়, বিজ্ঞান-শিক্ষিত কৃষক যে উন্নতি হইতে পারে, সেই উন্নতি-বিষয়ে বিশেষ সুক্লি-প্রদান।"

তিনি উক্ত দুই উদ্দেশ্য সাধনার্থে কি কৃষি-প্রদান করিয়াছেন, সম্পূর্ণ বিবরণী প্রকাশ না হইলে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই; কিন্তু তিনি কিরূপ সুক্লি দিলেন, এবং তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আবার নিম্নে কিছু বলি না, তিনি আপনর কথা আপনাই বলুন;—
"আমি মোটের উপর বলিতে ইচ্ছা করি, আমার মতে, ভারত-বর্ষের কৃষি অতি উৎকৃষ্ট (Excellent) আমি মূলকর্তে বলিতেছি। ইহার উন্নতি বিধানের কমনা, বিলাতী কৃষির উন্নতি-বিধানের কমনা অপেক্ষা কঠিনতর সম্ভা। এখনও সব বলা হয় নাই, আমাদের দেশের ভাল ভাল স্বাস্থ্য বেগল, ভারতবর্ষের নানা স্থানে আমি সেইরূপ লক্ষণ ও careful চাষ এবং বিষয়সুবিধামণ্ডল কৃষক দেখিয়াছি।"

এক্ষণে ডাক্তার ভেলকারের কথার মূর্ত্যাসত্যতা প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য মনে, আমরা কেবল এই কথা-জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, ভারতের কৃষি-উদ্ধার করে, পঞ্চাশ সহস্র টাকারও অধিক ব্যয় করিয়া, তাঁহাকে যে দেশে আনা হইল, তাহার কি এই পরিণাম? ভারতের কৃষি অতি উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ ইহার আর উন্নতি হইতে পারে না; এই কথা জানিবার জন্মই কি আমাদের মাথার-বাম-পায়ে-পাশে, ভ্রম-বহুল-উই পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা বোলাম-কৃত্তির দ্বারা ব্যয়িত হইল?

এখনও দুঃখ্য নাই। ডাক্তার মহাশয় বলিতেছেন, "আমার বিশ্বাস, অনেক স্থলেই লোকদের চাম দেশীয় কটোর বিশেষ উপযোগী এবং বিলাতী লাভসে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভব।" ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতিকল্পে সরকারী কৃষিবিভাগ আপন আদর্শ ভারতের সমস্তই কৃষিকর্মচারিণ, দেশী লাভসকে বিলাতী লাভসের হাতে চালিয়া পরিভ্রমণ করিতে সম্ভব হইবে এবং এইরূপ কত যে নূতন নূতন লাভস গঠন করিলেন, তাহার নাম করা যায় না। ডাক্তার ভেলকারের সুক্লি শুনিয়া তাঁহারা এক্ষণে কি বলেন?

ডাক্তার মহাশয় আরও বলিতেছেন, "ভারতবর্ষে

যেখণ্ড কৃষিপদ্ধতি প্রচলিত, তাহাতে অমী ক্রমে উৎকোচন হইতেছে কি না, ইহা এক অতি গুরুতর প্রশ্ন; কিন্তু এক্ষণে ইহার সঠিক উত্তর দেওয়া হইতে পারে না।"

ডাক্তার মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তথ্যে এই তিনটিই প্রধান। এই তিনটি বিষয় উপলব্ধ করিয়া তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা যোগ্য—১ম, ভারতবর্ষের কৃষি অতি উৎকৃষ্ট; ২য়, ভারতবর্ষের লাভস, কৃষকের বিশেষ উপযোগী; এবং ৩য়, ভারতবর্ষের সুক্লি ক্রমে উৎকোচন হইতেছে কি না, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।

ইহাই যদি কৃষি-রসায়নজ্ঞ ডাক্তার মহাশয়ের ভারত-পরিভ্রমণের ফল হইল, ইহাই যদি সচল সহস্র মুদ্রায়োরে পরিণাম হইল, তাহা হইলে বলিতে হয় না, আমাদের কৃষি-রসায়নজ্ঞের আশংকতা নাই, আমাদের স্বরের টাকা স্বয়ং বাতুল? আমাদের পূর্বসূরির বলিয়া আশিষ্যে, ভারতবর্ষের কৃষি-ভারত বরাবর লোক যত সুখিণে, যিদেশীয় লোক হাজার গড়িত হইলেও কখনই ততদূর সুখিতে পারিলেন। কঠোর বংশের গত হইল, একজন বিশিষ্ট ও ব্যাভ-নামা পার্লামেন্ট মহাসভার সভ্য, ভারত-পরিভ্রমণে আসিয়া কিছুদিন কলিকাতায় বাস করেন এবং পরে প্রত্যাগমনপূর্বক আপন ভ্রমণ-কৃত্যর বৃত্তান্তকে প্রকাশ করেন। তিনি সেই বৃত্তান্ত লেখেন, "কলিকাতার সুক্লি-দুর্ঘটনা মুচিৎকালে ন্যায়ের আশেষ বিপদগোষ্ঠী হইতেছেন।" কলিকাতার সুক্লি-দুর্ঘটনা কিরূপগোষ্ঠী হইতেছেন, কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই মুচিৎকালে বা মুচিৎকালে ন্যায়ের নামও কখন শুনেই নাই—ইহাতে উক্ত সহস্রের ভারতবর্ষের বিশেষ পরিচয় পাওয়া উঠেছে। যিদেশীয় লোকের পক্ষে ভারতীয় কৃষির বৃহৎ অংশই হওয়া আরও কঠিন। গ্রন্থের বিষয়, এতাব্যবহাল এক্ষণে রাষ্ট্রের পরিচয়, উৎকোচ-রাজ এই সমাজ বিপর্যয়ী সুখিলেন না। ডাক্তার মহা-শয় রসায়নজ্ঞ বটেই, কিন্তু কৃষিকি কি বলেন? তিনি আপন দেশের কৃষিই জানেন না, আমাদের দেশের কৃষি সুখিলেন কি? আমাদের বিবাস, ইহা অপেক্ষা একজন শিক্ষিত চম্ভুদান বিলাতী কৃষককে এক্ষণে 'কিছু দিনের জ্ঞান আনিয়া দাওঁ', তিনি কতগুণা কর্তব্য পরামর্শ দিলেও দিতে পারিলেন।

ডাক্তার মহাশয় শেষে বলিয়াছেন, আরতীয়

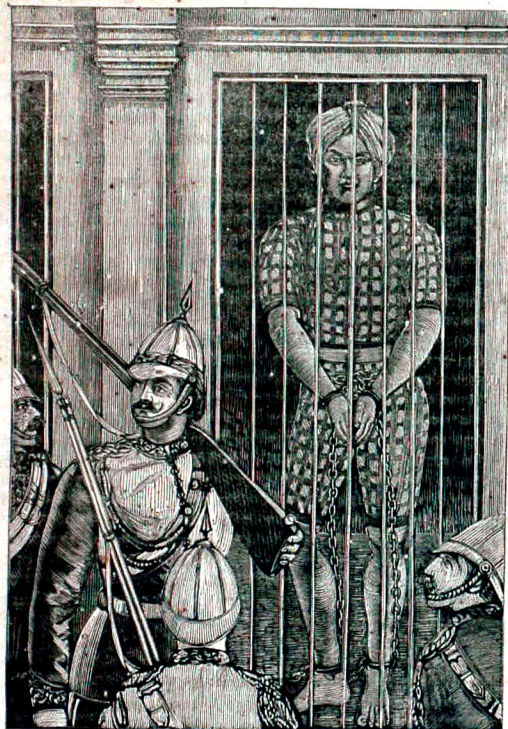
কৃষকের প্রকৃতপক্ষে কেবল মাত্র একটা লুপ্ত সার আছে, অর্থাৎ গোবর সার। তবে হাড়ের কণাতি তিনি কি অকপূর উড়াইয়া দিতে চাহেন? ভারত-বর্ষের লোক অর্জন-কীর্তির অভাবে ব্যথা হইয়া গোবর পোড়িয়া থাকে। ক্রমে জালানী-কার্তের অভাবের সুক্লি হইতেছে, কাজেই গোবরের উপর নির্ভর করিলে আর চলিলে না। হাড় উৎকৃষ্ট সার, যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহার স্বর্ভ কোন ব্যবহার নাই। তাহাতে কৃষকের ইহার ব্যবহার শিক্ষা করে, তাহার বিদ্যমত চেষ্টা করা উচিত। আমরা জানি, হিন্দু-সমস্বেপ হাড় ব্যবহার করিতে এখনো আপত্তি করিলেন, কিন্তু দুই একবার ইহার গুণ দেখিলে, তাহাদের সে আপত্তি শূন্যই হইবে।

স্বদেশের প্রশংসাবাদ অতি শ্রুতিদূর, আমা-দের দেশের কৃষি অতি উৎকৃষ্ট, আমাদের লাভস দেশের বিশেষ উপযোগী, ইংরেজ রসায়নজ্ঞ পণ্ডিতের হুগে, এ কথা, সত্য হউক মিথ্যা হউক, তনিয়ে মনটা একটু বসী হয়। আপন আপন দেখাও অভাব জ্ঞাত হওয়া, উন্নতির প্রথম ও প্রধান সোপান; উহা জ্ঞাত না হইলে কোন-কর্ম্মই সম্ভব না। তাই বলি, আমাদের কৃষকের বদন বড়ই হুগুগু, বদন কবির অংশই দেখাও অভাব আছে। দেখা কি এবং অভাব কোথায়, অহসজ্ঞান দয়া বাহির করিয়া, তাহাদের বদন ও হীকরণ, প্রকৃত বিজ্ঞ ও দেশবিশেষীয় কৃষিক। তাহারা কৃষির কোন দেখা দেখেন না, তাহারা ভণ্ড-দেশবিশেষী, তাহারা ডাক্তার ভেলকারের কথায় একেবারে মতিচূরী হইলেন, তাহাদের সহিত আমাদের কোন মত-জ্ঞান নাই। ডাক্তার ভেলকারের ভারতগমনে কোন হুগল কলিবে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু এই যে একটা মহা ক্লেশ কলিবে, তাহা নিশ্চয়। আমাদের বিবাস, প্রকৃতপক্ষে ও ভারতভিজ্ঞ লোক, ডাক্তার মহাশয়ের আভাত্ত; শ্রুতিহৃৎকর মনোহাণ্ডলী কথায় কুণিবে না।

আমাদের দেশের কৃষির প্রকৃত অভাব কি, তাহা আর এক দিন আলোচনা করা যাইবে।

প্রীগিরিচন্দ্র বসু।

বন্দী বীর চীকেন্সজিং।



• মণিপুরের বীর বন্দী।

We must consider who the Senapati is. He is a man of great ability and force of character, and popular among the people for his generosity, which is one of the highest virtues among Orientals.

I confess that I think the Government of India are very likely right, when they consider that it is better, that great abilities and independence such as distinguished the Senapati should be considered a disqualification for State service—that it is perhaps on the whole better and more for the safety of the world, that you should depend upon mediocrity

Sir John Gorst.

পার্বমেন্ট-মহাসভার ভারতের অগুর সেক্রেটারি মার জন পরষ্ট এই কথা বলিয়াছেন। তিনি যাঁহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই,—

“মণিপুরের ভূতপুত্র সেনাপতি কর্ণাৎ বুবারাজ চীকেন্সজিং বড়ই ক্ষমতাশালী পুরুষ, তাহার অগুরে পৌরুষের লেশমাত্র নাই। যে উদারতা এবং বদান্ততা প্রাচ্যমন্ডলে অদ্বান ওণ বলিয়া পরিচিত, সেই উদারতা এবং বদান্ততাওণে তিনি মণিপুরী প্রজাবর্গের বড়ই অমুরপতাজন ছিলেন।

“কিন্তু এইরূপ শক্তিমত্তা, যোগ্যতা এবং স্বাধীনতা, চীকেন্সজিংয়ের পক্ষে ওণ না হইয়া পোষ হইয়াছিল। এরূপ ক্ষমতাশালী ও অতিযোগ্য লোককে রাজ্যে রাখিলে জৈবের অনিষ্ট। যাঁহা সৈর শক্তি ও যোগ্যতা মধ্যবিরূপ, তাঁহাদিগের উপরই নির্ভর করা উচিত।”

ভারতবর্ষের যিনি বিলাতের সহকারি মন্ত্রি, সেই মার জন পরষ্ট নিজে বলিতেছেন,—“চীকেন্সজিং রাজস্বসম্পন্ন, ক্ষমতাশালী এবং যোগ্য বলিয়াই, ভারতবর্ষমেন্টের—বড় লাট লেনডাউনের বিরপতাজন হইয়াছিলেন।” এরূপ উচ্চশ্রুতির লোককে রাজ্যে থাকিতে দিলে, জগতের বড় অনিষ্ট হউক আর নাই হউক, ইংরেজের ভারতরাজ্যের

যে অনিষ্ট হইবে, মার জন পরষ্ট বলিতেছেন, বড় লাট লেনডাউন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই তাঁহাকে পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্দাসিত করিতে বিদ্যাছিলেন।

চীকেন্সজিংয়ের বা ভারতবর্ষমেন্টের পর-রাষ্ট্রনীতি বা স্বরাষ্ট্রনীতি লইয়া আমরা আলোচনা করিব না; ইংরেজের রাজনীতি লইয়াও আলোচনা করিব না; চীকেন্সজিংয়ের দোষ-ওণ এবং ভাণ্ডা-অভাণ্ডা লইয়াই অন্য আমরা আলোচনা করিব। অগুর ‘সেক্রেটারি মার জন পরষ্ট বলিতেছেন,—“চীকেন্সজিংয়ের যিনি ক্ষমতা, যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উদারতা, বদান্ততা এবং প্রজাবর্গদীনীলতা না থাকিত, তাহা হইলে, মণিপুরে তাঁহার আধিপত্য হইত না; আর তাহা হইলে, ভারতের বড় লাট তাঁহার ভরসেই হইতেন না। ভারতের বড় লাট চীকেন্সজিংয়ের ওণ দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে ভারতের লোক বলিয়া” মনে করিয়াছিলেন। আর সেইজন্যই তাঁহাকে, তাঁহার পৈতৃক, রাজ্য হইতে, বর্ণপুরুষ নির্দাসিত করিতে বিদ্যাছিলেন। চীকেন্সজিং বীরপুরুষ, বুদ্ধিমান এবং সাহসী পুরুষ, নিজওণে প্রজাবর্গের অমুরপতাজন ছিলেন, তাই বড় লাট মনে করিয়াছিলেন, তিনি জয়সর লোক। চীকেন্সজিং মণিপুরমন্ত্রণের জন্য সুরচক্রকে সুরা-ইয়া বৃগচক্রকে রাজ্য করিয়াছিলেন, তাই ভারতের বড় লাট তাঁহাকে ভারতের লোক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। চীকেন্সজিংয়ের কাণ্ডে মণিপুরের সকল প্রজা মগ্ধ হইয়াছিলেন; রাজকর্ষা হুচক্ররূপে মণিপুর হইতেছিল; তাই বড় লাট লেনডাউন তাঁহাকে ইংরেজরাজ্যের শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

যাঁহা অমুররাজ্যে ওণ, তাহা হইতেই ইংরেজের ভাণ্ডা-রাজ্যে পোষ। ওণের জগ্গই চীকেন্সজিং বড় লাটের বিরপতাজন হইয়াছিলেন। চীকেন্সজিং কেই বলে—চীকেন্সজিং চীকেন্সজিংয়ের নামে, ভারতের ওণে।

মার জন পরষ্ট মুকুর্ভে স্বীকার করিয়াছেন, ইংরেজের বৈদেশিক রাজ্যে কোন ক্ষমতাশালী লোককেই অস্তিত্ব থাকিতে পুরি না। বৈদেশিক রাজ্যে ক্ষমতাশালী লোক থাকিলে, ব্রীটিশ রাজ্যের আশঙ্কা আছে, তাহা আমরাও স্বীকার করি না। আর এরূপ ক্ষমতাশালী লোকের বড় ওণই যে, ইংরেজ-শাসন-প্রতির চক্রে পোষ বলিয়া প্রতিষ্ঠাত হইবে, তাহাও আমরা বুঝিতেছি।

টাকেশ্বরজিৎ বীরপুরুষ ছিলেন, রাজনীতি-বিদ্যাও তিনি পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার গুণ মণিপূরের যত প্রশংসা-সৌভাগ্য ছিল, সার জন পরাই বলিতেছেন, এইজন্যই বড় লাট লেন্সডাউন তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহাতে আমরাও লর্ড লেন্সডাউনকে ধোঁকা দিই না। কে বল, বিজিত রাজ্যের প্রজাকে প্রবল হইতে দিতে পারে?

বড় লাট লেন্সডাউন যে, টাকেশ্বরজিৎকে ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন; আর সেইজন্যই যে, তাঁহাকে নির্দোষিত করিতে চাহিয়াছিলেন; তাহা আমরা বুঝিতেছি। তিনি যদি সার জন পরের দ্বারা স্পষ্টাঙ্গের মনের কথা বোঝিত করিয়া, টাকেশ্বরজিৎকে প্রভুত সৈন্যসাহায্যে পরাজিত ও বন্দীভূত করিতেন, যদি তাঁহাকে বুক-কৌশলে হত্যা করিতেন, তাহা হইলে, আমরা বিস্মিত বা বিব্রত হইতাম না। স্পষ্টে কথার এবং স্পষ্ট কার্যের আমরা বড় ভুট হইয়া থাকি।

কিন্তু লর্ড লেন্সডাউন স্পষ্ট কথা বা স্পষ্ট কার্যের কথা দিয়াও যান নাই; সার জন পরের বৈরুপ রাজনীতির পক্ষসমর্থন করিয়া, বৈরুপ স্পষ্ট-বাদিতার পরিচয় দিয়াছেন, লর্ড লেন্সডাউন যদি, সেইজন্য রাজনীতির পক্ষসমর্থন করিয়া, সেইজন্য স্পষ্টবাদের পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে, আমরা বিব্রত হইতাম না। "টাকেশ্বরজিৎকে মত অনুভাশাও ও গুণবান লোককে ভাঙের কোন রাজ্যে বা হুদাঙ্গি রাথিতে দেওয়া, আমাদের পক্ষিত্র-সম্মত নহে; অন্তরঃ আমরা টাকেশ্বরজিৎকে ক্ষম্য করিব; তাঁহাকে নির্দোষিত করিয়াই হউক, আর প্রাণে মারিয়াই হউক, আমরা নিষ্কণ্টক হইব। এইজন্যই তাঁহাকে ছল বসে কৌশলে সঙ্গাইতে গিয়াছিলাম।" লর্ড লেন্সডাউন যদি এই কথা বলিতেন, তাহা হইলে ত আর আমরা কথা করিতে পারিতাম না।

রুশী-পারস্যের মত বা ভারত-পারস্যের মত রাজ-নীতি আমাদের আলোচ্য নহে; বিজিত প্রবল রাজ্যের রাজনীতি কেবলমূল, বিজিত দুর্বল প্রবল রাজ্যের রাজনীতি কেবলমূল, সার জন পরই বলিতেছেন, ইহাওকাজ টাকেশ্বরজিৎকে লজ্জা যে কৌশল বাটাইতে গিয়াছিলেন, সর্বত্রই সেই কৌশল বাটাইয়া গেলেন। বলিতেছেন, "নিউজিল্যান্ডের আমির বাজকে রুশী-পারস্যের একইরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার জুরাজে

রাজ্য কেটেমোরোকে এইরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মিশরের আরবিশাখা এবং জরুরশাখাকে এইরূপে অবসর করিয়াছিলেন। ভারতের টাকেশ্বরজিৎকেও এইরূপে অবসর করিয়েন।" তিনি বলিতে পারি-
বেন, "কারুলের আদ্র ও যাকুবকে এইরূপে অবসর করা হইয়াছে; অবাধ্যার ওয়াখি আলিকে এইরূপে অবসর করা হইয়াছিল; পাঞ্জাবের আল শিখ সর্দার এবং গিলের অনেক আমীরকে এইরূপে অবসর করা হইয়াছিল; ওপোলের জলদাহারকে অবসর উৎসর্গ না করা অস্বস্তিত হইয়াছিল।"

এইরূপ এবং অসংখ্য অনেক কথাই সার জন পরই বলিতে পারিতেন; আমরা তাঁহার কথায় কোনরূপ আপত্তি করিতাম না। কিন্তু আপত্তি করিতেছেন, তাঁহার সম্মেলনগণ; পার্লামেন্টে তাঁহার মত প্রতিনিমিত্ত। ইংরেজের কথার ইংরেজেরাই প্রতিবাদ করিতেছেন, আমরা কেবল তন্নিয়া হাইতেছি মাত্র।

লর্ড লেন্সডাউন যদি এখনও স্পষ্টাকরে বলেন, "সার জন পরই যাহা বলিয়াছেন, আমিও তাহাই বলি। মতাই আমি টাকেশ্বরজিৎকে, গুণবান ও ক্ষমতাশালী বলিয়াই, উৎসর্গ করিতে গিয়াছিলাম; এখনও উৎসর্গ করিতে চাই। ভারতের যে কোন রাজ্যে যে কোন ব্যক্তিই ক্ষমতাশালী হয়, তাহার ভয়েই আমরা ভীত। আমরা যে কোন প্রকারেই হউক, তাহাকে উৎসর্গ করিতে চাই। বিশেষ এইরূপে আমাদিগকে আশঙ্কিত করিতে হয়; এই-রূপেই আমরা কাঁপাকাঁপ করিয়া আসিতেছি। যাহারা রাজনীতির সহিত বর্ণনাত্মক নিম্নোক্তে চাষ, স্রামিতাধিপিককে নির্দোষ বলিয়া মনে করি। রাজনীতির সহিত বর্ণনাত্মক মত ব্যক্তি পেরে না। যখন পরের রাজ্যে দক্ষিণ দখল করিতেছেন, তখন বাহ্যতে পরের রাজ্য চিত্রকায় আমাদের হাতে থাকে, তাহার উপায় করিতেই হইবে। টাকেশ্বরজিৎকে স্রাও ও শক্তিমূল লোক-
নিগণে—রাজস্ব-নিগণকে—রাজ্যে থাকিতে দিলে, আমাদিগকে আজ না হউক, এক দিন না এক দিন অবশ্যই বিপর হইতে হইবে; সুতরাং ইহাশিগকে উৎসর্গ করিতেই হইবে।"

লর্ড লেন্সডাউন যদি এখনও স্পষ্টাকরে এই কথা প্রচার করেন, আর তাহার পরই টাকেশ্বরজিৎকে দুর্বল করিলে, তাহা হইলে, আমরা দুঃখিত হইব না। কিন্তু লেন্সডাউন সার জন

পরের দ্বারা সোজা পথে "হাইতেছেন না। তিনি বলিতেছেন, "টাকেশ্বরজিৎ অতি ভীত মনলোক; তাহার জন্ম মণিপূর বিপর হইয়াছিল; মণিপূরের প্রজারা তাহার জালায় জ্বালাতন হইয়াছিল; মণিপূরের মঙ্গলার্থই আমি টাকেশ্বরজিৎকে নির্দোষিত করিতে গিয়াছিলাম।"

এই পরাধীনতার বৃদ্ধি আমাদিগকে বিরক্ত করিয়াছে। বড়লাট যে, পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতারও পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। তিনি "হাইউমকে বণিয়া গিয়াছিলেন, "আমি বড় লাট থাকিতে, টাকেশ্বরজিৎ একজন রাজাকে সরাইয়া আর একজনকে রাজা করিল; তাহারই অপরাধ ক্ষম্য নহে। যে ব্যক্তি আমাদিগের আশ্রয়-আজ্ঞা না লইয়া, আমাদিগের মত-ভেদ না লইয়া, এইরূপ ক্ষমতা চালাইতে পারে, তাহাকে আমরা রাজ্যমধ্যে রাখিতে প্রস্তুত নহি।"

বড়লাট লেন্সডাউন যদি শুধু এই স্বার্থপরতার বৃদ্ধিজন্যই নিশ্চিত হইতেন, যদি তিনি টাকেশ্বরজিৎকে নিরুপস্থান অত্যাচারী প্রভুতি বিশেষণে বিশেষিত না করিতেন, তাহা হইলে ত আমরা কোন কথাই বলিতে পারিতাম না।

লর্ড লেন্সডাউন যদি সার জন পরের মত সোজা পথে গিয়া, প্রভুত সৈন্য-সামন্ত-সাহায্যে টাকেশ্বরজিৎকে বধিয়া আনিতে, আনিতে আনিতে তাঁহাকে পশ্চিমঘোঁড়—তাৎপার মনে উড়াইয়া দিতেন, যদি মণিপূরবাসীরা শুষ্ক বীররাজ্যে অধিন-পতন করিতেন, যদি স্বার্থপরতার সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতার ভীতি না দিতেন, তাহা হইলে ত আমরা অজ্ঞান কোন কোনমতেই বোকা করিতে অগ্রসর হইতাম না।

লর্ড লেন্সডাউন প্রমাণে পড়িয়াছেন, এখনও প্রমাণ-সাপরে হস্তান্তর হইতেছেন। টাকেশ্বরজিৎ রুশী-প্রজাদের শত্রু নহেন, বরংই রুশীপ্রজাদের ও রুশী-প্রজাদের পলিটিক্স একজের সহিত সন্ধা রাখিয়া চলিতেছিলেন; কিন্তু বড় লাট লেন্সডাউনই ইহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিলেন। যে গুণে, সার জন পরের ভয়ে, টাকেশ্বরজিৎ গুণবান বলিয়া শত্রু, লর্ড লেন্সডাউন যদি তাঁহাকে সেই গুণের জন্ম জন্ম বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে-
প্রমাণে পড়িতেন না। তিনি যদি প্রবল টাকেশ্বরজিৎকে দুর্বল করিবার জন্ম সোজা পথে গমন করিতেন, তাহা হইলে, প্রমাণে পড়িতেন না।

তিনি যদি "হাইউমকে কৌশল-জাল বিস্তার করিতে না বলিতেন, তাহা হইলে, প্রমাণে পড়িতেন না। তিনি যদি কাকে অবশেষে একশেষ করিয়া কথার ধর্মের পান না করিতেন, তাহা হইলে, প্রমাণে পড়িতেন না। তিনি যদি প্রথমে নিজের সোণে বিভীষিকা স্রষ্টাইয়া, হাইউমানির হত্যার পথ প্রশস্ত না করিতেন, তাহা হইলে, প্রমাণে হইতেন না।

আবার, বিভীষিকার পর বিচারের অভিনয় করিয়া, লর্ড লেন্সডাউন আরও প্রমাণে পড়িয়াছেন। "হাইউম প্রভুতি টাকেশ্বরজিৎকে বন্দী করিতে গিয়া-
ছিলেন; তাঁহাকে ধরিবার জন্ম জাল-পাততে গিয়াছিলেন। অন্তর্ভোগে আপনাকেই হত হইয়া-
ছিলেন, জালে পড়িয়াছিলেন; জালে পড়িয়া শেষে মন্ত্রণব্যবস্থাপিত হইয়াছিলেন। যে কৌশল তাহাকে মন্ত্রণব্যবস্থাপিত করিতে গিয়াছিলেন, সেই কৌশলে আপনাকেই পড়িয়াছিলেন। ইহারা গিয়াছিলেন টাকেশ্বরজিৎকে উৎসর্গ করিতে, ইহায়েন আপনাকেই উৎসর্গ।

অতঃপর একজন বটীয়া থাকে। "পরকে বন্ধিত করিতে গিয়া নিজে বন্ধিত হইলে, লোককে কোড়িতে রাখে আরোহণে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া থাকে। লর্ড লেন্সডাউনও যে, ক্ষিপ্তপ্রায় হইবেন, তাহা বিজিত নহে। আর বাহার হাতে লালনা ঘটাইলে, তাহার হৃৎপাত করিতে যে, লর্ড লেন্সডাউন অভিজানী হইবেন, তাহার আশ্চর্যের বিষয় নহে। টাকেশ্বরজিৎকে জন্ম লালনা হইয়াছে; তাঁহাকে হাতে পাইয়াছেন; লর্ড লেন্সডাউন এখন তাঁহাকে লইয়া মাঝা ইচ্ছা করিতে পারেন। আশুনে পোড়াইতে পারেন, হুতর দিয়া বাওয়াইতে পারেন, তাহা পোড়াইতে পারেন, কীভাবে লুণ্ঠাইতে পারেন; কি কি বিচারের অভিনয় কেন? "লোক-লোভনে কামিন কেন? টাকেশ্বরজিৎকে বিরুদ্ধে সাক্ষ্য "সাদৃশ্য লওয়া কেন? "ভরি তদারক তদন্ত কেন? "যখনের পর এক প্রহসনের আয়োজন কেন? "বিচারের অভিনয়েই ত লর্ড লেন্সডাউন অধিক প্রমাণী হইয়াছেন।

আবার যদি বিচারের ব্যবস্থা করিলেন, তাহা যে বিচারে বিভীষিকা ঘটাইতে গিলেন কেন? টাকেশ্বরজিৎকে উপরূপ বিচারালয়ের অধীন করিলেন না কেন? এ যে হইল, না এদিক না ওদিক। কোর্ট মার্শলে সামরিক-বিচার হইল না, বিনা বিচারে তাহা উড়ান হইল না, আবার যথার্থি

উপযুক্ত বিচারালয়ে উপযুক্ত বিচারপতিদের কার্যেও ত বিচার হইল না। বিচারের সময় আসামীর বিরুদ্ধে স্থবিচারের সুযোগ সাধ্যা পান, টীকেসজিওর সেইরূপ সুযোগ সাধ্যা পাইতে দেওয়া হইল না কেন? এ যে হইল, প্রমাণের উপর প্রমাণ।

বিচারের ব্যক্তিভার হইল; আশীশে স্থবিচারের সুযোগ দেওয়া উচিত। কেন তখন টীকেসজিওর আশীশ বিচারের সময় কৌশল দিতে দেওয়া হইল না? কেন একজন সাক্ষ্য বিরোধেই 'কিন্তু' রাখা হইতে? লোকের বলে, টীকেসজিওর আশীশ শুনেও বড় লাট নিজে অভিযাচী ছিলেন না; বিলাতী উত্তেজনাই তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে। যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলেও ত, মোকাদ্দা পক্ষে ভাটা উঠিত ছিল। যখন আশীশই ফলিত হইল, তখন আসামীকে কৌশল দিতে দেওয়া না হইল কেন? এ যে লেখিতেছি, মহাপ্রমাণ।

এদিকে, মণিপুর যে, বৃত্তিশ অধিকারভুক্ত, তাহা এখনও প্রতিপন্ন হয় নাই, বরং বিলাতের মন্ত্রী-দিলকেও মানিতে হইয়াছে, মণিপুর আশ্রিত হইলেও, বৃত্তিশের অধিকৃত রাজ্য নহে। মণিপুর যদি অধিকৃত রাজ্য নহে, তবে সেখানে ইংরেজ নিক্তর আইন চালাই কি বলিয়া? ভারতের কোন্‌রাজ্য আইন ও সাক্ষ্য আইন মণিপুরে চালাই হইল কোন নজীর অনুসারে? মণিপুরের একজন বিচারের ক্ষমতি কয় যে, অভিপ্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রমাণ পদে পদে। বড় লাট পেন্ডাউনকে প্রমাণবিশিষ্ট শ্রেণ্যধর্ম প্রমাণ-সাধনের পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে। এটা তাঁহার দৃষ্টান্ত—আমাদেরও দৃষ্টান্ত। ভারতের সর্বময় কবী, চরম রাজ-নীতিজ্ঞ, প্রধানতম রাজপ্রতিনিধি, বড় লাট পেন্ডাউনকে সোচ্চ যে, বৃত্তিশপনমেককে দোষী হইতে হইল, ইহার বাড়ী দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে বল!

টীকেসজিওর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা দুঃখিত নাই। তিনি বীর-পুরুষ; পরাজয়ের স্বাধীনতার মঙ্গলসাধন করিতে গিয়া, অষ্ট-পোষে বিপন্ন হইয়াছেন। বৃত্তিশ পার্লামেন্টের বড় বড় রাজনীতিকেরাও তাঁহার গুণ-গান করিতেছেন; তাঁহাকেই মণিপুরের রাজা করেন নাই—অন্য, অনেক বৃত্তিশ রাজনীতিক বড় লাট পেন্ডাউন ও তাঁহার অমাত্য

দিলকে দোষী করিতেছেন। তাঁহাকে কৌশল-জ্ঞান বলা করিতে পিয়াছিলেই বলিয়া, সত্য বই-ও না। জাতিতে বেন্দুজাউন বৃত্তিশ পার্লামেন্টে বৃত্তিশ প্রতিনিধিদের কাছে নিখিত হইতেছেন; বৃত্তিশ সংসদ-পক্ষে ভিতরত হইতেছেন।

টীকেসজিওর যে, অস্থির পিঠাও নহেন, তিনি যে একজন প্রকৃত বীরপুরুষ, পরেশহিতমী ও গুণবান পুরুষ, ইহা সহকারী মন্ত্রী শ্রীর জন গরুড়েরও বলা করিতে হইয়াছে। তিনি যে, পরেশবীর প্রজাপুঞ্জের হিতার্থেই সদা ব্যস্ত থাকিতেন, তাহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইতেছে। আর তিনি যে, আশ্রয়কার জন্ত বৃত্তিশ সেনার আক্রমণে বাধ্য দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাও ইংরেজের বিচারেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বিশিষ্টগণি স্বপ্নওনয়। অষ্ট-পোষেই মণিপুরের প্রকৃত রাজা টীকেসজিওর এবং তাঁহার দুই সহোদর আজ স্বাক্ষরে স্বাধীন প্রাঙ্গণে বলা হইয়াছেন; বীরবর আজ অষ্ট-পোষে শূন্যস্থান। তিনি যে, শূন্যস্থান হইবার উপযুক্ত অপরাধী নহেন, তাঁহাকে যে অকারণ বলা করা হইয়াছে, তাহা বৃত্তিশ পার্লামেন্টের বৃত্তিশ প্রতিনিধিদেরও মুকুটেরে বলিতে হইয়াছে। আমরা তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আর আশ্বাস নাই। বীরভায়ে বৃদ্ধরা, আবার বীরভায়েই কারাবাস। জগতের অনেক বীর অনেক সময় এইরূপে শূন্যস্থান হইয়া, বলিভাবে কালাপান করিয়াছেন, বিপক্ষহস্তে প্রাণ দিয়া, ইহলোকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। ইতিহাস জীবন্ত চিত্র; টীকেসজিওর এককী নহেন।

পেন্ডাউনের বিচারালয় টীকেসজিওর প্রাণ-দেও দণ্ডিত করিয়াছেন, পেন্ডাউন নিজে চূড়ান্ত নীতিমালা করিয়াছেন। টীকেসজিওর মন-পাচন এখন তাঁহার উপরই নির্ভর করিতেছে। লর্ড পেন্ডাউন মণিপুর ব্যাপারে প্রমাণবিশিষ্ট প্রমাণী হইয়াছেন; শেষেও প্রমাণী হইবেন কি না, টীকেসজিওর ও তাঁহার সহোদরদের প্রত্যয় অনুমোদন করিবেন কি না, তাহা তিনিই জানেন।

আমরা কিন্তু চরমের তত্ত্বও প্রকৃত হইয়া আছি। বীর রাজপুত্রকে যে যজ্ঞা সাহ করিতে হইয়াছে, যে যজ্ঞা সাহ করিতে হইতেছে, যে যজ্ঞা এখনও সাহ করিতে হইবে, মৃত্যুবরণা কিছু আর তাহার নিজের অঙ্গক নহে। স্বরাজ্যের প্রকৃত রাজা হইয়া, তিনি আজ নিজের শৌর্য, বীর্য, সাহস,

স্বমিত্রতা, প্রজারঞ্জনশীলতা, বলাভ্যতা প্রভৃতি গুণের জড়ই, বৃত্তিশ-শক্ত না হইয়াও, বৃত্তিশ সেনাকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, লাঞ্চিত হইয়াছিলেন, এখন বৃত্তিশের জন্ত স্বীয়-পাশ্চাত্যপ্রাঙ্গণে বলাভ্যতা ও শূন্যস্থান বহু হইয়া মৃত্যুবরণা ভোগ করিতেছেন, প্রকৃত মৃত্যুবরণাও তাঁহাকে আর অধিক কষ্ট দিতে পারিবে না।

কড় লাটের চূড়ান্ত বিচারে প্রাণদণ্ড ও বজায় থাকিলেও, টীকেসজিওর আর অধিক দণ্ডিত হইবে না। রাজা পিয়াছে, স্বাধীনতা পিয়াছে, আছে কেবল প্রাণটা। এ প্রাণ থাকিলেই কি, আর গেলেই কি? টীকেসজিওর ভবিষ্যৎ এইখানেই সাধ হইয়া গিয়াছে। ঐ শেষ পাঠক; কারাক্ষত শূন্যস্থান বীর যেন ভবিষ্যতের জন্ত প্রকৃত হইয়া এত দুঃখেও আনন্দের হালি হামিওনেন। যিনি মৃত্যুর জন্ত প্রকৃত; মৃত্যুভয়ে তিনি ভীত হইবেন কেন?

মহাবিদ্যা—সাধন ।

যজ্ঞী মহাবিদ্যা—ছিন্নমস্তা-ধ্যান ।

প্রত্যাত্মাট্যপাং সর্বৈব ধর্ম্যোঃ ধিঃ শিবাঃ কৰ্ণকং বিশ্বাং প্রকবক্ষশোভিতমুখ্যধারায় পিতৃব্যং মুখ্য।
নাগাবধুশিরোমণিঃ জিনয়ঃ হস্তাংপশ্চাৎপদভাং
প্রত্যাসকলমোজোবায়বিশ্রুতাং যজ্ঞোজ্ঞসমিতিম্ ॥
দধে চাতিগিতা বিমুক্তচিত্তরাঃ কর্ণাং তথা ধর্ম্যং
হস্তাভ্যাং দধতী রজ্ঞোওপকথা ন্যাস্যি সা বাধনী।
যেবাশ্চিন্দ্রকবজতঃ পদম্বধ্যাং পিতৃব্যং মুখ্য।
নাগাবধুশিরোমণিঃপ্রব্রীষ্য যোগ্য সা সা যজ্ঞৈঃ ॥
যোযা বা প্রণয়ে সমস্তজুবং তজ্জুঃ কমা তামনী।
শক্তিঃ সাপি পরাপ্যত তবযতী ন্যাস্য পরা ভাঙ্কিনী ॥

নবমুদ্রকমলকর্ণিকা মধ্যস্থত ॥

হৃশোভিত ভিনওপে ত্রিকোণমণ্ডল ॥
কামোপার রতিরতা বিপরীত শোভা ॥
তত্ত্বপরে ত্রিভুজা উপাধী তাত্য পায় ॥
আদীত সে অধিপদ ভদ্রর অভি ॥
রক্তজ্বা-সম্ভিত বরণে মহাভোজ ॥
ধৃগে কর্তন কর মস্তক আপান ॥
বায় বামহস্ততর্পণে মরেন স্থাপন ॥
কণ্ঠেতে উদাত রক্ত তিনবার মুখা ॥
মধ্যধার, নিম্নমুখে মিটিতে মুখা ॥

যেই যেই যেই যেই নাচিয়া নাচিয়া।
ভাঙ্কিনী বর্ণিনী সখা হুই ধার পিয়া ॥
নাগবক্ষ শিরোমণি অলঙ্কৃত হুং ॥
বিমুক্ত চিত্তের করে যেনে চমকিত ॥
জিনয়ী ধর্মণি করেছে অঙ্গিধার।
দৃষ্টিতে কলিত করে ধর্ম মর্ত্য ধরা ॥

ছিন্নমস্তে দেবি, তব পদ সেবি,
দেবি যে করুণাবিশ্ব ॥

প্রত্যাত্মাট্য পদ, শঙ্কর-সম্পদ,
দশনয পদ হুং ॥

শঙ্কর-বনিতা, রতি-পূর্তে স্থিতা,
ধরন আসি হস্তা ॥

ইক্ষুর পাঙ্কতি, ধর এ মুহুতি,
জ্ঞানক ছিন্নমস্তা ॥

মধ্যে স্বীয় শির, পিণ্ডে রুধির,
ভাঙ্কিনী বর্ণিনী ॥

দ্বন ধোর ছটা, প্রণয়ের ছটা,
উৎপন্ন কর মা ধামে ॥

চরণ ছটল, চন্দ্রিমাটল,
উজ্জ্বলে শরীরে নব ॥

গিরিরাজহস্ত, হস্তিসারভূতা,
নামনি চরণে তব ॥

যোগদায়ী নাম, প্রকবক্ষোপ-ধাম,
দীর্ঘ কর ব্রহ্মছায়া ॥

ধ্যানজিত্রা যোগ, তব ত্রিভুজ ভোগ,
যোগিনী স্বং যোগনিজা ॥

বালবিদ্যোচন, সমজ্ঞোচন,
নিভায় রজনী দিবা ॥

ভুবনমোহিনী, অচ্যুতবর্হিনী,
মিন-মোহোক্তি শিবা ॥

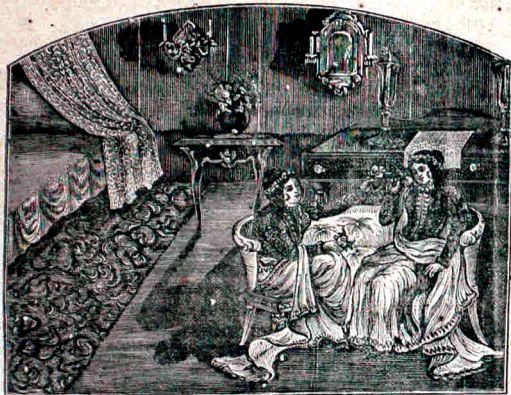
একারণ জলে, বিম্বুরে ভাসলে,
নিজে হলে ঝটপা ॥

স্বর্গ তল ভূমি, ধোনেতে তুমি,
চিন্তনক স্বায়ী তত্ত্ব ॥

বরদ গোমাতা, সে কীরাদেশারী,
যোগনিজা ভূমি সতী ॥
আধারবাসিনী, হুংলুওলিনী,
ব্রহ্ম স্বং সে প্রকৃতি ॥

শ্রীরসিকচন্দ্র রায় ।

চামেলি ও গোলাপসুন্দরীর ফুলখেলা।



ब्रह्मानाथ ।

গোলাপসুন্দরী প্রকরণ

अक्षय्य परिच्छेद ।

চামেলি। 'ভাই কুরঙ্গ! তোমার হাট' এত
শুক কেন? 'স্বাস্থ্যগুণ' এত কড়া কেন? 'শরীর'
এত পাতলা কেন? যদি তোমার টুকটুকে মুখখানি
না থাকিত, যদি তোমার কথাগুলি মিষ্ট না হইত,
তাহা হইলে 'কিছুতেই' তোমাকে লইয়া এক
বিজ্ঞানীর গুইতাম না।

কুরব। (স্বপ্নত) উঃ, তবে বেধিতেছি,
চামেলি দিদি যদি আমাকে মুচির মেয়ে বলিহ
আনিত পারেন, তাহা হইলে, আমাকে নিচুই
কাজে স্ততে নিবন না—হরত এ ধর থেকে উঠিয়ে
নিবেন—হরত আমার ছেঁয় পর্যন্ত মাড়বেন না।
মাঝা কণা বজা হবে না—কার্ত্ত শেখর, কার্ত্ত
একট পোষর কল্লি আমি হাত ভেদে দেয়ে,—

এ কথা বলা হবে না;—খেতে না-পেয়ে আমি যে, এত রোগী হয়েছি, তাহাও বলা হবে না; তবে দিনিকে বলি কি ?

চামেলি। ভাই! চুপ করে রৈলে যে ? কথার
উত্তর দাও না। না,—তোমার ঘুম পেয়েছে—

কুপ্ত। না দিদি, আমার ঘুম পায়ে নাই :—
তবে এই ভাব্চি, ভগমান আমার হাত শক্ত করে
দিয়েছেন, আমাকে পাতলা,—রোগা করেচেন,—
আমি কি করবো ?

চামেলি। ভগবান এমন অসমিক,—আনাড়ি—
 কেন ভাই ? তবাবান তোমার এমন রূপ দিলেন,
 এমন গুণ দিলেন, এমন কোকিল-কণ্ঠ দিলেন,
 চামর জিনিয়া এমন কেশ দিলেন ;—কিন্তু এমন
 শব্দ অস্বপ্ন, শব্দ হাত, পাতলা ছিপুচ্ছিপে
 পাকুদিটে চেহারা দিলেন কেন ভাই ?

কুরহ। কেমন করে জানিবো দিদি ?
এমন সময় দরজায় কে যেন ঝংঝং ধাক্কা দিল,—
দুইতীবর ঠুকঠুক শব্দ হইল। ভয়-চকিতা হরিণীর
দ্বায় কুরহ জ্বমনি কাণ খাড়া করিয়া রহিলেন।

আবার একবার সেইরূপ শব্দ হইল। কুর্ত্ত সম্মুখে
ধার আঙুলে চামেলিকে জিজ্ঞাসিলেন,—“নিদি।
ও কিম্বের শব্দ?”

हामेलि । अथ कि १-७ किछु नम

করছ। না—দিদি।—ঐ যে আবার শপথ
হলো। আমার ভয় করছে।

চামেলি তখন দ্রুত হাঙ্গিরা, বিল্ডা হাঙ্গিরা
 ঐক্যের ধরেন শিল্পবলেন। হিহি কুত্ৰিয়া হাঙ্গিরা
 উজ্জ্বলের গলপবেশা ধাক্কা দিলেন। যিনি গলপবেশে
 দ্বারা হাইলেন, তিনিও হাঙ্গিরা হাঙ্গিরা পলাইয়া
 দিলেন। চামেলি হাতাকে ভড়াইয়া, ধরে ছুটিল
 আবার শিল্প দিলেন। বলিলেন—“জুয়ে জুয়ে
 গল্প করার হুকিবে হেছেজে—এ—এম আমোরা
 বিলাটা কুত্ৰিকো বিয়া থানিক গল্প করি।”
 এই কথা বলিতে বলিতে চামেলি অর্থনি কুরসে
 হাত ধাক্কা উঠাইলেন। কুরসে কুরসে পূঁজুলে
 গাড়া উঠিয়া দেই চোঁকিতে যিনি বাবলেন। চামেলি
 তখন হুটহুট ফুলের তোড়া, হুটহুট ফুলের মালা কুরসে
 হতে দিলেন। “থানিকগল্প ফুল বেলা চলিল
 হুতু হুতু। এ কিরকম-কাতু-ও মেনে আ
 থাকিতে না। গারিয়া কুরসে-কুজিয়াসিলেন, “নিদি
 আমানদের ধরেন কপোতে যিনি থাকা দিতছিলেন
 তিনি তোমার কে ধন?”

চাংমলি । তিনি আগর ভগিনী ।

কুরান। ছোট না বড় ?

চামেলি। ভুগিনীও ছোট বড় নাই—সব
সমান।

কুর্রের এ কথা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল না জানি না। কিছু, কুর্র কৌতূহল-পরবশ হইয়া প্রথক করিলেন,—“দিদি! সবশুদ্ধ, তোমার ‘ভগিনী’ কয়টি?—এবং তোমার এখানে কয়টি ভগিনী আছে

চামেলি। ভগিনী অসংখ্য। পুরা এক হাজা
না হউক, ন্যূনত নিরানব্বইটোর কম নহে। এখানে
স্বামারা ১৯টা ভগিনী আছে।

করঙ্গ বড়ই বিস্মিত হইলেন,—কিছু অন্তরে
ভাব অন্তরে কতক চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন,—
“নিদি! তুমি কিছু মনে ক’রো না,—আমি জানি
চাইচি—এটা ত তোমার বাপের বাড়ী?”

চামেলির মুখে আর হাসি ধরে না। তিনি উদ্বিগ্ন
 দিলেন,—“আমাদের বাপের বাড়ীও নাই, স্বপ্ন
 বাড়ীও নাই,—সমুদায় পুরুষ, আমাদের ভ্রাতৃ
 সমন্বয় কী আমাদের ভগিনী।”

কুরঙ্গ। দিদি! সত্যি করে বল না,—তোমার
খন্তুর বাড়ী কোথা?

চামেলি। (হাসিয়া) আমার আবার পুস্তক-
বাড়ী কি ?

কুরঙ্গ। তোমার কি আজও তবে বিবাহ হয়
নাই?

চামেলি। (জিহ্বা কাটিয়া) ও,—বিবাহ।
—ইহারই মধ্যে বিবাহ।।—আমার অধি

হাইবে কেন ? এবং আমি এখন এমন লেখা
পড়াই বা কি শিখিরাছি যে, বিবাহের উপযুক্ত হইব
আমি আভিসনের স্পেকটেলর এখনও সম্পূর্ণ

বিবাহ করা উচিত 'কি' টডহাক্টারের 'আলজেব্রার কোয়াদ্রেটিক ইকোয়েশন এখনও' আদিকশিতে শিখি নাই,—সুতরাং এ সময় আমা

মেট্রিক্স মধ্যে আমি তিন-বুক মাত্র পড়িয়াছি;—
টি গননামেট্রিক্স, স্ট্যাটিক্স, ডিনামিক্সে আমি তথ্য
পরিপক্ব হইয়া উঠি নাই;—লজিক, ফিলজফি

শিক্ষিকা এবং এট্রনমিতে আমার তত ব্যাপ্তির জন্ম
নাই; সেক্সপীয়র, মিশ্টন, বেকন এবং চসার
আমার এখনও কর্ণ হই নাই; ইচ্ছা করিলে
আমি আরও শেলির করিতা আবৃত্তি করিতে পারি।

না। সুতরাং আমার এ অল্প বিন্যাস কালে, এ অল্প বয়সে, বিবাহের কথা আরো উঠিতেই পারে না। আগে আমি এন্ট্রান্স পাস নিব, তার প

পাস, তার পর ডিক্লেটশিপ দিব,—তার পর বি-এ
তার পর ডিএল,—অবশেষে বিবাহের কথা মুখে
আনিলেও আনা বাইতে পারে !

কুরঙ্গ এসব কথার প্ররোচিত কিছুই ভাব
নুকিতে পারিলেন না;—তবে মোটের উপর
এই নুকিলেন, চামেলির এখনও বিবাহ
নাই।

কুদৃষ্ট, মুচির মেয়ে হইলেও, বুদ্ধিমতী;—এ
বালিকাকাল হইতেই ভদ্রলোক-ঘেঁষা। সেই
কুরঙ্গ ভদ্রলোকের ভাষার কতকটা কথাবার্তা কহি-
সংসার : এবং ভদ্রলোকের ভাষা কতকটা বুদ্ধি-

মঙ্গল। ব্রহ্ম জ্ঞানে, প্রায়শ্চিত্তের অর্থ
শব্দের অপভ্রংশ; জী শব্দের অর্থ,—মেই
শব্দের অপভ্রংশটি যাহাকে বিবাহ করিয়াছে;

ইত্যাদি বহুবিশ সভ্যকথা কুরঙ্গনয়নী শিলালাভ করিয়াছেন। কুরঙ্গের আর এক গুণ,—যাহা একবার শুনে, তাহা আর ভুলেন না। কুরঙ্গ জানেন—অট্টালিকা বা হাট অর্থে কোটালডা; নড়োমণ্ডল অর্থে আকাশ; হননটা অর্থে দেশ, সকল; পক্ষ অর্থে পক্ষাঘল; বহু অর্থে কাপড়; অন্ন অর্থে ভাত; তৈল লবন অর্থে তৈল দুধ;—ইত্যাদি অনেক কথাই তাহার অস্ত্যস্ত।

কুরঙ্গ সর্ববিষয়ে এরূপ অভিজ্ঞ হইলেও, চামেলির কিছু সেই বিবাহ-বিবাহি বক্তৃতা তাহা বুঝিতে না পারিয়া, কথকিং বিমগ্ন হইলেন। কুরঙ্গের স্পর্শা ছিল, তিনি ভুলোকের সকল কথাই বুঝিতে পারেন, এবং ভুলোকের সহিত সমান ভাবে কথাবার্ত্তাও করিতে পারেন। কিন্তু চামেলির নিকট গর্ভ বর্ধ হইল,—অঙ্কুর চূর্ণ হইল।

গর্ভ অঙ্কুর দূর হউক,—তাহাতে কুরঙ্গের তত দৃষ্টিভুক্তি নাই—কিন্তু তাহার বিষম ভাবনা হইল। “এ কি এ? চামেলি দিলির বয়স অর্ধটাই বোল বৎসরের কম নহে—অর্থাৎ ইনি বলেন, আমার এখনও বিবাহ হয় নাই;—বিবাহ করিতে এখনও অনেক সিল্প আছে। গৃহস্থ-ঘরে এরূপ স্ত্রীলোক আদিত কোথাও দেখি নাই। তবে ইহারি কে?—আমি কোথায় আসিলাম?—চামেলি দিলির কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। কেননা, যার একটিও জেলপিলে দেখিতে পারিতেছি না। বাহা, এ বাড়ীর যে সকল মেয়েমানুষের বয়স কুড়-পঁচিশ বা চল্লিশ, তাহারাও কি বিবাহ করেন নাই? আচ্ছা, কিজান্না করিয়াই দেখি না কেন? আমি যে, যুব বিমিত হইয়াছি, একথা ইহাবিদকে এখন জানান হইবে না?—ইহাওয়ে মন যোগায়া কবা বলিতে হইবে।”

তখন কুরঙ্গ প্রকাশে বলিলেন,—“দিদি! তোমারও বিবাহ এখনও হয় নাই—তা, বেশই হইয়াছে—এ বাড়ীর কাহারও কি এখনও বিবাহ হয় নাই?”

চামেলি (হাসিয়া) না। কেবল তুর্দিনী রজনীগন্ধা সন্মেলন এখন কোটশিপ আরম্ভ করিয়াছেন।

কুরঙ্গ কোটশিপ কি? চামেলির যোহো হাঙ্গ। তিনি বলিলেন, “তোমার এত বয়স হইল—তুমি এখনও কোটশিপ কাহাকে বলে জান না? তুমি যদি কোটশিপের

অর্থ জান না, তবে তোমার গোঁচলচন্দ্রের সহিত বিবাহ হইল কিরূপে? কেন না কোটশিপ ব্যতীত বিবাহ হয় না।”

কুরঙ্গ। “দিদি আমার পড়াশোনা মাহু,—এত কথা বুঝি কি? তুমি আমাকে বুঝিয়ে বল, কোটশিপ অর্থ কি?”

চামেলি। বিবাহের পূর্বে যে সম্বন্ধ হয়,—সেই সম্বন্ধকেই ইংরেজীতে কোটশিপ বলে।

তবে সম্বন্ধ বর-কন্যার দেখা শুনা, আলোচনা-পরিচয় হয় না,—কোটশিপে দেখা শুনা সবই হয়।

কুরঙ্গ। রজনীগন্ধা দিলির বয়স কত? চামেলি। বয়স কিকিং কম ত্রিশ বৎসর।

ক্রমশঃ—

হরিহর।

জীব যদি ভবভূষণ

এড়াইতে চাও।

মনো-বর্ধ চড়ি তবে
তীর্থযাত্রা যাও ॥

তথায় প্রশান্ত-কায়্য

যমুনা হোয়া সোয়া

বিশদ জাহ্নবী মনে

চলিছে উদ্যো।

অরুণ-সলিলবতী

ওগুণবো সরাগতী,

এ মহা সমুদ্রস্থলে

শরির তুয়াও ॥

ভিজিবে না, বস্ত্র, অঙ্গ,

চাহি না কাহারও মঙ্গ,

সমুদ্র দগ্ধিবা নাই,

তুবিমে মুড়াও।

এ প্রয়াগ স্থবিলিত,

সর্বস্থলে বিরাজিত,

কেশব-শরত-রূপ—

অবশ্যে দেখাও ॥

এম ভাগ।

ভাদ্র।

১২২৮।

২ম সংখ্যা।

বেদান্তদর্শন।

(এম প্রস্তাব)

প্রাচীন আন্তিক দার্শনিকগণ, দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কর্মবাদী ও জ্ঞানবাদী। কেহ বলেন, কর্মই চতুর্দর্শের নিদান। ধর্ম-অর্থ-কাম-মুক্তি—যাহা ইচ্ছা তাহাই পাইবে, কেবল কর্ম—বাগবত্ত করিতে কর্ম করিবে, মুক্তি তাহারই ফল। কেহ বলেন, মুক্তির কারণ ধর্ম। সংকর্ষই হউক, আর তত্ত্বজানই হউক, ধর্মই তাহার ফল। সেই ধর্ম-বিষয়ে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কেহ বলেন, জ্ঞানই বা আর কি পার্থক্য? উহাও ত মনের কাম। জ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিলেও সেই কর্মকেই মুক্তির কারণ বলা হইল; তবে নামসিক কর্ম আর বাহ্যিক কর্ম; প্রভেদ এই মাত্র। কর্মবাদিগণ, “এইরূপে নানা প্রকারে স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করেন। তাহাদের বিশেষ কথা এই যে, বিবিধাক্য ও অর্থবাদ ভিন্ন বেদের সার্থক্য নাই; হুতরাং ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদকে (যাহা)—বিধি-প্রত্যয়-ব্যতীত) বিধি-ব্যাকরণ ও অপরাধকে অর্থবাদরূপে সার্বক করিবে। জ্ঞান-বাদিগণ, তাহা স্বীকার করেন না; তাহারি এক তত্ত্ব-জ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলেন, ধর্ম কর্ম তত্ত্বজ্ঞানের কারণ বটে, কিন্তু মুক্তির সাধক কারণ নহে; পরমহংস পরিত্যক্তচার্য্য ভগবান শঙ্করচার্য্য বলেন, শ্রুতি বা উপনিষদের ইহাই অভিপ্রায়। ব্রিহাৎ ইহা লুপ্তই চলিয়াছে;—পূর্বপ্রসঙ্গে বিচারের কিয়দংশ কীর্তিত হইয়াছে। ধর্ম যে

মুক্তির সাধক কারণ হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার মুক্তি, পূর্ব প্রস্তাবেও প্রদত্ত হইয়াছে; এখনও হইতেছে,—

(১)

“নিত্য দ্বিধি; পরিধামি নিত্য ও কুটম্ব নিত্য। বস্তুতঃ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হইলেও যাহার পরিবর্তন স্থল দৃষ্টিতে বুঝা যায় না, তাহা পরিধামি নিত্য। যেমন পৃথিবী, জল, আকাশ ইত্যাদি। আর কুটম্ব নিত্য—আচ্ছা,—ইহার পরিবর্তন নাই; পরিধামি নাই; চিরদিন সমান। মুক্তি যদি পরিধামি নিত্য হইত, তবুও না হয় বলিতে, উহা ধর্মের কাণ্ড। পরিধামীর পরিধামি-ভারতম্য বা পরিবর্তন-ভারতম্যকেই ধর্ম-ভারতম্যের ফল নির্দেশ করিতে পারিতে। ক্ষণভঙ্গুর পরিবর্তন-কেই অনিত্য ধর্মের মুক্তিকারণতা পক্ষে উত্তর প্রমাণ-স্বরূপ কীর্তিত করিতে পারিতে। কিন্তু মুক্তি ত তাহা নহে; মুক্তি কুটম্ব নিত্য।

“অজ্ঞাত ধর্মাদিজ্ঞাতাধর্মাদিত্যাহাং কৃতাকৃত্যং অজ্ঞাত ভূতভাব্যাক্যং।” (ইতি শ্রুতি)
অর্থ্যং ধর্ম, অর্থ্যং, তৎকার্য্য-কারণ ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কালের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, তাহাই মুক্তি। সেই কেবলা আর ব্রহ্ম এক। হুতরাং মুক্তি বিধি-বিষয় নহে। বিধি-বিষয় হইলে অর্থ্যং ধর্মসাধ্য হইলে, মোক্ষের অনিত্যতাপত্তি। কিন্তু মুক্তিবাদিগণকেই মুক্তিকে নিত্য বলিয়া থাকেন।”

(২)

অপিত, ধর্মাদর্শন ও আর দেখা যায় না; তবে তাহা না মানিলে দৃষ্টি ভিন্ন—পূর্ণ নরক,—সংকর্ষ ও অসংকর্ষের সাধক ফল বলিতেই ত হয়। মাঝে

স্বামীজীর হরিদ্বার-যাত্রা।

(২)

অযোধ্যা।

হই চৈত্র রাজি প্রায় মাড়ে সাড়টার সময় স্বামীজী অযোধ্যায় উপস্থিত হন। অযোধ্যা! কি শব্দ! ইতিহাসিক-ভার-পূর্ণ নাম। অযোধ্যার অবনতির কবাল বন্ধুহরে প্রবিশিপ্রায় একপ্রকার কৌশল্যুত হিসাবজ্ঞানের কৰ্মহুত্রে ‘অযোধ্যা’ এই অম্বর বসতি প্রবিশি হইলে জলবে কতপ্রকার ভাবের স্রোত করিতে থাকে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? সুখাবশ্য নরপতিগণের অখণ্ড-দৌৰ্দ্ধিত্য-প্রাপ্ত, নিপজ্ঞব্যাপিনী অনন্তকীর্ণ, অনন্ত-রহস্য-রাজ-পরিপূর্ণ অম্বর কোষ, অযোধ্যার জন-সাধারণের তাত্কাহিক হৃৎখাঙ্কন্যাপরিপূর্ণ সত্যতা, অস্বাভাব্য শিক্ষা, জিলোকবিশ্যাত বৈশিষ্ট্য-পারিপাট্য, আর মর্ষোপারি সকল হুত্রে অযোধ্যা-ভূতা নিখিলশাস্তির নিদানভূতা অম্ব ও বাহ্যনতা,—একে একে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া ভারতের অমর্য্য অম্বা ভুলাইয়া দেয়। এই শোক-তাপ-নিপূর্ণ নিপজ্ঞব্যাপিনী-হাফাকার-পরিপূর্ণ অবনত-রাজসীর চিরচির-অনন্ত শাশন-সমুদ্র বর্তমান-মুগের-ভারত যেন কোথায় বিলীন হইয়া যায়। মানসরাজ্যে স্মৃতির নেত্র বিকাশ পাইয়া যেন পূর্বোক্ত বস্তুনিচয়কে প্রত্যক্ষদর্শন করিয়া ভুলে। যেন সত্যসত্যই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়—

সেই হস্ত্য-নাগরিপূর্ণ, সুবিস্তৃত-রাজপথ-পরিমোহিত, অগণ্য-পথ্যাপল্লভ-বিপরিপাক-বিদ্যাজিত, শান্তি-বাদীনা-স্বপ-পরিপূর্ণ, সবার-বিশীল-মশরপ-মামচন্দ্র-প্রভৃতি গুণপাল্লভিত প্রজ্ঞা-বঙ্গল-মুত্তিমান কজ্জিৎখণ্ডরূপ নরপতিগণের পবিত্র-সিংহাসনোচ্চাষিত, বসিষ্ঠ-বামদেব-জাবালি-প্রভৃতি ব্রহ্মবিদগণের মুখপঞ্চকোক্তারিত-পবিত্র-বেদ-অধিনি-নির্নামিত, ভারতবর্ষের রত্নমুষ্টিটামান, প্রত্যক্ষতঃ পরিপূর্ণ হইতেছে। সে-কালের আনন্দময় কোলাহলে এ কালের ভাষণ হাফাকার গনি আর যেন শুনা বাইতেছে না। অনন্যভূতপূর্ণ আনন্দের উজ্জ্বলে যেন সত্যসত্য জলগের বর্তমান নিরাশতা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—কিন্তু এ শব্দ অত্যন্ত সন্দেহের স্রষ্টা। অযোধ্যায় সত্যতঃ পৌছিতে না পৌছিতে

অযোধ্যাশাটের ষ্টেশনে এন্ধিনের দুঃখানী বঙ্গীকানি কহুত্রে প্রবিশি হইয়া, সে ভাবনা-মাগর শুকাইয়া দেয়, বর্তমান যুগের তীব্র যন্ত্রণাময় চিন্তার মরুভূমিকে পবিত্রই উৎসাহিত করিয়া ভুলে। নিরাশা-গদহর্য, আপনাই যেন গাছিয়া উঠে ‘সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই’।

অযোধ্যায়, পূর্বোক্ত রাজাসাহেবের সরস্বতীর স্ব বিস্তৃত প্রাসাদে স্বামীজী অবতরণ করিলেন। রাজ-প্রাসাদে সকলের স্থান সম্বলান হইলে না বলিয়া, পূর্বে হইতে সরস্বতীর অম্বল্যাবাহিতের ভারের উপর আর তিনটি বড় বড় বাড়ী পরিত্যক্ত করিয়া রাখান হইয়াছিল। যেখানে হুখিয়া পাইল, সে সেখানেই রাসা নইল। স্বামীজীর নিকট ছাড়িতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না; হুতরায় আমরা পূর্বে হইতেই স্বামীজীর বাসস্থানের অতি নিকটে রাজা-সাহেবেরও রাজাকীরের সমুদয় বসনে নিষ্করে স্থান কল্পনা করিলাম। আমরা যখন ও রামমণিরে প্রবেশ করি, সে সময় ও রামজীর নিকটে একজন রাজাকীর গাফক, তানপুবাযোগে তুলসীদাসী রামায়ণ গান করিতেছিলেন। তানপুবাযুক্ত সেই রাম-জুতিতে অনেকেরই সেই সময় অশ্রুপাত হইয়া-ছিল। হুতরায়ের রাজা হীরামহেব বড়ই সাধু-পুণ্ডিত। স্বামীজীর প্রতি ইহার প্রজ্ঞাও অপরিণাম। রাজাসাহেবের আভিষেখতা বড়ই প্রাথমিক। সেই রাজিতে এক পর্যাণ্ডপরিমানে আহার্য জন্মের তদ্বন করিয়া নিরুদয় করিতে পারেন না। সেই জৈত্র প্রাণ্ডকালে স্বামীজী ও তদনুযায়িকর্ণ দানার্ণব সর্ব-তীরে গমন করেন। পূর্বোক্ত স্বামীজীর আগমন-প্রজ্ঞা প্রচারিত হওয়ারপরে যেন লোকের হিড়ম্বিত্য হইয়াছিল। সন্ন্যাসী নিকটে হইলেও, সেই সকল দর্শনার্থী লোকনিবন্ধকে সরাইয়া, তীরে হইতে স্বামীজীর প্রায় এক ষট্ কাল অভিপাতিত হয়ে। অযোধ্যায় গিয়ে সন্ন্যাসী পূর্ববাহিনী ও অভিপ্রান্ধা-বয়স। জল অভিষুক্ত ও বিশেষ সাধ। সন্ন্যাস হলো আনন্দিক ও তর্পণবিদ্রি জিয়া মাগপন করিয়া, সকলে স্বামীজীর সহিত আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অযোধ্যাবাসিনে নিতিত হন।

অযোধ্যা নরসী অতি-বিস্তৃত হইলেও, বেশ হুয়বিধি অখণ্ড পরিদর পরিত্যক্ত। বিদ্যার-দান-

নিচয়ের অপেক্ষা শ্রীমামচন্দ্র-সেনক বৈরাগী-সম্প্র-দায়ই এখানে প্রবল। এখানে অনেক বৈরাগীর মহাত্ম আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বিশেষ বন্দনা ও আভিষেখ। অযোধ্যায় দুইটি সংস্কৃত পাঠশালা আছে। একটা এখানেকার একজন ব্রহ্মজ্ঞ বৈরাগীকণ্ডক প্রভৃতিতে, অপটী হুতরায়ের রাজা বাহারকণ্ডক সম্বন্ধিগণ। দুইটি পাঠ-শালাতেই বিভাষিগণের স্রষ্টা বিশেষ বৃত্তির বাসনা আছে। অধিকাংশ ছাত্রই ছাত্র, ব্যাকরণ ও কব্যা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। অযোধ্যাতে বহুতর রাম-মন্দির বিদ্যমান আছে। অনেকগুলি বাধান বাট সন্ন্যাস-তীরে লাগানোভাবে সন্নিবেশিত আছে। স্বর্গবার নামক খাটটাই সর্বাধিকো হুতর ও সন্নিবেশ ভাবোদীপক। অযোধ্যাতে হুতরায়পড়ি নামক ব্রহ্মজ্ঞ হুতরায়জীর মন্দিরটি বড়ই রমণীয় স্থান। ইহা দেখিতে একটা ঘোড়চাঁপ ছুঁরির ছায়। গড়ির ভিতরে একটা অনতিবিস্তৃত মন্দিরের মধ্যে মহাবীর পদন-ওদয়ের প্রকাণ্ড মূর্তি বিরাজমান রহিয়াছে। শুনিলাম, মুসলমান-রাজকালে মুসল-মানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৈরাগীজন এই গড়ি ও অত্রস্থ দেবতাকে বিশেষ পরাক্রমের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অবধি এখন পর্যন্ত বৈরাগীজনই এই হুতরায়জীর রক্ষাবোধন করিয়া আসিতেছেন।

আমরা নরপরিদরমণ করিয়া যখন রাজসভনে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম, তখন বেলা প্রায় এগারো। আশিয়া দৈশ, শিশেনীর রাজা যোগিপ্রভে চন্দ্রশেখর, স্বামীজীকে নিজ লক্ষ্যে প্রাসাদে লইয়া বাইবার কল কতিপয় অহুতর সামন্ত্যভিহায়ে অযোধ্যায় স্বামীজীর চরণোপায়ে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা চন্দ্রশেখর গৃহ হইতে সন্মত করিয়া নির্গত হইয়াছেন। এই শ্রীমামচন্দ্রের জিন দিল নির্ভল উপাশাস ও রাজা বাহারজীর মুখ্যতঃ কোন প্রকার কাভরতার চিন্তা-মাত্রও দেখা বাইতেছে না; বরক অন্তঃসংকল্প পূর্বোক্তরাজ্যতক মুখমল হাফ অম্বলপ ওয়াস, বননে দীপ্তি পাইতেছে। কি স্থির প্রতিজ্ঞা! কি অলৌকিক অভ্যাস!!

অযোধ্যায় আমরা বাহারাদি করিয়া অতি বন্দনা করিলাম। বিদ্যামাত্র স্বামীজীর নিকট

উপস্থিত হইলাম। সেখানে বাহা সেলিলাম, তাহা জন্মে কখন ভুলিতে পারিব না। সেলিলাম, অযোধ্যায় বৈরাগীসম্প্রদায় ও তৎপ্রধানপন, প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতগণ এবং প্রায় দুই শত বিদ্যারী, অর্থমণ্ডল-কারে স্বামীজীকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে মুখপঞ্চ-নিঃখত স্বর্ধমাতৃপূর্ণ বাণী প্রবণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছেন। স্বামীজী মননময়ী অলপন করিয়া, সংসারের অনিচ্ছাত, ব্রহ্মের পার-মার্থিক, মাতা, অবিকা প্রভৃতি দেগতপ্রতিপাতা বিশ্বনিবহ বিশপনকে সকলকে বুঝাইয়া গিচ্চে-ছেন। সেই অশীতিবর্ষব্যয়-সম্যাসিপ্রবণ স্ববির স্বামীজীর মুখে যুবার ছায়া উদাসপূর্ণ অখণ্ড অপোহবহিত পারমার্থিক বাক্যাবলী প্রবণ করিয়া সকলের জলয় যুগপৎ বিদ্যায় ও শাস্ত্রিগণে পূর্ণ করিয়া গেলেন। লোককণের ধর্ম্মবিদ্যাবাণীা শুনিতে শুনিতে চিত্র এত একত্র হইয়াছিল যে, সে-সময় অত্যাধিকার সেধিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন সে ছাদে যেন জগিত মহুদ্য নাই, শুধলই যেন-যেন চিত্রকরের অলৌকিক শিল্প-কৌশলগুণে বিরাজমান রহিয়াছে। সেই অপবিত কাণ্ডলঠন দেয়ালপরি ও বিলাস-ব্যাক্ক শাস্ত্রিগণের রাজ-প্রাসাদও যেন সে সময় জিহ্ম-প্রতিম হইয়া-লগ্না হাফ করিতেছে। যেন রাপয়গুণে নৈমিষা-রমণে শিষ্যগণও নগ্না তপনান দেদ্যদ্য বেষ্টের গড় মর্ম্মভাবায় ব্যাপ্ত হইয়াছেন।

গতি অগারী পণ্ডিত স্বামীজীর নিকট এই প্রকার যোকসমাবেশ ছিল। এগারটার পুর তাঁহার অজ্ঞাহুতর সন্মত উঠিয়া গেল। তখন রাজা চন্দ্রশেখর একাকী স্বামীজীর নিকট হইলেন। আমরা সকলে শমনমান প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। সেই চৈত্র প্রাতঃকালে ১০ টার গাড়িতে স্বামীজী লক্ষ্যে বাহার কল প্রান্ত হইলেন। সকলে তাদা-তাদি বধ্যাস্তব আহারাদি তুরিয়া অযোধ্যাশাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। রাজাসাহেবের স্বর ছত্র ধারণ করিয়া স্বামীজীর সড়ারীর নিয়ে পদযাত্র ষ্টেশন পর্যন্ত আসিলেন। স্বামীজীকে বিদায় নিতে তাঁহার জলয় কি পরিমাণে, যখন অহুতর করিতে-ছিলেন, তদা তাঁহার মুখস্থ উপসর্গমান অশ্রুধারী সাক্ষ্য এগান করিতেছিল। জন্মে দশটা বাজিল। গাড়ি ফল্গবার ষ্টেশনেই প্রত্যে চুটিল। রাজা হরিদ্বারস্থলে অশ্রুজল বদনে অতিক্রান্ত হইলেন। সকল লোক সম্বরে করিয়া উঠিল, ‘জয় রাজা রাম

চন্দ্রকী জয়। আর বিজ্ঞানবান খাম্বাজীকী জয়।" বঙ্গদেশের বাড়ি কয়লাবাগে পৌঁছল। এই ষ্টেশনে সকলকে নামিয়ে লক্ষ্যের বাড়ি অগোচর করিতে হইল। বেশা বারটার সময় বাড়ি আসিল। সকলে নিমিষের বাড়িতে আরোহণ করিলেন। সাড়ে বারটার সময় বাড়ি কয়লাবাগ ষ্টেশন হাজির।

লক্ষ্যে।

৭ই চৈত্র অপরায় ৫ টার সময় খাম্বাজী লক্ষ্যেতে পৌঁছলেন। রাজা চন্দ্রশেখর অযোগ্য হইতেই খাম্বাজীকে সঙ্গে ছিলেন। কিছু ষ্টেশনে তাঁহার কেওয়ান ও অস্ত্রাধ প্রদান কর্মচারিগণ খাম্বাজীকে অপেক্ষা করিতেছিলেন। পূর্বে হইতেই তারফের খাম্বাজীকে আপনমনবাকী সবার রাই হওয়ায় নব্বয়ের প্রদান প্রদান করিক হিন্দুধর্মবরণ ষ্টেশনে খাম্বাজীকে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বঙ্গদেশের খাম্বাজী বাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্বে হইতেই শিবিকার বন্দোবস্ত ছিল খাম্বাজী তাহারে আরোহণ করিলেন। রাজা চন্দ্রশেখর নিম্নে আরতি করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। সমুদয় পদ তিনি আরতি করিতে করিতে খাম্বাজীকে নিম্নে ভবনে লইয়া যান। সেই সময়কার দৃশ্য বড়ই জ্বলন্ত হয়ছিল। দর্শনপ্রদর্শন খাম্বাজী শিবিকার পরিদর্শন। দূর্গ-দুর্গের দৌলদারগণ যুগ্মগণিতে চারিদিক অন্ধকারপ্রায়; উত্তর পার্শ্বে নগরের সন্ধ্যা অবিদ্যাপিত কেবল চন্ড, কেবল চান্দ, কেবল পাখা হস্তে করিয়া পদন্তরে খাম্বাজীকে অগ্রসর করিতেছেন। পদন্তরে প্রায় পঞ্চাশ বানি অশ্বশকট, খাম্বাজীকে সহযোগিতা করি বহন করত সন্ধ্যা পড়িতে চলিতেছেন।

নগরের প্রশস্ত রাজপথ লোকে লোকারণ্য। সকলে ভিত্তিমতেরে খাম্বাজী শাশ্বতস্থি বিলাকন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চ ও সমধরে বলিতেছেন, "জয় খাম্বাজী মহারাজকী জয়।"

এইপ্রকার জনতাশ্রোতে মধ্য দিয়া খাম্বাজী প্রায় বেড়কটায় গোলাগঞ্জস্থ রাজসাহেবের নব-নির্মিত দ্বারীতে উপস্থিত হইলেন। গোলাগঞ্জ লক্ষ্যেই হইতে প্রায় বেড়কটায় দূর। খাম্বাজীকে সম্মানমোদনগণ্যে রাজপ্রাসাদ অতি দ্বন্দ্বভায়ে আসিয়া হইয়াছিল। উপরন্তু প্রায় গৃহে খাম্বাজীকে ব্যাকপ্রদর্শন দ্বিত্ব আসিল পরিবর্তিত ছিল।

নীচের গৃহ সকলও খাম্বাজীকে অগ্রদূতগণের নিমিত্ত

বিহিতরূপে সজ্জিত ছিল। একত্র অধিক লোক থাকিলে কষ্ট হইবার সম্ভাবনায় রাজপ্রাসাদের বহির্দিকের প্রশস্ত স্থানে আর পাঁচটা অনতিদূরবৎ বস্ত্র-গৃহ (তঁথু) সন্ধ্যা হইয়াছিল। বস্ত্রগৃহগুলিও অতি পরিকার ও বিহিতরূপে সজ্জিত ছিল। পরিভ্রমত-বেশধারী পরিচারকগণ অতি বিনম্রভাবে খাম্বাজীকে সহযোগিতার আদেশপালনার্থে প্রস্তুত ছিল।

আমরা খাম্বাজীর সঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক প্রাসাদশোভা ও রাজসাহেবের পরিচারক ও উচ্চ কর্মচারিগণের উদ্যমপূর্ণ ভক্তিবিনম্রভাব বিশোকন করিয়া বিশেষ হর্ষ লাভ করিলাম। রাজসাহেবের আতিথেয়তা বেশিয়া আমরা সকলেই বিমিত্ত হইলাম ও তাঁহাকে শত সহস্র সাধুদান দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই সময় রাত্রিতে রাজসাহেবের আবেশ করিলেন যে, লক্ষ্যের সহর অতি প্রাচীন ও দৃন্দীয়, হুতরাং অনেকেরই ইচ্ছা হইতে বিশেষদণ্ড হইয়াছে, অতএব আমার ইচ্ছা আবেশ করিল—খাম্বাজীকে অগ্রদূতগণের মধ্যে যে কেহ যখন ইচ্ছা যথাস্থা হইতে পাতিভাড়া করিয়া যেখানে ইচ্ছা বেধিতে পারেন; তা পাতিভাড়া আমায় কর্মচারীকে নিকট হইতে চাহিলামাত্রই সে তৎক্ষণাৎ দিয়া দিবে। এ রাত্রিতে কাঁচা পাকা যিথি আহার পর্যাপ্ত পরিমাণে আচ্ছাদিত ছিল। নিজ নিজ ইচ্ছা-স্বাদে সকলে ভৃত্য বদায়িবার পা পাক্য লুটি প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বিশ্রিষ্ট রূপে লুণ্ণ-নিদ্রাপূর্বক হুখে নিজস্বোপলব্ধি জোড়ে অগ্রসরগণ করিলেন।

৮ই চৈত্র লক্ষ্যের সময়।

৮ই চৈত্র প্রাতঃকালে আমরা সকলে সুপ্রসঙ্গ মজ্জীভবনে গেলিযে যাই। প্রথম একটা বিস্তৃত গোট পার হইয়া সুপ্রসঙ্গ সমতলক্ষেত্র প্রাপ্তবের মধ্য দিয়া দ্বিতীয় বেটের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বেশিমান, গেলের পার্শ্বে ইংরেজী ভাষায় লেখা আছে যে, কেহ পান্ডা করিয়া ইহার ভিত্তিরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। খাম্বাজী পান্ডাতে ছিলেন, হুতরাং এইরূপেই তাঁহারকে নামিতে হইল; তিনি পান্ডাতে অগ্রসর হইলেন,—আমরা পশ্চাতে দ্বিতীয় গোট পার হইলাম। ভিত্তির প্রবেশ করিয়া যাই বেশিমান, তাহা অতি অপরূপ—সুপ্রসঙ্গ সমতলক্ষেত্র সমদুর্গা-দলপরিমোচিত প্রাসাদ; মধ্যভাগে প্রস্তরবীধান অনতি প্রশস্ত সুন্দর বস্ত্র; চারিদিকেই নন্দনামোদনের প্রাসাদপ্রবেশ সমতলবে প্রস্তুত হইয়া লুণ্ণায়মান;

পশ্চিম দিকে অতি সুন্দর বড় বড় বিশালদুর্গ একটা মসজিদ; সমুখে খতিবুৎ অনন্ত ভাস্কর্যকারের চরম উৎকর্ষের, পরিচারক গোর-ভবন। সেই মজ্জী-ভবনের মধ্যে লুণ্ণায়মান হইয়া আমরা লক্ষ্যের সুপ্রসঙ্গ নবাবগণের অপরিদায়ক ঐক্যের বিষয় চিন্তা করত বিশ্বদুঃখের নিমন্ত হইলাম। সুপ্রসঙ্গ সিংহাী ক্রিমোদনের সময় এই মজ্জীভবনে ইংরেজের দুর্ভেদ্য কার্য করিয়াছিল। সে সকল বিষয় একদে উল্লেখ করা নিম্নপ্রয়োজন, কারণ ইতিহাসের পাঠক-নাতেই এ সকল বিষয় অতি পরিচুটরূপে অবগত আছে। মজ্জীভবনে একজন সাহেব, খাম্বাজীর পরিচার পাইয়া বিশেষ প্রশংসারূপে তাঁহাকে নিবীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি হিন্দু-সম্রাটের হুতরাং মনুষ্যমানের কং-অন্যদে কেন আসিলেন? খাম্বাজী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, সাহেব! আমি কং-ভবন দেখিতে আসি নাই, আমি দেখিতে আসিয়াছি হিন্দুসম্রাটের পূর্ত্যপাণ্ডা-নিমিত্ত। আর ঐক্যের পরিণাম! যে বিষয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া এই অপূর্ব প্রাসাদ নির্মাণ হইয়াছিল, সেই বিষয়ে এই প্রাসাদনির্মাণকারী মন—অন্যকার নিজ-অনন্তন পুণ্যপাণ্ডা ও এই প্রাসাদের দুর্ভবনকে বিষয় কি একবারও চিন্তা করিয়াছিল? তাহা করে নাই, কিন্তু ঐক্যের অধরোহে তাহার স্তম্ভ অন্ধকারে জ্বলিবে। কিংকরণের মনোবী শক্তি-প্রকাশে আজ সে দর্শন কোথায়! লক্ষ্যের নবাবগণের অতি যত্নের প্রাসাদে আজ কোন দুঃখ ব্যক্তি সর্গের পার্যবর্ণন না করিতেছে। এই সকল বস্তু দেখিলে লোকের নন্দনাত্মা ঐক্যের প্রতি রূপ উদয় হয় এবং নবাবের স্তম্ভের করিতে আশ্চর্য্য আছে, তাই আমি এখানে আসিয়াছি। খাম্বাজীকে উত্তর ভাষায় নীরবে গভীর ভাবে অভিমান করিয়া সাহেব চলিয়া গেলেন; আমরাও মজ্জীভবন হইতে নিজস্বাং হইলাম। মজ্জীভবন হইতে নিজস্বাং খাম্বাজী গোমতীতীরে যমন করিলেন এবং গোমতীতে অবস্থানান্তরে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন হইলেন। আমরা খাম্বাজীকে রাজসাহেবের সুপ্রসঙ্গ বৌদ্যাণ্ড (বেসিভেল) দেখিতে চলিলাম। মিথ্যার বিদ্রোহের দ্বারক চিত্ররূপের মধ্যে বৌদ্যাণ্ডের দ্বার উদ্বোধক অথচ দ্বারক চিত্র অথচ কোথাও নাই। বৌদ্যাণ্ড মিথ্যার দ্বারের উপস্থাপিত অভিনয়ের প্রকৃত অর্থ্য বৌদ্যাণ্ড এবং নৈম সাংঘ্য দেখাইয়া দিতেছে। উত্তম গোলায় আঘাতে কোন

গুণের ছাপ উড়িয়া পিয়াছে, কাহারও আঘাতান লেওয়াল নাই, প্রাচীর ও দেওয়ালে নিকট গতির দাপটগণ এখনও পূর্ণিভূতভাবে পরিত্র হইতেছে; ছত্র খেরী সাহেব যে গৃহে মিথ্যারহিত গোলায় আঘাত হন ও সেই আঘাতে প্রাণ বিদগ্ধন করন, সেই ছত্রখেরী গৃহ এখনও সেই ভাবেই পড়িয়া আছে; যে ছত্র করিয়া গোলা গৃহমনে প্রবেশ করে, সেই ছত্রখেরী পড়িয়া এখনও সেই ভাবে রহিয়াছে—নিকটই ছত্র খেরী সাহেবের উচ্চ স্তম্ভরূপে সমাধি স্থান। বৌদ্যাণ্ডের এই সকল সোমহর্ষ-অন্যদায়ক দৃশ্য দেখিয়া 'নৈমন্ত-পূর্ত্য-দুঃখের বোলা' এগারটার সময় আমরা রাজ-ভবনে প্রত্যাবর্তন হইলাম। বাসায়-রাজা সাহেবের অতিবিশ্বাস্য-বুদ্বলভ্য সে বিষয় বড়ই আশ্চর্য্যজনক—উৎকৃষ্ট তত্ত্ব, অপরূপ উন্নত দৃঢ়, সকল প্রকার উত্তম আনন্দ-সাক্ষকেই ইচ্ছাক্রমে বিবর্তিত হইয়া উঠিল। আমরা তত্ত্ববাহককে আহার্য্য করিয়া কিছুই বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার নগর ভ্রমণে বহিষ্ঠ হইলাম। প্রথমই কেশবদায় উপস্থিত হইলাম, চতুর্দিকে শীতল প্রাসাদ-বলি-বেষ্টিত হৃদিত হুতরাং ভূভাগের মধ্য স্থলে মর্দক-প্রস্তর-নির্মিত একটা দ্বন্দ্বের সত্যপূর্ণ; চারিদিকে চারিটা সুপ্রসঙ্গ কাটক, সেই অভ্যন্তরীত হুতরাং-সমতল অপরিসীম-শিখ-চাহিয়া-সমতলগত মজ্জীভবন-শোভাভারী কাক, কাকী দেখিলে লোক বহুদূর দূরিতহইতে চাহিয়া থাকে ও ঐক্যের সর্গভূতগণিত। সর্গভূতগণিত ও সর্গভূতগণিত কারি শক্তি উল্লেখ অনন্ত হুতরাং প্রদান করিয়া থাকে। সাহায্য পূর্বক কেশবদায়ের দৌলদার বিলাক-কন করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারে পড়িতে কেশবদায়ের অস্তিত্ব নামাত্র-পূর্ত্যবসারী একধা বলিলে অস্বীকার হয় না, হটে, কিংকরণ। পূর্বক কেশবদায়ের দৌলদার দেখেন নাই, 'তাঁহাদের নিমিত্ত কেশবদায় অস্বা ও বিশ্বদায় প্রাসাদ, তাহার কোন মতেই নাই। স্বরাজ্যনাথ স্বরাজ ও রাজকী আশি-শা যে দিন কেশবদায়ের অস্তিত্ব ছিলেন, সে দিন বড় বড় রাজা শাসনকর্তৃগণ অতিদূরত্ব চকিতহইতে কেশবদায়ের দৌলদার লুণ্ণায়মান হইয়া প্রবেশ্যায় প্রতীক্য করিতেন ও আজ্য পাইলে আজ্যকে তত্ত্ববাহক করিতেন; আর অন্য সেই সেইদৃশ্য-প্রদর্শন কেশবদায়ের আদৌরিত দ্বার অধিকন ব্যক্তিও ছাত্রা গাতিতে চড়িয়া প্রব-পীড়াজনক স্বরাজ শকে

আশ-পার্শ্বের লোককে বিস্তৃত করত অনায়াসে নিজকে
স্বপ্নে প্রবেশ করিতেছে—হায়! কাপুড়ে বরাল-
দপুড়ে নতম মকুত নত না—বাপা! থাকিতে পারে
এমন ঐশ্বর্য, এমন প্রভুতা,—কোন ভাগতে আছে
এই সকল বিষয় উঠিয়া। আকুলছপে একটা দীর্ঘনিশ্বাস
নিশ্বাসে করিয়া আবার কেরণের পরিত্যাগ করি-
না। স্মৃত্তিক দরবারলুকে জন্মমালি দেখিয়া পূরে
বাসিশাবাগ নামক লক্ষ্যের নবাব-বংশধারের
প্রদোষ-মামল উপলিখত হইল। বাশাবাগের
অতি বৃহৎ বাগান; নানা জাতীয় দুষ্ক ফলগত জব-
নত হইয়া দৃষ্টিগোচর মনন মন হইল করিতেছে—
উপদানের মধ্যস্থলে একটা রাশবিধিগোলা খাতি
মনোরম প্রাসাদ, প্রাসাদ-ভাভামত মধ্যরপ্রস্তর-
নির্মিত স্থবিত্ত উপলিখিত শিবকোণ-সমুদ্রাতি স্থর-
শেষিত,আবার পঁচাংগুহা আকুলের মধ্যস্থলে
বাস করিবার জন্য একটা অনতিবিস্তৃত মধ্যরপ্রস্তর-
নির্মিত শীতল গৃহ, গৃহটা এতই শীতল যে, তাহার
ভিত্তি প্রদানের উপরে জৈঠা মামের মধ্যস্থলে
গুজা শিল্পের উঠে। এই প্রাসাদের চারিদিকেই
হুল্লর স্থর নানা জাতীয় পুষ্পভারানত দুর্গাভি
অতি সৌন্দর্য বিস্তার করত দর্শকের মন প্রাণ
হরণ করিতেছে।

বেলা পাঁচটার সময় বাদশাবাগ হইতে নির্গত
হইয়া আমরা হোসেনাবাদস্থ শ্রুপ্রসিদ্ধ ইমামবাড়ীতে
উপস্থিত হইলাম।

অত্যাচার ইচ্ছাপূর্ণদৃষ্টিতে তেঁদের মধ্যে বিয়া
ইমামসাহাবীর মধ্যে একেপেরক্কু বাহা হোসেন
মোস্তা, তাহা অতি শ্রুত ও অত্যাচার প্রবোধের
পরিচায়ক। অতি শ্রুত একটা পুণোপবন; চারি-
পেরক্কু স্কুত অমসিগরিশ্রুত পরশপারকার দ্বারা
বোরে বোরে বহু জল বহিয়া বাইহোসেন; মধ্যে
মধ্যে সোয়ারা সকল বহু জলরাশি উল্লিঙ্গ
করিতেছে; নানা জাতীয় পুণের সৌন্দর্য্যে রাশেস্তি
পুণ্ডিত হইতেছে। উপবনের দলিত ভাগে
শ্রুত বদজিকার প্রসাধ। তাহার মধ্যে একটা
শ্রুত বদজিকার। স্বহাতি প্রাচীন স্বরাগলিতে বিরাট
কালনের মধ্যেসেই বদ নবাব আদম উকৌয়ার
শ্রুত বদজিকারপ্রাচীন বদজিকার আদমের আদম

তাহারই পার্শ্বে একই দূরে মোমের নির্মিত একটা উচ্চ মন্ডরের তালিয়া, তালিয়াটা বড়ই সুন্দর নির্মিত হইয়াছে; শুনিলাম, প্রতিবৎসর এইরূপ একটা

নৃত্য তালিকা মধুসেনের সমগ্র বর্ণিত হয় এবং সেখানে
নৃত্যিনী এই ছান্দে পরিচয়। এই বঙ্গসুন্দর, পুরাণের
আলিঙ্গিতা নর্তি কায় হয়। দাম্পত্যে পুষ্ক-
কর্তা বহুত ক্ষুদ্র সোপানাবলিবিদ্যুৎ রোমাঞ্চ
সিংহাসন। শুনিমাস, প্রধান বোলী এই সিংহ-
সমর উপর। উপেক্ষণ করিয়া কোণ পাঠ
থাকেন। এই সকল দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে
অন্তর-চন্দ্রাবলী হইলেন; আমায় ধীরে ধীরে
সজ্জার নবানব-লগ্নয়ে ভূতর্য্য অব্যয়
কল্পিত বিষয় চিত্ত কবিত্তে কবিত্তে প্রায়
আজামায়। রাগিতে দিব্যি চরণ দর্শন
কল্যাণবাহুদয়ের প্রাসাদে দাঁড়াইয়া
নিদার বিরাময়ে ছায়ে আশ্রমমণ্ডল করিয়া।

ই চৈত্র মংগলতাম।

এই চেষ্টা প্রাচ্যকালে স্বাভাবিক কহিলেন, “আমার রাজ্যের বাড়িতে অশ্বিন লক্ষ্মী পূজিতব্য করিব। রাজ্যভাষ্যের অর্থশাস্ত্র আওতাপ্রকাশ করিলেন যে, আর একদিন আপনি আমার প্রতিপূর্ণ বংশধর করুন; কিন্তু স্বাভাবিক তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন নহন। কাঞ্চনবাহনই সেই দিন বাহ্যে গিরি হইয়া যামার। সকল সময়ে আহারাদি করিয়া লক্ষ্মী সন্তানের অপর দ্বারা বিশেষ দ্রব্য বসিয়া কীর্তিত— তাহাই দেখিতে নিশ্চয় লক্ষ্য হইয়া। অপরই দেখিতে হাইশাম, যুগ্মদিক্ মাটিন মাঘেবের কুচ। মাটিন মাঘেবের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর একটা প্রধান কুচ, তাহার নাম সুদেহ নাম। ভূমিহায লক্ষ্মীর অন্য বংশধর সময় মাটিন মাঘেবকে বসিয়াছিলেন যে, এতদূর দূর্যে ভূমি হামাকে সেইখানে পাঠ, বাহ্যের ন্যে একটা দিক্ ঠাকা। মাটিন মাঘেব একজন ভাষ্যবান্ ধনিক ছিলেন। তিনি “দেখাই” ইহা লক্ষ্মী করত একই ছাটী নির্মাণ করেন ও কালে নাবার মাঘেবকে উপহার দিয়া করেন। হুইটী দ্বি বড়ই দৃশ্য। অর্ধচক্রাকার প্রাসাদবল্লীর মধ্যেদেহে অত্যন্ত ও অশ্বিনের একটা বাটা। বাটার মধ্যে একটা গুহেরে কড়িতা হইয়া; সকল প্রাণগণইই বিলানের উপর নির্মিত হইয়াছে। সেই বিলানের উপর পশ্চিম কান্জ কান্জ নামাজাতীয়া স্বরাসদেহের চিত্র। প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিলে লক্ষ্মী সন্তান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাসাদের নিম্নে মাতীর নীচে বজ্রের সোপান অস্ত্রনিদ্রা কর্তব্য একটা হুইট গুহেরে দুখোণ প্রস্টিত হইতে হয়। হুইট বাটা জায়া, হুইট লোক জামাদের পথ দেখায়।

বাস্তালায় ওলন্দাজ বণিক্ ।

তৈ গৃহমধ্যেই হইয়া যেন। পুত্ৰী এত নীতল দেখে,
 তার মা দেখি আসনের বেশ নীতলবেশ হইতে
 লাগিল। মায়ে পুত্ৰী কুঠরীর পার্শ্বে একটা হুস্ত
 কুঠরীর মধ্যে মাটিম সাহেবের ককর ব'হাচ্ছে—
 সেই নির্জন ও অতি নীতল গৃহে যেন মাটিম
 সাহেবের আঁখা অনন্তকালের জন্ম বিশ্বাস
 অনুভব করিতেছে। পাতালকুঠরী হইতে
 নিম্নস্তর হইয়া আসার ক্রমে প্রাসাদের পটভিত্তি
 আসিল। প্রাসাদের ত্রিক সম্মুখভাগে একটি
 হবিত্তত মিল ও তাহারই মধ্যে ফরাসিদেশী
 কোন স্তম্ভের অল্পকয়েক পট্টি একটা হুস্ত
 উক্ত স্তম্ভ। এই স্থানে বলা ভা, মাটিম সাহেব
 কার্মাদেশে জন্ম গ্রহণ করেন ও সৈনিকরত্নে
 নীলীত হইয়া ভারতবর্ষে আপন করেন এবং
 ভাষ্যবল বিপুল ধন ও বিশাল যুগ্মে অধিকার
 ন। এখন মাটিম সাহেবের কুঠরে নবাবী সৈন্য
 চিহ্নই বিরামান। উইরোপীয় ও ব্রিটান
 হাভরণ এই স্থানে থাকে এবং তাহাদের জন্ম বিলা
 মণিলর কার্য, এখনে মাটিম সাহেবের হুস্ত
 সম্পাদন করিতেছে। কুঠরীপনের পর কাছ
 দেখিরা আমরা বাসায় প্রত্যাপন ও হইয়া
 বহন বাসায় আসিলাম, তখন প্রায় সমা
 হইয়াছে; আসিরা দেখি, শামীকী, ষ্টেশনে
 বাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন; অনেক কয়েক ষ্টেশনে
 গিয়াছে, কেহ বা বাইতেছে, কেহ বা ঘরবাড়ি
 প্রস্তুত হইতেছে। আমরা শেষদলেই গিয়া
 বিলাপান পর নীতলা যায় বারিরা অল্পে পাণি
 করিয়া ষ্টেশনে রওনায়া করিয়া গিয়া, ইকান-পলি
 শামীকী সহিউ ষ্টেশনে বাস।

সদস্যদের খামোছী, রাজবাড়ী, ইহতে প্রেনোভি
মুখে বাত্বা করেন, তিনি একখানি তাক্সো বিষয়
ছিলে, মদ্যাদ্যখরণ ও রাজবাহাভুরের সিপাহী
জগপ্রসং হইয়াছিল। সরেবর বড় ত্রাক্ষণ পতিত
অধিকাংশ ধনিগণ ও সম্রাট গৃহস্থগণ খামোছী
উপর পুশাখিলি বহণ করিত করিতে পদত্রে
অধুগমন করিয়াছিল। লক্ষ্যন করিতে পদত্রে
গণের খামোছী প্রতি এ প্রকার ঐক্যিক অন্ধ
বেশিয়া আমরা বিশেষ পুশিকিত হইয়াছিল।

আমরা যখন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম তখন রাত্রি প্রায়
৮টা। ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য স্বামীজীকে দর্শন
করিবার জন্য লক্ষসংখ্যক যেন ভাঁসিয়া পড়িয়াছে
লোকের এত ভিড় হইয়াছিল যে, ষ্টেশনের পুলিশ

স্বৈচ্ছাধিপতি সকলেই বিব্রত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়শাস্ত্র দূর করিতে প্রয়াস পাইছিলেন। রাণা চন্দ্রশেখরবর সোহান ও আবু আজমের কন্ঠচ্যারী স্বামীজীকে যেদেখী পথ্য্য পৌঁছিয়া গিতে সম্মত ছিলেন। তাঁহাদের গিহিবে দশমবারমিহ স্বামীজীর তত-লোকের পাণ্ডিতে ঊঠিবার বিশেষ বয়োবসন্ত প্রবেশ্য ছিল। এই হানে বলিমা গিহি, উত্তরপশ্চিম ক্রদেশবর হযোগ্য মাননীয় পুলিস মহাপুস্পের নোবেলেস বাহাদুর, হাফিজ মেলার পুলিস বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয়ের নামে একখানি এই মর্শে চিঠি প্রকাশ করেন, 'বাছাতে স্বামীজী হরিদ্বারে ভাল করিয়া মানাগি করিতে পাশনে এক ভাংতে তাঁহার কোন উপকার ক্রো না হয়, একপুত্র ব্যবস্থা করিলে তিনি বইই উৎকর হন। একিকরে চিঠি ক্রেশম বাহাদুর পাশিল। বামরা সকলে মনোবী হাফিজ ক্রজ কামদুয় হইতে বাগতে পাণ্ডিতে ঊঠিমান।' বৃন্দাময়ের গিহি শ্রোণ তাড়িঙ্গ দিল। প্রায়ঃকাল প্রায় ৭ টার সময় গাডিং বেরোবী শ্রোণে পৌঁছিল।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ ।

বাস্তালায় ওলন্দাজ বণিক্।

বাণিজ্যাবিভাগে সমাপ্ত হইয়া ওলন্দাজগণ এই
“মুজলা মুকলা” বন্দুকটির বিভিন্ন স্থানে এবং
উড়িয়া ও বিহারের চুই একটী স্থানে বাণিজ্যাগার
(কুঠী) সংস্থাপিত করেন। কুঠীসমূহ ভিন্ন ভিন্ন
স্থলে থাকিলেও চুঁচুড়াই ওলন্দাজ-বাণিজ্যকেন্দ্র
ছিল। উক্ত স্থানেই এক জাতীয় প্রধান বণিক-
প্রতিনিধি বাস করিতেন এবং উইদিগের সেনা-
নিবেশও এই স্থানে সংস্থাপিত হইত।

হুগলী নগরের পার্শ্বে এবং বাদশাহার ফরাসি-
অধিকারাবীন চন্দননগর হইতে প্রায় এক
কোশ ব্যতীতে ভাগীরথীর দক্ষিণ উপকূলে চুঁচুড়া
নগর সম্মিবেশিত। দুই শত বৎসরের অধিক হইল
“পুরুষভারতবর্ষকসমিতি” নামধারী ওলন্দাজ বণিক-
গণ এই স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপিত করি-
কোনোদলে ওলন্দাজগণকর্তৃক চুঁচুড়া অধিকৃত হয়,
তাহা ঠিক জানিবার সন্ধানাই।

• চুচুড়ান্নিত পুরাতন ওলন্দাজ-গির্জাদ্বার

জাতীয়তার চিহ্নাক্তি চর্যকল সনক সংরক্ষিত ছিল। এই চর্যকলসমূহের মধ্যে একটিকে উক্ত হাশের জৈনক ওলন্দাজ শাসন-কর্তার বিপরীতভাবে যে ১৬৬৫ খ্রষ্টাব্দে তিনি জীবনলালা সংরক্ষণ করেন। কোন পুস্তকে লিখিত আছে যে, ওলন্দাজেরা ১৬৬৫ খ্রষ্টাব্দে এই স্থান প্রাপ্ত হইয়া নগর স্থাপন করেন। ইহার সম্ভাব্যতার বিষয় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য; যে যেহে ১৬৬৫ খ্রষ্টাব্দে যদ্যপি উক্ত স্থানকে স্বত্ববহুর মত্বা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ওলন্দাজগণ এই স্থানে ১৬৬৫ খ্রষ্টাব্দে আরও পূর্বে আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অনুমান সংশয় থাকিবে না; সুতরাং ১৬৬৫ খ্রষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের জন্মক উক্ত স্থান প্রাপ্ত হওয়া মতটা সম্পূর্ণ ভুলমূলক।

এতদ্ব্যতীত ইংরেজদিগের প্রাচ্যত্ব স্থাপিত হইবার বহু পূর্বেই হইতেই ওলন্দাজদিগের বাসিত্ব বিস্তারিতরূপে পরিচিন্ত হইয়া আসিতেছিল। ওৎসম কালে ওলন্দাজাভিলাষে অম্বাভূমি যে সনক ইউরোপীয় জাতি এতদেখে আগমন করিয়াছিলেন, তদন্থে ওলন্দাজেরা বাসিজো সর্বাঙ্গকো কৃতকার্য এবং প্রকৃত ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা ১৬৮৭ খ্রষ্টাব্দে চুঁচুড়া নগরে একটি হৃদয়কৃত নির্মাণ করিয়া 'ফোর্ট নগটেজেন' নামে অভিহিত করেন। সেই পূর্বে চারিটা বৃক্ষক মণ্ডল ছিল, একটি বৃক্ষটোটা হইতে বড়জালদেবের বারিকের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আহ্মাদশাহ খাঁর ১৮০১ সন পূর্বে, যখন সেই দুর্গ একাকালীন ভূমিভাঙ্গ করা হয়, সেই সময়ের পূর্বে উহার উত্তর তোরণদ্বারে ১৬৮৭ এবং দক্ষিণ তোরণদ্বারে ১৬৯২ খ্রষ্টাব্দ লেখিত ছিল। ইহাতে স্পষ্ট আভ্যাসমান হইতেছে যে, বৎসকালে এই দুর্গ ভূমিভাঙ্গ করা হয়, তাহার সঙ্গে শতাব্দী পূর্বে উহা নির্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গস্থিত প্রাসাদসমূহের যে সনক কড়িকাঠ পাওয়া গিয়াছিল, সে সনক এরূপ স্থল যে, বর্তমানকালে তাহাতে দুইটা কড়ি হইতে পারিত। এ কলি বেরণ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বোধ হইয়াছিল, যেন সে কলি অতি স্বল্প বিনিমি প্রাসাদ সমূহে সরিষাশিত হইয়াছে। এ সনক কড়ি যাদে-তিজা হইতে প্রেরিত জাভাটিক হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা প্রতীপন হইতেছে যে, ডেড শব্দটা কালে উঠি এবং অর্জতা, জাভাটিক কাঠ শব্দটা কড়িতে পারে না। ফোর্টিং প্রতিনিউসমূহের

অনন্তত উদ্যান মধ্যে একটা সুখমা প্রাসাদে ওলন্দাজবর্ষিকপ্রতিনিউ শাসনকর্তার বাস করিতেন। এ সনক প্রতিনিউ এক্ষণে আর ন্যূনগোচর হয় না, বহু পূর্বে উহা অধুনা হইয়া গিয়াছে; এবং এই উদ্যানস্থ বৃক্ষপ্রাণীর মধ্যে যে গাছ বিস্তৃত ছিল—এক সময়ে বহুদূর ভব কড়ি প্রতিনিউশাসন সন্ধ্যামীর সেনানাভিলাষে পাদচারণ করিতেন—সন্ধ্যাপিও সেই বর্ষা পাতিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে এক্ষণে আর সে বনলাজজাতির পদচারণ হয় না; এক্ষণে উহা গৃহস্থ বাসিন্দাদের সর্গস্ব পদবিক্ষেপে বিকলপিত ও প্রতিবন্ধিত হইয়া থাকে।

চুঁচুড়ার অন্তর্গত 'মিঞা বোড' এবং 'ধর্মপুত্র' পরিষদের মধ্যবর্তী একটি প্রাচীরবেষ্টিত প্রাচীন সমাধিভূমি পরিচিন্ত হইয়া থাকে। উহার অভ্যন্তরে কতকগুলি ওলন্দাজদিগের সমাধিও দেখাযায় হইয়াছে। এই বেষ্টনের হাঁড়িগণে অসংখ্যক ব্রহ্মকায় বহু পাদপ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কটকাধারী বৃক্ষাধিপূর্ণ পতিত ভূত্বাধিকার মধ্যে আহ্মাদশাহি বিংশতি হস্ত উন্নত একটি সমাধিও দেখাযায় আছে, উক্ত সমাধির "বিবির পোর" কলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। প্রাচীন যে, এই সমাধি-মণ্ডিটিই সর্বাঙ্গশেখা প্রাচীন। ইহা মাত সাহেবের বিবির পোর।

ওলন্দাজদিগের প্রাচ্যত্বকালে ফার্সী-চন্দন-নগরের সহিত সীমা নির্দ্ধারিত করিবার ক্ষমতা-বোধ্য বরুণ চুঁচুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে বসবাস করিয়া গিয়া বাত হয়। অম্বাপিও এই নালী বর্তমান রহিয়াছে। সাধারণে উহাকে 'ফার্সিস গড়' বসিয়া থাকে।

চুঁচুড়া নগরের পশ্চিম-সীমান্তে দূর-বহীন তোরণেবহী হইয়া উত্তরী তত্ত্ব পরিচুতমান হইয়া থাকে; কতিপয় বর্ষক, ফার্সী-উপনিবেশ চন্দন-নগর হইতে যে সনক বাসায়গিল পন্যাময়্যাহি নইয়া বিক্রান্তিলাগে চুঁচুড়ায় আগমন করিত, এই তোরণ-বাহু তাহারিণে নিকট হইতে শুভ আশায় করা হইত। সেই কারণে উহার নাম 'তোলা-কটক' হইয়াছে।

ফার্সী-নগর-নির-প্রাধিকৃত-ভাগীরথী-বন্ধে নৌকা-রোহণে গমন করিবার সময় স্রোতধিনী-তীর-ভূমে রাজপ্রাসাদ-একটা অতীব বিপুলস্বরূপে প্রতীক্ষিতা উদয়-মস্তক পলিতভাবে দৃশ্যমান রহিয়াছে, সনকসহই নগরপথে পতিত হইয়া থাকে।

মুসে শিরী নামক জৈনক ফার্সীকর্তৃক এই জাতিলাগ ১৮১৫ খ্রষ্টাব্দে নির্মিত হয়। অর্ধ শতাব্দীর অধিক হইল, উক্ত ফার্সী, মহারাজদিগের অধীনে সেনাপতিগণে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিপুল অর্থোপার্জন করেন। অধুনা এই প্রাসাদ-মধ্যে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত। জাতিলাগী চুঁচুড়ার সীমান্তভাগে সংঘটিত হইলেও উহা 'ফার্সীকলেজ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহাদান মনিম নামক ভদ্রক ন্যাতা মুসলমানের বানানতাই এই বিদ্যালয় স্থাপ্যতিত হইবার মূল কারণ। তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপন এবং মুসলমানদিগের উপাসনা প্রকৃতি প্রচারনের জন্য ফার্সী নগরে একটি ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত করিতে যথেষ্ট অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

বকিও চুঁচুড়ার সহিত ওলন্দাজদিগের সংসর্গ বহুদিন হইল বিস্ত্রিত হইয়াছে, তদ্যপি উক্ত নগর-বাসীদিগের জাতি হইতে উহার একেবারে বিপুল হন নাই। অম্বাপিও চুঁচুড়াবাসিগণ প্রায়শক্রমে সময়ে সময়ে বলিয়া থাকেন,—“ওলন্দাজেরা এই প্রকার জিৎবা উহারিণের সময় ইংরপ হইত, ইত্যাদি।” সাধারণ লোকে “ওলন্দাজ” শব্দের অপভ্রংশে “ওলন্দা” শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। কলেশ প্রাধায়ে, বিমুখি-সহকারে যেনন ব্যক্তি স্থান অধ্যায় বিশেষের নাম বিস্ত্রিত প্রাধায়ে; সেইরূপ উক্ত নিয়মে বহুশব্দী হইয়া ওলন্দাজ শব্দও সাধারণের মধ্যে “ওলন্দা” শব্দে পরিণত হইয়াছে। কোন বন্ধুর নিকট আমরা অনুরণ হইয়াছি যে, ওলন্দা কড়াই এতদেখে প্রথমে ওলন্দাজদিগের কর্তৃক আনিও হইয়া, সেই যেহে উহার নাম “ওলন্দা কড়াই” হইয়াছে।

ওলন্দাজদিগের অধিকার কালে মালয় উপদ্বীপে ওলন্দাজ-ওৎসবে এবং মালয় (মসৌল) দেশীয় জীপ গর্ভে এতদেখে কিরীদীদিগের ভ্রায় মসৌল নামক এক জাতীয় কলস্করের উৎপত্তি হয়। প্রাপ্ত প্রী তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, উক্ত জাতীয় জীপ তৎকালে প্রায় সমস্ত ওলন্দাজ-উপনিবেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে চুঁচুড়াতেও উহারিণের পাওয়া নিত্যন্ত স্বাভাৱিক। উক্ত কলস্কর হারও যেনন যে, সৌন্দর্য্যের এবং নৃত্যীয়ের নিকাশ বশত ওলন্দাজদিগের উদারা বিশেষ শ্রিত্বভাজী ছিল। ওলন্দাজদিগের পুত্র সনকসহ—আধার্য-জিৎবা-বিহার করিবার পাত্রের স্বভাবে এই জাতীয় জীপের সম্ভাও চুঁচুড়াতে ক্রমে হইয়া আসিল। কলস্কর

বৎসর পূর্বে এই বর্ষের জীপোক চুঁচুড়া নগরে হুই একটা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষণে আর আছে কি না দেখিতে পারা যায় না। হয় উক্ত জাতি ভূতপ্ত হইতে এককালীন বিপুল হইয়াছে, অথবা ভারতবর্ষের বিস্ত্রিত হইয়া রহিয়াছে।

কিার সে ভগ্ন এবং ওয়েটন নামক তৎকালিক দুইজন স্থানীয় ইউরোপীয়ের বানদান চুঁচুড়াতে গিয়াছিল। একবাক্যে বাকি একজন দুষ্টায়-ধর্ম-প্রচারক ছিলেন। কবিতা আছে, ইনিই বাস্তাব্য-নিগমে প্রথমে ইংরেজী ভাষা শিখা সেন। শেষোক্ত ব্যক্তি আপন অধ্যয়নসময়েও বাসিজো বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়া চুঁচুড়ায় গঙ্গা বাস করিয়াছিলেন। ইনি প্রত্যেক মাসের প্রথম দিবসে এক সন্তস্ব ছয় মত মুদ্রা এককোশ দরিদ্রগণকে দ্বহন্তে দান করিতেন।

ডচ বা ওলন্দাজ জাতি নৃপ এবং অটল অধ্যয়নসময়ে সুচিতি বাসিজো-বাস্যদের অনুপ্রাণন করিয়া ইউরোপের ভ্রায় ভারতের বর্জিত ও উভয় হইয়াছিলেন। ভারতে অবস্থান কালের মধ্যে তাঁহারিণের কেবল একবার মাত্র পদ স্থলিত হয়। ১৮৭৭ খ্রষ্টাব্দে ক্রাইয়ের পলালী-মেষেত্তে বিজ্ঞানসম্মত মন-শাসন-প্রণালীর আভ্যন্তরীণ দৌর্য্য শাস্তিরূপে প্রকাশিত হইল। তদন্থেও ওলন্দাজদিগের চন্দন-সম্মিলিত হয়। পূর্বে তাঁহারা মুসলমান ধর্মপন্থের জাতি ও জিৎবা-সহকারে দেখিতেন। ক্রাইয়ের কৃত-কার্য্যতা দেখিয়া তাঁহাদের মনের ভাব পরিণত হইল,—তাঁহাদের মনে ভারতে ওলন্দাজ-রাজনীতি কল্যাণ সম্ভাষণের আশা সমুদিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কর্ণেল ফোর্ড তাঁহাদিগের সেই আশা-ভাব অকালে সমূহে উৎপাটিত করিলেন। এই ঘটনাই আমরা এতদেখে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

ইংরেজ-জাতির সাহায্যে এবং বিদ্যাসামর্য্যকাজ্য সাহায্যতঃ মুসলমানকুল-কলক মির জাফর মুর্শিদা-রায়ের নবায় হন।

বাপালায় সিংহাসনারূহ হইবার কিছু নিবস পক্ষে, তদীয় নবীন প্রকৃ ইংরেজের গবর্নরে অসদ্বর্জিত হইয়া তাঁহাদের অসীমতা-পাশ-মুক-হইয়া স্বাধীনতা লাভেজায় মির জাফর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ইহাতে, কৃতকার্য হইবার জন্য উক্ত নবায় ওলন্দাজ-নিগমে অধিক সংখ্যক সৈন্য আনিবার ক্ষমতা বারং-বার উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদেখে ইউরোপীয় জাতিদিগের প্রভাবে সমাজ

রাধিবার মানসেই এইরূপ একটা প্রতিযোগী ক্ষমতা সংস্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।
উভয়ন এইরূপে, নব্যকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া
সাংখ্যানি রপ্তায়া ব্যাটেকিয়া হইতে আদ্যন
করান। এই যুদ্ধভাষী সাতখানির মধ্যে তিন
খানিতে ছাত্রীরা করিয়া, তিন খানিতে প্রত্যেকে
ছাত্রীরা করিয়া এবং দ্ব্যধিকই একখানিতে যোগদান
মাত্র কামান ছিল। ইহা ব্যতীত এই রপ্তায়াসমূহ
সর্বসম্মত হইতে সঙ্গত এবং এক মত ইউরোপীয় ও
মধ্য উপদ্বীপবাসী সেনা দ্বারা পূর্ণ ছিল। এই-
রূপ রপ্তায়াসমূহ হুমজিত দেখিলে অস্বাভাবিক ইউরো-
পীয় জাতির মনোমধ্যে সঙ্কেত উৎপন্ন হইতে
পারে, সেই হেতু প্রকাশ করা হইয়াছিল যে,
করাদানভাগ উপকূলস্থিত ওলন্দাজ-উপনিবেশে
আনুগত্য স্বতন্ত্র এই রপ্তায়াসমূহ ব্যক্তিগত, কারণ
বিশেষে হস্তান্তরিত হইতে পারে বাধ্য হইয়াছে
মাত্র। বাহ্যিক উদ্দেশ্য উক্ত না কেন, ক্রাইবের
ভ্রাতৃ যুদ্ধার্থে ও বহননি-সম্পন্ন ব্যক্তিগত পক্ষে
ইহার প্রকৃত অভিজ্ঞ প্রায় গোপন থাকা অসম্ভব।
এতাবস্থায় ওলন্দাজ-বণিকগণ কেবলমাত্র বাণিজ্য
ব্যবসায় সন্নিবিষ্ট ছিলেন, রাজনৈতিক অথবা অস্ত্র-
কোন প্রকার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। পত-
নোদ্ধেয় মুসলমান-ক্ষমতার হবিষ্য হইয়া বাঙ্গালার
ইংরেজবিশেষের দ্বান অধিকার করাই যে, ওলন্দাজ-
বিশেষের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা দূরদর্শী ক্রাইব স্পষ্টই
স্মৃতিতে রাখিয়াছিলেন।

ওলন্দাজ-রপ্তায়া সমূহের আগমনবার্তা শ্রবণ
করাইয়া ক্রাইব, কর্ণেল কোর্ডে ওলন্দাজ-সৈন্য
আক্রমণ এবং কবিত রপ্তায়া সমূহকে চুচুড়া-গোপন
বাধ্য প্রদান করিতে আজ্ঞা করেন। ক্রাইবের নিকট
হইতে এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কর্ণেল কোর্ডে
বিস্মিত হইলেন, প্রত্যাহারে গিয়া পোর্টাইলেন
যে, তিনি সর্বদায় পাক্ষিক আক্রমণ ব্যতীত
অস্বাভাবিক বিপরীত পন্থায় এক অস্বাভাবিক
হস্তাক্ষর করিতে অক্ষম। কেননা, ওলন্দাজের সহিত
ইংরেজের এখন সন্ধি, হঠাৎ—তিনি বিনা অপরাধে
কেমন করিয়া ওলন্দাজগণের আক্রমণ করিবেন?

* এই সময়ে যথিত বঙ্গদেশে ইংরেজ, ফরাসী ও ওল-
ন্দাজ প্রভৃতি বহুদেশী উদ্ভাসিত হইয়াছিল, কিন্তু
তখনো ইংরেজই সকলোকা ক্ষমতাস্বাধীন ছিলেন।
শির কাণ্ড উক্ত জাতিই সমস্ত পরিবার ভ্রষ্ট
ও লজ্জাবশত উৎখাতিত করিয়াছিলেন।

তাসক্তজাতির যখন ব্যস্ত হইয়াছেন, ক্রাইব সেই
সময়ে এই পত্র প্রাপ্ত হইলেন। শিপি প্রাপ্তি-
মাত্রই—ক্রীড়া-টেলের তাগদ না করিয়াই পেসিলি-
ভিয়ে এই বিশিষ্ট পোর্টাইলেন,—“প্রিয় কোর্ডে, এই
সর্বদায় যুদ্ধ আরম্ভ কর। কাউন্সিলের আক্রমণ
করা পোর্টাইলেন।” এই পত্র প্রাপ্ত হইয়াই
কর্ণেল কোর্ডে যুদ্ধে প্রস্তুতিত করিয়া বাঙ্গালার
ওলন্দাজবিশেষের আশিষ্ট-সংস্থাপন-নিষ্পন্ন মূলে
চুচুড়াত্যাগ করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ ১৭১০ হইতে ১৭৮০ দ্বিত্বাবধি মধ্যবর্তী
সময়েই বাঙ্গালার ওলন্দাজবিশেষের বাণিজ্য, উন্নতির
চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। উক্ত জাতির
বাণিজ্যের প্রাথমিক উন্নতির পক্ষেই উপনিবেশ
সমূহে লাভালাভ ব্যয় অধিক হইত। ঐ সময়ে
উইরা অর্থক ব্যয়সম্বন্ধ সস্ত্র রাখিতেন এবং
উক্ত জাতির বণিক-প্রতিনিধি, তাঁহাদের পক্ষ
অপর্যাপ্তরূপে পুঙ্খন করিতেন। বাঙ্গালাস্থিত
ওলন্দাজ-কর্মচারীদের চরিত্র এবং কার্যপ্রণালী
কিঞ্চল ছিল, ব্যাটেকিয়ায় উক্ত কর্মচারীদের পক্ষে
কোন প্রকাশিত আছে, তাহার অথবা আশ্রয়
এ স্থলে সন্নিবেশিত করিতেছি;—

“ক্রমবশেষে কয়েক বৎসরকাল বঙ্গদেশে কতকগুলি
বাণিজ্যব্যবস্থা-সম্পন্ন, অত্যন্ত কদর্য আশ্রয়
ও প্রভাবনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রকাশিত হই-
য়াছেন। তাহাদের সন্তানদের উপর নির্ভর করিয়া
কোম্পানির পক্ষ দ্রব্যাদি রাখা হইত, সেই
সকল যেন জাতিবিশেষের পুঙ্খন করিয়া থাকিত।
কঁরায়া যথোক্তকালে বাণিজ্যব্যবস্থার চালানের
দর নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিযুক্ত। তাঁহারা কার্য-
গ্রহণ কালীন শপথ ও কৃত্তব্য-কর্তব্যের প্রতি বিধি-
ভাষা লক্ষ্য না করিয়া, পদাশ্রয়াদি গ্রহণ বিষয়ে আশা-
বিশেষ রাখিত। ও নিম্ন অতি দ্রুতি এবং কৃত্তব্য-
রূপে উল্লভ্য ও অগ্রাহ্য করিতে অসুস্থতা কৃত্তি
হন নাই।”

এই বর্ণনার কিছুকাল পরে বঙ্গদেশে ওলন্দাজ-
বিশেষের জল এবং স্থল সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত
হইয়া দশ জন গোলাঘাট, উনসত্তর জন সৈন্য
ও নাবিক প্রভৃতি আটজন জন নৈমিক, সেনাধ্যক্ষ
ও সৈনিক-প্রকৃত চিকিৎসক মাত্রের পরিণত হইয়া-
ছিল। ইহা ব্যতীত গোটিয় জন চিকিৎসকর্মচারী
এবং দুই জন স্বাভাবিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে
দশপাক্ষিকপ্রাণ্য কর্মচারীদের এত অধিক প্রবল

হইয়াছিল যে, উহা দমন করিতে ওলন্দাজ-বণিক-
সমিতির সন্ধানিকারিবশত বিশেষ প্রয়াস পাইতে
হইয়াছিল,—সময়ে সে বিষয়ে তাঁহারা কৃতকার্য
হইতে পারিয়াছিলেন।

এতদবশতঃ জীব্যাবির ইউরোপে রপ্তানি অপেক্ষা
জাভা রাপে অধিকেন প্রেরণ করিয়া ওলন্দাজবণিক-
বিশেষের কার্য লাভ হইত। তাঁহারা পটনা প্রবেশ
হইতে প্রাপ্ত আটশত বাক্স অধিকেন, প্রত্যেক
বক্সে বাবেতিয়া উপদ্বীপে জাহাজে প্রেরণ
করিতেন। তথা হইতে নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জসমূহে
বটন করা হইত এবং সম্ভবতঃ চীনদেশেও প্রেরিত
হইত। কবিত বাঙ্গালসমূহের প্রত্যেকে ৬৪ মণ
অধিকেন থাকিত। সর্বপ্রকার খরচ ইয়া প্রত্যেক
বাক্সে সমিতির ৭৮শত মুদ্রা পড়ত ব্যয় হইত।
সেই বাক্স ব্যাটেকিয়া উপদ্বীপে ১২০০ মুদ্রায়
বিক্রীত হইত। এই ব্যবসায় ওলন্দাজ-বণিক-
সমিতির আয় চারি লক্ষ মুদ্রা বাৎসরিক লাভ
হইত।

চুচুড়া উপনিবেশ ব্যাটেকিয়ার অধীনে ছিল।
এই স্থানে যে সকল পদ বাণি হইত, ব্যাটেকিয়ায়
কর্তৃপক্ষীদের কর্তৃক নিযুক্তি ব্যক্তি সেই সকল
পদ প্রাপ্ত হইতেন। স্থানীয় সভার সভাপন কেবল
কোন সাময়িক কার্য নিষ্পত্তির নিমিত্ত কোন ব্যক্তি
নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এই উপনিবেশের
শাসন-কার্যের ভার একজন পণ্ডিত অথবা ডি-
রেক্টর এবং প্রতিবিশেষে মন্ত্রণা দিতে সম্মত
উপর বসিত ছিল। এই সাত জন সভার মধ্যে
পাঁচ জন, সভার প্রত্যেক কার্যে ভোট বা সম্মতি
দিত এবং প্রতিবিশেষে মন্ত্রণা দিতে সম্মত
ছিলেন। কিন্তু আর বাকী দুইজন মন্ত্রণা বা পরা-
মর্শ দান ব্যতীত আর কোন বিষয়ে অধিকারী
ছিলেন না। গুরুতর বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করণ
তাহার সভার সভ্যদের পরামর্শ লইতে বাধ্য
ছিলেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তি মতামুসারে এই
সকল বিষয়ের মীমাংসা হইত। কিন্তু অধিক
লাভালাভ সম্বন্ধে ঐ সকল সভাপন পণ্ডিতের অধীনে
ছিলেন, সেই হেতু পণ্ডিতের কার্যপ্রণালীর উপর
সভ্যদের প্রাধান্য বা দমন ব্যতীতই নাম মাত্র
ছিল। প্রধান ডিরেক্টরের পক্ষের যেজন অধিক
সমর্থ হইলেও তাঁহার উপরিলাভ অত্যন্ত অধিক
পরিমাণ ছিল। মিঃ জার্নে নামক জনৈক ওল-
ন্দাজ-পণ্ডিত বা প্রধান ডিরেক্টর বণিয়াছিলেন যে,

তাঁহার গৃহস্থরচ বাৎসরিক ছত্রিশ সহস্র মুদ্রা হইত।
এই পদের সুকীর্তিদারিপণের অপেক্ষা এই ব্যয়
তিনি অত্যন্ত পরিমিত বণিয়া দৃষ্টবান করিতেন,
যে হেতু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ব্যয়
লক্ষ মুদ্রার কম হইত না। ওলন্দাজপণ্ডিতের যদিও
কেবল একটা মাত্র বণিক-সমিতির প্রধান ছিলেন,
কিন্তু তাঁহার তাঁক জমক ও ঐশ্বর্য বড় সামান্য
রকমের ছিল না। তাহারা নামক এক প্রকার
বান্দারী এখনও আছে, তাহাতে চোয়োর ভ্রাতৃ
পরিবার আছে আছে। ওলন্দাজ উপনিবেশের প্রধান
ডিরেক্টর ব্যতীত কাহারও ঐ পাকী আরোহণ
বাহারোহণ অধিকার ছিল না, তিনি যখন ঐ
বাহারোহণ দমন পণ্ডিত করিতেন, সেই সময়ে
চুচুড়ার কোন কোন নির্দিষ্ট স্থানে এতদবশে-
বাসীমণ্ডিক ব্যাঘ্র বাকন করিতে হইত। এমন
কি, কবিত আছে যে, উক্ত নগরসমূহে ব্যাপ্তি কোন
নৈমিত্তিক অথবা বাহ্যিক বাহ্যিক সময় কোন
ইউরোপীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে
তাহাকে অত্যাচার অথ হইতে অবতরণ করিতে
হইত এবং যে পণ্ডিত না ঐ ইউরোপীয় উক্ত স্থান
পরিভ্রমণ করিয়া বাহ্যিক, সে পণ্ডিত তাঁহাকে
মিঃ জার্নে নামে ডাকিত হইত।

তৎকালে সকল উপনিবেশের উক্ত কর্মচারী-
বিশেষের সঙ্গে পরামর্শমূলক চোয়োর বা চোয়োর-
গণ (শান্তিগণ বা গোলাঘাটবাসী) যে গোপনভাবে
বাণিত হইত। ইহাদের হস্তে রক্তপত্র-মণ্ডিত আসা
সৌটা থাকিত। চুচুড়াত যখন ওলন্দাজ-ডিরেক্টর
ইচ্ছাপূর্বক পদন করিতেন, তখন তাঁহার সহিত
ছয় জন আসা সৌটারী চোয়োর থাকিত।
ডিরেক্টরের অব্যবহিত নিরপুষ্ক কর্মচারীর সঙ্গে
হইত জন মাত্র চোয়োর থাকিত। কলিকাতায় তৎ-
কালে প্রত্যেক পণ্ডিত ইংরেজের সহিত একজন
করিয়া চোয়োর থাকিত। ওলন্দাজবণিক ব্যক্তিগত
সম্মানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, সেই জন্য
কেননাও ওলন্দাজ-পণ্ডিতের চোয়োরবিশেষের আসা
সৌটা সমস্ত রক্ত-পত্র-মণ্ডিত হইত; এবং
কাউন্সিলের সভ্যদের চোয়োরবিশেষের হস্তে অর্ধ-
চোয়োরবিশেষ আসা সৌটা থাকিত। ইংরেজ-বণিক-
সমিতির ভ্রাতৃ ওলন্দাজবিশেষের কাউন্সিলের সভাপন
জ্যেষ্ঠ বণিক নামে অভিহিত হইতেন; এবং
প্রত্যেক বণিক হাতে এক একটা বিভিন্ন কাহারও
কর্তৃক তার দ্রব্য থাকিত। যিনি কোষাধ্যক্ষ, তিনিই

ভিয়ারে উপনীত হইলেন। উক্ত স্থান পটিকপিরের
অধিনিত নহে। তথায় একটা সমুদ্রের সন্ধান্য কর্তৃক
হুম্বর একজন বানান প্রবরে অতীত প্রীতি এবং
নৈমিত্তিক-কালে উপায়ে জন্মিত ভোজনে
পরিভোজ লাভ করিয়াছিলেন। রক্তাণ্ডি গ্রন্থের
সময়ে তাঁহার নগরস্থ নিজ নিজ আশ্রমে গিয়া
আসিলেন। পর বিশ্ব সম্ভাসমাগমে কোট হাউসে
একটা বিরাট নৃত্য সভার উদ্যোগ হয়। ওলন্দাজ-
গবর্নরকে আহ্বান করিবার অভিপ্রায়ে এই দিবস
বেলা নান বক্তার সময় কাটায় সময়ে প্রথম
নিমন্ত্রণ করিতে তাঁহার বাসস্থানে গমন করিয়া
ছিলেন। নৃত্যগৃহীত পুষ্পমালা হ্রস্বোত্তি ইয়া-
জ্জি। যদিও গ্যাশালোক তৎকালে প্রবর্তিত
হয় নাই, তৎকাল গৃহীত মাধ্যমত আলোকিত করিতে
কৌশল হয় নাই। উহার চতুর্ভুজ উৎসবময় বোধ
হইতেছিল; কলে এই প্রোদাম-প্রকটীক অতীত
স্বপ্ন ও প্রকৃতি সহকারে হৃৎকম্পিত করা হইয়াছিল।
কাটিয়া-পড়া এবং ওলন্দাজ-ভিত্তিককর্তৃক নৃত্য
আরম্ভ হয়। এই নৃত্যগণনাতে বহুসংখ্যক বাকি
আহুত হইয়াছিলেন। সকলেই জন্মকাল বহুমুখ্য
ব্যায়ি পরিধান করিয়া ছিলেন; বিশেষত পেশাদারী
ইংরেজ-মহিলাগণ বিবিধ প্রকার মূল্যবান রত্ন-
লগ্নায়ে বিভূষিতা ছিলেন। পার্শ্ব একটা গৃহে
ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। এই নামের সভা
ভঙ্গ পরদিন প্রাতঃকালে হয়। ইহার পরদিন
আরোহণ সাক্ষি তিন বক্তার সময় ওলন্দাজ-ভি-
লার কলিকাতা গবর্নরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া
তাঁহার মন্ত্রিপন সহকারে গবর্নরের শকটোরেয়ে
চিহ্নপুত্র প্রত্যাপন করিলেন। যে সকল কর্মচারী
তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত পূর্বে চিহ্নপু-
ত্র গিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং গবর্নরের ছায়ার রশ্মি-
সৈন্য উদ্ভাবনের সম্ভাবনায়ারের অসম্মত পূর্ণো-
ন্মিষিত তত্ত্বীমসমূহে উঠাইয়া দিয়া কলিকাতায়
ফিরিয়া গেলেন। কলিকাতা পৌছিয়াবর সময় গুরুপ
তোপারকনি দ্বারা আহুত হইয়াছিলেন, সেই
রূপ উক্ত নগর পরিভ্রমণকালীন ওলন্দাজ-ভি-
লার বিদায়-সন্ধানগুরু ফোটেলিয়ারম হৃৎপের
উত্তরে আহুত উন্মিষিত বার তোপ সন্মিত হইল।
এই সাক্ষাৎকার-উপলক্ষে ওলন্দাজ-গবর্নর কলি-
কাতার গবর্নরের বার্ষিক ভূতরুলকে এক সহস্র মুদ্রা
পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিল। জ্যোতিষমাগমে
ওলন্দাজ-সমীলন চুচুড়াভিমুখে যাত্রা করিল।

সমগ্রগ্রাম-শ্রীর অবসান-কালে, উক্ত নগরনিবাসী
যে সকল জাতি স্থানান্তরে বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া
যান, তাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্ণবিপ্লব (অধিকাংশ)
চুচুড়ানগরে আসিয়া বাস করেন। ইহাদিগের
মধ্যে প্রায় অধিকাংশই দম্যতা। আবার কলিকাতার
শ্রীত্রিঙ্গ সহকারে উদ্ভাবনের মধ্যে অনেকেরই এই
নগরে আসিয়া বাসস্থান করেন;—এই সকলের
মধ্যে কেহ পূর্ণাঙ্গ এবং কেহ বা অসুপাঙ্গ।
বুড়, দীল, মজিক প্রভৃতি কলিকাতায় দম্যতা
স্বর্ণবিপ্লব বহুপুত্র হইতে আসিয়াই বাস
করিতেছেন।

চুচুড়ার সোমদিগের নাম অনেকেরই অবগত
আছেন। ওলন্দাজদিগের সময় হইতে ইহাদিগের
বংশ উক্ত স্থানে প্রচায়া। ন্যূনাধিক শেখরভাঙ্গীও
পূর্বে রামচন্দ্র সোম নামক—অনুদাতন সোমদিগের
জন্মক পূর্বপুরুষ, ওলন্দাজদিগের সেওয়ানী-পদে
নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, তদীয় পুত্র
গ্রামসম সোম ওলন্দাজ-গবর্নরকে কলিকাতায়
মেশ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তদা যাহা যে,
বাস করিবার ভঙ্গ শ্রামসম সোম একটা প্রাসাদবৎ
অট্টালিকা চুচুড়ায় ভারীপীর তীরেই নির্মাণ
করেন। এই অট্টালিকা-সংলগ্ন একটা অবতরণী
মোদানাবলি ভাগীরথীর জলে প্রবেশ করিয়া দূর
বহিষ্ঠ হইয়াছিল। অত্যাগিও এই বাটের অস্তিত্ব
রহিয়াছে এবং উহার নির্মাণের নামানুসারে
“গ্রামবাসুর বাট” নামে অভিহিত হইতেছে।
কথিত আছে যে, এই অট্টালিকার চারিদিকে চারিটা
রুবাকার পিরামিড ছিল। একদা উল্লাসে
গ্রামসম সোম মুরশিদাবাদের নবাবের নবৎ
আনাইয়া নিজ বাটেরে বাক্সাইয়াছিলেন। উই
সংবাদ নবাবের কণ্ঠোত্র হওয়াতে তিনি উই
বাসুরে বক্ত করিয়া মুরশিদাবাদে লইয়া যান। তথায়
বিস্মদিসম উইকে কারাগর হইয়া থাকিতে হইয়া;
ছিল। কারাবাসকালে গ্রামসম বাসু কোন যুদ্ধে
গুরু সংবাদ পাঠাইয়া একটা মহামুখ উপলক্ষন
(নজর) লইয়া বাইয়া নবাব-সমীপে উপস্থার দেন।
উইকে কারাগর নবাব এবং বেলাং দিয়া
নিদায় দেন। তিনি নবাবের নিকট হইতে ‘বাসু’
উপাধি প্রাপ্ত হন।

ওলন্দাজদিগের সময়ে চুচুড়া, ইউরোপীয়দিগের
তাৎকালিক একটা স্বাধ্য-নিদায় ছিল। অজ্ঞাত

ইউরোপীয় জাতিগণ ঐয়কালে এইস্থানে বাটা
ভাড়া লইয়া বাস করিতেন। চুচুড়ায় ওলন্দাজ-
দিগের মধ্যে সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই মরণকালে একটা
করিয়া কল-পুত্র-সমগ্রিত পত্নী-নিবাস ছিল। দিবা
দ্বিধের কালে তাঁহারা কথিত পত্নী-নিবাস সমূহে
গমন করিতেন। উক্ত স্থানে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া
উপনিবেশে প্রত্যাপ্ত হইতেন। তৎকালে এক-
দেখের ওলন্দাজ-মহিলাগণের কিরূপ প্রকৃতি ছিল,
তৎসম্পদে প্রোভোনিম্ন দ্বারা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে
তাঁহার মর্ম্ম এখানে সন্নিবেশিত করা যাইতেছে;—
ওলন্দাজ মহিলাগণ অত্যন্ত অলসপ্রকৃতি, অসুখ্যামশীল
ও অমনোযোগী ছিলেন। ইহঁদের হইবার কারণ
এই যে, তাঁহারা অশিক্ষিতা একই প্রকার বহুসংখ্যক
বাস দানী কর্তৃক পরিত্যক্ত থাকিতেন। মাড়ে মাত
অথবা আট বক্তার পুর্বে তাঁহারা কখনই শয্যা
ত্যাগ করিতেন না। দিগ্ভের কালে পরনিদ্রা-
দিগের সঙ্গে জৌড়াকৌতুকে ব্যস্ত থাকিতেন। এই
পরিচারণকালের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকিতে
পারিতেন না, অথচ এই হুর্ভাগ্যদিগের একই মাত্র
জ্যেষ্ঠ হইলেই নির্দয়রূপে কশাঘাত করিতেন।
তাঁহারা দাস সর্বদা ‘এলোবেলোরুপে বস্ত্র পরিধান
করিয়া থাকিতেন। কোন মোদায় শব্দ করিয়া,
কখন মোড়ায় এবং কখন বা কু-শয্যায় পশয় বিস্তার
করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ইহা ব্যতীত দাস সর্বদা
তাপুস্কারে ওঠার রীতি এবং দোকান-চর্চণে
হতপ্রাণী কৃষ্ণগায়ক করিতেন।”

নানা কাহার শাক সমগ্রিত বীজ ইংরাজ ও অজ্ঞাত
ইউরোপীয় জাতি প্রত্যেক বৎসর ওলন্দাজদিগের
দ্বারা প্রাপ্ত হইতেন। ইংরাজগণ ওলন্দাজদিগের নিকট
ইহঁতে বাগান প্রস্তুত করিবার সখ শিক্ষা করেন।
ওলন্দাজগণ প্রথমে পিপুলি এবং বাসোদনের
বাগিচা করতেন, পরে চুচুড়ায় এই স্থানে করেন।
কক, ঢাকা, কলিকাতাবু, পাটনা, ফড়িয়া প্রভৃতি
স্থানে সমূহ ওলন্দাজদিগের হুঁ ছিল। বরাহগণের
এবং পশুতা চুচুড়ায় ভ্রায় উক্ত জাতি অধিকাংকুল
ছিল। বরাহগণের সম্বন্ধে এখানে ইহা একটা কথা
উল্লেখ করি। কানীপুরের অব্যবহিত উক্তের বরাহ
নগর। ওলন্দাজদিগের বাগিচারে উক্ত সহকারে
এই স্থানেরও বিশলক্ষ উন্নতি হইয়াছিল। এইপ্রাণে
অনেককাল ইষ্টকালর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার
মধ্যে কতকগুলি ওলন্দাজদিগের সম্বন্ধে। পণ্ড-
বেদকে-দ্যেক এই স্থানের প্রাচ্য উৎপত্তের চিহ্ন

অত্যাগিও স্পষ্টরূপে পরিদৃশমান হইয়া থাকে।
বিগত শতাব্দীর অধিকাংশকাল এই প্রাচ্য ওলন্দাজ-
দিগের অধিনায়ক ছিল। ইউরোপীয়গণ উক্ত জাতির
বাগিচা-তরী সকল চুচুড়ায় বাইবার কালে এইস্থানে
নগর করিয়া, অবস্থিত করিত। ওলন্দাজদিগের
পূর্বেই এই স্থানটা পট্টীজদিগের অধীনে ছিল।
বৎকালে কলিকাতা বঙ্গ জঙ্গদিগের আসা ভূমি
মাত্র, তৎকালে বরাহগণ দিপুল বাগিচারে অগার
ছিল।

ওলন্দাজ-পূর্ব-ভারত-বিশ্ব-সমিতি যখন দৈব-
নৈমিত্তে, ভারতে তাঁহাদিগের বাগিচারে দিন দিন
অন্যত হইতেছে,—পূর্বে বাগিচা-কৃতিসমূহ যেরূপ
লক্ষপ্রায় ছিল, তৎকালই তাহার ভ্রাস হইয়া আসিতেছে;
তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, ভারতে তাঁহাদিগের
উপনিবেশ রক্ষা করা কেবল রাজস্বকে ভ্রাস্রাজ্য
করা মাত্র। কথত ওলন্দাজগণ তাঁহাদিগের বস্ত্রী
উপনিবেশ এবং কৃতি সমূহ পরিত্যাগ করিবার
অভিপ্রায়ে করিয়া বিশলক্ষ বিজ্ঞতার কার্য করিয়া
ছিলেন। মুরাতী বীপ-পুত্র গবর্নমেন্টের অধিকার-
ভুক্ত ছিল। উক্ত স্থানীয় বৃষ্টি-কর্মচারিগণ বুঝেছে
ব্যয়ভূষণ করিতেন। ইহঁতে নিম্নেই ইংরেজ গবর্নমেন্ট
এই বীপের সম্বন্ধ হইতে সম্রাট পাইবার বিশলক্ষ
সুবিধা পাইলেন। একশত অশ্বতি বৎসর কাল
ভোগ দগল করিবার পর ওলন্দাজগণ ১৮২৫-২৬
বঙ্গোপে চুচুড়া ও মালদা উদ্ভাবনের ইংরাজ ঢাকা,
কলিকাতাবু, বাসোদন, কটক, পলতা, পাটনা এবং
ফড়িয়া প্রভৃতি স্থান সমূহে অবস্থিত হইত।
ইংরেজগণের অদ্বান করিয়া, তদিনিমিত্তে যেটো
মার্কবা এবং ইহার অবদান অজ্ঞাত স্থান-সমগ্রিত
স্থানটা বীপ গ্রহণ করিলেন। এই বিনিময় কার্য
সম্পাদিত হইবার অব্যবহিত পরেই চুচুড়ায় ওল-
ন্দাজদিগের প্রাচীন দুর্গ এবং গবর্নমেন্ট-হাউস
ইংরেজ কর্তৃক ভূমিভাগ করা হয়। অপর দিক-সমীপে
ইহাদিগের স্থানে সহস্র জন উৎসব-সৈনিকের
বাসযোগ্য একটা হুত্ব সৈন্যনিবাস (বারিক)
নির্মিত হয়। চুচুড়া যে এক সময়ে ওলন্দাজদিগের
অধিকারভুক্ত ছিল, এই-কথিনী উক্ত বহুসংখ্যকে
কনাইয়ার জন্ত কোন চিহ্ন অবশিষ্ট হইল না—যাহা।
কিছু বলিল, তাহা’ অতি ব্যয় কালেই বিস্তৃত
সুপারে নিম্ন হইবে।

ঐ আধোরনাথ দত্ত।

দেখিতে পাইবে, ৩০।৮ জন উক্ত ও নীচ বংশোদ্ভব প্রকৃষ্ট-বংশ যাত্রী, মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক 'বম্' মূখ হইয়া হইয়া' রহে পণ্ডিত হইয়া।

হাথারা হস্তা দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রথমতঃ প্রাতে শিশুগণ পূর্বদিক-ভাগে করিয়া বাবার পূজা-বিজিয়া সম্পন্ন করেন; তারপর পূর্ণ দিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত একমনে একাগ্রচিত্তে অনারিত বারানার উপর গড়িয়া থাকেন; তাহার পর উদয়ীয়া পূজা-বিজিয়া সমাধা করিয়া বাবার চরণসম্মত পান করেন। এইরূপে থাকিয়া, কেহ বা প্রথম রাত্রিতে, কেহ বা দ্বিতীয় রাত্রিতে এবং কেহ বা তৃতীয় রাত্রিতে বাবার প্রসন্নতা লাভ করেন। কাহাকে রাত্রিতে ৭৮ দিন অপেক্ষা করিতে হয়। কেহ কেহ বা নিম্নের ভাষণসোবে বাবার প্রসন্নতা লাভ করিতেই পারেন না। আশা। এই সব যাত্রীর সেই বিবাহ-কামিাময় মুহূর্ত্তবি দর্শন করিলে এবং নিরাশার নিম্নস্থ ব্যবহৃত মন্দিরে আর্দ্রান্না এবং করিলে পূর্ণিমাও বিপণিত হয়। আবার যে সকল পাণী ভাণী শোক-জরগ্রস্ত ব্যক্তি বাবার প্রসন্নতালভে সক্ষম হয়, তাহাদের মূখ দেখিলে জ্বর প্রেম-বিশেষ বিকারিত হইয়া উঠে। 'বম্' বম্ হইয়া রহে নিত্য ধ্যানিত ও প্রতিব্রজ্যনিষ্ঠ—সত্যতঃ সৌগন্ধ্য ও মাংসবাহী পর্বন দ্বারা বাজিত—সুপু-দুনা-সমবিত্ত আরাতি প্রদায়ক আলোকমালায় আলোকিত—এই সব যে একবার দর্শন করিয়াছে, সেই ক্ষণ। এই সেল, বাবার মূল মন্দিরে কথা। এখার সম্মুখে অস্ত্রাঙ্গ মন্দিরে বিদ্য বলা বাউক।

এক্ষণে যে সকল মন্দির বিদ্যমান আছে, পূজা-পদ্ধতি-স্বরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বৃদ্ধা যাত্র, তাহাদের মধ্যে এমন একটা নাই যে, তাহা অতি প্রাচীন বলা যাইতে পারে। যদিও কোন কোনটাকে বলা যাইতে পারে; কিন্তু মূলে ইহাদের যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই। যে সকল মন্দিরের উপর এখন প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি সমভাবে সমস্তের রক্ষিত নহে। মন্দিরসমূহের মধ্যেও বহু দুঃস্থান-দর্শন নহে। এই সব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে সহজই উপলব্ধি হয় যে, অনেক স্থানই আধুনিক সংযোগের সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান। মন্দির-সমূহ প্রাচীন হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের চতুঃ-পাদিক বেন নতুন বসিয়াই মনে হয়। লক্ষ্য-

নারায়ণের মন্দির সর্বাপেক্ষা মৃদু বয়সী পরিচিত।

এখন বৈদ্যনাথের অতি প্রাচীনতম মন্দিরাদিগে ভ্রমণাশেষে লক্ষিত হয়। আক্সিলজিকাল সরবরের পারিক সাহেবও ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন:—

"It is perhaps one of the most interesting sites in India.—not so much for its present standing architectural remains, which, though ancient, are comparatively few in number, but on account of its historical associations, both archeological and ethnological, its situation being surrounded on all sides by countless structural relics of a by-gone time, which alike tell vividly of the rise and fall of unknown dynasties, and set forth examples of the earliest Brahmanical architecture of which we have knowledge." (*)

আমরা ইতিপূর্বে পৌরাণিক প্রমাণে বৈদ্যনাথের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। পারিক সাহেব ইহার প্রাচীনত্ব গৃহাধির ভ্রমণাশেষের দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

পারিক সাহেব বৈদ্যনাথ স্বতন্ত্রক দেখিয়া-ছিলেন। তিনি বৈদ্যনাথক্ষেত্রে গিয়া প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্থান স্থান পরীক্ষা করিয়া-ছিলেন। তাঁহারই কথা সংক্ষেপে বলি;—(†)

"বৈদ্যনাথের পশ্চিম দিকে একটি মৃদুত্ব বৃহৎ মস্তিকাস্তপ পরিলক্ষিত হইয়া আছে। উহার উপরে একটি শিখ-মন্দির নির্মিত আছে। উহা অসংলগ্নতঃ কিঞ্চিৎ আধুনিক বলিয়া অনুভব হয়; এবং উক্ত গ্রামের উত্তর-পূর্ব অভিমুখে অর্ধেকোণ অন্তরে একটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার উপরে কোন প্রকার মন্দিরাদি নির্মিত নাই। কেবল ইষ্টক সনন ইত্যন্ততঃ প্রশস্ত রহিয়াছে। তাহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি আছে, এইস্থানের উপর পুরাকালে ইষ্টকালয় বসিয়াছিল। এক্ষণে ইহাও বহু কতকটা শব্দভায়ে-পরিব্যত হইয়াছে। ইহা কাহারিও

নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে আর একটা-ইষ্টক-স্তূপ আছে, এখানে উক্তের মূখ-নিচয়ের স্থলে কতকগুলি ভগ্ন কোণিত প্রস্তরখণ্ডও পণ্ডিত রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত বৈদ্যনাথ হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য স্বরূপ অস্ত্রাঙ্গ ভ্রমণাশেষও দেখিতে পাওয়া যায়।

"মন্দির-সম্বন্ধে বনন-কালীন তিনটা প্রকাঠ এবং প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে কোন একটা ব্যাভাববশতঃ বননভাগ্য হৃদিত রাখিতে হইয়াছিল, ফলে ভূমধ্য হইতে আর কিছু ব্যাধিত হইতে পারে নাই। সে যাহাই হউক। এই প্রকাঠত্রয়ের মৌলিক যেকোনটি চূর্ণমিত্রিত মসলা দ্বারা প্রলেপিত ছিল। উহা দেখিতে অতি মৃদুত্ব ও দুঃস্থ। ইহা ব্যতীত ভূমিতে কাঞ্চ্যাক্ষয়ক প্রকাঠ প্রস্তরও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি রক্তবর্ণে বেণিয়া আছে এবং কতকগুলি বা ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ পুষ্টি। মধ্যে পুষ্টিপুষ্টি-রূপে অল্পসংখ্যক আমার মনে এইগুলি বিদ্যমান জমিয়াছে যে, এই ভূমধ্যস্থিত বাটা প্রাচীন বৈদ্যনাথের মন্দির ব্যতীত আর কিছু নহে।

"আধুনিক ভূ-বননে আমার এইরূপ অনুমান হয়, প্রাচীন মন্দিরের সমুদ্রস্থ অক্ষাধ পূর্বদিকে স্তম্ভতাপরি সংরক্ষিত ছাদরূপ টানা মন্দির এবং এই পূর্বের মাধ্যমে মহাপ্রাণ এবং এই মন্দিরের পশ্চাতে পশ্চিমদিকে পুরোহিতবিশেষের জন্ম মৃদু মৃদু গৃহস্থেই নির্মিত ছিল। আবার এই সমস্ত মন্দিরাদি উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত ১২০ ফিট এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত ১০০ ফিট হইয়া মৃদুত্ব ও বৃহৎ প্রকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীর-দ্বয়ের স্তম্ভ ত্রিভু পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

"আধুনিক মন্দিরাদি যে প্রাচীন মন্দিরের অনেক উপকরণদ্বারা বিনির্মিত, তাহা সহজই অনুভব হইয়া থাকে। যেহেতু বর্তমান মন্দির ও তৎ-সংক্রান্ত অস্ত্রাঙ্গ গৃহাদির প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার গায়ে প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি অস্ত্রাঙ্গ বিশৃঙ্খলরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে, ফলে এই সকল প্রাচীন মন্দিরের ভ্রমণাশেষ উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মূল্যবানদ্বারা কেবল মন্দিরাদি গৃহস্থেই নির্মিত হইয়াছে। ইহাও প্রমাণিত হইতে হইয়াছে। ইহাও প্রমাণিত হইতে হইয়াছে। ইহাও প্রমাণিত হইতে হইয়াছে।

পারিক সাহেব ভ্রমণাশেষ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন এবং ভ্রমণে আক্সিলজিকাল সরবরের বেণলার সাহেব বর্তমান অধিকার আধিপত্যিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। উপর বান-নির্ণয়ের যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বেণলার কর্তৃত্বই সংগৃহীত। এই নির্দিষ্ট মন্দিরাদির কালাধিনির্দেশ ও কোণিত নিদিষ্ট সম্বন্ধে বহুতর ব্যবস্থার উপলব্ধি করিব।

(১) পণ্ডিতগণ এইখানে নীতকালে শত্রু-ব্যাধী করিয়া থাকেন। আত্ম-ক্রিয়াদিও এইখানে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

(২) সম্প্রতি এইখানে একটি বৃহৎ প্রস্তর-নির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রাম পাণ্ডা পিতার সমানার্থ এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

(৩) ইহা ইকটা-মন্দির? কাহার মন্দির মূল্যে প্রতিষ্ঠিত। সে বড় মৃদুত্ব। এই মন্দিরে এক কোণিত নিদিষ্টে হরিদাধ ওঝার নাম এবং ১০০ সংবৎসর উল্লেখ আছে। ৩৩ দিক কিঞ্চিৎ অল্প লিপিতে অল্প প্রকার সংবৎ লিপিত হইয়া যায়।

(৪) ইহা জগৎ-র অধিপতিনি দেবী অম্বরপূর্ণা মন্দির। এ মন্দিরেও কোণিত লিপিত আছে।

(৫) ইহা ইহা রাবণ-ধামিত্যসেই চন্দ্রকূপ। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পথে দক্ষিণ দিকেই এই মূল্য প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণের চারিদিকে অম্বরত প্রকট হইতে দেখিত। ইহাও সংবৎসর-ত্রি-ওঝার নাম প্রকট হইতে হয় না—নির্ভাও মৃদুত্ব বলিয়া বোধ হয়। জল বড় নির্মূল্য ও মৃদুত্ব। ইহাও জল নিত্য মন্দিরের কাণ্ড এবং নিরুপকট অধিবাসীদিগের পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৬) ইহা ই লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। বেণলার সাহেব বলেন, মন্দিরের গঠন—মূল্যবান এবং হিন্দুর গঠন-মিশ্রণে গঠিত। তিনি বলিয়া গিয়া-ছিলেন, এ মন্দিরের নির্মাণকাণ্ডে সমগ্র স্থান নাই; এখন কিন্তু ইহা ইহা সমগ্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বর্তমান মন্দিরসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে:—"বর্তমান প্রধান পাণ্ডার পূর্বপুরুষ বাবোহে ওয়া 'বৈদ্যনাথের' মন্দিরকে টোকা দিয়া 'শৈবসম্প্রদায়কে লজ্জা প্রদায়ক' লক্ষ্মীনারায়ণের এক উচ্চতম মন্দির নির্মাণ করিবার সক্ষম করেন।

মন্দিরের চূড়া ২১ ফিট উচ্চ করিবাইই কল্পনা ছিল। কিন্তু বাবা বৈদ্যনাথ বামেন্দেবকে স্বপ্নে দেখা যেন দেখা ভীতি-প্রদর্শন করেন। এইমত পূর্ণাঙ্গ প্রকৃত পথিকতা হওয়ায়। ২১ ফাউন্ট প্রায় ছাত্র একতর হইল। বারান্দা চারিদিকেই ছিল। তখন পশ্চিম ও দক্ষিণদিকের বারান্দা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উত্তর ও পূর্বদিকের বারান্দা উন্মুক্ত থাকে,—৩টা দ্বার নির্মিত হয়। অনেকই অসুস্থমান করেন, স্বপ্নের মন্দির অশ্রম নির্মিত হয়, তখন কোন প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা ছিল না। এখন তিনটা বিহুমূর্তি দেখা যায়। উক্ত মন্দির উপর এই ত্রিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্তি তিনটা পশ্চাত্তরী প্রাচীর অংশবিশেষ হওয়ায়। একটা ৮ ফিট ৬ ইঞ্চি, একটা ২ ফিট এবং অপরটা ১ ফিট ৬ ইঞ্চি উচ্চ। মূর্তির পৃষ্ঠদেশে স্থানে স্থানে কাটাটা চট্টায়া পিরাছে।

(১) ইহাও আনন্দ-ভৈরবের মন্দির। আনন্দ-ভৈরবের মূর্তি মন্দির উপর অধিষ্ঠিত—স্থানে নির্মিত। প্রথমে যেখানে বৌদ্ধ-মূর্তি বসিয়া অসুস্থিত হয়—আনন্দবত ওঝা এই মন্দির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তিনি ইহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র প্রেমানন্দ ইহার প্রতি বড় লক্ষ্য করেন নাই; তাঁহার পুত্র সর্বানন্দ ১৯৩২ খ্রষ্টাব্দে মন্দিরের অবশিষ্ট সজল কার্য সমাপ্ত করেন।

(২) আনন্দ ভৈরবের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটা কুপ আছে। ইহাও ইন্দ্রনা ও পদার ভগ্নে পরিপূর্ণ বালিয়া কবিত আছে। এই দুই মন্দির নামে এই মন্দির অতিথিত হইয়া থাকে।

(৩) মার, লক্ষ্মণ এবং জনকীর মন্দির। মূর্তি-ত্রয় আধুনিক। গত শতাব্দীর ১ম বৎসরে রামদত্ত ওঝা এই মন্দির নির্মাণ করেন।

(৪) চৌচাক। ইহাতেই বাবা বৈদ্যনাথের জল-চলন প্রকৃতি আসিয়া জন্ম হয়।

(৫) বাবা বৈদ্যনাথের মন্দির।

(৬) নীলকণ্ঠের মন্দির। এই মন্দিরের ছাদ সমস্তই নীলকণ্ঠের ত্রিমূর্তি এইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

(৭) পার্শ্বভীর মন্দির। এই পার্শ্বভীর মন্দির-চূড়া হইতে বাবা বৈদ্যনাথের মন্দির-চূড়া পর্যন্ত এককোনা কাপড় টানান আছে। দুই মন্দির-চূড়ার দূরত্ব প্রায় ৭০ ফিট হইবে। মন্দিরের মধ্যেস্থ পূর্ব দিকের উপর দুইটা চন্দ্র-চক্রনির্মিত মূর্তি

প্রতিষ্ঠিত আছে। একটা গোবীর চতুর্ভুজ মূর্তি—উচ্চ প্রায় ১ ফিট ৬ ইঞ্চি;—অপরটা অষ্টভুজা মহিমমন্দিরী পার্শ্বভীর মূর্তি—উচ্চ প্রায় ১০ ইঞ্চি হইবে। উক্ত মূর্তির স্থানে স্থানে ঈশ্বর চট্টায়া কাটায়া পিরাছে। সর্বাপেক্ষা মহোৎসব এইখানেই হয়। হুগোৎসবের সময় অসংখ্য ছাত্র মহিলাদি বসি হইয়া থাকে। এই সময় বাবার মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। যেহেতু বাবা বসিতে বিতরণ। গত শতাব্দীর প্রথমই রূপপাণি ওঝা এই মন্দির নির্মাণ করেন।

(৮) বগলাদেবীর মন্দির। ১৭৬২ এবং ১৭৯৩ খ্রষ্টাব্দের মধ্যে রামদত্ত ওঝা এই মন্দির নির্মাণ করেন। বগলা দশমহাবিদ্যা মূর্তির যে অকৃত্যতা, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই মূর্তির এই লক্ষণ—

মহোৎসবকালিমণিগণপদপরিধা-
নিংহাশ্যনাপরিত্যক্তা পরিপীড়িতকর্ম।
পীতাবরীজমণ্যাবিভূমিহাসীকাসী।
সেবীয়া নানাদি হুগোৎসবেরিরিক্রিয়ায়।
জিহ্বাঃপ্রমাণায়করূপে দেবী।
বাসেন শঙ্খন পরিপীড়িতমুখী।
পদাভিভাষনে চ দক্ষিণেন
পীতাবরীজায়া বিজ্ঞান্য নামা।

(৯) সূর্য্যদেবের মন্দির। মন্দিরটা ছোট। রামদত্ত ওঝা এই মন্দির নির্মাণ করিয়া। এইখানেই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসম্বন্ধে ৩ বার। রাজেন্দ্র-লাল মিত্র বিলিয়াছিলেন—“এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতার নাম সূর্য; কিন্তু সেই মূর্তি দেখিয়া আমার মনে হয়, বৌদ্ধ-গণপতির মূর্তি,—২ ফিট উচ্চ। মূর্তির নিম্নভাগে ফোটিত লিপিতে হুচিলা অক্ষরে দেখা আছে, “দেবোৎসাহেয়”। ইহাতেই বুঝা যায়, পূর্বে ইহা কাঁহার মূর্তি ছিল।” এই মন্দিরের বারান্দায় বাঙ্গলা অক্ষরে এক ফোটিত লিপি দেখা আছে।

(১০) ইহাও দেবী সরস্বতীর মন্দির। (১১) খোলা বারান্দা। এখানে নানাস্থান হইতে সাংগৃহীত বিদ্যাহ মূর্তি রক্ষিত হইয়াছে। হুগোৎসবে মূর্তি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। “হুগোৎসবের নামেই এই মন্দির নাম। বাতী এবং সাং-সম্প্রদায়ীরা এইখানে আশ্রয় লইবেন, এই উদ্দেশ্যেই ইহা প্রথম নির্মিত হয়।

(১২) কালভৈরবের মন্দির। কালভৈরব মূর্তি উচ্চ ৬ ফিট ৬ ইঞ্চি হইবে। এ কালভৈরবের

মূর্তিও ৩ বার। বাহারুরের ঢকে “ধান বৃদ্ধ” বসিয়া বিবেচিত হয়।

(১৩) সন্ধ্যাদেবীর মন্দির। সন্ধ্যাদেবীর মূর্তি রূপোন্নতি প্রতিষ্ঠিত। রব এবং রবেশ খোঁড়া ভাঙ্গিয়া পিরাছে। ১৯৩২ খ্রষ্টাব্দে ফোকাব ওঝা এই মন্দির নির্মাণ করেন।

(১৪) গণপতির মন্দির। ১৭৬২—১৭৯৩ শকে রামদত্ত ওঝা কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়।

(১৫) একটা বারান্দা। সারি সারি দুই সারি স্তম্ভ আছে। এখানে মদনমোহন এবং কাণ্ডিকের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(১৬) পূর্ববার। পূর্বে ইহা বায়্যাক কর্তৃক ব্যবহৃত হইত; এখনে কিছু নাই।

(১৭) দ্বিতীয় নহবৎখানা। এখন এইখানেই নহবৎ বাজিয়া থাকে।

বর্তমান মন্দিরসমূহের বিবরণ বিবৃত হইল। ইহাতেই অল্প কতকটা উপলব্ধ হয়, এই সব মন্দির অসম্পূর্ণকৃত আধুনিক। পারিচয় তত্ত্বনির্ণয়ে অবশ্য প্রতিপন্ন হয় যে, ইহার পূর্বেও এখানে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যখন এখনও অনেক গৃহ-নির্মাণ ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তখন এ কর্দার সাংকসা-প্রমাণে সন্দেহ কি? বৈদ্যনাথ ভার্বেই মুন্সিফারসিরা

কাল নির্ণয় কি হয়? কালমধ্যে কত মন্দির ভাঙ্গিয়াছে, আবার কত মন্দির গঠিত বা সংকৃত হইয়াছে, তাহারই বা ইয়ত্তা কি? কোন কোন মন্দিরের ফোটিত লিপিতেই বুঝা যায়, যে কেহ যে মন্দিরের নাম রাখা বা পূর্ণগঠন করিয়াছেন, তিনি আপনকার নাম মরণীয়া করিবার জন্য আপনকার নামোদ্দেশ্যে করিয়া পিরাচ্ছেন। আবার এই সব বর্তমান মন্দিরের যখন যে কেহ সংস্কার বা পুনর্গঠন করিয়াছেন, তখন তিনি হয়ত আপন নামোদ্দেশ্যে করিতে ছাড়িতেন না। বৃত্ত-বিভাগ্যে বর্তমান কালের লিপিত নাম জরিত হইবে;—নুতন সোকার নাম ফোটিত দেখা যাইবে। ৩ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কোন কোন মন্দিরে অসম্পূর্ণকৃত আধুনিক শকাব্দের উল্লেখ দেখিয়া, “বৈদ্যনাথ-মহাভাষ্য”খণ্ডিত মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কথা-গুলি অপ্রিয় বলিতে হইত হন নাই। যখন এখনও বৈদ্যনাথের ভূতপূর্ব-ধনেন প্রাচীনতম গৃহ-মন্দিরটির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তখন রাজা বাহাদুর মহাশয় যে এ মীমাংসায়ে কেন উপস্থিত হইলেন, ইহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। বাহা হউক, এসব কথা লেখা আর বাস্তবিকতায়

প্রয়োজন নাই;—এই সব মন্দিরবিবরণ ভিন্ন বৈদ্যনাথের অজ্ঞাত উদ্দেশ্য এবং বন্ধনা বিপর্যাস আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিব। অগ্রে কোন মন্দিরে কিরূপ ফোটিত লিপি দেখা যায় এবং তাহা হইতে কি তত্ত্বই বা সাংগৃহীত হয়, তাহারই যথাসাধ্য বিবৃতি করা যাক।

পূর্বে বারার মন্দিরবিবরণে যে ফোটিত লিপির প্রেক্ষিতা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, রাজা পুরাণকর্তৃক ইহা নির্মিত। এই রাজার পুরা নাম, পুরাণ নাম, মন্দির নাম, মন্দির আছে, ইনি পিরিবিয়াল বীর বিক্রমসিংহের ১ম বংশধর। বীর বিক্রমসিংহ ১১৬৭ খ্রষ্টাব্দে পিরিবি-রাজবাটার প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণের পূর্বম বংশধর ১৩৫১ খ্রষ্টাব্দে সম্রাট দ্বাধি-হানের নিকট রাজা-উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বাধি-হানের ইংরেজ বিহার গ্রহণ করেন, তখন রাজা পোপাল সিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি বিক্রমসিংহের উনিবংশশততম বংশধর।

এখনি যে ফোটিত-লিপির উল্লেখ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এইরূপ প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত আছে,—মন্দির এবং মন্দিরের চতুঃপার্শ্ববর্তী ভূভাগের উপর যে আধিপত্য এবং অধিকার আছে, তাহারই বুঝাইবার জন্য পুরাণ নাম মন্দিরের কতকটা সংস্কার সাধন করিয়াই আমরা বলপূর্বক উক্ত লিপি দেখাইয়া দেন। কেবল সংস্কার, রোজ, হাওত মন্দির-গঠন সম্বন্ধে আরও অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। মন্দির নির্মিত হইবার বহু পূর্বে যে মন্দিরের বারান্দা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত। ফোটিত লিপিতেই বুঝা যায় ওঝার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তিনিই মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। রাজা এইরূপে আপন নাম প্রচার করেন, পুরোহিত মহাশয়ের আদৌ তাহা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করেন, রাজার সঙ্গে লগ্নেও পারিয়া উঠিলেন না, তাই তিনি রাজার কৌণিকবাহায়া কোন কথার উল্লেখ করেন নাই; তাহার মৃত্যুর পর তিনি “বারাণা” প্রস্তুত করাইয়া তাহাতেই বসিয়া “বৈদ্যনাথ-মহাভাষ্য”খণ্ডিত মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কথা-গুলি অপ্রিয় বলিতে হইত হন নাই। যখন এখনও বৈদ্যনাথের ভূতপূর্ব-ধনেন প্রাচীনতম গৃহ-মন্দিরটির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তখন রাজা বাহাদুর মহাশয় যে এ মীমাংসায়ে কেন উপস্থিত হইলেন, ইহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। বাহা হউক, এসব কথা লেখা আর বাস্তবিকতায়

বিশ্বের রাজত্বের পূর্বে নির্মিত হয় নাই। অমিত্যকণ্ড আরম্ভিক, তবে বৈদ্যনাথ, পার্শ্বাতি এবং লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আশাশুভ প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই সর্গ মন্দির মানসিংহের সম্মুখেই বলা যায়।

হইতে পারে, এই সব মন্দির অনেকটা আধুনিক। ইহার পূর্বে যে মন্দির ছিল না, একথা বলিবার পথ নাই। যখন অতি প্রাচীনতম মন্দির-রাশির ভাঙাচোরা পাণ্ডুরা যায়, তখন এ কথা বলা অস্বাভাবিক। অধিকাংশ মন্দিরই যে, মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে এবং তৎপরে এই বর্তমান শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছে, এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। এখন এরূপ দেখা যায়, কেহ কেহ কোন কোন মন্দিরের কেবল ভাঙা সম্ভার কয়লা আনানাদিগকে প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তখন অস্বাভাবিক সন্দেহ যে সেইরূপ হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, এখন এ সম্বন্ধে আর ভর্তুকের প্রয়োজন নাই। এখন অস্বাভাবিক বিশ্বাসের সম্মুখে আসে। আমরা প্রবেশের উপসংহার করা যাইক। প্রকার আছে—অতি প্রাচীনকাল হইতে সাধু-সন্ন্যাসীরা বাবা বৈকানাথের পূজাধি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন। বোধশ শতাব্দীতে মিথিলা হইতে ১২তী ব্রাহ্মণ আশিয়া পূজাধিকারের ভার গ্রহণ করেন। এই বার জন কয়েকের মনে জন্ম ওয়া নামে এক ব্যক্তি তৎকালিক পুরোহিত সম্ভ্রান্তিগণে ভাড়াইয়া দিয়া আপনি কর্তা হন। এই সময়কালে নানা গোকে নানা কথা বলেন। যাহা হউক, ইনি বর্তমান প্রধান পাণ্ডা লৈলজানদের ওপরে উচ্চতম একবিংশ পুরুষ। উপাধ্যায়ের অপরূপ কথা। এই বংশের এইগুণ তালিকা পাওয়া যায়,—(১) ব্রহ্মনাথ ওয়া, (২) চিত্র ওয়া, (৩) মাল ওয়া, (৪) বামদেব, (৫) ঘোষাকর, (৬) সন্ন্যাস, (৭) চন্দ্রমোহন ওয়া, (৮) হরপাণি ওয়া, (৯) জয়নারায়ণ, (১০) যদুনাথ, (১১) চীকারাম, (১২) দেবকীনাথ, (১৩) নারায়ণ দত্ত, (১৪) রাম দত্ত, (১৫) আনন্দ দত্ত, (১৬) পরমানন্দ, (১৭) সর্দারপাণি, (১৮) দ্বন্দ্বনাথ, (১৯) শৈলজানন্দ।

বর্তমান প্রধান পাণ্ডা শৈলজা ওয়ার এবং তাঁর-বাড়ীদেবের স্থিতি এ-প্রবন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। এ প্রবন্ধে তাহা প্রকটিত হইল না। এতদ্বিধ বৌদ্ধ-সংপ্রদায়-সম্বন্ধেও বলিবার

অনেক বিষয় আছে; তাহা কিছু তরুণের ঘল। এ প্রবন্ধে তাহাও পরিচ্যুত হইল। ঐশ্যানাথ সর্বকথ্য জন্ম জন্ম যাহা, তাহা বাধাসাধ্য সংক্ষেপে বিবৃত হইলমাত্র।

বৈকানাথের মন্দির এবং প্রাচীন ভিত্তি, বহির্ভাগে আর যাহা কিছু দ্রষ্টব্য আছে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাইক। বৈকানাথ-মন্দিরের উত্তর দ্বার হইতে বাহ্যর যে রাস্তা গিয়াছে, তাহারই পূর্বপার্শ্বে “শিব-গণ্ডা” “শিব-গণ্ডা” একটি হইল হ্রদ। ইহা বৈশ্ব ৬ শত এবং প্রায় ৬ শত ফুট। দীর্ঘকালে ৩ ফুট গভীর জল দেখা যায়। জল কিয়ৎ হরিৎবর্ণ,—অনেকেই এই জলে স্নান করে। একটা বাঁধ আছে, সেই বাঁধের উপর দিয়া রাস্তা গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মানসিংহ উড়িয়ায় ধামিবার কালে এই বাঁধ বিধায়া দেন। ইহার উত্তরভাগে খামান-ভূমি। তাহার উত্তর বিস্তৃত জঙ্গল। মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিমে, বড় রাস্তার দক্ষিণপার্শ্বে দুই হোটে মন্দির আছে। এই মন্দিরের সম্মুখে ছয় ফিট উচ্চ একটা পাকা পোতার উপর একটা প্রস্তর-পদম দেখা যায়। এই প্রস্তরপদম তিনটা স্তম্ভের মতম,—দেখিতে অতি সুন্দর। এতৎসম্বন্ধে নানা জনের নানা মত;—কেহ বলেন, দীর্ঘতমপদ পূর্বে এই প্রস্তরস্তম্ভ পূজা করিত;—কেহ বলেন,—ইহা কৃষ্ণের দোলায়ক ছিল;—আবার কেহ বলেন, ইহা কোন মন্দিরের দারদেশ। এখন ইহা “খিলোনি” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এইখানে দোলাখা হইয়া থাকে। এ প্রস্তর পদম কতকালের এবং কাহারকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, আত্মাযবি তাহার নির্ণয় হয় নাই। ইহার কিয়ৎ পশ্চিমে একটা শিব আছে।। নোকে বলে, ইহা সেই ভীল “বিজু” রোর নাম। দেখিলে মনে হয়, এই দরতী দুই শত বৎসরের উপর নাই। এই বিজুর কথা পুরাণে উল্লিখিত আছে।

তত্ত্ব-তত্ত্ব।

যে সেতুধর গার্নি। এই উত্তাল-তরঙ্গ-মঙ্গল নদ্যা-স্রোতের গভীরবর্তন্য হিন্দা-ধ্বংসন-ভীষণ ক্ষণের তরঙ্গ সংসার-মাগের আর কত দিন ভাগিতে হইবে? উত্তরে কি কোন উপায় নাই? যে

চক্রপাশে। নিয়ত-পরিবর্তনশীল ভয়াবহ সংসার-চক্রের আর কত কাল নিশ্চিহ্নিত হইতে পারে। শিল্পের কি কোন আশা নাই? যে দীনবন্ধো। যে অনাধার। রোগ-শোক-জন্ম-মৃত্যু-জরা-কর্তৃক এই নিবিড়-বন্ধ পাশতোতৈ দেখে-পাশের কত কাল আনন্দ থাকিতে হইবে? মুক্তি পাইবার কি এক-বারেই সুযোগ নাই? তাহা?

“আনিত্য নটবয়্য তত পুরে ত্রীকূট যা ভূমিকা গোমালাধারখানারিবাগবিশ্বপ্রতীতহয়গোপাধি। প্রীতো ভাগ্যি তৎপ্রসীদ ভগবান যদ্যভিহুং সেই মে নোচেৎসব কদাপি না নয় পুনঃপ্রাণীভূতমিহ।” ত্রীকূট। আপনার এই অসীম বিপদগের, আপনার প্রীতিসাধনের জন্ম, আমি নবদে প্রায় চৌদশী লক্ষ্যবান নানা সাজ সাজিলাম; কখন কীট, কখন পতঙ্গ, কখন পক্ষী এই তালিগি নানা রকমের ভূতাবি পরিগ্রহ করিলাম; আনন্দ মৃত্যুযা সাজিয়া আছে।—যে ভগবান। যদি প্রীত হইয়া থাকে, ত আবার অভ্যন্তরীক করুন, যদি না হইয়াই থাকেন, ত আমাকে কদাচ যেন আর এরূপ সাজ সাজিতে আসেন না করেন।

সংসারে বাহির এইরূপ বিফলা ও মুমুক্ষা হইয়াছে, নিত্যানিত্য-বদ্বিবেক হইয়াছে, যিনি মন-দ্যাদিগাম্য এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাচরণ ও পাপ-পুণ্যভ্যাস প্রবৃত্তি নির্যাসিতকরুন,—সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য বেদে, তত্ত্ব তত্ত্বমসি এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; প্রকরণস্থপাত কথিয়ার সেতুকেই বোলে।

সংসার-জালা জুড়াইবার এমন উপদেশ আর নাই। জগতে এই মর্শন আছে, এত ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, কিন্তু বেদের এই উপদেশ—এই ‘তত্ত্ব’ বা এই জাতীয় মহাশাক্য ‘একমেবাদিত্যং’ আর কিছুতে নাই। এক বেদেই আছে—এক ‘হিন্দু’ শব্দেই আছে। দুঃখহানি জন্ম, জন্ম-মরণের হস্ত হইতে উদ্ধার প্রার্থনার জন্ম, রোগ-শোকের কঠোর ভাঙনকে কীট দিবার জন্ম, বৌদ্ধ-জৈন দার্শনিক গণও অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম্ম-শিখণ, অনেক কেশ মসজ করিতে বলিয়াছেন ও অনেক মনোনিবেশ দিয়াছেন, কিন্তু এই অশ্রুতা বাক্য, দুঃখহানির অসামান্য উপায় আর কেহ নির্দেশ করিতে পারেন নাই।

কি ‘তত্ত্ব’ কথাটির অর্থ কি? শুধু শব্দ ত আর উপায়-নির্দেশক নহে। অতএব অর্থটি

বক্তব্য বাটে,—শান্তিপ্রদেব ইহার ত্রিবিধ অর্থ কবিত হইয়াছে, শান্তরত্না-ভূষিত বৈদ্যগুণশ্রী, ভ্রায়-ব্রহ্মবৈদিক-পাতঞ্জল এবং ‘যৈশব’ গ্রন্থ তিন পথে তিন ‘প্রশ্নানি। অর্থভেদে বিভিন্ন বিষয়, নিদিষ্টাঙ্গদের বিষয়, বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য এক।

—সুখকৃষ্টিলাভনামপঞ্চাংখ্য।
মৃণামেকো গম্যঃ... পরমাধর্মণ ইব।
জলপানি যে পথেই প্রবাহিত হউক না, কুটিল পথেই হউক, আর সরল পথেই হউক; শেষে-বিশ্রাম-স্থান তাহার সমুদ্র হইবেই।

শান্তির-বেদান্ত। জগতে চৈতন্যই এক-মাত্র সত্য, আর সমুদ্রই অসং, অনিত্য মিথ্যা; ‘একমেবাদিত্যং’ যিজন-মানসং তদং। এক অধিত্যার চৈতন্যই ব্রহ্ম। অবিত্যারত উপেক্ষামই জীব। যেমন সর্বব্যাপী সর্বগত আকাশ, স্ট-কৃত্তাণি-যোগে স্টকাশ কৃত্তাকাল প্রভৃতি অভি-ধানে অভিহিত হয়, তদ্রূপ। যাহা হইল একমুখে প্রবৃত্তি প্রচার এখানে করা নিশ্চয়োজন।

হৃদয়ের নিদান, বিশ্বাসের নিদান,—শরীর-পরি-গ্রহ। শরীরপরিগ্রহের মূল, কর্ম্ম। কর্ম্মাচরণের মূল, রূপ ধর্ম্ম। রূপ ধর্ম্মের যেহেতু, অভিমান। অভি-মানের বীজ, অবিত্য—অজ্ঞান। আত্মা চিত্তরূপ, সর্বব্যপিত্ব জাগরক,—তদ্রূপ। দুঃখ, কষ্ট, জন্মমরণ-হস্ত-প্রবৃত্তি, আত্মার এসব বিকৃতি নাই। বৃত্তান্ত, কৃশতা, ভ্রম-কৃশাণি বর্ষ, রোগ-শোক-পাপ-পুণ্য—এসব কোন উপদ্রব আত্মার নহে। আত্মা নির্মল, নিম্পেদ। কিন্তু সংসারীর এ তত্ত্ব অপ্রতিভাত থাকে। সংসারী,—পাক্তোক্তিক বেদের ধর্ম্ম আত্মার আরোপিত করিয়া ‘আমি কুশ’ ‘আমি গৌর’ ইত্যাদি বাহ্যর করে। সংসারী, দুঃখ ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত—করিয়া ‘আমি দুঃখী’ ‘আমি পাপী’ ইত্যাদি মনে করে। আত্মা যে কি, তাহা সংসারী বুঝে না। পাক্তোক্তিক বেদের প্রতিষ্ঠা তাহার আত্মা বলিয়া অনেকটা বিশ্বাস থাকে। এই জন্ম সে এই দেখে-বিলোপক—মৃত্যু বলে, তাহার জন্ম কাতর হয়; মৃত্যু-দেহ-সংসারকেই উৎপত্তি বলে। এই ধারণা বশতই সংসারী,—পুত্র জন্মে আনন্দিত, যদু-মরণে দুঃখিত হইয়া থাকে। এই ধারণাই অবিত্য; জন্ম-মরণকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞান আনন্দি, তবে কি না ইহার উচ্ছেদ আছে। ওজ্ঞান হইলে, এই অজ্ঞান দূর হয়। অজ্ঞান নিবর্তি হয়।

রাগ বেবে অনন্তে বিলীন হয়। কৰ্শ্বের সহিত মগ্ন থাকে না। কারকের অভাবে কাষ্ঠ ভংগন হয় না, কৰ্শ্বের অভাবে শরীর-পরিগ্রহও উপর না; সুতরাং দুঃখও অন্তর্স্থিত হয়। এই তত্ত্বজ্ঞানের মূল (তত্ত্ব) মহাবাক্য।

ক্ষেত্র বৃক্ষপত্র কবিতা না হইলে, ভূমির উন্নতি দূর না হইলে, জল বীজও তথ্য প্রেরণিত হয় না—অধুনা তখন না। কাজেই মানুষ বিরাজ্য মানবের, সু সহস্রবার 'তমসঃ' জ্বলিলেও জ্ঞান হয় না। আকাশের শব্দ আকাশেই নিশাইয়া যায়।

'তমঃ' শব্দে ব্রহ্ম, আর 'তমঃ' শব্দে জীব। জীব-ব্রহ্মের অভেদই এই মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য। যাহার অভূক্তি নাই, আকাশজ্ঞা নাই, অভাব নাই—সেই ব্রহ্মই তুমি। যাহার হৃদয়-বিধান জালা-মগ্নতা নাই, সেই তুমিই চৈতন্যই তুমি। যাহার আবি-বাহি বহুমুক্তি নাই, সেই নির্মিত্যের নিরঞ্জনই তুমি। যে জীব। যাহার সংসার নাই, শূন্য প্রভু নাই, আই-বন্ধ নাই, শত্রু নাই নাই, স্বর বাজা নাই, বিনি ব্রহ্ম-ওষে, কীট-পতঙ্গ, পত-পতাকা, নর-কিন্নর, দেবোহরে সমভাবে বিরাজমান, বিনি পর্বতে নীপরে, অনুপে উষরে সর্বত্রই অবস্থিত, সেই নিত্যতত্ত্ব মানন্য সর্বের আর তুমি—এক। তত্ত্ব বা তত্ত্বমসি হইবে প্রতিপাদ্য।

পূর্ণ-পূর্ণাঙ্গ-কল বে মূখপুংস্ব এই মহা উপদেশ সম্পূর্ণ জয়স্বয়ন করিতে পারেন, পশ্ট অল্পভব করিতে পারেন, এই জ্ঞান যাহার জ্ঞাপে কুমল হয়, তিনে জীবমুক্ত। সংসারের 'জন্ম' আর তাঁহারে বেশি ভোগ করিতে হয় না। সংসার-বাবসনকে কলিত হইয়া আর তাঁহারে 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতে হয় না। তিনে—অন।

‘বাতকরু অনন্তে বাহ চর্মেইনৈকমুক্তঃ’।

নাগাধাং ন কণ্যাং তয়েয়িচ চ চিত্তয়েং।
‘একজন এক বাহ চর্মেইনৈকমুক্তঃ’ হেঁদন করিতেছে, অপরে তখন বাহতে চর্মেইনৈকমুক্তঃ, তিনি কিন্তু তখন সে হুর্জনের কাহারও ইষ্টান্টি চিত্তা করিলেন না।

কেন করিলেন? তিনি—কে তখন বুদ্ধিযাজ্ঞেয়, পাকভোজী জড়পণ্ডের সঙ্গে তাঁহার যে কোন মগ্নক নাই, ইহা বেবে জয়স্বয়ন করিয়াছেন; তথ্যর নিরঞ্জন যে শূন্যসেহের সঙ্গে তাঁহার কোনরূপ মগ্নক নাই—জানিয়াছেন; অর বাহর তাদন বা লগনে তাঁহার কি? তাঁহার বাহ, আর মুক্তিকান্ত্য।

ত একই জিনিস। মুক্তিকান্ত্যে আশা করিলে, কোন মানুষের যেমন অমুভব হয়?

মনে কর, এক সময়ে অজানতা: তুমি কোন কার্য করিয়া ফেলিয়াছ, পরে কিন্তু তাহা তোমারই অন্ত কোন গুণের অতীত-মিথি প্রতিকূলে অবস্থিত হইল। কিন্তু পূর্বকৃত যে তোমার নিজস্ব, তৎকালে তাহা মনে নাই বরং অমুক ব্যক্তির কৃত প্রতিজ্ঞা জন্ম আছে। এরূপ অবস্থায় সে ব্যক্তির বলিয়া তোমার কোষে হইতে পারে, হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কেহ তখন বুঝিয়া দেয় যে, ঐ কার্য তোমারই কৃত, তখন সেই পূর্বকৃত কার্যের জন্ম দ্বারা অনুতাপ হইতে পারে বটে, কিন্তু জোষ কদাচ হয় না। কেননা, আপনার প্রতি প্রীতি সর্বপক্ষেই অধিক। অন্তি-সাধনে কীকপ মনোভাৱই জোষ; জ্ঞানত: আপনার অনিশ্চয়ান করিতে পারারও প্ররুতি হয় না। অজানাবস্থায় মাৎস, ‘আমার পুত্র’ ‘আমার কন্যা’ ‘আমার পুত’ এইরূপে বিভিন্ন বস্তুকেই আত্মীয় বস্তু করে। সেই আত্মীয়তা-বোঝেই প্রীতি-অপ্রীতি বা অনুতাপ-বিষয়ে পার।

‘ন বা অরে পত্ন্য: কাম্যর পতি: প্রিয়ে অনত্যা-জ্ঞানক কাম্যর পতি: প্রিয়ে ভবতি’ ইত্যাদি (শ্রুতি) ‘পতিঃ অভিনাম-পুত্রং জন্ম-পতি প্রিয়পাত্ন হন না, পতিঃ আপনার ইষ্ট-সাধক বলিয়া প্রিয় হইয়া থাকেন।’ ইত্যাদি।

জীব যখন জানিতে পারে, সুস্থ দুঃখ বাসনা সজ্জন প্রকৃতি কোন-ওই ব্রহ্মে নাই, আর সেই ব্রহ্ম আত্ম আমি এক পদার্থ; ‘ব্রহ্মাহমসি’ বলিয়া যখন দৃঢ় নিশ্চয় হয়; তখন বিষয়-তুলা স্বভবে নিবৃত্ত হয়। তখন সেই জীবের অব্যবহার্য বিবৃতি হওয়াতে সজ্জনবাসন বিচ্যা থাকে। মুক্তিবাহের এরূপ প্রকৃষ্ট উপায়, সম্পূর্ণ সুপরিচ্ছন্ন মার্গ আর কোন ধর্মবালমহীর অনুশীলিত নহে। আদ্যোদেব সকল দৌর্য যদি বিনষ্ট হয়, অতীতের সমুদয় সাক্ষী যদি কালকলমে প্রবর্তি হয়, ননকিঞ্চন তবু আমোদের পূর্বপুরুষের মহনীয় মহিয়ার কথা জানিতে পারিলেন, যদি কেবলমাত্র ‘তত্ত্বমসি’ ‘তৎ-সং’ বাস্ত্য জ্ঞাপিত থাকে।

ম্যাদর্শন!—আত্মাই চৈতন্যের আশ্রয়।
‘আত্মা বিবিধ—জীবিত্য আর পরমাত্মা। পর-মাত্মাই ঈশ্বর। তিনিই জগতের, যেহেতু। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, হেঁদে, ধর্মবাহী এবং সংসার, এই

সমুদয় শুণ জীবাত্মাতে অবস্থিত, কিন্তু সমস্তই বিনশ্বর। নিত্য জ্ঞান, নিত্য বস্তু এবং নিত্য ইচ্ছা পরমাশ্রয় ওপ। জীবাত্মা ও পরমাশ্রয় অত্যন্ত সামুদ্রিক তত্ত্বমসিবাচ্যের প্রকৃষ্টত। ‘নিরঞ্জন: পরম: সমামুদ্রপতি’ (ইতি শ্রুতি) নিরঞ্জন পূর্ণ পরমাশ্রয় পরম সামুদ্র্য প্রাপ্ত হন।

এই বাক্যার্থ জ্ঞান হইলে ‘অংং কৃশ’ ‘অংং পৌরঃ’ ‘আমার পুত্র’ ‘আমার পুত’ এই মিথ্যাজ্ঞান দূর হওয়াতে জীবের দুঃখ নিবৃতি হয়। তবে আশ্রয়ের অভেদ-ভিন্ন মুক্তির কারণ হইতে পারে। জ্ঞান-পাতঙ্গল যৌনমিক-মতে তত্ত্বমসি এইরূপই ভাব্য।

বৈদ্যবদর্শন। ‘তিনি ঈশ্বর আর তুমি এক পদার্থ, বা তাঁহার সমুদ্র তুমি’ এতদ্ব্যপদেশ শাস্ত্রের হইতে পারে না। সে-ও-সংসারের উপাত্ত-উপাসকের কি অন্তর বা সামুদ্র্য হওয়া সম্ভব! কোথায় সেই সর্বেরই শম-চতু-পদ-পদধারী বনামাী শ্রীহর, আর কোথায় পাপপাত-জর্জরিত সর্বস্বাধীন দ্বন্দ্ব নহ! এতদ্ব্যপদেশ যদি সাম্য হয়, তবে হুহুহুও স্বর্গকোষও এক পদার্থ বলা হইতে পারে। হুহুহুহু—

‘তৎ-তৎ’ তাঁহার তুমি।

(তত্ত্ব-তৎ—স্বীকৃতপুংস্ব সম্যম) তুমি পুংস্ব ব্যক্তি হইলেও কিছুই তোমার নিজের নহে; সুব তাঁহার, তুমি তাঁহার। যে পরাধীন—জীব। তুমি কদাচ আত্মাভিমান কুরিও না; ‘আমার পুত্র’ ‘আমার ধন’ বলিয়া এক দিনের জন্মও মনে করিও না; ‘আমি কৃতী’—এ কার্য আমি সম্পন্ন করিলাম’ এ অংংজ্ঞান অবকালের জন্মও অবলম্বন করিও না। তুমি তাঁহার; তোমার সকলই তাঁহার। জগতের বা কিছু, সবই তাঁহার। ‘বক্তব্যভাবে তোমার কিছুই নাই।—তুমি জানিলে, সুস্থিবে, দারবা করিবে—‘বস্তু স্থাপনে বুদ্ধিহিতেন যথা নিয়তোহসি তথা কয়েমি।’ ইহা বুদ্ধিতে পারিলে তোমার আর জন্ম হয় না। পাপ-পুণ্য তাহাকে ‘স্পর্শ’ করিতে পারে না; কর্তব্য তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে।

তত্ত্বমসি বাকার এইরূপ নানা তাত্ত্ব্যপ। অব-কারিত্বে, ইহারও অবিকার-বিস্তার জানিবে।

প্রিয়কানন তর্করত্ন।

আমার জীবন চরিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভূগোলে কিঞ্চিৎ বিদ্যা না থাকিলে, সবই যেন অন্ধকারময় বোধ হয়। ভারতবর্ষের কোথায় কোন প্রদেশ বা কোন নগর অবস্থিত,—কোন পর্বত হইতে কোন পূর্ণাবর্তী নদী বহির্গত হইয়াছে—সমস্ত জ্ঞেয় দিগ্ধ প্রবাহিত হইয়াছে,—কোথায় কোন জুনি গিরি-সঙ্কট, কোন কলপপুং-সমভিত্তি উপত্যকা-অভিত্যকা আছে,—কোথায় কোন নদী বহুতমে পূর্বে ভল্লিবে রুধিরের নদী বহিয়াছিল,—সেখাপড়া-অভিজ্ঞ-অভিজ্ঞানী ব্যক্তিদেরই এ সব বিষয় জানা উচিত।

পূর্বে আমার মনে মনে দারবা ছিল, ইংরেজী-জ্ঞেয়পড়া-জ্ঞানী লোকের ভারতে ভূগোলে বুনি প্রায়ই কর্তব্য আছে,—দারবা ছিল,—অনু-স-এনে-ই পাশ করিলেই বুনি বিদ্যা হয়,—দারবা ছিল, বুনি প্রদেশের নাম করিলেই প্রবান নগরের নাম লোকের জয়স্বয়ন হইবে; কিন্তু অস্মি-সেই-ভিত্তি আমার সে দারবা অনেকদিন পূর্বে। কেহই যে, কিছু জানেন না, তাহা আমি বলি না। অভিজ্ঞ অজ্ঞ ব্যক্তি, অনভিজ্ঞ রহস্যোক্ত।

আমার জীবনচরিত যথেষ্ট দুই একস্থলে হামি-নগরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। জন্মভূমির একজন পাঠক আমার দ্বন্দ্ব সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত—‘জীব। তুমি কদাচ আত্মাভিমান কুরিও না; ‘আমার পুত্র’ ‘আমার ধন’ বলিয়া এক দিনের জন্মও মনে করিও না; ‘আমি কৃতী’—এ কার্য আমি সম্পন্ন করিলাম’ এ অংংজ্ঞান অবকালের জন্মও অবলম্বন করিও না। তুমি তাঁহার; তোমার সকলই তাঁহার। জগতের বা কিছু, সবই তাঁহার। ‘বক্তব্যভাবে তোমার কিছুই নাই।—তুমি জানিলে, সুস্থিবে, দারবা করিবে—‘বস্তু স্থাপনে বুদ্ধিহিতেন যথা নিয়তোহসি তথা কয়েমি।’ ইহা বুদ্ধিতে পারিলে তোমার আর জন্ম হয় না। পাপ-পুণ্য তাহাকে ‘স্পর্শ’ করিতে পারে না; কর্তব্য তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে।

এবার যখন আমি এলাহাবাদ হইতে রেল-গাড়ীতে কলিকাতায় আসি, তখন রেলগাড়ীতে কয়েকটি বাবু আমার বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহার যে কামরার ছিলেন, আমি তাহার গ্রিক পোলের কামরায় ছিলাম। তাঁহাদের কাছেই তিন খানি দলভুক্তিও ছিল। বলা বাহ্য্য, আমিই যে, হুগাঁও দলভুক্তিপাঠ্য, তাহা তাঁহার জানিতে পারেন নাই। আমি এক্ষণেই ব্রহ্ম-প্রিয়কানন তর্করত্ন।

স্ট্রাট মারিয়া, এক কোণে বনিয়াছিল।—মধ্যে কেবল এক একবার তামাক খাইতে ছিলাম, এবং বাদ্যধ্বনিতে ধ্বনিত। সাজি প্রভাত হইল। একজন বাবু, আপন ব্যাগ হইতে কয়েকখানি জন্মভূমি বাহির করিলেন। প্রথমেই আমার বিষয় আরম্ভ হইল। আমি গভিক বড় দুখানো নোবেলা মুখ পুকাইলাম। কোন বাবু বলিলেন,—“জর্জাস বাবু, একজন ভারী বীর পুরুষ, বালস্ক্রীম মধ্যে এমন বীর আর দেখা যায় না।” কোন বাবু বলিলেন,—“হুগো বাবু বাস্কোনির পৌরব রূপ।” অর্থাৎ প্রথমবার আমার খুব প্রশংসাবাদ চলিল। বলা বাহুল্য,—তাহাদের মধ্যে আমাকে কেহই চেনেন না। না কেনা সত্ত্বেও তাহারা,—বীর পুরুষ এবং দেশের পৌরব রূপ। বলিয়া কেন যে, আমার নাম কর্তন করিলেন, তজ্জা আমি বুকিতে গারিলাম না। কেননা, জন্মভূমিতে আমার সুবিক্রমের কথা এ পর্যন্ত কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এসব কথা শুনিয়া, আমার মনে বড়ই হাসির সঞ্চার হইল।

ইতিমধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন,—“আপনারা কি মনে করিয়াছেন,—হুগো বাবু? কথা সত্য? উহা পরমাত্র, উপকথা মাত্র, উপভ্রান্ত মাত্র।” উক্তর। সে কি কথা? জন্মভূমিতে স্পষ্টতঃ লিখিত রহিয়াছে,—ভ্রুনি একবে এলাহাবাদে অবস্থিত করিতেছেন, তাহার আশ্রিত-নিবাস তবনী-কোয়ার অর্ন্ততঃ তড়া-স্ট্রাটপুর্, সেন্ডাধ্যক্ষ ফুকলের সার্টসিক্রেট ছাপা হইয়াছে,—ইত্যাদি কত প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে, তখাৎ আপনি বলিতে চান হুগো বাবুর কথা সত্য নয়? উত্তর উপকথা মাত্র।

এইরূপে তুমুল ঝড়ো বাহিল। একপক্ষের যুক্তি এই,—ইংরেজী এক ক্যাসী এমন অনেক উপভ্রান্ত আছে, অজস্র লোকে বাহা পাঠ করিলে, মনে করে যে, ইহা জীবন-চরিত, উপভ্রান্ত নহে। সেই সকল উপভ্রান্তের অধুকারেই হুগো বাবুর উপভ্রান্ত লিখিত হইতেছে। যদি কেহ বিশেষ মনোযোগের সহিত হুগো বাবুর এই জীবন-চরিত পাঠ্য থাকেন, গ্রাম ও নগরের নামের প্রতি সতীকার করিতে বাধ্য হইবেন, এই জীবন-চরিত সতীকার করিতে বাধ্য হইবেন, এই জীবন-চরিত উপভ্রান্ত মাত্র। সহরের নাম দেখুন না কেন?—উপভ্রান্ত মাত্র। অহা! এমন নাম কেহ কখন

শুনিয়াছেন কি? আর সহরের নাম লিখিভিট, নীমত, হাসি ইত্যাদি। (যো যো হাসিয়া) হাসি কি বাবা? আমি অনেক জিপগ্রাদি এবং হিন্টরি পড়িয়াছি,—কিন্তু হাসি নাম ত কখন শুনি নাই। আমি হাসি জানি, ইংরেজী কথা হাসি জানি,—কিন্তু কৈ, কনিমকালে হাসি কথায় করহুইবে প্রার্থিত হয় নাই। (পুনরায় হাত) আমি হাসি বাহিতে প্রস্তুত আছি।—হুগো বাবুর কথা যদি উপকথা না হয়, তাহা হইলে আমি ৫০, পঞ্চাশ টাকা দি।

অতঃপরে যুক্তি বিশেষ কিছু দেখিলাম না।—তবে কথা এইরূপ,—“হাসি কথারী হাসি হইবে। ছাপার তুলে “হ” স্থানে “হ” হইয়া গিয়াছে। বাসলা পুস্তকে এমন অনেক ছাপার ভুল খট্টা থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া যে, হুগো বাবুর কথা উপকথা—তাহা কখনই হইতে পারে না। এই ত্তরকথারের কাছে তড়া-স্ট্রাটপুর্ গ্রাম, চলুন আমরা সেখানে গাই—তথার গেলে নিশ্চয়ই আপনাব জন প্রতিপন্ন হইবে। আমিও শপথ-পূর্বক বলিতেছি, হুগো বাবুর কথা যদি উপকথা হয়, তাহা হইলে আমিও পঞ্চাশ টাকা দি।—চলুন, তড়া-স্ট্রাটপুর্।

অপর পক্ষ তখন দ্বন্দ্ব ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—“আপো একবার হাসি গেলে হয় না?—হাসি,—হাসি,—সে জাখা ভাল।” রেল-গাড়ী মধ্যে হাসির তরঙ্গ উঠিল। আমিও খুব ধানিক হাসিলাম।

আমার একবার মনে হইল, এইবার আমি যদি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলি,—“আমিই হুগো বাবুর বনোপাধ্যায়।—আমিই হাসিতে (হাত) ছিলাম, সত্য সত্যই আমিও আছি, হাসিও আছে।”—তাহা হইলে ইহার কি মনে করেন? সত্য সত্যই যে, আমি আছি,—আমি ‘উপভ্রান্ত’ নই, জীবন-চরিত—এ কথা বোধ হয়, ইংরেজের ধারাব্য কিছুতেই আইসে না। ইহার আমাকে হয় জুরাতোর, না হয় ভূত বলিয়া ভাবেন। ইহার একজন আমার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু হাসিনগরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবেন না। হতভাগ্য এরূপ স্থলে নীরব থাকাই উচিত।

তখন সর্বশেষ আপনাপন নির্দিষ্ট চেষ্টায়ে অবতরণ করিয়া পঞ্চাশমান পয়সা করিলেন। আমি

পাড়াতের বসিয়া ভাবিতে লাগলাম,—এ কি? আমিই মুখ,—ইহাই আমি জানিতাম; কিন্তু আমা অপেক্ষাও যে মুখ আছে, আজ আমার বিশিষ্ট-রূপে জন্মসম্ম হইল।

সে বাহা হউক, আমার অস্তিত্ব ধাক্ক আর নাই থাকুক,—হাসিনগরের অস্তিত্ব যে, নিশ্চয় আছে। ইহা সকলের জানা ভাল। হাসিনগর পঞ্চাশ প্রদেশের অন্তর্গত—হিমার জেলায় অবস্থিত। হাসি কলিকাতা হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত ১৭২৫ খ্রষ্টাব্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষে হাসিনগর এককালে ধ্বংস হয়,—জনগণ খাদ্যের হ্রাস কিছুদিন এই নগর পড়িয়া থাকে। ১৮২২ খ্রষ্টাব্দে ইহা ইংরেজকর্তৃক অধিকৃত হয়। সেই সময় হইতে ইংরেজ-সৈন্যগণ ঐ স্থানে অবস্থান করিতে আরম্ভ করে। হাসি গুরু নগর। বার চৌদ্দ হাজার লোকের অধিক বাস হইবে না। এই নগর চারিদিকে উচ্চ ইষ্টক-নির্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

মোলাগুলি চালাইবার জন্য মাঝে মাঝে ত্রি-চৌদ্দ রালের গায়ে গল্ভকাটা আছে। প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া ঝাল প্রবাহিত। বালের তরঙ্গেরে দুঃশ্রেণী সজ্জিত। প্রভাতে ষোড়শ চাঁড়া আমি প্রায়ই বালের দ্বারে ধাপে বেড়াইতাম। প্রভাত-সমীরণ-সেবনে মন প্রাণ প্রভু হইত। নগরের উত্তরভাগে একটা পুরান ভাঙ্গা বেঙ্গা আছে। পঞ্চমুখ প্রশস্ত,—এবং বেশ সোজা ভাবে চোখ হইয়া চলিয়াছে,—আমি পথের নৈশী ঘুরপাক বা বাঁকু নাই; এখানকার জলবায়ু ভাল।

এই ত হাসি নগর। এখন যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে তিনি হাওড়ায় ইষ্টইণ্ডিয়া রেলগাড়ীতে চড়ুন,—তুই দিন মধ্যে হাসি পৌঁছিবেন।

বালা কাল।

“আর আর বালাকাল আর রে আমার।
স্বপ্নেরে বাধিল তোরে,
অশ্রু যতন করো।
মাতিন লইয়া তোরে, আমি গুলু অপার।
দাঁখি হুখ বালাকাল আর রে আমার।

“ভালবাসা তোরা প্রতি বড় রে আমার।
তাই ডাকি দিবানিশি,
হেরিবারে মুখশলী,
আর ছুটে আর আর কাছে রে আমার।
আর হুখ বালাকাল আর রে আমার।

“হেরিতে বাসনা বড় হাসিমুখ তোরা।
বহ দিন হেরি না’বে,
আর রে আর রে হেরি,
সরলতা নিষ্ঠায়ে পুরাত্নে সংসার।
আর হুখ বালা-হাসি আর রে আমার।

“মোহন অগ্নেরে হুখ হাসির উদয়।
শরলিখ দেখি লাঞ্জে,
লুকার জলধামানে,
নহে লুপে সে হাসির কাছে কেহ হয়।
আমি যু বালা-হাসি আর রে আমার।
নিগিলী-মন তোরা সরলতাপার।

দেখা’রে বারেক মোরে,
বড় আশা হেরিবারে,
সে নয়ন, সমতুল নাহি আছে যার।
আর সেই বালা-আঁধি, আর রে আমার।
“নৌবন-দেহেতে মৃত সমগ্র সংসার।

হেরিয়া জন্মভূমি,
পাইছাই বড় ভাল,
যে দিকে কিরাই আঁধি না দেখি হুয়ার।
আর আর বালা-আঁধি আর রে আমার।
“মনে হলে আনন্দেতে উললে পরান।

প্রহসিত জুটিলে,
খেলিতি হুমমানে,
মান অপমান জান ছিল রে আমার।
আর আর বালা-খোলা আর রে আমার।

“বউ বস। ‘চুকপাট’ ‘ওলি’ ‘আই বলা’।
খেলিতি হুখভেরে,
সমাদের পরা পরে,
করিণি রে খোহা হতে কোথা পলায়ন।
আর আর বালা-খোলা নেরে ঘরঘন।

“সকলের কাছে তুই যতনের ধন।
সাদরে উলসে লাগে,
অমরে জ্বলব হিরে,
যে সেখিত সেই তোরে করিত চূষন।
আর হুখ বালাকাল আর রে আমার।

“আঁখি হইয়া তোরে ডাকি বার বার।

পথপানে আছি চেয়ে,

কেন না আইনি মেয়ে;

ভালবাসা দিব আঁখি ছায়ে আমার।

আঁখি হুখ বালা-কাল আঁখি রে আঁখি।”

শ্রী হরিমোহন মুশেপাধ্যায়।

মুরশিদাবাদের নবাব।

গজশ্রিয় বাঙ্গালী পাঠক! বাঙ্গালার শেষ নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা সম্রাজ্ঞ হুইটী নৃত্য ও মনোহর গজ-কবির। তুমিরা হুইটী হইলে কি না?

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে ৩৪ বৎসর ক্রমাবধি “আমি নবাব-বাটাতে” চাচুরী কবি, সেই সময়ে একজন অসীতিবদ্ধ-বাক বৃদ্ধ বৈধা এই “হুইটী” গজ করেন। আমি নিজের লিখিবার পোষে গজ হুইটী মনোহর করিয়া উঠিতে না পারিতে পারি, কিন্তু গজ হুইটী যে অন্তরিয় মনোহর, উপন্যাস হইতেও জগৎস্বামী তাহা আমি বেশ বলিতে পারি। গজকারক বৃদ্ধ বৈধা তাঁহার পিতামহের প্রত্যাশা ইহা শ্রবণ করেন। ষট্ সংবাদ আঁখিও হয় নাই; এখনও “পুথান” বাগ্ম্য পাইতে বিলম্ব আছে। পুথান হইলে আমি বলিয়া দাম। সিরাজ-উদ্দৌলা ইতিহাসে জলন্তমূর্ত্তি; মূর্ত্তি দেহপূর্ণ হইত। সিরাজ-উদ্দৌলা সম্রাজ্ঞ অনেক গজ-ওষধ ইতিহাস-উপন্যাস ইংরেজী ইতিহাসে আছে। কিন্তু এ হুইটী গজ নাই। তাই বলিতেছি যে পাঠক! নৃত্য হুইটী গজ শুনিব; কিন্তু আমার একটা অনুভবের ব্যাপ্তি হইবে; নচেৎ গজ কবি না।

তোমরা মগের রীতি নীতি জানিতে চাও, চাঁদমের আচার ব্যবহার উদ্ভিতে চাও, কাপানের কথা উদ্ভিতে বহু, আর ইউরোপের তু কবাই নাই, এমনত অবস্থায় এই বরের কাপের নবাব-বাটা, এই মুরশিদাবাদের ভাঙ্গা-নবাব-বাটার অবস্থা রীতি-পদ্ধতি আগে একবার করিয়া লইতে হইবে। কীর্তন শুনিতে গিয়া কতজন মগের “বুঢ় বড়” বড় আঁখি ভাঙ, কামোয়ারের পান ভলিতে গিয়া কত অশুভকরী দেখিয়া থাক,—কত ভলিতে গিয়া কত অশুভকরী মগের গজের গোড়ার নবাব-বাটার নিয়ম-বার্তা মগ হউক, বিমস

হউক, না তুমিবে কেন? এ সময় ইহা অপ্রাসঙ্গিকও নহে, এমনকি বিষয় জানিয়া ভুলিয়া আমার গজ পড়িলে মিলি অধিক লাগিবে। পুথান পূর্বে তুতুভক্তি করিতে হয় জান ত। হুইটায় আগে একটু পরিচয় দিয়া রীতি নীতির কথাই পাইলাম, মনোযোগ দিয়া পড়।

মুরশিদাবাদের নবাবের স্বর বসুদেবশেখর প্রদান হইতে প্রধানতম স্বর ছিল এবং এখনও অনেকের বিশেষতঃ মুরশিদান সন্তানদের সকলের না হইলেও অধিকাংশ লোকের বিবেচনায় সেইরূপই আছে। কিন্তু আমাদের এক পুরুষের মধ্যেই সেই প্রধানতম স্বর বসুদেবশেখর কত পরিবর্তন এবং কত অবনতি না দেখিলাম। ঠিক কোন বৎসর তাহা আমার মনর নাই, কিন্তু সার চার্লস মেটকাফের কিংবা লুড-অফুল্যান্ডের প্রথম-শাসনকালেই নৃত্য নবাব সৈয়দ মনুহর আলী বা বাহুদর, মাদ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন, আমি সেই সময় কলিকাতায় হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, কাজেই তখন যাহা শুনিয়াছিলাম এবং দেখিয়াছিলাম, তাহা এখনও বিলম্ব মনর রাখা হইবে। নবাব মনুহর আলিও তখন কেবল মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নবাবী পদ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বখা আমার বিশেষ মনর থাকিবার কারণ এই যে, তিনি সেই উপকলে গবর্নমেন্টের একজন সেক্রেটারী সঙ্গে করিয়া হিন্দুকলেজ দেখিতে আসিয়া ছিলেন, এবং কলিকাতায় তিনি মধ্য য়ে প্রণালীতে যে কীট করিয়াছিলেন, তাহা আমার আমাদের শিক্ষক-দের কাঁট অবগত হইয়াছিলাম। এই স্থানে ইহাও মনর রাখা কর্তব্য যে, আমি যে সময়ের কথা বলি-তেছি, তখন কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে অপ্রিয়তা বহুবার এবং সম্রাজ্ঞ ছিল। তখন তাঁহার উদ্ভাগ ছিল “বিজ হাইদেন্স দি নবাব নাম্বিয় অব বেঙ্গল বেহার এণ্ড উডিয়া”। নৌকাযোগে মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আগমন করা হইল, সঙ্গে সঙ্গে “একটু টু দি নবাব কেমোরলিয়া ইয়াই মুরশিদাবাদ” নামক ২০০০ টাকা বেতনে একজন সৈনিক উক্ত কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিলে কোম হইতে ২১ ডোপলসন হইল। যে দিবস লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলেন, সেই সময়ে লাট-গৃহেরে ফটকে তাঁহার পাকী উপস্থিত হইবামাত্র লাটসাহেব নিজের তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্নর আসিয়া পাকী:

হুই মদুয়া, হুইজন হাত দিয়া পদজল লাট-গৃহের সোপান পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন। সোপানের অগন্তন স্থানে নবাব সাহেব উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত হুই সাহেবের হুই হাত দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার এইই সম্মান ছিল। কেবল সম্মান নহে। তখন তিনি ১২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা করিয়া মাসহারা পাইতেন। কিন্তু কালের পরিবর্তন লগুন। সার চার্লস মেটকাফের পর লাট অক্যাপট, তাঁহার পর লাট এলেনবোর, তৎপরে আসিলেন লাট ড্যানহোমসী। এই লাটের আমলেই ১২ লক্ষ টাকা কমিয়া নবাবের ৭ লক্ষ টাকা মাসহারা হইল ও তাঁহার উপাধি হইতে “বেহার উডিয়া” হইতে শব্দ কটুিত হইল; কেবল রহিল “বিজ হাইদেন্স দি নবাব নাম্বিয় অব বেঙ্গল” ডোপও কলিকাতা করিতে হইল। এই উদ্ভাগ সৈয়দ মনুহর আলী জৌবখা পর্যন্ত ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র একমে হইয়াছেন কেবল “নবাব বাহাদুর” এবং মাসহারা হইয়াছে, “মাসে চারি হাজার টাকা। কালের কি বিচিত্র গতি! কোথা ৫০ বৎসর পূর্বে “বিজ হাইদেন্স দি নবাব নাম্বিয় অব বেঙ্গল বেহার এণ্ড উডিয়া” এবং কোথা একমে “নবাব বাহাদুর”। কোথায় এক লক্ষ, কোথায় চারি হাজার টাকা! এই অশেষ অবনতি আর অধিক কি হইতে পারে? বহু হইবার পরে বাহাদুর শকটী উডিয়ায় দিয়া নবাব আবদুল লতিফ প্রভৃতি উপাধির ভায়া যে কেবল নবাব উপাধিটাই রাখা হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

মুরশিদাবাদ সহরটা পূর্বে প্রায় সমস্তই নবাবের নিজস্ব ছিল এবং এখনও ইহার অধিকাংশ তাঁহার সম্পত্তি বহিয়াছে; অমধ্যে কোমো অতি বিস্তৃত স্থান। এই কোমোর ভিতরে নবাবের পরিবারগণের বাস, যাহা মগে সেরাই বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভক্তির কোমার মধ্যে প্যাসেল বলিয়া একটা জিতল বৃহৎ গৃহ আছে। যদিও ইহা কলিকাতা লাট-ভবনের ভায়া বড় মেয়ে, তথাপি ইহার আয়তন কম নহে। ৪০-১০০ মানেই হউক, অথবা তাহার ভায়া বৎসর পূর্বেই হউক, শতলক্ষ টাকা ব্যয়ে নবাব মনুহর আলীর পিতার আমলে হা নির্মিত হয়। এই শ্যালেগেল অবস্থাই ইংরেজী ভায়া গুণ এগ্নং বিলাত ও ইউরোপের অজ্ঞাত:

দেশ হইতে সংগৃহীত অনেক বহুমূল্য আসবাবের দ্বারা সজ্জিত; লোকের বলে যে, এই গৃহে এক সহস্র বরজা জানালা আছে, কিন্তু আমি তাহা গণনা দেখি নাই; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে নবাবের এই গৃহে বাস করেন না। প্রথাগ আছে যে, যখন এই কুঠী নির্মাণের সমস্ত কার্য শেষ হইল, তখন ঐ গৃহে অজ্ঞত কয়েক দিন বাস করিয়া তাহা হালগা (পবিত্র) করিবার জন্ত নবাবকে অহু-রোধ কুরা হইয়াছিল। নবাবও সেই অনুযায়ণ মত কয়েক জন পাহারদার লইয়া এই রাত্রি উহার ত্রিতল এক কামরায় আতিবাহিত। পরিত্রা ছিল। কিন্তু পরিব্রজন প্রাতে তাঁহার “সানার” সে স্থান হইতে উঠিয়াই তাঁহার পুত্র-পুত্র-পুত্র বসে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। কারণ যোজার বলিলেন যে, ইহায়ে দেউদানা দ্বারা, এমনকি ক্রিষ্টি-কে ওগাভে নহি।” অর্থাৎ ইহা মগের কুঠী উপগুহ বাসস্থান নহে, দেবতার থাকিবার স্থান। মিনাসে বৃদ্ধি এমন প্রশস্ত স্বরে শুইয়া ইহা ইংরেজী উঠিয়াছিল। আমি হইলে ত তাহাতেও জগদীশ কাটাতে পারিতাম। যাহা হউক, তাহাও পুট্টেই মনুহর আলীও প্যালেগে কখন থাকেন নাই। এবং শুনিতেছি যে, বর্তমান নবাব বাহাদুরও সেইরূপ নহে। ইহাতে দরবার এবং বহুসংখ্যের সাহেবগণের থানা ও নাচ হইয়া থাকে। কোন ইহা অশেষ হুতা আমিগে এই হুইটীতে তাঁহারে বাসের জন্ত থানা দেওয়া হয়। সাহেবগণের মনন সচি-প্রভৃতি, সেরাই তাহারে, ভায়ে ভাল বাস-স্থান শটিয়া উঠে; কিন্তু এই ইঙ্গুপুটী যে ব্যক্তির তাহাই বা কে বলিতে পারে?—এই ইঙ্গুপুটীর দলিগণিকে মহল সেরাই নামক স্থানের মধ্যে। এই ইহা প্রাককৈ পরম্পর তুলনা করিলে, মহল সেরাইয়ের তীক্ষ্ণতা মুরশিদাবাদ কিংবা ভেড়ানানা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। অজ্ঞত একতলা ভিজা স্নায়-স্নায়িতা বহুশবির মধ্যে নবাব সাহেবেরা তাঁহাদের পরিবারগণকে লইয়া চিরকাল স্থলে কাশখাপন করিয়া আসিতেছেন। মহল সেরাইয়ের ভিতর কেবল ক্রীলেকের বাস এবং নবাব নিজে, তাঁহার পুত্রেরা ও খোজারা ভিন্ন তাহার মধ্যে আর কাহারও বাইবার অধিকার নাই। এই স্থানটা অতি উচ্চ এটাতের দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত। প্রাচীর এমন উচ্চ যে, বড় উচ্চ হস্তীর পুষ্ঠে হাওদাতে আরোহণ করিলেও তাহা

উপর দিয়া ময়ল সেয়ারের মধ্যে কাহারও দৃষ্টি
এখনে হয় না।

নবাব মনসুর আলীখাঁর অবশেষ যখন আমি
চাকরি করিতাম। তাহার তখন ৩৭/৩৮ বৎসর বয়স
হইবে। দেখিতে তিনি মধ্যম আকারের লোক
ছিলেন। বয়ঃসম্পূর্ণ। ইংরেজী ভাষায় খুব
অধিকার ছিল এবং তাহার অনর্ণল কহিতে পারি-
তেন। বয়ঃসম্পূর্ণ ছিলেন এবং আবেগ ভাষা
চড়িতে পারিতেন। পার্শ্বিতে যে ভাল অধিকার
ছিল, মন আবার বেশ হয় নাই; কিন্তু তিনি
বাহ্যঃপ্রভাৱ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। এমন

মি. উক্হ তাহার সমুখে বাস্তবায়ন বর্ণনাপকন
পদ-প্রতি, তিনি তাহা বুঝিতেও পারিতেন না। রিপু-
রাণ্ড, তাহার কোন ধোঁস ছিল না; তবে তাহার
আমি ছিল হুজিটারও অধিক। পানের সহিত
একজন দানার লোকতা ভিন্নই ছিল। অন্য কোন নামক
নামক তাহার অভ্যাস ছিল না। গিলাস্তী এবং
পদ-প্রতি তাহার অভ্যাস ছিল। তাহার বাহ্য আভ্যন্তর ছিল
স্বাভাবিক ছিলেন। তাহার বাহ্য আভ্যন্তর ছিল
কিছু (১) পোষাক-তিনি অষ্টমের মান-সময় ব্যবহার
হইতে করিতেন। মূলমানসিগের পান্যপথত ধর্মবিষয়ে
পারি পদ-প্রতি-আটা-কাটা থাকে, তাহা নবাব মনসুর
এমন আদর্শে তখনও আমি বুঝিতে পারি নাই। তাহাকে
কখনও নমাজ করিতে কিংবা কোরান পাঠ করিতে
দেখি নাই; তবে মসজিদ, ইদ, বকরির জুজুতি পক্ষে
তিনি তাহার সম্বন্ধবোধবোধিগের সন্নিহিত যোগ না
দিগেতে অনানুহে; বয়ঃসম্পূর্ণ আমি তাহাকে স্বা-
শিলা কল্যাণ ডেউ-ডেউ করিয়া কলিগেতে দেখিয়াছি।
আমি তিন বৎসর কাল বাবঃ তাহার নিজে প্রতি-
নিত্য উপস্থিত থাকিয়া একদিনের নিমিত্তও কুহাকে
কাজ করিতে কিংবা কাহারও প্রতি কোন কঠিন
বাস্তব অথবা কর্তব্য ভাষা প্রয়োগ করিতে দেখি
নাই; কিন্তু তাহার এই সন্তোষ এবং সুখি দেখে
নষ্ট হইয়া যাইলাম। মনসুর আলীর পুত্র পরি-
পক ছিল না, অগুননার হিজাবিত বুঝিতে পারিতেন
না। যখন যে কর্মচারী প্রিয় হইত, তখন সে যাহা
বলিত, তাহাই করিতেন; আবার কিছুকাল পরে
অজ্ঞ এক ব্যক্তির দ্বারা চালিত হইতেন। সন্তোষ
তাহার বি-বুদ্ধি ছিল না এবং, তাহার এই বুদ্ধি
বোধেই তাহার যত 'অবিশিষ্ট রটায়াজিল' যত

হিস্তি; কিন্তু কি কখনও কোথা হইতে আগল-
হোসেন নামক লক্ষ্যীএর এক কুটুম্বিয়ারী হকিম
আসিয়া তাহাকে বশীভূত করিল, সে, সেই
মুহুর্ত হইতে তিনি যোব বিপদগ্রস্ত হইলেন এবং
তাহা হইতে তিনি আর ইহজন্মে উদ্ধার হইতে
পারিলেন না। এই হকিমের ভ্রাতা রাজা এসম-
নায়ারবৎ সাহিত তাহার বিচ্ছেদ হইল এবং সেই
জন্ম তিনি পর্বমেষ্টের এমন কোপ-দৃষ্টিতে পতিত
হইলেন যে, পর্বমেষ্টে তিনি বৎসর পর্যন্ত তাহার
মানসে বাধ করিয়া রাখাছিলেন। এই সময়
তিনি যে সকল নতন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন,
তাহাদিগের নিকট প্রত্যজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে,
তাহাদিগকে তিনি কখনও পরিভ্রাণ করিবেন না।
কিন্তু তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তিনি স্থির রাখিতে
পারিলেন না; কারণ প্রথমনায়ার দেখে পুনরায়
পদস্থ হইয়া এই পরিবর্তনাদিগকে কেরা হইতে
বিস্তৃত করিয়া গিলেন এবং নবাববাহবৎ তাহাতে
কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। ইহার পরে
তিনি বিলাত গিয়াছিলেন এবং সেই থানে একটী
ইংরাজ মেমকে বিবাহ করিয়া মুরশিদাবাদে প্রভা-
পনন করেন এবং তাহার কিছুকাল পরেই পর-
লোক গমন করেন।

যদুপদেশে মধ্যে বুঝি কেবল মুরশিদাবাদের
নবাব-বাড়ীতেই এখন পর্যন্ত খোজার ব্যবহার
আছে। ইহার সময় তথায় ৮-১০ জন থাকে
ছিল। তাহাদিগকে নবাব বাড়ীতে থাকাসেবা বসিয়া
ডাল এবং ইহাদের মান-সময়ও কম নহে। এক
এক জন ২০০ হইতে ৩০০ টাকা পর্যন্ত বেতন পায়।
দরবারীরা বী নামক নবাবের পিতামহের আমলের
এক জন বড় খাজানোয় এক সহস্র টাকা বেতন
পাইতেন। খোজারা প্রায়ই আফিকা যত্নেও যত্নে
(যাহাকে ইংরেজীতে ম্যারিনিয়া বলে), ইথিওপিয়া
এক মিসর দেশের লোক। সকল খোজাই রুমার
এক লম্বা। দুবাকালে ইংরাজ দিলম্বল লম্বাবন
থাকে, কিন্তু চল্লিশ বৎসর পার হইলে অনেক
দুগলকায় হইয়া পড়ে। উক্তদের মাতৃভাষা স্বতন্ত্র,
কিন্তু ভারতবর্ষে থাকিয়া এক্ষণে ইংরাজি বলি
বিস্তৃত পালে। ভূমিগাতি যে, পূর্বে হিন্দুস্থানে
হিন্দুস্থান অধিবাসিদিগকেও খোজা কহা হইত;
কিন্তু এখন সে প্রথা-উঠিয়া গিয়াছে। হিন্দু
খোজাও ছিল। তাহাদের কথা ইহার পরে সিরাজ
উদ্দৌলার কাহিনীতে বিশেষ করিয়া বলিবার

আনশুক হইবে, তখন বলিব। এক্ষণে তাহার উল্লেখ
করার আবশ্যক নাই। খোজারা প্রায়ই নিরক্ষর,
কিন্তু ইংরাজ মড় মুহুর্তজ্ঞ। একেই ত মূলমানস
ধর্মশাস্ত্র রূপকতা অত্যন্ত নিদান্য; তাহাতে আবার
তক্রান্তে ইহাদিগের ভাই বর্গ, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রীপুত্র
কেই নাই; কাজেই ইংরাজ যাহা কিছু উপার্জন
করে, তাহার দ্বারা ইংরাজ আদানারা কাল খাওয়া, ভাল
পরে এবং স্বীকৃতের ভিজুক প্রভৃতিকে দান করে।
আমি দেখিয়াছি যে, দরবারী বীর বাড়ীতে প্রভুত্ব
শতাব্দী লোকে 'পোলাক' 'কালিয়া' রিয়া ভোজন
করান হয়। নবাবদিগের স্ত্রীমহলে খোজাদিগের
অত্যন্ত প্রভুত্ব; কারণ খাজানোয় ভিন্ন তাহাদিগের
নিকট অল্প কয়েক হাতিতে পারে না। নবাব মনসুর
আলী বীর্ঘন দেখানে যাইতেন, সঙ্গে এক কিংবা
দুই জন খাজানোয় নিযুক্ত থাকিত। এই মাঝেবে
হুজা আমান বলিয়া এক জন বড় প্রিয় খোজা
ছিল। সে এখনও জীবিত আছে কি না, তাহা আমি
বলিতে পারি না। [কাজী] ওজা আমান মুক
ও বলির ছিল, কিন্তু ইংরাজ ও ঠাণ্ডে-ঠাণ্ডে উত্তরে
উত্তরে যাহা বাকী বিশদগ্ন বুঝিতে পারিতেন।
অজ্ঞ খোজা দ্বারা যে কার্য সংঘটিত না হইত, ওজা
আমান তাহা অনাগ্রাসে করিত। নবাবের অঙ্গর
মহলের শয়ন কক্ষে অনেক ইংরাজ প্রভুত্ব
এক চিঠি পরে থাকিত, বাহিরে তাহার কোনটার
আবশ্যক হইলে তিনি তাহা খোজাকে হস্ত প্রাণ
ইহিত করিবারদল সে তাহা অজ্ঞাতস্বরে আনিয়া
উপস্থিত করিতে পারিত। ইংরাজ খুব বিদ্যারী
সেই জন্ম নবাবের মনি মুক প্রভৃতি জরুরী ও
শাল সেলামা সকল ইহাদিগেরই ক্রমোন্নয় থাকে।

কলিকাতা হইতে যখন আমি প্রথম মুরশিদা-
বাদে গমন করিলাম, তখন আমায় অধিকারী নতন
বয়স হইতে লাগিল। যেন ইংরেজের অধিকার হইতে
কৈই পুরাতন নবাবী কোন সহরে উপস্থিত হই-
য়াছিল। স্থানে স্থানে উক্ত নবাবত সনাক্ষর প্রহর
নবাবত বাহিরেও। রাস্তাতে সনাক্ষর একা ও
বয়েলের পাড়ী। পাক্ষর পরিবর্তে জুলা ও মিজান
যান এবং যে হই এক থানা বসী কিংবা চেটেটে পাড়ী
হইত। তাহাদের সমুদেও রাজিকালে ইহজন্ম সহিষ
হুজী মসাল গাওয়া দোড়িত। 'অধিবাসিদিগের
পোষাক-পরিচ্ছদও সেইপ্রকার। গেটেটের পর-
বর্তে চুড়িদার কিংবা ঢিলা পাঞ্জামা, ঢাপকানের
হাটো মে ক্রোলে জামা-জোড়া আপুরা, টিপার জামা

গায় পাখি এবং ওরারের বাড়ীর জুতার নবলে
নিম্নার, নাপরা। বোলচাপও সেইরূপ নতন।
ইংরেজীর নাইট্র নাই, ক্রেল বিন্দী ও পান-
মিশ্রিত বাদলা এবং সেক্ষ্যাতের ও নবোলা
ও সূর্যাস। এ ত সেল বাহিরের দৃশ্য; আবার
বাহিরে নিজেই তাহার অঙ্গত। নবাব যে স্থানে
মসজিদ বিসেতে, তাহার নাম দেউড়া। অঙ্গরমহলে
হইতে নিজস্বত হওয়ার দ্বারের উত্তরদিকের আশ্রয়
২-৩ তরফ প্রায় একটা উঠান পার হইয়া, দুই দিকে
আনুপ্রস্থ ভাতি পুরাতন এবং চারি কিংবা সাড়ে
চার হাত উচ্চ একটি কোঠা-ই সেই দেউড়া।
ইহার পূর্ব-পশ্চিম লম্বা আংশটোতে 'নবাবের
বৈঠকের স্থান' এবং তাহার সংলগ্ন উত্তরদিকের
আংশটা তখনো আলা নামক একজন খোজার
খানিকার স্থান। তখনো আলী মিজা কিংবা
সৌদানী। তাহার শয়ন কুঠারিতে বাঁশের জুট-
করা হুজী লজাইয়ের বড় আকারের খাতালি
মোড়োপে বসিত থাকিত এবং তাহার সমুদে সমুদে
পলা ছাড়িয়া নবাবের সভাসদগণকে আসা-
সিক করিত। বৈঠকের স্থানে কয়েক খাতা ছোট্ট
তক্তাপোষ পাশাপাশি করিয়া পাতিয়া একটা মক
এক ও তাহা একখানা সামান্য শীতলপাতা দ্বারা
আচ্ছাদিত। সমুদে কয়েক খাতা বেতের মোড়া।
পাটা-আচ্ছাদিত তক্তাপোষে বসুনের বসিবার আসন
এক কুর্মচারী ও মোহালাবৎসিগের জন্ম সেই মোড়া।
ইহা স্থিতি যে স্থানে বসে কোন আমদান কিংবা অন্য়
ছিল না। বজুর যখন বাহিরে আসিতেন, তাহার
এক আশ মিনিট মুহুর্তেই সর্দা খোজারা উত্তরে
'হজিরান, হজিরান' বলিয়া শব্দ করিয়া বাহিরের
লোকদিগকেও বর্তক করিত। 'অধিবাসী' শব্দ কখনোই
আমরা সকলে উঠিয়া বাড়াইতাম এবং জবুজ
আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে আমদান সেলাম করিতেন
মোড়ার দরবারী পড়িতাম। বজুর 'ভাকার' হইতেন
না, কেবল তাহার সঙ্গে একটা স্বাভাবিক কয়েকটা
বড় বড় পানের থলি আসিত। সেই থলি ওজা এক
একটি পোশারি পানি আনত। বজুর 'ভাকার' হইতেন
সময় পিন্ডী খুলায় থিগাটী মুখে দিতেন। সঙ্গে
জ্বর একটা রূপার পিকানোও থাকিত। পান হাইয়া
সেই পিকানো ফেঁকে ফেলিতেন। সেই ফেঁকে
কোলা কাঠোটা সর্দারাই করিত হইত। ফেঁকে
ফেলিবার সময় মূলমানস মোসায়েবেরা বজুরের
সমুদে পিকানো দরিত এবং তাহা করিতে পূর্বে

হাজারে নবাব। ৫২৯

হাজারে দাঁতাকে বুলবুল।" এই বাক্যটা ইংরেজীতে তরজমা করিলে হয়, *You are the nightingale of a thousand tales*, বাস্তাব্য। হয়, "আপনি সমস্ত 'শব্দের সুবাহী।" কিছু নূর হুসৈন কদরার কথা তদানি ভিকিং অসফট হইয়া বলিলেন যে, ইহা সত্য বৈদ্য। এই কথার পোষকতায় তিনি যে প্রকার শব্দ কতুলন, তাহাও আমার নিকটে এক প্রকার নতন বোধ হইয়াছিল এবং তজ্জন্য আমি তাহা এই স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি বলিলেন যে, "হজুর ইহা বুট বাত নেহি, বদা, আপনা চামমে দেখা, কসম হজুরকা, কসম হজুরকা শীরকা, কসম খোদাকা, কসম কাম্বাহালা।" অর্থাৎ ইহা মিথ্যা কথা নয়, আমি নিজেই চক্ষু দেখিয়াছি; আপনাদি দিকী, আপনাদি 'মাধার দিকী, খোদার দিকী এবং খোদার দিকী দিকী। এইরূপ সময়ে সময়ে যে ভূত পর হইয়া থাকে তাহারও উল্লেখ নাই।

বাগুধিানা হইতে জেনাবালীর ধান বণন অন্তরমহলে যায়, তখন তাহার অগ্র-পশ্চাৎ আশাবর্ধক ও পোষাকদিগর যায় এবং রৌশনশব্দীকী নাজাইতে বাজাইতে যায়। পূর্বে বাগুধিানার ধরত অপরিমিত ছিল। অতঃপর কর্মচারীরা নবাবকে সুবাহীয়া সিপাহি এবং তিনিও তাহা বিক্রাস করিয়াছিলেন যে, উঁহার ধানার (বাগের) যাহা যে সমস্ত সবজী ও তরকুরী ব্যবহৃত হয়, তাহার বাজারের জিনিষের দ্বারা উৎপন্ন হয় ন। ধানার তরকারীর ক্ষত্র হয় দিয়া মাটি ভিজাইয়া বীজ বপন করিতে হয় এবং দুই জমিতে তাহার গোড়ায় চিনির ও মিশ্রির জল দিয়া তাক্সা রাখিতে হয়; 'আজ্ঞেই তঁহার পুঁথ বোপের,—দাধার বেষ্টন পটল কপোলা অনেক বেশী দূখ। কিন্তু এখন আর সে কস নাহি; ওথাপি বীজ আছে তাহা অমের পর্ত্ত।

নবাব-সরকারের অধস্তন কর্মচারীদিগের বুদ্ধি ও কোলাল বিলম্বপ্রসন্ন, তাহার একটী দূরীভূত দিয়া আমি এই প্রবক্তার কসম করিব। নবাব মনুহর আলীর হীপানী কানী-বেরা দিয়া, যামার মনুহরদাবার বাগ্গার কসকে বসমর পূর্বে এক জন মুসলমান হকিম আশিয়া বলে যে, ঐ বোরের, যো এক অর্থ্য ঐখ জানে; কিন্তু তাহা প্রকৃত তাহার কস এক ডটাকী-মাধির ও আশাক হইবে। জেনাবালী থা তাহা সমগ্রই করিয়া দিতে পারেন,

ভাল, নচেৎ তাহার নিকট ঐ দ্রব্য বাহ্য আছে, তাহা সে দশ হাজার টাকা পাইলে বিতে পারে। কারা, উহা সে-বৎ পরিত্রমে অনেক অনেক পূর্বত হইতে আহরণ করিয়া আনিয়াছে। নবাবের পারি-
দর্শেরা মাছির ও-ব নাম ভণিয়ারই অবাক; বিশেষ এক ছটাক পরিমাণে তাহা এই বৎসরে পাওয়া দুস্কর, কাজেই নবাব অবশেষে ঐ মুদ্রা দিতে নিম্নাকাই হইলেন। কিন্তু গোপাল কন্দার নামক পেউড়ার প্রহরাদিগের মধ্যে একজন প্রহর মুন্সি-
কোষী কন্দারের ছিল, সে দেখিল যে, এক ব্যাটা কোষা হইতে আসিয়া হজুরের নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া এত অধিক টাকা আশ্রম্যাস করিতে উদ্ভাস্ত, অতএব কন্দোবালীরা সমুখে একদিন উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে, 'হজুর অনন্যক এমন এক তুচ্ছ জিনিষের জন্য কেন দশহাজার টাকা ব্যয় করিবেন, তোমাদের প্রতি হুমুয় করিলে, সে পাঁচ শত টাকার ও মাছির ও স্ফাং করিয়া দিতে পারিবে।' কন্দোবালী প্রথমে গোপালের কথা বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু সে বাবুবার বলাতে স্নেহশ্রোত্রে তিনি তাহাকে আশ্বাস করিলেন।
গোপাল তৎকাল্য এক হাজার বাত চিকন দড়ি একটা বানতত হানে—তঁাতিয়া যে প্রণালীতে তিনা পড়নের পুত্ৰা শুভার সেই প্রণালীতে—আগতে কাটা পড়িয়া তাহার খাতার খাতার টাকাদ্বারা ছিল এবং কয়েক-সের জড়ীতত ওড় ঐ সমুদায় দড়ি বাত লেপন করিয়া ছিল। শুড়ের পক্ষে সেই অঞ্চলের বত মাছি আসিয়া দড়ির উপরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহা সকলেই দেখা ছয় জানেন যে, মাছিয়া যে দ্রব্য বাত সেই দ্রব্যের উপস্থিতিতে মল ত্যাগ করে। অতএব ঐ ওড়-লেপা-নুড়ি হই তিন দিমস পর্যন্ত ঐ রূপা রাখিয়া জড়দ্বারা সে গোপাল সেই ওড় তালি দড়ি হইতে চাঁটিয়া উঠাইল। এক ছটাকের বাত সে এই কোশে সে এক শেরেরও অধিক মাছির ও মিলিত ওড় লইয়া কন্দোবালীর নিকট উপস্থিত হইল। তিনি গোপালকে ধন্যবাদ দিয়া একদণ্ড টাকা বহুশ্রম দিলেন; কিন্তু তাহার পর দিমস সেই হকিমকে মুন্সিদিবানে আর কেহ দেখিতে পাইল না। বাত হইতে শীকার পরিমাণ দেখিয়া সে পুকাইয়া চম্পট দেয়।

বিবাহ।

‘হিন্দুর সকল কাজেই স্বাভাবিক;—আত্মসর-শুভ অনার্যাস-দাধ্য কার্য, বুদ্ধি হিন্দু-মাস্যারে একে-বারেই নাই। এমন যে যুগের কাজ বিবাহ, তাহাতেও কি কম শোঁতা! বিবাহও কি কম নিয়ম-জালো জড়িত; কম বন্ধনে আবদ্ধ; এই এ-ন্যে-বিবাহ করিতে নাই, তার-মেয়ে বিবাহ করিতে নাই, এ-ন্যে বিবাহ করিতে নাই, সে-মেয়ে বিবাহ করিতে নাই, একদণ্ড কত নিয়মই আছে। তা ছাড়া বিদে করিতে নাই যে ‘ওর পোপানা’ একরকম মেয়ে—আট-বছুরে, ন-বছুরে, বড় ছোর দশ-বছুরে মেয়ে। ইহার উপর হইলেই সর্বনাশ। একই বেশী বড় হইলে—পুপুপতী হইবার পর বিবাহ করিলে ত বিবাহকর্তার একেবারেই আতিপাত। তাহার সহিত বোকা’ একপাঞ্জিতে ভোজন বা সম্ভাষণ করিবে না। একি কম কর্তার নিয়ম। বিবাহ করিব মাংসাদির যুগের জন্ত, অনির্জন্যের আনন্দের জন্ত, পৃথি পৃথিবার জন্ত নহে; যাহাকে লইয়া কোন কাজই হয় না, এমন বালিকাকে বিবাহ করিয়া লাভ কি? যতদিন শুক আশা সুক ধর্মিয়া বালিকার উপদ্রুত করিতে হয়, তাহার মধ্যে কত বিবর্তন পরিবর্তন মঙ্গলটি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। তাই বলি হিন্দুর বিবাহেও বিষম স্বভাব। লোক-কোষা বলে ‘চে কি হর্যে মেলেও বান ভানে’। এমন যে বিবাহ, হিন্দু তাহাও মজাইয়া রাখিয়াছে। যে পাণিগ্রহণে যেমতারা নির্মিত না হইল, শরীর পুঙ্খক কটকিত না হইল, হিরা হ্রস্বকর না সীপিল, তাহা আবার বিবাহ কি? সে বিবাহে হয় কি? যে বিবাহের শুভভুক্তি—করিতে হয় বলিয়া করা, না করার স্বভাব উৎকর্ষা থাকে না, বা উৎকর্ষা থাকিলেও তাহার

* পতিভরে কল্যাণবিবাহ; পিতৃশত্ৰু-বিশেষ সমুদয়পুত্রের মধ্যে এ-এ-মাতামহলাক ও মাতৃশত্ৰু-বিশেষ পুত্রের মধ্যে কোম কল্যাণকর বিবাহ করিবে না। পিতার পিতৃক মাতৃক মাতামহ ভাই পিতৃশত্ৰু। মাতার পিতৃক মাতৃক মাতামহ ভাই মাতৃশত্ৰু। মতোলা সমানকরা এবং মাতামহ-মতোলা স্বভাবের বিবাহ করিবে না। এই সেম সাধারণ কথা; একই বানাই বিশেষ নিয়ম ও স্বভাব নিয়ম উভারিত্ব প্রকৃতি এবে স্বভাব।

নিরুদ্ভিতে মনে অনির্জন্যের স্বয়ংসংগর হয় না বা হওয়া উচিত নহে; সে বিবাহকে কেনি বিকলপ ব্যক্তি, অসামান্য হর্ষপ্রপ বণিতে পারেন? হিন্দুর বা হিন্দুশ্রমের ইহাই নীরসতার যোগেই পরিচায়ক নহে, কিন্তু এই বিবাহ—এই বাণ্যকালের বিবাহ যে রমণী একবার সমাজটিত হইয়াছে, তাহার, আর নিস্তার নাই; এই বানাই শেষ, আর বিবাহ করিবার যো নাই, কিছুতেই না; বিধবা হইলেও বিবাহের নামটি করিবার যো নাই; এই সর্বশেষে নিয়মেই তাহার পূর্ব পরিচয়। পৃথিবীতে সমস্ত সমস্ত সত্য আসত্য নৃশাস জুর কোলাহল বিমল জাতি আছে, কিন্তু এমন দারুণ নিয়ম বিবাহের যেমত আছে এই কর্তারতার একশেষ, আর কেহ দেখাইতে পারেন না। শুধু কর্তারতার বলে, সঙ্গে সঙ্গে পলা-পাতও আছে। রমণীর বিবাহ-সমক্ষে পেরেক কর্ডাক, পুরুষের পক্ষে সেরাপ নহে। পুরুষ বহু-দার পরিগ্রহ করিতে পারে, জী থাকিতেও পারে, তবে যোয়ের মধ্যে সে জীকও থাকিতে থাকে। একে ত রমণীর বাণ্যকালের বিবাহ; তখন বালিকা, পুঙ্খলের বিশেষ দেখে বটে, হুগু হুগু ধনি কন দেটে, বাঁখা রাখা বটে, কিন্তু যিয়ে কাছকে বলে, কেন বিয়ে করে, এ সব তত্ত্ব যে কিছুই জানে না। কাজেই বর পঙ্খল হইল না হইল, কেইই গু পঙ্খল-নাই, আর হয় না, এ সব বিষয় তাহার ভাননার স্বভাব। তাতে বিবাহের পর ‘ভাইসোম’ নাই, পুনরায় বিবাহ নাই, নিকাও নাই; স্বস্ত একজন পুঙ্খক বাছাই করিবার হুয়েপা নাই, পঙ্খল করিবার যো নাই, গোপনে ছুটা আলাপ করিবার যো নাই; এমনতর স্ববহার নিরপেক্ষ উভয়-উভয়, হিন্দু-শাস্ত্রকে হিন্দুশাস্ত্রকে, বিজ্ঞান না দিয়া কদাচ থাকিতে পারেন না; বাঁখা কিছুতেই নহে।

পক্ষান্তরে, স্বস্ত জাতির দিকে চাহিয়া দেখ, চোচা আপন চটা পর, চাটার মেয়ে বিয়ে করা করেন দেখাই দিয়া পিতৃ-কল্যাণকও বিবাহ করেন। এত বাচ-চোত ও কোন জাতিই নাই। আর বিবাহে ত যুগের তদ্রূপ; ইউরোপে দেখ, কত বাছাই করিয়া কত বাছাই হইয়া, এক যুগের প্রণয়গির প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলে, দিন কতকের পর, আবার বলল, আবার নুতন, উভয়-পক্ষের নুতন; কত হুয় বল দেখি। আর বাছাইতেই কি কম হয়? ইউরোপে এই বকলী-বকলী স্বস্ত ও সচরাচর হইলেও বর হু একটা কথা জন্মায়, ব্রহ্ম

পায়জ্ঞ ত মহাহুয়। সেখানে সামগ্রিক বিবাহও প্রচলিত আছে। সামগ্রিক বিবাহের নিয়ম এই;—পথে ঘাইতে ঘাইতে কোন যুগের কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, উভয়ের উভয়ের ‘চটপ-কটকে’ ভুলিলে; উভয়ের কন্দের পতি একশেকে ছুটিল; এক পথে প্রাণান্ত হইল; গর্ভকালের জন্য উভয়েই আশ্রয়্যার হইলেন; আর কি, আর যার কোষাও; অম্মন একটা সামগ্রিক বিবাহের বদলেও হইয়া গেল, তিন মাস ছয় মাস বা এইরূপ কোন এক নির্দিষ্ট কালের জন্ত উভয়েই পরিত্রহুয়ে বদ্ধ হইলেন; আকাজকা মিটিল; পুরাতন অতৃপন্য কামিতে লাগিল; নির্দিষ্ট কালও হুয়াইল; একটা দিবারা-চুয়েল উভুয়ের পরিবর্তন হইয়া বিচ্ছিন্ন হইল। আর কের কার? উভয়েই পতন্ত; যেন কেহ কাছকে জানেও না। তারপর আবার নুতন, একি কম হুয়। কাহার কাহারও তা এই সামগ্রিক বিবাহ হইতে চির ত্রিয়ারে বদলেও হুয়।

এরূপ আনন্দের প্রবাহ আছে বলিয়াই বিবাহকে সকল দেশেই উৎসব বলে; নতুবা হিন্দুর ভায়া বিবাহ হইলে, লোক আর উৎসব ভ্রমিত না। হিন্দু কেবল মাংসার ‘শতই’ ইহাকে উৎসব বলে; নতুবা বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে কোন মতেই উৎসব বলা চলে না। ইহা মুকরুণ বর্ণিতোক্তি,—‘হিন্দুনা’ তোমাদিগের ভায়া নীরস ও একটা প্রধান হুয়ে বকিত জাতি জন্মে নাই। যদি এই বিবাহ-যুগের আদ্যক লইতে ইচ্ছা থাকে, তবে পরিবর্তন কর, নোভোভের বিবাহ প্রথা প্রচলিত না; একজন না হয়, তোমাদের বাকলী বিবাহ সকল বর্ষে প্রতিষ্ঠিত কর। না কর ত কেন করিবে না উত্তর দাও।

১। বিবাহের বিবিধরূপ বর্জন কেন?

২। বাণ্যবিবাহ প্রচলিত ও যৌন-বিবাহ নিষিদ্ধ কেন?

৩। জীলোকদিগের দ্বিতীয়াদি পতি পরিগ্রহ নিষেধ কেন?

৪। পুরুষের যখন বহুবিবাহ আছে, স্ত্রীলোকের তাহা থাকিবে না কেন? যদি স্ত্রীলোকের না থাকে, তবে পুরুষের শ্রাব্য থাকিবে কেন?

৫। একে একে ইহার দুই প্রকার উত্তর দিতেছি,—

প্রথম প্রকার, পার্শ্ববিষয়-বচিৎ, হৃদয়ঃ দুল-
দ্রুতি পূৰ্ণক-ও মনঃ।

১। উদ্বেগের আত্মশূলকার প্রথম প্রথম
বৈজ্ঞানিক ভাষারো বসন, সমাজীয় ধাতু-মধ্যমে
যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদের অধিকাংশেরই কুট
প্রকৃতি বোরতর রোগ জন্মিবাব নিমিত্ত সন্তান।
হৃদয়ঃ সমাজীয় রক্তসংশ্লিষ্ট রমণীকে বিবাহ করা
ভালো কর্তব্য নহে।

যে যে রমণী সমাজীয়-রক্তসংশ্লিষ্ট; বিবাহে
সম্বন্ধ-বন্ধন-প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারেরা তৎসমুদয় নির্দেশ
করিয়াছেন। শাস্ত্রে ইহার প্রত্যক্ষত্ব হেতু নির্দেশ
না থাকিলেও সাধেব পণ্ডিতের যেতুবা তোমাকে
কব্ধ শিরোধার্য করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমার
একটা বন্ধ যে গল্পটা আমার নিকট করিয়াছিলেন,
তাহা বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, আশানার বন্ধুর
বাটীতে আয়িয়া উপস্থিত। বন্ধুও উচ্চশিক্ষিত-জ্ঞান
আত্মবিশ্বের উপর হস্তপ্রসন্ন নহেন; আগন্তকের
সে দেখেই পুত্রীয়ভাৱে বিলম্বন। আশানার
বন্ধুর সমিত সাক্ষ্যঃ হইল; তখন বন্ধুর গণপেশে
উভর্য, পরিচয়নে কেমঃ বন্ধু; তিনি আশ করিবাব
কৃত্ত উপদেশ শ্রাবণেই গমন করিতেছেন। মাধ্যঃ
হইয়াবাম্বঃ গৃহস্থানী বন্ধু, সমাপিত বন্ধুকে সাদর
সম্ভাব্য করিয়া বসিলেন, বন্ধু এত বার বস, ছেলের
পুলে আনিতেছে, তোমাক চাকরে দিলেছে; কি
করি ভাই, কাজে বসিতে পারিতেছি না, শ্রাদ্ধ
করিতে বাইতেছি। আগন্তক বন্ধু এত উপ-
হাসের হাসি হাসিয়া বসিলেন, 'যাও আমি বিদ-
হাতেছি।' গৃহস্থানী, বন্ধুর হাসির অর্থ বুঝিয়াও কোন
কথা না কহিয়া অবচলিত-চিত্তে শ্রাবণ করিতে গমন
করিলেন।

এদিকে বন্ধু বৈঠকস্থানীয় বসিয়া চাকরের প্রণত
আলম্ব্যার তামাক সেবন করিতে করিতে, টেবিল
হইতে একখানি ইংরেজী সংবাদ পত্র, মাসিকপত্র,
বা পুস্তক (গ্রিক মনে নাই) লইয়া গাড়িতে লাপি-
সেন—বৈঠকম্বে তাহাতে ইংরেজী ভাষায় ইংরে-
জের কৃত্ত শ্রাবণ-সমালোচনা ছিল; সাধেব,
সমালোচনার শ্রাবণের কর্তব্যতা বুঝাইয়াছেন। বন্ধু
পড়িয়া থির করিলেন, শ্রাদ্ধ ব্রতটা তবো ভাল বটে।

গৃহস্থানী শ্রাবণ করিয়া আসিলে, বন্ধু বিলম্বন,
বন্ধু, শ্রাদ্ধ ব্রতটা ভাল বটে। গৃহস্থানী বন্ধুর নি-
শেন, কেনে যে, হঠাৎ মত-পরিবর্তন হইল যে?

সাধেবের লেখাটা বুঝি পড়া হইয়াছে। আমিও
সাধেবের বোহাই নিলাম; অতঃপর স্ত্রীজ্ঞা সনক-
কেই মানিয়া লব্ধ হইবে।

২। বালাকালে বিবাহ হইলে, রমণী বস্ত্র-
কলের পোষ মানে ভাল; আমদের পাটের
সংসার—পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, ভাতৃ-পুত্র-ভগি-
নের সকলেই এক পরিবার-ভুক্ত, কাজেই গৃহস্থীর
মন হাওয়াতে সমস্তত সকলের প্রতিই প্রীতি-
মূল্য থাকে, সকলেই হাওয়াতে গৃহস্থিকে ভালবাসার
চক্রে বন্ধে, তাহার বিধান বালাবিবাহ ব্যতীত
হইতে পারে না। এই জন্ম বালাবিবাহ প্রচলিত
ও যৌবন-বিবাহ নিষিদ্ধ।

৩। জীলোকের বুদ্ধি হৃদয়তঃ চকল; কি সমবাব-
হায় কি বিবাহব্যায় পতন্তর গ্রন্থ ব্যবস্থা
থাকিলে, সমাজে একটা নতুন বিপ্লবকার হৃদ-
পাত্তা থাকিত। ইচ্ছাও সমবাব বিবাহে যৌব-
সমল সমাজেই বুঝে; সলা সর্কনা সমবাবেরই পী-
বিলেব শক্ত্যর ও পীতীভাঙ্গনের জালা ভোগ করিবাব
অন্তঃকর্মনীভাৱে সকলেই বুঝে। সে ব্যবস্থা তাই কোন
সমাজেই নাই। আর বিবাহ-বিচ্ছেদের রাশি রাশি
মুকর্মনা দেখিয়াও কি কোনরূপ সমবাব লা পরিভ্রা-
ভাব বিবাহ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা হয়। যে সম-
সভা ও সন্তানসম বশে বিবাহ-বিবাহ প্রচলিত, তথায়
কমতঃ পতীর হস্তে স্বামীকে প্রান দিতে হয়,
সন্তান, সন্তিয়াও কি করিয়া বিবাহ-বিবাহের অহ-
মোদন করি।

৪। জীলোকের একটা বহুবিবাহ হইতেই
পারে না, কেননা তাহাতে সন্তানের পিতৃপুত্র হইয়া
বিবাহ ও পরাক্রান্ত ব্যক্তিরদের সম্বন্ধে হত্যা। মারা-
বার প্রকৃতি সভ্যত ব্যটিতে পারে। পুরুষের বহু-
বিবাহে ততঃপর গড়াইবার সমাবনা হইত কথা। আর
সন্তানের পিতৃপুত্র মাতঃপুত্র ত বিবাহ হইতেই পারে
না। জীলোকের বিভিন্নকালে বহু-বিবাহের সোপাও
শোভনতঃই বৃদ্ধান্ত দেখিয়া থির হয়। পুরুষের
বিভিন্নকালীন বহুবিবাহে যে সমাজে বিবাহবন্ধন
ছেদনের প্রথা নাই, তথায় সে সব দোষ অপঘণ্ড
বহিষ্ট নাই। যদিও বাটায়া থাকে, তাহা নিভান্ত
থির। না হয়, বর্ণিগণ লইয়া, জী পুত্র উত্তরোত্তর
বিভিন্নকালেও বহুবিবাহে সোপাইব; জীলোকের যেমন
বৈষ্যব; পুরুষেরও সেইরূপ বৈষ্যব। রওনাযব
কথা কটা উচিত। কিং তাহাতে এতই মহা-
ভ্রাস হইবার সম্ভব, যে ক্রমে মৃত্যুরের নাম পর্যন্ত

বিশুদ্ধ হইতে পারে। হিন্দু, মুসলমান, ইষ্টান, বৌদ্ধ,
যে জাতিই হউক, ইহাদিগের মধ্যে একটি একটী
বংশ দেখাইতে পারিবে না, যাহার অত্যাধিক অস্তিত্ব
দ্বিতীয়-পরিণয়-মূলক নহে। তাই বলি, জীপুত্র
উভয়ের সমভাব্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হইলে মহা-
জ্ঞানি এতদিন বিশুদ্ধ হইয়া বাইত। কাজেই ইহার
মধ্যে যাহার বিভিন্ন কালে বহুবিবাহে অপেক্ষাকৃত
অল্প দোষ, সেই পুরুষজাতির বহুবিবাহ প্রচলিত
করা অসম্ভব নহে।

নানা কারণে পুত্র অপেক্ষা কন্ডার ভাগ অধিক
হওয়া সম্ভব; বিশেষতঃ যদি কোন সময়ে এইরূপ
আধিকারী হয়, পুরুষের যুগপৎ বহুবিবাহ একেবারে
নিষিদ্ধ হইলে তখন অনেক রমণীকেই অবিবাহ-
হিত অবস্থায় থাকিতে হয়। এরূপ অবস্থা
অনেকে সোপাইব। পুরুষের যুগপৎ বহুবিবাহ অপেক্ষা
ও অধিক সোপাইব। কাজেই পুরুষের যুগপৎ বহু-
বিবাহও শাস্ত্রকারেরা অহমোদন করিয়াছেন। এই
বহুবিবাহ-ব্যবস্থা স্বভাব-চলণা রমণীজাতির আত্ম-
সংযমের একটা হেতুও বটে। পুরুষের অসমবাপ্ত
ব্রতচ্যুত, কোরা, মর্যাদা ও পুরুষের আত্মশো-
নিক বিবাহ এই জিবিব কারণে গৃহস্থের জীৱ অসমবাপ্ত
হইবার কোনরূপ সমাবনা ছিল না। অসমবাপ্ত
হইলেও পুরুষের আত্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা আছে।
প্রথমতঃ এইরূপ সম্ভব ব্যবহার তোমার চার আপত্তির
পণ্ডন করা হইতে পারে।

মাফী গোপাল।

পণ্ড্যঃ চলন যঃ প্রতিমাত্রারূপে
রক্তপালোহো হি শত্ৰুঃ গম্যঃ।
বশঃ যদ্যো বিপ্রকণ্ঠেহুতঃহ
তং মাফিগোপালং মহং নাতোহি যি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

জগদ্বাস মহাক্ষেত্র—পরিব্রাজক পুতী হইতে
পাঁচ কোশ উত্তরে, সত্যবর্তী নামে একটী ক্ষুদ্র
গ্রাম সমিধিত। একটী প্রব্রাজক। দেবদাসের
অবস্থান যেহেতু এই গ্রামটী প্রখ্যাত, এবং সেই
কারণ বসতিই এই স্থানের পরিভাষা সমাপিত
হইয়াছে। বসদেহ হইতে বৈ সাধারণ প্রজ্ঞা
পর্যায়পূর্বে পুণ্যার্থ পুতী যাঁহিতে হয়, সেই

প্রধান বস্ত্রের সান্নিধ্যে,—হুইপত হস্ত-পরিমিত
বাসনাবের মধ্যে কবিত দেবনিকেন্দ্রনী সমিধিত।
উড়িয়া ঐশেন্দ্রের তত্ত্ব হানোংপূর শতাব্দীর
ক্রমবিভাজ্য হইবার যে সকল ক্রম আছে, সেই
গুলির মধ্যে এই গ্রামস্থিত হাটী সঙ্গতম।
শান্তিরঞ্জন স্কন্ধ এই গ্রামে একটা ক্ষুদ্র পুণ্ড-
স্টোন সম্ভাষিত আছে। পুতী যাঁহিতে হইলে
ডাক পরিবর্তন করিবাব অন্তিম আভাষা বিহার বহু
সংখ্যক পালকীসহক এই স্থানে বাস করে। এই
গ্রামেব শত্ৰুপুণ্য পণ্যাবীকার প্রতি লক্ষ্য করিলে
স্থানীয় শত্ৰুপাণ্ডিতের বহুবা বিলম্বন-উন্নত বসিয়া
প্রতীতি জন্মে।

বিশদীর অতি সুকৃতিতঃ হৃদয়প্রসন্ন পরিভা-বোষ্ট
একটা হৃদয়স্তঃ উপাধানের মধ্যবর্তী স্থানে বৈ-
নিকেন্দ্রন সমিধিত। পুতীজাতি বহুসংখ্যক বন-বিপ্লব
ফল-বৃক্ষসমূহে পরিশোভিত। পুতী প্রবেশ ঘারে
'আত্মা' নামক সোতর ছায়াক্রান্তি বিধান সমাপিত
একটা প্রবেশসোতর অতিক্রম করিয়া এই উপান্য মধ্যে
প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটী প্রায়-মুঠ চতুর্বিংশতঃ
হস্ত (৭০ ফিট) উচ্চ হইবে। উহার সমস্ত পাঠকে
চুপ প্রবেশিত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্যাকৃতি
বিরহিত। মন্দির-প্রবেশের চারিদিক—চাঁপনি,
হুইতী হস্তশোভিত উপর সংরক্ষিত—১০০০ ইষ্টান
পর্যন্ত অত্যন্ত ভদ্রাবস্থায়, এমন নকি, পতনোদ্বুধ
হইয়াছিল। এই স্থানের অস্বাভিক পরে উহা
সংস্কৃত ও চুপ প্রবেশিত হয়। মন্দিরের আয়তন ইহা-
তে কোনপ্রকার স্থপতিবিদ্যা-বিকিত কার্যকর
নাই। কবিত প্রবেশের-বিকিত সমুদ্রে একটা
সুবিবৃত্ত সন্ধানের 'বাক্য' দেবদাসের সৌন্দর্য
বিকৃত্তঃ সমিধিত হইয়াছে। সমস্রী এক পার্শ্ব
ইষ্টানপুত্রিক বিদ্যার উর্ডাসনসমূহে পরিবেষ্টিত।
ঐগুলির উপরে আচ্ছাদনীয়রূপে একটী ছাদ সং-
স্থাপিত। এই স্থান যেমন-যেমন কল্পন-প্রসূত একটা
উপভাসিক কল্প সৌন্দর্যে পরিশোভিত বসিয়া অহু-
মিত হইয়া থাকে। দেবদাস-সংগঠিত অস্ত্রান্ত গৃহ-
নিচয় মন্দিরের পশ্চাত্তোমে সমিধিত।

মন্দির অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই
ত্রিগুণ 'মাফী-গোপাল' নামে অভিহিত হইয়া
থাকে। বসুদেহমূর্তি প্রস্তর-নির্মিত। উক্তে পাঁচ
ফিট, বৃদ্ধবাসে গড়ামান, দেহবস্ত্রের উত্তর পার্শ্ব
ইষ্টানর মধ্য ভানে দেবদাস। শ্রীকৃষ্ণমূর্তি মনে
হইলে স্বভাবতই মনঃকল্প সমূহে দূর্বল-শ্রাম-

কলধর-নটর স্রুঠাম শ্রীকৃষ্ণমূর্তি সমুদিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এই প্রবন্ধোদ্দেশিত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি খেত-পীড়পাল বা দ্বন্দ্ব বর্ণে রঞ্জিত। দেবদেব অলঙ্কারাদি পরিশুদ্ধ। পরিধান বৃত্তি এবং চাদর। ইহার দান পাশে চারিদিকের ক্রিষ্ণ অধিক পৌরকান্তি মানময়ী শ্রীমদ্বিক্রমমূর্তি বিরাজিত। মন্দিরাভ্যন্তরে দেববাহবাহারোপযোগী জ্যোতিষ বাহুশ্য নাই। কেবল একটা পর্ষদো-পরি শয্যা দূরচিত। ইহার সমীপে একটা তাপুল-করক, একখানি কাককায়দরু পিত্তপাত্র বিশেষ এবং একটা শিখানী দেবগণের ব্যবহারোপক্ষেই সংরক্ষিত। (২)

কিরূপে এই মন্দিরাদিগিত দেবতার নাম সাকী-গোপাল হইল এবং কিরূপে বা এই দেবদেবান তাঁহা হানে পণ্ডিত হইল, তৎসংক্ষেপে একটা অতীত প্রীতিপ্রাণ আখ্যান পরিকল্পিত আছে।

বহু মতাকী পূর্বে কাক্জিত্তিরামে (১) নগরের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানপণ্ডিত দুই জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। একরা ইহার তাঁরপর্ষদটন অভিনাবে উভয়ে গৃহ হইতে বিনির্গত হইলেন। গর্য, বারাদর্শী, প্রয়াগপ্রভৃতি মহাতীর্থনিচয় দর্শনান্তে ব্রাহ্মণদ্বয় সানন্দচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মনোহর পরিভ্রমণ দ্বন্দ্ববনে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় দাদশ বন ভ্রমণ ও গোবৎসাদি পরিদর্শন করিলেন। দ্বন্দ্ববনভ্রমণে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত যে সকল বোলাল আছে, তন্মধ্যে শ্রীগোপাল দেবের মন্দিরটীই সুসুহৃৎ। বহু সমারোহের সমিতি এই বিদ্যেবর মহোৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদ্বয় কেশির্ভাও ও কার্ণাটদেশ প্রভৃতির পুত-ভোগে অস্বাসনান্তে শ্রীগোপাল দর্শন করিলেন। পরে তন্ময় যমুতুল নিকটস্থ অশ্বদান করিলেন। উক্ত বিগ্রহের স্থল স্রুঠাম মূর্তি দর্শনে উভয়ের মন প্রাণ নির্মোহিত হইল, তাঁহারা আনন্দে বিচরণ হইয়া তথায় তিন চারি দিবস অতিবাহিত করিলেন। এই দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ও

অপর ব্যক্তি যুবা। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষায় যুবা দাসদাসর্গবা বিশেষ মনোযোগী থাকিতেন। দেয়ার অত্যন্ত প্রীত হইয়া বৃদ্ধ বিপ্র কনিষ্ঠ বিপ্রকে বলিতেন,—“হে বৃদ্ধক! নিয়ত আমার সেবার তব থাকিয়া ও সহায়তরূপে ইহা আমাকে অনেক তাঁহা দর্শন করাইয়াছে, এরূপ সেবা পুত্রকে করিতে পারে না। তোমার আত্মকল্যাণ ও অহ-কৃপায় কদাপি আমার এমন বোধ হয় নাই। তোমার কোন প্রকারে সম্মান রক্ষা না করিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধতায় কার্য করা হয়। অতএব আমি আমার মনতাময়ী হৃদিতত্ত্ব তোমার করে সমর্পণ করিব।”

যুবক বলিলেন,—“মহাশয়! যাহা ইহার কারণ, এরূপ অসমর্থ কণা কেন করিতেছেন? আপনিত্রিভূত কল্যাণ এবং বিদ্যাদানাদির অপরিহার্য, আর আমি বিদ্যাদানবি-বিক্রান্ত অকল্যাণ, আমি আপনায় কষ্টার উপযুক্ত পাত্র নহি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থ আপনায় সেবার তব রহিবারি, বেদেহ ব্রাহ্মণসেবা শ্রীকৃষ্ণের অতীত প্রীতিকর। তাঁহার প্রীতি সম্পাদিত হইলে ভক্তি-সম্পাদাদির বৃত্তি হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞেয় বৃদ্ধ বিপ্র কহিলেন,—“তুমি কিছুমাত্র সংশয় করিও না, আমি যির বলিতেছি, তোমাকে আমার কষ্টারত্ব দান করিব।”

তরুণ বিপ্র বলিলেন,—“মহাশয়! আপনায় স্ত্রী, পুত্র, বহুতর জাতি, গোষ্ঠী ও আশ্রয় বন্ধ-বান্ধব আছে। তাঁহারের সমস্ত ভাবিতকরে কষ্টাদান করা সম্ভবপর নহে। কষ্টদর্শি পিতা ভীষ্মকরাজ এ বিষয়ের দৌণ্ড্যমান প্রমাণরূপ। ভীষ্মকরাজের ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণকে কষ্টা সমর্পণ করেন, কিন্তু পুত্রের বিরোধে কষ্টাদানে সমর্থ হন নাই।”

ইহা প্রবণে বৃদ্ধ বিপ্র কহিলেন,—“কষ্টা আমার নিজের দন, নিজদন দান করিব, তাহাতে কোন ব্যক্তির বিরোধী হইবার অবকাশ নাই। যদ্যপি কেহ বিরোধী হয় তাহার কথা গ্রাহ্য করিব না; বিশেষতঃ কৃপাল, দণ্ডী, বা পতিত না হইলেও তোমার জ্ঞায় সুপাতি বৃদ্ধক; ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ও তোমাকে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কষ্টা তোমাকেই দান করিব। তুমি এক্ষণে অস্বীকার রক যে, গ্রহণ করিবে?”

প্রত্যহারে তরুণ বিপ্র কহিলেন,—“যদ্যপি

আমাকে কষ্টা দান করিবার একান্তই আপনায় বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই গোপাল দেবের সমীপে বাক্য প্রদান করুন।”

তখন বৃদ্ধবিপ্র শ্রীগোপালদেবের সমীপে করষোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া এরূপে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—“হে গোপাল দেব! আমি আপনায় সমীপে সত্য-ব্রহ্মনে আবদ্ধ হইয়া অস্বীকার করিতেছি যে, এই ব্রাহ্মণকে আমি কষ্টা দান করিব।”

তরুণ বিপ্রও করষোড়ে বলিতে লাগিলেন,—“স্বাহা! আপনায় আমার সাকী রহিলেন। ইহার কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটিলে আপনাকে সাক্য প্রদান করিতে হইবে।”

তদনন্তর ব্রাহ্মণদ্বয় বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তরুণ বিপ্র পূর্বমত নিয়মিতরূপে শুভকল্যাণমন্ত্রে বৃদ্ধ বিপ্রের সেবা করিতে লাগিলেন, দেশে সমুদ্রান্ত হইয়া উভয়ে নিজ নিজ আশ্রয়ে গমন করিলেন। কিছু দিবস অতিবাহিত হইলে, বৃদ্ধ বিপ্র মনোযোগে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তাঁর ব্রাহ্মণ যুবককে যে, বাক্য দান করিয়াছেন, কিরূপে সে সত্য পালন করিলেন। এই ভাবিয়া স্ত্রী, পুত্র, জাতি, বৃদ্ধি এবং বন্ধ বান্ধবাদির এ সমস্তকে আত্মনে জ্ঞানিতে উদ্যত হইলেন।

অনন্তর একবা বৃদ্ধ বিপ্র, শ্রবণমন্ত্র একত্রিত করিয়া তাঁহাদের অগ্রে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাঁহারা এই বিপ্র অগতঃ হইয়া অত্যন্ত ক্রোধমহাকরে কহিতে লাগিলেন যে,—“একর্ণ বাক্য আপনায় আর কখন সেবা আনিবেন না। নীচ কল্যে কষ্টাদান করিবে, হুল ভণ্ড হইবে এবং হেলাক সকলের নিকট উপহাস্যসাম্প হইবেন।”

বৃদ্ধ বিপ্র বলিলেন,—“তাঁর-সংকলিত বাক্য কিরূপে অন্তরা করিতে পারে? যাহা হয় হউক, আমি কষ্টাদান অবশ্যই করিব।”

এই কথা শুনিয়া জাতি কুটুম্বাদি কহিলেন,—“আমরা আপনাকে পরিভ্রমণ করিব।” স্ত্রী পুত্র-বলি, “আমরা হলাহল-পানে জীবন ত্যাগ করিব।”

বিপ্র আবার বলিলেন,—“আমি যদ্যপি কষ্টাদান না করি, তাহা হইলে এই বিপ্র সাকী আশ্রিয়া বিচার করাইবে। বিচারে আমার পরাজয় হইলে তখনই কষ্টা প্রদানে হেহ বাধ্য প্রসন্ন করিতে পারিবে না। অতঃপর আমার ধর্মও বাক্য হইবে।”

পুত্র কহিলেন,—“এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা আপনায়

সাকী, প্রতিমার চলিয়া আশা কখনই সম্ভবপর নহে, ইহাতে আপন চিন্তা করিতেছেন কেন? এ কথা আপন বর্ণের নাই, একরা মিথ্যা কথা কহিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন যে, ‘আমার কিছু ক্ষয় হই-তেছে না।’ এইরূপ বলিলেই বিবাদ করিয়া ব্রাহ্মণকে তাড়নাই দিতে পারিব।”

এবংশক্লান্ত বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ আহুতি হইয়া উঠিল। তিনি একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণে শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ‘হে গোপাল! তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যাহাতে ধর্ম রক্ষা হয় এবং আশ্রয় শ্রবণকেই না আমাকে পরি-ভ্রমণ করে, উভয় সঙ্কট হইতে আমাকে রক্ষা কর।’

যে সময়ে বৃদ্ধ বিপ্রের গৃহে এইরূপ হলুল চলাতেছে, সেই সময়ে এক দিন তরুণ বিপ্র আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সমাগত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে বৃদ্ধ বিপ্রকে নমস্কারকরিত রূতজলিপুটে মনোবন্দন করিলেন। “মহাশয়! যে, আমাকে কষ্টা দানে অসম্মত করিয়াছিলেন, কৈ এখনও যে সে বিপ্রের কোন প্রকার উদ্যোগ দেখিতেছি না, ইহার কারণ কি?”

এতদ্বিধে বৃদ্ধ বিপ্র, মৌনাবলম্বন করিয়া রহি-লেন। তাঁহার পুত্র প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে ব্যক্তি হস্তে আসিয়া কহিলেন,—“অরে রে পামর মর-না! তুই আমার ভগিনীকে বিবাহ করিবার অভি-লাষ করিয়া তোর এই বড় শপথ, বামন হইয়া চলে পশ্চাৎ বাসনা।” এইরূপ মূর্খ বাক্যাবলি শ্রবণে এবং অজান্ত প্রীতিপ্রাণ ব্যক্তি দর্শনে তরুণ বিপ্র ঐ ক্রোধ হইতে প্রবৃত্তি লাগিলেন। তদনন্তর এক দিবস তিনি প্রামাণ্য ভদ্রমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া একটা সন্ধ্যা করিলেন। সত্য সমাগত তরুণকরণ বৃদ্ধ বিপ্রকে ডাকাইয়া আনিলেন। সর্বসমীপে তখন তরুণ বিপ্র বলিতে লাগিলেন,—“হইনি আমাকে কষ্টা দান করিলেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এক্ষণে আর উহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাতে আপ-নাদের বাহা সমস্ত বোধ হয় করুন।”

ইহা শুনিয়া সভাসম্পূর্ণ বৃদ্ধ বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদ্যপি স্ত্রিণি ব্রহ্মাণীয়া ধামেন, তাহা হইলে এক্ষণে কষ্টাদানে অসম্মত হইতেছেন কেন? বৃদ্ধ বিপ্র বলিলেন,—“ভূপালনা! আমার নিদেয় প্রাণ করুন, আমি যে কখন কি বলিয়াছি, কিছুই আমার স্বার্থ হইতেছে না—

‘আরেক বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার

(১) Vido the Antiquities of Orissa Vol: II by Rajendra Lal Mitra. L. L. D., C. I. E. 1906 142 & 148.

(২) “সাকী-কারেণী” হইতে “কাক্জিত্তিরাম” হইয়াছে। এই নামকে “কালিকাচরিত”ও বলিত। প্রাচীন কালে ইহাকে “দক্ষিণকাক্জিত্তিরাম” বা “কটাপটাম” বলিত। Asiatic Researches V. L. X. v. p. 24

পুত্র প্রাণভতাসূরক সানুশে আসিয়া কহিল;—
তাঁহাদ্বারাকাল পিতার সহিত প্রচুর স্বর্থ থাকে,
পিতার মুখে অপর দুঃখ ছিল না। সেতদবশত
হইয়া এরূপ নয়সন নরায়ন হইয়া সোভন
নমস্তনম গ্রন্থ করি। কহে, তত্ত্বের সকল বন
অপহরণ করিয়াছে। পিতা কহাদিনে অস্বস্তিত
হইয়াছেন বলিয়া এক্ষণে আবার বাব উপস্থিত
করিয়াছে। আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখেন,
এই ব্যক্তি কি আমার উনিয়ার উপযুক্ত পাত?—

এই সকল কথা শুনিয়া ভদ্রমণ্ডলীর মনে সন্সার
উপস্থিত হইল। ধনলোভে ধর্মজ্ঞান-বিরুদ্ধিত
হওয়া নোকার পক্ষে অসম্ভব নহে। তখন তরুণ
বিশ্ব কহিলেন,—“হে মহাজনমণ্ডলী! প্রথা
করন, কেবল বিচারে জরাজাতের উদ্ভাই এই ব্যক্তি
এ প্রকার মিথ্যা বাক্য রচনা করিতেছে। আমার সেবা-
ভক্ত্যবস্থা প্রীত হইয়া বিশ্বের বইছায় কড়াপদে
প্রস্তাব করেন, (এই বলিয়া আদ্যোপাধ্যাত্ত মনুয়ার
বর্ণন করিলেন) তাহাতে আমি অসম্মত হই।
যে যেহে উনি পিত্ত, ধনী ও একজন মহাত্মান।
আর আমি দরিদ্র, মূর্খ ও ফলহীন ব্যক্তি; উইর
কিয়ার যোগ্য পাত্র নহি। কিন্তু দ্বিজবর, আমার
কোন ব্যাধ কর্পাত না করিয়া বলিয়াছিলেন “আমি
অবশ্যই কড়াপদ করিব, গ্রন্থ করিব অস্বীকার
কর।” এতদ্বশে আমি পুনর্বার বলিলাম যে,
এ কার্যে আপনি কোন মতেই রুদ্ধকায় হইতে
পারিবেন না, আপনার জী, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের
বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিবেন। তাহাতে
বিশ্রবর অত্যন্ত বহুসংসকারে আবার কহিলেন,—

“আমার কড়া আমি দান করিব, তাহাতে কাহারও
আপত্তি কর্ণবার অধিকার নাই, আমি তোমা
ব্যতীত অল্প কাহাকে কখনই কড়াপদ করিব না।”
মুতগতঃ ব্রাহ্মণের এই দায়ঃসম্পন্ন তাঁহাকে আমি
শ্রীমোপদেশ-সমিধান প্রতিকল্পন হইতে কহি-
লাম। বিজবর, সেই-সমীপে অস্বীকারে আত্ম
হইলেন। তখন আমিও শ্রীমোপদা জীউকে
সকল বহিগাম। হে মহাজনমণ্ডলী! আমার নিবে-
দন এই যে, শ্রীমোপদাশ্রমে আমাদে এই বাক্যের
সাক্ষী আছেন, তাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইতে
পারে না। এক্ষণে আপনাদিগের বাহা ইচ্ছা হয়
আজ্ঞা করুন।”

বৃদ্ধ বিশ্রবর বরাবরই ব্যস্তকরি ইচ্ছা যে,
তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়। এক্ষণে তখন বিশ্রবর

বাক্যাবলি শ্রবণে তাঁহার মনোমধ্যে এইরূপ কণো-
দয় হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ পরম ধ্যায়স, আমার প্রতিজ্ঞা
বাহ্যতে রক্ষা হয়, তাহা তিনি অবশ্যই করিবেন।
পুত্রের মনোভাব যে, প্রতিভার আশ্রয় করা কখনই
সম্ভবপর নহে। সুতরাং পিতা পুত্র, উভয়ের
বলিলেন যে, গোপাল ব্যাধি পূর্ণ, আমায়ন করিয়া
সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে তরুণ বিশ্ব এই
প্রতিজ্ঞা বিসর্জ্য করিতে পারিবেন। অতঃপর সভার
সমুপস্থিতি ভদ্রমণ্ডলীরা স্বাক্ষরিত একধাণি পত্র এই
মর্মে লিখিয়া রাখা হইল। এই ঘটনায় একে কেহ
উপাশ্য করিলেন এবং কেহ কেহ বা বলিলেন ঈশ্বর
দয়ালু আদিলেও আশিষ্টে পাবেন।

তদনন্তর তরুণ বিশ্ব শ্রীহরিচরণ শ্রবণ করিয়া
প্রথমতঃ শ্রীহরীদামধায় অভিমুখে বাক্য করিলেন।
খ্যাসময়ে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীমোপদা
সমীপে গমনসম্বন্ধ দণ্ডেই প্রধামানস্তর সমুদয়
বিষয় বিবৃত করিয়া কহিলেন—

“হে ব্রহ্মণশ্রেণ! হে দয়াময়! রূপা করিয়া
ব্রাহ্মণপ্রতিপদ ধর্ম রক্ষা কর। কড়া পাইব বলিয়া
মন যত যত্ন না হউক, পাছে ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা
অহ হই ও সভ্যশ্রেণে নিকট আমি মিথ্যাবাদী
বলিয়া প্রতিপদ হই, এই আমার হৃদয়। হে দীন-
বন্ধ! আমি তোমার গমন করিয়া সাক্ষ্য দিন, জামিনি
সাক্ষ্য না দিলে পাণের ভাণী হইতে হয়।”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—“হে ব্রাহ্মণ! তুমি গৃহে
প্রভাণমান কর। সভায় আমাকে স্বয়ং করিব,
আমি তোমার আবির্ভাব হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিব।
প্রতিমঃ স্বরূপে সেখানে হইতে পারিব না।”

তদনন্তর ব্রাহ্মণ কহিলেন,—“হে জগৎপতে!
আপনি ব্যাধি চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভাব হন,
তথোপা কাহারও বিবাস্য হইবেন না। এই মূর্তিতে
গমন করিয়া ব্যাধি এই শ্রীমুখ সাক্ষ্য প্রদান
করেন, তাহা হইলেই সকলে প্রত্যয় করিব।”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—“প্রতিমা চলিয়া যায়, ইহাত
স্বাক্ষ্যি ভনা যায় না।”

ব্রাহ্মণ,—“প্রতিমা হইয়াই বা কেন কথা
কহিতেছেন? প্রজ্ঞা! আপনি প্রতিমা নহেন,
আপনি সত্যং জগৎপতি দয়াময়! রূপা করিয়া
ব্রাহ্মণের জ্ঞান অসাক্ষ্য দান করুন।”

তখন শ্রীমোপদা দেব হস্তপূর্বক কহিলেন,—
“ব্রাহ্মণ! শ্রবণ কর; আমি তোমার সঙ্গে এই
প্রতিমাঃ পরগমিই গমন করিতে প্রস্তুত আছি।

তুমি অগ্রে বাইবে এবং আমি তোমার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ বাইব; কিন্তু যখন আমি চলিতে থাকিব,
তখন তুমি পশ্চাৎভিমুখে কিরিয়া চলিতে পারিবে
না, দেখিলেই আমি সেই স্থানে থাকিয়া
বাইব।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—“দেব! তাহা কি প্রকারে
সম্ভব হইতে পারে? নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে
হইলিহু অভিব্যাহিত হইবে, আমি কিরূপে জানিব
যে, আপনি আমার পশ্চাৎ অঙ্গসম্বল করিলেহে
ও একেতঃ ত্রাশ্রয় আমাকে এই কষ্ট দিয়াছেন, তাহার
উপর ব্যাধি আপনার বাইবার কোনরূপ ব্যাঘাত
জন্মে, তাহা হইলে এ জন্মের মত আমার আশা
ভরসা সমস্ত নিশূন্য হইবে।”

গোপাল জীউ কহিলেন,—“ভীত হইও না, আমি
তোমার সহিত ব্রাহ্মণের ঠায় বাসবার করিব না।
আমি যে তোমার পশ্চাৎ গমন করিতেছি, তাহার
প্রমাণ স্বরূপ সর্বদাই তুমি আমার পুণ্যের ধনি
চলিতে পাইবে। আর এক কথা এই যে, প্রত্যহ
একশের তুল্যের আর প্রস্তুত করিয়া আমাকে
অর্পণ করিবে, আমি উহা ভোজন করিয়া তোমার
মগ্ধে গমন করিতে থাকিব।”

এই সকল প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন।
গোপালের আজ্ঞা লইয়া পরদিন প্রাতে গৃহাভিমুখে
যাত্রা করিলেন। সেই যাত্রা প্রস্তরমূর্তি গোপীপদ
মনোরম, ভক্তবৎসল, গোপালপ্রীতি শ্রীমোপদা
ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন,—স্বপ্ন যুগ স্বপ্ন
যুগ যুগুর ব্যক্তিভে লাগিল। যত্নর নৃপ-ধনি
শ্রবণ করিতে করিতে বিশ্ব মহানন্দে চলিতে লাগি-
লেন। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ উৎকৃষ্ট আর পাক করিয়া
গোপাল দেবকে ভোজন করি। এবং হৃষ্টচিত্তে
চলিতে থাকেন। এইরূপে চলিতে চলিতে বহু-
দিন অতিবাহিত হইল, কোন প্রকার ব্যাঘাত
ভূমিল না। অনন্তর বিশ্ব শ্রীমোপদা দেব সহ নিজ
গ্রামের অতি সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
এই স্থলে ব্রাহ্মণ পশ্চাতে যুগ দিরাইয়া দেখিলেন,
গোপালদেব আপনান করিতেছেন কি না; সেমূর্তি
অমনি হাত করিয়া তদায় রহিয়া গেলেন। এই
রূপ যুগ দিরাইবার কারণ সক্ষেত্রীতভক্ত
চরিতামৃত এবং ভক্তমাণ্য ঐশ্বর্যচরিত্রের মধ্যে
কিঞ্চিৎ মতেভদ্র পলিগলিত হয়। পাঠকদিগের
অবগতি স্বজ্ঞা উভয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃদ্ধল উদ্ধৃত
করিয়াছি।

বাংলা,—

একরূপ।—
“হেবে মুক্তি গ্রামে আইহু যাইমু ভবন।
—তোহকের কহিমু গিঞা সাংগী আপনম।
সাক্ষ্যং না দেখিলে মনে প্রভাত না হয়।
ইহা যদি রহে তবে কিছু নাই ভয়।
একটিচি সেই বিশ্রবর সাক্ষ্যি চাইল।
হাসিয়া গোপাল দেব তাহাঞি রহিল।” (৩)
অন্তরূপ।—“আমের নিকটে আমি নুপর ছিভেরে।
বাগি সাহায্যি আর রব নাহি করে।
ব্রাহ্মণের মনে কিছু সম্বন্ধ হইল।
গোপাল না আইল বিশ্রবর চাইল।
হাসিয়া গোপাল সেই হইল রহি গেল।
গ্রামে দিয়া ছোট বিপ্র সবারে কহিল।” (৪)

ফলে ভক্তমাণ্যের মতে যুগুর মধ্যে বালুক
প্রবেশ করাতো নুপরের স্রু যুগ রব নিমজ্ঞ হয়,
তাহাতেই ব্রাহ্মণ পশ্চাতে কিরিয়া সেবেন। এবং
চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যে গোপাল বাগিই আপনম
কহিতেছেন কি না তাহা ব্রাহ্মণের জ্ঞাত ব্রাহ্মণের
কোহুল জন্মে।—অতঃ তাঁহার মনে ইহাও বিবাস্য
ছিল যে, গোপালদেব এই স্থানে থাকিয়া বাইলেও
কোন ক্ষতি হইবে না; যেহেতু উক্ত স্থান, গ্রামের
অতি সন্নিকট। এই উভয়বিধ কারণের মধ্যে
কোনটী প্রস্তুত, তাহা পাঠকগণ স্থির করিয়া লোপ-
লেন। সে বাহাই হউক, এই ঘটনাতো গোপাল
দেব ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে, “তুমি গৃহে গমন
কর, আমি এই স্থানেই থাকিব,” ইহার পর আর
বাইব না।

তদনন্তর তরুণ বিশ্ব গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ
করিয়া বৃদ্ধ বিশ্ব এবং গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলীর সমিধান
উক্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। সমগ্র গ্রামবাসী
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন। মনে
মনে জনশ্রোতঃ শ্রীমূর্তি দর্শনে দাবিত হইল।
সম্যাক্ত লোকমণ্ডলী বাস্তবিকই শ্রীমোপদা-মূর্তি
অবলোকন করিলেন—সদর্শনে সকলে অতীব প্রীত
হইলেন এবং প্রণাত ভক্তি-সংকীর্ত্তে শ্রীমোপদা-
পদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া মহোদাদে উক্ত হারি
ধনি করিতে লাগিলেন। পূর্বের ভিত্তি হয়

(৩) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপামি প্রণীত জীতভক্ত।
চরিতামৃতের পত্রিচ্ছেদ।

(৪) ভক্তীরা কব্জ রজতায়ার প্রীত এবং কৃষ্ণ-
দাস বাগীরা বাক্যায় বাগায় অধ্যয়িত
জীতভক্তমাণ্যবহ।

পতিত ভূমি মাত্র ছিল, তাহা গ্রামবাসী মাঝেই বিলিত ছিলেন। কলি অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে যে, এই কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা কাহারও মনে সন্দেহ রহিল না। "প্রতিমা চলিয়া আসিয়া যখন এই অকৃতপূরী ব্যাপার দর্শনে সাক্ষ্যই বিম্বিত হইলেন। বৃদ্ধ বিপ্র, তরুণ বিপ্রকে যে, সত্য সত্যই কল্যাণদানে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে উন্মত্ত অত্যন্ত রূহিত ছিলেন। তখন বৃদ্ধ বিপ্র আনন্দাশ্রু বিচ্ছিন্নপূর্বক প্রেম-ভক্তি-বিভার হইয়া শ্রীগোপাল পাণপথে সাদায়ে প্রণিপাত করিলেন। পূরে সর্গ সময়ে নিম্ন হুহিতা-ররকে তরুণ বিশ্বের করে মগলণ করিলেন। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যক্তির সহিত একদা নৈকট্য সম্বন্ধে স্মরণ হওয়া প্রকৃত আপনাকে ধন জ্ঞান করিতে লাগিলেন। গোপাল দেব ব্রাহ্মণদ্বয়কে কহিলেন যে, "তোমারা জন্ম জন্ম আবার কিঙ্কর হইবে। তোমাদের প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, হুই জনে বর প্রার্থনা কর।" ব্রাহ্মণ-দ্বয় তখন হস্তচিহ্নিত কহিলেন,—"যে প্রভো। ব্যাপি বরদানে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরাই এই প্রার্থনা কই, এইখানে অবস্থিত করুন, তাহা হইলে এই কিঙ্করদিগের প্রতি আপনাদের দয়া সর্বক লোকে জ্ঞানিতে পারিবে।" সেই অবধি এই ব্রাহ্মণ গোপাল দেবের সেবা করিতে লাগিলেন।

এই অলৌকিক ব্যাপার অতি ব্যয় করিয়া রাসরাজের কর্ণপাত হইল। নৃপতি সভাসম্মেলন সভ্যবাহারের উল্লেখদে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত ভক্তি ও প্রীতি-সহকারী শ্রীগোপালদেবের পূজা প্রদান করিলেন। দেবতার জন্ত তথায় একটা যুগ্ম মন্দির নির্মাণ এবং চিত্রাধিন অর্চনা ও সেবা নির্দোষিত হইবার জন্ত বহুমুখ্য গ্রাম প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে শ্রীগোপাল দেবের খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল। জন্ম এই স্থল একটা মহাতীর্থ-মধ্যে পরিণত হইয়া উঠিল।

এই বন্দনার বশভাঙী পরে উদ্ভিয়ার নৃপতি গল্পপতি-বংশীয় মহারাজ (৫) পুরুষোত্তম দেবের

(৫) রাজা রাজেন্দ্রনাথ সিংহ তাঁহার "Antiquities of Orissa Vol II" তে এই নৃপতির নাম "প্রতাপরাজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চরিত্রামতে এবং "Asiatic Researches Vol XV" তে "গুপ্তদেবদেবদেব"

সহিত কলিভিরাম-রাজহুহিতা পদ্মাবতীর বিবাহের সম্বন্ধ একপদ ধাৰ্য হইয়া যায়। কিন্তু কলিভিরাম-রাজ কোন যুগে অবতত হইলেন যে, রথযাত্রা কাশীর জগন্নাথ দেবের রথের সমুখে পুরুষোত্তম দেব বসে মার্জ্জনী দ্বারা পদ পরিহার করিয়া চণ্ডালের কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই বার্তা প্রবণ করিয়া কলিভিরামরাজ স্পর্ধা করিয়া কহিলেন, "কি আমি কি না স্বর্ঘ্যব্যশারতঃ হইয়া একজন চণ্ডালকে কল্যাণদান করিব। ইহা কি কখন সম্ভব হইবে পারে?" তাহার মনে ইহা উদ্ভিত হইল না যে, জগৎপতি জগন্নাথ দেবের প্রতি প্রণাত ভক্তি বশতই পুরুষোত্তম দেব একপদ কার্য করিতেন। ফলে কলিভিরামরাজ কল্যাণদানে "অসম্মতি প্রকাশ করিতেন। পুরুষোত্তম দেব এইরূপ অসম্মতজনকে পরিত্যাগ করিয়া সেরা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন না তিনি ঐ কল্যকে একজন প্রকৃত চণ্ডালের হস্তে অর্পণ করেন, ততদিন তাহার অপমানের প্রতিশোধ হইবে না। অনন্তর তিনি জগন্নাথ দেবের সাহায্যে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে রণজয়ী হইয়া শ্রীগোপাল দেবের আত্মাহুতের তাহাকে এবং রাজকন্যা পদ্মাবতীকে হরণ করিয়া পুর্বাতে আনয়ন করেন। একজন চণ্ডালের সহিত ঐ কল্যকে বিবাহ দ্বিতীয় জন্ত পুরুষোত্তম দেব মন্ত্রীকে আজ্ঞা দেন। একে পদ্মাবতী রাজ কন্যা, তাহাতে পরমাহুতী; হুতরাং যাহাতে একপদ কার্য সম্পন্ন না হয়, মন্ত্রী এবং অস্ত্রাঙ্ক উক্ত কর্ণচারী, তাহার জন্ত বিশেষ যত্নবান হইলেন। উইরাই এ সংক্ষেপে পরামর্শ করিয়া সেবে এক সত্ৰপায় গির করিলেন। একদা মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম, দেব মার্জ্জনী-হস্তে জগন্নাথ দেবের রথের সমুখে পদ-মার্জ্জনী-কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই সময় মন্ত্রী প্রকৃতি কর্ণচারিণ পদ্মাবতীকে লইয়া তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে নৃপতি-করে অর্পণ করিলেন। চূড়াল জিজ্ঞাস্য করিলেন,—"ইহার অর্থ কি?" মন্ত্রির সর্বকরে মৃগ্যপ্রাণ হইয়া উত্তর করিলেন,—"মহারাজ। আপনাদের আজ্ঞা, চণ্ডালের করে ঐ কল্যকে অর্পণ করা; যেহেতু আপনাকে উক্ত কার্যে নিযুক্ত দেখি-তেছি, হুতরাং আপনার করকলে এই মন্ত্রীকে অর্পণ করিলাম, রূপা করিয়া গ্রহণ করুন।" পুরুষো-

তলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পুরুষোত্তমদেব প্রতাপরাজ নামেও অভিহিত হইতেন।

ত্তম দেব আর কোন উত্তর না করিয়া সহাত-বদনে পদ্মাবতীর পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য-চরিতামৃত-প্রণেতা বলেন যে, পুরুষোত্তম দেব কলিভিরাম-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার "মাধিক-সিংহাসন" নামক সিংহাসন এবং প্রচুর ধন রত্নাদি লইয়া আইসেন। শ্রীগোপাল দেবকে অতীত সময়েও সহিত আনিয়া এই বর্তমান মনে—সত্যবাদী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। কথিত সিংহাসনটী নৃপতির শ্রীজগন্নাথ দেবকে অর্পণ করেন। রাজ-মহিষী গোপাল-দর্শনে আগমন করিয়া বহুমুখ্য রত্নরাজ্যের প্রদান করেন। মহিষীর নামিকার বহুমুখ্য একটা মুক্তা ছিল, তাহার ইচ্ছা হই যে, গোপালের নামায় ছিদ্র থাকিলে, উহা পরাইয়া দিতেন। রজনীযোগে রাজী যখন বোর নিদ্রায় অভিভূত, তখন স্বপ্ন দেখিলেন গোপালদেব তাহাকে ইচ্ছুক বলিতেছেন;—"ব্যাক্যকালে আমার মাতা আমার নামিকার ছিদ্র করিয়া বহুযত্নে মুক্তা পরাইয়াছিলেন। অব্যাপিও ঐ ছিদ্র রহিয়াছে, ভূমি আনিয়া আমাকে নিজ হস্তে ঐ মুক্তা পরাইয়া প্রীতি লাভ কর।" এই ঘটনা রাজ্ঞী নৃপতিকে কহিলেন। তদনন্তর উক্তর মন্দিরে আগমনপূর্বক মুক্তা পরাইয়া দিয়া আনন্দে মহা মহোৎসব করিয়াছিলেন।

শ্রীগোপাল দেব ব্রাহ্মণদিগের সভ্য-পালনে মহারাজা করিয়াছিলেন, বলিয়াই বোধ হয়, যেখানে এক্ষণে ঐ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত, উক্ত গ্রামের নাম 'সভ্যপাণী' হইয়াছে। নৃপতির পুরুষোত্তম দেবও তাঁহার মহিষী, গোপাল দেবকে যে সকল রত্নরাজ্যের প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ সকল এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না, উক্তা কি হইল, তাহা আমরা অবগত নাই।

শ্রীঅধোবানাহ দত্ত।

অশোক-কানন।

(১)

কর বিধকর্ম্মা, কানন সুন্দর, পশিও তপ্যায়, প্রাণি জুড়াইতে ভূমিবারে মঙ্গলারের জর।

মাছুষের সনে, রবনাঙ্ক আর, মাছুষের মনে, কানিথ কানিথ, চিত্র মৌর মাতত কানর।

(২)

এ জীক-প্রবাহ, শুভ্র দাবদাহ, অনন্ত বেদনা পরসে সবাই তজিবারে তাই ইহা চাই।
কর বিধকর্ম্মা, বিজন কানন, বিস্তার তাহার শব্দে জোজন, প্রাণভরে ঘুরিবারে পাই।

(৩)

পাহাড়ের শ্রেণী অরবাব্যাপি, রবে শত শত তুল-আচ্ছাদিত, শাল শোভন মনোহর।

সমতল হতে, বিস্তার বিশাল, চম্পক চলন, হিষ্টাল তরাল, কদম্ব অশোক তরুণ।

(৪)

শ্রীধী-পাতায় শন শন বনে, পবনে প্রচুর করিবে আশ্রয়, নিরবিধি সে বন শুনিব।

যে চিত্তার শিখা মাতত ছায়ে, যেথা বাই সেখা সাধ সাধ কিয়ে, বিজনে তাহারে নিভাইব।

(৫)

অতপার তরে তা বদিনা কা, কদম্ব, মল্লিকা কটক কানন, সদা তপ্ত দিনকর করে।

তরুণতা পল্ল-পঙ্খী নাহি রবে, তপ্তগালি ল'য়ে পথন বহিবে, থাকিবে পথন অকাতরে।

(৬)

মাছুষের সনে চাহিনা শুধ, ইহা হতে আমি হুখ ভালবাসি, নিরঞ্জে একাই ভূমি।

কানিধা আর কারো ভরে আমি, কানিধা কারো এই মন আশ, একে একে সকলি ভূমি।

৩ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।



রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনী।

যে শক্তিশালী পুরুষ সাহিত্য-সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহার সম্ভার সর্বদাই সমান। সাহিত্য-আলোচনাই “জন্মভূমি”র প্রধান লক্ষ্য-স্থল; হস্তান্তর সাহিত্য-সেবকের সম্মান “জন্মভূমি”তে সর্বদাপেক্ষা অধিক হইবে। বিশাল সাহিত্য-সম্ভার ঘাঁহার নিকট রূপে “আবজ্ঞ, “জন্মভূমি” তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। দ্রুত শক্তিশালী সাহিত্য-সেবকের সহৃদয়ে “জন্মভূমি”র স্থল যে অতিশয় ব্যথিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য-

মাত্র। ৩ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এ. বীন-হান বঙ্গের একজন আদ্যম শক্তিশালী সাহিত্য-সেবক, হাবিষ্ক সমীচীন সাহিত্য-সমালোচক এবং আভিত্য প্রতিভাসম্পন্ন প্রায়তকবিশিষ্ট ছিলেন। বঙ্গের দুর্ভাগ্যে বিনা ১১ই প্রাপ্ত বয়সের রাজি ১৮টা সময় রাজি ১৮ নম্বর “মাণিকতলার বাগীচে” এই অপরূপা ভাব্যবান পুরুষ ইহলোক পরিভাগ করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি প্রথম পঞ্চাষাত বোগাক্রান্ত হন। যোবার জীবনের আদৌ আশা ছিল না। ঈশ্বরের রূপায় কিঞ্চিৎ সে যাত্রা ইনি রক্ষা পান। ইহার পর ইহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। শরীর

ভাঙ্গিল রটে, পরিশ্রমের কিছু বিরাম ছিল না। এই ক্রম মধ্যে মধ্যে ইহাকে পঞ্চাষাত এবং জরুরোগের আক্রমণে কষ্ট পাইতে হইত। গত ৭ই প্রাপ্ত বয়স-বার প্রাতঃকালে প্রবল জর ইহাকে আক্রমণ করে। মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত এই জর প্রবল ছিল। জর-ত্যাগেই প্রাপ্ত-বয়স নিঃসৃত হয়। শনিবার প্রাতে প্রায় ১০টা টার সময় নিবাস-প্রাঙ্গণে নিদ্রাক্রম কষ্ট হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একবার কষ্টের লাগ্নব হয়রাছিল বটে, কিন্তু পরদিন পর্যন্ত সে কষ্ট ছিল। রবিবার বেলা প্রায় ১ টার সময় আবার সেই বাতনা উপস্থিত হইল। রাজি ১৮টা পর্যন্ত এই ভাবেই ছিল। আশা আশা রহিল না। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব এবং পুত্রবয়সের নিরাশ-স্থল উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সকলেই তখন শোক-হ্রস্বে মুগ্ধমান হইয়া পড়িলেন। হাংকান-জন্মন-রবে চারিদিক পূর্ণ হইল। যেখানে দেখিতে বঙ্গের অতুল কীর্তিমান রাজেন্দ্রলাল প্রাণ বিসর্জন করিলেন। হিমালয়ের তুষ্প্রস্থ দল-গিরি ধমিয়া পড়িল।

যে শুভে রাজেন্দ্রলালের এত ব্যাধি-প্রতিপত্তি, সে শুভ ইহ-সংসারে এখন সুদূরগত। তাঁহার যে শুভের কথা শ্রবণ করিয়া, আজ বহুসংখ্যক ভারত-বাসী শোকাচ্ছন্ন, বিদেশী-বিজাতীয় শিখিত সস্ত্র-দায়ও তাঁহার সেই শুভে বিমুগ্ধ হইতেন। রাজেন্দ্রলাল যে ভারতের একজন আভিত্য প্রস্তুতকবি, অনেক বিদ্যাভিমানী বিদেশীও সে কথা মুহূর্ত্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহার গভীর গবেষণাবলে যে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বাক্যপটুতার প্রসিদ্ধিও অবিসংবাদী। ইংরেজি-লিপিভাষ্যের প্রশংসা, জ্ঞানপরায়ণ বড় বড় শিল্পী-বিদ্যান ব্যক্তিগণের মুগ্ধও বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকে। তিনি বিজাতীয় ভাষার ন্যূনতম হইলেও মাতৃভাষার বীজন্ত ছিলেন না। এইজন্যই বাঙ্গালীর কাছে তাঁহার এত আদর। এইজন্য আমরাও তাঁহার প্রতি এত ভক্তিমান।

ইহার শুণ-গ্রাম সর্বত্রই পরিচিত। পুণ্ডিয়ার যেখানে সাহিত্যের আদর আছে, সেইখানেই ইনি সমীচুত, ইহা কি বঙ্গের কম গৌরবের কথা। পুণ্ডি ব্রাহ্মণা ঘাঁহার ব্যাভি-বিস্তৃতি; তাঁহার সহৃদয়ে আজ কে না কাণিবে। “জন্মভূমি”র প্রত্যেক পত্র আজ অশ্রু-প্লাবিত।

মৃত সাহিত্য-সেবকের জীবন-সমালোচনা, সাহিত্য-প্রতিকার যেমন একান্ত কর্তব্য; সেই

পুরুষকে চিরকাল সাহিত্য-সেবক-সম্প্রদায়ের চক্ষের সমুপে আঁকিত করিয়া রাখাও, তেমনই আবশ্যক। এই জন্যই ৩ রাজা বাহাদুরের সেই শিব-সিদ্ধোত্তম-স্বোত্তীর্ণ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠিত এবং সেই একটিট হইল। সাহিত্যসুরাগী পাঠক। একবার ঐ প্রতিষ্ঠিত দেবীয়া লইয়া ধ্যানে ব্যরণা করুন।

জীবনী-সমালোচনা লোক-শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। ৩ রাজা বাহাদুরের জীবন-সমালোচনা ব্যক্তির জীবনী-সমালোচনায় অনেক শিবিবার আছে। কিন্তু হাবিষ্কর জীবন-সমালোচনার এ সময় নহে। হুত-কলেশ্বর জন্মভূমিতে সে স্থানও নাই। তবে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বাহা সংগৃহীত হওয়া এখন সম্ভবপর, তাহাই সংগ্রহ করিয়া খণ্ডাসম্ভব সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, এমন কোন ব্যক্তি শ্রীজি হাবিষ্কর সমালোচনার ভার গ্রহণ করিবেন, এ আশাও আমরা পাইয়াছি। সর্বসিদ্ধিভাষা গণপতি তাঁহার কাণি সিদ্ধি করুন, আমাদের ইহাই এখন কাম্যমত-বাক্যের প্রার্থনা। কীর্ত্তিমূল্যী বসুওয়েল, জন্ম-সময়ের জীবনী লিখিয়া সাহিত্য-সংসারে যেমন প্রতিপত্তিশালী হইয়াছেন; যিনি রাজেন্দ্রলালের জীবনীর হাবিষ্কর সমালোচনা করিবার ভার গহিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তিনিও তেমনই কীর্ত্তিমান হউন।

আমরা সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বাহা প্রকাশ করিব, তাহাতেও মূলত: অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারিবে। সংসার-ক্ষেত্রে হৃদয় চরিত্রবলে এবং ঐকান্তিক অধ্যবসারে মানুষ কিরূপে কতদূর উন্নীতে পারে, ৩ রাজা বাহাদুরের এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তন্মাত্র করুণকটা যে উপলব্ধি হইতে পারিবে, এমন আশা করা যায়। পুরুষকারের প্রোজ্ঞল বৃত্তান্ত এবং অচ্যুতের অশ্রুস্তম্ভী কলাফল-নিয়োগ এই জীবনীতে অত্যন্তভাবে লক্ষিত হইবে।

পূর্বে-জন্মের প্রকৃতকালে ৩ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র আটানতম মাত্রা জন্ম-কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কায়স্থজ হইতে বঙ্গের রাজা আদিশ্বর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, কালিদাস মিত্র তাঁহাদের অন্যতম অচ্যুত ছিলেন। ৩ রাজেন্দ্রলাল এই কালিদাসের চতুর্বিংশ-অন্ততম বংশধর। ৩ রাজা বাহাদুর স্বয়ং যে বংশ-ভালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, এইখানে আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম;—

কালিদাস মিত্র

শ্রীর

হৃদি

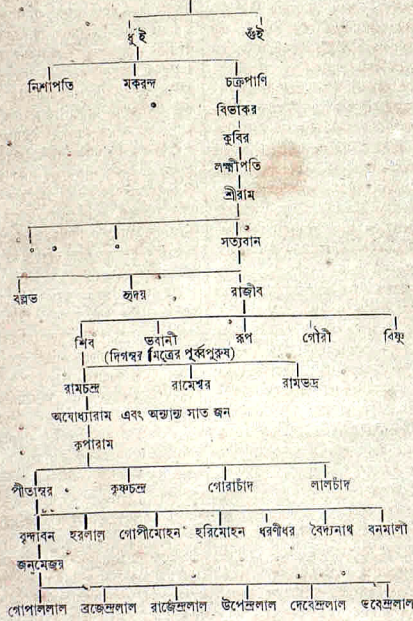
মোহরি

হরি

দেব

বংশ

মৃত্যু



কালিদাস মিত্রের পঞ্চদশ অবন্তন বংশধর সত্যবান মিত্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরিনা গ্রামে আদিয়া বাস করেন। ইহার পূর্ষ পিতৃপুরুষগণ কখন ক্রিপণ অবস্থায় কোন্‌ স্থানে অবস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। ইহার বংশপরম্পরা "পরিসার মিত্র" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। এই বংশের কেহ কেহ হুগলী জেলার অন্তর্গত কোমগরে গিয়া অবস্থিত করেন। ইহারাই বংশক্রমে "কোমগরের মিত্র-পরিবার" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কলিকাতা বাহা-পুত্রের ৩ রাজা সিগম্বর মিত্র এই পরিবারের কীর্তিমান বংশধর। ক্রমে কোমগরের মিত্র-পরিবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। এই মিত্র-পরিবার কোমগর হইতে প্রথমতঃ কলিকাতার অন্তঃপাতি বোম্বাইপুর; তাহার পর মেছুয়াবাজার এবং তৎপরে সহরতলা স্ট্রাড গিয়া বাস করেন। ৩ রাজা বাহাদুর এই স্ট্রাড জন্ম পরিগ্রহণ করেন।

এই মিত্র-পরিবার চিকাগো সম্রাট বংশ বলিয়া পরিচিত। কালিদাস মিত্রের অষ্টাদশ বংশধর ৩ রামচন্দ্র মিত্রের সময় এই বংশের সম্মান-পৌরব সর্বত্র সংবদ্ধিত হয়। রামচন্দ্র মুন্সিফাবাদ-নবাবের পাওয়া ছিলেন। তৎপুত্র অযোধ্যা-রাম মিত্র, পিতার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "নবাব বাহাদুর তাঁহারকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

অযোধ্যারামের পৌত্র পীতাম্বর মিত্রের সময় মিত্র-পরিবারের প্রসিদ্ধি সর্বত্র সীমায় উন্নিত হইয়াছিল। পদ-সম্মান-পৌরবে তিনিই যেমন বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বে তেমন আর কেহই করেন নাই। পীতাম্বর ১৮৬৯ শকের ৩১ আষাঢ় মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি দিল্লীর দরবারে অযোধ্যা-নবাবের উল্লী ছিলেন। পরে তিনি স্বকীয় অতুল অধ্য-বসার শুভে এবং বিপুল বুদ্ধিবেগে খাস-দিল্লীর দর-বারেই অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। এইখানে ইহার "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ হয়। কেবল তাহাই নহে, স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট তাঁহারে "সে-হাজির-নাসব" অর্থাৎ তিন হাজার অবারোহী সৈন্তের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা বাঙ্গালীর অসম্ভাবিত পদোন্নতি। এই পদের অতুল-সম্মান "দশ-হাজারী" অর্থাৎ দশ হাজার অবারোহীস অধিনায়কত। রাজচক্রবর্তী রাজ-

রাজেশ্বর-বংশসম্বৃত রাজপুত্রেরা এই দশ-হাজারী পদ পাইতেন। পীতাম্বর দোয়ারের অন্তর্গত কড়া জেলায় পুণ্যোপা ভাইগীর প্রাপ্ত হন। তিনি এবং তাঁহার দুই ভাতা "রাজা" উ পার্শ্বস্থানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৭৮১ খ্রষ্টাব্দে ৩ বারানসী ধামে চেতসিংহের সময়ে যখন জেনারেল পামার রামনগর আক্রমণ করেন, তখন রাজা পীতাম্বর উপস্থিত থাকিয়া ইংরেজের স্ত্রীকে উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্রিঃ ৮৮ সালে পীতাম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতায় আগিবার সময় তিনি অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে আপন প্রাপ্য নগদ নয় লক্ষ টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় আগিবার পর তিনি পরসারক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করেন। বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিবার পর তিনি মেছুয়াবাজারের পারিবারিক বাড়ী পুরিত্যাগ করিয়া স্ট্রাড গিয়া বাস করিতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এইজন্তই এই মিত্র-বংশ আজিও স্ট্রাড রাজা বলিয়া বিখ্যাত। এইখানে ভাবানু শ্রীকৃষ্ণের শীলাবাগ্নক নানা উৎসব-মহা সমারোহে সমাহিত হইত। আজিও স্ট্রাড রাস সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ১৮৬৬ খ্রষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কড়ার জায়গীরের বাৎসরিক আয় ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। মহারাষ্ট্রের মুক্তের সময় এই জায়গীর নষ্ট হইয়া যায়।

পীতাম্বরের পুত্র ৩ বৃন্দাবন মিত্র অষ্টবংশধো অনেক সম্পত্তি নষ্ট করেন। তিনি মিতব্যরী ছিলেন না। পরের "পায়ে দাশী" হইয়াও তাঁহার অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে। দুই বার দুই জনের জামিন হইয়া তাঁহারে ১৮১২ লক্ষ টাকা গিলে হইয়াছিল। এই দুঃসময়ে মেছুয়াবাজারের পারি-বারিক বাড়ী বিক্রীত হইয়া যায়। বৃন্দাবনচন্দ্র ছয় মাসের জন্ত কটকের কলেজীরাতে পাওয়া ছিলেন। কালীর রাজবাটী লুণ্ঠনের সময় পীতাম্বর যে প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থাদি আনিয়াছিলেন, বৃন্দাবনচন্দ্র দ্বারা তাহা সবটুকুই সুরক্ষিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের অনেক এখনও ঐ স্ট্রাড রাজবাটীতে পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনের পুত্র জনমেজয়। জনমেজয় কোন রাজচক্রবর্তী বঁকার করেন নাই। তিনি পারত এবং সংস্কৃতভাষায় হুয়ুৎপন্ন ছিলেন। তিনি অনেক পারত গীত (পঙ্কল) এবং সংস্কৃত ভাষা প্রকাশ

• ফুল কথা, যাঁহা যাঁহল, তাহা আর আসিবে না।
রাজা রাজেন্দ্রলাল যে সিংহাসন শূন্য করিয়া গেলেন,
তাহা আর কখন পূর্ব হইবে কি না, অন্তর্ধামাই
জানেন।

নেপোলিয়নের নির্বাসন।

ওয়াটার্লু'র দারুণ ক্ষেত্রে সৈন্যবিক্রমিকগণকে হতমৈত্র হইয়া সম্রাট নেপোলিয়ন, ক্রাসের রাজধানী পারী নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত। রজনী অন্ধকার। পথিপার্শ্ব আলোক সলিল নির্বাপনোদ্ভূত। এমন সময়ে নেপোলিয়ন 'ইলাইন' নামক রাজপুত্রকে প্রবেশ করিলেন। অবিরাহীণী-তলে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধ ও সচর কলনকোটি তাঁহাকে অতর্কিত করিলেন। অতিশ্রমে, অতিশ্রমে ইউরোপের রাজস্বাস্থ্য, তখন অতিমাত্র অবসর। তাঁহার বও-বেশ বহুদূর ও বিস্তৃত, মুখশ্রী মলিন ও নিশ্চিন্ত, পদযাত্র যেন দেহভার বহন করিতে আর পারিতেছে না। সম্রাট একখানি সোকার উপর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। বহু হস্ত স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে-কাস-কসে বলিলেন,—“এইখানে বড় বেদনা। আমার সৈন্যগণ বলবিক্রমের একশেষ প্রার্থনা করিয়াছিল। রথক্ষেত্রে তাহারা যাহা করিয়াছিল, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। তাহারা যুদ্ধে পারত তত্ব হয় নাই; অসংখ্য শত্রুর চাপে নিশ্চিপতি হইয়া গিয়াছে। আমার রক্ষিসৈন্য-সকল (Guard) ক্ষত বিক্ষত, শোণিতপ্লুত, শত আঘাতে আহঁত হইয়া একে একে প্রাণত্যাগ করিতেছে, এক জনেরও জন্মও কেহ প্রার্থনা মতান্তা করে নাই, এক জনও একটীয়া প্রাণভিক্ষা করে নাই। তাহাদের যত উত্তরা কেবল আমারই জন্ম। বাহ্যবীর তাহারা আমার নিকটে চাচিয়া কেবল বলিয়াছে, ‘মহাশয়, সদিয়া যাইউ। সদিয়া যাইউ। দেহিতেছেন না, বহু আপনাকে পরিহায্য করিতে কৃতসম্বন্ধ।’ এই বক্তব্য আমি বাহ্যতে আহত না হই, তজ্জ্ঞ আমাকে বেঁটন করিয়া তাহারা একে একে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হায়! হায়! আমার অমিত-সাহসী, অমিত-পরাক্রম, চিরবিজয়ী গার্ড নিশ্চয় হইল, আর তাহাদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হইল না।”

কলনকোটিতে বিদায় দিয়া ক্রিস্টিয়ান বিশ্রাম করিবার জন্ম নেপোলিয়ন ব্রিস্টিয়ালে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিশ্রাম করিবার তখন আর সময় নৈব ক্রাসের সর্বদল উপস্থিত। সময়েই ইউরোপের অসংখ্য সৈন্য পারী-লরায় অধিবেশন করিতে। আর এক সপ্তাহের মধ্যে তাহারা রাজ-

ধানীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। নেপোলিয়ন বিশ্রাম করিতে পারিলেন না। ওয়াটার্লু'র দারুণ রথক্ষেত্রে এবং ক্রাসের আসন্ন সর্বদল তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল। তিনি কলনকোটিতে পুনরায় ভাবিয়া বলিলেন,—“ওয়াটার্লু'র রথক্ষেত্রে যে আঘাত আমি পাইয়াছি, বেশ অশ্রুত করিতেছি যে, তাহা আমার পক্ষে সামাজিক। শত্রু-সৈন্য যদিও আমাদের অপেক্ষা সংখ্যাগত চতুর্গুণ ছিল, তথাপি আমি যে সকল সত্য ও রণকৌশলের ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে নিশ্চয় আমার শত্রুসৈন্য নিশ্চয় করিতে পারিতাম। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক যুদ্ধেই যুদ্ধের প্রাকলম আমানিককে পরিভাষণ করিয়া শত্রুর দলে গাওয়ায় আমাকে সকল বন্দোবস্তই পরিবর্তন করিতে হইল। যেকোন ঠাকুরকিন্দে আমাদের সৈন্যগণ বহুত করিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই; তথাপি আমার পান-ভাই হইলাম। এক্ষণে উত্তর চেম্বার* একজিত করিয়া আমাদের এই দল বিংশপাতের বিস্তারিত বিবরণ তাহাদের সমক্ষে সরল ভাবে বিবৃত করিয়া দেশের রাজ্য উপরে জন্ম প্রার্থনা করি। তার পর আমার যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যাবর্তন করি।”

পারী নগরী তখন ভীত, ত্রস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ইউরোপের নানাদিগ্ধ হইতে দশ লক্ষ যোদ্ধা রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত; ফরাসী জনসাধারণ যে আতঙ্কে বিকল হইবে, ইহা কিছুই বিজিত নহে। এদিকে নেপোলিয়নের শত্রুগণ প্রকৃষ্ট বলিতে লাগিলেন যে, “ইউরোপের সমস্ত রাজত্ববর্ণও কেবল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ-ধোঁয়া করিয়াছেন। তাহারা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ক্রাসের সহিত তাহাদের কোন বিবাদ নাই। আমরা যদি নেপোলিয়নকে পরিভাষণ করি, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই আমাদের উপর প্রীত হইবেন এবং ক্রাস আক্রমণ হইতে বিরত হইবেন। তার পর আমরা নিজেই ইচ্ছামত, হয় বৃত্তন সম্রাট মনোনীত করিব, নয় সাধারণ-জ্ঞ রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিব।” কিন্তু ফরাসী প্রজাসাধারণ আপনাদের রাজা আপনারা গভক করিয়া লইয়াছিল বলিয়াই ত তাহা-

* এক কুবীন-সভা (Chamber of Peers) যার এক প্রতিনিধি সভা (Chamber of Deputies) এই দুই সভা কক্করী ইংল্যান্ড পার্লামেন্টের (House of Lords) এবং (House of Commons) এই দুইটি।

সের উপর ইউরোপীয় রাজগণের যত রাগ। এ কথা তখন তাহারা কেহই মনে করে নাই।

কাউন্সিলের সম্মুখীন হইয়া নেপোলিয়ন ওয়াটার্লু'র দারুণ বিংশপাতের কথা নেপোলিয়নের বিবৃত করিলেন। তার পর অতি ধীরভাবে সকলকে বুঝাইলেন যে, ক্রাসের জনসাধারণ যদি উত্তেজিত ও প্রবল হয়, তাহা হইলে এখনও শত্রুসময়ে কৃতচেষ্টা হইতে পারা যায়। কিন্তু এবিষয়ে সল-লাতা লাভ করার পক্ষে ইহা নিতান্তই প্রয়োজনীয় যে, সকল কার্যই তৎপরতার সহিত করিতে হইবে। তৎপরতায় বাতির সময় নষ্ট করিলে সকল কিছু নষ্ট হইবে। ক্রাসের এই দায়িত্ব কর্ত্বিনে জাতীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। দেশের মঙ্গলের জন্ম এ সময়ে আমার হাতে অসীম ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন, নতুবা তৎকর্ত্বিনে সময় নষ্ট হইবে, দেশ রক্ষার জন্ম কিছুই করিয়া উঠিতে পারা যাইবে না। এই ক্ষমতা উভয় দেশের একব্যকো আমাকে অর্পণ করিলেই ভাল হয়।

কিন্তু নেপোলিয়ন ভুলিলেন যে, দেশেরয়ে তাহার প্রতিকূল মতেরই প্রাধান্য। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাহারা কি চায়? আমি সিংহাসন ত্যাগ করি, এই কি তাহাদের অভিপ্রায়?”

বেদনায় অতি বিষম-চিত্তে বলিলেন,—“তাহা ইচ্ছা করিয়া তাহারা চায়। আপনি ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ না করিলে তাহারা আপনাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য করবে।”

নেপোলিয়ন অতিমাত্র হুঃখিত হইয়া বলিলেন,—“ক্রাসের প্রকৃতিপূজ ইহাঙ্গিকগণ যে আপনাদের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিল, সে আমাকে সন্মত করিবার জন্ম—আমার প্রতিকূলতা করিবার জন্ম নহে। ক্রাসের সৃষ্টিকার শত্রুসৈন্যকে উপস্থিত দেখিয়া ইহাদের শব্দেবের মায়ী জ্ঞাত হয় না। ইহারা কি হতভাগ্য! ইহারা বাহাই কেন মনে করুক না, জনসাধারণ এবং সৈন্য আমার স্বয়ংস্বত ও বনবর্তী থাকিবেন। আমি একটীমাত্র মুখের কথা বাহির করিলে, একটীমাত্র ইঙ্গিত করিলে ইহাদের ক্রুদ্ধিত্ত্ব দেখাও থাকে। এই স্বার্থপর নিরোপ-দিশের জন্ম ক্রাসের যে কি সর্বদল হইবে, তাহা আমি বেশ পরিচিত পারিতেছি। বাহা হইক, আমি বিবেচনা করিব। আমি আবশ্যক হয়, সিংহাসন ত্যাগই করিব।”

ইহাঙ্গিক-রাজপ্রাসাদের নেপোলিয়ন অবস্থান করিতেছিলেন। নিশাগমে রাজধানীর জনসাধারণ

দলে দলে সেই দিকে আসিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই জনস্রোত ক্রীত হইতে লাগিল। সংস্কৃত সাধারণ সেই জনতা হইতে নৈম গণন নির্দীর্ণ করিয়া অশনি-নিম্নদেবের দ্বারা সম্রাটের জয়গান উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা তখন আপনাদের দেশে বুঝাইলেন যে, ক্রাসের জনসাধারণ যদি উত্তেজিত ও প্রবল হয়, তাহা হইলে এখনও শত্রুসময়ে কৃতচেষ্টা হইতে পারা যায়। কিন্তু এবিষয়ে সল-লাতা লাভ করার পক্ষে ইহা নিতান্তই প্রয়োজনীয় যে, সকল কার্যই তৎপরতার সহিত করিতে হইবে। তৎপরতায় বাতির সময় নষ্ট করিলে সকল কিছু নষ্ট হইবে। ক্রাসের এই দায়িত্ব কর্ত্বিনে জাতীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। দেশের মঙ্গলের জন্ম এ সময়ে আমার হাতে অসীম ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন, নতুবা তৎকর্ত্বিনে সময় নষ্ট হইবে, দেশ রক্ষার জন্ম কিছুই করিয়া উঠিতে পারা যাইবে না। এই ক্ষমতা উভয় দেশের একব্যকো আমাকে অর্পণ করিলেই ভাল হয়।

কিন্তু নেপোলিয়ন ভুলিলেন যে, দেশেরয়ে তাহার প্রতিকূল মতেরই প্রাধান্য। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাহারা কি চায়? আমি সিংহাসন ত্যাগ করি, এই কি তাহাদের অভিপ্রায়?”

বেদনায় অতি বিষম-চিত্তে বলিলেন,—“তাহা ইচ্ছা করিয়া তাহারা চায়। আপনি ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ না করিলে তাহারা আপনাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য করবে।”

নেপোলিয়ন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি যে নেপোলিয়নগণের যে, সমগ্র ক্রাস এক-সময়ে এক-প্রাণে কার্য না করিলে, এই অসংখ্য শত্রুসৈন্য হইতে ক্রাস-রক্ষার আর উপায় নাই। তিনি বলিলেন,—“আমি কি একজন কৃষ্ণ দলপতি? ভায় নিশ্চয় গৃহবিধাঘের অনল প্রজালিত করিব? তুমি গিয়া বহু প্রতিনিধিগণকে তাহাদের ভ্রম বুঝাইয়া দাও। তাহারা আমার অস্বকর্ত্বী-হইলে এখনও আমি দেশ রক্ষা করিতে পারি। তাহাদের সহায়তা ব্যতীতও আমি আমার নিজের জন্ম অনেক সুবিধা করিয়া লইতে পারি, কিন্তু মনে এক-মত এক-প্রাণ না হইলে, এ দারুণ বিপদে দেশ-রক্ষা হইবে না। অর্মি জানি যে, আমার একটীমাত্র ইঙ্গিত পাইলেই এই শিল্পোদ্ধার জনসাধারণ এই নওই তাহাঙ্গিককে নিশ্চয় লক্ষ্য করিলে—তাহাদের এক জনের স্বক্কেও মস্তক থাকিবেন না। কিন্তু আমার নিজের জন্ম একজন ফরাসীরও শোণিতপাত হয়, ইহা বন্দনই

আমি ইচ্ছা করি না। রাজধানী শোণিতে তাসা-ইতে আমি ত এতদ্বা দীপ হইতে কিরিয়। আমি নাই।”

এদিকে রাতে (২১শে জুন) সংবাদ আসিল, চমিশ হাজার সৈন্য লইয়া, শত্রুসৈন্যের হাতে এড়াইয়া, মার্শাল গ্রাউন্ড ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ওয়াটসনও লক্ষ্যাবশেষ আর-চমিশ হাজার মার্শাল দে ও জেরোম বোনাপার্টের অধীনে সীমান্তে সমবেত হইয়াছে। নিরুতবর্তী হানসবন্দ হইলে আর লক্ষ হাজার হুম্মিকিত ও হুম্মিকিত সৈন্য সীমান্ত ও সীমান্তের রক্ষা করিবার জন্ত রাজধানীতে আসিয়া হাজির। উদ্ভাতীত, যে শোকারবা রাজ-ক্রাসদে বেষ্টন করিয়া নিবারণ-অস্ত্রের ক্ষম কোলা-হল প্রদর্শিত, অধারসেই তাহাদের মধ্য হইতে পৃথক হাজার পৃথক, মরিতে কৃতান্তর যোদ্ধা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নেপোলিয়ন এ সংবাদ প্রতিনিধিগণের সন্নিহিত পাঠাইয়া দিলেন। বাগদা পঠাই-ইলেন—এখনও যদি তোমরা আসিয়া সমিতিত যোগদান কর, আমি শত্রুহস্ত হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিতে পারি।”

প্রতিনিধি-সভা ভয়ে দিশাহারা হইল। সভা-মধ্যে মধ্য হলস্থল পড়িয়া গেল। সকলেরই আশঙ্কা হইল, তবে সুবি নেপোলিয়ন সিংহাসন পরিভ্রমণ করিবেন নহ; কিন্তু অনেকেরই জানা ছিল যে, নেপোলিয়ন ফ্রান্সে জন্ত অনেক তাপ স্বীকার করিবেন। অনেক তর্কবিতর্ক, অনেক বাহ্যিকাবশেষ পর তাঁহাকে বলিয়া পাঠান হইল যে, এ যুদ্ধ ফ্রান্সের তাদৃশ স্বার্থ নাই। ইউরোপের সম্মিলিত রাষ্ট্রগণ যোদ্ধা করিয়াছেন যে, তাহাদের এ যুদ্ধ কেবল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে, ফ্রান্সের সন্ধিত তাহাদের কোন বিরোধ নাই। ফ্রান্সের দারুণ সমরালয় হইতে বন্ধা করিবার জন্ত, স্বদেশের মঙ্গলের জন্ত, নেপোলিয়ন যদি আত্মসমর্জন করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে ফ্রান্স অচিরে এবং সম্বন্ধেই শান্তিলাভ করিতে পারে।

যাহারা এই কথা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা-দিগকে নেপোলিয়ন অতি অমারিক ভাবে বিদায় দিলেন। ইহাদের সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহাতে কার্কেতে ছিল পণ্ডিত ছিল না, অপ্রসন্নতার লেশমাত্র ছিল না। তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, এ প্রস্তাবের উত্তর স্পষ্টই পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে, নেপোলিয়ন

বলিলেন,—“মনে করিয়াছিলাম, ইহারা সকলে একমত হইয়া স্বদেশ-রক্ষার আমার সহায়তা দিবে, তাহা হইলে, তাহা হইলে এ বিপদসাগর হইতে আমাদের উদ্ধার করিতেও পারি। যে বল এখনও আমার হাতে আছে, এই গৃহবিচ্ছেদ-নিমিত্ত তাহারও সম্যক ফল পাওয়া সম্ভব। একা আমি কি করি? ফ্রান্স রক্ষা হইবে না। দেশের লোককে বুঝান হইতেছে যে, মরির পক্ষে, শান্তির পক্ষে, অন্তরায় কেবল আমি। এ জন্ম অপদোষন করিবার সময় এঞ্জেণে আর নাই। আমার আত্মসমর্জন তাহার চায়ে; তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি। গৃহবিধোয়ের অনল জালাইবার জন্ত আমি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করি নাই। কামনা করি, আমার আত্মসমর্জন ফ্রান্সের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার কারণ হইক।”

বন্ধুবর্গের রানুমুখে মৃত্যুমালিন্ত প্রকটত হইল। সকলেই দীর্ঘনিবাস ফেলিয়া ভাবিলেন,—হায়! ফ্রান্স!!

অতপর নেপোলিয়ন তাঁহার সিংহাসন-তাপের ষোষণা ধীরে ধীরে বলিয়া দিতে লাগিলেন। তাহার ভাষা নৃসিমে লিখিয়া গেলেন। তাপ-পত্র প্রেরণ হইল।—

“স্বরাজ্যিণী! জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এই যুদ্ধ এখন আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন জাতীয় সমস্ত শক্তি-কেন্দ্রের একমততা এবং মার্কজর্জনি মিলিত হইয়া ও যদের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। ইউরোপের মিলিত নৃপতিগণ আমার বিরুদ্ধে যে বোম্বা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেও আমি ভীত হই নাই। তখন আমারের কৃতকার্য হইবার সকল সম্ভাবনাই ছিল। এখনও প্রতিজ্ঞিত, অথবা পরিবর্তিত হইয়াছে। আমার প্রতি ফ্রান্সের শত্রুগণের বিদ্রোহনগে আমি ফ্রান্সকে আহুতি দিতেছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাহাদের যোদ্ধা যেন প্রতারণা ও কপটতা পূর্ণ না হয়—যেমন কেবল আমিই তাহাদের বিরুদ্ধে পরাজিত হই।”

“আমার রাজত্বকে জীবনের অবসান হইল। আমার পুত্রকে ‘ফিডিয় নেপোলিয়ন’ নামে আমি ফ্রান্সের সম্রাট রূপে যোদ্ধা করিতেছি। স্বর্তমান মন্ত্র-কর্তৃক এখনও রাজকাজ চলাইবেন। আমার পুত্রের মঙ্গল-কামনায় আমি চেষ্টা করিয়া অসুখ্যে করিতেছি। তাহারা যেন অবিলম্বে অভিজাবক-

সামান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ত সকলেই যেন এক-পাশ দান।

ইলাইদি রাজপ্রাসাদ, জুন ২২, ১৮১৫।
নেপোলিয়ন।

এই ত্যাগপত্র এখন সভামধ্যে পঠিত হইল, যুদ্ধ স্বদেশভক্ত কার্যে দুই দৈব মুখ আরম্ভ করিয়া শিশুর ছায়া বোদন করিতে লাগিলেন। তিনি অন্তরের অন্তরে রুচিক-দংশনের ছায়া অমুভব করিতেছিলেন যে, নেপোলিয়নের এই রাজ্য-ত্যাগের অর্থ—শত্রুগণকে ফ্রান্সের বিলুপ্ত।

এদিকে অসংখ্যিণী কার্য সকল নির্বাহের জন্ত একটা আদ্যাত্মী রাজকাব্য-নির্বাহী সমিতি গঠিত হইল। স্বদেশ-বোহী ফাউচি তাহার প্রধান ছিলেন। বিভাতিত যুবকগণ বাক্যকে সিংহাসন দিবার জন্ত যে তখন ব্যবস্থা করিতেছিল। ইংরেজ-সৈন্যাব্যাহার ওয়েলিংটনের সহিত এ বিষয়ে তাহার পরামর্শ চর্চিত হইল। কিন্তু কিছুতেই সে নিরু-পেক্ষ হইতে পারিতেছিল না। নেপোলিয়ন এখনও রাজধানীতে—ইলাইদি-রাজপ্রাসাদে। এখনও তিনি জনসাধারণের সেই উপাশ্রয় দেখা। রাজধানী মধ্যে পথে লক্ষ লক্ষ ঘণ্টে সৈন্যক্রসস্রোতের জয় বিবাহিত হইতেছে। সেই আশঙ্কনক মর্যাদিত কোলাহলে পাঠী মহাপ্রাণী সাক্ষ্য সাধারণত উল্লিখিত, উত্তেজিত, বিভীষিকাময়। জনতার উপর জনতা—এ জনতাই বা কেন।—আমি রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করিতেছি। শোকে, রাগে, হতাশে রাজধানীর জনসাধারণ তখন বিহ্বল, উদ্ভ্রান্ত, আত্মহারা—দিন নাই, রাত নাই, বুধা নাই, তৃণা নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, লোক-বর্গের উপর লোকাব্যাহারী কেবল চাঁচাকার করিতেছে,—হে রাজধানীর! তুমি আমাদিগকে কান্নার হাতে গিয়া যাইতেছ? আমাদিগকে ছাড়িয়া আমারা যাইতেছ? তোমার সিংহাসন-পরিহার প্রত্যাশার কথা, আমাদিগকে অন্ত দান, যুদ্ধোপ-করণ দান, স্বয়ং আমাদের নেতা হও, তোমাকে মাথায় করিয়া, ইউরোপে জ্ঞান ছার, পৃথিবী জয় করিয়া দিও।”

নেপোলিয়ন কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তাহার সেই একই কথা—“স্বধিবিরোধ বাধাইতে আমিও ফ্রান্সে কিরিয়। আমি নাই। সকলে এক-

মত হইয়া আমার অনুবর্তন কর, দেশরক্ষা করিবার জন্ত আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।”

এদিকে কাউচি-প্রমুখ প্রতিনিধি-সভা প্রমাদ পণ্ডিতছিল। জনসাধারণের এই উত্তেজিত ভাব, নেপোলিয়নের প্রতি এই তক্তি, যুদ্ধ করিবার জন্ত এই উৎসাহ, এই সকল দেখিয়া ভনীরা তাহারা ভীত, কণ্ঠিত হইতেছিল। ইহাদের নির্বন্ধা-শিষ্যে যদি নেপোলিয়ন পুনরায় আত্মপ্রবল করেন, স্বদেশ-রক্ষার বন্ধ-নিবন্ধ হইবে, তাহা হইলেই ত সর্বসম্মত—তাহাদের সকল দুরভিসন্ধি, তাহাদের বত যত্বভর, সকলই ত তাহা হইলে বিফল হইয়া যায়—তাহা হইলে ত তাহাদের একজনেরও যুদ্ধে মস্তক থাকে না। নেপোলিয়নকে পোপের হাতা করা হইবে, বোনাপার্ট একটা ওজনও উঠিল। তাঁহার যুদ্ধার্থ আশঙ্কিত হইলেন। ২১শে জুন রাতে নেপোলিয়ন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া মাল্মসেন-উপকূলে যাত্রা করিলেন। তাহাকে রাজধানী পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া পাছে প্রজাসাধারণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে, উত্তেজিত হইয়া পাছে যেন অত্যাচীর করিয়া ফেলে, এই জন্ত তিনি দ্রুতবেশে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

নেপোলিয়ন হায়াতে সম্বর ফুল পরিভ্রমণ করেন, কার্যনির্বাহী সমিতি তত্ত্বস্ত পাড়াপিড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার বলিতে লাগিলেন যে, ফ্রান্সে শান্তিমাধ্যমের জন্ত ইউরোপের লক্ষ লক্ষ নৃপতিগণের সহিত যে কথাবা-লি চর্চিত হইতেছে, তাহা কার্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে নেপোলিয়নের কৃপাভ্রমে অসম্ভবই প্রধান অন্ত-রায়। তিনি ফুল ছাড়িয়া গেলেই তাহার একটা সীমান্তা সমবেশে হইতে পারে। নেপোলিয়ন বলিয়া পাঠাইলেন, “দুইখানি জাহাজ (Frigate) আমাকে দাও, আমি এখনই আমেরিকায় যাইতে প্রস্তুত আছি।” পররাষ্ট্র-নির্বাহীরা দুই তৎক্ষণাৎ দুইখানি জাহাজ সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন এবং ওয়েলিংটনের কাছে ‘ছাড়-পত্রের’ জন্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। ওয়েলিংটন লিখিয়া পাঠাইলেন—“নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্ত ‘ছাড়-পত্রের’ প্রার্থ-নার কোন প্রকার উত্তর দিবার ক্ষমতা তিনি তাহার গর্ভমতে হইতে প্রাপ্ত হন নাই।”

এদিকে শত্রুসৈন্য রাজধানীতে আগতপ্রায়। রাজধানীর নিরুত-বাক্য আর যুক্তিহীন হইল। ইতিপূর্বেই ফাউচি কতকগুলি সৈন্য জেনেরাল

অহুত, হুত, সর্বতত্ত্ব উনষষ্টি জন শোক সঙ্গে সম্রাট নেপোলিয়ন ইংরেজের জাহাজে গিয়া আশ্রয় লইলেন। জাহাজে পৌঁছিয়া পোতাভ্যন্তরে বলিলেন,—“কপ্তেন মেটল্যাণ্ড, ইংলণ্ডের আইনের আশ্রয় পাইবার জন্য আমি আজ আপনার জাহাজে আসিলাম।” ইহার উত্তরে কপ্তেন মেটল্যাণ্ড অতি বিনীত-ভাবে নমস্কার করিলেন।

ইংরেজের জাহাজে নেপোলিয়ন উপযুক্ত সম্মান পাইতে লাগিলেন। এই সম্মান প্রদর্শনে তাঁহার সহচর ও অহুতদিগের আশঙ্কা ও উদ্বেগ ভয়ে নশীভূত হইয়া আসিতেছিল। ইতিমধ্যে ‘রেলেরোকন’ জাহাজ সীমিউথ বন্দরে পৌঁছিল। যে দিন পৌঁছিল (২৬শে জুলাই), সেই দিন অকস্মাৎ ইংরেজ-কর্মচারীদের মধ্যে বেন কতকটা ভাবান্তর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। সেখা পেল, কপ্তেন মেটল্যাণ্ড—চিঠাছিল, উদ্বিগ্ন, অত্যন্ত বিধ্বংস। বতকগুলি সামরিক জাহাজ আমিরঃ চক্র-বর্তিক প্রদ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিত। ৩০শে জুলাই অপরাহ্নে বিনা মেঘে ক্রান্ত্যভা হইল। সার হেনরি ব্যানবরি আসিয়া একখানি অস্বাকরিত শিপ হইতে পার্ট করিয়া কনাইলেন যে—

“জেনারেল বোনাপার্ট সম্রাজ্ঞে ব্রিটিশ-গণ-মেটের অভিপ্রায় কি, তাহা তাঁহাকে অবগিত হইয়াছে। ইংরেজ হইয়া থাকিলে তাহা জানিতেন। অতএব আপনি তাঁহাকে জানাইলেন যে, প্রত্যেক প্রতি-এক সহযোগী রাজস্ববর্গের প্রতি আমাদের বাহা-কর্তব্য, তাহাতে জেনারেল বোনাপার্টকে এগুণ অবহার রাখা যাইতে পারে না, বাহাতে তিনি পুনরায় ইউরোপের শাস্তিভঙ্গ করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার বৈদিক ধার্মিকতা সংযমিত করা আবশ্যিক। সেটাই হেলেনা দ্বীপে তাঁহার ভবিষ্যৎ আবাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট হইল। এই রাগের জলধারা বেশ স্বাভাবিক, এবং ইহার সম্মান গ্রহণ, যে, যত স্থান হইলে যেরূপ কঠোরতা প্রয়োজনীয় হইত, এখানে তাহা প্রয়োজন হইবে না।”

নেপোলিয়ন নির্দোষিত হইলেন।

তাঁহাকে জানান হইল যে, তিন জন কর্মচারী, একজন চিকিৎসক এবং বার জন ভৃত্য তিনি সঙ্গে-সাথে করিতে পারিবেন। ইংরা তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন, কিন্তু ইংদিগকেও সামরিক বস্ত্রধারণ করা যাইবে। আর তাঁহার সঙ্গে বাহা কিছু আছে—টাকা, বস্ত্রাদি, খাদ্য, বাধ্য দ্রব্য, জব্বার,

বস্ত্র—বাহা কিছু আছে, তাহা কাড়িয়া লইতে হইবে। তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে, তাহা ইংলণ্ডের মন্ত্রীদিগের হস্তে থাকিবে। তাহার হৃদ হইতে নেপোলিয়নের কারাবাসের ব্যয় নির্বাহ হইবে।

অতঃপর নেপোলিয়ন, ইংরেজ-গণবন্দে-তাঁহার উপর যে অত্যাচার করিলেন, তৎসম্বন্ধে একটা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডের মন্ত্রীদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন। মন্তব্যটি এইরূপ;—

“আমার শরীর ও স্বাধীনতার উপর অত্যাচার করা হইল, তাহার বিরুদ্ধে এই মন্তব্য আমি সমগ্র মনুষ্য জাতির সমক্ষে জনদায়করূপে সাক্ষী করিয়া প্রকাশিত করিতেছি। আমি দেখিয়াগ্রহণ হইয়া ‘নেলোরোফন’ জাহাজে ‘আদিয়াসিয়া’ আমি ইংলণ্ডের অতিথি, বন্দী নহি। আমি ইচ্ছা করিলে আনাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিতে নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কপ্তেন এইগুণ বলায় আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ইংলণ্ডের বিধি-বিধানের আশ্রয় লইতে আনিয়াছিলাম। যদি কেবল আমাকে কীল্ডে ফেলিবার ভয় এই মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়া থাকে, তবে যেন ইং-জগতে ইংলণ্ড আর কখন নাগতা, সমরতা, ও মনুষ্যবর্গের নাম মুখে না আসে।

“আমি ইতিহাসের গোবাই নির্দেশিত ইতিহাসে বলিলে যে, যে শত্রু বিনাশিত বঙ্গের প্রিয়া ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, হৃদ্যেয় হৃদয়ে তিনি ইঙ্গাপুংকর ইংলণ্ডের আতিথ্য-গ্রহণ করিতে আনিয়াছিলেন। প্রতিবাদে ইংলণ্ড কি না, আতিথ্যের প্রলোভনে তাঁহাকে হস্তগত করিয়া, অবশেষে বধ করিয়াছেন।”

অনেককেই ইতিহাসবেত্তা, ইংলণ্ডের এই কার্যকে গর্হিত মনে করেন না; কেননা ইউরোপে শাস্তিস্থাপনার্থ ইংলণ্ড নেপোলিয়নকে বন্দী করিতে গিয়াছিল। যদি সমগ্র দেশের দুঃখ, সম্রাটাজিত দুঃখ, একজনের অবশ্যম্যানে দুঃখীত হয়, তবে সেই একজনকে যে কোন উপায়ে হউক, ঘুরে রাখাই প্রয়োজন।

ক্রমঃ—

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

* এই গ্রন্থ প্রকাশিত: আশ্বিনে লিখিত বৈশাখবিশ্বের জীবনচরিত হইতে সংগৃহীত।

কলিকাতা শিল্প ম্যাজাজিন লাইব্রেরি
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯

জন্মভূমি।

১ম ভাগ।

আশ্বিন। ১২ ৮।

১০ম সংখ্যা।

আমার জীবন-চরিত।

নবম পরিচ্ছেদ।

বেরিলি—উত্তর-পশ্চিমের অন্তর্গত—রোহিল-খণ্ডের রাজধানী। বেরিলি—এলাহাবাদ হইতে ৩১১ মাইল দূরে অবস্থিত। বেরিলি—দিল্লী হইতে ১৫২ মাইল দূরবর্তী। বেরিলি—কলিকাতা হইতে ৭৮ মাইল পথের দূর। বেরিলি কোথায়, কি ভাবে, কত দূরে অবস্থিত, তাহা বুঝিলেন কি?

মানচিত্রে জ্ঞান না থাকিলে, এ সব তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা বিমল দায়। কলিকাতা হইতে বেরিলি বাইতে হইলে, দিল্লী বা এলাহাবাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। কলিকাতায় টিকিট লিখিয়া রাতি সাড়ে দশটার সময় ডাকপত্রের উঠ; পরদিন বেলা এগারটার সময় তোমাকে মোলপুরায় ট্রেনে নামাইয়া দিবে। তৎপরে এই ট্রেনের অপর দিকে দেখিলে, আউস-বোলিখণ্ড-বেলপথের পাড়া গুণ্ডারমান আছে—বেরিলির টিকিট লও—সেই পাড়ায় উঠ,—পরদিন প্রভাতে তোমাকে বেরিলি-ট্রেনে নামাইয়া দিবে।

আমি যখন কলিকাতা হইতে বেরিলি গিয়াছিলাম—তখন রেল-কাজে ভারত বেষ্ট পূর্ণ হইয়াছিল। রাণীপুত্র পণ্ডিত রেল-পথ পড়িয়াছিল। আমারই অধোদাই-সৈন্যল (৮ নম্বর) ইষ্টা-পথে ‘প্রাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ’ দ্বারা দ্রুতগমনের কিছু দিন থাকিলা বেরিলি গিয়াছিল। এই যাত্রার

নাম—‘রেলবার-ক্ল’। কিরপ শৃঙ্গারার সহিত, সুকোমল এবং ধীরভাবে এই হৃদ-কার্য সম্পন্ন হইতে, তাহা তাহিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সর্বদায়কমে প্রায় এক সহস্র শোক, সর্বদায়কমে প্রায় এক সহস্র ঘোড়া—প্রত্যহ শৃঙ্গারার পথ চলিলে, বিশ্রাম করিলে, আহ্বাষি করিলে, ঘুমায়ে—ব্যাপার বড় সহজ নয়! শুধু কি ইহাই? রেলবার সঙ্গে উট আছে, পাখা আছে, পোকা আছে—সকলকেই সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গারায় হইতে হইবে। ইহার উপর, মেম-সাহেব আছে, পুত্র কন্যা আছে, ঝাড়া আছে—তত্ত-উপর ছকর পাড়া আছে, একা আছে, গো-শকট আছে।

একদিনে ইহাষ্ট রাষ্ট্রভোক্তার সহিত হইলে, কিরপ হৃদ-ভাঙ করিতে হয়, কিরপ হৃদ-ভাঙ করিতে হয়, তাহা বোধ হয়, অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাঝেই অবগত আছে। পটিন জন তদ্রূপে বরষায় গেলে, তাহাষ্টের শয়ন-স্থান এবং শয়্যার জুখ ব্রিগুন কষ্টভোগ করিতে হয়—জুতভোগীই তাহা জানেন। কিন্তু ইহা একদিন নয়, দুইদিন নয়—ক্রমাগত একমাস, দুইমাস কখন বা তিন মাস কাল, শীত-গ্রীষ্ম-নির্মিশেষে—প্রত্যহ যাত্রার, লোকের আহ্বারের বদোবস্ত, শয়নের বদোবস্ত চাই—প্রত্যহ হাজার হাজার আহ্বারের বদোবস্ত, শয়নের বদোবস্ত চাই—প্রত্যহ বহুসংখ্যক উট, পাখা, পোকা, আহ্বারের বদোবস্ত চাই, শয়নের বদোবস্ত চাই! তাহা দেখি, কিরপ ক্রোধের কাণ্ড!

হৃদয়শলা, হৃদয়শিলা বহিলা, সহস্রই এক সেদাপারিত আত্মারী এবং বশ ছিল বলিয়া—এই গুণ্ডায়, ব্যাপার সহজে সম্পন্ন হইত। আমাদের

চন্দ্রের অধারোপস্থলে ৫০৪ জন ইহুদার ছিল। ইহা ছাড়া, ইংরেজ এবং দেশীয় আফিসার ছিলেন। তৎপরি জমাদার, দফাদার, ডিব্বীমেজার, কোত-দফাদার, ডাক্তার-দল, কাদক-দল, ভিত্তিগণ, ফোর-দল, বাহক-দল ছিল। প্রত্যেক ইহুদন সওয়ারের একজন করিয়া সহিস এবং প্রত্যেক সহিসের একটা করিয়া ছোট টাট বোড়া ছিল। সওয়ারগণ আপন-আপন বড় বড় নির্দিষ্ট বোড়ার চড়িয়া বাহিত। সহিসগণ সেই টাটের উপর প্রত্যেক ইহুদন সওয়ারের আসাবান, তাঁর প্রভৃতি বহিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে অনু-সরণ করিত। ইংরেজ-আফিসারদের স্বত্ব বন্দোবস্ত। তাঁদের প্রত্যেকের ছিল চারিটা করিয়া বড় বড় বোড়া থাকিত। সাত আট-জন সহিস থাকিত। পাঁচ-ছুরটা টাট থাকিত। সাহেবদের তাঁর উষ্টের পিঠে বোকাই হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিত। প্রত্যেক সাহেবের প্রায় পাঁচ ছুরটা করিয়া তাঁর থাকিত। দেশীয়-আফিসারদেরও জাঁকজমক নিত্যের কম ছিল না। কোন কোন রেখালদার-মেজর, ইংরেজ-আফিসারদের সঙ্গে সমান খুঁট দিয়া চলিতেন। আমাদের সঙ্গে ৫০৪ জনের অধিক সওয়ার ছিল না। বটে, কিং ইংরেজ ও দেশীয় আফিসার এবং অস্ত্রাস্ত্র লোক-দলর লইয়া হাজার মন্বয়ের কম হইবে না; টাট ও বড় বোড়া লইয়া হাজার বোড়ার কম হইবে না। বাজারের অধিক হইবে, তবু কম হইবে না। যখন গ্রন্থ হইতে প্রজ্ঞাপিত হইয়া কলিকাতায় আসি,—তখন আমার চারিটা তাঁর, একখনি ব্যস্ত্র গাড়া, দুইটা বড় বোড়া, তিনটা টাট, চারিজন সহিস, একজন খানদান। এবং একজন রহস্যে দ্রাক্ষণ ছিল। আমি ক্রম-ক্রম যক্তি হইলেও, এত আসাবান আমার সঙ্গে বাহিত;—সাহেবদের সঙ্গে যে কত জিনিস বাহিত, তাহার ইয়াক করিব কে?

কলিকাতা হইতে আমাদের কৃৎ কুরিবার প্রায় ২০ দিন, প্রধান-সেনাপতির নিকট হইতে আমাদের সৈন্যধাক্ষ করণ রিটার্ডানের নিকট একখানি “পরের বিবরণ-পুস্তিকা” ডাকে আসিল। কলিকাতা হইতে কোন্ পথ দিয়া রেলগাড়ি বাহিত হইবে, কলিকাতা হইতে রেলগি পর্যন্ত কত চৌরীয়া আজ্ঞা আছে, এক চটী হইতে অল্প চটী কত মাইল দূর, কোন্ চটীতে পানীয় জল কিরূপ পাওয়া যায়, বোড়ার অল্প বাস কিরূপ পাওয়া যায়, সৈন্যদের কোন্ দিন কত মাইল পথ চলিতে

হইবে, ইত্যাদি সকল কথাই সেই পথের বিবরণ-পুস্তিকাত শুনি। কোন কোন চটী কোন পুস্তিকার অধীন, কোন কালেস্তারের এলাকা কত, কোন্ জমাদারের জমাদারীর অন্তর্গত—ইহাও সেই বিবরণ-পুস্তিকাতে আছে। কোন্ তারিখ কোন্ চটীতে এই অখারোহন উপনীত হইবে,—আমাদের সৈন্যভাষ্যকে সেই বিবরণ-পুস্তিকাতে প্রত্যেক চটীর নামের প্রায় ত্রাণ লিখিয়া ছিলেন। কৃত কুরিবার ১৪ দিন বাকি আছে, এমন সময় কৃত-সাহেব প্রত্যেক কালেস্তারের নিকট এক একখানি পত্র পাঠাইলেন। যে যে কালেস্তারের এলাকার আমায়ের চটী পড়িয়াছে, কেবল সেই সেই কালেস্তারের নিকটই পত্র ডাকযোগে রওনা হইল।—অল্প কোন কালেস্তারের নিকট অল্পই নহে। সেই পত্রে এই ভাবে লিখিত হইল, “আমাদের লোক এত, বোড়া এত, অস্ত্রাস্ত্র পত এত,—এত বি, এত আটা, এত দানা, এত ডালপ, এত চাট, এত জেত, এত মুন্সী-ভিঙ্গ, এত হাসের ভিঙ্গ, এত মুন্সী, এত জেতা, এত পটা,—ইত্যাদি চাহি। আমরা অমুক তারিখ অমুক সময়ে উক্ত স্থানে গিয়া পৌছিব। তাহার পূর্বেই রদন মজুত থাকা চাহি।” কালেস্তার সাহেব এই মন্যদ পাইয়া স্থানীয় তহশীলদার বা জমাদারের উপর রদন বোপাইবার ভার্যাদিলেন। তার দিলেন বটে, কিন্তু নিজে নিশ্চিত রহিলেন না,—তহশীলদার ঠিক সময় মত রদন বোপাইতে পারেন কিনা, তৎফলে তহি পূরণযোগে করিতে লাগিলেন।

কৃত ইহুদার পূর্বদিন, ইহুদন অখারোহী, প্রথম চটীতে অগ্রগামী হইল। এক দলের নাম লাইন-জুরি-পার্ড; অল্প দলের নাম রদনপার্ড। লাইন-জুরি-পার্ড গিয়া, সর্বোত্তম স্থানে সৈন্যভাষ্যকের তাঁর বাটাইল,—কোঠার, টেলি, আলমারি, বাট, তাঁর ভিতর মাঝাইল। মানাপার প্রভৃতি জন্ত স্বস্ত তাঁর তোলা হইল। বড়-সাহেবের পার্শ্বে অস্ত্রাস্ত্র সাহেব-গণের তাঁর পড়িল। তার পর নির্দিষ্ট সময়সময়ে দেশীয়-আফিসারদের তাঁর বাটান হইল। প্রত্যেক তাঁর পার্শ্বে এক এক প্রকাণ্ড প্রোথিত হইল। কালি কোন্ তাঁর, সেই প্রকাণ্ড দ্বারা বুঝা যায়। যখন যখন আসিলেন, তিনি অমনি নীরবে আপন আপন তাঁরকে প্রবেশ করিলেন। কাহারো কোন কথা বিজ্ঞাসা করিবার অশোভা রহিল না।

ওদিকে সাহেবগণ রদন-কার্যের জন্ত এক

প্রকাণ্ড তাঁর পড়িয়াছে; তাহার সমুখে একটা সামান্যনা টাঙ্গন হইয়াছে। সামান্যনাটা আট-চালবৎ। সেই আটচালার এক দুই-ট্রেলি, এবং তাহার চারিবারে প্রায় ২০ বাহি চতুর সজ্জিত। এ দিকে বাটীচিগণ অগ্রে আসিয়া রদন-কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছে।

এই সমল কার্য সমাধা করিয়া লাইন-জুরি-পার্ড-দল বোড়া থাকিবার স্থান ঠিক করিল। সারি সারি হইয়া বোড়া থাকিবে,—সেইরূপ হিমায়ে বেটী পুঁজিতে লাগিল, এবং একখানি বেটী দল করিয়া সেই বেটীটার বাঁধিল। এমন ধারা ১৫১৬-৬৮ সারি করিল। প্রত্যেক সারিতে ৭০ বা ৮০টা করিয়া বোড়া বাঁধা হইতে পারে, এমন বন্দোবস্ত হইল।

তার পর দেশীয়-আফিসারদের তাঁর পড়িল। তাহার পার্শ্বেও প্রকাণ্ড পোতা হইল। বড় বড় উচ্চ-পদস্থ দেশীয় কর্মচারীগণের জন্ত দ্বাণ বাস কর। অদৃষ্ট, তৎসমস্তই তাহারের দ্বারা সমাপ্রদিত হইল। কিন্তু গণ্ডারগণের তাঁর কেহ চাহাইল না; তাহারা নিজে আসিয়া নিজে তাঁর টাঙ্গাইবে,—ইহাই বন্দোবস্ত ছিল। তাহার প্রথম আসিয়াই আগে বোড়ার তত্ত্বাবধান করিত—তার পর তাঁর বাটাইত—তার পর বিজ্ঞান, অবশেষে রদন-উৎসাহ,—ইত্যাদি।

রদনপার্ডের কার্য ছিল,—আহারীয় সামগ্রী অগ্রে সংগ্রহ করা। তাহারের সঙ্গে ছাত্র জন হইয়া—আমি বৈশিগ-মুনি থাকিত; বেশীয়া আসিয়া তহশীলদারের লোকের নিকট হইতে চাণা, ডাল, আটা, ধান, মূন, প্রভৃতি,—বাধা বাধা আদরক হইত, সমগ্রই নিগণত করিয়া, ছয় স্থানে জড় করিয়া রাখিত। সওয়ারগণ আসিয়া বাহা, বড় আবরগ, সে তত সামগ্রী লইয়া বাহিত। বলা বাহুল্য, সওয়ারগণকে কলিকাতা দিয়া কোন জিনিস কিনিতে হইত না;—তাহারা কেবল বেয়ের বাটার সহি করিয়া জিনিস-পত্র লইয়া বাহিত। যে যক্তি সহি করিতে জানিত না, তাহার হইয়া অল্প যক্তি সহি করিয়া দিত। মাসকাবারে বেশী বিল করিত; সওয়ারগণের মাহিনা কাটায়া, সরকারী খাজমাখানা হইতে এই টাকা বেশীকমে দেওয়া হইত। এইরূপে সাহেব-দের বাহারও সেই বেশীয়া কর্তব্য বোপাইত; কিন্তু সে সকল জিনিস, বেশীয়ার অঙ্গুষ্ঠ ছিল, তাহা অল্পই বেশীয়া খরিদ-বিক্রয় করিত না,—অল্প মুদ্রাসমান-খান্দানা দ্বারা সে কাজ সম্পন্ন হইত। নির্দিষ্ট

বাক্সার-দর বাহা হইত, সেই হিমায়ে উক্ত বেশীয়া-মুদি তহশীলদার বা তাহার পোমস্তাক্র দ্রুত জন্মের মূল্য চুকাইয়া দিত।

প্রত্যহ আমাদিগকে দশ-বার মাইল চলিতে হইত। পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ গেলেই একটা চটী পাওয়া বাহিত। তবে কোন কোন দিন ৮৯ ক্রোশ পথও বাহিত হইত। যে চটী যেমন দূরে পড়িয়াছে, সেই হিমারে আমাদিগকে বাহিতে হইত। সেদিন ১০ মাইল পথ চলিতে হইবে, সেদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া গাটী চলিতাম। সেদিন ১১ বা ১৮ মাইল পথ বাহিতে হইত, সেদিন রাত্রি ৩০ টার সময় উঠিয়া সকলে রওনা হইতামন বোড়ার উপর বাহিতামন বটে, কিন্তু শৌভ-কাটবার নিয়ম ছিল না; যন্ত্র অন্তর্য্য বীর-বন্দনে ইহুদক করিয়া বাহিতাম। সাধারণত বেলা ১১টা ১০টার সময় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতাম। পৌছিয়া, অবশিষ্ট দিন এবং রাত্রি বিভাগ, আহারাদি ও নিদ্রার পর্যায়সিদ্ধ হইত। আমরা যেমন এক চটীতে পৌছিলাম,—অমনি সেই অগ্রগামী অখারোহী দল, বেশীয়া-মুদিগণকে সঙ্গে লইয়া (দুই বৃত্ত) বা দেড় বৃত্ত) পরে। মূল্য এক চটীর অভিমুখে যাত্রা করিল। সে চটীতে গিয়া, তাহারা আমার পূর্বস্মৃত রদন-খরিদ এবং তাঁরখানান-কার্যে ব্যাপৃত হইল।

সঙ্গে আমাদের সর্বকর্তাও প্রায় চারি পাঁচ শত সহিস ছিল,—চারি পাঁচ শত টাট, ইহাদের অর্ধািন ছিল। ইহাদের প্রধান কার্য—বোড়ার বাস করা। রেখেলা আসিয়া কোন এক চটীতে পৌছিলাম,—সহিসগণ প্রকাণ্ড পরাই অমনি তাঁর উপর চড়িয়া দ্রুতবর্তী বা অদ্রুতবর্তী মাঠে বাস করিতে চলিল। সাহেব ইহাদের পানীয়া রক্ষণ দক্ষ পনের জন অধিকী সৈন্যও চলিল। এই সহিসগণ সাধারণত বড় ছুট;—একে নীচ-জাটী, তাহার উপর মানিক কন,—বাঁহ-বাঁহ করিয়া ইহার সর্গাই বিস্তৃত। পাছে কোন লোকের উপর উপদ্রব করে, মাঠের শস্য নষ্ট করে, বা কোন রহস্য বাগানে চুকিয়া পড়ে,—১৮৬৮-১৮৬৯ জন অখারোহী সৈন্য ইহাদের পশ্চাত্তান করিত। ক্রিষ্টি চারি পাঁচ শত সহিস একটু দ্বারা করিয়া যাত্রা করিয়াছে,—১৮৬৯জন সওয়ারে তাহারিগণকে অনেক রাধিবে কিরূপে? সুতরাং সময়ে সময়ে এই সহিসগণ দ্বারা বিশলগণ অজ্ঞাতর বাটত, আকের ঘেউ পড়িলে, এতদ্বারা ইহার কাহান-কাহান আক ভাসিয়া লইয়া আসিত। মূল্য

বেশ, কলা, আম, কাঁঠাল—কিছুই ইহাদের
একটিই না। আমাদের অশ্বখ-সাথেব একশ
অভ্যচারের কথা শুনিবে, এক্ষেত্রে রাশিয়া জরিমানা
হইবে। সহস্রবৎসর আগে মাদেজ অধিনা
করিতেন এবং অল্প বয়সে ব্রোডবার্ডের দণ্ডও
সিদ্ধ। একদিন, ওপলী, কি বর্মনি জেলায়।
আমার ঠিক ঘুরে নাই—আমাদের সেনারা আসিয়া
এক চটতে অবস্থিত করিল। বেকালে সৈন্যদল
সাথেব এবং আমি, উভয়ে ষোড়শ চড়িয়া, নদীর
দুই পাশে—সীকার করিতে যাইতে ইয়াছিল।
সীকার-উপযুক্ত পাখী বড় দেখিলাম না। কিছুক্ষণ
পরে দুই কতকগুলি বক দেখিলাম। আমি
মাথেকের বলিলাম,—“বোড়া হইতে নামিয়া বাগাইয়া
ভাল; কেননা, ষোড়শ চড়িয়া গেলে, পাখীগুলো
জয় পলাইয়া যাইবে।” সাথেব এবং আমি উভয়ে
বোড়া হইতে নামিলাম। পাখীরা ছোট-বড়
হাড়ে নাই। আমরা উভয়ে ধীর-পদে অগ্রসর হইতে
লাগিলাম। প্রতি পদক্ষেপে আমাদের পদে হইতে
লাগিল, পাখীগুলো অসামান্যকর দেখিয়া, অথবা
দুশক পাইয়া এখনি উড়িয়া পলাইয়া যাইবে।
চলকথা, পাখীগুলো তখনও অনেকদূরে ছিল,—পশ-
শব্দ তাদের কর্ণে যাইবার কোন আশঙ্কা ছিল না।
গাছ হউক, আমরা যুব সত্যভার সহিত নীরবে
হাইডেজি—এমন সময় দেখি, একটা বৃদ্ধা প্রাণকে,
মুখে একটা বড় ভুজু বহুদূরে ছেলেক নৈয়া, অমা-
দের নিকটে পৌঁছিয়া আসিতেছে। আমি “হাত
খুলিয়া সেই প্রাণেকটিকে ইঙ্গিতে নিষেধ করি-
লাম,—তুমি এদিকে আসিও না। বৃদ্ধা জানে না
না, আমরা এখন পাখী-সীকারে বহির্ভূত ইয়া
যৌনত অলংঘন করিয়াছি—যেন একটা কথা
কহিয়াই আমাদের যব সর্বনাশ হইবে। বৃদ্ধা
আমার ইঙ্গিত সুলিখ না—সে আমার বেগে
আমাদের সমুখে আসিতে লাগিল। সে তখন
উজ্জবনে টাকার তুরিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে,
“দোহাই বাবা! আমাকে রক্ষা কর,—আমার সূর্য-
শব্দ হইয়াছে।” সাথেব সেই বৃদ্ধার আর্জনা
করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন,—তার বাবা,—বৃদ্ধার
টাকার বকপা পলাইবে। সে যাহা হউক,
বৃদ্ধা আসিয়া দাড়ান করিয়া সাথেবের পদপ্রান্তে
পড়িল। সাথেব রুই ব্রিক ইয়া আমাকে
জিজ্ঞাসিতেন,—“এই বৃদ্ধা প্রাণেকটি কি চায়?”
আমি সাথেবকে ইংরেজীতে বুঝাইয়া বলিলাম,—

“এ, কি চায়ে, তাহা আমি জানি না; তবে এ
বলিতেছে যে, আমার সর্বনাশ হইয়াছে, আমাকে
রক্ষা কর।” আমাদের এইরূপ কথাবাদী হইতেছে,
এমন সময়, বকপা আশানা-আপানি হউক, অথবা
আমাদের গোলাগুলি উড়িয়াই হউক, উড়িয়া পলা-
ইল। সাথেব সেই ভিত্তি পাখীরাতে উপর এক-
গুলি করিলেন,—কিন্তু একটাও পাখী মরিল না।
সাথেব, সীকার পলাইল দেখিয়া, জুজ, জুজ কহ
বিষয় হইলেন। আমি ইতঃপন্থে বুড়াকে জিজ্ঞাসা
করিলাম,—“তোমার কি হইয়াছে, তুমি কাঁদিতেছ
কেন?” বুড়ী বলিল,—“আমার একবিধা মূগার
সম্মুখে বস মূলা হইয়াছিল। পটনের সিপাহী
আমিয়া সব মূগা উপড়াইয়া গিয়াছে। আমি
এ বছর বাই কি,—এবং আমার বাজনাই বা কি
কিরূপ?” আমি বৃদ্ধার অহুবেগের কথা সাথেবকে
সমস্ত বুঝাইয়া দিলাম। সাথেবের রোগ এতখন
বুড়ীর উপর ছিল; আমরা কথা ভাবার পর,
সাথেবের নিদারুণ রোগ হইল,—সেই বাস-কাটা
সহিসংঘের উপর। সাথেব বলিলেন,—“আমি
আমাদের দ্বারা যদি প্রাণদের উপর এত অত্যাচার
হয়, তাহা হইলে প্রাণগণ আর কাহার নিকট আশ্রয়
প্রাপ্ত করিবে?—আজই এখনি ইহার সমুচিত দণ্ড
দিব।” আমরা উভয়ে গিয়া বোড়ার উপর চড়ি-
লাম। বুড়াকে, বোড়ার সহস্রের জিয়া করিয়া
দিয়া সাথেবের আশোষত আমি বলিলাম,—
“ইহাকে বড়-সাথেবের তায়ুতে নৈয়া চল।” বোড়ার
সহস্রের সঙ্গে যাইতে বুড়া কহিবে—ইতস্তত করিতে
আমি বৃদ্ধাকে সন্ধান করিয়া বলিলাম,—“মা,
তোমার কোন ভয় নাই,—তুমি ইহার সঙ্গে ছাউ-
নিতে আসি।”

তখন সাথেব এবং আমি তায়ুবেগে বোড়া
ছুটাইলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেবেলয় গিয়া
পৌছিলাম। সাথেব আপন তায়ুতে না গিয়া,
সহিসংঘে দেখিবার স্তুপাকার করিয়া বাস জবা
করিয়া, সেইখানে গেলেন। বোড়া হইতে
নামিয়াই, সাথেব অর্ধশত বৎসরে বোধা
সহাইতে লাগিলেন। আমিও সাথেবের দেখাশোনা
সেই কার্যে ব্যাপ্ত হইলাম। দেখিবার-তিনিয়া
বেবেলয়ার সকল লোক অবাক হইল। জন্মশ
অজ্ঞাত সাথেবগণ এবং সুবেদার-সেবারগণ
আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু
বড়-সাথেবের অধিদৃষ্টি দেখিয়া কেহ তখন কাঁদাকে

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।
বড়-সাথেবকে নীরবে কেবল শব্দ উচ্চাইতে
দেখিয়া, সকলেই বিম্বিত হইলেন। অবশেষে
বড়-সাথেব বাঁসের তলা হইতে একখানি মূগা
বাহির করিলেন,—আমিও সেই সঙ্গে চারি পাঁচ
বোকা মূগা বাসের মাথাগন হইতে বাহির করিলাম।
ক্রমে অজ্ঞাত অশ্বতন সাথেবগণ একাধি বোপ দিলেন।
কেবল মূগাই বাহির হইতে লাগিল। শেষে বস বাস,
তত মূগা বাহির হইল। সাথেব মূলা-সম্মুখে
উঁহার তায়ু সমুদ্রে লইয়া বাইতে আদেশ দিলেন।
রহস্ত প্রকাশিত হইল। প্রায় পাঁচ শত সহস্রকে
সারি বারিধা, সমুদ্রে দাড় করান হইল। প্রত্যেকের
চারি আনার হিসাবে জরিমানার বস্তুম হইল।
সেই জরিমানার টাকা বৃদ্ধাকে দেওয়া হইল।
বৃদ্ধা ১১২২ টাকা মূল্য পাইল,—এক মূলাগুলোও
পাইল। শেষে সহস্রগণের প্রতি আদেশ হইল
যে, তোমরা মাথার করিয়া এই সমস্ত মূলা বৃদ্ধার
বাঁটতে পৌঁছিয়া দিয়া আসি। বৃদ্ধা আনন্-
দভ্রমেতে সেই সিক্ত করিতে-করিতে গৃহে
গিয়া পৌঁছিল।

এইরূপে প্রায় দেড় মাস পরে আমাদের পূটন
কানীধায়েব নিকট স্থলতনপুর্বে আসিয়া ছাউনি
করিল। আমি বিবাহ করি বলিয়া, সাথেবের
নিকট একমাসের ছুটি দায়ী কানীতে আসিলাম।
জননী প্রপাত্তে গয়া তরিয়া প্রণাম করিলাম।
মাতা শিরে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মা,
সংস্কৃতভাষা একটা পরমা-মুন্দরী কথা ঠিক করিয়া
আমার বিবাহ দিলেন। পরম মনো মনো
কানীতে একমাস কাল থাকিয়া, স্থলতনপুর্বে
প্রত্যাপ্ত হইলাম। স্থলতনপুর্বে কিছুদিন থাকি-
য়াই, আমরা বেরিলিতে আসিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

১৮৬৩ সালের শেষভাগে আমরা বেরিলিতে
পৌছিলাম। আমার বয়স তখন একশ বৎসর।
কিছু দায়ের গঠন—আকার-প্রকার দেখিয়া লোক
ভাবিত, আমার বয়স ২০ বা ২৫ বৎসরের কম নহে।
এখানে আসিয়া হৃৎ, পঙ্খদন্ত, এবং সৃষ্টি
চিত্তগণিত করলেন।

বেরিলি প্রাচীন সহর যটো; অনেক ক্ষুদ্র-বিগ্রহ
বেরিলিতে ব্যটারিতে বটে; কিন্তু বেরিলি সহর গড়-

বলি নহে,—প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিতও নহে। যতুৎ,
যতুৎ কোথাও বেরিলিতে নাই। যেখানে তেপ-
খানার ছাউনি হইয়াছে, তাহার নিকটেই একটা
বড় কোথা আছে—তাহাকে খোলা-বহুর কোথা
বলিলে, অসুবিধে হয় না। সে কোথায় সিপাহী-
সৈন্য কেহ কখন থাকিত না;—খোলা-বাহস বা
অগ্রসর কখন অশ্বতন রক্ষা করিত হইত।

বেরিলি যটো, সেনা-নিবাস বা দুর্গ-সমূহ
আমি যাহা বলিতেছি,—তৎসমস্তই ১৮৬৩ সালের
পূর্বে। এখন যদি কিছু নতুন পরিবর্তন হইয়া থাকে,
তাহার বিষয় আমি অজ্ঞ হইয়াছি। সাথেব হইতে
একমোহল সেনা-নিবাস বা সৈন্যদলের শিবির
সমুদ্রাঙ্গি। এখানে তখন তিনি রেজিমেন্ট সৈন্য
ছিল। এক রেজিমেন্ট অপরোহী, এক রেজিমেন্ট
পদাতি, এবং একমোহল তেপখানা। সহরের মধ্য-
রাষ্ট্রা দিয়া গেলে, ঠিক পদাতি-সৈন্যদলে পড়িত
হয়; সহরের বামের রাষ্ট্রা, অপরোহী-দলের শিবিরে
সমুদ্রাঙ্গি হইয়াছে; দক্ষিণের পথে তেপখানা
বাগিয়া যায়।

আমি অপরোহীদলে চাকরি করিতাম বটে,
কিন্তু বাসা লইলাম, ঠিক পদাতি-সেনা-নিবাসের
পশ্চাতে। তথায় বাস-উপযোগী ছাড়াখানি আমি
কিছু। অমধ্যে ৫ টাকা মাসিক ভাড়ায় আমি
একটা বাড়ী ভাড়া লইলাম। আমার বাড়ীটা অপরোহী-
রূত ভাল বগিয়া ভাড়া কিছু বেশী দিতে হইল।
নব্বিশ, ২০ বা ২৫ টাকা মাসিক ভাড়ায়
পাওয়া যায়। আমার ছোট্ট আদালত ছিল,
চাকরদের থাকিবার একটা ঘর, রুই-ঘর, গোশা-
খানা ছিল। ইহা ব্যতীত অন্তরে তাম্রা থাকিবার
ঘর দুইটা এবং বাহিরে একটা ঠাকৈখানা ছিল।

সে সময় বার-চৌক জন মাত্র বাঙ্গালী বেরিলিতে
ছিলেন। তাদের কয়েকজন আমার ব্যক্তি
নিকটস্থ ভাষাগুলিতে বাস করিতেন, বর্মান্তি
বাঙ্গালী সহরে থাকিতেন। সকলের নাম এখন মনে
নাই—সীহাদের নাম মনে আছে, তাহাদের নাম
হইত—সীহাদের নাম। হরদেব বন্দোপাধ্যায় এবং
নিয়ো লিখিত নাম।

হরদেবের বন্দোপাধ্যায়—ইহার ৫ই মহোদয়।
কমিশনার-আফিসে চাকরি করিতেন। ইহার
আফি-বাড়ী ছিল কলিকাতা বাগানবাড়ী। ইহার
পিতা—কানীধাধর কলিকাতা বাগানবাড়ী। ইহার
জন্ম সপ্তকেই ইহার আমার দাদা হইলেন।
কয়েক পাল বেরিলির পোষ্টমাস্টার ছিলেন,—আরও

তিনজন বাঙ্গালী তখন পোতাধিসে কাজ করিত। তখনকেই চট্টাপাধ্যায় ত্রিগোচর-আখিরের বড়-বাথু ছিলেন। হরিখোদন সবুজার পবানী-সৈন্যবলের বড়-বাথু। আখোরাই-সৈন্যের বড়-বাথু। আমি আমার ভাতা কীশোরাম তখন বেদবিহারী কনিশন-আখিরে কাজ করিত। আর কালেক্টরিতে ছিলেন—মুখ্যে মহাশয়। হইবার নাট্যী আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু হইবার নূত-নিষ্ঠাবান হিন্দু আমি কখন দেখি নাই। সিপাহী-বিত্রোদের সময় কারাগারে নিষ্কণ্টক হইলেন—অন্যারের দিন বাইতেছে, অস্বাভাবিক বাঙ্গালী বাজারের মুচি সম্মেশ, তরকারি লুকাইয়া ধাইয়া জীবনধারণ করিতেছেন, কিন্তু মুখ্যে মহাশয়ের তাহা হইয়ায় ঘো-নাই। তিনি সেই যে, আরে দাঁত দিয়া মুখটা বুজিয়া ভিজিয়া আছে—আর সেখানে পৈতা জড়িয়ায় “দুর্গা দর্শী” নাম জপ করিতেছেন,—ভাষার মাঝে যে, তাঁরকে বাজারের জিনিস বা অজ কোন অখ্যাযা গাওয়ায় এ হইকপ চারদিন তাঁহার উপবাস হয়। পঞ্চম দিন বরকটে কাঁচা ছোলায় বদলেবপ করিয়া দিলাম। তাহাই তিনি কাঁপে ভজিয়ায়া বাইতেছেন। এছ-ক্রমে ত্রিনি একমাস কাল অতিবাহিত করেন। হজ তাঁহার কর্তার প্রত। মুখ্যে মহাশয়ের অধীনে কালেক্টরিতে আরও দুইজন বাঙ্গালী ছিলেন। আর ছিলেন, আমার ঠাকুরা—প্রামকম চন্দ্রবর্তী। তিনি তখন ১৫ টাকা করিয়া পেনশন পাইতেন। পুরো কালেক্টরী-আফিসের একজন কর্মচারী ছিলেন। গৌরবে—কলিচাঁদ-পাড়া—পেশকম। তাঁরকে দেখিলে মুনিষ্কমি বলিয়া ভ্রম হইত। বিদ্যোদীর্ঘা তাঁরকে দূর করিয়া ছাড়িয়া গিয়াছিল।

এই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে পরম্পর বেশ সমান ছিল। সঙ্গা আশ্রয়-প্রদায়, হস্ত-পরিস্কারে সিন কাড়িত। এখন যেমন, কি উত্তর-পশ্চিম, কি পূজার, কি বিহার-প্রদেশ—অনেক স্থানেই দেখিতে পাই, বাঙ্গালীরাই পদপথের নিরঙ্কর, স্বাধীন, পূর্ণবাহু ছিল না। সংখ্যার অস্বাভাবিক-প্রকৃতি সভ্য গাঢ় হইয়াছিল।

আমার বাসাদী একটী যেন আড়া-ধর ছিল। সম্ভার পূর্ণহইতেই এরা সৈমত খেলাইই থায়া একত্র হইতেন। পান, বাজনা, বেগা, গর—সমস্ত পূর্ণ হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত দহমান চলিত। পান, তামাক, আভু, গোলা—হয়ময় চলিত। আমার ঘরে তখন তীব্রোকেব সম্পর্ক

নাই—আমি তখন নব-বিবাহিত;—মাতা, নববধূকে লইয়া ৮ কানীধামে থাকিতেন। প্রতি শনিবার আমার বৈঠকখানায় তরকারি নাচ হইত;—যেদিন শনিবারে মাতা কিছু বৈঠক চড়িত, সেদিন আশ্বিনার রবিবার হইত। গিন্নি তিন চার লন নর্তকী আমার বাটতে নৃত্য করিত। প্রায় প্রতি শনিবার আমার পুণে বৈঠকিখ বাঙ্গালীগণের ভোগ হইত—কালিয়া, পেগাও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত।

আমি বাইতাম খুব, খাওয়াইতামও খুব। বৈঠকির তখন জল-দায়, উৎকৃষ্ট,—কিনিসপত্রও শূন্য। খুশোও যেমন হইত, আহারীয় সামগ্রীও তেমনই সহজে পাওয়া হইত। এখন মুমুটা চাশ-ফোনা-ভাজা বাইলে পেট কামড়ায়, রাতে পেগাও বাইলে সকালে পেটভার থাকে,—এখন কথায় কথায় অজল হয়, কথায় কথায় সন্ধি হয়, কথায় কথায় জর হয়। তখন সে সব আদ্য-বাহ্যী কিছুই ছিল না। আত্ম পূর্ণ করিয়া বাইতাম, এক বটী মিষ্টা কর্তার জল উত্তর স্বপ্ন—একই ভেড়াইয়া আইস,—অমান এক দণ্ডী মরো দেখিলে, আবার তেমার জুনা হইয়াছে। এখন হইয়াছে,—কেনে যেন জীবনভয়ে অবস্থা। এখন অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহাদের কেবল ভিগিপিয়া! বৃষি ভিগিপিয়া—রোপ-ভোগের জ্বলই হইসেবের জন্ম। তিনে বাসে তিনটে পাই, তাঁহাদের কেবল জয়াবিটনের পূর্ণ-লক্ষণ। কোথাও কেবল বাতুলোপের। কোথাও কেবল শিরোবর্ণ। কোথাও কেবল আশ্রয়। এই সকল দেখিয়া-ভুলিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া তা হাড় জলাতন হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৫৬ মাসে বেরিগিতে যখন আমি গিলাম—মাছব-সর্বত্রই এত রোপ-ভোগ করিতে পারে, তাহা আমার তখন অজানী ধারণাই ছিল না। অজুখা-কায়েক বলে জানিতাম না। অতি প্রত্যয়ে একই-আত্মা আদার থাকিতে থাকিতে, উঠিয়াই গৃহপালিত গাভীর একসের কাঁচা দুধ বাইতাম। এ দুধবুজু না বাইলে যেন ঝাঁড়িতে পারিতাম না,—তৎপরে ঘোড়ায় চড়িয়া প্রায় আট মাইল পথ একটী যেন আড়া-ধর মধ্যে বেড়াইয়া আসিতাম। তার পর যান-আহিক—এব জলযোগ। সে বিষম-জলযোগের কথা এখন আর কি বলিব? পরম-হিন্দু মুখ্যে মহাশয় আমাকে অস্বাভ-অস্বাভ্যায় এবং আছিকের পূর্ণে দুধ রাখিতে নিষেধ করেন। আমি এক সপ্তাহকাল দুধ বড় করিয়া প্রকৃতই

আমার-গুরু হইয়াছিল। তার পর আবার কাঁচা দুধ ভক্ষণ আরম্ভ করিলাম।

আমার বাটতে, মা কলীর নামে প্রভাৎ একটা করিয়া ছাপ বৈলান হইত। দুইসের করিয়া মাছের বরাদ্দ ছিল। চুত, ছুত, দধি, মাখন—এ সকল ঢালাও ছিল। বাইতাম,—আমরা দুই কাই। এত বড়-মাছবি-মরুও যে মাসিক পথত খুব বৈঠক হইত, তাহা নাই। তখন বেরিগিতে একশত কিলোর ওজন এক টাকায় আড়াই সেরে ভাল বড় পাগো বাইত। আমার চাউল আদিতে—অতি উৎকৃষ্ট। পিগিভিটের নিকট নিউরিয়া নামক একস্থান আছে;—অথাকার চাউল প্রসিদ্ধ।—মিহি চাশ, লগা লগা লানা—সম্মুখে সেই চালের দোকান দিয়া দিলে মরিচ-লবঙ্গের মূল্যকে সেরে সে প্রায় আশ্রয়গিত করিত। সেই চালের মূল্য ছিল ১০ টাকা। এখন সে চাশ ১২ টাকা মূল্যে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। রামি চাশ ১০ টাকা বা ২১ টাকা মূল্য ছিল।—আমরা ১০ টাকা বা ৩২ সের পাওয়া বাইত। ষাঁট দুধ টাকায় ৩০ সের। বাজারে দুধ (মহিষের) এক পয়সা হইত। হিন্দুস্থানীরা মাছ-মাংস বড় অধিক বাইত না। বেরিগির মুসলমানের মাছ-মাংসে বিশেষ ভক্ত। মাছের সের ১০, কখন ১০—কই, কাতলা, পুঁটা মাছ মিলিত। পুঁটা একটীর মূল্য ১০ হইত—১০। আতু, বেগুণ, মুলা, মীম, কপি, কিশে, বগুন—পাওয়া বাইত। এসময় জিনিস কিংবা মধ্যস্থত বলিয়া বোধ হইত। হিন্দুস্থানীরা তরকারি পাওয়া বাইত না,—ডাশ আর রুই হইলেই তাহারা মুগুজ। বেগুন এক পয়সা সের। বড় বড় মুলা পয়সা ৬৩টা। নইনিহাল পাছাছে স্ফায় হইত,—তাহার সের দুই পয়সা। ফুল-কপি ও খাঁল-কপি মুলা প্রায় এক ডিন—১৫ বা ১০ করিয়া একটা। কটীলি অজন্ত। পটল খুব কম। বেরিগিতে ভিগা, কলা, নারিকেল নাই—কিছু আম খুব। বেরিগি মরুতে, মরুতে প্রান্তভাগে, পল্লীগ্রামে, মাঠে, বাটে,—সর্বত্রই আমপাছা—আমের বড় বড় পয়সা। পঞ্চাশ বিঘা, একশত বিঘা বাগিয়া এক একটা আমের বাগান। এক একটা আমপাছা যেন অশ্ব বৃক্ষের ছায় প্রকাণ্ড। এখানে আম-চ-প্রায় দুই মাস আমের—মাস। এই সময় সাধারণ-গোকে ‘আম’ বাইয়াই জীবন ধারণ করে। নিরুপে ও মধ্যম আম এক পয়সা

হইতে তিন আনা পর্যন্ত দরে একশত বিক্রীত হইয়া থাকে। ভাল আম চারি আনা বা পাঁচ আনার একশত। কু আম আম আট আনা শায়েওঁক এক আমি কখন দেখি নাই। পাড়া-পাড়া আম বোকাই হইয়া বাজারে আসিতছে,—বাজারে আম রাখিবার স্থান নাই,—অতঃপরে পাড়া আমার কামাই নাই। আম পড়িয়া বাজারে দুর্গক উঠিয়াছে, পুলিশ আছে আর আমবানি বন্ধের ভয় হইয়াছে, অতঃপরে আম-বোকাই পাড়া অগ্রসর হইতেছে।” সে এক বিরাট বিলিবিজি ব্যাপার। তখন এক পয়সায় দুই শত বা পাঁচশত পর্যন্ত আম বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ঘটনা প্রতি বৎসর ঘটে না। একবার এক পয়সায় দুই শত আম বড় হইল। সঙ্গে আমার একটা চাকর থাকে। বিক্রোত একটা পয়সা শিলাম,—চাকর আমের বাজরা মাথায় উঠাইল। বিষম ভয়ে চাকরের কাঁধে মরিয়া গেলে। চাকর আমকে বলিল,—“বাণু! সাহেব! হইতে দুইশত আমের অধিক আছে;—দোকানদার লুকাইয়া তিনশত গণিয়া দিয়াছে।” আমি বলিলাম,—“তাও কি কখন সম্ভব হয়? আমি কিনিলাম দুইশত,—আর—দোকানদার গিবে তিনশত?”

চাকর, কীভাবে আমের বাজরা রাখিতে অনেক হওয়ায় আমি তাহা ধরিয়া নামাইলাম। তখন আমার চাকর গিয়া বিক্রোতর সহিত বগড়া আরম্ভ করিল। বলিল,—“তুমি বড় বীলকো;—লুকাইয়া তিনশত আম দিয়াছ;—এখন আমার কাঁধে বাগিয়া ১১৩টা।” পরম্পর তর্কবিতর্ক হইয়া আমের পয়সা আরম্ভ হইল। দেখি গেল, সমুদ্রের ২৪৯টা আম আছে। দোকানদার বলিল,—“ঐ ৪৯টা আম ফাও দিয়াছ।” চাকর বলিল, “ঐ ৪৯৩টা আম আমার কাজ নাই।” দোকানদার উত্তর দিল,—“ঐ ৪৯টা আম তোমাকে লইতেই হইবে,—আমি ও-আম কোথায় রাখিব?” বিবান কিছু ওস্তাদ আমের দেখিয়া, আমি প্রায় তিনটা আম একটা কাপড়ে বাঁধিয়া লইলাম। কিন্তু এই ব্যাপার দেখিয়া আমি অবাক। চাকরকে জিজ্ঞাসায়, বুঝিলাম,—“পুলিস হইতে ভয় হইয়াছে, বাজারে বড় আম আছে, সমস্ত একদিন মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে আছে। বাজার আম না বিক্রয় হইলে, তাহার আম পুলিশ লইয়া গিয়া রামপদায় বাহিতে পুঁজিয়া ফেলিবে।” (আমের এই আম-বিরোধের ঘটনা ১৮৫৮-মাসে ঘটে)

একটা কথা বলিয়া রাধি,—বেরিগিতে এক বৎসর অতীত আমি জন্মে। একবৎসর কোথায় কিছুই নাই—জিনসাধারণ আমের মখাতি দেখিতে পায় না,—তার পর এংসের অমনি তরুণ আমি,—কুহুরের ল্যাজে আমি—আমে ছি ছি পড়িয়া যাই। যে বৎসর আমি জন্মে না,—সে বৎসর যে, একটীও বাইতে পাওয়া যায় না, এমন নহে। অতি কম আমি জন্মে। চারি বা পাঁচ টাকা করিয়া “খ” হয়। দশমান সোকেই যে অমম বায়ুকে অবতীর্ণ করিয়া আমাটা বেরিগিতে এক বৎসর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

যেখানে এত স্থলতমুগ্ধ আহার্যের সামগ্রী পাওয়া যায়,—যেখানে স্বয়ং অপরূপ অবতীর্ণা বলিতে অত্যুচ্চ হয় না,—সেখানে আমাদের আহারের কণ্ড হইবে কেন? আমার থাকিতাম রাজভোজের।

বেরিগিতে স্বধন আমি আসি, তখন আমার হাতে মজুদ—প্রায় ২২ হাজার টাকা। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় ৭৫ টাকা মনে এক শৌনৈতিক কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেই সিগুরের ভিত্তি বেরিগির বাদ্যয় আমায় টাকা থাকিত।
“মোহর, টাকা, মোট—এই তিন কর্মের ৩২ হাজার টাকা ছিল। তখন আমার টাকা জমা দেওয়ার প্রথা তত প্রচল ছিল না,—কোশানীর কারাগারে বৃদ্ধ অতি কম বলিয়া আমি ঐ টাকায় কোশানীর কারাগার কিনি নাই। নগর টাকা তোড়ান্বীত করা সিগুরে থাকিত।”

ওরফের সর্বকর্মের আমার মাসিক কিছুকম চাহিয়া টাকা মাফিয়া ছিল। ব্রহ্মদেশে আমার এক পরমাণুও পরত ছিল না। মাহিনার টাকাসমস্তই জমিত। আমার বাসা-ভাড়া ছিল না, খাট-খরচ ছিল না। পোষাক-খরচ ছিল না,—অথচ ধার্মিকতা আমি কাছ বাসায়, বাইতাম উত্তম সামগ্রী, পরিতাম উৎকৃষ্ট পোষাক। আমি ব্রহ্ম প্রথম দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বাবু কৃষ্ণনাথ বহোদা, প্যাব্যারের বাসায় আচ্ছাদ্য করি। তিনি কমিশনারিজে গোমস্তা ছিলেন। তাঁহার দান-শক্তি অসুত ছিল। পর্বমেষ্টের কর্মট্রাষ্ট লইয়া তিনি বড়মানুষ হইল। তাঁহার বাসায় পাঁচ-মাস তিনি থাকিয়া আমি অল্প বাসা করিতে চাহিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে স্বত্তর বাসা করিতে দিলেন না। ছয় মাস পর আবার স্বত্তর বাসা করিতে উদ্যত হইলাম,—ছুতাহা—ছুতাহা করিয়া বাবু মহারাজ করিয়া উঠিলেন,—এবং আমাকে অনেক

ভৎসনা করিলেন। তাঁহার পোষাকের সঙ্গে আমার পোষাকের তিন কর্মমাই দিলেন,—দাম দিতে দেয়াই তিনি আমার শীটে কাঁপ মারিতেন;—কিছুতেই বস্ত্রের দাম লইতেন না। একবার টাকায় একমুখ দশপনের করিয়া তিনি প্রায় একলাক টাকার চাউল কিনিয়া শুধামে মজুদ করিয়া রাখিলেন। তাহার পর বৎসর ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষ হইল। টাকায় আং-খণ চাউল বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। একজন বহু কৃষ্ণনাথ বাবুকে বলিলেন,—“আর কোন সময়?—এই বেলো চাউল বিক্রয় আরম্ভ করুন।” তিনি বলিলেন,—“একই ধামো,—আরও কিছু চাউল মার্ঘ হইক।” জন্মে চাউলের দর টাকায় পনের মেরে উঠিল। সেই বাকি আবার বলিলেন,—“আর বিলপ করিবেছেন কেন?” তিনি উত্তর দিলেন,—“আরও ১৫ দিন দেখি।” অবশেষে টাকায় আটসের দশপনের চাউল বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। চাউল হস্তগাত্য হইল। ইতিপূর্বে তাঁহার বাসায় প্রত্যহ পাঁচ-মাস তম ভিত্তি আসিত; কৃষ্ণনাথ বাবু বাজার হইতে চাউল কিনিয়া প্রত্যেককে একপোয়ার হিসাবে চাউল দিলেন। কিন্তু ত্রমশ বৎসর টাকায় দশপনের চাউল বিক্রয় আরম্ভ হইল, তখন প্রত্যহ ভিত্তিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন কৃষ্ণনাথ বাবু ধাম হইতে চাউল আনিয়া প্রত্যেক ভিত্তিয়ারকে বেকালে আং-সেরের হিসাবে বসন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ দশহাজার মণ-ভিত্তিয়ার এইরূপে তাঁহার নিকট হইতে চাউল পাইতে লাগিল। এইরূপে লক টাকার চাউল তিনি দাম দিয়া রাখিলাম। ত্রমশের পর থেকে তাঁহাকে “হাতী বাবু” বলিত। আমি ব্রহ্মদেশে বাহিয়ার পূর্বেরই ঘটনা ঘটাইয়াছি।

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রায় আমি বার হাজার টাকা আনিয়াছিলাম। পৈতৃক সম্পত্তিও এইবার আমার হাতে আসিল। বাহা হউক, সর্বকর্মের আমার নিকট বেরিগিতে প্রায় ২২ হাজার টাকা মজুদ রহিল। বেরিগিতে তখন আমার মাসিক মাফিয়া ছিল,—১৩৫ টাকা। কিন্তু মাহিনায় করে কি? আমি বহিংশ হাজার টাকার উপর বসিয়া। একশ বৎসর বরসে আমার মাসিক কি কম গরম হইয়াছিল? সংসারে যে, দুখ আছে, দারিদ্র্য আছে, জনমান আছে, অর্জন আছে,—তাঁহা আমি তখন জানিতাম না। এইরূপেই ইদাম্, খেলিয়া, স্বল্পদে, পরমানন্দ দিন কাটিল,—ইহাই ধারণা ছিল।

আমার সেতার শিথিবাস সখ জন্মিল। পনের টাকা মাসিক বেতনে একজন ওস্তাদ রাখিলাম। ওস্তাদ, জাতিতে মুসলমান। নাম ঠিক মনে নাই—বোধ হয় কুমার। বাড়ী মুন্সাবাদ। এ বাকি পেশাবার সেতার-নাচিলে। শিল্পকাণ্ডে বেশ হুসুট—অনেক রকম গৎ জানিত। অর্থনির্নে মনোই আমি অনেকগুলি গৎ শিখিলাম। ত্রমশ আরও দুই একজন বহু আমার বাসায় সেতার শিখিতে আনিতে লাগিলেন। আমি নিজ গরবে তঁহারিগকে, এ কার্যে উৎসাহ দিবার জন্ম, দুইটী সেতার কিনিয়া দিলাম। আমার নাম-ডাক পড়িয়া গেল। আমি গুব দাতা এবং ভাললোক—ইহা সহস্রময় রাষ্ট্র হইল। অথচ দান করিয়া যে, কাহার কলনও হুগু দূর করিয়াছি, তাহা আমি জানি না। গলি কা, আমার ‘মুগ-খি’ ছিল।—আহারে, আমোদে, লোককে আপ্যায়িত করিতাম। হিন্দু-খানি-মসজিদে বেশ পসার হইত। রাজা নবহুয়, রাজা, মিশর বৈজ্ঞান্য, লাল্য লক্ষ্মীনারায়ণ, রায় চেংরাম, রায় লেখনার প্রভৃতি—বেরিগি-সহরের ইহারী মাছপান্য সম্ভ্রান্ত হিন্দুখান। নবাব বাঁ বাহাদুর বাঁ, নবাব হাকিম নিয়ামত বাঁ, হাকিম মাহমুদ আলি বাঁ, আলুতাক আলি প্রভৃতি—ইহারী মাছপান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান। সহরের সন্তুদ্য নানা-হুজে আমার আলাপ-পরিচয় হইল। তবে ভাব কাহারও সঙ্গে বেশী, কাহারও সঙ্গে কম।

মিরান বৈজ্ঞান্য—জমীদার এবং মহাজান ছিল। তাঁহার কাছাকাছ আটালিকা। বড় বড় বাসান ছিল। দাঁরা, নিরানান হিন্দু এবং ক্ষতপাতালী লোক ছিলেন, ইহারী সহিত আমার বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। বৈজ্ঞান্য বুক, রঙ কর্ণা, একটী পুঁদা হইল। পরি-খাণ চুপে ওস্তাদ ছিল। সদাই শিল্প-আহুকে ব্যাপুত। ঘোড়া ১৬ টি এবং পাড়া ৮ খানি ছিল। ইনি ইংরেজের বিশেষ অগ্ৰগত ও প্রিয় ছিলেন। নিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরেজের গুরু অব-লগ্নন করেন। বিদ্রোহ-দমন হইলে, ইনি ইংরেজের নিকট হইতে জায়গীর-রক্তক বহু আয়ের কৃপান্তি এবং রাজ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। রামলোয়া, গালে, বিবাহ-উৎসবে, সকল শুভকর্মেই বৈজ্ঞান্য নামকে নিমন্ত্রণ করিতেন।

লালা লক্ষ্মীনারায়ণ, টাকার সমুচ্চ। শিল্পী এবং বেরিগির গণ্যমুখ্যেও গালাখানার ইনি কড়া ছিলেন। দেখিতে হুসুদুগ। কাহারি-বাগ নামক

ইহার এক বাগান বেরিগিতে ছিল। এমন উদ্যান আমি দেখি নাই। অদ্ভুত মাঠে-সুখা, রাজা-রাজড়া এই বাগান দেখিতে আসিতেন। ইহার প্রায় ৪০ টা বোড়া ছিল।

রাজা নবহুয়, রাজা, ব্রাহ্ম-কুমার। ইহার পিতা গুব প্রাপ্তপালনী ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমানগণ ইহার পিতার ভয়ে থর থর কাঁপিত। কোন মুসলমান, ইহার পিতার আমোদ, হিন্দুর উপর কোনগুণ অত্যাচার করিতে সক্ষম হইত না। বেরিগির কয়েকজন ওস্তাদ-মুসলমান ইহাকে বড়জ্ঞ করিয়া হত্যা করে। একদিন, পাগিলা বেটিনার ভান করিয়া, একজন হুসুদরায় বড়-মুসলমান ইহার পিতার সৈন্যকথানায় উপস্থিত। এইরূপে কোনরূপ মনোহর না করিয়া, এই মুসলমানকে সৈন্যকথানায় প্রবেশ করিতে সিয়াছিল। গালি কা দেখাইতে দেখাইতে সেই মুসলমান তাঁহার পেটে এক ইয়া-মারিয়া ফেলিল। তিনি অমনি কাং হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভাড়াহেই তাঁহার মৃত্যু পট। হত্যাকারী মুসলমানের অবশেষী কান্দি হইল। তাঁহার পুত্র নবহুয় রায়ের প্রগতি ধীর এবং শান্ত। উহার দ্বারা নিতানায় গরম-ভরক হিন্দুখানী-হিন্দু বেরিগিতে আর কেহ ছিলেন কি না মনেহ। তাঁহার শরীরের রঙ উষ্টক করিতছে, লাবণ্য সূচিয়া গরিহ হইতেছে,—আরুণ-বিশুত চক্রে মনাই ঢালন করি-তেছে; মুখ মনে চক্রে উপহাস করিতেছে। তাঁহায়ে বেরিগে মনে হইতে, ইনি মাহুদ মনেন, শোভ্য। মনে হইতে, ইহার চরণতল বসিয়া ইহার পাশপাশ অতুল্য পূজা করি। ইহার, জমীদারীতে অনেক লক্ষ টাকা আয় ছিল। ইহার বাড়ী বড়ই লাক্ষমক-বিশিষ্ট। ইহার হাতী, ঘোড়া, উট ছিল। অনেক রকম পাড়া ছিল। প্রায় একশত লক্ষপাল্লার সিপাহী ছিল। ইহা বাতীত অনেক কৃষ্ণাঙ্গীর পালোয়াণ এখানে প্রতিপালিত হুইত বসন্তেদা, অতিবিস্ময়ক, সম্ভ্রান্ত, দানদান্যেই গুব মনে কে? ধী বাহাদুর বাঁ, প্রাচীন নবাব-বংশ হইতে উদ্ভূত। ইহার পিতামহ হাকিম রহমত বাঁ এক সময় রেখিলগরুর তবাব ছিলেন। পিতামহ,—মুজ ও সন্ধি-বিদ্রোহে পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজের সাহায্যে, অসোয়ায় নবাব হুজুউদ্দৌলা,—উক হাকিম রহমত বাঁকে মুজ পুজাতিৎকো এবং নিহত

নবাব হাকিম রহমৎ খাঁর পৌত্র বনিয়া, সকলেই নবাব উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন করিত। ইংরেজরাজও তাঁহার এক্ষণে বেশে সম্মান রাখিয়া ছিলেন। বর্ধমন্টে তাঁহাকে মাসিক প্রায় একশত টাকা ভদ্রা দিতে হইয়া ছাড়ি, তাঁহাকে সদরলাপির চাকরিও দিয়াছিলেন। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর আর ছিল, মাসিক পাঁচ-ছয় শত টাকার কম নগদ। ১৮৬৬ সালে যখন আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি, তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন—এবং সদরলাপির চাকরি ছাড়িয়া দিয়া পেনশন নহইয়াছেন। খাঁ বাহাদুর খাঁর দুই-এক পাড়া ছিল, যেনার দ্বায়ে একটি নাকিসুরে কথা কহিতেন। আমার সহিত ইহার সামান্যই আলাপ হইয়াছিল।

বৈরিতিতে তখন নিয়ামৎ খাঁ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। ইনিও নবাব-বংশীয়। খাঁ বাহাদুর খাঁর ইনি বড়ভূতা ভাই। বাহাদুর উল্লে একাধ-বস্ত্র পরিবার নহেন। ইংরেজের বাটা বৃত্ত। নিয়ামৎ খাঁও গবর্নমেন্ট হইতে, মাসিক ৭৫ টাকা ভদ্রা পাইতেন। ইচ্ছা ছাড়া, অত্যধিক ইহার মাসিক দুইশত টাকা আর ছিল।

নিয়ামৎ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চুয়ামিঞা। বয়স ২৫ বৎসর। স্বন্দর—সুখস্বাস; মুখে কিন্তু বসন্তের দাগ ছিল। হউক বসন্তের দাগ,—কিন্তু তেমন সুন্দর, সুখস্বাস, সুসম মূর্তি সদস্যরা চূরি-গোচর হয় না। ইহার বৈয়াকিক কোন কাল-কর্ম ছিল না,—সর্বদা কেবল সেতার বাজাইতেন। ওস্তাদ না হউন, সেতারে কিন্তু হাত বখারি ছিল। ১৮৬৭ সালের প্রারম্ভেই আমার বাটতে সেতার বাজনার ব্যবস্থা গাথিয়াছে। এদিকে চুয়ামিঞাও বড়ই সেতার-প্রিয়।

চুয়ামিঞা মধ্যে মধ্যে সহর ত্যাগ করিয়া, বৈশাল্যে বাস-সেবাধর্ম, মাঠের দিকে সেমানিবায়ে বেড়াইতে আসিতেন। পদাতি-সৈন্যদের পশাৎ ভাগেই আমার বাসা ছিল। একদিন বৈকালে আমার বাসার সেতার-বাজনা হইতেছে, ওস্তাদজী মধুসূদনের রাগ আলাপ করিতেছেন। চুয়ামিঞার কাছে এ স্বর প্রসিদ্ধ হইল। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া, আমার বাটার দরজার নিকট আসিয়া, কান পাতিয়া সেতার শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার চচ্ চুয়ামিঞার দিকে গেল। আমি, ভয়লোক হায়ে পাড়াইয়া আছেন দেখিয়া, সমস্ত্রমে তাঁহাকে ধরে আনিলাম। চুয়ামিঞা,—

ওস্তাদজীর বিশেষ পরিচিত। তখন ওস্তাদজী, আমার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে নবাব-বংশীয় জানিয়া অধিকতর সম্মান দেখাইলাম।

চুয়ামিঞাকে আর একদিন আমার বাসার আম্রার জন্ত অপরোধ করিলাম। তিনি আসিলেন। তাঁহার মিঠা হাতের সেতার ভনিয়া বড়ই পরিপুষ্ট হইল। ক্রমশ উত্তরের মধ্যে প্রাণাৎ সৌহার্দ্য জন্মিল।

চুয়ামিঞা প্রত্যহ আমার বাসায় আসিতে লাগিলেন। তিনি সহর হইতে পায়ে ইটীয়া আসিতেন। তিনি নবাব-বংশীয় বটেন,—কিন্তু এক্ষণে দরিদ্র-দশাপন্ন। আমি তাঁহাকে সহর হইতে আনিবার জন্ত প্রত্যহ আমার গাড়ী পাঠাইতে লাগিলাম। মাসের মধ্যে দশদিন তিনি আমার বাটতে বসন্ত স্থানে আমার করিতে গািলেন। আমি তাঁহাকে পোষাকাদি ধরিয় করিয়া দিতে আসিত করিলাম। ইহার জন্ত মনে প্রায় আমার ত্রিশ টাকা ব্যয় হইত।

চুয়ামিঞা বড়ই সচ্চরিত্র স্বজন ছিলেন। মদা আমাকিক ভাব,—মান অভিমান ছিল না। তাঁহার চিত্র যেন দুয়ার মাথা। গল-কপট নাই, গল-অঙ্গুর নাই,—যেন সারু পুষ্প। বলাই বাহুল্য, চুয়ামিঞার সহিত আমার বিশেষ বন্ধ হইয়াছিল।

চুয়ামিঞার ছোট ভাতার নাম নরেশ খাঁ। বয়স ১৯ বৎসর। তিনিও মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসিতেন; যখন তাঁহার দাদা থাকিত না,—এবং আমি বৈয়াকিক হইতে অপর বাটতে যাইতাম, তখন তিনি একটা সেতার লইয়া পিড়ি-পিড়ি করিতেন,—আর ওস্তাদজীক বসিতেন।—দুর্ভাগ্য বাবু যতশ্রম না আসিতেন, ততশ্রম মধ্যে আমাকে একটা গং মিথাইয়া রাও। আমি তাঁহার দাদার বড় বণিয়া, তিনি আমাকে মাঝ ও ভক্তি করিতেন।

খাঁ বাহাদুর খাঁর এক পরম রূপবতী এবং গুণবতী কন্যা। বড়ই আদরের এবং সোহাগ্যের কথা। কন্ডার লক্ষ আদার পিতা সহ করিতেন। পাছে দূরে, বড়লোকের ঘরে বিবাহ দিলে কতকালে সহজে দেখিতে না পান, এই জন্ত পিতা খাঁ বাহাদুর,—উক্ত নরেশীর সহিত কন্ডার বিবাহ-কর্তা সম্মান্যকরিলেন।

ক্রমশ চুয়ামিঞার পিতার সহিতও আমার

বেশ আলাপ হইল। অধিক কত বনিব, সহরের প্রায় নবাতীর সমগ্রা হিন্দু ও মুসলমানের সহিত (বিশেষ আলাপ না হউক) জানা-পরিচয় হইল।

১৮৬৭ সালে আমি টাকাকে টাকা জ্ঞান করিলাম না। পথের পাথর-কুটিরও বর মৃগা ছিল,—কিন্তু তখন আমার নিকট টাকার মৃগা ছিল না। আদর করিতে, বয় করিতে, ভক্তি করিতে শিখি নাই,—তাই বৃষ্টি মাংশস্বী ক্রমশ অন্তর্জাত হইলেন।

আমি থাকিতাম,—একা,—কিন্তু গাড়ী ছিল, বড় ইনা। ষোড়া ছিল তিনটা। চাকর (মায় সহিস) ছিল, গোরজন।

আমার নিকট যে, ৩২ হাজার টাকা ছিল, তন্মধ্যে প্রায় দুই হাজার টাকা ধার দিতে বাধা হইয়াছিল। কি অস্বাভাব্য! কি পবিত্র, কি ভোগ্যমানা—সকল পণ্ডনের মাথেরপন্থী আমার নিকট টাকা কর্ত্ত্ব হইতেন। না দিলে, কেহই ছাড়িত না;—পিতা-চাণ্ডালীয়া, করদাস করিয়া, প্রায় সকলেই আমার নিকট হইতে টাকা ধার লইতেন। এ দিকে সিপাহীপন, সুবেদারগণও টাকা ধার লইতেন। আমি, যে-যেন ব্যক্তি, সেই-রূপ বুকিয়া, ত্ত্বপস্কৃত টাকা দিতাম। ছাণ্ডোসাৎ পল্লভার রীতি ছিল না,—একটা খাতায় লিখিয়া রাখিতাম,—তাহার পায়ে, যিনি টাকা লইতেন, তিনি সহি করিতেন। খাতার মাটে বড় বড় অক্ষরে দেখা ছিল,—“বন্ধুরে খাতিরে ধর দেখণ।”

অনিচ্ছাসত্ত্বেও, একরূপভাবে ধার দেওয়া আমার যৌকানন কিছু ছিল না। আমি মাসিক প্রায় আট মন শত টাকা হুদ পাইতে লাগিলাম। আর কি ইংরেজ, কি হিন্দুস্বামী,—কি-ই সম্রাট্যাক্ষ, কি ভিত্তিকগণা,—সকলেরই নিকট মাঝ ও ভক্তি প্রাপ্ত হইলাম। সিপাহীপন জানি,—“আবেদের সহিত দুর্ভাগ্য বাবুর এক-প্রাণ এক-কেশ”—সৈন্যেরা জানিতেন,—“ত সিপাহী আছে, সকলেই দুর্ভাগ্যবানের গোলাম।” বড় মজাই হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনেকে হয়ত মনে করিতেছেন, আমি বড় বাজে কথা বলিতেছি। বস্তা কথ্য একটীও বাজে ব্রহ্ম, সমস্তই আবশ্যকীয়। ভবিষ্যতে নিত্যন্ত স্মরণ্য বলি-গাই, নবগৎ নবগৎবাসীর কিঞ্চিৎ বর্নন করিলাম।

বাজে কথা কিন্তু এখনও ফুরায় নাই।—গোড়া-পত্তন ভাগ করিয়া না করিলে, বনিয়াদ পাকা না হইলে, তাহার উপর কখনই সু-প্রকাণ্ড, সুস্থায়, হর্ম্য নিশ্চিত হইতে পারেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে অধুরোধ করিতেছেন, “মহাশয়! এঁরাবার আপনি সিপ্তাহী-বিষয়েদের কথা আরস্ত করুন।” যোর যুক্ত আমার বীর্য-কাহিনী কর্ত্তন করন।” সিপাহী-গুহর কথা শুনিতে হইলে, আসে সিপাহী-সৈন্য বিরূপে পুষ্ট হইত, তাহা শুনা উচিত। সিপাহীসৈন্য রীতি-নীতি আচার-পদ্ধতি কিছু জানা উচিত।

১৮৬৭ সালে মিউটিনের পূর্বে রেক্স নিয়মাদি ছিল, আমি তাহাই লিখিতেছি।—এখন সে নিয়মের একটী-আটটি পরিবর্তন হইয়াছে। আমি যাহা লিখিতেছি, তৎসমস্তই স্মৃতি-শক্তি সাহায্যে। স্বস্ত হিসাব ধরিলে,হয়ত একটী-আটটি ভুল হইতে পারে। কিন্তু তখন প্রকৃত-তত্ত্ব ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

বৈরিতিতে তখন একজন দৈবীর পদাতি-সৈন্য ছিল। ইংরেজীতে এই ধরমে বলিতে হয়,—“বৈরী” লিতে এক রেজিমেন্ট নেটিব-ইনকাওয়া ছিল।” এক রেজিমেন্টের ভাবার্থ একপল। এই রেজিমেন্ট-বা দল আঁ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে “কোম্পানী” কহে। এইরূপ চারি “কোম্পানীতে” এক-অর্দ্ধপল বা “উইং” হয়। প্রথম-চারি কোম্পানীকে “বাইট-উইং” বা দক্ষিণ অর্দ্ধ-দল বলে। দ্বিতীয়-চারি কোম্পানীকে “লেকট উইং” বা বাম অর্দ্ধ-দল বলে। আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা বৃষ্টিতে পারিতেছেন ত ?

পূর্বে বর্ণিয়াছি, প্রত্যেক পদাতি-রেজিমেন্ট আট ভাগে বা “কোম্পানীতে” বিভক্ত। প্রত্যেক কোম্পানীতে নিয়মিত লোক-গুণিআছেন,—একজন সুবেদার, একজন কমান্ডার, ছজন হালিগার, ছজন ন্যয়েক, একজন কিলাতী বংশীবাদক এবং ৬০ জন সিপাহী।—উক্ত ৮ কোম্পানীতে বা এক রেজিমেন্টে এতগুলি লোক আছেন—

১ x ৮ = ৮ সুবেদার।

১ x ৮ = ৮ কমান্ডার।

৬ x ৮ = ৪৮ হালিগার।

৬ x ৮ = ৪৮ ন্যয়েক।

১ x ৮ = ৮ বংশীবাদক।

৮০ x ৮ = ৬৪০ পদাতি সৈন্য।

৭৬০ জন।

স্বপ্নের, এক কোশানী-সৈন্যের অধিনায়ক। জম্মুতে সেই কোশানীর দ্বিতীয় অধিনায়ক। পলাতনসৈন্যের সহিত এক দল ইংরেজি বাধ্য আছে। বায়করণের সংখ্যা সর্বত্রকমে ২৫ জনের কম নহে। দ্বৈতীয় দ্বিতীয় বা হিরিয়ার সাধারণত বায়করণ-নয়নক হয়। এই বায়করণথকেও কিছু কিছু সুবিন্যাস শিখিতে হয়।

এই সমুদায় রেজিমেন্টের সর্বময় কর্তা একজন ইংরেজ, ইংরেজিতে তাঁহার “কমান্ডিং অফিসার” অর্থাৎ সেনাপতি বলে। রেজিমেন্টে আর একজন ইংরেজ আছে। তাঁহার বলে, দ্বিতীয় সেনাপতি। তৃতীয় ইংরেজকে বলে, এডজুটেন্ট। ৪র্থ ইংরেজটী—ডাক্তার (সারজন মেজার)। ইহা ব্যতীত এই জন ইংরেজ নম-কমিশও অফিসার আছে;—এক জনকে নম-সারকেট মেজার এবং আবার নাম কোয়ার্টার-মাস্টার-সারকেট। সৈন্যদের কাণ্ডাক প্রভৃতি শিকার পরিদর্শনকারী—সার-ব্রেক-মেজারের উপর। তাঁর, গোলা, গুলি, কাঁচ, কল, প্রভৃতি রক্ষার ভার—কোয়ার্টার-মাস্টার-সারকেটের উপর। প্রত্যেক পলাত-রেজিমেন্টে মোট ছয় জন মাত্র তখন ইংরেজ ছিলেন।

এ যে ইংরেজ ডাক্তারের কথা ব্যাখ্যাছি, উনি পটনের ইমপাতাল-বিভাগের কর্তা। ইহার অধীনে দুইজন মেটাল ডাক্তার, একজন রুপাউটার, একজন ড্রোয়ার আছে। এইখানে আহত বা পীড়িত সৈন্য বহনের জন্য দুইখানি ডুলি এবং আট-জন বোহারা আছে।

প্রতি রেজিমেন্টে আট জন ভিত্তি এবং আট জন মেথর আছে।

প্রত্যেক সিপাহী-সৈন্যের মাসিক তেল ৭১ মাড টাকা। ক্রমশ উহা ৮০ আট টাকা হয়। প্রতিমাসে ৭১ টাকা মূল্য। ৭১ টাকা পর আর বেতনের প্রদান হয়। এই বেতন হইতে, পূর্ববর্ণিত, পোষাকের দ্রব্য মাসিক নির্দিষ্ট টাকা কাটা য়।

বাজার-বিভাগে একজন বাজার-চৌধুরী নিযুক্ত। তাঁহার বেতন মাসিক ১১ টাকা। তাঁহার অধীনে একজন মুংহুদী ও দুই জন চাপারী আছে।

প্রত্যেক কোশানীতে একজন করিয়া বেরিয়া মুদি আছে। হুতায় প্রত্যেক পলাত-রেজিমেন্টে আট জন করিয়া মুদি থাকে। কোনো, এক রেজিমেন্ট ৮ কোশানীতে বিভক্ত। এই মুদিগণই সিপাহী-লিপিকের রসদ যোগায়। সেনা-নিবাস সাধারণত দুই

মাসে হয়, সহরের ভিতর হয় না। কাজেই সিপাহী-দের রসদ যোগাইবার জন্য পত্তন বন্দোবস্ত করিতে হয়। তাহাতেই প্রত্যেক সেনানিবাসে বেরিয়া মুদি রাখিতে হইয়াছে।

এ চৌধুরী, রেজিমেন্টের বাজার-পরিদর্শন করেন। জিনিস ভাল মন্দ কিনা, বাটখারা ঠিক কিনা, আনুষঙ্গিক সামগ্রী বাজারে আছে কি না—

এই সকল দেখিয়া ভোজন চৌধুরীর কাজ। রেজিমেন্টের বাজারে যে-সে আসিয়া লোকান করিতে বা জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে থাকে। সৈন্যভাণ্ডারের প্রথম হইলে, তবে কোশানীর রেজিমেন্টে লোকান করিতে পায়। নির্দিষ্ট—আজ্ঞাপ্রাপ্ত গোয়াল ব্যতীত, অন্য কোনও গোয়াল রেজিমেন্টে দ্রব্য বিক্রিতে পাইবে না। প্রায়

সারকমেরই লোকান রেজিমেন্টে থাকে। সৈন্যভাণ্ডারের প্রথম মতে বাজারে দ্রব্য-দ্রবের জন্য বা হুড়ি-পটনির বেশা থাকিতে হইয়া পায়।

কিছু কোন কোন সৈন্যভাণ্ডার বাজারে বেশা থাকিতে যেন না। রেজিমেন্টের প্রত্যেক লোকের প্রতি এই আদেশ হয়, তাহার যেন রেজিমেন্টের বাজার হইতেই কাপড়, জামা, জুতা প্রভৃতি খরিদ করে। সহরের বাজারে কোন সিপাহী থাকে কোন সামগ্রী কিনিতে পারে না। কিনিলে, তাহার

দণ্ড হয়। আর, লোকানকার সেই দ্বারের দ্বার, সিপাহীর নামে আদালতে নাথিয় করিলে জিল্লি প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য কোন কোন সৈন্যভাণ্ডার, কোন সহরে ন্যূন পটনি রাখিলে, সহরে এই বসিয়া ডেয়ারী চিঠিয়ায় দেন যে,—“কোনও লোকানকার যেন কোন সিপাহীকে ধারে জিনিস না দেয়—বারে দিলে, সে টাকা সে আর ফেরত পাইবে না।”

রেজিমেন্টের কোনও লোকানকারের হঠাৎ বাজার ভাড়িয়া চলিয়া বাইবার যে না। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে লোকান খোলা ও লোকান বন্ধ হইয়া থাকে।

বেরিয়া মুদিগণ ধারে সিপাহীদিগকে রসদ দিয়া থাকে। এক মাশ পূর্ণ হইলে প্রত্যেক সিপাহী, মুদির নিকট গিয়া আপন-আপন আহারীয় সামগ্রীর হিসাব করিয়া আইসে। সিপাহীদের হুতায় ৪ বর্ষন মুদির হিসাবপর হয়, তখন বাজার-সহিত ৪ বর্ষন মুদির হিসাবপর হয়, তখন বাজার-চৌধুরী বা মুংহুদী তথায় উপস্থিত থাকিয়া, হিসাব বেরিয়া তাহার ভুলত্রুটি ঠিক করেন। এইরূপে

হিসাব-পত্র ঠিক হইলে, সৈন্যভাণ্ডারের আদেশ-অনুসারে, বেরিয়াগণ সিপাহীদের মাহিনা হইতে, আহারীয় সামগ্রীর ব্যবদ, টাকা পাঠিয়া থাকে।

পোষাক প্রভৃতি টাকা, রসদের টাকা, মাহিনা হইতে কাটয়া লইয়া, যে টাকা বাকী থাকে, তাহাই সিপাহীগণ নগদ হাতে পাইয়া থাকে। এইরূপে কোন সিপাহী মাসে নগদ ১০০ টাকা বা ১২ টাকা পায়; কেহ ১০ পায়; কেহ বা চারি পয়সা পায়; কেহ বা কিছুই পায় না—কেল অল্প অল্প মাহিনা শেষ হইল, ইহা ভুলিয়াই সে, শূন্য-হস্তে আপন স্থানে ফিরাই আসে।

যে যে জিনিসের বেরণ দর, তাহা মাস্তির সহরে বাজিয়া এবং খাচাই করিয়া, প্রত্যহ রেজিমেন্ট-বাজারের চৌধুরীর নিকট পাঠাইয়া থাকেন। বেরিয়া-মুদিগণ সেই দরের উপর টাকা প্রতি এক আনা হিসাবে লাভ পায়। মাস্তিরের দর দেওয়ার ভুলভাল হইলে, মুদিগণ মহা আপত্তি উপস্থাপন করে।—এবং দ্বিতীয়বার দর খাচাই আরম্ভ হয়।

অন্যকর্তা বা হুড়িফের সময় যখন দ্রব্য-সামগ্রী হুড়ু ল্য হয়, তখন সিপাহীগণকে সে সময়ের বাজার-দর জিনিস কিনিতে হয় না। তাহার সামগ্রিক-বিভাগের নিয়মামুসারে নির্দিষ্ট-হারে অর্পণকার্য সম্ভব দরে আহারীয় সামগ্রী প্রাপ্ত হয়।

সৈন্যদের সাধারণ আহার ভাণ-রুটী। মাছ-মাংস নাই, কাণিয়া-পোলাও নাই, আলু-বেগুন-পটল-মুগা নাই।—কেবল সেই ভাণ আর রুটী অনলকাল চমিকায়ে উপযুক্ত ভাণ-রুটী পাইলেই সিপাহী সন্তুষ্ট। সিপাহী, প্রত্যহ বেরিয়া-মুদির নিকট হইতে মিলা আনিতে যায়। কেহ ভিনে পোয়া, কেহ এক সের, কেহ বা পাঁচ পোয়া আটা লয়; ভাণ আর্ পোয়া, খি এক ছটাক, লবণ সিকি ছটাক লয়।—আর নন্দ লয়, দুইটী পুয়া। এই দুই পয়সায় কর্তা মসলা প্রভৃতি ক্রয় করে। যদি কোন সিপাহী ইহা অল্পেক অধিক বাইতে চায়, তবে তাহাকে কিঞ্চিৎ অধিক আটা ও দ্রুত দেওয়া হয়, কিম্বা মাসিক সে দর টাকা মাহিনা পাইবে, তত টাকা অধিক সামগ্রী বেরিয়া-মুদি কিছুতেই সিপাহীকে দিবে না।

৪৭১ রব সাথ হয়, তখন সিপাহী, এক-আধ দিন জরকারি পায়। কচুই, সিপাহীর প্রধান জরকারি। আলু-বেগুনও রন্ধন রন্ধন হাইয়া থাকে। এই মুদির নিকট হইতে প্রত্যহ দুইটী করিয়া

পয়সা পায়, সিপাহী ঐ পয়সা হইতে কিছু কিছু জমাইয়া এক-আধ দিন জরকারি কিনিয়া থাকে। জ্বালানি কর্তা, অনেক সময় কুড়াইয়াই সিপাহী কার্যোদ্ধার করে।

পূর্ববর্তি হিন্দুস্থানী সিপাহীগণ সাধারণত ভ্রাঙ্গল, জল্লিয়, রাজপুত-জাতিকৃত। আহার (গোয়াল), গড়েজিয়া (মেঘপালক) এরূপ জাতিও আছে। ইহার মাছ-মাংস পূর্ণ করে না। ওর্ডিনেস মাছ-মাংস খায়। জল্লনী শূদ্র-অর্থাৎ বারাহে মাংস হইবারে বড় প্রিয়। ওর্ডিনেস সাধারণত ভাত খায়; আটার রুটিতে ইহারের রুচি কিছু কম। ভাতের ফেন না গড়াইয়াই, ইহার কেমন-ভাতে শাইয়া থাকে। হিন্দুস্থানী পূর্ববর্তি-সৈন্য এককোলা খায়; শিশু-সৈন্য হুইকোলা খায়। শিশু-সিপাহী ছাগমাংস ভক্ষণ করে।—কিছু বাজারের মাংস শায় না,—আপনারা ছাগবলি গিয়া সেই ছাগের মাংস খায়। মসলাখান-সৈন্যও হুইকোলা আহার করে।

অনেকে মনে করেন, সিপাহীগণের কোন কাজ-কর্ম নাই।—তাহারা বসিয়া-বসিয়া থাক, আর বসিয়া-বসিয়া মাহিনা পায়। সিপাহীগণ যেন গরবমেন্টের পেনশন-প্রাপ্ত কর্তার। দ্রব্য মজা করিয়া, পানের উপর পা গিয়া, বারমাস সিপাহী বসিয়া আছে, কবে,—কালে-ভেরে বিশ রসদর পরে হয় একটী রুদ্ধ বাধিলে,—তখন সিপাহীকে একবার বন্ধ খাড়া করিয়া হুইকোলা দাঁড়াইতে হইবে। এমন সিপাহীকে অনেক দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারে এ জীবন কসিনকালে রুদ্ধ করিতে হয় নাই।—যেহেতু সিপাহীকার্যে প্রবেশ করিয়া,—শেষে রুদ্ধ হইয়া, পেনশন লইয়া, অনর্কমানে খরচে প্রাণন করিয়াছে।

বস্ত্ত সিপাহী-জীবন বিশেষ হুইকোলা জীবন। অতি প্রত্যহ, একট-আইটী বোর-বোর থাকিতে, থাকিতে—উদ্ভীর্ণ থাকিতে আরম্ভ হয়। উদ্ভীর্ণ ইংরেজী নাম “টাইট”। উহার, বাতলা নাহ নাই। অর্থাৎ খুব ভাতের বিউগাল বা বিলাতী বাসী বাজিতে থাকে।—সিপাহীদিগকে শয্যা হইতে অমনি তড়াডাইয়া গুজুড় করিয়া উঠিতে হয়। ৭২বীদমান যেনন বন্ধ হইলে, তৎক্ষণাৎ, ত্রুসনি দামামা-ধনি হইতে লাগিল। সিপাহীগণ তখন সজ হইয়া প্রান্ত-রুতা সমাপন করিল। পোষাক পরি। বন্ধ হাতে ধরিল। কিছুক্ষণ পর, আবার দ্বিতীয় বার সিপাহী বাসিল। সিপাহীগণ অমনি পায়েড করিতে বাধিত হইল। অর্থাৎ সময়-কৌশল শিখিবার জন্য

ময়দানে গমন করিল। যেদিন প্যারেড থাকে না, সেদিন আর দ্বিতীয় বার বৃশ্চীলন হয় না। কিন্তু শীতকালে প্রায় প্রত্যহই প্যারেড হয়। কেবল রবিবার ও বৃহস্পতি বারে প্যারেড হয় না। প্যারেড-ভূমিতে গিয়া বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কান্না নহে। শীত-কালেও এ কাজ দেখে বিশেষ ঘর্ম্মাক হয়। আর তেমন-তেমন কঠিন প্যারেডে কোন কোন সিপাহীরা কখন কখন হাত-পাও ভাঙিয়া গিয়া থাকে।

সিপাহীরাগণকে নির্দিষ্ট নিয়মামুত্রে পাণ্ড (পাহারা) রূপে নিযুক্ত থাকিতে হয়। যেখানে অস্ত্রাগার, সেখানে কতকগুলি সিপাহী দিনরাত পাহারা-স্বরূপ কাজ করিতেছে। যেখানে ইংরেজ-গবর্নর 'সেনা' (বাঁদা বাইবার ঘর), সেখানে কতকগুলি সিপাহী দিনরাত্রি পাহারা দিতেছে। যেখানে তাঁর প্রজ্ঞতি রক্ষিত হইয়াছে, সেখানেও পাহারা চাই। রেজিমেন্টের বাজনাখানার পাহারা ছাড়ে। পট্টনের বাজারেও পাহারা আছে। মন্দির পট্টনকে রক্ষা করিবার জন্য পাহারা আছে। আরও নানা স্থানে পাহারা। পালান-অমুত্রে সকল সিপাহীই জমায়ে পাহারা দিয়া থাকে। প্রত্যেক সিপাহীকে প্রত্যহ আট ঘণ্টার হিসাবে পাহারা দিতে হয়। প্রত্যেক দুইঘণ্টা অন্তর পাহারা বদল হয়। একজন সিপাহী দুই ঘণ্টা পাহারা দিল, চারি ঘণ্টা বিশ্রাম করিল, আবার দুই ঘণ্টা পাহারা দিল। এইরূপে দিনরাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ ঘণ্টা কাল প্রত্যেক সিপাহীকে পাহারা দিতে হইবে।

পাহারা দেওয়া বড় কঠিন কাজ। একটু এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। সামান্য একটু নিয়ম-গুলিক হইবার যো নাই। সামান্য একটু নিয়ম-গুলিক হইলেই অমন (কোর্ট-মার্শালে) সামরিক-আদালতে সিপাহীরা বিচার হইয়া থাকে। বন্ধুগণকে সুকের নিকট ঠিক সোজাভাবে উঁচু করিয়া দিয়া, নির্দিষ্ট-পরিমাণ ভূমিতে নির্দিষ্ট পাদ-বিস্তার সিপাহীকে কেবল পাদচারণ করিতে হইবে। এইরূপ পাচালি করিতে করিতে সিপাহী যদি একবার বসে, তাহা হইলে সে গুরুতর অধরাগে অপরাধী হইল। তখন একবার ঠেস দিয়া কোথাও দাঁড়াইবার যো নাই। দাঁড়াইলেই বিঘম দেয়। তখন কাহারও সহিত কথা কহা কহিবার অধম নাই। কথা কহিলেই দৃষ্টান্তে। পাহারার কাজ বড় কঠিন কাজ।

সিপাহীরাগণকে উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্মচারীগণের 'অর্ডারলি' হইতে হয়। অর্ডারলি ভাবার্থ আট-

দালি;—অর্থাৎ পত্রবাহক,—পিয়ন। যিনি প্রধান সৈন্যবাহক, তাহার প্রত্যহ ছয় জন বা আট জন অর্ডারলি আবশ্যক। এইরূপে কেহ পাঁচ জন, কেহ চারি জন, কেহ দুই জন, কেহ বা একজন অর্ডারলি পাইয়া থাকেন। সিপাহীরাগণকে পাল্য করিয়া এইরূপে পিয়নের কাজ করিতে হয়।

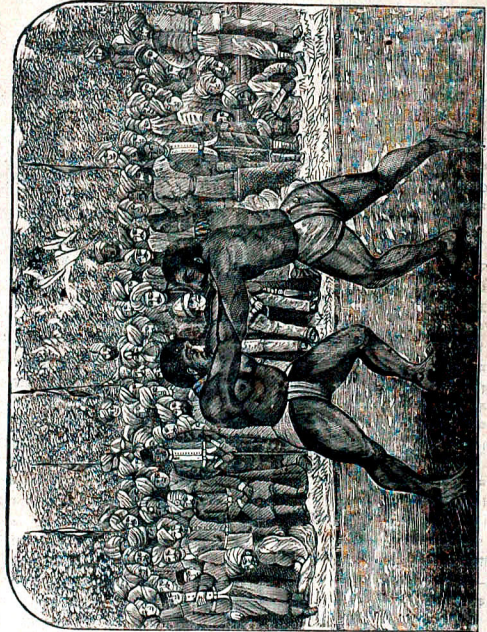
এইরূপে গড়ে প্রায় দুই-শত আড়াই-শত সিপাহী প্রত্যহ গার্ড এবং অর্ডারলির কার্যে নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট যে সকল সিপাহী থাকে, তাহারা ই প্যারেড-ভূমিতে গিয়া রণকৌশল শিক্ষা করে। প্রত্যেকে পাত্রেখান করিলেই প্রথমে ঠিক হয়,—অল্য গার্ড বা অর্ডারলির কাজ করিবার জন্য কাহার-কাহার পাল্য পড়িয়াছে। ফল কথা, মোটের উপর খাটিতে হয় খুব। প্যারেড উপর পা দিয়া, বসিয়া-বসিয়া, জামাই-আদরে বাঁহী-মাথিয়া, কোনও সিপাহী মাথিয়া প্রাপ্ত হয় না। সিপাহীকে মাথার বাম পায়ে ফেলিতে হয়, তবে তাহার ডান-হাতটা মিলে।

সেনা-নিলাসে সিপাহী-জীবনে আনন্দ আছে। যেদিন কাজ নাই, সেদিন আহারাদির পর কেহ দ্রুত করিয়া তুসদাদাসী রামায়ণ পড়িতেছে; আর, বিশ জন সিপাহী তাহারে বেঠন করিয়া তাহা একাগ্রমনে শুনিতেছে। শুনিয়া, কখন কাঁদিতেছে, কখন হাসিতেছে, কখন ক্রোধে উদ্ভীষ্ট হইয়া বলিতেছে,—“হুট নিশাচর রাবণ এখন নিপাত হউক।”

কোন দিন দেখি, ঢোলক, মন্দির, তানপুরা লইয়া সিপাহীগণ পান আরম্ভ করিয়াছে। শত শত সিপাহী, দর্শক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কোথাও দেখি, কৃষ্টি-খেলা হইতেছে। সে দিন সিপাহীগণের আগ্রহ উৎসাহ দেখে কে? পদাতি-পট্টনের মধ্যে অনেক পাগোয়ান ছিল। এক এক জনের দেহ যেন সৈন্যক-পাহাড়ের স্তম্ভ। দেহ দেখিলে মনে হয়,—যেন কলিকালে পুনরায় অশ্বাব-তরের আবির্ভাব হইয়াছে। অপৌকিক শৈথিক বল দেখিয়া, সৈন্যবাহক, এইরূপ পাগোয়ান-সিপাহী ভক্তি করিতে ভাল বাসিতেন। পাগোয়ান-সিপাহীগণ প্যারেড করিত বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের তাদৃশ মনে মনোযোগ ছিল না। তাহারা মৃগ্য ভাঁজিতে, নখন ফেলিতে, সোঁহ-বহু টানিতেই বিশেষ অগ্ররত। আহারাদির পর বেশা ২টা বা তদার সময় যখন কোন কাজ না থাকিত, তখন তাহারা কৃষ্টি করিত; অস্ত্রাভ সিপাহীগণকে কৃষ্টির প্যাঁচ শিখাইত।

বেরিলির ছাউনীতে কুস্তি-খেলা।



সংবাদ আসিল, সহরে অমুক বড়লোকের বাড়ী হুইক্সন স্কুটারি পালোয়ান আসিয়াছে। অমনি তাহা দেখকে নিমন্ত্রণ করিয়া পণ্টনে আনা হইল।

আর যদিও পর হাসি-জামাসা আসেন-আজ্ঞা হইল তার পর; পণ্টনের কোন সিপাহীর সহিত তাহারের মধ্যে এক জনের হুস্তি-খসিয়ার প্রস্তাব করা হইল। উভয়ের সম্মত হইলে, সৈন্যধাককে একথা জানান হয়। এমন কথা আমি-ই অগ্রণী। সৈন্যধাকের এবিষয়ে কলি কোন কাগজ অমত হইবে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার মত কহাইয়া আমি ১ কল কথা, সৈন্যধাকও সাধারণত বুঝ উৎসাহী। তিনি প্রায়ই নিজে ২৫ বা ৩০ টাকা দিয়া বলেন, “যে পালোয়ান জয় লাভ করিবে, সেই ৫ টাকা পাইবে।”

যখন বড়-সাহেবের হুকুম হইল, তখন মাঠে হুস্তি-খসিয়ার এক স্থান চিহ্ন করিলান। সহরে যত সাহেব-সুবা আছে, সৈন্যধাকেরে নিমিত্ত হইতে ১-২তাহারের নামে এক নিয়ম-পত্র বাহির করিয়া লইলান। সদাশাল, মুসলক, উকীলপণও নিমন্ত্রিত হইলেন। আর, সিপাহীপন, অধারো-দগ, ইহারাত আসিবে। সহরে বেখানে যত বেক, চেয়ার আছে, সমস্ত আনিয়া তাহার মাঠে লগাইল। হুইক্সন নামে পলিচা-শতরু পাতিয়া বিলাম। যে স্থানে হুস্তি-কোলা হইবে, সে স্থানটি বাবুকারে করিলাম। কাঠের বেড়া তাহার চারি-দিক্ বেরিলাম। কেল একটা মাত্র দ্বার রহিল। সৈন্যধাক-মধ্যে এমন উদ্ভাস এবং উদ্ভাসের দিন হইয়া আর হইবে না। কিরপ তাহা হুস্তিখেলা হয়, এবং দক্ষবল কিরপ আহারের সহিত সে ক্রীড়া উপভোগ করেন, তৎসংকে পূর্ণ পুষায় একখানি চিত্র প্রদর্শিত হইল।

কায় হ'ণ, কায় জিত হইল,—ইহার সীমামা কবির জয় ৩ জন, ৫ জন, বা ৭ জন মধ্যম বিসিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে গোয়ালপণও ১০—জয়-পরাজয়ের হ্রি হইত না। উভয় পক্ষই বলিত,—“আমার জয়, আমার জয়।” এই উপায় লইয়া কখন বা দাশ-দাশীয়া বাধির ব্যাপার হইত। সৈন্যধাক সাহেব তখন উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া, উভয় পক্ষকে কিছু কিছু পুরস্কার দিয়া উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতেন।

সিপাহী-জীবন ‘সহরেও নহে, দুহরেও নহে—সুখ-দুঃখে মিশ্রিত। মধ্য-জীবন সর্বত্র এইরূপ।

সিপাহী, আপন গৃহে, আপন সমাজে সম্মানিত। ছোজার কার্য, গোবের কার্য বলিয়া গণ্য। এইরূপ নানা বিষয়ে সিপাহী লাভবান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পদাতি-সৈন্যদলের কথা কথিত বলালাম। ইহার অধারো-সেনার কথা কিছু বিবৃত করিব। তাহা যথা হইল, যাহা অতি সংক্ষেপে জানিবেন। সমুদায় বিদ্য বাখা করিয়া বলিতে গেলে, এক পদাতি-সৈন্যের কথাই একখানি গ্রন্থ হইতে পারে। অধারো-সৈন্যের ব্যাপার অসংখ্যাত্ত কিছু বিস্তৃত। কিন্তু ইহাও খুব সংক্ষেপে করিব। কেহ রিক্ত হইবেন না,—বাজে কথা বলিয়া এসব কথা কেহে উৎসাহ করিবেন না। এতদ কথা বাঙ্গালীর পক্ষে নহে, অজ্ঞত নৃত্যেরে খাতিরেও ইহা পাঠ করা উচিত।

পদাতি-রেজিমেন্ট পুর্বেই বলিয়াছি, আট দলে (কোম্পানীতে) বিভক্ত। অধারো-সৈন্য-মেট ছয় দলে (ট্রুপস) বিভক্ত। * এখানে কতগুলি ইংরেজ আছে, দেখুন,—(১) সৈন্যধাক (২) ডিটার-সৈন্যধাক (৩) এক জন আডকুটাই (৪) এক জন ইংরেজ-ডাকার।

কতগুলি সৈন্য লোক আছে, দেখুন,— ১০ জন নেট-ব-আফিসার, ৫৯ জন নন-কমিশণ্ড আফিসার, ছয় জন ডিগ্রি, ছয় জন কনষ্টাবল, এবং ৫০৯ জন অধারো-সৈন্য। তবে জন নেট-ব-আফিসারের মধ্যে তিন জন রেফোদার আছে। ইহাদের পদ ব'ব উক্ত। ১ম রেফোদারের মাসিক বেতন,—৩০০; ২য় রেফোদারের মাসিক বেতন,—২৫০; ৩য় রেফোদারের মাসিক বেতন ২০০। ১ম রেফোদার ‘রেফোদার-মেজর’ নামে অভিহিত হয়। তিনি মাফিা ব্যাডজ আরও ৩০০ টাকা মাসিক ‘আলাউএদ’ রূপ অধিক পাইয়া থাকেন। তিন জন রেফোদার আছে। প্রথম রেফোদারের মাসিক বেতন ১৫০; ডিটারের বেতন ১০৫; তৃতীর ১২০ টাকা। ছয় জন জমাদার আছে। প্রথম দুই জন জমাদারের বেতন মাসিক ৮০ টাকা হিসাবে; দুই জনের ৭০ টাকা হিসাবে; বাকী দুই জনের ৬০ টাকা হিসাবে। এক জন ‘উদ্দীমেকার’ আছে। তাঁহার পদ

* এক্ষণে অধারো-সৈন্যের আট ট্রুপে বিভক্ত।

রেফোদারের তুল্য,—মাসিক বেতন ১০৫ টাকা। সর্বসত্ত্ব এই তের জন নেট-ব-আফিসার।

৫৯ জন নন-কমিশণ্ড আফিসারের হিসাব। ৬ জন কোং-দফাদার; প্রত্যেকের বেতন মাসিক ৪৭ টাকা। ৪৮ জন দফাদার; মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৩০ টাকা।

ছয়জন যে, বংশীবাদক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের মাফিা মাসিক ৩০ টাকা। এই ছয়জনের মধ্যে একজন কর্তা আছে—তিনি ৫ টাকা ‘আলাউএদ’ রূপ অধিক পান।

প্রত্যেক ডিগ্রির বেতন মাসিক ৫ টাকা। সওয়ার বা অধারো-সৈন্য যখন প্রথম ভর্তি হয়, তখন সে মাসিক ২৭ সাতবিহ টাকা করিয়া মাফিা পায়। ছয় বৎসর পরে, ঐ বেতন ২৮ টাকা হয়। দশ বৎসর পরে ঐ বেতন ২৯ টাকা হয়। ১৫ বৎসর পরে ঐ বেতন ৩০ টাকা হয়। বম,—আর বেতনের বৃদ্ধি নাই। সৈন্যগণের যদি দ্বিভা-চরিত ভাল হয়, যদি উত্তমরূপে কাজ করে,—তাহা হইলেই উপরোক্ত নিয়মে বেতন-বৃদ্ধি হয়, নচেৎ নহে।

সওয়ারপদের কমিশনকালে আর কোন উপায়েই যে, বেতন-বৃদ্ধি হয় না, তাহা নহে। ১ম সওয়ার হইতেই সে, সর্বোচ্চপন্থ রেফোদার-মেজর হইতে পারে। তখন তাহার বেতন হয়, মাসিক ৩০০ টাকা। যেমন জয়েট-মাজিষ্টার হইতে হাইকোর্টের জজ হওয়া যায়, সেইরূপ সওয়ার হইতে রেফোদার-মেজর হওয়া যায়। এখাও সেখিয়া সওয়ারপদের ক্রমশ পদোন্নতি হয়। ৩০ টাকা বেতনের সওয়ার প্রথম উন্নতিতে দফাদার হন। দফাদার হইতে কোং-দফাদার হন। কোং-দফাদার হইতে জমাদার হন।—এইরূপ পদবৃদ্ধি হইতে থাকে।

দুইতিনে বাহাই হউক, প্রথমে সওয়ারকে জর্জি হইতে হয় মাসিক ২৭ টাকার। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, এক জন পদাতি-সৈন্যের বেতন ৭ টাকা; আর একজন সওয়ারের বেতন ২৭ টাকা! কেন এত পার্থক্য হইল? পদাতিরা অপেক্ষা অধারো-সৈন্য বেশ-না বেশ-দ্রিগ হউক;—এ, একবারের প্রায় চারগুন কেন?

সওয়ারের বেতন তিনিতে সাতবিহ বটে, কিন্তু দ্বিতীয় মাফিা ব'ব কম* সওয়ার ২৭ টাকার ভর্তি হন মতা, কিন্তু শোজার খরচ ‘সিয়া’ ঐ বেতন

হইতে মাসিক ১৫ টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। ঐ ১৫ টাকা হইতে বেসেডা-সিফারের বেতন, শোজার টাকা, শোজার শীতবস্ত্র, কপাল, বোডা-বন্ধনের ঐগাড়া-পিছাড়া বড়ী,—ইত্যাদি ইত্যাদি গণনামেট ক্রয় করেন। এই ১৫ টাকা ছাড়া, আরও ২৫০ টাকা গণনামেট মাসিক কাটিয়া গন। ইহার নাম খরচা-ক্ষণ্ড। এই ২৫০ টাকা হইতে সওয়ারের জজ তাঁরু খরচি, বস্ত্র খরচি, এবং বন্ধু তলোয়ার প্রভৃতি মেয়াদ হয়, যেপা, নাপিত, খেখের খরচ,—ঐ ২৫০ টাকা হইতে হয়। যখন ঐ ২৫০ টাকার উপরোক্ত খরচ না-কুশার, তখন মাসিক ৩ টাকা বা ৩০ টাকা পর্যন্ত কতিত হইয়া থাকে। সাধারণত একজন সওয়ার মাসিক বেতন পায় ১০০।

সওয়ারদের আরও একটা কণ্ড আছে। তাহার নাম আমানত-কণ্ড। তাহাতে প্রত্যেক সওয়ার গুণডামানের মাফিা জমা দিতে বাধ্য। তখন সওয়ার কেন, ঐ কণ্ডও সময়েই—নাথ রেফোদার-মেজর পর্যন্ত ঐ রেফোদারের মাফিা জমা দিয়া থাকেন। যিনি এককালে, ব'ব হইতে আনিয়া ঐ কণ্ড মাসের মাফিা তিন টাকা আমানত-কণ্ডও কেলিয়া দিতে না পারেন, তিনি মাসে মাসে এক-আধ টাকা-করিয়া দিয়া ক্রমশ ঐ কণ্ড মাসের মাফিা পূরণ করেন। *এইরূপ কোন কোন রেজিমেন্টে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা জমিয়া যায়। যদি পুত্র-কন্যার বিবাহ বা পিতৃ-মাতৃ-জ্ঞা, গৃহনির্মাণ বা অজ কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্যে সিপাহীর টাকা কর্ত্তের, দরকার হয়, তবে সিপাহী ঐ আমানত-কণ্ড হইতে বাধিক শতকরা ১০ টাকা হুসে টালপ কর্ত্ত হয়। টাকা কর্ত্ত হইতে হইলে, প্রথমত সৈন্যধাককে দখলাত করিতে হইবে। সৈন্যধাকেরে হুকুম হইলে, সওয়ার টাকা কর্ত্ত পায়; হুকুম ব্যতীত টাকা পাইবার যো নাই।

কোন সওয়ার যখন পেনশন লাইয়া, অথবা নাম কাটিয়া ব'ব যায়, তখন ঐ কণ্ড মাসের মাফিা আমানত-কণ্ড হইতে ফেরত পায়। কিন্তু হুদ পায় না। ঐ ২৫০০ হাজার টাকা গণনামেট হুদে খাটান। রেজিমেন্টে রেজিমা-মুখিয়া শতকরা বাধিক ১৮ টাকা হুদে প্রায় ৫ হাজার টাকা কর্ত্ত লইয়া থাকে। আরও নানাবিধ ঐ টাকা হুদে খাটে।—একটি খাটতে-খাটতে কোন কোন রেজি-মেটে ৭৫০ হাজার টাকা মজুদ হয়। সওয়ারদের

টাকা এইরূপে আমানত-ফণ্ডে গিয়া, যুগে-যুগে কুইটী কাপিয়া উঠুক না কেন,—সওয়ারীদিগকে যখনই টাকা কর্ত্ত লইতে হইবে, তখনই শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হুদ দিতে হইবে। অর্থাৎ নিজের টাকা, হুদ দিয়া নিজেদের কর্ত্ত লইতে হইবে।

অনেক রকম পরীক্ষা দিয়া সিপাহী-ভর্তি হয়। পঁচ ফুট জট ইকির কম লম্বা হইলে, তাহাকে পদাতি-সৈন্য-মধ্যে লওয়া হয় না। পঁচ ফুট চার-ইকি পর্যন্ত লম্বা লোকের সওয়ার হইতে পারে। তবে কতিপয় গলা—মধ্য-৬ ফুট ৬ ইকি হইলে তাহাকে অখারের—দল-মধ্যে কেব্‌ গ্রহণ করে না। এইরূপ নূরুর নির্দিষ্ট মাপ আছে। এই সব মাপ-যেখ ঠিক হইলে, ডাক্তার-সহের তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। অবশেষে বুক-পিট, হাত-পা টিপে-টিপে দেখা হয়। তাহার চক্ষুর তেজ দেখিবার জন্য তাহাকে দূরে দাড় করা হয়। লাল-নীল রক্ত দেখান হয়, অঙ্গুলি দেখান হয়। কল কথা, বড় বিয়ম পরীক্ষা। রেজিমেন্টের ডাক্তার মাথের এ বিষয়ের পরীক্ষক।

সওয়ার, ইংরেজ-সৈন্যাদ্যদের নিকট ভর্তি হইবার জন্য গরম উপস্থিত হইয়া প্রথমে আবেদন করে। আবেদন-কালে, সৈন্যাদ্যক একবার তাহার আপান-মস্তক পরীক্ষা করেন। তীব্রদৃষ্টিতে এই-রূপ পরিদর্শনের পর ইংরেজ-সৈন্যাদ্যক তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—‘রূপের মজুদ হায়?’ সে ব্যক্তি উত্তর দেয়—‘হাঁ, খোদাবন্দ! মজুদ হায়!’ টাকা নাই, বা কম আছে,—যদি এইরূপ উত্তর সে ব্যক্তি দেয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়। টাকা মজুদ আছে জানিলে, তবে সৈন্যাদ্যক তাহাকে পরীক্ষার জন্য ডাক্তার-মাথেরের নিকট পাঠাইয়া দেন। ডাক্তার মাথের তাহাকে পুরোঁ-রকম বিয়ম অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া,—পছন্দ হইলে, যেমন—‘উপযুক্ত’। অসচ্ছন্দ হইলে, লেখেন,—‘অসুপযুক্ত’। ‘অসুপযুক্ত’ কর্ত্ত প্রার্থী অবশ্যই শুমারনে বসে ফিরিয়া যায়।

সৈন্যাদ্যক, কর্ত্ত প্রার্থী সওয়ারকে প্রথম দর্শনেই বেকিজাস করিগেন,—‘রূপের সব মজুদ হায়?’ —একবার অর্থ কি? রক্ত কেব্‌ বুঝিগাছেন কি? অখারের হইবার জন্য চাকীরী-প্রার্থী হইয়া আসিলে, সঙ্গে করিয়া নগদ প্রায় আড়াই শত বা পৌনে তিন শত টাকা আনিতে হইবে। অখারেরাও নিজে বোড়া নিজে কিনিতে হয়।

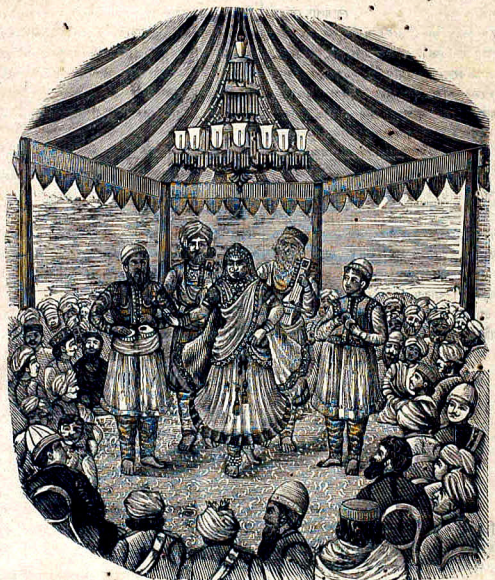
অখারেরা বোড়া গবর্ণমেন্টে নিজ খরচায় কিনিয়া দেন না। প্রথমে বোড়া-খরচ নগদ সেই কর্ত্ত-প্রার্থীর নিকট নগদ ২০০০ দুই শত টাকা লওয়া হয়। ঐ দুই শত টাকা ‘চান্দা-ফণ্ডে’ জমা হয়। ঐ দুই শত টাকা লইয়া গবর্ণমেন্ট, দেই সওয়ারকে একটা বোড়া দেন। গবর্ণমেন্টের অনেক বোড়া খরিন হইয়া, শিকিত হইয়া আন্তবলে মজুদ আছে। সেই মজুদী বোড়া হইতে সওয়ারকে একটা বোড়া দেওয়া হইল। বোড়ার জিন, লাগাম এবং অস্ত্রাচ্ছ মাজ-সরঞ্জাম খরিন করিবার জন্য আরও ৭০০০ টাকা সেই ব্যক্তিকে জমা দিতে হয়। এই ৭০০০ টাকা একান্ত নগদ না দিতে পারিলে, ধারে কাজ চলে। অর্থাৎ সওয়ার মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা উহার জন্য দিয়া থাকে। নির্দিষ্ট টাকা শেষ হইলে, তখন আর কিছুই দিতে হয় না। পেশমুন লইয়া বা নাম কাটা হইয়া সওয়ার যখন মরে ফিরিয়া যায়, তখন ঐ ২০০০ টাকা তাঁর এবং ঐ ৭০০০ টাকা পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সে ব্যক্তি, এই গচ্ছিত অর্থের জন্য হুদ কখনও কিছুই পায় না।

প্রতি দুইজন সওয়ারের একটা করিয়া সহিস চাকর থাকে। প্রত্যেক সহিসের একটা করিয়া টাই-বোড়া আছে। এই টাই লইয়া সে মাঠে বাস করিতে যায়। রেবেলা যখন অস্ত্র হানে ‘হা’ করে, তখন সওয়ারদের তাঁবু হুতাদি ঐ টাই দ্বারা বাহিত হয়। সওয়ারদের তাঁবু হুত—নাম মাত্র তাঁবু। সহিস এবং টাইর জন্য খরচ-পত্র, সওয়ার-প্রদত্ত পুরোঁকা ১৫ টাকা হইতে নিষ্কাসিত হয়।

অখারেরা—সৈন্য-সমূহের আরও অনেক কথা বলিবার আছে,—কিন্তু হানাভারে সলজ কথা লিখিতে পাইলাম না।

অখারেরা—সৈন্যদল-মধ্যে মাঠে মাঠে মহা-সমারোহে তরকারি নাচ হইত। বড় মাঠে, ছোট মাঠে,—সমস্তই নর্ত্তকীর নৃত্য-দর্শনে উৎসুক। বেরিলি-অফলে পরমা দ্বন্দ্বেরী নাচনেওলা পাজী হাইত। তাহাদের হাব-ভাব, ভাল-মান, হুদ-গান বড়ই মনোমোহক। কথাবার্ত্তা, আলাপ-আপ্যাহিত হইয়া সিদ্ধ। এমন মরদারীয়া, মরদ-জামিদি কামারী সম্রাচার অস্ত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। পূর্বাধের অপর্যায়শী বালিয়া ইয়ারা বিখ্যাত। নাই-নিতাল এবং কুমারের পার্শ্বত-প্রদেষে ইহাদের রাসা। তথায় ইহাদের মস্তদায়,—‘পাজানি’ নামে অভিহিত হয়। ইহারা হিন্দুধর্মই মাজ করে। ইহারা

বেরিলি-শিবির,—তয়ফার নাচ।



হরপার্কতীর সোবিকা। হুন্দরীগণের আচার, অহুঠান, নিষ্ঠা—সমস্তই প্রকৃত হিন্দু ধার। মুসলমানের মতই একাসনে বসিয়া ইহারা পান-ভোজ্য খায় না। মুসলমান-শৃণ্ট হইলে, ইহারা গান করে। এই মদুরতাবিধিগণ প্রভাতে উঠিয়া শিব বা দুর্গা পূজায় প্রায় দুই এক বটা-কাল অতিবাহিত করে। ইহাদের ব্যাপার কতকটা গৃহস্থের দায়, কতকটা বারিবাল-নিদার ভায়। মা-বাণ-ভাই—ইহারা গৃহস্থ—অন্দরে থাকেন; আর, কতক মন্তকীর ব্যবসার অব-লম্বন করিয়া বাহিরে, যৈঠকখানার অবস্থিত করেন,—এক পর পুরের গৃহে নৃত্যগীতাদি দ্বারা অর্থ উপা-

র্জন করেন। এই রামজানি জাতি রহস্য এই,—কতক হইলেই সাধারণত নর্ত্তকী হয়, আর পুত্র হইলে সেই পুত্র গৃহস্থ হয়,—যথাসময়ে পুত্রের বিবাহ হয়,—তখন পুত্র-বধুর বোমটার বোর-মটা দেখে কে?—এক একবারি বোমটা প্রায় আড়াই হাত লম্বা। বর, পরপুত্রের মুখটা পর্যন্ত বুঝি, কখনকালে দেখেন না।—অধিক কি, পুত্রেরও মুখ বুঝি কখন অবলোকন করিগেন না!

আমাদের রেজিমেন্টের বড়-মাঠের এই জাতীর নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিতে ভাল বাসিতেন। উপরে তয়ফার নাচের একটা দৃতি প্রকাশিত হইল।

এ ছবি ঠিক হয় নাই। আমি যেমন আঁকিতে বলিয়াছিলাম, তেমনটা হয় নাই। তবে কতক আভাস আসিয়াছে,—এই মাত্র। তেঁলোয় যেদিন বড়-মাহেরের আভাস নাটক হইত, সেদিন মহা মহা ধুম পড়িয়া যাইত। জুজ, মাজিষ্টার, জমিদার, মহাজন—সকলেই নিমন্ত্রিত হইতেন। আমি শালোয়ানের হুস্তি-শেলার দিন যেমন বিব্রত হইতাম, নাচের দিন তেঁলোকা অধিক বিব্রত থাকিতেন। কারণ সমারোহ-সম্রাটের দিন সোঁকতে জনতা বেশী হইত। তখন-নাচের সমস্ত বসো-বস্ত্রের ভার আমার উপর নির্ভর ছিল। আস-বোলাসে বজলিস মাং হইয়া উঠিত। কখন কখন কোঁকো কান রাতে চারি দল, বা ছয় দল তরকা নৃত্য করিত—নাচের বিরাম নাই, সমস্ত রাাত্রিই নৃত্য চলিত—দর্শক-দুন্দুভও বিরক্ত নাই, সমস্ত রাাত্রিই ঠায় বসিয়া আছেন। প্রভাত হইল; তু-অনেকে ইচ্ছা, আরও থাকিও নাচ চাও। ১৮৭৭ সালের প্রারম্ভে এইরূপ অসুখী আমোদেই আমার দিন কাটিতে লাগিল।

শ্রীচূর্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাম-মাহাত্ম্য।



অবতরণিকা।

হেঁজি দেখিয়া হয়ত অনেক মনে করিবেন, আমি হরিনামের কি দুর্গানামের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে বসিয়াছি; হয়ত মনে করিবেন, কোন অজামিন্দুসুখ রিপাপচারীর ভাবনাম-খণ-মাত্রের অতিভাষ্যপূর্ণি লাভের কথা কানাইতে প্রস্তুত হইয়াছি। অনেক ভক্ত হয়ত নাম দেখিয়াই আনন্দাশ্রু কণ্ঠে স্রবণ করিয়া অগ্রহেরে সহিত এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে বসিবেন; এইজন্য আরছেই বলিয়া রাখিতেছি,—ইহাতে সে সব কথা কিছুই নাই। ইহা ভগবৎ-প্রসঙ্গ নহে; একটা বটনাম-সামাজিক সামান্য বটনাম মাত্র অর্থাৎ 'বোকা' কি 'ভেল'।

বটনাম-সামাজিক সামান্য বটনাম মাত্র অর্থাৎ বটনাম ত বেশ বুঝা গেল, কিন্তু 'অর্থাৎ' এতট

যে বস্তু অনর্থক। অর্থাৎ বেল কি ভেল? বাঁহা থাকিলে কাকের কান লাভ নাই, ভাটুশ ফল-বিশেষই ত 'বেল'। বটনাম বাজালা, বেল শব্দ যাহা ষষ্ঠী বা জামিন বুঝাইতেও প্রস্তুত আছে, কিন্তু প্রবন্ধের সহিত তাহার যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা ত বলিয়া না। আর ভেল শব্দে ত 'নকল'; তাই বা সমস্ত হইবে কিরূপে?

‘কৈ’—সামাজিক নকল বলিলে কি অর্থ বুঝা হয় না?

‘মহাশয়! আপনি এইরূপ করিয়া প্রবন্ধ লিখিবেন—! আপনাত ত দেখিতেছি—বেলন বোকা বুঝাইতে চেষ্টা। কিন্তু আমি তবের বোকা নহি; ভেল মানে ‘আসল-নকলের’ নকল। যে নকল রকম-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা ত ভেল শব্দেই প্রকাশিত হয়। নকলে-নকলে মিলাইয়া যা-তা রকমে সঙ্গত করিতে চান না কি? আপনাত কি এ লক্ষিত কথাবা?—

‘কেটে বটে’; তুমি যে ভাল দেখিতেছ; বেশ বেশ। কথাটা কি জান; উপভাসকে ইংরেজীতে নলে কি নকলে বলে; এইরূপ ভনিতে পাই। আমি যে ঘটনাদি লিখিব; তাহা উপভাস অর্থাৎ নবেল নহে, বা নকল নহে। আমার নৈয়ায়িক মাহাত্ম্য, পৌরষকে বড়ই ধবার চক্ষে দেখি। অতঃ এইইও জানি,—‘দৌ নকো’ প্রকৃতার্থ ‘গময়ন্ত’; অর্থাৎ তোমরা ইংরেজিতে যাকে বল,—*“Two negatives make one affirmative”*—কহে—ই-স্রোযোগ ছাড়িতে পারি নাই। ‘নবেল নহে’ বলাও বা, আর ‘বেল’ বলাও ভাই; বা ‘ভেল নহে’ বলাও বা, আর ‘ভেল’ বলাও ভাই—নিশ্চিন্ত করিয়া বেল কি ভেল বলিয়াছি। কিন্তু দেশটা যে একবারে দর্শনজ্ঞানহীন হয়েচে, লগুওড় ডেল হাই এমনটা যে হয়েচে, তা আপে বুঝি নাই; বুঝিলে ওরূপ লিখিতাম না। এখন আমার প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছাই হইতেছে না; এমন দেশে আমাদের ছাত্র লেখকের লেখনী ধারণ করিতে নাই; দেশ এখনও ততদূর উপভুক্ত হয় নাই।

‘মহাশয়! ‘বিস্মিতমুহুরে’ হুতুতাপ জন-গতি। লেখা ও বলা একই কথা। এ খাতায় না লিখিলে বড়ই কষ্ট হইবে।’

‘আচ্ছা, অহুরোপে প্রবন্ধ পাড়িলাম, দায়-দোষ আমার নাই। এখন সকলে অবহিত হও।’

কথা।

ওরু চিনিবাম, বায়াজরাবুত চোয়ের উপবিষ্ট, সমুখে এক ধানি প্রকাণ্ড টেবিল; টেবিলের এক পার্শ্বে পেন, ষ্টীলপেন, রু ইনক, ব্রাক ইনক, রটাই, ইংরেজী-সংবাদপত্রস্তুপ, কতগুলি ইংরেজী-গ্রন্থ, চুফট, ২৪টা বাল-ঔষধপুত্র শিশি ও ২টা গ্যাস; অপর পার্শ্বে বাজালা-সংবাদপত্র, বাজালা-পুস্তক, আভার কাগি, কবির কলম, একটা ম-নল ওড়তি ও কতকগুলি ছোটো-খোঁড়া কাগজ; অপর পার্শ্বে কতকগুলি চারবন্ধ হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথি, তালপাত, তেড়েট, বাধারীর কলম, পালাগ কাগি, তুপিপার্ড অলঙ্কার-রস, নত্পূর্ণ শব্দকু ও ভূপুত্র প্রভৃতি;—এতদ্বির স্রো, জর্জান, ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, পার্সী, আর্বি, ফির প্রভৃতি ভাষার এক এক ধানি কেতাব, বিশেষ প্রয়োজনীরে মত নিত্যন্ত সমুখের মুক্তোজ্ঞে ভাবে রক্ষিত। ওরুকে খিরিয়া পাঁচ জন চক্র-শিষ্য উপবিষ্ট।

ওরু বলিতেছেন, ‘আজকাল নামের জ্ঞান লাগা-নিত সর্বাধি; অতঃ বাহাতে প্রকৃত নাম হইতে পারে, সে কার্যে প্রবৃত্তি কাহারও নাই। এখন—(নম্র টানিয়া)

‘বট, ছিত্তাং পটং ভিত্তাং কৃতাং রাসত্যতাদয়ং।
নে তেনং প্রকারেণ প্রমিত্তং জায়েতৈ মার।’

এই স্তোত্র উপাসক অনেকই—প্রায় ১৫ জনাও পাই। ১০ আনা পয়সা কাছড়ক দান করিয়া সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ করিবার জ্ঞান কত-কোটা লামানিত এবং সাহি-স্থানবিরের জোরে এই অসংখ্য নাম প্রকাশ হইয়াছেও কত জোরে। নাম হইবে বলিয়া প্রকটন—কত আশঙ্কিত ভেলিতে ভেলিতে হয়। নাম হইবে বলিয়া কত নিদ্রাপুত্র ভট্টাচার্য্য ধর্ম-ব্রততা করিয়া বেড়াইতে-ছেন। নাম হইবে বলিয়া কত অল্পত কিছুত জ্ঞানবান প্রাণ্ডুত হইতেছেন। নাম হইবে বলিয়া সংবাদ-পত্র সাময়িক-পত্রে কত লোক কত-কি লিখিতেছেন। এত গেলে সহজ কথা; এতদ্বিত নামের জ্ঞান সংবাদপত্রে ভ্রম বিভ্রাণেরও দিতে দেখিয়াছি। গ্রন্থ এক ধানিও নাই, অতঃ সংবাদ-পত্রে দেখিয়াছি—‘অমুক গ্রন্থের লেখতা অমুক।’ জন্মে ধিনি কখন ‘বটুতা’ করেন। নাই, করিবেন না, কুরিবার সম্ভাবনা নাই; তিনিও কায় বহু বয়ে সংবাদপত্রে বাখিপ্রব, বলিয়া

প্রচারিত হইয়াছেন। ‘এখনও দেখিয়াছি, সাত-পুস্তকের মধ্যে ষাটার বয়সে সম্পূর্ণ নাই, তিনিও অধ্যাপক বলিয়া বাহাতে পরিচিত হন, একজন সংবাদপত্রের প্রাক্ত লইয়াছেন। কলকাতা ‘আজকাল’ বয়স্কর ১৪ বর্ষ। অতীত হইলেই নামের জ্ঞান বহুদিনে মনে কেমন একটা অভা-বনীর অভাব আদিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন হইতে সর্বদাই মনে মনে হয়, ‘নাম হইবে কিরূপে? হা নাম।’ সঙ্গে সঙ্গে নাম-প্রকাশের উপায়-উদ্ভাবনেও চেষ্টা হয়। নিদ্রাপুত্র প্রভাবের ভার বেরূপ কোঁশল জুটাই উঠে, সে তাহারই সাহায্যে নাম-প্রকাশে দ্বন্দ্বমান হয়।’ শিষ্যগণ মস্তক-চালনা করিতেছিলেন ও একজন নামে নামে ‘তা বটে’ ‘হিক কথা’ বলিতেছেন। ওরু চুপ করিলেন।

এক জন শিষ্য, একই অসমুদ্র হইয়া বিজ্ঞান করিলেন, ‘ওরুদে! আজ আপনাত মুখে এই অল্পত কথা তনিয়া বড়ই বিমিত হইলেন। আপনি ব্যবহার বলিয়াছেন, ‘গননাম পুস্তকো দত্ত’ যে ব্যক্তি আপনার চেষ্টায় আপনি ব্যাভাষ্য, সেই-ই বট। অতঃ বেরূপ মনে হইক না, সর্ককে ব্যাতি উপার্জনে বা নাম-প্রকাশে বন্ধ করিলে। আপনি বলিয়াছেন, ‘নাম ব্রহ্ম’ শাস্ত্রে একথা গভীর উপদেশ-প্রদ। অতঃ শাস্ত্র গ্রাহকে কথা বিস্তার আছে বটে, কিন্তু হই একটা বেশ সুসঙ্গতপ্রসঙ্গ ব্যাকও আছে; ‘নাম ব্রহ্ম’ ভগবৎ-একটা। নামই ব্রহ্ম। নাম-লাভের জ্ঞান চেষ্টাই—ব্রহ্মোপাসনা। নামলাভ—ব্রহ্মপ্রাপ্তি। যতদূর এখন নাম-লিপ্যার নিদ্রা করিতেছেন; এ গুণ রহস্ত এ দাসকে বুঝা-ইয়া গেল।

ওরু, গম্ভীরভাবে—‘কথাটা বুঝিলে না? নাম ব্রহ্ম বটে; কলশিপুত্র ব্যক্তি নামের জ্ঞান লিপ্যার হওয়া উচিত বটে, কিন্তু অধিকার সর্বদাই নামের বিশেষ রূপে আছে; তা জান। নামের জ্ঞান লাগানিত হইতেও অধিকার হওয়া আবশ্যক। এবং তাহা লাভ করিবার প্রাণীও পতঙ্গ। তাই আমি বলিতেছি, এখন অধিকারী নামকরিত। সর্বাধি নাম লাভ করিতে বাস্ত। হিক উপাসক তাহা অসম্পূর্ণ করিতে পারে না। এই জ্ঞানই ত দুঃখাচার্য্য বলিতেছি।’ আর আমাদের পক্ষে মুদ-লিপ্য মহাপাপ—‘বলিয়া নম্র শাস্ত্রটী বী হইতে লইয়া, একটাপ ‘নম্র’ সত্যেরে টানিলেন। পরে

বলিতে লাগিলেন: “বহাঙ্গ, লাব রূপাল গতো
ব্রহ্মণি লিপ্তংসু।” নামসিদ্ধি আশ্রিত, পামাভা
বা ক্রমোপে ঠিক মনে নাই বৃত্তি দৃষ্টিয়া বলিলেন—
“বিহাঙ্গ নামকপণি নিমিত্ত ব্রহ্মণি লিপ্তংসু।”

পরিমিতভক্তত্বঃ স্বঃ সঃ মুক্তঃ কর্ণধন্যনামঃ।
অর্থাৎ—দাম্ভ্যঃ ব্যক্তিঃ নামলিপ্তঃ পরিভাষ
করিতে হয়।”

শিখা। ওহো! আমার অজানাম্বকার আপনি
দূর করিলেন। এখন কে নামলাভের চেষ্টায় অধি-
কারী? কে অধিকারী? এখন নামলাভের উপায় কি,
তাহা উপদেশ করিয়া দাসভাস্কর্য্যক চরিত্রবৎ
করুন। আমি পুনঃপুনঃ বিরক্ত করিতেছি, নিরুত্তর
অধমের অপরাধ মার্জনা করিলেন।

ওহ। এ বড় কঠিন ও নিশ্চয় রহস্য; ইহাশেণে,
অথ্য তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, মনোপাশে
কর। যে ব্যক্তি একদিনের জ্ঞেও ইহাশেণী স্থলে
ভর্ত্তি হয় নাই; অথবা একদিনেও ইহাশেণী বহি
পড়ে নাই; নামলাভের চেষ্টায় তাহার অধিকার
নাই। যে ব্যক্তি পায়ের জুতা ও গায়ের জামা না
সেধে, অথচ শিখা রাখে, কৌটা করে; নামলাভের
চেষ্টায় তাহার অধিকার নাই। যে ব্যক্তির সমাজ-
সংসারের দিকে আসে দৃষ্টি নাই, বরং তাহার
বিশ্বক—এমন ব্যক্তি শতজন্মেও নামলাভের চেষ্টায়
অধিকারী। যে ব্যক্তি, অল্পত একদিনের জ্ঞেও
উপলব্ধের হোটেলে ঘাস নাই, এক ঘ্রাসও গ্রাহি-
ভায় নাই, তাহার নামলাভের চেষ্টা বিশেষপা-
ষাণক। যে ব্যক্তি, ইহাশেণী সম্বৃত্ত, উত্তর ভাষা-
জ্ঞেও ভাল বাধ্যমান বা শুদ্ধ সত্যসম্বোধে
হৃদপতি নামলাভের চেষ্টায় তাহার অধিকার নাই।
যে ব্যক্তি, কোন একটা কথা উপাশিত ইহাশেণীর
তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে সম্বৃত্ত, ইহাশেণী, উদ্ভূ, পার্শ্বী
প্রভৃতি হই চারিটা অল্পত প্রেক্ষে আশ্রিত করিয়া
ভিতে না পারে, তাহার নামলাভের চেষ্টায় অধিকার
নাই। এবং যে ব্যক্তি, সঙ্গ সত্য বাস্তব বিনিময়ে
একটা মিথ্যা কথাকে গ্রহণ করিতে পারে, নাম লাভের
চেষ্টায় সেইই অধিকারী। যে ব্যক্তি নিজের
কৃৎসাদ্যে বার্থসিক্তির জ্ঞেও পরের সর্বস্বন করিয়া
কাত্যব্রত প্রদর্শন ইহাশেণে পারে; সেই নামলাভ-
চেষ্টায় অধিকারী। যে ব্যক্তি স্বপ্নে এক, স্বপ্নে
আর ও বহু; স্বপ্ন ভাব ধারণ করিতে পারে; নাম-
লাভ-চেষ্টায় তাহার সম্পূর্ণ অধিকার। যে ব্যক্তি,
আশ্ব উভয়ই বসনে সাহায্যে প্রবলন নিকট

হয়, গণলম্বাকৃতবাসা হয় এবং হৃদয়ে, গুল্লেশ
তদ্ব্যয়া বন্ধন করে, সেই ব্যক্তি নামলাভ-চেষ্টায়
নামলাভে উপযুক্ত অধিকারী। যে ব্যক্তি, পিতা-
মাতার সহিত নিমস্তুক অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিগণের প্রতি
মমত্বহীন ও ভ্রাতৃদ্বিগণের প্রতি কর্তব্য-জান-পরিপূর্ণ,
অথচ নিভাত্ত নিমস্তুক অধি পরের হৃদয়ে স্থাপিত,
এমন কি দর-বিলগিত ধরে অক্ষপাতিত, তিনিই
নামলাভ-চেষ্টায় অধিকারী। আর যাহার অর্থ
আছে, কাজে অকাজে—অকাজের অর্থায়ন করিতে
পারে, টাকায় ইহাশেণে বড় সাহায্যের পাণ্ডে পান-
ভোজনের পরিতৃপ্ত করিতে পারে, নামলাভ-
চেষ্টায় ও নামলাভে তাহারই সর্ব প্রথম
অধিকার। প্রিয় শিখা। তোমার প্রেমে ও
প্রার্থনায় অথক ইহাশি আমি এই অধি গোপনীয়
নামলাভ-চেষ্টায় অধিকারী-অধিকারীর কথা
জান আছে; বলাগাম; অথবা নামলাভের উপায়
নির্দেশ করিতেছি, অথচ নয়। বক্তৃতা, গ্রন্থ-
কর্তৃত্ব, সাধারণ-পত্রাঙ্গ-নিম্প্রসঙ্গকাত্ত অল্পত প্রব-
লেকাত্ত, নামলিপ্ত ব্যক্তির একত্বইহাশেণের অল্পতম
উপায় অল্পতমপত্র; এ বিষয়ে সাধারণের পরিজ্ঞান
অল্পতম ইহার প্রকাশ-পক্ষসিদ্ধান্তকে একটু বিশেষ
বক্তব্য আশ্রিত। সাধারণে এসব কথা করে—একটু-
আধটু জামিয়া-ভনিয়া লুপ্তাথো-নামবাক্যে। কিন্তু
তাহা কীট কর্তব্য নহে। যে বিষয়ে অধ্যায়
জান আছে, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করিবে না। যেন
কর, তুমি ধর্ম্মের কোন কথা জান না, কিন্তু তুমি
কখন বীর-পত্নীভাব, কখন বর্ধকালীন আশ্রিত-
নিম্প্রসঙ্গ-বারিধারার ভায় ক্ষতভাবের, কখন বা
কথাবারে মত প্রকাশ-ভৈরবের, বর্ধকালীন অগর্ভ
বক্তৃতা করিবে। দাম্ভ্যাদ্য দেখিও, অর্থ কোন কাহারও
সেখামো বা হৃদয়েণ না হয়। বহি বলিও, যেমন
আমাদের ভিত্তি অধিকার, অধিকারের ভিত্তি আসে,
অধিপণ্যার্থী সের্গামা আমি নিম্নত বলিতে পারি,
শাশ্বতকর্তৃত্ব বলিতে পারি, তখনই সকল প্রাণ-
মণ্ডলী বলিবে, “ব্যাঃ! কি অল্পত বক্তৃতা!। একপ
বক্তৃত্ত আমরা কখন ভনি নাই। ইনি ভারতবর্ষের
সর্বকণ্ঠ্য বক্তা”, অথচ তুমি ধর্ম্মের কথা কর্তব্য
বুঝিছ, তাহাও তোমার অজ্ঞানের দায়। রাজ-
নীতি ও সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধে বক্তৃত্ত-বিষয়েও
ওরূপ—নিম্নত জানিবে। রাজনীতি-বক্তৃত্তা একটু
কলহামলিত আশঙ্ককাত্ত “আজি, কলহা করিয়া
দলটা “আজকাহী” মত সামাজিয়া তাহার গণ-

প্রতিপক্ষের বৃত্তি-আশ্রিতকাত্ত প্রবর্ধন করিয়া বিনি
রাজনীতি-সম্বন্ধে বক্তৃত্তা করিলেন, তাহার বিপ-
লিপ্তগামী মনুষ্য ইহাশেণে। কিন্তু বক্তার রাজনীতি-
সম্বন্ধে “এতদুহু” জানা থাকিলেও চলিলে না।
সমাজ-সংস্কারের বক্তৃত্তা করা সব-চেয়ে সহজ, কিন্তু
বক্তার অর্থ একই কলহপ্রিয় ও বান্যাসে “হজা
চাই। পান্যপালিতা কিছু সংস্কার সমাজের দিকে
তীরমাত্রায় দেওয়া অবশ্যক।

ওরূপকর্ত্ত্বক ও প্রবল-গোপনে এই নিম্নত,
যে বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে, তাহার উপর নির্ভর
করিয়া গ্রন্থপ্রবন্ধ নামলিপ্তপুস্ত্র কদাচ কব্ধা
নহে। তুমি জ্যোতিষের “জা” জান না, গ্রন্থে
তোমার জ্যোতিষ লিখিতে ইহাশেণে, হাজার না
জান না, গ্রন্থে তোমাকে হাজার তর্ক করিতে
হইবে, তব্বলে তুমি নামটা পর্যন্ত জান না, তোমার
তব্বলে মত দুখিতে করিতে, তবে তোমার গ্রন্থ আদুত
ইহাশেণে, ইনি একজন অসাধারণ গ্রন্থকার বলিয়া
পরিচিত হইবে। তুমি বিপ বাস্তব না জানা,
তবে বাস্তবায় গ্রন্থকার ইহাশেণে, ইহাশেণী জানিলে
বাস্তবালী-সমাজে ইহাশেণী-গ্রন্থকার ইহাশেণে। গ্রন্থ ও
প্রবন্ধের একই ধারা। গ্রন্থ ও প্রবন্ধের অস্তিত্ব
“ওপ-পারদর্শন” দেখাইতে ইহাশেণে, নোট বড় বড়
গ্রন্থকারের উক্তি উদ্ধার করিবে। নানা-ভাষাভি-
জ্ঞতার সাহায্য নিবে।

সহায্য-পত্রায়ির সম্পাদক ইহাশেণে, অল্পত সাধারণ
পুস্তকে খুব কল্যাণ পালাপালি দিবে। সৎকার
কৃত্যায় রটনা করিবে ও ত মিথ্যাবল জড় করিতে
পারে, তাহেই প্রচার করিবে। কিন্তু যে মঙ্গল মিছা
ধার সঙ্গল রকমে সকলকে “নিকট ধরা পড়িত
পারে, তাহা প্রকাশ করিবে না। বিভ্রান্তের
পাখনা ইহাশেণে লিখিবে, কিন্তু বাস্তব নাম করিবে,
কোনোমের উত্তরপ্রান্ত লংলুগ্রাম বলিয়া। কদাচ
কলিকাতা বা কোন প্রসিদ্ধ স্থানের নাম করিবে না।
আর সকল বিষয়েই নির্ভরণ করিয়া দিবে। তুমি
জান আর নাই জান, অধিকারের নিকট “সব জাভা”
বলিয়া পরিচিত হইবে। অধিকার, অধিকার, অধিকার
নাম, অধিকার ভাবিবে, এক কটীর সময় ইহাশেণে
কথা বলাই আরম্ভ হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই
সকল হুত্যাণা অবাঞ্ছিত-সুখ্যমিথে যে ব্যক্তি,
নামলাভের জ্ঞেও চেষ্টা করে, তাহার নাম আসমদ
দরিদ্র্যাবল য়ম। এই রহস্য বিষয় ওরূপক ভিত্তি
দ্বারা কায়ের নিম্নে প্রকাশ্য নহে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও পদ্মপুরাণ।

(৫)

আশ্ব মাসের জম্বুভূমি পাঠ করিল পাঠক
অল্পত সুবিধায়, উপাখ্যানের হৃদয়, শব্দসুশ্রু-
বিশেষে কল্প মন্থনীভিত্ত ইহাশিদ্ধান্ত। উপা-
খ্যানকার কেবল বহিঃস্থপে হৃদয়তের বিহবাক্য অল্প-
ত্ব কাহিয়াছেন; নাট্যকারের অন্তরে “অল্পতম-
নিহিত জল্পত জামায়ের বিবর্ত্তকাল-সংস্করণী অধি-
পুস্ত্র নন্দপণ্ডিত দেখাইয়াছেন। উপাখ্যানকারের
সঙ্গে সঙ্গে গিয়া, রাজপ্রাসাদের মধ্যে, মহারাজ
হৃদয়তের সুসংবর্ধনী ইহাশি। সেই জীবনময়ী বিব-
বর্ত্তের প্রকটতা উপলব্ধি করিতে হয়; নাট্যকারের
মুদ্র অল্পতর বহিতে ইহাশেণে না,—বাহিরে বাহিরে,
অল্পতমের বহিঃস্থপে নন্দ-সুশ্রু-বৃত্তিভিত্তি, বিপুল-
বিবর্ত্তনামে বিজামায়ক রাজেশ্বরী প্রদেশমহাশেণে
বিবর্ত্তের শক্তিকারের অল্পতর বহিতে হয়। উপাখ্যানে
বিবর্ত্ত, হৃদয়ত্ব, দেখ-অল্পতম, নাট্যকারের বিব-
বর্ত্ত, হৃদয়ত্ব দেখ-আশ্রিত, নাট্যকারের বিব-
বর্ত্ত দেখ-আশ্রিত। নাট্যকারের বিব-বর্ত্ত
রিক্তমিহাশেণে অল্পতম নহে; জলে স্থলে, স্থলে কলে,
ভদ্রের উল্লিখিত,—তোমারই জম্বুভূমি জল্পত
সুপ্রতি ইহাশি। এমন বিব-জীবনী বিব-বর্ত্ত
প্রকটন করিতে কলিগদ্য কিং ইহাশেণে—আর
পুস্ত্র কেহই সঙ্গম নহে।

হৃদয়তের বিবর্ত্ত বহিতে সাহায্যী? নানী অল্পত
স্বর্ধ ইহাশে মর্ধে অনভীত ইহাশেণে। উপাখ্যানে
সাহায্যী কোথায়? নাট্যকার সাহায্যী আশ্রিত
অপ্রাসাদিক নহে; অথচ সৌন্দর্য-খটীর চূড়ান্ত পরি-
চালক। সাহায্যী কোনকার আশ্রিত। সেনকাই হৃদয়-
পুরী ইহাশে প্রিয়তমা কদা মনুষ্যগণকে ইহাশি “পিয়া

* মিসকেনী (মতান্তরে)।

পিণ্ডবিক্ষেপস্থলভাঃ পিণ্ডানি চ তবৈব হি
ক লভতে সা ললনা সাক্ষাৎ শ্রীরিব রূপিণী ॥
নন্দমাত্যাপ্য পাপিত্তং আত্মা মা পুনরেষাতি ॥
নৈবং বিবস্ত হৃষ্টস্ত দারপত্ৰ চুরাশ্বনঃ ॥
অবিধিবা বরাহো ভাৰ্গবা ভবিতুমর্হতি ॥
এবং বিলম্বস্য চ হৃষ্টস্ত মন্যপাতঃ ॥
যাতীয়াস্মি বর্ধাণি শেচতোহহনিশং হিজ ॥"
পদ্মপুরাণ, স্বর্গপণ্ড, ৫ অধ্যায় ।

ভাবার্থ—অনন্তর মন্ত্রীরা জানিয়া আপন করত
রাজাকে নিদ্রেন করিলেন, “মহারাজ! এই নগরে
বিসাগিনী নদী সেই ববিবরে বর্ভবতা এক ভাৰ্গবা
আছে ॥” রাজা কহিলেন, “নৌকা ও যাবতীয় দ্রব্য
তাহাকে সস্তর প্রদান করা হউক ॥” এই বলিয়া
ভট্টপালকে সেইনরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া ত্রিগুণ শেখে
দখানন হইয়া বলিতে লাগিলেন, “আমার বড়
হইলে আমার রাজ্যের ও এই প্রকার দুর্দশা হইবে
এবং এই পুণ্ডরীক দ্বাৰ্ষিক কি আশীর্ষকের বাটরে
পতিত হইবে ॥ হায়! আমি হতভাগ্য—এমন
হইয়া, গর্ভভাতা মহাভাগ্য প্রসমপাতা ভাৰ্গবকে
উপেক্ষা করিয়াছি ॥ অতপর বিধিপূৰ্বক জল প্রদান
করিলেও, পিতৃগণ ঈশ্বৰ উৎকৃষ্ট নিবাস পরিহার-
পূৰ্বক সেই জল নিত্য আনিব করিয়া পান
করেন; এবং পিতৃ-বিক্ষেপ জন্ত হৃষ্ট একান্ত
ব্যস্ত হইয়া, পিতৃও সেইরূপে ভগ্ন করিলেন ॥
একলে আমি কোথায় যাইলে সেই লক্ষ্যে লক্ষী-
রূপিণী ললনাকে পাইব? তিনি আমায় হতভাগ্য
ও নিতান্ত পাপাত্মা জানিয়া ছাড়িয়া গিয়াছেন;
পুনরায় আসিবেন না। অথবা এপ্রকার দারপত্ৰ
হরতাপত্ৰ তথিবা বরাহো ভাৰ্গবা হওয়া উচিত
নহে ॥” এই প্রকার বিবান্ধি বিলাপ করিতে করিতে
রাজা হৃষ্টস্তের তিনবৎসর অতীত হইয়া গেল ॥

অতপর সৈন্যদমনার্থ ইন্দ্র-প্রেসিত মাতলি
জানিয়া রাজা হৃষ্টস্তকে স্বর্ণে লইয়া গান ৷ ও ধনা
নাটকেও আছে, উপাধানেও আছে ॥ উপাধ্যানের
কথা এই;—
“অথানৌ দেবরাজেন সমস্তুতো যদৌ দিবম্ ॥
ত্রিগির্দেবৈশ্ববদনানাং নিনয়ান ব্রহ্মবিদ্যম্ ॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গপণ্ড, ৫ম অধ্যায় ॥
ভাবার্থ—অনন্তর তিনি দেবরাজের অঙ্গনে
সেবপথের অথবা অশ্বরিদিগের বিনাশার্থ স্বর্ণে গমন
করিলেন ॥

এইখানে কাশিদাস একই বিজ্ঞানেচিত্র কৌশল
বয়লাগেছেন ॥ মাতলি একবারে বিহঙ্গমসমুৎ
স্থগতির সমুদ্র উপকৃতি হন নাই ॥ পাছে বিহ-
ঙ্গম রাজা ভীহার কথায় কর্ণপাত না করেন, এই
জন্ত তিনি রাজার মতি-পরিবর্তনের উপায়ান্তর
দেখেন ॥ তিনি অন্তরালে বিদ্যুৎকে আক্রমণ
করেন ॥ বিদ্যুৎও প্রাণভয়ে ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার
করিতে থাকেন ॥ জন্মাক্রমণের প্রিয়-মহতর
মাধবের আর্জনাও ভুলিয়া রাজাও শত্রুপদে উদাত
হন ॥ তখন মাতলির হৃষ্টস্ত ব্যাপার উল্লাসিত
হইল ॥ কাশিদাসের ইচ্ছাই সূচিত ॥

অতপরকর্তী হনয়ারও গরভাগের তারতম্য
নাই ॥ তারতম্য বা কিছু গঠনে ও আকারে ॥
অক্লিয়-সৌভাগ্য-সাধনেও কখন কোন কোন
স্থানে উপাধ্যানে নিমিত্ত কোন কোন স্থানে ব্যক্তি
পরিভক্ত এবং কোন কোন স্থানে ঈশ্বৰ পরিমাণে
পরিবর্তিত হইয়াছে ॥ এইটুকু বুঝিবার জন্য
আমরা পার্থক্যকর অভিজ্ঞান শব্দভুগের সমস্ত
বাক্য পর্যালোচনা করিতে অগ্রসর করি ॥
মার পর্যালোচনার স্থান নাই ॥ অথবা আমরা
উপাধ্যানের উপসংহার টুকু বিবৃত করিয়া, প্রবন্ধের
উপসংহার করিব ॥

“নির্দীৰ্ঘ দেবতাকর্ণ স্বৰ্ণং মাতলিগারিণিম্ ॥
আরুহ চুৰামায়ান নারী চাপ্রমমামগম ॥
তত্র কালকোষা মাতী ত্রাক্ষণী বালমুদ্রম্ ॥
লার্লগন্তী নৃপং বীক্ষ্য দদাবাসনমন্তিকে ॥
বালস্ত ভাবেনেন প্রক্ৰিষ্ট গননং বনম্ ॥
সিবধা পক পঞ্চানন্ত লভাতি: সমুদ্রানন্ত ॥
উবাচ বৃদ্ধাভেদোবা: কতি দত্তা: সমুদ্রত: ॥
নিয়া বা কতি মন্যা বা গন্বিহিতা বশাণ তম ॥
দ্রুতস্তম সৌলগ্য বালস্তাত্তবিক্রমম্ ॥
চিহ্ন্যমামো মোধাবী চিহ্ন্যমায়হকাতর ॥
পৌরবাহপদো বাসো ধেতবধিকরাজেনম্ ॥
সর্করাভজিয়া মুক্তো ন বিপ্রস্তমঃ ভবেৎ ॥
তোতো মে বহতে শ্বেং দৃষ্টা বাগঃ ব্রহ্মসাম্ ॥
কারণং তত্র পঞ্চামি যদ্যসমমপূজিত ॥
ইতি চিত্তাপরে রাজি সিংহঃ কোপিপ স্বকনকম্ ॥
দ্বিহা নধেন দ্বর্কদোবা: পত্তং প্রাক্রমত বিজ ॥
দুরাভং পুত্ৰ ত্য বালো নিগুধ পুনবেত তম্ ॥
উবাচ কিং রে পূজ্যত প্রাপ্তোহসি ত্রপ্ৰবালকম্ ॥
পৌরবাহমি ন জ্ঞানসি ক্ষত্রিয়ো রপকবিবঃ ॥
তদুপস্তত্র রাজভেৎ কিংকিঃক্ষুসি ত্রপ: মন: ॥

বাগ্ধ্রমিভিমতোব সমাক্ প্রাপ্য নি মো ভবেৎ ॥
অপাণ্যং কপপোহপি বাগঃ কুমারমিত্রকঃ ॥
বিলোক্য তত্র রাজানং হৃষ্টস্তঃ মৃণে ভূমম্ ॥
প্রাণীভিত্তমখাত্তর্য বিধায়তিধিসংক্রিয়ম্ ॥
পাশুক কুশলং রাজ্যো সেনোমাক্ অপাণমঃ ॥
রাজা তৎ সর্কমাচষ্ট মুনিবাচা গজতমঃ ॥
অথোবাচ বিহন্তেং কোংহঃ বালস্তপোধান ॥
মহাবলো মহাবাহঃ পৌরবাহোহমিতি ত্রপম্ ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গপণ্ড, ৫ অধ্যায় ॥
ভাবার্থ—দেবকীর্ঘ্য নির্দীৰ্ঘ করিয়া, মাতলি-দারবি
বরাহদেহে রাজা হৃষ্টস্ত পুণ্ডরীকে আবার সময়
মারীচাশ্রমে অবতরণ করিলেন ॥ তথায় কোন বৃদ্ধা
মণি একটা অদৃত-প্রকৃতি বালককে লালন করিতে
ছিলেন ॥ তিনি রাজাকে দেখিয়া আসন গিলেন ॥
বালক ঐ সময়ে সবেগে গমনের প্রবেশ করিল ॥
পাটনী সিংহশালককে লতাপানে বহনপূৰ্বক তথায়
আসন করিল এবং বৃদ্ধাকে কহিল, “ইহাধরে কত
গুলি দন্ত উত্তর, কতগুলি নিম্ন ও কতগুলি বা মধ্য-
ভাগাপন, গণনা করিয়া নীচ আমাকে বল ॥”

ভাৰ্গবা-বিরহাক্তের সেবারী হৃষ্টস্ত, বালকের এই
অদৃত বিক্রম দর্শন করিয়া, চিত্তা করিতে লাগিলেন,
“অহো! পৌরব অপেক্ষাও এই বালকের প্রাক্রম
অধিক ॥ এই বালক যেসকল সমস্তোক্তোক্তে রাজশ্রী
সম্পন্ন তাহাতে কখনই ত্রাক্ষণ বালক হইতে পারে
না ॥ এই ব্রহ্মসং বালককে দর্শন করিয়া আমার মনে
শ্বেং-সুকার হইতেছে ॥ বোধ হয়, আমি নিম্নস্তান
বলিয়াই এই প্রকার হইতেছে ॥

রাজা এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন
সময়ে কোন সিংহ, নথ রাজা দীর্ঘ বন্ধন ছেদন
করিয়া, হুসীর হইয়া প্রলাপে উপভক্ত করিল ॥
বালক বৃহ হইতে লক্ষ্যবাহুপূৰ্বক পুনরায় তাহাকে
নিগূহীত করিয়া, কহিতে লাগিল, “রে সিংহশালক!
আমি ত্রাক্ষণ বালক নহি; আমি যে বরপুত্র পুষ্ক-
বংশীয় বালক, তুই কিইহা জানিস না?”

এই কথা শুনিয়া রাজার মন কিংকি উজ্জ্বলিত
হইয়া উঠিল ॥ কিন্তু ইহা বালকের কথা ভাবিয়া,
সমাক্ষ আত্মা হইল না ॥ ঐ সময়ে কপ্যপুনিক কুমারি
গণ্যপূৰ্বক অথবা হইতে সমগত হইলেন, রাজাকে
তথায় মণি করিয়া, অস্তিত্য আনুজিত হইলেন,
এবং আশীর্বাদপূৰ্বক অভ্যর্থনা ও অতিথি সংকার
করিয়া, রাজারও ও বেগবের কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা
করিলেন ॥ মুনিবাচ্যে সমস্ত প্রশ্ন বিপত হইলে, রাজা

তৎসমস্ত নিবেদন করিয়া লজ্জিতকাক্য কহিলেন,
“তপোন! এই বালকটী কে? এই মহাবল মহাবাহ
বালক আপনাকে পুষ্কবংশীয় বলিতেছে ॥”
কষ্ণপ বলিলেন,—

“তবৈব পুত্রো রাজন যমস্তত শকুন্তলা ॥
দমনঃ সর্কমস্থান্যং সিংহাদীন্যং মহাবালঃ ॥
তঃ সর্কমদোনা নাম দেবভাঃ নিরুপগম্ ॥
ভবতিৈচ চ বচসি ত্বাং ততোহনৌ ভজতে ভবেৎ ॥
হুর্দাসসো হি শাপোন ব্রহ্ম বা বিশ্বতা বপা ॥
তক্তা নেনরানারীং নমি দ্রষ্টা মনসিনী ॥
সা তে শকুন্তলা রাজ্ঞী সুবানেমঃ কুমারকম্ ॥
মহাবলো মহাপ্রাণো হুর্দকঃ সর্ককুচুজাম্ ॥
বরকঃ ক্রৌড়িত পশুদৈঃ প্রবিত্তোভাপি নান্তকং ॥
ময় বিয়ুঃ হুর্দকঃ শিশুরেব মমাতমঃ ॥
বহৎ নার্তি বাল্যজি কদা কিং হু সমচরেন ॥
অত এনং ঐহীভুর্দকঃ হুতং তং প্রাপগম্যাহম্ ॥
কপ্যপৌ দেবকীর্ঘ্যং গতং স্বর্গং ততো ভয়া ॥
কৃতো ভবতিঃ রাজশ্বে শাপাত্তোহসি তত প্রভো ॥

এই যে পুত্রত্যা পুত্র-কুচবলী ত্রিভাষি ॥
আত্মী সর্কমজ্ঞান্যং মহাতাপবতো নৃপ ॥
ইত্যুক্তা ত্রাক্ষণীঃ প্রাহ বৃদ্ধাং দেবভুগুম্ ৷
শকুন্তলাসিংহানীং সমগরং ময়ীপতে ॥
ইত্যুক্তা ত্রাক্ষণী গতা সমাহুত শকুন্তলম্ ॥
রাজে সমগর্যামাস রাজা তৎ মৃণে ভূমম্ ॥
অখানুজাম্ মারীচং সর্কমঃ সর্ককুচু নৃপ ॥
কষ্টঃ পশুমাখজ্জদেববানেন মারিষ ॥
সংব ভজতো নাম হৃষ্টস্তনরো মানন ॥
বহুতে ত্রি বৈশ্বেদ ভূপদে কপ্য শশী ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গপণ্ড, ৫ অধ্যায় ॥
কষ্ণপ কহিলেন, “এই বালক তোমারই পুত্র,
শকুন্তলা ইহাকেই প্রসন্ন করিয়াছেন ॥ এই মহাবল
বালক, সিংহাদি সমস্ত প্রাণীরই দমন করিয়া থাকে
বলিয়া ইহার নাম সর্কমদোনা রাখিয়াছি ॥ এক্ষণে তুমি
ইহাকে ভরণ কর, বলিতেছি; তাহা হইলে, ইহার
নাম জর হইবে ॥ তুমি পূর্বে হুর্দকীর শাপে যাহাকে
বিদ্যাপ ও বর্জন করিয়াছ, যেনকা তাহাকে আমার
হস্তে আনিয়া দ্রষ্ট করুন, তোমার রাজার সেই
মুদ্রানী শকুন্তলা এই পুত্রকে প্রসন্ন করিয়াছেন ॥
এই বালক মহাবল, মহাপুত্র, সমুদ্রা রাজার হুর্দক
এবং সিংহদিগকে বন্ধন করিয়া ক্রৌড় করে;
গন্যক ও ইহার ভা নাই ॥ এই সর্ক দেখিয়া
আমি-বিবেচনা করিলাম, এই বালক যেসকল হুর্দক

হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর কোন অংশই আশ্রয়ে বাস করিবার যোগ্য নহে। কেননা, বালা-গভাবগ্রন্থক কখন কি করিবার যোগ্য। অতএব ইহাকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিবা। ইতিমধ্যে আপনি দৈবকার্য্য-সামর্থ্য স্বর্গে প্রিয়াছিলেন, সেই জন্ত আপনি বিলম্ব করিয়াছি। ওরিকে তোমার শাপেরও অবসান হইয়াছে। এই তোমার পুত্রকে গ্রহণ কর। এই পুত্র চক্রবর্তী হইবে এবং সমস্ত বসন্তে আরণ্যকারী ও গরম ভাবনস্ত হইবে। এই বসিয়া সেই দেবগুরু মহাবী কস্তুর, রাজা তাকসীকে বলিলেন, “শঙ্করলাকে আনয়ন করিয়া, এই মহাপ্রতি হস্তে সর্মপণ কর।” তখন তাকসী যখন পুত্রকে শঙ্করলাকে আনয়ন করিয়া, রাজার হস্তে সর্মপণ করিলেন। রাজার আজ্ঞায়ের সীমা রহিল না। মহারাজ! অনন্তর রাজা দ্বাবীর অরুমতি লইয়া ভাণ্ডা ও পুত্রের সহিত স্ট্রীচিতে সের্বোৎস আনয়ন করিয়া পুত্রের সমপাত হইলেন। বিপ্রেশ্বর! ভরত নামক সেই দুঃখভরম তথায় স্তম্ভপক্ষীর শখ-যের দ্বার, বন্ধিত হইতে লাগিলেন।

উপাধানে এই, নটকেও তাই। তবে যদি আভ্যন্তরীণ জগতের দ্বাত-প্রতিদ্বাত, ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়া দেখিতে চাও, যদি বুঝিতে চাও; কবচ-সর-বাণী নিরাক্ত, প্রিয়বস্তুর সমাপন, মানব-চরিত্রের কীটনী অবস্থা উপস্থিত হয়, যদি ক্ষমতা-স্বক্ষমপে তাদৃশী অবস্থার অন্তর্ভূত হইনিত। শিরা-স্বাক্ষরের লক্ষ্য-স্বাক্ষর করিতে চাও; তাহা হইলে আভিজ্ঞান-শঙ্করের সমগ্রমহের পর্য্যায়োচনা কর। কবিত্বের রুতিহ এখানেও জড়নীয়। কালিদাসের কবনা মর্ত্যে কবু হইতে পারে—বর্ষ হইতে রাক্ষসেরে মর্ত্যে কবু হইতে পারে। সময় চরাত্র-স্বাক্ষরসমের কীটনী অবস্থা অন্তর্ভূত হয়?

শৈলানামবহোহস্তা শিখরাবৃদ্ধজ্ঞাতা মেদিনী পশুপত্তনকীভাৎ বিকসতি স্ফুটকায়ঃ পাদপাঃ। সম্ভারিতমুত্তরনৈঈসলিগা বালিক। ভক্ত্যপ্যাদ্যঃ কেনোপাধিকপ্তেন পশু ভুবনং মংপার্মাননীভতে।” হুমি বৈজ্ঞানিক। যোগাধানে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়া, অমর্য অবতীর্ণ হইয়া। অব-তীর্ণ হইতে হইতে এই দৃষ্টও বহবার দেখিয়াছে। দেখিয়াছ হটে, কিন্তু এ চিত্র আঁকিয়া দেখাও। পার কি? এ চিত্র দেখিয়া বৈজ্ঞানিক। বল দেখি, তোমাকেও সমগ্রমহের সমগ্র অবনত করিতে হয় না কি? যেমের দৃষ্ট হস্তের রণ, কালিদাসের

কবনা দেখানেও বিকসিত। কালিদাস কি মস্তের কবি?—কালিদাস যে গর্গের। কালিকা এখানেও নট্য-মহের শূন্যপথে রথনাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহারা শঙ্ক-জলা পড়েন নাই, তাঁহারা সর্মপ্রেই তাবিয়া থাকেন, এ অভিনয়-কৌশল বিদেশীর অতুকার্য। শঙ্করলা-পাঠকদিগের অশ্রু স্রোতঃ তাবিবার কারণ নাই।

কালিদাসের কৃত্তিবৃত্ত এখানে বহুপ্রকার। মংপ্রেই দুই চারিটার উল্লেখ আবশ্যিক। (১) কালিদাসের কপির; রাজার নিকট আসিরাছিলেন। নটকে রাজা কস্তুরের নিকট প্রিয়াছিলেন। কালিদাস হুমারগুরু জগতের পিতা কস্যপের প্রতি সন্ধান প্রশংসন করিলেন। (২) উপাধানে বুলিলাম, শঙ্করলা সহিত দুঃখের সখিলন হইল। কবিত্ব দেখিবে—সেই বিরহ-বিদূরা এক-বেলী-দ্বারা মলিন-কুবেরা পরিধূস-বসন-বিধারা শঙ্করলা জীবনময়ী মূর্তি। নটক-লক্ষণ-নির্ণয়েও কৃত্তিবৃত্ত এইখানে। একবেলী-দ্বারাই বিরহ-বিদূরতর লক্ষণ। থা—

“তত্রাচ-চেলমাগিতমেকবেলীদ্বারঃ শিরাঃ।”
সাহিত্যদর্পণ, ৩৭ পরিচ্ছেদ, ২২২ সূত্র।
(৩) শঙ্করলা ও পুত্র সর্মপনমের সহিত রাজা দুঃখভরম “অপুত্র” সখিলন-সমাশ্রয়। এসময়ে কালিদাস যে কৌশল দেখিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার অতুল কৃত্তিবৃত্তের পরিচয় পাইবে। রাজা প্রিয়া-বিরহমহের নিবারণ সম্ভব; হস্তায় অকুমাং সখিলনে রাজার নিরাপত্তা দশা-বিপর্যয় ঘটতে পারে; তাই সখিলনে ক্রম-বিকাশ। নটকেও এইখানে। রাজা দেখিলেন, বালক সর্মপনমের হস্তে রাজকন্যার গণনা। রাজা ভাবিলেন, “এ কি।” মুনিমুখারের হস্তে এ চিত্র কেন? এ অবস্থা কোন রাজকুমারই হইবে। তৎপরে তিনি বালকের সহচারিণী তাপসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বালকটি কাহার পুত্র?” তাপসী উত্তর বলিলেন,—“কে সে বর্ণপুত্রী-ভাগিণী নাম করিবে?” রাজা বুঝিলেন,—“যেহ আমাকেই উদ্দেশ করিতেছে।” পরে তাপসী একটি বৃত্তিকা-নির্মিত মধু আনিয়া বালককে বলিল,—“এই মধু শঙ্কর-লাগা।” বালক বলিল,—“আমার মা কে?” রাজা এইবার পূর্ণ আশায় উদ্ভাসিত হইলেন। কবিলেন, এই বুঝি আমার শঙ্করলা পুত্র। তবিল ২৭পরিচ্ছেদে আরোহণ—এই নাম ও আর কাহারও বিবেচনা করিলেন।

বালিকের দ্বারা। ইহার পর হঠাৎ বালকের বলাকাও (ভাণ্ডা) পড়িয়া গিয়াছিল। দুঃখ সেই ভাণ্ডা-তুলিয়া দিতে সেলেন। তাপসী বলিলেন,—“ভাণ্ডা ভুলিলাম না; বালক, বালকের পিতা কিংবা মাতা ভুলি অপর কেহ ভাণ্ডা স্পর্শ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সর্প দংশন করে।” রাজা আগেই তাহা তুলিয়াছিলেন, অতঃপর সর্মপন হয় নাই। তখন প্রতিপদ হইল, ইনি রাজা দুঃখ। রাজারও সর্মপন সন্দেহ দূর হইল। এখন আর শঙ্করলা সহিত সখিলন-সম্প্রদানের বিলম্ব হইল না। রহস্যোন্মোচনে কি মধুর ক্রমবিকাশ। জীবন্ত নটক এইখানে নহে কি? উপাধানে ত আর ইহা নাই, প্রয়োজনও হয় নাই। নটকেও উপাধানের ভারত্যা এই-রূপই হয়।

যাহা হউক, পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিলেন, অভিজ্ঞান-শঙ্করের গম্ভীর পদপুণ্য হইতেই গৃহীত উপাধানের আন্যোপাত্ত বিবৃত করিবার উদ্দেশ্য তাহাই। তবে মধো মধো যে বসামাত্মক কৃত্তিবৃত্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা কেবল কালিদাসের চিত্র-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবারই প্রয়াস মাত্র। কালিদাসের পূর্ণ কৃত্তিবৃত্ত-পরিচয় দেওয়া এ অধম লেখকের অসাধ্য।

গম্ভীর পদপুণ্য হইতে গৃহীত হউক, আমরা উপাধানে রাজার মহাশয়ের মত চিত্রকায়ী বলিব,—“কালিদাসের অভিজ্ঞান-শঙ্করলা অলৌকিক পার্শ্ব। ধুম কালিদাস। ধুম অভিজ্ঞান-শঙ্করলা। প্রকল্পের পূর্বে তোমাদের বিলম্ব নাই। ধুম বিক্রমাসিত। এই কালিদাস তোমার বস্ত্র ও সঙ্গসম্পন্ন ছিলেন। এই অভিজ্ঞান-শঙ্করলা, তোমার পরিভাষণ, সর্ম-প্রথম উজ্জয়িনীর রত্নভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল।

উপসংহারে পূর্ণবর্ণী-নিবাসী ভক্তিবান পণ্ডিতের শ্রীমুখ যখনই প্রিয়ায় মহাশয়ের নিকট স্রবণের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তিনি পূর্ণপদবন হইয়া, পদপুণ্যের হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া না দিলে, আমরা চিরকালই হস্ত অজ্ঞান-শঙ্করলা গম্ভীর-সংগ্রহ-সময়ে অক্ষরকে অভিজ্ঞিত থাকিতাম। অত্যাচ অনেক মহাশাও অতি প্রাচীনতম কীটমিত্র হস্তলিখিত পুঁথি বিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল পুঁথি না পাইলে, এতৎসংগ্রেহ নানা প্রশংসে থাকিয়া যাইত। ইহাদের নিকট চিত্র-ক্ষেপ আবশ্যক রহিলাম। তবে বিদ্যার মহাশয়ের সদস পুঁথির

পাঠ সর্মপোষণা বিস্তৃত। সেই পাঠই এ প্রবন্ধে একটিল হইল। ভট্টপন্ন-নিবাসী পুণ্ড্রপাদ পণ্ডিত-প্রবর অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীমুখ পদানন তর্করথ, পূর্ণবর্ণী-নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীমুখ বীরসিংহ শাস্ত্রী এবং বর্মমান গোবিন্দপুত্র-নিবাসী অশেষ সান্নিহ-বিশারদা শ্রীমুখ বীরানন্দ কায়নিধি মহাশয় এতৎসম্বন্ধে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদিগের নিকটও আমি চিরবিত্ত।

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

কদলী।

উৎকৃষ্টবঙ্গ প্রদেশের এক প্রকার মিষ্ট ফল। বাঙ্গাল দেশে ইহাকে চলিত কথায় ‘কলা’ বলে। ইহার মধ্যস্থ নাম কদলী। মধ্যস্থে ইহার আরও কতকগুলি নাম আছে—বারংবুসা, রস্তা, মোচা, অংগুৎসংলা, কল, কাঠল, বারংবুসা, ফুলকা, সুহমার, সত্যংলা, ওঙ্কফলা, হস্তিবিবালী, গুঙ্ক-পুঙ্কী, নিসারী, রাজেশী, বালকচাঁদা, উরুশস্তা, তাহফলা, বললম্বী, কলপুত্র, মোচক, মোচক, মোচক, বারংবুসা, চর্মবতী। এই সকল নামের সার্বভূতা আছে।

আরও বহুই কদলীর আদি বাসস্থান, এক্ষণ এ দেশে নানাবিধ কর্মে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার তুল্য আবশ্যকীয় ফল আর দ্বিতীয় নাই। ইহা জন্মেও অনেক। বৎসরের সকল কালেই ইহার ফল জন্মে। তবে গ্রীষ্মকালেই অধিক উৎপন্ন হয় আর ঐ সময়ের ফল অধিকতর কোমল, মধুর এবং স্বাদু হয়।

কদলীর উদ্ভিদ তত্ত্ব—ইহার গাছকে উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদেরা কোলকাণ্ডে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন। তাহার কাণ্ডে অর্থাৎ গুড়িতে কাঠের অল্প থাকে। গাছকেই কোলকাণ্ডও বলে। বাস্তবিক কদলী-বৃক্ষের কোনরূপ কাণ্ড নাই। বাহা কাণ্ড বলিয়া ধরিয়া গুল্লা হয়, তাহা বাস্তবিক পাড়ার শেষ ভাগ অর্থাৎ কাণ্ডের শেষ; বাহাকে বাস্তবিক কোলকা, বাসুনা বা বাসুনা বলে, তাহার সমগ্র মাত্র। কলাগাছের পিণ্ডুল (এটে) আছে, এই

পিতৃমূল হইতেই একবারে পাজ বাহির হয়। পিতৃমূলের ঠিক মধ্যস্থল হইতে একটা সরল সোলাকার খেতবর্ণ মজ্জা উঠে, ইহারই চতুর্দিকের স্তরে স্তরে কাণ্ডকোমগুলি ঢাকা পড়িয়া কাণ্ডের ভ্রায় আকার ধারণ করে, এই জন্ম ইহাকে কোমল-কাণ্ড বলে। কালে ঐ মজ্জা পুষ্পেরে পরিণত হয়। যখন নতুন পাজ বাহির হয়, তখন ইহা একবারেই মূল হইতে জন্মে এবং মজ্জার বাহ্যিক স্তরে পাতকুল সিরা বাহিরে পড়িয়া পাতা ছাড়িতে থাকে। ইহার পত্রাংশ অত্যন্ত বিস্তৃত হয়। যাকে 'এক একটা পাতা ৮০ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট বিস্তৃত হয়। ইহার পাতার 'মধ্যপত্র'ক' হইতে, পাতার ধার পর্যন্ত লম্বাভাবে সমদূরে সরল শিরা আছে। এই সকল শিরার মধ্যে সূর্য-পাতার মত জলের ভ্রায় স্থলশিরা-বিভাগ নাই, সুতরাং একই প্রবল বাতাস লাগিলেই ইহা চিরিয়া যায়। কলাপাছের পত্রভাগ, হৃৎভাগ, কাণ্ডেরকার সমস্তই একসাথে কলাপাছের মজ্জা, যাহাকে বাঙ্গালার খোড় বলে, তাহা অতি কোমল। ইহা কেবল কতকগুলি পাকান পাকান রসায়ার শিরার সমন্বিত। মজ্জাও এই বৃক্ষশাণ্ড হইয়া পুষ্পও পরিণত হইয়া থাকে। ইহার পুষ্পকে বাঙ্গালার 'মোচা' বলে। মোচা ইহার পুষ্পের ইহার স্বরূপ হইতে একশাণ্ড 'মাসিকলক' নির্ভর হয়। বাঙ্গালার তাহাকে পাতমোচা বলে। পাতমোচার অভ্যন্তরেই মোচা থাকে। মোচা পুষ্ট হইলে এই পাতমোচা তার দিকে কাঁচা যায়, আর মোচা নিম্নমুখে স্থলিয়া পড়ে। নারিকেল, তাল, গুপারি, বর্জ্বর প্রভৃতি গাছেরও পাতমোচা হয়।

মোচা কলাপাছের স্বক হইতে উদ্ভবী হইয়া নির্ভর হয়, শেষে কতকটা বড় হইলে নিম্নমুখী হইয়া পড়ে। ইহা দেখিতে কোণাকার, লম্বা প্রায় ১ ফুট ও মধ্যস্থলের বেড় প্রায় ২ ইঞ্চি হয়। একটা মোচার অনেকগুলি বিভাগ থাকে, প্রত্যেক বিভাগে দুই স্থায় পুষ্পসূতুল এক একখানি বেণু প্রত্যেক বেণুপোক পত্রাবর্তে আরত থাকে। প্রত্যেক সাতরে ১টা বা ১০টা পুষ্প থাকে। প্রত্যেক পুষ্পই কল হয়। এই পুষ্পগুলির মধ্যে পুষ্পপতল নিম্নে প্রোতবে, দ্রীপপ বা উভয় পুষ্পপতল উপরে প্রোতবে থাকে। প্রত্যেক ভাগের ফুলগুলি

যেমন যেমন বাড়িতে থাকে, অমনি তাহাদের আবার পোষাক পত্রাভরণানি বসিয়া বাহিতে থাকে। পোষাক বিহীন হইতে পুষ্পগুলি ফুল পরিণত হইতে থাকে। বাঙ্গালার এই পোষাক পত্রাভরণগুলি চলিত কথায় মোচার খোলা বলে, প্রত্যেক মোচার ১ হইতে ১০ 'খাক' ফল ধরে। এক এক খাককে বাঙ্গালার 'ছড়া' বলে। মোচার খড়গুলি ফুল থাকে, সব গুলিতে ফল হইতে পারে না। সমস্ত ছড়া পাইয়া ফলগুচ্ছকে বাঙ্গালার 'কাঁচি' বলে। একটা গাছের আশ্রয় মাত্র একটা কাঁচি ধরে। কাঁচি কাটিয়া লইলেই কিছু দিন পরে বাছ পড়িয়া মরিয়া যায়। গাছ অতি পুরাতন হইলে বা কাঁচি ফেলিয়া মরিয়া গেলে, তাহার পিতৃমূল হইতে ভটা হইতে ভটা পর্যন্ত চারা নির্ভর হয়। বাঙ্গালার এই চারাকে 'ভেড়ু' বলে।

কলা অনেক প্রকার আছে। সকল কলায় বীজ হয় না। বহু কলায় এবং চটগ্রাম প্রদেশের এক জাতীয় কটকলায় বীজ হয়, এই বীজ গাছ হয়। অল্প কোন কোন জাতীয় কলায় বীজ জন্মে বটে, কিন্তু সে বীজে চারা হয় না। পার্শ্বত প্রদেশে কলাগাছ অতি অল্প হয়। এ সকল স্থানে কলাগাছ বাড়িতে থাকে না, কারণ অজ্ঞাত প্রদেশে প্রতিযোগিতায় কলাগাছ পার্শ্বত প্রদেশের কলি হইয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য ইহার ভেড়ু হয় না। ভেড়ু হয় না বলিয়াই, পার্শ্বত কলায় বীজ হইয়া থাকে। বীজও আবার এত বেশী হয় যে, কালে শত কিছুমাত্র থাকে না। বীজগুলির উপর পাতলা সরুর মত একই কোমল চটতে শক্ত থাকে। পরমধরের আশ্চর্য মরিয়া। পলকী এই শব্দটুকু বাহিরের জন্ম বহুরূপ হইতে আশিয়া পুরুলম লইয়া যায়, এবং সেই সকল স্থানে এই উপায়ে বীজ নীত হইয়া কলার গাছ জন্মে।

অজ্ঞাত বলে কলায় আবার হয়। আবাদী কলায় বীজ হইতে পায় না এবং উত্তরোত্তর কলের উন্নতি হয়, গাছে ভেড়ু জন্মে, ভেড়ুগুলি উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া থাকে। আবারের গুণে ভাল ভাল কলায় এখন আর মোটেই বীজ জন্মে না। ইহাদের বীজোৎপাদিনী শক্তি একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থানের জলবায়ু-প্রভাব 'আবাদ' করিলেও সংবৎসর ইহারে এ শক্তি রহিত হয় না। হু একবারের ফলে

হয় ত বীজ হইতে পারে না, কিন্তু তৃতীয় আবাদেই বীজ হইয়া থাকে। বর্ষাকালের জলবায়ু এইরূপ বটে। বাঙ্গালার কাঁঠালীকলা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজিও তাহার বীজোৎপাদিনী শক্তি একবারে নষ্ট হয় নাই। অতি অল্প দিনেই ইহাতে বীজ জন্মে, এজন্য বাঙ্গালার কাঁঠালীকলার গাছ বেশী পুরাতন হইতে দিতে নাই, তেউড়গুলি লইয়া অল্প স্থানে লাগাইয়া কলার উন্নতি বর্তমান রাখা কর্তব্য। আবাদের গুণ ও ভ্রমার গুণে কাঁঠালীকলার উন্নতি হয় মাত্র; কিন্তু কিছুমাত্র শক্তি নষ্ট হয় না। চীন দেশে এক প্রকার কলাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি দ্রুতকার এবং তাহার ফলও হয় না।

কলাগাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। ভাল জমিতে আবাদ করিলে এই বৃদ্ধি সহজেই চলুগোচর করা যায়। কলায় কটি পাতা—বাঙ্গালার ইহাকে 'মাজ' অর্থাৎ মধ্যপত্র বলে—যখন পাতা বুলিয়া বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন তাহার বোঁটা (হুট) হইতে পত্রাংশ পর্যন্ত একটা হুতা ধরিয়া বটখানেক অপেক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে, সেই সময়ের মধ্যেই মাথের হুতা ছাড়িয়া প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়াছে।

প্রবল বাতাসে কলাগাছের বড় অনিষ্ট করে, বিশেষতঃ ফল হইলে অতি অল্প বাতাসেই 'চাউয়া' পড়ে। বাঙ্গাল দেশে বীশের তেঁকটা করিয়া এই সময়ে গাছ রক্ষা করিয়া থাকে। বাঙ্গাল দেশে কলায় ছুই নামে এক প্রকার পোকা লাগে, এই পোকাতোও অনিষ্ট করে, ছুই নামে লাগিলে গাছ শুকায় পড়ে।

কোথায় কোথায় কলার গাছ এবং তাহার প্রেণী বিস্তার।—ভারতবর্ষ কলার আদি জন্মস্থান। এখানেও পাণ্ড্য প্রদেশ অপরূপ পুষ্করদেশে ও দাক্ষিণাত্যেই বেশী জন্মে। পূর্বে—বাঙ্গালার এবং দক্ষিণাত্যে মালাবার উপকূলে ইহার বহল আবাদ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার রায়সভা, অহুপাম, মালভোগ, অধির-মণ্ডা, মর্তমান, চম্পক, চিটিনাটা, কান্দাবানী, ঘিয়ে, কালাবট, কাঁঠালী প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলা প্রকার এক প্রেণীর, তাহার পক্ষে চারিপ্রকারও এক প্রেণীর, আর শেষ তিন প্রকারও এক প্রেণীর কলা। মর্তমান প্রেণীকে চাটম কলাও বলে, স্বেথাও

কোথাও মর্তমানও বলে। এই সকল কলায় আদৌ বীজ হয় না। কাঁঠালীজাতীয় অজ্ঞাত কলার বীজ হয় না, কেবল শুষ্ক কাঁঠালী বলিয়া বাহা বিখ্যাত, তাহাই বর্তমান এক ভুলিতে থাকিলে বীজ-বিশিষ্ট হইয়া উঠে। এতদ্বির মদনী, মদনা, তুলসী, মহুয়া, ব্রহ্মবীরা, পোড়ারবীরা প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলার কোন কোন জাতিতে অল্প বীজ হয়, আবার কোন প্রেণীতে মোটেই হয় না। বাঙ্গালার 'কাঁচাকলা' (বীজবহুল) নানাবিধ। ইহার 'এক একটা কলায় যথেষ্ট বীজ হয়, কিন্তু মিষ্টতা বহু বেশী হয়। বর্ষাকালের 'দ'বেকলা' নামে এক প্রকার কাঁচাকলা হয়, ইহার সবত অতি সুন্দর হইয়া থাকে। কলিতাকার নিকটবর্তী স্থানে 'স্বেথাকলা' নামক এক প্রকার কাঁচাকলা হয়, ইহার কলা বহু হইতে পারা যায় না, কিন্তু মোচা বড় বৃক্ষায় হয়। মোচার জন্মেই ইহার আবাদ করা হয়। 'ময়া' নামক আর এক প্রকার কাঁচাকলা আছে, তাহার রসে নানাকল চক্কলেই আরোপা হয়। কাঁচকলা, কাঁচাকলা, আলাজি কলা প্রভৃতি কলা 'কাঁচকলা' জাতীয়। এই প্রেণীতে নানা আকারের কলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পাকিলে হুমিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তর-কারীতেই ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। কাঁচকলার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক নাম (Musa Paradisiaca) বিশেষতঃ ফল হইলে অতি অল্প বাতাসেই 'চাউয়া' পড়ে। বাঙ্গাল দেশে বীশের তেঁকটা করিয়া এই সময়ে গাছ রক্ষা করিয়া থাকে। বাঙ্গাল দেশে কলায় ছুই নামে এক প্রকার পোকা লাগে, এই পোকাতোও অনিষ্ট করে, ছুই নামে লাগিলে গাছ শুকায় পড়ে।

'মাসিকমর্তমান'মতস্পন্দকাত্য।
ভূভোগ কদল্যা বহুবোহপি সতি।'
এই সমস্ত 'মর্ত্ত' কলাই বাঙ্গালার মর্তমান বা চাটম, আর 'চম্পক' চাটাকলা নামে বিখ্যাত। কাঁঠালীজাতীয় 'কান্দাবীকলা', প্রায় ১ ফুটের উপর লম্বা হয়। আর 'কালাবটকলা', বেশ মোটা হয়। 'ঘিয়ে' কাঁঠালী হইতে দুইয়ে ভ্রায় বৃক্ষ নির্গত হয় এবং উচ্চ হুটে ফেলিয়া দিলে মাখনবৎ গলিয়া ভাসিয়া উঠে।

কাঁঠালীকলা পাকিলে 'বর্ষ' ঈষৎপীত হইয়া উঠে, চাটমকলা পাকিলে বর্ষ পীততর হয়, কিন্তু গায়ে কটা কটা দাগ হয়, চাটমকলা পাকিলে বোর পীতবর্ণ হয়। কাঁঠালী পরিপুষ্ট হইলে কতকটা চৌপাল, ঈষৎ বক্র; চাটমকলা হুগোল

মূল এবং চাপা হ্রদে, অথচ বর্ষাকাল হইয়া থাকে। এদেশে কণ্ঠাকার রক্তবর্ণ কলা জন্মে, তাহাকে 'সিঁরুতকণা' বা 'চালে কলা' বলে। মর্তমানকলা ও কাঁটালীকার উচ্চৈশ্বার্যের নাম *Musa sapientum*।

বাংলায় কাঁটালীজাতীয় কলার শস্য কিছু কড়া হয়, 'মর্তমান' জাতীয়ের শস্য খুব সাধা ও মাখন-বৎ কোমল এবং 'চম্পক' জাতীয়ের শস্য স্বয়ং অমরসুন্দর সুগন্ধ ও ফলের মধ্যে শীতল বর্ণ হয়। কাঁটালীর ফলের খোসা পুরু, চাপার খোসা পাওয়া যায়। বাঙ্গালার মর্তমান কলাই বেশী আদর করে। এদেশীয় হুগো-প্রবাসীরা 'চাপাকলার' আদর করে। কাঁটালীর ও কাঁচকলার ব্যবহারই অধিক।

দক্ষিণাভ্যন্তর দিল্লীওল প্রদেশের পর্বতে যে সকল কলা উৎপন্ন হয় ও বনভোগে সাধারণতঃ যে সকল কলা দেখা যায়, তাহার ইংরেজী নাম *Musa superba*। বেনিন প্রদেশের কলা সুগন্ধবিশিষ্ট ও বরোড প্রদেশের কলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 'নেপালী' এক প্রকার কলা জন্মে, ইহার নাম 'নেপালী কলা' *Musa Nepalensis*।

এ দেশে এক প্রকার সুবৃহদাকৃতি কলা জন্মে, তাহাকে 'কাবুলে কলা' বলে।

মাস্ত্রাজে তৎ রকম কলা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 'বনফলি' দক্ষিণপেকা উত্তম। 'পতি' জাতীয় কলার শস্য বেশ কড়া, পাকিতে বড় বিলম্ব হয়, কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কলাই ভাল বাসে বলিয়া জ্ঞান দিয়া লোকহিত্য বিস্তার করে। 'পাড়া' জাতীয় কলা বাল লাল হয়, কিন্তু পুষ্ট হইলেই 'বাঁটিয়া' যায়। ইহার বর্ষ সুসুন্দর, থাকিলেও বর্ষ পরিবর্তিত হয় না। 'মোবিলি' জাতীয় কলা হুমিষ্ট, কিন্তু বর্ষ পাণ্ডে উঠে। 'মোরোবি' জাতীয় কলা বর্ষ বড় হয়, ইহার বর্ষ লোহিত, দেখিতে বেশ। এতদ্ভিন্ন বহু, বেঙ্গলা, বর্মেই, পে, সেরবা, মেরোপারিয়ান, পিসিমোয়ে প্রকৃতি কয়েক শ্রেণীর কলা পাওয়া যায়।

মর্তমান কলা চট্টগ্রামে ও তেনাসারিম প্রদেশে বহুল পরিমাণে জন্মে, এই উভয় প্রদেশের লিপ্সনে মাস্ত্রান বা উপসাগর। অনেক বনেন যে, এই উপসাগর দিয়া এই কলা প্রথমে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া, ইহার নাম মর্তমান হইয়াছে। আমদের মতে তাহা নহে, মর্ত্য নামক লোকহিত্য এই মর্তমান কলা।

বোম্বায়ে নয় প্রকার কলা জন্মে—স্পারই, মুর্শেলি, তাহডি, রজ্জেলি, লোখতি, সোমকেলি, বেসকেলি, করজ্জেলি ও নরসিজি। ইহার মধ্যে তাহডি রক্তবর্ণ কলনী।

অন্ধ্রদেশে পীত ও রক্তবর্ণের নামপ্রকার কলনী দেখিতে পাওয়া যায়।

সিঙ্গাপুর, মালয় এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রায় ৮০ প্রকার ভোজ্যনামযোগী কলা জন্মে, ইহার মধ্যে অনেকগুলির আকারই রুহৎ এবং সুগন্ধ-বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে 'পিসাম' টিপালা' রক্তবর্ণ কলা, ইহাকে যে দেশের লোকেরা ভাতাটে কলা, বা কাঁকড়া কলা বলে। 'পিসাম' যখন 'বেকেব' এই জাতীয় কলার তদায় কতকটা খোসা বহুভাগে হাঁসের টোঁটের মত থাকে। 'পিভাং রাজা'—ইহাকে রাজাকলা বলে। 'পিভাং হুহ' ইহাকে 'হুসে কলা' বলে। আর একপ্রকার কলা আছে, তাহাকে সোণাকলা বলে। শেষোক্ত তিনপ্রকারই অতি সুন্দর, সুমিষ্ট, সুগন্ধবিশিষ্ট।

ম্বহাশূপে 'পিভাং উগু' নামে একপ্রকার কলা জন্মে, তাহা দীর্ঘ প্রায় ছই ফুট হয়। বাঙ্গালার বোধ হয় এই শ্রেণীকেই কানাইবাঈ বলে।

ম্বহাশূপে আরও একপ্রকার কলা হয়, তাহার এক গাছে একটা ফল পরে। অত্যাচ্ছাদিত ছায় এই ফল মোটা সমস্ত কান্ডের বাহিরে নির্ভর হয় না। ইহা কান্ডের ভিত্তরে থাকিতে থাকে। এখন সমুদ্র পার্শ্ব উঠে, তখন কাণ্ড বাটিয়া যায়। ইহা এত বড় হয় যে, একটা মলে ৫ জন লোকের লুণা বহুদমে নিবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল বিখ্যাত কলা ব্যতীত বহুদশে পাটালী বা মর্তমান শ্রেণীর যে সকল কলা জন্মে, তাহাতে বীজ হয়। এই শ্রেণীর কলাকে সে দেশে 'পিভাং মুঠা' বলে।

লিপিলাই দ্বীপের পার্শ্বভাগে অনেক এক প্রকার কলা হয়, তাহা এত রুহৎ যে, একটা কলা একটা মানুষের উপরুক্ত বোঝাই হইতে পারে।

মালয়দ্বীপের মালাকাসার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক নাম *Musa glauca* মরিশস দ্বীপে গোলাপী বর্ণের একপ্রকার কলা পাওয়া যায়, তাহার নাম *Musa rosacea* অর্থাৎ গোলাপী কলা।

আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কাঁটালী ও মর্তমান জাতীয় কলাইই আদর হয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে একপ্রকার লুচাকার বেণুৎ বরে কলা হয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর।

সে দেশের বড়মানুষেরা এই কলারই সমধিক আদর করে। এই জাতীয় কলাকে ইংরেজেরা *Fig banana* বলে। এই জাতীয় আর এক প্রকার লুচাকার কলা আছে, তাহাকেও নিয়ন্ত্রণের লোকে বিশেষ আদর করিয়া থাকে। ইংরেজীতে ইহাকে *Fig Sucrier* বা *Lady finger* বলে, এই জাতীয় নাম *Musa orientum* ও পুরোনো *Fig banana* জাতি নাম *Musa musculata*।

খামোদেরা 'কোরিডা' নামে 'ওকো' নামক কলা অতি উত্তম, ইহা যে দেশের সুলভ হইলে পাওয়া যায়। বহি ইহা পাছপাকা হয়, তাহা হইলে তাহার সন্মুখ—এমন কি, মাছ খপ পক্ষী পর্যন্ত পাগল হইয়া উঠে।

চীনাদেশে এক প্রকার কলনী জন্মে, তাহা বর্ষাকার হয়। ইহাকে ইংরেজেরা *Dwarf plantain* অর্থাৎ বাননকলা বলে। ইহা ছই জাতীয় আছে; এক জাতীয়ের নাম *Musa Occinea* আর একপ্রকারের নাম *Musa nana*। চীনের আর একপ্রকার কলার নাম *Musa Cavendishi*। তথায় বর্ষাকার আরও এক প্রকার কলা জন্মে।

আবিসিনিয়া প্রদেশে একপ্রকার কলা জন্মে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর, ইহার নাম *Musa ensata*।

এতদ্ভিন্ন অত্যাচ্ছাদিত হানেও কলা পাওয়া যায়। প্রধাতভ্য উপক্রমণ হানেই কলা জন্মে। এদ্বীয়ার পূর্বের চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে তুরস্কের অন্তর্গত ইউট্রোপিয়া নদীর তীর পর্যন্ত সমস্ত দেশেই কলা পাওয়া যায়। অত্যাচ্ছাদিত যে সকল ভূভাগ পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত, সেই সকল হানেই কলা 'পাওয়া' যায়।

হিমালয় পর্বতের শীতল প্রদেশে কলা জন্মে। ইহার পায়দেশে ৩০° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত কলা বেশ জন্মে, মুরোভী, ক্যান্সন ও গায়েওয়াল প্রদেশেও কলা জন্মে বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল বীজ ব্যতীত শস্য থাকে না বলিলেই হয়। সমুদ্র হইতে উচ্চে ১০০ ফুট পর্যন্ত হানে কলা জন্মিতে পারে। ইহার আমোদিত্রাজ্য আজবকার আদার বর্ণেই হই-ছে। কারাকাস, গোরেনা, ডেমেরেরা, ক্রাসমেকা, জিনেদা প্রকৃতি হানেও একেবারে অনেকটা জন্মিতে কলার অব্যাব 'হইয়া' থাকে। চট্টগ্রাম প্রদেশেও বনমধ্যে কলাপাছ এত অধিক জন্মে, যে,

তাহা দেখিলে বিমিত্ত হইতে হয়। এখানে বনের মধ্যে হস্তী এবং গয়ল নামক মহিষ জাতীয় পশুপক্ষ এক প্রকার কলাপাছ বাঁহিয়া বাটিয়া যায়। পার্শ্বভাগে প্রদেশে সাধারণতঃ যে সকল কলা জন্মে, তাহাকে *Musa ornata* (পাছকে-কলা) ও বনমধ্যে সাধারণতঃ যে সকল কলা জন্মে, তাহাকে *Musa superba* (বনকলা) বলে। চট্টগ্রাম প্রদেশেও কলাপাছ বাসের মত অপরূপ জন্মায়। 'অত্যাচ্ছাদিত' হানে থালি মাঠে পড়িয়া থাকিলে যেমন দুর্গমুখা প্রকৃতি বাস জন্মে, সেইরূপ চট্টগ্রামে থালিমাঠে পূর্বে বাসের সঙ্গে সঙ্গে কলাপাছও বাহির হইত। আবাদ করিতে হইলে, কত যে কলাপাছ মারিয়া ফেলিতে হইত, তাহার আর সংখ্যা করা হইত না। এখনও নতুন আবাদী জঙ্গল-মহলে এইরূপে বাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

ইউরোপে দক্ষিণ-দেশে কলা হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে কাচবার বা উম্মুর ব্যতীত থোলা ক্ষেত্রে কলা হয় না। কিউবা দ্বীপে কোথাও কোথাও হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নাম—সংস্কৃত নাম এলি থুর্নেই উক্ত হইয়াছে। অতি পুরোনো এদেশে ইহাকে মোক অর্থাৎ মোচা বলিত। মোক অর্থে মুক্ত হইয়াছে বাহা—অর্থাৎ প্রথমতঃ বৃন্দপতি হইতে ইহার ফল বাহির হয়, তাহা একটা আদর-মুখা থাকে, সেই আদর-মুখা দ্বারা ফল নির্ভর হয়। প্রত্যেক ফুলটি আবার শুষ্কপাথে আরও একটা আদর-মুখা আদর থাকে। সেই আদর-মুখা দ্বারা ফল নির্ভর হয়। ইহার প্রাচীন নাম, তাহা আবার শিবপুত্রের মতে দেখিতে পাই।

"এতৎ-মোচাকলঃ মমঃ শিবায় নমঃ।" কেহই এতলে কলনী বা রজ্জা কি অল্প কোন নাম ব্যবহার করেন না। কলনী ও কল জন্মে বাহা জন্মেই পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। কলাপাছ কৃষ্ণ-প্রধান অর্থাৎ কল-কলা, ইহা সসম লিমেই ভাল উৎপন্ন হয়। অক্লান্তকলা অর্থাৎ বাহার খাণ্ড বা তক্ত আছে। কলাপাছের তক্ত বিশেষ বিখ্যাত। বাহারসু ও বাহারসুজা অর্থে হস্তি-প্রিয়া। মরুকলা অর্থে একটা গাছে এক-বারমাত্র ফল ধরে। ভাহুকলা অর্থে সুহৃৎপ্রাণ-প্রিয়া। বনলক্ষী অর্থে কতক ফলের মোচাপ্রিয়া ইহা, এবং বনও বনাময় বা প্রাণবায় হয়। হস্তি-

বিষাণী/অর্থ বাহা হস্তিবিধান বা হস্তিভেদের ভাষা হুগোল, দীর্ঘ অর্ধচন্দ্রময় বাক্য। চর্যবতী অর্থ চর্যের ভাষা আবেগযুক্ত। অস্ত্রাতী নামের অর্থ নামটীপড়িলেই বুঝা যাইবে।

কলাকে আরও ভাষায় 'মৌল' বলে। ইহা সংস্কৃত মৌচা শব্দ হইতে উৎপন্ন। গাটিন ভাষায় মিউসা বা মুসা বলে, ইহা আরবি মৌজ হইতে উৎপন্ন। ইংরেজীতে ব্যানানা ও প্রাট্টেন বলে। ইংরেজী ব্যানানা শব্দ গ্রীক অরিয়ানা শব্দ হইতে উৎপন্ন। গ্রীক অরিয়ানার অপর পর্যায় ঔরানা ছিল। গ্রীক অরিয়ানা সম্ভবত তৈলঙ্গী ভাষার অরিত শব্দ হইতে উৎপন্ন।

অনেকে গ্রীক ঔরানা শব্দ সংস্কৃত বারণধুবা শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গ্রীক ভাষায় বারণধবী যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহার দেশীয় নাম অরিকাকশ দক্ষিণ-দেশীয় শব্দ হইতে সংগৃহীত।

'প্রাট্টেন' শব্দ গ্রীক গ্রন্থকার থিওফ্রাস্টাস বা সিনির লিখিত পল নামক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন। পলুরূপের ও তাহার ফলের বর্ণনা গ্রীক কলণী বৃক্ষের ও কলণীর ভাষা বটে এবং হিন্দু অধিবাসের দ্বারা বলিয়া উল্লিখিত। এই পল যে সংস্কৃত কল শব্দ হইতে বা তামিল 'কল' শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহা নিশ্চয়। বাঙ্গালার ইহার নাম কলা, কিলিতে কেল্লা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কেলি, তামিল বল বা বেল্লা, তৈলঙ্গী অরিত, হিন্দীতে কহিকা, ব্রহ্মদেশে নেপিয়ান বা প-হেই, বাগ্‌মিণীয়ে বিয়ু, জাপানী গড়ং, মলয়-ভাষায় পিতাং।

কলীয় ব্যবহার—এদেশে কাঁচকলা, মুচো ও খেড় তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। সূতা কলা ভাই প্রাচুর্য্য হয়। হিন্দুর চক্ষে কলা বড় পবিত্র জিনিস; পুতা, ভাঙ্ক, বিবাহ প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই কলা ব্যবহৃত হয়। ইতিবাচক অল্প তরকারী থাকিতে নাই, কিন্তু কাঁচকলা-সিদ্ধ খাওয়া যায়। পাতায় তারপরইর সকল ফলে তাজপাতের কাণ্ড করে। অধিক-সংখ্যক শৌক খাওয়াইতে হইলেই কলাপাতা ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণদি উচ্চবর্গের লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোককে—বাগ্‌দিগের জল অশুশ্য তাজদিগকে—বাগ্‌দিগের হইলে, কলাপাতার বাইতে দেয়। নান্নাভে, কাণ্ডাভাং ও মালাব প্রদেশে কলার জন্ত মত হউক না হউক পাতার জন্মই কলার আবার করে, সেখানে সকল শ্রেণীর

লোকেরা কলণীপাত্রে আহার করিয়া থাকে। গ্রাম্য পাঠশালা তালপাত্রে লেখা হইলে ছাত্রেরা কলাপাত্রে লেখা অভ্যাস করিতে থাকে। কলাপাত্রে হাত পাঠিলে কাণেজ লিখিতে আরম্ভ করে। ইহার কলিপাতা (মাছপাতা) বেলেবায়ার বাঘের উপর ঢাকা দিলে জালা নিবারণ হয়। মাছপাতা কাটায়া তাহার সোজা পিঠে মাখন মাখিলে বাঘের উপর দিয়া ৪৫ দিন বাঁধিয়া রাখিলে বেলেস্তম্বর বা জাল হয়। পশ্চিম-ভারতে 'বিড়ি' চুসুট, শুকনা কলাপাতায় জড়াইয়া প্রস্তুত করে। যে দেশে কোন দ্রব্যাদি মুন্ডিয়ার জন্ত শুকনা কলাপাতা ব্যবহার করে। বাঙ্গালার মালায়া ফুল ও ফুলের মালা মুন্ডিয়ার জন্য কলাপাতা ব্যবহার করে। চমুবেগের কচি কলাপাতার আবেগ বড় উপকারক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার কলাপাতা দিয়া বর ছাইয়া থাকে বাঙ্গালার গ্রনীবরে কলাপাতা পুড়াইয়া সেই ছাই দিয়া কাপড় কাঠায়া থাকে। বহুজরোপে কবিরাজ মহাশয়ের কলমাদি হুতে ইহার শিকড়ের রস ব্যবহার করেন। এই হুত বায়ু ও পিত্তরোগ-নাশক। কোলেসুপ ক্রোয়া এই গাছের রস দিয়া রক্তপাক নিবারণ করে। জ্যান্মেঘাতেও এইরূপ ব্যবহৃত হয়। (স্তম্ব্য গাছের গায়ে একটা বৌচা বাসন্ত রস বাহির করিয়া থাকে।) যথৌপে এক জেব্রি কলাপাতার পাতার উত্তরদিকে মোচের দ্বারা এক কাণ্ডের আটাই পদার্থ জমে, লোকে তাহা মগ্‌গ্রহ করিয়া খাতি প্রস্তুত করে। কলাপাত্রে অনেক কাণ্ড মাঝাঝি ইয়া থাকে। যেখানে হঠাৎ বন্ধা প্রদেশে গুচে, সেখানে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া স্পার্মিয়া করিয়া রাখিয়া দিয়া লোকে প্রস্তুত করে। ইহাকে কলার ডেলা বা মালাস বলে। আফ্রিকার অসভ্যদের এবং ভারতে দামিপাতায় লোকেরা কলাপাত্রে লম্বা কাটা তীর ও তরবারি শিলা করে। বাঙ্গালার হস্তীপুজায়, বিবাহে এবং অধিবাসাদি মাংসাকর্ষে এক ছড়া ঝং ও কলা আবহৃত ইয়া থাকে। মূল্যমান্যতাও পীরের শিখি বিহার সময় কলা ব্যবহার করে। বাসন্তী ও দুর্গাপুজার সময় নবপত্রিকা কলার ডেউড় ব্যবহৃত ইয়া থাকে। নবপত্রিকা কলাপত্র-লোকে কলাউ বলে। হিন্দুরা শুভ-কর্ম্ম কলার ডেউড় মঙ্গলচিহ্নরূপে ব্যবহার করে। উৎসবের সময়, পুজা ও বিবাহাদির সময় হিন্দুরা ঘরে ও পথে কলাগাছ দিয়া থাকে

হিন্দুদের বিবাহাদি সংস্কারে 'কলাতলা' করে। এক স্থানে একখানি আসন রাখিয়া তাহার চতুঃকোণে চারিটা কলার ডেউড় স্থাপন করে, এইখানে স্বগৃহারাই বজির রানকরা, কোরকর, চুড়াবল, কর্ণবল, বরণ ইত্যাদি ছাইয়া থাকে। বোম্বাইয়ে পণ্ডিত কামিনীরা কলাগাছকে দন ও আত্মপ্রদ বোমে পুজা করিয়া থাকে। প্রাচ্যে ইহার কাত-কাথে বা খোলা বড়ই আবহৃত হয়। ইহা দ্বারা শ্রাদ্ধ্যভোজ্য জল ও কল প্রদানের জন্ত এক-প্রকার ডোলা নির্মিত হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালার সন্তানবতী রমণী কলার খোলায় নৌকা প্রস্তুত করিয়া গাভাঙ্গল দিয়া সাজাইয়া অত্যন্ত প্রদীপ জালিয়া দেয় দ্বারা নদী বা পুকুরীতে জলে ভাসাইয়া থাকে। ইহা ভগবতী ভবানীর উদ্দেশ্যে সন্তানের মঙ্গলকামনা। ইহার নাম সেণো বা তুলনী ব্রত। কলাপাতার আগাগোড়া সমস্তই গব্যাদি খাওয়া। হৃৎকেশপ সময় এই গাছ আগাগোড়া হুচি হুচি করিয়া কাটিয়া গরেক খাওয়া। খেড় কাটিয়া লইলে তাহার বানানো পুলা গরেক দেওয়া হয়। ইহা গরুর পক্ষে বিশেষ উপকারক। জ্যান্মেঘা রীপে গম জন্ম না, হুতংগ কলণীই খোদানকর অধিবাসী নিম্নশ্রেণীর পক্ষে একমাত্র প্রধান খাদ্য। অধোমেরকার আদিনিবাসীরাও ইহা প্রধান খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করে। বোম্বাই প্রদেশে আম, কাঁটাল ফলের চারা লাগাইয়া তাহার পার্শ্বে এক একটা কলাগাছ রোপণ করিয়া লেয়। ইহা দ্বারা মাংসভারের পরভরে রোগের আগ্রহ হইতে চারা গাছটী রক্ষা পায়; শেষে বৃন্দ ৬৮ বৎসর বাদে চারা গাছের চারটা নিজে রোগে মৃত্যু করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট হয়, তখন কলাগাছ কাটিয়া ফেলে। বাঙ্গলা দেশেও এপ্রকৃতি দেখা যায়। বোম্বাই প্রদেশে গুপারির ক্ষেত্রেও কলাগাছ রোপণ করিয়া প্রাচ্যে, কলার কলাগাছের ছায়ায় গুপারির শিকড় শীতল থাকে। এখানে একপ্রকার কলা শুকাইয়া রাখিয়া থাকে; রাসেলি নামক কলা পাঠিলে একটা বাগের মধ্যে ছড়া ছড়া করিয়া সাজাইয়া বড় চাপা দিয়া ৭৮ দিন রাখিয়া দেয়, তাংপর খোলা ছাড়াইয়া সমুদ্রের তীরে মাচার উপর শুকাইতে দেয়। মাগাদি রোগে শুকাইয়া সন্ধ্যা-বেলা উঠাইয়া আনিয়া হুত মাখাইয়া সারারাত্রি মাছুর ও কলাপাত চাপা দিয়া রাখিয়া দেয়। এই-রূপে শাণি দিন পর্যন্ত সকালে ছোঁয়া দেয় ও সন্ধ্যা-

বেলা হুগিয়া আনিয়া হুত মাখাইয়া ঢাকিয়া রাখে। ৭৮ দিনে কলা বেশ শুকাইয়া যায়। ইহা বাইতে মদ নয়। শুককলা বড় লবণাক্ত ও শৈত্যনিম্নকারক; ইহা গাছ ফুলার পক্ষে উপকারী। সমুদ্রযাত্রায় ইহা বেশে ব্যবহৃত। ঘরে বাইবার জন্ত বোম্বাইবাসীরা পাকাকলা খোঁসা ছাড়াইয়া বাঁশের জোড়ি দিয়া পালা পালা করিয়া চিরিয়া রোঁজে শুকাইয়া রাখে। ইহা হইতে এক প্রকার ঘোষকা প্রস্তুত করে, তাহা বাইতে, অর্ন্ত হুগুর। সেমকলি কলা শুকাইয়া পরে ডুঙাইয়া বোম্বাইবাসীরা এক প্রকার পালা তৈয়ার করে, তাহা শিশু, রোগী ও সন্ধ্যাপ্রহৃত-কামিনীর পক্ষে অতি উপকারক এবং বলকারক খাদ্য। মরিচদেশে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ ও দক্ষিণ আমেরিকারও এইরূপ পালা করে। মেক্সিকো-দেশেও কলা শুকাইয়া থাকে। নিগ্রোরা পাকাকলা-সিদ্ধ বা মত উপায়েও বোম্বাইয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকার, আফ্রিকার ও পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপে ইহার মত প্রস্তুত করে। দক্ষিণ-আমেরিকায় এই চূর্ণ হইতে আবার বিকট তৈয়ারি হয়। ব্রিটান গিনিতে কাঁচকলা প্রধান খাদ্য বলিয়া শূন্য এবং ইহুগুর পর ইহার চাব বেশী হয়। ইহার গাছের রসে দার বা লবণং দ্রব্য প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ-আমেরিকায় তাড়ির মত এক প্রকার মদ্য পাকাকলা হইতে প্রস্তুত করে। শুকনা কলা হইতেও এক-প্রকার মদ্য হয়, তাহা উভয় নহে। এইখানে পাকা ফলের মত পাতায় জড়াইয়া শুকাইয়া ছোট ছোট পটালির ভাণ্ড করিয়া রাখিয়া দেয়। প্রযোজ্য মত ইহার একটু তুলিয়া লইয়া জলে তালিয়া সরবত করিয়া খায়। এই সবরত বড় শীতল ও অস্বা-প-কারক। ভারতবর্ষে ইহার খোলা হইতে কামড়ার কাল বড় প্রস্তুত হয়।

কলার গুণ।—পাকাকলার গুণ অনেক। ইহা লবণাক্ত, শীতল, পিত্তনাশক, শুষ্কপাক, জ্বল-রোগে অপর্য্য, সন্ধ্যা-তজ্জালিবদ্ধ, চক্ষু ও শ্রমহারক, লাণবাণবদ্ধ, কক্ষর, আমকর হৃদয় এবং ইহা বাইতে দিবং কায়ামস্তক মদুরসাবিশিষ্ট। দারি, হুত ও ঘোষের মতই কলণী মাইলে অতিশয় চুম্ব্য হয়। চাঁপাকলার কয়েকটা বিশেষ অঙ্গ আছে—ইহা বাতপিত্ত নষ্ট করে অথ অতি স্নায়।

মোচা।—কল, কুমি, হুট, দ্বা, বাতপিত্ত ও রক্ত-পিত্ত ও রক্তাশয়, প্রমিথক্কির এবং বাতপিত্ত, উত্তর-দেহিবিহারক। খেড়ো বহুজি করে এবং বাতপিত্ত

লই করে। চাপাকসায় রহমুজ রোপের উপকার হয়।
মলমল-হেকিমেনাও শিতব্যায়, রক্ত এবং ক্ষরণ-
নামক বলিয়া কলার গুণু ব্যাধা করেন। ডাক্তার সের-
ক্সোর বলেন যে, ইহা শুক্ররক্ষিকর ও মস্তিষ্কসোহ-
নামক; কিন্তু রূপচা হেকিমেরা কলনী-জোজন-
জনিত দোষের জন্য মধু, আদা ও পান বহিতে
বলেন। ইহার কচিপাতার আবরিত চক্ষুরোপের
পক্ষে উপকারী। ইহার শিকড়ের রসে বহুমূত্র-
রোপের কলগালা দ্রুত প্রসূত হয়।

কলার সূতা।—কলাপাছে দল, প্রোজ, মোচা,
পাচমাসা ভিন্ন আরও একটা স্থলপ প্রোজ জন্মায়
বহু উৎপন্ন হয়। ইহার বাসনা, ছাল ও পাভা
হইতে তত্ত্ব প্রসূত হইতে পারে। ইহাকে কলা-
পাছের সূতা বলা বাইতে পারে। পাভাতাগণের
অন্যন্যময়ে এই তথা আবিল্লত ও গুয়ায় তাঁহারা
ইহার জন্ম বিশেষ বাহ্যত্ব লইয়া থাকেন এবং
অনেকে দিগ্ধাও থাকেন। কিছু প্রাচীন ভাষায়
জোককোও যে এই বিষয় অবগত ছিলেন এবং
কোন কোন কথ্যে ব্যবহার করিতেন, তাহা নিশ্চয়; এ কথা
একমাত্র ইহার সংস্কৃত নাম আশ্বেদা-ফলা হইতে
ও মানাকরণের ব্যতীরা পর্যবেক্ষণ করিলে এমায়
ও যায়। মালীরা এখনও কলার ছোটায় ও
বাসনার সূতা খণ্ডে মাল্য পাঁখে, ফুলের পাত পাঁখে,
লতাপাছের মাচা বাঁধে এবং আবিল্লত তত দুই
ভিন্নটা ছোট্ট একত্রে পাকিয়া কাপড় শুকাইবার
দড়ি, কুড়ি ধরিবার দড়ি উত্থাপি করিয়া থাকে।

কলাপাছের সূতায় কাপড়, দড়ি, কাচি প্রভৃতি
প্রসূত হয়। বিশেষায় বিপণিবাসের দ্বারা ইহা
সৈন্যনিষিদ্ধ উপায়ে প্রসূত হয়। কলাপাছের সূতা
সৈন্যনিষিদ্ধ হইয়া উপায় আছে:—(১) পাছ 'জলে
পচাই, (২) কল পিষিয়া। প্রথম উপায়ে
সূতা বাহির করিয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হয়;
শেষোক্ত উপায়ে হইলে পাছ কাটাইয়া উহাকে
কলের ভাঁড়ায় বা জলদায় দিয়া পিষিতে হয়।
পোষাই হইলে ও পতিয়া দিলে সেই পাছগুলি
লইয়া মোড়া ও কলিচুর্গের জলে সিদ্ধ করিয়া সূতা
গুলি কঠিন করিয়া লইতে হয়। এই সিদ্ধ
করিবার সময় সূতার গা হইতে অস্ত্রাত্মক অংশ পলিয়া
যায়। ১টা ৬৫ মণ, কলদায় একদিনে ২১ মণ সূতা
হইতে পারে। সূতা পরিকৃত করিবার জন্য ৫ বার
সিদ্ধ করিতে হয়। ২১ মণ সূতা সিদ্ধ করিবার জন্য

১ মণ মোড়া ও ১ মণ কলিচুর্গ বাগে। সিদ্ধ করিবার
সময় রকম রকম সূতা বাছাই করিয়া দেখিতে হয়।
কিকে রসের সূতা হইলে ৬ বটা, লইলেই পরিকার
হয়, কিন্তু ষোড়শ হইলে ১৮ বটার কল মণ ভাল
রকম পরিবার হয় না। বয়সার হইতে সিদ্ধ সূতা
যন্ত্রের সাহায্যে জলের খোঁজে গৌত হইতে থাকে।
ইহার পর সূতা গুলি ছায়ায় শুকাইতে হয়।

পাছের বাসনা, ডাল, পাভা ও মরুল অংশ হই-
তেই সূতা পাওয়া যায়। ও ডি অপেক্ষা ডালের সূতা
পরিবারে অধিক হয়, আর তাহাই অধিক মূল্যবান।
পাভার সূতা অত্যন্ত হৃদয় হয় বটে, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র হয় বলিয়া কাপড় ভিন্ন আর কিছু হয় না।
১৮৬৭ সালে ডাক্তার ক্রে ইহা হইতে এক প্রকার
চিঠির কাগজ প্রসূত করাইয়াছিলেন। উহা অতি
স্থলপ হইয়াছিল। ১৮৫২ সালে ডাক্তার হাটোর
মাদ্রাজ মহাশয়পরিশ্রমে কলার সূতায় প্রসূত
কাচি, কাচি, কাপড় ও সূতার নানারূপ মনুনা দিয়া-
ছিলেন। এই মনুদায় এক প্রকার কাপড় ছিল,
আর এক প্রকার কাপড় ছিল, তাহা পাচমসের সূতা, কড়া,
ইহা জলে ভিজিলে নষ্ট হয় না। মনুদার সূতাও
নানা বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছিল। দড়ি ও প্রকার
কলার কাপড়, কাপড়কা দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ
ক্রে ইহা হইতে এক প্রকার কাপড় তৈরি করিয়া
লইতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন যে, কলা-
পাছের সূতায় কাপড় অতি উৎকৃষ্ট হয়। অল্প কোন
সূতা না পিষাইয়া কেবল কলার সূতায় পাভা মজ-
নুত কাপড় হইতে পারে। কল চলিবার সময়
ইহাতে শুইনি বা বাট পড়ে না, ইচ্ছামাত্র অধিক
ও বর্ণের কাপড় হইতে পারে। ডাঁজ করিলে ইহার
পাছ মালিয়া যায় না। ইহার কাপড়ের সূতা
হানে সমান হয়। বাসনার ও আলদানার সূতায়
কলাপাছের সূতা লইয়া বাসীর কল ও ইহা পরীক্ষা
করা হইয়াছিল,—মল ও মস্তায়ার হইয়াছিল।
প্রতি পাছ ১২ সের সূতা হইতে পারে।

দড়ি কি কাচি করিতে হইলেও সেই কলাপাছের
সূতা বহুলে ব্যবহার করা বাইতে পারে, কিন্তু যিনি-
পাইন বাপের Musa Textilis নামক একপ্রকার
কলাপাছের সূতা এই ও সবক্ষেপে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাকে
ইংরেজীতে "ম্যানিলা শব্দ" Manila hemp বলে।
ইহার রস থাকে না। বাজাল, মাদ্রাজ ও বোম্বা-
য়ের হানে যখন আবাক্স এইভাণ্ডার কলনী-
জন্মিচ্ছে। বোম্বায়ে ইহার খোড় যায়।

ইহার বাজেও চারা হয় বটে, কিন্তু ডেউড়
লাগাইলেই ভাল হয়। ইহা পার্শ্বভূমিতে ও
যেখানে অস্ত্রাত্মক পাছপালা পচা পড়িয়া থাকে, একপ্র
স্থলে থুং বাড়ে। এই শ্রেণীর,—কল হইতে দিলে
সূতা ভাল হয় না। ইহার বাসনাগুলি ও ইপি
চওড়া করিয়া চিটিয়া, পিষিয়া রোঁজে শুকাইয়া সূতা
বাহির করিয়া লইতে হয়। এই কাজায় সূতায়
হৃদয় বহু প্রসূত হইতে পারে। ইহার সূতা শপ
অপেক্ষা ২৫ গুণ ভারবহ।

চাকায় এক প্রকার কলার সূতার কাপড় প্রসূত
হয়। চাকাই তাঁতিরা সময়ে সময়ে এই কাপড়ে
নানা কারককার্য করিয়া আপনাদের গুণপনা দেখায়,
অল্প লোকে তাহা দেখিয়া মোহিত হইয়া যায়।
১৮৪৩ সালের কলিকাতা-প্রদর্শনীতে চাকাই তাঁতিরা
কেবল কলার সূতায় একপ্রকার প্রমাল্য দুনিয়া তাহার
উপর সাজাজরিয়া কাজ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল।
কলিকাতার বাহাদুর এই প্রমাল্যনি আঁজিও
কিছ। ইহা দেখিতে ঠিক তসরের সূতা, কিন্তু
তাহা অপেক্ষা বৃথাময়। ইহা ৩০ ইঞ্চি লম্বা-
চওড়া। কাপড়ের দাম ৫০ টাকা।

কলার চাষের বিষয়।—বাসালায় ইহার চাষে
বিশেষ পরিপাটি নাই, কেহ বড় বড় ও লম্বা না।
যেমন জমিতে যেমন ভাবে ইচ্ছা, লাগাইয়া দাও,
ফল হইবে; কিন্তু যত করিলে ভাল ফলশ পাওয়া
যায়। এখানে যদিও কেহ ইহার চাষে বিশেষ যত্ন
করে না, তথাপি ইহার আবাদ-সম্বন্ধে নতুওগুলি
নিম্ন আছে, সেগুলি পালন করিলে বাস্তবিকই
সুফল পাওয়া যায়।

মাতী—কুটীন, নীরস ও কেবল বাসুকামর স্থান
ব্যতীত অল্প মরল প্রকার মাতীতে ইহা হইতে
পারে। সঁাতা মাতীতে, পুকুরিগির তোলা মাতীতে
ইহা বুং ভাল হয়।

মারের কথা।—কলায় বোম্বাটী (পুকুরিগি)
কাটাইলে বা বালাইলে মাতীর নিম্নস্তর হইতে যে
কলামাটী বাহির হয়, তাহা বর্ধদিনে বুদ্ধাদি পচা
মাতী বলে। ও, ছাইয়ের দার দিখে হয়।

রোপণের সময়—বৈশাখ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ
মাস পর্যন্ত বাসালয় কলাপাছ পোঁতা যায়। কিন্তু
ধনা বলেন,—

১. "কি কর বন্ধু মিছে খেতে,
কাজনে পোঁত এঁতে কেঁতে,
বেশে বাসে কাড় কি 'কাড়,
কলা' বইতে ভাঙবে বাড়।"
২. দুটা পোঁত কাজনে, কলা,
খাড়া হবে মাস দশলা।
৩. ডাক দিয়ে বলে বনা,
আমায় আশনে কলা পুঁত না,
রবি বটে বাপুনে, কলাতলায় বাসিনে,
লেগে ধবে জুঁবে, কলা পড়বে শুয়ে।
৪. সিংহ মীন বন্ধে, কলা বুধে আর্জকে।
৫. ভাদরে করে কলা রোপণ,
সবংশে মরিল রত্ন।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে কাজনে মার
কলার হইতে কাটিয়া লাগাইতে বলা হইয়াছে; আর
তাহা হইলে কলা বৃং শীঘ্র করিলে এবং কাচি ও
ছড়া বড় হইবে। ৩য় নিয়মে আমায় আশনে কলা
রোপণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কারণ ইহাতে
জুঁয়ে ধরিবার সম্ভাবনা। জুঁয়ে লাগিলে কলাপাছ
ভুঁয়া পড়িবে। ৪র্থ নিয়মে 'চেত' ও ভাদ মাস
বলা কলা লাগাইতে বিধি দেওয়া হইয়াছে। ৫ম,
নিয়মে ভাদমাস পরিভুক্ত হইয়াছে। আরও
একটা বন্যার বন পণ্ডায়া যায়, তাহাতে কল
আমায় আশনে কলা লাগাইতে বিধি দেওয়া আছে।
তাহা এই—

"ডাক বে বলে বাবু,

কলা পুঁতগে আমায় আশন।"

রোপণের নিয়ম।—কলাপুণ্যান করিতে হইলে
প্রথমে ক্ষেত্রে ৮ হাত অন্তর এক একটা শ্রেণী
করিবার জন্য অনুমান এক হাত মাটী তুলিলে এবং
কোমালি পচা ভাঙ্গিয়া পলার ভরিয়া ক্ষেত্র
সমতল করিয়া দিলে। ডেউড় লাগাইতে হইলে,
প্রত্যেক ডেউড়ের সহিত একটা করিয়া প্রাচীন
রুক বা এটের কিসদাম থাকা আবশ্যক। আর
এঁতে লাগাইতে হইলে এঁতেগুলি উকাধোকা
৪ বা ৮ বং করিয়া ক্ষেত্রেয় রোপণ করিলে। প্রত্যেক
চারা বা এটের কিসদাম ৮ হাত অন্তর লাগাইবে।
ডেউড়ের, পাছ দীর্ঘ হয় আর এটের চারায় পাছ
বাঁট হয় বটে, কিন্তু মল অধিক বড় ও সুস্থায় হয়।
বালান করিবার স্থিতি। না হইলে, যে কোন স্থানে
মারি দিয়া লাগাইলেও হয়। "আর মারি দিবার
স্থিতি না থাকিলে যেমন ভাবে ইচ্ছা সেমেনই

লাগাইলে হয়, তবে তার দেওয়া আবশ্যক।
বোম্বের সময় কোলান মাত্র সঙ্গ কিনিং বোম-
মাটা মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। তৎপরে
মধ্যে মধ্যে চারার গোড়ায় ছাই গিলেই চলিলে।
এ সময়ে খনার কয়েকটা নিয়ম আছে;—

- ১। সাত হাতে, ভিন্ন বিষাতে,
কলা লপায়ে মায়ে-পুতে।
- ২। নলেকান্তর পক্ষে বাই,
কলা ধরে বেগে তাই।
- ৩। সাত হাত অন্তর সাত হাত বাই,
কলা পুতে খাও চাখা তাই।

১ম নিয়ম, সাত হাত অন্তর দেহে হাত পড়ার
করিয়া ডেউড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পাছ লম্বাভে,
২য় নিয়ম, ৮ হাত অন্তর ২ হাত পড়ার কটিয়া এবং
৩য় নিয়ম, সাত হাত অন্তর ও পোনে দুই হাত
পড়ার করিয়া পথার কাটিয়া চারা লাগাইলে।

কলার আয়—কলার আয়-সময়ে খনার দুইটা
উপলব্ধ আছে, তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং স্বাধঃ।

- ১। কলা পুতে কেট না পাত,
তারেই কাপড় তাইতে ভাত।
- ২। ভিন্ন ম বাট কাড় কলা ধরে,
ধাক্কে গৃহস্থ ঘরে ভরে।

কলাপাছে পাতা কাটিলেই পাছ বলমান হয়।
পাড়ে, হুতরাং মোচা হাতে বিলম্ব হয়। নতুনা
বৃষসময়ে কল হইলে লাঠি হওয়ার সম্ভব। ৩০-
৪০ কাড় কলাপাইলে ৮ মাস বাবে প্রায় সমূল্যগুলি
কলিবে, হুতরাং একবারে ৩০-৪০ কাড় কলিতে অতি
অস্ব হইলে ১০-১২ টাকা আয় হইবে। পল্লীগায়ে
মাসে যদি ১২ টাকা ধর্য করা যায় তখন যথেষ্ট
বহুল্যে চলিতে পারে। আর ২ বিধা জমীতে
৩০-৪০ কাড় কলা বহুল্যে হইতে পারে।

কলাপাছ একবার লাগাইলে এক জমীতে প্রায়
৫ বৎসর পর্যন্ত বেশ ফলে, কিন্তু তৎপরে অল্প
ভূমিতে লাগান অবশ্যক। বোম্বাই প্রদেশে সরস
মাতীতে কলার চাষ করে। বোম্বাইবাসীরা মাড়ের
মধ্যে কখন একটা, কখন দুইটা ডেউড় রাখিয়া
বাঁক সম্বলি কাটিয়াফেলে। এখানে ইহার চাষে বড়
ফল করিয়া থাকে। ইক্ষু ও পানের চাষের পরই
সেই জমীতে ইহার চাষ করে। এখানেও পান
কাটিয়া লইলে, ইক্ষু বুনে, ইক্ষু কাটিয়া লইলে
জমীটা কিছুদিন ফেনিয়া যায়; তৎপরে দ্বিতীয় পর
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে (দানিগায়ে এই সময় জল

হয়) লাঙ্গল ও মই দিয়া ৮ ইঞ্চি করিয়া দুবাইয়া
চারা পুঁজিয়া দেয়। চারা বদাইবার সময় বোম্বা,
পচমাছ, পোবন ইত্যাদি সার মিশাইয়া দেয়।
ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কলা বৃক্ষীয়া চারা, রোপণ করিতে
হয়। এক একটা পরিমিত জমীতে বসাই
কলার চারা ১০০০ আর তরুড়ি কলার চারা ৫০০ মাত্র
লাগাইয়া থাকে। অল্পাত জাতীয় প্রত্যেক পাছের
মধ্যে ৭ ফুট ফাঁক দেয়। তাহার চারা পুঁজিবার
সময় হইতে ৫ মাস সার দেয়, প্রথম ৩ মাসে খোল
ও ৪র্থ মাসে পচমাছের সার। প্রত্যেকবার সার
দিয়া তাহার উপর পাতলা মাটি ঢালা দেয়।
মাছের সারে বড় পোকা হয় বলিয়া এই সার বিবার
পর ৮১০ জন জল দেয় না। জল না লাগিয়া
চৌধে পোকাদোষ মরিয়া যায়। চারা পচাইবার
পর ইহার সমস্তই দুবার জল দেয়; তৎপরে যতদিন
বৃষ্টি না হয়, ততদিন সমস্তই ১ বার করিয়া
জল দেয়।

মাছাজে দুই প্রকার চাষ হয়। উক্ত জমীতে
‘পাক্সা বলই’, আর নিম্ন জমীতে ‘খুঙ্গ বলই’।
এখানে কলাপাছে রাঙ্গা আদু ইত্যাদি বসান করে।
এখানে লাঙ্গল দেয় না, কোমলাইয়া কলার জমী
তৈয়ার করে। ৫ বৎসর পরে কলাপাছ মরিয়া
কোমলাইয়া অল্প ফসল দেয়।

অন্ধ্রদেশবাসীরা ইহার চাষে কোন বস্তু লয় না,
কিন্তু প্রত্যেকের বাড়িতে কলাপাছ আছে। বস
না করিলেও এখানে বহুল্যে অপর্যাপ্ত উত্তম
ফসল হয়।

পূর্বাভারতীয় দ্বীপে কলার চাষে বড় বস্তু করে।
প্রতি ৬ বৎসরে ইহার ক্ষেত্র পরিবর্তন করিয়া নুতন
ডেউড় লাগায়। পুরাতন এটে সারসঙ্গে ব্যবহার
করে। এখানে এত বস্তু না করিলে ফলে বীজ
জমে। বিক্রিবার্থেও পুরাতন এটের সার দেয়
যদি, কিন্তু তাহার এমার ভাল বলে না, ইহাতে জমী
টুকু হইয়া উঠে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে পুরাতন পাছ কাটি হুচি
করিয়া পুড়াইয়া ফেলে, পরে ডেউড় কাটিয়া সেই
ছাইয়ের মধ্যে দুই হাত অন্তর পাঁচি দিয়া গর্ত
করিয়া লাগাইয়া দেয়, আর কোন সেক্সা করে না।

Musa textilis (বাহার মত ভাল হয়)
৬ ফুট হইতে ১ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। শেষে
এই ফাঁকেও চারা বাধির হয়। ২ বৎসরেই হুতা
হইতে পারে, কিন্তু ৫ বৎসর হইলে হুতা কিছু

পাকা হয়। ইহার ফল হইতে নিতে নাই, তাহা
হইলে হুতা ধারাপ হয়। এই ফল হওয়া বন্ধ
করিবার জন্য দুইটা মাত্র পাতা রাখিয়া আর সব
কাটিয়া ফেলিতে হয়।

কলনী সময়ে প্রবাদ—বাতালীর মধ্যে কলা
গম্বকে অনেকগুলি প্রবাদ আছে। ১টা প্রবাদ—
কলাপাছে বজ্রবাৎ হইলে, বজ্র আর উঠিয়া
স্বর্গে যাইতে পারে না। চেতেরা এই বজ্র সেই
লইয়া পোপনে রাত্রিকালে জানালা পলাইয়া কামার
বাড়ী ফেলিয়া আসে। কামারের তাহাতে সর্দিকাটা
গড়িয়া জানালায় রাখিয়া দেয়, চোর রাত্রে আসিয়া
পোপনে লইয়া যায়। ইহা হইতেই প্রবাদ
হইয়াছে,—‘চোরের কামারে দেখা নাই’।

২য় প্রবাদ—হুচী দৌবা কলা বড় ভাল বাসেন।
যথা—‘হুচী, কলা ধাবার পোতা’।

৩য় প্রবাদ—প্রিয়দাস। যথা—‘কলা পড়ে উপ-
চাপু, বড় ধাক্কা ওপুপাপু’।

‘ভালিক মরিক’ নামক পারসী চিকিৎসাগ্রন্থে
লিখিত আছে, ইহাতে কপূর হয়, কিছ অহিন-
আকরী তাহা স্বীকার করেন না।
ইয়েরদের মধ্যেও এত সমস্তই প্রবাদ আছে
যে, ইহাই বাইবেলোক্ত নিম্বিকার। মালুক

বেলেন যে, বাইবেলোক্ত ‘ডুডেইল’ ফলই কলনী।
কেহ কেহ বা ইহাকে নিম্বিক ফল না বলিয়া স্বর্গে-
কালনে মানবের প্রথম প্রধান থাকা বলিয়া বিবেচনা
করেন। ফলে বাহাই হইক, ইহার সেহিত স্বর্গে-
কালনের মধ্যবর আছে বলিয়াই বোধ হয়, ইহার
নাম *Paradisia* (*Paradis* = স্বর্গ) হইয়াছে।

কলাপাছে কারিগরি।—(১) লতাকার—একটা
কলাপাছ এক স্থানে পুঁজিয়া। এই পাছটার গোড়ায়
বড় বিন ডেউড় বাধিরা না হয়, তত দিন কিছু করিতে
হইবে না, কিন্তু ডেউড় হইতে আরম্ভ করিলে উহা
মরিয়া ফেলিবে। বাড়িতে দিবে না। পরে এক
স্থান মাত্র পোড়া রাখিয়া মূল পাছটী সমস্ত কাটিয়া
ফেলিবে। প্রত্যহ ঐ পোড়াটীতে এক কলনী
করিয়া জল দিবে। ইহাতে পুরনায় পাছ বাহ্য
হইবে। এক হাত বাড়িলে আবার পূর্বকর্তিত
স্থানেই কাটিয়া দিবে ও প্রত্যহ জল দিবে। এই-
রূপে পুনঃপুনঃ কাটিতে কাটিতে যখন মোচা বাধির
হইবে, তখন আর না কাটিয়া, গোড়ার পাছটা
মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে। এদিকে বোঝে ও মোচা
বাড়িতে থাকিবে; কিন্তু আশে পাশে অলপদল না
পাইয়া, উক্ত উচ্চ হইতে না পুরিয়া জমীর উপর

হেলিয়া পাড়য়া, লতাইয়া বাড়িতে থাকিবে। ইহার
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

চৌ-মোচা।—চারি জাতীয় কলার চারিটা ডেউড়
এটে সমেত কাটিয়া ‘খানিয়া পাছগুলি কাটিয়া’
ফেলিবে এবং প্রত্যেক এটে হইতে এমন ভাবে বার
খানা পাছ দিবে যে, ঐ চারিটা একত্র করিলে যেন
একটা পূর্ণ এটে হয়। তৎপরে ঐ চারিটা একত্র
করিয়া পাট দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া উপরে পোবর
লোপিয়া দিবে। যখনই ইহা পুঁজিতে হইবে, সেইখানে
একহাত পড়ার একটা গর্ত করিয়া, তাহার অর্দ্ধাংশ
পাছা বঁড়ে পূর্ণ করিয়া, তাহার উপর ঐ এটেটা
বদাইয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে।—কিছুদিন পরে
চারি বাধির হইবে। যতদিন পর্যন্ত মোচা বাধির
না হয়, ততদিন ইহার আর একটা পাট বাই, কেবল
গাছ না মরিয়া যায়, এইরূপ করিতে হইবে। পরে
যখন দেখিবে যে, মোচা হইবার উপক্রম হইয়াছে
অর্থাৎ ‘পাছমোচা’ পড়িবে, তখন পাছের অগ্রভাগ
শুক বুজু ছাড়া বাকিয়া দিবে। তৎপরে পাছটীতে
এককালে চারিটুকু গিয়া ৪ জাতীয় ৪টা মোচা
বাধির হইবে। মোচার তার রাখিতে পারে, এমন
করিয়া মোচার ডালগুলি নীচে তেঁকাটা রাখিয়া
দেওয়া উচিত।

কলাপাছ—একটা মর্তমান বা চাপাকলার ছোট
ডেউড় একটা ভলয় বড় ছিদ্র করা টবে এমন
করিয়া পুঁজিবে যে, তাহার, তাহার শিকড়ের নীচে
যেন বড় অর্থ ৮১০ অঙ্গুলি মাটি থাকে।
যতদিন চারটা বেশ সমস্তই না হয়, ততদিন অল্প
অল্প জল দিবে। পরে যখন দেখিবে যে, বেশ
সমস্তই জলিছে, তখন ১ হাত উচ্চ একটা বৈশা
মাচার উপর বৃষ্টিয়া রাখিবে এবং জল দেওয়া বন্ধ
করিতে। পরে সমস্ত পাতা ডাঁটগুলাে কাটিয়া
ফেলিবে। প্রত্যহ এই শিকড়গুলিতে জলের ছিটা
দিবে। পরে যখন পাতমোচা বাধির হইবে, তখন
তাহার অগ্রভাগ কাটিয়া দিবে। ইহাতেই বোঝা
হইবে, তাহা কলাপাছটার মাধার উপর ছল্লাকারে
হুটীয়া ফেলের মত দেখাইবে। করিয়া উঠিতে
পারিলে ইহা সেহিতে অতি মন্দ হয়।

ঐনগেলুনাপাছ বস্তু।

এসিয়ার পারশ্বদেশীয় সিংহ।



সমস্ত বন বিকশিত হইতেছে। এখনও সাধনান হও, আর শয় লও, চরিত্রিকে আশ্রয় জালাও, নচেৎ আপনামালিকে হারাইবে।" একজন এত অধীর হইয়াছিল যে, তাহার আর সন্ধান না, সে আমাকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল, কহিল, 'তবে কি আর হারিকে দেখিতে পাইব না?' এ আশার গলা ধরাধরি করিয়া কানিলে চলিবে না।" কানি-বার ইচ্ছা থাকে ত ধরে গিয়া তোমার প্রিয়র গলা ধরিয়া কানিও। এরূপ স্থানে তোমার মত লোক সঙ্গে থাকিলে প্রকৃত আর কি।" আমি তাহাকে ঠেলিয়া দেলিয়া দিলাম। আমার সঙ্গীরা আশ্রয় জালাইয়া করকণিক মন্ডাল প্রস্তুত করিল। পরে দ্রুতগত অশ্রয়স্থ ও মন্ডাল লইয়া আমরা পলা-দত্ত হইল। সেইদিন সকলের উদ্ভায়ে আমি খিনটী সিংহ শীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু হারির কিছুমাত্র সন্ধান পাইনি।

আফ্রিকার সিংহ-সমূহকে অনেক অনেক কথা লিখিয়াছেন, তাহার চরিত্র-চরিত্র করিয়া বুঝা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলাম। এখন এসিয়ার সিংহ-সমূহকে দুই এক কথা বলিয়া রাখি।

এসিয়ার সিংহ।

আফ্রিকার সিংহ যেমন ভয়ানক, এসিয়ার সিংহও তদপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে। উভয়ের

সদ্যবই সমান। তবে প্রভেদ এই, আফ্রিকার সিংহ মরুভূমির রাজা, এসিয়ার সিংহ বন-জঙ্গলের রাজা।

অতি পূর্বকাল হইতে এসিয়ার রাজপন সিংহ-শীকারে বাহির হইতেন। সঙ্গে প্রধান প্রধান শীকারীরা চলিল। পীণপমোহরা হস্তরী বর্মগণপ হাতে ধর্ম্মদণ্ড লইয়া রাজ্যদিগের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিত। এক দিকে সিংহাদি মাংসভোজী জন্তুদের অশ্র-ভেদর নিদান, অপর দিকে কোকিলকণী নর্ত্তন-পনের সংগীত-আলাপে বনভূমি এক অপূর্ণ ভাব ধারণ করিত। রাজপন কেহ রথে, কেহ হস্তিপৃষ্ঠে, কেহ না অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া শীকার করিতেন।

এসিয়ান এক প্রকার সিংহ আছে, তাহার ভেদই এবং অস্ত্রের মাংসভোজী হইলেও, মানুষ দেখিলেই ছুটিয়া পলায়। কিন্তু আর একজাতীয় সিংহ আছে, তাহার মানুষকে ভয়পেও করে না। এই সিংহ নির্ভয়ে শীকারীর সমুখ দিগ্গত চলিয়া যায়। ইহাশিগকে বাণবিক্রিতে কিবা গুলি করিতে বড় কষ্ট হয় না। কিন্তু একবার আঘাত করিলে আর নিস্তার নাই। তখন মরণাজ কেশর ফুলাইয়া ভীমমর্জ্জনে আক্রমণকারী সমুখীন হয়। এমন কি, লাসাইয়া হস্তীর উপর উঠিয়া নখাঘাতে তাহার মস্তক নিদীর্ণ করিয়া ফেলে। মাংস-শীকারী,—এ যে মোক্ষ হাতির উপর থাকে, হয়ত সকলকেই ইদানী

ভারতবর্ষীয় কেশরহীন গুজরাটী সিংহ।



বাইতে হয়। তাই, এই সকল সিংহ-শীকারে বিশেষ সতর্ক হওয়া চাই। দুই একটা গুলিতে ইহাদের বড় কিছু ক্ষতি হয় না। সিংহ মারিতে হইলে উপর্যুপরি গুলিমাগা আবশ্যক।

এসিয়ার সিংহী এক সময়ে ৩৪টা সন্তান প্রসব করে। ৫ মাস পর্যন্ত সন্তানগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে রাখে।

এসিয়ার সিংহজাতিকে দেশভেদে তিন ভেগীতে বিভক্ত করা যায়—আরব্য, পারস্ত ও ভারতীয়।

আরব্য-সিংহ দুই প্রকার; এক জাতীর কেশর আছে, আর এক জাতীর কেশর নাই। বাহাদের কেশর নাই, তাহারাই আরব জাতীর প্রিয়। 'আর-বেরা বলে, ইহারাই মধ্য প্রদেশ'। তাহারাই এই সিংহের বড় অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কেশরী সিংহ, তাহাদের মতে 'ধবর' অর্থাৎ কাহার; ইহারাই বিদ্রোহী, দেখিলেই ইহাশিগকে বিনাশ করা উচিত।

আরব্য ও পারস্ত উভয় দেশের সিংহই দেখিতে একপ্রকার এবং একজাতীয়। কিন্তু আরব দেশে বাহাদের দেখা যায়, তাহারাত্ত সাহসী হয় না। তাহারাত্ত মেঘ, মধ্য প্রদেশ শীকার করে বটে, কিন্তু জন্তুদের কাছে অগ্রসর হয় না। শীকারী দূরে বাউক,—কীলোক, এমন কি ছোট বালক দেখিলেও ইহারাত্ত ছুটিয়া পলায়। এই জাতীয় ভীক সিংহ, ক্রুরকৃত্ত দেশেও দেখা যায়।

পারস্তের সিংহ চতুর এবং সাহসী, কিন্তু ভয়ানক শক্তিশালী নয়; ইহার কোপ, সুবিধাক্ষ কোপ মারে। ইহার দূরে শীকার দেখিলে, প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে; শীকার কাছে আসিলে, বাঘের মত লাফাইয়া তাহার খাতে পড়ে, এই সময়ে ধোরবরে গর্জন করিতে থাকে। এইরূপে ইহাদের মনধামনা অজ্ঞানসেই সিদ্ধ হয়। শীকার-ভয়ভোজী জন্তুর মাংসই ইহাদের প্রিয় খাদ্য।

ভারতবর্ষীয় সিংহ।

ভারতের সিংহ প্রধানত দুই প্রকার; সৌরাষ্ট্র সিংহ এবং বর্ডার সিংহ। কেহ বলেন, সৌরাষ্ট্র বা গুজরাটী সিংহের খাতে কেশর জন্মে না। এই জন্তু ইহাশিগকে কেশরহীন সিংহ বলা যায়। আবার কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন 'গুজরাটী' সিংহের কেশর হয় না, এমন কথা বলা যায় না। আমি নিজেই ২৫টা গুজরাটী সিংহ দেখিয়াছি; তবে ইহাদের কিছু শৌর্য বয়স না হইলে, কেশর গজায় না এবং কেশর হইলেও আফ্রিকার সিংহের মত মার্কপ্রহসন ও পূর্বভা-প্রাচ্য করিতে পারে না, এই জাতীয় সিংহ পুরস্কৃত পুস্তকভাষ্যের নিকট পর্যন্ত দেখা যায়।

গুজরাটের কোন কোন স্থানে ইহাশিগকে 'উট্টয়া বাঘ' বলে। সে দেশে উট্টয়া বাঘ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একজন প্রাচীন

সম্যাসীর নিকট ভূনিয়াছিলাম, তিনি গুজরাটের শিবিরের পাহাড়ের নিকটে বৈরাটচাল-দর্শনে গমন করেন। এই বৈরাটচালের উপর অনেক গুলি ভাঙ্গ আছে।

সম্যাসী-ঠাকুর শিবিরের উপরে অথবা বেরীকে দর্শন করিয়া নামিতছেন। তখন স্বর্ঘ্যোদয়ে মনে পড়ে বসিয়াছেন। পাহাড়ের কোন স্থানে আশোক, কোন স্থানে অন্ধকার। যে পথ দিয়া তিনি নামিতছেন, তাহার দুই প্রান্ত দুরায়ে পর্বতশ্রেণী। দিনের বেলায় এখানে প্রাণ হায়ে করিয়া চলিত হয়; তাহাতে এখন সন্ধ্যার ঘোর হইয়া আসিতেছে। তিনি ধানিক পথ আসিয়া চক্ষুকি টুকিয়া আলো জালিয়া লইলেন। গ্রিঙ্ক এই সময়ে কড়কগুলি লোকের কোলাহল শুনিত পাইলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ করিয়া আলো লইয়া সেই দিকে ছুটিলেন। কিছু দূর নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, একজন বুদ্ধকে বেরিয়া জনকরকে মহারাষ্ট্র পাড়িয়া আছে। সেই বুদ্ধ ভূমিতে বিলুপ্ত হইতেছেন, নয়নজলে লক্ষলক্ষ জালিয়া লইয়াছেন। তাহার আন্তর্য্যে পামা-জলরও বিচলিত হয়। বুদ্ধার সেইরূপ দুর্দশা দেখিয়া তাহার সঙ্গীপও চক্ষের জল মুছিতেছে। সম্যাসী সন্ধ্যাকে সম্মুখ করিয়া তাহারে বিদ্রোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধা চেঁচাইয়া কান্দিত কান্দিত বলিল, 'ওরে বাপের! ভোরে কি আর প্রাণ বৈ, বুকে কেটে গায়ে বৈ রে।'

একজন মহারাষ্ট্র কহিল, 'আমিজী! তুই বুদ্ধার পৌত্রকে মাঝে লইয়া গিয়াছে। এমন উপায় কি? উপদ্রু পৌত্রকে হরাইয়া কোন মুখে আবার দেশে ফিরিবে? বুদ্ধার সেই পৌত্র তৈ আর কেহ নাই।'

সম্যাসী উত্তর করিলেন, 'এখন উভ্যার সময় নয়, লক্ষলক্ষ স্ত্রীর হও। যখন তোমরা এই দূরদেশে অশেষ কষ্ট করিয়া মাঝে দর্শন করিতে আসিয়াছ, তখন তোমাদের পুণ্যবলে মার আশীর্বাদে অবশ্যই দ্রুত দূর হইবে, আবার তোমাদের সঙ্গীকে ফিরিয়া পাইবে। কোন আশঙ্কা নাই।'

আর এক জন মহারাষ্ট্র কান্দিত কান্দিত বলিল, 'ঠাকুর! মূর্খ কি আবার মূর্খ খুলিয়া চাহিবেন। এখন দ্রুতশা মাজ। আমি দেখিয়াছি, বাঘ তাহাকে মুখে করিয়া শাইয়া যাইতেছে।'

পুনরায় সম্যাসী কহিলেন, 'আমি জানি, এ দেশে বাঘ নাই। অবশ্যই তাহাকে পাইবে। সকলে নরাল জালাইয়া লও—সকলে আমার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ আইস, এখন তাহার সন্ধান করিব।' সকলে মশাল জালিয়া লইল, বুদ্ধাও তখন জলের মুছিয়া উঠিয়া দাড়াইল। তখন সম্যাসী-ঠাকুর সকলকে সম্মুখের করিয়া বলিলেন, 'লো, অম্মা মায়ী কী জয়।' প্রাণ খুলিয়া সকলে ডাকিলেন, 'অম্মা মায়ী কী জয়।' গিরিপাহরে প্রতিধ্বনিত হইল, 'অম্মা মায়ী কী জয়।'

অগ্রে সম্যাসী, পশ্চাতে মহারাষ্ট্রগণ বুদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। কিছু দূর আসিয়া সম্যাসী সকলকে কহিলেন, 'এইখানে সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াও। বেহ ভয় পাইও না। আমি এখন আসিতেছি।' সকল ভীত হইয়া কহিল, 'ঠাকুর আমাদের রাখিয়া কোথায় গিয়া! আলো জালিয়া লইলেন। গ্রিঙ্ক এই সময়ে কড়কগুলি লোকের কোলাহল শুনিত পাইলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ করিয়া আলো লইয়া সেই দিকে ছুটিলেন। কিছু দূর নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, একজন বুদ্ধকে বেরিয়া জনকরকে মহারাষ্ট্র পাড়িয়া আছে। সেই বুদ্ধ ভূমিতে বিলুপ্ত হইতেছেন, নয়নজলে লক্ষলক্ষ জালিয়া লইয়াছেন। তাহার আন্তর্য্যে পামা-জলরও বিচলিত হয়। বুদ্ধার সেইরূপ দুর্দশা দেখিয়া তাহার সঙ্গীপও চক্ষের জল মুছিতেছে। সম্যাসী সন্ধ্যাকে সম্মুখ করিয়া তাহারে বিদ্রোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধা চেঁচাইয়া কান্দিত কান্দিত বলিল, 'ওরে বাপের! ভোরে কি আর প্রাণ বৈ, বুকে কেটে গায়ে বৈ রে।'

একজন মহারাষ্ট্র কহিল, 'আমিজী! তুই বুদ্ধার পৌত্রকে মাঝে লইয়া গিয়াছে। এমন উপায় কি? উপদ্রু পৌত্রকে হরাইয়া কোন মুখে আবার দেশে ফিরিবে? বুদ্ধার সেই পৌত্র তৈ আর কেহ নাই।'

সম্যাসী উত্তর করিলেন, 'এখন উভ্যার সময় নয়, লক্ষলক্ষ স্ত্রীর হও। যখন তোমরা এই দূরদেশে অশেষ কষ্ট করিয়া মাঝে দর্শন করিতে আসিয়াছ, তখন তোমাদের পুণ্যবলে মার আশীর্বাদে অবশ্যই দ্রুত দূর হইবে, আবার তোমাদের সঙ্গীকে ফিরিয়া পাইবে। কোন আশঙ্কা নাই।'

আর এক জন মহারাষ্ট্র কান্দিত কান্দিত বলিল, 'ঠাকুর! মূর্খ কি আবার মূর্খ খুলিয়া চাহিবেন। এখন দ্রুতশা মাজ। আমি দেখিয়াছি, বাঘ তাহাকে মুখে করিয়া শাইয়া যাইতেছে।'

পুনরায় সম্যাসী কহিলেন, 'আমি জানি, এ দেশে বাঘ নাই। অবশ্যই তাহাকে পাইবে। সকলে নরাল জালাইয়া লও—সকলে আমার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ আইস, এখন তাহার সন্ধান করিব।' সকলে মশাল জালিয়া লইল, বুদ্ধাও তখন জলের মুছিয়া উঠিয়া দাড়াইল। তখন সম্যাসী-ঠাকুর সকলকে সম্মুখের করিয়া বলিলেন, 'লো, অম্মা মায়ী কী জয়।' প্রাণ খুলিয়া সকলে ডাকিলেন, 'অম্মা মায়ী কী জয়।' গিরিপাহরে প্রতিধ্বনিত হইল, 'অম্মা মায়ী কী জয়।'

কেশরী ও কেশরহান সিংহ, ভদ্রক, শিরাগ প্রভৃতি জগদগণ দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সাধু 'আমিকী জল লইয়া ছিটাইয়া দিলেন। পরে ইঙ্গিত করিয়া কি বলিতে লাগিলেন, 'তাঁহার ইঙ্গিতে কয়েকটি সিংহ কোথায় চুলিয়া গেল; বানিক পরে তাহারা আর একটাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। বনাগত সিংহের মুখে ও পায়ে রক্তের দাগ দেখা গেল। কুটারমধ্য হইতে সম্যাসী এই সকল আত্ম কণ্ঠ দেখিতেছেন। তিনি বক্তব্য সিংহকে দেখিয়াই বুকিলেন, ইহারই কাঁজ। এই বৃত্তি বুদ্ধার পৌত্রকে নয় করিয়াছে। সাধু সেই সিংহের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সাধুর কর 'স্পর্শে সিংহ বেন কতই পরিতপ্ত হইল। পরে বেন সাধুর অহুযিত লইয়া কোথায় চলিয়া গেল, অন্ধকার পরেই একটা মৃতদেহ মুখে চুলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সাধু সেই দেহ চাহিয়া গলিলেন এবং সকলকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। মহান্থমধ্যে সে স্থান জনশ্রুত হইল।

সম্যাসী মৃতদেহের নিকট আসিয়া বৃষ্টিতে পারিলেন, বুদ্ধার পৌত্র এই সেই মহারাষ্ট্র যুবক। সাধু কয়েক গাছা তুল লইয়া হাতে নিড়াইয়া তাহার রস যুবকের মুখে দিলেন। কিম্বৎকাল পরে যুবকের চেতনা হইল। সাধু আর সেখানে রহিলেন না। তিনি সম্যাসীকে কহিলেন, 'তুমি যুবককে লইয়া প্রব্রাজ কর, আমি চলিলাম।'

সম্যাসী এক হস্তে মশাল ও অপর হস্তে যুবককে ধরিয়া নিকির্ হানে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধা পতিমায়ী পৌত্রকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিলেন। সকলে সকলে সম্যাসীর সহিত প্রাণ খুলিয়া ডাকিলেন, 'জয় অম্মা মায়ী কী জয়।'

বন্দ্যায় সিংহ।

এই সিংহের বর্ণ নুগের জায়, ইহাদের কেশর স্ফিক হৃদয় রঙের মত, মথো-মথো কটা রঙের গুটি-কটা। আফ্রিকার সিংহের মত ইহাদের গাভীরা বর্ণ; তবে বলবীর্য্যে ও উৎসাহে নিতান্ত কম নয়। বর্ডন নাম ইহাদের কেশর উঠে, ততদিন অস্বেন্দে বাধা বলিয়া মনে করে। ইহার শব্দ অস্বেন্দে, রাগপূর্ণতায়, গোয়ালিয়ার মতো, হরিয়ারও ও কচ্ছ-প্রদেশে জিহ্বের সময়ে মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

গুস্তো ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই সিংহ বাস

করিত। আমাদের বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সিংহের উল্লেখ আছে। * প্রাচীনকালে যে ব্যক্তি জাতির বলবান হইতেন; লোক সিংহের সহিত তাহার শক্তির তুলনা করিত।

"সিংহং সিংহীং বিজাতমহং রামসমুদ্রত।"

রামায়ণ ৩০৩৬
প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে এই সিংহের অনেকগুলি নাম আছে। 'বান্য, মগস্ত্রে, পাকাত, হর্যাক, কেশরী, হরি, পারীত্র, শেতপিল্ল, কল্লীরব, পশুমিখ, শ্বেতাট, ভীম-বিক্রম, মটাক, নুগরাজ, মগস্ত্রম্রব, কৌল, লগেটাক, কবিরাক, মহাবীর, শেতপিল্ল, গজমোচন, নুগারি, ইজারি, নুগরায়, মহাবান, নুগপতি, নুগ, বিজাত, ব্রিহদাত্তাক, কলকল, দীপ্তবী, বিক্রমী, দীপ্তপিল্ল।'

তৎকালকার রাজপুত্রগণ সিংহ লইয়া কোলা করিতেন। শব্দতাপাশ্র ভক্তের কথা মনে কর। কবিকল্প, ভবনভীর বাহন ও কালকৌর যুব-বর্নন কালে সিংহের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"দূরে থাকি দেখে চর, কঁহে সিংহ বরাবর, কালেকতু ত্রু আইসে বন।
করি অতি মৃদু দন্ত, পথ আওলি সিংহ,
হুই জনে করে মহারণ।
সিংহে মহারণের। চমকিত পশুগণ,
অবিরত হুহার গর্জন।

সিংহের না বাব টুটে, অস্ত্র নাহি পায় ফুটে,
কঁহে বয়ে নিশাস-পশন।
সিংহহুৎ বেন দরী, নথ বেন তীক্ষ্ণ ছুরি,
হুটী পৌক লাগিল প্রবেশ।
দশনের ক্ষমফিট, ডাকে বেন পেড়ে বাড়ি,
বেন তারা-উদয় গোচনে।
কাঁপয়ে উদগু জট, বোম্বা ছাড়ি মেঘমটো,
বেন ঘিরে বিল্লী স্যামো।
থায় অতি শীঘ্র পতি, নথ ঐচ্ছিক্তা দ্বিতি,
ফনে ভুমে ফণেক, মৃগেরে।"

* রঘুবে ১৩৪১, ১১৪১, ১০৭৭১, ৩৩ বৃহৎসং ১৪১১, অথর্ববেদ ৪০৩০৩, শতপথ্যব্রাহ্মণ ৭০৪১০৩
দুনিহে তাপনী উপনিষদে সিংহ 'আরা' বলিয়া নির্ণত হইয়াছে।

হয়, জগতীয়া সিংহকে বলিতেছেন,—

“সিংহ ভূমি মনুভোজা, পশুমনো ভূমি রাজা,
তোরে নখে পাখান বিদ্যে।”

অনিয়া তোমার বা, কপ্প হয় মূর্খ পি,
কি কারণ তর কর মনে।

বাস্তবিক মনুষ্যের তড়নে তরতর হইতে সিংহবংশ নির্মূল হইয়া আসিতেছে। পূর্বে যেখানে শিশু শত সিংহ বাস করিত, এখন সেখানে মেটে নিহত নাই। অশ্বখর বনের ধারে পূর্বে কতই সিংহ ছিল, তাহা ইহা হইতে এই বঙ্গীয় সিংহের নাম হইয়াছিল। এখন সে সব কোথায়? ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা ক্রমেই নিরুপহাষ হইতেছি।

বহিঃ ও বহুদেশে এখন আর সিংহ দেখা যায় না, কিন্তু এক সময়ে স্থলধর লইয়া সমস্ত বঙ্গদেশেই সিংহের বসবাস ছিল। পুন্ড্রবর্ননের সিংহ আফ্রিকা-র সিংহের দ্যায় তেজস্বী ও সামর্থ্যবান হইতে পারে নাই। এখানকার বড় বড় হিংস্র মুগুণ্ডা সিংহের চেয়ে বলবান, তেজস্বী ও অতি ভয়ানক। কেহ কেহ বলেন, সিংহের ওপরে আনিয়ার গর্ভে স্থলধর-বন বাঘের জন্ম, সুতরাং এখানকার বাঘেরা পিতার শক্তি ও মাতার বল স্বভাব পাইয়া উৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। একবার আবার অনেককে বিপদ-কথা বলিয়াই অগ্রাহ্য করেন। তাহারা অগ্রাহ্যই করেন, আর উড়িয়াই ভিটন, তাহাদের সত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত নাই। তবে সিংহ ও আনিয়ার মজনে যে এক-প্রকার জটিলব জন্তর জন্ম হয়, তাহা অনেক দেখিয়াছেন। ইংরেজীতে এই জটিলব জন্তকে ‘হাইব্রিড’ বলে।

বন বনদেশে সিংহের উপাতি ছিল, সে সময়ে এখানে সিংহদেরকে অনেক গরুও প্রচলিত ছিল। সিংহদের মধ্যে মহাবংশ নামক পালি-এর বঙ্গীয় সিংহ দেখে একটা ঐতিহাসিক গল্প বর্ণিত আছে। গরুটা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহা এই—

“বঙ্গদেশের রাজা, কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আপনাদের পাটরাণী করিলেন। সেই কলিঙ্গ-রাজকন্যা দ্বারকালে একটা কলিঙ্গের প্রসব করেন, কলিঙ্গের নাম ইহা মূর্খদেবী। পূর্বে আসিয়া তাহার কপাল দেখিয়া, বলিল, ‘এই কুমারী পুণ্ড্ররাজের মনোমোহিনী হইলেন।’

“মূর্খদেবীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপও বাড়িতে লাগিল, সে রূপের ছটাই বা কি; সে রূপে মুনীর

মন টলে, বিরাজী আবার সংসারা হইতে চায়। ক্রমশঃ কন্যা যৌবনবতী হইলেন। কলিঙ্গের রূপ-বান্ধবা ও যৌবন দেখিয়া রাজা ও রাণী উভয়েই চিত্তবৃত্ত হইলেন।

“একদিন রাজ কন্যা একাকিনী রাজবাটা পরি-
ভ্রমণ করিয়া কোন পাখনিবাসে আসিয়া একজন
শ্রেষ্ঠী সঙ্গে মিলিলেন। সেই শ্রেষ্ঠী মগধে বাইতে-
ছিল। বন্যক্রমে একটা সিংহ তাহাদের পক্ষাৎ
গেল। সিংহের ভয়ে কে কোথায় পলাইল;
রাজকন্যা ধরা পড়িলেন। তখন পুণ্ড্ররাজ লেজ
নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার কাছে আসিল। তাঁহার
অশ্রুপূর্ণ রূপে সিংহেরও মন তুলিল।

“রাজবাটা পক্ষের কথা শুনিয়াছিলেন। এখন
সিংহকে দেখিয়া ভয় পাইলেন না। বৎস মগ-
ধরাজের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।
কুমারীর কোমলতা স্পর্শ হইয়া মাতা কেশরী
কাম-মগধে আহুত হইল। তখন পুণ্ড্ররাজ আস্তে
আস্তে রাজকন্যাকে পুষ্টে লইয়া আপনাদের বাসায়
ফিরিলেন। এখানে সিংহের সহবাসে বঙ্গরাজ-
কন্যা গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে এক পুত্র ও
এক কন্যা এই যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। তাহাদের
হাত পা ও পতন সিংহের দ্যায় হইল। রাজকন্যা
পুত্রের নাম রাখিলেন সিংহবাহা, এবং কন্যার নাম
রাখিলেন সিংহশ্রীকী।

“সিংহবাহার ব্যাক্রম বোল বর্ষ হইল। সে
একদিন আশ্রয়ান মাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা,
তোমাকে দেখিতে এক রকম, আর বাবা অপর রকম
কেন?”

“সূর্যদেবী সকল কথা শুলিয়া বলিলেন। তখন
সিংহবাহা বলিল, ‘তবে কেন আমরা এখান থেকে
চলিয়া যাই না?’ তাহার মা কহিলেন, ‘কেন
করিয়া যাবে, বাবা। তোমার বাপু যে গর্ভের মধ্যে
পাথর চাপাইয়া গিয়াছে। বাহিরে বাইবার
উপায় নাই।’

“কেন মা? আমি কি পাথর তুলিয়া কেলিতে
পারিলাম? এই বলিয়া সিংহবাহা পাথর খানি
সরাইয়া ফেলিল। পরে মা ও বোনকে কাছে
লইয়া অমরকামধ্যে প্রায় শত কোশ পথ চলিয়া
গেল। প্রথমে তিন জনেই উল্লভ ছিল। বাকি
দুই আসিয়া সমলে পাছের পাতা পরিয়া লজ্জা
নিবারণ করিল।

“অন্য বেলা হইয়াছে, এমন সময়ে তিনজনকে

গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌছিল। এই এখানে বঙ্গরাজের
সেনাপতি (রাজকল্লার মাতুলপুর) অম্বরের
সহিত তাঁহাদের সন্মান্য হইল। অম্বর, তাঁহাদিগকে
বস্ত্র ও খাদ্য প্রদান করিলেন। শেষে তাঁহাদের
পরিচয় পাইয়া অম্বর সেই রাজকন্যাকে বঙ্গপুরে
আনিয়া বিবাহ করিলেন।

এদিকে সিংহ গর্ভে আসিয়া দেখে,—সব মৃত;
ঈ, পুত্র, কন্যা, কেহই নাই। ‘এই আশ্রয়
এখানে’ মনে করিয়া দুই ভিন্ন ভিন্ন অনাহারে গর্ভে
পড়িয়া রহিল। শেষে হতভম্ব হইয়া তাহাদের অনু-
সন্ধান বাহির হইল। কাজেই লোক সিংহজনে
ভীত ও ব্যতীত হইয়া বঙ্গরাজকে সিংহোপনয়নের
সংবাদ দিল।

বঙ্গরাজ, বোধবা করিয়া দিলেন, যে সিংহ
মারিবে, তাহাকে ১০০০ মোহর পুরস্কার দেওয়া
যাইবে। ভয়ে কিংহই অগমর হইল না।
সিংহবাহা, অগমর হইতে ইচ্ছুক হইলেন বটে, কিন্তু
তাঁহার মাতা বলিলেন, এই সিংহ বোধ হয় তোমার
বেশ জগদাভা হইবে; এই সিংহ স্বয়ং করিলে
তোমার মহাপাণ্ড হইবে। কাজেই সিংহবাহা নিরস্ত
হইলেন। হুইবার এইরূপ হইল। পুত্র সিংহহস্তার
১০০০ মোহর পুরস্কার শুনিয়া সিংহবাহা আর মাতাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন না। চুপে চুপে সিংহবাহা যাত্রা
করিলেন। সিংহের সহিত সাপে হইল; সিংহ
পুত্র সেলিয়া আনান্দ্রক বর্ষণ করিতে লাগিলেন;
পুত্র জন্ম করিয়াই বিদ্যক বাস দ্বারা তাহার
প্রতিশোধ দিলেন।

সিংহবাহা, মৃতসিংহের মস্তক ছেদন করিয়া
লইয়া বঙ্গরাজকে দেখাইতে চলিলেন। ইতিমধ্যে
কিছু বঙ্গরাজ অশ্রুতক্রান্তরাজ্যে লোকান্তরিত হইল।
এমন সময়ে প্রজা ও সচিববৃন্দ সিংহবাহার বীর্য ও
তাঁহার মাতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজা
করিলেন।

ইনি সিংহেশ্বর নামে রাজধানী স্থাপন করিলেন।
ইহার পুত্র বিজয় সিংহল-রূপে প্রথম বাঙ্গালী রাজা।
সিংহের মামের গুণ,—বায়নাশক, গুণ্ড, উষ-
বীর্য মূরগর, স্নিগ্ধ এবং বঙ্গাকারী। ইহা চতু-
রোগী ও গুরুরোগীর পক্ষে বড় উপকারী।

পূর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, আমেরিকার সিংহ
গাওয়া য়ার না, শুধু আফ্রিকায়।
তহার ‘দ্রুম’ নামে এককাতার সিংহ দেখা গিয়াছে।
যেখানে ইহাদের বৌ উৎপাত, সেখানকার

লোকেরা উচ্চ পাহাড়ের উপর মাচা বাঁধিয়া বর করিয়া
অসময়ে বাস করে। রাজকাল ইহা বড় একটা
কেব ভূমিতে নামে না।

পূর্বে ইউরোপেও বিশ্ব সিংহের বাস ছিল,
কিন্তু এখন বাত-বত-বিশেষ নিমূল হইয়াছে। সে
সময় রোমকরা এই সিংহ লইয়া এক মহোৎসব
করিত। রোমক-সম্রাট, রাজপুত্র লোকদিককে
নিমন্ত্রণ করিতেন। সম্বল আসিয়া উচ্চ পাহাড়ের
উপর বসিলেন। নীচে একেবারে ৪।৫ শত সিংহ
ছাড়িয়া সেখানে হইত। সিংহে সিংহে তুমুল দ্বন্দ্ব
হইত; এমন দ্বন্দ্ব কেহ কখন দেখেন নাই।

সিংহ, পুথিলে ঠিক বিভুলের মত পোষ মানে।

শ্রীচূড়া।

বর্ষাকাল অতীত। শরৎ উপস্থিত। ওত্র-ওত্র
জলপানানী গভীরবস্ত্র-ভিন্না পক্ষ-বায়র-গর্ভকী
কুলুধা তালিম্বীর আর সেই রূপ-ভৈরবী প্রচণ্ড-
মুখি নাই; সেই অমরকমুখিত সুনিলাচয় অনাচার-
বেগে কাহারও প্রতি জ্ঞানপদ না করিয়া আপন
মনে ছুটিতেছে না; সেই যৌবন-দৃশ্য প্রোত্তোরাণি
আর লোকের সর্ম্মান্য রূপিতে কুসমুদ্র নহে;
চাঁদনী এখন প্রশান্তোজ্জ্বলা নির্মূল-নিলি। এবং
বিনীত-প্রোত্তো। চাঁদনী এখন মনোভাবী; দূরলে
অঙ্গুলিগলন করিতেও মুগ্ধতা; বীর অতি-বীর—
এক একবার মাত্র বীচি-কর-ক্লিগলয় দ্বারা সন্ধিনী
তীরভূমিকে স্পর্শ করিতেছে। লজ-ও-বন-পত্নির
সেই অশ্রুপাণ্ডিত শোকময়ী গভীর-মুখি আর
নিরীক্ষণ করিতে হইতেছে না। বহুভাষীর ক্রি়
আর দেখিয়া কাহারও অক্ষ করিবার ক্ষমতা
হইতেছে না। বিষ্ণু-দীপাভিনীর মানদ্বারা অন্ধকার-
মুখ দেখিয়া কাহারও ভীত হইতে হইতেছে না।
এখন আশ্রয়-দেয়ের গুহ সজ্জা নাই; অভিবান-
ভূত-পার্জন নাই; বিকট বর্ষসমাহ নাই এবং
জ্যোতিষমণ্ডলের প্রভাবও নাই। এখন সকলই
শান্ত,—সকলই উজ্জল,—সকলই মনোহর। বর্ষার
মনিমানদ্বারা দীনা অশ্রুভাষী প্রুতিবীরী এখন হা-
হায়ে

• এখন গাছে ফুল, লতা ফুল, গুল্ম ফুল, তরু
ফুল, আকাশে ফুল, পৃথিবীতে ফুল, জলে ফুল, স্থলে
ফুল, নদীতে ফুল,—সংসার এখন ফুলময়; আকাশে

হইল; এখন এ দেশের ২৪ বার্নি বিশেষ-রকমের প্রতিমার কথা বলিতেছি;—

রুক্মণ্য-রাজবীর্যতে শাক্যীয়া হুগার হুই বানি হাত প্রমাণ। আর, আট বানি হাত মুদ্রা। এই মুদ্রা হাতকে সাধারণে 'মূলোমোজা' হাত বা 'কলাছড়া' হাত বলে।

আবার বাটতে মহিষ একেবারে শিরঃশূল। হৃষিকেশ-নপাভায় এক কাষের বাটতে রুক্মণ্য লজ্জা। শিবনিবাস মহাভাজ শিবক্স রাবের শৌর্যের বাটতে, কেবল মহিষ-মর্দিনী। লক্ষ্মী, লক্ষতী, কার্তিকী, গণেশ নাই। পূর্বস্থায়ী এক ব্রাহ্মণের বাটতে কার্তিক গণেশ নাই; তিন শক্তি-মূর্তি। কোন স্থানে মহিষমর্দিনী ও জয়া-বিজয়া। হেমচৌর সারক-বাটতে প্রচলিত সমুদয় মূর্তি, তাম্র আর শিব ও জয়া-বিজয়া কিন্তু মহিষ-হীন অস্থর। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার প্রতিমা বংশ-বিশেষে চিরন্তনশ্রাব্য। লক্ষী সারথী কার্তিক গণেশের পার্শ্বাভ্যন্তর বৈশাখের সাধারণ-প্রচলিত। নিবেই প্রকার নানাস্থানে নানা রকম। প্রতিমায় চিত্রিত চাল, ভিন্ধও রংকারের অবস্থি। ইহাকে চৌচাল বলে; সেখানে মন্দির এই চাল ছিল। এখনও গ্রাম বনিয়াদী-বাটতেই তাহা আছে। সেল বিগানের মত অরও চাল,—যাহাকে বাদালা চাল বলা যায়—তাহা অধুনা বহুস্থলে প্রচলিত।

পূজা।

এই শারদীয়া মহাপূজা প্রতিবৎসরই করা কর্তব্য। না করিলে পাপ হয়। করিলে পাপের পক্ষ হয় বহু, অধিকন্তু দেবী-প্রীতি হয়। তিন প্রীত হইলে ফল লাভের কথা কি আর বলিব।

"ভূপীয়া নৃপ হুগায়াং নিমেষাক্ষে বৎ কনুম।
ন তচ্চকুঃ বহেশোপি-শঙ্কো বর্ধনাতপিন।"

হুগায়াংসব-ভক্তত্বং দেবীপূজাং-বচন।
হে নৃপ! ভূগবতী হুগা সন্তুষ্ট হইলে, অন্ধ-নিমেষের মধ্যে যে ফল লাভ হয়, সাধক-বর্গ, শতবৎসরকে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না।

এইজন্য মহারাষ্ট্র ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ-বাসিন প্রতীমা নির্মাণ না করন, নবভূত প্রদেশ-হার কলাহার প্রকৃতি ঐতিহাসন ও ভগবতীর পূজা করত নবরাত্রি করিয়া থাকেন। 'দে-দাম' বাছাই বেশে থাক, কিন্তু এ উপর্যসকল দেশের হইয়া করিয়া থাকেন। এই শারদীয়া মহাপূজার সাতটা কথা আছে;—

১—রুক্মণ্যমহা হইতে মহানবমী পর্যন্ত পঞ্চ-দশদিন-সাধ্য।

২—ভক্ত-প্রতিপদ হইতে মহানবমী পর্যন্ত নব-দিন-সাধ্য।

৩—ষষ্ঠী হইতে মহানবমী পর্যন্ত চতুর্দশ-সাধ্য।

৪—সমুদ্রমাত্র দিনরাত্র-সাধ্য।

৫—মহারত্নী মহানবমী এই দিনস্বা-সাধ্য।

৬—কেবল মহাষ্টমী-সাধ্য।

৭—কেবল মহানবমী-সাধ্য।

শক্তি বা কুশাচারায়াসের ইহার মধ্যে যে কোন একটি কৰ্ম গ্রহণ। কোন এক কজালমপনে পূজা করিলেই শারদীয়া পূজা সিদ্ধ হইবে। এইরূপ কোন কৰ্ম-কল্পসারের পূজারস্তই প্রকৃত পক্ষে "কজালম" নামে অভিহিত। কিন্তু সাধারণে চতু-পাঠ আরম্ভকেই "কজালম" বলে। নৃপন, পূজন, বলিদান এবং হোম এই কয়েকটা কৰ্ম্ম এক শারদীয়া পূজা। কিন্তু;—

"শারদী চতুপূজা ত্রিবিধা পরিণীত।

সাহিত্যী রাজসী চৈব তামসী চেতি তং শৃণু।

সাহিত্যী জপ-বজ্ঞাদৈবৈবৈদ্যং নিরামিমে।

নাথায়াম্ জলব্যত্যং পূরাণাসি কীৰ্তিত্যু।

পাঠস্তত্ত্ব জপঃ শ্রোত্রং পঠেদেবীমানন্তব্য।

রাজসী রূপিদানে দেবেবৈঃ সামিবেপ্তব্য।

সুত্রা-মাংসাত্মপথ্যক্কেপ-মজ্জৈবিনা হু যা।

বিনা মজ্জৈবতামসী জ্ঞান কিরাভ্যাসক্সমত।"

স্বপূজাং ও ভবিষ্যদ্বাণী।

ভাবার্থ;—শারদীয়া হুগাপূজা ত্রিবিধ;—সাহিত্যিক, রাজসিক, তামসিক। যেমন ব্যক্তি, তাহার পূজাও অনুযায়।

সতত্ত্বাবলম্ব্যর সাহিত্যিক পূজা, রাজসিক পূজা, আর কিরাভ্যাসি তামস-জ্ঞাতিক তামসিক পূজা। কে কিরূপ ব্যক্তি,—

জানিতে ইচ্ছা থাকিলে গীতায় ১৮ অধ্যায় পাঠ করিলেই চলিলে। মোটী-মুটী-সমস্যার রাজ-সিক লোক কিন্তু অধিক; আর কাল তামসিকও অনেক।

সে বাহ্যউক্ত, তদাতচিতে দেবী-মাংসাত্ম পাঠ, বজ ও নিরামি দেবেব দ্বারা সাহিত্য-পূজা করিতে হয়। বলিদান ও সামিবে দেবেব্যক্তি রাজসিক পূজার উপকরণ। আর বাহ্যতে জপ বজ নাই, তন্ত্র মন্ত্র নাই; কেবল মং মাস উৎসবের ছড়াছড়ি, তাহা তামসিক পূজা। অতএব রাজসিক পূজাই চতুঃকর্ম্মময়; কেননা, বলিদান সাহিত্যপূজার

নষ্টে। হোমাদি তামসিক পূজায় নাই। অথবা সাহিত্যিক পূজায় পণ্ড বহির্গই নাই, কুশাচাণ্ডি বলিও থাকিতে পারে; হুতং সাহিত্যিক পূজাকেও চতুঃকর্ম্মময় বলা হইতে পারে।

অষ্টমীর উপবাস-দিনে অর্দ্ধরাত্রি অর্দ্ধরাত্রী-পূজা এবং অষ্টমী-নবমী-সন্ধিকালে সন্ধিপূজা আছে। এই পূজা দুইটা, কাম্য। তবে কলাচারণ শারের ভায় বলন। সেইজন্য সন্ধিপূজা অনেকেরই এবং অর্দ্ধরাত্রী-পূজা কাহারও কাহারও নিত্যবং প্রতি-পালিত হইয়া আসিতেছে।

পূজারস্তের পূর্ণদিন সায়াংকালে সপরিবার দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস করিতে হয়। শরৎ-কাল রক্ষিণাশ্রম,—কেবলমপের রাত্রি বলিয়া, হয় অর্দ্ধনিমিত্তবৃত্ত কৃষ্ণ-নবমীর পূর্ণিচ্ছে, না হয় ষষ্ঠীর দিন সায়াংকালে দেবীর বোধন আচারাস্ত্রাসারে করিতে হয়। বিশেষ ব্যবস্থা পরে বলিব। শেষ দশমীর দিন বিশুদ্ধন।

প্রকরণ-পদ্ধতি।

আমাদের দেশে শারদীয়া পূজা অধুস্তিত হয়, বৃহদাক্ষরেশ্বর-পূজা, কালিকা-পূজা বা দেবীপুরানের মতদ্বারা পদ্ধতি মতে। হুগাপূজারস্ত্রিম্বী ও শারের মতেও পূজা হয়। এই প্রকৃত, কুশা-চারায়াসের ইচ্ছা হয়।

পূজা,—কর্তব্য প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মকর্তার। কিন্তু এখন যেন পুরোহিতেরই কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক কর্ম্মকর্তাই জানেন না যে, পূজা তাহার নিজেরই করিতে হয়।

সাপরম্বল, নিরম্বল, তাঁরম্বল, পাঁদাল, পোরোদান, পর্নিত-মুক্তিকা এক্ষু বৃষভ-মুক্তিকাদি, এই শারদীয়া পূজার আখণ্ড করিতে হয়। তবে মকল স্থাপন-মতে এক আয়োজন নহে। হুগায়াং, কবির, অগ্নিমং, কত বস্তুরই আয়োজন করিতে হয়; ততাবতারে ভাবিকা দেখিয়া আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু উপকরণের হুগায়াং-প্রবন্ধই উক্ত বস্তুকলারম্বের উদ্দেশ্য। গজাঙ্গলের ষ্ট্র হুগায়াং-সমারী হইবে।

"সম্যক ক্রমোদিতাং পূজাং যদি কুর্ভুং ন শক্যতে।
উপচারাস্ত্রব্য বাহুং পঞ্চদশনি বিভবৎ তা।"
পঞ্চ পূজাপ দৃষ্টপ দীপং নৈবেদ্যং করিষ্যে চ।

অতাবে পূজ-পোতাংকাং তদভাবে চ ভক্তিতঃ।"

কালিকাপুরাণ।

সম্যক ক্রমোদিতাং পূজা, করিতে বা যথোক্ত উপচার আশ্রয় করিতে যে না পারিলে, সে পঞ্চ পূজা হুগ দীপ নৈবেদ্য এই পঞ্চাংপচার দিতে। তাহাতে অমূলক হইলে, অথবা জল দ্বারাও পূজা করিতে পারিলে। তারিও পূজা বহির্গইলে শুধু ভক্তিতাবেই তাহার পূজোপকরণ হইবে।

অষ্টাদশীভুক্তা মহিষমর্দিনী বোদন, পিতৃপূজায় নবমীত্রিভেৎ ও বোদনভুক্তা মহিষমর্দিনীর বোধন কৃষ্ণ-চতুঃকীর্তিতে হইবে; অজ্ঞ ভিত্তিতে হইবে না। (প্রাথম কালিকাপুরাণে ৬৩ অঃ ১৪ প্রোঃ জটব্য।)

দশভুক্তা-বোধনের কথা পূর্বস্থানেই হইয়াছে।

বাস্তব।

নবমীর বোধন,—অর্দ্ধাশ্রমভুক্ত নবমীতে পূর্ণিচ্ছে কর্তব্য। প্রাতে অর্দ্ধনিমিত্তযোগে না হইলে, দিনের মধ্যে যখন যোগ হইবে, তখনই বোধন। নম্রভোগ, দিনের মধ্যে যোগে না হইলে, শুভ নবমীতেই পূর্ণিচ্ছে বোধন। নবমী হুইদিন থাকিলে যে দিন দিব্যভোগে অর্দ্ধনিমিত্তযোগ, সেই দিন, বোধন। হুই দিনেই অর্দ্ধনিমিত্তযোগ না হইলে, যে দিন পূর্ণিচ্ছে পাইয়াছে, সেই দিন;—হুইদিন পূর্ণিচ্ছে পাইলে, পূর্ণদিন বোধন করিলে।

ষষ্ঠীর বোধন,—পত্রিকা প্রবেশের পূর্ণদিন সায়াংকালে ষষ্ঠী থাকিলে ঐ সায়াংকালেই বোধন আমন্ত্রণাবিবাস হইবে। যদি সোদন সায়াংকাল পর্যন্ত ষষ্ঠী না থাকে ও তৎপূর্ণদিনে যদি সায়াংকালে ষষ্ঠী থাকে; তবে বোধন হইবে পূর্ণদিন সায়াংকালে; আমন্ত্রণাবিবাস পরদিন সায়াংকালে। উভয়দিনেই ষষ্ঠী সায়াংকালে থাকিলে, পরদিন সায়াংকালেই বোধনাদি হইবে। আর উভয়দিনেই সায়াংকালে যদি ষষ্ঠী না থাকে, তবে পঠদিন পূর্ণিচ্ছে বোধন হইবে। আমন্ত্রণাবিবাসের সাধারণ সময়, পত্র-প্রবেশের পূর্ণদিন সায়াংকাল।

সমুদ্রযাত্রা হইতে দশমীভুক্ত পর্যন্ত প্রতি-দিনের কাধ্যই উপদ্রাবী কর্ম্মযোগ্য ভিত্তিতে কর্তব্য। ষষ্ঠি-নবমীক ভবিষ্যৎ পরদিনহুগায়াং জপ "ভবিষ্যৎ" বলিয়া গণ্য। এইজন্য সেই শোষণ পূজার অধ্যোয়। কিন্তু সন্ধিপূজাতে অহাি গ্রাহ্য। ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মস্মিৎ অহুসারে ত্রীভু পূজা হুই দিনও হইতে পারে, চারি দিনও পারে। যদি সমুদ্রী ষষ্ঠি-সপ্তমীক হয়,এক অষ্টমী নবমী দশমী—তিন ভিত্তিরই শোষণ

এইরূপ ৪৮টা বর্তমানবৎসর হইয়াছে।

পরি পর দিনে অন্ততঃ এক মুহূর্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই চারি দিন পূজা হয়। আর সপ্তমীপূজার দিন কি অষ্টমীর দিন ত্র্যংশর্শ হইলে, দুই দিন পূজা হয়। বিসর্জনের পরদিন শাওরাংশব করিতে হয়। যে তিথিবধে প্রারম্ভমান এক মুহূর্তের কম, তাহা পূজার অযোগ্য। কিন্তু মুহূর্তনূন উপসর্গমী তিথিবধেও বিসর্জন হইতে পারে, তবে বিসর্জনের পর কর্তব্য অপরাঞ্জিত-পূজা ঘাঘরা করিয়া থাকেন, অপরাঞ্জিত-পূজায় অহরোহে তাঁহাদিগকে পূর্বদিনে বিসর্জন করিতে হইবে। কেননা, উক্ত পূজা মুহূর্তনূন তিথিবধেও হইতে পারে না।

স্মৃতিগুরু রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের ইহাই অভিপ্রায়। আমজন্ম হইতে বিসর্জন পর্যন্ত কয়টা কার্যে নিবৃত্তিকালে নক্স-যোগের কথা আছে। যথা;—

“কোষ্ঠান্নকরুকায়াং যষ্ঠাং বিবাত্তিময়ঃ।
সপ্তম্যাং মূলকুকায়াং পত্রিকায়াং প্রবেশম্।
পূর্বাষাঢ়াত্তিষ্ঠিয়াং পূজাং-হোমাত্তোষণম্।

উত্তরেণ নবম্যাং বসিতা পূজয়েজ্জিহ্বাং।
প্রবেশে দশম্যাং প্রবিপত্যা বিসর্জয়েৎ।
অামঙ্গ—কোষ্ঠা-নক্ষত্রজু বসিতে, পত্নী-প্রবেশ—মূলকু পদমীতে, অষ্টমী-পূজারি—পূর্বাষাঢ়া-নক্ষত্রজু অষ্টমীতে, নবমী-পূজা—উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র-জু নবমীতে, বিসর্জন—প্রবৎসুক দশমীতে হইবে। এই সমুদয় মন্ত্র-যোগ ফালাপিকুর মন্ত্রমতে হয়।

মা। তোমার শাস্ত্র, তোমার বিধি, তুমিই জান মা। আমি ঠিক বলিতে পারিলাম কি না। যেমন নিষাধিহীন, যেমন শিখিতে শক্তি দিয়াছে, অমূল্যমানেই শিখিয়াছি, এবং বাহা বলিয়াছি তাহাই বলিলাম; মা। ব্রহ্মশক্তিময়। পোষ-জন্মের ভাগী তুমিই।

নিবেদন।

মা। সাধারণের কাছে দরকা সাধ করিলাম বটে। কিন্তু তোমার শ্রীচরণে দাসের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে;—

মা। সামান্যময়রি। আনন্দ কি সকলকেই বিলা-ইতে হয়? নাগো। নিরানন্দও ত আনন্দে বসিত হয় নাই; বিলাসও ত বিলাসে মলিন হয় নাই। অমি ভাবিয়াছিলাম মা। তুমি আসিনি; এবার একবারে কেবল আনন্দেই প্রাণিক। সদা তোর শ্রীচরণ দেখিব, আর ‘মা। মা।’ বলে ডাকিব; চিরপ্রতিষ্ঠিত নিরানন্দ বৈটাকে কদিনের ভ্রম এক-

বারে কীকি দিব। কিন্তু মা। তাত হ’ল না। আসিবি বলে আনন্দে ডেউ উঠিয়াছিল, কিন্তু তত তেরে আসিবার দিন নিকটগত হইতেছে, ততই ডেউ কমিতেছে। নিরানন্দ, আনন্দ করিতেছে। এই কি মা। তোর আনন্দ বিলাস! এক মুহূর্তের—সেই নিরানন্দ বৈটাকে আনন্দ না বিলাসে, সকলেই যে চির-আনন্দ ভোগ করিত, সেটা কি মা। পারিবি না।

মা। “হঠাৎ-স্থিতি-বিনাশনাং শক্তিভূতে।” ব্রহ্মজগৎ। কি দিয়া তোর পূজা করি। অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই; অরোজন যে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সবই হুস্ম্য, কিছুই ক্রম করিতে পারিতেছি না। মা। পূজালব্ধ গন্ধ-পুষ্প আছে যত; কিন্তু কি জানি মা। অবশেষে মন যে তাতে পরিতুষ্ট নহে। মা। দয়ায়মি। দরিদ্রের জন্তও তুমি বিধান করিয়াছিস বটে, কিন্তু দরিদ্র যে তাতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছে না। মা। ভগ-হুটরে,—চির-অন্ধকারময় প্রেতভূমি শূন্যগৃহে তোর নিঃস-মহিষোপরিস্থাপিত সমবিশ্ব চরণপঙ্কজরূপ দেখিব বলে, তোর দশবিধ প্রসারিত শলাবাহর আদৌলন দেখিব বলে, তের পুংগব-প্রস্রাবনের দিকে চাহিয়া ‘মা। মা।’ বলিয়া ডাকিব বলে, তোর মহাভ্রাশ্রমের আলোকচ্ছটা দেখিব বলে, এই গভ-বসার বিজ্ঞান-মন্ডলার পান পান হইতে আকাজ্ঞা করিয়া আসিতেছি। সেই আকাজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য যত-সম্মতি অর্থে প্রতিমানিষাদের করাইয়াছি; কিন্তু মা। পূজা করিব কি দিয়া? এমন রূপে কি না, শুভ-কু-পুষ্প দিয়া পরিতুষ্ট হইতে পারি। মা। তুমি অপরূপ, তোর শুভাধিষ্ঠান হইবার জন্য যত করিতেছ।—অথচ কাহাকেও তোর প্রসাদ-অর দিতে পারিব না; ইহার অধিক বিদায়ের বিষয়—হৃদয়ের বিষয় কি আছে। মা। যদি আমাকে ভক্ত করিতে, ত কোন লোকই হইতে পারে; তাকে মন উপহার দিয়া নিশ্চয় হইতাম, কিছুই ভাবিতে হইত না। তাত করিনু নাই। অশ্বশ মন একবার তোর চরণের দিকে গিয়া আবার আশ্রম-পাতাল ভাবিতে থাকে;—তোর পূজাপ্রদর্শনের অযোগ্য-ভোগ কাতর হয়, ধূম্রাণ্ড অতিথির চীৎকার-রবে আকুল হয়, ডাক্তরের অপরিস্রবিত্তে কান্না-ধরা মা। বিধেধরি। এ হুঃখ কি মোচন করিবি না?

দূর হউক, অধিনান; দূর হউক, হুস্তিতা। আমি কে? কেন-আমি ভাবিত যার পূজা, সেই সব করিয়া লইবে; না করে, না করিবে। আমি চিন্তা করিলেই কি; আর না করিলেই কি? ইচ্ছামায়ার ইচ্ছা ভিত্তি কিছুই হইবে না। আমার এ বিধুনা কেন? তবে যদি নিতান্তই কিছু করিতে হয়, তবে হেঁ বাচচর-দশদীপ্তিমায়ী অস্পৃশ্য দরিদ্রগণ। এম, সব মিথিয়া একবার কাতর-কণ্ঠে বলি;—মা।

“হুগ্ম স্মৃতা হরসি ভীতমশেষজ্ঞতাঃ
হষ্টৈঃ স্মৃতা মতিমান্তা ভভাং দদাসি।
দারিদ্র্যাহু-ব্রহ্মহাযিনি কা দদত্বা
সর্বোপকারকরণ্যার মদারচিত্তা।
সর্বমঙ্গলমদ্রুৎ শিবে সর্বপ্রদায়িকৈ।
যথো ভ্যাস্তকে পৌরি নারায়ণি নমোহস্ত জেৎ”

শ্রীপঞ্চানন উর্করত্ন।

আমাদের হাজত।

প্রথম অধ্যায়।

বানাস্তল্লাসী।

আমাকে অর্থাৎ শ্রীমদেবপ্রভু বহুকে বহুবাসীরা স্বভাবিকারী বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণক বদ্যোপাধ্যায়কে মঙ্গলাধিকারী বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাস বদ্যোপাধ্যায়কে কার্যাবধিকারী বলিয়া, এবং শ্রীকৃষ্ণ অরুণবাসীরকে প্রিন্টার ও প্রকাশক বলিয়া,—যহাং ইংরেজবাজার ভারতবর্ষীয় নৃবণিদি আইনের ২২৪ ক ধারা অনুসারে যৎ উক্ত আইনের ২০০ ধারা অনুসারে, আমাদের চারিজনদের উপর অভিযোগ আনান করেন। এই অভিযোগের মর্ম্ম কুই গুরুত্ব। অর্থাৎ বহুবাসীর বোধের ‘আরা পরমমোহের প্রতি লোককে অজ্ঞান উদ্বেগে আসিয়া, তালোহে, অথবা অভক্তি উদ্বেগে করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এক’ কথায়,—রাজবিদ্রোহের হুচনা হইতেছে। এই অপরাধের দণ্ড বানাজীবন দীপান্ত বাস পর্যন্ত হইতে পারে। অথবা তিনবৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডও হইতে পারে। অথবা কেবল জরিমানা হইতে পারে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি বহুবাসীতে “আমাদের অশ্বা” ও “আমাদের বহুবাসীতে” ইংরেজবাজের প্রকটমতি “অশ্বা হিন্দু প্রদান ও প্রথম বারবা” এবং “২০শে ফেব্রুয়ারি বহুবাসীতে” পরিবর্তন কি?

“অসত্যের পক্ষে অকপট নীতিই ভাণ”—এই পাঁচ প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত হয়।

বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আইন পাস হয়। উক্ত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সহস্রাং সমর্থিত আইন-যাচিতি। নানা কারণে প্রবন্ধগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

সে রাহাই হউক, ২৩শে প্রাণে সজ্জবর দর্শন-মেটের ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল পিউ মায়েব, বারিষ্টার জা মায়েব, এবং পুলিশ—আদালতের সরকারী উকীল কাউন্সিল মায়েব এই তিন জনে একত্র মিলিত হইয়া বেলা ১১ টার সময় আমাদের নামে পুলিশ-আদালতের প্রধান-মাজিষ্ট্রেট মিঃ হাওসী মায়েবের নিকট উক্ত প্রবন্ধগুলি আনয়ন করিলেন। অমনি আমাদের নামে প্রেক্ষাপত্র পরগণনা বহির হইল, এবং বহুবাসী-কার্যালয়ে বানাস্তল্লাসীর হুস্ম হইল। সেদিন আমি বানো বহুবাসী-কার্যালয়ে যাই নাই;—আমাদের পরই কার্যভারের দিয়া-ছিলাম। প্রিন্টার ও প্রকাশক বলিয়া অজ্ঞান-শ্রীমদেবপ্রভু বায় কেবল আনয়িত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণক বদ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাস বদ্যোপাধ্যায়ও আইনে ছিলেন না। এ দিকে মহা-সমারোহে ইংরেজ এবং দেশীয়—পুলিশ ইংল্যান্ডবাস এবং কলকাতাবাস বহুবাসী-আইনসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলকাতার পথে দর্শকদের ভ্রমাক ভিড় হইল। বিজ্ঞাপনটিতে এ সংবাদে মন সহরবাসীর নিকট পৌঁছিল। পুলিশ-প্রাধিকরণ বহুবাসী-কার্যালয়ের ভিতরের কোনও লোককে বাহিরে যাইতে দিলেন না, এবং বাহিরের কোনও লোককে বহুবাসী-আইনসে ভিতর ঢুকিতে দিলেন না। বহুবাসী-কার্যালয়ের সমুদায় হুটপাহা লোকের বিষম জনতা দেখিয়া, কয়েকজন গোরা কন্ট্রোল আসিয়া, ত-খণ্ডাং সেই হুটপাহা হইতে লোক সরাইয়া দিল।—কাহাকেও তথায় দাঁড়াইতে দিল না। গোকুমহু ভীত-কাম্পিত হইয়া অনুরে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার অব-লোকন করিতে লাগিল। একটা যেন ‘পেগের’ পেগের শব্দ পড়িয়া গেল। বাহিরে বাকী আমাকে প্রথম দর্শক। কলকাতা কলকাতা কলকাতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ ঠিক করিলেন, পুলিশ-সৈন্য দর্শকদের অস্বাভাবিক অহমারে বহুবাসীতে যেমন, এতদিন, প্রেস সামন্ত উড়াইয়া বসিয়া যাইতেছে। কেহ

ভিজিল, পিরিহাম ভিজিল, কাপড় ভিজিল,—
আমার তখন সন্ধি-কামি। কবিরাজের ঔষধ
ধাইতেছি। কাউল্যাম, পুখা হইতেছে, ভাল।
সাম্যত জ্ঞতপদে পুলিস-প্রহরীগণের দ্বিতলে
উঠিলাম। আশ্রয় পাইয়া চার দ্বারা মাথা মুচি-
লাম। পিরিহাম-কাউল্যাম, কাপড় কাউল্যাম,—
দেখিলাম, চান-সহ-গোছ ভিজিয়াছে, খুব বেশী
ভিজি নাই। এই অবস্থায় জিতে উঠিলাম।
একে ফুলমার, তায় রুসবর্গ,—লোক-সকল অনি-
মেহ-লোভে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে
লাগিল। ক্রমশঃ যে রূহ, ধূপে মিঃ খাউনী
বসেন,—সেই ঘরের দ্বারদেশে উপনীত হইলাম।
দেখিলাম, লোক-লোকপাশ। সেই জনতা তেল
কুরিয়া প্রথম ঘরে প্রবেশ করিল। কতকগুলি অঙ্গুর
হইলাম,—‘‘ভিতর ঘরে, একজন কনকরণ আমাকে
আঁকিরাই বলিল,—‘‘ওখানে বাইবার ভয়
নাই,—আপনি এই দিকে থাকুন।’’ আমি বলি-
লাম,—‘‘আমাকে ভিতরে বাইতে হইবে,—
‘‘ভিতরে না গেলে আমার চলিলে না।’’ কনকরণ
সম্মত রূপে কথ্য করিতে সাহস করিল না, বলিল,
‘‘ওখানে উকীলদের বসিবার স্থান,—’’ আমি বলি-
লাম,—‘‘আমি উকীলদের কাছেই ধাইতেছি,
উকীলদের সঙ্গে আমার এখন বিশেষ কথা।’’
কনকরণ আর আমাকে বাধা দিল না।

ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ বাসু যোগেশজন্য
মিডরে সহিত সাক্ষাৎ। ইনি একজন ডিটেক্টিব-
পুলিস ইন্সপেক্টর। রাজ-নীতিতে বিভাগে ইহার
কাৰ্য্য। তিনি আমাকে হাসি-হাসি মুখে সাগর
সম্ভাবন করিলেন। ‘‘তাঁহার বুকেই মুখ-মিষ্টি।’’
এক থানি বেকে গিয়া আমি বসিলাম। তিনি
আমার পাশে বসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাসু প্রিয়নাথ
মুখোপাধ্যায় আমার আর পাশে উপবেশন করি-
লেন। প্রিয়নাথও একজন ডিটেক্টিব-পুলিস সাহ-
ইন্সপেক্টর। তৎপরে ডিটেক্টিব যোগেশ বাসু,
[একজন ইন্সপেক্টিব-পুলিস-ইন্সপেক্টরের প্রতি লক্ষ্য
করিয়া বলিলেন,—‘‘এই আপনার আসামী
আসিয়াছেন। আপনি ডাবিউকলেন, যত
আপনার আসামী পলাইয়াছেন,—কিছু হইয়া।’’
পূর্ণাঙ্গায়েন কেন? আমি বলিলাম,—‘‘কোন হুখে
পলাইয়া?’’ সকলের মুখে হাসির দেখা দেখা গেল।
যোগেশবাসু, জিজ্ঞাসিলেন,—‘‘কক্ষ বাসু, ব্রজরাজ
বাসু কোথায়?’’

আমি। তাঁহারাও আসিতেছেন।

যোগেশ। তাঁহাদের আসিতে কি বিলম্ব হইবে?
আমি। না,—বড়-জোর আদম্ভটী বিলম্ব
হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, আমার আসিবার পূর্বেই মাঝিষ্টর
মিষ্টার হাওনী সাহেব আমাকে উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন। তখন তিনি প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলিস-
মোকদ্দমা এক নিমেষে নিম্পত্তি করিতেছেন।
অমুক লোক পথে মাতাল হইয়াছিল,—জরিমানা
২১ টকা; অমুক লোক পথে প্রস্রাব ত্যাগ
করিয়াছিল,—জরিমানা ১০ টাকা; অমুক
অমুক লোক জুয়া খেলিয়াছিল,—জরিমানা ২৫
পাঁচ টাকা; অমুক লোক চোরেদের ছুর চুর করিয়া
পথে দ্বারা ভূঁড়িয়া ছোলে,—জরিমানা ১০ টারি
আনা,—ইত্যাদি ধরনের মোকদ্দমা প্রথম-কাছারিতে
হইয়া থাকে। কোন কোন দিন এই ধরনের
পলি-বিশদী মোকদ্দমা এক দ্বন্দ্বেতে নিম্পত্তি
হয়, জরিমানাও কোন কোন দিন তিন চারি শত
টকা হয়। এ সকল মোকদ্দমায় উকীল-বাগিষ্টর
গণকে আসামীর পক্ষসমর্থন করিতে দেখি নাই।
উকীল-বাগিষ্টর নিযুক্ত থাকিলে, মাঝিষ্টরকে চারি-
দিক্ অধকার দেখিতে হইতে। বোধ হয়, তাঁহার
তায় পাঁচজন মাঝিষ্টর বহুত্ব করিয়া বিচার করি-
লেও সম্ভব দিনে এ শ্রেণীর সকল মোকদ্দমা শেষ-
নিম্পত্তি হয় কিনা সন্দেহ। যত বাগিষ্টর, যত
উকীল, মোকদ্দমা শেষ হইতে তত বেশী সময়, তত
বেশী দিন লাগে। ইহাই হইলে, সভ্যদের হৃদয়।

আমি দেখিলাম, আমাদের পক্ষ সমর্থন করিবার
জন্ত বাগিষ্টর মিঃ হিল, মিঃ লালমোহন বোশ, এটনি
শ্রীকৃষ্ণ পাশেভ চন্দ্র, এটনি শ্রীকৃষ্ণ কলিকাতা
মিত্র এবং উকীল শ্রীকৃষ্ণ কানাইলাল মুখোপাধ্যায়
উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত, হাইকোর্টের
আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ বিজ্ঞ উকীল, আমাদের
প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া, বিনা নিমন্ত্ৰণে, বিনা
বাসনায়, আপনা হইতে আসিয়া মোকদ্দমার
সংবাদ লইতেছেন। পূর্ণমেন্টে-পূর্ণমেন্টে বাগিষ্টর
পিউ সাহেব তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই।
কেল বাগিষ্টর তুম সাহেব এবং উকীল কাউই
সাহেব—পূর্ণমেন্টে-পূর্ণমেন্টে এই দুইজন তখন
আসিয়াছিলেন।

কৌ। ১১টা টার সময় শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যো-
পাধ্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া

পৌঁছিলেন। তাঁহারা উভয়ে আমার কাছেই বসি-
লেন। চারিজন আসামীর মধ্যে আমরা তিনজন
একত্র হইলাম,—আসিলেন না কেবল,—অপরাধো-
দায় রায়। গত কল্যা বধন পুলিস-প্রহরীগণ বহুবাসী-
কার্য্যালয়ে বানাত্তরী করিতে যান, তখন
শ্রীকৃষ্ণবোশের দ্বারা জ্ঞেয়নে যে, তাঁহার নামে গ্রেপ্তার
বাহির হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি পুলিসের
হাতে আশ্রয়মণ্য করেন। পুলিস সেই দিনই
তাঁহাকে লইয়া মাঝিষ্টরের কাছে গেল। মাঝিষ্টর
তাঁহাকে হাজতের দ্বন্দ্ব দেন। উকীল শ্রীকৃষ্ণ কানাই-
লাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার জামীনে থালাস হইবার
জন্ত বাগিষ্টরকে নিকট দরখাস্ত করেন। মাঝিষ্টর
বলেন,—‘‘আমি আসামী হাজতেই থাকুন,—কল্যা বধন
অন্ত তিনজন আসামী হাজির হইবেন, তখন জামীনে
থালাস দিবার বিষয় একত্র বিচার করা যাইবে।’’
তাই শ্রীকৃষ্ণবোশের রায় করা হইতে এ পর্যন্ত
হাজতেই ছিলেন।

কৌ। ১২টা বাজিল, জনতা আরও বৃদ্ধি পাইল।
ক্রমশঃ ঠোকাঠোকা বৈদ্যোদেয় আসিতে হইল। এই
লোকচানবাস্য হইতে ক্রমশঃ একটা অন্ধুট অধ্যাক্ষ
লোক উপস্থিত হইতে লাগিল। মাঝিষ্টর মহোদয়,
এক একবার আয়তলাচনে সেই মানব-মহাসমুদ্র
অবলোকন করিতে লাগিলেন।

১২ টা বাজিয়া ২৫ মিনিট হইল, তখান আমরা
বহুস্থানে উপস্থিত আছি। আমাধিকারকে কেহ
ডাকে না, কেহ আসামীর কারায় দাঁড়াইতে
বলে না। এমন সময় আমাদের বাগিষ্টর মিঃ হিল
উঠিয়া মাঝিষ্টর সাহেবকে কি কথা আস্তে আস্তে
বলিলেন। ইহার অঙ্গশব্দ পরেই একজন হিন্দুস্থানী
হিন্দু-কনকরণ উচ্চৈঃস্বরে হাক দিল,—‘‘আসামী
উপস্থিত! আসামী জাহার ইন্সপেক্টরে আসামীর কারায়
প্রিয়া গুণ্ডামায় হইলাম। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
আমার নিকট ক্রমশঃ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ৪র্থ
আসামী অপরোধায় আসিলেন না। মাঝিষ্টর জিজ্ঞা-
সিলেন,—‘‘৪র্থ আসামী কোথা?’’ কে একজন উত্তর
দিয়া,—‘‘৪র্থ আসামী হাজতে আছে?’’ মাঝিষ্টর
একটু বিরক্ত হইলেন। বিরক্তির কারণ এই যে, ৪র্থ
আসামীকে একজন হাজত হইতে এখানে আনান দ্বারা
উচিত ছিল। বাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবোশের রায়কে
হইতে আসিলেন ২৩ জন লোক দুটিল। দশ মিনি-

টেম মধ্যে ৪র্থ আসামী আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাকে
গত কল্যা বহনবাগিষ্টর হাজতে লইয়া বানাত্তা হয়
নাই, সালবানজারের দ্বন্দ্ব হাজতাহেই তিনি ছিলেন।
চারিজন আসামী একত্র হইবামাত্র বাগিষ্টর
মিঃ হিল সাহেব,—সরল, সহজ, সুমিষ্ট ভাষায় বক্তৃতা
আরম্ভ করিলেন। বাগিষ্টর সাহেবের বুরাইতে
লাগিলেন, বহুবাসীর সেবার রাজভবিষ্যৎ হুন্সা
আদৌ হয় নাই। বহুবাসীর প্রবেশ কোন দোষ
নাই। ‘‘সংবাদ-সাম্প্রদায় আইন পাস হইবার সময়
সময়ে সেবারত আদোলন উপস্থিত হয়। সমগ্র
হিন্দু-সংবাদপত্র দ্বারা, এই আইন যে ঘোর
আনন্দিত এবং হিন্দুধর্ম-সৌপাঙ্গক-হইবে,—এই কথা
বিবাহিত হয়। কলিকাতার হাইকোর্টে পঞ্চদশ
চিক্‌কট্রীস তত্ত্ব রচনাতে মিত্র মহাশয়ও বর্ণন,—
এই আইন দ্বারা হিন্দুধর্মের আখ্যাত পঙ্খি। আমার
মোকদ্দমণও জ্ঞেয়নিত। ভাষায় এ পর্যন্ত রায়
করিয়াছেন। হুন্সার তাঁহাদের অপরাধ কি?
অপরাধ যদিই কিছু থাকে, তাহা হইলেও, এপর্যন্ত
আমার হাজতের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ বা সাক্ষ্য
হয় নাই। অতএব তাঁহাদিককে আপাততঃ জামীন
লইয়া থালাস দেওয়া হউক।

এই মধ্যে অনেক কথা বলিয়া মিঃ হিল, আমি,
দ্বিপকে জামীনে মুক্ত করিবার জন্ত, অনেক নজীর-
আদিও দেখাইলেন। শেষে তিনি মাঝিষ্টরের অসি-
ন,—‘‘আজিবার তত্ত্বের বটে কিছু ক্রাইন বহি-
মারে আমি এক মোকদ্দমার জামীন পাইবার হুকুম।’’
‘‘আমি হুঁকুম। এই মধ্যে বক্তৃতা করিয়া
হিল সাহেব বসিলেন। তখন মাঝিষ্টর, পূর্ণমেন্টে-
পূর্ণমেন্টে বাগিষ্টর পিউ সাহেবকে জিজ্ঞাসিলেন,—
‘‘জামীনে একজন দেওয়ান সুস্থেজ আমায় কিছু
বক্তব্য আর্থে কি?’’ (যদি মিঃ হিল দ্বারা একজন
বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন, তখন পিউ সাহেব আদা-
লতে উপস্থিত হন।) পিউ সাহেব বলিলেন,—
‘‘আসামীদের হাজত হইয়া উচিত। প্রকৃতমতে
‘‘স্পষ্টতঃ রাজবিদ্বেহ-সুচক। বহুবাসীর সেবার
রাজ-বিদ্বেহ প্রকাশ পাইতেছে। আসামীর পক্ষে
বাগিষ্টর মিঃ হিল বাহা-বলিলেন,—‘‘তাহাতে মার
কথা কি? এই না,—একটি রাজবিদ্বেহ-সুচক বরার
অভিযোগে আত্মকৃত লক্ষ্যমণ্ডলিক জামীন লইয়া
কখন অব্যাহতি দেওয়া হইতে পারে না।’’
কৌ। প্রায় ৩টা হইল। মাঝিষ্টরের এ সম্বন্ধে
রায় শুনিবার জন্ত দশকিটন দীর্ঘত উৎকণ্ঠিত হইয়া

দেওয়ামান। লোকসমূহের ধারিতা হইয়াছে যে, বুঝি হাজতে গেলেই মারা যাইবে। বুঝি আমরা নদীর পুতুল রোজ নাথিলেই গলিবে। অনেক অনিমে-
লোভনে মাজিষ্টরের মুখপানে চাহিয়া আছেন। এমন সময় মাজিষ্টর এই মর্মে হুতুম প্রকাশ করিলেন,—“আমার জামান দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মিঃ গিট যখন জামান দেওয়ার সম্বন্ধ আপত্তি করিলেন, তখন আর আমি কেনম করিয়া জামানে মুক্তি দিতে পারি? অতএব জামানদার হাজত হইল।”

দশকিছু কাণ্ডপুলকিকাবৎ নীরব, নিস্তব্ধ। কাহারও চক্ষু গিয়া টু টু জল পড়িতে লাগিল। এ ভাব দেখিয়া আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হইল।

সকলমুখে, বিস্তর-বদনে, অশু-পূর্ণ-নয়নে, হাইকেটের উকীল শ্রীমুখ গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়, আমাদের মুখপানে একবার চাহিয়া উঠিয়া গেলেন। এইরূপে অনেককই একে-একে উঠিলেন। আমাদিগকেও অধিকক্ষণ আর সে স্থানে থাকিতে হইল না। হুই

জন মাষ্টার লোবানবন্দী হইবার পরই, আমাদিগকে কয়েকজন কর্মচল, মাজিষ্টরের দক্ষিণ-পার্শ্ব এক ঘরে ভুইয়া গিয়া বসাইয়া রাখিল। হাজতে বাইবার পূর্বে, আমাদিগকে সেই ঘরে কিছুক্ষণ রাখা হয়।

সেই ঘরে তুমিকাই পরম বোধ হইল। বায়ু প্রবাহিত হইবার জড় এ গৃহে জানেনা কম। এখানে অনেকও কম। এক্ষণি বেলের উপর বসিলাম। আমি একদ্বারি পাখার সন্ধানে এদিক ওদিক চাহিতেছি; দেখিলাম, একদ্বারি ভাঙ্গা পাখা বসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া একজন কর্মচল আপনা-আপনি পাখা করিতেছে। আমরা বেঁকে,—আর ৭ টাকা

মাহিনার কর্মচলপ্রভু চেয়ারে বসিয়া ভালবুস্ত বাজান করিতেছেন।—হুইং তাহার নিকট হইতে পাখা-চাওয়া বৃত্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম না। ঘরে

প্রায় ৩৭ জন কর্মচল ছিল; তাহারা এ পর্য্যন্ত কোন অভয় প্রবহার করে নাই।—তথাপি কেহ কেহ বরং বলিচ্ছে,—“বাবু! আপনাদের বড় কষ্ট হইবে। সবই ভগবানের হাত।” আমরা এ কবার

কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া আছি। এমন সময় একজন পুলিশ-ইন্সপেক্টর-গোছ লোক আমিয়া প্রব্রবণগকে এই মর্মে বলিলেন,—“বাবুরের সহিত

সম্মানের সহিত ব্যবহার” করিও,—দেখিও, কোন রকম যেন অভ্যচার না হয়।” তিনি চলিয়া গেলে, আমি কুম্ভাবরকে বলিলাম,—“স্বাভাবিক, কোন সময়?—এইবার আপনি পাখাদানি এই কর্মচলের নিকট

হুইতে চাহিয়া লউন। চাহিলেই দিবে।—চাহিবা-
মাত্র পাখা পাইলাম। সেই ভাঙ্গা পাখার সামান্য
বাতাসের মুখ্য তখন লক্ষ টাকা বলিয়া মনে
হইল। পাখা করিতে-করিতে আমি শ্রীমুখগোবিন্দ

রায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসিলাম,—
“কখন? তোমার মুখ এত শুকনো কেন? তোমার
চোখ এত বসিল কেন? তোমার কি ভয় হইয়াছে?”

অবশ্য। হাজতে, না,—ভয় হয় নাই। আপ-
নারা যখন কাছে বসিয়াছেন, তখন আমার ভয় কি?

আমি। তবে চেয়ারা এমন হইল কেন?
অবশ্য। আমার গা কেনম ঝিম ঝিম
করিতেছে।

আমি। হুইয়াছে কি?
অবশ্য। কল্য আমি বেলা ৯ টার সময় আমার
করিয়াছি;—আর অন্য বেলা প্রায় চারিটা। এ

পর্য্যন্ত আমি জলস্পর্শ করি নাই। কল্য আমার
হাতি কাটিয়া যাইতেছে।

আমি। হাজতে কি হুই ঠায় উপবাসী
ছিলে? কেহ কি বাবার কথা বলে নাই।

অবশ্য। না।
এই কথা শুনিয়া শ্রীমুখ কৃচ্ছল বদ্যোপাধ্যায়
মহাশয় বলিলেন,—“উঃ বড় বিষম ভ। কর্মচল!

এখানে এখন জল পাওয়া যাইবে কি?”
কর্মচল বলিল,—“মাজিষ্টরের হুতুম হইলে,—
জল, জলখাবার, মিষ্টান্ন সমস্তই পাওয়া যাইতে
পারে।”

এমন সময় আমাদের উকীল ট্রিকানাইলাল
মুখোপাধ্যায় সেই ঘরে আসিলেন। তাঁহাকে এ

ব্যাপার সমস্ত বলা হইল। তিনি মাজিষ্টরকে এ
কথা বলার আমাদের ঘরে জল ও মিষ্টান্ন আনিবার
হুতুম হইল।

একজন কর্মচলকে ২১ হুই টাকা দিলাম।
জলখাবার ও জল একজন ডাক্তার সেকানদার লইয়া
আসিল। অকণ্ঠস্বর প্রাণ পাইল।

জম্মুজমিতে এবার আর স্থান নাই। সুতরাং
“আমাদের হাজত” প্রবন্ধের এবার কেবল ভূমিকা
মাত্রই হইয়া গেল। হাজতে আসিল কথা, আর
কথা, কেতুকাবৎ কথা,—হাজত, কল্যসম, নীতিস-

রসের কথা,—বারাংবার প্রকাশিত হইবে।
ত্রিযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।



লক্ষ্য নাই, সরস তা নাই, স্নিগ্ধতা গণেশ নাই, শক্তির কান্তিকর শাই,—জপদ্বাতা
ভগবতীও নাই,—আরে কেবল কাঠমাহিন। মহিম-মহিনী-রূপিণী শিল্পিতা জী প্রাণপাতি-
দয়ানর্ঘ তৎসন অধিকার করিয়াছেন। স্বামী, বিশ্বম-বিশদ বুঝিয়া, জী-বৈরাগ্য স্বব আত্ম
করিয়াছেন,—

চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব।

কর রূপা,—কীমসিনি। কাতর পরাণ মোর,
কহ কিছু কমনীয় কথা।
কমট-কটিন-পিঠে কোমল চরণ দেখে,
কোন ধানে করে না ডুবায়া ?
বসন্তে বসন্তে 'ধাঞ্চি' ধাই, বাতির ধ্বংস হ'ল
ধাম বিধম-দায়ী তব।
ধান কয় আভরণ, ধট-বিলাসিনি। তাই
মিলিল না ঝুঁকি এ ভব।
পরিকী ভূমি ধনি। গোমার-পণিতে গুরু,
পতি কোন বিদ্যাতে বা নাই ?
পবেশ পবেশ হয়, পবেশ পরাসে রয়,
স্বপনপবতি। 'ধন' হই।
ধর্মি। যুগে আঁধি, 'ধন' ঘন কেন আর,
স্বোভয় কেন পরজন ?
চপলে। ঢালাও মোরে যেমন,—তেমনি ঢলি,
চকু-মুখি। তব কোন মান ?
চিন্তাচটিকার আমি, ছল কারি ছাড়িও না;
ছাড়িলে ছাড়িছ ছার প্রাণ।
জয় জুতা-প্রহারিণি। জগৎ জননে পতি
জরাজপা জলদীপ-কায়।
রক্তটি নিটাও প্রিয়ে। 'বীটার স্বাক্ষরে সীপি;
রক্তে স্বাধি স্বীজয়া হইয়া।
'এ'কার-টায় র মত পিঠেতে পানান লয়ে,
তোমা'র বহিতে আছি রাজি।
টিটকা। বিওক টাইমে টাইমে, ভে—
ইটুক মনে মনেটা বাজি।
হট্টে উঠিতে নারি, কি উপায়ে বনয়ারি।
ঠারো হ'ল বিষম ঠেংগা।
ঠেংগে আসিলে প্রাণ, ঠেঁলি নাই তব কথা,
এ ঠুঁটি ভুলেও কেন ভাও।
ভাজবে চোখ দেখে, ভরে দেন কাটা হই,
ভাকি 'প্রিয়ে। রক রক' বলে।
ভাকে কাটি দিলেক। চাইয়া শব্দ-মাঝে,
ঢাল রূপ-অমৃত দুর্বলে।
'দ'এর মনে মনে কাট মাথা ভাও 'দ'এ,
তু তব হৃদয় লিখিব না।
'তাজ ত তরলি। তুমি তপ রোব; তরি তরে—
তরহীন কেশপিন্দুহাম।
ধাম প্রিয়ে। ধোও রোব; থাক পিঠে, কিংবা রুকে,
তাহে নাই কোন কথা কই।

দয়া করি' দান-দেহে হাঁড়িহবে এর চেয়ে,
ধাসের দর্পের ভাষা কৈ ?
ধনি। ধনহীন বলে ধরমে অমক দিলু—
তব আজ্ঞা নারিহু পালিতে।
দ্যু প্রাণ ক্ষয়-পথে, ধমনি ধনিত বেগে,
ধেরয় ধরিতে নারি চিতে।
নলিন-নয়নি। নারি। নিখিল নিগ্রহ কর,
নরাধম আমি নর্য-মাঝে।
নবীন নরর দেহে না দিতে পারিহু আজ
নব সন আভরণ সাজে।
পূজার পরম পতি পতী-পরিভোম তরে
'পরশ' হরয়ে দেয় আমি।
পেয়েও প্রিয়ার ফর্দ ফলে আমি ফেল ছহ
কীক মোর ধরাত বাখানি।
বড়ি-আটা-মুখ বঁধু। বি, এম বলিতা তুমি
বহু অপরাধী আমি হার।
ভূষণ নারিহু দিতে ভাল ভাষা, ভাষণহীন;
ভব কর ভামিনি। আমায়।
মাধব, মহেশ, শিব, মাঝ করে মথিলারে;
মৃত মর্ত্য আমি কোন ছার ?
মত যা করহি সোম বেতে সেও ঘরায়ো
মোহিতের মত দয়া কার ?
মুখ মূখি। রমণি। কেন গো রাধ;
রাধ কথা রয়েছি চরণে।
ললনা-লগনা ভূমি, লাংবা ললিত-ভাব
লও প্রিয়ে এ সাজ কেনে ?
বস বল-বিদ্যাগিনি। 'বিদ্যা' বলিনি। বৃকে,
বচন মরে না আর মম।
শক্তিরূপে। শান্ত হই। শীতল পুখিা হোক
শীতলি শুভ কেনে অম ?
মতী ভূমি, লক্ষী ভূমি, মটেশ্বর-প্রসাদিনি,
মও আমি—কল্যাণে তোমারি।
স্বামী স্বামিনী ভূমি। সত্যকাল-শিগোমণি
সর্বপ্রিয়া সর্বসহচরী।
'হামসোটা'-হাটে লুটা হেসে অলকারে তুটী
হোমোনি হৃদয়হারিণি।
হারমোনিয়ম-বাণ্যে হস্তবতি। হেঙ-হুঙো।
হের রূপা-কটাকে হজনি।
হম হুসে হেমকরি। হীরা কর ঘোড় করি'
হাম-কটে বতি বার বার।
হণতরে দেয়ে বই দ্বাত্তমুখি দ্বাপাচারি।
দীপ প্রাণ-পবন আমার।

THE ALBERT VICTORIA PUBLICATIONS
কলিকাতা টিলে ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
14 RUTTOY ROAD'S LANE
CALCUTTA.
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার সেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

জন্মভূমি।

১ম ভাগ।

কার্তিক। ১২৮৮।

১১শ সংখ্যা।

৩ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মুখবন্ধ।

দ্বিতীয় দাতা-কর্ণ এবং দয়ার সাগর অনাথ-বান্ধব
বঙ্গের 'বিদ্যাসাগর', মন ১২৮৮ মাল, ৩০ই জ্যৈষ্ঠ,
মঙ্গলবার রাতি ২টা ১৮ মিনিটে ই-লোক পরিভাগ
করিয়াছেন।
বঙ্গা বাহ্যে,—'বিদ্যাসাগর' বলিলেই ৩
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই বুঝায়। সেই
বিশ্রুত 'বিদ্যাসাগর' আজ চারিমাস হইল, আ-
নন্দিক পরিভাগ করিয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন;
কিন্তু আজিও আমাদের সোহাগ শোকে মোহে
আচ্ছন্ন। এ বর্ষ-ক্রেতে, সেই কর্তৃপুত্র, আপন
কর্তৃপদে করিয়া এবং অপেক্ষাকৃত অল্পত ভাণ-
হীন ব্যক্তিগণকে বহু কষ্টের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া,
হৃদয়ে প্রভাবময় করিয়াছেন। সৌখ্যবোধেই এই
অবস্থা। সেই আদ্যেশকি মূল প্রকৃতিই এই
ব্যবস্থা। অবোধ মায়ার কৌব আমরা, মায়-মুগ্ধ
হইয়া, এ সব তত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। এ
অনিত্য সংসারে কেবল বিদ্যো-বিলাসেই অধীর
হইয়া পড়ি। তাই বিদ্যাসাগরের বিষয়ে এখনও
আমরা মুগ্ধমান। মনকে প্রবেশ দিই কিংবা
দ্বার করণা শত শত নিরাম নিরাশ্রয়, আভাষ
পাইত,—দ্বার আভাষে থাকিয়া অগবিত অনাথ
আতুর গীন হান হুহু রহিল অসহায়, আশ্রয়-
নির্কশেয়ে প্রতিপালিত হইত,—দ্বার করণার
দ্বার-দ্বারিণী কপুরুহীন, অধর্মণ, উত্তমর্গের
নিরাশ্রয় নিপীড়িত হইতে রক্ষা পাইত,—দ্বার

সহায়তাগুণে মন-মূল-পুত্রিত পৈতের পরিত্যক্ত রূপ
পথিক, গৃহে আনত হইয়া ধ্বংসোপা উপহ-পথ
পাইত,—দ্বার করণ কৌব দুষ্টাভে অতি-বড়
কু-পুত্রও অতুল মাতৃভক্তি শিক্ষা পাইত,—
দ্বার করণার অধ্যবসায়, অদম্য উদ্যম-উৎসাহ,
অজুড়িত নির্ভীকতা, অমোক্ষিক প্রমোহিততা, অদম্য
কর্তব্য-পরায়ণতা, অমোহনিক সরলতা সেখিয়া বিদেশী
প্রবাসী লোকেও সর্বিমধ্যে সহস্রাবার মস্তক অবনত
করিত; আজ সেই অমলজা ভাণ্যাবান পুত্র
লোকান্তরিত। বল বেগি, মন প্রবেশ মানে কিসে।
এ শুভ,—এখনও চারিদিকে শত শত কাশ্মের
পূর্ণ-হৃদয়ে পূর্ণ হাছাছা। এ শুভ,—এখনও
অদম্য অনাথগণে আজ প্রাণের বর্ষভেদী গভীর
চাঁকবর। এ সব ভুলিলে বৃক 'কাটিয়া যায়। সে
সব কথা ভাবিলে চকু কাটিয়া রক্ত বাহির হয়।
সেই করণ-প্রতিম অহুগম করণময়ের কথা মরণ
হইলে কহয়ে শোক-মাগর উর্ধ্বাশ্রয় উঠে।

বিদ্যা-বুদ্ধিতে 'বিদ্যাসাগর' অপেক্ষা বড়
অনেকেই থাকিতে পারেন; দয়া-দানিণী বড় কিন্তু
ঐশ্বর্য অপেক্ষা অতি অল্প বোকাই আছেন। এমন
নিরসের অমদাতা, ভ্রাতার ভ্রাতৃত্য, বিপদের
উদ্ধার-কর্তা এবং দীন-দীনীর দুঃখ পালক-পাতি,
এ কলিযুগে, এ মঙ্গল্যে আর কে আছে বল ?
তিনি যে দয়ার অগুণী অবতার। তিনি যে 'মুর্খিমতী'
দয়ার পূর্ণ পুত্র-দাতার। বঙ্গের 'বিদ্যাসাগর' একমাত্র
দয়ার বনোই বড়।

এক জন বড় লোক হইলে, সমগ্র দেশ বা
জাতি বড় বলিয়া পরিচিত হয়। দ্বাশ্বিন প্রভকার
বড় লোকদের কথাই বলিয়াছেন,—

"The race goes with us on their credit"

স্বরা এলিভাবেথের সচিব সিমিল বলিয়াছিলেন,—
“I know he can toil terribly.” ওয়াগনার ভা-
নক পাপিশ্রম করিতে পারিতেন; এ কথা শুনিলে যেন
স্বৈচ্ছাতিক প্রভাবে সর্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠে।
পাঠক! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী পাঠে বৃত্তিতে
পারিবেন, সিমিলের এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
বাটে কি না। বিখ্যাত বিলাতী-ইতিহাসলেখক
ফ্রান্সেন হ্যাভেনে সহজে বলিয়াছিলেন;—

“Who was of an industry and vigilance
not to be tired out or wearied by the most
laborious; and of parts not to be im-
posed on by the most subtle and sharp,
and of a personal courage equal to his
best parts”

হ্যাভেনে অকাতরে পরিচয় করিলেন। তাঁহার
মতঃ তীক্ষ্ণচিন্তা বিশেষতঃ ছিল। তিনি অতি
পরিশ্রমেও কাতর ও ক্লান্ত হইতেন না। চতুর ও
তীক্ষ্ণচিন্তা স্নেহকেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে
পারিতেন না। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও উদ্যমশীলতা
সমান ছিল।

ইংলণ্ডের প্রথম চর্লসের তত্ত্ব অচরত স্বক-
ল্যাণ্ড সহস্রকেও ফ্রান্সেজ বলিয়াছেন;—

“Who was so severe an adorer of truth,
that he can as easily have given himself
leave to steal as to dissemble”

ফকল্যাণ্ড এমনই হৃদয়-সত্যপ্রিয় ছিলেন যে,
চুরি করা তাঁহার পক্ষে যেন অসম্ভব, আত্মগোপন
করাও তদ্রূপ অসম্ভব।

চীন দার্শনিক লু সহজে চীন দার্শনিক মেন-
সিয়াস বলিয়াছিলেন;—

“When the manners of Loo are heard
of, the stupid become intelligent, and the
wavering determined.”

লু ব্যবহারের কথা শুনিলে অতি নির্দোষেরও
ব্যোমের নকার হয় এবং অস্থির-চিন্তেরও একাগ্রতা
উপস্থিত হয়।

বিদ্যাসাগরের জীবনের এই হ্যাভেনের,
ফকল্যাণ্ড এবং লু চরিত্রসমর সমাবেশিত। বিদ্যা-
সাগর মহাশয়ের জীবনী এইতে এই সবই শিক্ষা
লাভ। ইহাও জীবনীর তৈরিক সাধ। এই জন্মই
কল্যাণ বলিয়াছেন;—

“Not only in the common speech of men,
but in all art too—which is or should
be concentrated and conserved essence of
what men speak and show—Biography is
almost the one thing needful.”

এই জন্মই বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রয়োগনয়।
আরেক জনক-লিখন-প্রথাই বিদেশী অল্পকর।
বিদেশী শক্তিশালী বড়লোকগণেরই বিদ্যাসাগরের
প্রীতিপাত্র ছিলেন; অতএব বিদেশী শক্তিশালী
ব্যক্তিবাদের সহিত তাঁহার তুলনা অযৌক্তিক নহে।
কোন না কোন বিদেশী শক্তিশালী ব্যক্তি কোন
না কোন গুণ তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। এখন
আমি, তাঁহার জীবন-পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

ইতিমধ্যে পুস্তকে এবং সংবাদপত্রে বহুপ্রকারে
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে।
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় অল্পক শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতঃ
ব্যক্তিবাদের জীবনচরিত্র সর্বপক্ষে সুবিস্তার।
প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণের জ্ঞাতব্য জীবনের অনেক
কটনাই লিখিত হইয়াছে। তবে মেতালি পর পর
গণ্যাবধিকরণে হৃদয়লব্ধ নহে। অনেক অনাব-
শ্যক বিষয়েরও সমাবেশ দেখা যায়। স্থানে স্থানে
এমনও ইহা একটা ঘটনা কথা উল্লেখ আছে যে,
তাহাতে যখনে বিষয় প্রাপ্ত হইত।
না। বাহা হউক এ জীবন-চরিত্রে আমাদের অনেকটা
সাধারণ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ
নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “বিদ্যাসাগর-
চরিত্র” নামে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত জীবনী
প্রকাশ করিয়াছেন। বড় দুঃখের বিষয়, ইহা সম্পূর্ণ
জীবনী নহে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ
করিবার পূর্ববর্তী টান-লইয়াই ইহা রচিত
প্রকাশক পুত্রই দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন,—“যদি
তিনি তাঁহার জ্ঞান-জীবনের ইতিহাস লিখে লিখিয়া
হইতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার জীবন-
চরিত্র সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইত।” নিজের জীবনী
নিজে লিখিলে জীবন-বিবরণ যে সম্পূর্ণ হয়, তাহাতে
আর সংশয় কি? এতদ্ব্যতীত জীবনাবলী বহুভুক্ত
ব্যক্তিরা ভাষা মনোভূমি, ধর্ম প্রভৃতি, নীতি, নীতি,
প্রভৃতিও অনেক আভাস পাইবার সুবিধা ও
সুযোগ হয়। জন্মদায় জীবনী লিখিতে বাসিয়া,
জীবনী-লেখক বসন্তেরেণে বলিয়াছেন;—

“Had Dro Johnson written his own

life in conformity with the opinion which
he has given, that every man's life may
be best written by himself; had he em-
ployed in the preservation of his own
history, that clearness of narration and
elegance of language in which he has em-
bodied so many eminent persons, the world
would probably have had the most per-
fect example of biography that was ever
exhibited.”

কথাটা ঠিক বটে; কিন্তু আয়তব্যয় স্বল্প সমা-
শোচনা চলে না। সে তার বাহিরের লোককে
লইতে হয়। আয়-দোষ উল্লেখটো সাহস ছাড়া জন্মে
হইয়া থাকে। রম্যের “কনফেসন” বহুত দুঃসা-
মিকতার কাজ। ভলটের ঠিকই বলিয়াছেন;—

“There is no man, who has not some-
thing hateful in him—no man who has not
some of the wild beast in him. But
there are few who will honestly tell us
how they manage their best beast.”

মাংসের এমন দোষ ও দুর্কলতা থাকিতে পারে
যে, তাহা দ্বন্দ্বের নিকটও প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়।
বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার স্যামুয়েল বসিয়াছেন;—
“It seems to me impossible, in the ac-
tual state of society, for any man to
exhibit his secret heart, the details of his
character as known to himself, and
above all, his weaknesses and his
vices, to even his best friend.”

মিলের আত্মজীবনীতে সর্বক সন্দেহ দূর হয়
না। মুট, মুর এবং মাউসে আত্মজীবনী লিখিতে
আত্মক করিয়াছিলেন,—কিন্তু নানা কুখ্যা উপস্থিত
হওয়ায়, তাঁহার তাহা পরিত্যাগ করেন। তবে
বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল সত্যপ্রিয় ছিলেন,
তাহাতে তিনি যে অনেক মত প্রকাশে পশ্চাৎপদ
হইতেন না, এ বিশ্বাস আমাদের ছিল। বাহা হউক,
তাঁহার জীবনীর তত্ত্বসংগ্রহসময়ে তৃতীয় আয়ত্যা
এক বন্ধ-বাক্যবর্ণন আমাকে যথেষ্ট সাহায্য
করিয়াছেন এবং আরও সাহায্য করিবার আশাও
দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট চিত্র-রক্তভ্রাতাপানে
৪৬ বৎসর।

মৌনিপুত্র জেলার অন্তর্ভুক্ত বীরসিংহ গ্রাম
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান। তাঁহার পিতার
নাম ৮ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরসিংহ গ্রাম
কলিকাতা হইতে ২৬ কোশ দূর। কলিকাতা
হইতে জলপথে বীরসিংহ গ্রামে বাইতে হইলে
গঙ্গা, রূপনারায়ণ নদ প্রভৃতি বহিয়া গিয়া
বাঁটালে উপস্থিত হইতে হয়। বাঁটাল হইতে
বীরসিংহ ২৮ কোশ। আজ কাল যোরসিয়ার
কোশানপুর গ্রামের চুড়িয়া বাইবার সুবিধা হই-
য়াছে। শ্রীমদে কল্যাণে এখন এক দিনে বীর-
সিংহ গ্রামে যাওয়া যায়। যখন শ্রীর চলিত না,
তখন নৌকা করিয়া বাইতে ৪৫ দিন লাগিত।
শ্রলপথে বাইতে ৮৫ দিনে গরুর পথদ্বারা
শালিবার বাধা রাখা গিয়া বাইতে হয়। দুই দিনে
পৌঁছান যায়।

পূর্বপুরুষ বৃত্তান্ত।

বীরসিংহ গ্রাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান
হইবে; কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পিতামহ এত পূর্ব-
পুরুষের জন্মস্থান নহে। তাঁহাদের জন্মস্থান দুর্গা
জেলার অন্তর্ভুক্ত বনমালিপুর গ্রাম। এই গ্রাম
তারশেরের পরিচয়ে ও জাহানাবাদ মহকুমার
পূর্ব ৪ কোশ দূরে অবস্থিত। এখন ইহাদের
কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইহাদের
অবস্থা-তুলনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীর শুদ্ধ
সাম্প্রদায়িক উপলব্ধি হইবে। এতৎসম্বন্ধে বিদ্যা-
সাগর মহাশয় স্বয়ং বাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উ-
হইল; কেন না তাহাই সর্বপক্ষে প্রশংসা।

“প্রতিভাযশেরে ভূবনেশ্বর বিদ্যালয়গণের পাঁচ
সন্তান।” শ্রোতা নৃসিংহরায়, মধ্যম গণেশ্বর, তৃতীয়
রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচন্দ্র। তৃতীয়
রামজয় তর্কজ্ঞান আমার পিতামহ। বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের দেহাভ্যন্তরে পর, শ্রোতা ও স্বামী, সাধারণ
কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে,
গ্রাম্যদের সহিত রামজয় তর্কজ্ঞানের কথাবার্তা
উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিশেষ মনোভার বাটয়া
উঠিল। • • • তিনি কথোত্তর কিছু না বলিয়া,
এক কালে, দেশত্যাগী হইলেন।

বীরসিংহগ্রামে, উপাধিত্তিকসিদ্ধান্ত নামে অতি
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। • • • রামজয় তর্কজ্ঞান
এই উপাধিত্তিকসিদ্ধান্তের তৃতীয় কথা হার্বার্টের
পাণিগ্রন্থত করেন। হার্বার্টের গর্ভে, তর্কজ্ঞান

মহাশয়ের, হুই পুত্র ও চারি কন্ডা জন্মে। ছোট ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস; ছোট, মধ্যম, মধ্যমা কন্যা, তৃতীয়া পৌত্রবধূনি, চতুর্থী অমৃণ্ণা। ছোট ঠাকুরদাস বন্যোপাধ্যায় আমার জনক।

‘রামজয় তর্জন্তব্য’ শেখত্যাগী হইলেন; হুগাঁওবৌ, পুত্র কন্ডা নইয়া, বনমালিপুত্রের বাটতে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। অমৃ দিনের মধ্যেই হুগাঁওবৌর লাভনাজন্ম, ও তদীয় পুত্র কন্ডাসের উপর কর্তৃত্ব-মস্তক আরম্ভ ও বন্দ্যদার, এতদর দৃষ্টিভঙ্গ হইয়া উঠিল, যে হুগাঁওবৌকে, পুত্রঘর ও কন্ডাচতুষ্টয় নইয়া, পিত্রালয়ে বাইতে হইল। ••• কতিপয় দিবস অতি মহাদেয়ে অতিবাহিত হইল। হুগাঁওবৌর পিতা, তর্জন্তজন্ম মহাশয়, অতিশয় রক্ত হইয়াছিলেন; একমুহূর্ত্তে মনোহর কণ্ঠে তদীয় পুত্র রামহরক বিদ্যা-চূষণের হস্তে ছিল।

‘কিছু দিনের মধ্যেই, পুত্র কন্ডা নইয়া, পিত্রালয়ে কল্যাণপন করা’ হুগাঁওবৌর পক্ষে বিলম্ব অমৃশয়ের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি দ্বার্য্য হুগাঁওবৌ পালিলেন; তাঁহার ভাতা ও ভাতৃত্যাগী তাঁহার উপর অতীব নিম্ন। ••• অবশেষে, হুগাঁওবৌকে, পুত্রকন্ডা নইয়া, পিত্রালয় হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইল। তর্জন্তজন্ম মহাশয়ের স্মৃতিশয় দৃষ্ট ও হুগাঁওবৌ হইলেন এবং তাঁহার বাটের অবস্থানে, এক হুটার নির্মিত কুরিয়া দাঁড়ান। হুগাঁওবৌ, পুত্রকন্ডা নইয়া, সেই হুটার কাছাকাছি ও অতি কঠোর দিনপাত করিতে লাগিলেন।

‘ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরবার হুত কাটিয়া, সেই হুত বেচিয়া, অনেক নিমস্হায়া নিমস্হায়া হুগাঁওবৌ আপনাদের গুজরান করিতেন। হুগাঁওবৌ সেই রূপিত অবশেষের বরিলেন। ••• তাত্ত্ব শ্রম আর ঘরা নিজে, হুই পুত্রের ও চারি কন্ডার ভরণপোষণ দাম্পত্য হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা, সময়ে সময়ে, ধর্ম্মদাস্ত্র সাহায্য করিতেন; তথাপি তাঁহারের আহার্য্যি সর্ব্ববিধে, রোগের পরিশীলনা ছিল না। ঐ সময়ে, ছোট পুত্র ঠাকুরদাসের বয়সক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি, মাতৃদেহের অমৃ-মতি নইয়া, উপার্জনরূপে জোটার, কলিকাতা প্রাধান করিলেন।

‘সত্যরাম বাচপতি নামে আমাদের এক পরি-
হিত জ্ঞাতিক কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জনমোহন ভায়ালাকার, হুগাঁওবৌ চতুর্ভুজ

ভায়াবদেয় নিকট অধ্যয়ন করেন। ভায়ালাকার, মহাশয়, ভায়াবদেয় মহাশয়ের প্রাশ্রয়িতা ছিলেন। তাঁহার অমৃগ্রন্থে ও সহায়তায়, কলিকাতায় বহুদাম্প প্রাণেশ্বর হইলেন। ঠাকুরদাস, এই সর্বিহিত ভায়াবদেয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, আশ্রমপরিচয় দিলেন এবং কি জন্মে আসিয়াছেন, অশ্রমপূর্ণোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া, ভায়াবদেয় প্রাধান করিলেন। ভায়ালাকার মহাশয়ের সময় ভাল, অকাতরে শ্রাবণ্য করিতেন; এমন স্থলে, হুগাঁওবৌ আসর জাতিসন্তানকে অমৃ শেখা হুগাঁওবাপার নহে। তিনি, পাত্তির দ্বারা ও সর্বিশেষে সৌভাগ্য প্রাধানপূর্ণক, ঠাকুরদাসকে আশ্রম প্রদান করিলেন।

‘ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুত্রের, তৎপরে বীরসিংহে বাল্যগুরুদ্বার্য্য ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি, ন্যায়ালকার মহাশয়ের চতুর্শপাঠে, রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার অমৃশীলন করিলেন, প্রথমতঃ এই বাবস্থা স্থির হইয়াছিল, এবং তিনিও তাত্ত্ব অধ্যয়ন বিষয়ে, সর্বিশেষ অমৃরক্ত ছিলেন। কিন্তু, যে উদ্দেশ্যে, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিরুত্ব হইলে, তাহা সম্ভব না হইত। তিনি, সংস্কৃত পড়িবার জন্য, সর্বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, মধ্যাহ্ন বটে, এবং সর্ব্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন, ‘বৃত্ত কষ্ট, বৃত্ত অমৃবিধা হউক না কেন, সংস্কৃতপাঠে প্রাণপন্য বয় করিব। কিন্তু, জননীকে ও ভাই ভগিনীওলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রতা ও মে প্রতিক্রিয়া, তদীয় অন্তঃকরণ হইতে, একবারে অপসারিত হইত। বাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অব্যাহতি হইল, বাহাতে তিনি নানা উপার্জনকর্ম্ম হন, সেরূপ পড়া শুনা করাই কর্তব্য।

‘ঐ সময়ে, মোটামোটা ইন্দুরকৌ জালিলে, নৃগণের সার্বভেষিকের হোসে, অন্যদাসকে কর্তৃ হইল। এক্ষত, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইন্দুরকৌ পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শমিত স্থির হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইন্দুরকৌ পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এমনকর পড়া, প্রতি পত্রীতে ইন্দুরকৌ বিদ্যালয় ছিল না। তাত্ত্ব বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ভ্রাতৃ নিরুণ্যায় দীন বাবকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা জটিল না। ভায়ালাকার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কাচোলাপাণী ইন্দুরকৌ জালিলেন। তাঁহার অমৃরোধে, ঐ

যাকি ঠাকুরদাসকে ইন্দুরকৌ পড়াইতে, সমুদ্র হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম্ম করিতেন; হুতাংগ, শিবাজিগে, তাঁহার পড়িবার অবকাশ ছিল না। এক্ষত, তিনি ঠাকুরদাসকে, সম্ভার সময়, তাঁহার নিকটে বাইতে বলিয়া দিলেন। তদুপহারে, ঠাকুরদাস, প্রত্যহ সম্ভার পর, তাঁহার নিকটে গিয়া ইন্দুরকৌ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

‘ভায়ালাকার মহাশয়ের বাটতে, সম্ভার পরেই, উপরি লোকে আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া বাইত। ঠাকুরদাস, ইন্দুরকৌ পড়ার অমৃরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাকিতেন পারিতেন না; যখন আসিলেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না; হুতাংগ, তাঁহারে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নরুন্তন আহারে বর্গিত হইয়া, তিনি, দিন, গিন, শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। এক দিন, তাঁহার শিথলক জিজ্ঞাস্য করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতেছ, কেন। তিনি, কি কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা বাটতেছে, অমৃপূর্ণ নমানে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে, সেই ব্যক্তি তাহার সেরূপ অবস্থা বাটতেছে, অমৃপূর্ণ নমানে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে, সেই ব্যক্তি তাহার সেরূপ অবস্থা বাটতেছে, অমৃপূর্ণ নমানে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে, সেই ব্যক্তি তাহার সেরূপ অবস্থা বাটতেছে, অমৃপূর্ণ নমানে তাহার পরিচয় দিলেন।

‘ঐ সম্ভার দয়ালু মহাশয়ের দ্বারা ও সৌভাগ্যে, আমি তোমার আমার ব্যায়্যার থাকিবে পাই।’ এই সম্ভার প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস, ধার-পর-নাই, আশ্বাসিত হইলেন, এবং পর দিন অমৃবি, তাঁহার ব্যায়্যার গিয়া অবস্থিত করিতে লাগিলেন। ‘ঐ সম্ভার দয়ালু মহাশয়ের দ্বারা ও সৌভাগ্যে, আমি তোমার আমার ব্যায়্যার থাকিবে পাই।’ এই সম্ভার প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস, ধার-পর-নাই, আশ্বাসিত হইলেন, এবং পর দিন অমৃবি, তাঁহার ব্যায়্যার গিয়া অবস্থিত করিতে লাগিলেন।

দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে, কোনও দিন বা মৃদুত্বে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার, সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, তিনি শিবাজিগে ব্যায়্যার আসিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে, সমুদ্র পুত্র, উপভাষী থাকিতে হইত।

‘ঠাকুরদাসের সামান্যরূপ এক ধানি পিতলের বালা ও একটি ছোট মৃতি ছিল। ধান্যাবানিতে ভাত ও কাটীতে জল থাকিতেন। তিনি বিরেকনা করিলেন, এক পরমার সালপাত করিয়া রাখিলে, ১০। ১২ দিন ভাত ধান্যও চলিবেক; হুতাংগ, বালা না থাকিলে, কাজ আইকিহইবেক না; অতএব, ধান্যাবানি বেচিয়া ফেলি; বেচিয়া যাযা পাইব, তাহা আপনরা হাত্ত রাখি। যে দিন, গিলের বেয়ায় আহারের খোয়াড় না হইবেক, এক পরমার কিছু কিনিয়া লইব। এই স্থির করিয়া, তিনি সেই ধান্যাবানি, নূন বজায়ে, কামারিরে যোকানে বেচিতে গেলেন। কামারিয়া বলিল, আমরা অমৃ-মিন শোকের নিকট হইতে পূরণ বাসন কিনিতে পারি না। পূরণ বাসন কিনিয়া, ব্রহ্মন ও কখনও, বড় কোমোতে পড়িতে হয়। অতএব, আমরা তোমার বালা লইব না। এইরূপে দুইনও সোকাবানাই সেই বালা কিনিতে সম্ভব হইল না। ঠাকুরদাস, বড় আশা করিয়া, বালা বেচিতে গিয়াছিলেন; এক্ষণে, সে আশা বিসর্জন দিয়া, শিথল মনে বাসায় ফিরাই আসিলেন।

‘এক দিন, ধন্যাহ্ন সময়ে, দ্ব্যায়্যার আশ্রিত হইয়া, ঠাকুরদাস, বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অমৃ-মন্ড হইয়া, দ্ব্যায়্যার বাসনা হুগাঁওবৌর অভিপ্রায়ে, পক্ষে পক্ষে অমৃশ করিতে লাগিলেন। কিংম্বৎ অমৃশ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ে সর্গুণ বিপরীত ফল পাইলেন। হুগাঁওবৌ বাসা ভুলিয়া ব্যগ্রতা দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঈর্শনীয়া পূর্ণত গিয়া, এত রাত্তি ও দ্ব্যায়্যার ও দ্ব্যায়্যার এত অভিজ্ঞত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিংম্বৎ পরেই, তিনি এক যোকানের সর্গুণ উপস্থিত ও গাওদামান হইলেন; সেখান, এক মধ্যরাত্রি বিধবা নারী ঐ যোকানে বসিয়া মৃতি মুক্তি বেচি-তছিলেন। তাঁহারে গাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ যোকাল জিজ্ঞাস্য করিলেন, বাপাঠাকুর, গাড়াইয়া আছে কেন। ঠাকুরদাস, তদুপার উত্তর করিয়া, পানাহে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাধন ও সর্গেবাবোকা, ঠাকুরদাসকে বসিতে বসিলেন, এবং

ভাষ্করের ছেলেকে মুখুন্স দেওয়া অবশেষে, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুচকি ও জল দিলেন। ঠাণ্ডাবাস, যেখান বাগ্ন হইয়া, মুচকিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ জীলকি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাপাঠাকুর, আজ মুন্সি তোমার বাগ্না হয়ে নাই। তিনি বলিলেন, না, বা বাগ্নিয়া, আমি, এখন পর্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই ত্রোলাক ঠাণ্ডাবাসকে বলিলেন, রাপাঠাকুর, জল খাইওনা, একই অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকটবর্তী গোয়ালার পোকান হইতে, সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুচকি দিয়া, ঠাণ্ডাবাসকে স্টেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সর্বশেষে সফল অংগুত হইয়া, শ্রিত করিয়া বলিয়া দিলেন, যে বিন তোমার একপ বটিকে, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

“যে যে বিন, দিবাভাসে আহারের ঘোড়া, না হইত, ঠাণ্ডাবাস, সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশীসকাল অম্বাসে, তাঁহার পোকানো পিয়া, স্টেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন।

“কিছু দিন পরে ঠাণ্ডাবাস, আশ্রয়ভাটার সহায়তা, মাসিক দুই টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম পাইয়া, তাঁহার আর আশ্রয়ের সীমা রহিল না। পূর্বক আশ্রয়ভাটার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্রেশ সৃষ্টি করিয়াও, বেতনের দুইটি টাকা, ধারাবাসে, জননীকে নিকট পঠাইতে লাগিলেন। তিনি বিলম্বক পুষ্টিমান ও বাস-পন-নাই পরিত্রাণী ছিলেন, এবং কখনও কোন ওজর না করিয়া, সকল কর্মই ফলারসে নিমগ্ন করিতেন; এজন্য, ঠাণ্ডাবাস যখন বাঁহার দশটি কর্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সান্ত্বিত সফল হইতেন।

“তই তিন বৎসরের পরেই, ঠাণ্ডাবাস মাসিক পাচ টাকা বেতনে পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীও ও ভাই ভগ্নিনীওগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে কর্ম দূর হইল। এই সময়ে, পিতা-মহৎসেও বেশে প্রভাণ্ডগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন, তথায় প্রী, পুত্র কন্যা দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহে আসিয়া, পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সন্মানমণ্ডিতে, সকলেই

আজ্ঞাসম্মানে মগ্ন হইলেন। বস্তুতঃ, বা বস্তুতঃইয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অসমর্থান। জানি করিতেন; এজন্য কিছু দিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গাপালের মুখে ভাটানের আচরণের পরিচয় পাইয়া, সে উন্মত্ত হইতে বারণ হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক বীরসিংহে অবস্থিত বিহবে সন্মতিপ্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহগ্রামে আশ্রয়লাভ বাস হইয়াছিল।

“বীরসিংহে ক্রটিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, চ্যেট পুত্র ঠাণ্ডাবাসকে দেখিবার জন্য, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাণ্ডাবাসের আশ্রয়ভাটার মুখে, তদীয় কটমহিষতা প্রকৃতি প্রকৃত পটভর পাইয়া, তিনি যেসকল আশীর্বাদ ও সর্বশেষে সত্যের প্রকাশ করিলেন। সত্যভাটের দহেচোটা, উত্তরাষ্ট্রীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সমস্তপন বাকি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলম্বন পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অস্তির ময়ানীল ও সদায় মহত্ব ছিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশভাণ্ডার স্বাধি বাদ্যীয় স্বতন্ত্র অংগুত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাণ্ডাবাসকে আমার বাটতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রকৃতির ভার লইতেছি; সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া যাইতে পারে, তখন আর তাহার কেনও অংশে অসুবিধা ঘটবেক না।

“এই প্রস্তাব শুনিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, সান্ত্বিত আশ্বাসিত হইলেন; এবং ঠাণ্ডাবাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া, বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই স্বাধি, ঠাণ্ডাবাসের আহারক্লেশের অবসান হইল। যথা সময়ে আহারকমত, হই বোলা পাইয়া পাইয়া, তিনি পূর্ণজন্ম জ্ঞান করিলেন। এই ভক্তভবনা দ্বারা, তাঁহার যে কেবল আহারের ক্রেশ দূর হইল, একপ নহে; সিংহ মহাশয়ের সহায়তায়, মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাণ্ডাবাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, এই সন্মান শুনিয়া, তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আশ্বাসদেয় সীমা রহিল না।

“এই সময়ে ঠাণ্ডাবাসের ব্যয়কম তেইশ চলিশ বৎসর হইয়াছিল।” অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া

• গুনিয়াছি; এই সময় ঠাণ্ডাবাসের কনিষ্ঠ কালিদাস কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন।

আত্মক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোষ্ঠা-নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয় কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত, তাঁজুর বিবাহ দিলেন। এই ভগবতী দেবীর পক্ষে আমি ভগ্নগ্রহণ করিয়াছি। ভগবতী দেবী, শৈশবকালে মাতুলগণের প্রতিপালিত হইয়া-ছিলেন।

রামকান্ত তর্কবাগীশের নিবাস গোষ্ঠাতে ছিল; কিন্তু তিনি শ্রমসাধনায় সিদ্ধ হইতে পিয়া উন্মত্ত হইয়া যান। এই ভ্রম পাতুলগ্রামনিবাসী তদীয় বস্তু পলামন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাহারকে সস্ত্রীক নিজ ভবনে আনিয়া রাখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী দেবী সেই ভ্রম মাতুলগণের প্রতিপালিত যন। ভগবতী দেবী ভিন্ন পলামন বিদ্যাবাগীশের আরও একটা কন্যা ও চারি পুত্র ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সভ্যবাসিতা ও সরলতা চির-প্রসিদ্ধ। তিনি এক-পাশ পিতা ও পিতামহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পিতামহ ইহা মনে হইল। পিতামহ রামকান্ত তর্কভূষণ অসীম তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি কথারও মূলাপেক্ষা করিতেন না এবং পরস্পর-কান্ত ব্যক্তিবর্গের ক্রুদ্ধভক্তিতে ভীত হইতেন না। তিনি একরূপ স্বাধীনপ্রকৃতি লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার ভালবাস ও তৎপক্ষীয় লোক তাঁহার বিপক্ষ ছিলেন। তিনি সর্বদাই বলিতেন,—“এদেশে মানুষ নাই, সবই প্রজা।” তিনি যেমন সমসামান্য, তেমনি নিরহঙ্কার ও সভ্যবাদী ছিলেন। ভট্টাচার্য্য ভাষ্করের একট রসিকতাবাদ ও পরিচয় লইন,—এক দিন গ্রামের পথ গিয়া যাইতেছিলেন, একজন বলিল,—“ও পথ দিয়া যাইবেন না,—বড় বিষ্ঠা।” ভাষ্কর উত্তর করিলেন,—“নিষ্ঠা! কে? সবাই ত গোবর, এ দেশে মানুষ কৈ, সবাই ত প্রজা!” কথিত অল্পক, তিনি যখন গৃহ ভাঙ্গা করিয়া তীর্থপর্যটন করেন, তখন একদিন রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখেন,—“তোমার পরিবার তোমার জন্মভূমি বনমালিপুর্ন পরিভাষা করিয়া বীরসিংহ গ্রামে বাস করিতেছে। তাহাদের এখন কষ্টের একশব্দ।” ইহার পর

রামকান্ত বীরসিংহে প্রভাণ্ডগমন করিয়া পুনরায় পরিবারবর্গের ভার গ্রহণ করেন।

বীরসিংহ গ্রামের ভূস্বামী তাঁহাকে তাঁহার বাজুভিত্তি ভূমিটুকি নিদর ত্রস্ত্রাক্ত করিয়া দিতে চাহেন এবং তাঁহার আশ্রয় স্বজনও তাঁহাকে তৎ-গ্রহণার্থে অনুরোধ করিতেন। ভাষ্করী রামকান্তের বিশ্বাস ছিল যে, নিদর ভূমিতে বস করিলে ভূস্বামী তাঁহার পুণ্যভাগ গ্রহণ করবেন এবং তাঁহার অহঙ্কার বাড়িবে। এই ভ্রম রামকান্ত নিকর ভূমি লইতে সম্মত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত জীবন-চরিতে পিতামহ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“তিনি কখন পরের উপাসনা বা অমুগত্য করিতে পারেন নাই। তীহারাত্মিক সিদ্ধান্ত ছিল, অস্ত্রের উপাসনা বা আহুগত্য অপেক্ষা প্রাণভাণ্ডার করা ভাল। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপুত্ৰ ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে সর্বিধে অবস্থিত ছিলেন।”

রামকান্তের ছদ্মবর্ণন বল যেমন ছিল, তাঁহার শারীরিক বলও অসমর্থ ছিল। এমনই বল থাকিলে, দেহের বল যেন আপনি আসিয়া পড়ে। সেহ মনের এমনই নিত্য-নিষ্ঠ সন্তুষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয়ে ইহা আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।—পিতামহ রামকান্তের কথা কর্তে শুনি-মাছি। রামকান্ত সর্বদাই লৌহবল হইতে নির্ভীক চিত্তে ভ্রম করিতেন। এক সময় তিনি বীরসিংহ হইতে মৈনৌপুর যাইতেছিলেন, পথের মধ্যে এক ভ্রুকু তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি ভ্রুকুকে দেখিয়াই এক বুদ্ধের অন্তরালে গুণায়মান। ভ্রুকুও তাঁহাকে ধরিলে চোটা করিল। ভ্রুকু যেমন দুইটা হস্ত প্রসারণ করিয়া ধরিতে যাইল, তিনি অমনি তাঁহার দুইটা হাত ধরিয়া ক্ষেপে বর্ধক ভিত্তিতে লাগিলেন। তখন ভ্রুকু তৎক্ষণাৎ হইল। রামকান্ত তাহাকে নৃত্যপ্রায় দেখিয়া চলিয়া পলাতন উপক্রম করিলেন। ভ্রুকু কহি তাঁহার পদাঘাতগে মনোরাহত করে। রামকান্ত তখন কখনোপ্রায় হইল। হস্তস্থিত গোহবৎ-আবাসে

• বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত জীবন-চরিতে এক কথার উল্লেখ করেন নাই; ত্রিভাষ্য, মহাশয় নিজ গ্রহণে লিখিয়াছেন।

• ঐ সময়ে অসুখ দার্শনিকদের ভিতর মতভেদ আছে। সে সব কথা দুইটা এ প্রকার বিচার করিয়া সমর্থ হইবে।

কনিষ্ঠ ভাষ্কর কাব্যকর্ম হইলে, তাঁহাকে নিজ কুণ্ডলী রাখিয়া ঠাণ্ডাবাস গ্রহণ লেখন ও তৎপরে বাসনের বাসনা করেন। কনিষ্ঠের ভাষ্কর ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয় না চলায় তিনি অত্যাধি ইচ্ছাপূর্বক সত্বর স্বকর্মে মগ্ন হইল।

ছয়টিতে রাজত্বলা এবং সাতটি এইই বন্ধে
বাঁকিলে রাজা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি
এই বন্ধে। এই বন্ধ তিনি ক্রোড়িত তেজস্বী
ছিলেন।

একাদশগ্রন্থে দুঃখপাত হইলে কি ফল ?

উৎকৃষ্টাঃ শ্রীমদ্রামায়ণঃ রাজপ্রতিরূপকামঃ।
রাজান একবিধিত্ত্বভীর্ণ্যন্তেষ্টঃ পরঃ দিব্যঃ।
ইতি কুটোহয়ঃ। রঘুবংশঃ সর্গঃ ১০ শ্লোকে মলিনাংঃ।
ধাহার একটি এই তুকা থাকে, তিনি উৎকৃষ্ট
লোক, হুইটা থাকিলে শ্রীহরী, তিনটা থাকিলে
উৎকৃষ্ট কার্যকারী, চারিটা থাকিলে রাজপ্রতিরূপ,
(পাচটা এই তুকা হইলে) রাজা হয় এবং নরকারে
অবতরণ শেষবারই ছয়টা এই তুকা হয়। সাতটা
এই একবারে তুকা হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
হুইটা এই তুকা।

দনবজালিযোগঃ।

লম্বাভীর্ন বহুমানু বহুমানু শশাঙ্কঃ।
সৌমাগ্রহেষ্ণুচরণ্যপবন্তেঃ সমন্তৈঃ।
হাতাং সমেতব্রহ্মসংগঃ তদুনুভাঃ।
মন্ত্রেণ সংবলি ফলবিরমুংকটমঃ। দীপিকায়াম্
জন্মকালে লগ হইতে যদি সমস্ত শুভ এই
ঈশচরণ অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ
মানপাত হয়, তবে অত্যন্ত দনবানু হয়। ঈশ্রপ
জন্মরাশি হইতেও যদি সমস্ত শুভ এই উপচরণ-পাত
হয়, তবে ধনবানু হয়। হুইটা এবং ষষ্ঠ লগ্নের বা
রাশির উপচরণ-পাত হয়, তবে মাধ্যমগণ ধনবানু হয়
এবং অল্পাংশ কম থাকিলে সামান্যরূপ দনবানু
হয়। অত্যন্ত কল সঁকল অল্পাংশ হইলেই ফল
অমিক হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোষ্ঠীতে লগ্ন
হইতে বৃহস্পতি, চন্দ্র ও বুধ এবং জন্মরাশি হইতে
চন্দ্র ও বুধ উপচরণ-পাত।

বিনয়বিগাহানামমমমব্যমোত্তমামিনিকল্পপদম্।

নৌপকার্যঃ ঐ ৬০ শ্লোকে।
অধমসমবর্তিতানলককেন্দ্রসিদ্ধিঃ
শশিনি বিনয়-বিনয়-জ্ঞান-বী-সেনুপানি।
অবনি বিনি চ চন্দ্রে বাহিমিহাংশকে বা
বৃহস্পতি-সত্ত্বগুণে কিতবানু জ্ঞান হুই চ।
জন্মকালে চন্দ্র যদি রবির কেন্দ্রে, রহান, চতুর্থ,
সপ্তম, দশম) মানপাত হয়, তবে বিদ্যা, ধন, জ্ঞান,
বুদ্ধি ও নিপুণতা অধমরূপ হয়। চন্দ্র, রবির
পন্থক (দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠম, ষড়্কাশ) হইলে
বাঁকিলে বিনয়াদি মধ্যমরূপ হয়। আর ঐ চন্দ্র

যদি রবির আশোকিম (তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ)
মানপাত হয়, তবে বিনয়াদি সমস্তই উত্তমরূপ হইয়া
থাকে। অথবা চন্দ্র যদি বীর অধিমিত্র গৃহে
থাকিয়া বৃহস্পতি বা শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে
ধনী ও সুখী হয়। এই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
কোষ্ঠীতে চন্দ্র রবির আশোকিম-পাত; অতএব উইহার
বিনয়াদি উত্তমরূপ ছিল।

দুঃখপাত চন্দ্রের ফল।

শ্রিগরগতিঃ হুমতিঃ কমনীয়তাঃ
দুঃখপাতঃ হি নৃপাশ্রয়ভোগতমঃ।
বৃষগতো হিমমুচ্ছন্দমাদিশেং
হুগতিতঃ সূর্য্যতঃ হুখানি চ।

চন্দ্রসঙ্গঃ।

জন্মকালে চন্দ্র, বুধ রাশিপাত হইলে জ্ঞাত মানবের
শ্রিবশতি, সমুদ্র, সৌন্দর্য, মৈনুপ্য, উপভোগ
এবং স্বীয় পুণ্য ও কাহা হইতে সুখ হইয়া থাকে।
ইহার জন্মকালে বুধ রাশিতে চন্দ্র ছিল।
দুঃখপাত বুধের ফল। চুড়িরাশি-জাতকারণে—

স্বভবানুভবতঃচতুর্বে নরো
লিখনকল্পপত্রো হি যেরাতিঃ।
শশিনুভে নৃভূতে চ পতে হুখা
হুনয়ানয়নামকণ্টেঠৈঃ।
জন্মকাল কন্ডারামিহে বুধ থাকিলে, জ্ঞাত
মানব সম্ভবতা, চতুর্থ, দ্বন্দ্বের লেখক, উন্নতিমানু
এবং হুখার অমর্য নরায়ণ-চৈত্রাদি দ্বারা হুখা
হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মকালে কন্ডারামিহে
বুধ আছে।

লম্বাঃ কর্ণগি তুর্ঘ্যে চ যদি হ্যাপপবেতি কামঃ।
বধর্থে নিভার্য ততঃ জ্যোতে চক্কা মতিঃ।
ইতি জাতকালভার্যাকায়াম্।

জন্মলগ্নের চতুর্থ ও দশম হইলে পাপপ্র
থাকিলে, মানবের বধর্থে চক্কা মতি হয়।
কামাত্ত্বাচরণত্বহরোহদনানঃ
ত্রাঃ সাধুসিদ্ধিঃ হুতরাঃ পবিত্রঃ।
প্রসন্নমুস্তিঃ নরো বৃষহে
নীতভার্যঃ ভূমিবিশেষে নৃপ্তে। ইতি চুড়িরাশিঃ।
জন্মকালে বৃষরাশি চন্দ্রের উপর মঙ্গলের দৃষ্টি
থাকিলে, জ্ঞাত মহত্ব কামাত্ত্ব, কামিনী-মোহপ্রদ,
সজ্জন-বহু, অত্যন্ত-পবিত্র এবং প্রসন্নমুস্তি হয়।
বৃষহে তদ্বিশেষতঃ ততঃ নৃপ্তে ভূতইত্যং ইহঃ।
দানবীকো ভবেদিত্যঃ সাধুধর্মঃ মানবঃ।
ইতি শতহুয়ারপ্রকাশে।

এই ব্যক্তির জন্মকালে লগ্নের দ্বাদশ হইলে
অধিপতি এই, দ্বাদশের দ্বাদশপাত হয়, আর ঐ
দ্বাদশ হইলে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে সেই ব্যক্তি
সংকল্পে দানবীর অর্থাৎ অত্যন্ত দাতা হয়।
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লগ্নের দ্বাদশাধিপতি মঙ্গল
একাদশ হইলে আছে এবং ঐ দ্বাদশ হইলে বৃহস্পতি
ও চন্দ্রের দৃষ্টি আছে; অতএব ইনি একজন প্রসিদ্ধ
বদাতা ছিলেন।

আমাদের হাজত।

তৃতীয় অধ্যায়।

জন্ম-যোগ।

বেলা প্রায় সাড়ে চারিটা। আমরা তখনও সেই
পুলিশ-আদালতের ত্রিতলে মাজিষ্ট্রেটের দিগ-
পাশি সম্মুখ-আলোক-হীন্দির-সম্মুখ-বাগ্মিনী প্রকাণ্ড
অবস্থিতি করিতেছি। ত্রস্তার বাবু একদানি
বেক একই সরাইয়া লইয়া, ত্রস্তার একা চিৎপাত
হইয়া পড়িয়া আছে; চারদিকের ঠাইয়া মাপার
রাশিগণ-গুরুপ করিয়াছেন; এবং অতি সুস্থদের বুন-
বুন করিয়া গান ধরিতেছেন। রুম্বাণী এইরূপ-
কনট্রোলপত্রের সঙ্গে হাসিয়া-হাসিয়া কল্যাণী
কহিতেছেন। অল্পাংশের জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া,
নীরবে বেকোপের বসিয়া আসিয়া, কনট্রোলপত্র
কপারপত্র হইয়া অমনোহর হইতেই আসিয়া
চোয়ার দিয়াছিল; আমি সেই চোয়ারে বসিয়া, সেই
লগ্ন টাকার পাখা লইয়া বাতাস করিতেছি, আর
মনে মনে ভাবিতেছি—“এখানে একরূপ জায়ে আর
কতকগুলি বসিয়া থাকিতে হইবে? এখন বড় শীত এই
নকল-হাজত হইতে হরিবাড়ীর আসল-হাজতে
“হাইতে পারি, ততই ভাল।”

নানা কারণে আমরা কয়জনই অল্পমাত্রায়
ক্লান্ত হইয়াছিলাম। যখন আমরা মাজিষ্ট্রেটের
সম্মুখে কাটায় একদমে প্রায় চারি ঘণ্টা কাল বাড়া
লাইয়াছি। জিলা, তখন দণ্ডায়মান থাকি-নিবন্ধন বিশেষ
কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। যখন পার্থক্য সেই
কুঠারীতে আসিয়া বসিলাম, তখন আমাদের পা
য়ে কোন “আউট-আউট” বেগ হইল। তখনও
কিঞ্চিৎ পাইয়াছে। রুম্বাণী আমায় জিজ্ঞা-

সিলেন,—“কোন কণ্ট-কণ্ট হয় নাই? আমি
হাসিয়া বলিলাম,—“না,—কণ্ট ছিল,—অতাব ছিল
পাখা; তাহা পাইয়াছি।”
কৃত্য। জলুকণা পায় নাই?।
আমি। আপনার তৃপ্ত পাইয়াছে নাকি?
কৃত্য। কিঞ্চিৎ।
আমি। তবে আমারও কিঞ্চিৎ।

ত্রস্তাবু তৃতীয় ছিলেন, তিনিও উঠিয়া বসিলেন,
—“আমারও হু-কিঞ্চিৎ।”
আমি বলিলাম,—“জমাদার-সাধবের জলের
জল বসি কি?” কৃত্যবাসু উত্তর দিলেন,—“তাও
কম নয়। কোথাকার জল, কি বকম জল,—
সে জল কি কখন ঠাণ্ডা হয়? আর, কোথার
বসিয়াই বা জল পাইবেন? বিশেষ, এখানে কার্প-
চোপড় ছাউনিরও উপায় নাই,—এই কাপড়ে
মঙ্গলমণ্ড ছাউনিয়া, রেজুও ছুইয়াছি।”

আমি দ্বিধ বজ্রহায্য হাসিয়া টিপনি কাটিয়া
বলিলাম,—“দেখুন,—আসিয়াছেন, হাজতে;—
এত বাজ-বিচার, এত ইন্টিম্যাট করিলে পলিবে না।
এখানে সবই সমভাষ,—ইহা এক জগদাধিপতি।”
কৃত্য। হাজতে আসিয়াছি বলিয়া কি জাতি-
দিতে হইবে নাকি? অথর্ব “নষ্ট করিতে হইবে
নাকি?”

দেখিলাম, রুম্বাণী মনে-মনে একটু চট্টয়াছেন।
রুম্বাণী, যেখান গতিতে দেখিতেছি,—রুম্বাণী
হাজতে গিয়া একটা মহা কলহকণা বদাইলেন,—হেত
আমাদের দ্বিধে ষাঁত দিয়া পাড়িয়া থাকিবেন। আমি
তখন ষাঁতবোনে রুম্বাণীকে বুঝাইতে আস্ত
করিলাম,—“দেখুন, জ্ঞাপার বড় গুরুত্ব। সমাগার
অধীশ্বর ইংরেজ-রাজের সহিত সাক্ষাৎ সপক্ষে আজ
আমাদের মোকদ্দমা।—এখন আমরা যে কোন
কার্য করি না কেন, তাহা বুঝ ধার্যবে বিবেচনার
সহিত করিতে হইবে। এখন আমাদের প্রত্যেক কণা
প্রত্যেক পদক্ষেপ-প্রত্যেক নিষাদী পদক্ষেপ-কর্তৃক
পদক্ষেপে হইতেছে। জাঁপনি হাজতে গিয়া
যদি বলেন,—“আমি স্থগাপ (জি বাইব না,—তাহা
হইলে একটা বিষয় কাও বাধিয়া যাইবে। বলা
যাক, হাজতে যাকার বিদ্যাবত্ত অজ্ঞাত হইবে
না,—হুতরাং আপনাতঃ আনন্দন ব্রত অল্পলগ্ন
করিতে ব্যাঘ হইবে।” পরবর্তনের কাছে “এ
বিষয়ের বিপোর্ট অজ্ঞাতই পৌঁছিতে। পরবর্তন
হয়ত ভাবিতে পারেন,—“বদ্বাসীর লোককণা বড়

হুট, তাই বৃষ্টি এ এককম যাহা কালানুসারে পরিবর্তিত হয়—

কুম্ভ। নবমস্কোতের বাহা ইচ্ছা, তাহা মনে করিতে পারেন—তাহাতে আমার কতি-বুদ্ধি কি? আমি। কতি-বুদ্ধি কিছু-কিছু আছে যে কি? আমরা হইলাম, রাজনৈতিক আশায়—আমাদের উপর অধিপত্য হইল—রাজবিরোধের মূচনা করা—একপ মনে আমাদের কার্যের উক্তি অর্থ নবমস্কোত হইতে বাহ্যতে না করিতে পারেন, সেজন্য তাহা চলা আমাদের কর্তব্য।

কুম্ভ। হাজতে গিয়া যদি দেখি, এখানে মহা-মামল না বাইলে চলিবে না;—তবে আমাকে কি তাহা আপন খাইতে বলেন?

আমি। না।

কুম্ভ। হাজতে যদি কেহ পৌরাজ মুখী বাইতে বলে, তবে তাহাই কি আমাকে বাইতে হইবে?

আমি। না।

কুম্ভ। যদি মুলমান বা অজ কোন নীচ জাতির সহিত আমাকে একত্র এক পংক্তিতে বাইতে দেখ, তাহা হইলে কি আমি তাহারে সহিত-বাসিয়া বাইব?

আমি। না,—এ সব কিছুই করিবেন না;—

আমাদের অবস্থা এ সব কিছুই করিবে না;—একটি স্বপ্ন রক্ষা করিতে সত্য যত্নবান, তিনিই প্রকৃত ব্যক্তি। তবে এখন কথা হইতেছে—আমি এক বটা জল বাওয়া লইয়া। হাজতে পলাইল নিলিবে না; এবং সর্বদা কপড় ছাড়াও চলিবে না। যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমন ব্যবস্থা।

কুম্ভ। আপনার বুদ্ধি। তারি জল-কুম্ভা পাইয়াছে!

আমি। (হাসিয়া) না; অন্য সমস্ত রাজি জল না বাইয়াও, আমি থাকিতে পারি। তবে এখন পারায় জল পাইলে, ভাল হয়—এই মাত্র। সে বটা হউক—অব্যাহত-মুখ্য ভোজন করি না,—নিজন্ত স্নেহচাচের প্রবৃত্তি হইবে না,—ইহাই আমা-দের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকিবে। তবে জল বাওয়া, পান বাওয়া, মদ্যপানি বাওয়া সবকে মাধারন মতে ব্যবস্থা করিতে হইবে—এ হাজতে হইতে যখন থালাস হইবে, তখন একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে।

কুম্ভাবু। নরম হইয়া ভীতিতে লাগিলেন।

আমি। তখনাবুকে জিজ্ঞাসিলাম,—“এ সবকে আপনি কি বলেন?” তিনি হাসিতে হাসিতে বলি-

লেন,—“আমাকে আর এ সব কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমি একবেলা বাই,—আপন চাউলের ব্যবস্থা করি;—হাজতে গিয়া আমি বাহা বাইব, তাহাই আমার পক্ষে অবশ্য হইবে। তাহাজতে আর সেসব লম্বা লম্বা না। এ সবকে আপ-নারা বেরণ যুক্তি বিব করিবেন, সেইজন্যই করা হইবে। তবে এম পেলো, নিজন্ত স্নেহচাচের করিতে স্বীকার হইবে না।”

আমি। ঐ কথাও আমিও বলিতেছি।

এমন সময় জরায়র-কনষ্টবল আমাদের সম্মুখ আসিয়া এই মর্মে বলিল,—“বাবু, কোম্পানীর বাইতে সমস্ত আপনাদের একই বাড়ি হইতে পারে,—রাহি না হউক, সম্ভার পুরে আপনারা হেলনখাড়া পৌঁছিতে পারিবেন না। এ দিকে কোম্পানীর পাঁচটার পর, ছয়টার মধ্যে সকলের আহ্বানীয় কার্য সম্পন্ন হয়। আপনারা কোলে গিয়া বোধ হয় কিছুই বাইতে পাইবেন না,—কারণ আপনাদের জল আঁচ আর বস্ত্র আহ্বানীয় প্রভৃত থাকিবেন না। তাই আমি বলি, আপনারাও এই স্থানে একই জলচল বাইয়া যান।”

কুম্ভাবু বলিলেন,—“বাপু! আমি ও তাক্সব, বাব্বারের কোন জিনিষ আমি হঠাৎ কেমন করিয়া বাইব?”

জরায়র। আপনি বলেন’ত, বেশ ভাল তাক্সবের লোকান হইতে পুচি-কুচি আনাহিয়া দি।

কুম্ভ। সমস্ত কলস চিনির ময়ত।

জরায়র। বাবু! সে তাক্সব-হাউসের প্রভার নগদান—পূজা-আফিক করে,—করণ চিনি সে তাহার লোকান চুকিতে দেয় না।

কুম্ভ। তবে এক কল কর,—সেই তাক্সবকে আমরা প্রাথমিক করণ কিছু দি,—সে তাক্সব মনে নিজে সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া আহিবে। সর্বকলসে ভেঙে সের সামগ্রী আনিলেই হইবে—

জল ও পান সেই সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিবে।

জরায়র প্রস্থান করিল। আমি বলিলাম,—“ওভার নোভ।” এই সময় আমার কতি-রসিকতা করিবার ইচ্ছা হইল। রত্ন-রম-হস্ত উঠিয়া-বুনিয়া হয় না—অব্যবসায়, গবেষণা বা প্রবৃত্তির দ্বারা হয় না,—ইহা জানি সভ্য; তখাৎ কেমন ইচ্ছা হইল,—একবার রসিকতা করি। টেডি কট্টা, পোকা পিয়া, বাউরা আসিলে গিয়া, বড়ির চেয়ে বুক সাজাইয়া ঝাঁঝি হইল “বাবু-মহাশয়”

হওয়া বাইতে পারে, কিন্তু “রসিক-পুরুষ” হইবার যো নাই। আমার ভাওরে লক্ষকোটি রামচন্দ্রী মৌরির থাকিতে পারে,—যার বেহস্ততা সজ্জিত থাকিতে পারে,—উষায় পল্লিভাত পূর্ণ প্রকৃতিতে হইতে পারে,—আমি পুরুষ-রমণের অধিকারী হইতে পারি, আমি বজ্রবীর্যে বেহস্ত হইতে পারি, আমি রতিপতি কামদেব হইতে পারি, তখাৎ আমি “রসিক-পুরুষ” না হইতে পারি। এ সব গুরুত্বের অজিততা থাকিলেও, আমি রসিকতা করিয়া কুম্ভাবুকে বলিলাম,—“কুম্ভাবু! জল আমার মতি-পতি কিংকি, কম,—হুতরাং জল-ধাবারের আমি কিছু অধিক অর্থ পাইতে পারি।”

কুম্ভ। সে কি রকম?

আমি। কথা ভাবিয়া বলিলে, রসিকতা হয় না। ভাষা, টাকা, অবয়ব, ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে, রসিকতা হয় না।

কুম্ভ। (হাসিয়া) মনিনাথের টাকা ব্যতীত, আপনাদের এ রসিকতা সহজে বুঝিবার যো নাই।

আমি। হাজতের ইলিকটাই এইরূপ।

কুম্ভ। তাহা হইলে, সর্বদা স-শক্তি থাকিতে হইবে—বলুন!

আমি। অ,—পাকিলে, কিছু ভাল হয়।

জরায়র। একে দুখ, তার উপর তৃণ,—তার উপর এই অমৃত-স্নেহের রসিকতা-লুপ্ত চাটতে আরম্ভ হইলে, প্রকৃত পক্ষেই অসহ হইয়া উঠিবে।

এইরূপ এবং আরও নানারূপ আমাদের কথা-বাণী চলিতেছে, এমন সময় একজন কৃষ্ণ হিন্দু নীচ তাক্সব-হাউসের বড় একটোয়া জলধারার এবং হুটী ছোট-ছোট বটীতে দুই বটা জল লইয়া উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য,—ইহার সঙ্গে সেই জমাদার কনষ্টবল আছে।

চৌধুরা বাহাি থাকুক,—সেই কৃষ্ণ হুটী জলের বটা দেখিয়াই আমার প্রাণ চট্টিয়া উঠিল। আমি তখনই কনষ্টবলকে বলিলাম,—“এ বটীটা জলো-বের হইবে না; আরও অনেক জল চাই। তুমি নীচ গিয়া একটা দূব বড় বটা বা ছোট কলসী করিয়া জল পাইয়া আইস। তুমি বহুদূর পাইবে।”

হাউসিকর। আচ্ছা বাবু! আপনাদের আগে এই জল থান, তার পর আমি আমার জল নিয়ে আসছি।

আমি। তা হবে না। তুমি আগে কলসী করিয়া জল আন, তবে আমার বাইতে যাবি।

হাউসিকর। (হাসিয়া) বাবু! এক কলসী জল আনিয়া কি হইবে?

আমি। (হাসিয়া) কলসী কি? কেবল চকু-লজ্জার খাতির তোমাকে এতক্ষণ জ্বালায় কথা বলিতে পারি নাই—

তখন হাউসিকর আর ব্যাকবোধ না করিয়া, জল আনিতে চলিল। এ দিকে কুম্ভাবু পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। লুচি, কচুরি, কাঁচাপোয়া, রস-মোয়া, অমৃতি,—এ সমস্তই ছিল। একই স্থান পল্লিভাত করিয়া, শালুপাতা পাড়িলাম। কুম্ভাবু পাতেও উপর খেতে সামগ্রী গিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

“আর কিছু দিব কি? আমি বলিলাম, সে আমার অদৃষ্ট, আর আপনাদের হাত-পা।” কুম্ভাবু হাসিয়া আরও কিছু বলেন? তবাবু! অতি অল্পই আহা-র করিলেন। কিছু কুম্ভাবু খয়ং বড় কম দেন।

বোধ হইল, শেষে একই দর্শ হইলে, যেন তাঁহার আরও ভাল হইল। আমি পরম পরিভূত হইয়া,

ব্রত্টিভাং মহিৎ আহা! জিয়া সম্পন্ন করিলাম। আমার পাতে কিছু পড়িয়া রাখিল না। পিপিলিকা-জল কাঁদিয়া প্রত্যাগত হইবার প্রস্তর সর্ব লক্ষণই

আমার পাতে তখন বর্তমান।

আমাদের আহাির যখন প্রায় শেষ হইয়া আসি-

য়াছে, তখন হাউসিকর একটা বড় বটা করিয়া অর্থ লইয়া আসিল। কলসী আনে নাই দেখিয়া তাহার উপর আমার রাগ হইল। “ভাবিলাম, বড় হাউস-কলসে, ঠকাইতে হইবে,—কেবল জল আনিবার জন্য তাহাকে নোচে পাঠাইতে হইবে।”

হাউসিকর হাতে জল লি; হাত মুখ হইলাম। তখন কুম্ভাবুয়ের দ্বার দীর্ঘে সেই ছোট বটা চারি বটা জল উপস্থাপ করিলাম। কুম্ভাবু বলিলেন, সব জলটিই আমি একা গ্লাইবেম না,—আমি এখন

বাকি আছি।

আমি। জলের জন্ত ভাবনা কি? জল যদি সবই মুখ্য, তবে এখানে এই হাউসিকর আমার নোচে দিয়া জল লইয়া আসিবে।

তখন কুম্ভ হাউসিকর আমার মূখপানে চাহিল। এই মাত্র হইবার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে; আবার উপর-নীচে করিতে হইল, তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইবে। তাই, আমি যখন বলিলাম,—“জল যদি সবই মুখ্য, তবে এখানে এই হাউসিকর আমার নোচে গিয়া জল লইয়া আসিবে।” তখন সেই বুদ্ধি-বিকীর্ণপ্রভ

হইয়া আমার মূখপানে চাহিয়া বোধ হয় ভাবিল,—
‘এ লোকটা বলে কি?—আবার আমাকে নীচে
নামিতে হইবে নাকি?’

বুদ্ধ খাড়াই তালুক, আমি কিছু আরও হুই বটা
কল হাইলাম। ‘বুদ্ধের মুখ শুকাইল। আমি হাফি-
হাসি মুখে বলিলাম,—‘বুদ্ধতা! আউর বোডি পানি
কে ওশে? শোটায়ে আউর পানি হুই ত?’

কুক। শোটাও শোটা, সমুদায় গদায় আজ
আপনার কলার কিনা সন্দেহ।
এইবার বুদ্ধ হাসিল। আমিও আর কল কল
করিয়া বুদ্ধকে বিরক্ত করিলাম না।

আহারের পর পান। পানের কি চুপ,—কোথা-
কার চুপ, কাহারও চুপ, কোন জাতীয় চুপ—ইহা
লইয়া প্রবোধ ধানিক তরু উঠিল। তরুর বিশেষ
কিছু মীমাংসা হইল না,—কিন্তু আমার পরমানন্দে
পান চিরাইতে লাগিলাম।

সবই ত হইল।—এইবার কি, বলুন দেখি?
অনেকই ত হু-পতি ত্য্য-মুখিমান,—বলুন দেখি,—
এইবার কি চাই? অনেক গুণ্ডার আছে, এটা
আছে, ত্বর, আছে,—পলিটশান, মেটাফিজি-
শান, মেথোমেটশান আছে—বলুন,—এইবার
এ আন্তমে কাহার মধুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে
হইবে?

সেই যে বেলা ১০ টা হইতে বেলা ৫টা পর্যন্ত
সাত বটা কাল—একটা বারও বার মুখে চুষন
করিতে পাই নাই,—কিন্তু ঐরূপ আহার্য্যির পর
আর কি থাকা যায়? জিনিসটা ব্রিয়ারছেন ত?
ও কি আশ্চর্য্যক!—সে জিনিসটা—তামাক!

তামাক, ইঁক, কলিক, নল।

হাজতে তামাক নাই। আমি তামাক পাই-
লাম না।

তত্বেরোকে বিনা হুয়াং শব্দ বা সুলগ বিনা।
তামাক বিনা নৈব তত্বেতু মন কবিনম্।

তখন প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি যদি কখন
কোন দেশের শাসনকর্তা হই—তবে হাজতে
তামাকে হুবেদোবন্ত সর্বদাও সাধন করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

লালবাজারের লু-খপ।

জমায়ার অল্পখপ পরেই বলিল,—‘আপনারা
আমুন,—আমুন,—আর এখানে বিলম্ব করিলে
চলিলে না। বেলা ৫ টা বাজিয়া গিয়াছে। আর
একই পরেই কয়েকদের গাড়ী হরিণবাড়ী যাইবে।’
কুম্ভাবু বলিলেন,—‘বাইতেছি।’ এই বলিয়া
তিনি পিরিহান পাশে দিবার উদ্যোগ করিলেন।

আমার গায়ে পিরিহান আঁটাই ছিল। আমি
জমাদারকে জিজ্ঞাসিলাম,—‘কয়েকদের গাড়ী কি
রকম?’

কুম্ভাবু বিরক্ত হইয়া ধীর-অস্তুতপরে আমাকে
বলিলেন,—‘এখনি দিয়া সে গাড়ী দেখিতে পাই-
বেন,—তাহাতে চাপিবেন,—তবে আর জমাদারকে
সেকথা জিজ্ঞাসা করা কেন?’

আমি ঐরূপায় এ কথা বেন ভাবিতে না
পাইয়া—প্রবের উত্তর-প্রত্যাহার জমাদারের মুখ-
পানে তাকিয়া রহিলাম।

জমাদার বলিল,—‘সে এক লম্বা গাড়ী,—
ভিতরে শুকরা—দশ-পনের জন বা হুজিজন
কয়েটা তাহাতে একত্ৰ বসিয়া যাইতে পারে। বড়
বড় হুটা বোড়া যোতা আছে।’

আমি। ‘বেন গাড়ীখানি ত?’
জমাদার। ‘আজ যে সকল লোক হাজত
মাইবে, তাহারা সকলে ওজনপ একত্ৰ জমায়ে
হইয়াছে। আপনারা গেলেন, সকলে একত্ৰ সেই
কয়েকদের গাড়ীতে উঠিবেন।’

আমি। চল,—চল,—তবে আর বিলম্ব
কাজ নাই।

আমরা চারিজন আসাী চলিলাম। আমাদের
সমুখে সেই জমাদার—পথপ্রদর্শক;—আর পন্যতে
একজন কনষ্টেবল। যে সিঁড়ি দিয়া সাধারণ-লোক
পুলিশ-আদালতে উঠা-নামা করে, সে সিঁড়ি দিয়া
আমাদের পথ নহে। আমরা হাজত-বাড়ী,—আমা-
দের অস্ত পথে। আমরা জিতলে যে ঘরে বসিয়া
ছিলাম, সে ঘরের দক্ষিণদিকের দরজা খুলিবারাত্র
একটা সিঁড়ি দেখা গেল; সেই ক্ষুণ্ণায় সিঁড়ি
বুজিয়া-ধরিয়া নীচে নামিয়াছে। তাহাতে আলোক
কিছু কম।

কুম্ভাবু কহিলেন,—‘যোগিন বাবু! মজার
সিঁড়ি দেখুন—’

আমি। শুই সিঁড়িতে মজা দেখিলে, হইবে
না,—মজার এখনও ঢের বাকি।

কুক। অজ্ঞ মহা! দেখিতে আমিই কোন্
পন্যাপণ আহঁ!

ব্রজব্রাহ্ম। আপনারা এত কথা বাক্যব্যয় করি-
বেন জ্ঞানিলে, আমি কখনই আপনাদের সঙ্গে
হাজির হইতাম না—

কুক। (হাসিয়া) এখন বাক্য ছাড়া আর
আছে কি যে, ব্যয় করিব?

এইরূপ সেই বন্ধি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামি-
লাম। জমাদার লালবাজার-পুলিশ-দানার এ-দিক
হইতে ও-দিকে আমাদিগকে লইয়া গেল। আমরা
একজন হিন্দুস্থানির সমুখে গাঁড়িহালি। হিন্দুস্থানী
চোবের উপরিষ্ঠ,—সমুখে টেলি। দেখিলাম, তিনি
ইংরেজীতে ভাষায় কি লিখিতেছেন। আমরা
সেখানে গাঁড়িহা-মাত্র, একজন বাঙ্গালী এবং হুই-
স্মিজন হিন্দুস্থানী আমাদের কাছে আসিল। একজন
জিজ্ঞাসিল,—‘মহাশয়! আপনারা বিসেস হাজত
হইল?’ কুম্ভাবু তাহাদের সহিত কথাবাড়া আরম্ভ
করিলেন।

আমার ঠিক পাশেই অজ একজন হাজতের
আসারী গাঁড়িহা ছিল। সে নীচ-জাতীয়, বোধ হয়
জোম হইবে। চেয়ারে উপবিষ্ট সেই হিন্দুস্থানীট
সেই জোমের নাম আপন ভাষায় লিখিলেন। নাম
লেখা হইলে, তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—‘তোমার কাছে
কিছু টাকা কড়ি আছে কি?’ সে বলিল,—‘না।’

হিন্দুস্থানী। ঠিক বলিতেছিল ত?
জোম। টাকা নাই,—এই কয়টা পয়সা আছে
মাত্র।

হিন্দুস্থানী। তবে কেন হুই? আগে বলিগি,
কিছুই নাই?

জোম। আপনি টাকার কথা কহিলেন,—তা,
টাকাত ছিল না,—এই কয়টা পয়সা মাত্র আছে।

হিন্দুস্থানী সেই পয়সা কয়টা লইলেন। জোমের
গায়ে একখানি গামছা-গোছ ছেঁড়া চাদর ছিল;—
সেখানিও তিনি জোমের দ্বা হইতে খুলিয়া
লইলেন। তার পর তিনি জোমের ট্যাক টিপিয়া,
কাছা টিপিয়া দেখিলেন। অবশেষে তিনি জোমের
কোথার কাপড় খুলিয়া জোমের উলমস্ফুট দিরাধপ
করিলেন। পর্ষবেষণ পরিসমাপ্ত হইলে, একজন
কনষ্টেবল তাহাকে একটা ঘরে খুলিয়া ঢালা দিয়া
রাখিল।

আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। কুম্ভাবুকে
বলিলাম,—‘নূতন মজা উপস্থিত। এখনও কি
রহস্ত তেজ করিয়া উঠিতে পারি নাই?’ ঐরূপোহা
রায় বলিলেন,—‘কাল আমাকেও ঠিক কি রকম
করিয়াছিল। আমার গায়ের পিরিহান চাফ
খুলিয়া লইয়া, এমন কি হাতের মাহুলিটা পর্যন্ত
খুলিয়া লইয়া,—সমস্ত রাত্রি এই ঘরে বন্ধ করিয়া
রাখিয়াছিল। এই শরটার দাক্ষন হুগ্গকে আমার
বাহে একবারও ঘুম হয় নাই।’

কুম্ভাবু সেই বাঙ্গালী-বাটুককে জিজ্ঞাসিলেন,
‘মহাশয়! এ শরটা কি?’

বাঙ্গালী। এটা পুলিশ-লুক-অপু। এটা
একটা ক্ষুদ্র হাজত। এখানে কয়েকগণ ২৪ বটা
বা একবারের জন্ম থাকিতে পারে। কয়েকদে
গাড়ী আনিবার এখনও আধ বটা বিলম্ব আছে,—
আপনাদিগকেও এই ঘরে আধ বটার
খানিতে হইবে।

কুকচর। পিরিহান, চাদর, টাকা, পয়সা,—
সমস্তই এখানে রাখিয়া যাইতে হয় কেন?
বাঙ্গালী। ইহাই নিয়ম। আমার হরিণ-
বাড়ীর হাজতে যাইবার সময়—এ সমস্তই আপনারা
স্বেরত পাইবেন।

কুক। ঐরূপ উলঙ্গ করিয়া কাপড়-কাছা-
লইবে ত?
বাঙ্গালী। না,—আপনাদের কাপড় খোলা
হইবে না।

‘চোবের উপবিষ্ট হিন্দুস্থানীর আদেশমত প্রথমতঃ
কুম্ভাবুই জোমের পিরিহান, চাদর খুলিয়া কেলি-
লেন। পাঁচটে তাঁহার ৫০০ টাকা ছিল, তাহা
লইয়া তিনি হিন্দুস্থানীর হাতে দিলেন। হিন্দুস্থানী
বলিলেন,—‘আপনার ডান হাতে যে মাহুলি কয়েকট
আছে, তাহাও দিতে হইবে।’

কুক। মহাশয়—ঐশ্বর্য্যরূপ,—ডবলানের
চিহ্নস্বরূপ—উহাও কি দিতে হইবে?

হিন্দুস্থানী। কি করিব ব্যা?—উহাও নিয়ম।
তখন কুম্ভাবু, নিজস্ত আনিচ্ছাসকেও, সেই
মাহুলী কয়টা খুলিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন,—
‘দেখিলেন, মাহুলি’ যেন না হারায়?’ হিন্দুস্থানী
উত্তর করিলেন—‘না, ব্যা!—বাহাইবে না,—আমি
বন্ধ করিয়া রাখিব।’ কুম্ভাবুকে দিবার দিবার সম
তিনি আর একবার জিজ্ঞাসিলেন,—‘বাবু! আর
কোন জিনিস আপনার নিকট নাই ত?’

কুম্ভ। না।
হিন্দুস্থানী। যেখানে,—ইহার পর, কোন জিনিস যদি আপনার নিকট হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে, মুক্তিলাভ করিবে।

কুম্ভ। কিছুই না—তবে সন্ধ্যাহিকের জন্ত এই দুই আঙ্গুর দুইটা তার-আটাই আছে—একটা আটটা সোণার, অপরটা রূপার। প্রত্যেক-পক্ষেই দুই আটটা নয়—সোণার ও রূপার তার জড়ান মাত্র।

হিন্দুস্থানী। ও তার-আটটাও যে, বুলিয়া দিতে হইবে।

কুম্ভ। বলেন কি? তবে সন্ধ্যাহিক করিব কিরূপ?

কমলাটা-বাগুটা তখন একটু বিবাদের হাসি হাসিয়া কুম্ভাবরকে বলিলেন,—“মহারাজ! হাজতে আবার সন্ধ্যাহিক কি? ধর্মকর্ম? এখন মাথার রাগুন। এ যমালগের নিয়ম বড় শক্ত নিয়ম!”

এইবার কুম্ভাবর দুখ হুকাইল, চোখ জল জল করিতে লাগিল। তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। বামহস্তের দ্বারা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি হইতে সেই তার-অঙ্গুরী দুইটা বুলিয়া হিন্দুস্থানীর হস্তে অর্পণ করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

তার পর আমার পাঁচা আসিল। আমাকেও বিবদন করিয়া—গিриহান লইল, চারপ লইল, শড়ী লইল,—লইল না কেবল বুজধানি। আমি তখন সভাপদের একরকম পুরুষ-দ্রোণী সাক্ষিরা দাঁড়াইয়া বহিলাম।

তরবার এবং অঙ্গুর, ব্যাপার দেখিয়া; আপনা হইতেই জানা বুলিয়া বাখিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানী চাহিকামাত্র, তাঁহাদের বান ভূষণ পাইল।

যে বরে পূর্বে সেই ডোমটা চুকিয়াছিল, তখন কুম্ভাবরের চারি মূর্ত্তিকে পাওঁর সেই বরেই প্রবেশ করাইল। প্রতিটি হইয়াবার, একজন কনটল সেই বরে ঢাবি দিয়া চলিয়া গেল। আমি তখন অনিমেষ-গোচনে সেই কনটল অঙ্গুর পোতা নিরীমক-পরিচয় লাগিলাম। প্রথম কেহেই, মানব-মূর্ত্ত-বিচার নব্বু-নব্বু গরম-গরম গন্ধ নাসারঞ্জে আগমন করিতে আরম্ভ করিল।

অঙ্গুর বলিল, “হুগন্ধ পাইতেছেন কি?”

আমি বলিলাম, “কে?”

কুম্ভ। কে, কি?—একটা আঙ্গুরে টান্‌মে

হুগন্ধ উঠিয়াছে,—এখানে মানুষ-তিষ্ঠিত পায়ে না;—আর আপনি বলেন,—“কে হুগন্ধ?”

আমি। গন্ধ আছে বটে,—কিছু হঠাৎ হইয়াছে হুগন্ধ বলিল কেন? ছয়মাসের পূর্বা সোনা-ইলিশ মাছে এক রকম গন্ধ হয়। কাহারও নিকট সেই গন্ধ, হুগন্ধ; কাহারও নিকট তাহা, হুগন্ধ। মগদের নৈপির গন্ধ, কাহারও বা আমার অগ্র-প্রাশনের অর পর্ণাৎ ঘনি হইয়া যায়;—কিছু সেই নৈপির মগদের উপাদেশে আহার। এ দিকে ঘৃত আশনার গন্ধে অতীব সং-আহার; কিছু সেই ঘৃতের গন্ধে ব্রহ্মদেশের অবিবাসিণ পাপল। ইহাদেরই হুগন্ধা ‘মার্ডিন’ টা কি? দূরে থাকিলেও আপনাকে নাক কাপড় দিতে হইবে। তাই বলিতেছি, এই হাজত-ঘরের এই গন্ধটিকে (হুগন্ধ না বুলিয়া) একবার অল্পম ময়িকা ফুলের গন্ধ বুলিয়া মনে করুন না কেন?

কুম্ভ। (হাসিয়া) আপনার ভ্রাতা আমার এখনও ভক্তজ্ঞান হয় নাই।

আমি। হাজতে যদি হুগন্ধ-স্বল্পে বাস করিতে চান, তবে তত্ত্বজ্ঞানের কিছু আবশ্যক হইবে।

কুম্ভ। আমি এখনও সে জ্ঞানের অধিকারী হই নাই।

আমি। হইতে চেষ্টা করুন।

তরবার। আমার হইজনে বকিতে আরম্ভ করিলেন!!

আমি। ইহা বকাবকি নাহে,—তর্ক-বিতর্ক। পশ্চিমদেশ হইতেও শাস্ত্রীয় ঘালাপ করিয়া থাকেন।

এ আলাপ স্বরেও চলে, বাহিরেও চলে, কেবলুনে উঠিয়া চালা চলে, হাঁজতেও চলে।

এমন সময় অরুণোদয় রায় বলিল,—“দেখুন,—ঐ সমুদ্রে দেখুন, দুইটা পাইখানা খোলা রাখিয়াছে। কয়েকদিনের পূর্বেই শৌচ-প্রসঙ্গ তাহা করিতে হয়,—বাহিরে যাইবার নিয়ম নাই। কল্য যখন আমি প্রবেশ এই বরে চুকি, তখন আমি একা ছিলাম; তার পর ত্রমশ দুইজন-চারজন করিয়া লোক জমিতে গারিল। রাত্রি দশটার সময় আরও আট-দশ জন হইল। রাত্রি তের সময় আরও কয়েকজন লোক আসিল। ইহারের মধ্যে কেহ পূর্বা মাতাল, কেহ অর্ধ-জ্ঞান; কেহ যদি করিতে গারিল, কেহ বহির্ দ্বারিতে আদম্ব করিল; কেহ রাড়িয়া মূর্ত্তাভাষ করিল। কেহবা উলঙ্গ হইয়া

পড়িল। সে এক বিভীষণ বিতর্কিত্য ব্যাপার। ‘ফাল অনেক করে এখানে আমি রাত কাটিয়াছি।’ আমি অঙ্গুরের কথার কোনও উত্তর না দিয়া, কুম্ভাবরকে কহিলাম,—“এ কেমন বর,—পড়ত-সই বটে ও?”

দেখিলাম, তরবার নাকে কাপড় দিরাচ্ছেন। তরবারকে বলিলাম, “হাজতে নাকে কাপড় দেওয়া নিষিদ্ধ।”

আমার কথার কেহই কোনও উত্তর দিলেন না।

ঘরের মেঝেটা সমুদ্রে ভিলে, ঘেন জল ‘উঠিতেছে।’ ঘরে দুখানি পাচা-ছোট বড় বড় তক্তাপোষ পাচা আছে। একখানিতে মাত আট জন হাজতের আসামী বসিয়া বহিয়াছে; অন্য খানিতেও দুইজন আসামী বসিয়াছিল। কিছু আনবার ঘরে চুকিয়াবার ঐ দুই ব্যক্তি প্রথমখানিতে বসিয়া বসিল; তাহার। আমাদের জন্ত গোটী এবং গিরা তক্তাপোষ ছাড়িয়া দিল।

তক্তাপোষে বসিতে গিয়া দেখি, তাহা দুখানি পরিপূর্ণ; তাহার একখানে বাসিন্দা গয়েরও আছে। সমুখ-তাপটা একটু ভিজা,—বোধ হয়, জল পড়িয়াছিল।

কুম্ভাবর আমাকে বলিলেন,—“আপনার ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, আপনি শিল্প আয়ে তক্তাপোষে বহুন,—আমরা একটু পা-চালি করিয়া বড়াই।”

প্রথমত অঙ্গুর এবং আমি, সেই মনোমোহন তক্তাপোষে উপবেশন করিলাম। আমি অঙ্গুরকে জিজ্ঞাসিলাম, “হাজতে কি বাসিণ-বিজ্ঞান দেয় না?” অঙ্গুর সে কথার উত্তর দিতে না দিতে কুম্ভাবর বলিলেন—হী, জ্ঞানদান একদিন ত্রিকিমে-বালিস, তোষক-গদা দিবে, আর শুওড়িতে তামাক সাক্ষিরা আনিয়া সমুখে বসিবে।

আমি তখন বৃষ পঞ্জরাত্তরে বলিলাম,—“ভাবি-বেন না,—মহা-জীবনে সকল রকম শিকাই আর-শ্রম। আমি এইরূপ শিকাই চাই।”

কুম্ভ। যাহা চান, তাহাই পাইয়াছেন;—কোন হুগন্ধ উত্তর নাই?

আমি। না।

সেই বরে বড় বড় দুইটা জানালা আছে; তাহাতে মোটা মোটা লোহার রেল। বাহির দিক হইতে এক ব্যক্তি সেই রেল মুখ সমুদ্রে করিয়া কুম্ভাবরকে বলিল,—“মহারাজ! এই কলধাখনি

লউন,—আপনার তক্তাপোষে পাত্তিয়া বহুন।” তাহার কথামত কুম্ভাবর সেই লৌহ-রেলের কাঁক দিয়া ত্রমশ হইখানি কল ধিতরে আনিলেন। আনিয়া, আমাকে বলিলেন,—“আপনি উঠুন,—এই কল ধা পাত্তিয়া।” আমি বলিলাম,—“আমি যখন বসিয়াছি, তখন আর উঠিতেছি না।

কুম্ভ। ঐ ত আপনার দোষ। বলিলে আর উঠিতে চান না। চিরকাল আমি এই একই রকম দেখিতেছি।

আমি। “যখন জানেন, আমার সে দোষ আছে, তখন আমাকে উঠিতে বলা কি আপনার দোষ হয় নাই?”

কুম্ভ। স্বকাম্যি করিয়াছি,—আর বলি না।

সমুদ্রে তখন সেই কাঠগদনের অঙ্গুর ‘দিকে একখানিমাত্র কল পাতিতে মনোহ করিলেন। কিন্তু সে দিকে বিশেষ পরবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—সেই-ওগদনার-তথুগত গয়ের।

এদিকে আমি অঙ্গুরকে টিপিয়া লিলাম,—“তুমি এ স্থান হইতে উঠিও না,—খোখা ধাক্কা, কুম্ভাবর কহে।

কুম্ভাবর সেই গয়ের দেখিয়া নাক-মুখ নিট-কাইলেন। তখন তিনি কলধাখনি লইয়া মহা-বিরত হইয়া পড়িলেন। এক একবার আমার মুখ পামে তিন চাহেন, কিন্তু কোন কথা কহিতে পারেন না।

আমি তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম,—“কুম্ভাবর! চিরকাল আমার একই রকম! এখন আর কথার কাজ নাই;—আহুন, কলধাখনি পাতুন, বহুন।”

কল পাটা হইল,—আমরা তাহার উপর বসিলাম। বসিয়া আমি বিচার করিতে লাগিলাম,—কল ধরা বেশী, কি তক্তাপোষে ধরা বেশী? কল ধরা এখন হুগন্ধে আছি, না, তক্তাপোষে তখন হুগন্ধে ছিলাম? যৌমাংসা কিছুই হইল না। হইবে কেমন করিয়া? কেমনা, কোন কোন বিষয়ে কল শ্রেষ্ঠ, কোন কোন বিষয়ে তক্তাপোষ শ্রেষ্ঠ।

এইরূপ বিচার-বাক্তি করিতে হইলে, ত্রম-বসুকে জিজ্ঞাসিলাম,—“তুমি মহা কেমন?”

তরবার। এখার মহা যৌমাংসা। আচ্ছা,—

হরিণবাটার হাজত কেমন?

আমি কলধাখনি হরিণবাটার হাজত না দেখি-

লেও, জ্ঞানবলে বলিলাম,—“এ হাজতও বড়

মুখে আছে; হরিণবাড়ীর হাজত ইহা অপেক্ষা
নতুনকৈ বারান।

তরবার। বলেন কি ?
আমি। বাহা সত্য, নিত্য তাহাই বলিতেছি।
বড় তক্তাপোষাখানিতে যে কয়েকজন বসিয়া
ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, “না,
মোমাই।” সে হাজত ভাল। তাহার আলাহিরা
হৃদয়বস্ত।

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় একজন
প্রহরী হাজত-বরের কপাট খুলিয়া, বরে প্রবেশ
করিল। সে আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিল,—
“আপনারা বাহিরে আইন।”

“বাহিরে আইন”—এই কথা শুনিমাত্র সকল
আসামাই উঠিয়া ঝাঁড়াইল। প্রহরী বলিল, “না,
না—তোমরা নও—কেবল বহরসারি চারিজন
বাকুকে বাহিরে আসিবার হুকুম হইয়াছে।”

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, “আমরা নই
কেন ?” প্রহরী রুদ্ধস্বরে উত্তর দিল, “সে কথা
আমি জানি না—তোমরা বসিয়া থাক।”

বাহিরে হইবার সময় আমি আর একবার পূজা
কিরিয়া চাহিয়া, সেই বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-
লাম। মনে মনে বলিলাম,—“যে লালবাজারের
নিমন্তনের পশিম-লক্ষ-কপু। তোমার তুলনা নাই।
তোমার যিটার নাই।

বু! তোমার তুলনা ভূমি এ মহিমাগুলে।”

পঞ্চম অধ্যায়।

হরিণবাড়ী বাড়ী।

হুকুমদেবের মৃত্যুর সময় মহাবীর অর্জুন-একবার
শ্রাণস্রাণ করিবার প্রতীক্স করেন। অশ্রুস্রাবী
অশ্রুস্রাবী শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে বেহতাবে কৃতসঙ্কল্প
করিয়া, কেশেদে অর্জুনের প্রাতি উপদেশ-বাক্য
কহিতে লাগিলেন,—“দেখ, পার্থ। মৃত্যুই যদি
ভূমি বিস্তারিত করিয়া থাক, তাহা হইলে এক
কর্তৃক কথা আশ্ব-প্রশংসা মৃত্যু-ভূম্য। ভূমি আশ্ব-
প্রশংসা কর, তাহাই তোমার মরণময় হইবে।
এখন ভোগ-দেহ পরিভ্রমণের কাল তোমার উপক্ৰান্ত
হয় নাই; অতএব এক্ষণে ভূমি আশ্ব-প্রশংসাকার
মৃত্যুকে আশ্রয় করিয়া, তোমার প্রতিজ্ঞ
পালন কর।”

শ্রীকৃষ্ণের কথা অর্জুন তাহাই করিলেন।

অর্জুন বলিতে লাগিলেন,—“আমার সমান বীর
পৃথিবীতে আর কেহই নাই। দেব-ঈশ্বর-নরক-
মধ্যে এমন কে আছে যে, আমার অন্তবেদ সম
করিতে পারে ? ইহা-কেন-বাহু-বরণ-কবীর-হত্যাদিও
আমার শৌর্যবীর্য সেবিয়া বিমিত-স্তুতি হইয়া
থাকেন।”

এইরূপ এবং অন্তরূপ আশ্ব-প্রশংসা করিয়া
অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—“প্রভু। আপনি সত্যই
বলিয়াছিলেন। আশ্ব-প্রশংসা মৃত্যুভূম্য, অবশ্য
মৃত্যু অপেক্ষা কিছু অধিক।”

আমার হৃৎ স্রোতের সহিত পরিচয় আছে,
তাহার মধ্যে অন্তত অর্ধেকাংশ ব্যক্তি, সত্যত আশ্ব-
প্রশংসায় নিরত,—ইহাই আমার ধারণা। স্পষ্টত
না হউক, অন্তত মনে মনে সদাই তাঁহার আশ্ব-
প্রশংসা-ধামান রাখিতেছেন। এ ধারণা হয়ত আমার
চল হইতে পারে, কিন্তু ইহাই আমার ধর্ম ধারণা।

কিহি বিনোদিনীও ভাবেন, “আমার গ্রাম হুগুণা,
সরলহলধন্যপ্রাণী, সরলহৃদয়ী কামিনী বুলি
আর এ ধারণাকে জয়গ্রহণ করেন নাই। তবে
এই বৌদ্ধা বলিয়া লোকে আমার কিঞ্চিৎ অপবাহ
রটায়। চন্দ্রেই কলক স্থপরিভূম্যমান হয়।”

শ্রীমতী শেখন-হাসি মনে করেন, “আমার বড়
তত কহু না হউক, কিন্তু আমার মুখশ্রী বেরূপ
চমৎকার, তাহাতে আমাকে পরীক্ষাতীর্থ বলিলে
অত্যাচি হয় না।”

মহিলাগর পটী ও পুন্ডার বকে প্রবাস হইতে
বাটী আসিয়া বলিতেছেন, “সেখানে আমি যখন
যেডগাড়ী হইতে নামিয়া সেবার জতিমুখে বাই-
লাম,—তখন চুপচাপ সকল লোক, আমাকে সেখিয়া
বলিত,—ঐ মাতিবতী আসিতেছেন,—ঐ মাফা-
জগজগতী আদ্যাদিক আসিতেছেন।” জগজগতী
মাফাভূম্য। মাংসপিণ্ডের মূঢ় পাষাড বলিলেও
অত্যাচি হয় না। পেটীটা ঢাকাই জালা, মুখখানি
এক মহামালায়। এই ভগবতকে যদি বেরো-
টোপের ভিতর রাখিয়া, বরের দ্বারে বসিয়া বকী
বাক্যইয়া ইকা যায়,—এক অন্তত মনুষ্য,—টান-
সেকী অসুপরি জীব,—এক পয়সা,—এক পয়সা,—
“জীলো,—জীলো,—পৃথিবীতে এমন নাই,—
আইদ,—আইদ,—দশনী এক পয়সা মাত্র।”
—তাহা হইলে, বোধ হয় পয়সা রাখিবার বরে হাম
হয় ভা।

‘দন্তেব্রী শ্রীশ্রীমতী নগেন্দ্রনন্দিনীর রূপের কথা
কিহিবলি হাইবেল হয়। তাঁহার উপর-পাঠের
সমুদয়ের ভিত্তি ঠাঁত বাহির হইয়া আছে। যখন
তিনি তাঁহার ঐ দন্তেব্রী গবের চর্চ সম্প্রসারিত
করিয়া বহুদূরে চাকিতে চেষ্টা করেন, তখন লজ্জায়
শরকবুদ্ধের মনে হয়,—‘পৃথিবী। ভূমি হৃৎকল-দাঁত,
আমরা তাহাতে চুকিবে।’ অথচ ঐ দন্তেব্রীই
বলিয়া বেড়ান, “আমার নব-লাভ্য আর
কাহারও নাই। চক্ষু নয় ত, ঠিক বেন পরপাশ
শোভান,—কতী নয় ত, ঠিক বেন স্থবরাজ জিনি
মাঝ—নাগিকা নয় ত, ঠিক বেন মদনমোহনের
মোহন-বীরী।”

পুণ্য জাতির মধ্যেও, এই ভাব দ্বিগুন-মাত্রায়
মা হউক, অন্তত সমভাবে হুগুচরিত। পরায়ণও
ভাবেন, “আমার গ্রাম হুগুগু পুণ্য সমসরে আর
কেহ নাই,—এমন সখিয়ান কেহ নাই, এমন সাহিত্য-
বিগুকেহ নাই।” নামের পর ভেঁটি কাটিয়া, গয়্যাম
বহন আরম্ভিতে মুখ দেখেন, তখন তিনি মনে মনে
নিশ্চয়ই লেন,

“কে বলে শারদ-শশী এ মুখের তুল।”

পদে নখে পড়ে নোর আছে কতলা।”

পরায়ণ এদিকে বাড়োমো জড়িত,—পাতলা
ছিপিলে; রঙী দানসিদ্ধকরা হাড়ির জগদেব-
বিনিমিত। মুখে বহুবিধ সেবা দিউক, আর নাই
দিউক,—মুখের পর ধূলাগালি পড়ুক আর নাই
পড়ুক,—পরায়ণ কিন্তু সদাই একখানি রম্যাল
নয়ী মুখ মুছিতেছেন।

এইরূপ আশ্ব-প্রশংসা-ধামান অনেকেই করিয়া
থাকেন। কি ছোট, কি বড়, কি মাঝারি,—স্পষ্টই
হউক, আর অস্পষ্টই হউক,—সাধারণভাবেই
হউক, আর নিরাকারভাবেই হউক,—অধিকাংশ
ব্যক্তি মধ্যে সদাই গুণগুণ-সুগুণ-গুণে এ আশ্ব-
প্রশংসা-ধামি চলিতেছে।

অথচ আশ্ব-প্রশংসা মৃত্যুভূম্য। মায়ার-বশে
মায়ুষ সদাই আশ্বাভ্যাসী।

অব্য আমি একই আশ্ব-প্রশংসা করিল। অর্থাৎ
যে কথা বলিলে সাধারণ লোকে “আশ্ব-প্রশংসা করা
হইল।” টানী করে,—সেই কথা আমি (নয়দেপে)
বলিব। এই হাজত-বাসের হুকুম হওয়ার দরুন
আমার কষ্ট বা দ্রুত কিমাত্রায় হয় নাই,—বরং
অধিকন্তর আনন্দ এবং স্কৃতি-ইহাঙ্গলি।

সু্যাব-চক্রে আমার ঐ কথাটা আশ্ব-প্রশংসার
হয় না।

কথা। কেননা, ইহাতে হয়ত এই ভাব প্রকাশ করা
হইল,—“আমি ভাতীর বীর পুণ্য, মানসিক কল
আমার অপরিমীম, বিপদে জরুপ নাই, কারাবাসে
ভয় নাই, হৃৎ-হৃৎ সমভার, পঙ্ক-চরন আমার
পক্ষে এক, আমি একরকম জীবদ্রুত পুণ্য।”

আশ্ব-প্রশংসা যদি মৃত্যুভূম্য, তবে আমি
আশ্ব-প্রশংসা করি কেন ?

প্রকৃত পক্ষে আমি আশ্ব-প্রশংসা করি নাই।
তবে লোকে তাহাকে আমার ঐ কথা আশ্ব-প্রশংসার
সূচক বলিয়াই, আমিও উহাকে “আশ্ব-প্রশংসা
বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।” হাজতের হুকুমে
আমার কষ্ট হয় নাই, বরং স্কৃতিই হইয়াছিল,—
এ কথা আশ্ব-প্রশংসা হইবে কেন ?

সেখানে জগলোকের বরের স্রীলোক টাটক
শ্রীকৃষ্ণের বাহিনে; তাঁহার পা মূলিত, পা কাটিয়া
কৃষ্ণবর্ণা নির্গত হইত; সেই বেনা-জন্মিত তাঁহার
কষ্ট অধিক হইত,—না, শ্রীশ্রী জগদাধিপতি-অভি-
শায়ে শরদেব অধিক হইত ?

কষ্ট শ্রুতির অর্থ বুঝা বড় কঠিন। এই রেন-
গাড়ীতে বাগা—বিশেষ ঐ ব্রহ্মেতে বাগা—বড়
কষ্টকর। টিকিট কেনার কষ্ট, গাড়ীর ভিত্তি ভিত্তি
কষ্ট, গাড়ীর ভূতভানি-শলে কামের কষ্ট, গাড়ী
দোশাগ শরীরের কষ্ট, এজিনের কলাইচি আমিয়া
গাড়ীর চেয়ের কষ্ট। অন্তরে অবধি নাই। কিন্তু
শনিবার দিন-টোর গাড়ীতে বাহি হইতে ইহঁবে।
রেলপটী-অভিমুখে হন হন ছুটিয়াছি। গাড়ী
“পুট্রি হেয়, পাইলে হয়,—তখন ইহাই কেবল এক-
মাত্র চিন্তা। দূর হইতে যখন দেখিলাম, টেন-
প্লাটফর্মে ওটার গাড়ী সালম আছে, তখন মনে
যে কতই অপরিমীম আনন্দের উপর হইল,—তাহার
ইহাতে কে করিবে ? আমার বহন টিকিট কিনিয়া
গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, তখন একবার আঁকো
নিভোল হইয়া মনে মনে বলিলাম,—“আ-
বীচিলাম।—আজ অগুণ কতই না হুগুসম।”

উদ্দেশ্য মুখিয়াই অনেক সময় বিবরের ভাল-
মন্দ শ্রীরীকৃত হয়। হুগুপান দোষ; কিন্তু উভাবার্থে
হুগুপান বস্তু আছে। জৌহুয়া দোষ; কিন্তু
হুগুপ পণ্ডনের বস্তু আছে। স্রী-চিহ্ন এবং পু-
চিহ্নের প্রতিমূর্তি অকোণ অধিক হইলে তাহা
দুশীর্ণ, কিন্তু চিহ্ন-সমাগ্রে তাহা হুগুপরি
এবং হুগুপকৃতিভাবে অধিক হইলেও দুশীর্ণ
হয় না।

“হাজতের হুকুমে আমার কই হয় নাই, বরং আমার হৃদয়ই ছিল”—এ কথা যদি আমি আত্ম-প্রকাশনার উদ্দেশ্যে না বলি, তবে আমার সেসই হৃদয়ে কেন? উদ্দেশ্য নইয়াই ত কথা। উদ্দেশ্যই আসল জিনিষ।

সাধারণত আত্মপ্রকাশের ব্যতিক্রম-রূপে অপেক্ষাকৃত অস্বাভাবিক কিছু কম। যখনই আত্ম-প্রকাশের অভাবের জন্মে, তখনই বেশি অস্বাভাবিক লোক আমা অপেক্ষা বড়—অস্বাভাব্য শৈল্পিক আত্মপ্রকাশ দীর্ঘকাল উন্নত এবং বলাবলাই; আমি ক্ষুদ্রবাহু—তাঁহাদের নিকট পিশিগিরিও প্রতীতমান—তাঁহাদের বাম-পাশের কলিতা-সুনের নথের নিকটও থাকিবার মেয়াদ নাই। এইখানেই আমায় আত্ম-প্রকাশের অভাবের সমুদায় নির্ণয় হয়। অস্ত্রের সহিত ফুলার প্রকৃতই আমার মনে হয়—আমি মূর্খ, অক্ষম, অকৃতী। এ শেরে-সমরার-ভক্তের আমি কি জানি, ঐকি বুঝি। দূর্ব্য উভয় হয়, শব্দ্য হইতে উঠি, বানাহার কুরি, পুসার জাবনা তাবি, আর বাচীরা থাকি। তারবাহী হুস্তে আমার আত্মপ্রকাশ কি?

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হাজতের হুকুমে আমার কই হইল না কেন? কেহ মনে মনে না করেন, আমি সৈবশক্তি-সম্পন্ন, অথবা সিদ্ধপুরুষ—তাই হাজতের হুকুমে আমার কোন কই হয় নাই।

এমনও কেহ যেন মনে না করেন—আমি রাজ-নীতিক আদমী, যবনের জন্ত আত্মপ্রকাশ বলি দিতেছি, অতএব কারাবাসেই আমার আনন্দ, মৃত্যুতেই আমার হৃদয়। বলা বাহুল্য, আমি দশম-হিতৈষী-জাতীয় নহি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উপর-প্রণয় প্রেম, অনন্ত উদারতা, বুক চিরিয়া রক্তপান, আত্ম-প্রাণ বিসর্জন—এ সকল উপসর্গ আমার কই

তবে হাজতের হুকুমে আমার কই হইল না কেন? বাসে বাসক না হইলেও, আমাতে এখনও ক্রিষ্ণ-বাসক আছে। আমি এখনও আমোদগম, নন্দন-প্রিয়। নৃত্য দেখিষ, নৃত্য নবন, নৃত্য করণ করি—ইহাই আমার জীবনের সার। হাজত কখন দেখি নাই, হাজতে কখন বসবাস করি নাই—অতএব হাজতে মজা একবার, থাকিবেই হইবে। পাণ্ডিত্যের পরমা ধরত কল্পিয়া, শিল্পিগণের মজা, সিনচল-পর্বতের মজা দেখিয়াছি; আর আজ মর-কারি পাণ্ডিত্যে চাপিয়া বিনা ব্যয়ে হাজতের মজা দেখিতে পাইব—ইহা কি কম আনন্দের বিষয়।

আমি এক কথা। আমি কোটী দেখিতে ক্রিষ্ণ-কিৎ জানি। মোকদ্দমা দায়ের হইবার পূর্বেই আমার কোটী নিজে বিশেষরূপে দেখিয়া, এবং অস্ত্রের দ্বারা বিশেষরূপে দেখিয়া সুক্ষ্মজ্ঞানী,—উপস্থিত বিপদপাত্রে কোনও সম্ভাবনা নাই। গোচরে হই একটী গ্রন্থ বিরক্ত থাকিলেও, বিশেষ অন্তিষ্ট ঘটনার কোনও কারণ স্বর্তমান ছিল না। স্বর্ণশেখি রাখা আছে, কোটীতে রাখা আছে—হুস্তাও মনোমধ্যে ভয়ের উদ্ভা এককালেই হয় নাই।

আরও এক কথা। মনে পাপ ছিল না। রাজকোষেরে হুস্তান। আমার কখন কই নাই। ইংরেজ-রাজ্য লয়প্রাপ্ত হউক, কুম-রাজ্যের উন্নয়ন হউক, অথবা আমরা স্বাধীন হই,—এ সব কথা কখনও আমার আশা নাই। আমরা রাজত্ব; ইংরেজ-রাজ্যের ভারতে স্বাধিত্য কামনা আমার বরাবর করিয়া আসিতেছি। এক্সপ রাজত্বিক-হুচক অন্যান্য পঞ্চাশটি প্রবন্ধ বঙ্গবাসীতে সরিয়েনিত আছে। মল্য কল্য, প্রকৃতপক্ষেই মনে কোন পাপ ছিল না। তাই এর ধারণা ছিল—মোকদ্দমায় আমাদের কিছুই হইবে না।

হুস্তান এক মুহূর্তের তরেও হাজতের হুকুমে আমার ভয় হয় নাই; বরং অস্ত্র কারণে মনে অপার আনন্দ উদ্ভূত হইয়াছিল।

বলা বাস্তবে আমার অনেক সময় অভিযাহিত হইল। আসল কথা কেহ ভুলিয়া যান নাই ত? একজন কলকাতা গিয়া লালবাজারের সেই লক্স-অপ হইতে হুস্তান আমাদের চারিজনকে বাধির করিয়া আনিল। বাহিরে আসিয়া দেখি, যেন জামাই-আদার। আমাদের জন্ত হুস্তানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গম্বুসে জুড়িয়াগা প্রদত্ত। যে বিশ্বাসীমিতর গম্বুসে আমাদের কাপড়-চোপড় টাকাকড়ি ছাড়িয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার নিকট হইতে তাহা আমরা নলয়াম। আমার দিয়া বেশকিছুয় ভূষিত হইয়া “বাবু” মাঝিলাম। আমার সঙ্গে সেই ভাঙ্গা খড়ী আমার বগামানে সরিয়েনিত করিলাম।

কুমাবু বলিলেন,—এবার নয় কিছু বেশী দেখিতেছি—পরমেষ্টের উপর আমাদের রক্তজ হওয়া উচিত। চোর বুনে, ডাকাইত আমাদিগের সঙ্গে একপাড়িতে যে, আমাদিগকে হরিণবাড়ী হাইতে হইল না, ইহা এক বিশেষ সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে।

আমি বলিলাম,—“আপনি বাহা বলিতেছেন, ত্রাছা হিক। রাজার ও অনুরোধ আমাদের সন্তত স্বরণ থাকিবে। কিন্তু বলিতে কি, আমার মনে এক বড় কোঁত রহিল। কলকাতার স্বত্বকারায় লগাখাড়াটা কিরূপ, তাহা ভিতরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম না।”

কুমাবু হাসিলেন। আমি এবং অরুণোদয় একধালা গাড়ীতে বসিলাম। অপর থাকিত ত্রাছাবু ও কুমাবু বসিলেন। একজন দেশী-কনষ্টবল গাড়ীর কোচবাসে বসিল—এক পোরা-কনষ্টবল গাড়ীর ভিতর অরুণের সহিত একত্র বসিল। আমি একা গাড়ীর একদিকে রহিলাম। গাড়ী হরিণবাড়ী-অভিমুখে ছুটিল।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

পাপ ও পুণ্য।

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি? বুঝায়ে দিবে কি কেহ, ঘূচাইবে এ সন্দেহ, তবিরে কি মধ্য করে কথা ছুই চারি। আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি? পাণ্ডা বলে পায় ঠেলে, ঘুরায় দিও না ফেলে, সত্যই এ প্রাণভরা শাশয় আমারি। আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি? কি চেয়ে থিরা জড়, এই বিশ্ব চরাচর, ক্ষুদ্র কি বৃহৎ অংশ সকলি তাহারি। আমি কেন ভিন্নভাষা বুঝিতে না পারি?

তারে ছাড়া কিছু নাই, সকলি তদয়, যদি কিছু থাকে আর, সবছা থাকিবে তার, দ্বিতীয় স্বজনকর্তা কেন মনে লয়? তারে ছাড়া কিছু নাই, সকলি তদয়।

তারে ছাড়া কিছু নাই, সকলি তদয়, জান-জানো-জাতা তিন, স্বজন-পালন-লীন, বর্তমান-অনাপত্ত-অতীত সময়, তারে ছাড়া কিছু নাই, সকলি তদয়।

তারে ছাড়া কিছু নাই, সকলি তদয়, কারণে থাকে সে জন্মে, কার্যে জ্ঞানরূপে বুঝে, জটাই শিল্পি বৃহৎ মধ্য পরিভার। তারে ছাড়া কিছু নাই, সকলি তদয়।

ইচ্ছায় গড়িল বিশ্ব নিজে ইচ্ছায়, অস্ত্র উপাদান তার, আপো ত ছিল না আর, কাজেই অশিষ বিশ্ব সেও ইচ্ছায়ময়; বাহাতে রচিত বিশ্ব সে কি বিশ্ব নয়?

সে আমি অস্ত্রের যদি একই উভয়, তার কাজে কবে তবে, অমঙ্গল নাহি কবে; অনন্ত স্থল তার আপূর্ণ প্রকর। পিপীলিকাবৎ মম কেন পাপ হয়?

সে আমি অস্ত্রের যদি একই উভয়, সে করিলে আমি করি, সেই করে হাতে ধরি, ভাষার আমার কাজে তেজ কিসে হয়? সে আমি অস্ত্রের যদি একই উভয়।

সে আমি অস্ত্রের যদি একই উভয়, আমার তপ্তিতে তবে, সে কি তপ্ত নাই হবে? পুর্নিলে আমার ইচ্ছা তারি পূর্ণ হয়, সে আমি অস্ত্রের যদি একই উভয়।

সে আমি অস্ত্রের যদি একই উভয়, করে, তবে কা ধর্ম, করে কা পাপকর্ম, যে ধর্ম জগতে সে কি অধ্যস্ত নয়? সে করিলে আমি করি, কিসে পাপ হয়?

সে আমি অস্ত্রের যদি একই উভয়, কিসে বা উন্নত হই, কিসে স্বনন্দত হই, যা হই তা হই যদি তারে ছাড়া নয়। আমায় উন্নতি তবে লোকে করে কয়?

অনন্ত উন্নতি তবে লোকে করে কয়? তারে করিয়ে তুচ্ছ, আরো নীক আরো উচ্চ? বুঝি না কেমন কথা, প্রহেলিকায়, সে আমি অস্ত্রের যদি একই উভয়।

সে আমি অস্ত্রের যদি একই উভয়, নাহি থাকে পাপ পাপ, নাহি থাকে পরিভাপ, তবে ও নরক স্বর্গ কিহে কেন কয়? সে আমি অস্ত্রের যদি একই উভয়।

সে আমি অতেন যদি একই উভয়,
হাস্তায় আহার তরে, পূর্ণ আশ্রিত্য সাধে,
কিসে থাকে পূর্ণ-কথা-ভেদ-সমুদয়,
সে আমি অতেন যদি একই উভয়।

সে আমি অতেন যদি একই উভয়,
বা থাকে আপন পর, শত্রু-মিত্র পরস্পর,
যদি এ প্রেমের রাক্ষস অনাদি অবয়ব,
কেন কামি তার শোকে, যে গিরেছে পরগোকে,
সে কি গো আমার তরে পুণ্য চেয়ে হয় ?
জ্ঞেয় কি সেখানে যেয়ে, তেমন থাকে না চেয়ে ?
আশ্রায় আশ্রয়ত গো কেহ পর নয়,
সে আমি অতেন যদি একই উভয়।

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
অনেক তার তরে, নিশি নিশি স্বাধি করে,
উদার-বিনেদী-বেশে না খিরি হায়,
কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়।

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
কু ভেদে নিরীহ, হাস্তায় ডাকিলে যদি,
সে ধাবাই একটু ফিরে নাহি চায়।
একই শোনে না কথা, নিদারুণ নির্যাস্তা,—
জনসেব মত যদি এককারে যায়।
কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়।

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
বনস্ত কালের প্রোভে, চলে অনন্তের পথে,
অনন্ত আশ্রয় মিলে সে যেখানে যায়,
চির আশ্রিত্য যদি আশ্রয় স্রাস্তায়।

আমি কেন কামি তবে তাহার আশায় ?
এ জনতে তার মত, যেহ কি মিলে না তত,
একজন গেলে নাকি পৃথিবী হুয়ায় ?
হাস্তেছে শশানকুল, দেখিয়াছে যে ক্রুশে,
ফুলনে পরী যেন খেলিয়া বেড়ায়।
কি যেন সে আসে নিতে, কি যেন সে হাশে দিতে,
কি যে রীতি নিতি নিতি ফিরে ফিরে যায়।
জল-দানত পড়ে, সোমে ঘা পাঠত বার,
মারতভা পরতে যেন প্রীতি প্রায়।
সে তপস্বী সে সাধনা, শূন্যে কেলে কণ জনা ?
তোলেত ভাঙ্গিয়া বেগ স্বাধি মেলে চায়।
তোলে পুঙ্খম স্মৃতি, বিধির নিয়তিভাতি,—
এ কি পৃথ্য—এ কি পাণ কই না আদায় ?

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়।
সমস্ত শোকাপেক্ষণে, তপ টুহু নাহি টলে,
অমনি নিয়ম যদি নিষিদ্ধ ধঃ
কেহ না কাহারে বোঁজে, সবাই আপনা বোঁজে,
শুষ্টির নিগূঢ় অর্থ এই যদি হয়,
তবে ও শশানে এসে, সুদায় কিংসে ভেসে,
যে নব লাবণ্যজ্যোতি ভস্মিয়া ধাঁড়ায়,
সমাজ নদনে তার, নিমগ্ন শত বার,
অজানা ছলয় যদি হাত পেছত চায়,
এ কি পৃথ্য—এ কি পাণ কই না আদায় ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস

বিবাহ।

২য় প্রস্তাব।

প্রথম প্রস্তাবে হিন্দু-বিবাহের প্রকরণ-পদ্ধতি
সম্বন্ধে মূল বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।
এক্ষণে ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য প্রকাশ করিতে বহু
করিতেছি।

জাতি জাতির বিবাহের মধ্য উদ্দেশ্য ঐহিক
আনন্দ; হিন্দু-বিবাহের মধ্য উদ্দেশ্য কিন্তু সার্ব-
মাত্র-বিহারিণী জাতি-প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য স্থির রাখিতে
হইলে, হিন্দু বিবাহ-নিয়ম, রেখামাত্রও উল্লঙ্ঘন
নহে। এই বিবাহই জাতিভেদের জীবন। বিবাহ
না থাকিলে ব্রাহ্মণ্যি জাতি অস্তিত্ব থাকে না।
সম্ভোগদ্বার পুষ্টি ও সন্তানের মাতৃকরণ এই
বিবাহ অস্তমত কাব্য। ব্রাহ্মণের জাতিভেদ নাহি,
ওৎসবের কথা বাহাদের পরিজ্ঞাত নহে, তাহারা
এ বিবাহেব লৌহ না বুঝিতে পারে; কিন্তু বাহারা
বেশিয়া ভূমিয়া, প্রকৃত তর অরণ্য করিয়া, জাতি-
ভেদের উপকারিতা ছয়দশম করিয়াছেন, জাতি
ভেদের ওপে অসীম ফল লাভ করিয়াছেন, তাহারা
হিন্দু-বিবাহকে অতি অদ্ভুত পার্শ্ব মনে করেন।
অতি উপকারিতা বলিয়াই ঋষিপুরবর্ণন নিজ নিজ বর্ণ-
দ্বয়ের ভূত কানায় সেই বিবাহ-প্রণালী প্রবর্তিত
করিয়া গিয়াছেন। কেবল শিল্পি-চরিতার্থতা ইহু
বিবাহকে হইতে ধার্য ও হইয়া থাকে বটে; কিন্তু
হিন্দু সে উদ্দেশ্যে বিবাহ করে না। কথাতী বুঝিতে

হইলে, হিন্দু-বিবাহের প্রভেদের দিকে দৃষ্টিপাত
করিতে হইবে;—

বিবাহ আট প্রকার,—

ব্রাহ্ম্যো দৈবত্ববৈবাহ্যে প্রাজাপত্যস্তবাহুঃ।
পাক্ষর্যো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচত্যাগমোহস্তমঃ ॥

মত, ৩৪ অঃ।

ব্রাহ্ম্য, দৈব, স্বর্গ, প্রাজাপত্য, আহুয়, পাক্ষর্য,
রাক্ষস এবং পৈশাচ—এই অষ্টবিধ বিবাহ। তন্মধ্যে
শোকেণ বিবাহতী অমূল্য।
ব্রাহ্ম্যো বিবাহ আহুয় দীর্ঘতম শতাব্দীকৃত।
ব্রহ্মস্বায়ত্বিকৈব দৈবঃ—

বাক্সবক্ষ্য, ১ম অঃ।

একং গোমিথুনং রে বা বরাদিদায় ধর্ম্মতঃ।
কৃত্যপ্রদানং বিধিবদাধৌ ধর্ম্মঃ স উচ্যতে।

মত, ৩৪ অঃ।

ঈগরী পুত্ববৎ গোমিথুনং অতএব রে বা বরাদ
ধর্ম্মতঃ ধর্ম্মার্থে বাবাদিসিদ্ধয়ে কৃত্যেই বা দাতৃ নতু
তৎকৃত্য গৃহীত্বা যৎ বখশ্যাত্ত্বং কৃত্যাদানং স আধৌ
বিবাহোব্যবহিত্যতে। ব্রহ্মস্বয়তঃ।

মহাভোক্ত চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচ্যনৃত্যায় চ।

কৃত্য প্রদানমতর্জ্যে প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ।

মত, ৩৪ অঃ।

আহুয়োরো অধিধানাদ্যাক্ষর্যঃ সমাধিযঃ।

রাক্ষসো যুদ্ধবরণ্যং পৈশাচ্য কৃত্যকৃত্যাদানং ॥

বাক্সবক্ষ্য, ১ম অঃ।

চতুরো ব্রাহ্মণভাত্যানু প্রশস্তানু কবয়ো বিদুঃ।

রাক্ষসং কল্লির্যৈকমাহরণং বৈশম্পয়নোহতঃ।

মত, ৩৪ অঃ।

ভাবার্থ;—ব্রাহ্ম্য বিবাহে কৃত্যকৃত্য। কৃত্যকে
ধর্ম্মার্থিক অলঙ্কার দিয়া একটা পুত্বকৃত পাত্র
অবেশবর্ণকৃত্য তাহার হস্তে সপ্তাধান করিবে।
ব্রহ্মণ্ড গর্ভকৃৎ দমিপাক্ষণে কৃত্যাদান করা দৈব
বিবাহে বিহিত। যোগাধি-নিমিত্ত একটা পাত্র, একটা
লৌহবর্ণ অথবা হুইটা গাভী ও হুইটা লৌহবর্ণ গ্রহণ
করিয়া কৃত্য দান করা স্বর্গ বিবাহের পদ্ধতি। “হুই
জনে একত্র ধর্ম্মচার্য কর,” এই কথা কৃত্য ও জামা-
তাকে বলিয়া, প্রার্থী বরকে কৃত্য দান করায় প্রাজা-
পত্য বিবাহ নির্দ্বিধিত হয়। স্তম্ভ গ্রহণ করিয়া
কৃত্য দান বা কৃত্য বিক্রয় আহুয় বিবাহে প্রচলিত।
ঈগুপ্তের পরম্পর অলঙ্কারকৃত্য অপধর্ম্মকৃত্য
বিবাহই পাক্ষর্য বিবাহ নামে প্রসিদ্ধ। মনুগ্রামে

পাত্রী অপহরণ রাক্ষস বিবাহের নিয়ম। ছলক্রমে
অর্থ্য্য হুমারির নিজাদি-সময়ে তাহার সম্মতি না
পাইয়া তাহাতে উপনত হওয়াই পৈশাচিক
বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। প্রথমোক্ত চারি বিবাহ ব্রাহ্মণের
পক্ষে প্রশস্ত। কল্লিরয়ে পক্ষে রাক্ষস বিবাহ এবং
বৈশম্পয়ের পক্ষে আহুয় বিবাহ প্রশস্ত, ইহা
পণ্ডিতগণের মত।

পূর্বোক্ত ত্রয়ো ধর্ম্ম্য দ্বাবধৌ স্মৃতিবিধিঃ।
পৈশাচত্যাগহুইচৈব ন কৃত্ব্যৌ কদাচন।
পুত্বং পুত্বা মিথো বা বিবাহৌ পূর্বমিতিবিধিঃ।
পাক্ষর্যো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্মৌ দ্রুতয়ো।

মত, ৩৪ অঃ।

ভাবার্থ;—ব্রাহ্ম্য, দৈব এবং স্বর্গ বাস্তবিক অষ্টবিধ
পাত্র প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, পাক্ষর্য
এবং রাক্ষস এই বিবাহত্রয় ধর্ম্ম্য; পৈশাচ এবং
আহুয় এই বিবাহত্রয় অধর্ম্ম্য; হুমারি কদাচ কৃত্ব্য
নহে। পাক্ষর্য এবং রাক্ষস বিবাহ কল্লিরয়ের পক্ষে
ধর্ম্ম্য ও ঋষিসম্মত। যদি বর ও পাত্রীর পুত্বস্পর্শ,
অহুয়র হয়; এবং কৃত্যপক্ষ বা পাত্র প্রভিধৌ-
দিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া বর যদি ইচ্ছাকে বিবাহ
করেন, তাহা হইলে উক্ত বিবাহকে মিত্র-পাক্ষর্য-
রাক্ষস বিবাহ বলা যায়। এইরূপ বিবাহও কল্লিরয়ের
পক্ষে প্রশস্ত।

যজুর্ন্যূর্যো বিপ্রস্ত জ্ঞাত্যু চতুরোহবরানু।
বিতৃশ্রয়োস্ত চতনৈব বিদ্যাভূত্যানারম্যানু।

মত, ৩৪ অঃ।

ভাবার্থ;—ব্রাহ্ম্য প্রভৃতি ছয় প্রকার বিবাহ
ব্রাহ্মণের পক্ষে, পাক্ষর্য চারি প্রকার বিবাহ
কল্লিরয়ে, পক্ষে এবং পাক্ষর্য, আহুয় ও পৈশাচ এই
তিন প্রকার বিবাহ বৈশম্পয়ের পক্ষে অধর্ম্ম্য।
পারিভো বিবাহান্যং পৈশাচত্যাগমোহস্তমঃ।

মত, ৩৪ অঃ।

আট প্রকার বিবাহের মধ্যে অষ্টম পৈশাচ
বিবাহ, সর্গলোচনা অধম এবং পারিভো।

এই সমুদয় চতন পর্যালোচনা করিলে বুঝা
যায়, ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম্য প্রভৃতি চারি বিবাহ
প্রশস্ত। কল্লিরয়ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণ, বা অষ্ট ব্রাহ্মণ
প্রশস্ত বিবাহ না জ্ঞাতিয়ে, পাক্ষর্য, রাক্ষস বিবাহ
করিতে পারে। আহুয় ও পৈশাচ বিবাহ ব্রাহ্মণ,
কখনই করিতে না।

কল্লিরয়ে পক্ষে রাক্ষস বিবাহ প্রশস্তকৃত্য; পাক্ষর্য
বিবাহ প্রশস্ত; প্রাজাপত্য-বিবাহও বিহিত। বৈশম্প

পূর্বের লব্ধ ও সন্তুষ্টি, বুদ্ধি এই বিশ্বব্যাপ্তিতেই
হইয়া থাকে। ক্রমে অল্প বিবাহবিশেষ অধিক
হওয়া সম্ভব। কিন্তু, আমরা তাহার কি করি ?
অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কত এক-পুত্র, পুত্র হারাইতেছে ;
কত জাতি, অকালে। কালসাপেরে রূপ নিতেছে ;
আমরা তাহাকে কি করিতে পারি ? সেইজন্য বিবাহ-
বিশেষেও অধ্যয়ন আমাদের সাধ্য নহে। পরন্তু
বিজ্ঞানজি উন্নতির জন্য হিংস্র-বিবাহকে বেশে সম্ব-
ল করিতে হয়, ইহা বিবাহের বড় কম গোপন কথা
নহে। বিবাহের বিবাহ থাকিলে হিংস্রমণীর এই
বেগভাব থাকিত না। কাজেই সমাজ ও জগৎসার
অপকৃতই তামসিক হইত। পুরুষের নৈতিক প্রকরণী
যাতি, আর স্ত্রীজাতির বিবাহ—উভয়েই স্ব স্ব শ্রেণীর
চিরোদ্বৈধ ধারণা করিতেছেন।

পুরুষের বহুবিবাহের সঙ্গেও জাতিপ্রতিষ্ঠার
যনিত সম্বন্ধ আছে।

হুয়াসী ম্যাবিরা বৃদ্ধ বক্ষ্যাব্যশিষ্যবৎ ;
রাষ্ট্রপুণ্ড্রবিশেষত্বাৎ পুরুষদ্বৈধীত্বাৎ ॥

বাক্যবক্ষ্য, ১ম অঃ।

পত্নী, হুয়াসীনি, হুস্কিকিং-রোবার্ডী, বৃদ্ধী,
বন্ধা, অনিষ্টকারিণী, অগ্নিসমভাষিণী, কন্ডামাত্র-সং-
সবিনী এবং পুরুষদ্বৈধী হইলে পুনরায় দারপরিগ্রহ
করা কর্তব্য।

হারিরাগ্নিযোজেন স্ত্রিয়ং বৃত্তবতঃ পতিঃ।
আহরেবিবাহকরানবীং-সংবালিগতঃ ॥

বাক্যবক্ষ্য, ১ম অঃ।

পতিব্রতা পত্নীর মৃত্যু হইলে, পতি সৌভাগ্য
যুক্ত অগ্নি দ্বারা তাহার দাহ করিয়া পুনরায় সন্তর
দারপরিগ্রহ ও অগ্নি গ্রহণ করিবে।

উপযুক্ত চন্দনের বেগিলাই বোধ হয় ;—বংশ-
নাম, ধর্ম্মানি এবং নিষ্ঠুর-সম্প্রদায়-পতি—এই তিনটি
অর্থ নির্ধারণের জন্যই পুরুষের বহুবিবাহ বিধিত
হইয়াছে। নিষ্ঠুর, সমাজে জাতি অনতি হয়।
মাত্র-জননা হইলে সমাজের নিষ্ঠুরতা ইত্যা বিশেষ
সম্ভাবিত। তাই বলিতেছি, পুরুষের বহুবিবাহও
জাতি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্বন্ধ।

জাতি ও বিবাহ সংগত মত বাক্যবক্ষ্য অশ্রুতি
স্মৃতিকারণে দ্বাং বলিষ্ঠাছেন, তাহা এবং তাঁহাদের
বিশেষ অভিজ্ঞার প্রয়োজনবোধে এখানে ব্যক্ত
করিতেছি ;—

ব্রাহ্মাদিগু বিবাহেষে চতুর্বে বাসুপূর্বকঃ।
ব্রহ্মবর্জ্যবিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিশুসম্বতঃ।

অনির্দিষ্টঃ স্ত্রী-বিবাহেরনিমিত্তা ভবতি একা।
নির্দিষ্টেইনির্দিষ্টা নৃপাং তন্মায়িন্যান বিকল্পয়েৎ ॥
মতঃ, ৩য় অঃ।

ভাবার্থ ;—ব্রাহ্ম অশ্রুতি চারি বিবাহে বিবাহিতা
রমণীর গর্ভজাত সন্তান ব্রহ্মভেদঃসম্পন্ন ও শিশু-
সম্বত হয়। অনিন্দনার বিবাহে অনিন্দনার সন্তান
উৎপন্ন হয়, নিন্দনার বিবাহে নিন্দনার সন্তান উৎ-
পন্ন হয় ; এইজন্য নিন্দনার বিবাহ অকর্যব।

এখন বচনটা ব্রাহ্মণের পক্ষে অকর্যব ; শেষ
বচনটা সর্বধর্ম্ম-সাধারণ ; ইহা দেখিয়াও কি হিংস্র-
বিবাহের উদ্দেশ্যবিশেষ কোন সংশয় থাকে ?

সর্বধর্ম্মেণ কুল্যাসু পত্নীব্রতভবোনিঃ।
আহুলোমোদনঃ সন্তা জাত্যা জ্যেষ্ঠাঃ এব তে ॥

মতঃ, ১ম অঃ প্রোকঃ।

ব্রাহ্মাদিগু বর্ষে চতুর্বাৎ সমানজাতীয়সু
বংশাশ্রয়ঃ পরিণীতসু অনন্তর্যোনিঃ আহুলোমোদনঃ
ভ্রাতৃগণেন ব্রাহ্মণ্যাম কলিত্বেন কলিত্রায়ামিত্যেনান্য-
ক্রমেণ যে জাত্যন্তে মাতাপিতৃভোক্তা দুকৃত্য-
তীয়া এবং জাত্যন্তা ॥ কুলভুক্তা ॥

সর্বজাতিঃ সর্বধর্ম্ম জায়ন্তে বৈ সজাত্যন্তঃ ॥
—বিদ্যাস্থেব বিধিঃ স্মৃত্যুঃ ॥

বাক্যবক্ষ্য, ১ম অঃ।

পরিষ্কৃতা সর্বধর্ম্ম স্ত্রীর পক্ষে পরিণয়নের ঊরসে যে
সন্তান হয়, তাহার পিতামাতার সম্ভাতি। উক্ত
বচনদ্বয়ে ইহাই ভাবার্থ ;—

নৃত্য—
হিউয়েন তুং পিত্রা সর্বধর্ম্মাং প্রজায়তে।
অব্যকং ইতি ঋতঃ শূদ্রধর্ম্মাং স জাতিতঃ।
তত্বীনা ন সংস্কৃত্য্য সইভার্গ্যপে যে সূতাঃ।
উৎপাদিতাঃ সর্বধর্ম্ম আত্ম ইব বহিঃকৃত্যঃ ॥

কুলভুক্তমুদ্রং দেবলচয়নঃ।

পর-পরিণীতা সর্বধর্ম্ম গর্ভে কোন ব্রাহ্মণের
ঊরসে যে সন্তান হয়, সে অব্যক জাতি বলিয়া
বিখ্যাত। তাহার ধর্ম্ম শূদ্রের মত। অব্যকটির উপ-
নাম ও দ্বিজোচিত সংস্কার নাই। অপরিণীতা স্বামীনা
রমণীর গর্ভজাত সন্তানও এইরূপ। ইহার। ভ্রাতার
সন্তান নিন্দনার।

এই সব দেখিয়া অনার্য্যসেই বলা যাইতে পারে,
উৎকট-কামপ্রবৃত্তি-মূলক সমস্যা উৎপন্ন সমাজ-স্রি-
জাতিই নহে। সমাজের পাদপদ-প্রবৃত্তির ধর্ম্ম-মূলকতা-
সম্পাদনের জন্যই বিবাহের স্রি। মৃত্যু-বিবাহে

সকলের না হউক, অনেক লোকেরই প্রবৃত্তি-বিশেষ
যেকোনপ্রবৃত্তিতে হয়, এক্ষেত্রে অল্পই সমবেগ আছে।
জীবধর্ম্মে সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সমাজও
ব্রাহ্মণ নহে। এই নিয়ম দ্বারা ইচ্ছাচিত্রাটো যে
বিবাহোদ্দেশ্য, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝা যাইতেছে।

আরও দেখ :—
যেবরাহা সপিতায়া স্ত্রিয়া সম্যগনিযুক্তয়া।
প্রোপিতাঃশিগন্তয়া সমাজন্ত পরিণয়েৎ ॥
বিবাহাঃ নিযুক্তস্তা রতাতো বাপুস্তো নিশি
একমংপায়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথংন ॥
বিবাহাঃ নিয়োগার্থে নিরুক্তে তু বধাধি।
কন্যকঃ হ বাক্য বস্ত্রোভাঃ পরম্বরা ॥

মতঃ, ১ম অঃ।

অপুত্রাঃ গুর্ভকৃত্যো দেবরঃ পুত্রকাময়াঃ।
অপুত্রো বা মনোভো বা হত্যাত্মকঃ কৃতবিদ্যাঃ ॥
অ। গর্ভমন্তব্যাপুত্রং পতিভুক্ত্যভ্য ভবেৎ ॥

বাক্যবক্ষ্য, ১ম অঃ।

পুরুষকালে ঊরস পুত্র-শোভা দি থাকিলে,
কন্যধর্ম্মাৎ সেক্ষেত্র পুত্র কার্ণের ব্যবস্থা ছিল।
সমাজোৎপাদনে অর্থম পতিঃ বা পতিঃ অভাবে
পিত্রাণি গুরুজনের পুত্রোৎপাদনার্থে অর্থমতি প্রার্থা
রমণীতে অর্থমতি প্রার্থ দেবর, সপিও, সমেজ (বা
মর্ঘ) কৃত্যক-কলেশর ও মৌনী হইয়া তৎকালে
এক একবার উপকৃত হইবে, বর্তমান পর্য্যন্তের না
হয়। নিয়োগের কার্য সম্পন্ন হইলে, সেই স্ত্রী, উক্ত
পুরুষের প্রতি পিতৃবৎ এবং সেই পুরুষ উক্তরমণীর
প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহার করিবে। ইহার দ্বারা
বৃদ্ধা দ্বাং, এই মত ব্যবহাতে কামপ্রবৃত্তিমূলক না
হয়, তদ্বিধে বহিষ্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।
কেবল ধর্ম্মলক্ষ্য হইয়াই, এই ক্ষেত্র সমাজোৎ-
পাদন করিতে হইবে। বিবি অতিক্রম করিলে স্ত্রী ও
পুরুষ উভয়েই পতিত হইবে।

এখন কলিকাল, কামপ্রবৃত্তি অধিক ; এইজন্য
একালে ক্ষেত্র কন্য ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হইয়াছে।
যদি হউক, উৎকট কামপ্রবৃত্তিমূলক সংসর্গভাত
সমাজ যে হিংস্র অনজিত্রো, তাহা সকল ব্যবস্থা
পুত্র স্থির করা যায়। বিবাহ, প্রেই প্রবৃত্তি-মাজ্জিগতা
মহা সংস্কার। তাই বিবাহ জাতি-প্রতিষ্ঠার মূল।

শ্রীপকানন তরুভূত।

নিশীথে অম্পকৃষ্ণত সঙ্গীত।

পর্ষে পর্ষে যেন গেল এখনি পথিক রে
কি গীত গায়িল !

জয় ছুইয়া গেল, জগাইয়া, গেল রে
আর না ফিরিল !

মাদুরীর দ্বাং কণ কোয়ারান মত রে
শুভাগে বৈশে ছড়াইল।

স্বপনেরে বুঝা বুঝি দেবে বরহিল রে
ভাণ্যবাসে কেবল ভুলিল।

চালা-চামক-সম সে স্বর-মাদুরী রে
অম্লি অজ্ঞান মিলাইল।

শুভ করি কোড় তস, রে শুভ, স্বর্ধাৎ নাম
যেন আভি তোর দিয়ে গেল ও

দরিয়া স্রিয়ার মনে নিলিয়ায় ঢাকি রে
রাখিতে নারিলি কন-তর।

চাঁদের কোছান ছুই পারিল রাখিতে যদি
তোর ও অনন্তরুক জোরে ॥

বুঝি রে বুঝিল নাই তার চেয়ে কতদূর
দুরন্ত ও স্বর-নটন,

অবধা পরশে তার রসের আশ্রয়ে রে
হয়েছিলি দ্বাং অচেনে ॥

কতই মাদুরী শত অশু-অশু হয়ে তার
জগজজি হিল একতানে ॥

যদিও অশ্রু-তর, তবু না গরিল রে
নেম নোর একদী পরানে ॥

দরিয়া রাখিতে রুক কানী তেহনে রে
পলাইল দিয়া ঘমঘোরে,

নারিস চুপিতে ভাং মিটোয়ে আশার কুণ্ডা,
স্বপার অধিক সমাদরে ॥

চলি গেল, চলি চলি গেল রে,
তবু দাম্প চাঁচি চলি গেল,

স্বপের স্বপনে যেন আদ মনে পড়ে রে
সেই ভাবে কখনে রাখিল ॥

প্রাণমণী চলি যায় যেন পরমানে রে
দূর পর্ষে এখনি নেহারি,

তোমতি স্মৃতি পথ উজ্জলি এখানে দ্বাং
রয়েছে রে সে স্বর-মাদুরী ॥

শ্রীশারদাপ্রদাম-দশর্ধী।

হামীজীর হরিদ্বার-যাত্রা।

শেষ প্রস্তাব।

১০ই চৈত্র—বৈশাখী

১০ চৈত্র—প্রাতঃকাল দশটা সময় হামীজী বেরেলীতে পৌঁছেন। বেরেলী-ষ্টেশন হইয়া কাঠ-জামে বাহতে হয়। বৈনিডাল বাহিতে, হইতে কাঠওয়াল পর্যন্ত রেলপথে বাহিতে হয়। বেরেলী-ষ্টেশন হইতে বেরেলী-সহর রেলপথে উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় এককোশ দূরে। আমরা অস্বতীর্থ হইয়া ষ্টেশনের উত্তরে একটি বাগানে সেগিন বাসের ঘানু পরিভ্রমণ করিলাম। এই বাগানটা ষ্টেশন হইতে প্রায় আশেপাশা হইবে; হুতরাং আমরা সকলেই পদযাত্রা সেই বাগানে উপস্থিত হইলাম। রাজা চন্দ্রস্বরের দেওয়ান সাহেব আড়ি ঘরের সহিত সকল লোকের বিছানাপত্রাদি বাগানে পাঠাইয়া বসেবস্ত করিয়া নিজে আহার্য ভ্রম আনয়ন করিতে সন্দের মধ্যে প্রস্থি হইলেন। স্বাসাময়ে আমরা বাগানে উপস্থিত হইয়া নিত্যমানসিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলাম। এই বাগানে স্থাপত্যক অতি স্নিগ্ধ ও বিশেষ আশ্রয় এবং পরে জানিতে পারা গেল যে, এই জনের পাচক-ওষধ বিলাসপ আছে। স্বাসাময়ে দেওয়ান সাহেব আহার্য সামগ্রী লইয়া বাগানে উপস্থিত হইলেন। অচ্যুত পরিভ্রমণ হুত, আটা, তণ্ডুল ও শর্করা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। যে-কর্তা পারিল, গ্রন্থে বস্তুকে তলে রন্ধনাদি করত পর্যায়ন্তপূর্ণ আহার্য কর্তব্য ও বাস্তবিকভাবে প্রথম অনুভব করিতে প্রস্তুত হইল। স্বাসাময়ে আহার্যেও আহার্যেও ক্রিয়াকর্ম করিয়া প্রায় তিন-চার সময় হামীজীর চরণোপরি গিয়া উপবেশন করিলাম। এই বাগানের দক্ষিণাংশে একটি দৃশ্য দেখিতে ছিল। তাহারই দ্বারা হামীজী উপবেশন করিয়াছিলেন। এই সময় বেরেলী-নগরের পশ্চিমাত্মক অবিসাধন ও তত্ত্বাত্মক ভাবধর্মগুলির শাসনভার অধ্যক্ষ হামীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সকলেই বিনীতভাবে হামীজীর উপবেশন স্থান করিতে করিতে প্রশংসাক্রমে সকলতা অনুভব করিতেছিলেন। ভাবধর্মগুলির সহকারী স্তম্ভস্বরূপ এই সময় বিশেষ আগ্রহের সহিত হামীজীর নিকট আবেশন করিলেন যে,

“আমরা দীনদয়াল শর্মা প্রমুখ ও দেশীয় সংবাদ-পত্রনিচয়ে অবগত হইয়াছি যে, ৭ হরিদ্বারকে ভ্রমভ্রমসংবাদগুলির যে বিশেষ প্রাধিকার হইবে, তাহাতে আপনি ক্রমপূর্বক সভাপতিত্ব আনয়ন করিতে পারেন; এ সংবাদে আমরা যে, কি প্রকার আশ্চর্যজনক হইয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি, একপ্রকার বাকচাতুর্য্য আমাদের নাই। এখন যে আমরা ক্রমপূর্বক হইতে হইবার নিমিত্ত-জাপক বাধা ভুক্তিতে পাইলে, আমাদের সেই আশেপাশা শতভেদে বঞ্চিত হইবে।” এ কথার উত্তরে হামীজী বলেন যে, “দীনদয়াল শর্মা নিকট আমি কানীতে এইমাত্র বলিয়াছি যে, “ভারতবর্ষমহামণ্ডলের উন্নতি বিশেষ করিয়া কামনা করি বটে, কিন্তু ইহার সহিত একপ্রকার কোন সংঘর্ষ নাই। আমার কর্তব্য কি না—এ বিষয় আমি এখনও বিবেচনা করিতে নাই; তবে আমি হরিদ্বারে বাহিতেছি; তথায় গিয়া বাহা আমার কর্তব্য, তাহা তোমাদিগকে সেই হাওয়াই জানাই।” এই পর্যন্ত আমরা দীনদয়ালের সহিত কথা হইয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে আমি ভ্রমিতে পাইয়াছি যে, দীনদয়াল শর্মা সংবাদপত্রদ্বিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি মহামণ্ডলের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম করিয়াছি—এ ব্যবহার স্বর্ঘসংগত পদে, দীনদয়াল শর্মা কি প্রকার উচিত হইয়াছে, তাহা আপনাদি বিবেচনা করুন। কিন্তু ইহাতেও আমি ভ্রমভ্রমগুলির প্রতি বিনীত হই নাই; হরিদ্বারে গিয়া দি দেবি, ভ্রমভ্রমগুলির দ্বারা হিন্দুপ্রাচীন মতে নিজকর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে আমি সাধারণ হইবার সম্ভাব্য কথাই পরিভ্রমণ করি না।” পাবন ১১ই চৈত্র প্রাতঃকাল সাড়ে সাড়টার পাড়িতে আমরা বেরেলী পরিভ্রমণ করিয়া মুরাদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

১১ই চৈত্র—মুরাদাবাদ।

১১ই চৈত্র এরাটীর সময় বাড়ী মুরাদাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিল। হামীজীর আগমন-বার্তা পূর্ব দিন ভায়েক মুরাদাবাদ প্রচারিত হওয়ায় বাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবাদি প্রায় এক ঘণ্টাকাল পূর্ব হইতে ষ্টেশনে লোক জনিতে আরম্ভ করে। অন্যান্য ৩৪ মণ্ড-সংবাদী এই সময়ে হামীজীর অভ্যর্থনা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মুরাদাবাদ সহরের হুপ্রাচীন দনবাস সাহ বোবর্ডন দাস রায় বাহাদুর,

পূর্বের তদ্ব্যবসায়ী প্রধানকে আশেপাশা পঠান যে, “কানী হুপ্রাচীনকাল মহাশয় বিত্ৰা-নন্দ হামী মুরাদাবাদ বাইতেছেন। বাহাতে হামীজী বাহ্যিকভাবে কৌশলক্রমে জটিল না হয়,—আমরা তখন, আমার পরিচারক সকলই যেন অল্পপরিভ্রমণ হামীজীর সেবার ব্যবস্থার হয়, ইহা আপন করিবেন।” এই কারণে উক্ত পার্শ্বিক-ষ্টে মাহাজনের প্রধান-কর্তব্যকারী নিজ পরিচারকগণের সহিত পূর্ব হইতেই বাড়ী পাঠী প্রকৃতি বোধোত্তম করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছিল ভ্রমভ্রম-মহামণ্ডলের মুরাদাবাদ শাসনভার অধ্যক্ষ ও সভাপতি বিশেষ আগ্রহের সহিত হামীজীর অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। হামীজী ষ্টেশনে অব-জ্ঞান করিয়া মাত্র পূর্বোক্ত মহোদয়গণ উদ্যমভরে সজ্জা অপিনাত পূর্বক হুপ্রাচীনকাল হামীজীর জ্যোতিষাচরণ-কর্ম করিয়া উঠিলেন। চতুর্দিক হইতে ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক নিজগুণ পুষ্পমালানিচয়ে হামীজীর চারিপার্শ্ব পুষ্পভরিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর চাম্র-মহাজন করিতে করিতে সকলে হামীজীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া নগরের অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পদযাত্রা পদযাত্রা ৪০ ধানি অধঃপতন হামীজীর মহামণ্ডল আগ্রহের করিলেন। বাড়ী সকল হামীজীর পদযাত্রা পদযাত্রা নগরভিত্তিক ধারিত হইল। প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা সময় সকলে মুরাদাবাদ নগরের গ্রিক মাহাজনে প্রাচুর্য মহাজনের ক্রীতে পৌঁছিলাম। বলাৎসব পূর্ব হইতে সমস্ত ঠিক ছিল। ক্রীটার মধ্যে চারিটা প্রশংসাত্মক ছিল। সকলেই হুপ্রাচীন নিকের বাসোদ্ভূত গৃহ দেখিয়া লইল। পূর্বোক্ত একটি হুপ্রাচীন দানব হামীজীর আবাস-স্থান পরিভ্রমণ হইল। স্বাসাময়ে দানবের পর সমস্তের আহার্য সমান হইল। প্রাচুর্য হুপ্রাচীন ক্রীটা ও তত্ত্বাত্মক বিদ্যাগোমারী যুদ্ধসময়ের বিশেষ আগ্রহসহ চেষ্টায় সকলে পূর্বদিকের আহার করিয়াছিলেন। সে দিগে আহার্যদিক করিতে প্রায় সকল হইয়াছিল, হুতরাং মুরাদাবাদ মহরতি কি প্রকার, তাহা দেবিতার হুপ্রাচীন ছিল না; তথাপি জ্যোতিষগোমারী যামিনী বলিয়া আমরা নগর-সন্দর্ভ-নির্গত হইলাম। মুরাদাবাদ নগর, দৃশ্য-মহাজন-আধারগোমারী সহরে বেশী পরামাণে আছে। এখানে ভ্রমভ্রমগুলির একটি শাসনভার আছে। নব্য স্নিগ্ধ হিন্দুসংবাদগণের মধ্যে বক্তব্য প্রাচীক

সানাতন হিন্দু-ধর্মের বিশেষ পদপাঠী। হুপ্রাচীন রামপুর রাজ্য এই স্থানের নিকটবর্তী। পূর্বকালের নবাবী রীতিতে রাষ্ট্র সকল নির্মিত। “চক্রী” মন নহে। “কোতোয়াগীটী ছোট” হইলেও দেখিতে পারিবার বটে। প্রায় সকল বাটরাখাইয়েই বাগান আছে। বাজীর নানাবিধ উদ্ভিদভেদে প্রসিদ্ধ। মুরাদাবাদের হলকরা বাসন ভ্রমভ্রমে অসিদ্ধ। সেই জ্যোতিষগোমারী যামিনিতে এই প্রকার ধ্বংসাত্মক সহর দেখিয়া আমরা রাষ্ট্র-মহাজন নগর সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

প্রভাতে মিলিমা, হামীজী স্নানার্থে হরিদ্বারে যাত্রা করিলেন। কাল যে পাড়িতে আমরা মুরাদাবাদে পৌঁছিয়াছি, সেই পাড়িতেই হরিদ্বারে যাত্রা করিতে হইবে, ইহাও স্থির হইয়াছে। ১১টার সময় পাড়ী ছাড়িলেন; হুতরাং তাড়াতাড়ি মানসিক সমাপনভেদে স্বাসাময়ে রন্ধনাদি ব্যাপারে আসক্ত হইতে, হইল। বেলী দশটার সময় আহারাদি সম্পাদন করিয়া আমরা হামীজীর পদযাত্রা ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি। মুরাদাবাদ সহরের আধারগোমারী পুষ্পমালানিচয়ে কানী অভ্যর্থনা করিবার জন্ত অনেকেরই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সকলেরই অভ্যর্থনা ছিল যে, হামীজী বাহা একদিন মুরাদাবাদে থাকিলেন ও তাঁহারা সকলে তত্ত্বাত্মক-নির্গত শাসনভার্যামুদ পান করিয়া আহার্যে চরিতার্থ করিবেন, কিন্তু হুতরাং হামীজীর দৃশ্য অত্যন্ত ব্যগ্র হওয়ায় তাঁহারের সে আশা পূর্ণ হইল না; হুতরাং সকলে আড়ি উৎকণ্ঠিত হইতে হামীজীকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারের মঙ্গল মান, জ্বলন্ত পূর্ব ভক্ত-মিলিত, ব্যাকুলতার পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

জন্মে প্রতিভা বাজিল। বাসায় শকট গুণ্যোপায় করিতে করিতে প্রাচীকালের আসিয়া দাঁড়াইল। নগরবাসিনদের উজ্জ্বলপরিপূর্ণ জ্বলন্ত সজ্জিত জন্মযাত্রা-পরিভ্রমণে হামীজী বাসায় শকটে আরোহণ করিলেন। পাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া গন্তব্য পথে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

১২ই চৈত্র। হরিদ্বার—আশাধার।

১২ই চৈত্র মুরাদাবাদ ছাড়িয়া পাড়ি যখন যুদ্ধ-মরে পৌঁছিল, তখন প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে। হরিদ্বার-ভ্রমভ্রমের পূর্বকরে পাড়ী পরিভ্রমণ করিতে হয়। সকল হইতে হরিদ্বার বাহিতে হইলে পথের

মধ্যে আরও তিনটি ষ্টেশনে গাড়ী অপেক্ষা করে। আমরা সকলে লুকসরে অবতরণ করিয়া হরিদ্বারের বাড়ীতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আর দুই তিন বণী পৌঁছাই বহনমধ্যে অভ্যস্তিত হরিদ্বারের বিলাস-কন করিয়া জন্ম মূল্য করিতে পারিল। এই আশায় সকলের অন্তঃকরণ উন্নতিত হইয়া উঠিল। গাড়ী ছাড়িতে অবশিষ্ট দেড়ঘণ্টা কাল মেয়ে যুগপরিমাণে গিয়া বোধ হইতে লাগিল। লুকসর ষ্টেশনটা খুব বড়; সেই সময় হরিদ্বার বাড়িরপরে ভিড় খুব বেশী ছিল না। বোধ হইতেছে, দুই শত হা বাড়ীই হয়। বাড়ী হরিদ্বার বাইবার জন্ত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। ষ্টেশনের বাসিন্দাদের সহিত আলাপ করিয়া জানা গেল যে, এখন পর্যন্ত কুস্তর মেলায় জনতা জমিয়া উঠে নাই। যে প্রকার লোক আসিবেছে, সেইধর চলিয়াও যাইতেছে; বোধ হয়, আরও ৭৮ দিন পরে আশ্বিনের জন্মের মেলায় জনতা জমিয়া উঠিবে, হরিদ্বারের বাইবার জন্ত গাড়ী প্রস্তুত হইবে। স্বামীজীর সহিত আমরা সকলে আরোহণ করিলাম, গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া হরিদ্বারগামীয়ে চলিল। লুকসর হইতে দুইটি ষ্টেশন পার হইলেই জলাপুর্ন নামক ষ্টেশন পাওয়া যায়। জলাপুর্ন হইতে হরিদ্বার ষ্টেশন দুই ক্রোশ দূর যায়। স্বামীজীর ধামের জন্ম কন্থলে একটি বৃহৎশত মুগুপা-দান স্থাপিত ছিল। কন্থলে বাইতে হইলে জলাপুর্নে নামিলেই হরিদ্বার হয়; এইজন্ত আমরা সকলেই জলাপুর্নে অবতরণ করিলাম। পূর্বেই আমরা মুরানাবাদ হইতে কন্থলে তাহাদের মারাদ গিয়াছিল। যে, “১২ই তারিখে আমরা জলাপুর্নে পৌঁছিতে, হুতায় ষ্টেশনে স্বামীজীর জন্ম মেনে সওয়ারী প্রস্তুত থাকে।” কোন বাড়ীতেই আমরা জলাপুর্নে পৌঁছিতে, তাহার নিম্নত বরনা পাওয়ায়, রামপ্রভাৎ মিহনে (স্বামীজী যে বাগানে বাস করিয়াছিলেন, তাহার অধিকারী) প্রাণভাষণ হইতে ষ্টেশনে লোকের ওলটপালট বহনকৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সময় বিনের মধ্যে আমরা তথায় পৌঁছিতে না পারায় ও অল্প কোন সংখ্যক না পাওয়ায় সম্ভাব্য উপ ই সকল লোক সবে (কন্থলে) প্রত্যাবর্তন করত হোলদী উৎসবের মধ্যে প্রাধান্য করিয়াছিল। হুতায় আমরা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া কোন প্রতিষ্ঠিত লোক দেখিতে পাইলাম না। সেই সময় হরিদ্বার হইতে গুহাবাণী বাড়িরপরে ভিড় এত বেশী ছিল যে, আমরা কোন প্রকারে ষ্টেশন-মধ্যে জিয়ার্জি খায়ও

পাইলাম না। কাজে কাজেই ষ্টেশনের বাহিরে কিছুদূর একটা আত্মবিশ্বাসের নিয়ে আমরা সকলে প্রবেশন করিয়া, কন্থলে কোন লোকের থায়া সবার প্রেরণ করাই প্রেরণের এই প্রকার নিশ্চয়্যে ষ্টেশন হইতে উক্ত জুড় আত্মবিশ্বাসভিমে স্বামীজীকে লিখিত অগ্রসর হইলাম। আমরা যখন ষ্টেশন হইতে নির্গত হইলাম, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। ব্যাপিও সে সময় আকাশ পূর্ণ হুতায়ের রক্তকাকি রশ্মিবিম্বের সর্বিমে উজ্জ্বলিত ও বিম্বভাও বিম্বেরূপে প্রকাশিত ছিল, তথাপি পানবনে তখন এতই ভীমভায়ে গর্জন করিতে করিতে বহন ও সমবিকভাবে স্থিতিয়ে বর্ষ প্রচলিতছিল যে, তাহাতে অনারুত হানে একদগুণও নাড়াহইতে পারে, এরূপ সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই ছিল; হুতায় বাহিরে আসানের সহচরীরা বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বামীজীর এ প্রাকৃতিক উপহারের প্রতি উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি সেই শশিকিরণবিন্যাস অনারুত হানে বলা-চর্চামনে অনারুতহে শাশ্বতচিত্ত মর্ষিরে চায় দেহ ও সারগাণ্যুর্ন দৃষ্টিতে সকলের সেই-প্রত্যয় ব্যাকুলতা হইয় করত অসুপসাগ্রান্তত ম্যা-পুতীম্যায়ো উল্লিখিত হরিদ্বার-তীরের সর্বোচ্চ কুস্তর ও বহুপুণ্যলভ্য, কন্থলের ভৌগোলিক-সম্বলনে ও তাহার মাথায় প্রকৃতি পৌরাণিক দৃষ্টান্তনিয়ম সকলকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্থলগতি ও স্থগতীর ভাবপূর্ণ অমৃত-ময় বচনাবলি শ্রবণ করিতে করিতে অতকালে তৎ-সহচরীরবর্গের হৃদয় এতই সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়াছিল যে, তাহার অতকালে সেই প্রাকৃতিক তীর উপাশ্রয়ে বিম্বিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কন্থলে প্রায় লোক প্রেরিত হইল, তাহার আশ্বিত্যে প্রায় দুই বটকা বিলম্ব হয়। কিন্তু স্বামীজীর আলৌকিক ভাবপূর্ণ পুণ্যলভ্যপর্বা-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলে এতদূর তলাস্তরিত হইয়াছিল যে, এই ধ্বননীর অবশ্যতও তৎ-দীর্ঘ কালকে তাহার দুই এক দফের চায় দেহ করিয়াছিল। কাশ্য পূর্ণপ্রেরিত লোক কিয়দা আমরা যখন সন্ধ্যা নির্গত, স্বামীজীর জন্ম অঞ্চলি ভীম্যাম ও অপর সকলের জ্যাগি দৃষ্টয়া বাইবার জন্ত চারিবাশি পোশাকটি উপস্থিত হইয়াছে, তখন সকলেই আত্মবিশ্বাসভরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিল যে, “হুমি বোড় জোশেরও অধিক পথ ষ্টেশন

করিয়াওত অন্ন সময়ের মধ্যে প্রত্যাপূর্ণ হইল?” রাতিবাসে সকলের আরোহণ জন্ত অধঃশকট পাওয়া উদ্ভবত বিবেচনায় সংকলন এই পরামর্শ স্থির হইল যে, স্বামীজীকে তাক্সমে চড়াইয়া ত্রুণটির পশ্চাতে সকল পোশাকটি বীরাধায় ত্রুণটির বিপরীত করিয়া আমরা সকলে হাঁটাইয়া কন্থলে বাইব। পূর্বেই বলা হইয়াছে,—চন্দ্রোদয় প্রকৃত-লিঙ্গ মূল্য প্রকাশিত থাকায় অধিকার জন্ম প্রোশা-ভবের সম্ভাবনা ছিল না। এই পরামর্শদ্বারা এই পরিপূর্ণ পোশাক এবং তাহার পশ্চাতে স্বামীজীর সন্ধ্যারি-কর্ণ বাইরে বাইরে পশ্চিম-কৃত জ্যোতিষলোকে পার্শ্বত পথ দেখিতে দেখিতে চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথে হইতেই কত কোন মনে ছিল না বটে, কিন্তু পন্থাবাপিত পথের-নিশি-নিম্ন চতুর্ভুত পশ্চিম হইয়া সকলকে বিস্তৃত করিয়াছিল। এই প্রকার মর্শ্বভিত্তি চলিতে চলিতে আমরা প্রায় দেড়-ষট্টি কন্থলে উপস্থিত হইলাম। কন্থলের পশ্চিম-ভাগে নদীর পর্যন্ত-পশ্চিম দিয়া একটি অল্পপরিমাণে বড় বাল উত্তর-দক্ষিণ-দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে। তাহারই পূর্বপার্শ্বে একটি বৃহৎশত বাগানে আমাদের সকলের বাসস্থান পরিবর্তিত হইল। আমরা সকলে সেই উদ্যানলভ্যবাহী পথের বাসে একটি প্রকাশন করত সেই বাগানে প্রবেশ করিলাম। বাগানের মাথানে একখানি আটকালা, তাহার মধ্যে স্বামীজীর বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। আটকালায় স্থবিস্তৃত চারি দিকের রোয়াকে প্রায় বিম্বভিত্তি জন লোকের মামোশে-পায়ে হান ছিল। সেই আটকালা চারিদিকে চারিটা বিস্তৃত পথ ও তাহার দুই পার্শ্বে নানাভাষায় মুগ্ধকি পুষ্পজলিত। সেই পথ চারিটাির মধ্যে যে পথটা পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়াছে তাহার হইতে বাইরে বাইবার জন্ম প্রস্তুত হয়। একটি স্থবিস্তৃত ফাটক পর্যন্ত আসিয়া এই পথটা নিম্নস্ত হইয়াছে। সেই ফাটকটির দক্ষিণে ৪৫ হুতয়ে দক্ষিণ-বাহী পথের একটি পশ্চিম বাত অতিপ্রজ্ঞাপ্রবাহে ও তর-তর-বেগে কা-কুপ্লাবী সালিননিম্নে লক্ষ্যকণের নান মন হরণ করিতেছে। আর তিনটা উদ্যানমধ্যস্থিত পথের দুই পার্শ্বে আরও সন্ধ্যা সন্ধ্যারি-কর্ণ জন্ম অনেকগুলি বড়ের গৃহ নির্মিত ছিল। তাহাইই মাঠে সকলে নিজ নিজ সুবিধামতে আপনান রীতিস-কন্য কন্যা করিয়া দিল। “হান” মর্শ্বপরিমাণে

থাকায়, কাহাকেও কোন প্রকার অনুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। রাত্রিই এই সময় স্থান দেখিয়া আমরাও একটি নির্দেশ, সুবিধামতে ছোট গৃহ অধিকার করিয়া বসিলাম। পথে নানা প্রকার পরিগ্রমে সকলেরই শরীর বিশেষ ক্রান্ত হওয়াতে সেই রাত্রিতে সকলে আর কোন প্রকার আহার্যারি উন্মোচন না করিয়া, কোন প্রকারে বিছানা পাতিয়া নিম্নার সর্বসংস্থাপ-সন্ধ্যারক জোড়ো নিজ নিজ প্রাণে শরীর সমর্থন করিল।

১২ই চৈত্র প্রত্যতে-উট্টিয়া আমরা হরিদ্বারে যানবাহে উদ্ভুক্ত হইলাম। পরিবেশ বঙ্গালি চাকরের হস্তে দিয়া আমরা জনকয়েক যুগলী, স্বামীজীর আন্তা লইয়া কন্থলের মধ্য দিয়া হরিদ্বারে যাওয়া করিলাম। বলিতে, ভুলঞ্জী গিয়াছিল, পূর্বরাত্রিতে যখন আমরা কন্থল-ষ্টেশনে (জলাপুর্ন) অবতরণ করি, সেই সময়ই সরকারী লোক আমাদের প্রত্যেককে এক আনা পয়সা এক একখানি টিকিট লগ-হাইতে বাধ্য করিয়াছিল। কন্থলের বাজারে প্রবেশ করিবার মধ্যে একখানি বড়ের ঘরে জনকয়েক-পুলিশ-ভাগে নদীর পর্যন্ত-পশ্চিম দিয়া একটি অল্পপরিমাণে বড় বাল উত্তর-দক্ষিণ-দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে। তাহারই পূর্বপার্শ্বে একটি বৃহৎশত বাগানে আমাদের সকলের বাসস্থান পরিবর্তিত হইল। আমরা সকলে সেই উদ্যানলভ্যবাহী পথের বাসে একটি প্রকাশন করত সেই বাগানে প্রবেশ করিলাম। বাগানের মাথানে একখানি আটকালা, তাহার মধ্যে স্বামীজীর বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। আটকালায় স্থবিস্তৃত চারি দিকের রোয়াকে প্রায় বিম্বভিত্তি জন লোকের মামোশে-পায়ে হান ছিল। সেই আটকালা চারিদিকে চারিটা বিস্তৃত পথ ও তাহার দুই পার্শ্বে নানাভাষায় মুগ্ধকি পুষ্পজলিত। সেই পথ চারিটাির মধ্যে যে পথটা পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়াছে তাহার হইতে বাইরে বাইবার জন্ম প্রস্তুত হয়। একটি স্থবিস্তৃত ফাটক পর্যন্ত আসিয়া এই পথটা নিম্নস্ত হইয়াছে। সেই ফাটকটির দক্ষিণে ৪৫ হুতয়ে দক্ষিণ-বাহী পথের একটি পশ্চিম বাত অতিপ্রজ্ঞাপ্রবাহে ও তর-তর-বেগে কা-কুপ্লাবী সালিননিম্নে লক্ষ্যকণের নান মন হরণ করিতেছে। আর তিনটা উদ্যানমধ্যস্থিত পথের দুই পার্শ্বে আরও সন্ধ্যা সন্ধ্যারি-কর্ণ জন্ম অনেকগুলি বড়ের গৃহ নির্মিত ছিল। তাহাইই মাঠে সকলে নিজ নিজ সুবিধামতে আপনান রীতিস-কন্য কন্যা করিয়া দিল। “হান” মর্শ্বপরিমাণে

হঠাৎ এই প্রকার ধারণা হয়, যেন এই সুপ্রশস্ত জনপুত্র শিরকারী-সমলকৃত পদমণ্ডলী বিহীন নিচিয়াম শোভিত প্রমোদাবলির ভিতরে না জানি কি অনিচ্ছাচরিতীয় গৃহ সমিতিও থাকিবে। কিন্তু ভিতরে অংশুপ করিলে হৃদয়ে আর সে বিশ্বাস থাকে না। এতদুপেক্ষে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি একতলা গৃহ ও মধ্যবিত্ত মুকুন্দী, কোথায় বা বড় বড় ধুমকেশরিত বিস্তৃত প্রাচীর ভিন্ন আর কিছুই নাই। বাহিরে বাটের এক সৌন্দর্য্য-ভিতরে কিছুই নাই—মন যেন ফাঁকা বলিয়া বোধ হয়। যেন গুল্মশাটপাটর মূৰ্খ—বাহিরে কলিঙ্গ বোম্বাইয়া বসিয়া আছে। কনকশ্য নদরী দীর্ঘ প্রায় এক মাইল হইবে। আমরা মনর ছাড়াইয়া বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এখানেও জন-সংখ্যা কম নহে। ছোকের মধ্যে অধিকাংশই পঞ্চায়েশীল। তাহাদের মধ্যেও ক্রীণালেকের সংখ্যাই অধিক। কনকশ্য ছাড়িয়া হরিদ্বারে বাইতে প্রায় মেড মাইল পথ চলিতে হয়।

পথের হই পাৰ্শ্বেই মধ্যে মধ্যে মানুষসিহের রূপ বড় আশ্চর্য। কৌপীনধারী জটানুভিত্ত মস্তক ভদ্রাচ্ছাদিতসমুদ্র সমুদ্রাঙ্গুলি ইতস্ততঃ বিদ্যায় আছেন। কেহ বুদী জালিয়া মুদ্রিত-নয়নে নীরবে চ্যান-মণি। কেহ বা নিজ সমুদ্রাঙ্গুলি পুষ্টক লগ্নায় জর্ঘ-চিহ্নায় সমুদ্রিতহৃদয়। কেহ বা একবারেই সৌর্য-চন্দ্রশ্রেণীর পরমাঙ্গুলিগণনে সমাসল-মানস। একটা একটা আশ্চর্য্য গণনাপেশী এক-দণ্ডের উপর বিস্তৃত দ্বন্দ্বশৃঙ্গার-চিহ্নাক্রিত পতাকা সপ্তসজ্জের শূভে বাহুতে তুলিয়া করিতেছে। কোন কোন ঘূমে বহুতর লোক একজন মানসিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই সকল ব্যাপার বিলম্বমান করিতে করিতে আমরা হরিদ্বারের নিকট-বর্তী হইলাম। হরিদ্বারে কনকশ্যের পথে প্রবেশ করিতে হইলে সর্বপ্রথমেই একটা ব্রহ্মণ্ড ও হুপরি-বৃত্তে এসে পান হইতে হইবে। এই ব্রহ্মণ্ড সঙ্কট-চীত উপর দণ্ডায়মান হইয়া নৃবাহু বাকি যখন কল্পদ্বারে প্রাকৃত শোভানিচয়ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে, তৎকালে প্রাকৃত স্রাব্য কি যে এক অনির্দিষ্ট-নয় ভাবে উন্নতি হয়, তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। যে দেখিয়াছে, সেই বৃত্তিতে পারিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পুন্ড্রী পান হইয়া উত্তরাভিমুখে পদার জট দিয়া হরিদ্বার ব্রহ্মণ্ডভিত্তের বাইতে পায়। এই পথে বাইতে হইলে, প্রথমেই পথের পশ্চিম

তালে দ্বৈত-উচ্চ ভূভাগের উপর দস্তাবেজ-মতাদ্ব-বায়ী সমুদ্রাঙ্গুলির এক স্থবিস্তৃত আশ্রয়। পূর্বের মাধ্যমধ্যেই পদার উপরই স্থবিস্তৃত লোহিতবর্ণ চন্দ্রাতপের মধ্যে উচ্চ সমুদ্রাঙ্গুলির আরাধ্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। রৌদ্রাশ্রয় আসা-সোটা নদীয়া উল্লসপ্রায় সমুদ্রানিচয় সেমুদ্রিত চারি পার্শ্বেই প্রবাহীর কার্য করিতেছে। এই হান অতিক্রম করিয়া আমরা ক্রমশ বহুই ব্রহ্মণ্ডভিত্তের প্রসঙ্গ হইতে লাগিলাম, কনকশ্য ততই ভীতরূপে প্রভাত হইতে লাগিল। ব্যতিক্রমের মানসিকতার সৌকর্যের জন্ম চারিদিক মন লোকপা পূর্ণ নির্মিত হইয়াছিল। আমরা যখন ব্রহ্মণ্ডে উপস্থিত হইলাম, সেই সময় লোক প্রায় চটা ব্যক্তিগণের। হান, আশ্রিক, তপণ ও দর্শনাদি করিতে আমাদের বহুই বটকাল অতিবাহিত হইল, ক্রমে রৌদ্রের উত্তাপ অতি প্রবল বোধ হইলগত। আমরা সকল ক্রমপনে কনকশ্যভিত্তের প্রভাবজনক কনকশ্য। আদিত্যে প্রায় দেড়টাকাল অতিবাহিত হইল। বামায় বাসিয়া যথেষ্টরূপে আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা যেন। রেলো পাঁচটার সময় স্বামীজীর নিকট গমন করিলাম।

সুপ্রশস্ত বেদীর মধ্যভাগে একই উচ্চ আসনে স্বামীজী বসিয়া আছেন। প্রায় দেড়টাকাল হামোকে বৈদ্যপুস্তক বসিয়া আছে। স্বামীজীর নিকটে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় হরিদ্বার শাস্ত্রী, শ্রীধর শাস্ত্রী-প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ উপবেশন করিয়া শাস্ত্রার্থ-বিশ্লেষণ করিতেছেন। অনেক বৈদ্য চৈত্রিয়া স্বামীজীর নিকটে বসিয়া গেল। স্বামীজী মাধ্যম্য জলধন পূর্ব্বক চিত্তার তনিয়েছেন। হরিদ্বার শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রায় মাত অশ্বলম্বন করিয়া হোমি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত হইতেছেন। স্বামীজীর ভক্তসঙ্গে পরিচিতি হইয়া আমি বৈদ্য-মতের সমালোচনা করিবার করিতে প্রস্তুত করিলাম। পদপাশ বাম-প্রতিভার প্রায় দেড় বটী কাল অতিবাহিত হইল। সম্ভার সময় উপস্থিত দেখিয়া সে দিন বিচার সেই পণ্ডিত স্বজিত হইল; শিষ্য হইল, সন্তান হইল। এই প্রকার শাস্ত্রীয় বিচার প্রতিদিনই বৈদ্যকালে হইত, প্রাতঃকালি কার্য বর্ণনায় এ বিশেষক বিশেষ যত্ন অত্যাশ্রয় করা গেল না। সম্ভার বসন করিতে আমরা কনকশ্য ভীষণতরঙ্গের নিয়ে প্রভাতটো গমন করিলাম। কনকশ্য নদরী অতি সুন্দর। দীর্ঘতায় তাহা এক মাইল হইতে পারে। কিন্তু বিস্তারে অসম মাইলও হইল না। প্রভাতের

দুই দ্বিতীয়া পর্য্যায়না ও দুই একটা সেরালয় প্রভৃৎ। প্রভাতের প্রাকৃত শোভা দেখিলে সকলেরই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃত হয়। হরিদ্বারে যানের অজ্ঞা ও শোভাটির বিশেষ ক্রম প্রকৃত অনেক লোক কনকশ্যের বাস করিতেছিল। এইরূপ সর্ব্বদাই বহুতর মহত্বের কলকাল লক্ষিতে কনকশ্য সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হইত। দলেকশরের নিয়ে উদাসী সমুদ্রাঙ্গুলির একটি অতি বিস্তৃত আশ্রয় ভাগ্য-বৈশিষ্ট হইয়াছিল। খোড়া, হাতী, উট, ভ্রূ, বয়েদী গাড়ী প্রভৃতি রাজকীয় সরঞ্জামে এই আশ্রয় পরিচালিত ছিল। অনুসন্ধান সমুদ্রাঙ্গী এই আশ্রয়দায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কনকশ্য হইতে প্রায় দ্বিগুণ দূরতর সময় বাসায় প্রভাতবৃত্ত হইলাম। এই প্রকার ভাবে যিনিহান অনেক সহিত দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। স্বামীজীর তৎকালি প্রতি দ্বিতীয় কার্য এই রূপে উল্লেখ করিয়া রাখি। স্বামীজী হরিদ্বারে আসিয়া-ছেন, প্রবণ করিয়া, মহাজনন অতি হর্বো-হুম্ব হইয়াছিলেন। সকলেই নিজ নিজ সাধ্যার্থ্যসারে স্বামীজীর সেরা বিশেষ বায় করিয়াছিলেন। প্রতি-দিন ১০।১০ মণ ময়রা, ৩০ মণ দূত, তদুপস্থিত চাউল, হাইল, লবণ, তরকারী ও কাঠ এক একজন মহাজনের নিকট হইতে প্রাতঃকালে স্বামীজীর সেরা উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রভাত-প্রভাত চারিদিক লোক ও সকল দ্রব্য অভ্যাস অতি-বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া সম্মান পূর্ব্বক অম্বলম্বন করিতে সমর্থ হইত না। প্রত্যেক অভ্যাসের জন্ম অর্জ্বনের আশী, অর্জ্বন দ্বিত, তৎপরিমিত হাইল, লবণ, কাঠ ও তরকারী খা-বিত্ততাবে নির্দিষ্ট ছিল। হরিদ্বার উপর দ্বন্দ্বান মহাজনন কেহ এক মহত্ব, কেহ বা দুই মহত্ব মুদ্রা স্বামীজীর চরণোপাঙ্গে রাখিয়া প্রার্থনা করিতেন যে, এই হান রাজ্য পণ্ডিতগণের সজা কনাইয়া বিদায় করুন। এই প্রকার সভা প্রায় প্রতিদিন হইত। কোন দিন দুই শত, কোন দিন বা চারি শত বিনিষ্ট-দ্রাব্যদান আশ্রয় করিয়া অর্জ্বনগণের কোন দিন পাঁচ টাকা, কোন দিন চারি টাকা, কোন দিন বা দুই টাকা করিয়া প্রত্যেককে বিদায় প্রদান করা হইত। এতদ্বিত প্রতিদিন অন্যান্য চারি মহত্ব বা পদ সহস্র আশ্রয় লোক স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিত। ইহার মধ্যে অনেকেরই নানা প্রকার নিষ্ঠার ও নিজ নিজ সাধ্যার্থ্যসারে টাকা প্রদান করিত। এ

মিষ্টায় কোন কোন দিন ৩ মণেরও অধিক হইত। বৈদ্যকালে এক সপ্তম মিষ্টায় স্বামীজীর বারো দান দার-পূর্ব্বক বিভণ্ড করা হইত। এই সকল প্রাতঃকাল দান প্রতিদিনই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন সমুদ্র সমুদ্র সমুদ্রাঙ্গী, ব্রহ্মচারী, মহাজন, জমিদার, মধ্যবিত্ত পুত্র ও অধিকন দারিদ্র কৃত আশ্রয়ে লাগিল, তাহারা ইচ্ছা করা অতি সুকৃতিস ব্যাপার হইয়া উঠিল। কুন্তের দিবস বহুই নিকট-বর্তী হইতে লাগিল। জনগণ্যও ততই উত্তরোত্তর অধিকন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেখানৈক্য মন করা ব্যা, চারিদিক হইতে অগণন মহত্বের অমূল্য কলক শনি, উত্তর-উত্তরমালা-মহুগ-কলমির ভায় স্বপ্নবনের, গ্রাম সর্ব্বদাই প্রবণতর প্রভিত হইতে লাগিল। আমরা এই সময় প্রায় প্রতিদিনবহুই অপর্য্যক জনতা দেখিবার জন্ম হরিদ্বারে গমন করিতাম।

একদিন ভারতবর্ষমানসের মহামায়া শ্রীদীন-দারিদ্র পণ্ডিত হরিদ্বারে মহামিষ্টগণের অমূল্যদান করিতে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেরই বর্ণা দিগন্তে, দীনদয়াল পণ্ডিত মহামিষ্টগণের বিভাজনে প্রকৃত করেন যে, “স্বামী বিভাজনন দ্বন্দ্ববিত্ত মহামিষ্টগণে সভাপণ্ডিত পদে অবস্থিত হইলেন।” এতদ্বিত মহামিষ্টগণের অধিবেশনের দিন নিকটবর্তী দেখিয়া তিনি স্বামীজীকে মহামিষ্টগণে সভাপণ্ডিত-রূপে যোগ দিবার জন্ম বিশেষ আগ্রহপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। পাঠকগণকে পূর্ব্বেরই আমরা অধ্যাত কনাইয়াছি যে, স্বামীজী স্বামীজী না করিলেও দীনদয়াল পণ্ডিত নিজ ইচ্ছা-সারেই প্রকৃতর বিভাজন প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে যাহা হইক, পণ্ডিত দীনদয়াল শ্রী বিশেষ আগ্রহপূর্ব্বক স্বামীজীর নিকট নিজ প্রার্থনা-বাক্য বিভাজন করিলে স্বামীজী প্রভাব করিলেন যে, “দেখন, দীনদয়াল স্বামীজী বিশেষ সমুদ্রাঙ্গল প্রকাশ করণার্থ উৎসাহ-প্রদানগিত ধর্ম্মাঙ্গলগণ দেখিয়া আমি বিশেষপুণ্ডিত অর্জ্বন, তাহাতে সমর্থ নাই; কিন্তু এই প্রকার ধর্ম্মাঙ্গলগণ দেখে অতিবিক্রিত ভাব আমরা জন-প্রাচীর হয়, তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হই। তাহার প্রতিবিশ্ব হুণ্য প্রকাশ কল্পিয়াও থাকি। ভারত-ধর্ম্মাঙ্গলগণ উল্লেখ অতি সহ;—অত্যাশ্রয় ভায় তাহার বিশেষ পূর্ণপাঠ করিয়াও থাকি; কিন্তু তৎসমুদ্রাঙ্গল এই মহামিষ্টগণের যেন আমরা ভাল লাগিতেছে না। তাহার কারণ বাহ্য, কীটনা বহুই

বক্তৃতা করিয়া বা সংবাদপত্রে লিখিয়া ধর্মের বহুল প্রচার করি না কেন, বহু দিন পর্যন্ত আমরা একটা আশার ধামিক সম্প্রদায়কে লোকের নিকট প্রকাশ করিতে না পারি, তত দিন কখনই ধর্মপ্রচারণার কোন কল্পই লাভ করিতে সমর্থ হইব না। তাহার কারণ, আমরা না পাইলে সাধারণ লোকের চিত্তবৃত্তি মনন ভাঙ্গি দ্বিষ্ট হইতেই পারে না। অতএব এই 'মহর্ষিগণ্ডল' নাম স্তম্ভলই সাধারণ লোকের বিবেচনা করিবে, এই মহর্ষিগণ্ডল বৃষ্টি প্রাচীন যক্ষ্মাসমাজের আদর্শগত মহর্ষিগণ্ডলকে দ্বারা আদর্শগত লোকের দেখাইতে প্রস্তুত হইয়াছে; শুধু লোকের বিবেচনা তাহা নহে, আপনিও মহর্ষিগণ্ডলের দেশ্যশক্তি বিজ্ঞাপনের ও এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া তাহাদের সেই সংশয়কার বৃত্তিকে নিশ্চয়ে পূর্ণবিশ্বাস করিয়াছেন; কিন্তু কার্যে তাপনি মহর্ষিগণ্ডলের ঘরায় লোকের সেই আশা পূর্ণ করার কি চেষ্টা করিয়াছেন? বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তাহা করিতে পারেন নাই। আমি মহর্ষিগণ্ডল দেখে লিতে প্রস্তুত আছি—যদি মহর্ষিগণ্ডল, মহর্ষিগণ্ডলের অল্প-কাল কার্য করিতে প্রস্তুত হন। মহর্ষিগণ্ডলের অল্প-কাল কার্য কি প্রকার, তাহাও আমার বিবেচনাসূত্রে বর্ণন করিতেছি। মহর্ষিগণ্ডলের আদর্শগত পণ্ডিত আদর্শ ব্যক্তিকে কেহই সত্য হইতে পারিবেন না ও বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক সভ্যের কল্প বস্তুর পবিত্র আসন বিস্তৃত থাকিবে; দণ্ডায়মান হইয়া পারি সাহসের ভাষা অঙ্গুলি বাধা মুখে আসিবে, তাহাই বক্তা বলিতে পারিবেন না। ধর্ম-বিষয়ে কোন বক্তৃতা দিতে হইলে, সোমাসাধারণ বিষয়ে কোন বক্তৃতা দিতে হইলে, অতএব আমি ধর্ম-বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহার সোমাসাধারণ জ্ঞান বাক্য আশ্রয়। একটা নির্দিষ্ট আদর্শ উপলব্ধ করিয়া শ্রোতৃগণের নিকটে রাখিয়া শ্রোতৃগণ-বসনাসূত্রে বক্তৃতা শোভা বস্তুর অবশ্য কার্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। প্রত্যেক সভ্যকে প্যায় অর্থ দ্বারা সংস্কার করিয়া আসনে বসাইতে হইবে এবং সভ্যভঙ্গের সময় প্রত্যেককে গন্ধমালা ও মধ্যাঙ্গুলি দানকার দ্বারা পূজা করিয়া দ্বিগুণ দান করিতে হইবে। সভ্যগণ কেহই অর্পণশক্তি ভাষায় বাহা হইছে, তাহা ভগবান কেহই অর্পণশক্তি ভাষায় বাহা হইছে, তাহা কেহই অল্প কোন বক্তৃতা মহর্ষিগণ্ডলে কেহই করিতে পারিবেন না। এই সকল বিষয় যদি মহর্ষিগণ্ডল করিতে পারিত হইত, তাহা হইলে, তাহা করিতে পারিত হইত।

আনন্দিত ভাবে আগ্রহের সহিত ধর্মমহামণ্ডলের মহর্ষিগণ্ডলে যোগ দিতে সীতাত আছি।

ধর্মোজ্জ্বল এই সকল কথা পরিপূর্ণত দ্বারা ধর্মোজ্জ্বল কোন প্রকার উত্তর না দিয়া, অতএব বসনে ধর্মোজ্জ্বল নিকট হইতে বিশাখা গ্রহণ করিলে। তাহার পর আরও দুই দিন তিনি আশ্রয়ালয়ে, এবং নানা যুক্তি দ্বারা ধর্মোজ্জ্বল প্রস্তাব এখার কার্যে পরিণত করা, ইচ্ছা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু ধর্মোজ্জ্বল তাহাতে নির্ভর না করিয়া পুনর্বার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে আদেশ করেন। পণ্ডিত দীনদয়াল নিমন্ত্রণ আগ্রহ করিয়াও বসনে বসিলেন, ধর্মোজ্জ্বল তাহাতে নির্ভর না করিয়া, তখন একটা বসনে প্রস্তুত করিলেন। তাহার পর বোধ হয়, ধর্মোজ্জ্বলগণের ওস্তাদসকলসহ যোগ দিতে আসেন, তারপরও ধর্মোজ্জ্বল মহর্ষিগণ্ডলে ধর্মোজ্জ্বল উপস্থিত হন নাই।

২৮শে চৈত্র প্রাতঃকালে আমরা তারমণ্ডলে সংবাদ পাইলাম যে, "মহারাজ কাম্বোজপাণ্ডিত অল্প-কাল-সমভিষায়ে, কুশল, মান ও ধর্মোজ্জ্বল চরণ বর্শন করিতে ২৮শে চৈত্র হরিবার পৌরুষিণে।" এ দিবসই মহারাজের অনেক অল্প-চরণ হরিবার উপস্থিত হইল এবং মহারাজের আশ্রয়কার অধ্যায়িণ ধর্মোজ্জ্বল সহযোগিতা করিতে আসত হইল।

২৮শে চৈত্র বেলা ৮টার সময় মহারাজ প্রতাপ-সিংহ অল্প-কাল-সমভিষায়ে হরিবার উপস্থিত হইলেন। হরিবারে ব্রহ্মসুত্রের উপনিষাদে প্রস্তুত রাজসভায় মহারাজ অধিষ্ঠিত করিলেন এবং নিজ একজন পরিষদের দ্বারা কনকধ্বজ ধর্মোজ্জ্বল নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, "যদি রাজ্যে হুগত বলি রাজ্যে সন্তা সময়ে শ্রীচরণোপাস্তে উপস্থিত হইব।"

পরিষদের নিকট মহারাজের অতি বিনীত প্রার্থনাবাক্য প্রবণ করিয়া, ধর্মোজ্জ্বল প্রথম বসনে উত্তর করিলেন, "যদি, মহারাজকে আমার অনন্ত আশীর্বাদ জ্ঞাপন কর। তাহাকে কহ যে, মহারাজ ব্রহ্মসুত্রের হুগত পুত্রগণের হুগত বসন দর্শন করিতে আমার হৃদয় পুত্রগণের হুগত বসন দর্শন আছে। তাহাদের বসন ইচ্ছা, আশ্রয়ালে আমার দর্শন করিয়া যাইতে পারেন। এ বিষয় বিজ্ঞানসাধক, অতি নিম্নের, পরিচয় মাত্র।" রাজপারিষদ-অধিবেশনান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু সন্তা সময় উপস্থিত। আমরা সকলেই মহারাজ প্রতাপসিংহের আপনাম প্রতীক্য করিতেছি, স্বয়ং অন্ধকার সন্ধিত হইতে লাগিল, এমন সময় মহারাজ প্রতাপসিংহ—রাজা রামসিংহ ও রাজা অমরসিংহের সহিত ধর্মোজ্জ্বল চরণোপাস্তে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ ও তাঁহার অল্প-কাল-সমভিষা অতি সামান্য কনকধ্বজ ছিল। শুভ মনসেরে পায়লাসা, পুরী পিণ্ড ও শুভ উচ্চারণে ভূমিত অতি হুগতভাবে সেই রাজ্য-রাজ্যের দেখিয়া হুগত কি জানি এক একটাভাবে আশ্রয় হইয়া উঠিল। মহারাজ প্রতাপসিংহ, মধ্যমভাষা রাজা রামসিংহ—দেখিবে একবার; মধ্যমভাষা উভয়েই মারলা ও বিন্দুর পূর্ণ ছায়া সন্ধিত রহিয়াছে। ঐশ্বর্য-নিবন্ধন অভিমানে প্রতিক্রিয়া বোধ হয় যে কখনও কখনই প্রতিভা হইবে নাই। কলিত্রাজ্যের তাঁর উগ্রতা উভয়ের আত্মভিত্তিই বিশেষরূপে পরিগণিত হইল না। কিন্তু কলিত্রাজ্য রাজা অমরসিংহ দেখিতে চোখে লাভ্যর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক-প্রকৃতি। তাহার দ্বারা বিদ্যমান সন্তা, দূর ও পূর্ণ। তদীয় উজ্জল চক্ষুগণে উজ্জ্বলিত এবং কলিত্র-কলিত্রিতা পূর্ণ স্পষ্টই প্রতিভাসিত হইতেছে। দেখিতেও চোখে-হুগত হইতে বিশেষ হুগত বলিয়া বোধ হইল। তাহার প্রত্যেক-অঙ্গুলিলাই যেন তাঁহার হৃদয়ের বল-বিশেষ প্রকাশপদ-পূর্ণা বিদ্যমান প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

মহারাজ প্রতাপসিংহ, প্রবেশ করিয়াই ধর্মোজ্জ্বল চরণদ্বয়ের উপর নিজ মস্তক স্থাপন করত অধি-বীরসুরে অঙ্গপরিবৃত-নয়নে, বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মহারাজ! ভবন! এ সীমাসরে আমার আপনায় বলিয়া বাহা কিছু ছিল, ঐশ্বরের পণ্ডিত-ইচ্ছা-প্রভাবে তাহা বোধ হয়, একে একে সকলই সিদ্ধাছে। একবার আশা ও বিশ্বাসের পাত্র ঐ সময় পূর্ণ হইবে, এখনি প্রকাশ আশা আছে বলিয়া, এপ্রাণ ও অধম দেখে এখনিও পরিচয় করিয়া দিতে হইবে না। প্রত্যে। এই চারিদিকে শ্রুতগণের সন্তা প্রকাশ দ্বারা, এখন পণ্ডিত চরণগণ সন্তা, সন্তাময় অক্লান্ত ও বহুপাণ্ডিত মিত্রের উপর নির্ভর করিয়া এই অক্লান্ত এখনিও কার্যকর হইবে—অব-সর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই নাই। আমি বিজ্ঞানসাধক-আপনার শ্রীচরণ দর্শন করি ও আপনাকে কাম্বোজ

হইয়া বাইব বলিয়াই অনেক বাধা-বিপত্তি হুগত করিয়া, অনেক হুগতের হুগত আশ্রয় প্রদান করিয়া, হরিবারে আনন্দিত। আশা আছে, বিশ্বাস আছে, আপনি "ভক্তবৎসল"—আমার এই অভিলাষা নিশ্চয়ই সন্তা করিবেন।

অঙ্গপরিবৃত-নয়নে প্রকাশপদ মহারাজ প্রতাপ-সিংহকে মস্তক করে ধারণ করিয়া ধর্মোজ্জ্বল ভূমি হইতে উঠাইলেন। প্রকাশ-পদ-সুরে আশ্রয়পূর্ণ-ইচ্ছায়ে, ধর্মোজ্জ্বল করিলেন, "মহারাজ প্রতাপ-সিংহ! আপনার অর্জুন ভক্তি, আপনার লোক-ভাষা পাঠ্য, আপনার ত্রিভোক্ত-বিদিত বিনীত ভাব ও আপনার একান্ত ধার্মিকতা আমাকে কি পরিসরে পরম কলিত্রাজ্যে, তাহা আমার হৃদয় ভিন্ন আর কে জানিবে? আপনার পণ্ডিতা আমাকে কখন কখন, এত বিহ্বল করিয়া তুলে যে, মস্তক সন্তা আমি তাহার প্রভাবে আদর্শ-সন্তিত বেরাশ্রয় বস্তু হইতেও পরিগণিতপ্রাণ হইয়া থাকি। মহারাজ! সত্যই বলিতেছি, ভাষা-কলিত্রাজ্য এমনি একটা বাধা আমি পুঞ্জিয়া পাই নাই, বাহা দ্বারা আমার হৃদয়ের অর্জ আশীর্বাদ-বাক্যের দ্বারা আমি জগতে প্রকাশ করি। মহারাজ! এই পণ্ডিত বলিয়াই আমি নিশ্চয় হইব। হে রথবীরের বংশধর মহারাজ প্রতাপসিংহ! আমি বাহা আশা করি, সন্তাময় আপনাকে তাহা সন্তাই প্রদান করুন। মহারাজ! বিদ্যমান পণ্ডিত হইয়া বিহ্বল হইবেন না। কলিত্রাজ্য করিয়া চুলন, কলিত্রাজ্য ব্যাঘ্র হইবেন না। ভবিষ্যতে আলোক বা অন্ধকার সেই আনন্দ-শক্তি-মানের অপ্রতিহত ইচ্ছার প্রভাবে অন্ধকারে বা আলোকে পরিণত হইতে অধিক উদ্যোগের অপেক্ষা করে না। মহারাজ! সন্তাই এই বাস্তবী বস্তু করিবেন যে, সন্তাময় না হইলে রাজার সিংহাসনে উপবেশন এক প্রকার নিশ্চয় মাত্র। আপনি নিশ্চয় সন্তাময়, বিবেচক ও লোকবাহার-দ্বিমাত্র। এ হুগত একজন ভাবে আপনাকে অধিক কলিত্রাজ্য বলি নিশ্চয়-জ্ঞান। রংস রামসিংহ! প্রিয়তম অমরসিংহ! ও মহারাজ প্রতাপসিংহ! 'বৃদ্ধ, সন্তাময় আদর্শ পুত্রগণ! এখনি আমার কথা বলি কিছু অঙ্গুলি বোধ হয়, তাহা হইলে আপনাদ্বারা তাহাতে বিরক্ত হইবেন না।' হৃদয়ের এই পুত্রগণকে আপনাদের ঐক্যতম কথা বলিতে প্রস্তুত হইতেছি। আশা আছে—অবহিত-জগতে ভ্রমণ করিবেন।

তেন। বগদাদী, দীর্ঘায়ু, ধার্মিক, নৃত্যবাদী, জিতে-
শির, পুরুষতা উৎপাদন করিতে তাহারের বিশেষ
বল ছিল। বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যে তাহার যথ
পটীতিসকল কর্তৃক সমস্ত হইতেই নানাবিধ নিয়মের
অনুসারে রাখিতে। বর্তমান সময়ের সাধারণতঃ
রমণীগণ তাহার একটা নিয়মও পালন করিতে পারেন
না—অথবা ইচ্ছাপূর্বক পালন করেন না।

হুজুতাবে আলোচনা করিলে পবিত্ররূপে
কোথা বায় যে, প্রাচীন সময়ে অর্থাৎ যে সময়ে
কম্বোজপ নানাবিধ হুনিময় প্রতিপালন করিতেন,
সে সময়ের মন্তব্যধর্ম ধার্মিক, সরলমতি, দীর্ঘায়ু,
বলিষ্ঠ ও নীরোগ হইতেন। আর বর্তমান সময়ের
রমণীগণের, সে সকল নিম্নমুখীতালান না করায়,
ফলও সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। বাহা হউক,
খ্রীস্টবাদ সম্বন্ধে আর্থোরা কি কি নিয়ম প্রতি-
পালন করিতেন, সংক্ষেপে তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত
করা হইল।

(১) শুভমুখের পরিচাভা।

এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টত্বের চরিত্রলিপিত আছে :—
“কম্বোজী হইলে, প্রথম তিন দিবস নিবানিমা,
দ্বিতীয় অক্সান-বহরগী, ত্রয়োদশ, পাতে গন্ধদ্রব্য
জপন, তৈলোক্তির্জন, নবমুখের, বেগে গমন,
অপ্ৰায় হাত, অধিক ব্যাক্য-করন, উচ্চ-স্বক-প্রবণ,
চুল আঁচড়ান, অধিক বায়ু-সেবন, অধিক পুশ্রম,
—এই সমস্তই পরিভাষ্য করিতে। কারণ এই সমস্ত
আচরণ দ্বারা আত্মা শোণিত দ্বিত হইয়া নানাবিধ
অনিষ্ট বহিতে পারে।

বিশেষতঃ শুভকালে উপবাস, ভাস, রুগ্মবেদন,
মলমূত্রনিষেধ, রমণ প্রকৃতি পীড়িত, আচরণ
দ্বারা বন্ধ-ওষাধিতে নানাবিধ অনিষ্ট, উপপত্তি
হইতে পারে। বলা বাহুল্য, মাতার কোমল সন্তানও
অসুস্থপূর্ণ ও দুর্বল-প্রকৃতি হইতে পারে।

বর্তমান সময়ের রমণীরা গুরুতর সমস্ত এ সকল
নিয়ম প্রায়ই প্রতিপালন করেন না।

(২) স্নান-সম্বন্ধের নিয়ম।

এ সম্বন্ধে মহাবি হুজুত বর্ণনা করেন :—
“শুভমুখীর প্রথম তিন রাত্রি বাস—সংবাদ-
পরিচর্যকর। কারণ প্রথম তিন দিবস অভিব্যেগে
শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাতে মসগর
করিলে বীজ অস্ত্রপ্রব্রিষ্ট হইতে পারে না। যদিও
কোন করণে বাহা অস্ত্রপ্রব্রিষ্ট হইতে পারে, তথাপি

অবিদ্যে। কারণ প্রথম দিবস মসগর করিলে
পুরুষের আত্মনয় হয় এবং তাহাতে গর্ভ-সমগার
হইলে তৎপরিণত সন্তান ভূমিত হইয়া, পরেই গতাশ
হয়। দ্বিতীয় দিবসেও উক্তরূপ ফল অথবা স্ত্রীকাল
গৃহেই সন্তান নিষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসে গর্ভ হইলে
সন্তান অসম্পূর্ণরূপে বা আত্মা হইয়া থাকে।

তদুত্তর রাত্রি হইতে গুরুতর ষোড়শ রাত্রি পর্যন্ত
কম্বোজ যত পরে গর্ভদান হয়, তদুত্তরোক্ত সন্তান
তত্তই অধিক-দীর্ঘায়ুতা ও বলবান হয়।

শুভ-শোণিতের উপরন্তু সংবাদেই গর্ভোৎ-
পত্তি হইবে বটে, কিন্তু উক্ত ও শোণিত বিতরণ
থাকিলে বিতরণ গর্ভ-সমগারের সন্তাননা। আর
বাহাদি রোগে শুক্র ও শোণিত দ্বিত থাকিলে,
তজ্ঞাত সন্তান দ্বিত অর্থাৎ হানাস, অসুখ ও রোগ-
দুগ্ধ হইতে পারে। কলত শুক্র-শোণিতের কোষেই
সন্তান অর্পণ ও সম্ভাব্য হইয়া থাকে। বর্তমান
সময়ে কি কি উপায়ে শুক্র ও শোণিত বিতরণ
থাকিতে পারে তাহা অনেকেরই জ্ঞাত নহে; ও অজ্ঞ
হইতেও কেহ চেষ্টা করেন না। এতদন্তর যে যে
নিয়মে বা উপায়ে বিতরণ থাকে, তৎসম্বন্ধে কতক
পরিমাণে বাহা জানা আছে, তাহাত অনেক “হু-
মায়ী” ও “কু” বলিয়া ধ্বংস সহিত উপেক্ষা করিয়া
থাকেন।

(৩) তিথিবিশেষে সংবাদ নিষেধ।

অর্থাৎ মহাবিরা আমবস্তা পূর্ণিমা ইত্যাদি
তিথিতে সংবাদ করিতে পুণ্যপুণ্য নিষেধ করিয়া
প্রিয়ছেন। সকলেরই জ্ঞাত আছে যে, আমবস্তা
ও পূর্ণিমা ইত্যাদি তিথিতে আমাদের দেশের সকলের
অবস্থা ভাবান্তর-হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই সময়ের
তিথিতে রান্যাক্য হয়। বলা বাহুল্য, শুক্রের উপা-
নামেও সম্ভাব্য অধিক হয়। সেই শুক্র দ্বারা গর্ভ-
উৎপত্তি হইলে সন্তানও অর্পণ ও দুর্বল-প্রকৃতি
হইবে।

(৪) গর্ভিণী-চর্যা।

এ সম্বন্ধে হুজুত, বাউতে ও তারপ্রকাশ
লিপিত আছে :—“উপবাস্তা অতিশয় পুরুষ-মসগর,
অধিক পরিভাষ্য, পর্জন্য, অতিশয় তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও
করুণাক্রম্য ভ্রোজন, নিবানিমা, রান্যাক্যপ্রবণ,
কোম, ভাস, খানার-আয়োজন, উচ্চ নীচ স্থানে উপ-
বেশন, কলতর ভাস-বহন, কৌশল, অধিক পান, গমন,
চিৎসহী শয়ন, বিরক্ত পার্শ্বদর্শন ইত্যাদি পরি-

ভাষণ করিবে। কারণ ইহাতে গর্ভিণীর ও সন্তানের
নানা পীড়া হইতে পারে।”

(৫) দিকভ্রমণের বিধি।

এ সম্বন্ধে মহাবি হুজুত বলেন :—গর্ভিণীর যে
যে জন্মে অভিব্যয় জন্মে, তাহা প্রাপ্ত না হইলে,
গর্ভের সন্তান অসম্পূর্ণ, কুজ, বিরক্তত, বোমা,
মাহানাসিক-ভারী, খোঁড়া, জ্বর, বামন, বিরক্তত,
ট্যারা অথবা অন্ধ হইতে পারে।

বাউতে লিপিত আছে :—“গর্ভাবস্থায় অবিকম্ব
বাহাদর ও রুগ্মাদি যথ আচার করিলে বায়ু প্রস-
পিত হইয়া গর্ভের সন্তানকে কুজ, অন্ধ, জ্বর, বামন
ও অজ্ঞা করিতে পারে। অধিকাংশ কল-বন্ধক
জন্ম আহার করিলে সন্তান পিত্তবর্ধ ও রোগা
এবং তাহার মস্তক কেশপত্ন হইতে পারে। অধি-
কাশ কন্দরক্কর জন্ম আহারে সন্তান পান্দুর্ধ ধল
রোগদুগ্ধ ও অজ্ঞাত পীড়া প্রকাশ পাইতে পারে।

বর্তমান সময়ের গর্ভাবস্থায় এদেশের কোন
দৈবের কি দোষ-তপ, তাহা প্রায়ই জ্ঞাত নহেন।
আমাদের মধ্যে অনেকেরই বদেষ-বৈতরী ও
কৃতবিত্য বলিয়া সমাজে পরিচিত। কেহ কেহ
চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্ত মাতঃ সমুদ্রের
পর্যায়ন্তে বাইরা কৃতবিত্য ও বড় বড় উপাধি লাভ
করিতে দেশে কিরিতা আনিয়াছেন। ঐ প্রকৃতি
কোন ঔষধ কি পথের শুণ্যও সম্বন্ধে তাঁহাণিককে
জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার হী করিতা চাটিয়া থাকেন।
মধ্যে মধ্যে ইংরেজেরা এদেশের গুরু ও পুণ্যবিত্য
শুণ্যও সম্বন্ধে যে সামান্য হু-এক কথা বলেন, তাহাই
আমাদের প্রাণনাথ। আমাদের দেশে কৈনও মাহাশা
বিশেষ পরীক্ষা ও আলোচনা করিয়া যে, কোন
তত্ত্ব প্রকাশ করিলে, সে আনা কথা। বাহা হউক,
বর্তমান সময়ের ছোট বড় ডাক্তার মহোদয়গণ এ
দেশের পথ্যবিত্য ও ঔষধের দোষও উৎকৃষ্টরূপে
জানেন না থাকায়, পথ্যবিত্যর দোষেও সময় সময়
নানা প্রকারে অনিষ্ট হইয়া থাকে।

(২) আধুনিক প্রসুতিগণের প্রাচীন

সুনিয়মের প্রাপ্তি উপেক্ষা।

অমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন রমণীগ্রন্থ
অনেকে প্রকারে কঠোর নিয়ম পালন করিয়া
বর্তমান সময়ের ঐহী “সকল সুনিয়ম হুজুতরূপে
প্রতিপালিত হয় না। আমাদের দেশের অবস্থা ও

প্রকৃতি অনুসারে প্রাচীন “নিয়মগুলি মর্দোবক্কর
ছিল। সে সকল নিয়ম পালন করিয়া প্রাচীন
রমণীরা, আধুনিক রমণীগণ অপেক্ষা সর্পদপ্রকারে
সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকিতেন এবং সন্তানাদিও বলিষ্ঠ,
দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইত। এখনও যে সকল স্থলে
মস্পূর্ণরূপে প্রাচীন নিয়ম প্রচলিত আছে, তথায়
প্রকৃতির ও সন্তানের অনিষ্ট হইতে প্রায়ই দেখা
যায় না।

(৩) বিলাসী ওষধ ও পথ্যাদির

ব্যবহার।

এদেশের প্রাচীন শরীর-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এ
দেশের জল, বায়ু ও মৃত্তিকার অতুল্য, ঔষধের
বীজ্যাকরণ, এদেশের দেশের প্রকৃতি অনুসারে
বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা যে সকল ঔষধ সেবনের নিয়ম
ও পথ্যাদি বিবরণ করিয়াছিলেন, সে সকল ঔষধ, নিয়ম
ও পথ্যাদি যেমন এদেশীয় লোকের উপকারী হইতে,
ভিন্নদেশীয় জল, বায়ু ও মৃত্তিকাদুগ্ধ এবং ভিন্ন-
দেশীয় প্রকৃতিতে পরীক্ষিত ঔষধাদি উক্তরূপ উপকারী
করনই হইতে পারে না। জগদীশ্বরের স্বকীয়কাল
বিশেষতঃ করিলে নিগমেরূপে জানা যায়, যে দেশে
যে প্রকার জল, বায়ু ও মৃত্তিকা, সেই দেশীয় লোকের
প্রকৃতি অনুসারে। ঐ প্রকৃতি অনুসারে ঔষধাদি,
জল, বায়ু ও মৃত্তিকা অনুসারে সেই দেশের জন্ম
থাকে। তাহারকর্ত্তি-কৌশলে, সেই দেশের জন্ম,
তাহাদের প্রয়োজনীয় অব্যবসায় পুষ্টিবীর সেই থণ্ডেই
প্রায় ঔষধ হইয়া থাকে। সন্ত-প্রধান-মহাশাস্ত্রীরা
যত পরিশ্রমে মাহামাস ভজন করিয়া সুস্থ থাকেন,
এতকালীয়া তৎপরিমানে মাহা-মাংস ভজন করিয়া
নানা প্রকার রোগ-রেশে পীড়িত হইলে। আমাদের
জন্ম ভারতবর্ষে, আমরা পূর্বমাহাজুতের এক প্রকার
প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকি; আমাদের প্রকৃতি
অনুলব্ধ পরীক্ষা এবং প্রাণরক্ষক ঔষধ ও পথ্যাদি
সমুদ্র-পারাত্তর ভূগর্ভ হইতেও যে, যত ইচ্ছাছে,—
ইহা কোন কৃত্তিকাই আনিসে না।

প্রাচীন অর্ধেকদুগ্ধ পণ্ডিতগণ এদেশীয় লোকের
প্রকৃতি অনুসারে শত শত বার পরীক্ষা করিয়া
শির, করিয়াছেন, এদেশীয় লোকের জন্মের হুইট
অবস্থা। যথা—সামগ্রীর ও নিয়মকরণ। সাম
অবস্থায় জর তাগ করাতে এবং জ্বর তাহার
উপ দিতে পুণ্যশুন্য নিষেধ করিয়াছেন; যথা—

“ভেষজ হামদোষজ ভূমো জলপ্রতি জয়” সাম অবস্থার ভরতাব্যবস্থার ঐক্য দিলে, এই ভর ত্যাগ হইলেও, পুনর্বাসন প্রকাশিত হয়। অতঃপর সাম অবস্থার ঐক্য, পাচন ও লজ্জান্বিত দ্বারা ভেষজ নিরাম করিলে, ভর নিরাম অবস্থা হইলে, সেই ভর পুনরায় প্রকাশ পাইতে পারে না। আধোবৈধিক পশুপশুপন যক্ষণ, পাচন ইত্যাদি দ্বারা আধোবৈধিক শাস্তি করিয়া যাবার ভর ত্যাগ করান, তাহার ক্রমশ শরীরের ক্ষতি হইতে থাকে, মুখা ও স্ফূটিক হইতে থাকে, অজকালমধ্যেই পুনরায় শ্বাভাবিক স্ববস্থা হয় এবং শীত আর ভর হয় না। ডাক্তার চিকিৎসা দ্বারা যাবাদের ভর ত্যাগ হয়, ভর ত্যাগ হইলেও, তাহাদের মধ্যে অনেকের শরীরের প্রাণি, হর্ষলতা ও মনোমি দূর হয় না। কিয়ৎকাল পরেই পুনরায় এই ভর প্রকাশিত হয়। ইহার কারণ এই যে, ডাক্তারের লক্ষণ পাচনের পরিবর্তে যথেষ্ট হৃৎ ও স্থলবিশেষে মাংসের জুন প্রভৃতি পুষ্টি দেন; ভর নিরাম অবস্থা বা সাম অবস্থা কিছুই বিবেচনা করেন না। সুস্থি বা পাইলেই কুইনাইন দেন। হৃৎকাল অল্পপুরু সময়ের ভর ত্যাগ হইয়া পুনর্বাসন এই ভর প্রকাশিত হয়।

শীতপ্রধান-দেশীয়দের মাংস, হুয়া, রুটি প্রভৃতি খাবার। এদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহাদের প্রভৃতি অমৃত্যুর এক প্রকার পথের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এদেশীয় লোকের ভাল ভাত খাবারিক আহার, ইহাদের প্রভৃতি অমৃত্যুর এদেশীয় পণ্ডিতেরা অত প্রকার পথের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রভৃতি অমৃত্যুর ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের ভিন্ন ভিন্ন পথের ব্যবস্থা। এদেশীয় লোকের প্রভৃতি অমৃত্যুর সামঞ্জস্য হুয়, মাংসের জুন, হুয়া প্রভৃতি ভিন্ন নহি। কারণ এই সকল নারীসমূহ যখন কিছুকাল ভর অপ্রকাশিত থাকিয়া পুনরায় ভর প্রকাশিত হয় এবং প্রীতা যতগুলি রাগের উপস্থিতি হয়। এই নিমিত্তই পূর্বকাল অপ্রকাশ ইংলান্ড প্রীতার বিশেষত্ব যক্ষ্ম রোগের অন্তর প্রভৃতির দেখা যায়। উগ্রবীর কুইনাইন অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহারে এদেশ-বাসীদের যে কিস্তি-বিশেষ হইতেছে, তাহা কুইনাইন অল্প মাংসপে ইংল্যান্ডের বড় বড় বিলাতিন পণ্ডিতগণের মতামত নিন্দে উক্ত হইল।

বিলাত ডাক্তার যেনেরী বক সাহেব লিখিত।

হেন, “অধিক পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহারে যক্ষ্ম শরীরে বৃদ্ধি ও শক্তি হয়।

ডাক্তার এ. বি. প্রায়ড্ এম, ডি, এল, আর, এম, মহোদয় লিখিতেছেন;—
“অধিক মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার হইলে, হৃৎকালের ক্রিয়াকে ধমতাবহীন করে, তাহাতে রক্তের চাপাচাপ হতা; ক্রিয়া বাতায়তে অক্ষণ (যেঁকুনি) এবং মুখা পণ্ডিত হইয়া থাকে।

ডাক্তার রিটার এম, ডি মহোদয় বলেন;—
“কুইনাইন অধিক বিষম ব্যবহার হইলে, নিয়মিত উত্তরের গোলাযোগ হয়, যথা,—তলপটে উক্তক ও ভারবোঝ, যক্ষ্মামালা, গা বমি রিম, সর্দাই শীতা বোঝ, এমন কি প্রবল উত্তরায় ও উপস্থিত হয়।”

মধ্য-মাংসভোজী, মলকায়, শীতপ্রধান-দেশবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে ভেষজ কুইনাইন দেখিলে এত অপরকার, সেখানে শাকামভোজী, হর্ষল প্রভৃতি, শীতপ্রধান-দেশবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে কুইনাইন কিরপ বিষ-ক্রিয়া করে, তাহা দ্বারা কঠিনও আহার অক্ষম। ফলত অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহারে যক্ষ্ম, শরীরে বৃদ্ধি ও শক্তি হয়। পিতামাতার যক্ষ্ম-বিরাগ, কি অস্থ্যব্যবহার যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারও এই রকম শীতায় আক্রান্ত হইতে পারে।

মানিটারী-কমিশনার প্রেরে সাহেব লিখিতেন,—
“অপরূপ ও অপরিত্র প্রতীককিমের একর হর্ষল সন্তান-সুইত হয় যে, তাহাদের হৃৎকাল রাগের বিরলে তাহার আর মুক্তিলাভ করিতে পারে না।
“ওয়ে মাহেকফিক এত অধিক রাগের প্রাচুর্য বনে হইতেছে তাহার ক্রমেন ও বৃদ্ধি দেখাইতে পারেন নাই। পাঠক মহোদয়! আজ কাল শিশুদের অকাল-মৃত্যুর কারণ কি ও যতশেষ শীতায় কেন এত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা একবার বিচারিত চিন্তা করিয়া দেখিবেন,—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

বর্ত্তর ডাক্তার ঐক্য হুয়ার সহিত নিমিত্ত অবস্থা হুয়াতে জব করিয়া প্রায়োগ হয়। এই হুয়ার ক্রিয়া উৎকর্ষক। এই ক্রিয়া শরীরের প্রত্যেক মস্তকে প্রকাশ পায়। হুয়ারায়ের শরীরে বিবিধ যান্ত্রিক প্রণয়ের বিস্তার সম্ভাবনা। শরীরের সমুদয় মুখ, হুয়া দ্বারা বায়বীয় উত্তেজিত হওয়ায়, অবশেষে পুরাতন প্রাণ দ্বারা আক্রান্ত হয়। বর্ত্ত, পাকায়, হুয়ায় ও মস্তিষ্ক প্রাণিত হয়। ইহা ভিন্ন অস্ত্র, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এবং মনো সকলও আক্রান্ত

হয়। হুয়ারায় দ্বারা সমুদয় জীবনশক্তি ক্ষীণ হয়। এ কারণে যক্ষ্মামালা, অপরূপ, কোষ্ঠজ ও অপরূপ নিম্নস্বপন হয়। এতদ্ব্যতীত রক্তমালা, বাসিক্রিয়া, শোষণ, ও জনন-ক্রিয়া সকলই ক্ষীণ হয় এবং শরীর শীত হর্ষল ও নীরজ হইয়া পড়ে। যে হুয়ার এই ক্রিয়া, সেই প্রাণ-ভোজক ঐক্য আহার প্রতিরোধ ব্যবহার করিতেছে। যে যে ঐক্য-ভোজ হুয়াতে জব করা হয়, সেই সেই ঐক্যের ক্রিয়া প্রকাশ করে; ইহা ছাড়া হুয়ার ক্রিয়াও শরীরাত্তরে নামানিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। যাহা উক্ত, এই হুয়া অতি অপরূপভাবে ব্যবহৃত হইলেও, স্থল-বিশেষে এদেশবাসীদের অন্তি করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের অপরূপাকৃত অনেক ব্যক্তি হুয়ারায় ক্রিয়া থাকেন। অধিক বিষম হুয়ারানে পূর্বের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। হুয়ারায় হুয়ারায় করেন, তাহার নানা প্রকারে যখন ভোগ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত হুয়ারানের সন্তানগণও নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অগ্রগ্রহণ করে। হুয়ারায় সর্দাই হুয়ারায় করেন, তাহাদের যক্ষ্মের ক্রিয়া শীত ও বিরক্ত হয়। মাতালদের যক্ষ্মের দোষ প্রাচী দেখা যায়। ফলত আজ কাল পিতা-মাতার যত্নে মাতাল থাকায় এবং হুয়ারায়িত ডাক্তার ঐক্য বাহ্যরূপে সর্লয়া ব্যবহার করার ও শৈশব কাল হইতেই উগ্রবীর ঐক্য সেবন করার, বর্ধকদের শিশুদের যক্ষ্ম রোগ ও হর্ষল প্রভৃতি দেখা পাইতেছে।

ডাক্তার ঐক্য অপরূপ। এদেশীয় ঐক্য ভ্রমেন-বাসীদের মধ্যে বিশেষ উপকারী ও দ্বন্দ্বাকার। ডাক্তার ঐক্য বাহ্যরূপে এদেশে প্রচলিত হওয়ায় এদেশীয় লোকের হুয়ারায় কঠি হইয়াছে ও হইতেছে। এদেশে বিলাতী ঐক্য বাহ্যরূপে প্রচলন হওয়ায়, এদেশের বর্ত্তর অর্থ প্রতিরোধ বিলাত প্রভৃতি দেশে নষ্ট হইতেছে। “শিকিত” ব্যক্তি-দের দেশীয় ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি ও অবজ্ঞা হইয়াছে। এদেশের লোকেরা,—বিশেষতঃ প্রাচীন প্রতীকাকেরা সামান্য সামান্য পাছ-পাছা দ্বারা যে সকল পীড়া মস্তকে আরান করিতেন, আজ কাল সেই সকল পীড়াতে ডাক্তার ঐক্য বাহ্যরূপে ব্যবহার হইতেছে। ইহা কিরপ করে প্রাচী হইতেছে, তাহা কে নির্ণয় করিলে? বর্ত্তমান সময়ে শিকিত রমণীগণও বিলাতী প্রণালী শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাতী ঐক্য ও বিলাতী জবের বিশেষ পুণ্যপাতী হইয়াছেন।

দেশীয় “টোটকা” ঐক্য দ্বারা সহিত উপেক্ষা করিতেছেন। শিশুদের কোন সামান্য পীড়া দেখিলেই ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তারের ভিকিট, ঐক্যের মূল্যে কত পরিবার সর্লয়া হইতেছেন; সামান্য সামান্য পীড়াতে বাহ্যরূপে ভেষজের ঐক্য সেবন জন্ত খাবারী হইয়া বাইতেছে।

ডাক্তারী পীড়ার সময় সাণ্ড, এরাকট, বার্শী, ইত্যাদি পথ সর্লয় প্রাণিত হইয়াছে। সাণ্ডে “ডেজাল” বড় হয় না। শিকিট এরাকট ও বার্শীতে আজকাল অন্তত ডেজাল চলিতেছে। লেখক,—
এতদ্ব্যতীত ও শারীরে প্রচলিত হইয়াছে। সাণ্ডে “ডেজাল” বড় হয় না। শিকিট এরাকট ও বার্শীতে আজকাল অন্তত ডেজাল চলিতেছে। লেখক,—
এতদ্ব্যতীত ও শারীরে প্রচলিত হইয়াছে। সাণ্ডে “ডেজাল” বড় হয় না। শিকিট এরাকট ও বার্শীতে আজকাল অন্তত ডেজাল চলিতেছে। লেখক,—

এতদ্ব্যতীত ও শারীরে প্রচলিত হইয়াছে। সাণ্ডে “ডেজাল” বড় হয় না। শিকিট এরাকট ও বার্শীতে আজকাল অন্তত ডেজাল চলিতেছে। লেখক,—

(৪) মাতৃসুস্থের অভাব।
আজকাল এদেশে সাধারণত ধনবতী, “শিকিত” ও দরিদ্রা এই তিন শ্রেণীর প্রতীক দেখা যায়। ধনবতী শ্রেণীর রমণীরা অনেকেরই অত্যন্ত বিলাসিনী। সদাঙ্গরীয়া উচ্চশ্রেণীর অস্ত্রর করেন, অতঃপর শিকিত পরিভ্রমণ করিয়া করেন না। নিয়মিত শারীরিক পরিভ্রমের অভাবে বিলাসিনী হওয়ায়, তাহার নানা রোগে আক্রান্ত হন। অনেকেরই শিশু নিমিত্ত সামান্য পরিমাণে হুয়, হুয়াইলে ও অল্প সময় থাকিয়াই হুয়ের শরীরে অভাব হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত অনেকেরই সন্তান নিমিত্ত প্রতিভাশালী না করিয়া, অশিকিতা দ্বারা দ্বারা প্রতিভাশালী করিয়া থাকেন। দ্বারা-নির্লক্ষিত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। দ্বারা বর্ত্তর কঠিন পঠিত হওয়া বর্ত্তর,—দ্বারা বিলাতী ও প্রাচীনরা হইলে। একর অনেক বিষয়ে দেশীয় ভনীয়া দ্বারা নির্লক্ষিত করা কঠিন। “অশিকিতা”, “অপরূপিতা” ও নানা দ্বন্দ্বিত রোগে আক্রান্ত দ্বারা দ্বারা এদেশের শত সহস্র বালক নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছেন।
“শিকিত” শ্রেণীর রমণীগণও অনেকেরই সন্তান পালন করেন না। “অনেকেই শারীরিক পরিভ্রম হইতে করেন না, অতঃপর মানসিক পরিভ্রম অধিক পরিমাণে করিতে হয়।” বিলাতের ও আমেরিকার “অনেক বড় বড় ডাক্তার, বিশেষ পণ্ডিতা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, যে সকল প্রতীকাক অত্যধিক মানসিক পরিভ্রম করেন, তাহাদের দ্বারা-অস্ত্রের ক্রিয়া, হুয়-নিমিত্তের ক্রিয়া বিরক্ত ও স্থলবিশেষে অনেকেরই হুয়া হয়। বত্যা হওয়ার কারণের

মধ্যে দেখা যায় যে, অত্যাধিক মানসিক চিন্তাতেই লোক ব্যাধ্য হইয়া থাকে।

দরিদ্রাশ্রমীর স্রোতাক্রমে যথেষ্ট ব্যাধ্যের কারণে সন্দারবাড়া নিরীহ করেন, যে সকল স্রোতাক্রমে শ্রমীর পরিচয় করেন ও বাহারা সারথিত্য ভাবে থাকেন, তাহাদের দৃষ্টি উৎকর্ষ থাকে। নিত্যন্ত দ্রুত রমণীশ্রমে উপলব্ধ বস্ত্র ও আহার অভাব হইলে পরিচয়ের দ্রুত হয় সত্য, কিন্তু শিক্ষিতা শ্রমীর স্রোতাক্রমের অধিকাংশ ইহাদের দৃষ্টি উৎকর্ষ ও অধিক থাকে।

মাতা স্বয়ং সন্তানকে পালন করিবেন, ইহাই জনগণের নিয়ম। বিলাত প্রভৃতি দেশে এদেশের ও প্রায় প্রচলন হইয়া উঠিল, মাতারা সন্তানকে বালিতত্ত্ব প্রাপ্তপালন না করায়, সে দেশের ডাক্তার মহোদয়গণ কি লিখিয়াছেন, দেখুন। বিখ্যাত ডাক্তার পেন্সেলের সাহেব লিখিয়াছেন,—"নানা কারণে আজকাল সন্তানকে বোলস দ্বারা দুই দান পদাঙ্কিতর ওয়া অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইতে দেখা যাইতেছে। শুদ্ধরূপে না দিয়া ক্রমে তাহারা সন্তান পালন পালন করা যে নিত্যন্ত অজ্ঞাত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা শুদ্ধ দুইই স্বভাবত সন্তানের স্বাভাবিকতা। অতঃপর অল্প কিছু ব্যাবহার করা কর্তব্য নহে। যদিও অনেক স্থলে বোলস দ্বারা লালিত-পালিত সন্তান বেশ সুস্থ থাকে, তথাপি ব্যাবহারিক হইলে সেই সকল সন্তান শুদ্ধ দুই দান পালিত সন্তানের ত্রাণ ক্ষুদ্রপূর্ণ ও বদান্য হয় না।" উক্ত ডাক্তার মহোদয় আরও লিখিয়াছেন—

"বিলাতী সমাজের উচ্চশ্রেণীর স্রোতাক্রমে ইচ্ছাসূচক সন্তানকে স্বয়ং দুই দান করিতে প্রসন্ন হইয়া, কারণ তাহাদের মধ্যে কারণের সন্তান আদৌ দুই হইবে না এবং কাহারও বা সন্তান প্রথম প্রথম প্রবৃত্তি পরিমাণে জন্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। আসিয়া কিছু দিনের মধ্যে একেবারে বদ হইয়া যায়।"

দুই উৎকর্ষ ও শ্রমিকর বাবা সন্তানকে ডাক্তার কোপার সাহেব মহোদয় বহুতর তত্ত্ব লিখিয়া বিয়াছেন। তিনি বলেন, স্রোতাক্রমে মন সন্দর্ভা হইবে প্রথম থাকিলে এবং মানসিক চিন্তা না আসিলে, দুই উৎকর্ষ ও সন্তানের চিত্তে ক্রমে উপকার হয়। কিন্তু মানসিক চিন্তা ও বিচিন্তিত স্বভাব হইলে দুইয়ের পরিমাণ দ্রুত হইবে এবং দুই বিকৃত হইয়া সন্তানের কোষ্ঠ-বন্ধ, জর ও পেট-বেদনা হয়। তিনি বলেন, মানসিক চিন্তা আসিলে

দ্রুতের পরিমাণ দ্রুত হইবে, ভয় পাইলে দ্রুতের পরিমাণ বিকৃত ভাবে বৃদ্ধি পাইবে, জ্বোব হইলে দ্রুত এত বিকৃত হয় যে, সন্তানের, এই দুইপানে পেট-বেদনা ও সপ্তকর্ষণ মল নির্গত হয়। পাঠক মহোদয়! এ স্থলে প্রাচীন রমণীশ্রম অন্তর্ভুক্ত থাকিলে যে যে কার্যে সর্বপল সমন্বয়যোগ্য করিয়া চিত্তকে প্রবৃত্ত ও স্থবির রাখিলে এবং বর্তমান সময়ে 'শিক্ষিতা' রমণীশ্রম কি কি কার্যে সাদা সন্দর্ভা রত থাকেন, তাহাও একবার চিন্তা করিয়া উত্তরের পার্থক্য তুলনা করিয়া দেখিবেন। বিলাতী সমাজের উচ্চ শ্রেণীর স্রোতাক্রমের এই সকল কারণে দ্রুতের পরিমাণ দ্রুত ও বিকৃত হয় যথা—সন্দর্ভা মানসিক চিন্তা, উৎকর্ষ, স্বাধীনতায় ইত্যন্ত উৎসাহ, হঠাৎ কোন ভয় প্রাপ্তি ইত্যাদি। এতদ্বিত্যক্তির পর, উৎকর্ষক দ্রব্য আহার, সুরা-পান, সভ্যতার ও বিলাতিভার অজ্ঞাত নানা কারণে দ্রুত বিকৃত ও পরিমাণে দ্রুত হয়। বিলাতী সমাজের সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিয়া আমাদের সমাজ নাকি এখন স্তব্ধ হইতেছে! এখনও সাধবান না হইলে ও সমাজও অদ্যপাতে বাইবে।

(১) গো-দুগ্ধের অভাব।

আজকাল সমাজে নানা কারণে গো-দুগ্ধের অভাব ও সন্নিহিত হইয়াছে। গো সকল উৎকর্ষ আহার অভাবে ক্রমেই দুর্বল হইতেছে ও দুইয়ের পরিমাণও নুন হইয়াছে। মধ্য ইহা তাহা দ্রুত জনাবার্থ হানে প্রয়োজনীয় দুইয়ের সহিত নানা প্রকার অন্তর্ভুক্ত পার্শ্ব মিশ্রিত করিয়া দুইয়ের ক্রিয়াকে নষ্ট ও বিকৃত করিয়া ফেলে। সেই অপরূপ দুইপানে শিশুর সন্তানও ওদুগ্ধরূপে ক্ষতি হইতেছে। দুইয়ের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া মধ্য-বন্দরের আধিকাংশ লোকেরা সেই দুইয় দ্রুত শিশুদের জন্য খরচ করিতে পানেন না। শস্য, বস্ত্রাদির অভাব, ম্যালেরিয়া, অপাধ্য হানে বাস ইত্যাদি কারণে শিশুর অকাল-মৃত্যু হইতেছে।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দোপাধ্যায়

ভূতপূর্ণ ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সহকারী শিক্ষক।

আমার জীবনচরিত।

জন্মোদয় পরিচ্ছেদ।

১৮৫৭ সালের মার্চ মাস হইতেই সিপাহীসৈন্যের মেজাজ কিছু পরম বলিয়া বোধ হইল। একই বাকী চাটনি, একই বাকী-বাকী কথা, একই বাকী-বাকী চলন—সিপাহীসৈন্য-মধ্যে দৃষ্ট হইল। আমি ইহার মর্ম ভেদন ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মার্চ মাস এই ভাবেই কাটিল।

এপ্রেল মাসে আশান্ত্রি লখন আরও কিছু অধিকমাত্রায় দেখা গিল। সিপাহীসৈন্য কথায়-কথায় তেরিয়ান হইতে লাগিল; কথায় কথায় চতুঃ করণ করিয়া জন্মদায় করিতে আরম্ভ করিল। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল, কেহই কোন কথাই বলেন না।

ইহাতে একদিন জনবর উঠিল, ইংরেজ-রাজ, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের জাতিসকল নারীকৃত হইয়াছেন। এই কথা হাতে, বাজারে, সহরে, পট্টনে, ঘোষণা কেবল জন্মনা হইতে লাগিল। রাগ হইল, ইংরেজ—গো এবং শূকরের চর্নি-সামুদ্র টোটা সিপাহীদের দ্বারা দাঁতে কাটা হইয়া তাহাদের ধর্ম্মান্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। এ কথা আমি অপরোধী এবং পদাতিক সৈন্যদের সমুখে ভনিমাল। কিন্তু কেহ যে, উক্ত টোটা দাঁতে কাটা হইবে, বা কাহাকেও যে, দাঁতে কাটতে কেহ দেখিয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। অথচ অকাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই কথা শইয়া মহা আপোদান আরম্ভ করিল। বঙ্গোপকূল ওদুগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। কোন কোন পদাতিক সিপাহী প্রকাণ্ডতরু বলিতে আরম্ভ করিল, "আমরা আর, বৃক্ক বাড়ে করিয়া পারাবতে বাহির হইব না।" ভলিমান, কতকগুলো সিপাহী সৈন্য-সৈন্যধাক্ষণের আশাবাসী জালাইয়া দিবার কক্ষনা করিয়াছে। আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। আমাদের সৈন্যধাক্ষণ দিয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া কিছুদূর বস্ত্রভাষ্যে নীর্থ হইয়া রহিলেন। শেষে এই ভাবে উত্তর করিলেন, "দেবনা, দুর্গাশাস। আমি এ সকল কথাই জানি। শুণ্ড চর দ্বারা আমি এ সকল সাবাদাই লইতেছি। কিন্তু কি কি? উপায় কি আছে? আমাদার উপর আমার ধর্ম বিশ্বাস আছে। তাই আপনাকে বলি, শুণ্ড বেরিলগিতে নহে,

অজ্ঞাত স্থানেও সিপাহীসৈন্য এইরূপ নিপুণ্য হইয়াছে। সিপাহীসৈন্যকে শাজ করিবার কোন উপায় আপনি স্থির করিতে পারেন কি?"

আমি। আমাদের অপরোধীদল তত ব্যাপার হয় নাই। কিন্তু পদাতিক ও ভোগধামার সিপাহীসৈন্য বনে উদগতপ্রায় হইয়াছে। আমি সে দিন একদল পদাতিক সিপাহীকে বুঝাইয়া শলিখাছিলো, "কেম ভোমরা বুঝা গোলাঘণ্ড করিতেছ? ইংরেজ ভোমরা-কে জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই।" আমার এই কথা শুনিয়া তাহারা জোরে যেন বুঝ হইয়া উঠিল। একজন বলিল, "বাল্লালা এবং জলিয়া উত্তরে এককাটা হইয়াছে।" আমিন্দ্যাপার বুঝিয়া আর কথা কহিলাম না।

বুঝায়ে। তবে কি আপনি বিবেচনা করেন, সিপাহীরা মতামতই বিবেচ্য করিব? আমি। আমার বিশ্বাস, ভোগধামা ও পদাতিক সৈন্যের সিপাহীসৈন্য বিবেচ্য হইবে; কিন্তু অপরোধী-বিরোধী হইবে না।

বড় সাহেব। শুণ্ডচরণ বলিতেছে, "এখানে বড় ইংরেজ আছেন, তাহাদের স্রোতাক্রমে-কথা সকল-কেই শ্রোতাক্রমেই বুঝা হইবে।" আমি।

আমি। আমার মতে স্রোতাক্রমিকের নিরাপত্ত্য হানে পরাইয়া দেওয়া উচিত। বড় সাহেব। যদি এখন স্রোতাক্রমিকের অভাব হানে, পরাই, তবে সিপাহীসৈন্য ভাবিকা, ইংরেজ-রমণীশ্রম পলাইতেছেন। ইহাতে তাহাদের সাহস এবং উৎসাহ হিংসে বৃদ্ধি পাইবে।

আমি। স্রোতাক্রম উপস্থিত। নাইনিভাতাও নিরাপত্ত্য হান। হস্তান্তর স্রোতাক্রমে তদ্রূপ স্রোতাক্রমে নাইনিভাতাও পাইয়া শ্রম না কেন?

বড় সাহেব। আপনাদর কথা অযৌক্তিক। বেরিলগিত একই যে করণ, ইংরেজ ছিলেন, ভারীরা পরদিন ইংরেজ হইয়া গোপনে এক স্রোতাক্রম করিলেন। সেই শুণ্ডমভার আমিও ছিলাম। নাইনিভাতাও স্রোতাক্রম-কৃত্যপর্ণকে পট্টানই সভায় স্থিত হইল। সন্তান গরিব দিন পরে রমণীশ্রম নাই-নিভাতা অভিমুখে ব্যাটা করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

মে মাস আদিল। সিংহাসনধর্ম জন্মশই অধিক মাত্রার মাতা উঠিতে লাগিল। ইংরেজগণ ভয়ে সশঙ্কিত হইলেন। আমিও প্রমাদ বলিলাম। প্রায় ষোল হাজার টাকা, ইংরেজ-সৈন্যাদিগণকে এবং সিংহাসনধর্মকে বন্ধন-স্থলে ধার দিয়াছিল। সিংহাসনধর্মের নিকট টাকা শেষ হইলে এমন ভাষায় সে কথা বড় আশ্বাস দেন। টাকা আর কতক আরও নিকট যদি কিছুই পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে অমনি হুমকি দেখায়। এদিকে সাংকেলন বিপর্যস্ত; তাহাদের কাছেই বা টাকা চাই করিলে? কল কল, আমি বড় বিব্রত হইলাম।

মে মাসের প্রারম্ভেই একদিন অপরূপ সময়ে আমাদের অর্ডার-গৃহে এক সভা স্থাপিত হইল। সেই সভায় পবিত্রিক, অম্বারোহী, ভোপানার ইংরেজ-অধ্যক্ষগণ এবং অম্বারোহী-সৈন্যের উচ্চ-পদস্থ সৈন্য অধ্যক্ষগণ মিলিত হন। এই সৈন্য উচ্চপদস্থ অধীক্ষণগণের বিবাহী এবং প্রভুত্বক বোধে পতায় আহ্বান করা হইয়াছিল। সভায় প্রবেশ এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া উঠিলে? অম্বারোহী-সেনার প্রধান সৈন্য অধ্যক্ষ প্রস্তাব করিয়া বলিলেন, “না, তাহা কখনই হইবে না; আমি শীঘ্র বিদ্রোহ ঘটাবার কোন কারণ দেখি না। সিংহাসনধর্ম কতকটা উচ্চপ্রায় হউ, কিন্তু এমনও তাহারা বিদ্রোহের দিকে একপদ অগ্রসর হইয়া, এমনও নজর দিচ্ছে। তাহাদের পরস্পরগেহে দশনও নজর মিলে হয় নাই। সর্বদায়ে মাথা দিতে কেইই দীর্ঘত হইতেছে না; হুতায় বিদ্রোহ ঘটতে এখনও বিলম্ব আছে। আর আমাদের অম্বারোহী-সেনা-দলমধ্যে আদৌ বিদ্রোহ ঘটবে না, ইহা আমি নিশ্চিন বলিতেছি। আমি প্রত্যেক গুণ্ডারের এক নরক অভিশ্রাব অর্পণত আছি; হুতায় আপনারা চিন্তিত হইবেন না। আমাদের প্রাণ থাকিতে আপনাদের প্রাণের কোনও আশঙ্কা নাই।”

অম্বারোহী-সেনার প্রধানের সৈন্য মহম্মদ সফী কহিলেন,—“কেন ভয় নাই। যদি পবিত্রিক সৈন্য বিদ্রোহী হয়, তবে আমরা পাঁচ-দশগত সগুণার ভাণ্ডারেরো তাহাদের উপর পড়িব এবং তাহাদিগকে বধ খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব।”

সাংকেলন এই আশ্বাস-বাণী কতকটা অনুশ্রিত হইলেন। সভা ভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। আমিও আমার বেগলারি অশ্ব আরোহণ করিয়া, নানা বিষয় চিন্তা-করিতে করিতে, আপন আলয়-অভিযুগে চাড়া করিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের বড়-মাঠের পরদিনই গবর্নমেন্টের নিকট এই মত এক পত্র লেখেন,—আমাদের অম্বারোহী রেজিমেন্টে কখনই বিদ্রোহ হইবে না, ইহা আমরা স্বির বিশ্বাস।” গবর্নমেন্ট এই উত্তর লিখিলেন,—“যদি এক প্রকার বিশ্বাস ইহা থাকে যে, অম্বারোহী-সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইবে না, তাহা হইলে অম্বারোহী-সৈন্য-সংখ্যা পূর্ণাঙ্গপেণা বিচ্যুত করা আবশ্যিক। কেন না, এক হাজার রাজ-ভক্ত অম্বারোহী থাকিলে, বেরিলি অঙ্গল্য নিরাপত্তা থাকিতে পারে।” এই আদেশ প্রচার হইয়া মাত্র, দলে দলে অনেক লোক আমাদের রেজিমেন্টে নিযুক্ত হইবার জন্ত আসিতে লাগিল।

এরূপ দলে দলে এককালে বহু লোক আসিবার এক বিশেষ কারণও ছিল। কর্তৃপ্রার্থী প্রত্যেক লোককে, যেখানে তিনিবার জন্ত হইয়াত করিয়া টাকা নান্ন জেরা হইতে লাগিল। পূর্বে কর্তৃপ্রার্থী-গণকে স্ব স্ব হইতে হই-তিন শত টাকা আনিয়া অম্বারোহী রেজিমেন্টে ভর্তি হইতে হইত; কিন্তু এখন সে নিয়ম উলটিয়া গেল। সাতগণ্যইই স্ব স্ব কাষী ভাঞ্জনধান্য হইতে উক্ত কর্তৃপ্রার্থীকে এককালে হুই শত টাকা করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহা অপেক্ষ আর কি মজা আছে কখন! এরূপ হলে যৌক জন্মিলে না কেন? লোকের ভিত্তি-ইহা না হইবে কেন? কর্তৃপ্রার্থীদের নিকট হইতে এই হুই শত টাকার জাকী করিয়া জামিন লওয়া হইত, কিন্তু তখন সে জামিন মাত্র।

আমি এই টাকা-বন্টন-কার্যে নিযুক্ত হইলাম। তখন ডাক্তার সাহেবের কর্তৃপ্রার্থীর হেলপেরীয়ায় আর তত আঁটা-আঁটা রহিল না। প্রত্যাহ পঞ্চাশ, বাট, বা মস্তুর কল করিয়া সগুণার নিযুক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ককদশিন মধ্যে প্রায় মাত্র শত লোক ভর্তি হইয়া, নান্ন লিখাইয়া, যেখানে তিনিবার জন্ত হুই শত টাকা নান্ন লইয়া, আপন আপন ঘরে প্রস্থান করিল। আমরা এদিকে পথ চাইয়া

বসিয়া, আছি, সগুণার পরে যেখানে কখন প্রত্যাপত হইবে। কিছু হাংহোয়ামি। অনেক ফিরিল না। হুই শত টাকা নান্ন হাতে পাইয়া, দিয়া পারের উত্তর পা দিয়া, মজা করিয়া ডালা-স্ট্রট খাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে হুই শত অম্বাধাজ লোক ফিরিয়াছিল। কিন্তু ফিরিল কি হইবে? তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অকর্মণ্য। হুই শত টাকার বললে কেহ পঞ্চাশ টাকা দিয়া এক বেগো খোঁড়া কিনিয়াছে। কাহারও খোঁড়া খোঁড়া। কাহারও খোঁড়া একটু-হীন। ত্রমশ এক হাজার রসের কাপড় পরিয়া উঠিল। দেখিয়া ভনিয়া বড় মাঠের বড়ই চিন্তিত হইলেন।

এই সময় অর্থাৎ প্রত্যেক কর্তৃপ্রার্থীগণকে হুই শত করিয়া টাকা দান করিলে, আমার পরদিন বড়ই ভাড়াটা উঠিল। সমস্ত দিন রাত্রি মাঠিয়াও হঠাৎকমে কাদের আনন্ডকে ক্রিতে পারি না। এদিকে রেজিমেন্টে আমার যে নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য ছিল, তাহাও তাহাদের উপর এই টাকা-দান-কার্য বৃদ্ধি হইল। কে আসিল, কে না আসিল, কে কোথায় লুকাইল, কাহার খোঁড়া ভাড়া, কাহার খোঁড়া মল, এক সকল বিষয়েরও হস্তাবধারণ তাহার আমার বাড়ে পড়িল। আমার মধ্যম ভ্রাতা ত্রীমান মুকলীপ্রসাদ বেরিলি কর্তৃপ্রার্থীদের অধিনে চাকরী করিত; তাহাকে বলিলাম,—“ভাই! তুমি আমার ও কাজ বিন কতক স্থগিত রাখ, আমার সহিত কাজ কর।” ভাতার সাহায্যে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আমি রেজিমেন্টের কার্যোদ্ধার করিতে লাগিলাম। বড় মাঠের আমার কার্যতৎপরতা এবং অগাধ পরিশ্রম দেখিয়া বৎসবোন্নাস্ত্র সন্তুষ্ট হইলেন। এক ব্রিন স্প্লিটই আমাকে বলিলেন,—“হুতাদাস, তুমি আমার পায়েরে চায় মল, শরীরের মধ্যে, বিষয়কার্যে এরূপ তৎপরতা বৃদ্ধি আমি জ্ঞান লোকেরই দেখিয়াছি।” আমার বয়স তখন ২১ বৎসর মাত্র।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আর থাকে না। আগুন ও বারুদ পরিমিত হার হইয়াছে। কর্ণ, কোর্ন সময়ে কোন সন্ধিক্ষণে এক মহান সংঘর্ষ—এক অলৌকিক অগ্নি-উৎপাদ হইবে লোকসমূহ তখন কেবল তাহাই চিন্তা করিতে। সাংকেলন সমস্তই

মুক্তিতে পারিলেন। কিন্তু কোন কথা প্রকাশ না করিয়া, অতি সতর্কভাবে কাজ করিতে লাগিলেন। তাহাদের সেনাপিন্য কার্যে বিরাম ছিল না। কিন্তু মস্তর ভাব সহজে কাহারও নিমিত্ত প্রকাশ করিতেন না। মুক্তি-পরিণাম, সভ্য-সমিতি সমস্তই বন্ধ হইল। আমি যদি কোন ইংরেজের কাছে গিয়া তাহা বিদ্রোহ-দ্রব্যক কোন কথা পাড়িলাম, তাহা হইলে তিনি প্রকারান্তরে সে কথা চাপা দিয়া, অস্ত কথা কহিতে আরম্ভ করিতেন,—“আমি কখনই ঘরে ফিরিয়া আসিতাম।

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এমন হইল? সাংকেলন আমার উপর হুতায় কেন এমন আত্ম-আড়, ডাড়া-জড়া হইয়া উঠিলেন। এ দিকে তখনই সে বিধি-স্বত্বকে সাংকেলন অগ্নি-পায়ার একটা বা হুইটা খোঁড়া সূর্য্যবাহী হস্তাক্রান্ত হইয়া আছে, যেন চিত্রিত হইয়া কোন কালে সাংকেলন জিনিষের প্যাক-বকী হইয়া থরে পড়িয়া আছে, যেন শীঘ্রই কোথায় যাত্রা করিতে হইবে। আমি চারিদিকেই বিতীক্ষিতা দেখিতে লাগিলাম।

অর্য্যাবতার ১৮৫৭ সনের ৩০শে মে। রবিবার হইলেও মাসিক হিমা-বস্ত্র অদ্য দাখিল করিতে হইবে। কেননা, আজ আমাদের সংক্রান্তি। আমরা হুই ভাই—কর্তৃপ্রার্থীরা এবং আমি ৩০শে মে বেলা ঠিক সাড়ে দশটার সময় মাসিক হিমা-বস্ত্র লইয়া ভাণ্ডারিক এডমিট্টেট পেপেটেন্টে বিচার সাংকেলন বাস্তবায়ন উদ্দেশ্যে হইলাম। দ্রুতিগামি,—সাংকেলন আফিসের দরজা বন্ধ। কেইই কোথাও নাই। কিছু-কিছু জন্মানদের দেখা পাইলাম না। মাসিক এদিক ওদিক চাহিয়া, সাংকেলন বাস্তবায়ন-ঘরের অপর প্রান্তে গেল। দেখিলাম, সাংকেলন একটা সিসিম গুড়ি দিয়া, চুপটা করিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—“তুমি এমক করিয়া বসিয়া কেন? তুমি সাংকেলন বা কোথায় গিয়াছেন এবং আফিসের দরজাই বা বন্ধ কেন?” দ্রুত-বিলম্ব করিম কাঁপিতে কাঁপিতে শঙ্কাস-ভাড়া দ্রুত উত্তর করিল, “সাংকেলন যোগে পূর্ব চটক ভাগ গেল, তুমি হিয়া কাজ কর্তৃ যোগে। তুমি তাহা দেখে নেই মারে যাই হো। তুমি—আমি জানত হো, সিংহাসী সিংহাসী পদে?” এই কথা ভায়াই আমি একটু বিচলিত হইলাম। কি করিব,—কোথায় নাইব, ভাবিতে লাগিলাম, বামায় ফিরিয়া যাই কি অস্ত্র আন পালাই, অথবা এইখানেই একটু

আসিতেছে।" সাহেবেরা আর পণ্ডাৎ ফিরিয়া সেবিবার অবকাশ পাইলেন না; নাইনিভালের পথে তারেবেগে অর্ধ ছুটাইয়া ফিলেন। স্বপ্ন যেনো-নার মধ্যস্থ সফির সহিত আমাদের রেলসেমেন্ট আরকাননে উপস্থিত হইল; তখন সাহেব-সম্প্রদায় অর্ধ-মাইনের ভবিক পথ অতিক্রম করিয়াছেন। মধ্যস্থ সফির ভাবাতিক বিশেষরূপে ঘুরিতে না পারিয়া, সাহেবেরে সঙ্গ লইবার জন্ত সন্মত পিরোল বেগে অর্ধ ছুটাইল। সাহেবগণ মনে করিলেন, 'ঘুরি মধ্যস্থ সফির আশাপ্রসঙ্গ ধর-ধর করিয়া ঘুরিতে আসিতেছে।' হুতরাং তাহারায় প্রাণপণ চেঁচিয়া ক্ষতঘাতিতে শোড়-শোড় ধরল। এইরূপ একজোশ পথ-পথান্ত উভয় ধল চলিল। শেষে মধ্যস্থ সফির সুখিল সাহেবেরা আশাপ্রসঙ্গে বিমল ভাবিয়া প্রাণতরে পলাইতেছে। তখন সে নিভাত্তরক লালকমাল ঘুরাইতে লাগিল। কিন্তু সে রুমাল-ঘুরান আর দেখে কে। সাহেবগণ একটা বাক্ত পলাতনে দিকে লুটিনিকপে না করিয়া দ্রাবের দায়ে, নাইনিভালের পথে সমভাগেই ছুটিতে লাগিলেন।

"মধ্যস্থ সফির বানিক বমকিয়া ডাড়াইল। ভাবিল,—আমি এই পাঁচতর অধরেই লইয়া পার্শ্বতা পথে কোথায় যাইব? খোড়া এবং সপ্তা-রেব সমন নিম্নেই বা কোথায়? আর বন্ধকে যদি সাহেবেরে সম্বন্ধীনও হইতে পারে, তখন সাহেবেরা আমাদিগকে জন্ত ভাবিয়া সম্ভবতঃ গুলি চালাইতেও পারেন। গুলি গারে লাগিলে, আমাদিগের সপ্তা-র গণ কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। তখন উভা পক্ষে তুমুল ভুলু বাগিয়া যাইবে।" সম্ভবতঃ সাহেবগণ মন্মলে নিপুল হইবে। আমাদের ভাড়া উদ্ভেদ্য বাক্ত হইবে। এইরূপ নানা বিষয় ভাবিয়া, চিত্তিয়া আপন পদবাক্ত সহ মধ্যস্থ সফির অগ্রাবর্তন করিল।

বদনী বাহাই হুটক, অল্পেরে চাখিয়া দেখিলাম, পুস্কিতক ও তেপুধামার পোলদাক সৈন্তেরা আপন-আপন আদান-পুঁতে গুলি লাগাইয়া দিতেছে। স্বপ্ন আপন-আপন স্বর ধ্বং করিয়া জলিয়া উঠিল, তখন তাহার নিজ নিজ জিনিসপত্র ও আসবাব লইয়া পারিতো-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ভাবিলাম,—এ কি ব্রহ্ম কেশব? নিজের ঘরে নিজেই আগুন ধরে কেন? নিশ্চয়ই ইহার কাণ্ড জানন্থ হইয়াছে। নিশ্চয়ই ইহার রাখনী মুক্তি-ধারণ করিয়াছে।

পার্করণ জানেন, পদাতিক-সেনানিবাসের গায়ে আমায় বাসা-বাটা ছিল। জাতি কাশীপ্রসাদ বলিল, "দাদা! দেখুন, আমায় বাসাটাও ই কলিতেছে।" আমি যোঝা—কেনটা আমাদের বাসা, কেনটা অন্দের বাসা,—ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তখন সমগ্র মধ্যস্থ এক 'অধিকরে' এবং হুমকিরে হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই আমরা আর বাসার দিকে গেলো না। অতি পোননভাবে অস্ত পথ দিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আমায় সেই বাঁচার সাহেবের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বরখানিতে তখনও কেহ আগু ঘের নাই; বোধ হয়, আশুপ নিতে ভূগিয়া রাগা থাকিবে। সাহেবের সেই সহিসসকল আর জীবিত দেখিলাম না; তাহার পারদর্শে কেই করিয়া এক গুলি দেখাঘো প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সে তখন অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

হুই তাই বিষয় মনে ডাড়াইয়া তাহিতেছি, 'কি করি? কোথায় যাই? কি উপায় অবলম্বন করিলে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে পারি? কেন স্থান নিরাপদ, কেন স্থান সাপদ—তাহাও ভাল ঠিক করিতে পারিতেছি না। এ সময়ে কে শব্দে, কে স্মিত,—তাহাও ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। যে অধ্য-বোধ—সেতলস্থ আমাকে ভাবিত করি, ভাল বাসিত, তাহার আঙ্গ অহকুল, কি প্রতিফল,—তাহাই বা দেখেন করিয়া জানিব? এখন সকলই উদ্ভত, নিদ্রিত-কি-জাননি।' এইরূপ ভাবিতে তাহিতে আমার বাঁচার সাহেবের বাসার বানেশ্বর ধামের পাশে উপস্থানকৃত হইলাম। কিছুপন পরে দেখি, আমার একজন সহিস, একটা খোড়া লইয়া ঘুরে আসিতেছে। এই সহিসের নাম ভবানী। আমি এদিকে বাসার ধামের আড়ালে ছাছি। আমি ভবানীকে বেশ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু ভবানী আমায় দেখিতে পায় নাই। এই সময় এই বাঁচা-লার কিছুদূর দিয়া প্রায় ত্রিশ জন অস্ত্রধারী সিপাহী যাইতেছিল। তাহারায় একটা মহান করণ উদ্ভা-পন্ন করিয়াছে। তাহারের মধ্যে কেহ পদমে গান ঘুরিয়াছে, কেহ ইয়েজকে কট-অশ্রীল তায়রা গালি দিতেছে, কেহ আপনা-আপনি বকাবকি করিতেছে, কেহ 'আলি আলি' শব্দ করিয়া থাকিয়া উঠিতেছে। কেহ নাচিতেছে, কেহ তাহার পার্শ্ব-সহচরকে

বাঁকে দিয়া কোণিয়া দিতেছে। কাহারও হুই হাতে হুই বামি অবসার; কাহারও এক হাতে বন্ধু, এক হাতে ছোরা; কেহ বা একটা বন্দী পুস্কিত পুস্কিতে চলিয়াছে। কাহারও হাতে আশুপের মাল। 'সি-এক পোশাকি সমস্ত-মস্ত।' কাহারও হি-হি-হি হাসি, কাহারও বিকট বন-ব্যানান, কাহারও বিভাষণ দস্ত কুড়িমিড়ি। এই সকল দেখিয়া অন্তর্য মনে হইল বুধি, শমন-লুপ্তন এবার সত্য সত্যই আমা-দিকেরে সাহায্য করিতে আসিতেছে। কানী বলিল, "দাদা! এ দেখুন,—আসিতেছে। এবার আসি-বলুন নাই। এইবার উহার বাসলয় আগু পিছে, আর আমাদিগকে ঘন করিবে।" আমি বলিলাম, "তুমি এই ধামের আড়ালেই লুকায়িত থাক, আমি নিশ্চয়ই ধামের অগ্রে সমুখাই যাই। সিপাহীরা এখানে পৌঁছিবাব পূর্বে সিপাহীদের কাছে যাওয়াই ভাল। কানী আমার কাপড় ধরিয়া বলিল, "তাহা হইবে না, এ ভীষণ রাক্ষসের সমুখে আপনাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।" এইরূপ আমাদের কথাবাণী হইতেছে, এমন সময় আমার দিকের এবং খোচরক উপর—উক্ত সিপাহীগণের প্রথম দল পড়িল। খোড়া দেখিয়াই সিপাহীগণ একটা মহা হাঙ্গা করিয়া খোড়া লুট করিবার জন্ত ভবানীর দিকে দৌড়িল। ভবানী দিকের বলিষ্ঠ ব্যক্তি। সহজে সে খোড়া ছাড়িত না। দৃঢ় মুষ্টিতে খোড়ার মূখের লালম বরিয়া ধলিল। খোড়া-কোড়ার আশ্রয় হইল। ভবানী লাথির চোটে ২৪ জন সিপাহীকে ধরাশায়ী করিল। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। ইচ্ছা হইল, আমি এক লক্ষে সিপাহীদের নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু এদিকে ভাণী কাশীপ্রসাদ আমায় কাপড় ধরিয়া আমাকে টানিয়া বাধিয়াছে। আমাকে কোনও কথা কহিতে দিতেছে না। কথা কহিলেই আমার মস্ত হাত চাপা দিতেছে। কাহার শব্দ প্রাইয়া পাঁছে সিপাহীগণ এদিকে আসিয়া পড়ে,—ইহাও আমাদের ভয়। স্তম্ভমধ্যে দেখিলাম, ভবানী যেন অচেতন অবস্থায় পৰিণত হইয়া পড়িয়াছে; আর সিপাহীগণ আনন্দ-উল্লাসে খোড়া লইয়া একদিক পানে ছুটিল। তাহারায় বাঁচার সাহেবের বাসলয় আর আগু মিল না। বেদে হয়, খোড়া-প্রাপ্তির আনন্দে তাহার আশুপ-দেওঙ্গ কর্তা ভুলিয়া গেল।

সিপাহীগণ চক্চুরে বাহির হইলে, কানী আমায়

কাপড় ছাড়িল। আমি তখন আন্তে আন্তে বাহির হইলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, ভবানী ঠাড়াইছে। ত্রমে সে দাঁড়াইল। খোড়া দেখিতে পাইল। সে খুড়াইয়া খুড়াইয়া আমায় দিকে অঙ্গদর হইতে লাগিল। খোড়া-কাড়াকড়ি ব্রহ্ম পোশাণের ঘরে, খোড়াটা তখন একবার অঙ্গদর লাখাইয়া উঠে। খোড়ার ঘরে ভবানীর পাসের বুদ্ধভূতী এককোরে খোড়া গিয়া পা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ত্রমে আমি ভবানীর সহিত একত্রে মিশিত হইলাম। ভবানী হাউ-হাউ করিয়া কানিয়া বলিল,—"অনু! সর্বদা হইয়াছে। সিপাহীরা খোড়া ছিন্দিয়া লইয়াছে।" আমি বলিলাম,— "এ ধামের আড়ালে হইতে সমুখই আমি পৌঁছিয়াছি।" ভবানীর কাটা পা দিয়া হ হ শব্দে রক্ত পড়িতেছে। আমি বিজ্ঞাসিলাম, "বাসের বর কি?" সে বলিল, "বাসায় পদাতিক-সিপাহীরা প্রবেশ করিয়াছে।"

আমি। আমার সে ভাল খোড়াটা কোথায়? কানী। সিন্ধুরের টাকা-কুড়ি কই? ভবানী। সিপাহীগণ, গুণে, প্রবেশমাত্র আমি এই খোড়া লইয়া আপনার নিকট চালিয়া আসি-তেছি। তথায় কি ব্যক্তিগে, তাহা আমি ঠিক জানি না। আমি বিমল-সহিকে আপনায় ভাল খোড়া আনিবার কথা বলিয়া আসিয়াছি। দেখিতে দেখিতে রামনান সফির আসিয়া পৌছিল। সে বলিল, "বাবু! সিপাহী লোভ ঘর-ঘরকার সিন্ধু তেড়সে ঘর গোপায় আরও সব আসাবায় লুট গিয়া। আগু ঘরমে আগু লাগায় দিয়া। ছুছ মোহি বাঁচ। পানি পিনেকো গোটাটক ভা কই ছাড়া।" এই কথা বলিয়া সে আমার একটা ভালা সেতারও একটা বাঁয়া আমার হাতে দিতে আসিল। আমি বলিলাম, "এ প্রভে আমার কোনে প্রয়োজন নাই। তোমার ইচ্ছা হাত তুমি ইহা লইতে পার।"

হুইজন সহিসকে বিদায় শিলাম। বিজ্ঞান, "এমরা এখনে খোশোনে হুশিয়া বুক, সে-আমানে গমন কর।" তাহারায় "অশ্রুপুণ্ড-গোচনে লোলাম করিয়া চলিয়া গেল।" আমি আবার সেই বাসলয় ধামের আড়ালে বিমল ভাবিতে লাগিলাম,—"কোথায় যাই? কি করি?" সেখানেই নানারূপ চিন্তাভ্রম উথিত হইতে লাগিল। মনে হইল, "এক পক্ষে আমি পরম

সৌভাগ্যবান। এ সময় যদি আমার পরিবারবর্গ
বৈরাগ্যে ব্যাক্ত, তাহা হইলে তাহাদের বৈকি
শোচনীয় পরিবার হইত, তাহা বলিতে পারি না।
তাহারা তখন ও কল্যাণে ছিল—তাই শব্দ।
ইহাযেই সৌভাগ্য বলি। এতদিন বহুকষ্টে যাযা
ভোগজন করাছিলাম, বিদ্যোদীয়া তত্ত্ব পুট করিয়া
লইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের মাঘের বোড়াতাড়ি
পুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে হুঃ
করিলে আর কি হইবে? অল্পে থাকে, পুনরায়
টাকা ও বোড়া পাইতে পারি; কিন্তু দুঃখের
একবার অপমান হইলে, প্রতিশোধ লইবার আর
উপায় নাই। তাই আমাকে সৌভাগ্যবান বলি।

বসিয়া বসিয়া সেই ব্রহ্মদেশীয় বোড়াতাড়ি কত মন
ক্রমশঃ বড়ই আনন্দ হইল। হাটপুর্বে রামদাসের
মুখে শুনিয়া ছ্যাম যে, পদাতিক-দিয়াইগণ আমার
এ বোড়া লইয়া গিয়াছে। ভাবিলাম—এ বোড়ার
আবেশে একবার পদাতিক-সৈন্যের সেনা-নিবাসে
হাইকেস হয় না? কনিষ্ঠ্রমাদের এ বিষয়ে কষ্টে
যত করিয়া, তুইজনেই পদাতিক সেনা-নিবাসে
গমন করিলাম। গিয়া দেখি, ওয়ার জন-মানব
নাই। সিপাহীগণের রত হলিতেছে। বোড়া
অন্তই বুজিয়া পাইলাম না। শুধুমুখ প্রত্যঙ্গমন-
করা পদসৈন্যের একজন ওয়ার সহিত দেখা হইল।
বিশ জন বা পঁচিশ জন সিন্ধাবী লইয়া এক একজন
বাসন-মাজা ও বর পরিহায়ে চাকর থাকিত।
সেই চাকরকে ওয়া বলে। এই ওয়া আমার
কতকটা পরিচিত ছিল। সে ওখন আমন জিনিস-
পত্র লইয়া দেশে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।
তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, “তুমি আমার সেই ভাল
বোড়াতাড়ির কোন স্বরবলিতে পার কি?”—সে বলিল
“তোমারা বোড়া সিপাহী-পৌর পুট লিখা।”

আমি। তুমি দেখা, হামারা বোড়া কোন
সিপাহী যে পেরাফায়?
“ওয়া একটি পুরিহাসের হাসি হাসিয়া বলিল,
ইহা কি কং ভাগ্যে ভাগ্যে। বোড়েকা
কেলা পুজিতে হো। তোমারা বোড়া হুবেদার
মাঘেরে নগরীয়ে গিয়া হায়।”

সর্বশেষ লেখ। এখন আছে, কেমনমান প্রাণ
সেই প্রাণ-স্বপ্নার উপায় করিতে হইবে। আমারা
ওখন হই তাই সেই জগদ্বাচী অথচ বিপদ-
সমুদ্র প্রান্তরে দাঁড়িয়া প্রাণ-স্বপ্নার ভাবনা ভাবিতে
লাগিলাম। ওখনও ওলি চলা বন্ধ হয় নাই।

থাকিয়া-থাকিয়া মাঝে-মাঝে চারি দিকেই অনিষ্ট
হইতেছে। থাকিয়া-থাকিয়া মাঝে-মাঝে শুধুমুখ
শুধুমুখ শব্দ তোপেরও আওয়াজ হইতেছে। কোন
নিষ্ঠ নিরাপদ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।
আমি কিছুকাল যিমুটের ভায় কেবল ভাবিতেই
লিখিলাম। ত্রীমান কানীপ্রদান সঙ্গে ছিল বলিয়া
আমার ভয়-ভাবনা দিওঁলক হইল। আমি একা
থাকিলে, এরূপ চিন্তাভুক্ত হইতাম না।

রাধানাথ

গোলাপমুখরী-প্রকবন।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কোটশিপ কথার কুশলনদীর বড়ই কোহুল
জ্বলি। চামেলি দিগির কোটশিপ শব্দেয় দয়া-
সঙ্কেত, কুশল তৎপার্যার বিশেষরূপে হৃদয়
করিতে সমর্থ হইলেন। ওখন কুশল ওংহুকা-
পূর্ণ হৃদয়ে চামেলিকে জিজ্ঞাসিলেন,—“আমাকে
ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল না, এই কোট-
শিপটা কি রকম?”

এ কথা শুনিয়া চামেলি একবারে হাসিয়া
হাসিয়া, চলিয়া-চলিয়া পড়িতে লাগিলেন। কুশলের
আরও অগ্রহে চামেলি তিনি বলিলেন,—“কি দিদি।
তুমি এত হালুকা কেন? আমাকে কোটশিপের
কোন শীজ বুঝিয়ে বল না, দিদি।”
বহুকষ্টে চামেলি হাসি খামিল। চামেলি তোমার
লেন,—“আমি হাসি কি মূগে? ভাই। ভাগীর
কেবল রঙ্গ বেশিয়া হাসিতে হয়। তোমার এতখানি
বদন হইল, তুমি যেমন-পদবীতে পদাণ্ডি করিয়াছ,
এতক তুমি কোটশিপ কথাকে বলে জান না,—
ইহা কি কং হাজরসের বিষয়? আমাদের স্থলের
নাষ্টার বায়ু যদি এ কথা শুনেম, হে, তুমি নব্যে-
প্রাপ্তবতী হইয়াও, কোটশিপ-খ্যাতে অস্বস্তিভা,
তাহা হইলে, তিনি আর কি তুমতেই তোমাকে স্থলে
চাউ করিয়েম না,—অথিক কি, স্থলের ত্রিসীমা
মাড়িহুত দিবেন না।”

কুশল। (স্বতঃ) ও কথা—আমাকে আবার
ইস্থলে ভর্তি হইতে হইবে নাকি?

চামেলি। আরও এক কথা। বধন লোক-
জ্ঞানে প্রকাশিত হইবে যে, কুশলনদী, কোটশিপ
না করিয়াই, পোহুলচলকে বিবাহ করিয়াছেন,
ওখন লজ্জায় একেবারে সকলের মাথা হেঁট হইয়া
বাইবে। সভ্য-সমাজে কি-ছি-ছি লনি উঠিবে।
ক্রমশঃ পথ চলা ভার হইবে।

কুশল। (দ্বিঃ নীরব থাকিয়া) সেইজন্যই ত
কোটশিপ কি, তাহা জানিতে চাইতেছি। তুমি
আমাকে একবার প্রকাশ করিয়া বলিলেই, তাহা
আমি শিখিয়া লইব। একবার শিখিলে, তাহা
আর ভুলিব না।

চামেলি। (হুঃ হাসিয়া) সোৎ কথার কাজ
ময়। কথার বলিয়া, কোটশিপ শেখান যায় না।
বালো যেমন বদশেয়ার উদ্ধারসামান হয় না, সেইরূপ
কেবল বাক্য দ্বারা কোটশিপ বুঝান যায় না।
কিছুকালের কেবল উপদেশে পাইলে কুশল হওয়া যায়
না। সহস্রে লাগল ধরিয়া তুমি কর্তব্য করিতে হয়,
বহুসে বাস দিতে হয়, বহুসে বোঝাবদন করিতে হয়,
বহুসে বাস নিড়াইতে হয়, তবে কুশল হওয়া যায়।
ওখন বাস-কুশল জন্মগ্রহণ করে। কোটশিপ নিজে
না করিয়া দেখিলে, কোটশিপের প্রকৃত মর্ম, প্রকৃত
বিজ্ঞান, প্রকৃত বর্ষ,—কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে উপ-
লব্ধি হইবার নহে।

কুশল। সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি নাহিবা হইল,
কথা কথার বুঝিয়া বলিলে, কোটশিপের মর্ম
কতকটা উপলব্ধি হইবে।

চামেলি। কোটশিপ কি আহারীয় সামগ্রী
যে, তারো অর্থ ভোজন হইবে? কোটশিপ বুঝিতে
হইলে, স্বয়ং কোটশিপ করিতে হইবে। তা, তুমি
ইহা? একবার কোটশিপ করিয়াই দেখ না কেন?
ভাগ্যে কোনও সোম দাই। ইহা আশীষ পবিত্র
জিনিস। কোটশিপ-কার্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা
না থাকিলেও, কুশল প্রকাশিত বলিলেন,—“তা,
কতি কি? এখন তুমি বলিতেছ, কোটশিপ-কার্যে
সোম দাই, ওখন না হয়, একবার আমি কোটশিপ
করিয়াই দেখিলাম। তবে এই টুকু আমার জিজ্ঞাস্য,
কোটশিপ কি রকম? উহাতে কি করিতে হয়, কি
না করিতে হয়, কি আছে, কি নাই, উহা কেনম,—
আপাতত মোটামুটি আমি তাহাই কেবল জানিতে
চাইতেছি। প্রকৃত স্বকান্ত্য নাহিবা জ্ঞানিয়া,
মোটামুটি কুশল কং জানিতেপারিলেই এখন আবার
পদে-পদে?”

চামেলি। তা, বটে? ঠিক, ঠিক। যিনি
অদূর-ভবিষ্যতে স্বয়ং পাঠ করিলেন, প্রথমে তাঁহার
অঞ্চল-পরিচয় করাইয়া দেওয়া চাই। আছে,—
প্রথমতঃ হুঃ যেন তোমারই কোটশিপ হইতেছে।
তুমি এবং আমি দুইজনে বৈকালে দিয়া পোষাক
পরিয়া, (পাঠন পুরিলেই ভাল হয়) হামের উপর
হাত ধরাধরি করিয়া বোড়াইয়া বাসন্ত-সময়গে সেনন
করিতেছি। এমন সময় একটা নম-সুখক উপলব্ধি
হইলেন। তাঁহার হাতে, হাতের মাঝের বীণান
একখাড়া সঙ্গ বেক্তর ছড়ি, দাওয়ার এলাট
ফ্যানের টেঁড়ি, পায়ে পরদের পাশিঁকটি, মুখে
সোনার টেন, পকেট ক্রমাল, মুখশাখি অম্ব
হাসি-হাসি। আমি তাহাকে দেখিয়াই বেশ আনন্দ
অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম,—“এস, এস, বলি নু
এস।” তিনি আমাকে মূরুর স্বরে বলিলেন,—
“ভগিনী চামেলি। বেশ ভাল আছে? সেং, মন,
বা আশ্রয় কোনওর কষ্টাভবন হয় নাই?”
আমি। তোমাদের জায় মহামুখ বাক্তিপন
যাযাবর। তাহার আবার কষ্ট কি?

বলি নু বাউ। (হাঃ করিয়া) ভগিনী। তুমি
যাযা বলিতেছ, ওংসমস্তই নিজগুণে। আচ্ছ। এই
খানিটা, বিজ্ঞান এই খানিটা গভীরবৈ উপকৃত।
ভগিনী। বল, বল,—ব্যস্তানি উত্তর লাগিতেছে?
জয়ী পানীয় জল দ্রুত এবং মুখাই বটে ত?
বলি নু বাউ। যে সময়ে এইরূপ কথাবাণী করি-
তেন, সেই সময় বেশিবে যে, তিনি তোমাকে এক
একবার আড়ম্বনে চাহিয়া দেখিতেছেন। বধন
তোমরা উভয়ে উভয়ের কটাক্ষের দ্বারা বিকৃত হইবে,—
ইহা আমি দেখিব। তখন আমি প্রস্তাব করিব,—
“নলিন বাউ, আমার এই পার্শ্ববর্তিনী হুঃসানি
রমণীভীকে আশ্রিত বেশে হুঃ হুঃ চেনেন না। ইনি
মহিলা-মুখ-সম্বন্ধ-সবিতা। ইহার সহিত-আলাপ
করিলে আপনি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতে
পারিবেন।”

নলিন বাউ। স্বর্ষাৎ কথা। মহিলায় মুখবল
দেখিলেই মনে হয়, ইনি মধ্যস্থির মানবী নহেন,—
সেহিঁকই স্বর্ষায়া হুঃসানি। অথবা ইনি সুখি
হিসেবাত্মা রক্তা। নহেন ত? অথবা আপনি
কালপুর্বে রাজশক্তি রৌপ্য-রূপ-পুষ্টি। কিন্তু এগকে
কহাশি-সেখায়া সর্বকর্মণী ত্রীমিতী রোগাশেয়
সহিত আপনার কতকটা দাষ্ট্য দোষিতৈছি।
কতকটা, কেনম,—সুখি সম্পূর্ণই সাগুস্ত আছে।

নলিন্দ্ৰ বাবু যখন তোমার সম্বন্ধে এই সকল কথা আরম্ভ করিতে থাকিবেন, তখন তুমি গভীরভাবে আধ্যাত্মিক বদনধানি স্থলাইরা রাখিবে; কোনও কথা করিবে না এবং সে সময় নলিন্দ্ৰ বাবুর প্রতি একবার চাহিয়াও দেখিবে না। কিন্তু যখন নলিন্দ্ৰ বাবুর সমস্ত কথা বুঝাইবে, তখন একবারমাত্র অকৃত্রিম হৃদয়ে বলিবে,—“আমি জ্ঞতি কৃত্ত ব্যক্তি; আপনিতা আমাকে যে গুণব্যাখ্যা করিবেন, তাহা কেবল আপনাদেব মহাত্ম্যের পরিচায়ক।”

তোমার এই কথা বলা পরিসমাপ্ত হইলে, আমি কবিত্ব, প্রাণের ভগিনী। কৃত্ত। এই ব্যক্তিকে তুমি বোধ হয় চেন না। এই ব্যক্তির নাম নলিন্দ্ৰ বাবু। ইনি কলিকতায় অধ্যাপক; কল্যাণী-বাসী এবং কলিকতা ইষ্টার বিশেষ অবিকার। ইনি বাঙ্গালা এবং ইংরেজী উভয় সংবাদ-পত্রেরই সম্পাদক। সংস্কৃত সাহিত্যে ইনি অসীমতর পণ্ডিত। ইনি ইন্দো-জাতিতে এক পুস্তিকা রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, সংস্কৃত ভাষা গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত। এইজন্য ইউরোপ এবং আমেরিকায় ইহার নামে বই প্রচারিত হইয়াছে।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমায় তিনজনকে সেই ছাত্র তিনজনকে চোরে উপস্থাপন করিল। আমি তখন তোমাকে বলি, “ভগিনী! এখনও তুমি নলিন্দ্ৰ বাবুর সম্বন্ধে জানাপ ক’র।” তুমি বলিবে,—“আমি কৃত্ত ব্যক্তি; আমাপের, কি আমি? উনি পণ্ডিত ব্যক্তি, কলিকতায় অধ্যাপক; ইহার সম্বন্ধে আমি কি কথাবাতা কহিতে সক্ষম হইব?”

নলিন্দ্ৰ বাবু তোমার হাসিয়া বলিলেন,—“বিনম্রই জিজ্ঞাস্য তোমার, বিনম্রই জিজ্ঞাস্য আমায়, বিনম্রই জিজ্ঞাস্যকে কোহিনুর। কুরঙ্গনামি। বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য—এ সমস্তই মুক্তি দেবিলেই বুঝা যায়।” বিনি আপনাদেব মৌম্য মুক্তি-পাণ্ডিত্য অবলোকন করিবেন, “তিনিই বলিবেন,—বুনি আজ ক’র সংস্কৃত দরাসীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনাদেব মুনগুন হইতে সময়ে মনে উজ্জ্বল প্রতিভা-রশ্মি লাগিয়া “বাহির হইতেছে,—ইহাতে মনে হয় যে, বৃহৎপতি জ্ঞায় আপনাদেব বুদ্ধি। এক্ষণে আপনাদেব কেশরী-কীট-ভট-বারিহী। ইহাতে বুদ্ধি-বুদ্ধি—ইহাতে বুঝা যায় যে, আপনাদেব উচ্চ-বংশে জন্ম। আপনাদেব ঐ পীতাম্বিত পূর্ণাঙ্গ—বাহ্য-ব্রজ শিহরে কদম জরে দাড়িম বিলসে,—

উহা দেখিয়াই যাকি বুঝিব? বুঝিব যে, শেলির কবিতা, অকৃত্তই আপনাদেব, কৃত্ত মুখ্য আছে। নেননা, শেলির কবিতা অন্তরঙ্গ না থাকিলে, ওভাবে উহা ভিত্তিতে পারেন না। আপনাদেব সমস্ত—ধনসম্পন্ন—জীবাণুপাত মনে দেখিয়া মনে হয়,—আপনাদেবই যেন বেদ-বাইবেল-কোরান সমগ্রই হইয়াছে;—সমসারের সর্বোচ্চ সার সামগ্রী চুই আপনাদেবই নিহিত দ্বারা। বিনি খণ্ড বাস্তুবাদিনী, তিনি যে, সংসদৃশ সামান্য ব্যক্তির সঙ্গে কথাবাতা কহিতে সক্ষম হইবেন না,—ইহা কি কখন সম্ভবপর হয়? বরং ইহাই সম্ভব যে, আপনাদেব সম্বন্ধে কথা কহিতে আমিই অক্ষম হইব।”

নলিন্দ্ৰ বাবু প্রকৃত তোমার এইরূপ কথাবাতা চলিতেছে, এখন সময় হঠাৎ তুমি আপনাদেব হস্তান্তর গোলাপ ফুলের তোড়াতী ভূমে ফেলিয়া দিলে। এমনভাবে ফেলিবে যে, তাহাতে মনে হইবে, তোড়াতী আপনাদেব তোমার হাত হইতে বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে;—তুমি ইচ্ছা করিয়া, তাহা ফেল নাহি। তোড়াতী পড়বে, যদি তুমি দেখ যে, নলিন্দ্ৰ বাবু অন্তরে ব্যস্ত উঠিয়া, অমনি তোড়াতী হুড়াইয়া নগিয়া, তৎক্ষণাৎ রাডিয়া হুড়িয়া,—আহা! আহা! হায়! হায়! করিতে-কহিতে,—তোমার অর্পণ করিলেন, তাহা হইলে বুঝিবে, এইবার কোর্ট-ফিল্মের সূত্রপাতের সূচনা হইতেছে। যদি এ সম্বন্ধে আরও পুরানি করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে কিছুকাল পরে ঐভাবে একখানি রুমাল ফেলিয়া দিবে। সে রুমাল পড়িলে ওজনীয় ঐ ভাবে তুলিয়া তোমাকে যদি মনে, তবে সে পক্ষে নিশ্চিত থাকিবে। যদি কোনও কারণে তোমার বিশেষ-বিশেষ পরীক্ষা করিবার অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে—উঠিয়া পাড়াইবে, চলিয়া বাইবার ভান করিয়া, দেওয়ানে একটী মাথা ঠুকাইবে,—মাথা ঠোকা হইলে, ভুলসে মুক্তিও হইবে পড়িয়া যাইবে। এ সময় যদি দেখ, নলিন্দ্ৰ বাবু নহা স্তব্ধ হইয়া, জল আনিয়া তোমার সম্মুখে দিতেছেন এবং তোমার মাথাটা তাহার কোলে রাখিয়া কেবল “মরি! মরি!” করিতেছেন, তাহা হইলে ক্রবনিচ্চা জামিও—কোর্টশিপের একাডেমী সূত্রপাতের সূচনা হইয়াছে।

এই ঘটনার পর, কোর্টশিপের অক্ষর-পরিচয় হইবে। তারপর ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ। পরে বোম্বাই-দুঃ। তখন কৌমুদীর সাহায্যে কল্পপাত্র অবশেষে প্রবেশিকার উত্তীর্ণ। তারপর আবার এলে, বিবে,



এবং গাম। তারপর কোর্টশিপের প্রেমচাঁদ-সাম-চাঁদ, সর্বসম্মত যি এল,—তত্ত পর ভিএল। তখন কোর্টশিপ সমাপ্ত হইবে।

এই কথা বলিয়া, সেই দিলীখে, চামেলি, কুরঙ্গের চিত্র ধরিয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—“কুরঙ্গ-ভাই! আজ আর এ সব কথা বলিতে পারি না,—আমাকে ঘরা কর। কোর্টশিপ ব্যাপারের সূত্র-পাত বুঝাইতেই আজ প্রায় নিশি ডোর হইয়া উঠিল,—অতঃপর প্রবিরোধের এখন সমস্তই বলিতে পারি।—অতঃপর মজারতের ভলিতে পাই, একদল শ্রমিক আছে। কিন্তু এই কোর্টশিপ-মহা-ভাগ্যের প্রোকসংখ্যা উনপঞ্চাশ লক্ষের কম নহে। হুতংহা—ইহা কি এক রাত্রিতে বলা যায়? একশত রাত্রিতে ইহার বহিরা কৌতুহল করিয়া শেষ করা যায় না। একশত রাত্রি কেন, একশত বৎসর বলিলে, সংক্ষেপে যদি কিছু বলা যায়, তাহা হইলে বেষ্ট মানিবে। তাই বলিতেছি, এখন এ বিষয় থকুক,—আমাকে রাত্রি হইয়াছে, হইজনে ঘুমাইগে থাক। তার পর, প্রাতে উঠিয়া না হয় কিছু কথা আরম্ভ করিব।

কুরঙ্গনামির কৌতুহল কিছু ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি চামেলিকে নিমিত্ত হইলেন,—“ছেই দিদি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর একটী বণ। কোর্টশিপের অক্ষর-পরিচয়টা কিরূপ, তাহার কতকটা আলিহ কোন বণ না দিদি?”

চামেলি। আমার বড়ই মাথাটা ধরিয়াছে। আজ থাক, কাল নিশির লখনো।

কুরঙ্গ। দিদি! তোমার আমি মাথা টিপিয়া-টিপিয়া তোমার মাথা ধরা আয়াম করিয়া দিতেছি—তুমি কিছ আর একটী বণ।

কুরঙ্গের আগ্রহাশুচি দেখিয়া, চামেলি হৃদয়ী হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“ভগিনী! তাহা অতি গুপ্ততর ব্যাপার। অবশ্যনি। (একটী চিহ্ন করিয়া) অক্ষর-পরিচয়-বিভাগ তুমি দেখিতে চাহ, না জানিতে চাহ? অব্যাকান্ত হও, কল্য তোমাকে অক্ষর-পরিচয় দেখাইব।

কুরঙ্গের কৌতুহল এবার চতুর্ভুগ বৃদ্ধি পাইল। বলিলেন,—“দিদি! যদি রাগ না কর, তবে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।”

চামেলি। আচ্ছা—বল—বল।

কুরঙ্গ। কাণ কখন দেখাইবে? আমিই বা তখন কি দেখিব।

চামেলি। (হাসিয়া) কাল ঠেকালে দেখাইব। বৈকালে আমরা গড়ের মাঠে বেড়াইতে বাইব। তোমাকে বাহুবুর, কোম্বা, এবং ইডেন-বাগান দেখাইব। আর সেই সময়—

কুরঙ্গ। বাহুবুর কি দিদি? চামেলি। (হাসিয়া) প্রতি কথাই যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে তুমি আমি গিয়াছি। বাহুবুর এক প্রকাণ্ড গৃহ; সেই গৃহে পুত্রবাহু, যামতারা আশ্রিত; আশ্রিত, জীব-জন্তু, মনি-মানিক্য, বস-জলকার প্রভৃতি সমস্তই আছে। বাহুবুর দেখা সমাপ্ত হইলে, তোমাকে ইডেন-বাগানে লইয়া বাইব। সেই সময় তোমাকে অক্ষর-পরিচয় দেখাইব।

এই সকল কথা শুনিয়া কুরঙ্গনামি পুনরুক্তি হইলেন। বলিলেন, “দিদি! তুমি আমার পায়ে হাত দিয়া দিয়া করিয়া বণ, কল্য বৈকালে নিশায় গড়ের মাঠে লইয়া যাইব।

চামেলি, কুরঙ্গের পায়ে হাত দিয়া দিয়া করিলেন। তিনি প্রায় ১০টা ব্যক্তিগণকে। তখন উভয়ের সোকা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া সেই বাটের উপর হৃৎস্পর্শ শয্যা শয়ন করিলেন। চামেলি সর্বদায়ে নিমিত্ত হইলেন। কুরঙ্গের চক্ষে যম্ম আশ্রিতে কিছু বিলম্ব হইল।

সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইল। ছয়টা লাগিল। জলের কণে জল অসিল। বাটার অস্ত্রাঙ্গ পূর্ব-রমণীপ উঠিলেন। কুরঙ্গ ও চামেলির মূম ভাঙিতে কিছু বিলম্ব ঘটিল।

এদিকে ভাত্তর্য অভিজ্ঞা সম্ভবিত হইয়া আছেন। নেননা, পোঙ্কল-মুজিক এ পুণ্ডিত ব্রজিয়া পাওয়া যায় নাই। পাছে কুরঙ্গনামি জানিতে পারেন যে, ভাত্তর্য-সমী হারাইয়াছেন, এবং কামিগে পারিয়া, গভীর চাঁচকার করিয়া উঠেন,—ইহাই ভাত্তর্যের ভয়। অথবা কুরঙ্গনামি যদি একগুণ সবেল যে, ভাত্তর্যই তাহার স্বামীকে লুপ্তপ্রায় রাখিতেছে, অথবা মায়ীরা ফেলিতেছে, তাহা হইলে সে একটা মহা হুলস্থলণ কাত বাগিয়া যাইবে,—ইহাই ভাত্তর্যের এক বিশেষ ভয়। প্রভাত, উঠিয়া, নিম্নতনের বৈঠকে বসিয়া। তাহা

উভয় ভ্রাতা এইরূপ নানারূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় আর একব্যক্তি ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বরে ঝিল দেওয়া হইল। কুমিটি বসিল। মুক্তি হইল। অষ্টদশ, পরে ভ্রাতৃদ্বয় একথাকো বসিলেন।—“অতি সুন্দর মুক্তি। ঈশ্বরের অভিপ্রেত মুক্তি।”

পৌষে আটটা বেলা। চামেলি এবং কুরঙ্গ শয্যা হইতে উঠিয়া বারেলার চেয়ারে থিয়া উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিম্নতলে একটা গোলা হইতে লাগিল। একই হাটখাটিকি রকমের কথা-বাণী চলিল। কথা এইরূপ:—“না, না—তা হইবে না—আজ ত্রিবেণীতে পঞ্চাশতান করিতে যাওয়া হইবে না।—ইহাতে আশাশ্রম শাস্ত্রমিক কহি হইবে।

অন্য মনমোহন দর্শন করিয়া বাগবাজারের ঘাটে নান কদম * কিছুক্ষণ সুকলেই নীরব। আবার একজন ভ্রাতা চাঁৎকার আরম্ভ করিলেন,—“তা পোহুল। তুমি যদি অন্য একাত্তই ত্রিবেণী ঘাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার স্বাক্ষর সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। তোমার জী বে, এখানে একাকিনী থাকিবেন, তাহা আমরা পছন্দ করি না।” আবার কিছুক্ষণ সুকলেই নীরব। পুনরায় এই স্বরে চাঁৎকার আরম্ভ হইল,—“তা পোহুল। তুমি ঠিক কর্ণে; তোমার জী আমাদের কাছে থাকিলে যে, কোন ধরে থাকিবেন, তাহাচন্দনহে। তবে তোমার যদি জীকে আমাদের নিকট রাখা একান্ত অভিশ্রুত হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ইহার মধ্যে এক কথা আছে। এ সময়ে তোমার জী মতামত প্রকাশ করিতে হইবে। তিনি যদি ঘাইতে চাহেন, তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া তোমার অবশ্যই কর্তব্য।” কিছুক্ষণ সুকলেই নীরব। এবার দ্বিতীয় উঠিল এইরূপ,—“না, না—পোহুল। তাহা হইবে না। জীলোকের স্বাধীনমতে কখনই বাধা গিতে নাই।”

কুরঙ্গ উঠকঃপরে এইরূপ কথা চলিতেছিল, তাহাতে বাটার সকল লোকই সে কথা শুনিতে পাইতেছিলেন। কুরঙ্গ এবং চামেলি বারেলার বসিয়া ছিলেন;—সর্বদা, তাহাদের শ্রবণ-বিষয়ে এ কথা প্রবেশ করিতেছিল। চামেলি জিজ্ঞাসিলেন,—“তাই কুরঙ্গ! দেখিতেছি, তোমার শ্রমী ত্রিবেণীতে পঞ্চাশতানে—বাইবেন;—তুমিও কি ঘাইবে?”

কুরঙ্গ। ত্রিবেণী-ট্রিবেণী আমি ঘাইতে পারিব না। আমি আজ পড়ের মাঠে বাহুর দেখিব, ইডেন-বাগান দেখিব, আর জেক্স-পরিচয় দেখিব।

চামেলি। তাহা কি উচিত কাজ হয়? শ্রমীর অনুমতি করাই জীলোকের কর্তব্য।

কুরঙ্গ। বারমাসইত সঙ্গে সঙ্গে আছি। একদিন না হয় ছাড়াছাড়ি হইল,—তাহাতে ক্ষতি কি?

চামেলি। অহো! কি কুসংসার! কি অম শিখা!

উভয়ে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ভ্রাতৃ দ্বিংশে উঠিয়া আসিয়া, কুরঙ্গের নিকট সুমাগত হইলেন। কুরঙ্গ একই লজ্জিত হইয়া থানিকটা থোমটা টানিয়া দিলেন।

ভ্রাতা। আমি তোমার ভ্রাতা। আমাকে লজ্জা কি? সে বাহা হউক,—তোমাকে এখন একবার পোহুলচন্দ্রের সহিত ত্রিবেণী ঘাইতে হইবে। ত্রিবেণী এ স্থান হইতে অনেক দূর বটে, পথও দুর্গম বটে, কিন্তু তোমার যাওয়া উচিত।—বল, এ বিষয়ে তোমার মতামত বল।

কুরঙ্গ বাড় বাড়িয়া বুঝাইলেন—না, তিনি ত্রিবেণীতে পঞ্চাশতানে বাইবেন না।

ভ্রাতা। যখন তুমি শ্রমী-সঙ্গে ঘাইতে চাও, তখন আর উপায় কি আছে? বাধা, ভগ্নি। তুমি স্বহস্তে থাক। তোমার স্বাধীনতার আমি হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না।

ভ্রাতা তখন এই কথা বলিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। নীচে তখন আর একটা শব্দ উঠিল,—“লেখ, রামদয়াল মাঝি! প্রাশলক বেশ শ্রমবান্ধবে ত্রিবেণীতে লইয়া ধাইও, পথে যেন তাহার কোন কষ্ট না হয়। এখন তোমাকে ১০ টাকা দিলাম। থাক টাকা পোহুল দিগিয়া আসিলে চুকাইয়া দিব।”

সকলে নীরব হইলেন।

এ দিকে কুরঙ্গ কেবল বৈকাল বেলা অবেশন করিতে লাগিলেন। প্রানাহার হইল,—অন্ন নিজা হইল,—তথ্য বৈকাল হইল না। বেলা তখন ২টা নাক। কুরঙ্গ সাহসে ভর করিয়া চামেলিকে জিজ্ঞাসিলেন,—“দিদি! বৈকাল হয় নাই কি?”

চামেলি। ইহারই মধ্যে বৈকাল হ'বে কি?

কুরঙ্গ। দিদি! জেক্স-পরিচয় কি রকম? কাদের জেক্স-পরিচয় হইবে?



কোর্টশিপের অক্ষর-পরিচয়।

চামেলি। তোমার কি আর একটু বিলম্ব
কহ না—এখনিত দেখিবে;—তুমি যা আর কি
হইবে?

হুহর। কাহাদের অঙ্গর-পরিচয় হইবে,—
তাহা জানিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাচুল
হইয়াছে।

চামেলি। তাঁহাদিগকে তুমি চেন না।
হুহর। নাইবা চিনিলাম! তাঁহাদের নাম
কি—তাঁহারা কি করেন?—তাহা তুমি বল না!

চামেলি। পুরুষের নাম—এল, পি, ভূত্যাচার্য
একোয়ার। মহিলার নাম হুমারী বোজনপঙ্কজা
চাকি। মিঃ ভূত্যাচার্য একরকম বিলাত-প্রতাপক।

তিনি বাস্তবিক হইবার জন্য বিলাত যাইবার মানসে
একবার কলিকাতা হইতে বেলাপাড়িতে বোম্বাই পর্যন্ত
যাত্রা করিলেন। বোম্বাই-নগরে একমাস কাল থাকিয়া

আম্রাবতে শেষে ও-প্রদেশের বেলপাড়িতে কলিকাতায়
প্রত্যাপিত হইতে বাধ্য হন। এক্ষণে তিনি এক
বিশাল-প্রতাপক বসিয়াই সুখিত্য। তাঁহার

বেশ-ভূষা, চাল-চলন, কথা-বাড়ী—সমস্তই বিলাত-
প্রতাপেরে চায়। হুমারী বোজনপঙ্কজার সহিত
ইহার কোর্টশিপের যুচনা শেষ হইয়া এক্ষণে

অঙ্গর-পরিচয় আরম্ভ হইয়াছে। উভয়েই ভিন্নমুখ
হইতে প্রত্যহ গাড়ী করিয়া আসিয়া ইডেন-
উদ্যানে বসিয়া বসিবে নহেন। কর্মপত্র

কথাবাড়ী হয়। কোন দিন বা উদ্যান হইতে মিঃ
ভূত্যাচার্য, হুমারী বোজনপঙ্কজকে আপন ঘাসায়
লইয়া যান। এখন এইরূপই চলিতেছে। আর

ভূমি বৈকালে গরিয়া সমুদ্র তে দৃষ্টি করিতে পাইবে।
ভূমি বৈকালে গরিয়া সমুদ্র তে দৃষ্টি করিতে পাইবে।
ভূমি বৈকালে গরিয়া সমুদ্র তে দৃষ্টি করিতে পাইবে।

একাল আসিল। রাষ্ট্রধর সেবিয়া ভালেসি
এবং কুসুম ইডেন-উদ্যানে গমন করিলেন। তাহার
প্রসূতই এল, পি, ভূত্যাচার্য এবং হুমারী বোজন-
পঙ্কজ কোর্টশিপ-প্রতাপেরে প্রথম প্রহরের ১ম

দ্রোক সন্ধান করিলেন। নয়ন-মন-বোধ-প্রাণ
চরিতার্থ হইল।



বীর-চরিত্র।

নারায়ণ নন্দভট্ট নরকেশ নরোত্তমসু।
সেবী নন্দভট্ট নরকেশ নরোত্তমসু।

দিল্লী,—বেংগল মহার পুত্র, ইক্ষাকুর জাত।
তাঁহার বংশে মহারাজ বরদাসের জন্ম। বরদাসের
স্বয়ম্বর-লক্ষ্য মহিয়ার নাম বীরাল। অস্বীকৃত, এই
রাজপুত্রিকাকেই অকমাত্র নন্দন। রাজপুত্র অস্বীকৃত,
অমল বসুদেবী রূপ-লাবণ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি ও শৌর্য-বীণা-
মণ্ডে বিলম্বৎ বশীভূত হইলেন। তাঁহার রাজমণ্ডলী,
তাঁহার নিমিত্ত-শর-নিকরে আহত হইয়া বীর-
লোকের গমন করিলেন। বৃত্ত রাজা মহারাজ,
তাঁহার প্রভাবে ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন।

বিশাল-রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র। সকল রাজ-
পুত্র-সমীপেই নিম্নগত পুত্র প্রেরিত হইলেন। রাজ-
নন্দন অস্বীকৃত ও নিমিত্ত হইলেন। বিশাল-
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্রের কথা সর্বত্র যথাব্য-
বসীভূত, নিম্নগত পুত্র পাইয়া উৎকৃষ্টভাৱে
স্বভাৱ-সমভিযাচারেই বিশাল নগরে গমন
করিলেন।

তথ্য মহতী স্বয়ম্বর-মন্ডাল। পৃথিবীর সমুদায়
উজ্জয়-রাজপুত্র সেই সভায় সমবেত। সকলেই
উজ্জয়-রাজপুত্রের রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
করিয়া জন্ত অশ্রুণাক করিতেছেন। অনেকেই

থ খ বেশ-ভূষণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অপর
অশ্রুণাক আপনাদের উৎকর্ষ মনে করিতেছেন।
তখনও রাজপুত্র-স্বয়ম্বর-মন্ডাল উপস্থিত হন

নাই। সেই অশ্রুণাক, রাজপুত্রগণের পক্ষে বিষম
অসহ্য ভাবীয়া বোধ হইতে লাগিল। রাজপুত্র-
গণের তাকালিক চোঁটার কথা বিহত করিবার শক্তি
আমাদের নাই; থাকিলে বর্ণনা করিতাম। তথাপি

তিনি আমাদিগকে ভাড়িতে না চাইলে, ত্যাহাকে
রঘুবংশের স্বত্ব সর্ব পাঠ করিতে অহরোধ করি।
কিন্তু অপর পক্ষ রাজা-মহাভিযাচারে মায়াস্থলেপন-
হস্তা রাজপুত্র-স্বয়ম্বর-মন্ডাল উপস্থিত হইলেন।

রূপ-সকলেরে প্রভ, তদীয় রূপ-লাবণ্যের প্রতি
দারিত হইল; রূপ-সকলেরে কণ তাঁহার স্বভাব-
গুণ ভাঙি উদ্দেশে অবশিষ্ট হইল। সকলেরে স্ব-
ভাৱে দারিত হইতে সক্ষম হইল। সকলেরে স্ব-
ভাৱে দারিত হইতে সক্ষম হইল। সকলেরে স্ব-

ভাৱে দারিত হইতে সক্ষম হইল। সকলেরে স্ব-
ভাৱে দারিত হইতে সক্ষম হইল। সকলেরে স্ব-
ভাৱে দারিত হইতে সক্ষম হইল। সকলেরে স্ব-

ভাৱে দারিত হইতে সক্ষম হইল। সকলেরে স্ব-
ভাৱে দারিত হইতে সক্ষম হইল। সকলেরে স্ব-
ভাৱে দারিত হইতে সক্ষম হইল। সকলেরে স্ব-

বীর-চরিত্র।

হইল। তখন সকলেরে স্বয়ম্বর এক সাধিকভাবে
পরিপূর্ণ; আর কাহাও তথায় আসা হইবার যো
নাই। এইরূপে লক্ষ্য-কোঁঠি, মান-অপমান, প্রাণ-
বেশ, স্বয়ম্বর-বিদ্যা, বিদ্যা-কোঁঠি—আর্য্য গাভের
স্বয়ম্বর-বিদ্যা-কোঁঠি, মান-অপমান, প্রাণ-
বেশ, স্বয়ম্বর-বিদ্যা, বিদ্যা-কোঁঠি—আর্য্য গাভের
স্বয়ম্বর-বিদ্যা-কোঁঠি, মান-অপমান, প্রাণ-
বেশ, স্বয়ম্বর-বিদ্যা, বিদ্যা-কোঁঠি—আর্য্য গাভের

সত্যসিদ্ধি দীপশিখের রাজ্যে
বৎ যৎ যতীয়ার পতিত্বায়া।
নরেশ্বরমণ্ডল ইহ প্রদেশে
নিবর্তিতব্য মস ভূমিপালঃ

ভাষ্য—রাজ্যকালে দীপ-বিদ্যা-কোঁঠি রাজপুত্র
মহিয়ার সময়ে সোম্বা যায়, বীরলোকের পূর্ণপাৰ্থক্য
যে সকল আত্মলিকা অতিক্রম করিয়া যাত্রা-সমস্তই
অস্বীকৃত করি বিবর্ত হইয়া পড়ে; তদুপ যথাব্য-
বসীভূত রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ

রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ

রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ

রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ

রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ

রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ

রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ

রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ

রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ

রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ
রাজপুত্র-নিমিত্ত রাজপুত্র-প্রদত্ত বর-মালা গ্রহণ

এ কার্য্য তাঁহারা দোষাবহ মনে করেন না। বরং
ধর্ম-সম্পত্তি বোধ করেন। অস্বীকৃতেরে সেই
দারপাই ছিল।

রাজমণ্ডলী অস্বীকৃতের নিকট অনেক বার
পরাভূত হইয়াছিল। আবার এই দারপা অশ-
মান। হুমারী সকলেরে অস্বীকৃত হইয়া পড়িলেন।

অপমানিত বিশাল-রাজপুত্র অস্বীকৃত রাজপুত্রের সঙ্গে
একত্র হইলেন। সকলেই স্থির করিলেন, রাজ
কীর্ত্তি অস্বীকৃতকে মুচুতিতে প্রতিকূল দিবে। তাঁহা-
দের বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

সঙ্গে বহুতর সৈন্য বা সামগ্রিক উপকরণ অধিক
ছিল না। অস্বীকৃতও বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।
সঙ্গে বিশেষ সাহস এইরূপ হইল যে, অস্বীকৃতের

আহামিদের হান অবিকল করিল। বহুশব্দ এইরূপে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বিপক্ষ অব্যাহতের বেগে তদ্বীকৃত হইয়া গেল। কিন্তু এরূপ যুদ্ধ কতক্ষণ চলিতে পারে। একের সঙ্গে লক্ষবিকের যুদ্ধে যুদ্ধ কতক্ষণ চলিতে পারে। কতায় যুদ্ধে অব্যাহতের ধ্বংস, অং-সারবি, ধ্বং-বর্ষ, ধ্বং-চর্ম, শক্তি-শূল, মুক্তি-মূল্যের প্রকৃতি সকল অতঃশত্রুই বিলুপ্ত হইল। এখন কেবল বাহমাত্র লক্ষ্য। তখনও অব্যাহতের বেগে দেখে কে? তিনি দুর্যোধনের ও চণ্ডীপাঠের মূর্ত্তে মূর্ত্তে—কত বিপক্ষকে ক্ষুদ্রদমনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্বদাই বিপক্ষ; বিপক্ষদের অনবরত অস্ত্রাঘাতে, নিরস্ত্র হইয়া—কোলাহল রাধিয়া প্রাশান্তি-সাগরে ধৌপ বিল। অবিলম্বেই তিনি নিম্নলিখিত ও নিম্পদ অধ্যায় সমাপনের নিশ্চিত হইলেন। বিপক্ষের যেরাও জয়লাভ করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাত্ কায়ারো লইয়া গিয়া সোয়ার বীণাঙ্গ করিয়া দিল। বীরপ্রথমা রাজনন্দন অব্যাহত আঙ্গ বণী।

এই রূপান্তর মারাজ কর্তব্য, তদ্বিহী বীরা এবং তাঁহার সমস্ত নৃপতিজ্ঞ। অবিলম্বেই ভূমিতে পড়িলেন। তখন সকল কর্তব্য বিষয়ে পারদর্শন করিতে লাগিলেন। কোন কোন রাজা বিগলেন, 'মহারাজ! অব্যাহতের সমুদ্র রাজপথেরই বন কর্তব্য; মুষ্টি বিশালরাজকেও নিহত করুন।' কেহ বলিলেন, 'রাজপুত্র অব্যাহতই অব্যাহত'। অকস্মাৎ বিশাল-রাজনন্দিনীকে হরণ করা তাঁহার অতি পরিতোষার্থ। হুতরাং এই মুষ্টি পুত্রের জন্ত শোক দ্রুত কিছুই করিবার আশ্রয় নাই। প্রতীকার করিবারও প্রয়োজন নাই। অব্যাহত-জন্মদী বীরা এই সমস্ত কথা শুনিয়া রাজকে বলিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার মহিষী, দীর্ঘচন্দ্রের রাজা, মারাজ বনোন্মেষের পুত্রবধূ; আমার পুত্র যদি অর্পণিত হইত, যদি ভীষ্ম পাপুস্বয় হইত, যদি ভীষ্মস্বয় বলাই হইত, তাহা হইলে আমি সে পুত্রের হৃদয়-শোকন করিতাম না। তদুপরি ভিন্নরাধাস্য আমি পূজা করিতাম। কিন্তু আমার পুত্র ত অহা নহে। বীর সৌম্যকিত, যুদ্ধ পাত্রী-হরণ করিয়া বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; তাহা শুধু কল্পিতের শাখ

ও-ধ্বংসমাত্র প্রাপ্ত কার্য। তার পর সেই একাকী বালিক, লক্ষ লক্ষ প্রতিদ্বন্দী শোকাৎ ক্রান্তরূপে পরাজয় করিয়াছে। সকলে সমবেত হইয়া, অস্ত্রায়-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাতে সে জরুণ করি নাই; তাহাতেও তাহার ক্ষুর অঘাত চলিত হয় নাই; তাহার সাহস ও উৎসাহ বিপুল হইয়াছিল। মহা-রাজ! আপনীর পুত্র, বীরত্বের পরাক্রান্ত প্রদর্শন করিয়াছে; পৃথককারের চরমোৎকর্ষ ব্যাপন করিয়াছে। বিপক্ষদল অস্ত্রায় যুদ্ধকরিলেও তৎসম্মত-তে সে ভীষ্ম-যুদ্ধে সহস্র লক্ষ বিপক্ষ-সাহায্য করিয়াছে। এই সমুদ্র পৃথিবীমধ্যে এরূপ লোক-তাৎ কার্য করিতে জন্মে পারে? মারাজ! সে আপনীর বংশের তিলক; তোমার ঔরসের গৌরব, আমার গর্ভের গৌরব। আমি আজ বীর-জন্মদী হইলাম। মারাজ! বিপক্ষ করিলেন না; সেই অমৃত্যুচাচারী কলত্রিও কর্তৃক তলিকর মুচিত প্রতিকূল সিংহ পুত্রের উদ্ধার সাধন করুন।

তখন সকলই একান্ত হইলেন। মারাজ, 'সমস্ত-সামন্ত-সমভিযায়ের বিপুল রণযোগ্যে বিশাল-নগরে গমন করিলেন। বিশালরাজ, পুনরায় কড়াশরংঘরের বিষপত্র ভঙলিন। শত্রু করিতে বৈরভক্তের কর্তব্য অনুশ্রেয়স্ব সুললিত রাজপথেই রাধিয়াছিলেন। হুতরাং এখন মারাজ কর্তব্যের—বিশালরাজ এবং অস্ত্রায় সমস্ত নৃপতিজ্ঞের সমাবেশে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে তিনি হিন হইল। সমুদ্র রাজপথ পার্শ্বিত হুত-হয় হইয়াছে, এমন-সময়ে বিশালরাজ অর্থাৎ মারাজ কর্তব্যের নিকা পদার্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রীতপূর্বক পূজা করিলেন। অব্যাহতকেও মুক্ত করিয়া গিলেন। কর্তব্য প্রীত হইলেন। যুদ্ধ আন্ত হইল। সে রাজি হুলে অত্যন্তিত হইল। পরদিন বিশালরাজ, কড়াকে লইয়া কর্তব্য এবং অমৃত্যুচাচারী উপস্থিত হইলেন। অব্যাহত বলিলেন, 'পৃথক, দাবী; দ্রাক্ষাভি পুরাণ। আমি যখন, পার্শ্বিত হইয়া পরের সুলী হইয়াছি; পিতার পরাজয়ে মুক্ত হইয়াছি, তখন আমাকে আর সম্মতিতে প্রেরণ কি? রাজা! আমি ইহা-কেও গ্রহণ করিব না; অস্ত্র কোন রমণী-কেই গ্রহণ করিব না। আমি একটা জীলোক। আপনীর কথা অপরকে বিবাহ করুন।' বিশালরাজ, তাহা শুনিয়া কড়াকে বলিলেন, 'বৎস! ইহার কথা শুনিতে ও? তুমি অপরকে বিবাহ কর।'

রাজকন্যা বলিলেন,—'পিতা! আমি এমন বীর, কর্তব্য দেখি নাই। ধর্ম্মক্ষেত্রে ইনি একাকা সকলকে পরাজয় করিয়াছেন। তার পর অপরকেও সকলে সমবেত হইলো ইহা কে মাফাতে ও পরোক্ষে আঘাত করিয়া বহুদুঃখ পরাজয় করিয়াছে। তাহা কি আমার পরাজয়। পিতা! আমি ইহার রূপমধ্যে সুলী নাই। ইহার শৌর্য-বীর্য-বিক্রমে আমার চিত্ত একেবারেই অকৃত হইয়াছে। আপনি ইহার নিকট প্রার্থনা করুন। ইহা ভিন্ন আমি আর অন্যভাবে বিবাহ করিব না।'

বিশালরাজ বলিলেন, 'রাজনন্দন! আমার কন্যা তাল কথাই বলিতেছে, তোমার তুমি সুমার ত হুতলে নাই। তোমার শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ শত্রুকেও করে। আমার কন্যা গ্রহণ করিয়া আমার সুল পতিয়া কর।'

বিশালরাজ কর্তব্যও পুত্রকে সেই কন্যা গ্রহণ করিতে বলিলেন।

তখন রাজপুত্র অব্যাহত বলিলেন, 'পিতা! আমি তখন আপনীর আজ্ঞা লক্ষন করি নাই। অতএব আপনি অগ্রহণ করিয়া আমাকে এরূপ আজ্ঞা করুন, বাহা আমি পালন করিতে পার।'

বিশালরাজ, রাজপুত্রের মুখ নির্মল জানিয়া কড়াকে অনেক দুঃখাইলেন ও অস্ত্র রাজপুত্র বিবাহ করিতে ধ্বংসের করিলেন। রাজানন্দিনী, কিছুই ভাবিলেন না। তিনি রাজকন্যা উপেক্ষা করিয়া তপস্বিনী হইবার জন্য পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। পিতা অপর্যাপ্ত-বয়সের তাহাকে সন্তুষ্ট হইলেন। মারাজ কর্তব্য পুত্রাঙ্গ-সমভিযা-হারে হৃদয়ে প্রভাববর্তন করিলেন। রাজনন্দিনীও বিবাহভয়, স্বয়ংবরহীন পরিত্যক্ত করিয়া সমানী-বর্শে ধারণ করিলেন। পিতা রাজকন্যের পিতারিত্তে বিজ্ঞ কাননে গমন করিলেন। বিশাল-নগর বিদ্যায় পূর্ণ হইল। রাজপুত্র, শোকাৎজন্মায় বিশালরাজকে পরিব্যাপ্ত হইল। রাজকন্যা নিরাশ্রয়ে বোরত তপস্বী করিতে লাগিলেন। অবশেষে তপস্বী হইতে দেবদূত আসিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের কথা ও সংস্কৃত্যের কথা বলিয়া প্রাণ প্রদান করিতে তিনি দ্রো মরুজ কর্তব্যে প্রসন্ন করিলেন না। কোনমতে প্রাণধারা করিতে পারিলেন।

এদিকে মারাজ কর্তব্য, রাজমহিষী ও রাজকন্যা

হিতাভিযাধিগন সকলেই অব্যাহতের রমণী-বিষয়-ভায় বংশাধিনিভয়ে নিভাত দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কোন উপায় নাই। অব্যাহতের প্রকৃতি শালিত হইবার কারণ। কিছুদিন এইভাবে অত্যন্তিত হইল। অনেক চিন্তা করিয়া বিজ্ঞপনা রাজমহিষী বীরা এক উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি এক পুণ্যদিনে, পুত্র অব্যাহতকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বৎস! তোমার পিতার অমৃত্যুজন্মে আমি "কিনিস্ক" ব্রত করিতেছি। কিন্তু এই ব্রত বহুই দুরূহ। ইহাতে মারাজকে, তুমি এবং আমার এই তিন জনের প্রাণপণ যুদ্ধ চাই, নতুবা ইহা সম্ভব হইবে না। অতএবে অর্ধাংশে মারাজ অমৃত্যু নিরাশ্রয়ে, অতঃকাল মই করিতে আমি প্রণত আছি। এখন তুমি মনোগোণী হইবেই আমি ত্রাতচরণে প্রবৃত্ত হই। বাক্য। তের মা ইহাও কি আমি একান্ত করিতে পারি না? তুমি প্রতীজা কর, আমার জন্তে যুদ্ধ তুমি যথাসাধ্য কাধ্য করিবি।'

অব্যাহত বলিলেন, 'না। তুমি ব্রত করিবে, ইহার জন্য আমি কাধ্য করি, ও বিষয়ে আমার প্রতিজ্ঞা করিব কি? তুমি বাহা আজ করিবে, তাহাই আমার প্রতিজ্ঞা। পিতা বর্তমান; রাজ্যেও আমার আশ্রয় নাই। তবে আমার শত্রুর দ্বারা হইতে পারে, ও ব্রতে আমি তৎসমুদয়ই করিব।'

রাজী হুত্বিত্তে প্রত্যন্ত করিলেন। যে বাহা ইচ্ছা করিলেন, সে তুমি হইতে লাগিল। অব্যাহত বারো দণ্ডায়মান হইয়া উল্লেক্ষের বসিতে লাগিলেন, 'সে অর্ধাংশ।' মাতা 'কিনিস্ক' ব্রত করিতেছেন; আমার শত্রু দ্বারা হইতে যে প্রয়োজন, তাহা আমি সিদ্ধ করিব। আমার প্রতিজ্ঞাও এতদ্রূপ আছে। মারাজ কর্তব্য, এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধপনে পুত্রাঙ্গাধিনে আসিয়া বলিলেন, 'আমি শ্রাবী।'

অব্যাহত বলিলে, 'আজা করুন, কি করিব।' রাজা বলিলেন, 'দেবি, তুমি কেন্দ্র সত্য-প্রতিজ্ঞা; "আমাকে সৌত-মুখ প্রদান করাও।" অব্যাহত মনেও পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, 'পিতৃদেহ! সকলে প্রতি দয়া করুন'। আমার ব্রতচর্চা নষ্ট করিলেন না। কড়াকে আর সম্মতিতে প্রার্থিত করিলেন না। পিতা! আমি আপনীর ঔরসমাত্র সন্তান হইয়াও আপনীর ভাতৃ হওয়া দূরে থাক, সামান্য বীর কৃতিত্ব হইতে পারিলাম না। আমার সন্তান ত আমার! আমা

অপেক্ষা হীন হইবে। সুতরাং এমন কাণ্ডের
নির্বাহ রথ অপেক্ষা নির্বংশ হওয়াই ভাল।
সে। আপনার নিকট আমার এত কথা বলা
ভাল হইতেছে না। কিন্তু জ্ঞানের উত্তেজনায়
বলিতেছি। পিতা? আমার বলি,—অম্মা করুন।
ঐশ্রী, তিন আপনি বাহা ইচ্ছা, আদেশ করুন।
করুন বলিলেন, “অম্মা। তুমি পিতৃবৎ; তুমি
আমার বৎসের জিহ্বক; তুমি ধর্ম-মুখে সকলকে
পরাক্রম করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা বীরকে আছে।
বিশেষতঃ তুমি বর্ধন প্রতিজ্ঞার হইয়াছ।
তখন আর কতব্য-বিচার করিতেছি কি? পৌত্র-
বৎ-ধননিব কৃত্যত আমার আর কিছুই প্রার্থ-
নীয় নাই। অস্বীকৃত অধোমুখে অনেকের চিত্তা
করিলেন। কিন্তু কি করিবেন, দায়ন সভ্য-
প্রতিজ্ঞাধানে বদ্ধ হইয়া তাহায়েই তাঁরকে
স্বাকৃত হইতে হইল। তখন তাঁহার ভ্রাতার
অম্মা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “বিবাহ
স্বাকৃত করিতে হইল; কিন্তু সেই স্নানকরা
কোথায়? যিনি আমার জন্ম সর্বমুখে জ্ঞাত
নিয়া তপস্বিনী-হইয়াছেন, সেই সন্ন্যাসিনী কোথায়?
সেই চিরমুখোন্মিতা কি তপস্কর স্বক করিতে
পারিরাছেন? তিনি কি আর জীবিত আছেন?
সেই কোমলারী প্রাপদপূর্ণ অরবে কি প্রাণ রাখিতে
পারিরাছেন? আরি কোন প্রাণে গ্রন্থকে ছাড়িয়া
অজ রমণীর পানি গ্রহণ করিব? হার। আমাকে
কি এতই নৃণংস রাক্ষস-হইতে হইবে? ভগবান!
রক্ষা কর।

রাজপুত্রের শাস্তি নাই। যিনের পর যিনিই
বাহিতে লাগিল। প্রতিজ্ঞার কথা, আর রাজকন্ডার
কথা,—সত্যত মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া রাজপুত্রকে
দশ করিতে লাগিল। পান, ভোজন,—কিছুতেই
রাজপুত্রের রুচি নাই, তৃষ্ণা নাই। কিন্তু তাহাভাব
তিনি ধ্যানাধ্যায় মনোবশ করিয়া রাখিলেন। একদিন
“বলি কিছু উদ্যেকশাস্তি হয়” মনে করিয়া রাজকন্ডার
ধন্য করিবার জন্ত বনে গমন করিলেন। তথায়
সন্ধ্যা করিতে করিতে নৃমণীর আভ্যন্তর শুনিতে পাই-
লেন। তিনি তৎকাল্যৎ ধরানন উন্মত্ত করিয়া “মা
ভৈ, মা ভৈঃ” রবে সেই দিকে রথ চালনা করি-
লেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, “রাজগণ, পক্ষ
কালি দেবদানবিনশ বৃদ্ধ পিহার দম্বেষে, ধনধান
করিতে অসমর্থ; অসি সেই ইন্দ্রকোণ পরাক্রমশালী
কাক্ষদ-বনসং বীর্যপ্রপণ্য অস্বীকৃতের ভাড়া;

আমাকে এক হুট তথেরের ভ্রাতৃ হবন করি-
তেছে।” অব্যক্তিভ ভাবিলেন, “এ কি। আমার
পত্নী! এ কি তব রাক্ষসী মায়ী!—যাই হউক,
বাহিয়া সকলই নৃমণি। দক্ষিণ, বাহ। কল্লিত
হইতেছে কেন?”

“মনোবধায় নশনং কিং বাহো শপস্বন মুখা।”
অব্যক্তিভ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অম্বর,
করুণ-পরিবেশিনী রমণীকে সকলে গ্রহণ করিয়া গমন
করিতেছে। রমণীও তাঁহাকে দেখিয়া বাৎসর্য
“আহি আহি” বসিয়া চীকার করিতে লাগিলেন।
তখন রমণী—“ওরে দ্রুতং অম্বর! জানিনি না;
মহারাজ করকম, এই ভূমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা
তাঁহার অধিকারে তুই অবলার প্রতি অত্যাচার
করিতেছিস, এখন ইহার সমুচিত প্রতিশ্রুত
পাইবে” বলিয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই অম্বর-
কে নিহত করিয়া মনুষ্যকে মুক্ত করিলেন। তৎ-
কাল্যৎ ভ্রাতৃ দেবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং
বিশালরাজ-বনিবিনী-পতে মংবার পুত্র হয়।
দেবগণ বলিলেন, “এই রমণীর পতেই তোমার
রাজকন্যার পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।”

অব্যক্তিভ বলিলেন, “দেবগণ। আমি সেই
বিশালরাজ-বনিবিনী ব্যতীত আর কাহারও ত
বিবাহ করিব না। তিনি কি জীবিত আছেন?”
দেবগণ বলিলেন, “ইনিই সেই রাজকন্যার।”
অব্যক্তিভ, সেই স্বয়ংবর দিন হইতে এপর্যন্ত
রমণীর মুখালোকন করেন নাই। আজ এক
বার তাহা প্রদর্শন করিবে তখনই পুত্র হয়।
চক্ষু তুলিলেন। কিন্তু হার। দেখা হইল না। আনন্দ-
জলাধার নদ্য-তুল্য পূর্ণ হইয়াছিল। পুনশ্চ
মালিনী করিলেন। তত্ব দেখা গেল না। তিনি
দেবগণকে ভক্তিতে প্রণাম করিলেন। স্তব
করিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু কর্ত্তব্য বাপস্কর
হওয়াতে কিছু বলিতে পারিলেন না। দেবগণ ক্ষত
হিঁত হইলেন।

অব্যক্তিভ ত্রুনে প্রতিজ্ঞা হইয়া একবার গমন
করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে রাজকন্ডার নিকট
মকল ব্যাপার শ্রবণেও হইলেন। পরিশেষে উত্তরের
দ্বাবিধি বিবাহ হইল। প্রাসিক বাজিল মংবার
পরাক্রান্ত—রাজকন্যার মনুত এই দশপতি পুত্র।

অব্যক্তিভ এই পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-রূপ ও
প্রতিজ্ঞাশাপ হইতে মুক্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে মহারাজ করকম, মহিষী-সম-
ভিব্যাহারে বনগমনে অজিতারী হইয়া পুত্রকে
বলিলেন, “বৎস অস্বীকৃত। আমরা বৃদ্ধ হই-
রাছি; বিষয় ভোগ যথেষ্ট হইয়াছে, আর মা।
কিছুত শেষ পথের পাথয়ে চাহি; কুল-স্বর্গ্যাস্বারে
এখন আমরা বনগমন করি। এই বিশাল রাজ্য—
তোমাকে দিতেছি গ্রন্থ কর; তুমি এই ভার
বহনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত।”

অব্যক্তিভ বলিলেন, পিতা। ঐ আজ্ঞা করি-
বেন না। আমি স্ত্রীভ্রাতৃত্যগ্ণ; আমি পরিনিক্ষিত
পিতৃ-মোচিত কাপুরুষ; অপরকে রাজ্য প্রদান
করুন। আমি রাজ্যপালনে অসমর্থ। পিতা
অনেক বুঝাইলেন; “পিতা-পুত্র প্রভেদ নাই।
আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি; পরে ত মুক্ত করে
নাই; ইহাতে তোমার লজ্জা কি? অস্বীকৃত
বলিলেন, পিতৃদেব। আশীর্বাদ করুন;—

পিতৃদেব! জিহ্ম ভুক্তক পিতা কল্লান্ত সমুদ্রতঃ।
বিজায়তে চ বৎ পিতা মানকঃ সোমন্ত নো মূলে ॥
স্বয়মজ্জিতবিত্তানং ব্যাত্তি স্বয়মপুণ্যম্ ॥
স্বয়ং নিদ্রা-কল্লান্তং বা পিত্তি সান্ত মে পতিঃ ॥

পিতৃদেবভাগী পিতৃভিকমে বিপদকর্ম্মপনামে
পরিহিত পুণ্য আমাদেঃ বশে যেন জন্মগ্রহণ না
করে। আর, যোগ্যকর্ত্তিত বিস্তৃতভাগী, স্বনামধাত,
প্রায় বাহ্যতমে বিপদকর্ম্ম পুণ্যবিধে যোগ্য পতি, আমার
যেন সেই পতি হয়।

অব্যক্তিভ কিছুতেই রাজ্য-গ্রহণে সন্মত হই-
লেন না। বরকম, পুত্রের স্থির নিত্য জানিয়া
পৌত্র মরুতকে রাজ্যভার প্রাপনপূর্ণক মহিষী-
সমভিব্যাহারে বনগমন করিলেন। মরুত পিতার
অম্মতমুখে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

হরিত্যং রপি কুম্ভাকমে
প্রমত্তে নৃপনরোহি হি যং।
তত্ত্বপস্থিতমপ্যায় জহে
চরিতং বীরবরং চিত্তাভ্যাস ॥

শ্রীপঞ্চানন তর্কভট্ট।

* মার্কটর পুত্রগণের ১২০—১২১ অধ্যায় অবলম্বনে
এই উপাখ্যানটি লিখিত হইল।

রূপ।

কিরূপ নগরেন কার জাগে।

না জারি মোহিনী কিবা, কত রূপ ধরি বিভা,
রূপমোহে দিবানিশি জাগে।

নব-কিসলয়-কাষ্ঠি, কলারো করে আঁধি-শ্রাভি,
সমস্ত আশন যাহে পাততে;
কনক চম্পক গোরা, কারো স্তম্ভিতাপ-চোরা,
ভ্রমর ভ্রমরী যাহে মাততে।

শারদপুর্ণিমা-রাতি, তাহে যে চাঁদের জাতি,
হনীল গগনপায়ে খেলো,
তাহে জো মন বাধি, কেহ নীলময়ে আঁধি,
ভুলিয়ে পলক নাহি কেলে।

অমল মন্দিরা জাতি, বৃদ্ধ হৃদয়ের পাতি,
ভুলায় কাহারো আঁধি-ভারা;
গোলাপের হাসি-মাধা, শ্বেত-রক্ত রূপরেখা,
কারো আঁধি কহে মাতোয়ারা।

বহুধার সব অঙ্গে, নাকত বাস যেই রঙ্গে,
সেই নব-দুর্লভ-রূপ-রূপে,
কাহারো বদন-পটে, সত্যত অমিয়া অঙ্গে,
জুবে হিয়া সেই ভাবকূপে।

সম্ভল-জলাধ-কাষ্ঠি, চাতকের বাহে শাষ্ঠি,
যেবে কেঁদে সে রূপ-প্রতিমা;
চাহি হুহু এক দিগে, তত্ব কি পিয়াম মিটে,
বলিয়ারি জগের মহিমা।

কিবা সে অপরাজিতা, কখনে অ-রাজিতা,
ভাষে কার না হুসন নয়?
ইন্দ্রকোণ মণি ধরে, বিধা ভক্ত প্রাণ-পরে,
সাধাৎ প্রমাদ-দীপ্যাসন।

কে নহে রূপের কাঁচ, কে নহে রূপের ছবি,
মোহনিয়ে হিয়ার-নন্দিত,
প্রতিপলে উদ্ভটন, জামিয়ে দৈবে স্বপন,
হৃৎপানে না দেখিলে মরে?

হায় একি অপরূপ, প্রতি অঙ্গে নবরূপ,
কে গঠিল কোন রূপধানে !
বুঝি, রূপের সপরে বাস, অঙ্গে বিবরূপ ভাস,
তবু রূপরস দেখিবারে !

যে মে, কতরূপে রূপধারি, যেনো সেবা দিবাধিশি,
ছড়াইয়ে ভ্রমে রস-ভরে !
তাই, সকলি হৃদয় তার, এককলে হৃৎকুরাকার,
মল্লার নিখিল চরাচরে !

হায়, ভুবন-হৃদয় তুমি, অপর রূপার ভূমি,
আমাদেরই কেন বা নিদ্রা,
কেন, ঘুরি ঘুরি এ ভুবন, নাহি পাই দরশন,
কত হৃৎ দিবে দরশন ?

অগ্নি পৌর, অগ্নি শাস, অগ্নি বিবরূপ-ধাম,
বাহেক করহে অধিষ্ঠান ;
ওমা পৌরী, ওমা শাস, মণিকাল-মনোমারমা,
জুড়াও না, তাপিত্তে প্রাণ !

যেন, সবায় হৃদয় দেখি, নবায় তোমায় দেখি,
যেও জ্ঞান আধির অঙ্গন ;
সব, বুটাই আধির পাপ, বুটাই মনের তাপ,
মুছাইও প্রাণের কল্মস !

প্রেম-পূজা।

কব সাহি। পান্থ
নবভূতলালা।

আজ কাল কুরি কতদিন কাটল
না পূর্বলক্ষ্যে শুভ আশা।
কত দিন জাখব প্রাশা হিয়ে ধরি,
কত দিন স্নেহন, বাস।

মগ্ন সে বাখল চার চার কহ
কত আনু মনহে পরাণ।
দম্পত্যেবিসম হৈমন্তিক নিমি
কা কই জানত জানন

ওঃ
সো মৃগারাব ধামে বাখল
প্রবঞ্চক বরনারী।
তবসে বুঝাখব, ধন জন কুল মন,
ভেতু তাহার তিহারা।

বহু কহ, তুমি পদে কহত কহর কহু
নাহ তু কাহে নিরদর।
গম অবলা বলি সো সব হৃদয়।
জানব বাহির যোয়।

শারদ পূর্বমি চাঁদ ত বাখল
মন মে আশুপ সেই।
ছটকটি লালল, ধা কই অব সাহি,
কহত উপায় কি নাই।

পোপরমণি সব কহত পণাপলি
রোজাত যমুনাতীরে।
দেখ মন মন সহিতে আপরর
চাহে প্রাণ তাকইতে নারে।

ঠিক হেল সব; রোদন দুখল
হরি হরি বলএ সভাই।
“ছোড়ি দগধ প্রাণ; আমজনমে জহ
হরি হে তু বাপতি পাই।”

উঠল হরিষ রোগ; মরমমনা সব
একবর কামিনী; আজ
যমুনালক্ষ্যে ব্যাপিতে উল্লাস,
“নহি নহি” হোয় আলাপ।

“কা কহ, তুমি সব, কাহে হেন মাহস;
আখব মগধ সব নারী।
ভালত মরমমতি মতিচল্য বত
হরিপতি মিলিবে তুঁহার।

ভুক্তি বহুস, কাল, পরত নবমতিধি
পুত্র* ভববতী পৌরী।
দৈববতী জনি পুত্র ভববতী
হরমে বঁত প্রজনারী।

কলিকাতা গিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এব, ঢাকার সেন্ট, কলকাতা-৭০০০০৯

জন্মভূমি।

১ম ভাগ।

অগ্রহায়ণ। ১২২৮।

১২শ সংখ্যা।

নেপোলিয়নের কান্নাবাস।

আটলান্টিক মহাসাগরে, আফ্রিকা মহাদেশের
পশ্চিম উপকূল হইতে ছয় শত কোশ দূরে, সেণ্ট-
হেলেনা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপের
দৈর্ঘ্য পাঁচ কোশ, এবং প্রস্থ তিন কোশ।
ইহার চতুর্দিক উচ্চ শৈলের দ্বারা প্রাচীরবৎ
বেষ্টিত। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রাচীর-প্রাচীর ভিত্তি
মাত্র ক্ষুদ্র ছেদ আছে, বাহার ভিতর দিয়া জাহাজ
প্রবেশ করিয়া তার-মাংসপ হইতে পারে। এখান-
কার জল-বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। বহু ও
আমশায় রোগের এখানে বড়ই প্রাদুর্ভাব। নেপো-
লিয়নের নির্দাসন-সদা কাউন্ট মহলন শিখিয়াছেন
যে, এই দ্বীপের অধিবাসী বা ক্রীত-দাসদিগের মধ্যে
পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সের লোক একটীও দেখিতে পাওয়া
যায় না। (১) হেনরি সাহেব এতদী বীকার করেন
নাই বটে; কিন্তু তাহাকেও স্বীকার করিতে
হইয়াছে যে, মীতলতার প্রবেশের দ্বারা এখানে
মহুফ দীর্ঘজীবী হয় না। (২) সীল সাহেব এই
দ্বীপ-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:—সেন্ট হেলেনা
দ্বীপ যে আশেখ মজির বিশ্লেষ সমুদ্রজর্ভ হইতে
উৎকলিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় এই দ্বীপেই
উত্তমরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অনুরক্তদের
বিপুলতা, এবং ইহার আশ্রয়নের সহিত সেই

বিপুলতার আশ্রয়স্থল দেখিয়া অনেক অসুস্থমান
করেন যে, সেখান হেলেনা দ্বীপ কোন সাগর-প্রাঙ্গণিত
মহাদেশের ক্ষয়মণ্ডলের। ইহার অসুস্থর ও দূর-
প্রায় পার্শ্বদেশে ভূপ-পতল-শা-পাদপ-বিহিত হওয়ায়
লক্ষ্যতরুর দ্বারা নগন-কেশকর। এমন দৃশ্য-বৈচিত্র্য
কিছুই নাই; বাহা দেখিবার লক্ষ্য কোন দৈর্ঘ্যটো
ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিতে পারে। জল বা
আবহায়েন অগ্রভূত না হইলে কেবল বন্য এখানে
সাধ করিয়া আসে না। তবু, দ্বীপের অভ্যন্তরে,
যানে যানে বৃক্ষশা-পাণ্ডবাদি দেখিতে পাওয়া যায়।
এই সকল স্থান দেখিতেও বেশ সুন্দর। (৩)
নেপোলিয়নের জীবনের শেষ ছয় বৎসর কাল
তাঁহাকে এই অস্বাস্থ্যকর, ভীষণদর্শন শৈলদ্বীপে
সামরিক বন্দীভাবে রাখা হইয়াছিল।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর অপরাহ্নে
নেপোলিয়ন জাহাজ হইতে তাঁরে অবতরণ করি-
লেন। “সে রাতি তিনি ক্ষেম্‌স টাউনের এক ক্ষুদ্র
গৃহে আতিথ্যবিত্ত করেন। এই ক্ষুদ্র নগরীর
আবলম্বক সকলেই নেপোলিয়নকে দেখিবার জন্য
যার পর নাই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বীপের
নাম মাত্র শুনিতে ইউরোপের সমস্তে রাজকুমার
জামে কলিত হয়, সেই মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য
দলে দলে লোক আসিয়া এই ক্ষুদ্র গৃহ বেটন
করিতেছিল। এই কৌতূহল-পরবশ জনতা দেখিয়া
নেপোলিয়ন কতকটা বিরক্ত ক্ষমহুত করিতেছিলেন
বটে, কিন্তু বাহিরে যে ভাবের কোন চিহ্নই প্রকাশ
করেন নাই। ছিট, দীর, নীরব, বিষমভাবে নেপো-
লিয়ন সেই ক্ষুদ্র-গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক

(১) Abbott's Life of Napoleon Bonaparte.
(২) Henry's Events of a Military Life. Vol II.
নেপোলিয়নের লণ্ডনে অবস্থান-কালে এই হেনরি
সাহেব তৎপার সহকারী সর্বত্র রূপে নিযুক্ত ছিলেন।

(৩) Seale's Guegnony of St Helena. Quoted
by Forsyth.

নেপোলিয়নের শেষ-কথা।



A.W. H.B.

ভয়, পত্রের মধ্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে না।" (১) মার্স হুইটম ইহাতে সম্মত হইলেন না। নিরাম ছিল যে, নেপোলিয়নের নামীয় বা তাঁহার প্রেরিত চিঠি ধর্যের নিজে এনা পড়িয়া পাঠাইলেন না। হুতরাং নেপোলিয়নের চৌপা-উজ্জলানি বিক্রম ব্যতীত, আর গত্যন্তর রহিল না। তিন মাসের মধ্যে, একটা রূপার বিকিৎ করা পান পাত্র ব্যতীত, সমস্ত আসন-পত্র বিক্রীত হইয়া গেল। ইউরোপের রাজ্যরাজেশ্বর, নিতান্ত দীন-হীনের ভাষা, মামাত পাত্রের আহার করিতে ব্যর্থ হইলেন; হুতরাং এমন হইল যে, আর কিছুই খাইতে পেরিল না। এক দিন বড় দুঃখে লাকার-নেমুকে বসিলেন,—“যে আমি রান্নাকালে রুক্ষর পাত্রের আহার করিতাম, সেই আমি আজ কি না পাত্রের হীনতা-বশত অন্তরে আহার করিতে পারি না। আমার সকলই বয়োবৃদ্ধ শিশু মাত্র।”

সময়ে সময়ে আহারেরও বড়ই অভাব হইত। একদিনকার কথা লাকারনে লিখিয়াছেন,—“প্রাতে আমার ভৃত্য আঙ্গিয়া সহরাদ-লিল যে, প্রাতঃভো-

(১) নেপোলিয়নের এইরূপ দারুণ ছিল যে, তাঁহার স্বর্গের নন্দন পাইনোই ইহাতেও তাহা আশ্রয় করিলেন।

জন্ম কাকি, চিনি, দুধ, রুটি কিছুই নাই। পূর্ণ-নিরাম সাক্ষাতজন্মের কিছু পূর্ণে অস্বস্ত দুখা বোধ হওয়ায় একগ্রাম রুটি চাহিয়া তৎকালে যে, আর এক টুকরাও নাই। জীবন ধারণের জন্ম যাহা আশ্রয়, তাহাতেও আমরা বঞ্চিত। গোকে মহলে এতটা বিলাস করিলে না, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে।” স্বয়ং নেপোলিয়ন একদিন বালুস্থলকে বক্তব্য-ছিলেন,—“জালালি কঠোর অভাবে আমাকে কতকগুলি কঠোর জব্য আঙ্গিয়া পোড়াইতে হইয়াছে।” (২) এইরূপ কষ্টে, এইরূপ দুঃখে, এইরূপ নিঃসহায়ে নেপোলিয়নের শরীর দিন দিন মরে ইইতেছিল। ছয় বৎসর কাল এইরূপ পৈশাচিক পীড়ন সহ্য করিয়া অবশেষে, অকালে, তিনি মৃত্যুর উদ্দেশ্যে শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুশয্যার বৃত্তান্ত বিবৃত করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মৃত্যু শয্যা-য় মগন করিয়া নেপোলিয়ন এই কথাগুলি-বলিয়া-ছিলেন;—

“France—Army—Head of the Army Josephine.”

১ Eoneth's History. Vol II. p. 421.

নেপোলিয়নের এই কারাবাস-সম্বন্ধে বিখ্যাত জর্জ-লেকক হেনরায়েচ হায়েন লিখিয়াছেন,—

“ব্রিটানিয়া” ব্রিটানিয়া! ভূমি মহাসাগরের ‘অবীক্সী’। কিন্তু এই মহাপুরুষের জন্ম ভূমি যে কলঙ্কারশি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা প্রাঞ্চলন করিতে পারে, এত ব্যরি মহাসাগরেও নাই।”

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

ছায়া-সীতা।*

সীতাহারা রামচন্দ্র উদাস-পায়ে,
ভ্রমিছেন পরিচিত-ভূমি জনহাসনে,
প্রতি ভর, প্রতি লতা,
দিহেতে স্বপ্নেরে বাধা,
সীতার স্বপ্নে চিত্ত হইতে বিক্ষা,
অবিরল অশ্রুধারা বহিছে কেবল।
যেই বিন্দু লতাতীরে ছয়-কাননে,
হাশিয়াছিলে রাম অতীত যতনে,

উগলিতা করি তরে,
নিজে দিগন্তে নদে,
ছয়র খুলিতে কিন্তু মেলেনা ছয়র,
লতা সহ গেছে হিড়ি লতার আশ্রয়।
পৃথবী-বনমাঝে প্রত্যেক মাঝে,
সীতার লাবণ্য-ছায়া পড়িতেছে মনে,
সরলতা-মাঝে মূখ,
দিতেছে হৃদয়ে দুখ,

আজি যেন অকস্মাৎ কানন ভরিয়া,
সেই প্রেমময়ী মূর্তি বেড়ায় নাচিয়া।
প্রত্যেক উত্তর প্রতি পাতায় পাতায়,
সীতার মধুর ছবি যেন দেখা যায়,
বাহু-ভরে লতা হুলে,
যেন সীতা যান চলে,
প্রতি হুলে হুলে যেন সীতার আকার,
সমুদ্রে নয়ন আজ ঘেরে অনিবার।
সেই প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ পোদাবারী-জলে,
তরঙ্গে তরঙ্গে যেন উঠিছে উল্লে,

* বাহার “ছায়া-সীতা”র বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, উপদিগন্তক অধ্যয়ক ভক্তান্ত্রী শ্রীত উত্তরায়ন চরিত্রে ভূতীতাক পাঠ করিতে যত্নবান করি।

রমের হৃদয়ে সেই,
সমস্ত জগতে সেই,
অস্তর বাহির যেন একে পরিণত,
সীতা-মূর্তি জাগিছে হৃদয়ে সত্যত।
জনহান-বনদেবী বাসন্তী হৃদুরী,
সাম্রাজ্যে মিলেন আজ পৃথবী ভারি,
থরে থরে হৃদরানি,
হাসিছে মধুর হাসি,
তর, লতা, সরোবর, হসিছে সকল,
সীতাহারা, রামপ্রাণ করিতে সীতল।
নির্কামিতা-সীতামুখ কিন্তু প্রতিফলে,
আনিছে শিশুটা স্মৃতি অনুতাপ মনে,
পৃথবী-শোভা হেরি,
রমের হৃদয় ভরি,
দারুণ শোকের অগ্নি উঠিল জলিয়া,
সীতা, সীতা, করি প্রাণ উঠিছে কানিয়া।
হেরি সেই করভকে সীতার নন্দনে,
অস্তিত্ব সীতামাত্র স্মৃতির বশনে,
কনকীর বনমাঝে

সেই শিলাগুপ্ত রক্তে,
য’তে বসিলেন দৌড়ে; সীতা, ত্বরান্বিত
মিলেন হরিশ্চন্দ্র-মুখ, মুখ হাসি।
এখনও সীতার লাবণ্য পৃথিবীতে,
সেইখানে দলে দলে করে বিচরণ,
পলিত-কলপিত,
দ্রি শিশি-শিশিভীরে,
সীতা-করতালি-ভরে নাচিৎ যেনন,
বিস্ত্রিত করিছে তাহা স্মৃতির দর্পণ।
সেই তরুণে সীতা নিজের গিয়া,
গোদাবরী-জলারানি দিলেন ঢালিয়া,
বিকীর্ণ-স্মরণে,
খুঁটিত যে পাশবপ,
কীর্ণ তরুণ ছায়া করিত চরণ,
রমের নন্দন ঘেরে সেই মূখপণ,
সমুদ্রে ‘অনন্ত শ্রম’ কানন হৃদয়,
উজ্জ্বল নীলাকাশ রানে ‘অন্তি মনোহর,
জাহ্নবে মধুর-স্বরে,
গোদাবরী বীরে বীরে,

আপনা ঢালিয়া দিতে সিদ্ধপানে দুঃখ,
সীতা নারী ভালে প্রাণ যথা পতি-পাশ

পেঁপিতে দেখিতে যেন বাহির অন্তরে,
সীতারূপ ভরি' খেল নিমেষের ভরে,
সীতার রক্তের রশ্মি,
রামের মনের মাঝে উঠিল উজলি,
মুগ্ধিত হইয়া রাম পড়িলেন চম্ব।
সম্ভা কে যেন আসি' চন্দনের রস,
ঢালি' নিল রাম-লেহে অলস, বিবশ,
কিবা নিশাপাউনি কবু,
কৌমুদীর রশ্মি ধরি,
তাহার বিমল সেক শরীরে বরষে,
চৈতন্য আসিয়া কার পাখির পরশে ?
কে হায় অন্তরে থাকি রামের জীবন,
হৃদয়ের সাগরগর্ভে করিল বধন,
সেই স্পর্শ, সেই কর,
রামের বঙ্গের পর
কোথা সীতা, রামসেজ হেরেনা ত হায়,
সম্ভাবনী-সুখদানে কে তবে পাঁচায় !
অন্ধকে চেতনা লভি' যবে অচেতন,
ধরিতে সে ছাদুমুরী কোণিল বতন,
ধর-ধর হয় সেই,
অমনি সুকার্য সেই,
সম্ভ্রমেরী করিবারে যব। কমনায়,
চকল নুনিচয়ি' বুরিয়া ঝেড়ায়।
কি যে 'ছায়া' বুদ্ধিবারে পাবে কোন জনে,
চেতনা কি শুধু মাদ্য, বুদ্ধিবে কেননে !
রামের অন্তর হইতে,
আসিল কি আচরিতে,
সীতারূপ অর্ধ-আশা বা ছিল মিলিয়ে,
রামের আশ্বাস রম্ব এক-আশা হয়ে।
অবধা বাহিরে সেই ছায়া বিপ্লু ভরি'
ভক্ত, লতা, ফুল মাঝে ছিল আসোয়া করি',
এবে বনোক্ত হই,
রামমুখি ভেঙ্গে, বিয়ে,
তাহাদের সম্ভাষাে নিশায় আবার,
আনন্দ, শান্তির বাহা অনন্ত আধার।
অবধা অন্তরস্থিতা ছায়া বিমোহিনী,
বাহু ছায়া মনে মিশি' প্রভাও-ব্যাপিনে,
এক হয়ে দুই ছায়া,
যেন দুর্ভাগ্যী সত্য,

রামের 'চৈতন্য হরি' চেতনা লভিয়া
সুকার্য, রামের তাহা পুনঃ প্রদানিয়া ?
নহে 'ছায়া' ভবভূতি-কন্দনা-কুমারী
আর্ধ্যনারীমুক্তি এ যে ত্রিলোক-স্থপতী,
অর্ধ শ্রুতি-আশা, যেই,
ছায়ায় রূপে এত যেই,
বধন পতি প্রাণ উঠিলে কাঁদিয়া,
যবা থাকে সে অমনি আসিবে ছুটিয়া।
দুইটা আঁকে-আশা মিশেছে যখন,
থাকুক না ভিন্ন স্থানে সঙ্গা দুইজন,
একটীতে তান দিলে,
দ্বিতীয় আসিবে চলে,
আর্ধ্য-পতি-পত্নী, এই রহস্ত স্বন্দর,
হুয়ে এবে পূর্ণ-আশা অক্ষয়, অমর।
আর্ধ্যনারী-ছায়া নহে কন্দনা-উজ্জ্বল,
গভীর তবের ইং গভীর বিকাশ,
সামান্য রমণী নয়,
আর্ধ্যনারী সমুদ্র,
"যে দেখি' ছায়া সর্বভূতে বিদ্যমান",
অর্ধ্য নারী-আশা মাঝে তাঁরি অধিষ্ঠন।
তিনিই ত আর্ধ্যনারী-রূপে অবতরি,
হস্তত্যাগ জীবনোপনাম কোলে করি,
জীয়ে লগিয়া তাঁর,
কীদে প্রাণ অনিবার,
তাই তিনি আর্ধ্যনারী বুরিয়া আকার,
ঢালি' যেন কেমলতা ভারত-নারায়ণ।
সেই ছায়া ক্রমে ক্রমে যেতেছে চলিয়া'
অনন্ত ভাবগোচরে যাব যে 'মিলিয়া',
হস্তত্যাগ আদ্যেই,
স্টেজে ভাগ্যের ফের,
তাই ভারতের এত গভীর পতন,
শান্তিবীর, ক্ষুধিবীর ভারত-ভবন।
না গো বা। তোমার সেই ছায়া শুভবরা,
দেখাও ভারতে পুনঃ করণা-ঐশ্বরী,
প্রতি আর্ধ্যনারী-প্রাণে,
সেই ছায়া দেও এনে,
ছুটুক শান্তির স্রোতে ভারত আবার,
অশান্তির আবির্ভাব হোক ছারখার।
রাষ্ট্রপুত্র-কুস্তম-প্রাপ্তো।

আমার জীবন-চরিত।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বেরিলির পদাতি-সেনানিবাস হইতে যোগেশ্বর
মহাদেবের মন্দির একমাইল দূরবর্তী। নিম্ন
বেরিলি সহর হইতে এই মন্দির শোণে দুইকোশের
কম নহে। হিন্দু-সৈন্যদল প্রায়ই এই মহাদেবের
পূজা দিতে যাইত। আমিও প্রতি সপ্তাহে না
হউক, প্রতি পক্ষে, একবার করিয়া বাবার মন্দিরে
নিকট হইয়া পরীক্ষণকৃত মিত্রা বিতরণ
করিতাম; প্রাণ ভরিয়া অনাদি অনন্ত শিবলিপ্তের
পূজা করিতাম,—আর প্রত্যাপনাম 'কালে প্রধান
পাওকে কিবিত্ব রক্ততপলা গিয়া আসিতাম।
ফলস্বা, যোগেশ্বর-মহাদেব-মন্দিরে, আমার একটু
পনাম ছিল।

১৮৭৭ সাল-৩১ মে-রবিবার-বেলা প্রায়
দুইটা—আমরা দুই ভাই সেই জনশ্রুত মাঠমধ্যে
প্রাণেশ্বর মহাভাবনায় নিমজ্জিত আছি,—এমন
সময় আমার মনে কেমন উদ্ব্য হইল,—"যোগেশ্বর
মহাদেবের মন্দিরে গেলে হয় না ? সে স্থান অবশ্যই
নিরাপদ হইবে।"

তাই কাশীকে বলিলাম,—"চল, আমরা দুই-
জনে যোগেশ্বর-মহাদেব-মন্দিরে যাই। সে দেবতার
আজ্ঞাশাস্ত্র বিশেষ কোন কারণ নাই।"

কাশী। সেখানে যে, কোনো ভয় নাই,—
ইহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ? পাণ্ডুরা
যদি বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইয়া থাকে,
তবে উদ্যার ?

আমি একটু বিরক্ত হইলাম। বলিলাম,
"দেখ ভাই ! এ সময় এত ভয় করিলে চলিল কেন ?
একটু সাহস অবলম্বন কর। এখানে ভয়, ও-খানে
ভয়—সেই দিকই যদি তোমার ভয়,—তবে তুমি
বাবোই বা কোথায় ? এই মন্দির মাঝে পাড়াইয়া
বাকিলে যে, আরও ভয়,—তাহা কি তুমি বুঝিতে
পারিতেছ না ? আমার কথা শুন,—যোগেশ্বর
মন্দিরে চল, সেই মহাদেবের মন্দিরই আমাদের পক্ষে
নিরাপদ স্থান হইবে।"

প্রধান কাশীপ্রসাদ অরতী আমার কথায়
স্বীকৃত হইলেন। তখন সর্বস্বত্বীন দুই ভাই
জন্তপুত্র অগ্ন-রূপে গিয়া যোগেশ্বর-মন্দির-অভি-

যুধে ধানিত হইলাম। সোম্বা পথে না গিয়া,
বীকা পথ, ধরলাম। তখন হৃদয়ে প্রবল ক্রিয়-
জালে পৃথিবীকে দগ্ন করিতেছিলেন। মাতী, ফল-
কাঠের আত্মগতর ছায় বিধম, উত্তপ্ত হইয়াছে।
হাওয়া যেন আত্মগতর হলুকা। রোদের রাজ্যে
আমরা দুই ভাই অর্ধ-দগ্ন হইয়াছি। তখনও আমা-
দের বিরাগ নাই,—যোগেশ্বর-মন্দির-মুখে ছুটিতেছি।
কিঞ্চ কাশীপ্রসাদের পা আর চলে না। তাহার
দেহ যেন অবধন হইতে লাগিল। আমি
জিজ্ঞাসিলাম, "শক্তি। যদি বড়ই ঈর্ষ বোধ হয়
ত, বল,—আমরা ত্রি হুহৎ নিমুগ্ধেই তপায়
বানিক বিক্রম করিয়া লই।" কাশী বলিল, "দাদা !
তবে তাহাই চন্দন।" তখন উভয়ে আমরা নিম্ন-
রুকের ভগদেমে উপবিষ্ট হইলাম। কাশীপ্রসাদ
কাজ হইয়া ভাইয়া পড়িল। তাহার দেহ বর্ধমান
হইয়া উঠিল। কাশী ভাইয়া-ভাইয়া কেবল বলিতে
লাগিল,—"দাদা ! তুমি প্রাণ-বায়,—একটু জল
আনিয়া দাও।"

এ-দিক, ও-দিক চাহিয়া দেখিলাম, জল কোথাও
নাই ; জনশ্রুত প্রান্তর পূর্ণ করিতেছিল। আর
এ সময় জল মিলিলেও, কাশীকে ততহাৎ
বাইতে দেওয়া উচিত নহে ; কারণ, সাদিসম্মি
হইতে পারে। সুতরাং এ সময় আমি তাকে
কেবল মিত্র বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম।
বলিলাম,—"একটু অপেক্ষা কর, জল পড়িবে।
জলের প্রাধান্য কি ?"

আমরা যদি মোকো সাধারণ পথ গিয়া মন্দিরাভি-
মুখে আসিতাম, তাহা হইলে একজন মন্দিরে
পৌছিলাম। পাশে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পথে আছি
হয়, পাছে ওঁরা শোণো মাঝে লাগে, এই ভয়ে আমি
উপত্যকা দুরিয়া ছিলাম। বাহা হউক, আমি
যেখানে ছিলাম, তাহা হইতে যোগেশ্বর এক পোয়া
পথের কিছু বেশী হইবে। অজস্র বিক্রমের পর,
কাশীর সেই ছটকটানি ভাব কতক ফুলি। শুধর
কাশীকে আমি বুঝাইয়া বলিলাম, "ভাই ! যোগেশ্বর
আর অধিক দূর নয়,—ধীরে ধীরে তথায় বাইতে
পারিবে না কি ?"

কাশী। না। একটু জল বাইতে না পারিলে,
আমি উঠিতে পারিব না। দেখুন, বুজিয়া—এই
মাঠে যি কুয়া থাকে।
আমি ভাবিতে লাগিলাম,—কুপ গ্রাউন্ডে বা
জল, জলিল কিঞ্চৎ ? যদি কোথাও—দুর্ভাগ্য বা

কোথা? আমার যদি বাঙালীর বেশ থাকিত,—
যদি দৃষ্টিচ্যবর তখন পরিয়া থাকিতাম,—তাহা
হইলে চারব বা কাপড় ভিজাইয়া জল আনিতে
পারিতাম। কিন্তু পরিচান তখন ইজার-চাঁপকা
এবং মাথার টুপি। হিন্দুস্তানীর বেশে তখন
আমি সজ্জিত।

এ দিকে ভায়া নাছোড়-ঘুম। কি কিনি,
জানিতে পারিতেন মাসের মধ্যে কতক দ্রব্য অগ্রসর
হইগাম। কৃপ কোথায়ও দেখিলাম না। একবার
ধির করিয়া, পোশেখর দেখিয়া সিং, তৎক্ষণেই
জল আনিয়া, ভয়কে বাঙাইল। আমার ভাবি-
লাম, কানীকে একা রাখিয়া এতদ্বারি পূর্ব বাড়িয়া
আমার উচিত হয় না। মন বড়ই ব্যথা হইল।
যদি কল না লইয়া ভায়ার কাছে বাই, তাহা হইলে
ভায়া হয়ত মজ্জিত হইয়া পড়িতেন। বড় বিষম
বিপদে পড়িলাম।

এমন সময় দূর হইতে দেখিলাম, কানী প্রসাদ
কাজিয়া উঠিয়াছেন। ভায়া তখন ছোট একটা
নিমের ডাল ভাঙ্গিবার চেষ্টায় আছেন। ভায়াকে
এ অবস্থায় দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। আমি
তখন দেখিলাম কানীর নিকট পেলো। কানী
বলিল, “আমি বুঝিয়াছি, জল এখানে পাওয়া
বাইবে না।—তাই ধীরে ধীরে ভিট্টায় একটা
নিমডাল ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আছি। ভায়া
মাথার দিয়া, পোশেখর পেলে রোদে তত কষ্ট
হইবে না।”

ভায়াকে আর কষ্ট করিতে হইল না। আমি
তৎক্ষণাৎ এক টানে এক মোটা ডাল ভাঙ্গিলাম।
তাহাই ভায়াকে চক্ষুরূপে ধারণ করিয়া চাটিতে
লাগিলাম। অমনিভিলপে পোশেখর-বাঁধেব-
মন্দিরে উপনীত হইলাম।

মন্দিরটি ক্ষুদ্র। মন্দিরমধ্যে এক অনাড়ম্বর অনন্ত
শিবদেব। মন্দিরের সমুখে এক পাথরে বাঁধান,—
পাথরের গলদ্বিরি-করা পুষ্করিকা। পুষ্করে চারি
ধারে প্রস্তরময় চাতাল। ভায়ার উপর ম্যান্ডা,
কাঁঠি, ও বাঁজির্ব বসিয়া থাকেন। মন্দিরের
চতুর্দিকে অখণ্ড, অমর, এবং নির ভূদে পূর্ণ।
মন্দিরের নিকট এক অগ্ন্যবলুপের মধ্যে একজন
বৃদ্ধ ম্যান্ডা উপবিষ্ট। ঐত গ্রামে এবং প্রথর
বৌদ মন্দিরও, তিনি মন্দিরে আশ্রয় লাভিয়া
আছেন। অনুরূপ দুই ভাই ভাইকে অধর্মের
ভক্তির প্রবাস করিলাম। তিনি কানীর

কহিলেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম, “বাবা! আপনীর
নিকট ঠাণ্ডা জল আছে কি?”

ম্যান্ডা সীটের এই ভাবে উত্তর দিলেন, “বেটা!
আজ সবই পর্যম, ঠাণ্ডা কোথা পাইবে?” এই
কথা বলিয়া ম্যান্ডা হাহারবে বিকটরূপে হাসিতে
লাগিলেন। আমি কানর হইয়া বলিলাম,—“ঠাকুর!
পিপাসায় আমার এই ভাচার প্রাণ বাঁচি হইবার
উপক্রম হইয়াছে, যদি একটু ঠাণ্ডা জল থাকে,
তবে অমর্যবপুর্কক বিন।”

ম্যান্ডা। (হাসিয়া) কেবল পিপাসায় কখনও
প্রাণবায়ু বর্জিত হয় না। আশ্চর্য বখন দেখে-
ভায়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন বিন পিপাসাতত্ত
ও মধ্য বাটয়া থাকে। এই ভোগদেহের মুক্তি হইলেই
ত মরণ। কিন্তু সে সত্ত বিন সম্বল আসে কৈ?

ম্যান্ডা সেই ভায়ের অনেক কথা কহিলেন;
অনেক সংস্কৃত প্রেক্ষা বৃন্দ্য বলিলেন, শেষে ভায়া
পায়ে হাত পোকিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“ভূমিই
কিছুকাল হইয়াছ?” কানী প্রসাদ বিনয়ন-বচনে
বলিল, “আজ্ঞে হাঁ।”

ম্যান্ডা তখন তাঁহার কমণ্ডল উত্তোলন করিয়া,
কানীকে কহিলেন,—“হাঁ কানী! মুখ রাখান
করিল। ম্যান্ডা ধীরে-ধীরে, অঙ্গের-অঙ্গের, সময়ে
সময়ে কমণ্ডলুখ পানীয় জল কানীর মুখে
চলিতে লাগিলেন। ধানিক বাঁধিয়া, হুন্ড নাড়িয়া,
কানী বুঝিয়া দিল,—“আর না,—আজ জল খাইব
না।” জলপান শেষ হইলে, কানী বলিল, “এমন হুন্ড
নীতল জলও আমি ইহ জীবনে আর কখন পান
করিব না।” এ জলে দেখে হয় হুন্ডা ঢালা আছে।
আমি মনে করিয়াছিলুম, এই এক কমণ্ডলু জলে
আমার বোধ হয় দুইখাইবে না; কিন্তু কয়েক কাল
এই জল উপরস্থ হইলে, মনে হইল, ফল, ভাতি,
ক্রান্তি সমস্তই দূর হইয়াছে।” আমারও কিঞ্চিৎ
জল-ফলা পাইয়াছিল। কানীর কথায় ম্যান্ডার
সেই কমণ্ডলু জল পান করিতে হইয়াছিল।
ম্যান্ডা হাসিয়া আমার মুখে আবার জল চলিতে
লাগিলেন। পানকরী শেষ হইলে, আমার শরীর
মনে রোমান্সিত হইল। প্রকৃতই এমন মিঠা পানি
আমি কখন খাই নাই।

আমি তখন যোগ্যভাবে ম্যান্ডাটিকে বলিলাম,
“বাবা! আমার বড় বিষম বিপদে পড়িয়াছি।
আমাদের প্রাণরক্ষার উপায় কিছু বনিয়া দিতে
পারেন কি?”

ম্যান্ডা। এ এংদারে বিপদও নাই, রক্ষণও
নাই।

আমি।—বাবা! আমি সর্বশক্তি হইয়াছি;
এখনে প্রাণ লইয়া টানাটানি। এখন কোথায়
বাইব, কি করিব—আপনি বলিয়া দিলেন।

ম্যান্ডা।। যেখানে কইবার সেই বাঁধেই
বাইতে হইবে; বাহা করিবার, তাহাই করিতে
হইবে। আশ্রা—প্রাণ কাহারও আশ্রয়স্থান নহে;
আপন হইবা দৃঢ় হই না।—ভাঙ্গু ভবাবির দ্বারা
এই বিধ্বস্ত হয় না; শত কামনা দামিলেও ইহার
এক কোণ ক্ষয় হয় না। তবে এক ভয় কেন?

এই কথা বলিতে বলিতে ম্যান্ডা এক সংস্কৃত
শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

আমি বেবাক্তি বুঝিয়া ম্যান্ডাটিকে অস্ত্র এক
কথা জিজ্ঞাসিলাম,—“ঠাকুর! এই যে, ইংরেজপন
পলাইয়াছেন, আর সিপাহীপন বেশ অধিকার
করিয়াছেন,—ইহার ভবিষ্যৎ ফল কি হইবে,—
আপনি আমাকে বৃন্দ।”

ম্যান্ডা।। বেটা! মন্দিরে গিয়া বিশ্রাম করহে।
আমাকে আর বিরক্ত করিও না।

আমি। এ কথা না বলিলে, আমি আপনীর
পাশবর্তী ছাড়ি না।

ম্যান্ডা সীট চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; যন, যন দীর্ঘ
শ্বাস শ্বাসিত লাগিল। তিনি মনে পোষাচিত
হইয়াই কানীকে বলিলেন,—“মুখ! শেম্বরী পলা-
ইবে,—আর কুরুক-খুপালে রাজত্ব করিবে,—ইহা
কি কখন সম্ভবপর হয়? বাও—বাও—মন্দিরে
গিয়া ভগবানের সেবা কর।”

আমরা ম্যান্ডাটিকে প্রণাম করিয়া মন্দিরভূমিতে
বাত্তা করিলাম।

বিশ্ব পরিত্যক্ত।

ঈশ্বর দূর অগ্রসর হইয়াছি—অমনি পথেই
পাড়া বা প্রাণম পুরোহিতকে সন্নিহিত দেখা হইল।
পাড়া নামটি জুগিয়া গিয়াছে। তাঁহার বয়স ৬০
বৎসরের কম নহে। পোড়ায়। পললপত্র রুমালমালা
হইতে। হস্তবন্দন। আমাকে দেখিয়াই পাড়া
কহিলেন, “বাবু-দায়েব। আপনি পাপন ম্যান্ডার
সন্নিহিত কি তর্ক করিতেছেন?” আমি বলিলাম,
“ম্যান্ডারী উপস্থিত নহে; দিবা জানাপ্রকম
বলিয়া বোধ হইল।” সে বাহা হুড়ক,—আমরা

বড় বিপদে পড়িয়াছি; আমরা সর্বশক্তি হইয়াছি,—
আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।”

পাড়া। সিপাহীপন কি আপনীরও ঘর-বাড়া,
টাকা-কড়ী নষ্ট করিয়াছে?

আমি। মোহার শিশুকে প্রায় চৌদ্দ পনের
হাজার টাকা নগদ মজুদ ছিল, তাহা লইয়াছে;
সিহাবিগকে মারিয়া-ধরিয়া আমার সমস্ত ঘোড়া
কাড়িয়া লইয়াছে; জলধারার একটা ষ্টা পর্যন্ত
ভাঙা। আমার বাটতে ব্রাহ্মণ বায় নাই। শেষে
যবে ঐকন লাগিয়া তাহা পোড়িয়া ফেলিয়াছে।

পাড়া। সিপাহীপন ত বড়ই বেই-মান।
আপনি টিহাবিগকে কত ভাল! বাগিচের, কত
আমার গাছের, বিঘুরে প্রাক্তে গৃহনির্মাণে
আপনি উদ্যোগিক বিনা শুদে টাকা কর্ত্ত
দিতেন,—কিন্তু তাহারা আপনাকে আজ তাহার
সমুচিত প্রতিক্ষণ লিল।

আমি। পূত-কর্ম্মের জন্য শোক করা বৃথা।
সকলি অশুভ-মূলক। এখনে আমাদের প্রাণরক্ষার
আপনি উপায় বলিয়া দিউন।

পাড়া। কেন,—সিপাহীপন আপনাকে প্রাণে
মারিবার চেষ্টায় আছে নাকি?

আমি। কিছুইত সুবিধেত পারিতেছি না।
সিপাহীদের চরিত্র—পতি-মতি-প্রবৃত্তি এখনে
উত্তরময় উপলব্ধি হইবার নহে তাহাদের
পোষাচিত—আমসীমুন্নি দেখিলে এখন আতঙ্ক
উপস্থিত হয়।

পাড়া। সিপাহীদের এখন কে কড়া হইয়া-
ছেন,—জানেন কি?

আমি। না।

পাড়া। অন্য বৎসমানের উপস্থিত হইবে,—
তাহা আপনি পূর্বে জানিতেন না কি?

আমি। না। আমি যদি কিছু পূর্বে সন্মান
পাইতাম, তাহা হইলে আমার ভ্রমনা কি ছিল?

পাড়া। তনিতেছি, ইংরেজের বাঁধন-মুন্ডনা
প্রভৃতি সমস্তই নুষ্টিত হইয়াছে। অনেক গৃহ
দগ্ন হইয়াছে। বা বাহুরূপ বী নাবা ইংলান্ডে
আছেন। আমি এ সুকল বিধেরে প্রকৃত সমাধা
আনিবার জন্য দুইজন চর সমরে পাঠাইয়াছি।

তাহারা কিরিয়া আসিল গৃহ দগ্ন হইতে পারিল।
এইরূপ কবাবাড়া উপস্থিত করিতে পারিলে
অভ্যন্তরে উপনীত হইলাম। শিবলিঙ্গকে সন্নিহিত
প্রণামপুর্কক কহিলাম, “বাবাঘো রক্ষা কর।”

বলিয়া, তাঁহাকেই আমাদের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছি। তিনিই এখন আমাদের কণ্ঠ বা বাক্যের স্বরূপ হইয়াছেন। আমাদের বৈজ্ঞানিক-রেশনালার-মেজর মহাশয় সন্নিও এখন তাঁহার অধীনস্থ। অন্য তাঁহার নিকট প্রায় দশলাখ টাকা মজুর হইয়াছে। সেই টাকা হইতে কিছু কিছু ব্যয়ও আরজ হইয়াছে। টাকার হিসাবপত্র রাখিবার জন্য এখনও উপযুক্ত লোকের আবশ্যক। হিঙ্গাবাদ রাখা বিষয়ে আপ-নার চিন্তাই বিনি হইয়াতি ভনিয়া। আসিগেনে। তাই বস্তু বা আপনাকে তলব করিয়াছেন। আজ বৈজ্ঞানিক মহত্বের নানা স্থানে আমাদের গুপ্ত চর নিযুক্ত আছে। তাহাদের দ্বারাই সংবাদ পাইয়াছি যে, আপনি এখনো আশ্রয় হইয়াছেন।

আমি। তোমাদের নূতন সেনাপতি আমাকে যে কাজে নিযুক্ত করিবার কথা বলিয়াছেন, সে কাজ আমার দ্বারা কিছুতেই হওয়া সম্ভব নহে। আমি কেবলমাত্র ইংল্যান্ডি জাতি, মুরোয়া ইংল্যান্ডেই হিসাব পত্র রাখিলে বস্তু বা বস্তুকে করিয়া দে। অতএব আমাকে বস্তু বা বস্তু নিকট গিয়া বাইয়া তোমার কোন সল নাই।

দফাদার। বস্তু সাহেব। আপনি কথা করিবেন। আমার প্রতি হুকুম হইয়াছে, আপনাকে পুষ্টিয়া লইয়া তাঁহার নিকট হাজির করা। আপনি সে কাজ করিতে সম্মত কি অসম্মত?—তাঁহার জবাব আমাদের সেনাপতিও নিকটই দিবে। আর তাহাদের। আপনার কোনও ভাব নাই, সলুন আমার সঙ্গে।

এই কথা ভনিয়া আমি মনে মনে বুঝিলুম। যেদগ পতিক রেষিভেজি, তাহাতে আমায় উপর প্রেষণারেরই হুকুম নিশ্চয় হইয়া থাকিবে। যদি আমি সম্মত না হই, তবে উহার। আমাকে ধরিয়া লইয়া বাইবার প্রেরণ করিবে। দফাদার মহাশয় ভুলভুল-বোঝাইতে বসে, কিন্তু আসল কাজে গ্রিক আছে। উহার সঙ্ঘট বিবাদ বা মারামারি না করিয়া বস্তু বা বস্তু নিকট গিয়াই যুক্তি।

এইদগ ভাবিয়া আমি দফাদারের বিশেষ-অসু-প্রতি করিতে প্ররত হইলাম। প্রতিগাম,—জুনি যখন বলিতেছেন কোন ভাব নাই, তখন আমি অবশ্যই আর কাহাকেও ভাব করি না। তবে এক কথা এই, বস্তু বা বস্তু সময়ে উপস্থিত হইবার পূর্বে, আমাকে একবার অশ্বারোহী রেশনালার-মেজর মহাশয় সন্নিওর সহিত দেখা করাইয়া দিই।

দফাদার বলিল,—সে কোন আশ্চর্য কথা। আপনি বাহা বলিলেন, মাথা, থাকিলে এ সোলাম তাহাই করিতে প্ররত আছে।

আমি। আচ্ছা, এক কথা জিজ্ঞাস্য এই, তোমারা সকলে বর্তমান থাকিতে আমার ঘর-বাড়ী ওরূপ ভাবে সুস্থিত হইল কেন? দফাদার। এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। আমরা এ বিষয়ের বিষ্-বিমর্গও জানি না। যখন আমরা ইংল্যান্ডগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য আসি কাননে বসি, সেই সময় একজন বন্যমাইস পদাতিক সৈন্য একজ হইয়া আপনার বাড়ী লুট করে ও জাগিয়া দেয়। মহাশয় সন্নিও হইতে বড়ই হুঙ্কার হইয়াছেন। বস্তু বা বস্তু এ কথা উঠিয়াছে। কোন কোন সিপাহী আপনার ঘর বাড়ী লুট করিছে, তাহা এখনও গ্রিক জানা যায় নাই।

আমি। আমার সেই ভাল খোড়াটা কোথায় গেল?

দফাদার। হুঙ্কার-মেজর বস্তু বা বস্তু আন্তা-বলন তাহা আছে। আপনি চাহিলে বস্তু বা বস্তু হইয়া আমাকে খোড়া ফেরত দিবেন।

আমাদের একরূপ কথা বাড়ী হইতেছে, এমন সময় ভাড়া কাশীপ্রসাদ এবং পাণ্ডাজী আমাদের নিকট উপস্থিত হইল।

কাশীপ্রসাদ মনে-মনে রাজসী ভাষায় আমাকে বলিল। ভ্রামন কি আমার বন্ধী হইলো? আমি যদিও বলিলাম, “না, বন্ধী কেন হইবে? তোমার কোন ভাব নাই, জুনি আমার সঙ্গে আসি।” কাশী উত্তর করিল, “আমি আপনাকে ছাড়া অন্য কারো আছি? কিন্তু দাঁত। আপনার আমার একটা কথা রাখিবেন;—বিশ্বাস্যবীরের অধীনে কখনই ঢাকরা রাখিবার কবিত্ব নাই।” কাশী কথা ভনিয়া আমি মনে মনে খামিয়া। কথা বাস্তব প্রায় এক বটী কাল অভিযাচিত হইল। আমি ভাবে বুঝিলাম, দফাদার বাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। বলিলাম, “আমি এখনো বিপদের প্রয়োজন কি? চল আমরা যাই।”

দফাদার একটী বিরত হইল। আমরা চলিয়া যাইব, আর তাহারপট জননে অশ্বারোহণে আমা-বস্তুকে সঙ্গে বাইবে, দফাদারের চক্ষু হইয়া বস্তু। বিবম বোধে। “কিউ উপায় নাই, আমাদের জন্য আর হইলি বন্ধী খোড়া কোথায় মিলিকে?”

আমার জীবন চরিত।

তাই দফাদার ভদ্রতা করিয়া বলিল, “বাসু সাহেব। আপনারা হুই জনে এই হুই খোড়ায় চলুন, আমরা হুই জনে ইটিয়া যাইতেছি।” আমি বলিলাম,—“তাহা কখনই হইতে পারে না। তোমারা খোড়ারোহণে আমাদের পণ্ডা পণ্ডা আসি, আমরা অগ্রে অগ্রে যাইতেছি। বিশেষ কথা এই যে, আমরা যদি অশ্বারোহণে যাই, আর তোমারা হুইজনলে যদি পদযুদ্ধে চলিয়া যাও, আর এই বা যদি তোমাদের নূতন মনির বস্তু বা বস্তু করণোচ হয়, তাহা হইলে তিনি বিরক্ত হইতে পারেন।” দফাদার উত্তর দিল,—“সে যাহাই হউক, আপনি মাতাতে পা দিয়া চলিয়া যাইবেন, আর আমরা খোড়ার উপর যাইব। এ বিষয় দৃষ্ট, আমি কখনই সোচ্চিত পারিব না।”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—“দফাদার সাহেব। তোমার কথা বড়ই অশুভ্রুহিত হইল। কিন্তু আমি কিছুতেই অগ্রে আরোহণ করিতেছি না। হইতে ভবিষ্যতে তোমার বিপরীত ঘটতে পারে।”

দফাদার আর কোন কথা কহিল না,—নীরব হইয়া হইল।

আমরা হুই ভাই আপে আপে পদযুদ্ধে চলিলাম। দফাদার এবং চারি জন অশ্বারোহী বীরকেই আমাদের পণ্ডা পণ্ডা হইতে লাগিল।

চারিংশ পরিচ্ছেদ।

সর্ব প্রথমে আমরা রেশনালার-মেজর মহাশয়, নীকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে সৌধায়া সরমের সহিত চোখের-কোষাইলেন। এক-প্রাণের পর, তিনি বলিলেন,—“আপনারা আমার কাছে না আসিয়া হঠাৎ পলাইলেন কেন?” আমি। আপনার নিকট আসিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, বটে, কিন্তু কি করি, উপায় ছিল না। চারিদিগেই তখন তলি গোলা ঝুটি হইতেছে, বন্যমাইসগণ লুট আরজ করিয়াছে। আপনি তখন কোথায়,—অ-অন্যোপায় হইয়া যোগেপের-মহাশয়ের মন্দিরভি-মুখে চলিয়া আসিলাম।

মহাশয় সন্নিও। বাসু সাহেব।—আপনার অবস্থা আমি সমস্তই ভনিয়াছি। কে আপনার বাড়ী-ঘর লুট করিল, তাহার অঙ্গশ্রমণ হইতেছে। কিন্তু কেহই কমল হইতেছে না। বাহা হউক, অশ্বাঘা-তাই দফাদার ভদ্রতা করিয়া বলিল, “বাসু সাহেব। আপনারা হুই জনে এই হুই খোড়ায় চলুন, আমরা হুই জনে ইটিয়া যাইতেছি।” আমি বলিলাম,—“তাহা কখনই হইতে পারে না। তোমারা খোড়ারোহণে আমাদের পণ্ডা পণ্ডা আসি, আমরা অগ্রে অগ্রে যাইতেছি। বিশেষ কথা এই যে, আমরা যদি অশ্বারোহণে যাই, আর তোমারা হুইজনলে যদি পদযুদ্ধে চলিয়া যাও, আর এই বা যদি তোমাদের নূতন মনির বস্তু বা বস্তু করণোচ হয়, তাহা হইলে তিনি বিরক্ত হইতে পারেন।” দফাদার উত্তর দিল,—“সে যাহাই হউক, আপনি মাতাতে পা দিয়া চলিয়া যাইবেন, আর আমরা খোড়ার উপর যাইব। এ বিষয় দৃষ্ট, আমি কখনই সোচ্চিত পারিব না।”

কথা আরও এ বিষয়ের বিশেষ অঙ্গশ্রমণ করাইব। এক্ষণে আপনি আমার সহিত একবার বস্তু বা বস্তু নিকটে চলুন। কোন বিশেষ কথা আছে, সেই-থানেই সে কথা বলিবেন।

বিশেষ কথাটি কি, তাহা অবশ্যই আমি মনে মনে বুঝিলাম। কিন্তু মহাশয় সন্নিওর মাঝাতে সে কথা ভাবিলাম না। বিশেষাধীনের অধীনে চাকরী লইব, কি লইব না? এ বিষয়ের কোন উল্লেখ-না। ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ড সন্নিওকে বলিলাম, “এটা আমাকে দিয়া করিতে হইবে, আমি বস্তু বা বস্তু নিকটে কিছুতেই যাইব না, আপনি আমাকে মারুন, কাটুন, কয়েদ করুন,—তাঁহাতে কোন ক্ষতি আছি, কিন্তু বস্তু বা বস্তু সমাপত্ত্ব হইতে কিছুতেই জানি নাই।”

মহাশয় সন্নিও। কেন কেন?

আমি। বস্তু বা বস্তু আমনি কি চেনেন না? সে লোকটা বড়ই গোঁয়ার, দাঙ্কি এবং অস্ব-স্ব-পরায়ণ। কি হিসাবে যে, আপনারা তাকে ছাড়। প্রধান-সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ‘সৈনিকের কথা কি মনে নাই? আমাদের রেশনালার তায়কার নাট হই-তেছে; বস্তু বা বস্তু নিম্নগ ছিল, তিনি হাসিয়া-জিনে; কিন্তু ভিত্তি চুকিতে একটু কষ্ট হইয়াছিল। বলিয়া তিনি চলিয়া গেল। আমি এ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পথে আটকাইলাম। কত অহুস-নিরু ক্রিয়াম, শেষে হুই হুই উদগীর্ণ, খোড়া তিনি দিগিলেন না। শেষে আপনিও ত তাহাকে মাধ্যমাধনা করিয়া আসিতে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি আসিলেন ঠিকই। আমার খামিগা, বস্তু বা বস্তু লোক-ভাল নহে।—পরজ পড়িলে হয় ত মুখে আপায়িত বেশু করিবে; কিন্তু অস্ত্রমণ একবারে বেন পাশেের ভ্রায় কুটিল-ক্ষয়। আপনারা তাঁহাকে সেনাপতি করিয়াছেন, করুন; তাহাতে আমার আপত্তি নাই—কিন্তু ভবিষ্যতে উহার সহিত আপনাদের কিরূপ বিনি-বান হইবে, কেবল তাহাই। আমি ভাবিতেছি।

মহাশয় সন্নিও এই কথা ভনিয়া দীর্ঘ নিবাস ফেলিয়া থাকি নীরব রহিলেন। শেষে গুপ্তাশ্রয়ের বলিলেন,—“বাহা রাখিবার জাহা, খাটিয়াছে; আমরা ‘দু’ কটায় প্রতিজ্ঞা-হুই বিবম অস্বাচ্ছ। এতাজ হইতেছে সে প্রতিজ্ঞা ভুলে’ করিতে পারিব না। অতএব আমাকে এ সময় কোন কথা-বা-আপনার দ্বারা।”

আমি। বুধা, তাহা আমি জানি। কিন্তু মন
বুকে নাই বলিয়াই—একথা বলিলাম।

মহৎমহা সকা। সেহুন, বাবু সাহেব! আমি
সাহেবদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রায় এক
ক্রোশ পথ ছুটিয়া বিদ্যাখিল্যাম। কিন্তু সাহেবেরা
একবারও আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।
সেই-বিভূষণ! অবশ্যই বলিতে হইবে। কাজেই
শেষে আমি বৃন্দ বীর সহিত মিলিত হইতে বাধ্য
হইলাম। এক্ষণে আপনিক একবার আমার সহিত
বৃন্দ বীর নিকটে চানুন। আপনার মনে ভয়
নাই। আমি জীবিত থাকিতে আপনার কেশুণ্য দেখে
স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না। বাবু সাহেব!।
আপনি জানেন, সামরিক-বিভাগের নিয়ম এই—
যেহে,—কর্তব্য পালন। অতএব আপন আমাকে
কমা করুন,—আমার সঙ্গে বৃন্দ বীর নিকটে চানুন।
আমার ভ্রাতা ভালই হইয়া বেরিলাম, বৃন্দ বীর
আপনকা নাই। মৃদুই বনি ঘটে, তবে এইমাত্র
বলিতে প্রায়, আগে আমার প্রাণ বাইবে, তৎপরে
আপনার প্রাণ বাইবে।

আমি আর বাক্য-ধন না করিয়া, মহৎমহা সকা
সহিত বাঁচি বীর পুনঃব্রত বৃন্দ বীর দরবারে
চলিলাম। উপনীত হইয়া বেরিলাম, বৃন্দ বীর
মহিমান্বয়ে এক মস্কোপরি বসিয়া আছেন।
কয়েকজন গৈনিক-পুরুষ সওয়ারেরে আপ গুলিয়া
ভারিয়া দিতেছে। আমি গোলাবর্ষে গড়ে মস্কোপ
পূর করিতেছি। বৃন্দ বীর স্বয়ং স্বয়ং-কচিত্ত
এক লালা পোষাক পরিধান করিয়াছেন। বৃন্দ
বীর ব্যস ৬৫ বৎসরের কন মনে। কিন্তু তখনও
শরীরে সামর্থ্য বিলম্বন আছে। চুল আধ-পাকা;
বর্ষে দোহাটা মোটা জুয়ান। শরীর বর্ষে মনুষ্য-ব
নয়। গাড়ি বিলম্বিত, চুইশখি তরোয়ায়াক
কিছু মুখে মেনে দলিলপত্র ভাণ কেউ মাথাইয়া
রাখিয়াছে। আমাদের আদমুন-নাড় বৃন্দ বীর
আমাদিগকে আদ্যুদিত করিয়া নিকটে বসাইলেন।
একজন মোক্তরপুরুষ আসিয়া পান দিল, আত
বিল, বোলাপ-জল ছড়াইয়া। বৃন্দ বীর প্রণত
আমাকে সান্ন্যাস সম্ভারু করিয়া বলিলেন, “বাবু
সাহেব!। আপনারও কোন কষ্ট হয় নাই?” আমি
অদ্বান-বদনে উত্তর দিলাম,—“না।”

বৃন্দ বীর। আপনার বদন দ্বারা দর্শন হইবে,
তাহা আমাকে জানাইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা
পূর্ব করি। আর এই রাজত্ব এখন আমাদেরই

হইয়াছে। দ্বিতীয় বাসনাযকে পুনরায় আমরা
দ্বিতীয়ে আপন করিব এবং আপনাকে বাসনাযকে
অধোনে এক প্রধান-মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিব শির
করিয়াছি। আপনকে যে বিশেষ কর্তব্য যুক্তি
তাহা আমি অবগত আছি। আপনি জানেন,
আপনাকে অনেক দিন হইতেই আমি বড়
ভালবাসি।

আমি। আপনার ভালবাসা থাকিলে, আমার
চিরদিনই সুলভ হইবে।
বৃন্দ বীর। সেহুন, ইংরেজ লোক পছন্দীয়ছে।
সম্ভবত শেষে অন্যায়ের তাহার প্রাণে মরিবে।
হা, যে সকা ইংরেজ সহরে ছিল, তাহার সন্মানেই
হত হইয়াছে। হতভাগ্য এ রাজত্ব এখন সম্পূর্ণ
আমাদেরই আধিকার। ইংরেজ-অধিকৃত প্রায়
দশ লক্ষ টাকা আমার হস্তগত হইয়াছে। আরও
নাশ। যখন হইতে টাকা ও লোকসম্পদ আমার
আমার নিকট পৌছিয়াছে। প্রত্যয় প্রায় দশ
হাজার লোকের আহার-ব্যয় আমাকে যোগাইতে
কেন। খি, আটা, ছোলা, ছাতু,—এই সকল
প্রচুরপরিমাণে সংগ্রহ করিতে হইবে। গোলা ওলি
বাল্পক ও তৈয়ারি করিতে হইবে। বাহাতে হস্তারু-
মতে এই সকল কার্য চলে। তাহার তত্ত্বাবধানে
ভার আপনাকে লইতে হইবে। টাকা কড়ার
আদানানী-প্রদানী এবং হিসাব-পত্র ও সকলও
প্ৰাণনি পরিশ্রম করিবেন। আমরা হই সমগ্র
কাল এখানে থাকিয়া আট-দশ হাজার সৈন্য
লগ্নগ্রহ করিয়া, এ সময় হইতে দ্বিতীয় প্রদান করিব।
আমাদী কল্য মোরাগালা, মাহেন্দ্রনাথ ও গিনি-
ভিত হইতে রাজনা আমাকে তাহাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ
টাকা হইবে। প্রাচীর হিসাব-পত্র ও রদান-সংগ্রহ
লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইয়াছি। আপনি আমার
সহায় হউন।

আমি। এক্ষণে আমি শারীরিক অস্থ্য অছি,
সুতরাং আমার দ্বারা এই ওস্তাদ কার্য সম্পন্ন
হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষতঃ আমি ইংরেজী ভাষা
আর কোন ভাষা জানি না; ইংরেজীতে হিসাব-
পত্র রাখিলে আপনার গ্রন্থিগণে বিরুদ্ধে।

আমি যে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা বলিলাম, তাহা
বৃন্দ বীর সুনিবেত্তে পরিণাম। তখন তাহার চক্ষুস্থল লাল
হইয়া উঠিল; ক্ষত মনে ভাব-গাশন করিয়া
বলিল,—“আমু সাহেব। আমাকে বধনা করিলেন
না। আমি বিশেষরূপে ভনীয়াছি, আপনিক পাটচী

ভাষা জানেন। বাগালা, ইংরেজী, ফার্সী, উর্দু
এবং হিন্দী—এই পাঁচ ভাষাতেই আপনি
অভিজ্ঞ। আপনার কি কোন রূপ আশঙ্কা হই-
তেছে? আমাদের কাছে আপনার কোন ভয় নাই।
আর ইংরেজবর্ণনও কখনও কিরিয়া আসিবে না,
ইহা আপনি নিশ্চয় জানিলেন। তবে আপনার
ভয় কাহাকে? আমি কোরাণ ছুইয়া সত্য-প্রতিভ
হইয়া বলিতেছি,—অন্য হইতে আপনাকে মানিক
এক হাজার টাকা করিয়া দেয়া যি। আর দ্বিতীয়
পৌছিতে—এ যেমন দ্বিগুণ হইবে। আপনার সহিত
এক শত সওয়ারের প্রহার-সম্পদ থাকিবে। অর্থাৎ
আপনি একশত সওয়ারের অধিনেতা হইবেন।
আপনি অস্বাভাব্যে, শত্রু-আক্রমণে,—স্বাক্ষরিকভাবে
বিশেষ পই—তাহাও আমি ভনীয়াছি। আপনার
কোন চিন্তা নাই, আপনি চাকরী গ্রহণ করুন।

আমি তখন মোহোভাসে কাজে হইয়া বলিলাম,
“আমাকে এ যাত্রা কমা করুন; প্রচুর পক্ষেই এই
পীড়িত শরীর এখন আমি এই কর্তব্যের লইতে
অক্ষম। অর্ধেক দি,—যাত্রারই কেলুন, আর বাহাই
করুন, আমি উপস্থিত কোন মনেই আপনার এ
চাকরী লইতে পারিতেছি না।”

এই কথো ভনীয়া বৃন্দ বীর কোথাগিতে মেনে হে
অলিয়া উঠিল। ভীষণ জন্তুরা করিয়া বলিল;—
ইংরেজ আগর বাসানী সব এক ছায়, তুমাকে
নেহি মাগুম ছায়, কি, হামু অভি তুমারা গরদন
কাটিনেকা হুম্ম যে সকতে হেঁ। ফিরকোরাশী!
বেহাম!। হাজার রূপেরা তম্বা কো ভি কুল বেহি
করো? খুব মাগুম ছায় কি ইংরেজকে মাফ
হুম্বারা মাগিন ছায়।”

এই সময় মহৎমহা সকা, ক্রোধ-মুগ্ধিত বৃন্দ বীর
কানে কানে কি কথা বলিলেন। বৃন্দ বীর তখন
দাড়ি মোহোভাসে মোহ ভাঙিতে আমার প্রতি এই
হুম্ম দিল,—ইহাকে লাইনকে গারদনে হিগা-
জমৎ রাখাযে।”

তখন সত্য উত্তর হইয়াছে। আমরা হই ভাই
কন্যে হইলাম। তদিক বয়সদর্শন স্মৃতি হইল,
কিন্তু কাগাদারের নিশিগু হইলাম। জানি না
১৮৫৭সালের ৩১শে মে রবিবার দিনে, আমার
কতগুলি গ্রহই বিরক্ত হইয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এইখা আত্মা প্রচার করিয়া প্রধান সেনাপতি
রামকৃষ্ণেশ্বর বৃন্দ বীর দরবার ভূপূর্বক অভ্য-
হানে উঠিয়া বসেন। চারিজন প্রহারী আমা-
দের হাতে হাতকড়ী দিতে আসিল। মহৎমহা
সকা প্রহারীপুরুষ বলিলেন,—“আমি বৃত্তবর্ণ
না করিয়া আমি, ততক্ষণ হাতকড়ী দেওয়া বন্ধ
গৃহীত।” এই বলিয়া তিনি বৃন্দ বীর যে পথে
গিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। কিছুকাল
পরে প্রভাত্যুত হইয়া প্রহরীপদকে বলিলেন,—
“ইহাদের হাতে হাতকড়ী দিতে হইবে না।
তৈমহা রামকৃষ্ণ চলিয়া যাত। ইহাদিগকে আমি
সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।” প্রহরীপদ মহৎমহা
সকার আজ্ঞা শিরোধার্য করিল। পুরোঁই
বলিয়াছিল, “মহৎমহা সকা—বিজোহী-সেনাপনের
হিত্তায় স্বাধিনায়ক।”

পুরোঁই সেনা-নিবাসে, ব্যাঙ্গর ত্রিভুজ ইয়া-
ন পথেই প্রায় এক হুহুহু বাগালা-বর ছিল।
সেনাপদ-মধ্যে, সেনাপতিরের সুদীর্ঘ-মধ্যে, এবং
ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ-সম্মুখ-ইনি টাকাড়ী ধার
হিচেন। প্রত্যেক বেগমিমেটের মধ্যেই টাকা
কাজ দ্বিবার এইরূপ এক এক জন শ্রেষ্ঠ, প্রধান-
সেনাপতির কয়েকজন-অগ্রদূতের থাকিত। ইয়ারান
শ্রেষ্ঠ মস্ত নথী লোক। দ্বিতীয় নিকট ভীমানি
নগরে ইহার মিথাল। ভারতের নানী যানে
ইহার, ফার্স-কারাদার। বেরিণীর ছানীতে ইহার
গুয়া হই গুলিতে থাকির লেন-দেন ছিল। ইয়ারান
স্বয়ং বেরিণীতে বার্কিন্দ না, তাহার পুত্র ভবদ্র-
মল শ্রেষ্ঠ পুত্রের নামে কারবার চালাইতে।
অন্য ভবদ্রমলের বর বাড়ী লুণ্ঠিত হয় নাই ঘটে,
গড়ও হয় নাই ঘটে, কিন্তু প্রায় একশত বৃদ্ধ-কারী
মিথাহীর দ্বারা বোঁটে, হইয়াছিল। বিজোহীপদ
কর্তৃক ভবদ্রমল কন্যে হইয়াছেন, কিন্তু একটু
ভদ্রভাবে। অর্থাৎ তাহাকে আধার-কারাদারের
শুশ্রূষাভক্ত করিয়া রাখা হয় নাই। তিনি আপন
গৃহে থাকিতে পাইয়াছেন, আপন চাকর-বাকর
পাইয়াছেন, কিন্তু জ্বাছেন অতঃই প্রহরী-বোঁটে
হইয়া; প্রচুরে বাহির হইবার ক্ষেত্র নাই।

মহৎমহা সকা আমাকে উক্ত ভবদ্রমল শ্রেষ্ঠের
ভবনে লইয়া আসেন। বলিলেন,—“আমুনায়ক
পারবে গ্লাসিকৃত হইবেন না, হাতে হাতকড়ী দিতে

হইবে না; আপনি এইখানেই থাকুন, এইখানেই আহার্যদি করুন।"

আমি। বন্ধী হইয়াছি বলিয়া আমি দ্রুতবর্তে হই নাই। কিন্তু আপনাদের মত সেনাপতির ব্যবহারে বড়ই কষ্ট বোধ হইয়াছে। আমি বাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই বলিয়াছে। সেই-জন্তই এখানে আসিবার কালীন আপনাকে বলিয়াছিলাম,—মারিতে হয় আপনিনই মারুন, কয়েক করিতে হয়, আপনিন করুন,—বধুত বীর নিকটে আমি থাকিব না।" বাহা হউক, এখন পড়াশুনাচেন করিলে দল নাই।

মহম্মদ সকা। দেখা শুমায়েই হইয়াছে বটে। এরূপ রাগে জানিলে, আপনাকে এখনে আসিতে কিংবা না। তবে এক কথা আমার মত বলিয়া জানিবেন,—আমার লগ্নে প্রাণ থাকিতে আপনার প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। আমি সন্নিহিত হই এক দিন এখানে কষ্ট করিয়া থাকুন, শীঘ্রই আপনাদের উদ্ধারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।

আমি। এ-মতকে আমি আর আপনাকে অধিক কি বলিব,—সমস্তই আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর নির্ভর।

মহম্মদ সকা। সুকাননরূপে আমাকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহাকে সেলাম করিয়া, জহরীমলের পাশে বিয়া বসিলাম।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

জহরীমল শ্রেষ্ঠ দুঃখপুরুষ। চোরাকাজি। আকর্ণ-বিশুদ্ধ-নয়ন। মুবত্বী হুম্বর। জুর-পুষ্ঠ, সগা বাহুর মাল্য।

জহরীমল আমাদের ছই ভাইকে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্যিত হইলেন। বলিলেন,—“আমার বড় সৌভাগ্য যে, এইজন্মসময়ে আপনার সহিত মিলিত হইলাম। কেহ নাই, একা,—আর বাটার চারিদিকে একশত প্রহরী। সেই একশতী লুণ্ঠ আছে, তাহারাত ভয়ে সমস্তে স্ত্রায় হইয়াছে; ডাকিলে উত্তর দিতে সাহস করেন না। বাহা হউক, এখনে আপনাকে পাঠিয়াছি,—আপনার সহিত কথাবার্তা করিয়াও অনেক শান্তি পাইব। বলিতেছি, আপনাকেও ঠেঁপিয়াই আমি দিগবল পাইয়াছি।” আমি। আমারও দিগবল পূর্ণ কর হইয়াছে।

বেলা ১০টা হইতে রাতি ৮টা পর্যন্ত এই ১০-৮টা কাল আত্মপ্রহরী হইয়া বেড়াইতেছিলাম; এখনে আসিবারে সহিত আপনাকে পাইলাম।

জহরীমল। (চমকিয়া) কেন বেন? আপনার বর-বাড়ী কি হইল? আমি। এই তব্বার সিপাহীদল সমস্তই মৃত করিয়াছেন, সমস্তই পোড়াইয়াছেন, এখন আমি বধুত বীর হকুমে বন্ধী হইয়াছি,—এইখানেই আমার থাকিবার আসনে বসিয়াছি। আমার কাণা থাক! —আপনার এখন অন্যথা কেন হইল, বন্ধন।

জহরীমল। আজ যে বিরোধে যাটবে, তাহা মৃগাকরও আমি জানিতে পারি নাই। হঠাৎ ১০টা তার সময় এক তোল পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে আমি পূর্জন জন সিপাহী আসিয়া, বলপূর্বক আমার নিকট হইতে চারি লইয়া সোহার সিমুক গুলিল। প্রায় চারিশ কালো টাঙ্গা নগ্ন ছিল, তাহা হইল। তাহার পরই প্রায় শতাধিক লোক আসিয়া আমার গুলি বেষ্টন করিয়া রছিল। একজন সৈনিক কর্মচারী আসিয়া আমাকে বলিল,—“বধুত বীর হকুমে তুমি বন্ধী হইয়াছ। তবে তুমি যদি বধুত বীর সহিত সিন্ধী বাও, তাহা হইলে তিনি তোমাকে ছাড়িয়া দিব। আর বিন্নাতে পৌঁছিয়া তোমার ভোমারি বুলি হইতে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা বধুত বীরকে দিতে হইবে।”

হুশন তব্বিয়াই আমি অব্যাহ। আমি সৈনিক কর্মচারীকে অবশ্যের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। সেই অবধি আমি যথা চিন্তায় নিমগ্ন আছি। আমি। ভাবনা করিলে কেবল শরীর ভয়; উহাতে আর কোন কাজ হয় না। বিপদকালে বৈধ ধরন,—সাধন অব্যবহৃত করুন,—আর সেই ভাবনাকে ভাঙুন। আপনায় যথ বৃত্ত ভণ্ড দেখিতেছি—বিসেসে আহার্যদি হইয়াছিল ত? জহরীমল। না। আমার আহার্যদি প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় সুসলমান-সিপাহীদল হইয়া বাটতে প্রবেশ কর। রক্তনশালায়ও তাহার মুকিয়াছিল। কানেই মরি নষ্ট হইল।

আমি। কবিত ত আর কোন দোষযোগ্য নাই; রক্তী তোরার করিতে বহুন না কেন? যবে আটা দি আছে ত? জহরীমল। যে আটা দি আছে, তাহাতে কোন কাজ হইবে না,—সমস্তই সমস্তই সুসলমান-পুষ্ঠ হইয়া থাকিবে।

আমি। আচ্ছা, আমি এই প্রহরী-জমালাপুরুকে বলিয়া আটা, দি, হিন্দু দ্বারা আনিয়া দিতেছি।

জহরীমল। না—না; উহাকে একা বলিয়া কাজ নাই; উহার ইচ্ছা লোক,—কি জানি, কি দোষ বোধাইবে।

আমি। আপনায় কোন চিন্তা নাই। সেজন্য আমি সমস্ত যোগাড় করিয়া দিতেছি। বিশেষ, শ্রীমান কাকপ্রসাদের লুণ্ঠা পাইয়া থাকিবেন; আমারও লুণ্ঠা নিত্যন্ত কম নহে। আর, আপনায় এখানে তোমাদের বন্দোবস্ত আছে ত? না থাকে বহুন,—আহাও আনিয়া দিতেছি।

জহরীমল। তোমাক আছে, ইকা নাই; যে একটা ডাকনের হকা আছে, তাহাতে আপনায় চলিবে না, জানি না।

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় দেখি, হুশন হিন্দু সৈনিক-পুস্তক আমাদের লুণ্ঠ পাটসের আটা, হইসের হুত এবং একসন্ম আসিয়া ডাল লইয়া উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহা মহম্মদ সকাই প্রেরিত। আহার্যদি সমস্তই প্রাচুর্য দেখিয়া আমার মনে আনন্দের উদয় হইল। বিদায় হইবার কালে বাহকগণকে বলিলাম, “দেখ তাই। লল যদি হুদিয়া হয়, আমার জন্ত কিছু ভাল তোমাক আনিও।” বাহকগণ “আমিন” বলিয়া, স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিল।

এ নিকে যুদ্ধিয়া দেখি, জহরীমলের পাচক ব্রাহ্মণী গৃহেই এক নিভৃত স্থানে, এক কোণে জড়-সড় হইয়া শুইয়া আছে। তাহাকে ডাকিলাম,—সে এখনে মাড়া দিল না। নাড়িলাম, তাহাতে সে বড় উজ্জ-বাটা করিল না। ডাকিলাম, এ ব্যক্তি মৃত না জীবিত? পরকণ্ঠে করিয়া বুঝিলাম, জীবিত—অব্যাহুই বটে। তবে মাঝা সেরা না কেন? শেষে জাহার গায়ে হাত দিয়া ঠেঁপিয়া-ঠেঁপিয়া বলিলাম,—“এহা তোমার কোন ভয় নাই; উঠ, উঠ। শ্রেষ্ঠজীর লুণ্ঠ ডাল রক্তী তৈয়ারী করিতে হইবে। আর, আমাকেও কোন তুমি না চেন? আমায় নাম হুর্জাদা বন্দোয়াখানার।”

পাচক-ব্রাহ্মণ তখন গা বাড়িয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, “বহু! সাদা! আনিয়া আসিগেলেন? আমি মনে করিয়াছিলাম, সিপাহী-লোক মুগি আনায় থাকিতে আসিয়াছে। আজ রক্তিকোয়া ১২ তার সময় আমি ব্রাহ্মণ হইতে না

পলাইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সিপাহী-লোক আমায় প্রেধার করিয়া লইয়া হইত।”

আমি বলিলাম, “তোমাকে আর বেশী ব্যাক্যায় করিতে হইবে না। হুদি আমার সঙ্গে আসিস, ডাল রক্তী তৈয়ারী করিতে হইবে।”

পাচক-ব্রাহ্মণ আমার পূর্ণাঙ্গ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল।

ছয় জনের আহার প্রস্তুত করা আবশ্যক। আমার ছই ভাই,—জহরীমল,—আমার গোমস্তা, এবং চাকর,—ওহু পাচক ব্রাহ্মণ,—মোট এই ত্রয়জন। পাটসের আটাই ব্রাহ্মণ করিলাম। হুত দেড়সের লইতে বলিয়া, আদ্যসের দুই কণাকার জন্ত রাখিতে বলিলাম। ডাল, বাহা ছিল, তাহা সমস্তই লইতে বলিলাম।

পাচক বিজ্ঞাশিল, “এত দি, এত আটা কে খাইবে? আপনায় তাহা হুইজন বৈ নয় না?” আমি। সে ভাবনা তোমায় নাই। রক্তী পাটে পড়িয়া থাকিবে না।

পাচকের রক্তন আমি যোগ আনা সাহায্য করিয়াছিলাম। আমি ব্যাক্যায় হইতেই কিঞ্চিৎ রক্তন-কার্যে পড়ি। আহাদের সময় শ্রেষ্ঠজী বলিলেন,—“আমায় পাটসে এরূপ রুই করিল কিরূপে? এমন মিরি রক্তী, এমন মিষ্ট ডাল, আমিও একদিনও খাই নাই।”

আমি বলিলাম, “অহা আপনায় তত দিন, তাই-এমন উই-রক্ত আহার্যদি সামগ্রী মিলিল।”

আমি যেমন রক্তন-কার্যে কিঞ্চিৎ দক্ষ, আহার-কার্যেও সেইরূপ দক্ষ। কাহারও বিশ্বাস হইবে কি না, জানি না,—সেই দিন আমি একসন্ম বসিয়া প্রায় হুইসের আটার রক্তী বাধিয়াছিলাম।

শ্রেষ্ঠজীর হুশ্রুণ্ড খাটে, হকোমল শয্যা, বামরা ছই ভাই শ্রুশন করিলাম। যথ শ্রেষ্ঠজী একুগুনি হুত খাটিয়ার উপর শুইয়া শুইলেন। তাই-শ-নাভ আমি ঘোর ঘুম অভিজুত হইলাম।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রদিনি অতি প্রত্যয়ে আমি উঠিলাম। যখন অঙ্গপোষ হইল না, যখন গাড়ে-পালার একই-আইট দল্লকার থাকে, তাহার বহুপূর্ব উঠাই আমার তদনকর অভ্যাস ছিল। আমি আজও সেইরূপ

উঠিলাম। দেখিলাম, ভায়া নিমিত্ত, শেঠীকি নিমিত্ত, পোস্তা-পাচক-চাকর সকলেই নিমিত্ত। ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। ঠিক দ্বারদেশে আট জন পদার্থ; তাহাদের মধ্যে কেহ বসিয়া নিমিত্ত, কেহ দৌড়িয়া নিমিত্ত, কেহ শুইয়া নিমিত্ত। আমি মনে মনে বলিলাম—“প্রবোধগণ। ভাল ভাল।” তেমনা আচ্ছাদনায়া বিচ্ছেদ। তেমনাদের মনিব বেশিলে এখন শলাখ মোহর গাওয়া তেমনাদের পূর্বস্বর দিবেন। বলীর বাগের মাধ্যম শাই যে, তেমনাদের কাজ দিয়া অন্য এখন পলায়।” তেমনা অন্য কত্বেয়া-পরাণবতার চার দুইভা দেখাইতেছি।

আমার কৌতুহল জ্বলিল। “মনে বড় হাসিও আসিল। অবশিষ্ট প্রবোধগণ কোথায় কি করিতেছে, জানিবার জন্য অন্তরে বড় সাধও জ্বলিল। শেঠীর বাল্যাল-বলীর চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। সেই প্রাচীরে কতকটা উঠিয়া, মুখ বাড়াইয়া, উকি মারিয়া দেখিলাম যে, প্রবোধগণ আমাদের পূর্বদে অধরেই হুইয়া বহু-নিম্ন বৃক্ষের তলদেশে সারি বানিয়া শুইয়া আছে। বৃক্ষ তাহাদের মায়ার বাগিন্—হইয়াছে। চর্যাধরনে আচ্ছাদিত তরবার। পান-বাগিন্ হইয়াছে। কাহারও মনে ডাকিতেছে, কেহ স্বপ্ন দেখিয়া আ-খা করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু নিভাভর কাহারও হইতেছে না। আচ্ছ। শেখ-রায়ে হুইয়া—ধূমের পীতভাই বা কি।

একই ছুট বুদ্ধি মনে আসিল। তাহালাম, প্রবোধগণদের একটা তিল মারিয়া দেখি না কেন, ইহারের ঘুম ভাঙে কি না। প্রাচীর হইতে একটা মাঝারি-আড়ার মাতার তিল দুইখিা লইলাম। গাছের উপর বেগে তিল দুইখিা। তিল শত-ভুটি হইয়া, কতকগুলি ধূমের মণ্ডিত, সোভরদের গায়ে আদিয়া পড়িল; কিন্তু খোচা বীরপুঙ্খ-পাণের তলোনা নাই। জনপ্রবোধগণ ওয় ভাগিল নাই। জনপ্রবোধ, কেহ কৌশল দিয়া ফিরাই শুইয়া, অধিকতর হুইয়া সন্তোষ করিতে লাগিল।

আমি মনে মনে করিলাম—“সিগাহীপদ।” তেমনাই ইংরেজের মণ্ডিত বৃক্ষ কবিরার উপকৃত পাত বট। যেমন “তেমনাদের শৃঙ্খলা, তেমনি তেমনাদের হুঙ্কলোনা।” তেমনাদের ওদের বালাই লইয়া মণ্ডিতে ইচ্ছা হয়।

আমি যদি ইচ্ছা করিতাম, তবে সেইদিন, সেই “সন্ধ্যা, ভায়াকে ও শেঠীজকে সঙ্গে লইয়া, অনুমতিসেই পলাইতে পারিতাম। কিন্তু অনেক

ভায়ায় চিত্তিয়া, বিচার বিতর্ক করিয়া দেখিলাম—এখন পলায়ন করা উচিত নয়।—পলাইয়া কোন-স্থানে বাইবে, তাহা কিং না হইলে, পলায়ন করা সুকিসম্ভব নয়। পলায়নের পর বলি হইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ নষ্ট হইবে। আর যেসব গড়কে দেখিতেছি, তাহাতে যখন চেষ্টা করা যাইবে, তখনই পলাইতে সম্ভব হইবে।

আমি প্রাচীর হইতে নামিলাম। বরের বারাদায় আসিলাম। তামাক খাইবার জন্য চকুমকি ইকিতে বলিলাম। দেখিতে দেখিতে পুখিরী অন্ধকার-ভাব একটু একটু কমেই মাগিল। টাকা খরাইয়া, তামাক মাজিয়া, কলিকাতে কুঁ দিতে অজ্ঞাত করিয়াছি, এমন সময় অল্পের এক মহাল কোলাহল-ধনি উভিত হইল। সে শব্দে কর্ণভর বিদ্যাই হয়। সে বিবর্তটামার মনে পড়িল গণনা পড়িল। সে “হর হর” শব্দ—সে “আলি আলি” শব্দ—“জয় কালী জয় কালী” শব্দ—সেই প্রমত্ত পলাদিক-সৈনিকদের পরধনি, সেই খেপ-খো খয়ের বরধনি, সেই বস্ত্রধূমের ব্যথিত ধনি—সমস্ত একত্র মিলিত হইয়া, যেন প্রমত্তকালের মহা কন্ডোল কোলাহল উপস্থিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শব্দ বৃদ্ধকরে একে অগোচর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তে মাথা শুভ্রম শুভ্রম শব্দে ভোমনাদে কামানের ভেঁবর নিলাহ হইতে লাগিল।

এ তিকে ভায়া কানীপদায়, কীচামুসে উঠিয়া, আতঙ্ক আঁবির হইয়া, শয্যায়া বসিয়া-বসিয়াই, “দাদা দাদা” শব্দ উচ্চারণপূর্বক চাঁচকার করিতে আরম্ভ করিল। শেঠীকি ভায়া-ভায়া হয়ে বলিলেন—“বামু মায়েহ। নেহি জানতে, আওর কাফা কামা বাড়ি হয়া। হামকো মালুম হোতা হায় কি, হাম লোগকা জান, কৈ সুবৎসে নেহি বঁচ সক্তা হায়।”

ভায়া একই সত্যের মধ্যালা রক্ষা করিতে হইলে, এইবার আরওই বলিতে হইবে যে, আমাদের প্রবোধগণ এইবার জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রথমত বাইয়া, বৃক্ষ বাড়ে করিয়া, ছোড়ভর হইয়া দাঁড়াইয়া—চলু কচলাইতে কচলাইতে ভিত্তি-বন্ধক হয়ে পরশ্পর পরশ্পরকে কেবল “কিডায়া কচলাইতে”—ক্যা হ্যা ভাই? ক্যা হ্যা ভাই? প্যায়েত পুর ক্যা হ্যা ভাই? অনবরত এইরূপ প্রবর্ত হইতেছে—কিন্তু উত্তর কেহ দিবেছে না।



আমাদের মন কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইল। “তারা আমি তামাক ছাড়িলাম না, ইচ্ছা-দণ্ডে কলিকা মালুম করিয়া, তামাক টানিতে টানিতে, দ্বারদেশে প্রবোধগণের নিকট আসিলাম। দ্বারদ্বারকে বলিলাম, “ভুমি আমাদের খোচা ছুটাইয়া প্যায়েত ভূমিতে প্রিয়া বেশ, কি হইতেছে। এখানে দাঁড়াইয়া বেগোলগের কলিক কি হইবে?”

দ্বারদ্বার আমায় কথা মত করিল। আমাকে সোমায় করিয়া আর হুইজন অবারোহী সঙ্গে লইয়া দ্বারদ্বারের দোড়িল। আমিও এক-শা এক-শা করিয়া, দ্বারদেশের বহির্ভূমিতে উপনীত হইলাম। এখন পুখিরী রঙ একটু সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে।

আমার বর্গধরনে কেহ বা দিল না। আমার অঙ্গের হইয়া, একটু উকি হানে দাঁড়াইয়া, এই মূখা বেগোলগ-কথা মনে করিতেছি, এমন সময় দূরত্ব একদল ঠেংহা হুয়া করিয়া উঠিল, “ভাই! ধবদব। ভাই! ধবদব।” গোরে আয়ে, “গোরে আয়ে।” ইহার অর্থ এইরূপ—“ইংরেজ-সৈন্য আমাধিককে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, ব্রহ্ম সতর্ক হও।”

এইবার সকলের মুখ হইতেই ভ্রমিতে পাওয়া গেল, “গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।” তখন আর কাহারও বিদিকৃদ্ধি জ্ঞান হইল না। নব্বইখি বিভী-মিকা-প্রমত্ত হইয়া যেন হাত-পা-হারা হইয়া চাঁচকার আরম্ভ করিল—“গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।” “গোরে আয়ে, গোরে আয়ে” শব্দে যেন আতঙ্ক, পাতাল, পুখিরী পূর্ণ হইয়া উঠিল। দৈনন্দন কি করিবে, কোথায় বাইবে, কিপু ভাবে দেখিবছ হইবে, তাহার কিছুই স্থির নীমায়না দেখিলাম না।

কোন দেখিতে লাগিলাম, রবণবীর স্বপ্ন ভনিয়া সৈন্যগণ বলে দলে প্যায়েত ভূমির দিকে দৌড়িতেছে মুছার উপকৃত পরিহ্রদ পোয়ে সৈন্তেরই অগ্রে দেখিলাম না। কাহারও পানে জুতা আছে কাহারও নাই; কাহারও মাল-কোঁচা-কাপা কাপা পায়, কাহারও পরনে ইজার, মাথায় একটা টুপি, কিন্তু কাহারও বাস্তবতা নাই। কেহ বা মল্লপূর্ণরূপেই মোক্ষমোহে মগ্নিত আছেন। কল কথা, অধিকাংশ লোকই অর্ধ-উপল ভাবে দৌড়িতেছিল। বলিতে সময় হয়, দৌড়িতে দৌড়িতে ইহা একজন বীরপুঙ্খ পূর্ণমাত্রায় উদ্ভব হইয়া গিয়াছিল।

গোরা অর্থাৎ ইংরেজ-সৈন্য আসিয়াছে ভনিয়া আমায় মনে অতুল আনন্দ হইল। ক্ষেপ্তর বা

হুইশত গোরায় মূর্ত্তি দেখিলেই বহু-বুদ্ধি সিগাহী-পদ ভয়ে পলাইবে, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস ছিল। ইংরেজ-আগমনেরে শুভবাহা ভনিয়া মনে মনে কতই হৃৎহর কথা কখন-কখন করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ স্বপ্ন পাইলাম, ইংরেজ আইসে নাই—গোরা আক্রমণ করে নাই; সিগাহীপদের উৎ কাশনিক ভয় মাজ। কোথায় বা গোরা কোথায় বা আক্রমণ। কেইই কোথাও নাই। সিগাহী-সদৃশপদ সম্ভবত অধিকারের ভূত দেখিয়া ছিলেন।

গোরা আমার বটনা এইরূপে বটে—ইংরেজের পলায়নে, গত রাতে সিগাহীপদ-মধ্যে হ্রদ আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। নাচ-গান রঙ্গ-তামাসা—সমস্তই চলিয়াছিল। সিদ্ধি-গাঁজা, চরন-চতু—কিছুইই অভাব ছিল না। “আমোদে-প্রমোদে,” আহায়ে-বিহায়ে, উদ্ভব হইয়া সোনাগণ কয়েকটা খোড়ো, কয়েকটা উট—হয়, বাগিতে ভূমিয়া দোড়িল। না হয়, আলো করিয়া বাঁধিয়াছিল। সেই উট ও খোড়ো দড়ী হিড়িয়া “গেছায়ে” গভীর গর্জন করিয়া চারিদিকে-ছুটাছুটা করিতে গাভীর মধ্যালা হইয়াছে। ইহারের ছুটাছুটিতে ভয়, বিহ্বল সিগাহীপদ, মনে-করিয়াছিল, “গোরা আসিয়াছে।” গোরা আসিয়াছে। ভনিয়া আর বাহাদুর কাহারও হইল না। তাহার পর পুরু-কথিতরূপ হৈ হৈ শব্দ পড়িয়া গেল।

এক অধিকার মধ্যে সুদূরত্ব ঘোরে, তলি চলাইতে গিয়া, সিগাহীপদ আমায়-অপনি-মোহে হুড়ি-পটিল “জানকে বুন-জঁধন করিয়াছিল।

অধিকৃতি মধ্যে দ্বারদ্বার প্রত্যগত হইল। সে ভূমিয়ারি বস্ত্র-বাঁহা বাড়ো ঘোব চালাল, এবং তাহার কতকগুলো নিম্বাবানও করিল; বলিল, “বস্ত্র বাঁহা সৈন্যদ্বারা ইহার উপকৃত ব্যক্তি নয়। কিন্তু সিগাহী তাহার প্রতি সহ্য নাই। তিনি কেবল নিশি-গর্জন-অংকুরে সদা মত্ত থাকেন। কোথাও কিছুই নাই, তিনি সিগাহীপদেরে এক-কি চালাইতে হুইন করিল, রামকী নিজ দলপ জ্ঞান লোককে বুন করিলেন। গোরা আসিয়াছে, কি খোড়ো ছুটা-ছুটা করিতেছে—ইহা তাহার অগ্রে দেখা উচিত ছিল। তিনি বহুই অসুস্থ নাই। কেবল তাহারই পোষাকের এক হুইয়া বাঁধিয়াছে।” আমি এ কথাব কোন উত্তর দিলাম না। ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশপূর্বক, কলিকা চক্ষিয়ার পুন্যায় তামাক মাজিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রভাত হইল। দেখিতে দেখিতে হৃদ্যেব
নান্যেধে পুর্বাধিক উদিত হইলেন। অর্থাৎ ১৮৫৭
বাসনের ১৩৩ জন্ম সোমবার—বৈশাখের সিংহাষা-
বিজোহের একদিবস প্রভাত হইল—বিতীয় দিবস
আমিল।*

আকাশ।

আকাশ।*

জীবনের কত যার ধন কত কি রহন
না জানি তোমার কাছে;
বারবার তাই এক মনে চাই তোমা পানে
কে তাহা কি ভাসে আছে।

নাহি জানি ও কেমন দেশ, কোথা গুর শ্রেয়
পরম জানিতে চায়;
বলে দাও এখানে বাহার কি হবে তাহার
হানে নাচে কাঁদে যায়।

হোথাও কি হৃদ্যকর-আপে পূর্ণরস-পাপে
মলিনী জলিয়ে মরে ?
হোথাও কি ফলী হইলে, হাসিয়ে উঠিলে,
ফুলটী করিয়ে পড়ে ?

* প্রকৃত চর্যাসদ বন্যোপাখ্যার মহাপ্রবল জীবন-
রক্তার অর্থ। “আমার জীবন-চরিত্র” যাহাতে প্রতি-
মানে আরও স্বদিক পরিমানে প্রকাশিত হয়, তা-
শব্দে সেরী করিতে অনেক প্রার্থনা আমাদিগকে পড়াই
কিহিতাহে। প্রকৃতপক্ষেই প্রার্থনা দেখিয়া, আমাদের
উচ্ছ্বাস বটে যে, প্রতি মাসে আশ্বিন ২৫ বা ৩০, পূর্ণী করিয়া
“আমার জীবন-চরিত্র” প্রকাশিত হয়। এদিকে জীবন-
চরিত্রও নৈশা প্রস্তুত; এবং যথ্য চর্যাসদ বন্যোপাখ্যার
সুখস্বপ্নও নৈশা উপস্থিত। সূত্রগাং “আমার জীবন-
চরিত্র” কল্পভূমিতে স্বদিক করিয়া বাহির করিয়ে
হইল। কিছু কথা এই—জন্মভূমিতে প্রতিমানে নানা
বিষয় পরিবেশিত করিতে হয়—সে বিষয়গুলি না
বেশক, মাসিক গল্পের প্রবাহান হয়। কাজেই
বার চৌক পূর্ণী বৈশাখ “আমার জীবন-চরিত্র” কল্পভূমিতে
প্রকাশিত হয় না। বৈশাখ পূর্ণীমাসের নান্যাদি-পূর্ণ
অনৈতিক জীবন-চরিত্রের প্রতি মাসে যথ্য মাত্র প্রকা-
শিত হইয়াছে—এমনও অনেক বাকী। মিউনির
ইতিহাসের অনেক বহুত ইহাতে প্রকাশিত হইবে।
প্রকৃতপক্ষে বৈশাখমাস কল্প।

হোথাও কি প্রেম-উষাদিনী হুমহুম্বিনী
এমনি চাদের তে—
প্রতিদিন আসিয়ে বলিয়ে, বাসর সাজিয়ে
বামিনী ব্যাগিয়ে মরে ?

হোথাও কি দোষান নায়ক শশাঙ্ক-মুন্দর
আরাধনে মজে রই,
হুম্বিনী দেখিয়ে ভুলিয়ে দরিতে রহিয়ে
(তবু) ভালবেসে স্থা হয়।

হোথাও কি শালগ্রাম-মহ লক্ষ্মীর বিবাহ
—বিধাতার খটকাল,
হোথাও কি বোঝা-বোঝা মহেশ-বনিতা
উলটী স্রামাদী কালী ?

হোথাও কি হাসিতে হাসিতে নয়ন-কোণেতে
অশ্রু-কণা দেয় দেখা ?
হোথাও কি আশায় নিরাশ, ভোপেতে উদাস,
প্রণয়ে কলঙ্ক-লোভা ?

আকাশ।

যখনই হেরে পুতলী এই আমি বলি,
কীকি দিয়ে চলে যায়;
তখনই সজল নিশ্চল নয়ন-মুগল
তোমার পানেতে চায়।

যখনই হৃদয় ভাবযাসা গুপ্ত সাধ-আশা
বিলে ভাবিতে যাই,
তখনই প্রত্যেক জুগলে স্ব স্বল-নয়নে
তোমার পানেতে চাই।

যখনই রজন ভুলিতে অশ্রু-দোষেতে
শব্দক হুহিয়ে লই,
তখনই তোমার পানেতে চাহিতে চাহিতে
নিশা ছাড়িয়ে যাই।

যখনই ফুলটী তুলিতে, একে একে হাতে
নগণকি ধরে আসে,
তখনই গোলাকি নাম সান্তনা কারণ
দোড়ায় তোমার পাশে।

যখনই হৃদয়ের স্বপন ভাসিলে, নয়ন
ঈশ্বরের দেখিতে পায়,
তখনই বাহিরে আসিয়ে বিলে বসিয়ে
তোমার পানেতে চায়।

যখনই বিদ্য-কল্যাণ করে ভূমিমাং
আশায় হৃদয়-তালি,
তখনই তব পুণ্যচর্য বোঝি, লবর
যায় সমুদয় ভুলি।

যখনই হৃদয় প্রবল জগৎ-মিলন
পুড়িয়ে করয় ছাই,
তখনই তোমার উপরি রমা-হৃদয় পড়ি
সকল পাশরি যাই।

আকাশ।

বড় সাধ তাজি এ সংসার পাপের আগার
তোমার দেখেতে যাই,
যেখানেতে বিলাপ-উজ্জ্বল, হতাশ-নিবাস,
দুঃখাশ-উদ্ভাসের নাই।

বড় সাধ তাজি এই সব বিষয় বিভব
মিকা-দুরানীর বেশ,
বড় সাধ হাসি মাচি যাই, বেড়িয়ে বেড়াই,
না থাকে ভাবনা-লেশ।

বড় সাধ মেঘ-আগোহনে পানিনীর সনে
সিঁহরি প্রমুদন দেশ,
বড় সাধ পূর্ণিমার স্নেহে নিরজন পথে
বেড়াই পরীর সনে।

বড় সাধ নেহারি রোহিণী শ্বি-বিনোদিনী
লইল তাহার তরে,
বড় সাধ সীমের বোলায় হেরি তব পায়
চিত্রপট সারি সারি;

বড় সাধ নিকটে যাইয়ে পরায় ভরিয়ে
ইন্দ্রধনু-শোভা হেরি,
বড় সাধ হেরি শটন-চর জ্যোতিষ্ক-মুন্দর
গুপ্ত মুখটি হেরি,

চারিধারে রাস-পূর্ণিমার অষ্ট সখী প্রায়-
অষ্ট চন্দ্র আছে হেরি।
এখানেতে এক চাঁদ নিয়ে জলিয়ে পুড়িয়ে
বিরহ-জীবন যায়,

এখানেতে এত চাঁদ নিয়ে যেমনে বাচিয়ে
রয়েছে তাহারায়।
আরো কত শত শত গ্রহ ভরে অহরহ,
দেখিবার সাধ যায়,

ভরা সনে রক্ত, নীল, পীত আলাকে রক্তিত,
প্রদীপ্ত প্রকাণ্ডকায়।

আকাশ।

বড় সাধ বাসন্তী নিধার পুণ্য-পূর্ণিমায়
তব চক্রাতপতলে
তবৈ থাকি প্রিয়জনসনে বিভুগুণপানে,
প্রেমের আবেশে গলে—

বড় সাধ মলয় আসিয়ে শিরের বসিয়ে
চামর চুল্লার ঘোর;
বড় সাধ সে হৃদ-শরমে যেমের স্বপনে
হই রে রজনী ভোর।

আকাশ।

বড় সাধ তোর দেখে যাই মন গুলে পাই
সরস-মধুর-গান,
বাধা-কল্প লোকের লজ্জায় সরসের দায়
রাহিতে পারি নি প্রাণ।

বড় সাধ সে মদ্যাত্ত ভনি, মাতার অবনী,
যমুনা উজ্জ্বল বয়;
সংসারের এত কাণ্ডকাণ্ডি, কটাক্ষ চাহনি
নিমেষে নিশ্চল হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বাল্যাবস্থা।

সত্য গ্রহ নব মদে। ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ণা-
ভাস জন্মগ্রহণেই। কলকাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়
জন্মগ্রহণ করিলেন; দিন দিন শশি-কলাসম বর্ধিত
হইতেলাগিলেন; মৃদু মৃদু পিতা ঠাকুরদাসেরও
ভাণ্ড-শ্রী শব্দভিত্তি হইল। ঠাকুরদাসের স্বব-
স্বপ্নপূর্ণ উন্নতি লাভ করিল; হৃদয়গা ধীরে
ধীরে অদৃশ্যে ধীরে আদর্শের হৃদয়ে একটী লক্ষ্য-
শ্রীও দেখা দিল। পাতার পাতায় সব উল্লিখ-
“বাঁধুঘোষের বাড়ীতে পরহস্ত ছেলে জন্মিয়াছে।”
“পদমস্তক” প্রতিপত্তি বিদ্যাসাগরের বাল্যকাল
হইতে। বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রতিবাসীর
প্রীতিভাজ।

* পিতামহ রামজয়, বিদ্যাসাগরের নাম রাখিয়া-
ছিলেন—ঈশ্বর। পঞ্চম বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যার
হয়। তখন বীরসিংহ প্রাচীর-অবস্থা তালুত উন্নত
ছিল না। প্রাচীর পাঠালেই বালকবিরোধ বিদ্যার

ঐশ্বর্যবাসকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বিদ্যা-
সাধনে মগ্নবশে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তাঁহার
মৃত্যু হয়। জনসংস্কৃত বাবু পিতার ভ্রাতা ঐশ্বর্যবাসকে
কলিকাতা, এমন কি তাহাকে পিতৃ-সম্মানেষণও
করিতেন। জন্মদুর্ভাগ একমাত্র বাবাষ্টা কষ্ট।
বয়স তাঁহার তখন ২৫ বৎসর মাত্র। গ্রুইথি, ফোটা
ভগিনী, তাঁহার বান্ধবী এই পুত্র, এক বিধবা কনিকা
ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র, এইমাত্র তাঁহার
পরিবার।

বালক ঐশ্বরচন্দ্র এই পরিবারের বৃহৎ প্রীতিপাত্র
হইয়াছিলেন। প্রীতির পূত্রপাত পরদিন প্রাতঃকাল
হইতেই হইয়াছিল। বালক নিজের অসুস্থ ধারকতা-
শক্তি বলে নিঃশব্দ-পরিবাহকের বাতীর ব্যক্তিগণকে
ভুক্তিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যিন সন্ধ্যার সময়
বালক ঐশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন,
তাঁহার পদবিন্দু পিতা ঐশ্বর্যবাস, জন্মদুর্ভাগ বাবু
কয়েকবার নিঃশব্দে বিলম্বিত দিতেছিলেন।
বালক ঐশ্বরচন্দ্র বলিলেন, “বাবা আমি ইহার
কিছু পারি।” কেবল বলা নহে, সভ্যসভায় বালক
কিছু পারি। বিনীত গিয়া নিলেন। একটীও
ভুল হয় নাই। উপস্থিত ব্যক্তিগণ চমকিত হই-
লেন। কালীকান্ত ঐশ্বরচন্দ্রের মূর্ত্তবন্দন করিয়া
বলিলেন, “বড় ঐশ্বর্য। তুমি চিরজীবী হও।
তোমার যে আমি অন্তরে সহিত ভাল বাসিতাম,
আজ তাহা সার্থক হইল।”

মানব-জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে
ইহা বড় বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয়। অনানু-
প্রতিভাসম্পন্ন বা অধ্যব-বিদ্যার পূর্ণাবস্থা বসন্তব্যাক
ব্যক্তিই ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ণাবস্থার পরিচয়
এইরূপ বাল্যে পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ জীবনে
সাঁধার যে শক্তির জড় প্রতিপত্তি, বাক্য-জীবনে
তাঁহার সেই শক্তির অনুরোধে গতি এই জড়
মিলটন করিয়াছেন—

“The childhood shows the man as
morning shows the day;”

ওয়ার্ডগার্লও বলিয়াছেন—

“Child is father of the man.”

কবি ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নাত-আত-বৎসরের সময়
কলিকাতায় বনসী জন্মেন। তখন একজন তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“ঐশ্বর্য, কলিকাতায় কেন
আছ?” তদবর্তী কবি উত্তর দিলেন,—“রেতে মশা,
বিনে মাছি, এই নিম্নে কলকাতায় মাছি।”

জন্মমূহুরে অসুস্থতা তখন মৃত্যু ধারকতাশক্তির
প্রতিভা সর্বদা কালি অধিক ছিল। বনসী জন্মনর
বালক সর্বদা লেগে পড়া লিখিতে আরম্ভ করিয়া-
ছিলেন; সেই সময় একদিন তাঁহার মাতা,
তাঁহাকে একবার প্রাণনা-পুত্রক মুখের করিতে
দেন। মুখের করিতে বলিয়া মাতা যেমন উপরে
উঠিলেন, অননন পুত্র পশ্চাত পশ্চাত দিয়া
বলিলেন,—“মা মুখের করিয়াছি।” সত্য সত্যই
বালক পরিবারকে মুখের বনিয়া গেলেন।
তিনি দুইবারমাত্র পুস্তকবিন্দু পড়িয়াছিলেন।
পোষ ১২ বৎসর বয়সে কবিতা লিখিয়াছিলেন।
বাল্যকালে তিনি কবিতা লিখিতেন; তাঁহার পিতার
কিছু তাহা অভিপ্রেত ছিলনা। এইজন্ম পিতা
তাঁহাকে কবিতা লিখিতে নিষেধ করেন। পোষ
কিছু তাহা তর্কিতেন না। এক দিন তাঁহার পিতা
এই জন্ম তাঁহাকে প্রবোধ করেন। প্রবোধ বয়সেও
বালক কবিতায় বনিয়া ফেলিল—

“Papa papa pity take,

I will no more verses make”

“মিলটন বাল্যকালে যে পদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা
দেখিয়া প্রসিদ্ধ লেখকগণও লজ্জিত হইয়াছিলেন।
বিদ্যাত বিদ্যাত। কায়িকের *Mechanic* শিল্প ছয়
বৎসরে বয়সে কলের ছাত প্রস্তুত করিয়াছিলেন।
এরূপ দৃষ্টান্ত অসম্ভব পাইবে। এ সব অসম্ভাবিক
লজ্জিতই পেরে। ইহা এইমাত্র ভাবিতে ভাবিতে
কত কথা বলা চিত্তাশীল শক্তিশালী দার্শনিকের
জীবনগাত হইয়াছে। মুক্তি-বুদ্ধির জ্যোতিঃ
বা ক্রমবিকাশকে লইয়া, কত দার্শনিক ইহ-জগতের
সুখেরই ভোলাবাস্য পরিচয় করিয়া চিত্তার
অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছেন। আসার সূত্র ভাঙি,
তাঁহার কি মীমাংসা করিব? তবে যখনই দেখি,
তখনই বিশ্বাস-বিকারিত নেড়ে চাহিয়া থাকি;
এবং ভাবিয়া অকল সমুদ্রে নিমগ্ন হই। সে
বিচার-বিতর্কের শক্তি নাই; এবং তাঁহার প্রবৃত্তিও
নাই। সবই প্রায়ঃকরণের ফল বলিয়া বুঝি;
এবং তাহা বুঝিয়াই নিশ্চিন্ত হই।

বাবা হউক, বালক-বিদ্যাদাসের মুক্তি-বুদ্ধির
পরিচয় পাইয়া উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইলেন।
সকলেরই অনুরোধে, ঐশ্বরচন্দ্রকে কোন একটা ভাল
স্থানে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হউক। পুত্রের প্রশংসা-
বাবে পিতার মন প্রোত্খিত হইয়া উঠিল। তিনি

“Ode on solitude,

বলিলেন,—“আমি ঐশ্বরচন্দ্রকে হিন্দু স্থলে পড়াইব।”
উপস্থিত সকলেই বলিলেন,—“আপনি ১০ টাকা
মাত্র বেতন পান, আপনি ৫ টাকা বেতন দিয়া
কিভাবে হিন্দু স্থলে পড়াইবেন।” ঐশ্বর্যবাস বলি-
লেন,—“২০ টাকার বেতনই হউক, সংসার চালা-
ইব।” ঐশ্বর্যবাসের স্বয়ং তখন উৎসাহের প্র-
দীপ্ত অনল-নিশায়া উদ্ভাপিত। বাণেশ্বর প্রতিভার
কথা মরণ করিয়া, ত্র্যাক্ষণ বাণেশ্বর দায়িত্ব বিমুগ্ধ
হইয়া গেলেন। দরিদ্র ত্র্যাক্ষণ পুত্রবিন্দে পূর্বভাবে
নিমগ্ন। ঐশ্বর্যবাস, পুত্র ঐশ্বরচন্দ্রকে হিন্দু স্থলে
পড়াইবেন বলাই স্বির করিয়া বাধিয়াছিলেন।
কিন্তু তিন মাস কাল তাহা আর ঘটয়া উঠে নাই।
এই তিন মাস কাল বালক-বিদ্যাদাসের, নিকটবর্তী
একটা পাঠশালায় বাইতেন। এই পাঠশালায় এক-
মাত্র মাসের মধ্যে বিদ্যাদাসের বহুমান প্রভিত
কৌশল-চরিত্রে লিখিয়াছেন,—“পাঠশালায় শিশুক
গুরুপদে বস, বীরসিংহের শিশুক কালীকান্ত
স্বদেশপাঠ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষালান বিষয়ে, বোধ হয়,
অধিকতর নিপুণ ছিলেন।”

“কর্তব্যে মহাদাশ্রয়” মহাজনের এই মহাবাহী
অম্বস্ত-পালনায়। এ বাবীর সাধাক্ষণ প্রত্যকী-
ভূত হইয়াছিল, বিদ্যাদাসেরের বাল্য-কৌশলে।
জন্মদুর্ভাগ নিঃশব্দে, যে পিতা-পুত্রকে আশ্রয়-
মাত্র দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার পরিবারবর্গ
ওই বিনীত স্বয়ং তাঁহাদিগকে কখনই সুমাধুর
করিতেন। জন্মদুর্ভাগ বাবুর কনিকা ভগিনী রাইমণি,
বালক ঐশ্বরচন্দ্রকে পুত্রপক্ষাও ভাল বাসিতেন।
এই মতই সখে বিদ্যাদাসের মহাশয় স্বয়ং বলিয়া-
ছেন,—“যেহ দয়া, সৌভাগ্য, অসাময়িকতা, মল্লিচেন্দ্র
প্রভৃতি সৎগুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ ত্র্যাক্ষণ
এ পর্যন্ত আমার নয়ন-পোচের হয় নাই। এই
দামারীণ সৌম্যমুখি, আমার স্বয়ং-মন্দিরে, দেবী-
মুখি ভ্রাতা প্রভৃতি হইয়া বিরামলায় গিয়াছেন।
প্রাসঙ্গ্যে তাঁহার কথা উদ্ভাপিত হইলে, ভগ্নায়
অকৃত্রিম তপস্বীর কীটন করিতে করিতে অশ্রুপাত
না করিয়া থাকিতে পারি না।”

বাতবিকই রাইমণির সেই অকৃত্রিম বহু-দেহ
ব্যতিক্রমে বিদ্যাদাসেরের কলিকাতায় বাসা দায়
হইয়া। তিনি কেহমতী কলিকাতা ও পিতামহীর
কথা ভাবিয়া এখন প্রাণন বড় ব্যাকুল হইলেন।
পিতা ঐশ্বর্যবাসও সর্বদা তাঁহার নিকট
বাঞ্ছিত পারিতেন না। তিনি প্রাতঃ এক প্রহরে

সময় স্বয়ং বাইতেন এবং রাত্রি এক প্রহরের
সময় বাসায় কিরিয়া আসিতেন। এই সময়
কলিকাতা এবং জন্মদুর্ভাগ বাবুর অসুস্থ পরিবার নিরি-
বাহার পিতাকে জুলাইয়া রাহিতেন; এবং নামাধার
আহার্য ও অসুস্থ মন-ভুলান “জিনিফর” দিয়া,
কায়িক সন্তান করিতেন। এইরূপ অনেক
দীনদীন বালকই মহাদাশ্রয়ে থাকিয়া, প্রতিপত্তি
হইয়া, পরিবাসে কীর্তিমান হইয়া গিয়াছেন।
কোটিভিত্তি রামদুর্ভাগ সরকার বাল্যকালে ঘনি
হাটখোলায় “সেই মাদার দত্ত-পুরিবারে প্রতি-
পালিত না হইতেন, তাহা হইলে একে স্বহৃদে
পারে, তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে অসুখ ধনের অধিকারী
হইয়া, অসুখ কীর্তিসময়ে সন্ধ্যা হইতেন।
আহা। রামদুর্ভাগ বাল্য-দারিয়া এবং সেই
দত্ত-পরিবারের তৎপ্রতি সান্নাধ্যতর কথা মরণ
হইলে, মর্মে এক অন্তিমতার তাবের উত্তর হয়।
শিলাভর বিখ্যাত একজন জীবনীকার এই বড়
বাল্যকালে তর-উইলিয়াম-হামিলটনের আর্ডার না
লইতেন; এবং রাষ্ট্রপতি পতিত-হিম স্বয়ংপিতার
মাঠে না থাকিতেন, তাহা হইলে এক অসুস্থতা হইয়া,
মুটিতেন কি না মনে।

বালক-বিদ্যাদাসের অগ্রহাণু রাসে কলিকাতায়
আসিয়াছিলেন; কিন্তু কলকাতায় আসিলে
রক্তাক্তার রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে পিতা
এতদূর উৎকর্ষ হইয়া ঈর্ষাভিগ্ন হইয়া, কলকাতায়
গেলেন তিনি সুখী সাধান হইতে পারিতেন না।
তাঁহার পিতাকেই অনেক সময় বহুদেহ কলকাতায়
পরিবার করিতে হইত। এই পিতার দুর্গতি
কবিতা তাঁহার চিকিৎসা করেন; কিন্তু রোগ
উত্তরোত্তর বৃদ্ধ হইতে লাগিল। বীরসিংহ প্রাণে
মরণ গেল। পিতামহী মরণ শাহীয়াই কলি-
কাতায় উপস্থিত হইলেন; এবং এই তিন দিন
বাঁকিয়া ঐশ্বরচন্দ্রকে বাঁজা গিয়া গেলেন। শুধু
মাত্র আট দিনের মধ্যে বিনা চিকিৎসার তাঁহার
রোগ পালিয়া গেল।

শোশাধীস পিতৃ ঐশ্বরচন্দ্র বাড়ীতে ছিলেন।
জ্যোতিষের প্রাতঃ “পিতা ঐশ্বর্যবাস তাঁহাকে
“নুনায় কলিকাতায় শ্যাননবর্গ বীরসিংহ প্রাণে
মরণ করেন। এবারও হাটখোলা বাসা শির হইয়া
পূর্ববারে মদে ভূত ছিল।” ভূত মধ্যে মধ্যে
বালককে ভাঙে করিয়া আনিয়াছিল। একই পিতা
জির্জানিলেন—“কেন ঐশ্বর্য। তুমি চলায় গাইতে

পারিষেদা আনন্দরামকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বালক বাহাদুরী দেখাইয়া বিদ্যালয়, —“না, আমি চালাই যাইতে পারিব।” বিদ্যালয়ের বাহাদুরীর পরিচয় বাল্যকাল হইতে।

এবার পিতাপুত্র চলিয়া আসিয়া প্রথম দিন পাণ্ডুলিপি আশ্রয় লইলেন। পাণ্ডুলিপি বীরসিংহ হইতে ছয় কোশ দূর। ঈশ্বরচন্দ্রের এদিন চলিতে আর কত হয় নাই। তারকেশ্বরের নিকট রাম-নদর এখানে ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতি লভ্য অসুখপোষে যেখানে বাহবার প্রয়োজন হয়। কতটা পীড়িত হইয়াছিলেন। রামনদর, পাণ্ডুলিপি হইতে ছয় কোশ দূরকণ্ঠ। পিতাপুত্র দুই জনে এতখানেক লেই রামনদর স্মৃতিমুখ্য ব্যক্তি করিলেন। তিন কোশ পথ দিয়া ঈশ্বর আসিয়া চলিতে পারিলেন না। পা টাইয়াই ছলিয়া গিয়াছে। পিতা বিশপদপ্রস্ত হইলেন। তখন বেগা দুই প্রকরের অধিক। ঈশ্বরচন্দ্র তখন এক রকম চল-শক্তি হইল। পিতা বলিলেন—“বাবা! একটু চেষ্টা, আরো মার্চে ফুট-ওরুম্ব খাওয়ারে।” ঈশ্বরচন্দ্র অতি কষ্টে প্রাণপণে ছিট্টিয়া, অগ্রসর হইলেন; এবং সেই মর্দের কাছে গিয়া ফুট-ওরুম্ব খাইলেন। পেট ঠাণ্ডা হইল বলি, পা কিন্তু অা উঠিল না। পিতা-ঠাণ্ডা করিয়া প্রত্যেক কেলিয়া কিয়কুট চলিয়া গেলেন; কিন্তু আবার কিরিয়া আসিয়া, প্রত্যেকদিন পুত্রকে ধরে করিয়া লইলেন। দুর্লভপণে পিতা, অষ্টম বছরে সপল বালককে কতরূপে করিয়া লইয়া থাকিতেন—খানিক দূর পিয়া, আবার ঈশ্বরচন্দ্রকে ধাঁধ হইতে চম্পাচিয়া গিলেন; বিরক্ত হইয়া দুই একটা নাস্তাখাও করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন শ্রিত্ত আর কি উপায় ছিল? এখন একেবারে চল-শক্তি-হীন। পিতা আবার পুত্রকে ধরে করিলেন; এরূপ একবার ধরে, করিয়া, একবার নামাইয়া, একটু একটু বিদ্যাসাগর চলিতে পারিলেন। এইরূপ অবস্থায় ‘ভাষার সন্ধ্যার’ পুত্রের রামনদর উপস্থিত হন। পরদিন তাহার শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিনের কলিকাতার আসিয়া উপস্থিত হন।

এইবার আবার বিদ্যালয়ে ভর্তি করিবার কথা। পিতা ঠাণ্ডায়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে যত্নসহ শিখাইয়া, মনস করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, বিদ্যালয়পর যত্নসহ শিখিলে, দেশে টোল করিয়া দিব। এই সময় মনুষ্যের বাচস্পতি সঙ্কটকালে অগ্রসর কর-

তেন। তিনি বিদ্যালয়ের মহাশয়ের মাফুল রাখা-মোদনে বিদ্যালয়পুত্রের শিখা-পুত্র। মনুষ্যের বাচস্পতি, ঠাণ্ডায়াসকে পরামর্শ দিলেন—“বিদ্যা-মাদরকে সংকটকালে ভর্তি করিয়া দাও। ইহাতে সংকট মিলাত হইবেই; ‘অধিকন্তু’ ‘ক’ করিবার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে, আদালতের জজ পণ্ডিতীর পথ পাইতে পারিবে।” এই সময় ঠাণ্ডায়া মাদর সংকট কালেই বিদ্যালয়পুত্র বদাধর তর্কবাক্যের সাহিত্যে এতখানেক ‘পরামর্শ’ করিয়া-ছিলেন। শেষে সংকট কালেই দেওয়াই স্থির হইল।

কলেজে পাঠাধ্যয়ন।

হইতেক ১৮২১ সালে জুন মাসের প্রথম দিনই ঈশ্বরচন্দ্র সংকটকালেই বিদ্যালয়-বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। তখন ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন, হুমায়াউনবাদী পণ্ডিত ঠাণ্ডার তর্কবাদী। পিতা ঠাণ্ডায়াস, প্রত্যহ ১০টার সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজে গিয়া আনিতেন; এবং অপরূহ ১০টার সময় লইয়া যাইতেন। ছয় মাস কাল এইরূপই করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ঈশ্বর চন্দ্র বয়সই কলেজে যাতায়াত করিতেন। ছয় মাস পরে ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ৫ টাকা বৃত্তি পান। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে ‘বীজ’ ছিলেন। ছাত্তা মাখা দ্বিতীয় চলিয়া গিয়ে মনে হইত, যেন একটা ছাত্র হইতেছে। তাঁহার মাখাটা বেহেরে অল্প-পাতে একটু বড় ছিল। এই জন্ম বালককে তাৎকাল ‘বস্তরে কৈ’ বয়সী দেখাওঁত। বালক ঈশ্বরচন্দ্র মনসরভরের বিজ্ঞপোক্তিতে বড়ই বিরক্ত হইতেন। অনেক সময় রাগে ক্রুদ্ধ-মুখ হইয়া উঠিতেন; কিন্তু কথা কহিতে, রাগে অা হাফস্পন্ন হইয়া পড়িতেন; কেননা তিনি তখন বয় ‘তোতা’ ছিল। সেই জন্ম মনে মনে কথা উচ্চারিত হইত না; এবং এক একটা কথা উচ্চারণ করিতে কালবিলম্ব হইত; হতভাং তাহাতেই মনসরক্ত বালককে। বাসির মাত্রা চড়াইয়া বিদ্যালয়ের মাত্রাও বাড়িয়া উল্লিত। জন্মে ‘বস্তরে কৈ’ নামটা ‘কহুয়ে জৈয়ে’ পরিবর্ত হইয়াছিল। বালককে তখন কি বুঝিত,—এই মাথা মোটা, ‘বস্তরে কৈ’ কালে বস্তুর একজন দ্বিতীয় পুত্র হইবে। তাহা’কি তখন বুঝিত, মাথা অপেক্ষা বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ক্ষুদ্র ক্রম হইবে।

বালক-বিদ্যালয়পর কলেজে যাহা শিখিয়া

আমিহেন, রাজি কালে প্রত্যহ পিতার নিকট তাহারই আভূতি করিতেন। পিতা ব্যাকরণ জানিতেন না। প্রত্যহ পুত্রের আভূতি ভূমিরা-ভূমিয়া ব্যাকরণে তাঁহারও অভিজ্ঞতা জ্ঞানিয়াছিল। এমন পুত্র কোন কথা বিদ্যুত হইলে, পিতা তাহা শব্দ করাইয়া দিতেন। পুত্র বুঝিতেন, পিতা তাঁহার ব্যাকরণে মনসে যৎসংপূর্ণ। পুত্রের নিকট পিতার শিখা; এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল হইত। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যালয়পরিতা মনসরভরকে, পর-সেবা-নিরত হইয়াও, পিতা ঠাণ্ডায়াস এক মুহুর্তের জন্ম কোনরূপ ত্রুটি করিতেন না। কাধ্যাহনের কটোর পরিসরেও, তিনি ক্রান্তি বোধ করিতেন না। রাজি ১০টার পর বাসায় কিরিয়া আসিয়া তিনি রন্ধনাধি করিতেন; এবং পুত্রকে বাওয়াই আপনি যাই-তেন। তাহার পর পিতা-পুত্র একত্র মনস করিতেন। শেষ রাত্রে পিতা, পুত্রের পঠিত বিদ্যার পণ্ডা-লোভা করিতেন; এবং পরমুখ-শ্রুত নিজের অভ্যন্তর নানাবিধ উচ্চ শ্রোত পুত্রকে শিখাইতেন। যে দিন বাসায় আসিয়া তিনি দেখিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র যুয়াইয়া পড়িয়াছেন, সে দিন তিনি তাৎকাল নিদাধর প্রহার করিতেন। সকলে সময়ে বালককে আনন্দেই সিংহ-পরিবার উদ্ভাব্য হইয়া উঠিতেন; এবং ঠাণ্ডায়াসকে বলিতেন,—“এরূপ প্রহারে হতে বালক কোন দিন মারা যাইবে; ‘অতঃপর যদি একজন কৈ, তাহা হইলে এখান হইতে তোমাকে দূরত্বের যাইতে হইবে।” ইহাতে প্রহারের মাত্রা কিছু কম-হইয়াছিল। বালক ঈশ্বরচন্দ্র অনেক মাখান হইয়া চলিতেন। পুত্রকে নিজা আসে বলিয়া, তিনি আপনাকে চক মরিয়া তেল দিতেন। তেজের জালায় নিজা গলায় করিত। এই সময় বর্তমান মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যুম ভাষাইবার জন্ম বাল্যকালে এইরূপ ও ভদ্রভাটুয়ায় অবলম্বন করিতেন; ইহাও আসার জ্ঞান। লোককণ্ঠে কোন বজ্জ বাল্যকালে যুয়াই-বার পূর্ণের পাত্রে দড়ি বাধিয়া রাখিতেন। দড়ির টানে নিজা জ্ব হইলে, তিনি পাত্রেভায়ে রত হইতেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী; এবং এখনে একজন উচ্চবেদ-ভোগী উচ্চপদ কর্মচারী।

ব্যাকরণ-শ্রেণিতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র অল্প ছাত্র

বিত মুখপত্র সেখিয়া অধ্যাপক তাঁহার উপর বড় সন্তুষ্ট থাকিতেন; এবং পাঠাতে আপনায় নিকট যাইয়া উচ্চ শ্রোত শিখাইতেন। পিতা ও অধ্যাপক নিকট ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় চার পাঁচ শত উচ্চ শ্রোত শিখাইয়াছিলেন।

ব্যাকরণ-শ্রেণিতে তিন বৎসরের মধ্যে তিনি দুই বৎসর উত্তম পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; এক বৎসরের পান নাই। যে বৎসর পারিতোষিক পান নাই, সেই বৎসর তিনি মনসকোভে ও অভিজ্ঞানে সংকটকালে পরিচাল্য করিবার সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা ও অধ্যাপককে অহুতোষে পানেন নাই। এ বৎসর যে তিনি পারিতোষিক পান নাই, তৎসময়ে তদীয় জন্মের শ্রুত বিদ্যায় তাহার এইরূপ লিখিয়াছেন,—“ঐ বৎসর প্রাইস্, মাহের পৌরুষ ছিলেন।” মাহের ভাল বুঝিতে পারিতেন না। দারা যাহা উত্তর করিতেন, তাহা ভালমুখ বিবেচনাপূর্ণক করিতেন; তাহা নিলু হইয়া। যে বালক বিবেচনা না করিয়া, তাড়াতাড়ি বলিয়াছিল, তাহা ভালই হউক, আর মনসই হউক, মাহের তাহাকে বুদ্ধিমান জ্ঞানিয়া প্রাইজ দিয়া-ছিলেন।” সংকট ব্যাকরণ পরীক্ষার মাহের-পৌরুষ সন্তুষ্ট এরূপ হওয়া যে অসম্ভব, এমন নাই।

এই সময় বালক-ঈশ্বরচন্দ্র—“একজন্মেরী” ফুটতে আরম্ভ হয়। এই “একজন্মেরী” দ্বন্দ্ব পিতা ঠাণ্ডায়াস অনেক সময় উচ্চ হইতেন। পিতা বলিলেন,—“কখনা কাপড় পরিয়া খুলে দাও।” ঈশ্বরচন্দ্র বলিত,—“মরণা কাপড় পরিয়াই যাইবে।” এই দিন বালক-ঈশ্বরচন্দ্র দান-করিব না বলিয়া মন করিতেন, সে দিন তাঁহাকে দান করান বড়ই দৃষ্ক হইত। পিতা তাহাকে ‘বলপূর্ণক বয়সী দিয়া গিয়া, হস্ত বাটো বলপূর্ণক দান করাইয়া দিতেন।

অন্ত কোন গুরুজন কোন কথা বলিলে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র যদি মন করিতেন করি না, তাহা হইলে কেহই তাহাকে তাহা বরাইতে পায়িতেন না। ঈশ্বর-
ক বিদ্যালয়ের মহাশয়ের মনসকিত “লোক-মজরা” নামক একে ‘লোক-মজরা’ উচ্চ শ্রোত সেখিতে করিতেন। বিদ্যালয়ের মহাশয় লিখিয়াছেন,—“এই উচ্চশ্রোত দারা আসার লিখিত উপকৃত করিয়াছিল, মনসকৈ নাই। আসারের ‘অভিজ্ঞতা, উচ্চ শ্রোতের জন্ম পাত্রে ও তাহাওনা’ সন্তুষ্ট হইয়াছিল, অপর কোন লোক সেখিতে ও মনসে পাত্রে দান না। বস্ত্র উচ্চশ্রোতের পাত্রে দান। একেবারে পুত্রপ্রায় হইয়াছে।”

মধ্যে এই ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র-কাহারও কথায় কোন উল্লেখ না দিয়া, কেবল ঘাড় বঁকাইয়া দাঁড়িয়া থাকিতেন। এই লজ্জা পিতা ঈশ্বরচন্দ্রের আঁখিতে অনেক সময় 'বাড়কেঁচো' তুলিয়া থাকিতেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের 'একজন্মসৌম্য' কথায় বালক-জন্মসনের 'একজন্মসৌম্য' কথা মনে পড়িয়া যায়। স্কুলকালে একজন ভূঞা জন্মনব্বের প্রভাব স্থল হইতে লয়য়া আসিত। এক দিন স্কুলের বাইতে বিলম্ব হওয়ায়, বালক জন্মনব্ব আপনি ফুল হইতে খাবার হস্ত; এবং পলক চলিয়া যায়। স্কুলের কড়া-জামিতে পারিয়া ভাবিতেন, 'বালক হয়, পথ তুলিয়া অন্তর পিয়া পড়িলে; না হয় অজ কৌনসপ পবিপ-গুণ হয়নি। এই ভাবিয়া তিনি জন্মনব্বের পুত-ভ্রম-বহিনী হন। বালক-জন্মনব্ব দেখিলেন, কড়া তাঁহার পণ্ডাৎ পণ্ডাৎ আসিয়াছেন। তাঁহার শক্তি মগ্ধকে কড়া সন্ধিহান হইয়াছেন ভাবিয়া, বালক-জন্মনব্ব, অভিযোজিত হইলেন; এবং স্কুলভ্যে রাধাধিত হইয়া উঠিলেন; এমন কি, যখনই কিরিয় পিয়া কড়াকে খাওয়ায় প্রহার করিতেন। জন্মনব্বের জীবনলোকের বদলে, তাঁহার এই 'একজন্মসৌম্য' বা দুঃপ্রতিভাতার দুঃপ্রতিভা বিনিয়া গিয়াছেন, "ভবিষ্যতে জন্মনব্বের জীবনে ইহারই পরিণতি পাওয়া যায়।" বিদ্যাসাগর মগ্ধকে আশ্রয় এই কথা বলিতে পারি।

এইসময় বালক-বিদ্যাসাগরের অল্পই অমনিগতর পঞ্চদশ বর্ষের। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে তিনি বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করেন। তিন বৎসরে ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত করিয়া, বাকি ছয় মাস তিনি অমর-কোষের সহযোগে ও ভট্টকায়ের প্রথম সর্গ পুস্তক পড়িয়া ছিলেন। এ অমর বহুসংখ্য তিনি প্রায় সারাজীত করিয়া পাঠ্যভাঙ্গ করিতেন। তিনি ১৮৪১সময় আহারান্তে পিতা ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত খণ্ডি কাপা কাপিয়া থাকিতেন ঈশ্বরচন্দ্র তখন নিদ্রা বাহিতেন। ১৮৪১সময় পিতা আবার তাঁহাকে তুলিয়া দিতেন। তার পর বালক সারা রাত পড়িতেন। এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে মর্যে-মধ্যে পড়াই দেয়া করিতে হইত। এইরূপ অমানুষিক পরিশ্রমে বিদ্যাসাগর বালকজীবনেই কুরিয়াছিলেন। অস্বাভাবিক বিবরণ্যলয়ের অল্পই জ্ঞান পাঠ্যবস্তুর অল্পই পরিচয় করিয়া স্বপ্নেই বসে; কিন্তু ভবিষ্যৎ এইরূপ অনেকেরই ভাব্যদেখিতে পাওয়া যায় না। পরিচয় করাও পথের কথা; ছই পরক উপার্জন

করিতে শিখিলে, তাঁহার্য বিদ্যা-মদ-লালসার সম্পূর্ণ পরশন হইয়া, এক একটা প্রকাণ্ড জড়ভড়ৎ 'বাগুন্নি' হইয়া উঠেন। বাক্যেরা কখনোই বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তক পঠিতার করিতেন না।

একদম বৎসরে বিদ্যাসাগরের উপনয়ন হয়। দ্বাদশ বৎসরে তিনি সংস্কৃত বহুলজ্ঞের কাগজে প্রবেশ করেন। সেই সময়ও লক্ষ্যগোপাল তর্কবিজ্ঞার সাহিত্যার্থক ছিলেন। কবি মুদুনমোহন তর্কালঙ্কার এবং শ্রীমদশঙ্করপ্রভে অমরবাক পণ্ডিত মুদুনব্ব বিদ্যাসাগর মহাশয়, বালক-বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পাঠ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্রদ্ধ জ্ঞাত অলোচন ভ্রমস্থত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অজুত দীক্ষিত পরিচয় পাইয়া, অধ্যাপকমণ্ডলী বিম্বিত হই-তেন। প্রথম বৎসর বালক ঈশ্বরচন্দ্র রত্নবংশ, হুমার-মন্তব্য, রাধাপ্রাণ্ডায় প্রভৃতি সাহিত্য-পরাশর সর্ব-প্রথম হান অবিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসর তিনি মায়, ভাবনা, মনুস্মৃতি, অশ্রদ্ধ, উৎসাহিত, বিরুদ্ধাচরণ, হুমারাম, কাদম্বরী, দামমুদার-চরিত প্রভৃতি পঠিত করেন। এগব কায় আচ্যোপাণ্ড্য তাঁহার কৃষ্ণ ছিল। অমরবাক তিনি অবিরত ছিলেন। পুস্তক না দেখিয়া সত্যত নাটকাদি অর্থলব বলিতে পারিতেন। দ্বাদশবর্ষীয় বালক অমলই সংস্কৃত কথা কহিতে পারিতেন, প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিতে তাঁহার কোন মগ্ধতা হইত না। অনানুস্তম্য পণ্ডিত-গণ তাহার অজুত সুখিত্যকে ও অশ্রদ্ধপূর্বক-বি-স্থিৎকমণ্ডলী দেখিয়া মোহিত হইতেন; এবং প্রায়ই বলিতেন, "এ বালক পুণিবীরে অমিত্যায় পণ্ডিত হইবেন।" প্রতিভা আর কাহারকে বলে? কজ্জল বাসকে 'একপ্র প্রভিকার পরিচয় পাওয়া যায়? কিডায় বৎসর সাহিত্য-পরাশর বালক-ঈশ্বরচন্দ্র সর্বপ্রথম হন। হস্তাকরের স্রজ তিনি প্রতিভাধরই পারিতোষিক পাইতেন, হস্তাকরের প্রশংসা তাঁহার বালকজীবনেই ছিল। মকল সাহিত্য-সম্প্রদায় ভাষা একপ্রাণে বড়িয়া উঠে না। সোমের ভাষা একপ্রাণে বড়িয়া উঠে না। সোমের উজ্জ্বল প্রাণভা-সোমের ও সাহিত্য-সমালোচকবিশেষ সমগ্রবে থাকিয়া অমিরের কবুতী এই প্রভৃতি জন্মিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অনেক সংস্কৃত পুঁথি দ্বিতবে লিখিয়া লইতেন। পুঁথির লেখা দেখিয়া সকলেই তাঁহার ছুসীয়া প্রশংসা করিতেন। তিনি যে মকল পুঁথি স্বতন্তে লিখিয়া গিয়াছেন, 'তাঁহার' পটিকালি দেখিলে বোঝ হয় যেম মুলাব্বর সজ্জন।

এই সময় বালক-বিদ্যাসাগর নিম্নাশ্রয় কঠোরতার নির্মম অচ্ছেদ্য দুঃখ-বিষয়ের পতিত হন। সে কঠোরতা পরিচয় হীনাবস্থাপর বালকের অসুখকরীয়, শিক্ণীয়, এবং সর্বসাধারণের চিরমুগ্ধার। এই সময় তাঁহার মধ্যম ভাতা শিক্ণাক কলিকাতায় আশ্রয় করেন। পাক-কার্যের ভার তাঁহারই উপর পতিত হয়। কেবলমি কই তাই? বালক-বিদ্যাসাগর প্রত্যহ অত্রাকালে নান করিয়া,বাক্যের খাইতেন; এবং তাঁহার হইতে পিতার মধ্যস্থতায় আর, পটল, প্রভৃতি ভবিষ্যৎকালি এবং মধ্যস্থতি জয় করিয়া লইয়া, বাসায় গিয়াই থাকিতেন। তৎপরে তিনি নিজেই স্নান হস্ত শিশে বাটয়া লইতেন। তখন পাঠের কলসার প্রচলন হয় নাই; তিনি স্বহস্তে কাট চলা করিতেন; এবং উত্তম খরাইতেন। বাসায় চারিটা লোক থাকিতেন। তিনি চারি-সকলের জ্ঞাত ভাত, ভাল, মাছের কোল রাখিয়া সকলেরই খাওয়াইতেন; এবং আহারান্তে সকলের উচ্ছিন্ন মুক্ত করিতেন ও বাসায় গিয়াই হস্ত। হস্ত বাটয়া কাট চিরিয়া, বাসন-মাছিয়া সত্যাতাই তাঁহার অস্থলে ও নখে ক্ষয় ধরিয়াছিল। তুমি আনি তনিলে শিখরিয়া উঠি বটে; বালক-ঈশ্বরচন্দ্র হইতেই কিন্তু অসার আনন্দে এবং পলয় পরি-ভোগ লাভ করিতেন। অনেক অমরবান বলি বাসকালে এইরূপ কঠোরতার নিমিত্ত সমগ্রায় করিয়া, ভবিষ্যৎ জীবনে অক্ষল কান্তিমান ও যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ভাকার ভবিষ্যৎ চকুরকীর মধ্যে এইরূপই ভয়া যায়। তিনি একজন হইতেন, সে যতী অতি অল্প ছিল। অজ্ঞে তখন হইতে বড়ী বাড়ীর সর্গ নিম্নজ্ঞে, তাহার উপর জ্ঞানোক্ত অত্যাচারে ভয়ানক অত্যাচার। নিকটে হইতী পাইখানা ছিল; হস্তাৎ বড়ী নদীই হৃদিকে পূর্ণ থাকিত। মগ্ধবস্তুর কীট সমক 'কিদি বসি' করিয়া বস্তুর ভিতর চুকিত। বালক বিদ্যাসাগর রত্নন করিয়া ময়ন খাঁতে জল পোকা বসিয়া থাকিতেন। তিনি জল খাটয়া দিয়া পোকাগুলো হুইয়া গিয়েন। এতজাতীয় ব্রহ্মম প্রায় আরহুলা ঘূরিয়া গিয়া যেত। সময়ে সময়ে ভাত-বন্ধনে গিয়াহুলা উড়িয়া পড়িত। বিদ্যাসর মহাশয় 'গিয়ারছেন'—সেখাৎ এক দিন অমরবস্তুর বন্ধনে একটা আরহুলা পড়িয়া-ছিল, প্রকাশ করিয়া বা পাতের নিকট ফেলিয়া রাখিলে, ভাস্পূর বা পিতা ব্রহ্মপ্রকৃত আরহুলা বন্ধন করিলে না, এই আশঙ্কায় তিনি সমস্ত আরহুলা, ব্রহ্মন সহিত উদ্বাহ করিলেন।

Be welcome, so thou come not too late in life.

শেখন কবি সারবেস্তিসের দারিভোর বধায় এক জন বলিয়াছিলেন;—
"ইহার সারিভোর পুণিবী দেশালিনী।"
সত্যাতাই ও দুষ্কিছবী শক্তিশালী ব্যক্তি দারি-ভোর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যে শক্তি ও দক্ষতা সঞ্চার করেন। আত্মীয়-পরিজন-পরিবৃত অস্থল খন্দে র্তার অধিষ্ঠিত ব্যক্তি অনেক সময় তাহা পায়েন না। কারাইল মাধে কি বলিয়াছেন—

"He who has battled, were it only with poverty and hard toil, will be found stronger and more expert than he who could stay at home from the battle, cohealed among the provision waggon, or even rest 'unwatefully, abiding by the stuff'."

বালক বিদ্যাসাগর রত্ননাদি করিয়া ভাতা ও পিতাকে মনের আনন্দে আহার করাইতে, এবং সত্যতই আশ্রয়সনে প্রস্থুতিত থাকিতেন। বাহকে আশ্রয়ে কঠোর কষ্ট বিনিয়া মনে হয়, তাহা তাঁহার হৃদয়ক বিনিয়াই মনে হইত। তিনি বহুসংখ্য প্রকাশ্যে শ্রেণী বিনিয়া মনে করিতেন না; অধিকন্তু প্রত্যহই অমিরাম প্রিশ্রম করিয়াও কিছু মাত্র কষ্ট অনুভব করিতেন না। বস্তের সোজা ছিল না। যে খের তিনি দৃষ্টন করিতেন, সে যতী অতি অল্প ছিল। অজ্ঞে তখন হইতে বড়ী বাড়ীর সর্গ নিম্নজ্ঞে, তাহার উপর জ্ঞানোক্ত অত্যাচারে ভয়ানক অত্যাচার। নিকটে হইতী পাইখানা ছিল; হস্তাৎ বড়ী নদীই হৃদিকে পূর্ণ থাকিত। মগ্ধবস্তুর কীট সমক 'কিদি বসি' করিয়া বস্তুর ভিতর চুকিত। বালক বিদ্যাসাগর রত্নন করিয়া ময়ন খাঁতে জল পোকা বসিয়া থাকিতেন। তিনি জল খাটয়া দিয়া পোকাগুলো হুইয়া গিয়েন। এতজাতীয় ব্রহ্মম প্রায় আরহুলা ঘূরিয়া গিয়া যেত। সময়ে সময়ে ভাত-বন্ধনে গিয়াহুলা উড়িয়া পড়িত। বিদ্যাসর মহাশয় 'গিয়ারছেন'—সেখাৎ এক দিন অমরবস্তুর বন্ধনে একটা আরহুলা পড়িয়া-ছিল, প্রকাশ করিয়া বা পাতের নিকট ফেলিয়া রাখিলে, ভাস্পূর বা পিতা ব্রহ্মপ্রকৃত আরহুলা বন্ধন করিলে না, এই আশঙ্কায় তিনি সমস্ত আরহুলা, ব্রহ্মন সহিত উদ্বাহ করিলেন।

"I can not but chose to say, to poverty,

আহারের ত এই অস্বাস্থ্য; শরনের ব্যর্থতা
তিনিলে চমকিত হইতে হয়। সম্প্রতি বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণকে কল্যাণাপাধ্যায়
মহাশয়ের মৃত্যু তাঁহার শমন্যবসন্তের এইরূপ
পরিচয় পাইয়াছি। নারায়ণ বাবু বলেন,—
“একদিন চন্দননগরের বাসা-বাড়িতে আমি বিলাস,
বাগা এ ছোট ঘর গুঁহিতে আশ্রয় করি হইবে না
ত? বাবা বলিলেন, বলিল কিরে। ভেলে বেলায়
বুঝাছোঁর বাসায় আমি সে ঘর চাওড়া এবং
হাত দুই লম্বা একটা আশ্রয় করি প্রভু হইয়া
করিতাম। বায়ুভর আলিমা আমার বলিল ছিল।
আমি স্বাভাবিক রূপে একটা মজুদ কল্যাণাপাধ্যায়,
সেই মজুদই শরন করিতাম। একদিন রাজি-
কালে বেলায়, সেই মজুদ উপর আমার দুই
চাকা ভইয়া আছে। আমি তাহাদের নিকট গিয়া
অনেক ভাঙা-ভাঙি করিয়া; আমার কিছু কিছুতেই
উঠিল না; তখন আমি তাহাদের নিজের
নিছান্নায় গিয়া ভইলাম। ভইয়াগার আমার
পায়ে বিড়া লাগিয়া গেল। আমি তখন আমার
পাশে উঠিয়া একই মজা করিব বলিয়া, যেখানে
আমার পায়ে বিছানায় আমার দুইটা ভাই ইয়া-
ছিল, সেইখানে গিয়া, তাহারপক্ষে ডাকিয়া বলিলাম,
কিছুই ওঠ না, না-হলে তাদের পায়ে কিছু মাখাইয়া
দিব। তখন তাহারা ভাড়াভাড়া উঠিয়া পড়িল।
তাহারপক্ষে উঠিতে দেখিয়া চলিয়া আসিলাম।
সে রাত্রি আমার শিলা হয় নাই।” কবচবর্জিত বাবুর
বাড়ীর সমুখের ভিলকরণে শেষ নামক এক ব্যক্তি-
বাবুর দ্বিতলে একটা ঘরে ঈশ্বরভক্ত শমন
করিবার আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার
তৃতীয় ভাতা কলিকাতায় করিতেন। ভাতা তাঁহার
শযায় শরন করিতেন। বালক-বিদ্যাসাগর
পাঠাভ্যাস করিয়া অনেক রাত্রে শরন করিতেন।
একদিন ভাতা গ্রন্থাশ্রমে মলতাপ করিয়া ফেলিয়া
ছিলেন। পাঠে এ কথা বলিলে, গৈরীর ম্যায়
হইয়াছে বলিয়া দুইতে না পান, সেই তরে ভাতা
মলতাপের কথা প্রকাশ করেন নাই। ঈশ্বরভক্ত
ও তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি প্রাতে
উঠিয়া দেখেন, তাঁহার ঘরিতে বিড়া। তখন
তিনি বিড়া দৌড় করিয়া বহুতল ভাতার মলময়
পরিষ্কার করিয়া দেন। বিদ্যাসাগরের পিতৃ-
মাতৃ ভক্তি বৈদ্য ছিল; জাতক-কর্ম উপলব্ধি।

বালক-বিদ্যাসাগর যখন সাক্ষ্য প্রেরিত

পড়িতেন, তখন তাঁহার উপর এক বোটা ঠক্কর
ভরি ছিল। রাত্রিকালে পিতা তাঁহার শরন বাসায়
আসিয়া পাকাদি করিতেন। এতৎপ্রকৃতি তাঁহার
পিতাভাসে জট ছিল না। তিনি কলকাতা যাইবার
সময় পুস্তক গুলিয়া পড়িতে পড়িতে যাইতেন; এবং
কলকাতা হইতে বিলাসের সময় উরুপাঠ করিতেন।
চিরকালই তিনি বিলাসে বীতশুণ্য ছিলেন; শরন
সময় হইয়াও মোটা কাপড় ও মোটা চামর ব্যব-
হার করিতেন। বাগা ভাইর কাছেই ছিল। লননী
চাকর সত্য কল্যাণ, বহু প্রার্থ করিয়া, কলিকাতায়
পাঠাইতেন। সেই মোটা কাপড় পরিয়া, তিনি
কলকাতা যাইতেন। তাঁহার বিদ্যাভাসে জটী
কেন্দ্রপতি ছিল না। একই জট হইলে,
পিতা ঠাকুরদাস ভয়ানক শাসন করিতেন।
তিনিও পিতার মতামত বড় ভয় করিতেন।
বাসাব্যবহারে তিনি ম্যায় মজা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।
পিতা তাঁহাকে শাসন করেন। তিনি ম্যায়
পুঁথি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কায়ে ও ব্যাকরণে বালক বিদ্যাসাগরের অসা-
ধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। বালকের পক্ষে
সে ব্যুৎপত্তি অসম্ভবত ব্যাপার। বীরসিংহ
এসে আচার্য্যদ্বারা উপদেশে তিনি এত জ্ঞান
বলে অনেক সময় সন্তোষিত কবিতা রচনা করিয়া
ছিলেন। তাঁহার রচনা দেখিয়া, তৎকালিক প্রসিদ্ধ
পণ্ডিতমণ্ডলী অবাক হইয়া, তাৎকালিক বিলাতী
পত্রিকায় রচনা করিয়া, তাৎকালিক বিলাতী
পত্রিকার্থকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। জাতিতে
সম্রাজ প্রচারিত হইলেও ভাষায় কবিতা লিখিবার
চেষ্টাআজোই যদি নিগটন প্রতিভাশালী বলিয়া
অভিহিত হইতে পারেন, তাহা হইলে বালক বিদ্যাসাগর
বাল্যে সংস্কৃত-প্রচার মত সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত-
জনমুগ্ধক কবিতা রচনা করিয়া অপরূপা অধিক-
তর প্রতিভাশালী বলিয়া কি পরিচিত হইতে পারেন
না? সংস্কৃত ভাষা আজ যদি জীবন্ত ভাষা হইত,
সংস্কৃত যদি হিন্দু-মতভেদে সাধারণ শিক্ষণীয়
ও পঠনীয় হইত, তাহা হইলে এই প্রতিভাশালী

* His first attempts in poetry were made as early as his 13th year, so that he is as striking an instance of precocity as of power of genius. Shaw's Students of English Literature.

বালক-বির মস্তক হইতে ভবিষ্যৎ-জীবনে অপূর্ণ
কোটিধর্মী কবিতা নিঃসৃত হইয়া যে প্রতিভার
পূর্ণবিভায়া নিপট উদ্ভাসিত করিত না, তাহাই
বা কে বলিতে পারে? বালক-বিদ্যাসাগর শ্রাব-
মভায় সনাতন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত সংস্কৃত
ভাষায় ব্যাকরণের বিচার করিতেন। তাঁহার
সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞতা ও কখনশক্তিগণিত্য প্রতি-
পত্তি জন্মে চারিদিকে প্রচারিত হইল।
চারিদিকে বহু ধর্ম বড় উজ্জ্বল। লোকের বলিতে
লাগিল, “বালক ঈশ্বরদ্বিতীয় পণ্ডিত।”

বালক-বিদ্যাসাগরের এইরূপ ব্যাচি-প্রতিপত্তি
হওয়ায়, নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকের
ইচ্ছা হইল, কতক সময় তাঁহার জ্ঞান লাগরিত হই।
বিরিদি করি, কীর্ত্তন করিবার জন্য ভট্টাচার্য্য
মহাশয়ের সপ্তম সন্যাসী কন্যা, দোমনীয়া মহিষ
বালক-বিদ্যাসাগরের বিবাহ হইল। এ সময়ে তাঁহার
বিবাহ কার্য্যে অধিক ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পিতার
অহরোহে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। দোমনীয়া
পাত্রী-কন্যা। পাত্রী-কন্যার মোচাম্বসকে
খাদ্য লম্বা অজ্ঞাত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
তাহাই হইয়াছিল। ভাষ্যবতী দোমনীয়া পুত্র কন্যা
রাখিয়া, স্বামী পূর্বের ইচ্ছানুসারে পতিভায়া করিয়া,
নিজ মোচাম্বসাদ্বারা এবং ভগবৎসম্প্রদায়ের
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি ম্যায় পূর্বের
সান্নিধ্য-ভর উৎসাহ করিয়াছিলেন। এই
সময় পাত্রবর্গ, একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
কোঠার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। কোঠারদ্বার
জাতিতে ও প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি হয় কি
বলুন দেখি।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বালক বিদ্যাসাগর “অলম্বার
শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। সেই সময় পণ্ডিত প্রেমচাঁদ
তৎকালীন মহাশয় অলম্বার শ্রেণীর অধ্যাপনা
করিতেন। এই শ্রেণীতে ঈশ্বরভক্ত অম্বাচ ছাত্র
অপেক্ষা অস্বাভাবিক ছিলেন। এক বছরের
মধ্যে তিনি সাহিত্যপত্র, কাব্যসমগ্র, রসদগুণের
প্রকৃতি অ’ হ’ গ্রন্থ পাঠকরেন। অলম্বারের বা-
সনিক প্রাচীর তিনি মর্সেতে পারিতোষিক প্রাপ্ত
হইল। এ দ্বিতীয় ও পণ্ডিত ভায়ানব তর্ক ভাস্কর্য্য
মহাশয়ের বাড়তে তাঁহাকে সাহিত্যপত্রের আদর্শ
কিভাবে দেখিয়া বিদ্যাত দর্শন্যাসনোক্ত জন্মদায়ক
তর্কপন্থায় বলা ছিলেন,—“এত ছোট—তেনে
সাহিত্যবর্ণনো। এমন যুবক আদর্শ করিতে পারে,

ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।” তর্কপন্থান মহাশয়,
ঈশ্বরভক্তের পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,—“এই
বালকের বদ্যবুদ্ধি হইলে, বালক বাদ্যনা দেশের
অদ্বিতীয় লোক হইবে।”

এই সমস্ত ঈশ্বরভক্ত কলকাতা মাসিক চাঁচকা
রুচি প্রাপ্ত হইল। তিনি বাহা রুচি পাইতেন, তাহাই
পালকে আনিয়া খিচেন। পিতা ঠাকুরদাস পুত্রের
রুচিবদ্ধ ঠাকুর বীরসিংহ এসেই নিকট কতকটা
জনি করিয়াছিলেন। এই জন্মে তাঁহার
চৌল কাহারিয়ার সংস্কৃত ছিল। চৌল মাখাইয়া,
ছাত্র রাখিয়া, সংস্কৃত শিক্ষার প্রণালি রুচি করি-
বেন। পিতা ঠাকুরদাসের এ মাধ বয়সেরই ছিল।
বিদ্যাসাগরের বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সুখের মধ্যে, তাঁহার
চিত্তাশীলতা স্নান সর্বাভিহৃত হইয়াছিল। বিদ্যা-
সাগর বালক, প্রায়ই বৃদ্ধ-বালকবিশেষে নিকট
এ কথা বলিতেন। ঈশ্বরভক্ত রুচির চাঁচকা
হস্ত-লিখিত পুঁথি জরি করিয়াছিলেন। আদর্শ
এ সম সুখি তাঁহার সাহিত্যেতে বিদ্যামান আছে।
কখন কখনও বালক বিদ্যাসাগর বালক হইতে
পত্রভব-মোদনে ব্রতী হইয়াছিলেন। কাহা? সেই
মুখ বুকপান, সেই অনন্তব্যাপিনী দয়াল পুঁথি ছিল।
দয়া তাঁর পুঁথি ব্যাপিনী; কিন্তু দয়া যেমন;
উপায় ত যেমন নহে; ভুলে যে কোন উপায়ে
ব্যথাপুঁথি দান, দোমনে হুঁসেদ্বারা তিনি প্রাণান্ত প
করিতেন। তিনি যে চাঁচকা রুচি পাইতেন,
পিতা তাঁর সম শাইতেন না। অবশিষ্ট যে
চাঁচকা থাকিত, তিনি সেই চাঁচকা জল খাইতেন।
লীল খাইবার সময়, যে সকল বালক তাঁহার
“নিকট থাকিত, তিনি তাহাপক্ষেও জল খাওয়াই-
তেন। কাহারও ছেঁড়া কাপড় দেখিলে, নিকট
হায়ে পরয়া না থাকিলেও, দরতপন্থের নিকট দান
করিয়া, তাহাদের কাপড় কিনিয়া দিতেন। বাসায় বেহ
আসিলে, তৎকালেই তিনি তাহাকে জল খাওয়াইতেন।
সে জানিত, ঈশ্বরভক্ত বড় মানুষের ছেলে; কিন্তু
ঈশ্বরভক্ত বড়, তাহাত রুচি না। কোন সম-
বয়স বালকের পীড়া হইল, তিনি গর্ভিত কার্য্য
পরিভায়া করিয়া, তাহকে সেবা ভজিয়া করিতেন।

* অসম কতকগুলি কোন যুগে বিদ্যাসাগর মহা-
শয়ের মাতৃ ভাষায় পণ্ডিত হইতেন, এই পুঁথি
দেখিবার ম্যায় পণ্ডিত হইতেন। অম্বাচ সনক হইলে
তাহা ইহা সনক হইল।

কাহারও কোন সংক্রামক স্পীড়া হইলে, অপর কেহ তাহার নিকট যাইত না, তিনি কিন্তু অমান-বদনে ও অকুণ্ঠিতচিত্তে, তাহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতেন।

ব্যাক-বিয়াসাপার এখন বারান্ধায়ে ঘাই-
তেছে, এখন সর্বত্রই ওর কালীকাতের রাড়ী পিয়া,
তাঁধাছে প্রথম সর্বত্রই সর্বত্র; পূর ত্রুণ জন্মে প্রত্যেক
প্রভাসার বাড়ী পিয়া, সকলের ত্রুণ লইতেছেন।
কাহার পীড়াহি হইলে, মিলিকার চিত্তে তাহার
দেবোত্তপ্রসাদি হইলে, এই জন্ত তখন যুগিক
বিয়াসাপার দেশেও কল্লু ধরায় নামে অভিহিত
হইতে* তিনি এখন বিয়াসাপার ঘন নাই;
কিছ দ্বার মাথর চহক লল। ইহুর ডিঙালী
বাঁধেও তঁহার চহক ছল আসিত। মরি। মরি।
দুর্ভ বালকের অসীম হ।

[illegible]

চাক্ষুৰ অমৰ হ'য়ৱা ৱহিলেন; তাহাৰই পাঠক
পাঠক, বিদ্যাসাগৰে ৱাংলা পাইলেন-
এই সব কথা এংগ ৰাজ্যৰ কাৰ, ৱন্ধন কাৰ
প্ৰভৃতিৰ কথা, ব্ৰহ্ম-বাক্ষিণ্যৰ নিউট অংগৱজ্ঞে
বুঢ়িয়া ৰণিতে তিনি বন্ধন কুঠিত বা, লজ্জিত
হইলেন না। ইহাতে ও মহৎৰে মাধোৱাজে
কাৰা, বংগ এহি সব কথা প্ৰোভাৱ মুখ হৈ
প্ৰচাৰিত হইয়, সাধাৰণেৰ একক বিষয় শিক্ষা
সুদায়ী হয়।
এইবাৰ তাঁহাৰ প্ৰভাৱ পৰিচয় আৰ একট
লভ। অলপকালৰে প্ৰৌঢ়ৰে পড়িয়াৰ সমস্ত তাঁহাকে
হুই বোলা বন্ধন কৰিতে হইত। ৱন্ধনভাৱে ও
ওগুৰু পৰ-পাঠকসে তিনি উপায়ৰেয়ে প্ৰাক্তিত
নয়। প্ৰভাৱ বৰ্ত্ত-ভেদ ইহাও। কলিকাতাৰ ৱোগ
আমায় হইল না। অসত্য তাঁহাকে সেয়ে বাঢ়
হইত। সেখানে নিমকভৰ কাখিয়া ৱোগ মাৰিয়া যায়।
তিনি কলিকাতাৰ কিয়িয়া আছেন। এবাও সেই
ৱন্ধন ও অধ্যান। সেয়ে মধ্যম ভাটনা লগত বধ্য-
পাধ্যা অনেকটা সাধ্য্য কৰিভেন এংগ মধ্য-
মধ্য ৰাজ্যৰ কৰিয়া দিভেন। একদিন হীনমুদ
মাধ্যাৰ সমস্ত বাৰাৱেৰে ভিত্তে থিয়া, ঘোড়ালীস
মুতৰ বাৰাৱেৰে একস্থানে বসিয়া দুমাইয়া পড়িয়া-
লিভেন। ইয়াতকৈ অনেক ৱাতি পৰ্য্যন্ত ইষ্টপত-
বৰফিৰ অষ্টদ্বান কৰিতে কৰিতে, হুতৰ বাৰাৱে
হায়াৰ ভাতকে নিৰ্জিত অংগৱা লৈতে পায়;
এংগ তথ্যহইতে ইহাকে তুলিয়া লয়ৱা আছেন।
জনিত পুই, ইহাৰ পৰ হইতে, ইয়াতকৈ আৰ
ভাট হীনমুদৰ কখন একবাৰ বাৰেৰে হায়ে
দিভেন না।
অংগৱাজে পৰা সমাপ্ত হইলৈ পৰ, তিনি
মুষ্টিৰ প্ৰৌঢ়ে গ্ৰেণ কৰেন। * তৎকালে কলেজ
মুষ্টিৰ পুৰ্বে দৰ্শন ও তৎপৰে বেদান্ত পড়িত
হইত। ইয়াৰে ইছা দিলে যে, মুষ্টি পড়িয়া,
‘ল কমিটী’ পড়িয়া, তৎপৰে ‘ল কমিটী’
পৰাৱৰ্ত্তিত হইয়া, জগৎপৰিতৰে পৰাপ্ৰাণই
তাঁহাৰ মৃত্যু উদ্ভৱ ছিল। কৰ্ত্তৃপথৰ অংগৱা
তিনি দৰ্শন ও বেদান্ত পড়িয়াৰ পুৰ্বে মুষ্টি পড়িয়াৰ
প্ৰকাশ পায়। ইয়াতকৈ ৱয়ত ৱংগ ১৭১৬ বংসৰ
হইবে। ইয়াৰে অমৃত কীৰ্ত্তি। তাৰিলৈ বংস-
পুথকে গোমাক হয়। সঁচাভাৱে ২০ বংসৰ পণ্ডিত-
গণও মুষ্টিৰ পাঠ্যভাস কৰিয়া উঠিতে পাৰিভেন
না। বাকৰ ইয়াতকৈ ও মাসে’ পড়িত ২৩ কৰি

“শংকরী” পরীক্ষা দেবে এবং প্রশংসিতকণে উত্তীর্ণ হবে। এই ক্ষেত্রেই প্রথম প্রবন্ধটি প্রবন্ধ রচনা করে
নাই। ছয় মাসের পরেই প্রবন্ধ রচনা করে ছয় মাসের
মধ্যে নিজা প্রবন্ধটি প্রবন্ধ রচনা করে ছয় মাসের
অধ্যাপক এবং সহপাঠীগণ তাঁহার এতদূর অগ্র-
গতি দেখিয়া কান্দাকাঁড়িতে হইলেন। এমন প্রবন্ধ
কি মানুষ ভাবিয়া কল্পনা করেন নাই। ছয় মাসের
পরেই বিদ্যালয়ের প্রধানের এই অগ্রগতি
কথা বলাই আমাদের মুগ্ধপথে উদ্ভাস হয়, তখন
কথা বলাই ভব-ভূতির এই স্বপ্নাম্বুর পড়ার ভাব
পূর্ণ প্রেক্ষিত মনে পড়ে।

“বিতরতি গুণঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যদৈব তথা জডে
নতু ষণ্ণ তয়োজ্ঞানে শক্তিঃ করোতাপহন্তি বা ।
ভবতি চ তয়োৰ্জ্ঞান ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্বশা
প্রভবতি শুচিবিশ্বব্রাহ্মী মণিনিগুণাঃ চয়ঃ ।”

ভাবার্থ:—ওহ, সুবোধ এবং নিরীক্ষি দ্বিবি।
ছাত্রকেই সমাজকে বিনা বিতরণ করেন; কিন্তু
তত্ত্বভয়ের সুবিধার শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে
পারেন না। বিনা বিষয়ে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ছাত্র
প্রভূত পার্থক্য লাভ করেন, ইহা বলা বালা
নির্গল মনি, প্রতিবিধি গ্রহণে সমর্থ হয়, নৃশিখ
কিছু হয় না।

দ্বৈরচয় সে সময় 'ল কমিটি'র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই সময় ত্রিপুরা প্রদেশের জমিদারি পদ পূন্য হয়। তিনি পটখাম উত্তীর্ণ হইয়া, এই পদেই প্রাথমিক করেন। প্রার্থনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু পিতা ত্রিপুরার তাহাকে বাইতে নিষেধ করেন। পিতৃহত বিদ্যাসূত্র, পিতার অহুরেতে উৎকট আকাজক্ষা জ্ঞাপিত মিলেন। যে পিতার সম্মার্যেই দ্বৈরচয় জন্ম তাঁহার হইয়া গিয়াছে, সেই পিতা, যখন তাঁহারকে নিষেধ করিতেছেন, তখন কি পিতৃ-পুত্র বিবাদার তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন? হইয়া যে তাঁহার একমাত্র আশ্রয়-বেড়া এবং মাতা যে একমাত্র আরাধ্যা বোধ করেন। তাও বটে; আর দ্বৈরচয় তাহাকে জন্ম পথে লইয়া বাহন না। তখনও দুইটি বিভা তাঁহার থাকি ছিল। পিতাও বেড়াও পড়া হয় নাই। তিনি জম্মপতিতে পদ্যনা, শৈয়া, শোভতে বৈষ্ণবে প্রবেশ করেন। এই সময় 'মুচুচয়' বাচস্পতি মাহাশয় দেয়ারও অধ্যাপক ছিলেন। বেড়াও পিতার সম্মার্যেই দ্বৈরচয়

পদ্য রচনায় সর্বোচ্চ 'হাইয়া' একশত টাকার
পুরস্কার পান। কঠোর জীবনে জুগুপ্সার অস্ত্র বি-
মহজে হয়। সকলই ভগবানের পরীক্ষা বৈ-
নহে।

এই সময় বিদ্যাপুর মহাশয়ের তৃতীয় জাত শত্ৰুজয় কলিকাতার বাসায় উপনীত হন। বাসায় একটা কোক বাঙ্কি; সুতরাং স্বপ্নদেবতার কল্যাণ বাঙ্কি। এতদ্বস্থির ম্যাম পুর বীনবন্ধুর বিবাহ বিয়া, পিণ্ডা বৈদ্যরায় বড় বর্ণপত্র হইয়া পঙ্কজ কাকের ঝাঙ্ক হ্রাস করিতে হইল। বিদ্যাপুর মহাশয় একদিন আমাশিরের কোন বন্ধুর, নিকট বাল্যান্নিবেশ—প্রাণ্যকোষ আশ্রি যেকোন কষ্ট পাওয়া; কিন্তু কোন-কষ্টেরও একদিনও কষ্ট-বিদ্যা-ভাবি নাই; বং তাহাতে আমাশি উৎসাহ-উদ্যম বর্জিত হইত, কিন্তু তাইওপরি কোন-কষ্ট-বৈশিষ্ট্যে আমাশি যে কষ্ট অন্তর্ধান হইত, তা আমাশি-কি, বাঙ্কি! বিদ্যাশ্রম বিদ্যাপুরের, পঙ্কজ হইয়া বিচ্ছিন্ন কি, যখন পিতা ঠাকুরবাব কলিকাতায় বাসায় বয় কমাইয়া দেন, তখন তুনিজি এবং তাহার অনুজ বিদ্যার মহাশয়ও গুণিতকোষে, বৈকালের জলখাবার জঙ্ক, আশ্রয়দার জেলা আমাশি জিজ্ঞাসিত হইত এবং আশ্রয়দার বাতাসা বাতাস। এই ভাষা ছোয়ার অধীকৈ আমাশি রাজে আশ্রয় বাক্স প্রস্তুত হইত। প্রাতে ও রাতে কুম্ভার ডালনা কষ্ট ছোয়াপিতা পোষা-জিঙ্কি বাঙ্কন মাত হইত। স্বপ্নদেব হইবে-পালা কবিবেৎ? তাই হইয়া পাতে তৎকালী দাবার ময় তিন চক্ষের জল সম্ভরণ করিতে পরিবেদন। এই সময় আহারের যেনম কষ্ট; আহার বাক্সার তৎকালী কষ্ট হইয়াছিল। পিতা, কণ্ঠপত্র, ইহার উপর আশ্রয়দাতা সিংহ পুনিবারও বর্ণপত্র। পিতা ঠাকুরবাব পুণ্ডলিকের পুণ্ডলিক তৎকালী শ্রম করিতেন; কিন্তু কণ্ঠপত্র ঠাকুর তৎকালী একজনকে ভাড়া দেনক কাকের উত্তার। পিণ্ডে নিয়ে একটা জলকোষের বাসের অধ্যায় জঙ্ক পুণ্ডে- বাসা করিত হয়। কষ্টের পুণ্ডা।

ইহাতেও ঈশ্বরচন্দ্র বিচলিত হন নাই। তিনি এই সময় দর্শনক্ষেত্রেতে প্রতিষ্ঠা দেন। পণ্ডিত ৩ নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় আয়শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। নিমচাঁদ শিরোমণির মৃত্যু হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় পণ্ডিত জয়নারায়ণ উরুস্বর তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন।

দর্শনের দ্বিতীয় বৎসর পরীক্ষায় ঐতর্য্যচন্দ্র সর্ব-
প্রথম হইয়া ১০০ টাকার এবং কবিতা রচনায়
১০০ টাকার পুরস্কার পান। ঐতর্য্যচন্দ্রের কিত্তি অকৃত-
শক্তি। তিনি ৫ বৎসরে দর্শনশাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত
করেন। আর কেহ ৫-১০ বৎসরে তাহা পারিতেন,
কি না সমর্থ। প্রতিভা তার কাহাকে বলে? এ-
প্রতিভার পরিচয় আরও পাইব। তৃতীয় মধ্যম কুহু
বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, “যৎকালে তিনি
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন, তখন গণেশ ভট্টসহ
অনেকের সহিত বিচার হইত, সকলেই তাঁহার
সহিত বিচারে সক্ষম হইতেন। হুরাপগ্রামবাসী
সুখিয়াত দর্শনশাস্ত্রেরা রামমোহন ভট্টসহিত
সহিত তাঁহার প্রাচীন ভ্রাতৃগণের বিচার হয়।
বিচারে ভট্টসহিত মহাশয়ের পরাজয় হয়। ইহা
তিনিয়া প্রকৃষ্টের ভট্টসহিত মহাশয়ের পরাজয় হইয়া
দর্শনশাস্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট।” এ বিবরণের জ্ঞাত বিদ্যারত্ন বৈদ্য-
শরের উপর নির্ভর করিতে হইল। বিদ্যাশাগর মহা-
শয়ের জ্ঞানটা সত্যকে যে সকল মহোদয়ের নিকট
হইতে জ্ঞান্য। সকল বিশ্বের নিগূঢ়তম অসীম পাই
রাহি, তাঁহাদের সকলকেই এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া
কিছু সমুদ্র পাই নাই। তবে বিদ্যারত্ন মহাশয় তখন
কলিকতা সাহস্রতুল্যকেন্দ্র ছাত্র ছিলেন; তাঁহার
সমুদ্র তখনকার অনেক কথা মনে থাকিবারই
সম্ভাবনা। “যত” কথাটা বিদ্যাশাগর মহাশয়ের
ভ্রাতৃ ভট্টসহিত ও প্রতিভাশালী পক্ষে অসম্ভব
নহে।

এই সময় ঐতর্য্যচন্দ্র দুই মাস ৫০ টাকার বেতনে
বাকস্বতের দ্বিতীয় খেলার অধ্যাপক হইয়াছিলেন।
এই টাকার পিতা ঐতর্য্যচন্দ্র পণ্য আঁপণ্যাটন করিয়া
আসেন।

বড় দর্শন ঐতর্য্যচন্দ্র সর্বশেষ যুগপৎ হইয়া-
ছিলেন। কলকাতার অধ্যাপক পণ্ডিত জ্ঞাননাগর
ভট্টসহিত “পরিচয় বহির্ভূতেন—এতদূর দুইমান
জ্ঞাত, আমি কখনও দেখি নাই। চারি বৎসরে দর্শন-
শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ ভৈষিক শক্তির পরিচায়ক।
আমার মনে হইত, দর্শন তাঁহার বহুপক্ষে অধিক
ছিল।” দর্শন পণ্ডিত বিদ্যাশাগর মহাশয়ের
কলকাতার পণ্ডিত হইল। ইহার পর ইনি প্রকৃত-
পক্ষে কলকাতার প্রবর্তন করেন। কালেক্টরের পরিচয়
বাঁটারে পাইবেন। বিদ্যাশাগর মহাশয় বাবুদায়
এই সংস্কৃত রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকটিমাত্র
উদাহরণ হইল।

বিদ্যাশাগরের সংস্কৃত রচনা।*

(১)

সত্যকথনের মহিমা।

“সত্যং হি নাম মানবানাং সার্বজনীনায়্যা
নিবন্দনীয়তয়া হেতুঃ। তথাবিদ্যায়াং বিশ্বসদী-
ভায়াঃ কলমিহ বহুদ্রবদ্যন্ত্যতে। তথাহি যদি
নাম কথিতং সত্যবাসিত্যো বিনিবৃত্তো ভবতি
সর্ব এব নিরতং তচ্চিদে সমগ্ৰং বিশ্বম্ভি।
সত্যবাদী হি সত্যং সজ্ঞানসংসারি সাত্ত্বিকঃ
মাননায়্য সর্ববিশেষঃ প্রশংসনীয়ঃ” ভবতি।

যে হি মিথ্যাবাদী ভবতি ন কোংপি কদা-
চিদপি তস্মিন্ বিবসিতি। স খলু নিঃসংসারঃ
নিরতিশয়ঃ নিকন্দীয়ে। ভবতি ভবতি চ সর্বত্র
সর্বথা সর্বোবাৎ কনানামবজ্ঞাত্যজননং।

কিঞ্চিদনাম নিম্নোদ্যোহি বালগৌল্যঃ যদি
কৃতিদ্বিধাযোহিতয়া প্রতীয়মানো ভবতি তৌ
ভাভে। নানেনাথেনান্যভিঃ পুনর্ব্যবহৃত্যময়ঃ
খলু সম্ভাভ্যাত্মিক্যি। ধর্মদীপ্তিভ্যাত্মকঃ পম-
বিতেন।

দর্শনের প্রথম বৎসর পরীক্ষার বেলা দশটা হইতে
একটা পর্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত রচনার জন্ত সময় নিষ্কার্য
ছিল। বিদ্যাশাগর মহাশয় প্রথম পরীক্ষার সময়
উপস্থিত ছিলেন না উপস্থিত থাকিবার তাঁহার
প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি প্রেমচন্দ্র তত্ত্ববোধিনী
সঙ্ঘের অত্রোদ্যে গতি বেলা বাটার সময় রচনা
করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার
রচনা হাতাশাল হইবে; কিন্তু তদ্বিপরায়ে তিনি
এই রচনার জন্ত পুরস্কার পান।

(২)

চিত্রা।

“বিদ্যা দ্বাতি বিনয়ঃ বিপুলকং বিস্তাৎ
চিত্রং প্রামাণ্যিভ্যি জ্ঞান্যাপকবিত্যং
সত্যম্ভ্যং বচসি সিকতি কিঞ্চ বিদ্যা
বিদ্যা নৃণাং স্বরত্নবরগণীতলয়ঃ”

এইচি পঠিৎকার রচনা, সকল রচনা যৎযত
হইল। ইহাও উপায় নাই। বিদ্যাশাগর মহাশয়
সকল লিখিয়াছেন, “এক যাদু—যাদুর রচনা দেখি-
বার নিমিত্ত যাদুর বাইরে একটি এবং তার খিয়ার
দিকের অক্ষরকার, সর্দিয়ার রচনাগুলি লইয়া যান
ও তার-বার প্রাণকীর্ণিয়া ও, তাঁহার নিকট হইতে তার
চিহ্নটা লাইয়াছেন।”

বিদ্যা বিকাশ্যতী মুক্তিবেদকীর্য্য
বিদ্যা বিদ্যেশ্রমমণে হুহুধবিত্ত্যঃ।
বিদ্যা হি রূপমূল্যং প্রথিতং পুণ্ডিয়াং
বিদ্যা ধনং ন নিবনং ন চ তত্ ভাবঃ ২
রূপং নৃণাং কতিচিদেব দিমানি নৃনং
সেংং বিজ্ঞমতি কৃপণমহিকর্য্যং।
বিদ্যাভিৎ পুনরিতং মহাকারিগুহ-
মাত্মা ভূতপতি ভূতাত্তরং হেংং ৩
অভ্যাসি যানি বিদিশ্যসি দাননি লোক-
দানেন যান্তি নিবনং নিয়তং হু তানি।
বিদ্যানন্ত পুনরত্ মহান্ তদোহসৌ
দানেন বুদ্ধিমহিগচ্ছতি যং সদেশম্ ৪
নৈবর্ধেণ ন রূপেণ ন বেলনাপি তদুদী।
যাদুদী হি ভবৎং ব্যাতিবিত্যায় নিবনং ৫
হুহুহোহপি দিহোহোহপি নৌবনং তবোহপি সন্।
ভাবনং রূপমূল্যং নহি ভবতি বিদ্যায়াং ৬
বিৎসত্যং মহন্তঃ পরিহীণবিত্যো
নৈবদায়ং কতিচুপৈতি ন চাপি শোভ্যম্।
হামায় কেবলমৌ নিয়তং জনানং
অসীমং বিফলমেব তথাবিদ্যায়াং ৭
অজ্ঞানবৎশুনকৌ ধন্যমহৎসেঃ
সৌভাগ্যপূর্ণং লম্বাগমিদেশিনী চ।
সং সমস্তকর্ণতাপকিলাগচ্ছতি ৮
বিদ্যা নিরত্ জড়তাপং পিয়মাদাৎ ৯
দর্শনের দ্বিতীয় বৎসরে পরীক্ষা ইহার রচনা
নিবন ছিল। এই রচনাও ঐতর্য্যচন্দ্র পুরস্কার পান।

(৩)

অগ্নি পুষ্কর উপাখ্যান।

অগ্নৌ নাম ভূম্যঃ প্রকারঃসবিক্রমঃ।
আর্য্যং হুতাকাজী দিগিপ্রবে প্রজাপতিম্ ১
অন্যন্য সোংং তত্ভাভ্য প্রেম্যামাস ময়ং।
এতরতঃ পুষ্কচিত্তি নাম কামপি কামিনীম্ ২
নৃপতিস্তাং সমালোক্য কাম্যং তলোকামোহিনীম্।
শ্রোকৌহুতাক কতিচিৎকজ্জবোহোমাত্রিতঃ ৩
আনীনীরদচরে শিখরেকমিত্র-
কৃষ্যবটকজবটৈরভিত্য বিকৌর্পে।
জ্ঞান্যটনৈরগণনৈরভ্যমাদানে
কিৎ হু যবন্তসি মুনীর ভূত্রেহমিন্ ৪
কৌণ্ডম্মির্মমমহতমুখম্ভি
ধংসে কিমবধেবা হরিণেপায়মাসম্।

বলে বশীকরণবাদন্য। নিতত্ত-
ম্যাদিশ্য হুতশাম্ভিজিতৈস্ত্রিগাম্যম্ ৫
রাধাবিনৌ বিবিধবিভ্রমমহতৌ তে
পুংখং বিনাপি কৃষ্টিতৌ নিশিতপ্রভাতৌ।
ভাভুঃ কটাক্ষপতিতায় হুতপ্রায়ঃ
কটম্ প্রযোক্তুম্ভিগাম্য তত্ বিজা ৬
ধু দৃগতং হুম্মি বিপুলং মনোজং
মধ্যে হুংপরিপকিত্ত্যুতগায়ঃ ৭
জানৌনং হু হি কবিয়তি কত্ হু-
চৈত্রেবিব্রম্মশিলাবিপুলং বিপতিম্ ৮
অম্মৈ নিরাত্তকলভশশাক্ষবৈপে
নৌশাভুভবপুংগলং বৃদিতং বিভ্রাতি।
মত্তে হুংগাংগুবি স্যবনমং বিজাতা
গোক্তরত্ বিহিত্য মহতাদেং ৮
যুগ্মিষ্যাপিগলিতা গলিতা নিত্যং
শক্তি ইংম্ মুনিবরমুতাত ভবন্তম্ ৯
প্রীতা ভবন্তং বিময়ং কিল পুংপুষ্টিঃ
ধ্বংসত্যা মুনিহুত ইব বেদশাখাম্ ১০
তথ্যাবৎ ভূপরিপ্লবত্ভ্যং
অভ্যাপ্রায়ম্ ইংম্ চট্টায়তাকি।
উদ্যানং বিজ্ঞতমুনীং প্রে বিজ্ঞমোহ-
ময়ঃসুখং কৃশণ্য নিরাদ্যাপ্যম্ ১১
পুষ্করৌ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার সময়
জি, টি, মার্শন সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপ-
ক ছিলেন; তৃতীয় বৎসর ছিলেন বাবু রময় দয়।
এ বৎসর অগ্নি পুষ্কর উপাখ্যান সাক্ষ্য রচনা
ছিল। তদুপায়ে উক্ত কবিতা রচিত হয়
রময় বাবু এ.কবিতা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যমিত
হইয়াছিলেন।

(৪)

গোপালায় নমোহুতম্।

মুশোদানন্দ্রদায় নোমোংপললপ্রিয়ে।
নমোংপালবায় গোপুলায় নমোহুতম্ ১
নৈবত্ববদনায় কামিনীকুলচারিণে।
ধ্বংসনীনীলায় গোপালায় নমোহুতম্ ২
হুতীং হুতুল্যং বনমাল্যগালিনে।
গোপাট্রেনমীনীলায় গোপালায় নমোহুতম্ ৩
হুংকণশবতগায়ী কুংসমমহিয়ারিনে।
ভৈতত্বকলায় গোপালায় নমোহুতম্ ৪
নবনৌককোয়ার চতুর্কৌংকামিয়ারিনে।
জগত্ হুতলায় গোপালায় নমোহুতম্ ৫

१. धनुजश्च कृतज्ञश्च आश्रयेदी नृत्ततः।

প্রজায়তে চতুর্দশাং পঞ্চদশাং পতিততা।
অশ্রোহঃ সর্ষভুতান্যং যোড়শাং কায়তে পুনান্ ৷”
নির্ধরমিদ্ধুতত্তে ব্যাসদমন ৷

“রজোদর্শনতোহঃ শুল্পশা নায়েদ্য দিনচতুষ্টয়ং।
ততঃ শুদ্ধকিত্রাভৈতর্য্য সর্ববর্ণবৈধঃ বিদ্বিঃ ৷”
নারদ।

এই সমুদ্র বচনের ভাষ্যার্থ এই যে, রজো-
দর্শনক প্রথম দিনে রজস্বল্য রমণী চাক্ষুণ্যী,
দ্বিতীয়া দিনে ত্র্যম্বদাভিনা, এবং তৃতীয় দিনে বৈশ্বকী
হইয়া থাকে। “স্বর্ধাৎ” এই সকল দিনে সহবাস
করা একান্ত নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিনে আমি-সহবাসের
যোগ্য। হয় বটে, কিন্তু বৈশ্বকীরা ক্রোধে অধিকারিণী
হয় না। আর সে সহবাসের ফলও ভাল হয়। তবে
প্রথম দিনে তিন অর্পণা ভাল হয়। মাত্র। চতুর্থ
রাত্রির সহবাসে গর্ভ হইলে তাহাতে পুত্র হয়। ৪টে;
কিন্তু এই পুত্র অল্প। এবং নিকল হইয়া থাকে।
পঞ্চমি রাত্রিতে গর্ভে কন্যা হয়, উক্ত কন্যা পুত্রভা
হইয়া থাকে। ষষ্ঠী রাত্রির গর্ভে সুখ্যবাস পুত্র উৎ-
পন্ন হয়। সপ্তম রাত্রির গর্ভে কন্যা হয় ও সেই
কন্যার সন্তান হয়। ষষ্ঠম রাত্রির গর্ভে
ঐশ্বর্যশালী পুত্র হয়। নবম রাত্রির গর্ভে সৌভাগ্য-
শালিনী কন্যা উৎপন্ন হয়। দশম রাত্রির গর্ভে
শ্রেষ্ঠ পুত্র হয়। একাদশ রাত্রির গর্ভে অধর্মিষ্ঠা
কন্যা হয়। দ্বাদশ রাত্রির গর্ভে অসুখ্যবাস পুত্র হয়।
ত্রয়োদশ রাত্রির গর্ভে পাণ্ডিত্য বর্ধনকারক রিণী কন্যা
হয়। চতুর্দশ রাত্রির গর্ভে ধর্মজ্ঞ রক্তজ্ঞ আয়ত্তজ্ঞ
দুর্ভুত পুত্র উৎপন্ন হয়। পঞ্চদশ রাত্রির গর্ভে
পতিভুত কন্যা জন্মে। সর্ষভুত পুত্র আস্তে আস্তে,
যোড়শ রাত্রির গর্ভে হইয়া থাকে। ক্ষুর প্রথম
চার দিন, একাদশ দিন এবং ত্রয়োদশ দিনে
সহবাস একান্ত নিষিদ্ধ। প্রশস্ত দিনেও মদ্য এবং
মূল্য নষ্টের সহবাস করিবে না।

“ন রোগোত্তমঃ ন রোগোত্তমঃ ন মলিনাং ন মলিনঃ
ন দিবা। ন সন্ধ্যাতোঃ ৷” (পাচ্ছেদিত্যাপ্রকরণঃ)।
বিদ্বসবিহিত।

পতি বা পত্নী, রোগোত্তম বা রোগবিহিত থাকিলে
তদনুসারে সহবাস করিতে নাই। ৩ দিন, উষাকাল
এবং সন্ধ্যাকালেও ত্রীসহবাস করা নিষেধ।

“অগ্ননাভ্যজনে পানং এবাস্য বস্ত্রাবাসম্।
ন স্তৃগাং স্তৃগব্যা নারীঃ প্রবাস্য দর্শনং তথা ৷”
মদ্যপানবিজ্ঞাততত্ত্ব দন্দবচন।

বৈজ্ঞানিক মাংসক পাতে শর্পে চ ভোজনম্।
পঞ্চদশো বিধা স্বাপং তদুপলব্ধ্যভ্যর্থনম্ ৷
দশে শরীরে ভুক্ত্যেতে সোমং নালিনা পিবেৎ ৷
আহারং পোরসানাক পুশালিকারবারম্ ৷
অগ্নমঃ রোহণং পক্ষীপীথাদিকিরোহণম্ ৷
অমিষ্যাম্পশনদিকং বর্জয়েত নিমজ্ঞম্ ৷”

ত্রিপুরাধিবৃত্ত অগ্নি বচন।
ক্ষুর প্রথম তিন দিনে স্তৃগী রমণী, মদ্যন
অগ্নন পিবে না। তৈলমর্দন, দান, স্বানান্তর-গমন,
দস্তাবাস এবং গ্রন্থমর্দন দর্শন করিবে না। মদ্যপান,
মাংসভোজন, পঞ্চ-মাংস্য পায়, দিবানিদ্ৰা, তদুপল-
ব্ধ্য, যুগন্তজ করা, গরু জন্মের ব্যবহার, বেশভূষা
করা, রোদন করা, পীঠ ও খটাদিতে আরোহণ করা
এবং অমিষ্যপিত্ত আহার করিতে নিষিদ্ধ।
“জোহমদিতো যোহমঃ সর্বকমে পুত্রিতাজেৎ ৷
সর্বপরিপাক্তা নিকং বর্জয়েত সর্বং হে বচন ৷
একাদশরাত্রে পান্য মানালস্বারবর্জিতা।
মোহিতমুখ্যাতী চতুর্থাপিপাথিভর্য্যকলা ৷
করীয়াং বৈশ্বক্য তরুং নরুং ময়ূরভাজনে
স্বপেদুভাব্যম্ভবাৎ অগ্নেদেবমহতরুং ৷
প্রায়ত চ ত্রিভায়াতে সচেসমুদিতং হব্যাং ৷”

ব্যাস মাংসবিদ।
উক্ত তিন দিনে রমণী পতি-সোপাণি করিবে না।
লাজ হইয়া গৃহস্থকে বিত্যা থাকিবে। সেই
যেন শৈবিক্ত না পায়। পরিধানে একধারি মাত্র
বস্ত্র থাকিবে। মৌনাবলম্বনে, দীনব্যয়ে অলমোদ্যম
থাকিবে। দিনান্তে একবার পানিয়া চাটাই। ভাত
দুঃপাতে ভোজন করিবে। হস্ত-পদ-নেত্রেরে চাকলা
রাখিবে না। সান্নক্শনে ভ্রুতনে শয়ন করিবে।
চারি দিনের পিতৃ-সুখ্যোদায় হইবে, দান করিবে।

সহবাস ও স্তৃগীচর্যা সম্বন্ধে এই সব নিয়ম।
ওস্ত্রিয় যুগ্মের কর্তব্য বর্ণন অনেক আছে। এখন
একে একে সমুদ্র পুত্র। পুত্রভূতির প্রকল আদি-
পত্না। তবে শিশুরা অল্পে না মরিবে কেন? যদি
বাক্য উললনকারী ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে মোকে
ভাষিবে কেন? অকালমৃত্যু শুষ্ক শিতবর্ণের নহে।
শিশুর পিতামহের ধরিতেছে। বহুপদ। এখনও পথ
আছে; এই সময় মাংসাদি হও; কবিচন্দনে আত্ম-
স্বাপনে মনোযোগী হও। অকালমৃত্যু নিবারণ
হইবে।

দাবা-খেলা।

হে জোড়ে! তোমার অপার মহিমা। ব্রহ্মা-
বিষ্ণু-মহেশ্বর সকলের উপরই তোমার প্রভুর আবি-
পত্না। তুমি সর্বোপরি। উপনিষদ্রুক্ত পদম ত্রুজ
হইতে সামাজ্য পদ-পত্তী পর্যন্ত সর্বত্রই তুমি
বিরাজমান। রাজনীতি-বেত্তারা তোমাকে ভালই
বসুক আর মন্দই বসুক, তাহাতে কিছু আসে
যায় না। তুমি যা, তা আছই। তোমার প্রসাদে
বুদ্ধিগিরি বনবাসী, নগরাজ স্বধর্মারবি; তোমার
প্রসাদেই মাহুল শঙ্করির অমীয় আদর।

হে জোড়ে! তুমি একরূপা হইয়াও নানারূপা।
যেমন এক ব্রহ্মই অবনী-সিগল-অনল-অনিপ-
স্বধারি নামে অভিহিত হয়, যেমন এক মুক্তিকাই
বট-শরাব-মালী-কুণ্ডলি নামে কথিত হয়, যেমন
এক জলই বাপী-কুণ্ডল-ভূগল-সরিংসবার-ভেদে নানা
প্রকারে বিভক্ত; সেইরূপ হে জোড়ে! তোমারও
নানা বুদ্ধি। তোমারও নানা নাম। তোমারও
নানা প্রকার। বট-মুক্তি-সংহাররূপা ভবনীর
মুক্তি ত্রুজ বা ত্রিমুখির অধিতা; তোমার সেই
মুখেরপটী মুক্তিকে প্রণাম করিয়া মজারিগতি
মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ
বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি;—হে শক্তিরূপে! আমার
বাপ্তা পুত্র কর।

এ দেশে তুমি দাবা (সত্তরক) পাশা, তাঁপ, দশ-
পটিন, খরোকাটা, মোগলপাটিন, বাবলী, চুচুটী,
দাণ্ডাওটি, হুজম, মোড়োনাটা, দালপটী, হুইটু,
বাসবিগ, বোপাটি, ভাঁনুকেটা, টাকুটুৎ প্রভৃতি
নানাবিধরূপে বালক-বালিকা, বৃদ্ধকমবৃত্তী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার
মনোবাহক করিয়া গিয়া। কিন্তু সমুদ্র মুক্তি
তোমার সমান নহে। ইহাতে তোমার রাজা-এক,
ধনী-দরিদ্র, যশা-বহা সকল প্রকার মুক্তি দেখিতে
পাই। তদ্ব্যযো দাবা বা সত্তরকই তোমার
রাজ্যমুখ্য। একজন সত্তরকপ্রিয় পণ্ডিত বলিডেন,—
“ভূতবৈদ্যবিদ প্রবোধিত্যে ন পুত্রনোয়ো
নৈবাসমগমমুখ্যঃ ক্রতুর্ভূতি সোকে।
পদাসমং ত্রিভুবনে ন চ তর্গ্যমিতি
ন জৌড়ক সত্তরকসমং তর্গ্যমিতি ৷”

ত্রিভুতে মহাবেদ অর্পণা পুত্রনো নাই,
অশ্বমেধের সমান যজ্ঞ নাই, ব্রহ্মার, ভায় তর্গ্য নাই
এবং সত্তরকের ভায় বেশী নাই।

আর একজন নৈয়ারিক বলিডেন,—“স্বয়ং
ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

জৌড়ায় সত্তরকপ্রিয় খাণ্ড শাশ্বতঃ বিজি মাম্।
জৌড়ার মধ্যে আমি সত্তরক, এবং হে পার্শ্ব!
শাশ্বতঃ মধ্যে আমাকে ভায়শাস্ত্র বলিয়া জানিবে।
আমাদের তত্ত জান নাই। সুতরাং প্রামাণ্য প্রমাণ
দিত্তে না পারি, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে,
সত্তরক-খেলা খেলার রাজা বটে। কেননা, ইহা
বুদ্ধি, খেলা। বুদ্ধির কাজকে বড়। বুদ্ধি
সকলেরই হবে। যত খেলা আছে, নির্মল্য বুদ্ধিও
তাহাতে নিপুণ হইতে পারে। “কিন্তু সত্তরকে
তাহা হয় নী। ভাস-পাশাতেও ‘পুতুভার’ প্রাচুর্য
আছে। কাগল-প্যাণ্ডা এবং দান-পড়ার মুখ্যলোপা
করিতে হয়; তাহে আবার মুকেচুরিও খেলিতে হয়।
তার পর একই আধৌ কৌশল বা বুদ্ধির আবশ্যক।
ইহাতে তত্তা নহে, পক্ষ প্রৌপক্ষ উভয়েই সমান
রত্ন সমান বশ পাইবে; কমেবনী কার্যও নাই।
মুকেচুরি নাই; সব সমুদ্রই বিস্তৃত। তার পর যিনি
সৈন্যপুত্র, বিবেচনামুক্তি আদিক প্রকারে
পারিবে—তাহারই জয় হইবে। পরায়নের জয়
করাও হইবে না। হুই জন্ম ‘ভুতন সেনা’ পাকা
খেলোয়াড় হুইচ্ছিতে এবং অজান্তকমে জোড়া
করিলে, বোধ হয়, এক খেলাই যাবজীবন থাকিতে
পারে। তবে একরূপ-স্টানা হওয়া অসম্ভব।
এক প্রস্তাব্যবহারী এক খেলার কথা ভাবিয়াছি। এক
খেলার এক মাস কারারের কথাও যেন কানে গিয়াছে
খলিয়া বোধ হয় এখন খেলা কি আর আছে?—
শুধু ইহাই নয়। সত্তরকে চারি আশ্রমের
আভাসও আছে। “সকল আশ্রমেরই শিখণীর ভাব
হইতে পনিহিত আছে। ব্রহ্মবোধের একনিষ্ঠতা,
মনের চাক্ষুশ-দমন নী হইলে সত্তরক চলে না।
বিপদ-মুগ্ধল সমসারো গৃহস্থালীর সাধনাত্মক সত্ত-
রকে সৌখ্যমান। সত্তরক-পরিপত্রের অনুভব,
একহার এবং অনিচ্ছা-কট-সমুদ্রাত্মক মনঃসংকল্পের
সঙ্গ সমান। আর সত্তরকে অসংহ ব্রাহ্মার পরিধাম-
দর্শন কি সত্তরাত্মা গতি হইতে উপদেশ-দেয় না?
তাই বলি, হে জোড়ে! এই দাবাই তোমার
পারামর্শ। এইজন্মই এই জৌড়ার ইউরোপ
এশিয়া সর্বত্রই প্রচুর আদর।

এই হেৎ মজাজৌড়ার উৎপত্তি কোন দেশে
জানিবার ক্ষমতা নাই, ব্রহ্মার, ভায় তর্গ্য নাই
এবং সত্তরকের ভায় বেশী নাই।

বর্তমানকালে প্রচলিত সমস্ত খেলার কিত্তি মাত্ৰ, পিশুড়ী ইত্যাদি নাম—পাশী কি আখিৰি ভাষায়; সমস্ত নামটাই তাই। ইহা দেখিয়া অনেকেই এই খেলায়কে বাদশাহী খেলা স্বৰ্ণাৎ পায় কিন্তু আর্য দেশের হস্ত খেলা ভাষায় বাদেন। কোন কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ববেত্তা, চীনাগণ, কেহ গ্রীসদেশে, কেহ বা মিশরে এই খেলার উৎপত্তি বলিয়া থাকেন। অথু বলিয়ারি কান্ত নরেন, এ মন্তব্যে তর্ক-বিতর্কও অমূলক আছে। প্রায়ের প্রায়—এই খেলা রাশ্যবাসিরাই আশ্চর্যকর হস্ত। রাক্ষসরাজ রাবণ, মৃত্যু হৃদ্যকিশোরী; তাহার রক্ত-পিত্তের নিগিরি কিছুতেই হয় না। ঐন্দ্রকোপের সমুদ্র প্রাণিক ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ করিলেন, তবু তাহার তপ্তি হইল না। তিনি সর্বদাই যুদ্ধার্থী ব্যক্তির অধোবৎ করিয়া বেড়ান; পুছে তিষ্ঠিতে পারেন না—দেখিয়া এই যুদ্ধে হৃদ্য-ক্রীড়া-কৌশল মন্দোদরী উভাবন করেন। তাহায়ে রানব হৃদ্য ইহায়া ক্রমে অকারণ-রথ-কৃত্তির হস্ত হইতে অস্বাভাবি পাইলেন। মাধে কি বলি, 'সমস্ত ক্রীড়া-রাজ'। কিন্তু এ প্রবাদের মূল কোন স্থলে পাওয়া যায় না।

ইহাশ্রম দুই কপিপিডিয়াতে দাবাখেলা-প্রবন্ধে প্রস্তুত লিখিত আছে,—দাবাখেলার আদি স্থান ভারতবর্ষ। এ প্রবন্ধে কইতে নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া,—

Dr. Duncan Forbes, professor of oriental languages in Ling's College London has settled the matter in favour of India, adopting the Conclusion of Dr. Hyde & Sir William Jones that "Chess was invented in India, and thence introduced in to Persia and other Asiatic regions during the 6th century of our Era."

শেষ নীমামায় এই দাঁড়াইয়াছে যে, এ ক্রীড়ার উৎপত্তি এই ভারতবর্ষে। ইহার মন্তব্য নাম 'চতুর্দশ'। এই খেলার চারিটা অঙ্গ,—

১) হস্তে বেদ্যাদ্য, চতুর্দশ-ক্রীড়া প্রথমে 'বদন্তি' রাক্ষস নাম 'রাক্ষসগণ' হস্তে প্রহরণ বিধিগর্ভক। এতৎসম্মত দ্বিবিধেই এক প্রকারে সমস্তা কৌশল করেন, ও অস্বাভাবিক উৎপত্তি বলেন; তাহাতে আদ্য বিধিই প্রচলিত করি।

হস্তী, অশ্ব, নৌকা এবং বটিকা। (রাশ্যে তৎপ্রধান) এ জন্ত ইহার নাম চতুর্দশ। আদিমি, ইহাকে 'চতুর্দশ' বলিলেও হয়। রক্ত, পীত, হরিৎ, কাল,—এই চারি রঙের বলে খেলা ইহাতে হয়। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, পূর্বকালে ভারতীয় ক্রীড়াতেও নৌকা-বাহার ছিল না। নৌকার স্থলাভিষিক্ত ছিল রথ। পারস্ত ভাষায় রথ এবং ইংরেজীর রক্ত শব্দ এই দুই শব্দের আশ্রয়; ইংরেজী ভাষায় ইহার নামান্তর কাশল। ইংলণ্ডের এখন এই খেলার খোড়ার পাখী হলে, কোন-কালের বাণী (স্ট্রাটিকেননি) ব্যবহৃত হয়। রথ থাকিলে 'চতুর্দশ' নামটির বেশ মূল্য হয় বটে, কেননা হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই প্রকৃতির সামগ্রিক চতুর্দশ; কিন্তু আমাদের সংগৃহীত চতুর্দশ-ক্রীড়াগ্রে স্পষ্টত নৌকারই উল্লেখ আছে। আর্য রতনকল ভট্টাচার্য্যও চতুর্দশ-ক্রীড়া সম্বন্ধে যে কয়েক পৃথক উক্ত করিয়াছেন, তাহাও উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

পারস্তরূপে স্থায়ী হই শতাব্দীতে ভারত হইতে এই ক্রীড়া প্রদেশে গিয়া যান। পারস্ত ভাষায় এ ক্রীড়ার নাম 'চতুর্দশ'। 'চতুর্দশ' শব্দের সামান্য পরিবর্তন হইয়াছে ইহাও। পারস্ত হইতে আর্য দেশে চতুর্দশ-ক্রীড়ার প্রচার হয়। আর্য ভাষায় 'চ' এবং 'প' নাই। সুতরাং চতুর্দশ শব্দ আর্যীয় ভাষায় বর্জিতও পারে না। বোধ হয়, কল যাত্র প্রভৃতির গ্রন্থে আদ্যবিধির 'চ' 'প' উভয়ই হয় না। দেশবিশেষে যে বর্ণোচ্চারণে এরূপ ব্যাঘাত জন্মে, ইংরেজের তদ্রূপ উচ্চারণে আদ্যবিধি তাহার প্রকৃত প্রমাণ। এরূপে আর্যবর্ষের নিকট উপস্থিত ইহা 'চতুর্দশ' 'সত্যক' নামে প্রচলিত হইল। 'পা' চকার এবং 'ক' পকারে ইহা আধিকার করিল। সে ভাষার নিয়মই এরূপ। 'আটান চতুর্দশের যে কেবল নাম পরিবর্তন ইয়াছে, তাহা নহে; পূর্বপ্রচলিত ক্রীড়া-নীতি এবং সংযান-নিয়মও পরিবর্তন ঘটাইছে। কিন্তু এ পরিবর্তন যে কোন দেশে হয়, তাহা ঠিক বলা নিতান্ত কঠিন। যাই হউক, প্রচলিত ক্রীড়াটি কিন্তু মূলধামগণের সহযোগে আর্য ভাষাে মিশ্রিত হইয়াছে। খেলার নাম প্রভৃতির লক্ষ্যই ইহার প্রমাণ পাওয়া। যখন এই দেশের চতুর্দশ ক্রীড়ার তত্ত্ব-রহ ব্যহিতছিল, এক রোমানগণ তখনও ইহার বিধি বিস্ময় অর্জন ছিলেন না। ভার্যর স্রার হইতে জন্মে জন্মে ইহাও প্রদেশে ইহার প্রচার হয়। ইহাও সমস্ত বংশের



পূর্বের কথা। এমিয়ার অস্ত্র যানেও এই সমগ্রই এই খেলার প্রচার হয়। ইংলণ্ডে প্রচার হয়, স্থায়ী একাদশ শতাব্দীতে। ইতালীতে এই ক্রীড়ার প্রথমে নাম হয় 'স্যাচ্চী'; তাহা হইতে হয় 'এচেচো'। এচেচো হইতে হইয়াছে, 'চেন'। 'স্যাচ্চী' শাস্তি ভাষা। ক্রেক ভাষায় এই খেলার নাম 'এচেচো' আর ইংরেজী ভাষায় 'চেন'। স্যাচ্চী শব্দ যে কালের অপভ্রংশ, তাহা স্থির করা যায় না। কেহ বলেন, পার্সি ভাষায় রাত্নকে 'শাহ' বলে এবং লাতিন ভাষায় বলে 'কিং'; এই 'শাহ-কিং' অর্থবা 'কিং-শাহ' শব্দের মিশ্রিতাপভ্রংশ 'স্যাচ্চী'।

চতুর্দশ-ক্রীড়াবিষয়ে এই গ্রন্থ আছে যে, তদুদ্যায় এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরি হইতে পায়। কিন্তু এ সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ হুইখানির বেশী আছে কি না জানি না। যে হুইখানির সকান পাইয়াছি, তাহাযে একাধিক নাম 'চতুর্দশ-বেলা' এবং আখানির নাম 'চতুর্দশ-প্রকাশ'। প্রায় ৭ শত বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যে ব্রিহদ্রাচার্য্য শাস্ত্রী নামে একজন চতুর্দশ-ক্রীড়ার আচার্য্য ছিলেন। তিনি এ সমস্তকে উপদেশে লিখাছেন, 'ইউরোপের কোন কোন অংশে, তাহার মতেই ক্রীড়া হয়। উত্তরির দেশে, সকল বিষয়েই উন্নতি; অবদন্তির দেশে সকল বিষয়েই অবনতি। তদন্থকে আচার্য্য হইবে; ক্রাংস, ক্রাশ্বানি, ইংলণ্ড, স্প্যানী, ইতালী এবং আমেরিকা—ইউনাইটেড স্টেটস হইতে এই দাবাখেলা সম্বন্ধে মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ হয়। কোন কোন সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক-পত্রও এই খেলার এক একটা প্রবন্ধ নিম্নলিখিতকর বাহির হয়। বিখ্যাত ক্রীড়াবিদের সংগৃহীত ভ্রাম্যঙ্গরসম খেলা, ক্রীড়া অবস্থায় কয় চাংলে মাত করা যায়, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় এই সকল পত্রিকাতে আনোচিত হয়।

ইউরোপে দাবা খেলা সম্বন্ধে প্রথম পাণ্ডেপত্র 'মিসোলাস'। তিনি একজন মধ্যযুগী পাদরী। ১২০০ খ্রঃ অব্দের পূর্বে মিসোলাস, দাবাখেলার পণ্য প্রকাশ করেন। তাহার ক্রেক অনুবাদ মুদ্রিত হয়, ১৮৩০ খ্রঃ অব্দে। লাতিন ভাষায় মুদ্রিত হয় ১৮৩০ খ্রঃ অব্দ। তৎপরে, ক্যাক্টন নামে, ক্রেক হইতে ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ করিয়া ১৮৩৮ খ্রঃ অব্দে প্রোটেষ্টান্টদের নগরে মুদ্রিত করেন। ইটালিয় সর্বিচক্টন এমবার বিশপ বিদ্য। ১৮২৩ খ্রঃ অব্দে একটা পণ্য প্রকাশ করেন। পদ্যের নাম 'স্যাচ্চী লুড'। (Scacchi Ludus.

আর ভারতবর্ষে চারি মন্ত বংশের পূর্বের দাবা বা চতুর্দশ খেলা সম্বন্ধে পণ্য রচিত হইয়াছে। মর্যে রক্ত-পাশন বেদ্যাদ্য, বুদ্ধিগতিক দেখে পণ্য ক্রীড়া ক্রীড়া শিখা দেন। বেদ্যাদ্য 'আবার 'ইতি পোতম-ভাষিৎ'। ইহা পোতমের উক্তি' বলিয়া এই ক্রীড়ার প্রচীনতমস্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইংরেজ-পণ্ডিতও বলিয়াছেন, 'স্বস্ত জন্মিবার বৎস মন্ত বংশের পূর্বেই ক্রীড়ার উৎপত্তি'। জনকোত্তরক অর্থ সেক্ষমনি, পাএচট্টও, (১৮৩৭ খ্রঃ অব্দ) এবং কেরী (১৮৩৭ খ্রঃ অব্দ) প্রভৃতি বহুতর বৎস বৎ ইংলোয়ার্ডের নাম ইউরোপে প্রসিদ্ধ। ইংরেজ ইহাদিগের সম্বন্ধে, পণ্য, পণ্য, উপাধান, উপদ্রাশ, নাতক, ইতিহাস এবং জীবনচরিত বাহা কিছু থাকিতে হয়, সব আছে। উৎসাহার উৎসাহের পরিচয় সর্বত্র।

অথমে সকলের কৌতূহল-নিবারণার্থ, পূর্ব-প্রচলিত চতুর্দশ-ক্রীড়াসম্বন্ধে 'কিছু বলা' বাহি-করিলে। পরপণ্যের ভাৎকালিক ক্রীড়াটির প্রদান দেখান।

এই ক্রীড়া চারিজন করিতে হয়। প্রথম চারি হইতে এক এক বলে দুই দুই জন খেলোয়ার। পূর্ব-পাশন খেলোয়ারের অঙ্গুল-চুক্র। আর উত্তর-দক্ষিণের খেলোয়ারের অপরদ-চুক্র। উভা-দিকের প্রত্যেকের একটা রাজা, একটা হস্তী, একটা অশ্ব, একখানি নৌকা এবং চারিটা করিয়া বটিকা বা পাদাতি। পূর্বধামের বলের রং লাল, পশ্চিমের পীত (হরিভাত)। দক্ষিণে সমস্ত এক উত্তরে কাল। ছকের চারি পাশে এক এক দিকে চারি চারিটা করে যে চারি চারিটা খুঁটি দেখিতে পাইতেছে, উহাই রাজ, হস্তী, অশ্ব এবং নৌকা। বাহিরের ছক দ্বারা বুঝিয়া লও।

১—রাজা। তাহার নাম ভূপে ২—হস্তী। ৩—অশ্ব। ৪—নৌকা। নৌকার অংশটি ছকের চারিটা। এই চারিটা প্রকার বলের সংখ্যেই উচিত করিয়া খুঁটি বটিকা বা পাদাতি। এ খেলার মতী বা দাবা নুহি। *

* বাসুদেবগিরিসংগ্রহে প্রচারিত।

বুদ্ধিগিত উভাৎ।

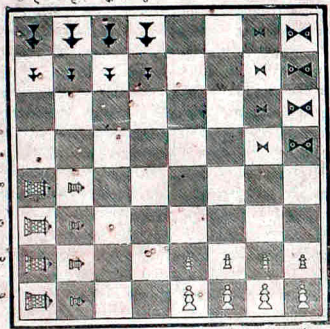
উত্তরকর্তাও যা নৌকা চাংলে কইত অর্থোবান।

একদমের খেলাও তদ্রূপী নৈতাং বৎস।

নাম উভাৎ।

স্বস্তী কোট্যভাস্যাদিবা প্রকাশিতকরেন।

চতুরঙ্গ বা প্রাচীন দাবা-খেলা।



রাজা সকল দিকেই এক্ষণ্য-বাহিতে পারেন।
 * বাটকা অগ্রে এক পদ বাইতে পারেন। কিন্তু বল
 মারিবে সমুদ্বের হুই কেপে। হস্তী চারিদিকে
 ইচ্ছামত বাইতে পারে। অর্থাৎ প্রথমান ক্রোড়ায়
 দাবার চাল আর সেন কালের হস্তীর চাল তুল্য।
 অথ, বিনশ্বর পদে গমন করে। অর্থাৎ সেই চাল
 এজন প্রচলিত। আর নৌকা কোণাবস্থাপিত
 লঙ্ঘন করিয়া চলে। * অর্থাৎ হুইপদের বেশী
 বাইতে পারিলে না।

অনুঃ পূর্বতঃ কৃত্য দক্ষিণে হস্তিঃ বলমুঃ
 পার্শ্ব পশ্চিমতঃ স্তিত্যন্তরে শ্রামণঃ বলমুঃ।
 রাজ্যো বামে বজঃ কৃষ্ণাঃ অশ্বাঃ ততঃশব্দম্।
 কৃষ্ণাঃ নৌভেদঃ পুরতঃ। হে শব্দচিহ্নমুদয়ম্।
 কোণেনৌকা দিকীভেদঃ নৌভেদে চ পদো বদ্যে।
 তুরীয়ে চ বদেনরাজ্যো বটিকাঃ পূর্ততঃ দ্বিত্যঃ।
 তিথিতত্ত্ব চতুরঙ্গরূপাঃ।

* কোর্টমেক, বিলিঙ্গারী নগরতো বাতি ভূতান্তিঃ।
 অথ এষ বটী দান্তি বলাঃ হস্ত্যাকোপনম্।
 যমেষ্টঃ বজ্রতো দান্তি চতুর্দিক্ সতীপতঃ।
 তিব্যাক্করকম্পে দান্তি লঙ্ঘনিকা ত্রিকোণিকা।
 কোণাকোঁরঃ লঙ্ঘাঃ প্রকোষকৌ দ্যুদিত্তিঃ।

আশ্রণ্যব হইতে রাজার লক্ষ্য ঠিক পাত পদ।
 রাজা, শূন্য সর পাইলে আপনার নির্দিষ্ট পদ
 হইতে জুঝিক বাইতে পারে না। বাটকা নির্দিষ্ট-
 বামে অগ্রগামী হইলেও আশ্রণ্য পরিত্যাগ করিয়া
 পাঁচ-পদ মাঝ চলিতে পারে। তার পর তাহার আর
 বাটকাও থাকে না। উত্তম বলরূপে পরিণত হয়।
 অথ, বিনশ্বর পদে গমন করে। অর্থাৎ সেই চাল
 এজন প্রচলিত। আর নৌকা কোণাবস্থাপিত
 লঙ্ঘন করিয়া চলে। * অর্থাৎ হুইপদের বেশী
 বাইতে পারিলে না।

* পদকেন বটী রাজ্য চতুর্কোণঃ প্রকোষঃ।
 ত্রিকোণেন চতুর্ভাঃ পার্শ্ব নৌকা গমনে তুঃ।
 কোষ কোষে বদেন, "পূর্ণে" এং ক্রোড়তেও বান পাঠ্য-
 ইত্যাদি।

সিংহাসন, চতুরঙ্গী, নৃপাটক, ঘটপদ, কাক-
 কীট, বৃহদৌকা এবং নৌকাভাঃ—এই ক্রোড়ায় অস-
 পরাজয়-সূচক পরিচায়ক এই মাত প্রকাশ হয়।
 এ ছাড়া চটা খেলা আছে এবং পাড়াবটী আছে।
 এক পক্ষে বা উভয় পক্ষের একটী বলও যদি
 না থাকে, তবে খেলা চটিয়া যায়। আর এক
 নৌকা এবং এক বটী থাকিলে, পাড়াবটী হয়,
 তাহাও পরাজয় নহয়। নিজ বল ও নিজপক্ষের
 বল সর্বতোভাবে রক্ষণীয়; তার পর পরকীয় উত্তম
 বল মারিতে চেষ্টা করিবে। সৈন্যসমূহ এবং
 হস্তীর সাহায্যে রাজাকে রক্ষা করিবে। রাজা
 বিনষ্ট না হয় এবং অপর রাজা আসিয়া রাজার
 নির্দিষ্ট পদ অধিকার করিতে না পারে, এ বিষয়
 বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যদি রাজা সবে অপর
 পক্ষীয় রাজা আসিয়া সিংহাসন হরণ করে, তাহা
 হইলে উহার নাম হইল "সিংহাসন"। দাবার রাজা
 সিংহাসনচ্যুত হইলে, সেই পক্ষের হার হইল।
 সিংহাসনচ্যুত হইলে, সেই পক্ষের হার হইল।
 পূর্বকালে এই খেলাইও পদ রাণা হইত;
 হার হইলে কেতাকে পদ্য অর্থ দিতে হইত।
 রাজাকে মারিয়া সিংহাসন অধিকার করিলে, দ্বিতীয়
 পদ্য দিতে হইত। *
 একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, এক এক দিকে
 দুই হুইটী রাজা। একটী রাজার আনন্দ অধিকার
 করিলে পূর্ব হার হয় না, কেবল ছত্ৰ-সিংহাসন
 রাজার সমুদ্র বলতালি বিনষ্ট হয়। তার পর
 যদি বজ্রমুগাশি-হীন উক্ত রাজার আসন অপর,
 কৃষ্ণ অধিকৃত হয়, তবেই পূর্ব হার। ইহার নাম
 সিংহাসন।

এক পক্ষের দুই রাজা বহুমান মতে অপর
 বার নিম্ন ছিল, পাঁচ-মান গড়িলে, রাজা বা বাটকা
 চালিতে হইত, ৪-মান গড়িলে গরু, ৩-মান অথ এবং
 ২-মানে নৌকা চালিবার নিয়ম ছিল। শেষে মান
 পড়ান উঠাইয়া দেওয়া হয়। * কিন্তু শব্দভেদে সে কথা
 ব্যক্ত থাকার উক্ত বর্ণে আমরা নির্ভর করিলাম না।
 * সিংহাসনঃ চতুরঙ্গী নৃপাটকঃ ঘটপদম্।
 কাককীটঃ বৃহদৌকা নৌকাঃ ত্রিকোণিকাঃ।
 অশ্বাঃ শবলাঃ রক্তঃ বজ্রমুগাশিঃ।
 নগরীভঃ চতুরঙ্গী পরিঃকোষঃ। বটীপতিঃ।
 অস্ত্রাঙ্গলপঃ রাজা যদাক্রোডো বুদিত্তিঃ।
 তদা সিংহাসনঃ তত্ত্ব ভগবতে রাজসম্মতম্।
 রাজা চ নৃপাটকঃ হস্তী কৃষ্ণাঃ সিংহাসনঃ বটী।
 তিব্যাক্কঃ বাহয়েৎ পদ্যাক্কবটীকপঃ ভবেৎ।
 ইত্যাদি।

পক্ষের দুই রাজা বিনষ্ট হইলে 'চতুরঙ্গী' হয়।
 এরূপ পরাজয়ে যে পদ রাণা হইয়াছিল, তাহার
 দ্বিতীয় হারিতে হয়। অপর পক্ষের এক রাজাকে
 মারিবার পর নির্দিষ্ট-পক্ষে অপর রাজাকে মারিয়া
 সিংহাসন লইতে পারিলে, পক্ষের চারি গুণ ক্ষেত্র-
 পদ্য পাইবে। পূর্বক্রোডা এইরূপ ভাবে ছিল।
 তার পর ৪ জনের খেলা দুই জনেই হয় ত নির্দোষ
 করিতে, এই কারণেই হুইটুক, বা শেষে দুই জনের
 খেলাই প্রচলিত হয় এবং চারি রাজার পরিবর্তে
 ইহাতে দুই রাজা ও দুই মন্ত্রী সন্নিবেশ হয়।
 এ কাণ্ডটা ঠিক ভারতবর্ষেই, প্রথম হইয়াছিল
 কি না বলিতে পারি না। তবে ৭ শত বৎসরের
 ত্রিভুগাচার্য এইরূপ ক্রোড়ায় উপদেশ দিয়াছেন।
 * এক্ষণে ইউরোপীয় এবং আমাদের দেশে
 প্রচলিত ক্রোডা বিষয়ে ক্রিষ্ণ বালিয়া ও জোন্স-
 লুইসের ভাষ্যবিধিগণে নামভেদ প্রদর্শন করিয়া
 প্রথমে শেষ করি।
 এই ক্রোডায় সকল দেশেই চৌপদ্যই বহু।
 ৩২টা বল লইয়া খেলা সর্বত্র। দুই পক্ষীয় বল,
 হুইটী বিভিন্ন বর্ণের। এদেশে লাল কালই অধি-
 কাংশ চলিত। ইউরোপে শাদা-কাল। আমাদের
 দেশে রাজার দলিগলভের পদে মন্ত্রী রাখিবার
 নিয়ম। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে কিন্তু বানদিকে
 মন্ত্রী রাখিবার রীতি আছে।
 আমাদের দেশে 'ছক' দুই বর্ণে চিত্রিত করিবার
 আশঙ্কতা নাই। ইউরোপে কিন্তু চৌপদ্যটা বর
 পর্যায়ক্রমে একটী শাদা ও একটী কাল রঙে
 চিত্রিত হইয়া থাকে। নতুন খেলার যোগে নাই।
 তাঁহাচারে শাদা রাজ্য কাল বরে, এবং কাল রাজ্য
 শাদা বরে বদে। শাদা রাজার বাম-বামে শাদা
 মন্ত্রী ও কাল রাজার দক্ষিণ-দক্ষিণে কাল মন্ত্রী বসে।
 তবেই হইল, রাজার অষ্টম পদে রাজা ও মন্ত্রীর
 অষ্টমে পদে মন্ত্রী। আমেরিক দেশে, এক-পক্ষের
 রাজার অষ্টম পদে অপর পক্ষের মন্ত্রী থাকে।
 আমাদের দেশে 'ছক' পাত্তিবার কোন নিয়ম
 নাই, ইউরোপে কিন্তু আছে। তথায় ছকখানি
 এইরূপে পাতিতে হয়, যাহাতে ছকের কোণের
 শাদা বর হইলেন—খেলোয়াড়ের দলিগলভের
 পক্ষে।
 যে চৌপদ্যই বলা কাকল, কাকপুত্র, বা কাক
 মলকে দাবা-খেলা হয়, এই দেশীয় ভাষায় তাহার

নাম 'জরু' সংকৃত নাম অষ্টকোত্তী, ফ্রোক নাম
এচিকোএর, ইংলিশ নাম চেস-বোর্ড, পারস্ত
ও হিন্দী, বিমাত।

রাজা (সংস্কৃত-রাজানী), বাদশাহ (ফার্সী),
শাহ (পারস্ত), কিং (ইংরেজী প্রভৃতি)।
মন্ত্রী (সংস্কৃত), দাবা (বাংলা) ও কবীর বা
ফক্সী (হিব্রী-পারস্ত), হুইন (ইংরেজী)।*

হস্তা বা গজ (সংস্কৃত), হাতী বা গজ (বাংলা),
পিল (ফিলী), আলফি বা লিল (পার্স), বিপুপ
(ইং)। এতদ্বির ফল, লীসার, এলট্রিন ইত্যাদি
নামও পাশ্চাত্য বহুও প্রসিদ্ধ।

বোল্টিক বা অর্থ (সং), বোল্ডা (বাং), বোডা
(ফিলী), আপন (পার্স), নাইট (ইং)।

নৌকা (সং-বাং), কিত্তী (ফিং), রুব
(পার্স) রুব বা ক্যানন (ইং)।

বটিকা, বটী, পলাতি, পতি (সং) বোডে
(ফার্স), পিয়াদা (ফিং-পার্স), পুন (ইং)।

একদশশীর্ষ জৌড়কণ, সকলেই অবগত আছেন,
যে সোড়ে হয় পন অগ্রগামী হইলে, বিপক্ষের
কোন না কোন খেলের (বাস্তবতার বল থাকে চণী
প্রধান বল বোধ হয়) পক্ষে উপস্থিত হয় এবং
সেই পক্ষের অধিকারী-বল-স্বরূপে পরিণত হয়।

রাজা ও দাবার সোড়ে কেবল দাবা হয়। ইউরোপীয়
জৌড়কণের মতে, মরক্ক-কম্বাই মন্ত্রী হইতে
পারে। অথবা জৌড়কণ যে বল ইচ্ছা করেন, তাহা
লইতে পারেন। আমীরের মতে, বৌদ্ধা পক্ষের
কোন, বিশেষ কারণ ব্যতীত সে চালাই চলেন না।
ইউরোপীয়দিগের মতে সে চালাই কোন বলই চলিতে
পারে না। আমীরের দেশে প্রথমে কেবল, হুইটী
চাল পাওয়া যায়, তাহাতে একটী বোড়ে একবারে
হুইটল অগ্রসর হইতে পারে, কেহ বা একপদ
করিয়া হুইট বোড়েও চালাই, কেহ বা অজ্ঞ বলও
চালাই। ইউরোপীয়দিগের মতে প্রথম এক চাল
সকট বোড়েই হুইটল চলিবার সম্ভাব্য আছে।

এ দেশে, খেলাত পরিণামে জয়-পরাজয়ের
সূচক হইল, মাত, আবদমাত, পিলোডী, (গজ-
চক্র প্রভৃতি) অথচক্র চতুর্ভু, পঞ্চাং, সপ্তাং
এবং নব্বাং। ইহার পরিত্যক্ত জৌড়কমারের অবগত
আছেন। এতদ্বির অর্থসংজ্ঞা, বোডেবোডাং এবং

বোডেবোডাং—এই তিনটি মাতের বিশ্বসংজ্ঞা।
হুইটী গজের উপরুপরি কিত্তী দাবা-মাত করাকে
পঞ্চজাং বলে। বোডেবোডাং বোডেবোডাংও
এইরূপ।

চটী খেলা, চতুর্ভালা, ফকির, বাঁচা-বল, এই
কথপ্রকার পরিণাম, কাহারও জয়-পরাজয় ঘটনা
করে না। এ দেশেও অনেক খেলা চতুর্ভালা ও
বাঁচা-বল প্রচলিত হয় না। ইউরোপে, মাত, আবদ-
মাত এবং চটী খেলা ভিন্ন এ খেলার আর কোন
পরিণাম বা পারিপাশ্বিক সংজ্ঞাতত্ত্ব প্রচলিত নাই।

বল ও বর না দেখিয়া বাহালা খেলিয়া থাকেন,
তাঁহাদিগকে 'গয়বি খেলোয়াড়' বলে। এদেশে
এরূপ খেলোয়াড়ের সংখ্যা নিম্নতম বিরল। ইহাতে
অসামান্য মেধাশক্তি ও বিশ্ব-সুজ্ঞতার আবশ্যক।

ইউরোপে আর একটী খেলা চলিত আছে,
ছকে চৌমুখি বর দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, উক্ত
জৌড়ী দাবা-খেলা হইতেই হইয়াছে।

প্রকৃত এইখানেই শেষ হইল। একজন,
বড়, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রবন্ধটীতে লিখিলেন,
আমীর মতে কিং দাবাখেলার প্রবন্ধ, কিছুই নহে;
ইহা না সাহিত্যিক, না দার্শনিক, না ঐতিহাসিক,
না প্রাণিগত বস্তুই; এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি-
লেন কেন?'*

আমি বলিলাম, আমীর হস্তে প্রবন্ধের সম্পূর্ণ
মর্মভাষা রক্ষা না হইতে পারে—কিন্তু দাবাখেলার
প্রবন্ধ কিছুই নহে; এ দাবাও তোমার জুল; দাবা-
খেলার প্রবন্ধ সর্ববোভেদ, সর্ববিষয়ক।

এই খেলাটী কী? 'কাব্য রম্যাকং বাকম'
রম এমন আর কিং আছে? একপ্রকার দর্শন-
বিচারও বটে। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞান ইহা অপেক্ষা
অধিক আর কিং হয়? এই রাজার সম্ভার, মাতর
উদ্যম, অজুল উৎসাহ; পরমেশ্বর আর কিছু নাই,
সব ভৌত। প্রাণিতত্ত্বের চরম দৃষ্টান্ত এইখানে
এখন খেলার প্রবন্ধকে সাহিত্যিক, দার্শনিক,
প্রাণিতত্ত্ব-বস্তুত, বাহ্য ইচ্ছা বলিতে পার। আর
ঐতিহাসিকও বলিতে পারি। প্রবন্ধের মধ্যেই
ইতিহাস আছে।

শ্রীপকানন তর্করত্ন।

ফুলেরণু।

গবে গবে।

চারিত্রী বহুর পরে—নহে দিন চারি,
হুই জন্মে দেখে আর নয়নে নারেন,
শঙ্কর শিবির' বেন উঠি রহে নারি,
ধমকি চমকি ত্রাসে জুলুক দরিনে।
কে জানে নারীর আকি কি যে মুপ্রভাত,
কার মুখ'দেখে তার মন ভেঙ্গে ছিল,
দিলবে দেখিল মুখিক কত উল্লাসত,
কত অমঙ্গলে রানি আমার দেখিল।
মলিন হইলে গেল মুখ-ভরা হাসি,
উদ্যম উৎসাহ গেল, তেজের গেল নল,
হৃদয়ের বন্যবিলু' ফেলিল রানি,
কোণাকার কাল মেঘ—তিলক আছাদন।
আকাশের চাঁদ মেঘে অন্ধকার ঢাক,
বিরক্ত নারীর মুখে চির মেঘ থাকে।

চারিত্রী বহুরে আজ চারি চক্ষু দেখা,
কোথা হবে চারি পটে মধুর মিলন,
তা না হয়ে হুই জন্মে দুই এক একা,
বাঁড়ারে রয়েছে যেন একটী স্পন্দ।
পুরুষের আঁখি হুটী ভাঁকে আসে আরা,
রমণীর আঁখি হুটী করে না উত্তর,
পুরুষের হাত হুটী ধরিবারে চায়,
রমণীর হাত হুটী ধরেন মর মর।
জগাবি আকানি' বেন পুরুষের প্রাণে,
চাহে নারী-শমধর করে আলিঙ্গন,
রমণী পলায়ে যায় ক্রান্ত নাথানে,
নারীর প্রেমের স্বপ্ন কে জানে কেন্দ্র।
আমি এ পুরুষ আর সরলা এ নারী,
পাশে পুখে আঁখি পথে দেখা হুজবানি।

গজ লিখিত।

এ কেনে পায় ঠেলে আবার আদর,
পুনরাব পদাধাত—দূর দূর দূর।
নারীর কোঁচক জোড়া বড় ভয়ঙ্কর,
কে জানে রমণী আঁখি এমনি নিষ্ঠুর।
পাখ-ধরে করেছিল আদিকার কালে,
মরণ, লিখিত পত্র—পুণ্ড্র আদর।
দিল সম্ভবিত চুর বিষ ভরা গালে,—
আলো এক বারি পত্র লয়নের না আর।
নুক চিরে আসে যায় শ'বের কাষত,
রমণী শ্বেদনি আঁখি পেট-ভরা দাঁত।

'লিখো একবারি পত্র যাঁদের সরলা,
পাখনা তোমাদের আমি সে আশা বিকল,
অতি উৎসে—অতি উৎসে 'হুই চমককা',
অতি নিম্নে খেলো আমি চকোর ঢাকল।
পার না তোমাদের আমি, শুধু করুণার
লিখো এক বারি পত্র লয়নের রানি,
জীবন রাখিবে হেবি, এই বাস্তবতা।'
লিখিল না এক ছত্র অঙ্গু পলায়ি।
ছয়বে ছয়বে নারী এক কথা কয়,
নয়নে নয়নে কহে আর এক ভাব,
শুধু অধরা হ'লে সে যেন সে নয়,
নাম শুনে কহি পত্র লয়নের জিজ্ঞাসা।
রমণী এমনি ভোলে ভালবাসে থাকে,
ছয়বে একটী নাথি আঁখিছাড়া থাকে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

আমাদের হাজত।

বস্তু অধ্যয়ন।

মাদানো মহোদয়।

অঙ্গুর এবং পোকা-কটিক, সেই দশাধরে
ছুড়ী-পাড়ার একটিকে উপবিষ্ট; আমি গম্বুশাসনে
একা অধিষ্ঠিত। আমরা তিনজন নীরবে পাড়াত্তে
উঠিলাম; নীরবেই বসিয়া রহিলাম।

একিকে কিস্তি কৃষ্ণবাসু' বলার আওয়াজ পাইতে
লাগিলাম। তিনি হাসিয়া হাসিয়া, তাঁহার পোকা-
কটিকগুলির সাহিত বেশ কথা আরম্ভ করিয়াছেন।
তাঁহার প্রোচনী আদর্শবাদী—ইত্তরন-প্রিয়, এবং
পাল-ম-পুট।

* হিন্দুধর্মের মতীকে কেহ কেহ 'গানী' বলিয়া থাকেন।

কেই নলপতি ঠিক করিয়া, গর্বমেতে বঙ্গবাসীকে
জন্ম করিবার চেষ্টায় আছেন। এবার আর বঙ্গবাসীরা
রক্ষা নাই। এইরূপ নানা কথা তথায় আমি
শুনিন। তাই আমি বলিতেছিলাম—এই মহা-
সভার জন্যই আজ আমাদের এই বন্দী।

আমি শোনা কথায় আঁধা স্থাপন করিতে
নাই। নিমেষ, অজ্ঞাত-দুশ্মনীল ব্যক্তির কথা
বর্জ্যই নহে। তাহার উকুন, কি আঁধা-
লগ্নে দেখোনা—তাঁহা তুমি জানিলে কিভাবে?
অথবা তাঁহার ব্যহিরের কোন বস্তুর স্পেক
হইলেও, হইতে পারে। এক কথা, গর্বমেতে
সেই মহাসভার জন্ম, আমাদিগকে জন্ম করিবার
উদ্দেশ্যে আমাদিগকে এই কীটনে ফেলিবার চেষ্টা
করিচ্ছেন—এমন কথা মুখে আনিতে নাই।
রাষ্ট্রের প্রতি অবিশ্বাস করিতে নাই। রাষ্ট্রকে
নেহেড়া বুলিয়া জানিও; এবং বঙ্গবাসীরা ভক্তি
করিয়া সে বাহা হউক, আমার কাছে, এ
কথা বলিয়াছ, স্মৃতি নাই—কিন্তু অস্ত্রের
স্পিকট এক্সপ কথা কখনও বলিও না।

অন্য, আমি এও বুঝি নাই। বাহা হউক,
—এ কথা আর কাছারও নিকট বলিব না।
আবার আমরা নীরব হইলাম। দেখিতে-দেখিতে
পাড়ী আলিপুর-কারাগারের দ্বারদেহে আসিয়া
পৌঁছিল। আগে সেই পোরা-কনটল এবং
চেচোয়ানের পার্শ্ব দেকী-কনটল নামিল। তার
পর পোরা-কনটল, আমাদিগকে নামিতে বলিল।
আমরা অবতরণ করিলাম। কুম্ভাবু ও শুভবাবুর
সহিত মিলিত হইলাম। কুম্ভাবু জিজ্ঞাসিল—
“কেমন?” আমি বলিলাম, “মন্দ নয়। তবে সেই
করাবোরের অব্যবস্থার লগ্না পাড়ীতে আসিতে
পারিলেই, আরও ভাব্য হইত।”

সপ্তম অধ্যায়।

হরিণ-বাড়ীর হাজতে প্রবেশ-মাত্র।

কারাগারের দুই দ্বার। একটা খুব বড়; তাহাত
বড় মধ্যমি পাড়ী প্রভৃতি অনারসেই বাইতে পারে।
দিয়েই বড়-বড় দ্বারের দিকগে আর একটা দ্বার দাঁড়াই।
আমরা পৌছিয়ামাত্র দুই দ্বারটা উন্মোচিত হইল।
অবশ্য এত জন পোরা-কনটল ভিতরে প্রবেশ
করিলে; অতঃপর তাঁহাদের পদাশ্রয় পাঁড়িয়া

বহিল। আমরা চারিজন সেই দ্বারের এবং পোড়ার
মধ্যে অবস্থিত করিতে লাগিলাম। অর্থাৎ অজন্ম
পরেই প্রবেশের আঁধা মাত্র আমরা চারিজন
এক একে ভিতরে বাইতে লাগিলাম। এক ব্যক্তি
একটুই, তিন, চারি—এই বলিয়া আমাদিগকে গণনা
করিয়া ভিতরে ঢুকাইল। ভিতরে একজন ইংরেজ
জিলা; তাহার সহিত ঐ দুইজন পোরা-কনটলের
কি কথাবার্তা হইল। তার পর সেই পোরা-বয়
পুনরায় সেই দুই দ্বার বুলিয়া বাহিরে গেল; এবং
এতদেকে এক এক বারি পড়িয়া আসান আপন
গন্তব্য পথানুযায়ী খাড়া করিল। দুই-দ্বারের রেলি-
ংরে কীক দিয়া তাহাদের গৃহ-গমন আমি বেশ
দেখিয়া লইলাম।

আমরা ফটক হইতে একই দূরে আসিয়া
দাঁড়াইয়াই বহিলাম। একই পর একজন চাপুরানী
আমিরা নাএব-জেলারের নিকট আমাদিগকে লগ্না
পেল। নাএব-জেলারের খরটির তিন দিকে ইটের
প্রাচীর; মধ্যস্থে কাঠের বেগ—তাঁহা আমাদের বৃক-
ম্যান উক। আবার প্রায় দশ মিনিট কাহা আমরা
সেই রেল ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া বহিলাম। আমি
বলিলাম,—“দেখানে লগ্না বাইতে হয়, সেই ধানে
লগ্না বাউক, পাঁড়িয়া থাকিব কতক্ষণ?” এমন সময়
পেটল-লন-চাপরানী-দুই-বারী নাএব-জেলার আসি-
লেন। তিনি বলিলেন। বয়স ৩০-৩২ বৎসর হইবে।
তিনি আসিবারাত্র কুম্ভাবু বলিলেন,—“মহাশয়।
আমরা, দুখা পাঁড়িয়া থাকিব। কত?—আমাদিগকে
হাজত-ঘরে পাঠাইতে বিলম্ব কি?” নাএব-জেলার
জিজ্ঞাসিল,—“আপনারাই কি বঙ্গবাসীর স্বভা-
বিকারী, সম্প্রদায়, মাহোজার—”

কুম্ভাবু। (হাসিয়া) হাঁ। আপনি কিরূপে
জানিলেন?
নাএব-জেলার। চেয়ারার বুঝা যায়। আজ আমি
ষ্টেসমানে আপনাদের কথা দেখিতেছিলাম।
জানানে বালাস কিছুইতেই হইল না বটে।
“কুম্ভাবু। জানামনে বালাস পাইলে, কি
দ্বার আপনার নিকট আসি?
নাএব-জেলার। অ্যা আপনাদের বারিষ্টার
কে ছিলেন?
কুম্ভাবু। মিঃ হিল সাহেব এবং লালমোহন
বোথ।
নাএব-জেলার। জাহান্নাম সাহেবকে দিলেন
না কোন?

কুম্ভাবু। তিনি পুলিশ-আদালতে আসিতে
রাখা হন নাই।

নাএব-জেলার। আপনাদের অব্যবস্থার বঙ্গ-
বাসীতে কে এ সব কথাবার্তা কোন উত্তরে নাই।

কুম্ভাবু। আপনি কি বঙ্গবাসীরা গ্রাহক?

নাএব-জেলার। হাঁ। আর বোনা দশটায়
সময় বঙ্গবাসী পাইরাছি—কিন্তু মোকদ্দমার কোন
কথা খেলিলাম না।

কুম্ভাবু। গত কল্য শুক্রবার বেলা ১১টার
সময় আমাদের মোকদ্দমা দাখল হইয়াছে। আর
বঙ্গবাসীর ছাপা আরম্ভ হইয়াছে, গত পূর্ব
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা হইতে—অতঃপর বঙ্গ-
বাসীতে এ মোকদ্দমার কথা যেমন করিয়া
থাকিবে?

নাএব-জেলার। শনিবারে বঙ্গবাসী প্রকাশ হয়—
তা, বৃহস্পতিবারে ছাপিতে আরম্ভ করেন কোন?

কুম্ভাবু। বৃহস্পতিবারে ছাপা আরম্ভ না

করিলে চলে কি? প্রায় ২০ হাজার কাপড়
ছাপিতে হয়—বৃহস্পতিবার সমস্ত রাত, শুক্রবার
সমস্ত দিন, আর শুক্রবার রাত্রি প্রায় ২৪টা পর্যন্ত
ছাপিলে তবে বঙ্গবাসীর ছাপা শেষ হয়। ডাকে
প্রায় চৌকুছাজার কাপড় মধ্যস্থে যায়—এ সমস্ত
কাপড়ই শুক্রবারে পাঠান হয়—তাই অধিকাংশ
গ্রাহক শনিবারেই বঙ্গবাসী পাইয়া থাকেন।

নাএব-জেলার। আপনাদের প্রতিশ্রুতিবাহকই কি
টিক বিশ হাজার করিয়া বঙ্গবাসী ছাপিতে হয়?

কুম্ভাবু। কখন কম, কখন বেশী। যোবার
ভারতবর্ষের পোষ্ট এলবাউন্টিকুর কলিকাতায়
আসিয়াছিলেন, সেবার প্রায় পঁচিশহাজার বঙ্গবাসী
ছাপিতে হইয়াছিল। মহাসম-সম্মত-বিষয়ক
আইনের বঙ্গা আদোলন হয়, তখন প্রতিসপ্তাহে
২০০৫ হাজার করিয়া বঙ্গবাসী ছাপা হইত।
সাধারণত ১১২০২২ হাজার, কখন বা ১৮ হাজার
বঙ্গবাসী প্রতিসপ্তাহে ছাপা হইয়া থাকে।

নাএব-জেলার। আপনারা এখন হাজতে
আসিলেন—এইবার যোগে যোগ আপনাদের বঙ্গবাসী
র আর্থিক বিক্রয় হইবে। কোননা, এক্ষণে দেশে
অ্যানক অসোলন উপস্থিত হইবে।

কুম্ভাবু। (হাসিয়া) বহুত মন্দ নয়। যদি
কারাগারে থাকিলে, বঙ্গবাসীর পক্ষাধিকার গ্রাহক
হয়, তাহা হইলে বন্দী—না হয়, কারাগারে
বাকস্বাধা থাকিয়া বাই।

আমি কুম্ভাবুকে বলিলাম,—“আমার নিকট
ধর্ম;—গ্রাহক নহা বাড়িলেও, আমি কিছুদিন
কারাগারের মজা দেখিতে প্রস্তুত আছি। আমি
স্বার্থপর নহি। কারাগারের জন্যই আমি কারাগারে
বাস করিতে অভিলাষী।

নাএব-জেলার। (হাসিয়া) আমি আর কি
বলিব?—শুভবাবু আপনাদের ভাল কল্পন।

আমি। বশেষ। আমাদের হাজতে বাইবার
আর বিলম্ব কি? শুভর সন্ধ্যা। প্রস্তুতই হাজতটা
দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ছুটুকি করিতেছে।

নাএব-জেলার। মহাশয়ের নামটা কি?

আমি। ত্রিভোজেন্দ্রচন্দ্র বহু।

নাএব-জেলার। আপনাই বঙ্গবাসীর স্বভা-
বিকারী?

আমি। অভিযোগ ঐরূপই বটে।

নাএব-জেলার। জেলার-সাহেব আসিলেই,
আপনাদের নাম-আদি লিখিয়া, এখন হাজতে
পাঠাইতেছি।

আমি। জেলার-সাহেবের মাহিনা কত?

নাএব-জেলার। মাসিক ২৫০ টাকা।*

আমি। আপনার মাহিনা কত?

নাএব-জেলার। মাসিক ৪০০ টাকা।

আমি। সাহেবের ঠিক নিম্নেইত আপনার

পদ—তবে মনিহারি এত তারতম্য কেন?

নাএব-জেলার। (হাসিয়া) তা, কেমন করিয়া
জানিব?

আমি। রেন-কোম্পানীর নিয়মামুত্রে প্রথম
শ্রেণীর ভাড়া—খিটর শ্রেণীর খিটর। এখানে
কারা-কোম্পানীর নিয়মামুত্রে বড় সাহেবের মাহিনা
না হয় আপনার চতুর্ভুজ হউক—তা, নয়—চতুর্ভুজ
অপেক্ষাও বেশী।

জেলার-সাহেবের কিছু, এখনও আসিলেন না।
একজন ক্রাক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি
আমিয়ারি বলিলেন, “মহাশয়, আপনারা বুঝি বঙ্গ-
বাসীর—”

ওঁহাকে আর অধিক কথা বলিতে হইল না।
কুম্ভাবু বলিয়া উঠিলেন,—“আমরা মহাবাসীর—
তাই বটে। এখন জেলার-সাহেবের কতদূর বলিতে
পারেন?”

* মাহিনা ২৫০, কি ২৫০ টাকা বলিচ্ছে; তাহা
এখন ঠিক মনে নাই।

চাক। তিনি এলেন বলে! মহাশয়! আমিও একজন বঙ্গবাসীর গ্রন্থক।

এমন সময় নাব-জেলার উঠিয়া গেলেন,—
বাত্মকালে বলিলেন,—“আজ্ঞা, আমিই মাথেকে
সেঁপিতেছি। এরপূর্বে দাঁড়াইয়া প্রকৃতই আপনা-
দের কষ্ট হইতেছে।”

জন্মবাসু এতক্ষণ এক্ষণে নাব-জেলারের
গৃহের বাকি দিয়া কায়া-উদ্ভাসেতে শোভা সন্ধান
করিতেছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন,—
“বড় চমৎকার বাপন! বাসের শোভা দেখুন! কে
যেন কাঁচি করিয়া এক একটা, বাস কাটিয়া সাজাইয়া
রাখিয়াছে। ও বাপনে কি বেড়াইতে যের না?”

“আমি! এখন চব্বন হাজত-বসে;—এর পর
দেখা যাইবে। তবু বাপনে কেন,—সম্ভবতঃ সমু-
দ্র-জেলটাকই এর পর আমাদের পুঁথি অধি-
কার করিতে হইবে।” হাজতে রি-কম্পেল,—আজ
ডুই পাত্তনা; আর কারাগারে প্রকাশ হইল।
হাজত-ভোগের মাছের ডিম কোটে,—মাছ এক
কুসুমি বড় হইলে, তাহা কারাগারের দাঁড়িকার
কেনিতে হয়। হাজতে ফুল, কাপাসের ফল
হাজত বিবাহ-বাসন্ত, কারাগারে পুত্র-মুখলন।

জন্মবাসু হাসিয়া বলিলেন,—“আমি আপ-
নাকে জিজ্ঞাসিলাম, বাপনের কথা। আপনি
বলিতে আরম্ভ করিলেন ফুল, ফল, বিবাহ, প্রভৃতি-
বর্ণনা—এক রকম?”

“আমি। পূর্ন হইতেই ত বলিয়া আসিতেছি,
—এইরূপই হাজতের রসিকতা।”

জন্মবাসু নীরব হইয়া রহিলেন। এমন সময়
নাব-জেলার প্রত্যাপ্ত হইয়া বলিলেন,—“আমিই
আপনাদের নাব-আদি ঋণায় লিখিয়া লইতেছি।
আর আপনাদের নিকট যাঁহা কিছু আছে,—টাকা,
পয়সা, শব্দী, আঁঠু, মাছলি যাঁহা কিছু আছে—
তৎসমস্তই আমাকে দিন। দেখিবেন, কিছুই যেন
আপনাদের নিকট না থাকে। সোমবার আবার
পুণিস-আদালত বাহিরার সময় এ সমস্তই কেবল
পাইবেন। আর, আপনাদের যে টাকা আমার
নিকট থাকিবে, তাহা বারা আপনারা হাজতের
আরম্ভকার সামগ্রী খরচ করিতে পারেন।”

জন্মবাসু বলিলেন,—“আবার সুবিধা সেই রকম
হইবে।”

আমি। আরও কিছু নূতন রকম আছে
কিনা দেখুন। নূতন ন্যাস হইলে, মজা নাই।

আমাদের অঙ্গে বাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তই
বলিয়া দিয়া যেন বিধবাবৎ দাঁড়া
রহিলাম।

একমুখি পাণ্ড হইতে আমাদিগকে পূর-
দিলেন,—“মহাশয়! জামা-চাদর খুলিতে বলিলে
সহজে আপনারা বলিবেন না। আপনারা জেবার-
মাথেকে বলিবেন,—“এ জামা চাদর পরিকা-
আছে,—ইহা যারা হাজতে কোন সংক্রামক রোগ
বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।”

পর জেলার-মাথের এইবার আমি যেন
আমাদের জামা-চাদরের প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য
করিলেন,—কিছু তাহা খুলিতে বলিলেন না।
হাসি-হাসি মুখে আমাদিগকে এইভাবে সম্বোধন
করিলেন,—“বাবু! আপনাদের নূতন-জীবন উপ-
স্থিত। হাজত বন্ধন দেখেন নাই—এইবার
দেখিতে পাইলেন। সম্ভবতঃ হাজত ভাপনাদের
কোন কয়ের কারণ হইবে না। লুচি, মদ্য,
প্রভৃতি বাহা কিছু আহাির সামগ্রীর দরকার
হইবে, তাহার বর্দ আমাকে দিলে, আমি উপযুক্ত
লোক দ্বারা তাহা বাজার হইতে আনিয়া দিব।
আর, আপনাদের যখন বাহা কিছু আবশ্যক
হইবে, বা অভিবোধ করিবার থাকিবে, পত্রের দ্বারা
তাহা আমাকে জানাইবেন। আমার সম্ভাব্য থাকিলে,
তৎসমস্তই আমি তাহার প্রতীকার করিব।”

জেলার-মাথের প্রধান করিলেন। কিছুক্ষণ
পরে একজন অগ্রহী আসিল। সে আমাদিগকে
সঙ্গে করিয়া হাজতালয়মুখে চলিল। পরমুখে
আমরা হাজত-প্রাঙ্গণে প্রবেশলাভ করিলাম। বেলা
তখন সাড়ে ছয়টা।*

আমার যত্ন-শক্তি উপর নির্ভর করিয়াই এই
সকল কথা লিখিত হইল। হুগত জল না থাকি-
বারই সম্ভাবনা।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

* বাত্মকালে বঙ্গ প্রদেশে অনেক অশ্রু, কপোজ
হইয়াও প্রকাশিত হইল না। বিশেষ, হাজত-জীবনের
প্রস্তাব কথা এখার কিছুই বলা হইল না। পাঠক! রস-
বহুস্তর কিছুই আশ্বাসিত করিতে পারিলেন না। আপনারা
বারে হাজত-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার মনস-
রহিল। এ নদে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-এই, শ্রীকৃষ্ণ-
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিমূর্তি, শ্রীকৃষ্ণক বন্দ্যোপাধ্যা-
য়ের প্রতিমূর্তি, ও শ্রীমদ্রথোদর বসু-এই প্রতিমূর্তি
অঙ্কিত হইবে।